সচিত্র মাসিক পত্র

প্রথম বর্ষ, ২য় খণ্ড

পৌষ ১৩৩৪—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

সম্পাদক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৪৮, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য ৬॥০ টাকা

বিষয় সূচী

ষাণ্মাসিক সূচী

ষাণ্মাসিক সূচী

লেখক সূচী

বাণ্মাসিক সূচী

ষাণ্মাসিক সূচী

ষাণ্মাসিক সূচী

ভ্রষ্টলগ্না

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র

প্রথম বর্ষ, ২য় খণ্ড | পৌষ, ১৩৩৪ | প্রথম সংখ্যা

নূতন শ্রোতা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

শেষ লেখাটার খাতা
প'ড়ে শোনাই পাতার পরে পাতা,
অমিয়নাথ স্তব্ধ হ'য়ে দোলায় মুগ্ধ মাথা।
উচ্ছ্বসি কয়, তোমার অমর কাব্যখানি
নিত্যকালের ছন্দে লেখা সত্যভাষার বাণী।

দড়ি-বাঁধা কাঠের গাড়িটারে
নন্দগোপাল ঘটর ঘটর টেনে বেড়ায় সভাঘরের দ্বারে
আমি বলি, "থাম্‌রে বাপু থাম্‌,
দুষ্টুমি এর নাম,—
পড়ার সময় কেউ কি অমন বেড়ায় গাড়ি ঠেলে?
দেখ্‌ দেখি তোর অমি-কাকা কেমন লক্ষ্মী ছেলে!"

অনেক কষ্টে ভালোমানুষ বেশে
বস্‌ল নন্দ অমি-কাকার কোলের কাছে ঘেঁষে।
দুরন্ত সেই ছেলে
আমার মুখে ডাগর নয়ন মেলে
চুপ ক'রে রয় মিনিট কয়েক, অমিরে কয় ঠেলে,

"শোনো অমি-কাকা,
গাড়ির ভাঙা চাকা
সারিয়ে দেবে বলেছিলে, দাও এঁটে ইস্ক্রুপ্ !"
অমি বল্‌লে কানে কানে, "চুপ্ চুপ্ চুপ্ !"
আবার খানিক শান্ত হ'য়ে শুন্‌ল ব'সে নন্দ
কবিবরের অমর ভাষার ছন্দ

একটু পরে উস্‌খুসিয়ে গাড়ির থেকে দশবারোটা কড়ি
মেজের পরে করলে ছড়াছড়ি।
ঝম্‌ঝমিয়ে কড়িগুলো গুন্‌গুনিয়ে আউড়ে চলে ছড়া,—
এর পরে আর হয়না কাব্য পড়া।
তার ছড়া আর আমার ছড়ায় আর কতখন চল্‌বে রেশারেশি,
হার মানতে হবেই শেষাশেষি।

অমি বল্‌লে, "দুষ্টু ছেলে !" নন্দ বল্‌লে, "তোমার সঙ্গে আড়ি,—
নিয়ে যাব গাড়ি
দিন্‌দাদাকে ডাকব ছাতে ইষ্টিশনের খেলায়,
গড়গড়িয়ে যাবে গাড়ি বদ্দিবাটির মেলায়।"
এই বলে সে ছল্‌ছলানি চোখে
গাড়ি নিয়ে দৌড়ে গেল কোন্ দিকে কোন্ ঝোঁকে।

আমি বল্‌লেম, "যাও অমিয়, আজকে পড়া থাক্,—
নন্দগোপাল এনেছে তার নতুনকালের ডাক।"
আমার ছন্দে কান দিলনা ওযে
কী মানে তার আমিই বুঝি আর যারা নাই বোঝে।
যে-কবির ও শুন্‌বে পড়া সেওতো আজ খেলার গাড়ি ঠেলে,
ইষ্টিশনের খেলাই সেও খেলে।
আমার মেলা ভাঙবে যখন দেবো খেয়ায় পাড়ি,
তার মেলাতে পৌঁছবে তার গাড়ি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার পড়ার মাঝে
তারি আসার ঘণ্টা যদি বাজে
সহজ মনে পারি যেন আসর ছেড়ে দিতে
নতুন কালের বাঁশীটিরে নতুন প্রাণের গীতে।
ভ'রে ছিলেম এই ফাগুনের ডালা
তা নিয়ে কেউ নাই বা গাঁথুক আর ফাগুনের মালা ॥

২

বছর বিশেক চ'লে গেলো সাঙ্গ তখন ঠেলাগাড়ির খেলা ;
নন্দ বল্‌লে. "দাদামশায় কি লিখেচ শোনাও তো এই বেলা।"
পড়তে গেলেম ভর্‌সাতে বুক বেঁধে,
কণ্ঠ যে যায় বেধে ;
টেনে টেনে বাহির করি এ খাতা ঐ খাতা,
উল্টে মরি এ পাতা ঐ পাতা।
ভয়ের চোখে যতই দেখি লেখা,
মনে হয় যে রস কিছু নেই, রেখার পরে রেখা।
গোপনে তার মুখের পানে চাহি,
বুদ্ধি সেথায় পাহারা দেয় একটু ক্ষমা নাহি।
নতুনকালের শান-দেওয়া তার ললাটখানি খর খড়্গসম
শীর্ণ যাহা, জীর্ণ যাহা তার প্রতি নির্ম্মম।
তীক্ষ্ণ সজাগ আঁখি
কটাক্ষে তার ধরা পড়ে কোথা যে কার ফাঁকি।
সংসারেতে গর্ত্তগুহা যেখানে-যা সবখানে দেয় উঁকি,
অমিশ্র বাস্তবের সাথে নিত্য মুখোমুখি।
তীব্র তাহার হাস্য
বিশ্বকাজের মোহমুক্ত ভাষ্য।

একটু কেশে পড়া করলেম সুরু—
যৌবনে যা শিখিয়েছিলেন অন্তর্যামী আমার কবিগুরু,—
তীব্রমধুর তরাস-দোদুল বক্ষ দুরু দুরু,—
উড়ো পাখীর ডানার মতো যুগল কালো ভুরু ;

নীরব চোখের ভাষা,
এক নিমেষে উচ্ছলি দেয় চিরদিনের আশা,
তাহারি সেই দ্বিধায় কম্পমান
দুটি একটি গান,
এড়িয়ে চলা জলধারার হাস্যমুখর কলকলোচ্ছ্বাস,
পূজায় স্তব্ধ শরৎ প্রাতের প্রশান্ত নিঃশ্বাস,
বৈরাগিণী ধূসর সন্ধ্যা অস্তসাগর পারে,
তন্দ্রাবিহীন চিরন্তনের শান্তিবাণী নিশীথ অন্ধকারে,—
ফাগুন রাতির স্পর্শ-মায়ায় অরণ্যতল পুষ্প-রোমাঞ্চিত,
কোন্ অদৃশ্য সুচির-বাঞ্ছিত
বনবীথির ছায়াটিরে
কাঁপিয়ে দিয়ে বেড়ায় ফিরে ফিরে,
তারি চঞ্চলতা
মর্ম্মরিয়া কইল যে সব কথা,
তারি প্রতিধ্বনিভরা
দুএকটা চৌপদী আমার সসঙ্কোচে প'ড়ে গেলেম ত্বরা।

পড়া আমার শেষ হ'ল যেই, ক্ষণেক নীরব থেকে
নন্দগোপাল উৎসাহেতে বল্‌ল হঠাৎ ঝোঁকে—
"দাদামশায়, সাবাস্!
তোমার কালের মনের গতি, পেলেম তারি ইতিহাসের আভাস।"
খাতা নিতে হাত বাড়ালো, চাদরেতে দিলেম তাহা ঢাকা,
কইনু তারে, "দেখ্‌তো ভায়া, কোথায় আছে তোর অমিয় কাকা।"

আবা-মারু জাহাজ,
২৭শে অক্টোবর,
গঙ্গা

—

—উপন্যাস—

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
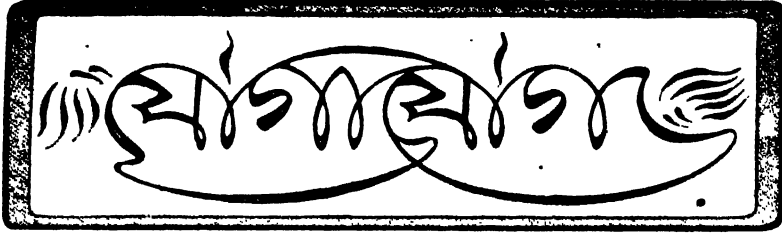
২০

রেলগাড়ি হাওড়ায় পৌঁছল, বেলা তখন চারটে হবে। ওড়নায়-চাদরে গ্রন্থি-বদ্ধ হ'য়ে বর-কনে গিয়ে বসল ব্রুহাম গাড়িতে। কলকাতার দিবালোকের অসংখ্য চক্ষু, তার সাম্‌নে কুমুর দেহমন সঙ্কুচিত হ'য়ে রইলো। যে-একটি অতিশয় শুচিতাবোধ এই উনিশ বছরের কুমারীজীবনে ওর অঙ্গে অঙ্গে গভীর ক'রে ব্যাপ্ত, সেটাকে, কর্ণের সহজ কবচের মতো, কেমন ক'রে ও হঠাৎ ছিন্ন ক'রে ফেল্‌বে? এমন মন্ত্র আছে যে-মন্ত্রে এই কবচ এক নিমেষে আপনি খ'সে যায়। কিন্তু সে মন্ত্র হৃদয়ের মধ্যে এখনো তো বেজে ওঠেনি। পাশে যে-মানুষটি ব'সে আছে মনের ভিতরে সে তো আজো বাইরের লোক। আপন লোক হবার পক্ষে তার দিক থেকে কেবল তো বাধাই এসেচে। তার ভাবে ব্যবহারে যে-একটা রূঢ়তা সে যে কুমুকে এখনো পর্য্যন্ত কেবলি ঠেলে ঠেলে দূরে ঠেকিয়ে রাখলো।

এদিকে মধুসূদনের পক্ষে কুমু একটি নূতন আবিষ্কার। স্ত্রী জাতির পরিচয় পায় এ পর্য্যন্ত এমন অবকাশ এই কেজো মানুষের অল্পই ছিল। ওর পণ্য-জগতের ভিড়ের মধ্যে পণ্য-নারীর ছোঁওয়াও ওকে কখনো লাগেনি। কোনো স্ত্রী ওর মনকে কখনো বিচলিত করেনি এ কথা সত্য নয়, কিন্তু ভূমিকম্প পর্য্যন্তই ঘটেছে—ইমারৎ জখম হয় নি। মধুসূদন মেয়েদের অতি সংক্ষেপে দেখেচে ঘরের বৌ-ঝিদের মধ্যে। তারা ঘরকন্নার কাজ করে, কোঁদল করে, কানাকানি করে, অতি তুচ্ছ কারণে কান্নাকাটিও ক'রে থাকে। মধুসূদনের জীবনে এদের সংস্রব নিতান্তই যৎ-সামান্য। ওর স্ত্রীও যে জগতের সেই অকিঞ্চিৎকর বিভাগে স্থান পাবে, এবং দৈনিক গার্হস্থ্যের তুচ্ছতায় ছায়াচ্ছন্ন হ'য়ে প্রাচীরের আড়ালে কর্ত্তাদের কটাক্ষ চালিত মেয়েলি জীবন-যাত্রা অতিবাহিত করবে এর বেশি সে কিছুই ভাবেনি। স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করবারও যে একটা কলানৈপুণ্য আছে, তার মধ্যেও যে পাওয়া বা হারানোর একটা কঠিন সমস্যা থাক্‌তে পারে, এ কথা তার হিসাবদক্ষ সতর্ক মস্তিষ্কের এক কোণেও স্থান পায়নি; বনস্পতির নিজের পক্ষে প্রজাপতি যেমন বাহুল্য, অথচ প্রজাপতির সংসর্গ যেমন তাকে মেনে নিতে হয় ভাবী স্ত্রীকেও মধুসূদন তেম্‌নি ক'রেই ভেবেছিল।

এমন সময়ে বিবাহের পরে সে কুমুকে প্রথম দেখ্‌লে। এক রকমের সৌন্দর্য্য আছে তাকে মনে হয় যেন একটা দৈব আবির্ভাব, পৃথিবীর সাধারণ ঘটনার চেয়ে অসাধারণ পরিমাণে বেশি,—প্রতিক্ষণেই যেন সে প্রত্যাশার অতীত। কুমুর সৌন্দর্য্য সেই শ্রেণীর। ও যেন ভোরের শুক তারার মতো, রাত্রের জগৎ থেকে স্বতন্ত্র, প্রভাতের জগতের ওপারে। মধুসূদন তার অবচেতন মনে নিজের অগোচরে কুমুকে একরকম অস্পষ্টভাবে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বোধ করলে—অন্তত একটা ভাবনা উঠ্‌লো এর সঙ্গে কি রকম ভাবে ব্যবহার করা চাই, কোন্ কথা কেমন ক'রে বল্‌লে সঙ্গত হবে।

কি ব'লে আলাপ আরম্ভ করবে ভাব্‌তে ভাব্‌তে মধু-সূদন হঠাৎ এক সময়ে কুমুকে জিজ্ঞাসা করলে, "এদিক থেকে রোদ্দুর আস্‌চে, না?"

কুমু কিছুই জবাব করলে না। মধুসূদন ডান দিকের পর্দাটা টেনে দিলে।

খানিকক্ষণ আবার চুপচাপ কাট্‌ল। আবার খামকা ব'লে উঠ্‌ল, "শীত করচে, না তো?" ব'লেই উত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রে সামনের আসন থেকে বিলিতী কম্বলটা টেনে নিয়ে কুমুর ও নিজের পায়ের উপর বিছিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে এক-আবরণের সহযোগিতা স্থাপন করলে। শরীর মন পুলকিত হ'য়ে উঠ্‌লো। চমকে উঠে কুমুদিনী কম্বলটাকে সরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, শেষে নিজেকে সম্বরণ ক'রে আসনের প্রান্তে গিয়ে সংলগ্ন হ'য়ে রইল।

কিছুক্ষণ এইভাবে যায় এমন সময় হঠাৎ কুমুর হাতের দিকে মধুসূদনের চোখ পড়লো।

"দেখি, দেখি", ব'লে হঠাৎ তার বাঁ হাতটা চোখের কাছে তুলে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার আঙুলে এ কিসের আঙটি? এ যে নীলা দেখ্‌চি।"

কুমু চুপ ক'রে রইলো।

"দেখ, নীলা আমার সয় না, ওটা তোমাকে ছাড়তে হবে।"

কোনো এক সময়ে মধুসূদন নীলা কিনেছিল, সেই বছর ওর গাধাবোট-বোঝাই পাট হাওড়ার ব্রিজে ঠেকে তলিয়ে যায়। সেই অবধি নীলা পাথরকে ও ক্ষমা করে না।

কুমুদিনী আস্তে আস্তে হাতটাকে মুক্ত করতে চেষ্টা করলে। মধুসূদন ছাড়লে না; বল্‌লে, "এটা আমি খুলে নিই।"

কুমু চমকে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "না থাক্।"

একবার দাবা খেলায় ওর জিৎ হয়; সেইবার দাদা ওকে তার নিজের হাতের আংটি পারিতোষিক দিয়েছিল।

মধুসূদন মনে মনে হাস্‌লে; আংটির উপর বিলক্ষণ লোভ দেখচি। এইখানে নিজের সঙ্গে কুমুর সাধর্ম্ম্যের পরিচয় পেয়ে একটু যেন আরাম লাগ্‌লো। বুঝলে, সময়ে অসময়ে সিঁথি কণ্ঠহার বালা বাজুর যোগে অভিমানিনীর সঙ্গে ব্যবহারের সোজা পথ পাওয়া যাবে,—এই পথে মধুসূদনের প্রভাব না মেনে উপায় নেই, বয়স না হয় কিছু বেশিই হোলো।

নিজের হাত থেকে মস্ত বড়ো কমলহীরের একটা আঙটি খুলে নিয়ে মধুসূদন হেসে বল্‌লে, "ভয় নেই এর বদলে আর একটা আঙটি তোমাকে পরিয়ে দিচ্ছি।"

কুমু আর থাক্‌তে পারলে না,—একটু চেষ্টা ক'রেই হাত ছাড়িয়ে নিলে। এইবার মধুসূদনের মনটা ঝেঁকে উঠ্‌লো। কর্ত্তৃত্বের খর্ব্বতা তাকে সইবে না। শুষ্ক গলায় জোর ক'রেই বল্‌লে, "দেখ, এ আঙটি তোমাকে খুলতেই হবে।"

কুমুদিনী মাথা হেঁট ক'রে চুপ ক'রে রইল, তার মুখ লাল হ'য়ে উঠেচে।

মধুসূদন আবার বল্‌লে, "শুন্‌চ? আমি বল্‌চি ওটা খুলে ফেলা ভালো। দাও আমাকে।" ব'লে হাতটা টেনে নিতে উদ্যত হোলো।

কুমু হাত সরিয়ে নিয়ে বল্‌লে, "আমি খুল্‌চি।"

খুলে ফেল্‌লে।

"দাও ওটা আমাকে।"

কুমুদিনী বল্‌লে, "ওটা আমিই রেখে দেবো।"

মধুসূদন বিরক্ত হ'য়ে হেঁকে উঠ্‌ল, "রেখে লাভ কি? মনে ভাবচ, এটা ভারী একটা দামী জিনিষ! এ কিছুতেই তোমার পরা চল্‌বে না, বলে দিচ্ছি।"

কুমুদিনী বল্‌লে, "আমি পরব না", ব'লে সেই পুঁতির কাজ-করা থলেটির মধ্যে আঙটি রেখে দিলে।

"কেন, এই সামান্য জিনিষটার উপরে এত দরদ কেন? তোমার তো জেদ কম নয়।"

মধুসূদনের আওয়াজটা খরখরে; কানে বাজে, যেন বেলে কাগজের ঘর্ষণ। কুমুদিনীর সমস্ত শরীরটা রী রী ক'রে উঠ্‌ল।

"এ আঙটি তোমাকে দিলে কে?"

কুমুদিনী চুপ ক'রে রইলো।

"তোমার মা নাকি?"

নিতান্ত জবাব দিতেই হবে ব'লেই অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বল্‌লে, "দাদা।"

দাদা! সে তো বোঝাই যাচ্চে। দাদার দশা যে কি, মধুসূদন তা ভালোই জানে। সেই দাদার আঙটি শনির

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সিঁধকাঠি,—এ ঘরে আনা চল্‌বে না। কিন্তু তার চেয়েও ওকে এইটেই খোঁচা দিচ্চে যে, এখনো কুমুদিনীর কাছে ওর দাদাই সব চেয়ে বেশি। সেটা স্বাভাবিক ব'লেই যে সেটা সহ্য হয় তা নয়। পুরোণো জমিদারের জমিদারী নতুন ধনী মহাজন নিলেমে কেনার পর ভক্ত প্রজারা যখন সাবেক আমলের কথা স্মরণ ক'রে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌তে থাকে তখন আধুনিক অধিকারীর গায়ে জ্বালা ধরে, এও তেম্‌নি। আজ থেকে আমিই যে ওর একমাত্র, এই কথাটা যত শীঘ্র হোক্ ওকে জানান্ দেওয়া চাই। তা-ছাড়া গায়ে হলুদের খাওয়ানো নিয়ে বরের যা অপমান হয়েচে তাতে বিপ্রদাস নেই এ কথা মধুসূদন বিশ্বাস করতেই পারে না। যদিও নবগোপাল বিবাহের পরদিনে ওকে বলেছিল, "ভায়া, বিয়ে বাড়িতে তোমাদের হাট-খোলার আড়ৎ থেকে যে চালচলন আমদানি করেছিলে, সে কথাটা ইঙ্গিতেও দাদাকে জানিয়ো না; উনি এর কিছুই জানেন না, ওঁর শরীরও বড়ো খারাপ।"

আঙটির কথাটা আপাতত স্থগিত রাখ্‌লে, কিন্তু মনে রইলো। এ দিকে রূপ ছাড়া আরো একটা কারণে হঠাৎ কুমুদিনীর দর বেড়ে গিয়েচে। নুরনগরে থাকতেই ঠিক বিবাহের দিনে মধুসূদন টেলিগ্রাফ পেয়েচে যে এবার তিসি চালানের কাজে লাভ হয়েচে প্রায় বিশ লাখ টাকা। সন্দেহ রইলো না, এটা নতুন বধূর পয়ে। স্ত্রী ভাগ্যে ধন, তার প্রমাণ হাতে হাতে। তাই কুমুকে পাশে নিয়ে গাড়িতে ব'সে ভিতরে ভিতরে এই পরম পরিতৃপ্তি তার ছিলো যে, ভাবী মুনোফার একটা জীবন্ত বিধিদত্ত দলিল নিয়ে বাড়ি চলেচে। এ নইলে আজকের এই ব্রুহাম রথযাত্রার পালাটায় অপঘাত ঘট্‌তে পারত।

২১

রাজা উপাধি পাওয়ার পর থেকে কলকাতায় ঘোষাল-বাড়ির দ্বারে নাম খোদা হয়েচে, "মধু প্রাসাদ"। সেই প্রাসাদের লোহার গেটের এক পাশে আজ নহবৎ বসেচে, আর বাগানে একটা তাঁবুতে বাজ্‌চে ব্যাণ্ড। গেটের মাথায় অর্দ্ধচন্দ্রাকারে গ্যাসের পাইপে লেখা, "প্রজাপতয়ে নমঃ"। সন্ধ্যাবেলায় আলোকশিখায় এই লিখনটি সমুজ্জ্বল হবে। গেট থেকে কাঁকর-দেওয়া যে-পথ বাড়ি পর্য্যন্ত গেছে, তার দুইধারে দেবদারু পাতা ও গাঁদার মালায় শোভা-সজ্জা; বাড়ির প্রথম তলার উঁচু মেঝেতে ওঠবার সিঁড়ির ধাপে লাল সালু পাতা। আত্মীয় বন্ধুর জনতার ভিতর দিয়ে বর-কনের গাড়ি গাড়ি-বারান্দায় এসে থাম্‌লো। শাঁখ, উলু-ধ্বনি, ঢাক, ঢোল, কাঁসর, নহবৎ, ব্যাণ্ড সব এক সঙ্গে উঠ্‌ল বেজে—যেন দশ পনেরোটা আওয়াজের মালগাড়ির এক জায়গাতে পূরো বেগে ঠোকাঠুকি ঘট্‌লো। মধুসূদনের কোন্ এক সম্পর্কের দিদিমা, পরিপক্ক বুড়ি, সিঁথিতে যত মোটা ফাঁক তত মোটা সিঁদুর, চওড়া লাল পেড়ে সাড়ি, মোটা হাতে মোটা মোটা সোনার বালা এবং শাঁখার চুড়ি—একটা রূপোর ঘটিতে জল নিয়ে বউ-এর পায়ে ছিটিয়ে দিয়ে আঁচলে মুছে নিলেন, হাতে নোয়া পরিয়ে দিলেন, বউ-এর মুখে একটু মধু দিয়ে বল্‌লেন, "আহা, এতদিন পরে আমাদের নীল গগনে উঠ্‌ল পূর্ণচাঁদ, নীল সরোবরে ফুট্‌ল সোনার পদ্ম।" বর কনে গাড়ি থেকে নাবলো। যুবক অভ্যাগত-দের দৃষ্টি ঈর্ষ্যান্বিত। একজন বল্‌লে, "দৈত্য স্বর্গ লুঠ ক'রে এনেচে রে, অপ্সরী সোনার শিকলে বাঁধা।" আর একজন বল্‌লে, "সাবেককালে এমন মেয়ের জন্যে রাজায় রাজায় লড়াই বেধে যেতো, আজ তিসি-চালানির টাকাতেই কাজ সিদ্ধি। কলিযুগে দেবতাগুলো বেরসিক, ভাগ্যচক্রের সব গ্রহনক্ষত্রই বৈশ্যবর্ণ।"

তারপরে বরণ, স্ত্রী-আচার প্রভৃতির পালা শেষ হ'তে হ'তে যখন সন্ধ্যা হ'য়ে আসে তখন কাল-রাত্রির মুখে ক্রিয়া-কর্ম্ম সাঙ্গ হোলো।

একটিমাত্র বড়ো বোনের বিবাহ কুমুর স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু তাদের নিজেদের বাড়িতে কোনো নতুন বৌ আস্‌তে সে দেখেনি। যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে থেকেই সে আছে কল-কাতায়, দাদার নির্ম্মল স্নেহের আবেষ্টনে। বালিকার মনের কল্পজগৎ সাধারণ সংসারের মোটা ছাঁচে গড়া হ'তে পায়নি। বাল্যকালে পতি কামনায় যখন সে শিবের পূজা করেচে, তখন পতির ধ্যানের মধ্যে সেই মহাতপস্বী রজতগিরিনিভ শিবকেই দেখেচে। সাধ্বী নারীর আদর্শরূপে সে আপন

মাকেই জানত। কি স্নিগ্ধ শান্ত কমনীয়তা, কত ধৈর্য্য, কত দুঃখ, কত দেবপূজা, মঙ্গলাচরণ, অক্লান্ত সেবা। অপর পক্ষে তাঁর স্বামীর দিকে ব্যবহারের ত্রুটি, চরিত্রের স্খলন ছিল; তৎসত্ত্বেও সে চরিত্র ঔদার্য্যে বৃহৎ, পৌরুষে দৃঢ়, তার মধ্যে হীনতা কপটতা লেশমাত্র ছিল না, যে একটা মর্য্যাদাবোধ ছিল সে যেন দূর কালের পৌরাণিক আদর্শের। তাঁর জীবনের মধ্যে প্রতিদিন এইটেই প্রমাণ হয়েচে যে, প্রাণের চেয়ে মান বড়ো, অর্থের চেয়ে ঐশ্বর্য্য। তিনি ও তাঁর সমপর্য্যায়ের লোকেরা বড়ো বহরের মানুষ। তাঁদের ছিল নিজেদের ক্ষতি ক'রেও অক্ষত সম্মানের গৌরব রক্ষা, অক্ষত সঞ্চয়ের অহঙ্কার প্রচার নয়।

কুমুর যেদিন বাঁ চোখ নাচ্‌ল সেদিন সে তার সব ভক্তি নিয়ে, আত্মোৎসর্গের পূর্ণ সংকল্প নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো। কোথাও কোনো বাধা বা খর্ব্বতা ঘট্‌তে পারে এ কথা তার কল্পনাতেই আসেনি। দময়ন্তী কি ক'রে আগে থাক্‌তে জেনেছিলেন যে, বিদর্ভরাজ নলকেই বরণ ক'রে নিতে হবে! তাঁর মনের ভিতরে নিশ্চিত বার্ত্তা এসে পৌচেছিল—তেম্‌নি নিশ্চিত বার্ত্তা কি কুমু পায়নি? বরণের আয়োজন সবই প্রস্তুত ছিল, রাজাও এলেন, কিন্তু মনে যাকে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেয়েছিল, বাইরে তাকে দেখ্‌লে কই? রূপেতেও বাধত না, বয়সেও বাধত না। কিন্তু রাজা? সেই সত্যকার রাজা কোথায়?

তারপরে আজ, যে-অনুষ্ঠানের দ্বার দিয়ে কুমুকে তার নতুন সংসারে আহ্বান কর্‌লে, তাতে এমন কোনো বজ্রগম্ভীর মঙ্গলধ্বনি বাজলো না কেন যার ভিতর দিয়ে এই নববধূ আকাশের সপ্তর্ষিদের আশীর্ব্বাদ মন্ত্র শুন্‌তে পেতো! —সমস্ত অনুষ্ঠানকে পরিপূর্ণ ক'রে এমন বন্দনা-গান উদাত্ত স্বরে কেন জাগ্‌লো না—

"জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ"

সেই "জগতঃ পিতরৌ" যাঁর মধ্যে চিরপুরুষ ও চিরনারী বাক্য ও অর্থের মতো একত্র মিলিত হ'য়ে আছে?

২২

মধুসূদন যখন কল্‌কাতায় বাস করতে এলো, তখন প্রথমে সে একটি পুরোনো বাড়ি কিনেছিল, সেই চক-মেলানো বাড়িটাই আজ তার অন্তঃপুর মহল। তারপরে তারই সামনে এখনকার ফ্যাশানে একটা মস্ত নতুন মহল এরি সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে, সেইটে ওর বৈঠকখানা বাড়ি। এই দুই মহল যদিও সংলগ্ন তবুও এরা সম্পূর্ণ আলাদা দুই জাত। বাইরের মহলে সর্ব্বত্রই মার্ব্বলের মেজে, তার উপরে বিলিতী কারপেট, দেয়ালে চিত্রিত কাগজ-মারা এবং তাতে ঝুলচে নানা রকমের ছবি, কোনোটা এন্‌গ্রেভিং, কোনোটা ওলিয়োগ্রাফ, কোনোটা অয়েল্‌পেণ্টিঙ—তার বিষয় হচ্চে, হরিণকে তাড়া করেচে শিকারী কুকুর, কিম্বা ডার্বির ঘোড়দৌড়ে জিতেছে এমন সব বিখ্যাত ঘোড়া, বিদেশী ল্যাণ্ডস্কেপ্, কিম্বা স্নানরত নগ্নদেহ নারী। তাছাড়া দেয়ালে কোথাও বা চীনে বাসন, মোরাদিবাদী পিতলের থালা, জাপানী পাখা, তিব্বতী চামর, ইত্যাদি যত প্রকার অসঙ্গত পদার্থের অস্থানে অযথা সমাবেশ। এই সমস্ত গৃহসজ্জা পছন্দ করা, কেনা, এবং সাজানোর ভার মধুসূদনের ইংরেজ এসিষ্টেণ্টের উপর। এ ছাড়া মক্‌মলে, বা রেশমে মোড়া চৌকি সোফার অরণ্য। কাঁচের আলমারিতে জমকালো বাঁধানো ইংরেজি বই, ঝাড়ন-হস্ত বেহারা ছাড়া কোনো মানুষ তার উপর হস্তক্ষেপ করে না—টিপাইয়ে আছে এলবাম্, তার কোনোটাতে ঘরের লোকের ছবি, কোনোটাতে বিদেশিনী এক্‌ট্রেসদের।

অন্তঃপুরে একতলার ঘরগুলো অন্ধকার, স্যাঁৎসেঁতে, ধোঁয়ায় ঝুলে কালো। উঠোনে আবর্জ্জনা,—সেখানে জলের কল, বাসন মাজা, কাপড় কাচা চল্‌চেই, যখন ব্যবহার নেই তখনো কল প্রায় খোলাই থাকে। উপরের বারাণ্ডা থেকে মেয়েদের ভিজে কাপড় ঝুলচে, আর দাঁড়ের কাকাতুয়ার উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়চে উঠোনে। বারান্দার দেয়ালের যেখানে সেখানে পানের পিকের দাগ ও নানা প্রকার মলিনতার অক্ষয় স্মৃতিচিহ্ন। উঠোনের পশ্চিম দিকের রোয়াকের পশ্চাতে রান্নাঘর, সেখান থেকে রান্নার গন্ধ ও কয়লার ধোঁয়া উপরের ঘরে সর্ব্বত্রই প্রসার লাভ করে। রান্না ঘরের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবশেষে একসময়ে গোলমাল ধুমধামের বান-ডাকা দিন পার হ'য়ে রাত্রিবেলা কুমু এই ঘরে এসে পৌঁছলো। তাকে নিয়ে এলো সেই মোতির মা। সে ওর সঙ্গে আজ রাত্রে শোবে ঠিক হয়েচে। আরো একদল মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আসছিল। তাদের কৌতূহল ও আমোদের নেশা মিট্‌তে চায় না—মোতির মা তাদের বিদায় ক'রে দিয়েচে। ঘরের মধ্যে এসেই এক হাতে সে ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে, "আমি কিছুখনের জন্যে যাই ঐ পাশের ঘরে;—তুমি একটু কেঁদে নাও ভাই,—চোখের জল যে বুক ভ'রে জ'মে উঠেচে।" ব'লে সে চ'লে গেল।

কুমু চৌকির উপর ব'সে পড়্‌ল। কান্না পরে হবে, এখন ওর বড়ো দরকার হয়েচে নিজেকে ঠিক করা। ভিতরে ভিতরে সকলের চেয়ে যে-ব্যথাটা ওকে বাজছিল সে হচ্চে নিজের কাছে নিজের অপমান। এতকাল ধ'রে ও যা কিছু সঙ্কল্প ক'রে এসেচে ওর বিদ্রোহী মন সম্পূর্ণ তার উল্টো দিকে চ'লে গেছে। সেই মনটাকে শাসন করবার একটুও সময় পাচ্ছিল না। ঠাকুর, বল দাও, বল দাও, আমার জীবন কালী ক'রে দিয়োনা। আমি তোমার দাসী, আমাকে জয়ী করো, সে জয় তোমারি।

পরিণত বয়সী আঁট-সাঁট গড়নের শ্যামবর্ণ একটি সুন্দরী বিধবা ঘরে ঢুকেই বল্‌লে, "মোতির মা তোমাকে একটু ছুটি দিয়েচে সেই ফাঁকে এসেচি; কাউকে তো কাছে ঘেঁস্‌তে দেবে না, বেড়ে রাখ্‌বে তোমাকে—যেন সিঁধকাটি নিয়ে বেড়াচ্চি, ওর বেড়া কেটে তোমাকে চুরি ক'রে নিয়ে যাব। আমি তোমার জা, শ্যামাসুন্দরী; তোমার স্বামী আমার দেওর। আমরা তো ভেবেছিলুম শেষ পর্য্যন্ত জমা-খরচের খাতাই হবে ওর বৌ। তা ঐ খাতার মধ্যে জাদু আছে ভাই, এত বয়সে এমন সুন্দরী ঐ খাতার জোরেই জুটল। এখন হজম করতে পারলে হয়। ঐ খানে খাতার মন্তর খাটে না। সত্যি ক'রে বলো ভাই, আমাদের বুড়ো দেওরটিকে তোমার পছন্দ হয়েচে তো?"

কুমু অবাক হ'য়ে রইল, কি জবাব দেবে ভেবেই পেলে না। শ্যামা ব'লে উঠ্‌লো, "বুঝেচি, তা পছন্দ না হ'লেই

বাইরে প্রাচীরবদ্ধ অল্প একটু জমি আছে তারই এক কোণে পোড়া কয়লা, চুলোর ছাই, ভাঙা গাম্‌লা, ছিন্ন ধামা, জীর্ণ ঝাঁঝরি রাশিকৃত; অপর প্রান্তে গুটি দুয়েক গাই ও বাছুর বাঁধা, তাদের খড় ও গোবর জমচে, এবং সমস্ত প্রাচীর ঘুঁটের চক্রে আচ্ছন্ন। এক ধারে একটি মাত্র নিম গাছ, তার গুঁড়িতে গোরু বেঁধে বেঁধে বাকল গেছে উঠে, আর ক্রমাগত ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে তার পাতা কেড়ে নিয়ে গাছটাকে জেরবার ক'রে দিয়েচে। অন্তঃপুরে এই একটুমাত্র জমি. বাকি সমস্ত জমিই বাইরের দিকে। সেটা লতামণ্ডপে, বিচিত্র ফুলের কেয়ারিতে, ছাঁটা ঘাসের মাঠে, খোয়া ও সুরকি-দেওয়া রাস্তায়, পাথরের মূর্ত্তি ও লোহার বেঞ্চিতে সুসজ্জিত।

অন্দর-মহলে তেতালায় কুমুদিনীর শোবার ঘর। মস্ত বড়ো খাট মেহগনি কাঠের; ফ্রেমে নেটের মশারি, তাতে সিল্কের ঝালর। বিছানার পায়ের দিকে পূরো বহরের একটা নিরাবরণ মেয়ের ছবি, বুকের উপর দুই হাত চেপে লজ্জার ভাণ করচে। শিয়রের দিকে মধুসূদনের নিজের অয়েল্‌পেণ্টিঙ্‌, তাতে তার কাশ্মীরী শালের কারুকার্য্যটাই সব চেয়ে প্রকাশমান। একদিকে দেয়ালের গায়ে কাপড় রাখবার দেরাজ, তার উপরে আয়না; আয়নার দুদিকে দুটো চীনে মাটির শামাদান, সাম্‌নে চীনে মাটির থালির উপর পাউডারের কৌটো, রূপো-বাঁধানো চিরুণী, তিন চার রকমের এসেন্স, এসেন্স ছিটোবার পিচ্‌কারী এবং আরো নানা রকমের প্রসাধনের সামগ্রী, বিলিতি এসিষ্টেণ্টের কেনা। নানাশাখাযুক্ত গোলাপী কাঁচের ফুলদানীতে ফুলের তোড়া। আর একদিকে লেখবার টেবিল, তাতে দামী পাথরের দোয়াতদান, কলম ও কাগজকাটা। ইতস্তত মোটা গদিওয়ালা সোফা ও কেদারা—কোথাও বা টিপাই, তাতে চা খাওয়া যায়, তাস খেলা যেতেও পারে। নতুন মহারাণীর উপযুক্ত শয়নঘর কি রকম হওয়া বিধিসঙ্গত একথা মধুসূদনকে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হয়েচে। এমন হ'য়ে উঠ্‌ল, যেন অন্দর মহলের সর্ব্বোচ্চতলার এই ঘরটি ময়লা কাঁথা-গায়ে-দেওয়া ভিখিরির মাথায় জরি-জহরাৎ-দেওয়া পাগড়ি।

বা কি, সাতপাক রেচ তখন এ পাক উল্টো ঘুরলেও ফাঁস খুল্‌বে না।"

কুমু বল্‌লে, "একি কথা বল্‌চ দিদি!"

শ্যামা জবাব দিলে, "খোলসা ক'রে কথা বল্‌লেই কি দোষ হয় বোন? মুখ দেখে কি বুঝ্‌তে পারিনে? তা, দোষ দেবনা তোমাকে। ও আমাদের আপন ব'লেই কি চোখের মাথা খেয়ে বসেচি? বড় শক্ত হাতে পড়েচ বউ, বুঝে সুঝে চোলো।"

এমন সময় মোতির মাকে ঘরে ঢুক্‌তে দেখেই ব'লে উঠ্‌লো, "ভয় নেই, ভয় নেই, বকুল ফুল, যাচ্চি আমি। ভাব্‌লুম তুমি নেই এই ফাঁকে আমাদের নতুন বৌকে একবার দেখে আসিগে। তা সত্যি বটে, এ কৃপণের ধন, সাবধানে রাখ্‌তে হবে। সইকে বল্‌ছিলুম আমাদের দেওরের এ যেন হোলো আধ-কপালে মাথাধরা; বউকে ধরেচে ওর বাঁদিকের পাওয়ার-কপালে, এখন ডানদিকের রাখার-কপালে যদি ধর্‌তে পারে তবেই পূরোপূরি হবে।"

এই ব'লেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুহূর্ত্ত পরে ঘরে ঢুকে কুমুর সামনে পানের ডিবে খুলে ধ'রে বল্‌লে, "একটা পান নেও। দোক্তা খাওয়া অভ্যেস আছে?"

কুমু বল্‌লে, "না।" তখন এক টিপ্‌ দোক্তা নিয়ে নিজের মুখে পুরে দিয়ে শ্যামা মন্দ-গমনে বিদায় নিলে।

"এখনি বদ্দিমাসীকে খাইয়ে বিদায় ক'রে আস্‌চি, দেরি হবে না" ব'লে মোতির মা চ'লে গেল।

শ্যামাসুন্দরী কুমুর মনের মধ্যে ভারি একটা বিস্বাদ জাগিয়ে দিলে। আজকে কুমুর সব চেয়ে দরকার ছিল মায়ার আবরণ, সেইটেই সে আপন মনে গড়্‌তে বসেছিল, আর যে-সৃষ্টিকর্ত্তা দ্যুলোকে ভূলোকে নানা রঙ নিয়ে রূপের লীলা করেন, তাঁকেও সহায় করবার চেষ্টা করছিল, এমন সময় শ্যামা এসে ওর স্বপ্ন-বোনা জালে ঘা মারলে। কুমু চোখ বুজে খুব জোর ক'রে নিজেকে বল্‌তে লাগ্‌ল, "স্বামীর বয়স বেশি ব'লে তাঁকে ভালোবাসিনে এ কথা কখনই সত্য নয়—লজ্জা, লজ্জা! এ যে ইতর মেয়েদের মতো কথা!" শিবের সঙ্গে সতীর বিয়ের কথা কি ওর মনে নেই? শিব-নিন্দুকেরা তাঁর বয়স নিয়ে খোঁটা দিয়েছিল, কিন্তু সে কথা সতী কানে নেন্‌নি।

স্বামীর বয়স বা রূপ নিয়ে এ পর্য্যন্ত কুমু কোনো চিন্তাই করেনি। সাধারণত যে ভালোবাসা নিয়ে স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ সত্য হয়, যার মধ্যে রূপগুণ দেহমন সমস্তই মিলে আছে, তার যে প্রয়োজন আছে একথা কুমু ভাবেওনি। পছন্দ ক'রে নেওয়ার কথাটাকেই রং মাখিয়ে চাপা দিতে চায়।

এমন সময় ফুল-কাটা জামা ও জরির পাড়ওয়ালা ধুতি-পরা ছেলে, বয়স হবে বছর সাতেক, ঘরে ঢুকেই গা ঘেঁসে কুমুর কাছে এসে দাঁড়ালো। বড়ো বড়ো মুগ্ধ চোখ ওর মুখের দিকে তুলে ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে মিষ্টি সুরে বল্‌লে, "জ্যাঠাইমা।" কুমু তাকে কোলের উপর টেনে নিয়ে বল্‌লে, "কি বাবা, তোমার নাম?" ছেলেটি খুব ঘটা ক'রে বল্‌লে, শ্রীটুকুও বাদ দি‌লে না, "শ্রীমোতিলাল ঘোষাল।" সকলের কাছে পরিচয় ওর, হাব্‌লু ব'লে। সেইজন্যেই উপযুক্ত দেশকালপাত্রে নিজের সম্মান রাখবার জন্যে পিতৃদত্ত নামটাকে এত সুসম্পূর্ণ ক'রে বল্‌তে হয়। তখন কুমুর বুকের ভিতরটা টন্‌টন্‌ করছিল—এই ছেলেকে বুকে চেপে ধ'রে যেন বাঁচলো। হঠাৎ কেমন মনে হোলো কতদিন ঠাকুরঘরে যে-গোপালকে ফুল দিয়ে এসেচে, এই ছেলেটির মধ্যে সেই ওর কোলে এসে বস্‌ল। ঠিক যে-সময়ে ডাকছিল সেই দুঃখের সময়েই এসে ওকে বল্‌লে, "এই যে আমি আছি তোমার সান্ত্বনা।" মোতির গোল গোল গাল টিপে ধ'রে কুমু বল্‌লে, "গোপাল, ফুল নেবে?"

কুমুর মুখ দিয়ে গোপাল ছাড়া আর কোনো নাম বেরোলো না। হঠাৎ নিজের নামান্তরে হাব্‌লুর কিছু বিস্ময় বোধ হোলো—কিন্তু এমন সুর ওর কানে পৌঁচেছে যে, কিছু আপত্তি ওর মনে আস্‌তে পারে না।

এমন সময়ে পাশের ঘর থেকে মোতির মা ছেলের গলা শুন্‌তে পেয়ে ছুটে এসে বল্‌লে, "ঐরে, বাঁদর ছেলেটা এসেচে বুঝি!" "শ্রীমোতিলাল ঘোষালের" সম্মান আর থাকে না! নালিশেভরা চোখ তুলে নিঃশব্দে মায়ের মুখের দিকে সে চেয়ে রইল, ডান হাতে জ্যাঠাইমার আঁচল চেপে। কুমু হাব্‌লুকে তার বাঁ হাত দিয়ে বেড়ে নিয়ে বল্‌লে, "আহা, থাক্‌ না।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"না ভাই, অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন শুতে যাক্—এ বাড়িতে ওকে খুব সহজেই মিল্‌বে, ওর মতো শস্তা ছেলে আর কেউ নেই।"—ব'লে মোতির মা অনিচ্ছুক ছেলেকে শোয়াবার জন্যে নিয়ে গেলো। এই এতটুকুতেই কুমুর মনের ভার গেলো হাল্‌কা হ'য়ে। ওর মনে হোলো প্রার্থনার জবাব পেলুম, জীবনের সমস্যা সহজ হ'য়ে দেখা দেবে, এই ছোট ছেলেটির মতোই।

২৩

অনেক রাত্তিরে মোতির মা এক সময়ে জেগে উঠে দেখ্‌লে কুমু বিছানায় উঠে ব'সে আছে, তার কোলের উপর দুই হাত জোড়া, ধ্যানাবিষ্ট চোখ দুটি যেন সামনে কাকে দেখ্‌তে পাচ্চে। মধুসূদনকে যতই সে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ কর্‌তে বাধা পায়, ততই তার দেবতাকে দিয়ে সে তার স্বামীকে আবৃত কর্‌তে চায়। স্বামীকে উপলক্ষ্য ক'রে আপনাকে সে দান কর্‌চে তার দেবতাকে। দেবতা তাঁর পূজাকে বড়ো কঠিন করেচেন, এ প্রতিমা স্বচ্ছ নয়, কিন্তু এই তো ভক্তির পরীক্ষা। শালগ্রামশিলা তো কিছুই দেখায় না, ভক্তি সেই রূপহীনতার মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথের রূপকে প্রকাশ করে কেবল আপন জোরে। যেখানে দেখা যাচ্চে না সেইখানেই দেখ্‌বো এই হোক আমার সাধনা, যেখানে ঠাকুর লুকিয়ে থাকেন সেইখানে গিয়েই তাঁর চরণে আপনাকে দান করবো, তিনি আমাকে এড়াতে পার্‌বেন না।

"মেরে গিরিধর গোপাল, ঔর নাহি কোহি"—

দাদার কাছে শেখা মীরা বাইএর এই গানটা বারবার মনে মনে আওড়াতে লাগ্‌লো।

মধুসূদনের অত্যন্ত রূঢ় যে-পরিচয় সে পেয়েছে—তাকে কিছুই নয় ব'লে, জলের উপরকার বুদ্‌বুদ্‌ ব'লে, উড়িয়ে দিতে চায়—চিরকালের যিনি সত্য, সমস্ত আবৃত ক'রে তিনিই আছেন, "ঔর নাহি কোহি, ঔর নাহি কোহি।" এ ছাড়া আর একটা পীড়ন আছে তাকেও মায়া বল্‌তে চায়—সে হচ্চে জীবনের শূন্যতা। আজ পর্য্যন্ত যাদের নিয়ে ওর সমস্ত কিছু গ'ড়ে উঠেচে, যাদের বাদ দিতে জীবনের অর্থ থাকে না, তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ,—সে নিজেকে বল্‌চে এই শূন্যও পূর্ণ,—

"বাপে ছাড়ে, মায়ে ছাড়ে, ছাড়ে সগা সহী,
মীরা প্রভু লগন লগী যো ন হোবে হোয়ী।"

ছেড়েচেন তো বাপ, ছেড়েছেন তো মা, কিন্তু তাঁদের ভিতরেই যিনি চিরকালকার তিনি তো ছাড়েননি। ঠাকুর আরো যা-কিছু ছাড়ান না কেন, শূন্য ভরাবেন ব'লেই ছাড়িয়েচেন। আমি লেগে রইলুম, যা হয় তা হোক! মনের গান কখন তার গলায় ফুটে উঠ্‌ল তা টেরই পেলে না—দুই চোখ দিয়ে জল পড়্‌তে লাগ্‌লো।

মোতির মা কথাটি বললে না, চুপ ক'রে দেখ্‌লে, আর শুন্‌লে। তার পরে কুমু যখন অনেকক্ষণ ধ'রে প্রণাম ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়্‌লো তখন মোতির মার মনে একটা চিন্তা দেখা দিলো যা পূর্ব্বে আর কখনো ভাবেনি।

ও ভাব্‌তে লাগ্‌ল আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন আমরা তো কচি খুকি ছিলুম, মন ব'লে একটা বালাই ছিল না। ছোটোছেলে কাঁচা ফলটাকে যেমন টপ্‌ ক'রে বিনা আয়োজনে মুখে পুরে দেয়, স্বামীর সংসার তেমনি ক'রেই বিনা বিচারে আমাদের গিলেচে, কোথাও কিছু বাধেনি। সাধন ক'রে আমাদের নিতে হয়নি, আমাদের জন্যে দিন গোনা ছিল অনাবশ্যক। যেদিন বল্‌লে ফুলশয্যে সেই দিনই হলো ফুলশয্যে, কেননা ফুলশয্যের কোনো মানে ছিল না, সে ছিলো একটা খেলা। এই তো কালই হবে ফুলশয্যে, কিন্তু এ মেয়ের পক্ষে সে কতবড়ো বিড়ম্বনা! বড়োঠাকুর এখনো পর; আপন হ'তে অনেক সময় লাগে। একে ছোঁবে কি ক'রে? এ মেয়ের সেই অপমান সইবে কেন? ধন পেতে বড়োঠাকুরের কতকাল লাগ্‌লো আর মন পেতে দুদিন সবুর সইবে না? সেই লক্ষ্মীর দ্বারে হাঁটাহাঁটি ক'রে মর্‌তে হয়েচে, এ লক্ষ্মীর দ্বারে একবার হাত পাত্‌তে হবে না?

এত কথা মোতির মার মনে আস্‌ত না। এসেচে তার কারণ, কুমুকে দেখ্‌বামাত্রই ও তাকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেচে। এই ভালোবাসার পূর্ব্বভূমিকা

হ'য়েছিল ষ্টেশনে যখন সে দেখেছিল বিপ্রদাসকে। যেন মহাভারত থেকে ভীষ্ম নেমে এলেন। বীরের মতো তেজস্বী মূর্ত্তি, তাপসের মতো শান্ত মুখশ্রী, তার সঙ্গে একটি বিষাদের নম্রতা। মোতির মার মনে হ'য়েছিল কেউ যদি কিছু না বলে তবে একবার ওর পা দুটো ছুঁয়ে আসি। সেই রূপ আজো সে ভুলতে পারেনি। তার পরে যখন কুমুকে দেখলে, মনে মনে বললে, দাদারই বোন বটে।

এক রকম জাতিভেদ আছে যা সমাজের নয়, যা রক্তের, – সে জাত কিছুতে ভাঙা যায় না। এই যে রক্তগত জাতের অসামঞ্জস্য এ'তে মেয়েকে যেমন মর্ম্মান্তিক ক'রে মারে পুরুষকে এমন নয়। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল ব'লে মোতির মা এই রহস্য নিজের মধ্যে বোঝবার সময় পায়নি,—কিন্তু কুমুর ভিতর দিয়ে এই কথাটা সে নিশ্চিত ক'রে অনুভব করলে। তার গা-কেমন করতে লাগল। ও যেন একটা বিভীষিকার ছবি দেখতে পেলে,—যেখানে একটা অজানা জন্তু লালায়িত রসনা মেলে গুঁড়ি মেরে ব'সে আছে, সেই অন্ধকার গুহার মুখে কুমুদিনী দাঁড়িয়ে দেবতাকে ডাকচে। মোতির মা রেগে উঠে মনে মনে বললে, "দেবতার মুখে ছাই! যে দেবতা ওর বিপদ ঘটিয়েচে সেই নাকি ওকে উদ্ধার করবে! হায় রে!"

২৪

পরের দিন সকালেই কুমু দাদার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছে, "ভগবান তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" সেই টেলিগ্রামের কাগজখানি জামার মধ্যে বুকের কাছে রেখে দিলে। এই টেলিগ্রামে যেন দাদার দক্ষিণ হাতের স্পর্শ। কিন্তু দাদা নিজের শরীরের কথা কেন কিছুই লিখলে না? তবে কি অসুখ বেড়েচে? দাদার সব খবরই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যার প্রত্যক্ষগোচর ছিলো, আজ তার কাছে সবই অবরুদ্ধ।

আজ ফুলশয্যে, বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য। আত্মীয় মেয়েরা সমস্তদিন কুমুকে নিয়ে নাড়াচাড়া করচে। কিছুতে তাকে একলা থাকতে দিলে না। আজ একলা থাকবার বড়ো দরকার ছিল।

শোবার ঘরের পাশেই ওর নাবার ঘর; সেখানে জলের কল পাতা, এবং ধারা স্নানের ঝাঁঝ্‌রি বসানো। কোনো অবকাশে বাক্সো থেকে যুগল রূপের ফ্রেমে বাঁধানো পটখানি বের ক'রে স্নানের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। শাদা পাথরের জলচৌকির উপর পট রেখে সামনে মাটিতে ব'সে নিজের মনে বারবার ক'রে বললে, "আমি তোমারি, আজ তুমিই আমাকে নাও। সে আর কেউ নয়, সে তুমিই, সে তুমিই, সে তুমিই। তোমারি যুগল রূপ প্রকাশ হোক আমার জীবনে।"

ডাক্তাররা বলচে বিপ্রদাসের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা নিউমোনিয়ায় এসে দাঁড়িয়েচে। নবগোপাল একলা কলকাতায় এলো ফুলশয্যার সওগাদ পাঠাবার ব্যবস্থা করতে। খুব ঘটা ক'রেই সওগাদ পাঠানো হোলো। বিপ্রদাস নিজে থাকলে এত আড়ম্বর করত না।

কুমুর বিবাহ উপলক্ষ্যে ওর বড়ো বোন চারজনকেই আনতে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু খবর রটে গেছে—ঘোষালরা সদ্‌ব্রাহ্মণ নয়। বাড়ির লোক এ বিয়েতে কিছুতে তাদের পাঠাতে রাজি হোলো না। কুমুর তৃতীয় বোন যদি বা স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি ক'রে বিয়ের পরদিন কলকাতায় এসে পৌঁছল, নবগোপাল বললে, "ওবাড়ীতে তুমি গেলে আমাদের মান থাকবে না।" বিবাহ রাত্রির কথা আজো সে ভুলতে পারেনি। তাই প্রায় অসম্পর্কীয় গুটিকয়েক ছোটো ছোটো মেয়ে এক বুড়ি দাসীর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে নিমন্ত্রণ রাখতে। কুমু বুঝলে, সন্ধি এখনো হ'ল না, হয়তো কোনো কালে হবে না।

কুমুর সাজসজ্জা হোলো। ঠাট্টার সম্পর্কীয়দের ঠাট্টার পালা শেষ হয়েচে—নিমন্ত্রিতদের খাওয়ান সুরু হবে। মধুসূদন আগে থাকতেই ব'লে রেখেছিল, বেশি রাত করলে চলবে না, কাল ওর কাজ আছে। নটা বাজবামাত্রই হুকুম মতো নীচের উঠোন থেকে সশব্দে ঘণ্টা বেজে উঠল। আর এক মুহূর্ত্ত না। সময় অতিক্রম করবার সাধ্য কারো নেই। সভা ভঙ্গ হোলো। আকাশ থেকে বাজপাখীর ছায়া দেখতে পেয়ে কপোতীর যেমন করে, কুমুর বুকটা তেমনি কাঁপতে লাগল। তার ঠাণ্ডা হাত ঘামচে, তার মুখ বিবর্ণ। ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই মোতির মার হাত ধ'রে বললে, "আমাকে একটুখানির জন্যে কোথাও নিয়ে যাও আড়ালে। দশ মিনিটের জন্যে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একলা থাকতে দাও।" মোতির মা তাড়াতাড়ি নিজের শোবার ঘরে নিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। বাইরে দাঁড়িয়ে চোথ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্‌লে, "এমন কপালও করেছিলি!"

দশ মিনিট যায়, পনেরো মিনিট যায়। লোক এলো,—বর শোবার ঘরে গেছে, বউ কোথায়? মোতির মা বল্‌লে, "অত ব্যস্ত হ'লে চল্‌বে কেন? বউ গায়ের জামা গয়নাগুলো খুল্‌বে না?" মোতির মা যতক্ষণ পারে ওকে সময় দিতে চায়। অবশেষে যখন বুঝ্‌লে আর চল্‌বে না তখন দরজা খুলে দেখে, বউ মূর্চ্ছিত হ'য়ে মেজের উপর প'ড়ে আছে।

গোলমাল প'ড়ে গেলো। ধরাধরি ক'রে বিছানার উপর তুলে দিয়ে কেউ জলের ছিটে দেয়, কেউ বাতাস করে। কিছুক্ষণ পরে যখন চেতনা হোলো কুমু বুঝ্‌তে পার্‌লে না কোথায় সে আছে—ডেকে উঠ্‌ল, "দাদা।" মোতির মা তাড়াতাড়ি তার মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে বল্‌লে, "ভয় নেই দিদি, এই যে আমি আছি।"—ব'লে ওর মুখটা বুকের উপর তুলে নিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলো। সবাইকে বল্‌লে, "তোমরা ভিড় কোরো না, আমি এখনি ওঁকে নিয়ে যাচ্চি।" কানে কানে বল্‌তে লাগ্‌লো, "ভয় করিস্‌নে ভাই, ভয় করিস্‌নে!"—কুমু ধীরে ধীরে উঠ্‌লো। মনে মনে ঠাকুরের নাম ক'রে প্রণাম করলে। ঘরের অন্য পাশে একটা তক্তপোষের উপর হাবলু গভীর ঘুমে মগ্ন—তার পাশে গিয়ে তার কপালে চুমো খেলে। মোতির মা তাকে শোবার ঘর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এখনো ভয় কর্‌চে দিদি?"

কুমু হাতের মুঠো শক্ত ক'রে একটু হেসে বল্‌লে, "না, আমার কিছু ভয় কর্‌চে না।" মনে মনে বল্‌চে, "এই আমার অভিসার, বাইরে অন্ধকার ভিতরে আলো।"

"মেরে গিরিধর গোপাল ঔর নাহি কোহি।"

২৫

ইতিমধ্যে শ্যামাসুন্দরী হাঁপাতে হাঁপাতে মধুকে এসে জানালে, "বউ মুর্চ্ছো গেছে।" মধুসূদনের মনটা দপ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ল; বললে, "কেন, তাঁর হয়েছে কি?"

"তা তো বল্‌তে পারিনে, দাদা দাদা ক'রেই বউ হেদিয়ে গেল। তা একবার কি দেখ্‌তে যাবে?"

"কী হবে! আমি তো ওর দাদা নই।"

"মিছে রাগ করছ ঠাকুর-পো, ওরা বড়োঘরের মেয়ে, পোষ মানতে সময় লাগ্‌বে।"

"রোজ রোজ উনি মূর্চ্ছো যাবেন আর আমি ওঁর মাথায় কবিরাজী তেল মালিস করব এই জন্যেই কি ওঁকে বিয়ে করেছিলুম?"

"ঠাকুর-পো, তোমার কথা শুনে হাসি পায়। তা দোষ হয়েচে কি, আমাদের কালে কথায় কথায় মানিনীর মান ভাঙাতে হ'ত, এখন না হয় মূর্চ্ছো ভাঙাতে হবে।"

মধুসূদন গোঁ হ'য়ে ব'সে রইল। শ্যামাসুন্দরী বিগলিত করুণায় কাছে এসে হাত ধ'রে বল্‌লে, "ঠাকুর-পো অমন মন খারাপ কোরো না, দেখে সইতে পারিনে।"

মধুসূদনের এত কাছে গিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেয় ইতিপূর্ব্বে এমন সাহস শ্যামার ছিল না। প্রগল্‌ভা শ্যামা ওর কাছে ভারি চুপ ক'রে থাকত; জান্‌ত মধুসূদন বেশি কথা সইতে পারে না। মেয়েদের সহজ বুদ্ধি থেকে শ্যামা বুঝেচে মধুসূদন আজ সে মধুসূদন নেই। আজ ও দুর্ব্বল, নিজের মর্য্যাদা সম্বন্ধে সতর্কতা ওর নেই। মধুর হাতে হাত দিয়ে বুঝ্‌ল এটা ওর খারাপ লাগেনি। নববধূ ওর অভিমানে যে ঘা দিয়েচে, কোনো একটা জায়গা থেকে চিকিৎসা পেয়ে ভিতরে ভিতরে একটু আরাম বোধ হয়েচে। শ্যামা অন্তত ওকে অনাদর করে না এটাতো নিতান্ত তুচ্ছ কথা নয়। শ্যামা কি কুমুর চেয়ে কম সুন্দরী, না হয় ওর রং একটু কালো,—কিন্তু ওর চোখ, ওর চুল, ওর রসালো ঠোঁট!

শ্যামা ব'লে উঠ্‌ল, "ঐ আস্‌চে বউ, আমি যাই ভাই। কিন্তু দেখো ওর সঙ্গে রাগারাগি কোরো না, আহা—ও ছেলেমানুষ!"

কুমু ঘরে ঢুকতেই মধুসূদন আর থাকতে পারলে না, ব'লে উঠ্‌লো, "বাপের বাড়ি থেকে মূর্চ্ছো অভ্যেস ক'রে এসেচ বুঝি? কিন্তু আমাদের এখানে ওটা চল্‌তি নেই। তোমাদের ঐ নুরনগরী চাল ছাড়্‌তে হবে।"

কুমু নির্ণিমেষ চোখ মেলে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো, একটি কথাও বল্‌লে না।

মধুসূদন ওর মৌন দেখে আরো রেগে গেলো। মনের গভীর তলায় এই মেয়েটির মন পাবার জন্মে একটা আকাঙ্ক্ষা জেগেচে ব'লেই ওর এই তীব্র নিষ্ফল রাগ। ব'লে উঠ্‌লো, "আমি কাজের লোক, সময় কম, হিস্‌টীরিয়া-ওয়ালী মেয়ের খেদ্‌মদ্‌গারী করবার ফুরসৎ আমার নেই, এই স্পষ্ট ব'লে দিচ্চি।"

কুমু ধীরে ধীরে বল্‌লে, "তুমি আমাকে অপমান করতে চাও? হার মানতে হবে। তোমার অপমান মনের মধ্যে নেবো না।"

কুমু কাকে এ সব কথা বল্‌চে? ওর বিস্ফারিত চোখের সাম্‌নে কে দাঁড়িয়ে আছে? মধুসূদন অবাক হ'য়ে গেলো, ভাব্‌লে এ মেয়ে ঝগ্‌ড়া করে না কেন? এর ভাবখানা কি?

মধুসূদন বক্রোক্তি ক'রে বল্‌লে, "তুমি তোমার দাদার চেলা, কিন্তু জেনে রেখো, আমি তোমার সেই দাদার মহাজন, তাকে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচ্‌তে পারি।"

ও যে কুমুর দাদার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এ কথা কুমুর মনে দেগে দেবার জন্মে মূঢ় আর কোনো কথা খুঁজে পেলে না।

কুমু বল্‌লে, "দেখো, নিষ্ঠুর হও তো হোয়ো, কিন্তু ছোটো হোয়ো না।" ব'লে সোফার উপর ব'সে পড়্‌ল।

কর্কশস্বরে মধুসূদন ব'লে উঠ্‌লো, "কী! আমি ছোটো! আর তোমার দাদা আমার চেয়ে বড়ো?"

কুমু বল্‌লে, "তোমাকে বড়ো জেনেই তোমার ঘরে এসেচি।"

মধুসূদন ব্যঙ্গ ক'রে বল্‌লে, "বড়ো জেনেই এসেচ, না, টাকার লোভে?"

তখন কুমু সোফা থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে খোলা ছাদে মেজের উপর গিয়ে বস্‌লো।

কল্‌কাতায় শীতকালের কৃপণ রাত্রি, ধোঁয়ায় কুয়াশায় ঘোলা, আকাশ অপ্রসন্ন, তারার আলো যেন ভাঙ্গা গলার কথার মতো। কুমুর মন তখন অসাড়, কোনো ভাবনা নেই, কোনো বেদনা নেই। একটা ঘন কুয়াশার মধ্যে সে যেন লুপ্ত হ'য়ে গেছে।

কুমু যে এমন ক'রে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে যাবে মধুসূদন এ একেবারে ভাব্‌তেই পারেনি। নিজের এই পরাভবের জন্মে সকলের চেয়ে রাগ হচ্চে কুমুর দাদার উপর। শোবার ঘরে চৌকির উপরে ব'সে প'ড়ে শূন্য আকাশের দিকে সে একটা ঘুষি নিক্ষেপ করলে। খানিকক্ষণ ব'সে থেকে ধৈর্য্য আর রাখ্‌তে পারলে না। ধড়ফড় ক'রে উঠে ছাদে বেরিয়ে ওর পিছনে গিয়ে ডাক্‌লে, "বড়ো বৌ।"

কুমু চম্‌কে উঠে পিছন ফিরে দাঁড়ালে।

"ঠাণ্ডায় হিমে বাইরে এখানে দাঁড়িয়ে কী করচ? চলো ঘরে।"

কুমু অসঙ্কোচে মধুসূদনের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। মধুসূদনের মধ্যে যেটুকু প্রভুত্বের জোর ছিল তা গেলো উড়ে। কুমুর বাঁ হাত ধ'রে আস্তে আস্তে বল্লে, "এসো ঘরে।"

কুমুর ডান হাতে তার দাদার আশীর্ব্বাদের সেই টেলিগ্রাম ছিল সেটা সে বুকে চেপে ধর্‌ল। স্বামীর হাত থেকে হাত টেনে নিলে না, নীরবে ধীরে ধীরে শোবার ঘরে ফিরে গেলো।

(ক্রমশঃ)

গত মাসের বিচিত্রায় প্রকাশিত যোগাযোগে ৭৯৮ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ৯ পঙ্‌ক্তিতে যে বাক্য আরম্ভ হইয়াছে তাহা এইরূপ হইবে,—কিন্তু ঐ যে চাদরে-আঁচলের গ্রন্থি, ওর সৃষ্ট জীবন্মৃত্যুর জয়তোরণ যদি মাপা যায় তবে তার চূড়া কোন্ নরকে গিয়ে ঠেক্‌বে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

৬

কল্যাণীয়েষু

রথী, বালি দ্বীপটি ছোট সেই জন্যেই এর মধ্যে এমন একটি সুসজ্জিত সম্পূর্ণতা। গাছে পালায় পাহাড়ে ঝরণায় মন্দিরে মূর্ত্তিতে কুটীরে ধানক্ষেতে হাটে বাজারে সমস্তটা মিলিয়ে যেন এক। বেখাপ কিছু চোখে ঠেকে না। ওলন্দাজ গবর্মেণ্ট বাইরে থেকে কারখানা-ওয়ালাদের এই দ্বীপে আসতে বাধা দিয়েচে, মিশনরিদেরও এখানে আনাগোনা নেই। এখানে বিদেশীদের জমি কেনা সহজ নয়, এমন কি, চাষবাসের জন্যেও কিনতে পারে না। আরবী মুসলমান, গুজরাটের খোজা মুসলমান, চীন দেশের ব্যাপারীরা এখানে কেনা-বেচা করে—চারদিকের সঙ্গে সেটা বেমিল হয় না। গঙ্গার ধার জুড়ে দ্বাদশ দেউলগুলিকে লজ্জিত ক'রে বাংলাদেশের বুকের উপর জুট্‌মিল্ যে নিদারুণ অমিল ঘটিয়েচে এ সে রকম নয়। গ্রামের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ গ্রামের লোকেরই হাতে। এখানে ক্ষেতে জলসেকের আর চাষবাসের যে রীতি-পদ্ধতি সে খুব উৎকৃষ্ট। এরা ফসল যা ফলায়, পরিমাণে তা' অন্য দেশের চেয়ে অনেক বেশি।

কাপড় বোনে নানা রং-চং ও কারুকৌশলে। অর্থাৎ এরা কোনো মতে ময়লা ট্যানা কোমরে জড়িয়ে শরীরটাকে অনাদৃত ক'রে রাখে না। তাই যেখানে কোনো কারণে ভিড় জমে, বর্ণচ্ছটার সমাবেশে সেখানটা মনোরম হ'য়ে ওঠে। মেয়েদের উত্তর অঙ্গ অনাবৃত। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠ্‌লে তারা বলে, আমরা কি নষ্ট মেয়ে যে, বুক ঢাক্‌ব? শোনা গেল, বালীতে বেশ্যারাই বুকে কাপড় দেয়। মোটের উপর এখানকার মেয়ে-পুরুষের দেহ-সৌষ্ঠব ও মুখের চেহারা ভালোই। বেঢপ্ মোটা বা রোগা আমি তো এ পর্য্যন্ত দেখিনি। এখানকার পরিপুষ্ট শ্যামল প্রকৃতির সঙ্গে এখানকার পাটল রঙের নধরদেহ গোরু, এখানকার সুস্থ সবল পরিতৃপ্ত প্রসন্ন ভাবের মানুষগুলি মিলে গেছে। ছবির দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে এমন জায়গা পৃথিবীতে খুব কমই আছে

নন্দলাল এখানে এলেন না ব'লে আমার মনে অত্যন্ত আক্ষেপ বোধ হয়; এমন সুযোগ তিনি আর কোথাও কখনো পাবেন না। মনে আছে কএক বৎসর আগে একজন নামজাদা আমেরিকান আর্টিষ্ট্ আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেন এমন দেশ তিনি আর কোথাও দেখেন নি। আর্টিষ্টের চোখে পড়বার মতো জিনিষ এখানে চারদিকেই। অন্নসচ্ছলতা আছে ব'লেই স্বভাবত গ্রামের লোকের পক্ষে ঘর দুয়ার আচার অনুষ্ঠান আসবাবপত্রকে শিল্প কলায় সজ্জিত করবার চেষ্টা সফল হ'তে পেরেচে। কোথাও হেলাফেলার দৃশ্য দেখা গেল না। গ্রামে গ্রামে সর্ব্বত্র চল্‌চে নাচ, গান, অভিনয়; অভিনয়ের বিষয় প্রায়ই মহাভারত থেকে। এর থেকে বোঝা যাবে গ্রামের লোকের পেটের খাদ্য ও মনের খাদ্যের বরাদ্দ অপর্য্যাপ্ত। পথে আশে পাশে প্রায়ই নানা প্রকার মূর্ত্তি ও মন্দির। দারিদ্র্যের

চিহ্ন নেই, ভিক্ষুক এ পর্য্যন্ত চোখে পড়ল না। এখানকার গ্রামগুলি দেখে মনে হোলো এই তো যথার্থ শ্রীনিকেতন। গ্রামের সমগ্র প্রাণটি সকল দিকে পরিপূর্ণ।

এদেশে উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ। এখানকার নারকেল-বন যেমন সমুদ্র-হাওয়ায় ছুলচে তেমনি সমস্ত দেশের মেয়ে পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত। এক একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পথ থাকে। বাঙলা দেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল সেদিন সহজেই কীর্ত্তনগানে সে আপন আবেগ সঞ্চারের পথ পেয়েছে, এখনো সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। এখানে এদের প্রাণ যখন কথা কইতে চায় তখন সে নাচিয়ে তোলে। মেয়ে নাচে, পুরুষ নাচে। এখানকার যাত্রা অভিনয় দেখেচি, তার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত চলায় ফেরায়, যুদ্ধে বিগ্রহে, ভালোবাসার প্রকাশে, এমন কি ভাঁড়ামিতে সমস্তটাই নাচ। সেই নাচের ভাষা যারা ঠিকমতো জানে তারা বোধ হয় গল্পের ধারাটা ঠিকমতো অনুসরণ করতে পারে। সেদিন এখানকার এক রাজবাড়িতে আমরা নাচ দেখ্‌ছিলুম। খানিক বাদে শোনা গেল এই নাচ-অভিনয়ের বিষয়টা হচ্চে শাল্ব-সত্যবতীর আখ্যান। এর থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গ'ড়ে তোলে। মানুষের সকল ঘটনারই বাহ্যরূপ চলা ফেরায়। কোনো একটা অসামান্য ঘটনাকে পরিদৃশ্যমান করতে চাইলে তার চলাফেরাকে ছন্দের সুষমা যোগে রূপের সম্পূর্ণতা দেওয়া সঙ্গত। বাণীর দিকটাকে বাদ দিয়ে কিম্বা খাটো ক'রে কেবলমাত্র গতিরূপটিকে ছন্দের উৎকর্ষ দেওয়া এখানকার নাচ। পৌরাণিক যে-আখ্যায়িকা কাব্যে কেবলমাত্র কানে শোনার বিষয় এরা সেইটেকেই কেবলমাত্র চোখে দেখার বিষয় ক'রে নিয়েচে। কাব্যের বাহন বাক্য, সেই বাক্যের ছন্দ অংশ সঙ্গীতের বিশ্বজনীন নিয়মে চালিত, কিন্তু তার অর্থ অংশ কৃত্রিম, সেটা সমাজে পরস্পরের আপোষে তৈরি-করা সঙ্কেতমাত্র। এই দুইয়ের যোগে কাব্য। গাছ শব্দটা শুনলে গাছ তারাই দেখে যাদের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটা আপোষে বোঝাপড়া আছে। তেমনি এদের নাচের মধ্যে শুধু ছন্দ থাক্‌লে তাতে আখ্যান বর্ণনা চলে না, সঙ্কেতও আছে, এই দুইয়ের যোগে এদের নাচ। এই নাচে রসনা বন্ধ ক'রে এরা সমস্ত দেহ দিয়ে কথা কইচে ইঙ্গিতে এবং ভঙ্গী-সঙ্গীতে। এদের নাচে যুদ্ধের যে রূপ দেখি কোনো রণক্ষেত্রে সে রকম যুদ্ধ দূরতঃও সম্ভব নয়। কিন্তু যদি কোনো স্বর্গে এমন বিধি থাকে যে, ছন্দে যুদ্ধ করতে হবে এমন যুদ্ধ, যাতে ছন্দভঙ্গ হ'লে সেটা পরাভবেরই সামিল হয় তবে সেটা এই রকম যুদ্ধই হ'ত। বাস্তবের সঙ্গে এই অনৈক্য নিয়ে যাদের মনে অশ্রদ্ধা বা কৌতুক জন্মায় শেক্স্‌পিয়রের নাটক পড়েও তাদের হাসা উচিত—কেননা তাতে লড়তে লড়তেও ছন্দ, মরতে মরতেও তাই। সিনেমাতে আছে রূপের সঙ্গে গতি, এই সুযোগটিকে যথার্থ আর্টে পরিণত করতে গেলে আখ্যানকে নাচে দাঁড় করানো চলে। বলা বাহুল্য, বাইনাচ প্রভৃতি যে সব পদার্থকে আমরা নাচ বলি তার আদর্শ এ নাচের নয়। জাপানে কিয়োটোতে ঐতিহাসিক নাট্যের অভিনয় দেখেচি তাতে কথা আছে বটে, কিন্তু তার ভাবভঙ্গী চলাফেরা সমস্ত নাচের ধরণে, বড় আশ্চর্য্য তার শক্তি। নাটকে আমরা যখন ছন্দোময় বাক্য ব্যবহার করি, তখন সেই সঙ্গে চলাফেরা হাবভাব যদি সহজ রকমেরই রেখে দেওয়া হয় তাহ'লে সেটা অসঙ্গত হ'য়ে ওঠে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নামেতেই প্রকাশ পায় আমাদের দেশে একদিন নাট্য অভিনয়ের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গই ছিল নাচ। নাটক দেখ্‌তে যারা আসে, পশ্চিম মহাদেশে তাদের বলে অডিয়েন্স্‌, অর্থাৎ শ্রোতা। কিন্তু ভারতবর্ষে নাটককে বলেচে দৃশ্যকাব্য,—অর্থাৎ তাতে কাব্যকে আশ্রয় ক'রে চোখে দেখার রস দেবার জন্যেই অভিনয়।

এই তো গেল নাচের দ্বারা অভিনয়। কিন্তু বিশুদ্ধ নাচও আছে। পশু রাত্রে সেটা গিয়ান্‌য়ারের রাজবাড়ীতে দেখা গেল। সুন্দর সাজকরা দুটি ছোট মেয়ে,—মাথায় মুকুটের উপর ফুলের দণ্ডগুলি একটু নড়াতেই দুলে ওঠে। গামেলান বাদ্য যন্ত্রের সঙ্গে দু'জনে মিলে নাচ্‌তে লাগল। এই বাদ্যসঙ্গীত আমাদের সঙ্গে ঠিক মেলেনা। আমাদের দেশের জলতরঙ্গ বাজনা আমার কাছে সঙ্গীতের ছেলেখেলা ব'লে ঠেকে। কিন্তু

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেই জিনিষটিকে গম্ভীর, প্রশস্ত, সুনিপুণ, বহুযন্ত্রমিশ্রিত বিচিত্র আকারে এদের বাদ্যসঙ্গীতে যেন পাওয়া যায়। রাগ রাগিণীতে আমাদের সঙ্গে কিছুই মেলে না, যে অংশে মেলে সে হচ্চে এদের মৃদঙ্গের ধ্বনি, সঙ্গে করতালও আছে। ছোটো বড়ো ঘণ্টা এদের এই সঙ্গীতের প্রধান অংশ। আমাদের দেশের নাট্যশালায় কন্সর্ট বাজনার যে নূতন রীতি হয়েছে এ সে রকম নয়—অথচ য়ুরোপীয় সঙ্গীতে বহুযন্ত্রের যে হার্ম্মনি এ তাও নয়। ঘণ্টার মতো শব্দে একটা মূল স্বর-সমাবেশ কানে আস্‌চে তার সঙ্গে নানা প্রকার যন্ত্রের নানা রকম আওয়াজ যেন একটা কারুশিল্পে গাঁথা হ'য়ে উঠ্‌চে। সমস্তটাই যদিও আমাদের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র তবু শুন্‌তে ভারি মিষ্টি লাগে। এই সঙ্গীত পছন্দ করতে য়ুরোপীয়দেরও বাধে না।

গামেলান বাজনার সঙ্গে ছোটো মেয়ে দুটি নাচলে, তার শ্রী অত্যন্ত মনোহর। অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে সমস্ত শরীরে ছন্দের যে আলোড়ন তার কী চারুতা, কী বৈচিত্র্য, কী সৌকুমার্য্য, কী সহজ লীলা। অন্য নাচে দেখা যায় নটী তার দেহকে চালনা করচে; এদের দেখে মনে হ'তে লাগল, দুটি দেহ যেন স্বত-উৎসারিত নাচের ফোয়ারা। বারো বছরের পরে এই মেয়েদের আর নাচতে দেওয়া হয় না, বারো বছরের পরে শরীরের এমন সহজ সুকুমার হিল্লোল থাকা সম্ভব নয়।

সেই সন্ধ্যা বেলাতেই রাজবাড়িতে আর একটি ব্যাপার দেখ্‌লুম, মুখোষপরা নটেদের অভিনয়। আমরা জাপান থেকে যে-সব মুখোষ এনেছিলুম তার থেকে বেশ বোঝা যায় মুখোষ তৈরি এক প্রকারের বিশেষ কলাবিদ্যা। এতে যথেষ্ট গুণপনা চাই। আমাদের সকলেরই মুখে যেমন ব্যক্তিগত তেমনি শ্রেণীগত বিশেষত্ব আছে। বিশেষ ছাঁচ ও ভাব প্রকাশ অনুসারে আমাদের মুখের ছাঁদ এক এক রকম শ্রেণী নির্দ্দেশ করে। মুখোষ তৈরি যে গুণী করে সে সেই শ্রেণী-প্রকৃতিকে মুখোষে বেঁধে দেয়। সেই বিশেষ শ্রেণীর মুখের ভাব-বৈচিত্র্যকে একটি বিশেষ ছাঁদে সে সংহত করে। নট সেই মুখোষ প'রে এলে আমরা তখনি দেখ্‌তে পাই একটা বিশেষ মানুষকে কেবল নয়, বিশেষ ভাবের এক শ্রেণীর মানুষকে। সাধারণতঃ অভিনেতা ভাব অনুসারে অঙ্গভঙ্গী করে। কিন্তু মুখোষে মুখের ভঙ্গী স্থির ক'রে বেঁধে দিয়েচে। এইজন্যে অভিনেতার কাজ হচ্চে মুখোষেরই সামঞ্জস্য রেখে অঙ্গভঙ্গী করা। মূল ধুয়োটা তার বাঁধা, এমন ক'রে তাল দিতে হবে যাতে প্রত্যেক সুরে সেই ধুয়োটার ব্যাখ্যা হয়, কিছু অসঙ্গত না হয়। এই অভিনয়ে তাই দেখলুম।

অভিনয়ের সঙ্গে এদের কণ্ঠসঙ্গীত যা শুন্‌চি তাকে সঙ্গীত বলাই চলে না। আমাদের কানে অত্যন্ত বেসুরো এবং উৎকট ঠেকে। এখানে আমরা তো গ্রামের কাছেই আছি, এরা কেউ একলা কিম্বা দল বেঁধে গান গাচ্চে এতো শুনিনি। আমাদের পাড়াগাঁয়ে চাঁদ উঠেছে অথচ কোথাও গান ওঠেনি এ সম্ভব হয় না। এখানে সন্ধ্যার আকাশে নারকেল গাছগুলির মাথার উপর শুক্লপক্ষের চাঁদ দেখা দিচ্চে, গ্রামে কুঁক্‌ড়ো ডাকচে, কুকুর ডাকচে, কিন্তু কোথাও মানুষের গান নেই।

এখানকার একটা জিনিষ বার বার লক্ষ্য ক'রে দেখেচি, ভিড়ের লোকের আত্মসংযম। সেদিন গিয়ান্যারের রাজবাড়িতে যখন অভিনয় হচ্ছিল চারদিকে অবারিত লোকের সমাগম। সুনীতিকে ডেকে বল্‌লুম, মেয়েদের কোলে শিশুদের আর্ত্তরব শুনিনে কেন? নারীকণ্ঠই বা এমন সম্পূর্ণ নীরব থাকে কোন্ আশ্চর্য্য শাসনে? মনে পড়ে কলকাতার থিয়েটারে মেয়েদের কলালাপ ও শিশুদের কান্না বন্যার মতো কমেডি ও ট্র্যাজেডি ছাপিয়ে দিয়ে কি রকম অসংযত অসভ্যতার হিল্লোল তোলে। সেদিন এখানে দুই একটি মেয়ের কোলে শিশুও দেখেচি কিন্তু তারা কাঁদ্‌ল না কেন?

একটা জিনিষ এখানে দেখা গেল যা আর কোথাও দেখিনি। এখানকার মেয়েদের গায়ে গয়না নেই। কখনো কখনো কারো এক হাতে একটা চুড়ি দেখেচি সেও সোনার নয়। কানে ছিদ্র ক'রে শুক্‌নো তালপাতার একটি গুটি পরেচে। বোধ হচ্চে যেন অজন্তার ছবিতেও এ রকম কর্ণভূষণ দেখেচি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এদের আর সকল কাজেই অলঙ্কারের বাহুল্য ছাড়া বিরলতা নেই। যেখানে

সেখানে পাথরে কাঠে কাপড়ে নানা ধাতু দ্রব্যে এরা বিচিত্র অলঙ্কার সমস্ত দেশে ছড়িয়ে রেখেচে কেবল এদের মেয়েদের গায়েই অলঙ্কার নেই।

আমাদের দেশে সাধারণত দেখা যায় অলঙ্কৃত জিনিষের প্রধান রচনাস্থান পুরোণো সহরগুলি যেখানে মুসলমান বা হিন্দু প্রভাব সংহত ছিল,—যেমন দিল্লি, আগ্রা, ঢাকা, কাশী, মাদুরা প্রভৃতি জায়গা। এখানে সে রকম বোধ হ'ল না। এখানে শিল্পকাজ কম-বেশি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ছড়ানো। তার মানে এখানকার লোক ধনীর ফরমাসে নয় নিজের আনন্দেই নিজের চারদিককে সজ্জিত করে। কতকটা জাপানের মতো। তার কারণ, অল্প-পরিসর দ্বীপের মধ্যে আইডিয়া এবং বিদ্যা ছড়িয়ে যেতে বিলম্ব হয় না। তা ছাড়া এদের মধ্যে জাতিগত ঐক্য। সেই সমজাতীয় মনোবৃত্তিতে শক্তির সাম্য দেখা যায়। দ্বীপ মাত্রের একটি স্বাভাবিক বিশেষত্ব এই যে সেখানকার মানুষ সমুদ্র বেষ্টিত হ'য়ে বহুকাল নিজের বিশেষ নৈপুণ্যকে অব্যাঘাতে ঘনীভূত করতে ও তাকে রক্ষা করতে পারে। আমাদের অতিবিস্তৃত ভারতবর্ষে এককালে যা প্রচুর হ'য়ে উৎপন্ন হয় অন্যকালে তা ছড়িয়ে নষ্ট হ'য়ে যায়। তাই আমাদের দেশে অজন্তা আছে অজন্তার কালকেই আঁকড়ে, কণারক আছে কণারকেরই যুগে,—তারা আর একাল পর্য্যন্ত এসে পৌঁছতে পারলে না। শুধু তাই নয়, তত্ত্বজ্ঞান ভারতীয় মনের প্রধান সম্পদ কিন্তু বহু দূরে দূরে উপনিষদের বা শঙ্করাচার্য্যের কালে তা ভাগে ভাগে লগ্ন হ'য়ে রইল। একালে আমরা শুধু তাই নিয়ে আবৃত্তি করি কিন্তু তার সৃষ্টিধারা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেছে। ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হ'য়েও এত শতাব্দী পরেও ভারবর্ষের এত জিনিষ যে এখানে এখনো এমন ক'রে আছে তার কারণ, এটা দ্বীপ, এখানে সহজে কোনো জিনিষ ভ্রষ্ট হ'য়ে যেতে পারে না। অর্থ নষ্ট হ'তে পারে, একটার দ্বারা আরেকটা চাপা পড়তে পারে, কিন্তু বস্তুটা তবু থেকে যায়। এই কারণেই প্রাচীন ভারতের অনেক জিনিষই এখানে আমরা বিশুদ্ধভাবে পাব ব'লে আশা করি। হয়তো এখানকার নাচ এবং নৃত্যমূলক অভিনয়টা সেই জাতের হ'তেও পারে। এখানকার রাজাদের বলে আর্য্য। আমার বিশ্বাস তার অর্থ, রাজবংশ নিজেদের আর্য্যবংশীয় ব'লেই জানে, তারা স্থানীয় অধিবাসীদের স্বজাতীয় ছিল না। তাই এখানকার রাজাদের ঘরে যে সকল কলা ও অনুষ্ঠান আজো চলে আস্‌চে সেগুলি সন্ধান করলে এমন অনেক জিনিষ পাওয়া যাবে যা আমাদের দেশে লুপ্ত ও বিস্মৃত।

এই ছোট দ্বীপে এককালে অনেক রাজা ছিল, তাদের কেউ কেউ ওলন্দাজ আক্রমণে আসন্ন পরাভবের আশঙ্কায় দলে দলে হাজার হাজার লোক নিঃশেষে আত্মহত্যা ক'রে মরেচে। এখনো রাজোপাধিধারী যে কয়েক জন আছে তারা পুরোনো দামী শামাদানের মতো, যাতে বাতি আর জ্বলে না। তাদের প্রাসাদ ও সাজসজ্জা আছে, তা ছাড়া তারা যেখানে আছে তাকে নগর বলা চলে। কিন্তু এই নগরে আর গ্রামে যে পার্থক্য সে যেন ভাইবোনের পার্থক্যের মতো, তারা এক বাড়ীতেই থাকে, তাদের মাঝে প্রাচীর নেই। আধুনিক ভারতে শিল্প চর্চ্চা প্রভৃতি নানা বিষয়ে নগরে গ্রামে ছাড়াছাড়ি। সহরগুলি যে দীপ জ্বালে তার আলো গ্রামে গিয়ে পড়েই না। দেশের সম্পত্তি যেন ভাগ হ'য়ে গেছে, গ্রামের অংশে যেটুকু পড়েচে তাতে আবার অনুষ্ঠান বজায় রাখা সম্ভব নয়। এই কারণে সমস্ত দেশ এক হ'য়ে কোনো শিল্প কোনো বিদ্যাকে রক্ষণ ও পোষণ করতে পারে না। তাই সহরের লোক যখন দেশের কথা ভাবে তখন সহরকেই দেশ ব'লে জানে, গ্রামের লোক দেশের কথা ভাবতেই জানে না। এই বালীতে আমরা মোটরে মোটরে দূরে দূরান্তরে যতই ভ্রমণ করি,—নদী, গিরি, বন, শস্যক্ষেত্র ও পল্লীতে সহরে মিলে খুব একটা ঘনিষ্ঠতা দেখ্‌তে পাই; এখানকার সকল মানুষের মধ্যেই যেন এদের সকল সম্পদ ছড়ানো।

গামেলান সঙ্গীতের কথা পূর্ব্বেই বলেচি। ইতিমধ্যে এ সম্বন্ধে আমাকে চিন্তা করতে হয়েচে। এরা যে আপন মনে সহজ আনন্দে গান গায় না তার কারণ এদের কণ্ঠসঙ্গীতের অভাব। এরা টিং টিং টুং টাং ক'রে যে বাজনা বাজায় বস্তুত তাতে গান নেই, আছে তাল। নানা যন্ত্রে এরা তালেরই বোল দিয়ে চলে। সেই বোল দেবার কোনো

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোনো যন্ত্র ঢাক ঢোলের মতোই, তাতে স্বর অল্প, শব্দই বেশি, কোনো কোনো যন্ত্র ধাতুতে তৈরি সেগুলি স্বরবান। এই ধাতুযন্ত্রে টানা সুর থাকা সম্ভব নয়, থাকবার দরকার নেই, কেননা টানা সুর গানেরই জন্যে; বিচ্ছিন্ন সুরগুলিতে তালেরই বোল দেয়। আসলে এরা গান গায় গলা দিয়ে নয়, সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে; এদের নাচই যেন পদে পদে টানা সুরের মিড় দেওয়া,—বিলিতী নাচের মত ঝম্পবহুল নয়। এদের নাচ বর্ষার ঝমাঝম জল-বিন্দু-বৃষ্টির মতো নয়, ঝরণার তরঙ্গিত ধারার মতো। তাল যে ঐক্যকে দেখায় সে হচ্চে কালের অংশগুলিকে যোজনা ক'রে, গান যে ঐক্যকে দেখায় সে হচ্চে রসের অখণ্ডতাকে সম্পূর্ণ ক'রে। তাই বল্‌চি এদের সঙ্গীতই তাল, এদের নৃত্যই গান। আমাদের দেশে এবং য়ুরোপে গীতাভিনয় আছে, এদের দেশে নৃত্যাভিনয়।

ইতিমধ্যে এখানকার ওলন্দাজ রাজপুরুষ অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েচে। এদের একটা বিশেষত্ব আমার চোখে লাগ্‌ল। অধীনস্থ জাতের উপর এদের প্রভুত্ব যথেষ্ট নেই তা নয়, কিন্তু এদের ব্যক্তিগত ব্যবহারে কর্ত্তৃত্বের ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করিনি। এখানকার লোকদের সঙ্গে এরা সহজে মেলা মেশা কর্‌তে পারে। দুই জাতির পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সর্ব্বদাই হয় এবং সেই বিবাহের সন্তানেরা পিতৃকুল থেকে ভ্রষ্ট হয় না। এখানে অনেক উচ্চপদের ওলন্দাজ আছে যারা সঙ্কর-বর্ণ, তারা অবজ্ঞাভাজন নয়। এখানকার মানুষকে মানুষ জ্ঞান ক'রে এমন সহজ ব্যবহার কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল এই প্রশ্ন করাতে একজন ওলন্দাজ আমাকে বলেছিলেন, যাদের অনেক সৈন্য, অনেক যুদ্ধজাহাজ, অনেক সম্পদ, অনেক সাম্রাজ্য, ভিতরে ভিতরে সর্ব্বদাই তাদের মনে থাকে যে তারা একটা মস্ত কিছু, এই জন্য ছোট দরজা দিয়ে ঢুকতে তাদের অত্যন্ত বেশি সঙ্কুচিত হ'তে হয়। নিজেদের সর্ব্বদা তত প্রকাণ্ড বড়ো ব'লে জানবার অবসর আমাদের হয়নি। এই জন্যে সহজে সর্ব্বত্র আমরা ঢুকতে পারি, এই জন্যে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করা আমাদের পক্ষে সহজ। ইতি

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে লিখিত

৭

কল্যাণীয়েষু,

অমিয়, বালিদ্বীপে আমাদের শেষ দিন। মুণ্ডুক ব'লে একটি পাহাড়ের উপর ডাকবাঙলায় আশ্রয় নিয়েছি। এতদিন বালির যে-অংশে ঘুরেছি—সমস্তই চাষ করা বাস করা জায়গা,—লোকালয়গুলি নারকেল, সুপারি, আম, তেঁতুল, সজ্‌নে গাছের ঘনশ্যামল-বেষ্টনে ছায়াবিষ্ট। এখানে এসে পাহাড়ের গা জুড়ে প্রাচীন অরণ্য দেখা গেল। কতকটা শিলঙ্‌ পাহাড়ের মতো। নীচে স্তরবিন্যস্ত ধানের ক্ষেত, পাহাড়ের একটা ফাঁকের ভিতর দিয়ে দূরে সমুদ্রের আভাস পাওয়া যায়। এখানে দূরের দৃশ্যগুলি প্রায়ই বাষ্পে অবগুণ্ঠিত। আকাশে অল্প একটু অস্পষ্টতার আবরণ, এখানকার পুরানো ইতিহাসের মতো। এখন শুক্লপক্ষের রাত্রি, কিন্তু এমন রাত্রে আমাদের দেশের চাঁদ দিগঙ্গনাদের কাছে যেমন সম্পূর্ণ ধরা দেয় এখানে তা নয়; যে-ভাষা খুব ভালো ক'রে জানিনে যেন সেই রকম তার জ্যোৎস্নাটি।

এতদিন এ-দেশটা একটি অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। আহুত রবাহুত বহু লোকের ভিড়। কত ফোটোগ্রাফ্‌ওয়ালা, সিনেমাওয়ালা, কত ক্ষণিক-পরিব্রাজকের দল। পান্থশালা নিঃশেষে পরিপূর্ণ। মোটরের ধূলোয় এবং ধমকে আকাশ ম্লান। খেয়া জাহাজ কাল জাভা অভিমুখে ফিরবে, তাই প্রতিবর্ত্তী যাত্রীর দল আজ নানা পথবিপথ দিয়ে চঞ্চল হ'য়ে ধাবমান। এত সমারোহ কেন সে কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারো।

বালির লোকেরা যারা হিন্দু, যারা নিজের ধর্ম্মকে আগম বলে, শ্রাদ্ধক্রিয়া তাদের কাছে একটা খুব বড়ো উৎসব। কেননা যথানিয়মে মৃতের সৎকার হ'লে তার আত্মা কুয়াশা হ'য়ে পৃথিবীতে এসে পুনর্জ্জন্ম নেয়, তারপর বারে বারে সংস্কার পেতে পেতে শেষকালে শিবলোকে চরম মোক্ষে তার উদ্ধার।

এবারে আমরা যাঁদের শ্রাদ্ধে এসেচি তাঁরা দেবত্ব পেয়েচেন ব'লে আত্মীয়েরা স্থির করেচে, তাই এত বেশি ঘটা। এত ঘটা অনেক বৎসর হয়নি, আর কখনো হবে কিনা সকলে সন্দেহ করচে। কেননা আধুনিক কাল তার কাটারি হাতে পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্চে অনুষ্ঠানের বাহুল্যকে খর্ব্ব কর্‌বার জন্যে, তার একমাত্র উৎসাহ উপকরণ-বাহুল্যের দিকে।

এখানকার লোকে বল্‌চে সমারোহে খরচ হবে এখানকার টাকার প্রায় চল্লিশ হাজার, আমাদের টাকার পঞ্চাশ হাজার। ব্যয়ের এই পরিমাণটা সকলেরই কাছে অত্যন্ত বেশি ব'লেই ঠেক্‌চে। আমাদের দেশের বড়ো লোকের শ্রাদ্ধে পঞ্চাশ হাজার টাকা বেশি কিছুই নয়। কিন্তু প্রভেদ হচ্চে আমাদের শ্রাদ্ধের খরচ ঘটা করবার জন্যে তেমন নয় যেমন পুণ্য করবার জন্যে। তার প্রধান অঙ্গই দান, পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনায়। এখানকার শ্রাদ্ধেও স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে অর্ঘ্য ও আহার্য্য দান যে নেই তা নয় কিন্তু এর সব চেয়ে ব্যয়সাধ্য অংশ সাজসজ্জা। সে সমস্তই চিতায় পুড়ে ছাই হয়। এই দেহকে নষ্ট ক'রে ফেল্‌তে এদের আন্তরিক অনুমোদন নেই সেটা সেদিনকার অনুষ্ঠানের একটা ব্যাপারে বোঝা যায়। কালো গোরুর মূর্ত্তি, তার পেটের মধ্যে মৃতদেহ, রাস্তা দিয়ে এটাকে যখন বহন ক'রে নিয়ে যায়, তখন শোভাযাত্রার ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে ঠেলাঠেলি প'ড়ে যায়। যেন ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা, যেন অনিচ্ছা। বাহকেরা তাড়া খায়, ঘুরপাক দেয়। এইখানেই আগম, অর্থাৎ যে-ধর্ম্ম বাইরে থেকে এসেছে তার সঙ্গে এদের নিজের হৃদয়বৃত্তির বিরোধ। আগমেরই হ'ল জিৎ, দেহ হ'ল ছাই।

উবুদ ব'লে জায়গায় রাজার ঘরে এই অনুষ্ঠান। তিনি যখন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ব'লে সুনীতির পরিচয় পেলেন সুনীতিকে জানালেন, শ্রাদ্ধক্রিয়া এমন সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবে এ দেশে পুনর্ব্বার হবার সম্ভাবনা খুব বিরল অতএব এই অনুষ্ঠানে সুনীতি যদি যথারীতি শ্রাদ্ধের বেদমন্ত্র পাঠ করেন তবে তিনি তৃপ্ত হবেন। সুনীতি ব্রাহ্মণসজ্জায় ধূপধুনো জ্বালিয়ে "মধুবাতা ঋতায়ন্তে" এবং কঠোপনিষদের শ্লোক প্রভৃতি উচ্চারণ ক'রে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করেন। বহুশতবৎসর পূর্ব্বে একদিন বেদমন্ত্রগানের সঙ্গে এই দ্বীপে শ্রাদ্ধক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল, বহুশতবৎসর পরে এখানকার শ্রাদ্ধে সেই মন্ত্র হয়তো বা শেষবার ধ্বনিত হল। মাঝখানে কত বিস্মৃতি কত বিকৃতি। রাজা সুনীতিকে পৌরোহিত্যের সম্মানের জন্যে কি দিতে হবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। সুনীতি বলেছিলেন এই কাজের জন্যে অর্থ গ্রহণ তাঁর ব্রাহ্মণবংশের রীতিবিরুদ্ধ। রাজা তাঁকে কর্ম্ম-অন্তে বালির তৈরি মহার্ঘ্য বস্ত্র ও আসন দান করেছিলেন।

এখানে একটা নিয়ম আছে যে, গৃহস্থের ঘরে এমন কারো যদি মৃত্যু হয় যার জ্যেষ্ঠরা বর্ত্তমান তাহ'লে সেই গুরুজনদের মৃত্যু না হ'লে এর আর সৎকার হবার জো নেই। এই জন্য বড়দের মৃত্যু হওয়া পর্য্যন্ত মৃতদেহকে রেখে দিতে হয়। তাই অনেকগুলি দেহের দাহক্রিয়া এখানে একসঙ্গে ঘটে। মৃতকে বহুকাল অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়।

সৎকারের দীর্ঘকাল অপেক্ষার আরো একটা কারণ, সৎকারের উপকরণ ও ব্যয়বাহুল্য। তার জন্যে প্রস্তুত হ'তে দেরী হ'য়ে যায়। তাই শুনেচি এখানে কয়েক বৎসর অন্তর বিশেষ বৎসর আসে তখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়।

শবাধার বহন ক'রে নিয়ে যাবার জন্যে রথের মতো যে একটা মস্ত উঁচু যান তৈরি হয়, অনেক সংখ্যক বাহকে মিলে সেটাকে চিতার কাছে নিয়ে যায়। এই বাহনকে বলে ওয়াদা। আমাদের দেশে ময়ূরপংখী যেমন ময়ূরের মূর্ত্তি দিয়ে সজ্জিত, তেমনি এদের এই ওয়াদার গায়ে প্রকাণ্ড বড়ো একটি গরুড়ের মুখ; তার দুইধারে বিস্তীর্ণ মস্ত দুই পাখা, সুন্দর ক'রে তৈরি। শিল্পনৈপুণ্যে বিস্মিত হ'তে হয়। শ্রাদ্ধের এই নানাবিধ উপকরণের আয়োজন মনের ভিতরে সবটা গ্রহণ করা বড়ো কঠিন। যেটা সব চেয়ে দৃষ্টি ও মনকে আকর্ষণ করে সে হচ্চে জনতার অবিশ্রাম ধারা। বহুদূর ও নানাদিক্ থেকে মেয়েরা মাথায় কত রকমের অর্ঘ্য বহন ক'রে সার বেঁধে রাস্তা দিয়ে চলেচে। দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে, যেখানে অর্ঘ্য মাথায় বাহকেরা যাত্রা করতে প্রস্তুত,সেখানে গ্রামের তরুচ্ছায়ায় গামেলান্ বাজিয়ে এক একটি স্বতন্ত্র উৎসব চল্‌চে। সর্ব্বসাধারণে মিলে দলে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দলে এই অনুষ্ঠানের জন্যে আপন আপন উপহার নিয়ে এসে যজ্ঞক্ষেত্রে জমা ক'রে দিচ্চে। অর্ঘ্যগুলি যেমন-তেমন ক'রে আনা নয়, সমস্ত বহুযত্নে সুসজ্জিত। সেদিন দেখলুম ইয়াং-ইয়াং ব'লে এক সহরের রাজা বহু বাহনের মাথায় তাঁর উপহার পাঠালেন। সকলের পিছনে এলেন তাঁর প্রাসাদের পুরনারীরা। কি শোভা, কি সজ্জা, কি আভিজাত্যের বিনয়-সৌন্দর্য্য! এমনি ক'রে নানা পথ বেয়ে বেয়ে বহুবর্ণ-বিচিত্র তরঙ্গিত উৎসবের অবিরাম প্রবাহ। দেখে দেখে চোখের তৃপ্তির শেষ হয় না।

সব চেয়ে এই কথাটি মনে হয় এই রকম বহুদূরব্যাপী উৎসবের টানে বহু মানুষের আনন্দমিলনটি কেবলমাত্র একটা মেলা বসিয়ে বহু লোক জড়ো হওয়া নয়। এই মিলনটির বিচিত্র সুন্দর অবয়ব। নানা গ্রামে নানা ঘরে এই উৎসবমূর্ত্তিকে অনেকদিন থেকে নানা মানুষে ব'সে ব'সে নিজের হাতে সুসম্পূর্ণ ক'রে তুলেচে। এ হ'চ্চে বহুজনের তেমনি সম্মিলিত সৃষ্টি, যেমন ক'রে এরা নানা লোক ব'সে নানা যন্ত্রে তাল মিলিয়ে সুর মিলিয়ে একটা সচল ধ্বনিমূর্ত্তি তৈরি ক'রে তুলতে থাকে। কোথাও অনাদর নেই, কুশ্রীতা নেই। এত নিবিড় লোকের ভিড়, কোথাও একটুও কলহের আভাস মাত্র দেখা গেল না। জনতার মধ্যে মেয়েদের সমাবেশ খুবই বেশি, তাতে একটুও আপদের সৃষ্টি হয়নি। বহুলোকের মিলন যেখানে গ্লানিহীন সৌন্দর্য্যে বিকশিত, যথার্থ সভ্যতার লক্ষ্মীকে সেইখানেই তো আসীন দেখি; যেখানে বিরোধ ঠেকোবার জন্য পুলিস বিভাগের লাল পাগড়ি সেখানে নয়; যেখানে অন্তরের আনন্দে মানুষের মিলন- কেবল যে নিরাময় নিরাপদ্ তা নয়, আপনা আপনি ভিতরের থেকে সৌন্দর্য্যে ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, সেইখানেই সভ্যতার উৎকর্ষ। এই জিনিষটিকে এমনিই সুসম্পূর্ণভাবে ইচ্ছে করি নিজের দেশে। কিন্তু এই ছোট দ্বীপের রাস্তার ধারে যে ব্যাপারটিকে দেখা গেল সে কি সহজ কথা! কতকালের সাধনায়, ভিতরের কত গ্রন্থি মোচন ক'রে তবে এইটুকু জিনিষ সহজ হয়! জড়ো হওয়া শক্ত নয়, এক হওয়াই শক্ত। সেই ঐক্যকে সকলের সৃষ্টিশক্তি দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা সুন্দর ক'রে তোলা কতই শক্তিসাধ্য! আমাদের মিলিত কাজকে সকলে এক হ'য়ে উৎসবের রূপ দেওয়া আবশ্যক। আনন্দকে সুন্দরকে নানামূর্ত্তিতে নানা উপলক্ষ্যে প্রকাশ করা চাই। সেই প্রকাশে সকলেই আপন আপন ইচ্ছার আপন আপন শক্তির যোগদান করতে থাকলে তবেই আমাদের ভিতরকার খোঁচাগুলো ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হ'য়ে যায়, ঝরণার জল ক্রমাগত বইতে থাকলে তলার নুড়িগুলি যেমন সুডোল হ'য়ে আসে। আমাদের অনেক তপস্বী মনে করেন সাধনায় জ্ঞান ও কর্ম্মই যথেষ্ট। কিন্তু বিধাতার রচনায় তিনি দেখিয়েচেন শুধু স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া নয়, রসেই সৃষ্টির চরম সম্পূর্ণতা। মরুর মধ্যে যা কিছু শক্তি সমস্তই বিরোধের শক্তি, বিনাশের শক্তি। রস যখন সেখানে আসে তখনি প্রাণ আসে, তখন সব শক্তি সেই রসের টানে ফুল ফোটায়, ফল ধরায়, সৌন্দর্য্যে কল্যাণে সে উৎসবের রূপ ধারণ করে।

বেলা আটটা বাজল। বারান্দার সামনে গোটা-দুই-তিন মোটর গাড়ি জমা হয়েচে। সুরেন সুনীতিতে মিলে নানা আয়তনের বাক্সে ব্যাগে ঝুলিতে থলিতে গাড়ি বোঝাই করছেন। তাঁরা একদল আগে থাকতেই খেয়াঘাটের দিকে রওনা হবার অভিমুখী। নিকটের পাহাড়ের ঘন সবুজ অরণ্যের পরে রৌদ্র পড়েচে, দূরের পাহাড় নীলাভ বাষ্পে আবৃত। দক্ষিণ শৈলতটের সমুদ্রখণ্ডটি নিঃশ্বাসের ভাপ লাগা আয়নার মতো ম্লান। ঐ কাছেই গিরিবক্ষঃসংলগ্ন পল্লীটির বন-বেষ্টনের মধ্যে সুপুরি গাছের শাখাগুলি শীতের বাতাসে দুলচে। ঝরণা থেকে মেয়েরা জলপাত্রে জল ব'য়ে আনচে। নীচে উপত্যকায় শস্যক্ষেত্রের ওপারে সামনের পাহাড়ের গায়ে ঘন গাছের অবকাশে লোকালয়ের আভাস দেখা যায়। নারকেল গাছগুলি মেঘমুক্ত আকাশের দিকে পাতার অঞ্জলি তুলে ধ'রে সূর্য্যালোক পান করচে।

এখান থেকে বিদায় নেবার মুহূর্ত্তে মনে মনে ভাবচি দ্বীপটি সুন্দর, এখানকার লোকগুলিও ভালো তবুও মন এখানে বাসা বাঁধতে চায় না। সাগর পার হ'য়ে ভারতবর্ষের আহ্বান মনে এসে পৌঁচচ্ছে। শিশুকাল থেকে ভারতবর্ষের ভিতর দিয়েই বিশ্বের পরিচয় পেয়েছি ব'লেই যে এমন হয় তা নয়; ভারতবর্ষের আকাশে, বাতাসে, আলোতে, নদীতে

প্রান্তরে প্রকৃতির একটি উদারতা দেখেছি, চিরদিনের মতো আমার মন তাতে ভুলেচে। সেখানে বেদনা অনেক পাই, লোকালয়ে দুর্গতির মূর্ত্তি চারদিকে—তবু সমস্তকে অতিক্রম ক'রে সেখানকার আকাশে অনাদিকালের যে কণ্ঠধ্বনি শুনতে পাই তাতে একটি বৃহৎ মুক্তির আস্বাদ আছে। ভারতবর্ষের নীচের দিকে ক্ষুদ্রতার বন্ধন, তুচ্ছতার কোলাহল, হীনতার বিড়ম্বনা যত বেশি এমন আর কোথাও দেখিনি, তেমনি উপরের দিকে সেখানে বিরাটের আসন বেদী, অপরিসীমের অবারিত আমন্ত্রণ। তাই আমার মনের কাছে আজকের এই প্রশান্ত প্রভাত সেই দিকেই তার আলোকের ইঙ্গিত প্রসারিত ক'রে রয়েচে। ইতি ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭।

—স্নেহানুরক্ত

পুনশ্চ :—দ্রুত চল্‌তে চল্‌তে উপরে উপরে যে ছবি চোখে জাগ্‌ল, যে ভাব মনের উপর দিয়ে ভেসে গেল তাই লিখে দিয়েছি, কিন্তু তাই ব'লে এটাকে বালির প্রকৃত বিবরণ ব'লে গণ্য করা চল্‌বে না। এই ছবিটিকে হয়তো উপরকার আবরণের জরি বলাও চলে। কিন্তু উপরের আবরণে ভিতরের ভাবের ছাপ নিত্যই পড়ে ত। অতএব আবরণটিকে মানুষের পরিচয় নয় ব'লে উপেক্ষা করা যায় না। যে আবরণ কৃত্রিম ছদ্মবেশের মতো সত্যকে উপর থেকে চাপা দেয় সেইটেতেই প্রতারণা করে, কিন্তু যে আবরণ চঞ্চল জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের ওঠায় পড়ায়, বাঁকায় চোরায়, দোলায় কাঁপনে আপ্‌না আপ্‌নি একটা চেহারা পায় মোটের উপর তাকে বিশ্বাস করা চলে। এখানকার ঘরে মন্দিরে, বেশে ভূষায়, উৎসবে অনুষ্ঠানে সব প্রথমেই যেটা খুব ক'রে মনে আসে সেটা হচ্চে সমস্ত জাতটার মনে শিল্প-রচনার স্বাভাবিক উদ্যম। একজন পাশ্চাত্য আর্টিষ্ট এখানে তিন বৎসর আছেন; তিনি বলেন—এদের শিল্পকলা থেমে নেই, সে আপন বেগে আপন পথ ক'রে নিয়ে এগিয়ে চলেচে, কিন্তু শিল্পী স্বয়ং সে সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত। তিনি বলেন,—কিছুকাল পূর্ব্বে পর্য্যন্ত এখানে চীনেদের প্রভাব ছিল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেটা আপনি ক্ষয়ে আসচে, বালির চিত্ত আপন ভাষাতেই আত্মপ্রকাশ করতে বসেচে। তার কাজে এমন অনায়াস প্রতিভা আছে যে আধুনিক যে দুইএকটি মূর্ত্তি তিনি দেখেচেন সেগুলি য়ুরোপের শিল্প-প্রদর্শনীতে পাঠালে সেখানকার লোক চম্‌কে উঠ্‌বে এই তাঁর বিশ্বাস। এই তো গেল রূপ উদ্‌ভাবন করবার এদের স্বাভাবিক শক্তি। তার পরে, এই শক্তিটিই এদের সমাজকে মূর্ত্তি দিচ্চে। এরা উৎসবে অনুষ্ঠানে নানা প্রণালীতে সেই রূপ সৃষ্টি করবার ইচ্ছাকেই সুন্দর ক'রে প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত। যেখানে এই সৃষ্টির উদ্যম নিয়ত সচেষ্ট সেখানে সমস্ত দেশের মুখে একটি শ্রী ও আনন্দ ব্যক্ত হয়। অথচ জীবনযাত্রার সকল অংশই যে শোভন তা বলা যায় না। এর মধ্যে অনেক জিনিষ আছে যা আনন্দকে মারে, অন্ধ সংস্কারের কত কদাচার, কত নিষ্ঠুরতা। যে মেয়ে বন্ধ্যা, প্রেতলোকে গলায় দড়ি বেঁধে তাকে অফলা গাছের ডালে চিরদিনের মতো ঝুলিয়ে রাখা হয় এখানকার লোকের এই বিশ্বাস। কোনো মেয়ে যদি যমজ সন্তান প্রসব করে, এক পুত্র এক কন্যা, তা হলে প্রসবের পরেই বিছানা নিজে বহন ক'রে সে শ্মশানে যায়, পরিবারের লোক যমজ সন্তান তার পিছন পিছন বহন ক'রে নিয়ে চলে। সেখানে ডালপালা দিয়ে কোনো রকম ক'রে একটা কুঁড়ে বেঁধে তিন চান্দ্রমাস তাকে কাটাতে হয়। দুই মাস ধ'রে গ্রামের মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়, পাপক্ষালনের উদ্দেশে নানাবিধ পূজার্চ্চনা চলে। প্রসূতিকে মাঝে মাঝে কেবল খাবার পাঠানো হয়, সেই কয়দিন তার সঙ্গে সকল রকম ব্যবহার বন্ধ। এই সুন্দর দ্বীপের চিরবসন্ত ও নিত্য উৎসবের ভিতরে ভিতরে অন্ধ বুদ্ধির মায়া সহস্র বিভীষিকার সৃষ্টি করচে, যেমন সে ভারতবর্ষেও ঘরে ঘরে ক'রে থাকে। এর ভয় ও নিষ্ঠুরতা থেকে যে মোহমুক্ত জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে বাঁচায় যেখানে তার চর্চ্চা নেই, তার প্রতি বিশ্বাস নেই সেখানে মানুষের আত্মাবমাননা আত্মপীড়ন থেকে তাকে কে বাঁচাবে? তবুও এই গুলোকে প্রধান ক'রে দেখবার নয়। জ্যোতির্ব্বিদের কাছে সূর্য্যের কলঙ্ক ঢাকা পড়ে না, তবু সাধারণ লোকের কাছে তার আলোটাই যথেষ্ট। সূর্য্যকে কলঙ্কী বল্‌লে মিথ্যে বলা হয় না তবুও সূর্য্যকে জ্যোতির্ম্ময় বল্‌লেই সত্য বলা হয়। তথ্যের ফর্দ্দ লম্বা করা যে সব বৈজ্ঞানিকের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাজ, তাঁরা পশু-সংসারে হিংস্র দাঁত নখের ভীষণতার উপর কলমের ঝোঁক দেবামাত্র কল্পনায় মনে হয় পশুদের জীবনযাত্রা কেবল্ ভয়েরই বাহন। কিন্তু এই সব অত্যাচারের চেয়ে বড়ো হ'চ্চে সেই প্রাণ যা আপনার সদা-সক্রিয় উদ্যমে আপনাতেই আনন্দিত, এমন কি, শ্বাপদের হাত থেকে আত্মরক্ষার কৌশল ও চেষ্টা, সেও আনন্দিত প্রাণ-ক্রিয়ারই অংশ। Inter-ocean নামক যে মাসিক পত্রে একজন লেখকের বর্ণনা থেকে বালির মেয়েদের দুঃখের বৃত্তান্ত পাওয়া গেল, সেই কাগজেই আর একজন লেখক সেখানকার শিল্পকুশল, উৎসব-বিলাসী, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাকে আনন্দের সঙ্গে দেখেচেন। তাঁর সেই দেখার আলোতে বোঝা যায় গ্লানির কলঙ্কটা অসত্য না হ'লেও সত্যও নয়। এই দ্বীপে আমরা ঘুরেচি, গ্রামে পথে বাজারে শস্যক্ষেত্রে মন্দির-দ্বারে উৎসব-ভূমিতে ঝরণা-তলায় বালির মেয়েদের অনেক দেখেচি, সব জায়গাতেই তাদের দেখলুম সুস্থ, সুপরিপুষ্ট, সুবিনীত, সুপ্রসন্ন—তাদের মধ্যে পীড়া অপমান অত্যাচারের কোনো চেহারা তো দেখ্‌লুম না। খুঁটিয়ে খবর নিলে নিশ্চয় কলঙ্কের কথা অনেক পাওয়া যাবে—কিন্তু খুঁটিয়ে পাওয়া ময়লা কথাগুলো সুতো দিয়ে এক সঙ্গে গাঁথলেই সত্যকে স্পষ্ট করা হবে এ কথা বিশ্বাস করবার নয়। ইতি ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭।

সুরবায়া, জাভা। (ক্রমশঃ)

গত মাসের বিচিত্রায় প্রকাশিত জাভাযাত্রীর পত্রে ৮০৪ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ৬ পঙ্‌ক্তিতে যে বাক্য আরম্ভ হইয়াচে তাহা এইরূপ হইবে,—এখানে এসে বারবার আমার এই কথা মনে হয়েছে যে, অতীত কাল যত বড় কালই হোক্ নিজের সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালের একটা স্পর্দ্ধা থাকা উচিত, মনে থাকা উচিত তার মধ্যে জয় করবার শক্তি আছে।

দেবদাসী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

ওগো দেব! তুমি চাহনা আমারে,
চাহ মোর বরতনু?
কুটিল নয়নে কাজলের ফাঁদ,
নিতি নব-নব কবরীর ছাঁদ,
গ্রীবা-কটিমূলে, ভুজ-ভঙ্গিতে
অতনুর ফুলধনু?

বহিব কি শুধু বুকের উপরে
কঠিন কনক-গিরি?
সলিল-তরল মুকুতার হার
উছলি' উঠিবে শুধু অনিবার—
উপলের তলে বহিবে না কভু
নির্ঝর ঝিরি-ঝিরি?

তব্ দেউলের দ্বারে বন্দিনী
উৎসব-দাসী আমি।
আমি সে নটিনী, তুমি নটনাথ,
তোমার নয়নে অসি খর-ঘাত—
ছন্দে ও লয়ে তাল কাটে কিনা,
নেহারিছ দিন-যামি!

চূড়াকেশে বাঁধা কুসুম-কেশর
মলিন হ'ল যে ভালে!
বক্ষে শুকায় স্বেদ-চন্দন,
একি নিকরুণ নীবি-বন্ধন!
বলয়ে-নূপুরে কেঁদে উঠে দেহ
সঙ্গীত-সুর-তালে!

* * *

দেবদাসী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

ছিঁড়ি' মমতার মৃণাল-তন্তু,
সরা'য়ে সরসী-জল—
দূর করি' কাঁটা, মধু পাসরিয়া,
পরাণের গূঢ় পরাগ হরিয়া,
চয়ন করিলে নয়নের লাগি'
ফুল-শোভা সুবিমল !
বাঁশী-সঙ্কেতে বরিলে যাহারে
বাসরের সঙ্গিনী,
আমি যে তাহার লীলা-শতদল !
ভরি করপুট, লভি পদতল,
খসে' যাই চুপে—ফিরেও চাহেনা
রাস-রস-রঙ্গিনী !

* * *

আমি দেবদাসী, দেবী নই আমি—
দাবী নাই সুধাপানে,
আমি নারী নই, নরের গেহিনী,
আমি সবাকার মানস-মোহিনী,
আমি দেবতার ভোগের প্রসাদ
ভক্তের পূজা-দানে !
নয়ন অন্ধ, শ্রবণ বধির—
নৃত্য-পুত্তলিকা !
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ,
নেচে ওঠে মোর সকল অঙ্গ,
প্রাণ নাই, তবু গান গাই আমি—
সৃষ্টির প্রহেলিক

* *

তবু মনে হয়, কে যেন আমারে
ডেকেছিল কতবার !
নদীর কিনারে তরুতলছায়ে
মাটির উপরে আসন বিছা'য়ে—
পিপাসার জল, দুটি স্বাদু ফল
সম্বল ছিল তার !

বাঁশের বাঁশিতে প্রভাতী রাগিণী
গেয়েছিল দূর হ'তে—
শরতের দিন, বাদলের রাতি,
শিশুর অধরে স্বরগের ভাতি,—
কত কুলুকুলু কত মর্ম্মর
সে গীত-লহরী-স্রোতে !

শুনি পুনরায়, মন্থর-মৃদু
বাঁশিতে ভরিছে শ্বাস—
আকাশে ফুটিল একটি সে তারা,
শেষ বিদায়ের অশ্রুর পারা !
নীল-লোহিতের নিমীলিত চোখে
নিশীথের আশ্বাস !

নাট-দেউলের নটিনী যে আমি,
তোমারি দুয়ারে বাঁধা—
মমতার মোহ, প্রণয়ের পাপ
হানিবে আমারে সুকঠিন শাপ,
কটির মেখলা মূক হ'য়ে যাবে,
নূপুরে বাজিবে বাধা !

যবে সে ক্ষণিক ধূপের ধোঁয়ায়
তোমারে আড়াল করে,—
পলকে লুটাই আপনার পা'য়,
নয়নের কূলে কুহেলি ঘনায়,
প্রাণের ভিতরে হাহা করে প্রাণ
ধরণীর ধূলি তরে।

হেরি চমকিয়া—তোমারি সে ছায়া
বেড়িয়া রত্নবেদী,
আরতির কালে করিছে নৃত্য
মথিয়া পরাণ, মথিয়া চিত্ত—
এ কি ইঙ্গিত জাগে সঙ্গীতে
করুণ মর্ম্মভেদী !

দেবদাসী

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

ফুৎকারে যেন সহসা নিবায়
শতাধিক দীপমালা!
আলোকের পিছে হেরি সেই ছায়া—
বিরাট বিপুল অসীমের কায়া!
মনে হয় যেন কেহ কোথা নাই,
নীরব নাট্যশালা!

পূজা শেষ হয়, আরতি ফুরায়—
তখনি দাঁড়াই ফিরে';
অলকের মণি ঝলকিয়া উঠে,
বুকের কলস ছলকিয়া উঠে,
গুরু উরু দোলে, নাচি তালে তালে
মুখরিত মঞ্জীরে!

*   *   *

এই ভালোবাসা?—আমার জীবনে
এই কি তোমার কাজ?
র'ব অচেতন রূপেরি শাসনে,
তুমি বসি' রবে আপন আসনে,
নেহারিবে শুধু চারু কার কলা,
শত বরণের সাজ?

দিবে কি আমারে চির-যৌবন—
হরিবে কি মোর জরা?
কণ্ঠে আমার ফুরা'বে না সুর?
পড়িবে না খসি' পায়ের নূপুর?
রবে কি রূপের মোহ-মঞ্জরী
চিরদিন মধুভরা?

চিরদিন তুমি চাহিবে এমনি—
অপলক অচপল?
ওগো সুন্দর সুঠাম পাষাণ!
তব দেউলের চূড়ার নিশান
কভু টলিবে না?—টুটিবে না মোর
নিয়তির শৃঙ্খল?

ভানুসিংহের পত্রাবলী

৩৭

আমার জ্যোতিষ্ক মিতাটি আকাশ নইলে বিচরণ করতে পারেন না—তাঁরি নামধারী আমি অবকাশ নইলে টিক্‌তে পারিনে। আমার যদি কোনো আলো থাকে তবে সেই আলো প্রচুর অবকাশের মধ্যেই প্রকাশ পায়; সেই জন্যেই আমি ছুটির দরবার করি—কেননা ছুটিতেই আমার যথার্থ কাজ। তাই লোক সমাগম দেখে আমি আশ্রম ছেড়ে দৌড় দিয়েচি। অথচ এই সময়ই উজ্জ্বল সূর্য্যের আলোয়, রঙীন মেঘের ঘটায়, ঘাসে ঘাসে মেঠো ফুলের প্রাচুর্য্যে, হাওয়ায় হাওয়ায়, দিকে দিকে কাশমঞ্জরীর উল্লাস-হাস্য-হিল্লোলে আশ্রম খুব রমণীয় হ'য়ে উঠেছিল। ষ্টেশনের দিকে যখন গাড়ী চলেছিল তখন পিছনের দিকে মন টান্‌ছিল, কিন্তু ষ্টেশনে ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজ্‌ল আর রেলগাড়িটা আমাদের আশ্রমকে যেন টিট্‌কারী দিয়ে পোঁ ক'রে বাঁশী বাজিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে চলে এল। রাত এগারোটায় হাওড়ায় উপস্থিত। এসে শুনি হাওড়ার ব্রিজ্‌ খুলে দিয়েচে। নৌকায় গঙ্গা পার হ'তে হবে। মালপত্র ঘাড়ে নিয়ে ঘাটে গেলেম। সবে জোয়ার এসেচে—ডিঙ্গি নৌকো ঘাট থেকে একটু তফাতে। একটা মাল্লা এসে আমাকে আড়কোলা ক'রে তুলে নিয়ে চল্‌ল। নৌকোর কাছাকাছি এসে আমাকে শুদ্ধ ঝপাস্‌ ক'রে পড়ে গেল। আমার সেই ঝোলা-কাপড় নিয়ে সেইখানে জলে কাদায় লুটোপুটি ব্যাপার। গঙ্গামৃত্তিকায় লিপ্ত এবং গঙ্গাজলে অভিষিক্ত হ'য়ে নিশীথ রাত্রে বাড়ি এসে পৌঁছন গেল। গঙ্গাতীরে বাস, তবু ইচ্ছা ক'রে বহুকাল গঙ্গাস্নান করিনি—ভীষ্ম-জননী ভাগীরথী সেই রাত্রে তার শোধ তুললেন। আজ বিকেলের গাড়ীতে শিলং পাহাড় যাত্রা করব, আশা করি এবারকার যাত্রাটা গতবারের গঙ্গাযাত্রার মত হবে না। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হয়েচে আর ঘন মেঘের আবরণে দিগঙ্গনার মুখ অবগুণ্ঠিত। পূর্ণিমা আশ্বিন, ১৩২৬।

৩৮

ব্রুক্‌সাইড্‌

শিলং

কাল এসে পৌঁছেচি শিলং পর্ব্বতে, পথে কত যে বিঘ্ন ঘট্‌ল তার ঠিক নেই। মনে আছে বোলপুর থেকে আসবার সময় মা-গঙ্গা আমাকে জল কাদার মধ্যে হিঁচড়ে এনে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন? কিন্তু মানলুম না, বৃহস্পতিবারের বারবেলায় কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথিতে রেলে চ'ড়ে বসলুম। ছুদিন আগে রথী আমাদের একখানা মোটরগাড়ি গৌহাটি ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ইচ্ছা ছিল সেই গাড়িতে ক'রে পাহাড়ে চড়ব। সঙ্গে আমাদের আছেন দিনুবাবু এবং কমলবৌঠান, এবং আছেন সাধুচরণ, এবং আছে বাক্স তোরঙ্গ নানা আকার ও আয়তনের এবং সঙ্গে সঙ্গে চলেচেন আমাদের ভাগ্যদেবতা; তাঁকে টিকিট কিন্‌তে হয়নি। সান্তাহার ষ্টেশনে আসাম মেলে চড়লুম, এমনি ক'সে ঝাঁকানি দিতে লাগল যে, দেহের রস রক্ত যদি হ'ত দই তাহলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রাণটা তার থেকে মাখন হ'য়ে ছেড়ে বেরিয়ে আস্‌ত। অর্দ্ধেক রাত্রে বজ্রনাদ সহকারে মুষলধারে বৃষ্টি হ'তে লাগ্‌ল। গৌহাটির নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে যখন খেয়া জাহাজে ব্রহ্মপুত্রে ওঠা গেল তখন আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন কিন্তু বৃষ্টি নেই। ওপারে গিয়েই মোটরগাড়িতে চড়ব ব'লে খেয়ে-দেয়ে সেজে-গুজে গুছিয়ে-গাছিয়ে ব'সে আছি—গিয়ে শুনি ব্রহ্মপুত্রে বন্যা এসেচে

ব'লে এখনো ঘাটে মোটর নামাতে পারেনি। এদিকে বলে, ছুটোর পরে মোটর ছাড়তে দেয় না। অনেক বকাবকি দাপাদাপি ছুটোছুটি হাঁকডাক ক'রে বেলা আড়াইটের সময় গাড়ি এল। কিন্তু সময় গেল। তীরের কাছে একটা শূন্য জাহাজ বাঁধা ছিল, সেইটেতে উঠে মুটের সাহায্যে কয়েক বাল্‌তি ব্রহ্মপুত্রের জল তুলিয়ে আনা গেল; —স্নান করবার ইচ্ছা। ভূগোলে পড়া গেছে পৃথিবীর তিন ভাগ জল একভাগ স্থল, কিন্তু বন্যার ব্রহ্মপুত্রের ঘোলা স্রোতে সেদিন তিনভাগ স্থল একভাগ জল। তাতে দেহস্নিগ্ধ হ'ল বটে কিন্তু নির্ম্মল হ'ল বলতে পারিনে। বোলপুর থেকে রাত্রি এগারোটার সময় হাওড়ার তীরে কাদার মধ্যে প'ড়ে যেমন গঙ্গাস্নান হ'য়েছিল, সেদিন ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নানটাও তেমনি পঙ্কিল। তা হোক্, এবার আমার ভাগ্য আমাকে ঘাড়ে ধ'রে পুণ্যতীর্থোদকে স্নান করিয়ে দিলেন। কোথায় রাত্রি যাপন করতে হবে তারি সন্ধানে আমাদের মোটরে চ'ড়ে গৌহাটি সহরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া গেল। কিছু দূরে গিয়ে দেখি আমাদের গাড়িটা হঠাৎ ন যযৌ ন তস্থৌ। বোঝা গেল আমাদের ভাগ্যদেবতা বিনা অনুমতিতে আমাদের এ গাড়িতেও চ'ড়ে বসেছেন, তিনিই আমাদের কলের প্রতি কটাক্ষপাত করতেই সে বিকল হয়েচে। অনেক যত্নে যখন তাকে একটা মোটর গাড়ির কারখানায় নিয়ে যাওয়া গেল তখন সূর্য্যদেব অস্তমিত। কারখানার লোকেরা বল্‌লে, "আজ কিছু করা অসম্ভব, কাল চেষ্টা দেখা যাবে।" আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, "রাত্রে আশ্রয় পাই কোথায়?" তারা বল্‌লে, "ডাকবাংলায়।"

ডাকবাংলায় গিয়ে দেখি সেখানে লোকের ভিড়—একটিমাত্র ছোট ঘর খালি, তাতে আমাদের পাঁচজনকে পুরলে পঞ্চত্ব সুনিশ্চিত। সেখান থেকে সন্ধান ক'রে অবশেষে গোয়ালন্দগামী ষ্টীমার ঘাটে একটা জাহাজে আশ্রয় নেওয়া গেল। সেখানে প্রায় সমস্ত রাত বৌমা এবং কমলের ঘোরতর কাশি আর হাঁপানি। রাতটা এইরকম দুঃখে কাট্‌ল। পরদিনে প্রভাতে আকাশে ঘন মেঘ ক'রে বৃষ্টি হ'তে লাগ্‌ল। কথা আছে সকাল সাড়ে সাতটার সময় মোটর কোম্পানীর একটি মোটর গাড়ি এসে আমাদের বহন ক'রে পাহাড়ে নিয়ে যাবে; সে গাড়িখানা আর একজন আর এক জায়গায় নিয়ে যাবে ব'লে ঠিক ক'রে রেখেছিল। সেখানা না পেলে দুঃখ আরো নিবিড়তর হবে তাই রথী গিয়ে নানা লোকের কাছে নানা কাকুতি মিনতি ক'রে সেটা ঠিক ক'রে এসেছেন। ভাড়া লাগবে একশো পঁচিশ টাকা—আমাদের সেই হাতী কেনার চেয়ে বেশি। যা হোক, পৌনে আটটার সময় গাড়ি এল—তখন বৃষ্টি থেমেচে। গাড়ী ত' বায়ু বেগে চল্‌ল, কিছুদূর গিয়ে দেখি একখানা বড় মোটরের মালগাড়ি ভগ্ন অবস্থায় পথপার্শ্বে নিশ্চল হ'য়ে আছে। পূর্ব্বদিনে আমাদের জিনিষপত্র এবং সাধুচরণকে নিয়ে এই গাড়ি রওনা হয়েছিল; এই পর্য্যন্ত এসে তিনি স্তব্ধ হয়েচেন। জিনিষ তার মধ্যেই আছে, সাধু ভাগ্যক্রমে একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ি পেয়ে চ'লে গেছে। জিনিষ রইল প'ড়ে, আমরা এগিয়ে চল্‌লুম। বিদেশে, বিশেষত শীতের দেশে, জিনিষে মানুষে বিচ্ছেদ সুখকর নয়। সইতে হ'ল। যা হোক, শিলং পাহাড়ে এসে দেখি পাহাড়টা ঠিক আছে; আমাদের গ্রহবৈগুণ্যে বাঁকেনি, চোরেনি, ন'ড়ে যায়নি; আমাদের জিওগ্রাফিতে তার যেখানে স্থান ঠিক সেই জায়গাটাতে সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। দেখে আশ্চর্য্য বোধ হ'ল, এখনো পাহাড়টা ঠিক আছে; তাই তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি, কিন্তু আর বেশি লিখ্‌লে ডাক পাওয়া যাবে না। অতএব ইতি—কৃষ্ণা তৃতীয়া, ১৩২৬।

৩৯

ব্রুক্‌সাইড্

শিলং

আমি যেদিন এখানে এসে পৌঁছলুম সেদিন থেকেই বৃষ্টি বাদলা কেটে গিয়েচে। আজ এই সকালে উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে চারিদিক প্রসন্ন; মোটা মোটা গোটাকতক মেঘ পাহাড়ের গা আঁকড়ে ধ'রে চুপচাপ রোদ পোয়াচ্চে—, তাদের এমনি বেজায় কুঁড়ে রকমের চেহারা যে শীঘ্র তারা বৃষ্টি বর্ষণে লাগ্‌বে এমন মনেই হয় না।

আমার এখানকার লেখবার ঘরের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সেই কোণটার কোনো তুলনাই হয় না। বেশ বড় ঘর—নানা রকমের চৌকি টেবিল সোফা আরাম কেদারায় আকীর্ণ। জানলাগুলো সমস্তই শার্সির, তার ভিতর থেকে দেখ্‌তে পাচ্চি দেওদার গাছগুলো লম্বা হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠে বাতাসে মাথা নেড়ে নেড়ে আকাশের মেঘের সঙ্গে ইসারায় কথা বলবার চেষ্টা করচে। বাগানের ফুলগাছের চান্‌কায় কত রঙ বেরঙের ফুল যে ফুটেচে তার ঠিক নেই,—কত ড্যাল্‌লি কত চন্দ্রমল্লিকা, কত গোলাপ,—আরো কত অজ্ঞাতকুলশীল ফুল। আমি ভোরে সূর্য্য ওঠবার আগেই রাস্তার দুই ধারের সেই সব ফোটা ফুলের মাঝখান দিয়ে পায়চারি ক'রে বেড়াই—তারা আমার পাকা দাড়ি আর লম্বা জোব্বা দেখে একটুও ভয় পায় না—হাসাহাসি করে।

এই পর্য্যন্ত লিখেচি এমন সময়ে সাধু এসে খবর দিলে স্নানের জল তৈরি। অমনি কলম রেখে চৌকি ছেড়ে রবিঠাকুর দ্রুতপদবিক্ষেপে স্নানযাত্রায় গমন করলেন। স্নান ক'রে বেরিয়ে এসে খবর পাওয়া গেল—কি খবর বল দেখি? আন্দাজ ক'রে দেখ। খবর পাওয়া গেল যে রবিঠাকুরের ভোগ প্রস্তুত—শ্রীযুক্ত তুলসী নামক উৎকলবাসী পাচকের স্বহস্তে পাক করা। আহার সমাধা ক'রে এই আস্‌চি—সুতরাং চিঠির ওভাগে পূর্ব্বাহ্ণ ছিল, এ-ভাগে অপরাহ্ণ পড়েচে—এখন ঘড়ির কাঁটা বেলা একটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করচে। সেই মোটা মেঘগুলো শাদা কালো রঙের কাবুলি বেড়ালের মতো এখনো অলসভাবে স্তব্ধ হ'য়ে রৌদ্রে পিঠ লাগিয়ে প'ড়ে আছে। পাখী ডাকচে আর জানালার ভিতর দিয়ে চামেলি ফুলের গন্ধ আস্‌চে।

ঐ মেঘগুলোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে একটা লম্বা কেদারা আশ্রয় ক'রে নিস্তব্ধভাবে জানালার কাছে যদি বসতে পারতুম তাহলে সুখী হতুম, কিন্তু অনেক চিঠি লিখতে বাকি আছে। অতএব গিরিশিখরে এই শরতের অপরাহ্ণ আমার চিঠি লিখেই কাটবে। তুমি ছবি আঁকচ কি না লিখো; আর সেই এসরাজের উপর তোমার ছড়ি চল্‌বে কিনা তাও জান্‌তে চাই। ইতি ২৮শে আশ্বিন, ১৩২৬ (তারিখ ভুল করিনি—পাঁজি দেখে লিখেচি)।

৪০

শান্তিনিকেতন

তুমি এত দেরিতে কেন আমার চিঠি পেয়েছ ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমি তোমার চিঠি পেতে দেরি হ'ল দেখে ভাবলুম হয়ত' অমৃতসর কংগ্রেসে তোমাকে ডেলিগেট করেচে, কিম্বা হাওয়া-জাহাজে কাপ্তেন রসের সঙ্গে তুমি অষ্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিয়েচ, কিম্বা হিমালয়ের পর্ব্বত শৃঙ্গে কোনো পওহারী বাবার শিষ্য হ'য়ে মাটির নীচে ব'সে এক মনে নিজের নাকের ডগা নিরীক্ষণ করচ, কিম্বা লয়েড্‌ জর্জ্জের প্রাইভেট সেক্রেটারীর সর্দ্দি হয়েচে খবর পেয়েই তুমি সেই পদের জন্য দরখাস্ত করতে ইংলণ্ডে চ'লে গিয়েচ। আমি পার্ল্যামেন্টে লয়েড্‌ জর্জ্জকে টেলিগ্রাফ করতে যাচ্চি ঠিক এমন সময়ে তোমার চিঠি পেলুম। প'ড়ে দেখি তুমি ঝরণার ধারে কোথায় বেড়াতে গিয়ে আর একটু হ'লেই কুয়োর মধ্যে প'ড়ে গিয়েছিলে। আশ্চর্য্য দেখ, কাল সন্ধ্যাবেলায় আমারো প্রায় সেই রকম দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তখন রাত্তির ন'টা। মুখ ধুয়ে বিছানায় শুতে যাচ্চি এমন সময় কি বল দেখি? কুয়ো? সেই রকমই বটে। এক কপি নৌকাডুবি ব'লে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এক গল্পের বই,—হঠাৎ তারি মধ্যে একবার হুঁচট্ খেয়ে প'ড়ে গেলুম। একেবারে শেষ পাতা পর্য্যন্ত তলিয়ে গেলুম। এত বড় বিপদ ঘটবার কারণ হচ্চে, বিলাত থেকে একজন ইংরেজ ঐ বইটা তর্জ্জমা করবার অনুমতি নিয়েছিলেন। আবার সেদিন আর একজন ইংরেজ ঐটে তর্জ্জমা করতে চেয়ে আমাকে চিঠি লিখেচেন। তাতেই আমার দেখবার ইচ্ছা হ'ল, ওটার মধ্যে কি আছে। কিন্তু সেই ইচ্ছেটা রাত ন'টার সময় হঠাৎ উদয় হওয়া কোনো শুভগ্রহের প্রভাবে নয়। কারণ এই কুয়োটা থেকে উদ্ধার হ'তে রাত তিনটা বেজে গেল। তার মানে আমার পরমায়ু থেকে একটা রাতের বারো আনার ঘুম গেল অনন্তকালের মত হারিয়ে। আজ সকাল

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেলা আমার মুখ চোখ দেখে সি, আই, ডি পুলিশ সন্দেহ করচে কাল রাত্রে আমি কোথায় সিঁধ কাটতে গিয়েছিলুম।

ঐ যে ডাক-হরকরা আসচে। একরাশ চিঠি দিয়ে গেল। তোমার বাবার হাতের লেখা এক লেফাফা দেখতে পাচ্চি,—তার মধ্যে তোমাদের আধুনিক ইতিহাস কিছু পাওয়া যাবে। ওদিকে আবার কাল রাত্রে এক ইংরেজ অতিথি এসেছেন—আজ সমস্ত দিন তিনি বিদ্যালয় পর্য্যবেক্ষণ করবেন, সেই সঙ্গে আমাকেও পর্য্যবেক্ষণ করবেন ব'লে বোধ হচ্চে। যখন করবেন তখন হয়ত' ঢুলব—আর তিনি তাঁর নোটবুকে লিখে নিয়ে যাবেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমস্ত দিন ধ'রে কেবল ঢোলেন। এমনি ক'রেই জীবন-চরিত লেখা হয়। সাহেব যখন আমার জীবন-চরিতে এই কথা লিখবেন তখন তুমি খুব জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ কোরো,—বোলো, আমার অনেক দোষ থাকতে পারে, দিনে ঢোলা অভ্যাস একেবারেই নেই। যাই হোক, তুমি লয়েড্ জর্জ্জের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করোনি এইটেতে আমার মন অনেকটা আশ্বস্ত হয়েচে। ইতি ২৮শে পৌষ, ১৩২৬।

৪১

সামনে তোমার পরীক্ষা—এখন দিনরাত তোমার মাথায় সেই ভাবনা লেগে আছে। অ্যালজেব্রা নিয়ে প'ড়ে থাকবে, তোমার ভয় হবে আমার কাছে থাকলে পাছে তোমার নামতা ভুল হ'য়ে যায়, আর পাছে Animal বানান করতে গিয়ে Annie mull লিখে বস। এই কথা মনে ক'রেই আমি উদাস হ'য়ে একেবারে অজন্তা গুহার মধ্যে চ'লে যাচ্ছিলুম। তুমি যদি আমাকে আটকে রাখতে চাও তাহ'লে কিন্তু অ্যালজেব্রার বইখানা তোমার বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে হবে।

দেখ এবারকার চিঠিতে তোমাকে একটুও ঠাট্টা করিনি—ভয়ঙ্কর গম্ভীর ভাষায় তোমাকে লিখলুম। তুমি পরীক্ষা দিতে যাচ্চ, আমি কোনো দিন পরীক্ষা দিইনি—এইজন্যে ভয়ে সম্ভ্রমে ভক্তিতে শ্রদ্ধায় আমার মুখ থেকে একটিও ঠাট্টার কথা বেরতে চাচ্চে না—আমি নতশিরে এই কথাই কেবল আবৃত্তি করচি—

যা দেবী পাঠ্যগ্রন্থেষু ছাত্রীরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

ইতি ১লা আশ্বিন, ১৩২৮।

বিদেশী চিত্র

—গল্প—

—শ্রীসুরুচিবালা রায়

১

সহরের প্রান্তে ছোট একটা পাহাড়ের গায়ে বি, ও, সি, কোম্পানীর ইউরোপীয়ান কর্ম্মচারীদের সুন্দর শোভন একই প্যাটার্ণের কতকগুলি বাংলো বাড়ী; পাহাড়ের গা বাহিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ছোট একটি পাহাড়ী ঝরণা নীচে ইরাবতীর বিশাল স্রোতে নামিয়া গা ঢালিয়া দিয়াছে; ঝরণার দুই ধারে নানা রকম ফার্ণ গজাইয়া উঠিয়াছে;—প্রকৃতির নিজ হস্তে রোপিত বন-গোলাপ, ডালিয়া ও কাঁটা ফুলের গাছে পাহাড়টি নিত্য শোভিত, নিত্য নূতন।

সদ্যাগত মিঃ জোন্সের বাংলোর উপর কোকোবিন গাছের গোলাপী ফুলের গায়ে সূর্য্যাস্তের লাল আভা পড়িয়াছে, বারান্দাঘেরা বেড়ার গায়ে ঝুলানো অর্কিড ফুলের টব, বারান্দার নীচে স্বল্প সমতল ভূমিতে কতকগুলি দেশী বিলিতি ফুলের গাছ, কতকগুলি পাতাবাহারের চারা। মাঝখানে একটা আরাম কেদারা পড়িয়া, জোন্স্ সাহেব নভেলের পাতায় মগ্ন হইয়া আছেন, সামনে একটা ছোট তেপায়ার উপর গোটাকয়েক যুঁই ফুল আর একটা কাঁচের গেলাসে লাল সিরাপ। সাহেব অন্যমনস্ক ভাবে মাঝে মাঝে গোটাকয়েক ফুল নাকে তুলিয়া শুঁকিতেছেন, মাঝে মাঝে গেলাসটি হাতে ধরিয়া চুমুক দিতেছেন।

দেশ হইতে অতিদূরে, ব্রহ্মদেশের এই ক্ষুদ্র সহর সাহেবের মনকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। দেশে যেখানে সামান্য কেরাণী গিরির উমেদার হইয়া হয়ত জীবনের অধিকাংশ ভাগই কাটিয়া যাইত, সেখান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবীর প্রান্তভাগে, এই কুলী মুটে মজুরের উপর অবাধ রাজত্ব, উপরন্তু দুই হাজার টাকার মাসিক সেলামী পাইয়া, সাহেব পরম তৃপ্তি এবং আভিজাত্য-গৌরবে আপনার প্রভুত্ব চালাইয়া, নির্ব্বিকার চিত্তে ব্রহ্মদেশের রূপ-রস পানে বিভোর হইয়াছিলেন।

মৃদু বায়ু-সঞ্চালনে গাছ হইতে দু'চারটা কোকোবিন ফুল ঝরিয়া ঝরিয়া সাহেবের মাথায় ও বইএর পাতায় টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতেই সাহেব মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সূর্য্যাস্তের লাল আভা পাহাড়খানিকে বায়োস্কোপের ছবির ন্যায় ফুটাইয়া তুলিয়াছে, সাহেব মুগ্ধ হইয়া সেই দৃশ্যের পানে তাকাইয়া রহিলেন। আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী পথখানি দিয়া কত লোক উঠিতেছে নামিতেছে, কত তরুণ কত তরুণী দল বাঁধিয়া, গল্প হাসির ফোয়ারা তুলিয়া লাল বালুর পথে রূপের জ্যোতি ছড়াইয়া যাইতেছে। সকালে যে যুবতী বা তরুণী ঝুড়ি হাতে চিনাবাদামের ক্ষেতে কাজ করিতে গিয়াছে, বা সারাদিন পথে পথে ফিরি করিয়া বেড়াইয়াছে, তারও বেনারসী লুঙ্গি, বা সিল্কের ব্লাউসের মূল্য কোনও ধনীর কন্যা অপেক্ষা ন্যূন নহে। কে জমিদার দুহিতা, কে বা পথের ফিরিওয়ালী, কিম্বা ক্ষেতের মজুরণী, সন্ধ্যাবেলার মিলন-মেলায় তাহা বুঝিবার ক্ষমতা কাহারো নাই।

সাহেব বায়োস্কোপের ফিল্মে আঁকা এই অপূর্ব্ব রূপসীদের পানে চাহিয়া রহিলেন।

অধিক রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া সাহেব সহসা জাগিয়া উঠিলেন। জ্যোৎস্না-দীপ্ত পথে তরুণ বর্ম্মী যুবকেরা ম্যাণ্ডোলিন বা বেহালা বাজাইতে বাজাইতে তখন নৈশ বিহারে বাহির হইয়াছে;—মাথায় খোঁপার উপর ও খোঁপার চারিদিকে সুগন্ধি ফুল ও লতাপাতার নীচে শুভ্র জ্যোৎস্না-মাখানো মুখগুলি জানালা হইতে দেখিয়া, সঙ্গিনী ব্রহ্ম-কুমারীগণকে পরী বলিয়া সাহেবের ভ্রম হইতে লাগিল। শয্যা ছাড়িয়া সাহেব বারান্দায় আসিয়া ইজিচেয়ার টানিয়া বসিলেন।

২

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। ফিরিওয়ালী মালেমিয়া তাহার পিঠার হাঁড়িটি সাহেবের বৈঠকখানার সামনে

ভরা দুপুরে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
শান্তিনিকেতন

শ্রীসুরুচিবালা রায়

আনিয়া নামাইল। প্রতিদিন একটার সময়, সাহেবের টিফিন মালেমিয়াই যোগায়। চা সহযোগে পরম আদরে সাহেব এই বিদেশী খাদ্য আহার করেন,—বাছিয়া বাছিয়া সব চেয়ে ভাল পিঠাগুলি মালেমিয়া সাহেবের প্লেটে তুলিয়া দেয়, সাহেবও আট আনার স্থানে এক টাকা, বা এক টাকার স্থানে দেড় টাকা দিয়া পিঠার মূল্য পরিশোধ করেন। শুভ্র তানাখার নীচে মালেমিয়ার স্বাভাবিক গোলাপী রংটী হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সাহেবও পরম তৃপ্তির সহিত সেটুকু উপভোগ করেন; তারপর সোনার চুড়িতে ঠুন্‌ঠুনি বাজাইয়া বর্ম্মা সিগারটিতে আগুন ধরাইয়া, বারকয়েক সেটিতে আপনি চুমুক দিয়া, সাহেবের হাতে তুলিয়া দিয়া মালেমিয়া হাসিয়া চলিয়া যায়; তাহার পদক্ষেপে, তাহার গতিতে, তাহার সকল-কিছুতে সে হাসি উজ্জ্বল হইয়া উঠে,—রাত্রে স্বপ্নের ঘোরে সে হাসি মনে জাগিয়া সাহেবের প্রবাসের কষ্ট ভুলাইয়া দেয়।

৩

সন্ধ্যার পর আফিসের কেরাণীগিরির কাজ সারিয়া কোবাকে ম্যাণ্ডোলিন নিয়া পথে চলিতে চলিতে হাসিয়া মালেমিয়াকে কহিল, "ক'টা পিঠে বিক্রী ক'রে ক'টাকা আজ সাহেবের কাছ থেকে নিলে মালেমিয়া?"

মাথার ফুলের গুচ্ছ গুছাইতে গুছাইতে, সত্য গোপন করিয়া, হাঁসিয়া মালেমিয়া কহিল, "সাহেবটা সত্যি কোবাকে, বড্ড বোকা;—যা দাম চাই, ম্যানিব্যাগ খুলে তাই দিয়ে দেয়।"

কোবাকেও হাসিল সত্য, কিন্তু গোপনে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া মালেমিয়াকে নিরীক্ষণ করিয়া লইল; তারপর হাসিতে হাসিতেই কহিল, "তা তাতে তোমার লাভ বই ক্ষতি কি? পায়ে সোনার মল অবধি হয়ে গেছে,—এইবারে সোনার ইয়ারিং দুটোতে চুণী-পান্না বসবে।"

মালেমিয়া হাসিল। লাল বালুর পথে কাঁকরের গায়ে গায়ে জ্যোৎস্না চক্‌মক্ করিতেছিল, আশে পাশে ফুটন্ত গোলাপ ফুটন্ত যুঁইএর গন্ধে সে পথ মাধুরীময় হইয়া উঠিয়াছিল, সে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে সাহেব তাঁহার বাংলোর সম্মুখে ইজিচেয়ার পাতিয়া আসিয়া বসিলেন। সম্মুখ দিয়া হাসিয়া হাসিয়া বেণারসী লুঙ্গির ঝলক তুলিয়া, দুই হাতে সেলাম জানাইয়া মালেমিয়া কোবাকের পাশে পাশে চলিয়া গেল, সাহেব কটাক্ষপাত করিয়া কোবাকেকে দেখিয়া লইলেন।

পরদিন সাহেব মালেমিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকটা কে মালেমিয়া?"

মালেমিয়া হাসিয়া সহজভাবে উত্তর দিল, "আমার বর, সাহেব, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।"

"ভাল, ভাল, তা কি করে ও? দোকান?"

"না সাহেব দোকান নয়, আফিসের কেরাণী।"

ঠোঁট উল্টাইয়া সাহেব কহিলেন, "কেরাণী? তা মাইনে কত? দু'তিন শ'?"

ম্লান হাসিয়া মালেমিয়া কহিল, "না সাহেব, দু'তিন শ' কোথায়? ষাট্।"

"তাও নয়? মোটে ষাট?" সাহেব বিদ্রূপভরে হাসিতে লাগিলেন, "মোটে ষাট্ মালেমিয়া, ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে? মোটে ষাট্?"

একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া মালেমিয়া কহিল, "মোটে কি সাহেব? ঐ ওতেই আমাদের চলে যাবে, তার বেশী আমাদের দরকার কি?"

"দরকার নেই? ওতেই তোমাদের খাওয়া-পরা, দু'চারখান তোমার গয়না, ভাল ভাল জামা কাপড়,—সব হবে? জানো মালেমিয়া আমার বাজার কর্ব্বার যে চাকর তারই মাইনে ত দেখি প্রায় ওর কাছাকাছি!" সাহেব হাসিতে লাগিলেন—মালেমিয়া লাল হইয়া উঠিল।

"তোমার ফিরি করা এ জন্মে আর ঘুচবে না দেখ্‌ছি মালেমিয়া! মালেমিয়া তোমার জন্যে আমার কষ্ট হচ্চে।—"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মালেমিয়া ফিরি তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের উজ্জ্বল আলো পড়িয়া পায়ের সোনার মল, পরিধানের বেনারসী লুঙ্গি চক্‌মক্ ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিল, "আরো কিছু

গয়না এরই মধ্যে করে নাও মালেমিয়া। পরে খরচ বাড়লে ওকি আর কিছু দেবে?”

মালেমিয়া চলিতে চলিতে ফিরিয়া বলিল, “তা না দিক সাহেব, ও আমায় ভালবাসে।”

“বেশ বেশ, খুশী হলুম।”

গমনের তালে তালে মালেমিয়ার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যৌবনের ঢেউ খেলিয়া চলিল, সাহেব বারান্দা পর্য্যন্ত আসিয়া দুই পকেটে হাত ভরিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—তারপব টেবিলের উপর হইতে এক গ্লাস হুইস্কি পান করিয়া বুট জুতায় মাটিতে তাল দিতে দিতে গান ধরিলেন,—

Lucy Lucy my sweetheart
My queen of beauty.—

৪

ঢালু পথে নামিতে নামিতে এক গোছা পাহাড়ী লতা সঙ্গিনীর খোঁপায় জড়াইয়া দিয়া মালেমিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, “সাহেবের বাংলোয় আজ আর আমি যাব না মাখিন, তুই আজ টিফিন নিয়ে যা।”

মাখিন হাসিয়া কহিল, “তাহলে গিয়েও আমার কোন লাভ নেই, সাহেবের আজ আর টিফিন খাওয়া হবে না।”

কে জানে কেন, তাহার অনুপস্থিতিতে সাহেব কিছু বলে কি না জানিবার জন্য মালেমিয়ার সমস্ত অন্তরে-মনে একটা ব্যগ্র কৌতূহল জাগিতেছিল;—তাই সে অনুনয় করিয়া বলিল, “তা না হোক, তুই একবার যা’ত।”

মাখিন একটু হাসিল, একটু বিদ্রূপ করিল, তাহার পর সাহেবের বাংলোর পথে চলিতে চলিতে এক একবার মালেমিয়ার প্রতি একটু কটাক্ষপাতও করিল। মালেমিয়া বাহিরে পথের ধারে একটা পাথরের উপর বসিয়া গুন্ গুন্ করিয়া গানে টান দিল।

ঘণ্টাখানেক পরে মাখিন ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “যা বলেছিলুম, সাহেব কিছু খেলে না মালেমিয়া।”

“কিছু না?”

“কিছু না”,—

“না খাক, তা তুই অত দেরী করলি কেন?”

মালেমিয়ার স্বরের উৎফুল্লতা লক্ষ্য করিয়া, মাখিন মনে মনে হাসিল। “কি কোর্ব্ব? সাহেব তার কত কি সুখ দুঃখের কথা কইতে লাগলো, কি ক’রে উঠে আসি বল্? তোর বাপু সাহস আছে, সব পারিস; আমি কি তা পারি? আমার দুই ভাই ওর আফিসে কাজ করচে, আজ যদি তাড়িয়ে দেয়, উপোস ক’রে সব্বাই মর্ব্বে।”

মালেমিয়া উপহাস করিয়া বলিল, “তা বেশ, খুব ভাব কর।”

“আহা, ভাব কি সাধে করি? না, আমার জন্যেই করি?”

“তবে কার জন্যে?”

ঔদাসীন্যের ভাব দেখাইয়া মাখিন বলিল, “কে জানে বাপু, কি সব বাজে কথা! তোর আর সে সব শুনে কাজ নেই মালেমিয়া।”

কি সে কথা জানিবার একটা উৎকট আকাঙ্ক্ষাকে মালেমিয়া সজোরে মনের মধ্যে পিষিয়া মারিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; বাহিরে সে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সহিত মাখিনের পাশে পাশে নীরবে হাঁটিয়া চলিল।

পরদিনও মাখিন সাহেবের বাংলো হইতে ফিরিয়া আসিলে, উভয়ে পথে চলিতে চলিতে মাখিন বলিল, “মালেমিয়া, ভাই, আমার উপর রাগ করিস্ নি;—আমার কি দোষ বল্? সাহেব তোকে এই ক্রচ্‌টা মাথায় পরতে দিলে; বল্লে,—আমার কথায় রাগ ক’রে মালেমিয়া আর আসে না, আর আসবেও না, এইটে তাকে আমার হ’য়ে দিয়ো, আর কাল থেকে তুমি আর মিছে এসো না,—টিফিন আর খাবো না, ভাল লাগে না।”

মালেমিয়া নীরবে ক্রচ্‌টা হাতে লইয়া কোনোদিকে না চাহিয়া, মোড় ফিরিয়া একেবারে নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সন্ধ্যার পর কোবাকে আসিয়া বলিল, “মালেমিয়া, শুয়ে যে? অসুখ করেচে?”

অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠ যথাসাধ্য সহজ করিয়া মালেমিয়া কহিল, “না, অসুখ নয়, তবে খুব ভালোও নয়। আজ আর আমি বেড়াতে যাবো না, তুমি যাও,—”

শ্রীসুরুচিবালা রায়

মালেমিয়া চোখ তুলিয়া ভালো করিয়া চাহিলে দেখিতে পাইত কোবাকের সে সুন্দর দেহের এবং সুন্দর বেশের উজ্জ্বল শোভা আজ নাই। মুখে একটা বর্ম্মা সিগার নিয়া কতকটা টলিতে টলিতে কোবাকে আসিয়া শয্যার পাশে বসিল। ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া, হঠাৎ একটা উৎকট হাসি হাসিয়া, কোবাকে অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল, "শুনেছ মালেমিয়া, আজ আমার চাকরী গেছে।" মালেমিয়া মাথা তুলিয়া সচমকে কহিল, "চাকরী গেছে! চাকরী গেছে কি?" "হাঁ, চাকরী গেছে। কোম্পানীর কি একটা কাগজ পাওয়া যাচ্ছে না, আর সেটা আমারই অফিসের ড্রয়ারে ছিল, আজ দেখা গেল, সেটা নেই, সুতরাং চাকরী গেল।"

ম্যালেমিয়া মাথায় হাত রাখিয়া ভীত বিবর্ণ মুখে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মাথা হইতে একটা একটা করিয়া রাশিকৃত ফুল ঝরিয়া ঝরিয়া কতক শয্যায় কতক বা তাহার কোলের উপর পড়িতে লাগিল।

ক্ষণকাল নীরবে বসিয়া থাকিয়া, হঠাৎ একটা বিকট হাসি হাসিয়া, কোবাকে উঠিয়া চলিয়া গেল, এবং পাশে একটা দোকানে ঢুকিয়া পড়িয়া, মদের গেলাসে আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া, লুঙ্গির তলা হইতে ছুরি বাহির করিয়া, সাহেবের বাংলোর পথে চলিল। সে পথ ধরিয়া মাথিন কোথা হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছিল, কোবাকেকে দেখিয়া ব্যাপার বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না;—সহসা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া সবিনয়ে সানুরোধে অনেক মিষ্টি কথা বলিয়া, অনেক বুঝাইয়া ফিরাইয়া বাড়ী নিয়া চলিল।

গভীর রাত্রে, রুদ্ধদ্বারে ঘা পড়িতেই মালেমিয়া উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। মাথিন গৃহে প্রবেশ করিয়া, পুনরায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয্যায় আসিয়া বসিল। ভোরবেলা পথে গরম ভাত তরকারী নিয়া ফিরিওয়ালীদের সাড়া পড়িতেই মাথিন যখন উঠিয়া পড়িল, মালেমিয়া তখন তাহার ভবিষ্যৎ জীবন স্থির করিয়া লইয়াছে।

৫

দীর্ঘ একটি বৎসর পরের কথা। বাংলোর সম্মুখে অর্কিড ফুলের টবে ঘেরা সুদৃশ্য সুশোভন বাংলাটিতে মালেমিয়া তাহার দুইমাসের বেবী ফ্লোরাকে কোলে লইয়া বসিয়াছিল। চারটা বাজিয়া গিয়াছে, মালেমিয়া ঘন ঘন হাত ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিতেছে, মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে; আজ বড় দেরী, বড় বিলম্ব! অদূরে মোটরের হর্ন বাজিয়া উঠিল, মালেমিয়া সাগ্রহে পথের পানে চাহিল; গেটের সম্মুখে আসিয়া মোটর থামিল। মিঃ জোন্স গাড়ী হইতে নামিয়া বারান্দায় উঠিয়া আসিলেন, মালেমিয়ার পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া, ঘুমন্ত বেবীর গোলাপ ফুলের মত গাল দু'টি টিপিয়া দিলেন। শীতল হস্তের স্পর্শে বেবী ঠোঁট দু'খানি বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া কাঁদিবার উপক্রম করিতেই মাতাপিতা উভয়েই হাসিয়া উঠিলেন। সাহেব নত হইয়া বেবীর ক্রন্দনোন্মুখ ঠোঁট দুখানি চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া দিলেন; দুই মাসের বেবী এ আদর বুঝিল না, সদ্য নিদ্রা-ভঙ্গের বিরক্তিতে গাল ফুলাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, আয়া আসিয়া বেবীকে মাতার কোল হইতে তুলিয়া লইয়া ঠেলা-গাড়ীতে করিয়া বাগানে বেড়াইতে লাগিল। নূতন কোন বিরক্তির আর আশু সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বেবী পরম নিশ্চিন্তে আবার চক্ষু দুটি মুদিল।

মালেমিয়া ও মিঃ জোন্স চা পান করিয়া মোটরে বেড়াইতে বাহির হইলেন। চুনী পান্না হীরা মোতিতে সাহেবের পাশে রূপসী মালেমিয়া ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মোটর চীনাবাদামের ক্ষেতের ভিতর দিয়া পাড়াগাঁয়ের পথে চলিল; পথে পূর্ব্ব সঙ্গিনীগণের সবিস্ময়, সকৌতুক দৃষ্টি মালেমিয়ার চোখ এড়াইল না। চীনাবাদামের ক্ষেতে মাঝখানে ছোট ছোট সুন্দর এক একখানি কাঠের বাড়ী; একটা বাড়ীর দ্বারে একটা কোকোবিন গাছের ছায়ায় একখানি বেঞ্চিতে এক কৃষক-বধূ বসিয়াছিল; পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহার তরুণ স্বামী তাহার মাথায় কতকগুলি লতাপাতা ফুল গাঁথিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছিল; সম্মুখে কোকোবিনের ডালে বাঁধা দোলনায় তাহাদের ক্ষুদ্র শিশু দুলিতেছে; তাহার হাত পা নাড়া, তাহার অস্পষ্ট কলকাকলীতে আকৃষ্ট হইয়া মাতাপিতা এক একবার হাত বাড়াইয়া শিশুকে আদর করিতেছে। মালেমিয়া চাহিয়া দেখিল, সে তরুণী মাথিন, এবং তাহার

তরুণ স্বামী তাহারই পরিত্যক্ত কোবাকে। অকারণে তাহার দেহের সমস্ত রক্ত সহসা টগ্‌বগ্‌ করিয়া উঠিল; মালেমিয়া নড়িয়া-চড়িয়া বসিল।

৬

আরো তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বি, ও, সি, কোম্পানীর মিঃ জোন্সের চাকুরীর মেয়াদ ফুরাইয়া গেল; আমেরিকা হইতে নূতন লোক আসিয়া অফিসের চার্জ্জ বুঝিয়া নিল। অতি দীর্ঘ চারি বৎসর বহুদূর বিদেশে কাটাইয়া, যাইবার দিন আসিতেই সাহেবের মন দীর্ঘ বিস্মৃত লণ্ডনের একটি প্রিয় হোটেলের জন্য আকুল হইয়া উঠিল। যাত্রার দিন ঠিক হইতেই, সাহেবের জিনিষপত্র সব গোছ-গাছ আরম্ভ হইয়া গেল; চোখে হাসি, মুখে শিশ, ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে সাহেব ঘুরিয়া ঘুরিয়া ব্রহ্ম দেশীয় জিনিষ-পত্র কিনিতে লাগিলেন; কতদিন পরের দেখা,—স্বদেশীয় বন্ধু বান্ধবকে উপহার দিতে হইবে।

যাত্রার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা মালেমিয়া বলিল, "ফ্লোরার জন্য গোটাকয়েক ফ্রক বেশি ক'রে নিতে হবে। জাহাজে তখন পাওয়া যাবে কোথা।"

আকাশ হইতে পড়িয়া সাহেব কহিলেন, "ফ্লোরা? ফ্লোরা জাহাজে যাবে কোথা?"

সাতঙ্কে মালেমিয়া কহিল, "সে কি, ফ্লোরা যাবে না? আমি যাব না?"

"তোমরা? তোমরা কোথা যাবে!"

"তুমি যাবে, আর আমরা যাব না? আমরা কোথায় থাকব?"

"ওঃ এই কথা! তাই বল! তা তুমি কোথা থাকবে তা আমি কি জানি! এসেছিলুম তোমাদের দেশে, তিন বছর চার বছর থেকে গেলুম; এই তিন চার বছর তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলে; আমি খাইয়েছি, পরিয়েছি, যথাসম্ভব সুখে রেখেছি, এই আমি জানি। তার আগে তুমি কোথায় ছিলে, পরে বা কোথায় থাকবে, তা আমি কি জানি বল?"

মালেমিয়া আকুল হইয়া উঠিল,—"ও কি কথা বলচ, তুমি জানো না? আমি তোমার স্ত্রী না? তুমি আমায় বিয়ে কর নি?"

হুইস্কির গেলাসে টান দিয়া হাসিয়া সাহেব কহিলেন,—"বিয়ে? তোমায় আমায় বিয়ে হ'তে পারে? কে এ কথা বিশ্বাস কর্ব্বে!"

মালেমিয়া উত্তেজিত হইয়া কহিতে লাগিল—"আমার সাক্ষী আছে, আমার প্রমাণ আছে।"

হাসিয়া সাহেব কহিলেন,—সাক্ষী? প্রমাণ? পাগল! তোমাদের ও সব বিয়ে আমি বিয়েই মনে করি না। দু'চার জন লোক খেলে—ব্যস!—আর কে তোমার সাক্ষী? নিয়ে এসো তাকে ডেকে,—তোমার সেই মামা ত? নিয়ে এসো তাকে ডেকে। তার নিজের স্বাক্ষর দেওয়া সেই কাগজ এখনো আছে আমার বাক্সে যে, যে-কদিন আমি এ দেশে আছি, সুধু সেই ক'দিন—ব্যস,—তারপর আর তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি! তোমার মামা পঞ্চাশ টাকা নিয়ে স্বাক্ষর করেছিল। তুমি সে জানবে কোত্থেকে,—এর পর আর আমার কাছে তোমাদের কোন দাবী নেই—"

হতাশ হইয়া মালেমিয়া কহিল,—"আর ফ্লোরা? ফ্লোরা তোমার মেয়ে নয়?"

সাহেব হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। বাগানের ভিতর কলকণ্ঠের উচ্ছ্বসিত হাসি শুনিতে পাওয়া গেল, জ্যাম মাখা রুটি খাইতে খাইতে ফ্লোরা পাপ্পা পাপ্পা করিয়া ছুটিয়া আসিয়া পিতার জানুদ্বয় জড়াইয়া ধরিল, পিতা সে দিকে লক্ষ্য মাত্রও না করিয়া, শিশ্‌ দিতে দিতে, ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাহির হইয়া গেলেন।

* * * *

ভোর হইল, সকাল নয়টায় জাহাজ ইরাবতীর গভীর জলে রেঙ্গুনের পথে পাড়ি দিবে; সাহেবের দরজার সামনে তিন চারিখানি গাড়ী মোটর দাঁড়াইয়া আছে। কুলি মুটে মজুরের ছুটাছুটি, চাকর বাকরের খানা তৈরির ব্যস্ততার মধ্যে মালেমিয়া অভিভূতের মত বসিয়া রহিল। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—মালেমিয়ারও কেবলই তাহা মনে হইতেছিল, কল্যকার সে আলাপ বোধ হয় নিতান্তই মিথ্যা উপহাস!

শ্রীসুরুচিবালা রায়

তাই যদি না হয়, তবে তাহার সেই হীরা জহরতের গহনার বাক্স, তাহার সকল মূল্যবান উপহার, সকলই ত সাহেবের মোটের সঙ্গে গাড়ীতে উঠিতেছে;—সাহেব তাহাকে তবে উপহাস করিয়াছিলেন!—

যাত্রার সময় আসিল। পোষাক পরিয়া সাহেব ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন এবং সেই স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসিয়া কহিলেন, "বাড়ীওয়ালার ভাড়া সব চুকিয়ে দিয়েছি, আজই হয়ত নতুন ভাড়াটে আস্‌বে। মালেমিয়া তুমি মার কাছে চলে যাও।" পাঁচখানা দশটাকার নোট মালেমিয়ার সম্মুখে রাখিয়া সাহেব বলিলেন, "তোমাদের দু-চার দিনের খরচের জন্য কিছু দিলাম।"

মালেমিয়া শূন্য দৃষ্টিতে যেন কিছু না বুঝিয়া চাহিয়া রহিল। হাত তুলিয়া রিষ্ট-ওয়াচের পানে চাহিয়া সাহেব কহিলেন, "সময় হ'য়ে গেছে আমি চল্লুম। আয়ার, চাকরদের মাইনে সব চুকিয়ে দিয়েছি; খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে তোমরা এখনই চলে যাও, আমারও জাহাজ এসে পড়েছে,—আচ্ছা তা হ'লে চল্লুম এখন,—"

সহসা উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া সাহেবের হাত ধরিয়া মালেমিয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "চল্লুম কি? যাবে কোথায়? আগে বলে যাও কেন তুমি আমার সঙ্গে এ ছলনা কর্‌লে? আমি সুখে ছিলুম, আমার ঘর থেকে তুমি আমায় ছিনিয়ে আনলে কেন? এখন আমি খাব কি? ফ্লোরাকে আমি মানুষ কোর্ব্ব কি দিয়ে?"

সাহেব কহিলেন, "ছলনা কি? এই দেখ কাগজ, এই দেখ কি লেখা আছে। তোমার ভবিষ্যতের জন্য কোন দায়িত্বই আমার নেই। আর ফ্লোরা? ফ্লোরার সম্বন্ধে কাগজে ত কোন কথাই নেই। তিন শ' টাকা তোমার মামাকে আগাম দিয়ে তবে এ কাগজ লেখা-পড়া হয়েছিল। এখন আমি চল্লুম, পার ত নালিশ করে আদায় কোরো।"

সজোরে হাত ছাড়াইয়া সাহেব মোটরে উঠিয়া পড়িয়া নিমেষে পাহাড়ের ভিতরকার পথে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

সুর্‌মা-পরা আঁখি

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

সুর্‌মা পরা আঁখি,
কাজল মেঘের আঁচল ছাওয়া
সুরের আলো না কি?
তন্বী সাকীর কটাক্ষেতে,
কোন্ কাহিনী দেয় সে পেতে,
দীপ্ত উষার কাজল চোখের
অরুণ আলোক মাখি।

সুর্‌মা-পরা আঁখি,
ভোর-আরতির ধূপের ধোঁয়ায়
রয় সে চাহিয়া কি?
কাঁপন ছুটি মণির শিখা,
নিবিড় আলিম্পনার লিখা,
রাত-আঁধারের উজল তারা
মৌন স্বপন আঁকি'!

লক্ষ্ণৌ কলাভবন

—সোমবর্ম্মা

লক্ষ্ণৌ-এ সরকারী কলাভবন ছাড়া আর যা' কিছু আছে, তা' না থাকলে হয়ত ইতিহাসের একটা পৃষ্ঠা অসম্পূর্ণ থেকে যেত; কিন্তু তা'ছাড়া আর বিশেষ কিছু ক্ষতি হ'ত ব'লে মনে হয় না।

শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার

লক্ষ্ণৌ-এ নবাবী আমলের অনেক স্থাপত্য নিদর্শন আছে, কিন্তু তার কতক—যাকে বলে rococo—একেবারে তাই। আর বাকীগুলিতে মোগল স্থাপত্যের অবসাদ-চিহ্ন, হিন্দু আমলের অক্ষম অনুকৃতি, আর তার সঙ্গে য়ুরোপের সস্তা অনুকরণ—এই সবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ ক'রে আসফউদ্দৌলার পরবর্ত্তী আমলে যা' কিছু হ'য়েছে—তা' একটা বিশ্বগ্রাসী জগাখিচুড়ী ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। তাতে আশ্চর্য্য হবারও বিশেষ কিছু নেই। নবাবদের পরামর্শদাতা ছিলেন কতকগুলো ছোটজাতের য়ুরোপী আর পরবর্ত্তীকালে নবাবী মস্‌নদ্ যাঁরা অলঙ্কৃত ক'রেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন বাঁদী গর্ভজাত। অতএব রুচির পরিচয়ে আভিজাত্যের ভাগটা যে একটু কম পড়বে, তাতে বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই।

লক্ষ্ণৌ হচ্ছে মুসলমানী সভ্যতার সমাধিভূমি। এখানে এসে মুসলমানী ভাষা একেবারে সাহিত্যকে ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক সমাজের অদ্ভুত আদব কায়দার প্রকাশক রূপে ব্যবহৃত হ'ল। দিল্লীর

লক্ষ্ণৌ কলাভবন

সোমবর্ম্মা
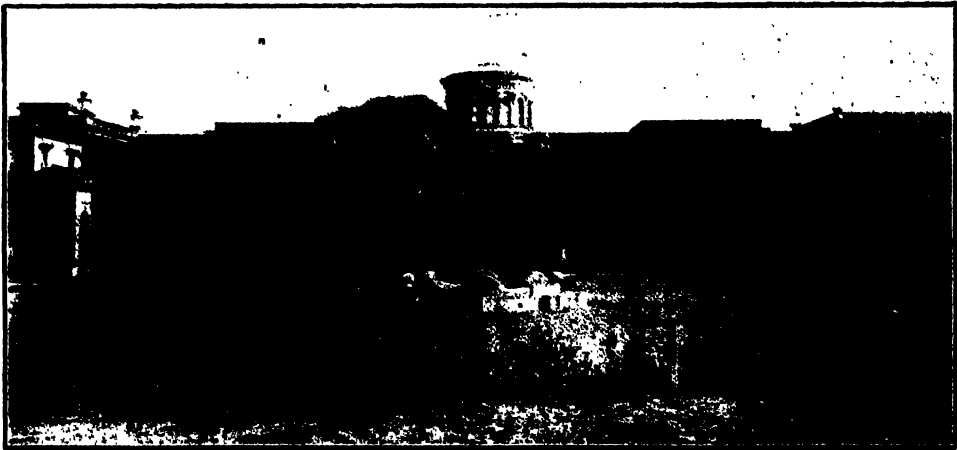
রাজসভার উর্দ্দু, কবি গালিবের উর্দ্দু—লক্ষ্ণৌ-এ এসে 'খানদানি'দের আসরে এবং বাইজির কণ্ঠে নিতান্ত 'শিরীন জবানে' পরিণত হ'ল ;—একটু বেশী মিঠে! লক্ষ্ণৌ ঠুংরির তালে তাল রেখে নাচ্‌তে লাগ্‌লেন বাইজিরা তো বটেই, এবং তাঁদের সঙ্গে স্বয়ং নবাব ওয়াজদ্ আলি শাহ! পুরুষ যে নিজেকে কতটা মেয়েলি ঢংএ গ'ড়তে পারে—তার নিদর্শন পাওয়া যায়—লক্ষ্ণৌ নবাব বংশের এই শেষ বংশধর ওয়াজদ্ আলি শাহে। চেহারায়, হাব-ভাবে, কটাক্ষে, রুচি এবং পোষাকে ইনি একেবারে স্ত্রীলোক ছিলেন ব'ললেই হয়, তাও খুব উচ্চ দরের নয়। শেষ জীবনটা ইনি কলিকাতায় কাটাতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। ঠিক জায়গায় এসে জুটেছিলেন বটে, তবে বছর কতক আগে—এই যা।

সে কথা যাক্। লক্ষ্ণৌ-এর এখন একমাত্র দ্রষ্টব্য হ'চ্ছে সরকারী কলাভবন (Government School of Arts and Crafts)—শিল্পাচার্য্য অসিতকুমার হালদার যার অধ্যক্ষ এবং শিল্পী বীরেশ্বর সেন যার প্রধান পরিচালক।

স্থাপত্য নিদর্শনের দিক থেকে ব'লছিনা—এঁরা দু'জনে লক্ষ্ণৌ কলাভবনের অন্তর্নিহিত ভাবটিকে গ'ড়ে তুলে যে বিশিষ্ট রূপে তাকে প্রকাশ করেছেন, তার তুলনা সমগ্র ভারতে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

ভারত-শিল্পের শ্মশান ভূমিতেই ভারতীয় শিল্পের পুনর্জীবন আরম্ভ হয়েছে। সেইটেই বোধ হয় স্বাভাবিক।

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের ষ্টুডিওর একটী দৃশ্য

ভারতীয় শিল্পের পুনরুত্থানের জন্য শিল্পী-গুরু অবনীন্দ্র নাথের তপস্যা হয়ত ব্যর্থ হ'য়ে যেত যদি তিনি নন্দলাল, অসিত কুমারের ন্যায় কৃতী এবং অনুগত শিষ্য না পেতেন। নন্দলাল বোলপুরের কলাভবনকে সেই প্রতিষ্ঠা দান ক'রেছেন যা' তাঁর গুরুর পক্ষেও কলিকাতার সরকারী কলাভবনে দেওয়া নানা কারণে সম্ভবপর হ'য়ে ওঠেনি। কিন্তু বোলপুরের কলাভবন শুধু চিত্র শিল্পের উৎকর্ষ সাধনেই

শিল্পী শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন

পরিচয় পাওয়া যায় না। বিদ্যালয় সংলগ্ন মুসিয়মে তাঁদের সংগৃহীত প্রাচ্যশিল্পের নমুনার মধ্যে শিক্ষার চেয়ে হাস্যরসের উপাদানই পাওয়া যায় বেশী। সেগুলো সরিয়ে দেবারও উপায় নেই—কেননা সেগুলো সরকারী লাল-ফিতের গ্রন্থিতে আবদ্ধ। সে গ্রন্থি উন্মোচনের চেষ্টা না করাই ভাল। তাতে অনেকটা সময় বাঁচে এবং—সহিষ্ণুতারও তো একটা সীমা আছে।

অসিতকুমারের হাতে আসার পর থেকে লক্ষ্ণৌ কলাভবনের শ্রী ফিরে গেছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ শুধু কলাভবনে নয় সমস্ত উত্তর-ভারতে ইতিমধ্যেই কিছু না কিছু আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত ক'রেছে। তার একটা কারণ হ'চ্ছে অর্থাভাব। লক্ষ্ণৌ কলাভবন এ-বিষয়ে সরকারী অনুগ্রহে সৌভাগ্যবান। সেইজন্যে অসিতকুমারের পক্ষে শিল্পের সব দিকগুলোতেই মনোযোগ দেবার সুবিধা হ'য়েছে। আর এ বিষয়ে এই ক' বছরেই তিনি যা' দক্ষতা দেখিয়েছেন, তাতে বাঙ্গালীর গৌরব করবার কারণ যথেষ্ট আছে। বাঙ্গালী চরিত্রের কার্য্যকারিতার দিকটা সুযোগ-সুবিধা পেলে যে ইংরেজের মতই ফুটে উঠ্‌তে পারে, তা' তিনি প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছেন।

লক্ষ্ণৌ কলাভবন খুব বেশী দিন স্থাপিত হয়নি—বর্ত্তমান রূপ নিয়েছে মাত্র নয় বৎসর পূর্ব্বে। ১৯১৮ সালেই প্রথম চিত্র-বিদ্যা শেখাবার বন্দোবস্ত হয়। তার আগে স্থানীয় কার্য্যকরী শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের দিকেই নজর ছিল বেশী। অসিতকুমারের আগে যে সব ইংরেজ অধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁরা শিষ্যদের ইংরাজী অঙ্কন-পদ্ধতিরই উপাসক ক'রে গ'ড়ে তুলছিলেন। হ্যাভেলের সঙ্গে A.R.C.A.র ছাড়া আর কোন বিষয়েই তাঁদের একত্বের

অধ্যাপক এলম্ হার্স্ট
শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত রেখাচিত্র

পাওয়া যেতে আরম্ভ হয়েছে এবং কালে যে সেটা খুব বেশী পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌বে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।
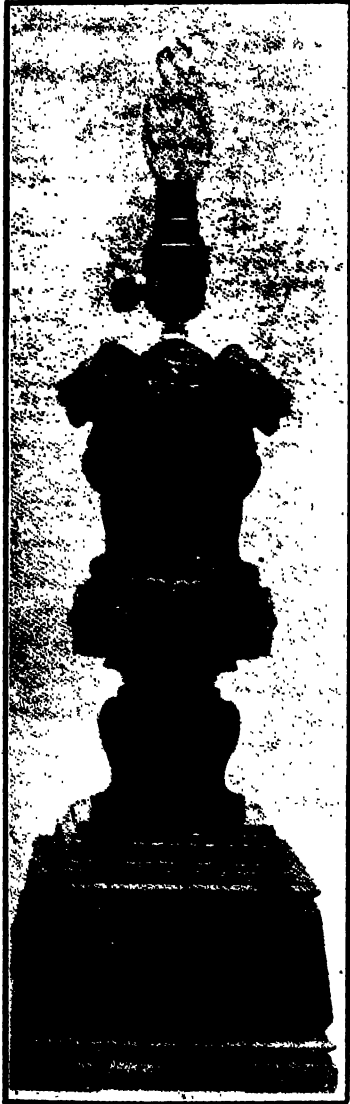
সারনাথের অশোক স্তম্ভের অনুকরণে টেরাকটা নির্ম্মিত দীপাধার—— শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার পরি-কল্পিত এবং লক্ষ্ণৌ কলাভবনে নির্ম্মিত

শ্রীমতী আঁদ্রে কার্‌প্‌নে
শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার অঙ্কিত রেখাচিত্র

অসিতকুমার অবশ্য এখানে ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতিরই প্রবর্ত্তন ক'রেছেন। এই বিভাগের ভার শিল্পী বীরেশ্বর সেনের হাতে। এঁর যত্নে, কল্পনায় এবং পরিশ্রমে অতি দ্রুতবেগে এই বিভাগটি অপূর্ব্ব শ্রী এবং সম্পদে গৌরবান্বিত হ'য়ে উঠ্‌চে। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র—সাহিত্যে এম, এ, পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার ক'রেছিলেন। তারপর কিসের প্রেরণায় যে তিনি চিত্র-বিদ্যায় নিজেকে নিয়োগ ক'রলেন, তা' বোঝা যায় তাঁর অঙ্কিত চিত্রাবলীর ভাব-স্থাপনার সৌকুমার্য্যে এবং তাঁর সূক্ষ্ম তুলির ললিত ভঙ্গীতে। শিক্ষিত বাঙ্গালীর ইঁহার অঙ্কিত চিত্রের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় আছে, অতএব সে বিষয়ে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। ইনি অসিতকুমারের দক্ষিণ হস্তরূপে

নটরাজশিব টেরাকটায়

বিশিষ্ট যীশুখ্রীষ্টকে প্রাচ্যের লোক ব'লে চিনতে আমরা এক রকম অনভ্যস্তই হ'য়ে প'ড়েছিলুম। গত বোম্বাই প্রদর্শনীতে টম্যাসের চিত্রাবলী সমঝ্‌দারদের কাছে যে রকম আদৃত হ'য়েছে, তাতে আশা হয় যে এই নবীন শিল্পীর প্রাচ্যভাব-সাধনা একদিন সফলতায় মণ্ডিত হ'য়ে উঠ্‌বে।

কিন্তু লক্ষ্ণৌ কলাভবনের বিশেষত্ব হ'চ্ছে এই যে, এখানে চিত্রাঙ্কণের উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের আর সমস্ত বিভাগগুলোরও সমানে পরিপুষ্টি বিধানের চেষ্টা লক্ষিত হয়। চিত্র-বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হয়; তার সঙ্গে অন্য বিভাগে কি ক'রে চিত্রের ব্লক তৈরী ক'রতে হয় এবং আরও এক বিভাগে কি করে তা' ত্রিবর্ণে রঞ্জিত ক'রে ছাপতে হয়,—এ সমস্তই শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। ব্যবসায়ের দরকারে লাগবার মতন শিল্প—যাকে বলে commercial art—তারও সুশিক্ষার উপায় এখানে যথেষ্ট আছে—বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা থেকে রঙীন

তাঁর সাফল্যের যে একটা বিশেষ অংশীভাগী রূপে গণ্য হন্, তাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নেই।

এই দু'জনের প্রেরণায় যে সব চিত্রশিল্পী তৈরী হ'চ্ছে, তাদের প্রভাব যে অচিরেই যুক্ত প্রদেশকে ছেয়ে ফেলবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বিদ্যার্থীগণের মধ্যে বিশেষ ক'রে একজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে—টম্যাস নামে একজন মাদ্রাজী খ্রীষ্টান। ইঁহার আঁকা বাইবেলবর্ণিত কতকগুলি ঘটনাদৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল। তাতে মনে হয়, জুডিয়ার অবতারকে প্রাচ্যে ফিরে আনা শিল্পীর পক্ষে একেবারে অসম্ভব নয়। জুডিয়া তো অনেককাল ধ'রেই পাশ্চাত্যের লীলাভূমি হ'য়ে আছে এবং কটাচুল-নীলচোখ

আচার্য্য উইণ্টার নিট্‌জ্‌

সোমবর্ম্মা

লিথো-চিত্রণ অবধি সমস্তই। সোনা, রূপা, তামা, পিতল, লোহার কাজেরও পরিকল্পনা থেকে ঢালাই, খোদাই অবধি সমস্ত কাজ এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। অসিতকুমারের চেষ্টায় জয়পুরী মিনা-কাজ শিক্ষারও এখন প্রবর্ত্তন হয়েছে। পুরাতন বিদ্‌রীর কারুশিল্প, সাধারণ মাটীর কাজ, টেরাকটা এবং প্যারিস্ প্লাষ্টারের কাজও এখানে গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত শিখ্‌তে পারা যায়। ছবিতে তার কতক কতক নিদর্শন পাওয়া যাবে।

ছবি ছাপবার যা' কিছু ব্যাপার, এবং বই বাঁধাই শেখবারও বন্দোবস্ত এখানে আছে। এক সময়ে য়ুরোপে বই বাঁধাই একটা বিশেষ শিল্পের মধ্যে গণ্য ছিল। ইমারতের উপর কারুকার্য্য এবং ইমারতি ড্রইং—এ সমস্তও প্রাচ্য আদর্শের উপর দৃষ্টি রেখে রীতিমতভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। কাঠের-কাজের কথা ভিন্ন প্রবন্ধে আমি বিশেষ ক'রে উল্লেখ ক'রব।

লক্ষ্ণৌ-কলাভবনে তৈয়ারী লৌহনির্ম্মিত বৃক্ষাধারের নমুনা

লক্ষ্ণৌ কলাভবনের তৈয়ারী অলঙ্কারের নমুনা

এ দেশের যন্ত্রশিল্পীরা নূতন পরিকল্পনার দিকে বিশেষ নজর দেয় না। পূর্ব্বপুরুষরা যা' ক'রে এসেছে, তাই কোন রকমে বজায় ক'রে রেখে যেতে পারলেই সন্তুষ্ট। এ সত্যটা অসিতকুমারের দৃষ্টিতে পড়ায়, তিনি অক্লান্ত চেষ্টায় এই সব শিল্পীদের কার্য্যধারায় একটা নূতন উদ্ভাবনী শক্তির প্রেরণা দিতে কতকটা সমর্থ হ'য়েছেন। জয়পুর, আজমীর, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রী প্রভৃতি স্থানের শিল্পাদর্শ নিয়ে তিনি ইংরাজী ড্রইং-বুকের মত একখানা বই শীঘ্রই প্রকাশ ক'রবেন।

বিদ্যালয়-সংলগ্ন ম্যুসিয়মটাতেও অসিতকুমারের সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও অক্লান্ত চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঘ-গুহার এবং রাজপুত, মোগল, কাংড়া, তিব্বত পদ্ধতির চিত্রাবলীতে ইহার দেয়ালগুলি অলঙ্কৃত, আর হস্তীদন্তের কাজ, খোদাই
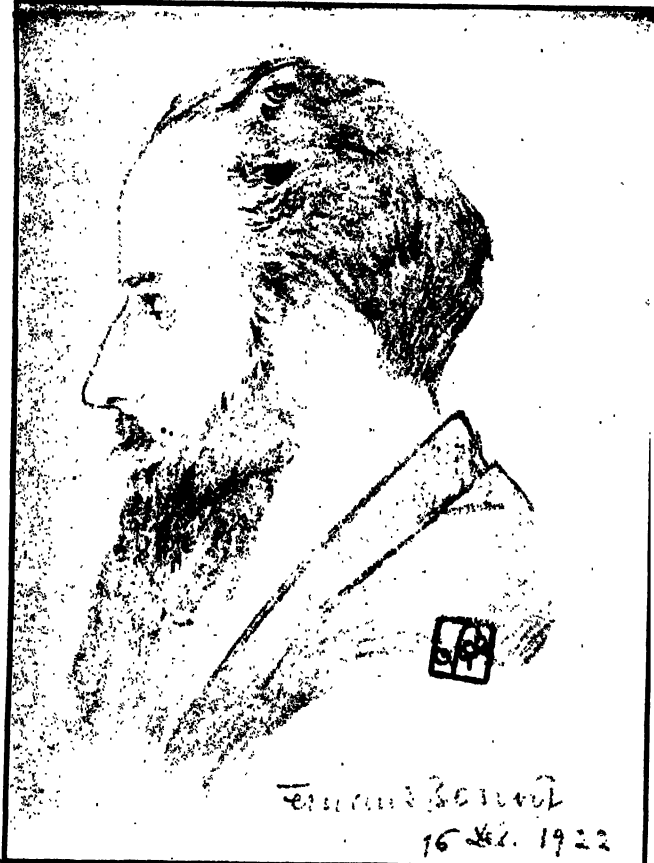
অধ্যাপক বেনোয়া
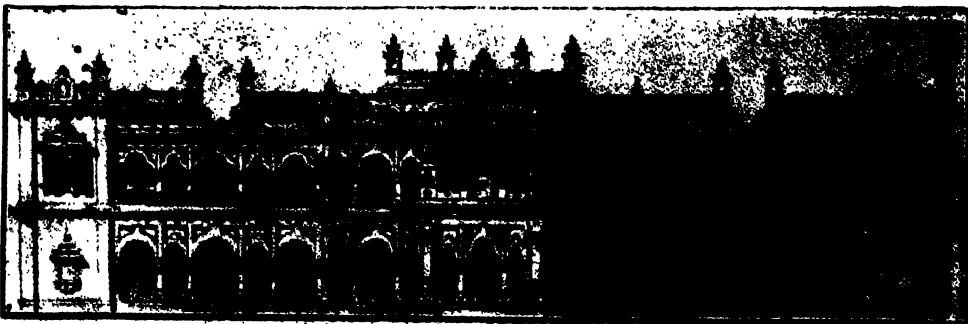
এই চিরব্যস্ত মধুমক্ষী-চক্রটার সমস্তটাই আবর্ত্তিত হ'চ্ছে অসিতকুমারের অঙ্গুলিহেলনে। এ ছাড়া সরকারী ফরমায়েস তো আছেই এবং বাহিরের অনুরোধও উপেক্ষিত হয় না। টিহরী মহারাজের জন্য একটা সমগ্র নূতন নগরের পরিকল্পনা অসিতকুমারকেই ক'রে দিতে হ'য়েছে। যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট হাউসের জন্য বৃহৎ রৌপ্যাধারের পরিকল্পনা তাঁকে ক'রতে হয়েছে এবং তা সম্পূর্ণ করতে সমগ্র বিদ্যালয়ের সমবেত চেষ্টা ছ'মাস ধ'রে প্রযুক্ত হ'য়েছিল। অসিতকুমারকে যুক্তপ্রদেশের সমস্ত কলাবিদ্যালয়-লিকেও পরিদর্শন ক'রে বেড়াতে হয়। তাঁর সময়ের মধ্যে ফাঁক খুব কমই আছে এবং সে ফাঁকটুকু তিনি যদি অন্য উপায়ে না ভরিয়ে রাখতেন, তা' হলে সেটা আক্ষেপের বিষয় হলেও তাঁকে বিশেষ দোষ দিতে পারা যেত না। কিন্তু তিনি তা করেন না। শিল্প এবং সাহিত্যের নব সৃষ্টির দিকটাও তাঁর নজর এড়ায় না। তাঁর অবসর সময়ে এই দুদিকেই তিনি দৃষ্টি সমান রাখেন। লক্ষ্ণৌ কলাভবনের কাঠের-কাজের কথা এ প্রবন্ধে উল্লেখ করা হ'ল না। আসচে মাসে ভিন্ন প্রবন্ধে বিশেষ ক'রে তার আলোচনা করা যাবে। আপাততঃ লক্ষ্ণৌ কলাভবনের এই পরিচয়ই যথেষ্ট ব'লে আশা করা যায়।

করা কাষ্ঠ ফলক, কার্পেট, জরির কাজ ইত্যাদি অনেক রকম নমুনায় ইহার প্রশস্ত কামরাগুলি পূর্ণ।

টিহরী মহারাজের নবনির্ম্মিত নরেন্দ্র-নগরের একটী সৌধ—শ্রীযুক্ত অসিতকুমারের পরিকল্পনা

ভ্রাম্যমাণের জল্পনা

রোমাঁ রোলাঁ

—শ্রীদিলীপকুমার রায়

রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ

সুইজর্ল্যাণ্ড ২৫-১০-২৭।

ঠিক পাঁচ বৎসর বাদে রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ। তাঁর চেহারার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন দেখ্‌লাম না, কেবল তাঁর স্বভাবতঃ পাণ্ডুর আনন যেন একটু বেশি পাণ্ডুর মনে হ'ল। কিন্তু সেই সৌম্য হাসি ও উদ্ভাসিত স্বাগত সম্ভাষণ।

রোলাঁর হ্রদতটবর্ত্তী ছোট কুটীরখানি হেমন্তের শুভ্র আলোয় ঝলমল করছিল।

আমরা একত্রে মধ্যাহ্নভোজনে বস্‌লাম ; রোলাঁ, তাঁর অশীতিপর বৃদ্ধ পিতা, তাঁর ভগিনী মাদেলিন রোলাঁ ও আমি।

কথায় কথায় রোলাঁকে বল্‌লাম, "যদি আপনি আমাদের দেশে একবার আস্‌তেন ত বেশ হ'ত।"

রোলাঁ ফরাসীসুলভ shrug-এর সহিত বল্‌লেন, "জানি না সে ইচ্ছা আমার পূর্ণ হবে কি না।"

"কেন?"

"সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি আমাকে নানা কাজে ব্যস্ত থাকৃতে হয়।"

"আপাততঃ কি কাজে ব্যস্ত আছেন?"

রোলাঁ হেসে বল্‌লেন, "কাজ কি একটা দিলীপ?—কাজ অনেক; আমি সচরাচর একসঙ্গে অনেকগুলি কাজ ক'রে থাকি।"

"যথা?"

"আমার Lame enchantee-র শেষ খণ্ড, এক। বীটোভ্‌নের সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি বড় বই লেখা, দুই। য়ুরোপের নানা লেখকের নানারকম ছোটখাট অনুরোধ রাখা, তিন—"

"অনুরোধ রাখা মানে?"

"য়ুরোপের লেখকেরা এত একদেশদর্শী হ'য়ে পড়েছেন মনে হয় যে এমন অনেক লোকের অনুরোধই আমাকে অনেক সময়ে রাখ্‌তে হয় যার ভার অপরের নেওয়া উচিত ছিল। ধর আমেরিকায় সাকো ও ভাঞ্জেটির প্রাণদণ্ড সম্বন্ধে সম্প্রতি আমাকে খুব একটি তিক্ত প্রবন্ধ লিখ্‌তে হ'য়েছে। এ কাজ আসলে ঠিক্ আমার নয়। তবে যখন বেশীর ভাগ লেখক একেবারে সম্পূর্ণ আত্মসর্ব্বস্ব হ'য়ে ওঠে তখন দু-একজনের ঘাড়ে পড়ে তাদের প্রায়শ্চিত্তের ভার।"

আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌লাম, "মিথ্যা বিচারে সাকো ও ভাঞ্জেটির প্রাণদণ্ড দিয়ে সভ্য জগতে আমেরিকার যে দুর্নাম হ'ল ও তাতে পরিণামে তাদের যে ক্ষতি হ'ল—"

রোলাঁ বাধা দিয়ে বল্‌লেন, "এখন এ ক্ষতি ও দুর্নাম হওয়ার যে দরকার ছিল। তবে আমার মনে হয় যে পরিণামে সাকো ও ভাঞ্জেটির প্রাণদণ্ড হ'য়ে ভালই হ'য়েছে এক-দিক্ দিয়ে।"

"কি রকম?"

"এতে আমেরিকান জাতির একটু ঘুম ভাঙ্‌তে আরম্ভ হ'য়েছে। এর ফলে তারা বোধ হয় একটু তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে তাদের কতটা অধঃপতন হ'য়েছে যার ফলে এমন বিচারের ব্যঙ্গ অভিনয় সেখানে সম্ভব হ'ল। আখেরে এর ফল যে সু-ই হবে এটা অন্ততঃ আমার ত' খুবই মনে হয়।"

"আর কি কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন এখন?"

"ঐ যে বল্‌লাম, কাজ কি একটা ; কাজ বহু। ধর একটা

মস্ত বই লেখবার যোগাড়-যন্ত্র করছি তোমাদের দেশের সম্বন্ধে যার জন্যে উপাদান সংগ্রহ করতে বড় কম পরিশ্রম করতে হচ্ছে না। প্রায় বিশ খণ্ড ইংরাজী বই এসে হাজির হ'য়েছে যা আবার মাদেলিনের সাহায্যে প'ড়ে নিতে হবে, যেহেতু আমি ইংরাজী জানি না।"

আমি উদ্দীপ্ত হ'য়ে বল্লাম, "আমাদের দেশের সম্বন্ধে? আবার কি লিখ্ছেন?"

"রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ।"

উৎসাহিত হ'য়ে বল্লাম, "এ ইচ্ছে আবার কবে হ'ল আপনার?"

মাদেলিন রোলাঁ বল্লেন, "ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের একটি বইয়ে প্রথম এ সম্বন্ধে কিছু প'ড়ে আমি রোমাঁকে অনুবাদ ক'রে শোনাই। সেই থেকে ও ভারি উৎসাহিত হ'য়ে ওঠে—রামকৃষ্ণের জীবন সম্বন্ধে বেশি জানবার জন্যে।"

রোলাঁ বল্লেন, "হাঁ। কারণ ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বইয়ে রামকৃষ্ণের প্রশংসায় য়ুরোপ ও আমেরিকার একদল লোক মহা রাগ করে; আমি সে সবের প্রতিবাদ স্বরূপ একটা বই লিখ্তে মনস্থ করেছি।"

"য়ুরোপ এখন এশিয়ার প্রতি অত্যন্ত বীতরাগ মনে হয়।"

"অত্যন্ত। য়ুরোপে আবার সেই পুরোনো সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ও তার ফলে নির্ব্বিচারে এশিয়ার সব মহামানুষকেই এখানে লোকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখ্তে আরম্ভ ক'রেছে।* ফলে য়ুরোপ এসিয়ার সম্বন্ধে ক্রমেই কম খবর রাখ্‌চে। সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে এতে আশ্চর্য্য হবার বিশেষ কিছু নেই বটে, কিন্তু বিদ্বান্ মনস্বীদের ক্ষেত্রে এটা শুধু বিস্ময়ের নয়, আক্ষেপেরও কথা ব'লে আমি মনে করি। একটা উদাহরণ দেই। সেদিন শোপেনহর সোসাইটির এক ধুরন্ধর পাণ্ডা আমাকে মহা আশ্চর্য্য ক'রে দিয়েছিলেন যখন তিনি আমার একটি প্রবন্ধে উদ্ধৃত বিবেকানন্দের দু চারটি অনুপম তেজঃপূর্ণ কথা প'ড়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'এ প্রতিভাবান্ হিন্দুটি কে'?"

"এতে আশ্চর্য্য হবার এমন কি আছে মসিয়ে রোলাঁ?—বিবেকানন্দকে স্মরণ ক'রে রাখা কি বর্ত্তমান য়ুরোপের প্রবণতার অনুকূল? বিশেষতঃ যখন য়ুরোপে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্ছে ব'লে আপনি এইমাত্র আক্ষেপ করছিলেন?"

রোলাঁ বল্লেন, "কিন্তু তাই ব'লে এত বড় মানুষটাকে এত সহজে ভুলতে চাওয়ার মানে কি এই নয় যে, বর্ত্তমান য়ুরোপ অতীত য়ুরোপের একটা মস্ত গৌরবের উত্তরাধিকার হেলায় হারাতেই ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছে? তা ছাড়া যারা মানুষের কীর্ত্তিকে বড় ক'রে দেখে তারা এতে ব্যথা পাবে না? রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একখানি ভাল বই লিখ্তে যে আমি সঙ্কল্প করেছি সেটা অনেকটা এই জন্যেও বটে।"

"এঁদের সম্বন্ধে আপনি এত উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্লেন কি ক'রে?"

"উৎসাহিত হব না? বিবেকানন্দের লেখার প্রতি ছত্রে যে সমাহিত তেজ, যে দীপ্ত আত্মমর্য্যাদা, মানুষের দেবত্বে যে বিশ্বাস সেটা কি মানুষের একটা মস্ত সম্পদ নয়? তবে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক জিনিষ য়ুরোপে লেখা বিপজ্জনক ও অনেক জিনিষ য়ুরোপীয়ের কাছে অগ্রাহ্য হবে ব'লেই আমার মনে হয়।"

"তার কারণ কি?"

"কারণ অনেক। তবে একটা প্রধান কারণ এই যে থিয়সফিষ্টরা হিন্দুধর্ম্মের গভীরতম তত্ত্বকে এমন বাজে ভড়ঙের মধ্যে দিয়ে বিকৃত ক'রে য়ুরোপের বাজারে সস্তা দামে বিকোতে ব'সেছে যে তাতে ক'রে য়ুরোপের চোখে হিন্দুধর্ম্মের মর্য্যাদার হানি হ'তে বাধ্য। তা ছাড়া এর ফলে এশিয়াকে খাটো প্রতিপন্ন করা অনেকটা সহজ হ'য়ে ওঠেও বটে। এবং এ কথা বলাই বাহুল্য যে, এ জন্যে আধুনিক আত্মসর্ব্বস্ব সঙ্কীর্ণ য়ুরোপীয়দের মনে এক দিক দিয়ে আনন্দ হবারই কথা।"

* যুদ্ধের পর থেকে এই সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার মূল যে আরও দৃঢ়তর হ'য়েছে গত জুনে রাসেলও একথা আমাকে ব'লেছিলেন, তাঁর নিরাশার একটা কারণ নির্দ্দেশ স্বরূপে।

"কিন্তু আশ্চর্য্য এই মসিয়ে রোলাঁ, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের গৌরব আপনি এত দূরে থেকেও এভাবে এত সহজে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। অরবিন্দ তাঁর একটি বইয়ে লিখেছেন যে ভারতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অভ্যুদয় একটা কত বড় ঐতিহাসিক ঘটনা সেটা আজ পর্য্যন্ত আমরাই, অর্থাৎ ভারতীয়েরাই, পুরোপুরি উপলব্ধি করিনি।"

"রোলাঁ উদ্দীপ্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লেন, "আমি এ কথায় অরবিন্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ সায় দেই। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যে বর্ত্তমান ভারতের একটা মস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা এ বিষয়ে আমার অনুমাত্রও সন্দেহ নেই, ও য়ুরোপে এঁদের প্রভাবে বর্ত্তমান সময়ে ভাঁটা পড়লেও জোয়ার আবার আস্‌বেই ব'লে আমি মনে করি। তা ছাড়া আমি ত রামকৃষ্ণের জীবনী পড়তে পড়তে বার বার বিস্ময়সাগরে তলিয়ে গিয়েছি। তুমি শুন্‌লে আশ্চর্য্য হবে দিলীপ, টল্‌ষ্টয় তাঁর শেষ জীবনে বিবেকানন্দের লেখায় মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পরম বন্ধু পল চিরুকফ প্রভৃতি সাহিত্যিক এখনও বিবেকানন্দের নাম জপ করেন। বিশেষ ক'রে রুষদেশে এমন আরও অনেক লোক আছেন।"

আমি বল্‌লাম, "পল চিরুকফ প্রভৃতি যে বিবেকানন্দের দ্বারা এতটা প্রভাবিত তা আমি জান্‌তাম না, তবে টল্‌ষ্টয় যে শেষ জীবনে বিবেকানন্দের লেখায় মুগ্ধ হয়েছিলেন তা আমি জানি। কারণ আমার এক বাঙালী বন্ধু টল্‌ষ্টয়কে তাঁর শেষ জীবনে বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' বইখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পড়ে টল্‌ষ্টয় তাঁকে লেখেন যে মানুষ নিষ্কাম আধ্যাত্মিক চিন্তায় এর চেয়ে উর্দ্ধে কখনো উঠেছে ব'লে তিনি মনে করেন না।"*

রোলাঁ ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন, "দিলীপ, তোমার সেই বন্ধুটিকে টল্‌ষ্টয়ের সে চিঠিটির একটি নকল আমাকে পাঠাতে বল্‌তে পার? আমি শীঘ্রই এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখ্‌ব। আমার বিশেষ দরকার।"

"তিনি আমাকে টল্‌ষ্টয়ের চিঠির এ অংশটি উদ্ধৃত ক'রে পাঠিয়েছিলেন—"

"আমি সমস্ত চিঠিটাই চাই—"

"বেশ, আমি তাঁকে লিখে দেব।"

"ভুলো না কিন্তু—এটা ভারি দরকার।"

"না, ভুল্‌ব না, নিশ্চিন্ত থাকুন।"

খানিকক্ষণ আমরা কথা কইলাম না। হঠাৎ রোলাঁ যেন আবার নিজের মনেই বল্‌তে সুরু ক'রে দিলেন, "বিবেকানন্দের লেখার মধ্যে কী তেজ, কী আত্মসমাহিত শক্তি গৌরব, কী সাধনক্ষমতা! আমার এক এক সময়ে মনে হয় যেন অসাধ্য সাধনের দিক্ দিয়ে বিবেকানন্দকে নেপোলিয়নের সমান বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না—অর্থাৎ, অবশ্য আধ্যাত্মিক জগতে। এত অল্প বয়সের মধ্যে একটা মানুষ যে এত বড় একটা কীর্ত্তি রেখে যেতে পারে তা ভাবলে সত্যিই সম্ভ্রমে মাথা নুয়ে আসে। আর রামকৃষ্ণের কথা ভাব্‌লেও অবাক্ হ'তে হয় যে এ বিশ্বজয়ী কর্ম্মবীরকে প্রথম সাক্ষাতে তিনি এক আঁচড়েই বুঝতে পেরেছিলেন।"

একটু থেমে আবার বল্‌লেন, "আমি শুধু মাঝে মাঝে ভাবি সমাজ সংস্কারের দিকে বিবেকানন্দের যে নিগূঢ় প্রেরণা ছিল বর্ত্তমান ভারতের মহৎ মানুষেরা সেদিকে কোনো প্রেরণাই অনুভব করেন না কেন? গান্ধি প্রমুখ সকলে এখন বিবেকানন্দের এ অসম্পূর্ণ কাজ কেন সম্পূর্ণ করতে অগ্রসর হন না।"

আবার একটু থেমে বল্‌লেন, "কী বিরাট প্রাণ! দুঃখীর জন্যে কী বিরাট ব্যথা! পতিতের জন্যে কি অনুকম্পা! বিবেকানন্দের জীবনের এই ট্রাজিডিটি আমার কাছে মহনীয় মনে হয় যে তিনি নিরন্তর ব্যক্তিগত জীবনে মুমুক্ষু হ'য়েও বাইরের জীবনের দাবীর জন্যে সে মোক্ষকেও আশু প্রয়োজনীয় মনে করেন নি!"

---

* চিঠিটি ১৯১৬ সালের অক্টোবরে লেখা হয়। যথা:—

Dear sir,

I received your letter and the book and thank you very much for both.

The book is most remarkable and I have received much instruction from it. ....

So far humanity has frequently gone backwards from the true and lofty and clear conception of the principle of life, but never surpassed it.

Yours etc.
LEO TOLSTOI

মাদেলিন রোলাঁ বল্‌লেন, "রামকৃষ্ণের জীবনে কিন্তু এ দ্বন্দ্ব ছিল না।"

রোলাঁ বল্‌লেন, "না। কারণ রামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক দিকে প্রকাণ্ড মানুষ হ'লেও ব্যবহারিক জীবনে বিবেকানন্দের পূর্ণতা পান নি।"

আমি বল্‌লাম, "আপনি কি মনে করেন যে য়ুরোপে বিবেকানন্দের বাণীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল?"

রোলাঁ বল্‌লেন, "নিশ্চয়— তবে শুধু সভ্য শিক্ষিত সুকুমার-হৃদয় মানুষের মধ্যে। তাঁর অখণ্ড আত্মনির্ভর ও মানুষের মধ্যে দেবত্বে বিশ্বাস সব দেশের সুকুমার-হৃদয় মানুষের হৃদয়-তন্ত্রীতেই সাড়া তুলতে বাধ্য। তাঁর কথা যেন তীরের মতন একেবারে সোজা গিয়ে হৃদয় বিদ্ধ করে। তাই ত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটি ভাল বই লেখার সঙ্কল্প করেছি। কেবল মুস্কিল হচ্ছে এই যে এত বেশি উপাদান জড় হয়েছে যে সব প'ড়ে উঠ্‌তে পারা কঠিন।"

রামকৃষ্ণের মধ্যে কোন্ বাণীটি আপনাকে এত স্পর্শ ক'রেছে?"

"তাঁর বিশ্বাসের উদারতা—সার্ব্বজনীনতা, সার্ব্বভৌমিকতা। এই-ই ত কর্ম্ম। যে-মানুষ একদম লিখ্‌তে পারত না, যে-মানুষ ব্যবহারিক বুদ্ধিতে অসামান্য নয়, সে মানুষ কেমন ক'রে আধ্যাত্মিক জগতে এই সার্ব্বধর্ম্মিকতা ও সার্ব্বভৌমিকতার বাণী শুন্‌তে পেল? এইখানেই তিনি বিরাট।"

"অরবিন্দ তাঁর একটি বইয়ে রামকৃষ্ণের সম্বন্ধে লিখেছেন যে এত বড় উচ্চ আকারের যোগী যোগীশ্রেষ্ঠের মধ্যেও বিরল।"

"সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।"

খাওয়া শেষ হ'লে আমরা রোলাঁর বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বস্‌লাম।

রোলাঁ আমাকে কয়েকটি গান করতে অনুরোধ করলেন।

(ক্রমশঃ)
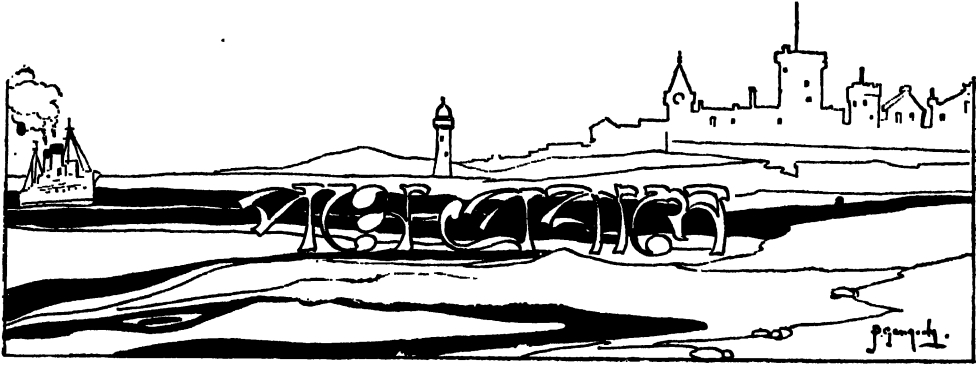
—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

৩

লণ্ডনের সঙ্গে আমার শুভদৃষ্টি হলো গোধূলি লগ্নে। হ'তে না হ'তেই সে চক্ষু নত ক'রে আঁধারের ঘোম্‌টা টেনে দিলে। প্রথম পরিচয়ের কুমার-বিস্ময় গোড়াতেই ব্যাহত হ'য়ে যখন অধীর হ'য়ে উঠ্‌ল তখন মনকে বোঝালুম, এখন এ তো আমারি। আবরণ এর দিনে দিনে খুল্‌ব।

পরের দিন সকালে উঠে দেখি আকাশ কলের ধোঁয়ায় মুখ কালো ক'রে ছিঁচ্‌কাঁদুনে ছেলের মতো যখন তখন চোখের জল ঝরাচ্ছে। সূর্য্যদেবের ঠিক-ঠিকানা নেই। সম্ভবতঃ তিনি কাঁদুনেটাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে মাষ্টারের ভয়ে দুষ্টু ছেলের মতো ফেরার হয়েছেন। লণ্ডনের চিম্‌নীওয়ালা বাড়ীগুলো চুরুটখোরদের মতো মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়্‌তে ছাড়্‌তে আকাশের দিকে চেয়ে হাস্‌ছে, আর যে-দু'চারটে গাছপালার বহু কষ্টে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তারা আমাদের অসূর্য্যম্পশ্যাদের মতো চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে পাতা খস্‌খস্ কর্‌তে কর্‌তে হতভাগ্য আকাশটার দিকে ছলছল চোখে তাকাচ্ছে।

ক্রমে জান্‌লুম এইটেই এখানকার সরকারি আব্-হাওয়া। মাঝে মাঝে এর নিপাতন হয়, গ্রীষ্মকালে এর ব্যতিক্রম হয়, কিন্তু সারা শীতকালটা নাকি এমনি চলে। কদাচ কোনোদিন আকাশে উঠোন নিকিয়ে নির্ম্মল করা হ'লে রূপালী সূর্য্য উঠে ধূমলা নগরীকে বলে, গুড্ মর্ণিং। অমনি ঘরে ঘরে খবর রটে, পথে পথে পথিক দেখা দেয়, চেনামুখ চেনামুখকে বলে, "হাও লাভ্‌লী! আজ সারাদিন যদি এমনি থাকে—!" মুখের কথা মুখ থেকে না মিলাতেই সূর্য্য বলে, এখন আসি,—বৃষ্টি বলে, এবার নামি,—এক-দল পথিক ভাবে ছাতা না এনে কি বোকামি করেছি, আরেকদল পথিক ভাবে ভাগ্যে রেনকোট্‌খানা সঙ্গে ছিল। ইংলণ্ডের weather এমনি খোস্‌মেজাজী যে খবরের কাগজ-ওয়ালারা প্রতিদিন তার ভাবী চালের খবর নেয় ও কাগজের সর্ব্বপ্রথম পৃষ্ঠার সর্ব্বোচ্চে ছেপে দেয়,—কাল বাতাস প্রথমে পশ্চিম থেকে ও পরে নৈর্ঋত থেকে বইবে, ক্রমশ তার বেগ বাড়্‌বে, সূর্য্য গা-ঢাকা দেবে, কিন্তু বৃষ্টি জোর পড়্‌বে না।

এ গেল লণ্ডনের অন্তরীক্ষের খবর। জলস্থলের বৃত্তান্ত বলা যাক।

লণ্ডন সহর টেম্‌স্ নদীর কূলে। কিন্তু গঙ্গা গোদাবরীর দেশের লোক আমি টেম্‌স্‌কে নদী বলি কেমন ক'রে? লণ্ডনের যে-কোনো দু'টো চওড়া রাস্তাকে পাশাপাশি কর্‌লে টেম্‌সের চেয়ে কম অপ্রশস্ত হয় না। ছোট হ'লে কি হয়, নদীটি নৌবাহু, বড় বড় জাহাজকে অনায়াসে কোল দেয়, বলিষ্ঠ শিশুর তন্বঙ্গী মায়ের মতো। লণ্ডনের যোজনজোড়া জটার ভিতরে জাহ্নবীর মতো এঁকে বেঁকে নির্গমের পথ খুঁজ্‌ছে, পিছু হট্‌ছে, মোড় ফির্‌ছে। সহরের বাইরে তার উভয় তটে ছবির মতো বন, তার কূল সবুজ মখমলে মোড়া। কিন্তু সহরের ভিতরে তাঁর জল কল্‌কাতার গঙ্গার মতো

বিবর্ণ, কাশীর গঙ্গার মতো স্বচ্ছ নয়। তার ধারে দাঁড়ালে নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে; বাতাস তো নেই, আছে ধোঁয়া। ঝাপ্‌সা চোখে দু' ধারের দৃশ্য দেখি, শিপিয়া-কালো ইট-কাঠের স্তূপ, তাদের গায়ে বড় বড় হরফে বিজলী আলোর বিজ্ঞাপন—"মদ" কিম্বা "সিগারেট্" কিম্বা "খবরের কাগজ"। ঐ তিনটে তিন রকমের বিষ এদেশে প্রচুর বিক্রী হয়।

লণ্ডন সহর গোটা সাত আট কল্‌কাতার সমান। আয়তন ছাড়া নতুন কিছু দেখ্‌বার নেই। সেই ট্রাম সেই বাস্ সেই ট্যাক্সি সেই ট্রেণ, সেই গলি সেই বস্তি সেই মাঠ সেই প্রাসাদ। প্রভেদ এই যে, সমস্তই superlative, সমস্তই অতিকায়। লণ্ডনের দীনতম অঞ্চলগুলিরও প্রত্যেকটি যেন এক একটি দক্ষিণ কল্‌কাতা, ঐশ্বর্য্যে অতটা না হোক পরিচ্ছন্নতায় অতটা। এত বড় সহর, কিন্তু সেই অনুপাতে কোলাহলমুখর নয়। অবশ্য কলের কর্কশ আওয়াজে বাড়ীর ভিৎ পর্য্যন্ত নড়ে এবং মোটরের দাপা-দাপিতে রাস্তাগুলোর বুক দুড়্দুড়্ করে, কিন্তু জনতার মুখে কথা নেই। ভীড়ের মধ্যে ফিস্ ফিস্ কর্‌লেও শোনা যায়। ফেরিওয়ালার রকমারি হাঁক নেই, তার চলন্ত বিজ্ঞাপন প'ড়ে বুঝ্‌তে হয় সে কি বেচ্‌তে চায় ও কত দামে। দুধ-ওয়ালা ঘরে ঘরে দুধ বিলি ক'রে যাবার সময় এমন সুরে "milk" বলে যে, শুন্‌লে মনে হয় কোকিলের "কু—উ", ডাক-পিওন কাঠ-ঠোকরার মতো দরজায় দুই ঠোক্কর দিলে বুঝ্‌তে হয় দরকারি চিঠি এসেছে, রুটীওয়ালা মাংসওয়ালা কয়লাওয়ালা ইত্যাদি প্রত্যেকরই নিজস্ব "চি-চিং ফাঁক" আছে, সেই সংকেত শুন্‌লে বন্ধ দুয়ার আপনি খুলে যায়, অর্থাৎ বাড়ীর ঝি দরজা খুলে দেয়। এক কথায় বল্‌তে গেলে এখানে হাটের মধ্যে তেমন হট্টগোল নেই, যেমন আমাদের দেশের ঘরে ঘরে। কিন্তু এতটা নিস্তব্ধতা কি স্বাভাবিক, না সুন্দর? সুর ক'রে "দই নেবে গা, মিষ্টি দই" হাঁক্‌তে হাঁক্‌তে চুড়ি বাজিয়ে যাওয়া সুন্দর, না পিঠে বিজ্ঞাপন এঁটে বোবার মতো পায়চারি করা সুন্দর? এদেশে নিরক্ষরতা নেই ব'লে এদের কানের ক্লেশ কমেছে, কিন্তু চোখের জ্বালা? বিজ্ঞাপনওয়ালারা যেন পণ ক'রে বসেছে মানুষের চোখে আঙুল গুঁজে বোঝাবে যে বিধাতা মানুষকে চোখ দিয়েছেন দোকানদারের ঢাকপেটা চোখ পেতে শুন্‌তে।

লণ্ডনের পথে পথে রথযাত্রার ভীড়, কিন্তু ভীড়ের মধ্যেও শৃঙ্খলা আছে। পুলিশের বন্দোবস্ত অতুলনীয়, কিন্তু কথা হচ্ছে, পুলিশের নয়, জনতার। শৃঙ্খলা মেনে চলা যেন এদের দ্বিতীয় প্রকৃতি। রাস্তায় কিছু একটা ঘটেছে, কৌতূহলীরা দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে, লাইনের পেছনে লাইন, যে লোকটা সকলের শেষ এসে পৌঁছল সে লোকটা মাত্র দুটো কনুয়ের জোরে সকলের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে না, যে আগে এসেছে সে আগে, যে পরে এসেছে সে তার পিছনে কিম্বা পাশে। রেলের টিকিট্ কর্‌তে হবে, ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তি ইতর ভাষায় গালাগালি কোনোটাই কোনো কাজে লাগ্‌বে না; যে আগে আস্‌বে সে আগে দাঁড়াবে, তার পেছনে তার পরের জন, তার পেছনে তার পরের। ড্রিলের ভাষায় যাকে file বলে কিম্বা চল্‌তি ভাষায় যাকে queue বলে তেমনি ক'রে সকলে দাঁড়ালে পরে একজনের পর একজন টিকিট্ নেবে; সিঁড়ি দিয়ে একে একে ট্রেণের কাছে যাবে, ট্রেণের থেকে যাদের নাম্‌বার কথা তারা নাম্‌লে পরে ট্রেণে যাদের ওঠ্‌বার কথা তারা উঠ্‌বে এবং জায়গা থাকে তো আগে মেয়েরা বস্‌বে, না থাকে তো যারা আগে থেকে ব'সে আস্‌ছে তারা উঠে মেয়েদের জায়গা দিয়ে নিজেরা দাঁড়াবে। এইটুকু কর্‌তে আমাদের দেশে হাত পা মুখ কান সব ক'টা অঙ্গের কস্‌রৎ হ'য়ে যায়, বিশেষ ক'রে কানের। এদেশে কিন্তু সমস্ত নিঃশব্দে সারা হয়। ট্রেণে চ'ড়ে হনুমানজীর ভজন কিম্বা পটলার মা'র পুরাবৃত্ত শুনে বধির হ'তে হয় না। প্রতিবেশীর উপকার কর্‌তে এগিয়ে না আসুক অপকার কর্‌তে এগিয়ে যায় না, এই হচ্ছে এ দেশের লোকের স্বভাব। এরা নিজের আরামটুকু ছাড়্‌তে না চাইলেও পরের আরামটুকু কাড়্‌তে চায় না। কিন্তু এদের এই নিঃশব্দ প্রকৃতি আমার নিছক ভালো লাগেনি। ট্রেণে পাশাপাশি বস্‌তে না বস্‌তেই দেশের মতো কেউ গায়ে পড়ে পিতৃপিতামহের নাম শুধায় না, বিয়ে হয়েছে কি না, ক'টি ছেলেমেয়ে, কত মাইনে, কত উপরি পাওনা ইত্যাদি খুঁটিয়ে জেরা ক'রে উত্যক্ত করে না;—কিন্তু ঐ অনাহূত উপদ্রবের

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

মধ্যে মানুষের ওপরে মানুষের একটা স্বাভাবিক দাবী থাকে,—অন্তরঙ্গতার দাবী, সামাজিকতার দাবী,—মানুষ যে সমাজপ্রিয় জীব। এ দেশের লোকও ও দাবী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে না, কিন্তু ওর সঙ্গে কিছু মৌখিকতার খাদ মিশিয়ে দেয়। "আজ দিনটা বড় ঠাণ্ডা, না?" "তা ঠাণ্ডাই বটে।" এমনি ক'রে আলাপ আরম্ভ হয়, কিন্তু বেশি-দূর এগোয় না, কারণ কথাবার্ত্তার পুঁজিই হলো weather; পুঁজি ফুরোলে নিঃশব্দে সিগারেট ভস্ম করা ছাড়া অন্য পন্থা থাকে না। এরা বাচাল নয় বটে, কিন্তু বাক্‌পটুও নয়। কথোপকথনের আর্ট এদের অজানা।

বলেছি লণ্ডন সহরে নতুন কিছু দেখ্‌বার নেই, আয়তন সমৃদ্ধি ও সজ্জা ব্যতীত। তবু মোটাগোছের গোটা কয়েক প্রভেদ স্থূলদৃষ্টি এড়ায় না। এই যেমন মাটির নীচে টিউব বা ইলেক্‌ট্রিক্ রেলরাস্তা,—যেন পাতালপুরীর রাজপথ, যাত্রীরা নীচে নাম্‌ছে, মিনিটে মিনিটে ট্রেন পাচ্ছে, মাইলের পর মাইল যাচ্ছে, ট্রেণ থেকে নেমে মাটীর ওপরে উঠে আপিস আদালত কর্‌ছে। মাটীর নীচে রেল্, মাটীর ওপরে ট্রাম-বাস্-ট্যাক্সি। কিম্বা যেমন কলে পয়সা ফেল্লে সিগারেট চকোলেট সর্দ্দি কাশির ট্যাব্‌লেট্ থেকে আরম্ভ ক'রে রেলের টিকিট্ ডাক-ঘরের ষ্ট্যাম্প্ স্নানের জল উনুনের আগুন পর্য্যন্ত আপনা আপনি হাজির হয়, যেন দেবতার বাহন, স্মরণমাত্র উপস্থিত। কিম্বা যেমন উঁচু নীচু পাহাড় কাটা রাস্তা, দু'ধারে একই প্যাটার্নের একই রঙের একই সাইজের এক-এক সারি বাড়ী, একটা দেখ্‌লেই একশোটা দেখা হ'য়ে যায়। বাড়ীর আশে পাশে হয়ত এক টুক্‌রো সবুজ, সবুজের ওপরে এক ঝলক রক্ত বা একমুঠো হরিদ্রা। কিম্বা যেমন সহরের স্থানে স্থানে মাঠ, গড়ের মাঠের চেয়ে চওড়া তাদের বুক, কিন্তু তেমন চিক্কণ নয়, বন্ধুর। পাহাড়-স্তনিত বক্ষ হ'তে ক্ষীর-ধারার মতো হ্রদ-রেখা নেমেছে; সেই কৃত্রিম হ্রদে নরনারী দাঁড় টানে, সাঁতার দেয়, দমদেওয়া পুতুলজাহাজ ভাসায়, হাঁসের সাঁতার দেখে, ছিপ ফেলে মাছের আশায় দিন কাটায়। মাঠের মেঝের ওপরে সবুজ দূর্ব্বার কার্পেট্ বিছানো, এত সবুজ আর প্রচুর যে মুহূর্ত্তকাল অনিমেষ চেয়ে রইলে যেন সবুজ jaundice জন্মায়, তখন যেদিকে চোখ ফিরাই সেদিকে সবুজ। কালো কুৎসিৎ চিম্‌নীর ধোঁয়ায় চোখ যখন নির্জ্জীব হ'য়ে আসে তখন ঐ এক ফোঁটা সবুজ আরক তাকে প্রাণ ফিরিয়ে দেয়।

লণ্ডনের উপবনগুলি নানা জাতের গাছ পালায় গহন, গাছেদের মাথায় সোনালী চুল। দুঃখের কথা এ দেশের ফুলে গন্ধ নেই। গুণ নেই রূপ আছে, ফুল নয় তো ফুল-বাবু। তাই হাওয়া ফুলের গন্ধে বেহোঁস্ হয় না, রাত ফুলের গন্ধে উতলা হয় না, মানুষের একটা ইন্দ্রিয় বুভুক্ষু থেকে যায়। মাঠ বা পার্কগুলি এদের ন্যাশনাল প্লে-গ্রাউণ্ড্। সেখানে ছোট ছেলেরা গাছে ওঠে, ছোট মেয়েরা বল নাচায়, কিশোরেরা ঘুড়ি ওড়ায়, কিশোরীরা বাজি রেখে দৌড়ায়, যুবক যুবতীরা টেনিস্ খেলে, বৃদ্ধেরা ব'সে ব'সে ঝিমায়, বৃদ্ধারা কুকুরের শিকলহাতে ঠুক্‌ঠুক্ ক'রে হাঁটে। সেখানে খোকাবাবুরা খুকুমণিরা ঠেলাগাড়ীতে চ'ড়ে দিগ্বিজয়ে বাহির হ'ন্, মায়েরা ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে চলেন ও চেনামুখ দেখ্‌লে ফিক্ ক'রে হেসে দুটো কথা ক'য়ে নেন, বাবারা সময় ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লে খোকাখুকুর সফরে মায়েদের সহগামী হ'ন, এবং সেখানে যুগলের দল "আড়াল বুঝে আঁধার খুঁজে সবার আঁখি এড়ায়।"

মাঠ বা পার্কগুলিতে যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণ বুঝ্‌তেই পারা যায় না যে, লণ্ডনের ভিতরে আছি। জনসমুদ্রের মাঝ-খানে এগুলি এক-একটি দ্বীপ, দ্বীপের চারিধারে ঢেউয়ের ওপরে ঢেউ ভেঙে পড়্‌ছে, সেখানে অনন্ত কলরোল। কিন্তু দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে তার প্রতিধ্বনি পৌঁছয় না, তার দুঃস্বপ্ন মিলিয়ে আসে, সবুজ আসন পেতে মাটী বলে, "একটু বসো", সোনালী চামর ঢুলিয়ে গাছেরা বলে, "একটু জিরিয়ে নাও।" কিন্তু লণ্ডনের মানুষকে শান্তির মন্ত্রে বশ মানানো যায় না, দু'দণ্ড সে স্থির হ'য়ে বস্‌তে চায় না, উদ্ভিদের মতো স্থাবর হ'তে তার আপত্তি, সে জন্ম-যাযাবর। কাজ আর অকাজ তাকে নানান্ সুরে ডাকে, তার ব্যস্ততার ইয়ত্তা নেই। যেখানে সে আপিস করতে শেয়ার কিন্‌তে টাকা রাখ্‌তে যায় সেখানটার নাম সিটী, প্রায় হাজার দুয়েক বছর আগে তাকে নিয়ে লণ্ডনের পত্তন হয়। সিটীর পশ্চিম দিকে

ওয়েষ্ট্ এণ্ড্। সে অঞ্চলে লোকে বাজার করতে আমোদ করতে আহার করতে যায়, সেখানে বড় বড় দোকান বড় বড় হোটেল বড় বড় ক্লাব বড় বড় থিয়েটার সিনেমা নাচঘর কন্সার্ট হল্ চিত্রাগার মিউজিয়াম প্রদর্শনী। সিটীতে বড় কেউ বাস করে না, ওয়েষ্ট্ এণ্ডে ধনীরা বাস করেন। দরিদ্রদের জন্যে ইষ্ট্ এণ্ড্ আর মধ্যবিত্তদের জন্যে সহরতলী-গুলো। ইহা মোটের ওপর নিরালা স্বাস্থ্যকর ও সুবিন্যস্ত। আমার আক্ষেপ কেবল এই যে, এদের নগরকল্পনায় বিশিষ্টতার স্থান নেই। সবটা জুড়েছে ইউটিলিটী বা প্রয়োজনীয়তা। সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌষ্ঠব কার না দরকার? কিন্তু সেই দরকারটাই চরম হলো, সৌন্দর্য্য হলো অবান্তর। তাই দেখি প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন বাঁধানো পথ ঘাট, বাতায়নবহুল উপকরণাঢ্য পরিপাটি বাড়ী ঘর, কিন্তু রাস্তার সব ক'টা বাড়ী একই ধাঁচের, একেবারে হুবহু এক, যেন এক ছাঁচে ঢালা সীসের টাইপ্। এরা সৈনিক নাবিকের জাত, কচি বয়স থেকে ড্রিল করতে অভ্যস্ত, সারি বেঁধে গির্জ্জায় যায়, সারি বেঁধে ইস্কুল থেকে ফেরে, এদের চালে চলনে উঠতে বসতে ড্রিল। তাই এদের ঘরবাড়ীগুলো পর্য্যস্ত লাইন বেঁধে পরস্পরের সঙ্গে সমান ব্যবধান রেখে "attention"-এর ভঙ্গীতে খাড়া, তাদের সকলের গায় একই ইউনিফর্ম্, তার একই মাপ একই রঙ্ একই রেখা একই গড়ন। চোখের ক্ষুধায় ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে তাকাই আর ক্ষোভে নৈরাশ্যে মরীয়া হ'য়ে উঠি। শুনেছি এদেশে উন্মাদ রোগ (insanity) বেশি। তার একটা কারণ বোধ হয় এ দেশের অতি একঘেয়ে weather, আরেকটা কারণ নিশ্চয়ই এদের প্রত্যেক বিষয়ে ইউনিফর্মিটী। শুনলুম সমগ্র ইংলণ্ড নাকি সপ্তাহের একই বারে কাপড় কাচতে দেয়, একই বারে কাপড় ফিরে পায়।

শহরের যে-কোনো রাস্তায় পা দিলে যে দশটা দোকান সর্ব্বপ্রথম চোখে পড়ে তাদের গোটা দুই মদের দোকান, গোটা দুই রেস্তরাঁ, একটা সিগারেটের একটা জামা কাপড়ের ও একটা আস্বাবের দোকান, একটা খবরের কাগজের ষ্টল্, একটা চুল সাজাবার সেলুন, একটা ব্যাঙ্ক্। এর ওপরে যদি টিপ্পনির দরকার হয় তো বলি, rum খেয়ে নাকি এরা Somme জিতেছিল, তাই সোমরসের এত আদর। সকলে অবশ্য খায় না, কিন্তু যারা খায় তাদের মধ্যে ককটেলখোর স্ত্রীলোকও দেখা যায়। রবিবারেও যে তিনটি দোকান খোলা থাকে তাদের নাম মদের দোকান, সিগারেটের দোকান, খবরের কাগজের ষ্টল্। সিগারেট সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ওর একটা ডিবে কাছে না থাকলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না, কারুর সঙ্গে দেখা হলেই ওটা সাম্নে ধ'রে বলতে হয়, "নিতে আজ্ঞা হোক্।" এ দেশের মেয়েরা যখন ভালোমন্দ উভয় বিষয়ে পুরুষের অনুধর্ম্মিণী হবেই ব'লে কোমর বেঁধেছে তখন তাদের কারুর আল্তা পরা মুখে আগুন জ্বলতে দেখ্লে আশ্চর্য্য হইনে, কিন্তু কোনো কোনো ভারতবর্ষীয়া যখন smart দেখাবার লোভে চিবুকের সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সিগারেট লক্ লক্ করতে করতে ভুরু কাঁপিয়ে মাথা নাচিয়ে কথা বলেন তখন রিজেন্ট্স্ পার্ক চিড়িয়াখানার দৃশ্যবিশেষ মনে প'ড়ে যায়। দৃশ্যটা আর কিছু নয়, বাঁদরদের টি-পার্টি। মানুষকে ওরা অবিকল নকল করতে পেরেছিল, দুঃখের বিষয় তবু কেউ ওদের মানুষ বলে ভুল করলে না। এদিকে আমি ইংরেজ যুবকদের সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখেছি ওরা নিজেরা সিগারেট খায় বলে কুণ্ঠিত বোধ করে ও নিজের বোনকে সিগারেট খেতে দেখ্লে লজ্জিত বোধ করে; কিন্তু পরের বোনকে সিগারেট খেতে দেখ্লে কেমন বোধ করে এ প্রশ্নটার উত্তরে তাদের মতবিচ্যুতি দেখা গেল। অমন অবস্থায় পড়্লে সবারই মত বদ্লায়।

রেস্তরাঁ যে এ শহরে কত লক্ষ আছে তার গণনা চলে না। আহারের জন্যে রেস্তরাঁ, নিদ্রার জন্যে ফ্ল্যাট্ বা রুম্স্—সাধারণ গৃহস্থের জন্যে এই হচ্ছে এখানকার ব্যবস্থা। এ-দেশের স্বাচ্ছন্দ্যনীতি বা Standard of comfort-এর সঙ্গে তাল রেখে গৃহস্থালী গড়া এদেশের বহুসংখ্যক স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। যাদের সঙ্গতি আছে তারাও বাড়ীতে না খেয়ে বাইরে খায় এই জন্যে যে, সারাদিন যেখানে জীবিকার জন্যে খাট্তে হয় বাড়ী সেখান থেকে অনেক দূরে, কিম্বা বাড়ীতে রান্না করতে যেটুকু সময় লাগে সেটুকুর বাজারদর রেস্তরাঁয় খাবার খরচের চেয়ে বেশি,

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

কিম্বা বাড়ীতে অল্প সংখ্যক লোকের রান্নায় যত খরচ রেস্তর'ায় বহুসংখ্যক লোকের রান্নায় সে অনুপাতে কম। কথা উঠ্‌বে তবে বাড়ীর মেয়েরা করে কি? তার জবাব এই যে বাড়ীর মেয়েরাও আপিস করে। সকলে নয় অবশ্য কিন্তু অনেকে। তরুণী মাত্রেই স্কুল কলেজে যায়, বয়স্কা মাত্রেরই কোনো না কোনো কাজ আছে। মায়েরাও ছেলেদের ইস্কুলে দিয়ে কাজে যায়, তবে কোলের ছেলে হ'লে তার গাড়ী ঠেলে মাঠে নিয়ে যায়, খোকা যতক্ষণ হাওয়া খায়, অন্ততঃ ফীডিং বট্‌ল চুষে দুধ খায়, খোকার মা ততক্ষণ জামা সেলাই করে। কাজ করে না, বসে খায়, এমন লোক তো দেখ্‌ছিনে; যার আর কিছু না জোটে সে একটা সভাসমিতি খুলে বসে, সে সব সভাসমিতির উদ্দেশ্যও বিচিত্র; কোনোটার উদ্দেশ্য জবাই করবার অনিষ্ঠুর উপায় উদ্ভাবন, কোনোটার উদ্দেশ্য সদস্যদের মৃতদেহ কবরস্থ না ক'রে অগ্নিসাৎ করা। ভালো মন্দ দরকারী অদরকারী কত রকমের অনুষ্ঠান যে এদেশে আছে তার আভাস পাওয়া যায় রবিবারের দিন হাইড্‌ পার্কের বেড়ার ভিতর প্রবেশ করলে। একখানা ক'রে চেয়ার জোগাড় ক'রে তার ওপরে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে কত বক্তাই যে ভূমিতে দণ্ডায়মান বা সম্মুখ দিয়ে চলন্ত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন ক'রে কত তত্ত্বই প্রচার করেন তার সংখ্যা হয় না; এদেশে ধর্ম্মের হাজারো সম্প্রদায় আছে, রাজনীতির হাজারো দল আছে, বক্তৃতা দেওয়া কাজটাও কঠিন নয়, আর লোকের ভীড়ের ভিতরে এমন দশপঁচিশ জন অখণ্ড ধৈর্য্যশীল সহিষ্ণু শ্রোতা বা শ্রোত্রী কি পাওয়া যাবে না যারা অন্ততঃ পাঁচটি মিনিট্‌ বিনিপয়সায় গলাবাজি দেখ্‌বে বা নাম সংকীর্ত্তন শুনবে? এমনি ক'রেই এদেশে পাব্লিক ওপিনিয়ন সৃষ্ট হয়। শ্রোতারা তর্ক করে, টিট্‌কারী দেয়, এক বক্তার লোক ভাঙিয়ে নিয়ে আরেক বক্তা উল্টো বক্তৃতা শোনায়, তবু সে বক্তার মেজাজ তরুর চেয়ে সহিষ্ণু সংকল্প মেরুর মতো অটল, একটিও যদি শ্রোতা না রয় তবু তাঁর বাক্যের ফোয়ারা ফুরোবে না। হাতে কোনো একটা কাজ না থাকলে যেন এরা বাঁচ্‌তে পারে না, জীবন ফাঁকা ঠেকে। চুপ ক'রে ব'সে থাকা এদের ধাতে সয় না, তাই ছুটি পেলে এরা বড় বিব্রত হ'য়ে ভাবে ছুটী কেমন ক'রে কাটাবে। ভিক্ষা করা এদেশে আইনবিরুদ্ধ, করলে কঠিন সাজা। তাই ভিক্ষুকেরাও কোনো একটা কাজ করবার ভাণ ক'রে পয়সা রোজগার করে, হয় দু'পয়সার দেশলাই চারপয়সায় বেচে অর্থাৎ বেচ্‌বার ভাণ ক'রে হাত পাতে, নয় ফুট্‌পাথের ওপরে ছবি এঁকে পথিকদের সাম্‌নে টুপী খোলে, নয় কিছু একটা বাজিয়ে বা গেয়ে দাতাকে খুসী করে, কিন্তু মুখ ফুটে বলে না যে, "ভিক্ষা দাও;" বল্লেই পুলিশে ধ'রে নিয়ে যায়। এত কথা এ প্রসঙ্গে বল্‌বার উদ্দেশ্য এরা কাজ জিনিষটাকে কি চক্ষে দেখে তাই বোঝানো। নিষ্ক্রিয়তাকে এদেশে ধর্ম্ম বলে না।

জামাকাপড়ের দোকানের এত বাহুল্য কেন? একটা কারণ, শীতের দেশের মানুষ কম্বল সম্বল ক'রে ধুনি জ্বালিয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে পরকালের ধ্যান করলে পরকালের দিন ঘনিয়ে আসে, দেহ সম্বন্ধে নির্ব্বিকল্প হ'লে দেহীমাত্রেই বরফ হ'য়ে যায়, তাই পথের ভিখারীরও গায় ওভার কোট ও পায় বুটজুতো চাই। মেয়েরা স্কার্ট্‌ হ্রস্ব ক'রে ও গলা খোলা রেখে পরিধেয় সংক্ষেপ করেছে বটে, তবু ওদের পরিধেয় শুধু একখানা শাড়ীর মতো সরল নয়। আর একটা কারণ, আংটি বা হার বা দুল্‌ ছাড়া অন্য অলঙ্কার বড় কেউ পরে না, তাই ভূষণের রিক্ততার ক্ষতি পূরণ করতে হয় বসনের বাহারে। একটু আগে বলেছি এদের নগর স্থাপত্যে বিউটীর চেয়ে বড় কথা ইউটিলিটী। এদের বেশভূষা সম্বন্ধেও ওকথা সমান খাটে। মেয়েরাও এখন কাজের লোক হয়েছে, গজেন্দ্রগমনে চল্‌লে ট্রেন ফেল্‌ ক'রে আপিস কামাই ক'রে বস্‌বে, সেই আশঙ্কায় পক্ষিরাজের মতো মাটী ছুঁয়ে ওড়ে, ছুটে ছুটে হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রেনের ওপরে লাফ দিয়ে ওঠে, জায়গা পেলে বসে, না পেলে দাঁড়ায়, এক সেকেণ্ড্‌ সময় নষ্ট না ক'রে খবরের কাগজ কিম্বা গল্পের বই বার ক'রে পড়তে আরম্ভ ক'রে দেয়। ছুটোছুটির সুবিধার জন্যে স্কার্টের ঝুল্‌ হাঁটুর ওপরে উঠে কোমর অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। দম আট্‌কাবার ভয়ে গলার ফাঁস খুল্‌তে খুল্‌তে আবক্ষ বিস্তৃত হচ্ছে, স্নান-প্রসাধন সুকর হবে ব'লে মাথার

চুল ছেঁটে কবরীর অনুপযুক্ত করা হচ্ছে। ফলে শরীর হাল্‌কা লাগ্‌ছে, প্রতি অঙ্গে বাতাস লাগছে, স্বাস্থ্য ভালো থাক্‌ছে, স্বাস্থ্যজনিত শ্রীও বাড়্‌ছে, এক কথায় স্ত্রীজাতির তথা সমাজের বহুতর উপকার হচ্ছে, ইউটিলিটীর দিক থেকে জয়জয়কার। এবং এর দরুণ মেয়েরা যে sexless বা mannish বা পুরুষালী হয়ে উঠ্‌ছে এমনও নয়। নারীর নারীত্ব যে সাগরতলের চেয়েও অতল, পরিবর্ত্তন সে তো জলপৃষ্ঠের বুদ্‌বুদ্, কোনো কালেই তা অতলস্পর্শী হ'তে পারে না, বিপ্লবের মন্দর দিয়ে মথন করেও নারীর নারীত্বকে নড়ানো যায় না, কেবল কাড়্‌তে পারা যায় তার সুধা আর তার বিষ। পরিবর্ত্তনকে আমি দোষ দিইনে, তার ইউটিলিটীকে আমি মহামূল্য মনে করি। তবু আমার ধারণা এ যুগের নারীর পরিচ্ছদ যদি এ যুগের নারীর প্রতিবিম্ব হয় তবে বিম্ব দেখে বল্‌তে পারি বিম্ববতী সুন্দরী নয়। নারীত্বের বিষ যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সুধাও যাচ্ছে। পরিচ্ছদকে উপলক্ষ্য ক'রে এত কথা বল্‌বার অভিপ্রায়—পরিচ্ছদ তো কেবল নগ্নতার আচ্ছাদন বা শীত বর্ষার বর্ম্ম নয় যে তার প্রয়োজনীয়তাই তার পক্ষে চূড়ান্ত হবে; পরিচ্ছদ-যে দেহেরই সম্প্রসারণ, দেহেরই বহির্বিকাশ, দেহের চারিপাশে সৌন্দর্য্যের পরিমণ্ডল। এরা জীবনকে ব্যস্ততায় ভ'রে এমন সংক্ষিপ্ত ক'রে আন্‌ছে যে মানুষের মনের আর সে-অবসর নেই যে-অবসর নইলে মানুষ নিজের পরিমণ্ডল নিজে রচনা করতে পারে না। তখন ডাক পড়ে পোষাক-বিক্রেতার আপিসের পোষাক ডিজাইনারকে এবং পোষাক-বিক্রেতার দোকানের (manequin) ম্যানীকিন্‌দের। গণতন্ত্রের বিবেক বন্ধক দেওয়া হয়েছে মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে আর গণতন্ত্রের রুচি বন্ধক দেওয়া হয়েছে large-scale manufacturer-দের কাছে। যখন দেখি আজানুলম্বিত আলগোল্লার মতো লোমশ ওভার কোটের অন্তরালে নারীদেহের contour (রেখাভঙ্গী) ঢাকা পড়েছে, দেখা যাচ্ছে কেবল কচ্ছপের খোলার ভিতর থেকে বা'র করা আজানু-উন্মুক্ত পা' ছুটি আর টুপীর দ্বারা রাহুগ্রস্থ মুখটি, তখন মনে হয় যেন ছুটি চলন্ত স্তম্ভের ওপরে কালো বা মেটে রঙের একটি বস্তা উপুড় করা হয়েছে, সেই বস্তার পৃষ্ঠভাগ একেবারে প্লেন্, তার কোথাও একটা রেখা বা একটা বঙ্কিমা নেই, কটির স্থিতি যে কোনখানে আর পরিধি যে কতখানি তা অনুমান ক'রে নিতে হয়। পুরুষের পোষাক সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভালো, কারণ পুরুষ চিরকাল কাজের লোক, সে যে ইউটিলিটী ছাড়া অন্য কিছু বোঝে এত বড় প্রত্যাশা তার কাছে করা যায় না। মজার কথা এই যে, নারীর পোষাক যত সরল হচ্ছে পুরুষের পোষাক তত জটিল হচ্ছে, তার আপাদমস্তক পোষাক দিয়ে মোড়া, সে-পোষাকের স্তরের পর স্তর, আণ্ডার ওয়ারের ওপরে আণ্ডার ওয়ার, কোটের ওপরে ওভার কোট্, জুতোর ওপরে জুতো, মোজার ওপরে স্প্যাট্, টাই-কলারের ওপরে মাফ্‌লার! টাইম্‌স্ বলেন নারী পরিবর্ত্তনশীল পুরুষ রক্ষণশীল। প্রমাণ, নারীর নীচে থেকে হাঁটু অবধি আর মাথা থেকে বুক অবধি যে-পোষাকের জঙ্গল ছিল নারী তা' জোর ক'রে ছেঁটে কেটে সাফ করেছে। কিন্তু পুরুষ কিছুতেই তার গলার শিকল-পট্টি খুল্‌বে না, পায়ের নল (tube) ছ'টো (অর্থাৎ ট্রাউজার্স) এক ইঞ্চি খাটো কর্‌বে না!

শীতের দেশের লোককে বিছানা পুরু কর্‌বার জন্যে লেপ কম্বলের বহুল আয়োজন করতে হয়, আর ইউরোপীয় পরিচ্ছদ প'রে মেজের ওপরে শোওয়া বসা চলে না ব'লে খাট পালঙ্ক কোচ্ সোফা চেয়ার টেবিল দরকার হয়। এ ছাড়া কাপড় রাখ্‌বার ওয়ার্ডরোব্, খাবার রাখ্‌বার কাবার্ড্ হাতমুখ ধোবার সরঞ্জাম, প্রসাধনের আয়না-দেরাজ, রান্নার ষ্টোভ্, ঘর গরম রাখ্‌বার অগ্নিস্থলী ইত্যাদি গরীব দুঃখীরও চাই। দেশে আমাদের বাড়ীর ঝি বারাণ্ডায় ছেঁড়া মাদুর পেতে গায় ছেঁড়া কম্বল জড়িয়ে শীতের দিনে ঘুঁটের আগুন পোহায়, এখানে আমাদের বাড়ীর ঝির জন্যে স্বতন্ত্র ঘর, ঘরের মেজেতে কার্পেট পাতা, দেওয়ালে ওয়ালপেপার আঁটা, লোহার খাটে আদফুট পুরু বিছানা, ঘরের একপাশে অগ্নিস্থলী সেখানে কয়লা পোড়াতে হয়, একপাশে টেবিল চেয়ার আয়না দেরাজ আল্‌না, সিলিঙে ইলেকট্রিক আলো ও জানালায় নক্সাকাটা পর্দা। এইজন্যেই এদেশে আস্‌বাবের দোকান এত। দোকানের থেকে

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

আস্‌বাব ভাড়া ক'রে আনতে হয় কিম্বা কিনে এনে মাসে মাসে দায়ের ভগ্নাংশ দিতে হয়। আস্‌বাব সম্বন্ধেও ইউটিলিটীর সঙ্গে বিউটির ছাড়া ছাড়ি, সৌষ্ঠব আছে, কিন্তু বৈশিষ্ট নেই, বৈচিত্র আছে, কিন্তু কলে-তৈরি প্রাণহীন বৈচিত্র। যন্ত্ররাজ বিভূতির কল্যাণে একালের রামশ্যামও সেকালের রাজরাজড়াদের চেয়ে স্বচ্ছন্দে আছে। সস্তায় বাদশাহী চালে চল্‌ছে, কিন্তু রামের সঙ্গে শ্যামের এখন একতিলও তফাৎ নেই; রামের নাম ৪৬৫ তো শ্যামের নাম ৪৭৫, নামের তফাৎ নেই, সংখ্যার তফাৎ। "কলী" যুগ বটে!

আমাদের বাড়ীর ঝি ফুরসৎ পেলেই খবরের কাগজ পড়ে, কোনো কোনো দিন খাবার সময় বা কোনো কোনো দিন পরিবেশন করার ফাঁকে। এই থেকে বুঝ্‌তে হয় এদেশে খবরের কাগজের কেমন প্রচার ও প্রভাব। যে কাগজ আমাদের ঝি পড়ে সে কাগজে গুরুগম্ভীর লেখা থাকে না, তার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আধ কলমও নয়, সম্পাদক মহাশয় হাল্‌কা সুরে গ্রেহাউণ্ড্‌ রেসিং বা শরৎকালের ফ্যাসান সম্বন্ধে দু'চার কথা ব'লে আমাদের ঝি ঠাকুরুণের সন্তোষবিধান করেন, উঁচুদরের রাজনৈতিক চাল বা অর্থনৈতিক সমস্যার ধার দিয়েও যান না, সংবাদের কলমে থাকে খেলাধূলা, ঘোড়দৌড়, চোরডাকাত, বিবাহ ও বিবাহভঙ্গ ইত্যাদি চটকদার ও টাট্‌কা খবর। আদালতে কে কেঁদেছে, এরোপ্লেনে কে হেসেছে, থিয়েটারে কে নেচেছে তাদের ফটো তো থাকেই, সময় সময় তাঁদের সঙ্গে "আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি"র সাক্ষাৎকারের লোমহর্ষণ বিবরণ থাকে। আমাদের দেশের কাগজের সঙ্গে এদেশের কাগজগুলোর মস্ত একটা তফাৎ এই যে এদেশের কাগজে গালাগালি থাকে না। ক্যাথেরিণ মেয়োর ওপরে রাগ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাকে বেশ্যা ব'লে গালাগাল দেওয়াটা ইতরতা। অমন ইতরতা এদেশের কাগজওয়ালারা এদের প্রধানতম শত্রুদের বেলাও করে না। পাঞ্চ্‌ কাগজখানার পেশাই হচ্ছে ভাঁড়ামি, কিন্তু সে ভাঁড়ামির মধ্যে অশ্লীলতা থাকে না। এদেশে ক্যাথেরিণ মেয়োর যারা প্রশংসা গেয়েছে তারা স্পষ্ট ক'রে বল্‌তে ভোলেনি যে, লেখিকা ইংরেজ নয়, আমেরিকান; এবং অনেকে ইঙ্গিতে বুঝিয়েছে যে, ইংরেজ লেখক হ'লে কুরুচি-পরিচায়ক প্রসঙ্গগুলো অমন খোলাখুলিভাবে বীরদর্পে উল্লেখ কর্‌ত না। বাস্তবিক অশ্লীলতা সম্বন্ধে ইংরেজ জাতির একটা স্বাভাবিক ভীরুতা আছে, তাই এদেশের খবরের কাগজে "কেলেঙ্কারির বর্ণনাটাও নীচু গলায় হয়। মোটকথা, "respectable" ব'লে গণ্য হবার জন্যে এদেশের "ইতরে জনাঃ"র একটা ঝোঁক আছে, তাই ডেলী হেরাল্ড্‌কেও টাইম্‌সের আদর্শ অনুসরণ কর্‌তে হয়। আমাদের ঝি-ঠাকুরুণের শ্রেণীর মেয়েরাও মনে মনে এক একটি লেডী। ইংলণ্ডের গণতন্ত্রে অভিজাতদের ক্ষমতা কমেছে কিন্তু প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে, অর্থাৎ এদেশে কুলীনকে অন্ত্যজ না ক'রে অন্ত্যজকে কুলীন ক'রে তুল্‌ছে।

এর পরের প্রসঙ্গ, চুল সাজাবার সেলুন। এই জিনিষটা আগে এদেশে পুরুষদের জন্য অভিপ্রেত ছিল, সুতরাং সংখ্যায় অর্দ্ধেক ছিল। এখন মেয়েরা বব্‌ (bob) বা শিংল্‌ (Shingle) করে; অর্থাৎ হয় পুরুষের মতো ছোটো ক'রে চুল ছাঁটে, নয় হরেক রকমের বাব্‌রী রাখে। বব্‌ করা মেয়েদের দূর থেকে দেখলে ছেলে ব'লে ভ্রম হয়, কেবল ওদের স্কার্ট বা ফ্রক্‌ দেখে বুঝতে হয় ওরা মেয়ে। শিংল্‌ করা মেয়েদের মন্দ দেখায় না। শিংল্‌ করাটা একটা আর্ট হয়ে দাঁড়িয়েচে, এ আর্টের আর্টিষ্ট হচ্ছেন্‌ নরসুন্দর আর তুলি হচ্ছে তাঁর কাঁচি। যার চুল যেমন ক'রে শিংল্‌ কর্‌লে মানায় তার চুল তেমনি ক'রে শিংল্‌ করাটা যথেষ্ট সৌন্দর্য্যবোধের পরিচায়ক। তবে ব্যাপারটা ব্যয় সাধ্য, মাসে মাসে নরসুন্দরকে খাজনা গুন্‌তে হয়। শুনেছি চুল ছেঁটে নাকি মেয়েরা সোয়াস্তি পায়। সম্ভবতঃ পায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও সেই ইউটিলিটীর প্রশ্ন। আগে ইউটিলিটী, তার পরে ওরি ওপরে একটু সৌষ্ঠবের ব্যবস্থা, সেজন্যে নরসুন্দরের শরণাপন্ন হওয়া, নিজের রুচি পরের কাছে বন্ধক রাখা ও শতসংখ্যকের জন্যে large-scaleএ সৌন্দর্য্য manufacture-করা। ভবিষ্যতে নরসুন্দরের কুটীরশিল্পটা বিদ্যুৎচালিত কারখানার শিল্পে পরিণত হবে না তো? সুন্দরীরা দলে দলে কলের নীচে মাথা পেতে slot-এ ছ'পেনি ফেল্লে আপনা-আপনি চুল ছাঁটা টেড়ি কাটা ঢেউ খেলানো শিং-বাঁকানো কানঢাকানো কলপ-মাখানো পাঁচ মিনিটে সমাপ্ত হবে না তো?

এবার ব্যাঙ্কের কথা ব'লে আজকের মতো পাৎতাড়ি গুটাই। সকল বাবুয়ানা সত্বেও ইংরেজেরা হিসাবী জাত, যেমন ফুর্ত্তি করে তেমনি খাটে এবং খাটুনির অর্জ্জন থেকে যতটা ব্যয় করে ততটার বহুগুণ সঞ্চয় করে। ব্যাঙ্ক হচ্ছে প্রত্যেকের খাতাঞ্চিখানা, ঘরে টাকা না রেখে সেইখানে গচ্ছিয়ে দেয়, ও দরকার হলেই তার নামে চেক লিখে দেয়। আমাদের বাড়ীর ঝিও ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেয়, সে টাকা দেশের ব্যবসাবাণিজ্যে খাটে, তার থেকে সে সুদ পায়। ইংল্যাণ্ডে অগণ্য ব্যাঙ্ক আছে, পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙ্কের শাখা। পাড়ায় ঐ ব্যাঙ্কটি না থাক্‌লে পাড়ার ঐ ন'টি দোকানও থাকৃত না, ইংলণ্ডের এ সমৃদ্ধিও থাকৃত না, আমাদের বাড়ীর ঝি টাকা না জমিয়ে উড়িয়ে দিত কিম্বা মাটীতে পুঁতে টাকার ব্যবহারই কর্‌ত না। ব্যাঙ্ক্ থাকায় আমাদের বাড়ীর ঝির দশ বিশ টাকা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘুর্‌ছে, এই মুহূর্ত্তে হয়ত নিউজীল্যাণ্ডের চাষারাও টাকা ধার নিলে, কিম্বা দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার খনির মালিকেরাও টাকার সুদ দিলে, কিংবা হাওড়ার পাটের কলওয়ালারা ও টাকার শেয়ারে ওর দুগুণ ডিভিডেণ্ড্ ঘোষণা কর্‌লে।

হাল্ ধর

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

বাচ্‌খেলার গান

পোক্তা হাতে শক্ত মুঠায় হাল্ ধর।
ওগো মাঝি হাল্ ধর।

দাঁড় টেনে যাই উজান বেয়ে,
অধীর নদীর আমরা নেয়ে,
আনন্দে যাই সারি গেয়ে;
হাল্ ধর।

ঘাটে ঘাটে উছল হাসি,
তীরের মাঠে বাজে বাঁশী;
ঢেউএর দোলায় দুলে ভাসি;
হাল্ ধর।

ঈশান কোণের ঘন মেঘে
ঝঞ্ঝা তুফান উঠুক জেগে,
ডরিনে—যাই হাওয়ার বেগে;
হাল্ ধর।

উড়াই উজান-জয়ের নিশান্
এড়িয়ে চলি শ্মশান মশান,
সঙ্গী সহায় স্বয়ং ঈশান;
হাল্ ধর।

মানুষ যখন শিশু থাকে তখন তাহার মনে একটা কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা থাকে। ছোট ছেলে কথা ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাপমাকে এটা কি ওটা কি জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। শিশু যখন বড় হইয়া মানুষ হয় তখন তাহার এই অনুসন্ধিৎসা জীবন-সংগ্রামের চাপে ঢাকা পড়িয়া যায়। সরল শিশুসুলভ জিজ্ঞাসাপ্রিয়তার জায়গায় দেখা দেয় অন্নবস্ত্রের চিন্তা। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন মানুষ দেখা যায় যাহাদের বয়স হইলেও ছোটছেলের মত এটা কি ওটা কি জানিবার স্পৃহা চলিয়া যায় না—যাহারা অন্ন বস্ত্রের ভাবনার মধ্যেও এটা কি ওটা কি জানিবার চেষ্টায় থাকে। এই রকম মানুষ সংসারে বিরল। বৈজ্ঞানিকেরা এই প্রকৃতির লোক—সাংসারিক হিসাবে ইঁহারা সব সময়ে জীবনে সফল হন তাহা নয়—কিন্তু ইহাদের চিন্তার ধারা জগতের উপর একটা ছাপ রাখিয়া যায়।

এই ধরণের অনুসন্ধিৎসু লোকেরা অনেক দিন হইতে একটা শিশুসুলভ প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন। প্রশ্নটা হইতেছে জড়ের উপাদান কি? জড় কিসে তৈয়ারি? এমন ছেলেবুড়া বোধ হয় নাই যাহার মনে কোনও না কোনও সময়ে এই প্রশ্ন উদয় হয় নাই। সাধারণ লোকের মনে এইরূপ প্রশ্ন উদয় হইলেও তাহারা এটাকে একেবারেই বাজে বলিয়া—অথবা উত্তর দিবার একটুখানি চেষ্টা করিয়াই প্রশ্নটাকে উড়াইয়া দেয়। কিন্তু অসাধারণ লোকেরা একটু নাছোড়বান্দা। সাধারণ মানুষ যতটুকু উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হয় তাঁহারা সেখানে থামিতে চান না—তাঁহাদের "কি" আরও অনেক বেশীদূর পর্য্যন্ত যায়।

ছোট ছেলে হাতে সন্দেশ পাইলে সেটা মুখে পুরিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করে "মা সন্দেশ কি দিয়া তৈয়ার হয়?" মা হয়ত উত্তর দেন সন্দেশে চিনি ও ছানা আছে। কৌতূহলী সন্তান আবার প্রশ্ন করে চিনি কি দিয়ে তৈয়ার হয়? মাতা বলেন ইক্ষুর একটা উপাদান চিনি—কিন্তু চিনির উপাদান কি তাহা তাঁহার বিদ্যায় কুলায় না। শিশুর প্রশ্নের উত্তর মেলে রাসায়নিকের কাছে—রাসায়নিক বলেন চিনি একটি কার্ব্বোহাইড্রেট, এক কণা চিনি যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে তাহা হইতে মিলিবে একটু কার্ব্বন বা অঙ্গার, একটু হাইড্রোজেন বা উদজান ও একটু অক্সিজেন বা অম্লজান—কার্ব্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এই তিনের রাসায়নিক সমবায়ে চিনি তৈয়ার হইয়াছে। রাসায়নিককে যদি আরও একটু বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা করা যায় তবে তাঁহার নিকট হইতে আরও অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যাইবে। তিনি বলিবেন যে চিনিকে ভাঙ্গিলে—

রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে—কার্ব্বন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায় বটে কিন্তু কার্ব্বন, হাইড্রোজেন বা বা অক্সিজেনকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে আর কিছু

লর্ড কেল্‌ভিন্‌

পাওয়া যায় না—কার্ব্বনের উপাদান কার্ব্বনই, হাইড্রোজেনের উপাদান হাইড্রোজেনই, অক্সিজেনের উপাদান অক্সিজেনই ; এগুলা হইল মৌলিক পদার্থ। সর্ব্বশুদ্ধ ৯২টা মৌলিক পদার্থ আমরা জানি। আমরা আমাদের চারিদিকে এই যে নানা রকমের জড় পদার্থ দেখিতেছি তাহা এই ৯২টা পদার্থের রকম বেরকমের সমবায়ে সৃষ্টি হইয়াছে। রাসায়নিকের পেশা এই ৯২টা জিনিষ পরস্পরের সঙ্গে কিরকম ভাবে মেলে, মিলিলে তাহাদের গুণের কিরকম পরিবর্ত্তন ঘটে, মিলিতপদার্থগুলাকে তাহাদের গুণানুসারে কি ভাবে বিভক্ত ও শ্রেণীবদ্ধ করা যায় নির্ণয় করা। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই ৯২ টি পদার্থেরই সন্ধান জানিতেন না। তাঁহাদের মতে কিন্তু মৌলিক পদার্থ ছিল পাঁচটি। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটি ভূতের সমবায়ে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক মতে এই পাঁচের পরিবর্ত্তে ৯২টা মৌলিক ভূত আছে। রাসায়নিক শিশুর প্রশ্নের এই পর্য্যন্ত উত্তর দিয়াই ক্ষান্ত হন। কৌতূহলী মানুষও যখন শোনে যে এই ধারণাতীত অসংখ্য রকমের কঠিন, তরল ও বায়বীয় জড়পদার্থের উপাদান অসংখ্য নহে—মাত্র ৯২টি মৌলিক জড়ের পরস্পরের মিলনে তৈয়ার হইয়াছে—তখন তাহার কৌতূহলও একটু শান্ত হয়। মানুষ বহুর মধ্যে একের সন্ধান চায় ও সেই একের সন্ধান পাইলেই তৃপ্ত হয়। জিজ্ঞাসু মানব একটু শান্ত হয় বটে কিন্তু রাসায়নিকের ঐ উত্তরে তাহার কৌতূহল কি একেবারেই মেটে? তেমন তেমন লোক হইলে রাসায়নিককে জিজ্ঞাসা করিবে, আচ্ছা মশায় জড়ের উপাদান ত বলিলেন ঐ কয়টা মৌলিক পদার্থ—কিন্তু ঐ মৌলিক পদার্থগুলার উপাদান কি? সেটা না বলিলে আমার প্রশ্নের উত্তর ত অসমাপ্ত রহিয়া গেল। রাসয়নিক
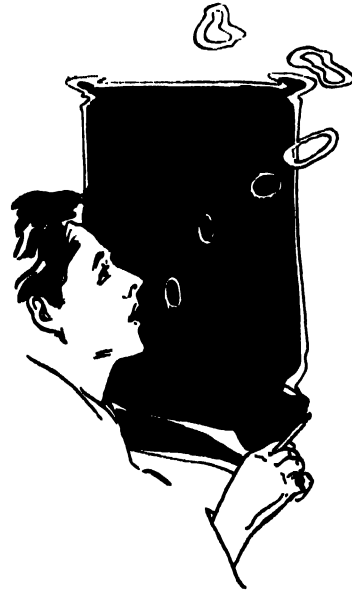
মুখ হইতে ধোঁয়া কৌশলে বাহির করিয়া ঘূর্ণীর মত করা যায়। কেলভিনের মতে ইথরে এই-রূপ ঘূর্ণীই জড় পরমাণু।

জড়ের উপাদান

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

এইবার চটিবেন। তিনি যদি অধ্যাপক হন ও ক্লাসে যদি কোনও ছাত্র এইরূপ প্রশ্ন করে তবে তাহাকে হয়ত জরিমানা করিয়া বসিবেন! তিনি বলিবেন যে ওগুলার আবার উপাদান কি? বলিলাম ত ওগুলি মৌলিক পদার্থ—
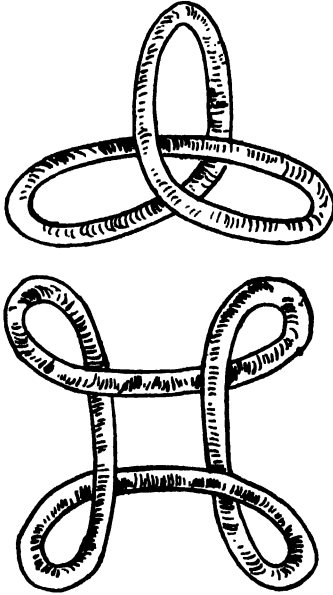
কেলভিন কল্পিত নানারকমের ঘূর্ণী

মৌলিকের আবার উপাদান কি? মৌলিক মানেই ত তাহার উপাদান নাই। সাধারণ ছাত্র হয়ত ইহার পর আর প্রশ্ন করিতে সাহসী হইবে না। কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় যদি একটু নিজে ভাবিয়া দেখেন তা হইলে দেখিবেন ছাত্রের সরল প্রশ্নের তিনি ঠিক সরল উত্তর দেন নাই। প্রশ্ন—ঐ জিনিষগুলার উপাদান কি? উত্তর—উহার উপাদান নাই উহারা মৌলিক পদার্থ। মৌলিক পদার্থ কি? যাহার কোনও উপাদান নাই। এরূপ উত্তর নিজের অজ্ঞতা ঢাকিবার জন্য বাক্যবিন্যাস মাত্র। সোজাসুজি উত্তর এই যে আমরা উহার উপাদান জানি না—হয়ত কোনও উপাদান থাকিতেও পারে-কিন্তু তাহা আমার জ্ঞানের বাহিরে। কিন্তু এই সরল ও সহজ ত্রুটি স্বীকার এতদিন রাসায়নিকেরা করিতেন না। এখন ইঁহারা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পদার্থবিদ্‌গণ রাসায়নিকদের মতো জড়ের উপাদান প্রসঙ্গে মৌলিক পদার্থেই থামিতে রাজি হন নাই। তাঁহার মৌলিকেরও মূল খুঁজিবার চেষ্টা করিয়াছেন ও কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদগণের এই বিস্ময়কর ও কৌতূহলোদ্দীপক গবেষণার কথা কিছু বলিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

জড়ের মূল কি তাহার সন্ধানের চেষ্টা অনেক দিন হইতেই চলিতেছে। মাঝে একটা মতবাদ উঠিয়াছিল যে আলোক-তরঙ্গের বাহক সর্ব্বব্যাপী ইথরই জড়ের মূল উপাদান। ইথর বৈজ্ঞানিকদের একটি কল্পিত পদার্থ। কল্পনার উদ্দেশ্য আলোকতত্ত্বের ব্যাখ্যা। বৈজ্ঞানিকের কল্পিত এই পদার্থ অতি ঘন ও কঠিন—ইহা সর্ব্বব্যাপী—অন্ততঃ মানুষের দৃষ্টি যতদূর যায় সমস্ত আকাশ ইথরে পরিপূর্ণ। সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে, পৃথিবী ও তারকার মধ্যে আপাত-প্রতীয়মান শূন্য আকাশ এই কল্পিত ইথরে পূর্ণ, প্রত্যেক বস্তুর অণু-পরমাণুর ফাঁকে ফাঁকে এই ইথর রহিয়াছে—

জে জে টমসন্

বিশ্বচরাচরে কোথাও ফাঁক বা শূন্য নাই। বৈজ্ঞানিকের এই কল্পিত ইথর আলোক-তরঙ্গ বহন করে, সর্ব্বপ্রকার
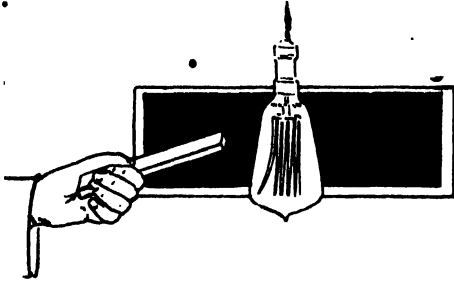
বিজলী বাতির ফিলামেণ্টের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ যাইতেছে বলিয়া তাহার নিকট চুম্বক ধরিলে ফিলামেণ্ট বাঁকিয়া যায়।

বৈদ্যুতিক ব্যাপারের মূলে বর্ত্তমান আছে ও চুম্বকের আকর্ষণ-শক্তির বিকাশ ঘটায়। গত শতাব্দীতে প্রশ্ন উঠিল—এই ইথর জড়েরও মূল উপাদান হইতে পারে কি না? প্রশ্ন যিনি তুলিলেন তিনি বড় সামান্য ব্যক্তি নহেন—বৈজ্ঞানিক জগতে তাঁহার নাম জানে না এমন কেহ নাই। প্রশ্ন-কর্ত্তা লর্ড কেলভিন। তিনি প্রশ্নের উত্তরও কিছু দিলেন। জড়ের দুইটা প্রধান গুণ—প্রথম, জড়ের বিনাশ নাই ও দ্বিতীয়, জড় কেহ সৃষ্টি করিতে পারে না। কেলভিন বলিলেন যে বিশ্বব্যাপী ইথরের মধ্যে যদি কোনও স্থানে আবর্ত্ত বা ঘূর্ণী থাকে, তা হইলে সে ঘূর্ণী কখনও থামিবে না—আবার ইথরের মধ্যে যদি অন্য কোনও স্থানে আবর্ত্ত বা ঘূর্ণী না থাকে তবে নূতন করিয়া ঘূর্ণীর সৃষ্টিও কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। অর্থাৎ ইথরে যদি কয়েকটা ঘূর্ণী থাকে তবে তাহার সংখ্যা কখনও বাড়িবে বা কমিবে না। কেলভিনের মতে ইথরের মধ্যে এই প্রকার একএকটি ঘূর্ণীই হইল একএকটি জড় কণা বা পরমাণু—এক এক মৌলিক পদার্থের এক এক রকম ঘূর্ণী—দুই তিনটা ঘূর্ণী জড়াজড়ি করিয়া অণুর সৃষ্টি হইয়াছে। কেলভিন কল্পিত কয়েকটা ঘূর্ণীর চিত্র দেওয়া গেল। যাঁহারা ধূমপান করেন তাঁহারা মুখে ধোঁয়া পুরিয়া ধোঁয়া ছাড়িবার সময় ধোঁয়া দিয়া ঘূর্ণী করিতে পারেন। কেলভিনের এই মতবাদ পণ্ডিত-সমাজে তেমন বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই—আজকাল এই মতবাদ কেহ মানেন না। তবুও এই মতবাদ একবার উঠিয়াছিল এই কারণে ইহার কথা এখনে বলিয়া রাখিলাম। যে মতবাদ এখন প্রচলিত তাহার উৎপত্তির কথা বলিতেছি।
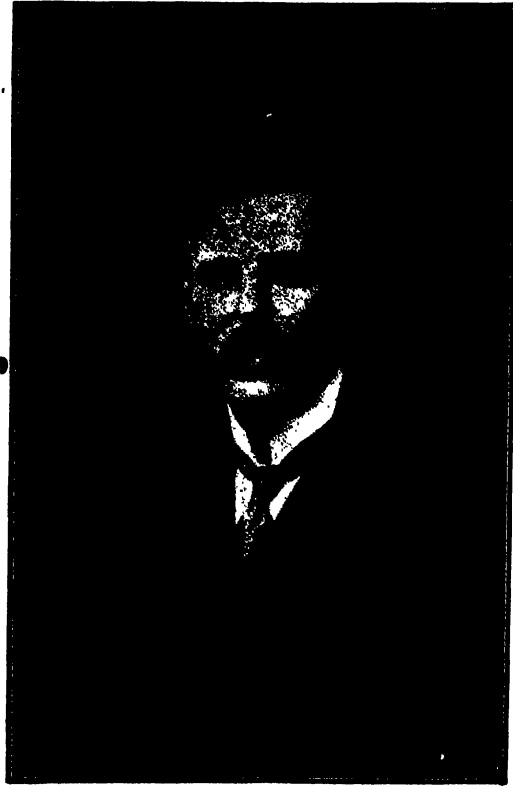
আর্ণেষ্ট রাদারফোর্ড

গত শতাব্দীর শেষভাগে পদার্থবিদেরা একটা বৈদ্যুতিক পরীক্ষা লইয়া খুব মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। পরীক্ষাটি বিশেষ কিছুই নয়—ইচ্ছা করিলে এখনও যে কোনও I. Sc
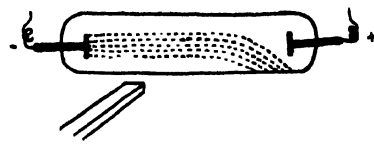
বায়ুশূন্য কাচনলে বিদ্যুৎ রশ্মি চুম্বকের আকর্ষণে বাঁকিয়া যায়।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

ক্লাসের ছাত্র পরীক্ষাটি করিতে পারেন। একটা কাঁচের পাত্র হইতে বায়ু নিষ্কাসিত করিয়া যদি পাত্রের ভিতর বিদ্যুৎ প্রবাহ চালান যায় তবে বুঝা যাইবে যে পাত্রের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে এক অদৃশ্য রশ্মি যাইয়া পড়িতেছে। রশ্মি কাচপাত্রের যেখানে পড়ে সেখানটা হরিতাভ রঙে রঞ্জিত হইয়া উঠে। প্রশ্ন হইল এ রশ্মিটি কি? এ রশ্মি যে আলোক নয় তাহা সহজেই প্রমাণ করা যায়। কাচপাত্রের কাছে যদি একটা সাধারণ চুম্বক লওয়া যায় তবে দেখা যায় যে এ রশ্মির পথ বাঁকিয়া গিয়াছে। আলেকারশ্মির কাছে চুম্বক লইয়া গেলে তাহার পথ বাঁকে না। যখন চুম্বকের আকর্ষণে রশ্মি বাঁকে তখন বোঝা যায় যে রশ্মি বিদ্যুৎপ্রবাহ মাত্র। ঘরে বিজলী বাতির কাছে যদি চুম্বক ধরা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে বাতির জলন্ত ফিলামেণ্ট একটু বাঁকিয়া গিয়াছে· ইহার কারণ তাহার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ চলিতেছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ সচরাচর পরিচালক বস্তুর মধ্য দিয়া চলিয়া থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রায় বায়ুশূন্য কাচপাত্রের ভিতর দিয়া যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতেছে তাহা কিসের আশ্রয়ে? উত্তর এই যে কাচপাত্রে যে একটুখানি বায়ু বাকি থাকে তাহার অণুপরমাণু বিদ্যুৎ-সঞ্চারিত হইয়া ওঠে। ফলে বিদ্যুৎ এই অণুপরমাণুর ঘাড়ে চড়িয়া পাত্রের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যায়। বৈজ্ঞানিকেরা সর্ব্বদাই একটু সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক। ইঁহারা কোনও কথা সহজে বিশ্বাস করিতে চাননা। প্রায়-বায়ুশূন্য কাচপাত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহ বাকি বায়ুর অণুপরমাণু ইত্যাদির উপর ভর করিয়া যাতায়াত করিতে পারে—এ বেশ সঙ্গত কথা। কিন্তু তবুও মতবাদটা ঠিক কি না একটু পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। যে কণাগুলা বিদ্যুৎ বহন করে তাহাদের ওজন কত? ও একটা জড়-কণা কতটা বিদ্যুতই বা বহন করিতেছে তাহা পরীক্ষা করিয়া এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। পরীক্ষা সুরু হইল। পরীক্ষা খুব সোজা নয়,—অনেক পরিশ্রম, বুদ্ধি ও যন্ত্রের ভাঙা গড়ার পর পরীক্ষার ফল বাহির হইল। এই সব পরীক্ষা প্রথম সুরু করেন এক জর্ম্মণ বৈজ্ঞানিক—ও সেই সঙ্গে সঙ্গে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে, জে টম্‌সন্। ইঁহাদের পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, ওজন দেখিয়া বোধ হয় বটে যে বিদ্যুতবাহা কণার মধ্যে অনেকগুলিই সাধারণ অণুপরমাণু মাত্র। কিন্তু এমন আবার অনেক কণা দেখা গেল যাহাদের ওজন হাইড্রোজেনের পরমাণুর দুই হাজার ভাগের একভাগ মাত্র! কথাটা বড় গুরুতর। এতদিন বৈজ্ঞানিক সমাজে সকলে বেদ বাক্যের ন্যায় স্বীকার করিতেন যে পরমাণুর (atom) চাইতে ছোট জড়-কণা হইতে পারে না—আর হাইড্রোজেনপরমাণু হইল

নীল বর

সব চাইতে হাল্কা, ইহার চেয়ে ছোট জড় কণার অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। কিন্তু জে, জে টমসনের পরীক্ষায়—পরীক্ষা অতি সাবধানেই হইয়াছিল, কোনও ভুল থাকা সম্ভব ছিল না—দেখা যায় যে হাইড্রোজেনের দুই হাজার ভাগের একভাগ ওজনের কণারও অস্তিত্ব আছে! রসায়ন শাস্ত্রের ভিত্তি বসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের এত গবেষণার, এত সাধের পরমাণু-বাদ তবে সবই ভুয়া? যা হউক একটা আপোষে নিষ্পত্তি

হইল। বলা হইল ওগুলা ঠিক জড়-কণা নহে—ওগুলা বিদ্যুৎকণা—বিদ্যুতাণু। জড়ের যেমন পরমাণু, ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা (smallest indivisible particle) তেমনি বিদ্যুতের বিদ্যুতাণুও (smallest indivisible
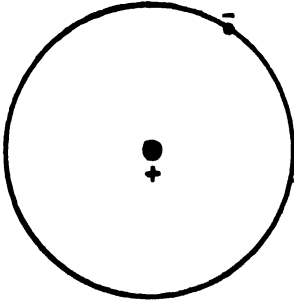
হাইড্রোজেন পরমাণু—মাঝে একটি ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা ও তাহার চারিধারে বিদ্যুতিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে

electric particle)। এই ক্ষুদ্রতম বিদ্যুতকণার নামকরণ হইল electron—আমরা ইহাকে বিদ্যুতিন বলিব। বিদ্যুতিনগুলি শুধু ঋণাত্মক (negative) বিদ্যুৎপূর্ণ কণা মাত্র। আকার ও ওজন অতি ক্ষুদ্র। হাইড্রোজেনের পরমাণুর দুই হাজার ভাগের একভাগ মাত্র।

রাসায়নিকেরা দিনকতকের জন্য একটু আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু বেশী দিনের জন্য নয়। পদার্থবিদ্‌গণ বলিতে লাগিলেন, ঐ যে বিদ্যুৎ কণাগুলি ঐ গুলিই হইল জড়ের আসল উপাদান। জড়কণা অর্থাৎ রাসায়নিকের পরমাণু শুধু বিদ্যুৎকণার সমবায়ে সৃষ্টি হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা এই মতবাদ প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—তাঁহারা নিজেদের স্বপক্ষে নানারূপ যুক্তি ও প্রমাণ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যুক্তি ও প্রমাণ এমন আসিয়াছে যে আজকাল পরমাণু বা atom-কে আর জড়কণার smallest indivisible particle বলা চলে না। এই নূতন মতবাদের নায়ক হইতেছেন জাপানের অধ্যাপক নাগাওকা, কেম্ব্রিজের অধুনাতন অধ্যাপক আর্নেষ্ট রাদারফোর্ড ও কোপেনহাগেনের অধ্যাপক নীল বর (Niels Bohr)। ইঁহারা অণু-পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে কি বলেন শোনা যাক্। প্রথম ধরা যাক হাইড্রোজেন বা উদজানের পরমাণু। ইহাই হইল সব চাইতে হাল্কা ও ছোট পরমাণু—সুতরাং ইহার গঠন খুব সরল রকমের হওয়া সম্ভব। বর ও রাদারফোর্ডের মতে উদজানের পরমাণু একটি ধনাত্মক (Positive) তড়িৎকণা ও একটি বিদ্যুতিনের সমবায়ে তৈয়ার হইয়াছে। ধনাত্মক তড়িৎকণাকে মাঝে রাখিয়া বিদ্যুতিন তাহার চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—ঠিক যেন পৃথিবীর চারিধারে চন্দ্র প্রদক্ষিণ করিতেছে। অথবা বালক যেন সুতা বাঁধিয়া ঢিল ঘোরাইতেছে—বালক হইল ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা ও ঢিল হইল বিদ্যুতিন। বালকের শরীরের ওজন ঢিলের ওজনের তুলনায় খুব বেশী বলিয়া ঢিল ঘুরিবার সময় বালক প্রায় স্থির থাকে—ঢিলটাই বালকের চারিধারে ঘুরিতে থাকে সেইরূপ বর ও রাদারফোর্ড বলেন যে মাঝের ধনাত্মক বিদ্যুতকণা বিদ্যুতিনের চাইতে প্রায় ২০০০ গুণ ভারী বলিয়া ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা স্থির থাকে ও বিদ্যুতিন তাহার চারিধারে ঘুরিয়া বেড়ায়। মাঝের এই ধনাত্মক বিদ্যুতপিণ্ডের নাম বৈজ্ঞানিকেরা দেন Proton, আমরাও ইহাকে প্রোটন বলিব। বর, রাদারফোর্ড শুধু এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—শুধু এইটুকু বলিলেএই মতবাদকে নিছক বৈজ্ঞানিকের উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিত। প্রশ্ন করা যাইতে পারে, বিদ্যুতিন যে কেন্দ্রস্থিত প্রোটনের চারিধারে ঘুরিতেছে—তাহার কক্ষটা কত বড়? কেন্দ্র হইতে বিদ্যুতিন কত দূরে অবস্থিত—বালকের হাতে ঢিল বাঁধা
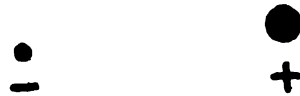
ছোট বিন্দুটি বিদ্যুতিন বা electron। ইহাই বৈজ্ঞানিকের বিদ্যুৎ-পরমাণু—ঋণাত্মক বিদ্যুতের সূক্ষ্মতম কণা। আকার ও ওজন অতি ক্ষুদ্র হাইড্রোজেন পরমাণুর ২০০০ ভাগের প্রায় একভাগ মাত্র। সাধারণ বৈদ্যুতিক প্রবাহ বিদ্যুতিনের প্রবাহমাত্র। বড় বিন্দুটি PROTON বা ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা উদজান পরমাণুর মাঝের অংশ। প্রোটনকে বিদ্যুতিনের মত সচরাচর আলগা দেখিতে পাওয়া যায়না। বিদ্যুতিন অতি সহজেই ধাতু হইতে বাহির হইয়া পড়ে।

জড়ের উপাদান

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

দড়িটা কত লম্বা ? আমি যদি বলি যে উহা এত বড়—তা হইলে আবার প্রশ্ন চলিতে পারে যে শুধু অত বড় কেন—উহার চাইতে বেশী বড় বা ছোট হইলে ক্ষতি কি ?

প্রথম ছবি আল্‌ফাকার। একজোড়া প্রোটন একসঙ্গে মিলিয়া একটা আল্‌ফাকণা হয়। বৈজ্ঞানিকের হাতে ইহা একটি ব্রহ্মাস্ত্র। রেডিয়ম জাতীয় পদার্থ হইতে ইহা আপনা হইতে সর্ব্বদা ভীম বেগে ছুটিয়া বাহির হয়। বৈজ্ঞানিকেরা ইহার সাহায্য অন্যান্য মৌলিক পদার্থের পরমাণু ভাঙ্গিয়া থাকেন। দ্বিতীয় ছবিটি হিলিয়মের পরমাণুর কেন্দ্রিন।

বর (Bohr) এই প্রশ্নের উত্তরও দিয়াছেন। তিনি বলেন বিদ্যুতিন যে কেন্দ্রস্থিত প্রোটনের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহার কক্ষা একটা নহে—একের পর আর এক—দূরে দূরে অনেক পথে বিদ্যুতিনের ঘুরিবার সম্ভাব্য কক্ষা আছে। বিদ্যুতিন এ কক্ষা হইতে ও কক্ষা, ও কক্ষা হইতে সে কক্ষায় লাফাইয়া পড়ে—আর এই লাফাইয়া পড়ার সময় এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে—পরমাণু হইতে আলোক বিকীর্ণ হয়। যদি একটা কাচপাত্রে অল্প হাইড্রোজেন ভরিয়া তাহাতে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালান যায় তবে বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বিকর্ষণের ফলে বিদ্যুতিনের কক্ষা হইতে কক্ষান্তরে লাফালাফি ব্যাপার খুব সমারোহের সঙ্গে চলিতে থাকে, ও আলোক বিকীরণও খুব প্রভূত পরিমাণে হয়। বিদ্যুতিন ভিন্ন ভিন্ন কক্ষায় লাফাইবার সময় ভিন্ন ভিন্ন রংএর—কখন লাল, কখন সবুজ, কখন বেগুনিয়া কখনও বা অদৃশ্য অতি-বেগুনিয়া—ultra-violet—রশ্মি বিকীরণ করে। কক্ষা কত বড় ও কোন্ কক্ষা হইতে কোন্ কক্ষায় লাফাইতেছে জানা থাকিলে বর-রাদারফোর্ড অনায়াসে হিসাব করিয়া বলিতে পারেন কোন্ রং-এর আলোক বাহির হইবে। বাল্যকালে পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্লাসে রুমকর্ফ কুণ্ডলীর সাহায্যে প্রায়-বায়ুশূন্য কাচনলে যে রং-বেরং-এর আলোকের খেলা দেখা গিয়াছিল ও গ্যানোর ফিজিক্সের প্রথম পৃষ্ঠায় তাহার যে রং চং করা ছবি দেখা গিয়াছিল—তাহার মূল তথ্য এইখানে।

আচ্ছা, হাইড্রোজেনের পরমাণুর গঠন না হয় জানা গেল—কিন্তু অন্যান্য মূল পদার্থের পরমাণুর গঠন কি রকম ? উত্তর একই ধরণের—তবে গঠন হাইড্রোজেনের মত অত সরল নহে। সবেরই কেন্দ্রে কয়েকটা প্রোটন ও বিদ্যুতিন আছে ও কেন্দ্রের চারি পাশে কতকগুলি বিদ্যুতিন বিভিন্ন কক্ষায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেন্দ্রস্থিত সমবেত বিদ্যুৎ-কণার সমষ্টিকে ইংরাজিতে core বলে—আমরা ইহাকে কেন্দ্রিন বলিব। পরমাণুর ওজন যত বেশী হয় গঠন ততই জটিল হয় কিন্তু মোটামুটি ধরণটা একই থাকে। মাঝের কেন্দ্রিনের গঠনে একটা খুব সরল নিয়ম দেখা যায়। যদি মূল পদার্থের পরমাণুগুলিকে ওজনের ক্রম অনুসারে (যেমন হাইড্রোজেন, তারপর হিলিয়াম, তারপর লিথিয়ম ইত্যাদি) পরে পরে সাজান যায় তবে বর-রাদারফোর্ড মতানুসারে দেখা যাইবে যে প্রথম পরমাণুর (হাইড্রোজেনের) কেন্দ্রিনে একটি প্রোটন আছে—দ্বিতীয়টির (হিলিয়মের

মাদাম ক্যুরী

পরমাণুর) কেন্দ্রিনে চারিটি প্রোটন ও দুইটি বিদ্যুতিন আছে, তৃতীয়টির (লিথিয়ম পরমাণুর) কেন্দ্রিনে ৬টি প্রোটন ও তিনটি বিদ্যুতিন আছে ইত্যাদি—ও কেন্দ্রিনের

বাহিরে প্রথমটিতে একটি, দ্বিতীয়টিতে দুইটি, তৃতীয়টিতে তিনটি বিদ্যুতিন ভিন্ন ভিন্ন কক্ষায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—
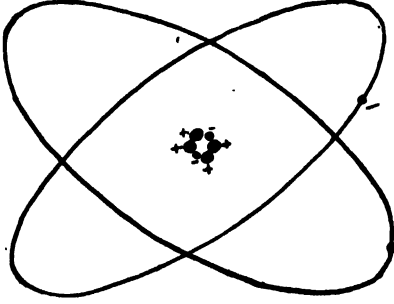
হিলিয়ম পরমাণু। দুইটি বিদ্যুতিন আড়াআড়ি-ভাবে চারিধারে কেন্দ্রিনের ঘুরিতেছে

অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর রাসয়নিকের তথাকথিত মৌলিক পদার্থ আর কিছুই নহে—শুধু ধনাত্মক বিদ্যুৎকণা বা প্রোটন ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণা বা বিদ্যুতিনের সমবায়ে সৃষ্ট। এই মতবাদে রাসায়নিকেরা গোড়ায় গোড়ায় একটু চঞ্চল হইয়াছিলেন বটে কিন্তু এখন ইঁহারা এই সব বিদ্রোহী মত অনেকটা মানিয়া লইয়াছেন। একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে অণু পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে এই আবিষ্কারে রসায়ন শাস্ত্রের আবিষ্কৃত অন্যান্য তথ্যগুলির বিশেষ কোন ব্যতিক্রম হইল না। এখনও সালফিউরিক এসিডে দস্তা ফেলিলে তাহা হইলে হাইড্রোজেন বাহির হইবে - তবে রাসায়নিক যে জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের শাস্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এখন দেখা গেল যে সেই জ্ঞানই চরম নয়—তাহার পরে আরও অনেক কথা আছে।

এইখানে সকলের মনে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। আগে আমাদের মনে হইত যে পরমাণু পদার্থের একটা চরম অবিভাজ্য নিরেট টুকরা মাত্র। এখন দেখা যাইতেছে যে ইহারা মোটেই নিরেট নহে—সৌরজগৎ যেমন সূর্য্য ও গ্রহের সমবায়ে গঠিত—পরস্পর পরস্পর হইতে দূরে থাকিয়া মাধ্যাকর্ষণের জন্য এ উহার চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—এক একটা পরমাণুও সেইরূপ ছোট খাট একটা সৌরজগৎ বিশেষ—মাঝের কেন্দ্রিন যেন সূর্য্য ও বিদ্যুতিন গুলি যেন গ্রহ।

পরমাণুর গঠন যদি এইরূপ হয় তবে সহজেই মনে হয় যে বিদ্যুতিন পরিবেষ্টিত সৌরজগতের মত এক একটি পরমাণু কি বেশ শক্ত জিনিষ? ইহার ভিতরের বাঁধন ত আল্‌গা বলিয়াই মনে হয়—জটিল গঠন হইলে ইহাদের কি সহজেই ভাঙ্গা যায় না? প্রশ্নটা সঙ্গত। সব পরমাণুর গঠন যে ঢিলা রকমের তা নয়—পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণে খুব দৃঢ় গঠনের পরমাণুই বেশী রকমের—কিন্তু আল্‌গা ও ঢিলা বাঁধনের পরমাণুও খুব বিরল নহে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এক ফরাসী বিদুষী মহিলা একটা নূতন ধরণের মৌলিক ধাতু আবিষ্কার করেন। আবিষ্কৃত ধাতুর এক অদ্ভুত গুণ দেখা যায়—ধাতু হইতে অনবরত তাপ ও বৈদ্যুতিক রশ্মি বাহির হইতেছে—ধাতুর নাম রেডিয়াম। সে সময়ে বৈজ্ঞানিক মহলে এই ধাতু লইয়া তুমুল গবেষণা উঠিয়াছিল—ধাতু হইতে যে আলোক ও রশ্মি বাহির হইতেছে সেগুলি কি তাহা নির্ণয় করিবার জন্য অনেক জল্পনা কল্পনা হইয়াছিল। আধুনিক মতে বলা হয় যে রেডিয়ামের পরমাণুর গঠন একটু জটিল রকমের। ফলে পরমাণুগুলি অনবরত ভাঙ্গিতেছে। অর্থাৎ একটুকরা রেডিয়ামের মধ্যে যে কোটি কোটি
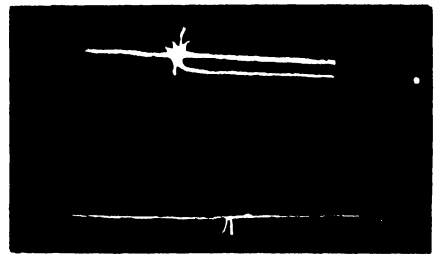
আল্‌ফাকণার সহিত পরমাণুর সংঘর্ষ। আল্‌ফাকণা বাঁ দিক হইতে ডাইনে চলিয়াছে। উপরে নাইট্রোজেন পরমাণুর সহিত সংঘর্ষ। ফলে ৫টা বিদ্যুতিন বাহির হইয়াছে ও নাইট্রোজেনের কেন্দ্রিনের অবশিষ্টাংশ ও আলফাকণা দুই পথে চলিয়াছে। নীচে হিলিয়ম পরমাণুর সঙ্গে আল্‌ফা কণার সংঘর্ষ। দুইটা বিদ্যুতিন বাহির হইয়াছে। দেবেন্দ্রমোহন বসু ও তৎসহকর্মী ৺সত্যেন্দ্রকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো হইতে।

জড়ের উপাদান

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

রেডিয়াম পরমাণু আছে তাহা হইতে একটি একটির কেন্দ্রিনের বিদ্যুৎ-কণা সমষ্টি ভাঙ্গিতেছে ও ভাঙ্গার সময় তাহা হইতে মাঝে মাঝে এক জোড়া প্রোটন (বৈজ্ঞানিকেরা ইহার নাম দেন আল্‌ফা পার্টিকেল—আমরা ইহাকে আল্‌ফাকণা বলিব), ও বিদ্যুতিন বাহির হইতেছে ও সেই সঙ্গে আলোক দেখা যাইতেছে।

রেডিয়ম হইতে আলো ও বিদ্যুৎ রশ্মি অনর্গল বাহির হওয়ার ইহাই রহস্য। এ কথা সহজেই মনে হইতে পারে যে রেডিয়মের পরমাণু হইতে এইরূপে কতকগুলি বিদ্যুতিন ও জোড়া প্রোটন বা আল্‌ফাকণা খসিয়া গেলে যেটা অবশিষ্ট

অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু

রহিল সেটা কি? সেটাত রেডিয়ম পরমাণু নহে। কথাটা ঠিক। এক টুকরা রেডিয়মের পরমাণুগুলি ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে রেডিয়ম শেষ পর্য্যন্ত সীসাতে পরিণত হয়। এই পরিবর্ত্তনে মোটমাট প্রায় ২॥০ হাজার বৎসর লাগে। রেডিয়মের ন্যায় আরও অনেক ধাতু আছে, সেগুলিও অনবরত আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া রূপান্তরিত হইয়া বিভিন্ন ধাতুতে পরিণত হইতেছে। এই সব ধাতুগুলিকে Radio-active elements বলে। আচ্ছা, না হয় বোঝা গেল যে আল্‌গা গড়নের পরমাণুগুলির কেন্দ্রিন আপনা হইতেই মাঝে মাঝে ভাঙ্গিতেছে—কিন্তু অন্যান্য মৌলিক পদার্থের পরমাণুর গড়নও কি ঠিক কঠিন নিরেট?—ঠোকাঠুকি বা ধাক্কা দিয়া অথবা ঢিল মারিয়া কৃত্রিম উপায়ে তাহাদিগকে ভাঙ্গা কি সম্ভব নহে?

গোড়াতেই বলিয়াছি যে বৈজ্ঞানিকেরা বয়সে বড় হইলেও তাঁহাদের মনের ভিতরটা ছেলেমানুষিতে পূর্ণ। ভাঙ্গিতে পারা যায় কিনা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিবার চেষ্টা সুরু হইল। ভাঙ্গিয়া কি হইবে এ প্রশ্ন বৈজ্ঞানিককে করিয়া লাভ নাই—শিশুর হাতে একটা ঘড়ি পড়িলে শিশু যেমন তাহাকে খুলিয়া ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতরটা না দেখিয়া পারে না—বৈজ্ঞানিকের মনেও কতকটা সেই ভাব। কিন্তু ভাঙ্গিবার ইচ্ছা হইলেই হয়না—ভাঙ্গা যায় কিরূপে? বিদ্যুৎ কণার সমষ্টি ঐ পরমাণুগুলিতে যদি ঢিল মারা যায় তবে তাহা হইতে দুই একটা বিদ্যুতিন বা প্রোটন কি খসান যায় না?* কিন্তু মুস্কিল এই যে বিদ্যুতিন ও প্রোটন সমেত এক একটি পরমাণু আকারে অতি ক্ষুদ্র। ঐ ঝাঁকে ঢিল মারিতে হইলে ঢিলও সেইরূপ ছোট হওয়া চাই। বড় ঢিলে কাজ চলিবেনা। মশা মারিতে কামান দাগার অবস্থা হইবে। ছোট ঢিল পাওয়া যায় কোথা?

সৌভাগ্যক্রমে ছোট ঢিল পাওয়া শক্ত নহে। আগেই বলিয়াছি এমন অনেক মৌলিক পদার্থ আছে—Radio-active পদার্থ—যেগুলি হইতে অনবরত জোড়া প্রোটন বা আল্‌ফাকণা ও বিদ্যুতিন বাহির হইতেছে। আল্‌ফাকণার আয়তন ঘূর্ণায়মান বিদ্যুতিনের ঝাঁকসমেত পরমাণুগুলার তুলনায় খুব ছোট। আর এই আল্‌ফাকণা রেডিয়ম জাতীয় পদার্থ হইতে বাহির হইবার সময় বাহির হয় ভীষণ বেগে। গতির বেগ গড়ে প্রায় সেকেণ্ডে লক্ষ মাইল। এই আল্‌ফাকণা যদি ঢিলরূপে ব্যবহার করিয়া পরমাণুতে মারা যায় তা'হইলে পরমাণুর কেন্দ্রিন হইতে অনেক সময় দুই একটা বিদ্যুতিনও খসান যাইতে পারে।

*এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। জটিল গঠনের পরমাণুর কেন্দ্রিনের বাহিরে যে বিদ্যুতিনের ঝাঁক ঘুরিতেছে তাহা হইতে ২।১ টা বিদ্যুতিন খসান বিশেষ আয়াসসাধ্য ব্যাপার নহে। অতি-বেগুনিয়া (ultra-violet) রশ্মি বা X রশ্মি দিয়া অনায়াসে এই কাজ করা যায়। এইরূপে ২।১টা বিদ্যুতিন খসিলে পরমাণুর বিশেষ কোনও স্থায়ী পরিবর্ত্তন হয় না। এইরূপ পরমাণুকে ionised পরমাণু বলে। ionised পরমাণু একটু সুযোগ বা সুবিধা পাইলেই দুটা বিদ্যুতিনকে ধরিয়া নিজের কক্ষাগত করিয়া আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। পরমাণুর কেন্দ্রিন ভাঙ্গাই আয়াসসাধ্য ব্যাপার। কেন্দ্রিনকে ভাঙ্গিতে পারিলে পরমাণু ভাঙ্গা হইল বলা যাইতে পারে। তবে, যে পরমাণুর কেন্দ্রিনের বাহিরে মাত্র একটা কি দুইটা বিদ্যুতিন আছে (যেমন হাইড্রোজেন বা হিলিয়ম) তাহাদের বিদ্যুতিন সহজে তাড়ান যায় না। কেন্দ্রিন প্রোটন ও বিদ্যুতিন লইয়া গঠিত। পরমাণুর রাসায়নিক গুণ নির্ভর করে কেন্দ্রিনে বিদ্যুতিনের চাইতে প্রোটন কয়টা বেশী আছে তাহার উপর—অর্থাৎ কেন্দ্রিনে কতটা পরিমাণ ধনাত্মক বিদ্যুতের চার্জ আছে তাহার উপর।

বাস্তবিকই এইরূপ পরীক্ষা করা হইয়াছে। অণুপরমাণুর ঝাঁকে আল্‌ফা পার্টিকেল মারিয়া অণুপরমাণু ভাঙ্গা হইয়াছে। অবশ্য ঢিল মারিলেই যে পরমাণু ভাঙ্গিবে তাহা বলা যায় না—ঠিক তাগ্‌মাফিক লাগা চাই। তবে অনবরত ঢিল মারিতে থাকিলে ২।১ টা লাগিয়া যাইতে পারে। গড়ে দশ হাজারের মধ্যে একটার লাগার সম্ভাবনা। অনেক ঢিল ঠিক ঝাঁকে না লাগিয়া যদি পরমাণুর কেন্দ্রিনের গা ঘেঁসিয়া যায় তবে কেন্দ্রিনের টানের ফলে তাহার গতির সরল পথ বাঁকিয়া যায়। কেম্ব্রিজের C. T. R Wilson —পরমাণুর কেন্দ্রিনে ধাক্কা লাগিয়া কেন্দ্রিনের দ্বিধা বিভক্ত হওয়া—ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারের ফটোগ্রাফ তুলিবার অতি চমৎকার কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই সব গবেষণার জন্য C. T. R. Wilson এইবার Nobel Prize লাভ করিয়াছেন। আমাদের দেশে বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু এই সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। উদজানের পরমাণু অনেকে ভাঙ্গার চেষ্টা করিয়াছিলেন—দেবেন্দ্র বসু মহাশয় প্রথম উদজানের পরমাণু ভাঙ্গিতে সমর্থ হন। ইহা ছাড়া দেবেন্দ্র বসু মহাশয় আল্‌ফাকণা দ্বারা আঘাত করিয়া নাইট্রোজেনের পরমাণু ভাঙ্গিতে সমর্থ হইয়াছেন। সম্প্রতি হিলিয়ম গ্যাসের বাহিরের দুইটি ঘূর্ণ্যয়মান বিদ্যুতিনকে খসাইয়া দিয়া শুধু মাঝের কেন্দ্রিনটুকু আলাদা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসাবে অধ্যাপক বসুর এই সব গবেষণা অতি মূল্যবান। ছবিতে আল্‌ফাকণার গতি ও পরে আল্‌ফাকণার সহিত ধাক্কা খাইয়া বিদ্যুতিন ও কেন্দ্রিনের গতির ফটো দেওয়া হইয়াছে।

পরমাণুর গঠন যখন শুধু প্রোটন ও ঘূর্ণ্যয়মান বিদ্যুতিন লইয়া তখন একটা কথা মনে উঠিতে পারে। দুইটা কাছাকাছি প্রায় একরকম গঠনের পরমাণুর একটাকে আর একটাতে পরিবর্ত্তন করা কি সম্ভবপর নয়? আবশ্যক মত কেন্দ্রিনে দুই একটা বিদ্যুতিন বা প্রোটন ঢুকাইয়া দিয়া একটা মৌলিক পদার্থকে আর একটা মৌলিক পদার্থে পরিণত করা কি অসম্ভব? এইরূপে এক ধাতুকে আর এক ধাতুতে পরিণত করিবার একটা আশা ও স্বপ্ন মানুষের মধ্যে অনেকদিন হইতে আছে। পারাকে সোনা করার চেষ্টা সব দেশে সব কালে কখনও না কখনও হইয়াছে এখনও আমাদের দেশে অনেকে এই বুজরুকি দেখাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। পারদের ও স্বর্ণের পরমাণুর গঠন অনেকটা কাছাকাছি। দুই-এরই কেন্দ্রিনে প্রায় ২০০র কাছাকাছি (ঠিক সংখ্যা জানা নাই) প্রোটন ও তাহার প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক বিদ্যুতিন আছে। এটুকু জানা আছে যে পারদের কেন্দ্রিনে বিদ্যুতিন যতগুলি আছে তাহার চাইতে প্রোটনের সংখ্যা ৮০টী বেশী ও স্বর্ণের কেন্দ্রিনে বিদ্যুতিনের চাইতে প্রোটনের সংখ্যা ৭৯টি বেশী। অর্থাৎ বিদ্যুৎকণাগঠিত এই দুই ধাতুর কেন্দ্রিনে তফাৎ এই যে, স্বর্ণের চাইতে পারদের কেন্দ্রিনে একটা প্রোটনে যেটুকু বৈদ্যুতিক চার্জ ধরে সেইটুকু বেশী আছে। আর কেন্দ্রিনের এই একটা প্রোটনের চার্জের পার্থক্যের জন্যই স্বর্ণ ও পারদে এত প্রভেদ। যদি কোনও উপায়ে পারদের কেন্দ্রিন হইতে একটা প্রোটনের বৈদ্যুতিক চার্জ কমান যায় তা'হইলে পারদ স্বর্ণে পরিণত হইবে। এ বিষয়ে জর্ম্মানীতে কিছু চেষ্টাও হইয়াছে। বার্লিনের Technische Hochschuleর অধ্যাপক মিথে (Miethe) বায়ুশূন্য কাচনলের মধ্যে পারদ রাখিয়া তাহার মধ্যে অনবরত ৬০ ঘণ্টা কাল বিদ্যুৎ চালাইয়া দেখিয়াছেন যে পারদের কতকাংশ স্বর্ণে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য স্বর্ণ যা পাওয়া যায় তাহা অতি অল্প পরিমাণ—সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে স্বর্ণের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হয়। এইজন্য মিথের পরীক্ষা সকলে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন না—কারণ পারদে অনেক সময় স্বর্ণের সংমিশ্রণ থাকে। কিন্তু মিথে বলেন যে তিনি বিশুদ্ধ পারদ ব্যবহার করিয়াছিলেন সুতরাং এ বিষয়ে তিনি নিজে নিঃসন্দেহ। যা হউক মিথের পরীক্ষা প্রামাণ্য না হইলেও মানুষের স্বপ্নাতীত যে আকাঙ্খা পারাকে সোনা করা তাহা যে সম্ভব তাহা বোধ হয় আর অস্বীকার করা চলে না।

আমরা এতক্ষণ জড় কি, জড়ের উপাদান কি, জানিবার চেষ্টা করিলাম। আধুনিক বৈজ্ঞানিকের উত্তর জড়ের উপাদান বিদ্যুৎকণা। কিন্তু আবার যদি প্রশ্ন হয় বিদ্যুৎকণার উপাদান কি? বিদ্যুতকণা কিসের তৈয়ারি? বৈজ্ঞানিক এখানে নিরুত্তর এ প্রশ্নের উত্তর বৈজ্ঞানিক আপাততঃ দিতে অক্ষম।

গীতরত দিনেন্দ্রনাথ
শ্রোতৃবর্গ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন প্রভৃতি

বেদনার দান

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিশির-শীতল প্রাতে
ছল-ছল আঁখিপাতে
হৃদয় দুয়ারে দিল দেখা,
দাঁড়াল ক্ষণেক তরে—
আমার বেদনা বহি' আমি আছি একা।
শ্রাবণ বরষা রাতি,
আঁধারে নিভায়ে বাতি
আজিকার প্রভাতের তরে
এ পরাণ ছিল আশা ধরে'।
শেফালির মনোব্যথা
চরণ তলে প্রণতা,
ঊষার রঙীন বাসখানি
অঙ্গ ঘেরি' শিহরিছে যেন লাজ মানি'।

আজি মনে হয়—
গোপনে ধরণী বুকে যত ব্যথা বয়,—
সব মিলি যেন মূর্ত্তিমতী
শিশির-সজল নেত্রে জানাল মিনতি।
নাহি জানি কি বলিব তারে!
যেন শেষ কথা বারে বারে
রচিয়া সুরের মোহ কেঁদে মরে তার কানে কানে
শুধু অর্থহীন অভিমানে।
এই যেন চাই,
বেদনার বিনিময়ে সুখ দুখ নাই—
আছে যাহা রবে তা' গোপনে
রঙীন বাসনা রচি' সোনার স্বপনে।

কত না কামনা ছুটে কত দিকে
নিশিদিন ছুটে হায় !
নিভৃত সাধনা তারি গতিটিকে
লক্ষ্য করিয়া ধায় !

শিল্পী—শ্রীমণীষী দে

পারে বা না পারে ধরিতে তাহারে

অনুসরণেই সুখ !

চঞ্চল পিছে চঞ্চলতার এ

হের চির কৌতুক !

সহযোগী-সাহিত্য

হজরত মহম্মদ

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

আহম্মদীয় সম্প্রদায়ের মৌলভী মহম্মদ আলি * ইংরাজীতে হজরত মহম্মদের একখানি জীবনী লিখেছেন। তাতে মহম্মদের জীবন বা ধর্ম্মমত বিষয়ে যে বিশেষ কিছু নূতন তথ্য পাওয়া যায়, তা' নয়। তবুও বইখানির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাতে অমুসলমান পাঠকেরও মনে গ্রন্থকারের প্রতি একটা শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। বইখানি প্রায় একেবারেই গোঁড়ামি বর্জ্জিত, কিন্তু সেইটেই তার বিশেষত্ব নয়। মহম্মদের জীবনের কতকগুলো ঘটনার উপর গ্রন্থকার যে আলোকপাত ক'রেছেন, তাতে তাঁর সূক্ষ্ম অথচ উদার বিচার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং অমুসলমান পাঠকের মনে মহম্মদ সম্বন্ধে কতকগুলো কুসংস্কারও একেবারে দূর হ'য়ে যায়।

এই কুসংস্কারগুলোর জন্ম দেন শ্রদ্ধাহীন পাণ্ডিত্যাভিমানী জীবন-চরিত লেখকগণ এবং গোঁড়াদের লেখা জীবনী সেগুলোকে দূর ক'রতে মোটেই সাহায্য করে না। সেই হিসাবে মৌলভী মহম্মদ আলির লেখা এই বইখানির দাম অমূল্য। মৌলভী সাহেব গ্রন্থবর্ণিত বিষয়টী অতীব শ্রদ্ধার সহিত বর্ণনা ক'রেছেন অথচ গোঁড়ামির দ্বারা বিচার বুদ্ধিকে কোথাও ক্ষুণ্ণ হ'তে দেন নি। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের দেশের জীবনীকারদের মধ্যে একমাত্র তুলনা করা যেতে পারে স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সহিত—যাঁর ইংরাজীতে লেখা অধুনা-দুষ্প্রাপ্য কেশবচন্দ্র সেনের জীবনী আজও অবধি জীবন-চরিত লেখার আদর্শ হ'য়ে আছে।

মহম্মদের জীবনী সম্বন্ধে আমাদের যা' কিছু জ্ঞান—তা' অধিকাংশই ইংরাজ লেখকদের বর্ণনা প'ড়ে। এ বিষয়ে সব চেয়ে অধুনাতন লেখক হ'চ্ছেন, H. G Wells। এর পরেও হয়ত কেউ লিখে থাকবেন—তবে আমার তা' জানা নেই। H G. Wells বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকদের ভিতর একজন এবং তিনি যে একজন উদার মতের পরিপন্থী, তা' তাঁর ভক্তেরা খুব জোর গলাতেই বলেন—যদিও আর একজন শ্রেষ্ঠ লেখক Hillaire Belloc তাঁর সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। সে যাই হোক্, Wells তাঁর লেখা "Outline of History"তে মহম্মদকে যেরূপ ভাবে চিত্রিত ক'রেছেন, তা' ইংরাজীতে যাকে বলে খুব clever—তাই, এবং তা'ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি মহম্মদ, নাপোলিঅঁ এবং আরও দু'একজনের চরিত্র আলোচনার চেষ্টায় এই প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন যে বাস্তব-পন্থীদের তৌলদণ্ডে প্রতিভার সম্যক ওজন হ'তে পারে না। তাঁর সতীর্থ বার্ণার্ড্ শ'ও তাই প্রমাণ ক'রেছেন,—তাঁর জঁা দ্য আর্ক, সিজার এবং নাপোলিঅঁর চরিত্রচিত্রণে। গোঁড়ামি এবং মিথ্যা আদর্শের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো খুব সৎ সাহসের পরিচায়ক সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই দাঁড়াবার ভঙ্গীর অন্তরালে যদি অপর দিকের গোঁড়ামি এবং আর এক রকমের মিথ্যা আদর্শ লুকোনো থাকে তবে সেটা খুব গৌরবের বিষয় নয়—তা' সেটা জ্ঞানকৃতই হোক্ আর অজ্ঞানকৃতই হোক্। মহম্মদের চরিত্র-চিত্রণে কার্লাইলের কবিত্ব-উচ্ছ্বাস আদর্শ হিসাবে হয়ত খুব উচ্চ নয়, কিন্তু তাই ব'লে কতকগুলো বাঁধি বুলি—historic sense, critical estimate প্রভৃতির দোহাই দিয়ে এক মহাপুরুষের চরিত্র-প্রতিভার দীপ্তিকে চোখ বুজে অবজ্ঞা করা যে তার চেয়ে খুব বেশী উচ্চ আদর্শ তা' বলেও মনে হয় না।

* ইনি রাজনৈতিক মৌলানা মহম্মদ আলি নহেন।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

মহাপুরুষদের জীবন চরিত রচনা করতে গেলে তাঁদের আদর্শের উপর বিশ্বাস এবং চরিত্রের উপর শ্রদ্ধা থাকা দরকার। মৌলভী মহম্মদ আলির তা' যথেষ্ট পরিমাণে আছে। গোঁড়ামি জিনিষটা বর্জ্জন ক'রতে হয় এবং মৌলভী মহম্মদ আলি তা' ক'রতে যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেছেন।

বইখানি প'ড়ে গ্রন্থকারের আদর্শ পুরুষ হজরত মহম্মদের সম্বন্ধে বেশ একটী শ্রদ্ধান্বিত ভাবে হৃদয়টি আপনিই পূর্ণ হয়ে যায়। আমাদের কল্পনা নেত্রে মহম্মদের যে চিত্রটি ভেসে ওঠে, তা' সমস্ত দেশে এবং সমস্ত যুগেই আদর্শ কুলীন-চরিত্র ব'লে কল্পিত হ'য়ে এসেছে—সৌজন্যে প্রতিষ্ঠিত একটি ভদ্রলোক, ব্যবহারে অমায়িক, বেশভূষায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ভোগে জিতেন্দ্রিয়, ত্যাগে মহিমান্বিত, তেজে দীপ্ত, সততায় গরীয়ান, দিব্য শক্তির স্নিগ্ধ জ্যোতিতে মুখ মণ্ডল উদ্ভাসিত।

মহম্মদ আচারে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্তও তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার চিরাগত অভ্যাস ত্যাগ করেন নি। বিলাসিতাকে তিনি সম্যক বর্জ্জন ক'রেছিলেন। সমগ্র মদিনা যখন তাঁর পদতলে, সৌভাগ্যের যখন সীমা ছিল না, তখনও তিনি বাস ক'রতেন একটা সামান্য কুটীরে। এই কুটীরটী তিনি নিজের হাতেই পরিষ্কার ক'রে রাখতেন এবং তাঁর আসবাবের মধ্যে ছিল শোবার জন্য একটা খাটিয়া, বসবার জন্য একটী সামান্য আসন এবং জল রাখবার জন্য একটা সুরাই। আহারেও কিছুমাত্র বিশিষ্টতা ছিল না। অধিকাংশ দিনই তিনি খেজুর এবং জল খেয়েই ক্ষুধা নিবৃত্তি ক'রতেন। মদিনার ঐশ্বর্য্যের আবহাওয়ায় অন্তঃপুরিকাদের এরূপ ভাবে জীবন যাপন লজ্জাস্কর হ'য়ে উঠেছিল। তাঁরা এসে মহম্মদের কাছে অনুযোগ করাতে, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন —তোমরা তো ইচ্ছা ক'রলে সম্রাজ্ঞীর মতো থাকতে পার, কিন্তু তা' হলে মহম্মদের সহধর্ম্মিণী ব'লে কি ক'রে পরিচয় দেবে?

মহম্মদ সর্ব্বশুদ্ধ এগারটী বিবাহ ক'রেছিলেন। এই বিবাহ উপলক্ষ্যে বিশেষ ক'রে তাঁর খ্রীষ্টান জীবনী লেখকগণ তাঁকে কি যে না ব'লেছেন, তাঁর ঠিক নেই। বিষয়টাকে সম্যক ভাবে বোঝবার না চেষ্টা ক'রে তাঁরা মহম্মদের পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক কালিমাটা এমন অম্লান নিশ্চিত হস্তে লেপন ক'রে গেছেন, যাতে অপরের পক্ষেও বিষয়টা বোঝা একটা দুরূহ ব্যাপার হ'য়ে উঠেছে। মৌলবী মহম্মদ আলি তাঁর পুস্তকের একটা সমগ্র অধ্যায়ে ইহার আলোচনা ক'রেছেন। যতটা মনে পড়ে, আমীর আলির "Spirit of Islam"-এও এ বিষয়ের সম্যক আলোচনার বিশেষ কোন চেষ্টা নাই। মৌলভী সাহেব সুন্দররূপে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে মহমম্মদের সমস্ত বিবাহই কতটা উচ্চ আদর্শ প্রণোদিত ছিল—লালসার লেশমাত্র স্পৃহাবিহীন এই সব বিবাহে মহম্মদের মহৎ চরিত্রের করুণা-মিশ্রিত কর্ত্তব্যানুভূতির দিকটাই বেশী ক'রে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। মহম্মদের অতি-বড় শত্রুও তাঁর যৌবনে ও চরিত্রে উচ্ছৃঙ্খল অপবাদ আরোপ করেননি। পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি খাদিজাকে বিবাহ করেন, তখন খাদিজার বয়স ছিল প্রায় চল্লিশ। মহম্মদের একান্ন বৎসর বয়সের সময় খাদিজার মৃত্যু হয়। খাদিজার জীবিতকালে তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেননি এবং তাঁদের দাম্পত্য জীবন যে কত সুখের ছিল, তা' তাঁর শত্রুপক্ষও শতমুখে স্বীকার ক'রে গেছেন। এরূপ ব্যক্তি যে একান্ন বৎসর বয়সে লালসার বশবর্ত্তী হ'য়ে দার পরিগ্রহ ক'রবেন, তা' বিশ্বাস ক'রতে গেলে সম্ভব-অসম্ভবের মধ্যের সীমারেখাটাকে মুছে ফেলতে হয়। সেকালের আরব সমাজে বিধবা এবং পরিত্যক্ত নারীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। অনেক ক্ষেত্রে তাদের ঘৃণিত জীবন যাপন ক'রে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ক'রতে হ'ত। বাকী দশটী স্ত্রীর মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন বিধবা এবং একজন ছিলেন পরিত্যক্তা নারী। মহম্মদ তাঁদের বিবাহ ক'রে যে শুধু তাঁদের প্রাণ এবং ইজ্জৎ বজায় রাখবার সহায়তা ক'রেছিলেন তা' নয়, তাঁদের মৃত স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁদের নিজের স্ত্রী পরিচয়ে একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠাও দিয়েছিলেন। বিবাহ না ক'রে তখনকার আরব সমাজে নারীকে আর কোনরূপে সম্মানভাগিনী করবার উপায় ছিলনা। ক্রীতদাসের নারীকে তিনি যে

বিবাহ ক'রেছিলেন, তাও যে কত গভীর কর্ত্তব্যবোধে তা' মৌলভী মহম্মদ আলি বিস্তারিতভাবে প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে সেই ক্রীতদাস মহম্মদের কাছ থেকে মুক্তি আজ্ঞা পেলেও চিরজীবন স্বেচ্ছায় তাঁর সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিল—পুনর্বিবাহের পরেও।

এ সমস্তের খুঁটিনাটি আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। যাঁরা মহম্মদ চরিত্রের সম্যক এবং সশ্রদ্ধ আলোচনা ক'রবেন, তাঁরা জানতে পারবেন—মহম্মদের মনে নারীর আসন কতটা উচ্চে প্রতিষ্ঠিত ছিল। "স্বর্ণলতা মায়ের পদতলে"—এত মহম্মদেরই উক্তি।

মহম্মদ কোনদিনই অপর ধর্ম্মের অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেন নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে এ বিষয়ে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন—যে পরিচয় তিনি অপর পক্ষ থেকে অনেক সময় পান নি। শত্রুকে তিনি চিরকাল ক্ষমা ক'রে এসেছেন; যুদ্ধকে ঘৃণা ক'রলেও কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হ'য়ে যুদ্ধে যোগদান করতে তিনি পশ্চাৎপদ হননি; নিজের উপর অত্যাচার কি যৌবনে কি বার্দ্ধক্যে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রেছেন এবং সর্ব্বোপরি জগতের সর্ব্বভূতের উপর প্রেমে তিনি আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন।

মহম্মদের ধর্ম্মমতের আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তেজে দীপ্ত, পবিত্রতায় উজ্জ্বল, প্রেমে নম্র এক মহাপুরুষের চরিত্রের একটু আভাষ এখানে দিতে চেষ্টা করিছি মাত্র। যাঁরা এই মহান চরিত্তের সহিত পূর্ণ ভাবে পরিচিত হ'তে চান, মৌলভী মহম্মদ আলির লিখিত জীবনচরিতখানি তাঁদের এ বিষয়ে সাহায্য ক'রবে।

নানা কথা

আমরা গভীর দুঃখের সহিত কবি রমণীমোহন ঘোষ মহাশয়ের দিল্লীতে আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি। রমণীমোহন কলিকাতার জেনেরাল পোষ্ট-অফিসে উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, মাত্র চার পাঁচ মাস হইল উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি দিল্লী যান।

রমণীমোহন সুকবি ছিলেন; তাঁহার রচিত মুকুর, উর্ম্মিকা, মঞ্জীর প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থাবলীর সহিত সাহিত্য-সেবী মাত্রই পরিচিত। তাঁহার ছোট ছোট গাথাগুলি সংগ্রহ করিয়া গত পূজার সময় তিনি যে কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন বঙ্গ-সাহিত্যে তাহাই তাঁহার শেষ দান।

শুধু সাহিত্যিক হিসাবেই নয়, সহৃদয়তা এবং সৌজন্যে রমণীমোহন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। এমন অমায়িক, বন্ধুবৎসল, মিষ্টভাষী, অকপট, ধীর, সজ্জন ব্যক্তি কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়বর্গকে আমরা আমাদের গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

* * *

গত ২২শে, ২৩শে ও ২৫শে অগ্রহায়ণ কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রচিত "ঋতুরঙ্গ" কাব্য-নাটিকার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। "ঋতুরঙ্গ" বিচিত্রায় প্রকাশিত "নটরাজের" রূপান্তর। অভিনয় অতিশয় হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছিল; কলিকাতার কাব্যরসপিপাসুগণ তিন দিন অপূর্ব্ব কাব্যরসসুধা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।

"ঋতুরঙ্গে" কবির ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ঋতু পর্য্যায়ের ভিতর দিয়া বিশ্বরাজ তাঁহার যে অপূর্ব্ব লীলা প্রকাশ করিতেছেন, ঋতুচক্রকে অবলম্বন করিয়া জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ আলো-ছায়া, আরম্ভ-শেষের যে অবিরাম রসোল্লাস চলিয়াছে তাহার মর্ম্মটুকু উপলব্ধি ও উপভোগ করিতে তাঁহাদের বিলম্ব হয় নাই, যাঁহারা "ঋতুরঙ্গে" রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব অভিনয় দেখিয়াছিলেন। নটরাজের লীলানৃত্যের রূপ দর্শক-চক্ষের সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল।

তৃপ্ত ও ক্ষুধিত

শিল্পী শ্রীপ্রভাত মোহন বন্দোপাধ্যায়

পৌষ. ১৩৩৪

বৎসরাজ উদয়ন

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ হইতে জানা যায় যে বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণকালে অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে ষোলটী মহা-জনপদ ছিল। তাহাদের নাম অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বৃজি, মল্ল, চেদি, বংশ বা বৎস, কুরু, পঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, অশ্বক, অবন্তী, গান্ধার এবং কম্বোজ। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে এগুলি দেশের নাম নহে, অধিবাসীদের বা জাতির নাম। প্রাচীন যুগে অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও ভৌগোলিক বিভাগের পরিবর্ত্তে জাতি বা কুলগত বিভাগ প্রচলিত ছিল এবং যে জাতির যেখানে অবস্থিতি তন্নামেই তাহাদের অধ্যুষিত জনপদ প্রসিদ্ধিলাভ করিত। এই ষোলটী জনপদের মধ্যে বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় কোশল, বৎস, মগধ ও অবন্তী এই চারিটী রাষ্ট্রই সমধিক প্রসিদ্ধিসম্পন্ন ছিল। উক্ত চারি রাজ্যের নৃপতিবৃন্দের কীর্ত্তিকাহিনীর পরিচয় বৌদ্ধ ও জৈনসাহিত্য হইতে কিছু কিছু পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য ঐ সকল গ্রন্থ মূলতঃ ইতিহাস বা রাজগণের গৌরব প্রকাশার্থ রচিত সন্দর্ভ নহে। ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা প্রসঙ্গক্রমেই তথায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সকল তথ্য প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সঙ্কলনের অন্যতম প্রধান উপাদান।

এই সকল গ্রন্থ হইতে মগধের অধিপতি বিম্বিসার ও অজাতশত্রু, বৎসরাজ উদয়ন, অবন্তীর নৃপতি প্রদ্যোৎ এবং কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ও বিরূঢ়ক, বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ঐ চারি রাষ্ট্রের অধিপতিবৃন্দের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধাদি প্রচলিত ছিল, আবার রাজ্য লইয়া বা অন্যান্য কারণে যুদ্ধবিগ্রহাদি প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। পরবর্ত্তীকালে মগধ রাজ্যই সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠে এবং প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের উপরই স্বীয় প্রভাব বিস্তৃত করিতে সমর্থ হয়। তাই মগধরাষ্ট্রের তথা মাগধ নৃপতিবৃন্দের নাম সকলের নিকট সুপরিচিত। কিন্তু বুদ্ধদেবের কালে অবন্তীরাজ প্রদ্যোতই যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন পালি গ্রন্থসমূহ হইতে সে কথা বেশ বুঝা যায়।

বৎসরাজ উদয়নের নাম ভারতীয় সাহিত্যে সুপরিচিত। সংস্কৃত এবং পালি অনেক গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ দেখা যায়। বিভিন্ন যুগের এবং বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থসমূহ হইতে তাঁহার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি প্রাচীন ভারতের অন্যতম প্রধান নৃপতি ছিলেন এবং দীর্ঘকাল ধরিয়াই লোকে তাঁহার কথা বিস্মৃত হয় নাই ও তদীয় কীর্ত্তি-কাহিনীর আলোচনা করিত।

উদয়ন, বৎস জনপদের রাজা ছিলেন, তাই তিনি বৎসরাজ নামেও পরিচিত। বৎস রাষ্ট্রের রাজধানী কৌশাম্বী-নগরী বারাণসী হইতে ৩০ যোজন অন্তরে যমুনার তীরে অবস্থিত ছিল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল পরলোকগত সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে প্রয়াগ হইতে ৩১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত "কোসম" পল্লীকেই প্রাচীন কৌশাম্বীর নিদর্শন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ভিনসেণ্ট্ স্মিথ্ প্রমুখ কেহ কেহ সে সিদ্ধান্ত মানিতে না চাহিলেও বর্ত্তমানে তাহা সম্পূর্ণরূপেই অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। *

সংস্কৃত সাহিত্য-মতে উদয়ন, ভরত বা পুরু বংশজাত এবং পাণ্ডবগণের উত্তর পুরুষ। পুরাণসমূহে ভবিষ্য-ভূপাল প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে পরীক্ষিতের পঞ্চম অধস্তন পুরুষ নিচক্ষু বা নেমিচক্র, গঙ্গা কর্ত্তৃক হস্তিনাপুর অপহৃত হইলে কৌশাম্বীতে আসিয়া রাজপাট স্থাপনা করিবেন। বৎসরাজ উদয়ন এই নিচক্ষু বা নেমিচক্র হইতে উনবিংশ অধস্তন

* Archæological Survey Of India; Annual Reports for 1921-22 দ্রষ্টব্য।

পুরুষ বলিয়া বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছেন। বিভিন্ন পুরাণে মধ্যবর্ত্তী রাজগণের এমন কি উদয়নেরও নামভেদ দেখা যায়। কোন পুরাণে উদয়ন নামের পরিবর্ত্তে পুঁথি-লেখকের ভ্রমে 'দুর্দ্দমন' নামও দাঁড়াইয়াছে।

উদয়নের পিতার নাম শতানীক এবং পিতামহের নাম সহস্রানীক। এ বিষয়ে পুরাণসমূহ, ললিতবিস্তর, মহাকবি ভাসের নাটক ও মহাবংশ সকলেই একমত।* পালি সাহিত্য-মতে উদয়নের পিতার নাম পরন্তপ।† ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কারণ প্রাচীন যুগের অনেক রাজারই এইরূপ একাধিক নাম থাকিত। ইহাদের মধ্যে কোনটী রাজার বাল্য-নাম, কোনটী বা সিংহাসনারোহণের পর গৃহীত, অপরগুলি আবার গৌরব প্রকাশার্থ গৃহীত বিরুধ মাত্র। বিম্বিসার, অজাতশত্রু, প্রসেনজিৎ, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, কুমার গুপ্ত, হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতির কথা এ প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য।

ললিতবিস্তর নামক বুদ্ধদেবের জীবনচরিতে উক্ত হইয়াছে যে, উদয়ন বুদ্ধদেবের সহিত একই দিবসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ইহা পরবর্ত্তী যুগের রচা-কথা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কারণ বুদ্ধদেবের সারথি ছন্দক, অশ্ব কণ্ঠক প্রভৃতি আরও অনেকে উদয়নের ন্যায় ঐ একই দিবসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া ললিতবিস্তরে লিখিত হইয়াছে। এ কথা কতদুর বিশ্বাসযোগ্য তাহা না বলিলেও চলে। কোন কোন গ্রন্থ হইতে আবার উদয়ন বুদ্ধদেব অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। মহাবস্তু অবদান নামক গ্রন্থে আছে, বোধিসত্ত্বের জন্মগ্রহণ উদ্দেশ্যে তুষিত স্বর্গ হইতে অবতরণকালে মগধরাজ বিম্বিসার এবং কৌশাম্বীরাজ উদয়ন উভয়েই তাঁহাকে নিজ নিজ রাজধানীতে জন্মগ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব শাক্যকুলজাত শুদ্ধোধনের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হওয়াই স্থির করিলেন, কারণ তদীয় পত্নী মায়াদেবী ধর্ম্মজ্ঞা এবং অতীব কোমল-হৃদয়া ছিলেন, এবং তদ্ভিন্ন বোধিসত্ত্ব দেখিলেন যে পুত্র জন্মের পর তাঁহার আয়ুষ্কাল মাত্র সাত দিন। বলা বাহুল্য এ সকল অলৌকিক কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য কিছুই নাই। উদয়ন বুদ্ধদেব অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, বয়ঃকনিষ্ঠ বা তাঁহার ঠিক সমবয়স্ক ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে তাঁহারা যে সমসাময়িক ছিলেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

কথাসরিৎসাগরে উদয়নের জন্ম সম্বন্ধে এক অলৌকিক কাহিনার উল্লেখ দেখা যায়। তাহা অনেকাংশে স্কন্দ পুরাণেও অবিকল গৃহীত হইয়াছে। কথাসরিৎসাগরে উদয়নের দিগ্বিজয় এবং রাজত্বকালীন অনেক ঘটনার বিবরণ আছে। ঐ সকল কাহিনীর অধিকাংশেরই মূলে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। সে যাহা হউক উক্ত দুই গ্রন্থ অবলম্বনে উদয়নের জন্ম বিবরণ এইরূপ '—'

বিধূম নামে বসু এবং দেবনর্ত্তকী অলম্বুষা, ব্রহ্মার শাপে কৌশাম্বীরাজ শতানীকের পুত্র সহস্রানীক এবং তদীয় মহিষী কোশলরাজ কৃতবর্ম্মার কন্যা মৃগাবতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

উদয়ন যখন মাতৃগর্ভে তখন একদিন এক বিকট বিহঙ্গ মৃগাবতীকে আমিষবোধে এক লোহিত হ্রদ হইতে লইয়া যায় এবং উদয়গিরির কন্দরে পরিত্যাগ করে। তাঁহার করুণ ক্রন্দন ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া এক ঋষিকুমার তথায় উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে নিজ গুরু জমদগ্নি মুনির আশ্রমে লইয়া যান। রাজমহিষী ঋষির আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তথায় তাঁহার পুত্র উদয়ন ভূমিষ্ঠ হইলেন। তাঁহার জন্মকালে আকাশবাণী হয় "উদয়াচলজাতত্বাচ্চ কারোদয়নাভিধম্"। অনন্তর মুনিবর তাঁহার ক্ষাত্রোচিত সকল সংস্কার সাধন করিলেন এবং ক্রমে তাঁহাকে নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন।

কালক্রমে উদয়ন যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন। একদিন মৃগয়ায় গিয়া উদয়ন দেখিলেন যে জনৈক ব্যাধ

* কথাসরিৎসাগর এবং স্কন্দপুরাণে এ বিষয়ে এক ভ্রম দৃষ্ট হয়। ঐ দুই গ্রন্থে উদয়ন সহস্রানীকের পুত্র ও শতানীকের পৌত্র দাঁড়াইয়াছেন। কথাসরিৎসাগরে শতানীক "পাণ্ডবান্বয়সম্ভবঃ পরীক্ষিতঃ পৌত্রো জন্মেজয়াত্মজো নৃপতিঃ" (৯ম তরঙ্গ) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। পুরাণসমূহ-প্রদত্ত বংশ তালিকায় জন্মেজয়-পুত্র শতানীক হইতে উদয়ন-পিতা শতানীকের স্থান বহু পুরুষ নিম্নে। তদ্ভিন্ন উভয় শতানীক যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি সে কথাও পুরাণকার স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে বিস্মৃত হন নাই।

† বিনয় ২, ১২৭ ; ৪, ১৯৮।

বৎসরাজ উদয়ন

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা সর্পকে পীড়ন করিতেছে। সর্পের ক্লেশ দর্শনে ব্যথিত হইয়া উদয়ন জননী দত্ত কঙ্কণের বিনিময়ে তাহার মুক্তিসাধন করিলেন। ঐ সর্প ধৃতরাষ্ট্র নাগের পুত্র কিন্নর নাগ। সে উদয়নের সহিত মিত্রতা করিল ও তাঁহাকে পাতালপুরে লইয়া গেল। তথায় উদয়ন কিন্নর নাগের ভগিনী ললিতার পাণিপীড়ন করিয়া নাগগণের আদরে মহাসুখে বাস করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। পুত্র জন্মের পর ললিতা তাঁহাকে বলিল "পূর্ব্বে আমি সুকণি নামে এক বিদ্যাধরী ছিলাম, শাপগ্রস্ত হইয়া ইদানীং সর্পযোনিতে বাস করিতেছিলাম। এক্ষণে পুত্রজন্মে শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে চলিলাম। আপনি এই পুত্র, ঘোষবতী বীণা এবং অপরিম্লান তাম্বুলীমালা গ্রহণ করুন।" এই বলিয়া বিদ্যাধরী স্বর্গে চলিয়া গেল। উদয়ন ললিতা বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া পুত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যাদিসহ পাতালপুরী হইতে জমদগ্নি আশ্রমে জননী-সকাশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কথাসরিৎসাগরে কিন্তু উদয়নের, নাগকন্যা-বিবাহের কোন উল্লেখ নাই। উহাতে সর্পই প্রীত হইয়া তাঁহাকে বীণা, তাম্বুলীমালা ও অম্লান-মালাতিলক প্রদান করিয়াছিল দেখা যায়—ঐ সর্প বাসুকীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বসুনেমি।

এ দিকে সেই ব্যাধ কঙ্কণ বিক্রয়ের জন্য কৌশাম্বী-নগরীর জনৈক রত্ন-বণিকের নিকট গমন করিল। বণিক, নৃপতির নামাঙ্কিত কঙ্কণ দৃষ্টে তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়া নৃপসমীপে উপস্থিত করিল। রাজা মহিষীর বিরহে নিতান্ত কাতর ছিলেন, তিনি কঙ্কণ দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন। অনন্তর ব্যাধের নিকট সব কথা শুনিয়া তিনি প্রিয়া-দর্শন-সমুৎসুকচিত্তে মন্ত্রিগণের সহিত উদয়াচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় জমদগ্নি-আশ্রমে পৌঁছিলে মুনিবর সকল বিবরণ রাজাকে বলিয়া তদীয় মহিষী ও পুত্রকে তাঁহার করে সমর্পণ করিলেন। মুনি বলিলেন—

"নরনাথ মৃগাবত্যা জাতোঽয়ং তনয় স্তব।
যশোনিধি মহাতেজা রামচন্দ্র ইবাপরঃ॥
ভবিষ্যতি দিশাং জেতা সিংহসংহননো যুবা।

—হে নরনাথ! মৃগাবতীর গর্ভে আপনার এই পুত্র জন্মিয়াছে। অপর রামচন্দ্রের ন্যায় যশোনিধি মহাতেজা সিংহবিক্রম এই যুবা কালে দিগ্বিজয়ী হইবেন। *

বৎসরাজ উদয়ন তাঁহার প্রেমলীলার জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধ। পালি এবং সংস্কৃত বহু গ্রন্থ এই চঞ্চলচিত্ত, চটুল-প্রকৃতি নৃপতির প্রেম কাহিনী অবলম্বনে বিরচিত। প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, স্বপ্নবাসবদত্তা, রত্নাবলী এবং প্রিয়-দর্শিকা এই চারখানি নাটকের আখ্যানবস্তু এই একই বিষয়। উদয়ন ও বাসবদত্তার পরিণয় কথা সুপরিচিত কাহিনী। পালি ধর্ম্মপদের টীকায় এ সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে তাহার সহিত প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ নাটকের ও কথা-সরিৎসাগরের বিবরণের যথেষ্টই সাদৃশ্য দেখা যায়।

উদয়নের প্রধানা মহিষী বাসবদত্তা অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের কন্যা ছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে ইনি চণ্ড-প্রদ্যোৎ, ভাসের নাটকে প্রদ্যোৎ মহাসেন এবং কথাসরিৎ-সাগরে চণ্ডমহাসেন নামে আখ্যাত হইয়াছেন।

প্রদ্যোৎ যে তৎকালের একজন প্রবল পরাক্রান্ত নর-পতি ছিলেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক রাজগণের মধ্যে তিনিই যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন সে কথা পূর্ব্বেই একবার বলা হইয়াছে। কথা-সরিৎসাগরে আছে যে সাধারণের অসাধ্য অনেক কর্ম্ম করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার চণ্ডমহাসেন নাম হইয়াছিল; স্বপ্নবাসবদত্তায় বাসবদত্তা বলিতেছেন যে তাঁহার পিতার বহু সৈন্য ছিল বলিয়া মহাসেন সংজ্ঞা হইয়াছে, যথা "তস্ত বল পরিমাণানির্ব্বৃত্তং নামধেয়ং মহাসেন ইতি।" পালি গ্রন্থে কোপন স্বভাবের জন্যই প্রদ্যোতের চণ্ড নাম হইয়া-ছিল বলা হইয়াছে। মহাবগ্‌গ (৮, ১, ২৩) হইতে তাঁহার কোপন স্বভাবেরও ধর্ম্মাধর্ম্মহীনতার যে পরিচয় পাওয়া যায় ধর্ম্মপদের টীকা (২১-২৩) হইতে তাহা সমর্থিত হয়। পুরাণগ্রন্থেও প্রদ্যোৎ "ন্যায়বর্জ্জিত" বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন।

---

* স্কন্দ পুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, সেতুমাহাত্ম্য, পঞ্চম অধ্যায় এবং কথা-সরিৎসাগর ৯ম ও ১০ম তরঙ্গ।

একদা প্রদ্যোৎ তাঁহার সভাসদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁহার অপেক্ষা অধিকযশা অপর কোন রাজা আছেন কি না। সকলেই একবাক্যে বলিল অবন্তীপতির যশের তুলনা হয় না। চর শুধু প্রথমে নিজের অভয় কামনা করিয়া বলিল কেহ কেহ কহিয়া থাকে যে নৃপতিবৃন্দের মধ্যে কৌশাম্বীরাজ উদয়নের তুলনা হয় না। এই কথায় কোপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া প্রদ্যোৎ কৌশাম্বী রাজ্য আক্রমণের সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু মন্ত্রীরা তাঁহাকে পরামর্শ দিল যে বৎস-রাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণায় তেমন সুবিধা হইবে না; তদপেক্ষা তাঁহাকে কৌশলে বন্দী করাই শ্রেয়। উদয়ন মন্ত্রসিদ্ধ ছিলেন অর্থাৎ মন্ত্র প্রভাবে বন্যহস্তী বশ করার তাঁহার ক্ষমতা ছিল। তাঁহার ঘোষবতী বংশীর শব্দে হস্তীরা আকৃষ্ট হইয়া মুগ্ধ হইলে রাজা তাহাদের বন্দী করিতেন, যথা "স উদয়নো যৌগন্ধরায়ণপ্রমুখেষু মন্ত্রিষু রাজ্য-ধুরং সমর্প্য সুখেষ্বেব একান্ততৎপরঃ সদা মৃগয়াং সিষেবে অবাদয়চ্চ তাং বাসুকিদত্তাং ঘোষবতীং বীণাম্। তস্যাশ্চ বীণায়াঃ কালনির্হ্রাদেন মোহমন্ত্রেণেব বশীকৃতান্ বন্যান্ মত্তদ্বিপান্ সংযম্য গৃহমানয়ৎ" (কথাসরিৎসাগর ১১শ তরঙ্গ)।

উদয়নের মৃগয়াস্পৃহার পরিচয় জানিতেন বলিয়াই প্রদ্যোৎ এবং তদীয় অনুচরবর্গ বৎসরাজকে ঐ উপায়ে বন্দী করিবেন স্থির করিলেন। প্রদ্যোতের আদেশে একটি কৃত্রিম হস্তী প্রস্তুত করা হইল। উহা এরূপ সুকৌশলে প্রস্তুত করা হইয়াছিল যে দেখিলে কৃত্রিম বলিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না। উহার অভ্যন্তরে বহু সংখ্যক অস্ত্রধারী মহাযোদ্ধা লুক্কায়িত রহিল। অনন্তর উভয় রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রদেশে অরণ্য মধ্যে হস্তিমূর্ত্তি রাখিয়া আসা হইল। উদয়ন চর-মুখে হস্তীর সংবাদ পাইয়া তাহা ধরিতে গিয়া যথাসাধ্য আত্মরক্ষার পর অবন্তী-সৈন্যহস্তে বন্দী ও উজ্জয়িনীতে নীত হইলেন। পালি গ্রন্থে আছে যে প্রদ্যোৎ প্রথমে উদয়নের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। পরে এই সর্ত্তে তাঁহাকে প্রাণ ও রাজ্য ফিরাইয়া দিতে চাহিলেন যে তিনি তাঁহাকে করী বশ করিবার মন্ত্র শিখাইবেন। প্রদ্যোৎ যদি শিষ্যের মত জানু পাতিয়া বসিয়া শিক্ষা করেন তবেই উদয়ন তাঁহাকে মন্ত্র শিখাইবেন বলিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অবন্তীরাজ পুনরায় উদয়নের বধ-দণ্ড দিবেন স্থির করিলেন। উদয়ন কিন্তু অবিচলিত ভাবেই উত্তর করিলেন, "আপনার যাহা অভিরুচি হয় করিতে পারেন, আমার শরীর আপনার আয়ত্তে বটে কিন্তু মন নহে।" যাহা হউক প্রদ্যোৎ উদয়নের বধ-দণ্ড দিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যদি অপর কেহ শিষ্যভাবে তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতে চায় তবে তাহাকে তিনি শিক্ষা দিতে প্রস্তুত আছেন কি না। উদয়ন অসম্মত না হইলে পরে প্রদ্যোৎ তাঁহাকে জানাইলেন এক কুদর্শনা কুব্জা যবনিকার অন্তরাল হইতে শিষ্যভাবে তাঁহার নিকট মন্ত্র শিক্ষা করিবে, সে স্ত্রী-লোক তাই তাঁহার নিকট আসিবে না। তাহার পর প্রদ্যোৎ তাঁহার কন্যা বাশুলদত্তাকে (বাসবদত্তা) বলিলেন যে এক বামন পর্দ্দার বাহির হইতে তাঁহাকে হাতী বশ করিবার মন্ত্র শিক্ষা দিবে; রাজকন্যাকে তাহা শিখিয়া পিতাকে বলিতে হইবে। কিন্তু কৌতূহল বশতঃ বাশুল যেন কখনও সেই বামনকে দেখিবার চেষ্টা না করেন তাহা হইলে মন্ত্র প্রভাব ব্যর্থ হইবে। উদয়ন ও বাসবদত্তা উভয়ে প্রদ্যোতের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অবন্তীরাজ ভাবিলেন এইরূপে উভয়ের প্রকৃত পরিচয় উভয়ের নিকট গোপন থাকিবে।

এইবারে অনেকদিন কাটিয়া গেল। বাসবদত্তার কিন্তু বামনের নিকট মন্ত্র শেখা ভাল লাগে না; তাঁহার আর মন্ত্র কিছুতে আয়ত্ত হয় না। একদিন রাজকন্যা মন্ত্র বলিতে কেবলই ভুল করিতেছেন। উদয়নের আর ধৈর্য্য থাকে না। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কুঁজী ত, তার নিকট আর কি আশা করা যায়?" বাসবদত্তাও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "বামন হইয়া আমাকে কুঁজী বলে এত স্পর্দ্ধা কার রে?" তাহার পর যবনিকা সরাইয়া উভয়ে উভয়কে দেখিলেন, তাঁহাদের পরিচয় হইল, প্রদ্যোতের ছলনা ধরা পড়িয়া গেল।

অনন্তর উভয়ে পলায়নের এক পরামর্শ করিলেন। উদয়ন প্রদ্যোৎকে বলিয়া পাঠাইলেন যে মন্ত্র শিক্ষাদান সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু মন্ত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য সাধিকাকে অমাবস্যা রাত্রে এক গাছের শিকড় আহরণ করিতে হইবে। দূরে জঙ্গলে সে গাছ পাওয়া যায় এবং অন্য কাহারও দ্বারা সে

বৎসরাজ উদয়ন

শ্রীঅমূজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাজ হইবার নহে। তাই শিকড় তুলিতে যাইবার জন্য রাজার বদ্রু হাতীটা দিতে হইবে। প্রদ্যোৎ সম্মত হইলেন।

অমাবস্যার দিন প্রদ্যোৎ মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। ইহাতে পলাতকদের সুবিধাই হইল। সে রাত্রিতে আবার ঘোর দুর্য্যোগ, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাতে প্রথমটায় কেহই উদয়ন ও বাসবদত্তার পলায়নের কথা জানিতে পারে নাই। মৃগয়া অন্তে পরদিবস প্রাতে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রদ্যোৎ শুনিলেন যে উদয়ন ও বাসবদত্তা রাত্রিতে শিকড় আনিতে গিয়া তখনও ফেরেন নাই। তাঁহার মনে স্বতঃই সন্দেহের উদ্রেক হইল। তখনই পলাতকদের ধরিবার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হইল। তাহারা যখন উদয়নের হস্তীর খুব নিকটবর্ত্তী হইল তখন বাসবদত্তা উপর হইতে দুই তোড়া স্বর্ণমুদ্রা সৈন্যদের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। সৈন্যরা কাড়াকাড়ি করিয়া স্বর্ণ কুড়াইতে লাগিল; ইত্যবসরে উদয়নের হস্তী অনেকদূর চলিয়া গেল। পরে সৈন্যরা পুনরায় নিকটে আসিবামাত্র উদয়ন আবার মুদ্রা বর্ষণ করিলেন এবং সেই অবসরে আরও কিছুদূর পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন। অবশেষে সব স্বর্ণ-খণ্ড হস্তগত করিয়া অবন্তীসৈন্য যখন আবার পলাতকদের আসিয়া ধরিল তত্তক্ষণে কৌশাম্বীর দুর্গচূড়া নয়নগোচর হইয়াছে। উদয়ন বংশীধ্বনি করিবামাত্র দলে দলে বৎস-সৈন্য নগর প্রাকার হইতে বাহির হইয়া তাহাদের নৃপতির রক্ষার্থ অগ্রসর হইল। তখন আর জয়াশা নাই দেখিয়া অবন্তীসৈন্য পশ্চাৎপদ হইল। তাহার পর মহাসমারোহে বাসবদত্তা রাজমহিষী পদে বৃতা হইলেন।

পালি সাহিত্যে বর্ণিত কাহিনী এইরূপ। এবার দেখা যাউক সংস্কৃত সাহিত্যে এ বিষয়ে কি আছে। প্রতিজ্ঞাযৌ-গন্ধরায়ণ নাটক, উদয়ন ও বাসবদত্তার পরিণয় কাহিনী লইয়া রচিত; তদ্ভিন্ন কথাসরিৎসাগরেও তাহার বিবরণ আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত কাহিনার এক হিসাবে পালি সাহিত্যের কাহিনীর সহিত কতকটা পার্থক্য দেখা যায়। প্রতিজ্ঞাযৌ-গন্ধরায়ণ এবং কথাসরিৎসাগর উভয় গ্রন্থেই প্রদ্যোতের উদয়নকে মৃগয়া ব্যপদেশে বন্দীকরণের অন্যরূপ কারণ প্রদত্ত হইয়াছে। আপন কন্যা বাসবদত্তার উদয়নের সহিত বিবাহ প্রদানই অবন্তীরাজের অভিপ্রেত ছিল; কিন্তু পাছে সে অনুরোধ করিলে অবমাননা বোধে বৎসরাজ অসম্মত হন সেই ভয়েই প্রদ্যোৎকে এত কৌশলজাল বিস্তার করিতে হইয়াছিল। যথা "উজ্জয়িনীপতি চণ্ডমহাসেনঃ অচিন্তয়ৎ মম দুহিতুর্বাসবদত্তায়াস্তুল্যো ভর্ত্তানৈব ভুবি বিদ্যতে, কেবলমেকঃ উদয়নোঽস্তি স তু মদ্বিপক্ষঃ, তৎ কথং স মে জামাতা বশ্যশ্চ ভবেৎ; একএবাত্র উপায়োঽস্তি যদসৌ মৃগয়াবিহারী একাকী দ্বিরদান্ বধ্নন্ বিচরতি অনেন ছিদ্রেণ যুক্ত্যা চ তমবষ্টভ্য গৃহমানয়ামি, আনীতঞ্চ কৌশলেন সুতয়া সহ গান্ধর্ব্ব বিধিনা সঙ্গতং করোমি, এবং কৃতে অবশ্যমেব অন্যাং মে দুহিতরি তস্য স্নেহঃ সম্ভবিষ্যতি।" *

"চণ্ডমহাসেনশ্চ ব্যচিন্তয়ৎ বৎসরাজ অতীব মানী নাত্রায়াতি কন্যাপি ময়া ন প্রেষণীয়া তথা হ্যে লাঘবং ভবেৎ তস্মাৎ কৌশলেন তং বদ্ধা নৃপমিহানেষ্যামি। ‡

মহাসেন প্রদ্যোতের সহিত বেশ ভাল ব্যবহারই করিয়াছিলেন। তিনি বাসবদত্তাকে উদয়নের নিকটে গান্ধর্ব্ববিদ্যা শিখিতে দিয়াছিলেন। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ যখন জানিতে পারিলেন উদয়ন প্রত্যাসন্ন নৃপতির করে বন্দীদশায় আছেন তখন তিনি তাঁহার মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করিতে সচেষ্ট হইলেন। যৌগন্ধরায়ণ ছদ্মবেশে উজ্জয়িনী আগমন করিয়া কৌশলে বৎসরাজের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি দেখিলেন উদয়নের উদ্ধার সাধন কার্য্য বেশ একটু জটিল ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে কারণ তিনি ইতিমধ্যে প্রদ্যোৎ দুহিতার প্রেমে পড়িয়াছেন এবং বাসবদত্তাও পিতৃপক্ষবিমুখী ও বৎসেশ্বর-প্রতি গাঢ় অনুরাগবতী হইয়াছেন। যাহা হউক অবশেষে তিনি একটা পরামর্শ করিলেন। তাঁহার পক্ষীয় এক ব্যক্তি ছদ্মবেশে বাসবদত্তার হস্তীপক সাজিল— নির্দ্দিষ্ট দিনে বাসবদত্তার ভদ্রবতী নামক হস্তিনীতে আরোহণ করিয়া উদয়ন ও বাসবদত্তা পলায়ন করিলেন। পশ্চাৎ হইতে যৌগন্ধরায়ণ এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী যোদ্ধৃগণ অবন্তীসৈন্যকে বাধা প্রদান করিয়া পলাতকদের রক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রদ্যোৎ পলাতকদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন,

---

* কথাসরিৎসাগর ১১শ তরঙ্গ।

‡ কথাসরিৎসাগর ১২শ তরঙ্গ।

যৌগন্ধরায়ণ সদলবলে বন্দী হন। পরে সত্যঘটনা প্রকাশ পাইলে সকলের মিলন হইল।

কথাসরিৎসাগরের আখ্যানের শেষাংশ অনেকটা অন্যরূপ। উদয়নের পলায়নে সন্তুষ্ট হইয়া মহাসেন প্রতিহারযোগে তাঁহাকে বলিয়া পাঠান, উদয়ন যে নিজেই বাসবদত্তাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন তাহা তিনি খুব ভালই করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যেই তিনি উদয়নকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; অবমাননাশঙ্কায় তিনি আর স্বয়ং বাসবদত্তাকে তাঁহার করে সমর্পণের প্রস্তাব করিতে সাহস করেন নাই। অতঃপর বাসবদত্তার ভ্রাতা গোপালক কৌশাম্বীতে আসিয়া উদয়নের সহিত ভগিনীর যথাশাস্ত্র বিববাহকার্য্য নিষ্পন্ন করিলেন। (কথাসরিৎসাগর ১১-১৪ শ তরঙ্গ) পালি এবং সংস্কৃত উভয়বিধ সাহিত্য-বর্ণিত আখ্যানদ্বয়ের তুলনায় আলোচনা করিলে প্রথমোক্ত কাহিনী যে দ্বিতীয়টী অপেক্ষা মনোরম ও স্বাভাবিক এবং অনেক পরিমাণে হৃদয়স্পর্শী তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। উদয়ন-চরিত্রের যে বৈশিষ্ট ইহাতে ফুটিয়াছে অপরটীতে তাহার একান্তই অভাব দেখা যায়।

বৌদ্ধজাতক গ্রন্থে উদয়নের হস্তীর সাহায্যে প্রাণরক্ষার উল্লেখ দেখা যায়। ভদ্দবটিকা নামক একটী করিণীর জন্যই উদয়নের প্রাণ, মহিষী তথা রাজ্য রক্ষা পাইয়াছিল বলিয়া উক্তগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে (জাতক ৩-৩৮৪)।

উদয়ন কর্ত্তৃক অবন্তীরাজকন্যা বাসবদত্তার হরণ ব্যাপার যে দীর্ঘকাল ধরিয়া লোকের স্মৃতিপটে ছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কালিদাসের মেঘদূতেও ঐ ঘটনার উল্লেখ আছে। উজ্জয়িনীনগরীর প্রসঙ্গে যক্ষ মেঘকে বলিতেছে—

প্রাপ্যাবন্তীমুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্।
পূর্ব্বোদিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্॥
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিনাং গাং গতানাম্।
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেবকম্॥ ৩১

"যে স্থানের গ্রামবৃদ্ধগণ উদয়ন নৃপতির বৃত্তান্তে অভিজ্ঞ সেই অবন্তীজনপদ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব কথিত শ্রীসম্পন্ন বিশালা নগরীতে গমন করিবে। ঐ নগরী যেন স্বর্গেরই এক অংশ; পুণ্যফল ক্ষীণ হওয়ায় মর্ত্ত্যধামে প্রবিষ্ট স্বর্গবাসীদের ভুক্তাবশিষ্ট পুণ্যফলে ভূতলে আনীত হইয়াছে।

বিশালাপুরী উজ্জয়িনীরই নামান্তর। গঙ্গার উত্তর তীরবর্ত্তী অপর বিশালাপুরী বা বৈশালী হইতে ইহা সম্পূর্ণই ভিন্ন। মল্লিনাথ "উদয়নকথাকোবিদা" পদের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"উদয়নস্য বৎসরাজস্য কথানাং বাসবদত্তাহরণাদ্যদ্ভুতোপাখ্যানানাং কোবিদা শুশ্রুজ্ঞাঃ।"

মহারাজ শ্রীহর্ষবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত বাণভট্টের হর্ষচরিতে সমসাময়িক বৃত্তান্ত ব্যতীত পূর্ব্বতনযুগেরও বহু ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবেশিত আছে, সে কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। শিশুনাগ বংশীয় কাকবর্ণ, সুঙ্গবংশীয় পুষ্যমিত্র, সুমিত্র, মিত্রদেব, কাণ্বংশীয় বাসুদেব, গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি অনেকানেক ঐতিহাসিক ব্যক্তি সম্বন্ধে ইহাতে নানা কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উদয়নের কৃত্রিম হস্তী মধ্যে লুক্কায়িত মহাসেনের সৈন্য হস্তে বন্দী হওয়ার কথাও আছে।

পৈশাচী বৃহৎকথার রচয়িতা গুণাঢ্য প্রতিষ্ঠানের সাতবাহন বা অন্ধ্ররাজের সভাসদ ছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দী উহার রচনাকাল বলিয়া অনেকে মনে করেন। বর্ত্তমানে মূলগ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। শুধু অনুবাদ হইতেই ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে তথ্য লইয়া সকলকে নিবৃত্ত হইতে হয়। সোমদেব স্পষ্টই বলিয়াছেন যে ভাষান্তর এবং তদানুসঙ্গিক পরিবর্ত্তন ব্যতীরেকে তিনি নিজ গ্রন্থে নূতন কিছুই সংযোজন করেন নাই। বৃহৎকথামঞ্জরী মূল গ্রন্থের কয়েকটী আখ্যায়িকার সঙ্কলনমাত্র। এই দুইটি গ্রন্থ ব্যতীত পৈশাচী বৃহৎকথার আরও দুইটি অনুবাদ আছে। তন্মধ্যে প্রথমটী নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছে, অপরটী তামিল ভাষায় রচিত। উহার নাম উদয়ন কদাই বা পেরুঙ্গদাই। কেহ কেহ মনে করেন খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভযুগ শেষোক্তটীর রচনাকাল। সে হিসাবে বৃহৎকথার রচনাকাল খ্রীষ্ট পূর্ব্ব শতাব্দীতে গিয়া পড়ে। সে যাহা হউক বৃহৎকথার কাল নির্ণয় বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বিভিন্ন

শ্রীঅমূল্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগের এই সকল বিভিন্ন গ্রন্থে একই বিষয়ের উল্লেখ দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে উদয়ন ও বাসবদত্তার কথা দীর্ঘকাল জনসমাজে প্রচলিত ছিল—তাই কালিদাসের বহু পরবর্ত্তী মল্লিনাথকে ঐ কথার ব্যাখ্যা করিতে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় নাই।

এবারে স্বপ্নবাসবদত্তার কথা বলা যাইতেছে। উদয়নের আরুণি রাজার সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল। এই আরুণি গঙ্গার উত্তরতীরবর্ত্তী প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। রত্নাবলীতে কোশলের সহিত বৎসরাজের যুদ্ধের কথা আছে। বৎসদেশ গঙ্গার দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। সুতরাং আরুণিকে কোশলের নৃপতি বা কোন সামন্ত রাজা বলিয়াই মনে হয়। আরুণি রাজার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে তিনি যে নিতান্ত নগণ্য শত্রু ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। যুদ্ধের প্রথমটায় উদয়ন পরাজিত হন, তিনি সীমান্ত প্রদেশে লাবণক নামক স্থানে পলায়ন করেন এবং তাঁহার রাজ্য বিপক্ষ কর্ত্তৃক মর্দ্দিত হয়। বিপক্ষ এত ঘনীভূত হইয়া দেখা দেয় যে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বুঝিলেন যে অবন্তী হইতে সাহায্য পাওয়া গেলেও তাহা শত্রু পরাজয়ের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে না। কোনও সিদ্ধপুরুষের নিকট হইতে তিনি অবগত হন যে যদি উদয়ন মগধরাজ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতীর পাণিপীড়ন করেন তবেই তিনি পুনরায় রাজ্য লাভ করিতে পারিবেন। তাই তিনি মগধরাজ ভগিনীর সহিত উদয়নের বিবাহ দিতে চেষ্টান্বিত হইলেন। উদয়ন কিন্তু বাসবদত্তাকে এত ভালবাসিতেন যে তাঁহার বর্ত্তমানে অপর কাহাকেও বিবাহ করিতে চাহিবেন না মন্ত্রী মহাশয় সে কথা বুঝিতেন। তাই তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। নৃপতির অনুপস্থিতিকালে পূর্ব্বকৃত পরামর্শানুসারে বাসবদত্তাকে লইয়া যৌগন্ধরায়ণ গোপনে প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গেলে পরে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইল। সকলেই জানিল উঁহারা অগ্নিদাহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সকল কথা শুনিয়া বৎসরাজ শোকসাগরে মগ্ন হইলেন। ইতিমধ্যে বাসবদত্তাকে লইয়া মন্ত্রী মগধদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে বাসবদত্তাকে আপন ভগিনী পরিচয় দিয়া পদ্মাবতীর নিকট তাঁহার অবস্থিতির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ঘটনাচক্রে উদয়নকে একবার মগধে আসিতে হয়। তিনি রাজা, তায় বিপত্নীক, শোকেরও তীব্রতা বোধ হয় তাঁহার তখন কতকটা কমিয়াছিল। তাই আর পদ্মাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহের কোন বাধা রহিল না। তাহার অল্পকাল পরেই, উদয়ন তখনও মগধ রাজধানী ত্যাগ করেন নাই, সংবাদ আসিল সেনাপতি রুমণ্বৎ বৎসজনপদ হইতে আরুণিকে গঙ্গার অপর পারে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অতঃপর উদয়ন মাগধ সৈন্য সাহায্য লইয়া গিয়া রুমণ্বতের সহিত মিলিত হইলেন। স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি মন্ত্রী ও মহিষীকে পুনঃপ্রাপ্ত হন।

পদ্মাবতীর সহিত উদয়নের বিবাহের কথা কথাসরিৎসাগরে আছে। স্বপ্নবাসবদত্তার সহিত তাহার অনেকাংশে পার্থক্য দেখা যায়। লাবণক প্রদেশে প্রাসাদে অগ্নি প্রদান ও বাসবদত্তার গোপনে অবস্থানের কারণ তাহাতে অন্যরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। বাসবদত্তার সহিত বিবাহের পর উদয়ন "বাসবদত্তামুখাসক্তমনাঃ অহর্নিশং কেবলমানন্দমনুভবন্ বিজহার" রাজকার্য্যের ভার মন্ত্রিগণের উপর রহিল। একদিন যৌগন্ধরায়ণ রুমণ্বতকে বলিলেন, "পাণ্ডববংশসম্ভূত উদয়নের সমগ্র মেদিনীর অধীশ্বর হওয়ার কথা কিন্তু তিনি রাজকার্য্য একেবারেই দেখেন না, তাঁহার জয়াশা একেবারে নাই। কিন্তু আমরা যখন তাঁহার শুভানুধ্যায়ী তখন যাহাতে তাঁহার সে দিকে মতি হয় আমাদের সে চেষ্টা করা উচিত। পূর্ব্বে একবার আমি রাজার জন্য মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর কর প্রার্থনা করিয়াছিলাম। কিন্তু বাসবদত্তা বর্ত্তমানে মগধরাজ পদ্মাবতীকে উদয়নের হস্তে দিবেন না বা উদয়নও অন্য বিবাহ করিবেন না। অতএব দেবী দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এইরূপ রটাইতে পারিলে সবদিকেই সুবিধা হয়। পরে মগধরাজ রাজশ্বশুর হইলে আর জামাতার উপর কিছু রাগ করিয়া থাকিতে পারিবেন না, বরং তাঁহার সহায়ই হইবেন। আমরা পূর্ব্বদিক এবং ক্রমে তাহার পর অন্যান্য দিকও জয় করিতে যাইব।" অনেক তর্কবিতর্কের পর রুমণ্বৎ যৌগন্ধরায়ণের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তাঁহার ইচ্ছায় বাসবদত্তার ভ্রাতা গোপালককেও সকল কথা জ্ঞাপন করা হইল। রাজহিতৈষী গোপালক ভগ্নীর পক্ষে কষ্টকর হইবে জানিয়াও

সেই সকল অনুমোদন করিলেন কারণ "কার্য্যৈকপ্রবণং হি মনীষিণাং চেতঃ"।

অনন্তর একদিন মগধরাষ্ট্রের সীমান্তবর্ত্তী লাবণক প্রদেশে অবস্থানকালে মৃগয়া ব্যপদেশে উদয়নের অনুপস্থিতি সুযোগে গোপালক, প্রভৃতি বাসবদত্তাকে সকল কথা জানাইলেন। স্বামী অনুরক্তা বাসবদত্তা উদয়নের মঙ্গলের জন্য নিজের সকল দুঃখ ক্লেশ ভুলিয়া তাহাদের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। অনন্তর যৌগন্ধরায়ণ ও বসন্তক ব্রাহ্মণবালা বেশিনী বাসবদত্তাকে লইয়া গোপনে প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া মগধ রাজধানীতে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণবেশী যৌগন্ধরায়ণ নিজ কন্যা অবন্তিকা এই পরিচয় দিয়া রাজকন্যা পদ্মাবতীর নিকট বাসবদত্তাকে সযত্নে রক্ষা করিবার ভার দিয়া রাখিয়া দিলেন; বসন্তক'ও তাঁহার নিকট ছদ্মবেশে রহিলেন। বাসবদত্তা প্রভৃতি প্রাসাদ ত্যাগ করিবার পর রুমণ্বৎ তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন—সকলেই জানিল অগ্নিদাহে বাসবদত্তা ও বসন্তক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

উদয়ন মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সকল কথা জানিয়া গভীর শোকসাগরে মগ্ন হইলেন। বাসবদত্তা বিহনে জীবন বৃথা ভাবিয়া তিনি দেহত্যাগ করিতে স্থির করিলেন। এমন সময়ে তাঁহার নারদের বাক্য মনে পড়িল। দেবর্ষি বলিয়াছিলেন বাসবদত্তার গর্ভে তাঁহার বিদ্যাধরাধিপ পুত্র হইবে কিন্তু তাঁহাকে কিছু ক্লেশ পাইতে হইবে। সে কথা ত মিথ্যা হইবার নহে। গোপালকও ত ভগিনীর জন্য বিশেষ শোক করিতেছে না, যৌগন্ধরায়ণেরও শোক অল্পই বোধ হইতেছে। তবে বোধ হয় বাসবদত্তা জীবিত আছে, তাহার সহিত আমার আবার মিলন হইবে; এটা বোধ হয় মন্ত্রীদের কারসাজি। এই সকল কথা পর্য্যালোচনা করিয়া উদয়ন কোন মতে ধৈর্য্যধারণ করিয়া রহিলেন।

মগধরাজের আর উদয়নের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে কোনই আপত্তি ছিল না। শুভলগ্নে উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল। বৎসরাজ নববধূ লইয়া লাবণকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, বাসবদত্তাও পদ্মাবতী সমভিব্যাহারে আসিয়া ভ্রাতা গোপালকের গৃহে আশ্রয় লইলেন। বৎসরাজ একদা পদ্মাবতীর নিকট অম্লানমালাতিলক দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহার প্রাপ্তি জিজ্ঞাসা করিলেন। পদ্মাবতী সকল কথা বলিলে তিনি বুঝিলেন যে আবন্তিকাই তাঁহার বাসবদত্তা। তখন সকল কথা প্রকাশ পাইল। যৌগন্ধরায়ণ তাঁহারই মঙ্গলের জন্য এ সকল করিয়াছেন জানিয়া রাজা তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। মাৎসর্য্যবিহীনা বাসবদত্তাও পদ্মাবতীকে ভগিনী সম্ভাষণ করিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন—রাজাও দুই মহিষী লইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। (কথাসরিৎসাগর ১৫শ ও ১৬শ তরঙ্গ)

স্বপ্নবাসবদত্তাবর্ণিত পদ্মাবতী-উদয়নের বিবাহ কাহিনীর সহিত, কথাসরিৎসাগরের কাহিনীর তুলনা করিলে প্রথমোক্তের শ্রেষ্ঠতা অবিসংবাদীরূপে প্রতিপন্ন হয়। শেষোক্ত আখ্যায়িকায় যে মূল কাহিনীর সৌন্দর্য্যহানি ও অসংলগ্নতা তথা উদয়নচরিত্রের খর্ব্বতা ঘটিয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

পুরাণে দর্শক (দের্ভক বা হর্ষক)। অজাতশত্রুর পুত্র এবং উদায়ী (উদয়ন বা উদয়াশ্ব) তাঁহার পৌত্র। মহাবংশ মতে উদায়ীভদ্র অজাতশত্রুর পুত্র। অনেকে মহাবংশ প্রদত্ত বংশতালিকাই বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া মনে করেন। কাহারও কাহারও মতে উদয়নের পক্ষে অজাতশত্রুর কন্যাকে বিবাহ করা সম্ভব ছিল না। তাঁহারা বলেন বুদ্ধদেব, বিম্বিসার, অজাতশত্রু ও উদয়ন সকলেই সমসাময়িক ব্যক্তি; সুতরাং উদয়ন বিম্বিসারের পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ধরিয়া লইলেও, সে সময় তাঁহার বয়স এত অধিক হইয়া পড়ে, যে সে সময়ে তাঁহার পক্ষে নায়ক সাজিয়া বিবাহ করা এবং ভাসের ন্যায় কবির পক্ষে তাঁহার প্রেমলীলা বর্ণনা করিয়া নাটক রচনা করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না,—অর্থাৎ ইঁহাদের মতে পদ্মাবতী, দর্শক প্রভৃতির ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ছিল না।* কেহ বা আবার মনে করেন যে মহাবংশোক্ত 'নাগদাসকই' পুরাণে দর্শক দাঁড়াইয়াছেন।

কিন্তু এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। স্বপ্নবাসবদত্তা মুদ্রারাক্ষসের ন্যায় নীরস রাজনৈতিক

* Dr. D. R. Bhandarkar 'Carmichael Lectures" Vl. I pp. 70-1

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটক নহে যে শুধুই শুষ্ক কূটনীতির প্রসঙ্গ উহাতে থাকিবে। আরও এক কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। উদয়নের প্রাদুর্ভাবের বহুকাল পরে ভাস নাটক রচনা করিয়াছিলেন, কাজেই রাষ্ট্রনৈতিক কারণে উদয়ন পদ্মাবতীকে বিবাহ করিলেও সে সময়ে কাহার কত বয়স হইয়াছিল, এবং উভয়ের মধ্যে কি প্রকার আকর্ষণ হইয়াছিল বা তাহা আদৌ হয় নাই এ সকল কথা ভাসের নাটকের মধ্যে আশা না করাই উচিত। বিশেষতঃ নায়ক নায়িকার প্রণয়লীলা বর্ণন করিতে কবি যে একেবারেই কল্পনার আশ্রয় লইবেন না এ আশাও সমীচীন নহে। এ কারণ স্বপ্নবাসবদত্তায় কবি, উদয়ন ও পদ্মাবতীকে পরস্পরের অনুরাগী করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহাদের বিবাহ ব্যাপার তথা দর্শকের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত একেবারে উড়াইয়া দেওয়া কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে।

উদয়ন-রাজার প্রেম কাহিনী লইয়া রচিত আরও দুইখানি নাটক আছে। প্রচলিত বিশ্বাসানুসারে কনৌজরাজ হর্ষবর্দ্ধন, রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকা নাটক দুইখানির রচয়িতা। আবার অপর এক মতে হর্ষের সভাকবি বাণ রত্নাবলী রচনা করিয়া স্বীয় প্রভুর নাম যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। নাটক-দুইখানি কাহার লেখনী প্রসূত সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে হর্ষবর্দ্ধনের সভাতেই উহারা রচিত।

রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকার অনেকস্থান স্বপ্নবাসবদত্তা ও কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়। রাজসভা ও অন্তঃপুরের প্রেমলীলা ব্যতীত নাটক দুইখানিতে আর কিছুই নাই—ইহাদের কার্য্যপরিসর অতীব সঙ্কীর্ণ। পূর্ব্বে সকলে মনে করিতেন মালবিকার আখ্যানবস্তুর অবিকল পুনরাবৃত্তি রত্নাবলীতে দৃষ্ট হয়। * তখনও ভাসের নাটকগুলি আবিষ্কৃত হয় নাই। এখন সকলেই জানেন যে রত্নাবলীর তথা মালবিকাগ্নিমিত্রের লেখক কাহার নিকট কি পরিমাণ ঋণী।

এবারে সংক্ষেপে রত্নাবলীর আখ্যান বলা যাইতেছে। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের ইচ্ছা ছিল যে সিংহল রাজকন্যা রত্নাবলীর সহিত উদয়নের বিবাহ হয়। কারণ তিনি এক ভবিষ্যৎদ্রষ্টার সাহায্যে জানিতে পারিয়াছিলেন যে যিনি রত্নাবলীর পাণিপীড়ন করিবেন তিনি সার্ব্বভৌম নরপতি হইবেন। কাজটী কিন্তু নিতান্ত সহজ ছিল না। মন্ত্রীবর জানিতেন সিংহলরাজ বিক্রমবাহু নিজ কন্যাকে ভাগিনেয়ী বাসবদত্তার সপত্নী করিয়া দিতে একেবারেই অনিচ্ছুক। তদ্ভিন্ন বাসবদত্তা যেরূপ প্রকৃতির রমণী এবং উদয়ন তাঁহার যেরূপ বশ তাহাতে বৎসরাজের পক্ষে অপর কাহাকেও বিবাহ করা সম্ভব নহে। সেজন্য তিনি কৌশল করিয়া রটাইয়া দিলেন যে উদয়ন যখন বৎস জনপদ ও মগধরাষ্ট্রের মধ্যবর্ত্তী লাবণক প্রদেশে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন সেই সময়ে প্রাসাদে অগ্নিকাণ্ডে বাসবদত্তা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। জনরব সিংহলে পৌঁছিবার অনতিকাল পরেই মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ প্রেরিত দূত গিয়া রাজার নিকট বৎসরাজের নিমিত্ত তদীয় কন্যা রত্নাবলীর কর প্রার্থনা করিল। বিক্রমবাহু সম্মত হইয়া রত্নাবলীকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে একটা বাধা দূর হইল। কিন্তু দ্বিতীয় অন্তরায়ের কোনই উপায় হইল না। তাই মন্ত্রীকে আবার একটা কৌশল করিতে হইল। রত্নাবলী যে পোতারোহণে সমুদ্র পার হইতেছিলেন তাহা জলমগ্ন হইল এবং তিনি একাকিনী মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট প্রেরিতা হইলেন। যৌগন্ধরায়ণ তাঁহাকে সাগর তীরে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে এই পরিচয় রাজ্ঞীর নিকট পাঠাইলেন। বাসবদত্তা তাঁহাকে সাগরিকা নাম দিয়া আপন পরিচারিকাবর্গে আশ্রয় দিলেন। যৌগন্ধরায়ণের উদ্দেশ্য ছিল যে রাজান্তঃপুরে থাকিলে ক্রমে তিনি উদয়নের লক্ষ্য-পথে পড়িবেন। * এই অবস্থায় নাটকের আরম্ভ।

বাসবদত্তা সাগরিকার অসামান্য রূপলাবণ্য এবং উচ্চাঙ্গের ধরণধারণ দেখিয়া সর্ব্বদাই তাহাকে উদয়নের দৃষ্টিপথ হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেন। রত্নাবলীর বাসবদত্তা গম্ভীর এবং তেজস্বিনী, তিনি স্বামীকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন অথচ তাঁহাকে চঞ্চলপ্রকৃতি বলিয়া জানেন।

* Sylvain Levi's Le Theatre Indien এবং Une poesie unconnue de Roi Harsha Siladitya দ্রষ্টব্য।

* এই প্রসঙ্গে অশোকের জননী সুভদ্রাঙ্গীর কথা স্মর্ত্তব্য।

উদয়ন যে বাসবদত্তাকে ভালবাসেন তাহা ভয় ভক্তি ও শ্রদ্ধামূলক এবং তিনি যে অন্যবিধ প্রণয়াকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন তাহা কবি নাটকখানির সর্ব্বত্র যথেষ্ট নিপুণতা সহকারে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু বাসবদত্তার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইল। মদনমহোৎসবকালে সাগরিকা রাজাকে দেখিল এবং তাঁহার কন্দর্পোপম মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে স্বয়ং "ভঅবং কুসুমাউহ" মনে করিয়া পূজা করিল। পরে যখন জানিল তিনিই রাজা উদয়ন তখন সাগরিকা মনে ভাবিল "কহ অঅংসো রাআ উঅঅণোণাম। জস্স অহং তাদেণ দিণ্ণা। তা পরপ্পেসিতদূষিদংবি মে সরীর এ দস্স দংসণেন দাবিং বহুমতং সবুত্তং।"—এই কি সেই রাজা উদয়ন? যাঁহাতে আমি পিতা কর্ত্তৃক দত্তা। তবে পরদাসত্বে দূষিত হইলেও আমার শরীর অস্য ইঁহার দর্শনে গৌরবান্বিত হইল।"

ক্রমে উদয়নের সহিত সাগরিকার পরিচয় হইল এবং বিদূষক বসন্তকের সাহায্যে উভয়ের নিভৃতে সাক্ষাৎ করিবার আয়োজনও হইল। কিন্তু রাজ্ঞী ইতিমধ্যে সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন এবং ক্রোধান্ধ হইয়া সাগরিকাকে শৃঙ্খলিতা করিয়া রাখিলেন।

তিনি গোপনে সাগরিকাকে উজ্জয়িনী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। উদয়ন মহিষীকে সদয় হইবার নিমিত্ত অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না।

ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল বৎস সৈন্যেরা কোশলদিগের উপর বিজয়লাভ করিয়াছে। যুদ্ধের প্রথমটায় কোশলরাই জয়ী হইতেছিল, পরিশেষে সেনাপতি রুমন্বতের বীরত্বে ও যুদ্ধ-কৌশলে বিজয়লক্ষ্মী বৎসরাজের অঙ্কশায়িনী হইলেন।

শত্রু পরাজয়ের সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া উদয়ন বিজয়োৎসবের আদেশ দিলেন। এমন সময়ে সিংহলরাজ প্রেরিত দুইজন দূত বাভ্রব্য ও বসুভূতি রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের নিকট রত্নাবলী পোতমজ্জনে জলমগ্ন হইয়াছেন জানিয়া সকলেই ব্যথিত হইল। সহসা ভীষণ এক হাহাকার ধ্বনির মধ্যে সকলে সভয়ে শুনিল যে অন্তঃপুরে আগুন লাগিয়াছে। রাণী সাতঙ্কে বলিয়া উঠিলেন সাগরিকা পুড়িয়া মরিবে এবং তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলেন। উদয়ন প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড মধ্য হইতে সাগরিকাকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। তখনই আগুন নিভিল—বলা বাহুল্য ইহাও মন্ত্রী মহাশয়ের এক কৌশল। সিংহলদেশীয় দূতদ্বয় তাহাদের রাজকন্যার সহিত সাগরিকার আকারগত সৌসাদৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইল। তখন সব কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মন্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার কারসাজি আগাগোড়া খুলিয়া বলিলেন। বাসবদত্তা তখন মাতুল কন্যাকে ভগিনী বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন এবং সাদরে তাহাকে নৃপতির করে সমর্পণ করিলেন। বৎসরাজ এই মহদুপকারের জন্য যৌগন্ধরায়ণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন এবং স্বীয় শুভাদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "আর অপর কিসের প্রয়োজন হইতে পারে? বিক্রমবাহু আমার আত্মীয়, জগতের সারভূতা সাগরিকা আমারই, ভগিনী পাইয়া বাসবদত্তা সুখী, কোশলরা নির্জ্জিত আর আমার কামনা করিবার জগতে কি আছে? শুধু এই কামনা করি যে—

উর্ব্বীমুদ্দামশস্যাং জনয়তু বিসৃজন্বাসবো বৃষ্টিমিষ্টা,
মিষ্টৈস্ত্রৈর্ব্বিষ্টপানাং বিদধতু বিবিবৎপ্রীণনং বিপ্রমুখ্যাঃ।
আকল্পান্তঞ্চ ভূয়াৎ সমুপচিতসুখস্সঙ্গমঃ সজ্জানানাম্,
নিঃশেষা যান্তু শান্তিং পিশুনজনগিরো দুর্জ্জয়া বজ্রলেপাঃ।

—দেবরাজ যথাকালে পর্য্যাপ্ত বর্ষণে ধরণীকে প্রচুর শস্য-শালিনী করুন, ব্রাহ্মণরা যজ্ঞ সম্পাদন দ্বারা দেবগণের অনুকম্পা লাভ করুন, কল্পান্ত পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গ সকলের আনন্দবর্দ্ধন করুক এবং অসাধুদিগের চিকীর্ষ্যাবৃত্তি চির-কালের মতই শান্তিলাভ করুক।"

এবারে প্রিয়দর্শিকার আখ্যান বলা যাইতেছে। কলিঙ্গ-রাজের খুব ইচ্ছা যে প্রিয়দর্শিকাকে বিবাহ করেন। কিন্তু প্রিয়দর্শিকার পিতা অঙ্গরাজ দৃঢ়বর্ম্মা তাঁহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিলেন না। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কলিঙ্গরাজ দৃঢ়বর্ম্মাকে শাস্তি দিতে মনস্থ হইলেন। শীঘ্রই একটা সুযোগ মিলিল। উদয়নের একটা ক্ষণিক পরাজয়ের সুবিধা পাইয়া তিনি দৃঢ়বর্ম্মাকে আক্রমণ করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। প্রিয়দর্শিকা পিতৃবৈরী বিন্ধ্যকেতুর হস্তে বন্দী হইয়া রহিলেন। উদয়ন ক্রুদ্ধ হইয়া বিন্ধ্যকেতুকে

শ্রীঅতুলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শাস্তি দিবার জন্য সেনাপতি বিজয়সেনকে আদেশ দিলেন। এইখানে নাটকের আরম্ভ।

যুদ্ধে বিন্ধ্যকেতু পরাজিত হইলেন। তাঁহার প্রাসাদে একটি রোরুদ্যমানা যুবতীকে পাওয়া গেল। তাহাকে লইয়া গিয়া বাসবদত্তার পরিচারিকা শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেওয়া হইল, তাহার নাম হইল আরণ্যকা।

রাজা তাহার প্রেমে পড়িলেন এবং জানিতে পারিলেন আরণ্যকাও তাঁহার অনুরক্তা। বিদূষকের সাহায্যে উভয়ের মিলনের ব্যবস্থা হইল। বাসবদত্তা ও উদয়নের পুরাতন প্রেমকাহিনী লইয়া একটি নাটক বিরচিত হইল; রাজ-মহিষীর সম্মুখে তাহা অভিনীত হইবে। স্থির ছিল আরণ্যকা বাসবদত্তার, ও তাহার সখি রাজার ভূমিকা গ্রহণ করিবে। বিদূষকের পরামর্শে স্থির হইল রাজা নিজের ভূমিকায় অবতরণ করিবেন। এইরূপে প্রণয়িযুগলের মিলনের ব্যবস্থা হইল। রাজ্ঞী এ সব কিছুই জানিতেন না, কিন্তু অভিনয়ের বাস্তবতায় তাঁহার মনে সন্দেহ হইল। তিনি অনুসন্ধান করিয়া সমস্তই জানিতে পারিলেন এবং মহাক্রোধে আরণ্যকাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। রাজার অনুরোধ ও উপরোধ এবং মুক্তির সকল চেষ্টাই বিফল হইল।

এমন সময় সংবাদ আসিল যুদ্ধে কলিঙ্গরাজ পরাজিত এবং দৃঢ়বর্ম্মা স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। দৃঢ়বর্ম্মার কঞ্চুকী তাঁহার পক্ষ হইতে বৎসরাজকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে আসিয়া জানাইল যে প্রিয়দর্শিকাকে পাওয়া যায় নাই। ইতিমধ্যে অন্তঃপুর হইতে সংবাদ আসিল আরণ্যকা বিষপান করিয়াছে। মুমূর্ষুকে দেখিবামাত্র কঞ্চুকী তাহাকে নিরুদ্দিষ্টা রাজকন্যা প্রিয়দর্শিকা বলিয়া চিনিতে পারিল। বৎসরাজ তখন ঐন্দ্রজালিক উপায় অবলম্বনে প্রিয়দর্শিকাকে রক্ষা করিলেন। বাসবদত্তাও তখন আরণ্যকাকে ভগিনী বলিয়া চিনিতে পারিয়া তাহাকে রাজার হস্তে প্রদান করিলেন।

ইহা হইতে দেখা যাইবে যে নামগুলি বাদে প্রিয়দর্শিকার আখ্যানাংশ রত্নাবলীর সহিত অভিন্ন।

স্বপ্নবাসবদত্তা, রত্নাবলী এবং প্রিয়দর্শিকা তিনখানি নাটকেই যুদ্ধের প্রথমটায় উদয়ন পরাজিত হইয়াছিলেন দেখা যায়। স্বপ্নবাসবদত্তায় দেখি যে উদয়ন পরাজিত হইয়া লাবণ্যক প্রদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজ্য শত্রু কর্ত্তৃক মর্দ্দিত হইয়াছিল। রত্নাবলীতে আছে যে যুদ্ধের প্রথম দিকে কোশলরাজই জয়ী হইয়াছিল। প্রিয়দর্শিকায় দেখা যায় যে উদয়নের একটা ক্ষণিক পরাজয়ে সুযোগ পাইয়া কলিঙ্গরাজ দৃঢ়বর্ম্মাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন—এই ক্ষণিক পরাজয় কোশলদের হস্তেই ঘটে বলিয়া মনে হয়।

উদয়নের ক্ষণিক পরাজয়ের উল্লেখ কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রেও দেখা যায়। যথা,—"সমস্ততোঽনর্থান্ মূলেন প্রতি বুধ্যাৎ। অশক্যে সমুৎসৃজ্যাবগচ্ছেৎ। দৃষ্টা হি জীবতঃ পুনরাবৃত্তিঃ যথা সুযাত্রোদয়নাভ্যাম্।" (পৃঃ ৩৬০)

চারিদিক হইতে বিপদজালে বেষ্টিত হইলে রাজা তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করিবেন। সমর্থ না হইলে সব ছাড়িয়া পলায়ন করিবেন। কারণ প্রাণে বাঁচিলে তাঁহার পক্ষে সমস্তই পুনরুদ্ধার সম্ভবও হইতে পারে, যেমন সুযাত্র ও উদয়নের ক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল।

সংস্কৃত সাহিত্য হইতে উদয়নের বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী এই দুই মহিষীর নাম পাওয়া যায়। এখানে রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকার কথা ধরা যাইতেছে না। কারণ ঐ নাটক দুইখানি উদয়নের প্রাদুর্ভাবের প্রায় সহস্রাধিক বৎসর পরে ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তার অনুকরণে রচিত হইয়াছিল এবং সিংহলের উল্লেখ যে লেখকের নিজের সময়ের অবস্থা হইতে গৃহীত তাহা না বলিলেও চলে, কারণ উদয়নের কালে সিংহলের সহিত এ দেশের সম্পর্ক কতদূর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাও বিবেচ্য।

বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ হইতে উদয়নের তিন মহিষীর পরিচয় পাওয়া যায়, যথা বাশুলদত্তা (বাসবদত্তা), সামবতী (শ্যামাবতী) এবং মাগন্দিয়া (মাকন্দিকা)। শেষোক্তা ব্রাহ্মণ কন্যা ছিলেন। উদয়নের একটি অপকীর্ত্তির পরিচয় ঐ সকল গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। মহিষী শ্যামাবতীকে সকলেই শ্রদ্ধাভক্তি করিত, তাঁহার গুণে সকলেই মুগ্ধ। সেই শ্যামাবতী অগ্নিকাণ্ডে শিবির-মধ্যে সখিগণের সহিত দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। উদয়নের প্ররোচনাতেই নাকি ঐরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

দিব্যাবদানমালার দশম অবদানে উদয়ন মহিষীর অগ্নিদাহের কথা আছে। বুদ্ধদেবের কুলমাসান্ত নামক স্থানে অবস্থানকালে মাকন্দিক নামক জনৈক তপস্বী তাঁহাকে তদীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করে। ভগবান তথাগত তাহার কথায় সম্মত না হইলে মাকন্দিক তাহার পর বৎস রাজধানী কৌশাম্বী গেল এবং রাজা উদয়নের করে কন্যা সম্প্রদান করিল। একদা রাজা যুদ্ধ কার্য্যানুরোধে রাজধানী হইতে অনুপস্থিত আছেন সেই সুযোগে মাকন্দিক-কন্যা অন্তঃপুরে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল—তাহাতে শ্যামাবতী ও অপর পাঁচশত সপত্নী দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

উদয়ন বুদ্ধদেবকে তাঁহার এই পাঁচশত পত্নীর পূর্ব্বকথা জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান তথাগত এই আখ্যায়িকা বলিলেন "পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের পাঁচশত মহিষী ছিল। একদা তাহারা বনবিহারে গিয়াছিল। নদীতে স্নানের পর সকলে অত্যন্ত শীতার্ত্তা হইলে প্রধানা মহিষী বহ্নিসেবার জন্য নিকটস্থ একটি পর্ণ কুটিরে অগ্নি সংযোগ করিতে দাসীকে আজ্ঞা দিলেন। কুটিরটা জনৈক তপস্বীর, অগ্নিদাহে তাঁহার প্রাণ যাইতে পারে দাসী সে কথা বলিলেও মহিষী তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অন্যান্য রাণীরাও প্রধানা মহিষীর কথায় সায় দিল এবং সকলে মিলিয়া কুটিরটা ভস্মসাৎ করিয়া অগ্নিসেবা করিল। তপস্বী প্রজ্জলিত কুটির হইতে বাহির হইয়া যোগবলে শূন্যে উঠিলেন এবং অন্তঃরীক্ষ হইতে রাণীদের আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন সকলের অনুতাপ হইল এবং সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করিল যেন তাহারা এই পাপের উপযুক্ত ফল পায় এবং তাহার পর দিব্যজ্ঞান লাভ করে। শ্যামাবতী ও তাঁহার পাঁচশত সখি সেই পাঁচশত রাজমহিষী।"

কাশ্মীর দেশীয় কবি ক্ষেমেন্দ্রের বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতাতেও উদয়ন সম্বন্ধে একটী অবদান বা গল্প আছে। একদা রাজা উদয়ন পঞ্চশত মহিষী সমভিব্যাহারে উদ্যান ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে পঞ্চশত ভিক্ষু পুষ্প চয়নার্থ তথায় আগমন করিলেন। ভিক্ষুদের মধ্যে সকলেই কিছু আর সাধুপুরুষ নহে, কেহ কেহ রাণীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা তাহাদের হস্তপদাদি কাটিয়া ফেলিবার আদেশ দিলেন। বলা বাহুল্য রাজাজ্ঞা অবিলম্বেই প্রতিপালিত হইল। বিষম যন্ত্রণায় কাতর হইয়া ভিক্ষুগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। বুদ্ধদেব তখন ঐ স্থানের অদূরেই অবস্থান করিতেছিলেন। ভিক্ষুগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার মনে অনুকম্পা হইল। তাঁহার করুণাস্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে তাহাদের কাটা হাত-পা আবার জোড়া লাগিল। তখন বুদ্ধদেব সেই ভিক্ষুদের পূর্ব্ব ইতিহাস বলিলেন। *

উদয়ন বুদ্ধদেব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনি প্রথমটায় বৌদ্ধ হন নাই। বৌদ্ধগ্রন্থে তাঁহার ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের উল্লেখ আছে। চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়নসঙ্গের ভ্রমণ বিবরণ মধ্যেও উদয়নের বৌদ্ধধর্ম্মে ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

একদা বনোৎসবে গিয়া ভোজনের পর উদয়ন বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন সময়ে বৌদ্ধভিক্ষু পিণ্ডোল সেখানে আসিয়া ধর্ম্মের কথা তুলিলেন। রাজার পরিচারিকাগণ ক্ষণকালের জন্য তাঁহার চরণ সেবা ছাড়িয়া ভিক্ষুর নিকট তথাগতের উপদেশ বাণী শুনিতে গিয়াছিল। বিশ্রামসুখে ব্যাঘাত হওয়ায় ক্রুদ্ধ উদয়ন যতিবরের পৃষ্ঠে লাল পিঁপড়ার বাসা বাঁধিয়া দিতে আদেশ দিলেন। পিঁপড়ারা কামড়াইয়া তাঁহার পিঠ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া তুলিল। সৌম্য ভিক্ষু অবিচল থাকিয়া উদয়নের মঙ্গল কামনা করিয়া চলিয়া গেলেন। †

কথিত আছে এই ঘটনা রাজার মনে একটা গভীর রেখাপাত করে এবং এজন্য তিনি প্রায়ই অনুতাপ করিতেন। অবন্তীতে প্রদ্যোতের কারাগারে বন্দী থাকা কালে পিণ্ডোলের কথা প্রায়ই তাঁহার মনে পড়িত এবং তাহাতে নিতান্ত অবসাদের সময়ও তিনি মনে যথেষ্ট বল পাইতেন।

দীর্ঘকাল পরে পিণ্ডোলের সহিত তাঁহার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। সেই সময়ে পিণ্ডোল আত্মসংযম সম্বন্ধে তাঁহাকে

* বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা ১৬ সংখ্যক পল্লব বা কুঞ্জরাবদান

† মাতঙ্গ জাতক ৪, ৩৭৫

শ্রীঅমূল্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহার ফলে বুদ্ধদেব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে তাঁহার আস্থা হয় এবং তিনি মহিষী বাসবদত্তার সহিত বুদ্ধপদে আত্মসমর্পণ করেন। *

বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পর উদয়ন ঐ ধর্ম্মে প্রকৃতই বিশ্বাসী হইয়াছিলেন। তিনি বুদ্ধদেবের একটি চন্দনকাষ্ঠের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, কথিত আছে যে উহাই বুদ্ধদেবের প্রথম নির্ম্মিত মূর্ত্তি। উদয়নের প্রায় সহস্র বৎসর পরে হিউয়েনসঙ্গ কৌশাম্বী নগরে উদয়ন রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ একটি বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন "নগরে পুরাতন রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে ৬০ ফুট উচ্চ একটি বিহারের মধ্যে চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত একটি বুদ্ধমূর্ত্তি আছে—রাজা উদয়ন কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। দৈবশক্তিবলে মূর্ত্তি হইতে মধ্যে মধ্যে অনৈসর্গিক প্রভা নির্গত হয়। বিভিন্ন নৃপতি এই মূর্ত্তি নিজ নিজ রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য বহু প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু কেহই সফলকাম হইতে পারেন নাই। সেইজন্য সকলে ইহার আদর্শে গঠিত মূর্ত্তি পূজা করিয়া ইহাই উদয়ন রাজা নির্ম্মিত প্রকৃত মূর্ত্তি বলিয়া প্রচার করেন।"

তথাগতের পূর্ণ জ্ঞানলাভের পর তিনি জননী মায়াদেবীর মঙ্গলের জন্য ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন করিয়া তিন মাসকাল যাবৎ তাঁহার নিকটে প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সময় উদয়নরাজ তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সৌদ্গল্যায়নকে স্বীয় ঐশ্বরিক শক্তিবলে কোন শিল্পীকে স্বর্গে পাঠাইয়া বুদ্ধের শরীর চিহ্নসমূহ পর্য্যবেক্ষণ ও মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য অনুরোধ করেন। তথাগত পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পরে ঐ মূর্ত্তি উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। বুদ্ধদেব উহাকে বলিলেন, "ভবিষ্যতে অবিশ্বাসীদিগকে ধর্ম্মে দীক্ষিত ও ধর্ম্মপথে চালিত করাই তোমার কার্য্য রহিল।" †

হিউয়েনসঙ্গ খোটান দেশের পিমো নগরে তথাগতের জীবদ্দশায় উদয়ন রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ চন্দনকাষ্ঠের আর একটি দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। মূর্ত্তিটীর নিকট অলৌকিক ক্রিয়া দেখা যাইত এবং ভক্তিভরে তাহার নিকট মানস করিলে ইচ্ছা পূর্ণ হইত। পীড়িত ব্যক্তিরা তাহাদের যে অঙ্গে ব্যাধি, মূর্ত্তিটীর সেই অঙ্গ সুবর্ণ পত্রে আচ্ছাদন করিত এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের পীড়া আরোগ্য হইত। †

হিউয়েনসঙ্গ ভারতবর্ষ হইতে চীন দেশে যে সকল দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছিলেন তাহার মধ্যে উদয়ন নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তির আদর্শে গঠিত একটি মূর্ত্তিও ছিল বলিয়া জানা যায়। ‡

তীব্বতীয় গ্রন্থেও উদয়ন কর্ত্তৃক বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণের কথা আছে। শিল্পীরা তথাগতের শরীর নিঃসৃত তীব্র জ্যোতিচ্ছটায় দৃষ্টিহারা হইয়া পড়িতেছিল। তাই বুদ্ধদেব তাহাদের শ্রমলাঘবের জন্য জলমধ্যে নিজ ছায়াপাত করিলেন। তাহা দেখিয়া শিল্পীরা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিল। সেই কারণে বুদ্ধ মূর্ত্তির পরিধানের বস্ত্র তরঙ্গায়িত গঠনের হইয়াছে। *

চীন দেশে যে ধরণের বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় তাহা চৈনিক গ্রন্থ ও বিশ্বাসানুসারে উদয়ন কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তির আদর্শে গঠিত। তাই আধুনিক পণ্ডিতগণ চীন দেশীয় বুদ্ধমূর্ত্তির নাম দিয়াছেন "উদয়ন আদর্শের মূর্ত্তি"।

কিন্তু উদয়ন কর্ত্তৃক বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচীন ভারতশিল্পে অর্থাৎ সাঁচি, বরহুত ও মহাবোধির শিল্প মধ্যে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায় না। সেখানে বুদ্ধদেবের অস্তিত্ব বোঝাইতে হইলে পদ্ম, হস্তী, শ্রীপদ বা জ্যোতিচ্ছটা প্রভৃতি চিহ্নের প্রয়োগ করা হইয়াছে। গান্ধার শিল্পে বৈদেশিক প্রভাবের ফলে সর্ব্বপ্রথম বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির উদ্ভব হয়। খৃষ্টমূর্ত্তির উৎপত্তিও ঠিক এইভাবেই হইয়াছিল। প্রথমে মৎস্য, মেষ ইত্যাদি চিহ্নযোগে যীশুখ্রীষ্টের স্বরূপ সূচিত হইত। তাহার পর যখন

* সংযুক্তনিকায় ৪, ১১০

† S. Beal—Buddhist Records of the Western World Vol I.

† Ibid—Vol II, p 324

‡ Ibid—Vol I, p 20

* G. Huth Geschichte des Buddhismus in der Mongolei.

খৃষ্ট চিত্র ও প্রতিমূর্ত্তিতে দেখা দিলেন তখন কি ধরণের মূর্ত্তি তাঁহার হইবে সে সম্বন্ধে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল না। তাই প্রথম প্রথম অনেক রকমেই খৃষ্টমূর্ত্তি দেখা দিয়াছিল। পরে বাইজান্টিয় শিল্পে তাঁহার যে মূর্ত্তি উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহাই যীশুর প্রকৃত রূপ বলিয়া গৃহীত এবং সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে। তাই আজ জগতের সর্ব্বত্র যীশুর ঐ এক মূর্ত্তি দেখা যায়। বুদ্ধমূর্ত্তির ইতিহাসও ঠিক ঐ একই প্রকারের। প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মে মূর্ত্তি পূজার স্থান ছিল না তাই বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণের কোন প্রয়োজনীয়তাও বোধ হয় নাই। পরে বৌদ্ধধর্ম্মে যখন মূর্ত্তিপূজা ঢুকিল এবং বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব প্রভৃতি অসংখ্য দেবমূর্ত্তির প্রয়োজন হইল অর্থাৎ বুদ্ধদেব যখন দেবতায় পরিণত হইলেন, তখনই তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের আবশ্যকতা অনুভূত হইল। কিন্তু সে কার্য্যটী নিতান্ত সহজ ছিল না কারণ বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর এত সুদীর্ঘকাল কাটিয়া গিয়াছিল যে তাঁহার প্রকৃত প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা অসম্ভব। তাঁহার যথার্থ আকৃতি কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তও সম্ভব ছিল না। তাই মহাপুরুষের সমস্ত লক্ষণ ও সৌন্দর্য্যের আদর্শ মিলাইয়া শিল্পী তাঁহার মূর্ত্তি গড়িল। এবং উহা প্রামাণিক করিবার জন্য তাহার সহিত নানা অলৌকিক কাহিনী জুড়িয়া দেওয়া হইল। উদয়ন ও প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক নৃপতি ছিলেন, সুতরাং ইঁহাদের নামে গল্প রচা ভাল, বোধ হয় এই বিবেচনা করিয়াই সর্ব্বপ্রথম বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করার সম্মান ইঁহাদের উপর প্রযুক্ত হইয়াছে। ফাহিয়ান শ্রাবস্তীতে প্রসেনজিৎ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি ও তৎসম্পর্কে অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন।* তাহার সহিত হিউয়েনসঙ্গ বর্ণিত কৌশাম্বীর উদয়ন নির্ম্মিত মূর্ত্তির কাহিনী একেবারেই অভিন্ন। ইহা হইতে কি বুঝায় না যে পরবর্ত্তী যুগে বুদ্ধমূর্ত্তির প্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্যই এ সকল কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল ?

পালি এবং সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ হইতে উদয়নের পুত্র বা বংশধরগণ সম্বন্ধে বিশেষ কোনই তথ্য পাওয়া যায় না।

* Fo—Ko ki chap XX.

পুরাণে অহিনর, বহিনর বা মহিনর নামে উদয়নের পুত্রের উল্লেখ আছে। পালি গ্রন্থসমূহ হইতে বোধি নামে উদয়নের পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। দেবদত্ত ভাণ্ডারকরের মতে বোধি ও বহিনর একই ব্যক্তির নাম। * বোধির নামে মজ্‌ঝিম নিকায়ে একটি সুত্ত আছে † তদ্ভিন্ন বিনয় পিটকেও স্থানে স্থানে তাঁহার উল্লেখ আছে। ‡ জাতক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে তিনি সুংসুমারগিরি হইতে ভগ্‌গ জনপদে রাজত্ব করিতেন। ** ভগ্‌গ দেশ বা ভর্গদেশ যে বৎসরাজের অতীব সমীপবর্ত্তী ছিল তাহা মহাভারত (সভাপর্ব্ব ৩০ অধ্যায় ১০-১১ শ্লোক) এবং হরিবংশ (২৯, ৭৩) হইতে জানা যায়। ভগ্‌গদেশ বৎসরাষ্ট্রের সামন্ত রাজ্য ছিল এবং বোধি যুবরাজরূপে তথায় রাজকার্য্য পরিচালন করিতেন। বোধি শিশুমারগিরি বা সুংসুমারগিরিতে জনৈক সূত্রধর দ্বারা একটি সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ; তিনি তাহার নাম রাখেন "কোকনদ"। পরে তাঁহার মনে হইল যদি সূত্রধর আর কাহাকেও ঐরূপ একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দেয় তবে ত আর রাজপ্রাসাদের গৌরব থাকিবে না। এই ভাবিয়া বোধি, হতভাগ্য সূত্রধরকে অন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন ! অষ্টম বর্ষায় বুদ্ধদেব কোকনদ প্রাসাদে ভোজন করিয়াছিলেন।

বৃহৎকথা বা কথাসরিৎসাগর মূলতঃ উদয়ন ও বাসবদত্তার পুত্র নরবাহনদত্তের অলৌকিক কথা লইয়াই রচিত। ইহাতে উদয়ন সম্বন্ধেও দীর্ঘ এক বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পণ্ডিতেরা তাহা নিতান্তই কাল্পনিক বলিয়া মনে করেন। আমরা ইতিপূর্ব্বেই কথাসরিৎসাগর হইতে উদয়নের জন্মবিবরণ, বাসবদত্তা ও পদ্মাবতীর সহিত বিবাহ এবং তাঁহার দিগ্বিজয়ের বিবরণ দিয়াছি। কথাসরিৎসাগর মতে নরবাহন কামদেবের অংশসম্ভূত এবং বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তী ছিলেন। তিনি মদনক নামক বিদ্যাধরের কন্যা মদনমঞ্চুকার পাণিগ্রহণ করেন। মদমঞ্চুকা স্বয়ং রতিদেবীর অংশসম্ভূতা ছিলেন।

* Carmichael Lectures I. p 63.

† বোধিরাজকুমারসুত্ত, মজ্‌ঝিম নিকায় ৮৫

‡ বিনয় পিটক ২. ১২৭ ; ৪. ১৯৮, ১৯৯

** জাতক ৩. ১৫৭

শ্রীঅমূল্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নরবাহনের আর কয়েকটি মহিষী ছিল। পিতার পারিষদ-বর্গের পুত্রগণ তাঁহার পারিষদ ছিলেন; যথা যৌগন্ধরায়ণের পুত্র হরিশিখ সেনাপতি, বসন্তকের পুত্র তপন্তক-সখা, নিত্যোদিতের পুত্র গোমুখ-প্রতীহার।

নৃসিংহপুরাণেও (২৩।১২) উদয়ন ও বাসবদত্তার পুত্রের নাম নরবাহন আছে। বলা বাহুল্য এ তথ্যটী বৃহৎকথা হইতেই সঙ্কলিত।

পালি বা সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ হইতে উদয়নের বংশধরগণের বিশেষ কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। পুরাণের বংশ-তালিকা হইতে জানা যায় যে উদয়নের চতুর্থ অধস্তন পুরুষ ক্ষেমকের সহিত পৌরববংশের অবসান হইয়াছিল। বিভিন্ন পুরাণে রাজগণের নামভেদ দেখা যায়। উদয়নের পুত্রের নাম অহিনর, বহিনর বা মহিনর, তাঁহার পুত্র খণ্ডপাণি বা দণ্ডপাণি, তাঁহার পুত্র নিমি বা নিরমিত্র, তাঁহার পুত্র ক্ষেমক। এই ক্ষেমক সম্বন্ধে সকল পুরাণেই এইরূপ পদ দেখা যায়—

ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশো রাজর্ষিসৎকৃতঃ
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থা প্রাপ্স্যতে কলৌ।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তির কারণ, রাজর্ষিগণ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত বংশ কলিতে ক্ষেমক রাজাকে পাইবার পর সমাপ্তিলাভ করিবে।

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে একটি ঐতি-হাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। উদয়ন, প্রসেনজিৎ ও অজাতশত্রু বুদ্ধদেবের সমসাময়িক নৃপতি ছিলেন। পুরাণে এই তিন রাজবংশের যে বংশতালিকা দৃষ্ট হয়* তাহা হইতে জানা যায় যে ঐ রাজত্রয়ের প্রত্যেকেরই চতুর্থ অধস্তন পুরুষের সহিত তদীয় বংশের অবসান হইয়াছিল। ঐ তিন সুপ্রাচীন রাজবংশের প্রায় সমসময়েই অবসান হওয়া শুধুই দৈববশে ঘটে নাই বলিয়া মনে হয়। তাহার অপর কোন গুরুতর কারণ আছে বেশ বুঝা যায়। পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছিল যে বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় কোশলরাষ্ট্র সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত থাকিলেও সে প্রাধান্য দীর্ঘকাল রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহা পরবর্ত্তী যুগে মগধের অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল। বিম্বিসার ও অজাতশত্রু মগধের প্রাধান্য বৃদ্ধির যে পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী মগধ রাজগণ তাহা সর্ব্বাংশে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। কালক্রমে মগধ সাম্রাজ্য প্রায় সমস্ত ভারতব্যাপীই হইয়া দাঁড়ায় সে কথা ঐতিহাসিকের অজানা নয়।

বৎস ও কোশলের রাজবংশ তথা মগধে বিম্বিসারের বংশ প্রায় সমসময়েই অবসিত হয়। মগধের রাজলক্ষ্মী তখন শূদ্র নন্দবংশকে আশ্রয় করেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্মনন্দ সম্বন্ধে পুরাণে উক্ত হইয়াছে—"ক্ষত্রিয় বংশের বিনাশকারী মহাপদ্মনন্দ অমুলঙ্ঘিত-শাসনে একচ্ছত্রা পৃথিবী, দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় শাসন করিবে। সেই সময় হইতে নৃপতিগণ অধার্ম্মিক ও শূদ্রপ্রায় হইবেন।" *

নন্দরাজগণ যে বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন তাহা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও গ্রীক লেখকবর্গের রচিত গ্রন্থসমূহ হইতে জানা যায়। তাই মনে হয় যে মগধে শূদ্র নন্দবংশের অভ্যুদয়ের সহিত উদয়নের তথা অপরাপর ক্ষত্রিয় বংশের উচ্ছেদ ঘটিয়াছিল।

* বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ ২১শ, ২২শ, ২৪শ অধ্যায়

* বিষ্ণুপুরাণ ৪।২১।৪-৫

ইংরাজী কাব্যে বাঙ্গালী

ও

সরোজিনী নাইডু

—শ্রীলতিকা বসু

তরু দত্তের কাব্য-সমালোচনা-প্রসঙ্গে * আমি উল্লেখ করিয়াছি—কিশোরী তরু তাঁহার 'ভারতের প্রাচীন গাথা'য় (Ancient Ballads and Legends of Hindusthan) প্রচলিত বিলাতী কবিতার ধারা অনুকরণ না করিয়া একটা নূতন ধারার সৃষ্টি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ঐ কবিতাগুলিতে তিনি কোনও বিজাতীয় ভাবের আমদানি করেন নাই; তৎপরিবর্ত্তে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির চিত্র ও শব্দ সৌন্দর্য্য তাঁহার প্রাণে যে ভাব জাগাইয়া তুলিত, কবিতায় তাহাই তিনি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অকাল মৃত্যু নিবন্ধন তরুর এই প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। তরুর পরবর্ত্তী যুগে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর কবিতায় এই চেষ্টা কতকটা সফলতা লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্তা নাইডুর লিখিত কাব্যগুলিতে ভারতীয় ভাব এবং অলঙ্কারসৌন্দর্য্যের অভাব পরিলক্ষিত হয় না।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে (তরুর মৃত্যুর দুই বৎসর পরে) ১৩ই ফেব্রুয়ারী হাইদ্রাবাদে সরোজিনী জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ডক্টর অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। অঘোর নাথ নিজে একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ উপাধিলাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিবার পর হাইদ্রাবাদ নিজাম কলেজে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হন। সরোজিনী একটি কবিতায় তাঁহার পিতার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

Farewell! Farewell! O brave and tender sage,—
Selfless, serene, untroubled, unbeguiled
By trivial snares of grief and greed or rage,
O splendid dreamer in a dreamless age—
Whose deep alchemic vision reconciled
Time's changing message with the undefiled
Calm wisdom of the Vedic heritage.

অঘোরনাথের সহিত যাঁহাদের পরিচয় সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল, তাঁহারা জানেন সরোজিনীর অঙ্কিত তাঁহার পিতার এই চিত্র বর্ণে বর্ণে সত্য।

অঘোরনাথ দুহিতার প্রথমে বিজ্ঞানশিক্ষারই বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল, সরোজিনীকে হয় একজন বড় অঙ্কশাস্ত্রবিৎ, নয়ত একজন বড় বৈজ্ঞানিক করিয়া তুলিবেন। কিন্তু বিধাতার লিপি কে খণ্ডন করিতে পারে? সরোজিনী যখন মাত্র এগার বৎসরের বালিকা তখন তাঁহার প্রথম কবিতা রচিত হয়। বলিতে গেলে তখন হইতেই তাঁহার কবিজীবন আরম্ভ হয়। সেই বয়সেই তিনি স্কটের "লেডি অব দি লেক" এর অনুকরণে তের শত লাইনের একটি কবিতা এবং দুই হাজার লাইনের একখানি নাটিকা রচনা করিয়া ফেলেন। বার বৎসর বয়সে সরোজিনী মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মাদ্রাজে উক্ত পরীক্ষায় ইতিপূর্ব্বে আর কোনও বালিকা উত্তীর্ণ হন নাই। কাজেই সরোজিনীর গৌরবরশ্মি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে; তিনি কলেজের উচ্চ শিক্ষার আশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু বাড়ীতে পড়াশুনা এবং কবিতা রচনার কোনও বাধা ছিল না। বাড়ী বসিয়া অল্প সময়ের মধ্যে তিনি অনেকগুলি বই পড়িয়া ফেলিলেন। অনেকগুলি কবিতাও এই সময়ের মধ্যে রচিত হয়। এ সম্বন্ধে

* 'বিচিত্রা'র শ্রাবণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রীলতিকা বসু

সরোজিনী নিজে লিখিয়াছেন—"যতদূর মনে পড়ে আমার পড়াশুনার বেশীর ভাগই চৌদ্দ হইতে ষোল বৎসরের মধ্যে শেষ হইয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যে আমি একখানি উপন্যাস রচনা করিয়া ফেলি, এবং মাসিক পত্রের জন্য অনেকগুলি প্রবন্ধও রচনা করি। তখন হইতেই লিখিবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা মনে জাগিয়া উঠে।"

সরোজিনীর বয়স যখন পনের, তখন ডাক্তার নাইডুর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। উভয়েই উভয়কে জীবন-সঙ্গীরূপে পাইবার জন্য ব্যগ্র হন। কিন্তু এই মিলনে উভয় পক্ষের আত্মীয় স্বজন হইতে গুরুতর আপত্তি ও বাধা উপস্থিত হয়। সরোজিনী ব্রাহ্মণকুমারী, ডাক্তার নাইডুর ব্রাহ্মণেতর বংশে জন্ম, সুতরাং এই অসবর্ণ বিবাহে আত্মীয়-স্বজন কেহই সম্মত হন নাই। প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইতে না পারিয়া সরোজিনী মর্ম্মাহত হন, কিন্তু একেবারে নিরাশ হন নাই। তাঁহার তৎকালীন মনের অবস্থা কয়েকটি কবিতায় বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নিজামপ্রদত্ত একটি বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়া সরোজিনী বিলাত যাত্রা করেন। তিনি প্রথমে লণ্ডনের 'কিংস' কলেজে ভর্ত্তি হন। পরে তথা হইতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত সুবিখ্যাত গার্টন কলেজে প্রবেশলাভ করেন। আর্থার সাইমন্‌সের একটি লেখায় সরোজিনীর বিলাত প্রবাসকালীন একটি ছবি বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে :—

"সরোজিনীর বিলাতে অবস্থানকালীন যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার আলাপ পরিচয় ঘটে, তাঁহাদের সকলেরই মনে পড়িবে কিরূপে এই কিশোরীটির সমস্ত প্রাণ প্রতিফলিত হইত তাঁহার দুইটি চোখে। সূর্য্যমুখী ফুল যেমন সর্ব্বদা সূর্য্যের দিকে চাহিয়াই ফুটিয়া রহে, সরোজিনীর চক্ষু দুইটিও তেমনি সৌন্দর্য্যের দিকে একান্তভাবে নিবদ্ধ থাকিত। বিস্ফারিত চক্ষু দুইটি সৌন্দর্য্য-ধ্যানে ক্রমশঃ এত বিস্ফারিত হইত যে, দুটি চক্ষু ছাড়া তাহার দেহে আর কিছু আছে বলিয়া মনেই পড়িত না। সরোজিনী সর্ব্বদা ভারতীয় রেশমের শাড়ী পরিয়া থাকিতেন। আগুল্ফলম্বিত ভ্রমর-কৃষ্ণ অলক-দাম তাঁহার দেহলতা ঘিরিয়া থাকিত—তাঁহাকে দেখিলে নিতান্ত বালিকা ভিন্ন আর কিছুই মনে হইত না। তিনি খুব অল্প কথাই বলিতেন, যাহা বলিতেন তাহাও অতি মৃদু-মধুর-স্বরে। বীণা-ধ্বনির ন্যায় তাঁহার কথা কর্ণে বাজিত। একেলা থাকিতেই তিনি ভালবাসিতেন।"

সরোজিনীর বুদ্ধিমত্তা, বিদ্যাবত্তা এবং মনের পরিণতির কথা বর্ণনা করিয়া আর্থার সাইমন্‌স্ পরিশেষে বলিতেছেন—"সরোজিনীর স্বভাবের একটা দিক আমাকে বড়ই আকৃষ্ট করিয়াছিল—উহা তাঁহার মনের একটা প্রবল আত্মসমাহিত ভাব। ঐ ভাবধারার শক্তিতে যাহা কিছু হেয়, ছোট বা অস্থায়ী তাহা সমস্তই ভাসিয়া যাইত। দৈহিক পীড়া তাঁহার একরূপ নিত্যসঙ্গী ছিল বলিলেই হয়, মানসিক অশান্তিও কম ছিল না। কিন্তু কি দৈহিক পীড়া, কি মানসিক অশান্তি—কিছুই এই ধ্যানরতা মনস্বিনীকে বিচলিত করিতে পারে নাই।"

প্রবাসে অবস্থানকালে সরোজিনী একবার ইটালি দেখিতে যান্। ইটালির অলোকসামান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও অপূর্ব্ব কলা সম্পদ তাঁহার চিত্তকে অভিভূত করিয়া ফেলে। ফ্লরেন্স দেখিবার সুযোগ পাইয়া সরোজিনী নিজেকে ধন্য মনে করেন। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইট্রুরিয়ার দেবতারা যে সৌন্দর্য্য পান করিতেন, দেবপদরজভূষিত জনগণবাঞ্ছিত ভূস্বর্গ ইটালির সেই সৌন্দর্য্য-সুধা সরোজিনী দিনের পর দিন অতৃপ্তনেত্রে পান করিতে লাগিলেন। ফিয়েসলি যাইয়া তাঁহার মনে হইল যেন তিনি স্বপ্ন-জড়িত চক্ষে অলিভ বৃক্ষের নিম্নে উপবিষ্ট দেবতাদিগকে দর্শন করিতেছেন। সৌন্দর্য্য-সুধা পানের জন্য সরোজিনীর মনে কি গভীর ব্যাকুলতা ছিল তাহার পরিচয় তাঁহার ইটালি হইতে লিখিত পত্রগুলিতে পাওয়া যায়।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সরোজিনীর স্বাস্থ্য আবার ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। ঐ বৎসরেই ডিসেম্বর মাসে তিনি সমস্ত বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া ডাক্তার নাইডুকে বিবাহ করেন। তাঁহার লিখিত একখানি চিঠি হইতে তাঁহার বিবাহিত জীবনের সুখচিত্রের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। উহাতে ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য দুঃখ করিয়া তিনি লিখিতেছেন—"আমার স্বাস্থ্য ফিরিয়া

পাইলেই আমি সম্পূর্ণ সুখী হইতাম। আমি আর কিছুই চাহি না, কারণ আমার মনে হয় আমার ছোট্ট নীড়টিতেই কবি শেলি বর্ণিত সুখ-দেবীর বাস—বাগানে পাখীর কল-কূজনে এবং শিশুর অনিন্দ্য মধুর হাস্য কলরবে আমার কুটির-খানি সর্ব্বদাই মুখরিত।"

হাইদ্রাবাদে অবস্থানকালে সরোজিনী যাহাতে সকলের সুখ ও শান্তি বিধান করিতে পারেন তজ্জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা

করিতেন। Dever লিখিত 'ভারতে ব্রিটিশ মহিলা' নামক গ্রন্থ পড়িলে আমরা তাঁহার জীবনের এই দিকটা জানিতে পারি। সরোজিনী নাইডু সম্বন্ধে উক্ত লেখক বলিতেছেন—"মিসেস নাইডু এখন হাইদ্রাবাদে অবস্থান করিতেছেন। এই সহরের পর্দ্দানশীন মহিলারা আরবি এবং পারসি ভাষায় সুপণ্ডিত। শুধু তাই নয়, প্রাচ্যের সকল ভাষার উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের সঙ্গেই তাঁহাদের পরিচয় আছে। এই সহরে মিসেস নাইডু ভারতীয় এবং ইউরোপীয় এই দুই সমাজের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার চারিদিকেই সৌন্দর্য্যধারা, সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার কবিতার প্রশংসা করিতেছেন। অন্তঃপুরচারিকাদিগের মধ্যে তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব"। সরোজিনীর যে যশঃরশ্মি এককালে হাইদ্রাবাদে আবদ্ধ ছিল আজ তাহা শুধু ভারতবর্ষে নয়—সমগ্র পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়াছে। আজ তিনি একজন ভুবন বিখ্যাত বাগ্মী। আর্থার সাইমনস্ যে কবির চিত্র আঁকিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন—"সুখ দুঃখ উভয়েই তাঁহাকে সম্যক অভিভূত করে", আজ আর তিনি সেই লজ্জানম্রা কিশোরী নহেন। তাঁহার সমস্ত কবি প্রতিভা—সমস্ত শক্তি আজ তিনি দেশের কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছেন। ভারতের রাজনীতি আকাশে আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া সরোজিনী নাইডু একটি উজ্জ্বল প্রভাবশালী জ্যোতিষ্কের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু কুসুম-সুকুমার দেহলতা বিশিষ্টা, ভাব, সৌন্দর্য্য ও স্বপ্নরাজ্য বিচারিণী সরোজিনী কিরূপে ধূলিধূসরিত রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ; ইতিহাসই ইহার উত্তর দিতেছে। অনেক দেশের অনেক কবিই দেশসেবা রূপ মহত্তর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। স্বদেশের দুঃখে বিগলিত-প্রাণা সরোজিনী যে দেশবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি আছে?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সরোজিনী অতি অল্প বয়সেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার বাল্য রচনায় কোনও বিশেষত্ব নাই। অধিকাংশ কবিতাই শেলি এবং টেনিসনের পদাঙ্ক অনুসরণে রচিত। প্রকাশিত তিনখানি কাব্যগ্রন্থেই এগুলির স্থান না দিয়া সরোজিনী সদ্বিবেচকের কার্য্যই করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। সরোজিনী নাইডু তাঁহার রচিত কবিতাগুলি প্রসিদ্ধ সমালোচক এডমণ্ড গসের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করেন। কবিতাগুলির রচনা নির্ভুল হইলেও উহার সমুদয়ই বিদেশী ছাঁচে ঢালা বলিয়া সমালোচকের মনপূঃত হয় নাই। তাই সেগুলি ফেরত দিয়া এডমণ্ড গস্ সরোজিনীকে বিলাতীভাব বর্জ্জিত এমন সব কবিতা লিখিতে

শ্রীলতিকা বসু

পরামর্শ দেন যাহাতে ভারতের প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার বিশিষ্ট রূপটী ফুটিয়া উঠে, যাহাতে ভারতের পৌরাণিক যুগের চিত্র পরিচয়ের আভাষ আছে, অথবা যাহাতে ভারতের নিজস্ব চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এডমণ্ড গসের উপদেশে ভারতের ফুল, ফল, বৃক্ষলতা, উদ্যান ও মন্দির সরোজিনীর কবিতায় স্থান পাইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে এডমণ্ড গস্‌ই এ বিষয়ে সরোজিনীর একমাত্র পথ প্রদর্শক। গসের কথাগুলি সরোজিনীর হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া যায়; সেই দিন হইতে তিনি নিজস্ব দেশীয় সম্পদের দিকে তাকাইতে শিখেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ সরোজিনী তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ—"দি গোল্ডেন থে শ্‌-হোল্‌ড" এডমণ্ড গসের নামেই উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ পত্রে সরোজিনী লিখিয়াছেন—যিনি আমার সোণার দুয়ারের পথ প্রদর্শক তাঁহারই উদ্দেশ্যে এই কাব্য গ্রন্থখানি উৎসর্গীকৃত হইল।

সরোজিনী নাইডুর কবিতা সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে পরিপার্শ্বিক কিরূপ প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া তাঁহার কবি-প্রতিভা উন্মেষিত হইয়াছিল সর্ব্বাগ্রে তাহারই আলোচনা করা প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাত্র যোলবৎসর বয়সে সরোজিনী বিলাত গমন করেন। সৌভাগ্যক্রমে বিশিষ্ট লেখক মণ্ডলীতে বিচরণ করিবার সুবিধা তিনি পাইয়াছিলেন। তৎকালীন উদীয়মান লেখকদিগের অধিকাংশের সঙ্গেই তাঁহার আলাপ পরিচয় ঘটে; আরও সৌভাগ্য যে এডমণ্ড গসের ন্যায় একজন প্রসিদ্ধ সমালোচককে তিনি বন্ধুভাবে লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের কাব্য গগনে গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছিল, ঠিক তখনই কিশোরী সরোজিনী তথায় উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং অতি সহজেই এই নূতন কাব্যধারা সরোজিনীর হৃদয় স্পর্শ করে। এক দিকে টেনিসন অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া কাব্য জগতের দেবতার আসনে পূজা পাইয়া আসিতেছিলেন। টেনিসনের কবিতাই এতদিন ইংলণ্ডের কবিদিগের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইতেছিল। লীলায়িত ভঙ্গী, স্বচ্ছ ঋজু কাব্যধারা, কতকগুলি বাছাই বাছাই সুন্দর সুন্দর শব্দ যোজনা—এইগুলিই ছিল তখনকার কাব্যের সম্পদ। কবিতার প্রাণের প্রতি কাহারও বড় একটা লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু টেনিসনের জীবিতাবস্থাতেই এই ধরণের কবিতার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ব্রাউনিংএর শ্রুতিকটু অথচ সতেজ কবিতাবলী, প্রি-রাফেলাইট দিগের প্রবল ভাব-বন্যা, এবং আর্নল্ডের গ্রীক কবিদিগের ন্যায় সংযত চিন্তা ও সুর, টেনিসনের প্রভাবের বিরুদ্ধে মূর্ত্তিমান বিদ্রোহের ন্যায় আসিয়া দাঁড়ায়। মামুলী ধরণে প্রকৃতির মধ্যে দেবদেবী কল্পনা অথবা প্রাচীন বীরগণের কীর্ত্তিগাথা এই নূতন দলের কবিতায় স্থান পায় নাই। স্পন্দনশীল মানব জীবনের খেলায় এই নব্য দলের কবিতার প্রাণ প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রকৃতির লীলাভূমি শান্তিময় গ্রাম্য জীবন বা বনভূমির বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া এই নূতন দলের কবিতা জন কোলাহল মুখরিত, দীপাবলী শোভিত নগরীর প্রাণের বার্ত্তা বা কথা দ্বারাই তাঁহাদের কবিতার প্রাণের পুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন। নাগরীক জীবনই হইল এই নব কল্পিত কবিতার প্রাণের উৎস।

সরোজিনীর কবিতাতেও আমরা এই উভয় দলের প্রভাবের ঘাত প্রতিঘাত দেখিতে পাই। গীতি কবিতাতে তিনি দক্ষহস্ত, এবং তাঁহার কবিতাও উচ্চশ্রেণীর ও মধুর বটে; কিন্তু তাঁহার কবিতাতে ভারতীয় জীবনচিত্র মোহন ও স্বপ্নসুন্দর করিয়া অঙ্কিত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। কাজেই কল্পনানুযায়ী রং ফলাইতে হইয়াছে; ফলে প্রকৃত দৃশ্যটির সঙ্গে পাঠকের ভাল করিয়া পরিচয় ঘটিতে পারে না। এক শ্রেণীর এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান লেখক আছেন যাঁহারা ভারতবর্ষকে পরীরাজ্য রূপে দেখাইতেই ব্যস্ত, সরোজিনীও অনেকটা তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। তাই তাঁহার মোহন তুলিকাস্পর্শে পাল্‌কী বেহারার গান, সাপুড়ের বংশীবাদন, অথবা রাজপথে উপবিষ্ট ভিক্ষুকের চিত্র পরীরাজ্যের কাল্পনিক সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়া পাঠকের চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাসিত হইয়াছে। তাঁহার ভিক্ষুক চারণগণ গাহিতেছেন —

What hopes shall we gather?
what dreams shall we sow?

Where the wind calls our wandering
footsteps—we go,
No love bids us tarry, no joy bids us wait,
The voice of the wind is the voice of our fate.

স্থানে স্থানে আবার তাঁহার কবিতা দুর্জ্ঞেয় রহস্য বা অলৌকিকতায় ভরা। যেমন The Golden Threshold-এ :—

The bridal songs, the cradle songs
have cadences of sorrow,
The laughter of the sun today
the wind of death to-morrow.
Far sweeter than the forest notes
where forest Streams are falling ;
O mother mine, I cannot stay,
the fairy folks are calling."

অথবা The Bird of Time-এ —

Swift are ye as streams
and soundless as the dewfall,
Subtle as the lightning
and splendid as the sun :
Seers are ye and symbols
of the ancient silence,
Where life and death and ecstacy are one.

সরোজিনী নাইডুর কবিতার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, উহার মধ্যে অনেক সময়ে একটা তাত্ত্বিকতার আভাষ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ "জীবন" (Life) "ভূত ও ভবিষ্যৎ" (Past and Future) ইত্যাদি কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। The Broken Wing-এ প্রকাশিত "বৃন্দাবনের বংশীধারী" (The Flute player of Brindaban) কবিতাটি বৈষ্ণব দর্শনতত্ত্ব এবং ভক্তি রসে আপ্লুত—

Still must I like a homeless bird
Wander forsaking all,—
The earthly loves, the worldly lure
That held my life in thrall.
And follow, follow, answering
Thy magical flute call.
No peril in the deep or height,
Shall daunt my winged foot,
No fear of time, unconquered space,
Or light untravelled route
Impede my heart that pants to drain
The nectar of thy flute."

অতি অল্প পরিসরের মধ্যে উজ্জ্বল জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করিতেও সরোজিনী সিদ্ধহস্ত। নিম্নে প্রদত্ত লাইনগুলি পড়িলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন কি বিচিত্র ছবি কবির তুলিকায় ফুটিয়া উঠিয়াছে —

An ox-cart stumbles upon the rock,
A wistful music pursues the breeze
From a shepherd's pipe as he gathers
his flock
Under the pepul tree—
And a young Banjara driving her cattle
Lifts up her voice as she glitters by,
In an ancient ballad of love and battle
Set to the beat of a mystic tune,
And the faint stars gleam in an early sky
To herald a rising moon.—

এই প্রকারের বর্ণনা সরোজিনীর কবিতার নানাস্থানেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। বর্ণনাগুলি মাঝে মাঝে এত সুন্দর যে মনে হয় যেন কোনও পরী আসিয়া তাহার মোহন তুলিকা দিয়া এই কল্পনা রাজ্যের ছবি আঁকিয়া গিয়াছে।

আবার অনেক স্থলেই মনে হয় কবি বিষয় অপেক্ষা শব্দছটার প্রতিই বেশী মনোযোগ দিয়াছেন। অবশ্য তিনি যে সমস্ত উপমা বা অলঙ্কারের আশ্রয় লইয়াছেন তাহার অধিকাংশই সঙ্গত, কিন্তু তবুও তাঁহার কবিতাতে উহাদের এত ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে যে ফলে অনেক স্থলে কবিতার সরল ভঙ্গীটুকু নষ্ট হইয়া গিয়া উহা অস্বাভাবিকতা দোষে

শ্রীপ্রতিকা বসু

দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। স্বভাব সুন্দর সুমিষ্ট বনকুসুম না হইয়া কবিতাগুলি যেন অনেক স্থলেই নিষ্প্রভ বিদেশাগত শুষ্ক কুসুমে পর্য্যবসিত হইয়াছে। উহাতে প্রাণ নাই—উহারা যেন সাজান গোছান লিখন ভঙ্গী মাত্র।

সরোজিনীর রচিত প্রেম বিষয়ক কবিতাগুলি ভাবের উন্মাদনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু স্থানে স্থানে এই ভাবের বন্যা ছুটাইতে যাইয়া কবি শিল্পের সৌন্দর্য্য ও সংযম বজায় রাখিতে পারেন নাই। তাই ভাবের আতিশয্যে তাঁহার কয়েকটি কবিতা তেমন মধুর হইয়া ফুটিতে পারে নাই, কেমন যেন অস্বাভাবিক ও অসঙ্গতিদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে—পাঠকের মনে একটা তৃপ্তির আস্বাদ রাখিয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ "The Broken Wing" হইতে দুইটি স্থল উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

Hide me in a shrine of roses,
Drown me in a wine of roses,
Drawn from every fragrant grove,
Bind me in a pyre of roses,
Burn me in a fire of roses,
Crown me with the rose of love.

অথবা :—

Take my flesh and feed your dogs
if you choose,
Water your garden trees with my blood
if you will,
Turn my heart into ashes, my dreams
into dust—
Am I not yours, O love, to cherish
and kill."

ইহার সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বহুস্থানে আবার দেশী কথার প্রয়োগে এই অস্বাভাবিকতা বাড়াইয়া তুলিয়াছে। বিদেশী পাঠকের নিকটে তো ঐ কথাগুলির কোন মানেই হয় না, সকল শ্রেণীর পাঠকের নিকটেই ঐগুলি বিসদৃশ বলিয়া প্রতিভাত হইবে। "ইয়া আল্লা, ইয়া আল্লা", "রাম রে রাম"—প্রভৃতি কথাগুলির ধর্ম্ম সম্বন্ধে যতই স্বাভাবিকতা থাকুক না, ইংরাজী উচ্চাঙ্গের কবিতা রচনায় ঐগুলি সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। উহাতে ভারতের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় না; বরং ওগুলি পড়িলে মনে হয় কোনও ফিরিঙ্গির রচনা পড়িতেছি।

ভারতীয় বিষয়ের বর্ণনা করিতে যাইয়া সরোজিনী নাইডু তাহাদের স্বাভাবিক ছবি আঁকিতে পারেন নাই। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান লেখকদিগের অনুসরণ করিয়া ভারতের একটি মোহন চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার রচিত কবিতা পড়িয়া মনে হয় ভারতবর্ষ যেন রূপ-রস-গন্ধে ভরা কতকগুলি বিপণির সমষ্টি মাত্র; উহার অলিতে গলিতে সুন্দর সুন্দর ভিখারী ও ভিখারিণী, ভবঘুরে চারণগণ ও সাপুড়িয়ারা বিরাজ করিতেছে। ভারতের সরল স্বাভাবিক চিত্র না আঁকিয়া কবি তাঁহার মনগড়া কল্পনা-নিখুঁৎ ছবি আঁকিতেই অধিকতর প্রয়াস পাইয়াছেন। এই জন্যই তাঁহার কবিতায় ভারতের প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায় না। উৎসুক মন নৈরাশ্যে ভরিয়া উঠে। তাই আমাদের মনে হয় উচ্চাঙ্গের কবি প্রতিভা থাকিলেও সরোজিনী নাইডু পাশ্চাত্যের নিকট ভারতের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিবার চেষ্টায় বিফল হইয়াছেন।

জমা-খরচ

—গল্প—

—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধনেখালির খুড়া

ফটকের গায়ে, পাথরের ফলকে লেখা ছিল,—'জে, লোহিড়ী এস্কোয়ার।'

বাটীর কর্তা বাটী ছিলেন না। কয়দিন হইল, একটা জরুরী কার্য্যের জন্য মফঃস্বলের কি একটা জায়গায় গিয়াছেন। ফিরিতে তাঁহার দিন পাঁচ-সাত আরও বিলম্ব হইবে। এই শুভ-অবসরে গৃহিণী আগামী পরশ্ব একটী ব্রতের অনুষ্ঠান এবং তদুপলক্ষে দু'দশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। বৈঠকখানা ঘরের রাস্তার দিককার দরজা ভেজাইয়া দিয়া ভট্টাচার্য্যের সহিত গৃহিণী হরিমতি দেবীর তাহারই আলোচনা ও হিসাব-ফর্দ্দ হইতেছিল।

বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য হিসাবের অঙ্কের নীচে কসি টানিয়া দিয়া, হরিমতির উদ্দেশে বলিল,—"তা হ'লে মা, এই মোট ছাপ্পান্ন টাকা হ'লেই সব হ'য়ে যা'বে ; মায় আমার দক্ষিণে পর্য্যন্ত। তারপর, ধুতির কাপড়ের বদলে তুমি মা, যদি গরদই একখানা দিতে চাও ত এর ওপর আর গোটা বার' টাকা।" শুনিয়া হরিমতি তাহার বাক্স হইতে টাকা আনিতে উঠিয়া গিয়াছিল।

সহসা রাস্তার দিকের দরজা সশব্দে খুলিয়া গেল। ভট্টাচার্য্য চোখ চাহিতেই সম্মুখে যেন বাঘ দেখিল। জগদীশ জুতা শুদ্ধ সতরঞ্চির উপর আসিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার গম্ভীর কণ্ঠ হইতে প্রশ্ন বাহির হইল,—"ব্যাপার কি?" সঙ্গে সঙ্গেই তাহার নজর পড়িল, খোলা ফর্দ্দখানির উপর।

ভট্টাচার্য্যের গলা যেন কে চাপিয়া ধরিয়াছিল, ঠেলাঠেলি করিয়া রব বাহির করিল,—"আজ্ঞে, গিন্নীমা—"

সতরঞ্চির উপর হইতে ফর্দ্দখানি তুলিয়া লইতে লইতে জগদীশ জিজ্ঞাসা করিল,—"আজ্ঞে গিন্নীমা, কি করচেন?"

"পরশ্ব দিনটা ভাল আছে, তাই একটা —"

"হোম? পুজো? ব্রত? প্রায়শ্চিত্ত? চান্দ্রায়ণ? ব্রাহ্মণভোজন?—শুভদিনে কী করবার আয়োজনটা হচ্চে?"

নাকের উপর হইতে চশমাখানি খুলিয়া কাগজের খাপে পুরিতে পুরিতে ভট্টাচার্য্য বলিল,—"এমন বিশেষ কিছু নয়,—একটা 'পুত্রেষ্টি'—"

"নইলে তোমার 'অন্ত্যেষ্টি'র খরচাটা বুঝি—এই তার ফর্দ্দ হচ্ছিল? আরে ছোঃ!—মোটে ছাপ্পান্ন টাকা!" বলিয়া ফর্দ্দখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া নিক্ষেপ করিল। বলিল,—"দেখ ভট্চায্, তোমাকে কতবার বলতে হবে জানি না যে, এসব চালাকি আমার বাড়ীতে কস্মিনকালেও চল্‌বে না। গরীব ব'লে, মাসে দুটো ক'রে টাকা ত দেবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি! এ মাসের টাকা বুঝি পাওনি? আচ্ছা—" বলিয়া ব্যাগ হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া ভট্টাচার্য্যের কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"যাও, ভেগে পড়। খবরদার বলচি, আমার বাড়ীতে এরকম ভট্চায্যিগিরি চালাতে আর এস না। তা হ'লে মাসে এই দুটাকাও বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে।" দু'পা গিয়া ফিরিয়া আবার বলিল,—"'পুত্রেষ্টি'টা বাগাতে পাল্লে, তোমার দক্ষিণেটা আদায় হ'ত কত? গোটা পাঁচেক টাকা ত? পুজোর বাজার—টানাটানি বড়, না?—আচ্ছা, নিয়ে যাও, আরো পাঁচ্‌টা টাকা" বলিয়া ব্যাগ হইতে আরও পাঁচ টাকা বাহির করিয়া, তাহার সাম্‌নে ফেলিয়া দিল।

বরাবর দ্বিতলে নিজের শয়ন কক্ষে গিয়া জে, লোহিড়ী এস্কোয়ার্ তাহার সাহেবী পোষাক ছাড়িয়া ধুতি পরিধান করতঃ জগদীশ লাহিড়ী হইল এবং আরাম কেদারাখানিকে

জানালার ধারে টানিয়া আনিয়া তাহাতে ক্লান্ত দেহখানি এলাইয়া দিল।

শরতের অপরাহ্ণ। বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারাকে বিদায় করিয়া দিয়া, কয়দিন হইতে আকাশে বাতাসে যেন একটা নূতন ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। প্রকৃতি দীর্ঘকালব্যাপী স্নান সমাপনান্তে সবুজ সাড়ী পরিধান করিয়া শুদ্ধাচারিণীর মত যেন আসন্ন পূজার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল।

জগদীশ জানালার ধারে বসিয়া দেখিতে লাগিল পথে লোক চলাচলেরও অন্ত নাই, অসংখ্য রকম ফেরীওয়ালার ডাকেরও বিরাম নাই। ও দিক্‌কার ফুট্‌পাথে একটা লোক ছড়া হাঁকিয়া বই বিক্রয় করিতেছিল—

"এবার পূজোয় বিপদ্ ভারি,
বউ চেয়েছেন মটর গাড়ী।
বুড়ো কর্ত্তার কী দুর্দ্দশা,
নগদ মূল্য এক পয়সা।"

মোড়ের মাথার বড় বাড়ীখানা পাঞ্জাবীরা ভাড়া লইয়া রাস্তার দিকের ঘরগুলাতে গ্যারেজ করিয়াছিল। তাহাদেরি কেহ একজন একখানা ট্যাক্সির নীচে মড়ার মত চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া তাহার কি একটা মেরামত করিতেছিল, আর তাহাই দেখিতে পাড়ার ছেলের দল ভিড় করিয়া সেখানটা ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল।

পায়ের শব্দে চোখ ফিরাইতেই হরিমতি বলিল, "আচ্ছা, ফর্দ্দখানা ছিঁড়ে ফেলে ভট্‌চার্য্যি মশাইকে না হয় তাড়িয়ে দিলে, কিন্তু হঠাৎ এরি মধ্যে ফিরে এলে যে? শরীর ভাল আছে ত?"

"এ শরীরের কি আর মন্দ আছে ক'নে বৌ?"

"তবে এরি মধ্যে ফিরলে যে বড়?"

"তোমার 'পুত্রেষ্টি' নষ্ট হবে ব'লে।"

হরিমতি মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল—"না—না সত্যি বলচি, ও সব কিছু নয়। পরশু মহালয়ার দিনটা ছিল, তাই গুটিকত ব্রাহ্মণভোজন করাব মনে করেছিলুম। তুমি বাড়ীতে নেই, তাই ভট্‌চার্য্যি মশায়কে দিয়ে—"

"রামো-চন্দর! চিরটাকাল ধ'রে বামুনেরা ত খালি খেয়েই আসচে। বলি, ভগবানের কাছ থেকে ওটা কি তাদের একচেটে অধিকার পাওয়া? আর কেউ খাবে না, সুধু ওরাই খাবে? খেয়ে খেয়ে যে বামুনদের ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ধ'রে গেছে! খাবার লোক জগতে ঢের—"

"তা থাক্‌গে,—তার আর দরকার নেই। তোমার মুখখানা কিন্তু বড্ড শুকিয়ে গেছে। জল খাবার নিয়ে আসি, আগে কিছু খাও, তারপর ব'সে ব'সে জিরোও।"

হরিমতি উঠিয়া গেল।

জগদীশও উঠিয়া আলমারী খুলিল এবং একটি ফ্লাস্ক্ বাহির করিয়া তন্মধ্যস্থিত তরল পদার্থ ছোট একটি গ্লাসে ঢালিয়া উপর্য্যুপরি দুই তিন গ্লাস গলাধঃকরণ করিল।

হরিমতি খাবারের থালাখানি রাখিতে রাখিতে বলিল,—"উঃ, গন্ধে ঘর একেবারে ভ'রে গেছে! ওই ছাই খেলে বুঝি?"

"ছাই বলতে নেই ক'নে বৌ—ওঁর অমর্য্যাদা করা হয়।"

"এই বিকেল থেকেই বুঝি শুরু করলে?"

"এর আর কালাকাল আছে কি? 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ'। ওগো, ঐ ধনেখালির খুড়ো আসচে না?—ওই যে গো ওদিক্‌কার ফুট্‌পাথে!"

হরিমতি সেইদিকে চাহিয়া বলিল,—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনিই ত বটে! ইস্, বড্ড রোগা হ'য়ে গেছেন ত!"

"তবুও ত মরবার নামটি নেই। যেন অক্ষয় অমর হোয়ে—ক'নে বৌ, শীগ্‌গীর, শীগ্‌গীর!" বলিয়া জগদীশ শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"সরাও—সরাও—শীগ্‌গীর সরাও!"

"কি সরাবো গো,—অমন ক'চ্চ কেন?"

"আরে খাবারের থালা ফালা সব সরিয়ে নিয়ে যাও শীগ্‌গীর! টুলখানা খাটের ধারে দাও। গোটা কতক শিশি—শিশি—ঐ ডাক্তারখানার ওষুধের শিশি গো! আরে যা হয় রাখনা শীগ্‌গীর টুলটার ওপর! এটা কি? ক্যাষ্টর অয়েল? এটা?—তোমার সেই মালিস্? দাও, দাও, মধুর শিশিটাও দাও। গোলাপ জলের খালি

বোতলটাও রাখ; লেবেলটা দেয়ালের দিকে ঘুরিয়ে রাখ না ছাই। ওষুদের গেলাস একটা। জল এক ঘটী—পিক্‌দানীটা। থার্ম্মোমিটারটা আলমারী থেকে বার ক'রে—"

"কি গো, কি ব্যাপার ?"

"ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু! আরে, এসে পড়্‌ল বুঝি! ওই ফড়িঙে শরীরে পা চালিয়ে কি রকম জোরে আস্‌চে! বেটা যেন—ওগো কম্বলখানা—কম্বলখানা! দেখ, এই শুয়ে পড়লুম্‌,—যেন আমার খুবই অসুখ। তুমি ঐ এক ধারে ঘোমটা দিয়ে চুপ্‌টি ক'রে ব'সে থাক। মাথার দিকের জান্‌লাটা—"

"কৈ,—ও জগদীশ—জগদীশ! কোথায় সব ?"

কাহারো কোন সাড়া শব্দ নাই।

"কোন্‌ ঘরে সব হে ?" বলিতে বলিতে ধনেখালির খুড়া গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া চম্‌কিয়া উঠিলেন,—"এ কি! এমন ক'রে—অসুখ নাকি ?"

জগদীশ আরাম কেদারাখানি হাত দিয়া দেখাইয়া দিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে সুধু বলিল,—"বসুন।"

"তারপর, কবে থেকে অসুখ হ'ল ? কি,—জ্বর, না পেটের অসুখ ?" বলিয়া তিনি জগদীশের ঘর্ম্মাক্ত কপালে হাত দিয়া বলিলেন,—"জ্বরই বুঝি,—তা'হলে এখন রেমিশন হচ্চে।"

একে সেই দারুণ গরম, তাহাতে উদর মধ্যে সদ্যঃ-প্রেরিত সেই তরলাগ্নির অবস্থান, সর্ব্বোপরি গলা পর্য্যন্ত কম্বল ঢাকা থাকাতে, জগদীশের কপাল পর্য্যন্ত ঘামিয়া উঠিয়াছিল।

অতি কষ্টে, থাকিয়া থাকিয়া, জগদীশ বলিল,—

"জ্বরও নয় পেটের অসুখও নয়, হয়েছে—এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা!"

"ও সব ইংরিজি বল্‌লে ত বুঝবো না বাবা, বাংলাতে একে কি বলে ?"

"এই যাকে আপনার বাংলায়—বাংলায়—নাঃ, বাংলাতে এর আর কোন নাম্‌ টাম্‌ নেই। এই প্রত্যেক গাঁটে গাঁটে খিলে খিলে প্লুরো-থাইসিস্‌।"

"থাইসিস্‌ ?—থাইসিস্‌ ত যক্ষা! পিলেতে যক্ষা! ইস্‌, তা হ'লে ত বড় ভয়ের কথা!"

"তা'ই হ'য়েছিল বটে, তবে এখন তা কাটিয়ে উঠিচি কাকা। এখন সুধু গায়ে একটু বল পেলেই হয়। ওঃ—গেলুম!" বলিয়া জগদীশ একবার এপাশ-ওপাশ করিয়া কাতরতা প্রকাশ করিল।

"তা, দেখ্‌চে কে ?—উঁঃ, কিসের গন্ধ বেরুচ্চে বল দেখি ? যেন মদের মত ?"

"ঐ যে, গেলাসে ওষুধটা ঢালতে গিয়ে, ক'নে বৌ সব ফেলে একাকার ক'রে ব'সে আছে! ওষুধের গন্ধটা ঠিক মদের মতই বটে,—মুখে দিলেই যেন বমি আসে!"

হরিমতি নিঃশব্দে উঠিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

ধনেখালির খুড়া বলিলেন,—"তোমার অসুখ হ'য়ে পড়লো! গয়নাগুলোর জন্যেও বাড়ীতে ওরা বড্ড ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। যাক্‌, তুমি একটু সেরে-সুরে ওঠ।"

জগদীশ অতি ক্ষীণ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল,—"সব তৈরি হ'য়ে গেছে নিশ্চয়। আজই ত আমাদের গিয়ে আনবার কথা ছিল। সে যে আমি না গেলে হ'বে না; নইলে ঠিকানা দিয়ে, চিঠি লিখে আপনাকেই পাঠিয়ে দিতুম।

যা'ক আর পাঁচ-সাত-দশ দিন, আমি একটু উঠ্‌তে পাল্লেই গিয়ে নিয়ে আস্‌চি। তারপর, আপনার শরীরটা কেমন আছে কাকা ? বড্ডই কাহিল কাহিল দেখছি যে ?"

"কাহিলের আর অপ্‌রাধ কি বাবা ? এই এক মাসের মধ্যে বার চেরেক জ্বরে পড়লুম। এ সময়টা কি গাঁয়ে কারুর আর ভাল থাকবার যো আছে ?—আচ্ছা জগদীশ, তিন হাজার ত তোমার কাছে দিয়ে দিয়েছি, বাকী আর কত আন্দাজ দিতে হবে বল দেখি ?"

"সবসুদ্ধ আপনার হাজার চারেকের ওপর যাবে না। তিন হাজার ত ওদের দেওয়াই আছে। 'রিসিট'খানা বুঝি আপনাকে দিইনি, নিয়ে যান সেটা। আর হাজার খানেক দিলেই হবে বোধ হয়। নেহাৎ একটা মাখামাখি ভাব-খাতির রয়েচে আমার সঙ্গে, তাই, নইলে মজুরী আপনার

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

অন্য জায়গায় ডবল প'ড়ে যেত। সবই জড়োয়া—মজুরী ওর বড্ড বেশী।"

"আচ্ছা, আমি উঠি তা'হলে আজ। তুমি সেরে উঠে, ওগুলো তা'হলে আনিয়ে রেখো। রেখে আমায় একখানা চিঠি দিও। টাকাটা এনেছিলুম, তোমাকে দিয়েই যাই। ধর দেখি,—এই একশ ক'রে বাণ্ডিল, গুণে নাও। এই এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট্, নয়, দশ।

ভৃত্য চিনিবাস গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে থতমত খাইল, তারপর দু'পা পিছাইয়া যাইয়া দরজার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল; পরিশেষে জগদীশের দিকে চাহিয়া বলিল,—"চালের গোলা থেকে লোক এসেছে।"

তাহার দিকে না চাহিয়াই জগদীশ বলিল,—"যা', বোল্‌গে বাবু বাড়ী নেই। জানিস্, আমার এই অসুখ, উঠে বস্‌বার ক্ষমতা নেই, আমি যাব তার সঙ্গে দেখা কত্তে এও তো-ব্যাটাদের ব'লে দিতে হবে?"

খানিক পরে বাহির হইতে চাউলের গোলার লোকটির গলা বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উপরে আসিল,—"এক মাস শয্যাগত কি রে! এই ত একটু আগে ট্যাক্‌সি ক'রে আসছিলেন আমাদের গোলায় নেবে ব'লে এলেন, বিল নিয়ে আস্‌তে, টাকা দেবেন।"

ধনেখালির খুড়ার মুখ হইতে কিছু একটা বাহির হইবার উপক্রম হইতেছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়াই জগদীশ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"আহা, একটি ছেলে, তাও পাগল হ'য়ে গেল! আচ্ছা কাকা, আপ্‌নাদের ওখানকার তেরল কালী'র বালাতে কি সত্যি কোন উপ্‌গার টুব্‌গার হয়?"

"কার জন্যে বল দেখি?"

"ওই যে ছেলেটি এসেছিল, ওরি জন্যে। ওটি হচ্ছে হৃষিকেশ সা—মস্ত একজন চালের আড়ৎদার—তারই ছেলে। বুড়োর ঐ একটিই ছেলে। ম্যাট্রিক্ পাশ ক'রে আড়তের কাজ কর্ম্মই দেখা-শুনা কচ্ছিল। হঠাৎ পাগল হ'য়ে গিয়েছে। সমস্ত দিন ধ'রে এর ওর তার বাড়ী বাড়ী ঘুরছে। কাউকে গিয়ে বলছে—'টাকা দাও', কাউকে বলচে—'এক গাড়ী চাল পাঠাব?' কাউকে বলচে—'চালের কিস্তি ডুবে গেছে।' আহা, ছেলেমানুষ, এই বয়সেই—আপনি একবার খপরটা নেবেন ত কাকা বালাটার সম্বন্ধে।"

"আচ্ছা তা নেব'খন। এখন উঠ্‌লুম তা'হলে, নইলে স'ছটার ট্রেন আর পাবোনা।" বলিয়া ধনেখালির খুড়া পীড়িত ভ্রাতুষ্পুত্রকে সাবধানে থাকিবার জন্য যথাবিহিত উপদেশাদি প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন এবং পরক্ষণেই হরিমতি ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। জগদীশ পূর্ব্ববৎ শয়নাবস্থাতেই ক্ষীণকণ্ঠে বলিল,—"উঃ গেলুম, ক'নেবৌ! আর বোধ হয় বাঁচবো—"

"দেখ, আর ঢং বাড়িও না, কত রকমই যে জান তুমি! ভ্যালা যা' হোক! তোমার সব ফন্দি বুঝতে পেরেছি। কাকার ঐ গহনার টাকাগুলো বুঝি গাপ্ কর্ব্বার মৎলবে আছ? আচ্ছা, এ সব কী কর্ত্তে লেগেছ তুমি?"

সেই মোটা কম্বলে তখনও সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত। গোঙাইতে গোঙাইতে জগদীশ বলিল—"আর বোলনা ক'নে বৌ! এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা! অর্থাৎ, কবিরাজীতে 'শব্দ কল্পদ্রুম্'! মাগো, গেলুম! তারা ব্রহ্মময়ী! ওগো হাঁ করে দেখছ কি? জান্‌লা দিয়ে দেখনা তিনি গেলেন কি না।"

"যাবেন না ত কি আর থাকবেন? ঐ ত যাচ্ছেন! ছিঃ ছিঃ, চিরটা কালই তোমার এই জুচ্চুরী!"

দু'হাতে কম্বলখানাকে ঠেলিয়া দিয়া জগদীশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"জুচ্চুরী কি রকম? যার আছে তার কাছ থেকে এ রকম ক'রে না নিলে সে দেয় কখনো? সুতরাং এতে দোষ মাত্রেন নাস্তি। আর তা' ছাড়া জোচ্চর ত সকলেই।"

"হ্যাঁ, সবাই তোমার মত জোচ্চোর!"

"নয় ত কি! একধার থেকে ধর। তোমার উকীল জোচ্চোর, ব্যারিষ্টার জোচ্চোর, ডাক্তার জোচ্চোর, মোক্তার জোচ্চোর, পাণ্ডা জোচ্চোর, গুণ্ডা জোচ্চোর, খদ্দের জোচ্চোর, দোকানদার জোচ্চোর, শিষ্যি জোচ্চোর, গুরু জোচ্চোর, বামুন—"

"থাম—থাম, বোকো না। উকীল—ব্যারিষ্টার—ডাক্তার—মোক্তার সব জোচ্চোর! যা' নয়—তাই!"

"উকীল জোচ্চোর নয় ?—মক্কেলের কাছ থেকে, আগে তাঁর ফী-এর টাকাটি কড়ায় গণ্ডায় নিলেন হাতিয়ে ; তারপর দিনের দিন, মকর্দ্দমার যখন ডাক পড়লো, তখন আর তাঁর দর্শন নেই, আর একটা কেস্ নিয়ে তখন তিনি আর এক ঘরে হাজির! এদিকে মক্কেল বেচারা বিশবার ক'রে দৌড়োদৌড়ি কত্তে লাগলো তাঁর কাছে, যেন দয়াময় তিনি —একটু দয়া করবেন!—তারপর ধর,—মক্কেল বলচে, 'পশ্চিম দিক, বাবু মশাই, ঠিকই সেটা পশ্চিম', তা'র উকীল বলচেন,—'না—না, পশ্চিম কিছুতেই নয়, বলতে হবে, ও একেবারে সোজাসুজি পুব।' এই ত উকীলের ব্যাপার। তারপর ধর, ব্যারিষ্টার। তিনি বিলেত থেকে 'ওথ্' নিয়ে এলেন যে কা'রো কাছ থেকে ফী বাবদ একটি পয়সাও গ্রহণ কর্ব্বেন না, কিন্তু তাঁর ফীয়ের গিনি থেকে কেউ কখনো তাঁকে একটি পাইপয়সাও বাদ দিতে দেখেছে ?—আর ডাক্তারের ত কথাই নেই। হোয়েছে যদি একটু সামান্য সর্দ্দিজ্বর, কি ধরেছে একটু ফিক্-ব্যথা, ব'লে বসলেন, প্রকাণ্ড একটা বদ্‌খৎ নাম—'গ্যালাক্‌টোগোগস্' কি 'হাইপোকন্‌ড্রিয়াসিস্'—'কেস্' বড় খারাপ—'হার্ট অ্যাট্যাক্' হ'বার খুবই 'চ্যান্স্'। বড় বড় গোটাকতক বাক্য ঝেড়ে, দিলেন বাড়ীশুদ্ধ সকলের মাথা একেবারে গুলিয়ে। তারপর, এই রকমারি ধরণের 'প্রেসক্রপসন্' লিখতে সুরু ক'রে, একদিকে খালি কত্তে লাগলেন রোগীর বাড়ীর ক্যাশ-বাক্স, আর অন্যদিকে বাড়াতে লাগলেন, নিজের নামের 'ব্যাঙ্ক-য়্যাকায়ুন্ট'। তারপর—"

"রক্ষে করো, আর 'তারপরে' কাজ নেই। যা নয়—তাই ? তা'হলে, বল না কেন যে জগৎশুদ্ধ সকলেই জোচ্চোর ?"

"আরে বলছি ত তাই। ঐ হালফিল দেখনা কেন, আর মিনিট পাঁচেক বাড়ী ফিরতে যদি আমার দেরী হ'ত তা' হ'লেই,—ভট্‌চায্ বুড়ো ছাপ্পান্নটি টাকা হাতিয়েছিল আর কি! সুতরাং জগৎ সুদ্ধই ত জোচ্চোর। ও তোমার গিয়ে রাজা থেকে আরম্ভ ক'রে মায় আরসোলা টিক্‌টিকি পর্য্যন্ত সব জোচ্চোর,—নয় কি বল ? স্বয়ং ভগবানকেও বাদ দেওয়া চলে না।"

"স্বয়ং ভগবানও তা'হলে জোচ্চোর! তবে দু'বেলা তোড়-জোড় করে তাঁর নাম জপ কত্তে ব'স কেন ?"

"ডাকাতেরা 'ডাকাত-কালী' পুজো করে জান ত ? সে মহা জোচ্চোরকে না ডাকলে কাজ সিদ্ধ হবে কেন ?"

"তা ভাল। এখন জল খাবারটা আনি ?"

"সে কথা আর বলতে। ক্ষিদেয় পেট একেবার চাঁইচুই কত্তে লেগেছে। 'ফ্ল্যাস্ক'টাও বার ক'রে দাও। দু' আউন্সের নেশাটা একেবারে ঘোলা মেরে গেল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—পুণ্ডরীকাক্ষ পতিতুণ্ডি—

আহারান্তে নিদ্রার পর জগদীশ নীচে বৈঠকখানায় আসিয়া যখন দরজা জানালা খুলিয়া বসিল, তখন বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। চিনিবাস চা আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল।

ঠিক সেই সময় একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক হঠাৎ সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া জগদীশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"মশাই গো, নম—স্কার! দয়া করে এক ঘটী জল যদি আনিয়ে দেন, তেষ্টাও পেয়েছে বটে, মৌতাতেরও সময়টা হয়েছে। ক'টা বাজ্‌লো বল্‌তে পারেন ?—গোটা চারেক হবে না ? একটু বস্‌তে পারি বোধ হয় এখানে আপনার ?" প্রশ্নকর্ত্তা শুধু প্রশ্নই করিল মাত্র ; উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া সটান বসিয়া পড়িল। লোকটির মুখের দিকে চাহিয়া জগদীশ শুধু জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নাম কি বাপু,—আসছ কোত্থেকে ?"

"থেকে যে কোথা, তা আর কি বলবো। উপস্থিত, ঐ রাস্তার ফুট্‌পাথ থেকেই ধ'রে নিন্। ভবঘুরে লোক,—নির্দ্ধারিত আস্তানা ত কোন জায়গায় নেই যে নাম ক'রে দোবো।" তারপর চায়ের পেয়ালার দিকে নজর পড়িতেই লোকটি বলিয়া উঠিল,—"চা খাবেন নাকি ?—আচ্ছা, এ পেয়ালাটা আমায় দিন, আপনি দয়া ক'রে আর এক পেয়ালা আনিয়ে নিন্ দেবতা। চা'টা হ'লে আফিংটা মজে ভাল।" বলিয়া একটি ছোট্ট কৌটা হইতে একটি আফিং-এর গুলি বাহির করিয়া আলগোছে মুখের ভিতর ফেলিয়া দিল এবং

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

চায়ের বাটিটি টানিয়া লইয়া দ্বিধাশূন্য নির্ব্বিকার মনে তাহাতে চুমুক দিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

লোকটির আচরণে জগদীশ বিন্দুমাত্রও আশ্চর্য্যান্বিত বা বিরক্ত হইল না। কেবল একদৃষ্টে তাহার সেই তাঁবাটে রঙের, ছিপ্‌ছিপে পাকাটে চেহারা, তাহার গোলাকৃতি নিষ্প্রভ চক্ষু এবং তাহার বাক্যালাপের ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিল।

চা খাইতে খাইতে লোকটি বলিতে লাগিল,—"কি জানেন? চা জিনিসটা বড় তোয়াজী, আফিংটার সঙ্গে জুৎ হয় ভাল। পয়সা কড়ির ত সম্বল নেই, ভিকিরি মানুষ, খেতেই পাই না, তা' আবার চা। তবু আজ যা হোক, মশায়ের দয়াতে চা'টা খাওয়া হ'ল মন্দ নয়।" বলিয়া খালি চায়ের বাটীটা টেবিলের উপর রাখিয়া, পকেট হইতে একটা পোড়া আধখানা সিগারেট্ বাহির করিয়া বলিল,—একবার দেশলাইটা দয়া করুন দয়াময়!"

জগদীশ চিনিবাসকে ডাকিয়া আর এক পেয়ালা চা আনিতে বলিয়া, লোকটির দিকে চাহিয়া বলিল—"আসচো কোত্থেকে, তা ত শুনলুম, এখন যাবে কোথায়?"

"আজ্ঞে যাবার ঠিকানাটা ঠিক আছে। ষ্টিফেন্‌সন সাহেবের কাছে যখন কাজ কর্ত্তুম, তখন মাইনের টাকা থেকে বড় বাবুর কাছে মাসে গোটা কুড়ি ক'রে টাকা জমা রাখ্‌তুম্। প্রায় শ'তিনেক টাকা হয়েছিল। তারপর আজ আট মাস হ'ল চাক্‌রীটা ছেড়ে দিয়িছি। এখন ঐ টাকাটার জন্যে বাবুর কাছে মাঝে মাঝে যাই। গোটা সতের টাকা এই ক'মাসে দিয়েচ্চেন। এই পূজোর ঝোঁকটায় যদি দু-পাঁচ টাকা পাই, তাই যাচ্ছি একবার তাঁর কাছে।"

"তিনশ'র ভেতর আট মাসে সতের পেয়েছ ত? আর সেখানে যাবার দরকার আছে ব'লে মনে কর? তা তোমার নামটা ত বল্লে না?"

"আমার নাম পুণ্ডরীকাক্ষ পতিতুণ্ডি।"

"ওরে বাসরে! তা ভাল। তা'হলে ব্রাহ্মণ?"

"আজ্ঞে ছিলুম্ বটে এককালে, এখন আর নেই।"

"কি রকম্?"

"সে অনেক ব্যাপার। সংক্ষেপে বলি। বাবা সর্ব্বস্ব খুইয়ে তিনবার ফেলের পর, চার বারের বার আমায় এনট্রান্স পাশ করালেন, তারপরই হঠাৎ গেলেন ম'রে। দিয়ে গেলেন পাঁচশো টাকা দেনা, লক্ষ্মীজনার্দ্দন ঠাকুর, আর তাঁদের নিত্য সেবা! দেনা আর পেটের দায়ে ত অস্থির ক'রে তুল্‌লে। একটা চাকরি-বাকরি কত্তে যে কলকাতায় চ'লে আস্‌বো, লক্ষ্মীজনার্দ্দন রইলেন পথ আটকে! গাঁয়ের দোর দোর খোসামুদি ক'রে বেড়ালুম, কেউ যদি কিছুদিনের জন্যে ঠাকুরের ভার নেয়, কেউ নিলে না। তখন বাঁধলুম ঠাকুরকে একটা ছেঁড়া গামছায়, তারপর কোলকেতায় এসে দিলুম্ একেবারে নিশ্চিন্দি ক'রে, পোলের ওপর থেকে গঙ্গায় ফেলে। ঠাকুরও জুড়ুলেন, আমিও জুড়ুলুম্। ও মশাই! কি ক'রে এদিকে ব্যাটারা পেলে টের! আর গাঁ সুদ্ধু সকলে মিলে পরামর্শ ক'রে দিলে আমায় একঘরে ক'রে।"

"এ যে একটা উপন্যাস হে পতিতুণ্ডি!"

"আজ্ঞে, আরো আছে রাজা, শুনুন্ একবার কাহিনীটা। একঘরে হ'য়ে ত থাকি। ছোটলোক ছাড়া, ভদ্দরের ভেতর কেউ বাড়ীতে আসেও না ডাকেও না। ওদিকে 'ষ্টিফেন্‌সন্' সাহেবের 'অণ্ডারে' চাকরী ত নিয়েছি এক বাগিয়ে, ত্রিশ টাকা মাইনে। শনিবার শনিবার বিকেলের ট্রেণে বাড়ি আসি। দু'রাত একদিন থেকে আবার সোমবার গিয়ে আফিস করি। এই রকম এক শনিবার বাড়ী এসেছি। শুনলুম সেই রাত্রে নবা বাগ্দির মেয়ের বিয়ে। রাত কত বল্‌তে পারি না নবার ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। নবা পা' দুটো জড়িয়ে বল্লে, 'কি হবে দা'ঠাকুর, মেয়ের আমার বিয়ে হয় না।' আমি বল্লুম 'অপরাধ'? নবা বল্লে,—'আমাদের বামুন ঠাকুর বলচে, যে দশ টাকা না হ'লে আসনে বোস্‌বেন না। খেতে পাইনে দা'ঠাকুর দশ টাকা কোত্থেকে দি, বলত একবার তুমি।' আমি তখনি ঘরে শেকল লাগিয়ে নবাইকে বল্লুম—'তোকে এক আধলা দিতে হবে না। চ'—আমি তোর মেয়ের বিয়ে দিয়ে দোবো।' দিলুমও তাই। মন্তর টন্তর কী যে তখন বলেছিলুম্ আর বলিয়েছিলুম্, তা জানি না, কিন্তু বিয়েটা তাদের সে রাত্রে ঠিকই হ'য়ে গেল। অনেক দিন পরে ও বছর মগরায় ইষ্টিসনে সৈরভীর সঙ্গে

দেখা হ'ল। ছেলে পুলে নিয়ে তারা ত্রিবেণীর মেলা দেখতে এসেছিল। দুজনে পায়ের ধুলো নিয়ে ত অস্থির ক'রে তুল্লে। যা'ক্—যা বল্‌ছিলুম্। বিয়ে ত দিয়ে দিলুম্। সকালে বাড়ী এসে দেখি, উঠানে গাঁ সুদ্ধু জড় হয়েছে। আমি এসে দাঁড়াতেই জনকতক ধ'রে আমায় বসিয়ে দিয়ে, নাপ্‌তেকে ডেকে, দিলে আমায় নেড়া ক'রে। তারপর জন দুই এসে, দিলে আমার মাথার ওপর কলসীখানেক ঘোল ঢেলে। অবশেষে ধনঞ্জয়ের সুব্যবস্থা। একজন নিলে পৈতে গাছটা খুলে, আর বাকি সকলে চাঁদা ক'রে মারতে মারতে দিলে গাঁয়ের বের ক'রে। তারপর—"

"আচ্ছা, তারপরের যা', তা পরেই শুনবো এখন। উপস্থিত বড়বাবুর কাছে আর গিয়ে কাজ নেই। আজ থেকে এইখানেই স্থিতি হো'ক ;—রাজী আছ ত ?"

"বরাবর ?"

"বরাবর।"

"আফিং ?"

"ফুরুলেই পাবে।"

চেয়ার হইতে উঠিয়া পতিতুণ্ডি জগদীশের পায়ের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল,—"পায়ের ধুলোটা দিন দেবতা! যা' বলবেন, শর্ম্মার দ্বারা সবই হবে. কোন কাজেই পেছপা পাবেন না। পেট্‌টা আর আফিংয়ের কৌটাটা যদি ভরিয়ে রাখেন দয়াময়, তা'হলে কী আর বলবো—"

"কিছু আর বলবার দরকার নেই। তা পৈতে গাছটা কী সেই থেকে এখনো নেই নাকি ?"

"বহুকালই ছিল না বটে, কিন্তু বছরখানেক হ'ল, আবার পরিচি। ও গাছটা থাকলে, অনেক সময় অনেক কাজে বেশ একটু সুবিধে হয়।"

"বেশ করেছ। তা হ'লে—"

"রাম্-রাম্ জোগোদীশ বাবু! তবীয়দ্ আচ্ছা আছে ত ?"

"আরে, রাম্ রাম্! আইয়ে আইয়ে।" জগদীশ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—"আপনাদের কাঙালী ভোজনের কি হোল, কিছুই ত আর খবর দিলেন না সুরজমল বাবু?"

বাবু সুরজমল মাড়োয়ারী চেয়ারখানি টানিয়া বসিয়া পাক দেওয়া গোঁফের পাশে মিঠা হাসি ছড়াইয়া বলিলেন,—"স্রেফ্ খবর দিলেই ত কুছু হোবে না বাবু সাব্, লেকেন্, রূপেয়া ভি ত দেনে হোবে। পঁচাশ হাজার কাঙালী খিলানো হোবে, পান্‌শো মন চাউল ত লাগ্‌বেই করবে!"

"তা ত লাগ্‌বেই। তিন দিন ধ'রে সহরের সমস্ত কাঙালীদের খাওয়ান—"

"ওহি বাত্ ত হামভি বল্‌ছে। লেকেন রোপেয়া ত আপনাকে বিলকুল্ দিয়ে দিতে হোবে জোগোদীশ বাবু?"

"রোপেয়া দিয়ে দিতে হ'বে বৈ কি। তবে চা'ল আপনার মজুত আছে জানবেন। যে দিন বলবেন, সেই দিনই পাবেন। আর ভাও, যা ব'লে দিয়িছি—সাত টাকা—বাজারে কেউ এ ভাওয়ে দিতে পার্ব্বে না। ভাঁড়ার গড়ের মাঠেই হবে ত ?"

"ব্যস্। একদম্ পছিমতরফ-ওয়ালা বঁড়িয়া তাঁবু। ত' বাত্ অউর কুচ্ নেহি জোগোদীশবাবু। পাঁন শো মন তা হ'লে কাল সবেরে ভেজিয়ে দিয়ে দেবেন। রোপেয়াটা হিসাব করে লিয়ে লিন্" বলিয়া বাবু সুরজমল একতাড়া নোট জগদীশের হাতে দিয়া বলিল,—"লিন্ —গিণিয়ে লিন্।"

জগদীশ নোটগুলি মিলাইয়া লইয়া বলিল,—"তিন হাজার দু'শো—"

"বত্তিশ্ শও হোলো ত? আউর তিনো শ, কাল সবেরে হামি ভেজিয়ে দেবে।"

"বহুৎ আচ্ছা। কাল সকালেই আমি পাঁচ শ' মন চাল পাঠিয়ে দোবো। আর কোন খবর?"

"ব্যস্" বলিয়া বাবু সুরজমল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ডাইন হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী দ্বারা ডাইন দিকের পাকানো গোঁফটাকে আরও একটু পাক দিয়া বাঁকাইয়া বলিলেন,—"বহুৎ কাম আছে, রাম রাম জোগোদীশ বাবু।"

"রাম রাম।"

সুরজমল চলিয়া গেলে, জগদীশ চিনিবাসকে হাঁক দিয়া ডাকিল, চিনিবাস আসিলে বলিল,—"ত্থাখ্ চা'লের

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

আড়তে গিয়ে ব'লে আয়, বাবু এখনি বাইরে কোথায় চ'লে যাবেন, তোমাদের টাকা নিতে ডাকছেন,—হ্যাঁ, আর ভাখ্, এই পতিতুণ্ডি বাবু আজ থেকে এখানে খাবেন দাবেন, থাকবেন,—তোর মাকে ব'লে আয়।"

"আসচি। বামুন দিদি অনেকক্ষণ থেকে এসে ব'সে আছে।"

"কে বামুন দিদি ?"

"ঐ ভবানীপুরের।"

অন্দরের দরজার দিকে চাহিয়া জগদীশ ডাকিল,—"কৈ, কোথায়, ও কেষ্টর মা,—কি খবর তোমার ?"

থান পরিহিতা একটী প্রৌঢ়া বিধবা, একটী ছোট ছেলের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহার দিকে চাহিয়া জগদীশ বলিল,—"আমি ভারি ব্যস্ত। তোমাদের কি, বল দেখি শীগ্‌গির।"

ঘোমটার ভিতর হইতে অতি ধীরে ধীরে স্ত্রীলোকটী বলিল,—"এ মাসের—"

"কেন ? এ মাসের টাকা ত আমি পাঠিয়ে দিয়িছি! তোমাদের ওদিক্‌কার সাত ঘরের পঁইত্রিশ টাকা আজই সকালে নন্দকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়িছি। তুমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছ কখন ? হ্যাঁ, ঐ গোবিন্দের ঠাকুমাকে গোবিন্দের এ মাসের স্কুলের মাইনের টাকাটা দিতে ভুলে গেছি, আর স্কুলও ত এখন বন্ধ হোয়ে গেছে।"

"আর বাবা, আর একটি ভদ্দর ঘরের মেয়ে, আহা, কেউ-ই আর নেই—বড়ই কষ্ট পাচ্ছে। উপযুক্ত ছেলেটি তার সম্প্রতি মারা—"

"আচ্ছা, আমাকে কি তোমরা রাজা না জমিদার পেয়েছ বল দেখি ? দোহাই তোমাদের, আর ঝক্কি বাড়িও না। আমি নিজে পাইনে খেতে, আর তোমরা ক্রমেই—না বাপু, আর আমার দ্বারা হবে টবে না। আমি কি দানছত্র খুলে বসিচি ?"

"বড্ড কষ্টে বউটা দিন কাটাচ্চে বাবা। গলায় আবার একটি কচি স্তাওর-পো। কি কষ্টে যে দিন তাদের যাচ্চে বাবা! গরীব হোয়ে পড়েছে, কিন্তু হ্যাংলাটি কত্তে পারে না। ভদ্দর ঘরের বউ!"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া জগদীশ বার দুই অস্ফুটে নিজে নিজেই বলিল,—"গরীব হোয়ে পড়েছে,—হ্যাংলাটি কত্তে পারে না!" তারপর পতিতুণ্ডির দিকে চাহিয়া বলিল,—ওহে পতিতুণ্ডি, শুনচো ? গরীব হোয়ে পড়েচে, হ্যাংলাটি কত্তে পারে না! বোঝ কিছু ?—ও সব হবে টবে না, কেষ্টর মা,—ভেগে পড়। আমার নিজের মদের খরচই জোটাতে পারি না, তা'র খবর রাখ ? তবে, নেশার ঝোঁকে ব'লে ফেলি,—তাই আমার জন্ম হয়েছে সুধু নিতে—দিতে নয়। সুতরাং, ওসব আশা ছেড়ে দাও।"

কেষ্টর মা এক পা এক পা করিয়া চলিয়া আসিতেছিল, জগদীশ ডাকিয়া বলিল,—"মেয়েটিকে সঙ্গে ক'রে একদিন নিয়ে এস ক'নেবৌর কাছে,—বুঝলে ? আর কোন কথা নেই ত ?"

"আর একটা কথা বাবা,—

"বাবা টাবা আর নয়। ভেগে পড় এখন। আমার অনেক কাজ। বিস্তর টাকার দরকার। দু'লাখ, চার লাখ, দশ লাখ দিতে পার কেউ ?—এ ব্যাটা গেল কোথা ? ওরে চিনে,—চিনিবাস !— ওরে আমার 'ফ্লাস্ক্'টা—

"চিনিবাস সে কোথায় বেরিয়ে গেল বাবা।"

"ওঃ,—গোল্লায় গেছে, না ?—পতিতুণ্ডি, কি রকম, আফিং ধরেছে না কি ? একটু জলটল খাবারও ত দরকার হোয়ে পড়েছে, কি বল ? আচ্ছা, বোস, আমি আসচি। কেষ্টর মা, যা' বলবার থাকে-টাকে, ক'নেবৌর কাছে গিয়ে বল, আমায় আর কেন জ্বালাও। তোমাদের 'ম্যানেজার' রয়েচে যখন—"

জগদীশ উঠিয়া বাটীর ভিতর চলিয়া গেল।

পতিতুণ্ডির নেশাটা তখন সত্যসত্যই বেশ ঘোর হইয়া জমিয়া আসিতেছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—শ্রীফল-কোঁকোর-কোঁ—

দুর্গাপূজার আনন্দ উৎসব সব শেষ হইয়া গিয়াছে। ছুটীর পর আফিস আদালত আবার সব খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রাতঃকালেই সাহেবী পোষাকে সজ্জিত হইয়া

জগদীশ, জে লোহিড়ী এস্‌কোয়ার হইয়া যখন উপর হইতে নামিয়া আসিয়া নীচে বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিল, পতিতুণ্ডি তখন বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া খরচের হিসাব মিলাইতেছিল।

জগদীশ জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয় পুণ্ডরীকাক্ষ পতিতুণ্ডি? বাপ! নাম বটে! দাঁত ভেঙে যাবার উপক্রম।"

পতিতুণ্ডি তাহার কাগজখানি হইতে চক্ষু না তুলিয়াই বলিল,—"দু'আনা পয়সা যে কিছুতেই মেলাতে পাচ্চি না দেবতা।"

"দেখি, দাও তোমার কাগজ পেন্সিল আমার কাছে" বলিয়া হিসাবের কাগজখানির যেখানে পতিতুণ্ডি কসি টানিয়া ৩৸৵০ আনা যোগ দিয়া মাথা ঘামাইতেছিল, জগদীশ তাহারই নীচে 'পতিতুণ্ডির আফিং দুই আনা' লিখিয়া কাগজখানি ছুড়িয়া দিয়া বলিল—"এই নাও, দেখ, চারে চারে একেবারে ঠিক মিল। আচ্ছা পতিতুণ্ডি, তোমার গাঁয়ের নামটা ত একদিনও বলনি, যেখান থেকে তোমার চির-নির্ব্বাসন-প্রাপ্তি ঘটেছে?"

"সে আর সকালবেলা শুনে দরকার নেই।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ, সকালবেলা, সে নামটা কেউ করে না আর কি। হাঁড়ি-ফাটা নাম, বুঝ্‌লেন না দয়াময়।"

"আমার পেতলের হাঁড়ী ফাট্‌বে না, তুমি বল।"

"নেহাৎ বলতেই হবে? 'শ্রীফল-কোঁক্কোর-কোঁ'।"

"শ্রীফল-কোঁকোর-কোঁ? তার মানে?"

"তার মানে,—আসল নামটা আর মুখে উচ্চারণ করবো না, একটু ঘুরিয়ে বল্‌লুম। এই নামেই বলে সকলে।"

"'শ্রীফল' ত তোমার 'বেল' আর 'কোঁকোর' কি? খালি পেটে মালটাল পড়লে, পেট ত কোঁকোর কোঁ করে।"

"উঁ-হুঁ-হুঁ, প্রথমটা ধরেছিলেন ঠিকই, কি পাখীতে কোঁকোর-কোঁ করে বলুন না?"

"ওঃ বুঝিছি, মুরগী—

"হয়েছে হয়েছে,—আর একটু কাছাকাছি আসুন।"

"আর একটু কাছাকাছি হ'ল গিয়ে তোমার 'মদ',—মুরগী আর মদ—একটু কেন খুবই কাছাকাছি।"

"দেবতা, অতটা ক'রে রোজ মাল খান বটে, কিন্তু বুঝতে আপনার বড্ড বেশী দেরী হয়। মুরগীকে চল্‌তি কথায় আর কি বলে?"

"চলতি কথায় বলে 'ফাউল'।"

"আহা-হা ইংরেজীর দিকে যাচ্চেন কেন? বাংলায় নেবে আসুন না।"

"বাংলা?—'রামপাখী'?"

"আর?"

"কুঁক্—

"এই হোয়েছে।"

"কুঁক্‌ড়ো?—তা'হলে 'বেল-কুঁক্‌ড়ো?"

"এঃ, নামটা ক'রে ফেল্লেন দেবতা?"

"কোন ভয় নেই হে, যেখানে মা দ্রবময়ী নিত্য প্রবাহিতা, কালাচাঁদের যেখানে নিত্য নিত্য দু'বেলা সেবা চলে, সে বাড়ীতে কি কখন হাঁড়ী ফাটে পতিতুণ্ডি? যাক্ অজেদ্ গাড়ী আন্‌লো না এখনো, আট্‌টা বাজে, এত দেরী হচ্ছে কেন?"

"কোথায় বেরুবেন রাজা? সকাল বেলাতেই আজ চোখ দু'টো বড্ড চক্‌চকে দেখ্‌ছি যে?"

"নিলুম গোটা দুই পেগ টেনে, ঘোরাঘুরি কত্তে হবে অনেক! বড্ড অস্থির হ'য়ে আছি পতিতুণ্ডি। এইটে লাগ্‌লেই, ব্যস্, 'বিট্ দি ফোর্ট উইলিয়ম্',—একেবারে লাখ তিনেক হস্তগত। তা'হলেই রিটায়ার্ড হ'য়ে বসা আর কি! ভগবানকে ভাল ক'রে ডাক পতিতুণ্ডী; লেগে গেলেই তোমাকে ভরি পাঁচেক্ আফিং একেবারে খাইয়ে দোব।"

"তা দেবেন বৈকি রাজা, এম্‌নিই ভালবাসেন বটে! আচ্ছা, তা না হয়—'

"কি হে হৃষিকেশ চন্দর, খবর কি? চেক্ নাকি ডিস্অনার্ড ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছে?"

একটি মিশ্‌কালো রংয়ের মোটা-সোটা, নাদুস্-নুদুস্ খর্ব্বাকৃতি লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; গলায় তুলসীর

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

মালা, আর ময়লা ঢিলে পাঞ্জাবী গায়ে, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো. গোঁপ কামান হইলেও, তাহার কাঁচা-পাকা চুলগুলি চিক্‌চিক্‌ করিয়া উঁকি দিতেছিল। লোকটি প্রবেশ করিয়াই অনেকখানি ঝুঁইয়া পড়িয়া, যুক্ত হাত দু'টি কপালে ঠেকাইয়া বলিল,—"পাতঃপেন্নাম্,—চেকখানা 'দিজোন্নাড্' ক'রেই ফিরিয়ে দিয়েছে হুজুর।"

"ডিস্‌অনার্ড করে ফিরিয়ে দেওয়াচ্চি আমি! পাঁচ হাজার থাকৃতে থাকৃতেই আমি যার বিশ হাজার জমা দিয়ে রাখি, আমার চেক্ 'ডিস্-অনার্ড'! মজাটা টের পাওয়াচ্চি আমি!"

"পাওয়াবেন বৈ কি হুজুর! আপনি হচ্চেন কী দরের লোক! আপনার সঙ্গে কি না—তবে, হুজুরের কাছে একটা নিবেদন করি" বলিয়া চাউলের আড়তদার হৃষিকেশ সা আর একবার হাত দুইটী জোড় করিয়া বলিল,—"বড্ডই টাকার টান্। আপনার এমন বেশী কিছুই নয়;—সবশুদ্ধ ত মোটে তিনহাজার সাত শ' একান্ন। যদি দয়া করে হুজুর ওটা নগদই দিয়ে দেন ত—

"কিছুতেই না। 'ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক'কে আমি দেখাচ্চি একবার মজাখানা। বাপ্ বাপ্ ব'লে ঐ 'চেকে'র টাকা ডেকে দিতে হবে না? এই জন্যেই ত যাচ্চি এখনি 'কম্যাণ্ডার-ইন্‌চীফে'র কাছে—এই যে, অজেদ্ এসেছ। আরে আটটা বেজে গেল, এত দেরী ক'রে গাড়ী নিয়ে এলে যা? নাও—নাও, আর দেরী কোরো না—'ষ্টার্ট' দাও।"

জগদীশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

আড়তদার হৃষিকেশ সা তেমনি জোড়হস্তে কহিল,—"হুজুর, আপনার হাত ঝাড়লেই পর্ব্বত! টাকাটা আটকে থাকলে—"

"না-না তা' কি হয়। আমি টাকাটা দিয়ে দিলেই ত চুকে গেল। 'ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক'কে একবার মজাটা দেখান দরকার কি না। টাকার জন্যে তোমার কোন ভাব্‌না নেই হৃষিকেশ। এই দেখ না, পাঁচ সাত দিনের মধ্যে ডেকে তোমাকে টাকা দিতে হয় কি না।"

জগদীশ গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিল। পিছনে পিছনে হৃষিকেশও গাড়ীর ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। জগদীশ জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ-হে সা', এবার আমার খাবার চা'ল যা' দিয়েছিলে, ও কি রেঙ্গুন না কি?

চক্ষু খানিকটা কপালের উপর তুলিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বা খানিকটা বাহির করিয়া হৃষিকেশ বলিল,—"বলেন কি হুজুর! দশটাকা মণের 'কাটারি ভোগ্ চা'ল—"

"না-না—ও 'কুলি-রাইস্' খাওয়া আমার চলবে না, ম'রে যাব তা হলে,—বুঝলে? বলি, ওর ওপর কিছু আছে?"

"ওর ওপরে ত চা'লই হয় না হুজুর। তবে, পাঁচ-খানা বস্তা 'বাদশা ভোগ' এক আড়ৎ থেকে এসেছে,—বলেন ত পাঠিয়ে দোবো ঐ পাঁচখানা বস্তা; কিন্তু বেজায় দাম, আমাদেরি খরিদ, হুজুর, দশটাকা সাড়ে তের আনা ক'রে।"

"আরে দশটাকা হো'ক বার টাকা হো'ক তা'তে কি; খেতে পারা যাবে ত? আচ্ছা, দিও ঐ পাঁচখানা বস্তা পাঠিয়ে। আজই দিও, চাল প্রায় ঘরে শেষ হ'য়ে এসেছে।"

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। হৃষিকেশ আর একবার ঝুঁইয়া পড়িয়া প্রণাম করিয়া যখন মাথা তুলিল, তখন জগদীশের 'মোটর' অনেক্‌দূর চলিয়া গিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—আবার ধনেখালির খুড়া—

"দেবতা, কাশী থেকে ফিরবেন কবে তাহ'লে?"

"দিন চারেকের মধ্যেই ফিরবো, কিন্তু যাওয়া বোধ হয় আজকাল ঘটে উঠবে না, পতিতুণ্ডি। 'বন্দেমাতরম্ ব্যাঙ্কে'র একটা হেস্ত নেস্ত না ক'রে আর নড়চি না। সেই ত লাল বাতি জ্বালাবি বাবা, গরীবকে দু'চার লাখ দিতে এত টালমাটাল কচ্চিস্ কেন!"

"ব্যাঙ্কের কি সব হেঁয়ালীর ব্যাপার, কিছুই বুঝতে পারি না, রাজা। মোটা মোটা টাকা একবার জমা দিচ্ছেন, আবার তুলে নিচ্চেন, আবার জমা রাখ্‌ছেন, এ সব—"

"ও সব আর বুঝেও দরকার নেই পতিতুণ্ডি। এই রকম্ দিতে নিতে, দিতে নিতে, শেষে লাখ তিন চার 'ওভারড্রাফ্ট' দিয়ে আমাকে সাধু-শ্রেষ্ঠ ম্যানেজার বাবু দয়া করবেন আর কি। তারপর তাঁর সঙ্গে আধাআধি বখ্রা। একবার হস্তগত কত্তে পাল্লে হয়। তারপর শম্মার কাছ থেকে ভাগ নেওয়াব এখন।—যাক্ এ হপ্তার মধ্যে বোধ হয় আমার কোলকাতা ছেড়ে কোথাও যাওয়া চল্‌ছে না পতিতুণ্ডি। আজ তোমার কি বার হোল বল দেখি?"

"আজ হ'ল আপনার মঙ্গলবার।"

"আজ মঙ্গলবার? ধনেখালির খুড়ো ত তা হ'লে আজই আসবেন।—এই যে অজেদ এসেছে, বোসো।"

ট্যাক্‌সিও'লা আলি অজেদ্, জগদীশের কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী। তাহার একসময়কার ভয়ানক দারিদ্র্য হইতে বর্ত্তমানে তাহার এই সাংসারিক সচ্ছলতা প্রধানতঃ জগদীশেরই সাহায্যে এবং উপদেশে হইয়াছে। সুতরাং অনেক কার্য্যেই সে জগদীশের দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ ছিল।

অজেদ্ আসন গ্রহণ করিলে জগদীশ বলিল—"দেখ, আজ বারোটার মধ্যেই আমায় বেরুতে হবে, তার আগেই গাড়ী আনবে। আগে 'বন্দেমাতরম ব্যাঙ্ক' তারপর আরও দু'এক যায়গায় যেতে হবে। তারপর বৈকেলে আমার ধনেখালির খুড়ো আসবেন। তার হাঙ্গামাটা আজ চুকিয়ে দিতে হবে। যা' বলি বেশ ভাল ক'রে শুনে নাও" বলিয়া জগদীশ অজেদ্‌কে চুপি চুপি অনেকক্ষণ ধরিয়া কি সব বলিয়া দিল। তারপর পতিতুণ্ডিকে বলিল,—"ওহে, তোমার মার কাছ থেকে ধনেখালির খুড়োর বাক্সটা চেয়ে নিয়ে এস দেখি, আর আশীটা টাকা।"

পতিতুণ্ডি উঠিয়া গেল এবং কিছু পরে খানকতক নোট এবং একটা ছোট চামড়ার বাক্স আনিয়া টেবিলের উপর জগদীশের সম্মুখে রাখিল।

অজেদের হাতে নোট কখানি দিয়া জগদীশ বলিল—"তোমার সেপ্টেম্বরের ৭৮৲ টাকা ট্যাক্সির পাওনা হয়েছে ত? এই নাও। আর, এই গয়নার বাক্সটা একবার দেখে রাখ।"

অজেদ নোটগুলি হাতে লইয়া, বাক্সটি খুলিয়া বলিল,—"একি সবই জড়োয়া?"

"এতদিন আমার সঙ্গে ঘুরেও তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছু হোলনা অজেদ। আরে সবই কেমিকেলের ওপর লাল-নীল কাচ বসান। সেই জন্যেই ত এটা দিতেও হবে যেমন, তেমনি আবার নিতেও হবে। কি বললুম তবে এতক্ষণ ধরে।"

হাসিতে হাসিতে অজেদ বলিল,—"এইবার বুঝিছি।"

"ছাই বুঝেছ। তোমার চেয়ে পতিতুণ্ডির আমার মাথা সাফ্ আছে। যাও, ঐ দু'টাকা বেশী দিয়িছি, নেশা-টেশা খেয়ে মাথা ঠিক ক'রে নাওগে।"

* * * *

বেলা প্রায় পাঁচ্‌টা। ধনেখালির খুড়া গহনার বাক্‌সটি হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"স'ছটার ট্রেণ, খুবই পাব; কি বল জগদীশ?"

"হ্যাঁ, তা খুব পাবেন। এখন পাঁচটাও বাজেনি। তা'হলে গয়না আপনার সব পছন্দ হয়েছে ত কাকা?"

"এমন গয়না যদি না পছন্দ হবে, কী পছন্দ হবে বাবা? তুমি যে উব্‌গার করলে, তা আর কী বলবো, ভগবান তোমার দিন দিন উন্নতি করুন। শরীরটা—"

"কিন্তু কাকা, অতগুলো গয়না নিয়ে 'ট্রামেতে' আর আপনার গিয়ে কাজ নেই। কোলকেতা যায়গা,—পথে ঘাটে কত রকমের জোচ্চোর,—বলা যায় না ত কিছু।"

"আমিও তাই বলি বাবা। তুমি আমায় ট্যাক্‌সি একখানা আনিয়ে দাও। কত আর ভাড়া নেবে।"

"এই সিকেপাঁচেকের মধ্যেই আর কি। ওহে পতি-তুণ্ডি, কোথায় গেলে?—ছাখ, বাঁ করে একখানা ট্যাক্‌সি ডেকে আন দেখি,—এই মোড়েই পাবে এখন।"

পতিতুণ্ডি অনতিবিলম্বেই একখানা ট্যাক্‌সি আনিয়া হাজির করিল এবং ধনেখালির খুড়া জগদীশকে আর এক দফা আশীর্ব্বাদ ও ভগবানের কাছে তাহার জন্যে শুভ কামনা ইত্যাদি জানাইয়া গহনার বাক্সটি একটি কাপড়ে জড়াইয়া লইয়া গাড়ীতে যাইয়া উঠিয়া বসিল।

পাগার রেখা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত মনীষী দে

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

* * * *

সন্ধ্যার পর বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া 'ফ্লাস্ক'টিকে সম্মুখে করিয়া জগদীশ কিসের একখানা হিসাবের কাগজ দেখিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে দু'এক 'পেগে'র সদ্ব্যবহার করিতে করিতে পতিতুণ্ডির সহিত নানাপ্রকার রসালাপও করিতেছিল।

অজেদ দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ করিল এবং জগদীশের সম্মুখে কাপড় জড়ানো গহনার সেই বাক্সটি এবং কাগজের মোড়ক সুদ্ধ তিন্‌টি টাকা ও চারি আনার পয়সা রাখিয়া বলিল,—"এই নিন্ আপনার বাক্‌স, আর এই নিন তের সিকে।"

"কাজ 'ক্লিয়ার্' করেছ তা হ'লে।—তা, এ তের সিকেটা কিসের?"

"ওই কাপড়েরই খুঁটে বাঁধা ছিল, একখানা পাঁচ টাকার নোট, আর দু'টো টাকা। তারই ফেরৎ ঐ তের সিকে,—"

"কি রকম্‌টা হ'ল বল দেখি?"

"হওয়া-হ'য়ি আর কি। এরাস্তা-সেরাস্তা ঘুরিয়ে, গিয়ে পড়্‌লুম্ একেবারে 'রেস্-কোর্সে'র সাম্‌নে। তার পর হঠাৎ দিলুম গাড়ী একেবারে থামিয়ে। উনি জিজ্ঞেস কল্লেন—'কি হ'ল হে?' আমি বল্লুম—'পেট্রল গরম হয়ে গেছে, তা কোন ভয় নেই, আপনি বসুন'। উনি বল্লেন, —'জ'লে-ক'লে উঠ্‌বে না ত হে' বলে গাড়ী থেকে তাড়াতাড়ী নেবে পড়লেন। আর যেই পড়লেন নেবে, 'ষ্টার্ট'-দেওয়াই ছিল, দিলুম একেবারে ঝড়ের মত গাড়ী ছুটিয়ে। অনেক দূর এসে একবার ফিরে চেয়ে দেখলুম্, তিনি হতভম্ব হ'য়ে, যেমন দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ত আর কোনদিকে না চেয়ে 'ফুল মোশনে' জিরেট্ পোল পেরিয়ে একেবারে পড়লুম গিয়ে খিদিরপুরের রাস্তায়। 'র‍্যাশ্-ড্রাইভে'র জন্যে পথে ধরলে এসে এক ব্যাটা পাহারাওলা। নিজের কাছে সুধু গণ্ডা চার পাঁচ পয়সা পুঁজি। তারপর দেখি, কাপড় খানার খুঁটে ঐ সাতটা টাকা বাঁধা। দিলুম সে ব্যাটাকে দুটো টাকা। থাক্‌লো পাঁচ। তারপর, পরিশ্রমটা বড্ড বেশী হয়েছিল, ক্ষিদেও পেয়েছিল,—কোয়ার্টার খানেক খেয়ে শরীরটাকে একটু তাজা ক'রে নিলুম, খাবারও কিছু খেলুম। তা'তে গেল আরও সিকে সাতেক। এই গেল আপনার তিন টাকা বারো আনা, আর বাকী ঐ তের সিকে।"

'ফ্লাস্ক্' হইতে একটি 'পেগ্' ঢালিয়া পান করিয়া, জগদীশ বলিল,—"বহুৎ আচ্ছা, অজেদ আলি মণ্ডল! সাগ্‌রেদী কত্তে পারবে বটে!—তা' এ তের সিকে আর আমায় দিচ্ছ কেন। নিয়ে যাও, কাল আবার একটু ফুর্ত্তি টুর্ত্তি কোরো।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—'বিট্ দি ফোর্ট উইলিয়ম্'—

জগদীশ কাশী গিয়াছিল,—এক্সপ্রেসে ফিরিতেছে। সঙ্গে একটি ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটি শ্যামবর্ণ; কিন্তু রূপ তাহার গায়ে ধরিতেছিল না। গায়ে মূল্যবান গহনার সংখ্যাও তাহার দেহের রূপের মত সুপ্রচুর। দ্বিতীয় শ্রেণীর সে কামরা খানি রিজার্ভ করাই ছিল।

গাড়ী বর্দ্ধমান ষ্টেসনে আসিয়া যখন থামিল তখন বেলা প্রায় ১১টা, জগদীশ বলিল,—"ছেলেপুলের জন্যে কিছু সীতাভোগ-মিহিদানা নাও কিরণ।"

কিরণবালা জগদীশের ট্রাঙ্ক খুলিয়া কি বাহির করিতেছিল, বলিল—"দেখুন আপনি আর আমায় ও ঠাট্টা করবেন না। আপনি বরঞ্চ আপনার ক'নেবৌর জন্যে নিয়ে যান।"

"ক'নেবৌর জন্যে না হ'ক, কিন্তু নিতে হবে কিছু অন্ততঃ নিজের জন্যেও বটে। গোটা পাঁচেক টাকা বার কর দেখি।"

টাকা বাহির করিতে গিয়া ধনেপালির খুড়ার সেই জড়োয়ার বাক্সটি তুলিয়া ধরিয়া কিরণ জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা এ কেমিকেলের গহনাগুলো পুরে এনেছিলেন কি জন্যে শুনি?"

"বল কেন আর; ও ক'নেবৌর কীর্ত্তি! ট্রাঙ্কটা গুছিয়ে দিতে বলেছিলুম। তার ভেতর ওটা কেন যে পুরে দিয়েছে সেই জানে।"

"গয়নাগুলো, বাস্তবিক, কেমিকেল্ ব'লে কারুর সাধ্যি নেই যে ধরে—ঠিকই যেন সত্যিকারের জড়োয়া!"

জগদীশ নামিয়া যাইয়া সীতাভোগ ও মিহিদানা কিনিয়া লইয়া আসিয়া কিরণের হাতে দিয়া বলিল,—"বর্দ্ধমানে এলে, সীতাভোগ খেতে হয়, তা না হলে কি হয় জানতো? ভূতে পায়। অর্দ্ধেক আমার সঙ্গে দাও, অর্দ্ধেক তোমার একটা পুঁটলি কর।"

"না, আমার সীতেভোগ মিহিদানা খাবার দরকার নেই। কি কতকগুলো চিনি মাখানো ভাতের মত—বিতিকিচ্ছি—ও আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমি পুঁটলি বেঁধে নিয়ে যেতে পারবো না।"

"আচ্ছা, পুঁটলি আমি বেঁধে দিচ্ছি। হাওড়ায় নেবে বাড়ীর দোরগোড়া পর্য্যন্ত ত বাবুসাহেব গাড়ীতে যাবেন,—এ নিতে আর কষ্টটা কি শুনি? তোমায় নিতেই হবে।"

"না, ও আমি কিছুতেই নোব না" বলিয়া কিরণ মুখ ফিরাইয়া জানালার বাহিরে দেখিতে লাগিল।

"রাগ হ'ল না কি?—তবে, নাও তোমার কাশীর বাড়ী ফিরিয়ে। রেজেষ্ট্রী করে তবে দিতে গেলে কেন, হ্যাগা, কিরণবালা?"

"নাঃ,—আপনার সঙ্গে আর পারবো না। দিন্—সীতেভোগ।"

"কাশীর বাড়ী তাহ'লে ফিরে নেবে না?"

কিরণ হাসিতে হাসিতে বলিল,—"নেবো।" তারপর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—"আমার কাশীর বাড়ী বলুন, কলকেতার বাড়ী বলুন, এ সব হ'ল কোত্থেকে? আপনি না থাকলে আজ যে আমার কী দুর্দ্দশা হ'ত, তা' সে আর কেউ জানুক, না-জানুক, আমি ত জানি। আজ যে আমার তিন চারখানা বাড়ী, বাগান, গয়না-গাঁটি, সোনা-দানা, এ সব কার জন্তে বলুন ত? কি?—চুপ ক'রে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলেন যে বড়? এ সব আমি ভুলবো না জীবনে। আর, ভুলেই যদি যাই কখনো, তাহ'লে জানবেন, আমার মত নেমকহারাম আর ভূ-ভারতে নেই। আপনাকেও বরাবরই আমি বলে আসচি যে আমার যা' কিছু, তা'র ওপর, আমার চেয়ে অধিকার যে আপনারই বেশী। আপনার যখন যা' দরকার হবে, আমার কাছে এসে চাইলে আমার বড় কষ্ট হয়; মনে হয়, আপনি যেন আমায় চাবুক মারচেন। আপনি তা এমনিই নেবেন, যেমন বাড়ীতে নিজের জিনিষ নেন্।"

"থ্রি চিয়ার্স ফর্ মিস্ কিরণবালা! তবে যে লোকে বলে, কিরণ-আপনার একটা কথা বলতে জানে না! তোমাকে এবার কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট করে দোবো, কিরণ!"

কথায় কথায় গাড়ী মগরার ষ্টেশনে আসিয়া পড়িল। একটী প্রৌঢ়-বয়স্ক লোক হাঁফাইতে হাঁফাইতে দরজা ঠেলিয়া গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই চম্‌কাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এ কি ডেড়াভাড়ার না কি মশাই?"

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জগদীশ বলিল,—"তা'রও ওপর। আপনি যাবেন কোথা?"

"আজ্ঞে, আমি কোলকাতায় যাবো" বলিয়া লোকটি নামিয়া যাইবার উপক্রম করিতে লাগিল। গাড়ি তখন ছাড়িয়া দিয়াছিল। জগদীশ তাহার হাত ধরিয়া বসাইয়া দিয়া বলিল,—"বসুন—আর গাড়ী পাল্টে কাজ নেই।"

"আমার যে থার্ড কেলাস্ মশাই, যদি ধরে?"

"ধরলেই হ'ল আর কি; সে তখন দেখা যাবে।"

লোকটির মুখ চোখের ভাবে বোধ হইল, জগদীশের কথায় সে কিছুমাত্র আশ্বস্ত হইল না।

জগদীশ বলিল, "কোন ভয়ের কারণ নেই, এ গাড়ী আমার 'রিজার্ভ' করা।"

এ দিকের বেঞ্চের একধারে বসিয়া পড়িয়া লোকটি জিজ্ঞাসা করিল,—"মশা'য়ের কোথা যাওয়া হ'য়েছিল?"

"গিছ্‌লুম—একটু তীর্থ ধর্ম্ম কত্তে।"

"সঙ্গে ইনি?"

"আমারই স্ত্রী।"

"আজ্ঞে, আপ্‌নারা?"

"ব্রাহ্মণ।"

"প্রাতঃ-পেন্নাম" বলিয়া লোকটি দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল।

জগদীশ জিজ্ঞাসা করিল,—"মশা'ইয়ের নাম?"

জমা-খরচ

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

"আজ্ঞে, আমার নাম—রাইচরণ রক্ষিত।"

"নিবাস ?"

"নিবাস এই ক্ষীরপুকুর, ত্রিবেণীর উত্তর।"

"বিষয়-কর্ম্ম কি করা হয় ?"

"আজ্ঞে, গাঁয়েতেই একটু ছোটখাট 'পত্তনি' আছে—"

"বেশ বেশ। তা' কোলকাতায় কি দরকার ?"

"খানকতক গিনী কিনতে হবে, সেইজন্যেই—"

"কতগুলো ?"

"এই খান পঞ্চাশেক। কি দর এখন বলতে পারেন ?"

"পনর টাকা আসল, আর মেলের দর দু'চার আনা কম।"

"ও কি আবার আসল মেল আছে নাকি ?"

"আছে বৈ কি,—সে আপ্‌নারা ধর্ত্তেও পার্ব্বেন না। একটু দেখে শুনে কিনবেন। এই হালেই আমি ৮০ খানা সেদিন কিনেছি। গহনাও তার গড়ান হোয়ে গেছে। দেখি গা, গয়নার বাক্সটা বের করে দাও ত ?"

রাইচরণ গহনাগুলি দেখিয়া বলিল,—"বাঃ! এ সবই ত জড়োয়া! কত ব্যয় হোলো মশায় ?"

"প্রায় হাজার চারেক।"

"গিনি ক'খানা তাহ'লে দয়া করে আপনাকেই কিনে দিতে হবে। এ কৃপাটুকু কর্ত্তেই হবে আপনাকে। নইলে,—হাজার হোক, গেঁও লোক আমরা, ও আসল মেল হয় ত চিন্তেই পার্ব্বো না। দয়া করে কষ্ট একটু আপনাকে কর্ত্তেই হবে বাবু।"

গাড়ী হাওড়ার প্লাটফরমের ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিল। পতিতুণ্ডি হাজির ছিল। জগদীশ পতিতুণ্ডিকে বলিল,—"ছাখ, আমার যেতে একটু দেরী হবে। তুমি বিছানা আর তোরঙ্গটা নিয়ে চলে যাও। কিরণকে ওর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে যাবে। ঠিকানা মনে আছে ত? আরে, ওই ত গোকুলও এসে হাজির! কি হে, তিনরাত ঘুমুতে পেরেছিসে ত? যাক্‌, এখন বল দেখি—'হেসে, হেসে, হেসে,'—এই—'তোমার জিনিস পেলে'। 'চার্জ্জ' বুঝে নিয়ে রসীদ দাও একখানা।"

পতিতুণ্ডি বলিল,—"দেব্‌তা, আমি বিছানা-তোরং নিয়ে চলে যাই তা'হলে ?"

"দাঁড়াও। ঐ গয়নার বাক্সটা দিয়ে যাও আমাকে।"

সকলে চলিয়া যাইলে রাইচরণ হাত দু'টি জোড় করিয়া জগদীশকে কহিল,—"তাহ'লে কি অনুমতি হয় ?"

ধনেখালির খুড়ার গহনার বাক্সটি হাতে লইয়া জগদীশ বলিল,—"ধরেচেন এত ক'রে, চলুন, দি কিনে আপনার গিনী ক'খানা।"

একখানি ট্যাক্‌সি করিয়া উভয়ে লালবাজারে একটি পোদ্দারের দোকানে প্রবেশ করিল। জগদীশ পোদ্দারকে জিজ্ঞাসা করিল,—"খান পঞ্চাশ গিনী দিতে হবে যে, দে মশাই, আজকের দর কি ?"

পোদ্দার তখন কি একটা ওজন করিতেছিল। সেই দিকেই চাহিয়া বলিল—"পনর টাকা দু'আনা।"

জগদীশ চম্‌কাইয়া উঠিয়া কহিল,—"১৫৵০ ?—বল্‌চেন কি আপনি ? আজকের দর যে পনর টাকা।"

"কে বল্লে আপনাকে ?"

"আমিই বল্‌চি।"

"পনের টাকাতে কেউ দিতে পার্ব্বে না।"

"আপনার পাশের দোকান থেকেই আনবো। এঁকে পাড়াগাঁয়ে দেখেছেন কিনা, তাই সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে দু'আনা বেশী।"

পোদ্দার একটু চটিয়া গেল, বলিল,—"পনর টাকাতে যদি কোথাও থেকে আনতে পারেন, ত এখান থেকে নাকখৎ দিতে দিতে সেখানে যাব।"

তর্কচ্ছলে জগদীশও একটু যেন উষ্মা দেখাইয়া বলিল,—"আমারও নাম পঞ্চানন্ চক্রবর্ত্তী নয় যদি পনর টাকায় না আনতে পারি। এই পাশ থেকেই নিয়ে আসছি দেখুন। গয়নার বাক্সটা নিয়ে মিনিট পাঁচেক একটু বসুন ত রক্ষিত মশাই, দেখি কেমন না আনতে পারি"—বলিয়া গহনার বাক্সটি রাইচরণের কোলে বসাইয়া দিয়া, তাহার হাত হইতে রুমালে বাঁধা নোটের তাড়াটি লইয়া জগদীশ দোকান হইতে নামিয়া পড়িল; এবং রক্ষিতের উদ্দেশে আর একবার বলিল,—"দেখবেন, গয়নার বাক্সটা একটু সাবধানে—" বলিয়া জগদীশ পাশের দোকান হতে পনের টাকা দরে গিনী কিনিতে চলিয়া গেল।

রক্ষিতের আট শত টাকার নোটের তাড়াটি গামছায় ড়ানো তাহার কোমরে বাঁধা ছিল। জগদীশেরই উপদেশে, কেট কাটা, কোমর কাটার ভয়ে, রক্ষিত তাহা হাতে রিয়া রাখিয়াছিল।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনর মিনিট কাটিয়া গেল। ক্ষিত একটু চঞ্চল হইল। বিশ মিনিট—আধ ঘণ্টা,—কানন চক্রবর্ত্তীর আর দেখা নেই। আরো মিনিট দশেক। খন রক্ষিত ছটফট করিতে লাগিল। একবার উঠিতে গিল, একবার বসিতে লাগিল। একবার রাস্তায় াসিয়া দেখিয়া যাইল।

পোদ্দার বলিল,—"কৈ মশাই, আপনার লোকটি গেলেন াথা? গিনী চাপা পড়লেন নাকি?"

"তাই ত, কোথায় গেলেন বলুন দেখি?"

"কোথায় গেলেন তা আমি জানবো কেমন করে। নি আপনার হ'ন্ কে?"

"আঁা, আমার হ'ন্ না কেউ, ট্রেণেতে আজ ালাপ—

"ট্রেণেতে আজ আলাপ! তবেই হয়েছে,—জোচ্চরের তে পড়েন নি ত?"

রাইচরণ রক্ষিতের মুখ শুকাইয়া জিভে আঠা ধরিয়া াসিতেছিল, গহনার বাক্সটি দৃঢ় করিয়া ধরিয়া বলিল,—আঁা, জোচ্চর!—কিন্তু ওঁর যে এই গহনার বাক্স—

"দেখি কি গয়নার বাক্স" বলিয়া, বাক্সটি লইয়া খুলিয়া খিয়াই পোদ্দার বলিয়া উঠিল,—"ডাহা জোচ্চরের হাতে ড়েছেন! এ ত সব কেমিক্যাল! কত টাকার নোট ছিল াপনার?"

রক্ষিত শুধু একটা "অঁা" বলিয়া সেইখানে বসিয়া ড়িল।

* * *

সন্ধ্যার পর জগদীশ নেশায় বুঁদ্ হইয়া টলিতে টলিতে হে ফিরিল। তাহার দুই বগলে দুইটি হুইস্কির বোতল, লায় ও মাথায় ছড়া কতক যুঁইয়ের গোড়ে জড়ান। অন্দরে বেশ করিয়া, ক'নেবৌকে সম্মুখে দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—

"ক'নেবৌ, 'বিট্ দি কোর্ট উইলিয়ম্'! বুঝতে পেরেছ?—একেবারে 'বিট্ দি কোর্ট উইলিয়ম্'! ফোর্ লাখ্স্। আজ বড় আনন্দের দিন, একেবারে ফোর লাখ্স্!—এই পতিতুণ্ডি, কাম্ হিয়ার! আজ আফিং ফাফিং সব দূর ক'রে ফেলে দোবো,—আজ খালি হুইস্কি চলবে!"

হরিমতি বলিল,—"আজ বুঝি খুব খেয়ে এসেছ?"

"এক পেট্ খেয়েছি, ক'নেবৌ,—আরো খাবো। বুঝতে পাচ্ছনা?—একেবারে চার লাখ্। বাবা! বিশ্বেশ্বরকে অত করে ডেকে এলুম, এ কি বিফলে যায়? একেবারে ফোর লাখস্! আবার তার সঙ্গে নেজুড় এল, রাইচরণ রক্ষিত মহাশয়ের আট শ', যেন জাহাজের সঙ্গে জালিবোট, বরের সঙ্গে নিতবর!"

হরিমতি কোন কথা বলিবার আর সুবিধাই পাইল না। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—"চল, ওপরে চল।"

টলিতে টলিতে জগদীশ বলিল,—"সব, এস আজ। আজ খালি হুইস্কি চলবে! পতিতুণ্ডি খাবে, চিনে বেটা খাবে, আমি খাবো, ক'নেবৌ খাবে,—আজ হুইস্কিতে বাড়ী-ঘর সব একেবারে ভাসিয়ে দোবো!"

হুইস্কির বোতল দুইটি জগদীশের হাত হইতে লইয়া ক'নে-বৌ তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—"বোকো না বেশি—চল ওপরে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—অন্নসত্র—

বারাণসীর 'পাড়ে-হাউলী'র প্রান্তভাগে একটি সুবৃহৎ অন্নসত্র খোলা হইয়াছে। কোথাকার কোন্ রাজা ইহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা এ পর্য্যন্ত লোকে জানিতে পারে নাই বা জানিবার জন্ম বিশেষ কাহারো কোন আগ্রহও হয় নাই। ইহা শুধু কানা, খোঁড়া, দীনদরিদ্র পথের কাঙ্গালীদের জন্ম, যাহারা পেট পুরিয়া কোন দিন দু'টি খাইতে পায় না।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। সত্রের বিস্তৃত উন্মুক্ত চত্বরে অসংখ্য কাঙালী সারি সারি খাইতে বসিয়াছে। আহারের সঙ্গে সঙ্গে কোলাহলটা তাহারা বড় বেশী করিতেছিল। পেট

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

পুরিয়া খাওয়ার তৃপ্তি ও আনন্দ তাহাদের সকলের চোখে মুখে ও কণ্ঠে ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

একটি রুক্ষ-শুষ্ক, ছিপ্‌ছিপে, দীর্ঘাকার ব্রাহ্মণ হুঁকাহস্তে ধূমপান করিতে করিতে চারিদিকে ঘুরিয়া তাহাদের খাওয়ার তদারক করিয়া বেড়াইতেছিল। লোকটি আসল তদারক যতটা করিতেছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বাজে বকুনি বকিয়া যাইতেছিল।

জন দুই তিন পথিক ভদ্রলোক চত্বরের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই বিরাট কাঙালী ভোজন দেখিতেছিল। যে লোকটি তদারক করিয়া বেড়াইতেছে, সে কাছে আসিলে, তাহাদেরই একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"এটি কার ছত্র, মশাই ?"

লোকটি তাহাদের মুখের দিকে একবার কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া, হুঁকায় একটা টান্ দিল এবং তাহাদেরই দিকে এক-মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "আপ্‌নাদের 'ছত্তর' ঐ দিকে সব আছে, 'রাঙ্গামেটে', 'আমবেড়ে', 'রাজরাজেশ্বরী', 'কুচ্‌বেহার' এটা হোলো সুধু কাঙালী……আপ্‌নারা অফিসার্ ত ? তাহ'লে, 'রাঙ্গামেটেতেই সুবিধে হবে, ন'টার ভেতরেই খাওয়া শেষ ; অনেক অফিসারই ওখানে খেয়ে থাকেন।"

যে লোকটি প্রশ্ন করিয়াছিল সে বলিল, "আমরা খাবার জন্যে 'ছত্র' খুঁজছি না, আমরা কাশীতে বেড়াতে এসেছি। এ 'ছত্র'টি কে করেছেন তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"ওঃ, তাই বলুন। মাপ্ কর্‌বেন,…ওহে, ঐ দিকে ক'টা পাতায় ভাত দিতে হবে যে, ভাত নিয়ে এস। কি চাই ? সুক্ত ? আজ্ঞে, এটি কোরেচেন—দিচ্চে, দিচ্চে, চেঁচিও না,—এটি কোরেচেন গিয়ে কোলকাতার একটী মস্ত ধনী লোক, তাঁকে রাজাও বলতে পারেন, দেবতাও…"

"কোলকাতার কোন্ যায়গায় থাকেন তিনি ?"

"থাকতেন বটে আগে। সে সব চিরদিনের জন্যে ত্যাগ করে, এখন এইখানেই, …… অম্বল আছে বৈ কি! টক্ নিয়ে এস হে, টক্ টক্! হ্যাঁ, তিনি সপরিবারে আজই সকালে এখানে এসেছেন।"

"ঠিকই বটে। আজ সকালে ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশনে খুব মস্ত কে একজন জমীদার নামলেন। সঙ্গে লোকজন, চাকর বাকর জিনিসপত্র, গাড়ী পাল্কী, হৈ হৈ ব্যাপার,"

"না-না, সে ইনি ন'ন্। এঁর লোকজনও নেই, চাকর বাকরও নেই, গাড়ী পাল্কিও নেই। কাঙালীদের জন্যে সর্ব্বস্ব দিয়ে, দেবতা আমার নিজেই কাঙালী হোয়ে বসেছেন! ওই যে আমার রাজারাণী দু'টিতে ব'সে কাঙালীদের খাওয়া দেখছেন! দেখতে পাচ্চেন না ? ঐ যে, করবী ফুলের গাছটা ফুলসুদ্ধ যেখানে নুয়ে পড়েছে" বলিয়া সেই দিকে হাত দিয়া দেখাইয়া দিল।

ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিল, "উঁনি কি সমস্তই দান করেচেন ? নিজের খাবার জন্যেও কিছু রাখেন নি ?"

"ঠিক খাবার জন্যে উঁনি কিছু রাখেন নি। বলেন, 'এত কাঙালী নিত্য যেখানে খাবে, আমাদের দু'টো পেট সেখান থেকেই চ'লে যাবে এখন', তবে অন্য খরচের জন্যে, ওঁর কোলকাতার বাড়ী ভাড়া দুটি শ' টাকা, তাই পুঁজি। তার ভেতর থেকে আবার অনেকগুলিকে মাসোহারা দেবার ব্যবস্থা আছে।"

করবী গাছের ছায়ার নীচে, পার্শ্বোপবিষ্টা সহধর্ম্মিণীকে জগদীশ তখন বলিতেছিল, "দেখ দেখি ক'নেবৌ, ব্রাহ্মণ ভোজনের চেয়ে বেশী আনন্দ কি না ?"

"আনন্দ ত বটে, কিন্তু—"

"কিন্তু, কি বল ?"

"নিরানন্দটাও যে ঠেলে রাখতে পাচ্চি না !"

"নিরানন্দ কিসের জন্যে ?"

"চির জীবনের পাপ ?"

"চির জীবনের পাপের বোঝা, যা এতকাল ধ'রে মাথার ওপর জমিয়ে আসছিলুম্, সে ত অন্নপূর্ণার পায়ের তলাতে সব নাবিয়ে দিলুম, ক'নেবৌ! তবু এর যদি কোন শাস্তি থাকে ত আমার এই সব ভাই-বোন্‌দের জন্যে তার ষোল আনাই আমি মাথা পেতে নিতে রাজি আছি।"

স্বরলিপি

"নটরাজ"

হেমন্তের রূপ

হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা,
হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমলরঙে আঁকা।
সন্ধ্যা প্রদীপ তোমার হাতে
মলিন হেরি কুয়াশাতে,
কণ্ঠে তোমার বাণী যেন করুণ বাষ্পে মাখা॥
ধরার আঁচল ভ'রে দিলে প্রচুর সোনার ধানে,
দিগঙ্গনার অঙ্গন আজ পূর্ণ তোমার দানে।
আপন দানের আড়ালেতে
রইলে কেন আসন পেতে;
আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন ক'রে রাখা॥

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II ধা -া -র্রা র্রা। র্র্সা -া র্সা -া I র্সা -না র্রর্সা -া। -া -া -পা -ধা I
হা ০ য়্ হে ম ন্ ত ০ ল ০ ক্ষ্মী ০ ০ ০ ০ ০

I ধা -া -র্রা রা। র্র্সা -া র্সা -া I র্সনা -া রর্সা -া। র্সনা -া র্সা -না I
হা ০ য়্ হে ম ন্ ত ০ ল ০ ক্ষ্মী ০ তো ০ মা র

I নধা -না ধপা -া। -া -া -া -া I -পা -ধা ধপা -া। পমা -া গা -মা I
ন ০ য় ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্ ০ তো ০ মা র্

I মরা -া গা -া। গা -া গা -মা I মা -পা পা -া। -ধা -া -না -পা I
ন ০ য় ন্ কে ০ ন ০ ঢা ০ কা ০ ০ ০ ০ ০

I ধা -া -র্রা র্রা। র্র্সা -া র্সা -া I র্সা -না র্রর্সা -া। -া -া -া -া I
হা ০ য়্ হে ম ন্ ত ০ ল ০ ক্ষ্মী ০ ০ ০ ০ ০

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I পা -া না -া। নধা -া না -া I নপা -া ধা -া। পমা -া পা -া I
হি • মে র্ ঘ • ন • ঘো ম্ টা • খা • নি •

I পমা -া ধা ধা। ধপা -া পধা -ধপা I পমা -পা পগা -া। গা -া গা -মা I
ধূ • ম ল র • ঙে • আঁ • কা • তো • মা র্

I গরা -া গা -া। গা -া গা -মা I মা -া পা -া। -ধা -া -না -পা I
ন • য় ন্ কে • ন • ঢা • কা • • • • •

I ধা -া -রা র্রা। র্সা -া র্সা -া I র্সা -না র্সা -া। -া -া -া -া I
হা • য় হে ম ন্ ত • ল • ক্ষ্মী • • • • •

I পা -া -া পা। পনা -া না -র্সা I র্সা -া র্সা -া। সা -া র্সা -া I
স • ন্ ধ্যা প্র • দী প্ তো • মা র্ হা • তে •

I র্সা -া র্সনা -র্সা। র্সধা -া -না -র্সা I র্সনা -া -া -া। না -া না -া I
ম • লি ন্ হে • • • রি • • • কে • ন •

I না -র্সা র্সা -া। র্সা -া রসা -া I র্সনা -া র্সা -র্সনা। নধনা -া ধপা -া I
ম • লি ন্ হে • রি • কু • য়া • শা • তে •

I ধা -া -র্রা রর্সা। র্সণা -ধা র্সণা -ধা I ধপা -া ধা -পা। পমা -া পা -মা I
ক • ণ্ ঠে তো • মা র্ বা • ণী • যে • ন •

I মগা -া মা গা। গরা -া গা -া I মা -া পা -া। ধা -া না -র্সা I
ক • রু ণ বা • ষ্পে • মা • খা • তো • মা র্

I র্সধনা -া ধপা -া। -া -া -া -া I -পধা -া ধপা -া। মা -া মগা -মা I
ন • য় • • • • ন্ •• • • ন্ তো • মা র

I সরা -া গা -া । গা -া গা -মা I মা -া পা -া । -ধা -া -না -পা I
ন • য় ন্ কে • ন • ঢা • কা • • • • •

I ধা -া -র্রা র্রা । র্সা -া র্সা -া I র্সা -না র্রর্সা -া । -া -া -া -া I
হা • য় হে ম ন্ ত • ল • ক্ষ্মী • • • • •

I সা -া সা -া । সরা -া রা -া I রা -া গা -রা । গা -া গা -মা I
ধ • রা র্ আঁ • চ ল্ ভ • রে • দি • লে •

I মা -া পা -া । পগা -া গা -মা I মা -া পা -া । -া -া -া -া I
প্র • চু র্ সো • না র্ ধা • নে • • • • •

I পা -দা দা -া । দা -া ণদা -পা I পা -া -া দা । দপা -া পা -মা I
দি • গ ঙ্ গ • না র্ অ • ঙ্ গ ন • আ জ্

I পা -া -না না । নদা -া পা -দা I দমপা -া মগা -া । গা -া গা -মা I
পূ • র ণ তো • মা র্ দা • নে • প্র • চু র্

I পা -া পা -না । না -া ধা -না I নধা -া পা -া । -া -া -া -া I
সো • না র্ ধা • নে • ধা • নে • • • • •

I পা -া পা -া । পনা -া মা -র্সা I র্সা -া র্সা -া । র্সা -া র্সা -া I
আ • প ন্ দা • নে র্ আ • ড়া • লে • তে •

I পর্সা -া -া র্না । ধা -া -না -র্সা I র্না -া -া -া । না -া না -া I
র • ই লে কে • • • ন • • • তু • মি •

I নর্সা -া -া র্সা । র্সা -া র্রর্সা -া I র্না -া র্সা না । ধনা -া ধপা -া I
র • ই লে কে • ন • আ • স ন পে • তে •

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I ধা· -া র্রা র্র্সা । র্সণা -ধা র্সণা -ধা I ধপা -া ধা পা । পমা -া পা মা I
আ • প্ না কে • এ ই কে • ম ন তো • মা র

I মগা -া মা গা । গরা -া গা -া I মা -া পা -া । ধা -া না -া I
গো • প ন ক • রে • রা • খা • তো • মা র্

I ধনা -া ধপা -া । -া -া -া -া I পধা -া -পা -া । মা -া গা -মা I
ন • য় • • • • • • • ন্ • তো • মা র্

I রা -া গা -া । গা -া গা -মা I মা -া পা -া । -ধা -া -না -পা I
ন • য় ন্ কে • ন • ঢা • কা • • • • •

I ধা -া -র্রা র্রা । র্র্সা -া র্সা -া I র্সা -না র্র্সা -া । -া -া -া -া I
হা • য়্ হে ম ন্ ত • ল • ক্ষ্মী • • • • •

এই গানটি "নটরাজে"র অন্তর্গত, কিন্তু গত আষাঢ় মাসের বিচিত্রায় "নটরাজে"র মধ্যে ইহা সংযোজিত হয় নাই। গীত-আকারে নূতন হইলেও, পাঠকগণ দেখিবেন, ৪০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত "হেমন্ত" কবিতার মধ্যে এই গানটি সম্পূর্ণ এবং সুন্দর ভাবে অবলীন আছে। এ গানটি যেন উক্ত কবিতার স্বরোল্লাস।

সম্পাদক

সতী
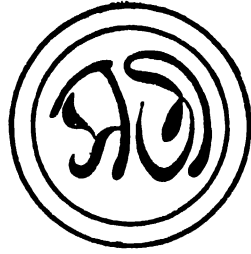
শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

১২

ভূপতি চাকরী ছাড়িয়া আমানতি পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ফেরত পাইল। তাতে তার দেনা সমস্ত পরিশোধ করিয়া সে থিয়েটারে চার শত টাকা মাহিনায় চাকরী আরম্ভ করিল। সে স্থির করিল আর ধার করিবে না, হিসাব করিয়া চলিবে। মাইনার চার শত টাকা লইয়া সে বিলাসকে দিত, বাড়ীর খরচ চলিত জমীদারীর টাকায়। এ দিকে সুরমা ও দিকে বিলাস দুইজনেই টাকা পয়সা বেশ গুছাইয়া খরচ করিত, কাজেই কিছুদিন বেশ চলিল।

কিন্তু মাস তিন চার এমনি থাকিবার পর ভূপতির উচ্ছৃঙ্খলতা আবার সীমা লঙ্ঘন করিতে লাগিল। তার মদের মাত্রা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল, আবার বাগান আরম্ভ হইল, আবার এককড়ি আসিয়া জুটিল। থিয়েটারে সে অভিনেতা হিসাবে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল। দর্শকদের কাছে তার প্রতিপত্তির অন্ত ছিল না। কিন্তু বৎসর দুই কাজ করিবার পর অতিমাত্র মদ্যপানে সে মাঝে মাঝে এমন কাণ্ড করিয়া বসিতে লাগিল যে বিনায়ক চঞ্চল হইয়া উঠিল। তা'ছাড়া মত্ত অবস্থায় থিয়েটারের মেয়েদের লইয়া মাঝে মাঝে বিষম উৎপাতের সৃষ্টি করিতে লাগিল।

বিনায়ক বন্ধুত্বের খাতিরে অনেক দিন সহ্য করিয়া রহিল; যখন অসহ্য হইল তখনও সে থিয়েটারের ভিতর এ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া একদিন বিলাসের বাড়ী গিয়া ভূপতিকে খুঁজিয়া তাহাকে বলিল এ সব চলিবে না। সে থিয়েটারের সব নিয়ম বন্ধন ভাঙিতে বসিয়াছে, যদি সাবধান না হয় তবে বিনায়ককে বাধ্য হইয়া থিয়েটারে সবার সামনে তাকে তিরস্কার করিতে হইবে।

কথাগুলি বিনায়ক বেশ ভৎর্সনার সুরেই বলিয়াছিল। ভূপতি যদিও মুখে অনেকটা বেপরোয়া ভাব দেখাইল তবু সে মনে মনে লজ্জিত ও কুণ্ঠিত বোধ করিল। বিনায়ক তার বক্তব্য কথাটা সংক্ষেপে বলিয়া শেষে বেশ একটু শাসাইয়া গেল।

বিলাস বসিয়া তার লাঞ্ছনার কথা শুনিতেছিল। যতক্ষণ বিনায়ক ছিল, ততক্ষণ সে কোনও কথা বলে নাই; বিনায়ক চলিয়া গেলে সে বলিল, "ইস, ভারি তেজ দেখিয়ে গেলেন,—বুঝিয়ে গেলেন উনি মুনিব তুমি চাকর। কেমন মিটেছে এখন বিনায়কবাবুর থিয়েটারে চাকরী করবার সখ?"

ভূপতি কতকটা অপ্রস্তুতভাবে বলিল, "বাস্তবিক—এ বড় বাড়াবাড়ি!"

"বলি এ অপমানের পরও যাবে ত' সেই থিয়েটারে নাচতে কুঁদতে?"

"ইচ্ছা তো হয় না, কিন্তু—"

"তুমি যাবে যাও, আমি আর ডিঙুচ্ছি না ও থিয়েটারের চৌকাট।"

ভূপতি স্তব্ধ হইয়া গেল। সে বলিল—"হ্যাঁ—তা—তাতো বটে—কিন্তু—"

"মাইনে ক'টাকার কথা ভাবছো? সে ভেবো না। একবার ছাড় না; তুমি আমি ও থিয়েটার ছাড়লে বিনায়ক

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

বাবুর থিয়েটার কতদিন চলে দেখি।—আমি বলি, এস তোমাতে আমাতে একটা থিয়েটার খুলি।"

কাজে তাই হইল। বিলাসের পরামর্শে ভূপতি মাতিয়া উঠিল। এককড়ি সঙ্গে আসিয়া জুটিল—আরও জুটিল অনেকে। বিনায়কের সঙ্গে পাল্লা দিয়া ভূপতি একটা নূতন থিয়েটার খুলিয়া বসিল। বিজলী থিয়েটারের শীঘ্রই খুব হাঁক ডাক পড়িয়া গেল।

সুতরাং ভূপতিকে খুব বড় হাতে ধার করিতে হইল। ধারের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। তবে পূর্ব্বের বার কোম্পানীর কাগজ ভাঙ্গাইয়া চট্‌পট্ ধারগুলি শোধ করিয়া দেওয়ায় এবার তার বাজারে প্রতিপত্তি বাড়িয়া গিয়াছিল, সত্তর আশি হাজার টাকা ধার করিয়াও তার বিশেষ তাগাদা সহিতে হয় নাই। পাঁচছয় বৎসর বিনা তাগিদে তাহার চলিয়া গেল।

* * *

সুরমার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তার সে সদা-প্রফুল্ল মুখ অনেক দিনই গিয়াছে,—চুলে পাক ধরিয়াছে, গাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বয়স যেন এক পায়ে দশ বৎসর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

স্বামীর অধঃপতন আরো অনেক প্রকার দুঃখের মত ছয় বছরে তার সহিয়া গিয়াছে। তার বুকের দুঃখ বাহিরে কোনও দিনই বড় প্রকাশ পাইত না, এখন একেবারেই পায় না। সে ঠিক আগের মতই গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম দেখা শোনা করে, খায় দায় শোয় বসে, জ্যোতির সঙ্গে তার আশ্রমের কথা আলোচনা করে—আর তার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য করে, তার একমাত্র সন্তানের পালন। খোকা তার নয়নের মণি, জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তার জন্যেই সে বাঁচিয়া আছে, তাকে আশ্রয় করিয়া সে আনন্দ ও গৌরবের স্বপ্ন রচনা করে, তাকে ভালবাসিয়া সে চরিতার্থ।

ভূপতি যখন থিয়েটারে অভিনেতা হয় তখন সুরমা লজ্জায় মরিয়া গিয়াছিল, লোকের কাছে মুখ দেখাইতে সে সঙ্কুচিত হইত। কিন্তু তার ভাগ্য-দোষে, স্বামীর অভিনয়ে খ্যাতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে তার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবেরা আসিয়া তাকে শুনাইয়াই ভূপতির মহা সুখ্যাতি করিত, কেহ কেহ আবার এজন্য তাকে ভাগ্যবতী বলিয়া অভিনন্দন করিত। সুরমার তখন মরিতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু তার চেয়েও কঠোর পরীক্ষা তার হইত যখন ইহারা তার কাছে আসিয়া থিয়েটারের পাশের জন্য দরবার করিত। সুরমা কোনও দিনই তার মনের দুঃখ লোক ডাকিয়া শোনায় নাই—তার ব্যথা জানিত সুধু জ্যোতি। আজও সে লোকের অভিনন্দনের উত্তরে তাহাদিগকে এমন কিছুই বলিত না যাহাতে তাহারা তার মনের দুঃখের আঁচ পাইতে পারে। তার দুঃখ ছিল সমুদ্রের মত, কিন্তু তার লজ্জাটা ছিল আরো বেশী গভীর; যখন দুঃখে তার অন্তর ভাঙ্গিয়া পড়িত, তখনও লোকের কাছে লজ্জার কথা স্মরণ হইতেই তার মনটা কাঠ হইয়া উঠিত—সে জোর করিয়া বুকের ভিতর দুঃখটার গলা চাপিয়া ধরিত। লোকের কাছে এমন একখানা মুখ লইয়া সে দাঁড়াইত যে তারা কেহই বুঝিতে পারিত না কত বড় বেদনা সে বুকে বহিতেছে। যখন লোকে পাশ চাহিত তখন তাই সে মহা সমস্যায় পড়িত। কিন্তু এত কঠিন পরীক্ষায়ও তার মজ্জাগত দর্প পরাজিত হয় নাই। আপনার সব বিরক্তি সকল দুঃখ চাপিয়া পিষিয়া সে স্বামীর কাছে চাহিয়া তার বন্ধুদের পাশ জুটাইয়া দিত।

ভূপতি ইহাতে সুখী হইত। পাপের পথে পাকা পথিক হইয়াও সুরমার কাছে সঙ্কোচের হাত হইতে সে একেবারে মুক্তি পায় নাই। তার কাছে আসিলেই সে মুশড়াইয়া যাইত। এত দিনের ভিতর একটি দিনও সুরমা তার দূরত্ব এতটুকু খাটো করে নাই, তার দীপ্ত তেজস্বিতা এক মুহূর্ত্তের জন্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। লোকের কাছে স্বামীর সঙ্গে সহজ ভদ্রতা মাত্র রক্ষা করিয়া সে চলিত, লোকচক্ষুর অন্তরালে সে ভূপতির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখিত না। তাই ভূপতি তাকে বড় ভয় করিত। কিন্তু যখন সুরমা এতটা দূর নামিয়া আসিল যে সে ভূপতির থিয়েটারের জন্য পাশ চাহিতে আসিল, তখন সে উল্লসিত হইয়া উঠিল এই ভাবিয়া যে বুঝি বা এখন তার সঙ্গে আপোষে বাস করা সম্ভব হইবে!

একদিন পাশ দিয়া ভূপতি সাহস পাইয়া বলিল, "তুমি চল না আজ থিয়েটারে—খুব ভাল প্লে হ'বে।"

পাশ হাতে করিয়া সুরমা স্বামীর দিকে এমন একটা ভ্রূকুটি করিয়া চাহিল যে ভূপতির সব সাহস লুপ্ত হইল। কোনো কথা না বলিয়া সুরমা নীরবে চলিয়া গেল। তথাপি ভূপতি বুঝিল লোকের কাছে এ সর্পিণী নাচে বটে, কিন্তু ইহার বিষের তীব্রতা এক ফোঁটাও কমে নাই। তারপর আর সে সুরমাকে ঘাঁটাইত না।

সুরমারও ভূপতিকে ঘাঁটাইবার কোনও প্রয়োজন ঘটিত না। এখন অনেক দিন হইল নীরবে উভয় পক্ষের মধ্যে কার্য্যতঃ এই বন্দোবস্ত দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে জমীদারী হইতে সুরমার কাছে রীতিমত টাকা আসিত। যাহা সে পাইত তাতেই তার সংক্ষিপ্ত প্রয়োজন সব চলিয়া যাইত। কাজেই তার ভূপতির সঙ্গে কোনও কারবারের দরকার হইত না।

সুরমা মাঝে মাঝে জ্যোতিকে পাকে-প্রকারে কিছু টাকা দিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু কোনও দিনই সে তাহা পারিয়া উঠে নাই। দাদার কাছে টাকা লইবে না, ইহাই ছিল জ্যোতির ভায়ের প্রতিজ্ঞা, তাই সে সুরমাকে আশ্রমের জন্য একটি পয়সাও খরচ করিতে দিত না। জ্যোতির আশ্রম এখন অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। অনেকগুলি বালক বালিকা, পথে কুড়ান অনেকগুলি মেয়ে এখন তার আশ্রমে থাকে। বিমলা আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কমলার মা সেখানে দাসীর যে-সব কাজ তাই করে। কমলা আশ্রমের বিশেষ কিছু করে না, সে এখন পাশ করা নার্স, বাহিরে নার্সের কাজ করিয়া রোজগার করে—রোজগারের সামান্য টাকা সে সব জ্যোতিকেই দেয়। আশ্রম বাড়িয়া গিয়াছে তাই জ্যোতির এখন অনেক টাকার দরকার। তাই সুরমা তাকে অনেকবার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে যে দাদার হাতে সম্পত্তিটা উচ্ছন্ন যাওয়ার চেয়ে জ্যোতি যদি তার অংশমত টাকাটা লইয়া এ আশ্রমে খরচ করে ত' একটা সৎকাজই হয়। কিন্তু জ্যোতি সে কথা কানে তোলে না। ইহা লইয়া দেওর ভাজে অনেক অভিমান, অনেক কথা কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে।

জ্যোতির আশ্রমের ভিতরে ইতিমধ্যে আর একটা খণ্ড কাব্যের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। বিমলা ও কমলা দু-জনেরই ছেলে এখন বেশ বড়-সড় হইয়াছে। তারা দু-জনেই, আশ্রমের আর সব ছেলেদের মতই বিমলাকে মা বলিয়া ডাকে।

একদিন বিমলা দুটি ছেলেকে লইয়া বসিয়া খেলা করিতেছে—তাদের খেলার মাঝে আনন্দ যেন উথলিয়া উঠিতেছে। জ্যোতি কিছুক্ষণ হইল দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিল। তারপর সে অগ্রসর হইয়া বিমলাকে ডাকিয়া বলিল, "দিদি, একটা সত্যি কথা বলবে?"

"তোমার কাছে সত্যি বই মিথ্যা কি বলা যায় দাদা?"

"আচ্ছা বল, চট্ ক'রে একটা জবাব দিয়ে ব'লো না, ভাল ক'রে বুঝে ব'লো। তোমার কোনটা বেশী ভাল লাগে, এই খানে ব'সে পথে কুড়ানো ছেলেদের নিয়ে মানুষ করা, না সংসারী হ'য়ে স্বামী পুত্র নিয়ে ঘর করা?"

অবাক হইয়া বিমলা বলিল, "এ সব কি কথা বলছো দাদা?"

"বলছি অনেক ভেবে চিন্তে, তুই আমাকে সত্যি জবাব দে। কি জানিস্, আমার তোকে দেখে শুনে মনে হয় যে তুই জন্মেছিস মা হবার জন্য, গিন্নী হ'বার জন্য। তোকে এনে এই সন্ন্যাসীর আখড়ায় ফেলে আমি হয় তো তোর জীবনটার অপচয় ক'রছি। ইচ্ছা হয় তোকে বেশ মনের মতো বরের সঙ্গে আবার বিয়ে দিয়ে তোকে সংসারী ক'রে দি। আর তোর সুখ দেখে চোখ জুড়োই।"

বিমলা মৃদু হাস্যে মুখ উজ্জ্বল করিয়া বলিল, "কেন হঠাৎ তোমার খোঁজে কোনও যোগ্য বর এসে জুটেছে নাকি?"

"এ অনুমান একেবারে মিথ্যে নয়। আমার সন্দেহ হয় যে একজন হয় তো তোকে পেলে স্বর্গ হাতে পাবে। কিন্তু সে জন্য নয়—বিশেষ ক'রে কারও কথা ভেবে আমি বলছি নে, আমি বলছি ঠিক তোর বড় ভাইটির মত, তোর সুখের দিকে চেয়ে। তোর যদি মন সত্যি চায়, আমাকে ব'লতে লজ্জা করিস নে বোন। আমি তোর ভাল বিয়ে দেব।"

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

বিমলা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে বলিল, "তুমি কি ক্ষেপেছ দাদা? আমি করবো বিয়ে? তুমি জান না, কিন্তু আমার বাবা অনেক দেখে শুনে খুব ভাল ঘর বর দেখে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। যে কয়দিন স্বামী বেঁচে ছিলেন, তিনি আমায় যারপর নাই ভাল বেসেছিলেন। কোনও দুঃখই আমার ছিল না। সে সুখ তুমি আমায় নতুন ক'রে দেখাচ্ছ কি দাদা? তার যে কি সুখ সে আমি জানি। সে সুখ যখন চুকে বুকে গেল, তারপর পাপের যে সুখ তাও আমি খুব ভাল ক'রেই জেনে এসেছি—পাপে ডুবলে রক্তের ভিতর যে নাচন ওঠে তার আনন্দ কম নয়। কিন্তু তুমি যমের দোর থেকে টেনে এনে আমাকে এই এক নূতন সুখের সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছ—আমি ঠিক বুঝেছি এর চেয়ে বড় সুখ নেই। এর কাছে স্বামীর ভালবাসা? এর কাছে প্রণয়ীর প্রেম? ছি! সাগরের পাশে গোষ্পদ? দাদা আমায় মাপ করো—তোমার চরণতলে থেকে চিরদিন তোমার কাজ ক'রবো, এর চেয়ে বড় সুখ আমি জানি না, চাই না।"

জ্যোতি গম্ভীর হইয়া ভাবিল। তারপর সে বলিল, "তাই যদি তোর মন বলে তবে সে খুব ভাল কথা। কিন্তু ব'লে রাখছি বোন, যদি কোনও দিন তোর মন চায়—কখনও যদি লোভ হয়—আমাকে বলতে লজ্জা করিস নে দিদি।"

বিমলা আবার হাসিল। সে বলিল, "আমার জন্য চিন্তা নেই দাদা, আমার মন বদলাবে না। কিন্তু আমি একটা কথা বলবো শুনবে? তুমি একটা বিয়ে কর।"

কঠোর ভাবে জ্যোতি চাহিল, কিন্তু বিমলার কৌতুকোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া সে হাসিয়া বলিল, "কি বলছিস্ তুই? এত বড় সাহস তোর?"

"হ্যাঁ" দাদা, তুমি যখন বিয়েটাকে এত বড় ক'রে ভাবতে লেগেছ, তুমি বিয়ে কর। তা'হ'লে এক বেচারা ত'রে যায়। পাত্রীটী ভাল, তোমার না-পছন্দ হ'বে না।" বলিয়া বিমলা ভারি হাসিল। জ্যোতিও হাসিতে বাধ্য হইল। বিমলা বলিল, "চিনতে পারছো না বুঝি কে সে? তবে বলি শোন, আমাদের কমলা।"

"দেখ্, যা নয় তাই বকিস নে! এ সব কথা নিয়ে ঠাট্টা করাও দোষের।"

গম্ভীর হইয়া বিমলা বলিল, "না দাদা, তোমার সঙ্গে ঠাট্টা ক'রলে দোষ নেই। আর সুধু ঠাট্টা নয়, কথাটা তোমাকে ব'লতে হ'বে ব'লেই বল্লাম। কমলা তোমাকে বড্ড ভালবাসে দাদা, এমন ভালবাসা দেখে কান্না পায়। আহা বেচারা, ওর দশা দেখে দুঃখ হয়!"

জ্যোতি বিষণ্ণ হইল। এ কথা সে একেবারে আঁচ না করিয়াছিল এমন নয়—তার মনে হইল এ কি আপদ! হিত করিতে গিয়া সে কমলার এ কি দুঃখের কারণ হইয়া বসিয়াছে।

কমলা আড়াল হইতে হঠাৎ এ সব কথা শুনিয়া ফেলিয়াছিল। সে সেদিন বিমলাকে নির্জ্জনে পাইয়া কাঁদিয়া বলিল, "আমি তোমার কি ক'রেছি দিদি যে তুমি আমার এমন শত্রুতা ক'রলে। এখন উনি আমাকে কি ঘৃণা ক'রবেন! হয়তো—আমাকে—"

বিমলা তাকে দরদের সহিত বুকে টানিয়া লইয়া বলিল, "ঘৃণা ক'রবেন না তোকে বোন, তোর ভালবাসা ঘৃণার জিনিষ নয়। কিন্তু বড় দুঃখ হয় যে তুই পাথরের দেবতাকে মানুষ ব'লে ভুল ক'রেছিস কমলা। তাইতো তোর বুকটা ভেঙ্গে যাচ্ছে।"

১৩

খোকার সেদিন একটু সর্দ্দিজ্বর হইয়াছিল, তাই পূর্ব্বরাত্রে ভূপতি সকাল সকাল বাড়ী ফিরিয়াছিলেন। খোকাকে ভূপতি বড় ভাল বাসিত—আর খোকার জন্য আজকাল সে পূর্ব্বের চেয়ে কতকটা বেশী বাড়ী থাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাই খোকার অসুখ দেখিয়া গিয়া সে সেদিন বেশীক্ষণ বিলাসের কাছে থাকিতে পারে নাই, রাত্রি নয়টা বাজিতেই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

ভূপতির ছেলের প্রতি এই আকর্ষণ বিলাসের দৃষ্টি এড়ায় নাই। সে একদিন ভূপতিকে বলিয়াই ফেলিয়াছিল—"এই বারে আমি তোমার বউর কাছে হেরে গেলাম।—তার খোকা আছে, আমার তো খোকা নেই।"

ভূপতি অনেক আদর করিয়া তাহাকে বলিল, "তোমার খোকা নেই, কিন্তু তোমার তুমি আছ বিলাস, তুমি একাই একশো।" কিন্তু বিলাসের দীর্ঘনিঃশ্বাসের উষ্ণতা সে একটুও কমাইতে পারে নাই।

*　　*　　*　　*

রাত্রে কিছু বেশীক্ষণ জাগিতে হইয়াছিল, তাই সকালে ঘুম ভাঙ্গিতে সুরমার সামান্য একটু দেরী হইয়াছিল! উঠিয়াই সে খোকার গায়ে হাত দিয়া দেখিল; মনে হইল জ্বর ছাড়িয়াছে। তারপর সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গৃহ-কর্ম্মে নিবিষ্ট হইল। ভূপতিও রাত্রে জাগিয়াছিল, সে তখনও ঘুমাইতে লাগিল।

নীচে আসিয়া সুরমা শুনিতে পাইল বাহিরের ঘরে এককড়ি চাকরকে বলিতেছে, "বাবুকে খবর দেও, বল রাধাকিশেন বাবু এসেছেন।"

এক কড়ির আওয়াজ শুনিয়া সুরমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। চাকর বাড়ীর ভিতর আসিতেই সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে এককড়িকে শুনাইয়া চাকরকে চলিল, "বলে দে বাবুর রাত্রে ঘুম হয় নি এখন ঘুমুচ্ছেন—এখন দেখা হ'বে না।"

চাকর সে সংবাদ জানাইলে এককড়ি মৃদুস্বরে তাকে বলিল, "মা ঠাকরুণকে বলগে বড্ড জরুরী দরকার—এখুনি না হ'লেই নয়—একবার বাবুকে উঠে আসতে বল নইলে বড় মুস্কিল।"

রাধাকিশেন ঝুনঝুনিয়া বড় বাজারের জিঠমল সুরযমলের মুনিম গোমস্তা। সে মস্ত বড় লোক, ভারী চালে থাকে। এককড়ি তাকে হাতে পায়ে ধরিয়া ভূপতির বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছে। সুরমার কথায় রাধাকিশেন আপনাকে একটু অপমানিত বোধ করিল।

সাধারণ মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর মতই অত্যন্ত চেঁচাইয়া কথা বলা রাধাকিশেনের অভ্যাস। তার সহজ গলা তেতলা ভেদ করিয়া উঠে—সেই কণ্ঠে সে এককড়িকে বলিল, "ঝুট্‌ঠে তুমি আমার এত তকলিফ্ করাচ্ছ এককৌড়ি। কুচ্ছু হোবে না—বাবুজীর এখনও নিদে ছুটলো না, বেলা আঠটা তো বাজিয়ে গেল। আমি এখন চলে। ফির খানা পিনা করিয়ে তো যাতে হোবে। আজ টাকা ভি দেবে না বাবু মরগেজ ভি করিয়ে দেবে না; লেকেন আজ টাকা কি মরগেজ না পাইলে নালিস হামার দাখিল করতেই হোবে।"

এককড়ি হাতজোড় করিয়া বলিল, "একটু, জেরা বৈঠিয়ে। এই বাবু এলেন ব'লে। আপনি বুঝতেই তো পারছেন, আজ যদি আপনি আপনার টাকার জন্য নালিস রুজু ক'রে দেন, তবে বাবুর সব যাবে। তাঁকে বাঁচিয়ে রেখে চালালে টাকা ভি পাবেন আর সব চ'লে ভি যাবে। একটু দয়া ক'রে বসুন। আমি কথা দিচ্ছি, মরগেজ আমি করিয়ে দিচ্ছি।"

"আরে তুমার কথা আর আমি মানে না। আজ ছ'মাস ধরিয়ে তো ঠালবাহানা করিয়ে করিয়ে তুমি আর তোমার বাবু ঘুরাইলে। তোমার কথা শুনিয়ে অনেক খরচ করিয়ে জিমিদারীতে গিয়ে সব খবর নিয়ে এলাম—লেকিন মরগেজ হ'লো নাই। আর মরগেজ দিতে উজুর কি? সব জিমিদারী মরগেজ দিলে আর এক বছর আমি টাকা রাখতে পারে—বল্‌কে আর বিশ পঁচিশ হাজার রূপেয়া ভি দিতে পারে, তা না হ'লে আর রাখতে পারে না।"

রাধাকিশেনের এই মৃদু বিশ্রাম্ভালাপের প্রত্যেক বর্ণ সুরমা শুনিতে পাইল, শুনিয়া সে স্তম্ভিত হইল। তার সর্ব্বস্ব তবে আজ যাইতে বসিয়াছে। খোকার হাত ধরিয়া তবে তাকে পথে বসিতে হইবে!

সে চাকরকে বলিল, "যা বাবুকে ডেকে দে।" তার পর সে বসিয়া ভাবিতে লাগিল—ভাবিয়া ভাবিয়া কুল কিনারা পাইল না।

সে তৎক্ষণাৎ জ্যোতিকে ডাকিবার জন্য একজন লোককে নারিকেলডাঙ্গায় পাঠাইয়া দিল।

চাকরের মুখে রাধাকিশেনের নাম শুনিয়া ভূপতি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া ছুটিয়া আসিল। সুরমা তার পথ হইতে সরিয়া আড়ালে দাঁড়াইল।

ভূপতি বাহিরের ঘরে ঢুকিয়াই ত্রস্তে ব্যস্তে রাধাকিশেন বাবুকে "রাম রাম" করিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে বলিল,

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

"কাল রাত্রে আমার ছেলের অসুখের জন্ত রাত জেগে সকালে ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম—আপনি কতক্ষণ এসেছেন ?"

রাধাকিশেন হাসিয়া বলিল, "রাত জাগা তো আপনার ব্যবসাই আছে বাবু—এ নউতুন কি ?"

ভূপতি খুব হাসিল—"হাঃ হাঃ তা' যা বল্লেন, আমরা নিশাচর বল্লেও হয়।"

রাধাকিশেন কাজের কথা পাড়িবার উদ্যোগ করিতেই ভূপতি বলিল, "দেখুন, দয়া ক'রে একটু যদি বিলাসের ওখানে যান—আমি এই এলাম ব'লে আমি সেখানে আজ আপনাকে খুসী ক'রে দেব, এখানে নয়,—বুঝলেন কি না ?"

রাধাকিশেন তার যোজন-বিস্তার কণ্ঠে বলিল, "না ভূপতি বাবু, ও-সব টাকা পয়সার কারবার হামি মেইয়ে মান্‌সের বাড়ীতে আর করবে না। সেদিন আমার একটা পচাশ হাজার টাকার মামলা ফেঁসে গেল। টাকা ভি লিলে দলিল ভি দিলে, লেকিন আদালতে বোল্লে কি সরাব পিলাইয়ে হামি লিখিয়ে লিয়েছি। আর হাকিম বেটা ভি সেই বিশোয়াস কর্‌লে কেঁও কি ও কারবারটা ঔরতের বাড়ীতে হইয়েছিল। আর হামি ওতে নেই। বাতচিত যা হোয় এখানেই হ'ক—না হয় তো চলুন হামার এটর্ণীর আফিসে, সেখানে হোক।"

"আচ্ছা, আচ্ছা তাই হ'বে চলুন। আজ ঠিক দশটার সময় এটর্ণীর বাড়ীতে আমি যাব,—এখানে নয়।"

"লেকিন হামার কথাটা বলিয়ে যাই। আজ আমার প্লেন্‌ট্‌ তৈয়ার হোবে, আজই দাখিল হোবে। সব ঠিক আছে।"

"না, না রাধাকিশেন বাবু, আর তিনটে মাস সময় দিন। এই শীতের মরসুমটা—আমি আপনার হুণ্ডী বদলে দেব আজ"—

ঘাড় নাড়িয়া রাধাকিশেন বলিল, "সে হোবে না। অনেক দিন হইয়ে গেলো। আর টাকা ছাড়বো না। ফের রাখতে চান, মরগেজ করিয়ে দিন, আপনার জিমিদারী মরগেজ দিন।"

"আচ্ছা বেশ, তাই না হয় দেব। আজই দেব—দশটার সময় গিয়ে।"

"লেকিন ষোল আনা জিমিদারী মরগেজ দেবেন।"

ভূপতি বলিল, "না না সে কেমন ক'রে হবে, আমার ভাই না যোগ দিলে ষোল আনা হ'বে কেমন ক'রে ?"

"কেন আপনার ভাইয়ের তো পাওয়ার অফ্‌ এটর্ণি আছে আপনার নামে,—হামি আপনার দেশে গিয়ে সব খবর লিয়েছি।" বলিয়া রাধাকিশেন হাসিল।

মাথা চুলকাইয়া ভূপতি বলিল, "তা আছে, কিন্তু তাই ব'লে তাকে না জানিয়ে আমি কেমন ক'রে দেবো।"

"বেশ তো বহুত আচ্ছা! আপনা ভাইকে ভি লিয়ে আসবেন।"

"সে তো এখানে থাকে না।" বলিয়া ভূপতি ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

এককড়ি ভূপতিকে একান্তে ডাকিয়া বলিল, "দেখুন, আপনি রাজী হ'য়ে যান ও ব'লছে যে মরগেজ হ'লে ও আরও পঁচিশ হাজার টাকা দেবে, ব'লে ক'য়ে আরও কিছু বেশী আদায় করা যাবে। তা' হ'লে আর সব দেনা শোধ ক'রে দিয়ে আপনি আরও দশ বারো হাজার টাকা থিয়েটারে ফেলতে পারবেন। আর পোনেরো হাজার টাকা যদি ফেলতে পারেন তবে বিনায়কের সব এক্টর এক্ট্রেস্‌ ভাঙ্গিয়ে এনে আপনি একেবারে জম্‌জমাট ক'রে তুলতে পারবেন। তার পর আপনার মাসে পঁচিশ হাজার টাকা ফেলে ছড়িয়ে হ'বে।"

এমনি করিয়া অনেকক্ষণ জপাইবার পর ভূপতি সম্মত হইল। সে রাধাকিশেনকে বলিল, "আচ্ছা রাজী, ষোল আনাই আপনাকে মরগেজ দেব, কিন্তু আর চল্লিশ হাজার টাকা দিতে হ'বে।"

"চল্লিশ হাজার! নেহী নেহী! বহুৎ তো পঁচিশ হাজার দিতে পারি।" বলিয়া রাধাকিশেন হাসিল।

ভূপতি তার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "আরে হোগা হোগা, চালিশ হাজারই হোগা। চলিয়ে হাম কৌন্নন আ যাতে হেঁ।"

মাড়োয়ারী সহ এককড়ি প্রস্থান করিল।

ভূপতি দ্বারপথে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ মেঝের দিকে চাহিয়া ভাবিল।

পিছনের দরজার পরদা ঠেলিয়া সুরমা ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। ভূপতি যখন মুখ ঘুরাইল তখন সুরমাকে দেখিয়া সহসা চমকাইয়া উঠিল।

সুরমা বলিল, "আবার কত টাকা দেনা ক'রেছ?"

কথাটার উত্তর দেওয়া ভূপতি সুবিধা মনে করিল না। সে তাই অসূয়াপূর্ণ দৃষ্টিতে সুরমার দিকে চাহিয়া বলিল, "আড়ি পেতে শোনা হ'চ্ছিল? কি ছোটলোক তুমি!"

"হাঁ আমি ছোটলোক; তোমারই তো স্ত্রী!—যাক কত টাকা—"

"কি? যত বড় মুখ তত বড় কথা! আমায় বল ছোটলোক।"

"বলিনি আমি, কিন্তু বল্লে মিথ্যে বলা হ'ত না। যে স্ত্রীর সম্মান রেখে কথা বলতে জানেনা, তাকে ছোটলোক বলা খুব বেশী কথা নয়।—যাক্, সে কথা থাক্; কত টাকা দেনা হয়েছে তোমার শুনি?"

"সে খবরে তোমার দরকার নেই। জানলে তো তুমি গায়ের গয়না ক'খানা খুলে দেবে না। সে দিতে তোমার দেওর হ'লে।"

এ কথায় সুরমার মনের ভিতর যত দুঃখ, যত ক্রোধ, যত অভিমান গর্জ্জিয়া উঠিল সে তাহা অনেক কষ্টে সম্পূর্ণ দমন করিয়া সহজ সুরে বলিল, "দরকার আমার আছে বই কি? দেনার জন্য তুমি আমার পেটের ছেলেকে ভিখারী ক'রতে যাচ্ছ, তোমার ভাইকে ঠকিয়ে তার বিষয় পর্য্যন্ত বাঁধা দিতে যাচ্ছ—এত বড় অধর্ম্ম তোমার আমি স্ত্রী হ'য়ে সুধু দাঁড়িয়ে দেখবো ভেবেছ? ও সব হবে না, তুমি বিষয় বাঁধা দিতে পারবে না।"

সুরমা দৃপ্ত সিংহীর মত তীব্র দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিল। এ দৃষ্টি ভূপতি কোনও দিন সহিতে পারে না, এ মূর্ত্তির কাছে সে চিরদিনই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তা ছাড়া, যে নিদারুণ অপকর্ম্ম সে করিতে যাইতেছে তাহাতে তার অন্তর তাকে কঠিন তিরস্কার করিতেছিল; তার উপর সুরমা যে সে কথা জানিয়া ফেলিয়াছে এবং ইহাতে তার সমূহ বিপদের আশঙ্কা আছে সে কথা ভাবিয়া সে ভয় পাইয়া গেল।

তবু দর্পের অভিনয়টা কোনও মতে বজায় রাখিয়া সে বলিল, "ইস্, তোমার হুকুম নাকি?"

"হাঁ আমার হুকুম। দেখ, যত বড় পাপিষ্ঠই তুমি হও, যত অত্যাচারই তুমি আমার ওপর কর, তবু তোমায় ধর্ম্ম দেখবার জন্য ধর্ম্মের কাছে আমি দায়ী। জেনে শুনে যদি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে আমি তোমায় অধর্ম্ম ক'রতে দিই তবে আমি অসতী। তাই আমার শাসন তোমার মানতে হ'বে, এত বড় অধর্ম্ম ক'রতে পারবে না তুমি! যদি কর, তবে তোমার শত্রুতা ক'রেও আমি তা বারণ ক'রবো।"

এ যে অযথা ভয় প্রদর্শন নয়, সে কথা ভূপতি বুঝিল। যদি সুরমা শত্রুতা করে তবে কাজও পণ্ড হইবে, হয় তো বা তার দণ্ড পাইতেও হইবে। সুরমা যদি জ্যোতির কাছে কথাটা প্রকাশ করিয়া দেয় তবেই তো সমূহ বিপদ!

কাজেই সাপুড়ের সামনে সাপের ফণার মত ভূপতির দর্প মাটির সঙ্গে মিলাইয়া গেল। সে মাথায় হাত দিয়া একটা চেয়ারের উপরে বসিয়া পড়িল।

সুরমাও আস্তে আস্তে একখানা চেয়ার টানিয়া স্বামীর পাশে বসিল।

অনেকক্ষণ পর ভূপতি বলিল, "তা'হ'লে এবার আমি জেলে যাই; আজ যদি ও নালিশ করে তবেই তো আমায় জেলে দেবে।"

"কেন জেলে দিতে যাবে। কত দেনা তোমার ওর কাছে?"

"প্রায় লাখ টাকা।"

"লাখ টাকা!" বলিয়া সুরমা চমকাইয়া উঠিল। তার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া সে বলিল, "তা বেশ তো, জমীদারীতে তোমার যে অংশ আছে তাই বেচে লাখ টাকা শোধ হ'বে।"

"তার পর আর সব মহাজন?"

"আরও আছে নাকি? সে আবার কত?"

"ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু হবে হাজার বিশেক।"

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

"তা বেশ, তোমার জমীদারী, থিয়েটার আর যা কিছু আছে সব মহাজনদের বুঝিয়ে দিয়ে তুমি ঋণ-মুক্ত হও।"

"তার পর? খাবে কি?"

"কেন? চাকরী কর।"

"চাকরী কে দেবে এখন আমায়?—আর—চাকরী ক'রবো আমি! তার চেয়ে গলায় দড়ি দেব।"

স্নিগ্ধকণ্ঠে সুরমা তখন বলিল, "দেখ, আমার কথা একটু শোন। একটা কথা জিজ্ঞেস করি—এত দিন তো এমনি কাটালে, এতে সুখ পেয়েছ কি? আগে তোমার যে হাসি-মুখ, প্রশান্ত অন্তর ছিল তা' কোথায় গেল? এখন কি তোমার সাধ হয় না আবার আমাদের সেই আগের সুখ ফিরিয়ে আনতে। তখন খোকা ছিল না, এখন সে আছে, আমাদের সুখের অভাব কি? আমার মাথা খাও, এখনও ও পথ ছাড়। ফিরে এসো। ঠাকুরপোকে ডেকে আন। দুই ভাই মিলে ব্যবস্থা ক'রে আবার লক্ষ্মী ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারবে। তোমার শক্তি আছে, বুদ্ধি আছে, বয়স এখনও আছে; লক্ষ্মণের মত ভাই আছে। কি হবে ব'লে ভেবে হতাশ হবে কেন?, পাঁকের ভেতর ব'সে তার ভিতর হাত পা ছুঁড়ে আরও ডুবে যাচ্ছ। আমার পানে হাত বাড়িয়ে দেও, আমি তোমায় তুলে আনবো; আমি তোমার সব ফিরে দেব। আবার তুমি ঠিক যেমনটি ছিলে সুধু তেমনি হও। আমি সব ভার নিচ্ছি, সব ঠিক ক'রে দেব।"

অনেক দিন পর সুরমা ভূপতিকে এমনি করিয়া তার পরিচিত স্নিগ্ধ কণ্ঠে কথা বলিল, ভূপতির মনটা ভারী নরম হইয়া গেল। সে অন্তরের ভিতর অনুভব করিল যে সুরমা যাহা বলিয়াছে তার প্রত্যেকটি বর্ণ সত্য। তার বিশ্বাস হইল যে সে যদি আজই সুরমার কাছে সব কথা খুলিয়া বলিয়া তার হাতে আত্মসমর্পণ করে, তবে সুরমা দেবীর মত তাকে হাতে ধরিয়া তুলিতে পারিবে! তা হ'লে আবার তার পূর্ব্বের শান্তি ফিরিয়া আসিবে, সে সুখ পাইবে।—তা ছাড়া মনে হইল খোকার মুখ চাহিয়া ঠিক ইহাই তার করা উচিত! একবার সে মাথা খাড়া করিয়া বসিল। স্থির করিল, সুরমা যাহা বলিয়াছে তাহাই করিবে, থিয়েটার ছাড়িয়া দিবে।—বিলাসকে?—সে কিন্তু অসম্ভব! বিলাসকে সে ছাড়িবে কেমন করিয়া? সে যে ভূপতিকে সুরমারই মত—সুরমার চেয়ে বেশী ভাল বাসে। ভূপতি যদি বিলাসকে ত্যাগ করে তবে বিলাস কি প্রাণে বাঁচিবে?

এ চিন্তায় তার মনের ভিতর এত নিদারুণ অস্বস্তি বোধ হইল যে সে ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুরমা তার মুখের দিকে বড় আশা করিয়া চাহিয়াছিল। সে বলিল "কি বল?"

ভূপতি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আমাকে একটু ভেবে দেখবার সময় দেও। অনেকগুলো জটিল কথা ভাববার আছে—ভেবে দেখি।"

হঠাৎ শক্ত হইয়া সুরমা বলিল, তারপর আজকের ব্যবস্থা কি ক'রবে?"

ভূপতি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া মাটির দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ আজ যেতে হ'বে একবার এটর্ণিবাড়ী। ও মাড়োয়ারীর বাচ্চাকে ব'লে কিছু হবে না, তার এটর্ণাকে ধ'রে আমি ঠিক কিছু সময় নেব। তারপর তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা হয় করা যাবে'খন।"

"আর যদি সময় না পাও?"

"তবে যা হয় একটা করা যাবে'খন। না হয়—আচ্ছা যা হয় হ'বে। মোদ্দা তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তোমার ঠাকুর-পোর বিষয় আমি বন্ধক দেব না।"

"আমি বলি এক কাজ কর—ঠাকুরপোকে আমি খবর পাঠিয়েছি সে এলে তাকে নিয়ে তুমি যাও। দুজনে বিবেচনা ক'রে যা ভাল হয় তাই করো।"

সুরমা যে জ্যোতিকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে এ কথা শুনিয়া ভূপতি একবার ফোঁস্ করিয়া উঠিল। সে তাড়া-তাড়ি বলিল, "না, না, তার এসবের ভিতর আসতে হবে না, তার সাহায্যের আমার দরকার নেই।"

"কিন্তু সেই তো এ বিপদে তোমার সাহায্য ক'রতে পারবে,— তার বিষয় আছে সে তাই দিয়ে"—

"না, না সে সব হ'বে না—তুমি বেশী ঘাঁটিও না · বলছি আমায়। বেশী ঘাঁটালে আমার মাথার ঠিক থাকবে না।"

সুরমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া নীরব হইল।

তারপর সে ধীরে ধীরে ভিতরে চলিয়া গেল; ভূপতি গেল উপরে শুইবার ঘরে।

ঘরে গিয়া ভূপতি আবার বাহির হইয়া সন্তর্পণে চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল। তারপর সে পা টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে দুয়ার ভেজাইয়া দিল। জামার পকেট হইতে একটা চাবী বাহির করিয়া সে সিন্ধুক খুলিল। যাহাদের কাছে সে সিন্ধুক কিনিয়াছিল তাহাদের নিকট হইতে সে বহুকষ্টে চাবীটা তৈয়ার করিয়া আনিয়াছিল।

সিন্ধুক খুলিয়া সে অবাক্ হইল—সামান্য কিছু টাকা কড়ি ছাড়া আর কিছুই নাই। সুরমার প্রায় বিশ হাজার টাকার গহনা ছিল। ভূপতি মনে করিয়াছিল চুরী করিয়া সে গহনা হাত করিবে। রাধাকিশেনকে এই গহনা ভাঙ্গিয়া টাকাটা দিতে পারিলে সে আপাততঃ থামিয়া যাইবে। তারপর শীতের মরসুমটা কাটিয়া গেলে সে সব ঠিক করিয়া লইতে পারিবে, এ বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না। যে সব লোক একেবারে দেনায় ডুবিয়া যায় তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার অন্ত থাকে না। এই শীতের মরসুমটা সম্বন্ধে আশা ছিল—এবার এত লাভ হইবে যে সব লেঠা চুকিয়া যাইবে।

কিন্তু একখানা গহনাও নাই—কোথায় লুকাইল সুরমা?

হঠাৎ ভেজান দরজা খুলিয়া সুরমা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। ধরাপড়া চোরের মত ভূপতি সিন্ধুকটা দড়াম করিয়া বন্ধ করিয়া ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরমার মন ঘৃণায় বিষাইয়া গেল। ভূপতি যে অবশেষে চুরী করিতে প্রস্তুত হইয়াছে—এত ছোট হইয়া গিয়াছে, এ কথা ভাবিতে তার সমস্ত অন্তর ঘিন্ ঘিন্ করিতে লাগিল।

সে চট্ করিয়া আঁচলে হাত দিয়া দেখিল, চাবি ঠিক আছে; তীব্রকণ্ঠে বলিল, "কি হ'চ্ছিল শুনি?—সিন্ধুক খুলে কি করছিলে?"

কথার সুরে ভূপতির মনটা যেন চাবুক খাইয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে বলিল, "আমার যা খুসী তাই করছিলাম। কিন্তু তুমি আমার কথার জবাব দেও দেখি। তোমার এ সব কাজের মানে কি? তুমি গয়নাগুলো কি ক'রেছ?"

"যা খুসী তাই ক'রেছি।"

"তা তো অবশ্য, কিন্তু খুসীর রকমটা কি তাই শুনি?"

"চাও শুনতে? বেশ। আমি ঠাকুরপোকে দিয়েছি।"

ভূপতি একথা শুনিয়া প্রথমে অবাক নিস্পন্দ হইয়া গেল। পঁচিশ হাজার টাকার গহনা সে জ্যোতিকে দিয়াছে!

তারপর সে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, "তবেরে শয়তানী! এত বড় তোমার সাহস!" —আর কথা বাহির হইল না।

সুরমা ও ভূপতি পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ শুধু চাহিয়া রহিল, ভূপতির দৃষ্টি ক্রূর, হিংস্র, যেন বিষের ছুরী দিয়া সে সুরমার অন্তঃস্থল বিঁধিয়া ফেলিতে চায়; সুরমার দৃষ্টি তীব্র, ক্রুদ্ধ, ভয়ানক।

কিছুক্ষণ এমনি থাকিয়া ভূপতি আস্ফালন করিয়া বলিল, "আচ্ছা, দেখে নিচ্ছি,—কেমন তুমি, আর কেমন তোমার দেওর।"

বলিয়া আর কোনও কথা না কহিয়া সে হুড়হুড় করিয়া নামিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

ঘৃণার দান

—গল্প—

—শ্রী চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১

বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি পরীক্ষাতেই বাগ্দেবীর বিশেষ কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলাম। শেষবারে এমন কোপবৃষ্টি হইল যে, তাহার চাপে নামটা একেবারে তৃতীয় শ্রেণীর কোঠায় গিয়া ঠেকিল। আত্মীয় বন্ধু দলে দলে দুঃখ জানাইয়া গেলেন। কিন্তু যাহার জন্য জানাইলেন, সে মনে মনে বিশেষ দুঃখিত হয় নাই। সে দেখিল, ঘাড় থেকে দেবী যেমনি নামিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মনিব আসিয়া চাপিবেন, এ আশঙ্কা রহিল না। কেননা, থার্ড ক্লাস এম্-এ, বাংলা দেশের পারিয়া। চাকরির সভায় তাহাদের হুঁকা বন্ধ। সুতরাং যতদূর দৃষ্টি যায়, কোথাও কিছু নাই, একেবারে অবাধ, উন্মুক্ত মুক্তি।

দ্বিপ্রহরের সুখনিদ্রার পর দক্ষিণের খোলা মাঠের দিকে তাকাইয়া এই কথাই ভাবিতেছিলাম। অজয় আসিয়া কহিল, আর কেন? আবার যাত্রা শুরু হোক্। আর একটা গ্রুপ (group) তো আছে।

বলিলাম, ঠিক বলেছ। যাত্রা শুরু করবো।

বন্ধু খুশী হইয়া কহিল, বেশ বেশ। কি নিচ্ছ তা'হলে?

সুটকেস্ আর একটা বিছানা।

কি রকম?

বলিলাম, যাত্রাটা এবার আর ভাবরাজ্যে নয়, একেবারে খাস ভারত রাজ্যে।

বন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, বল কি, এযে শুক্‌নো কাঠে ফুল! অর্থনীতির মরুভূমিতে কাব্যের ফোয়ারা!

অজয়ের দোষ নাই। দেশ-ভ্রমণটা যে নিছক কাব্য-রোগের লক্ষণ এ ধারণা আমারই। এজন্য, একবার কোন্নগর যাওয়া ছাড়া, হাওড়া ষ্টেশনের ওধারে আর কখনো পা দিই নাই। কেননা, এই রোগের উৎপাত সম্বন্ধে আমার গন্ধ-পিপাসু মন চিরকালই একটু বেশী সজাগ। অবশ্য কাব্যকে অবহেলা করি নাই। ইংরাজী সাহিত্য পরীক্ষার জন্য যত টুকু প্রয়োজন, পড়িয়াছি। আর বাংলাও যে একেবারে পড়ি নাই তাহা নয়। মাঝে মাঝে চয়নিকার পাতাও উল্‌টাইয়াছি। তবুও এ কথা সত্য যে আমার বর্ত্তমান ভ্রমণ-লিপ্সাটি আর যে কারণেই হোক, কবিত্বের তাড়নায় নয়।

শুভকর্ম্মে বাধা চিরকালের নিয়ম। মাতাঠাকুরাণী বাঁচিয়া ছিলেন। আমি তাঁহার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র। নিঃসন্তান এবং ধনবান্ মাতুলের স্নেহে ও অর্থে মানুষ হইয়াছি। অথচ এতকালেও কেন যে তাঁহাদের একটি দাসী আনিয়া দিই নাই, তাহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আমিও খুঁজিয়া পাইনা। তবু এতদিন পরীক্ষার ওজর ছিল। কিন্তু এবার মা আসিয়া যখন একসঙ্গে একেবারে গুটি পাঁচ ছয় সুপাত্রীর খোঁজ দিয়া বসিলেন, মাথা চুলকানো ছাড়া অন্য উত্তর জুটিল না। অবশেষে অনেক অনুনয়ের পর কি· দিনের ছুটি মঞ্জুর হইল।

বিবাহ-সম্বন্ধে এই অরুচি বা আতঙ্ক আধুনিক তরুণ-সম্প্রদায়ে একাধিক ক্ষেত্রে দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, অমুকের মন যে বিবাহে বিমুখ, তাহার কারণ বিবাহের কেন্দ্রটির দিকে সে উন্মুখ। আমার সে সৌভাগ্যও জুটিল না। কাব্য-লক্ষ্মীর মত রক্তমাংসের লক্ষ্মীও আমার মনোমন্দিরের বাহিরেই রহিয়া গেলেন। বাহিরে থাকিয়াও রেহাই পাইলেন না। সময়ে অসময়ে যে অভিনন্দন লাভ করিলেন তাহাকে আর যাই হোক প্রীতি বা শ্রদ্ধা বলা চলে না। তাহার কারণও ছিল। চার বৎসরের অর্থনীতি বিদ্যা আমাকে দেখাইয়াছে, প্রায় অর্দ্ধসংখ্যক বুভুক্ষু অথচ অকর্ম্মণ্য উদর অপর অর্দ্ধের দুয়ারে হাত পাতিয়া আছে বলিয়াই দেশের এই শোচনীয় দারিদ্র্য। দেশী এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞ-গণ যেদিন আমাদের hoarded wealth-এর (মাটি চাপা ধন)

পরিমাণ লইয়া ঝগড়া বাধাইলেন,—আটশ কোটি কি তিনশ' কোটি—আমি প্রথম দলেই সায় দিলাম, এবং বুঝিলাম, এই সাড়ে' ষোল কোটি বিলাসিনীর গয়না জোগাইতে হয় বলিয়াই ভারতে মূলধনের অভাব, ব্যবসায়ের দৈন্য, বেকার সমস্যা, দুর্ভিক্ষ, শিশুমৃত্যু, ম্যালেরিয়া ও জল-প্লাবন। তারপর ম্যালথাসের ভূত যে আমাদের ঘাড়ে চাপিবার উপক্রম করিয়াছে, তাহার মূলেও এই নারী। অথচ ইহারাই আবার রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের জন্য সভামঞ্চে দাঁড়াইয়া তারস্বরে বক্তৃতা করে, আর তাহার সভাপতিত্ব করে পুরুষ! ইনস্‌টিটুট বা সেনেট হলের সভায় শ্রীমান্ অমুক চন্দ্র ভিড়ের চাপে পিষিয়াই মরিলেন। আর শ্রীমতী অমুক দেবীর পাঁচখানা আসন আগে থাকিতেই রিজার্ভ। এম্‌-এ ক্লাসের ছাত্রী হইলেই, চেয়ার টেবিল, আর ছাত্রদের জন্য ভাঙা বেঞ্চিতে ঠেলাঠেলি। একজিবিসনে, থিয়েটারে, ট্রামে, বাসে, রেলগাড়ীতে, ভাঁড়ার ঘরে, দোকানে, দেব-মন্দিরে—সর্ব্বত্র এই মহিলা পূজা। পুরুষ জাতির এত বড় কলঙ্ক আর কিছু আছে? আমার এই মত যখন স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছি, বন্ধুগণ আমার মস্তিষ্ক সম্বন্ধেও তাঁহাদের মত অস্পষ্ট রাখেন নাই। কিন্তু তাহার ফল দাঁড়াইয়াছিল উল্টাই। তাই মা যখন বলিলেন, "পশ্চিমে যাচ্ছিস, ওদিকে ভালো মেয়ে পাওয়া যায়। কয়েকটির খোঁজও আছে। দেখে আসিস না?" তাঁহাকে মিথ্যা আশ্বাসটা আর দিতে পারিলাম না।

২

রেলগাড়ীর ভিড় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল না। সুতরাং অস্বস্তি খুবই হইয়াছিল। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে বিজাতীয় প্রাবল্যটা আরোও দুঃসহ লাগিল। মনে হইল যেন সমস্ত স্ত্রী-বাংলা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী বোঝাই করিয়া পশ্চিমে চালান হইতেছে। নিরুপায়। মুখখানাকে যথাসম্ভব হাঁড়ির মত করিয়া বসিয়া ছিলাম। একটা কি ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই আর দুইজন। একটি তরুণী তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে নিয়া উঠিলেন। সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র এ কথা নাকি বঙ্কিমচন্দ্র কোথায় বলিয়াছেন। অতএব একটি চশমাপরা যুবক তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইল। তরুণীটি তাঁহার শূন্য'স্থানের জন্য শুষ্ক ধন্যবাদ দিয়া পিতাকে সেখানে বসাইয়া দিলেন। গাড়ীতে অন্যতম যুবক যাত্রী আমি। এবার উঠিবার পালা আমারই, একথা যেন স্বতঃসিদ্ধের মত সকলেই একরকম মানিয়া নিয়া, আমার দিকে চাহিলেন। ইহার পরে আমার ওঠা একেবারেই অসম্ভব হইল। তরুণীটি আমার দিকে একবার তাকাইলেন। সে দৃষ্টি কিসের জানিনা। তবে মিনতির নয়। খানিকটা যেন কৌতুকের মতই লাগিল। তিন চার স্থল লইতে তাঁহার বসিবার আহ্বান আসিল। যুক্তকরে প্রত্যাখ্যান করিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং ঠিক আমার সম্মুখেই কাহার একটা ট্রাঙ্ক্ ছিল, তাহার উপরেই বসিয়া পড়িলেন। আমি পা দুইটা একটু টানিয়া নিলাম। মহিলাটি একটু হাসিয়া কহিলেন, আপনার একটু অসুবিধা হবে, কিছু মনে করবেন না।

আমি না হাসিয়াই কহিলাম, না।

কোন্‌টা না? অসুবিধা, না মনে করাটা?

আমি বলিলাম, অসুবিধা নিশ্চয়ই হবে। তবে কিছু মনে ক'রবো না।

কারণ জানতে পারি কি?

প্রস্তুত ছিলাম না। কহিলাম, ঠিক জানিনা। বোধ হয় আপনার অনুরোধ।

ওঃ। বলিয়া টানা চক্ষু দুটি আরো একটু টানিয়া জানালার বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অনাত্মীয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ হইলেও ইচ্ছা কখনো হয় নাই। ইহাদের কথা বলিবার রীতিনীতি তেমন জানিনা। তবু ইহাকে কেমন অদ্ভুত ঠেকিল। বয়স বোধ হয় উনিশ-কুড়ি। রূপ বিশ্লেষণের ক্ষমতা আমার নাই। তবে মোটের উপর তিনি সুন্দরী। বিশেষ করিয়া, স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে যে জিনিষটি অত্যন্ত বিরল, তাঁহার মুখে একটা বুদ্ধির জ্যোতি ছিল। কতকটা সেই কারণে তাঁহার এই অনাড়ষ্ট সহজ ভাবকে অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হয় নাই। কিছুক্ষণ পরে মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি পশ্চিম যাচ্ছেন এই প্রথম। তাই নয়? বলিলাম, হাঁ। একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

করি, কি করিয়া জানিলেন। কিন্তু পাছে ছোট হইতে হয়, তাই চাপিয়া গেলাম। আবার প্রশ্ন হইল, কোথায় যাবেন? ষ্টেশনের নাম বলিলাম।

সেখানে কে আছেন?

কেউ না।

বেড়াতেই যাচ্ছেন তো?

বলিলাম, হঁা।

গাড়ীর মধ্যে একবার চাহিয়া দেখিলাম, প্রায় সমস্ত চক্ষুই এইদিকে—কতক বিস্ময়ে, কতক ঈর্ষায়, কতক বিরাক্ততে। মহিলাটির সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি কখনো জানালার বাহিরে চাহিতেছিলেন কখনো একটু বাঁকা চোখে আমায় দেখিতেছিলেন। একবার মনে হইল, একটা চাপা হাসি তাঁহার ওষ্ঠে গণ্ডে যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা! আমি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

একটা ছোট ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই, মহিলাটি উঠিয়া ডাকিলেন, বাবা, ও বাবা! তাঁহার বাবা ঝিমাইতেছিলেন, চমকিয়া শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। 'এদিকে এসো' বলিয়া মেয়েটি হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, আপনি উঠছেন না যে?

আমি জানালা দিয়া কষ্টে ষ্টেশনের নাম পড়িয়া দেখিলাম, আমার গন্তব্য স্থানই বটে। কিন্তু স্থানটির চেহারা দেখিয়া, এবং বিশেষ করিয়া এই সঙ্গিনীটির কল্যাণে নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া নামিবার মত ইচ্ছা বা জোর খুজিয়া পাইলাম না। সমস্ত ভারতবর্ষে এত জায়গা থাকিতে বাছিয়া বাছিয়া কেন যে এইটিই চোখে পড়িল এবং কোন কিছু না জানিয়াই একটা টিকিট কিনিয়া বসিলাম, তাহার একটু ইতিহাস ছিল। শুনিয়াছিলাম, নামকরা স্বাস্থ্যনিবাসগুলি এ সময়ে এক একটি রীতিমত মহিলানিবাস হইয়া উঠে। সেই জিনিষটি এড়াইবার জন্যই এমন একটি স্থান খুঁজিয়া নিয়াছিলাম, যাহার নামটা এক টাইম টেবল ছাড়া আর কাহারও কাছেই শুনি নাই। তখন কে জানিত, অদৃষ্টের বিড়ম্বনা থাকিলে পোড়া শোল মাছও জলে পালায়। কাহার মুখ দেখিয়া বাহির হইয়াছিলাম!

ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া মেয়েটি নামিতে নামিতে মৃদুস্বরে কহিলেন, গাড়ীটা কিন্তু এখানে সারাদিন থাকে না। চাহিয়া দেখিলাম, সুমুখেই একটা কুলী দাঁড়াইয়া। সে যেন সমস্ত চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি দিতে আসিয়াছে। জানালা দিয়া বাক্স বিছানা তাহারি হাতে তুলিয়া দিয়া নামিয়া পড়িলাম। পিছন হইতে একগাড়ী লোকের চাপা হাসি আর চাপা রহিল না। সমস্ত রাগ পড়িল ঐ মেয়েটার উপরে। দেখিলাম, তেমনি করিয়া এখনো মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। স্ত্রীলোক না হইলে—।

ষ্টেশনে আর একটিও বাঙালী যাত্রী নাই। অন্যান্য যাত্রীও অত্যন্ত কম। আত্মগোপন করিব সে পথও বন্ধ। বৃদ্ধ ভদ্রলোক একরাশ বিনয় এবং কৌতূহল নিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় উঠবেন?

একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলিলাম, উঠবো যেখানেই হোক এক জায়গায়।

ভদ্রলোকটি যেন থতমত খাইয়া গেলেন। ক্ষণেক পরে আবার কহিলেন, আপনার এখানে কোন আত্মীয় আছেন?

বলিলাম, না, একটা হোটেল টোটেল দেখে নেবো।

তিনি স্নেহের সঙ্গে বলিলেন, ওসব তো এখানে কিছু নেই। ছোট জায়গা। এই আমরা তিন ঘর মাত্র বাঙালী, আর সব ছাতুখোর।

কন্যাটি চাপা গলায়, অথচ আমাকে শুনাইয়া কহিলেন, বোধ হয় ষ্টেশন ভুল হ'য়ে থাকবে।

ভদ্রলোক নিতান্ত সরল এবং সত্যকার সহানুভূতির সঙ্গে কহিলেন, ওঃ তাহলে তো বড্ড অসুবিধা হ'বে। তা' এ বেটাদের যে আলোর ব্যবস্থা ষ্টেশন ভুল করা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। বলতে কি, দেখুন, আমার এই মা-টি না থাকলে আমারও ঠিক ঐ অবস্থাই হ'ত। যাক্‌গে, কি আর হ'য়েছে? চলুন এই গরীবের বাড়ী। যা' জোটে, রাতটা কোনরকমে কেটে যাবেই।

চলুন, বলিয়া অগ্রসর হইলাম। কিন্তু কণ্ঠস্বরে রাগ চাপা রহিল না।

৩

নিজেকে গরীব বলিয়া ভদ্রলোক যে একটি বৈষ্ণব বিনয়ের সুদৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, পরদিনই তাহা বোঝা গেল। বাড়ীটি ছোট। কিন্তু তাহার প্রতি অঙ্গে, এবং তাহার ভিতরকার জীবনযাত্রার প্রতি ছন্দে যে ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহা মোটেই ছোট নয়। সকাল বেলা যে-সব ভৃত্যের দল আমাকে সাহায্য করিতে আসিল, তাহাদের কাছে শুনিলাম, ইঁহার নাম সুবোধচন্দ্র রায়। পূর্ব্ব বাংলায় কোথায় বড় জমিদার ছিলেন। ভ্রাতৃবিচ্ছেদে সব বিক্রী করিয়া এখানে আসিয়া আছেন। এখন থাকিবার মধ্যে এই সুলতা। ইহারও সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। বর বিলাতে পড়িতে গিয়াছে। শেষের খবরটায় বুকের ভিতরটা যেন কেমন একটু নড়িয়া উঠিল। ভাবিলাম, এ আবার কি? পরক্ষণেই খুব খানিকটা হাসি পাইল। সুলতা আসিয়া কহিল, ঘুম ভাঙল? হঠাৎ উত্তর দিতে পারিলাম না। তাহার দিকে খানিকটা নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলাম। কি জানি, এই কিছুক্ষণ আগের বুক কাঁপার সঙ্গে ইহার যোগ ছিল কিনা। তাহার সাজগোজের বিশেষত্বটা বেশ লাগিল। মেয়েদের এ-সব খুঁটিনাটি কখনো চোখে পড়ে নাই। আজ পড়িল। আমার এ ভাবান্তর বোধ হয় তাহার চক্ষুও এড়াইতে পারে নাই। কহিল, কি ভাবছেন?

বলিলাম, কই কিছুই না।

আপনার বুঝি ঠাণ্ডা চা খাওয়া অভ্যাস?

বলিলাম, ঠাণ্ডা গরম কোন চা'ই খাওয়ার অভ্যাস নেই।

কেন, মেয়েরা করে বলে? কিন্তু আজ আমি করিনি। আপনি নিরাপদে খেতে পারেন। বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

ইহার ব্যবহারে বিস্মিত হইবার মতো আর বিস্ময় ছিল না। তবু কেমন খটকা লাগিল। একি আমার নারী-বিদ্বেষ লইয়া ঠাট্টা? কিন্তু সে খবর ইহাকে কে দিল? কিছুক্ষণ পরে কহিল, আপনি আজই যাচ্ছেন তো?

প্রশ্নটা অদ্ভুত। কহিলাম, হাঁ।

ন'টা ৪৩ মিনিটে আপনার গাড়ী।

বলিলাম, তাতেই যাবো।

কিন্তু ১১টার আগে আমাদের রান্না হয় না।

সে না হ'লেও চলবে।

আপনার চলতে পারে কিন্তু আমাদের চলবে না।

বলিলাম, কেন?

অতিথি অভ্যাগতকে না খাইয়ে যেতে দেওয়া ভদ্রলোকের নিয়ম নয়। বলিয়া তেমনি হাসিয়া চঞ্চল চরণে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরেই কর্ত্তার ঘরে আমার ডাক পড়িল। অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কহিলেন, আমার সুবল থাকলে আজ তোমার মতই হ'ত। সুতরাং তোমাকে, বাবা 'তুমি'ই ডাকবো। তুমি যখন বেড়াতেই বেরিয়েছ, তখন কিছুদিন এইখানেই থেকে যেতে হবে। এ জায়গাটাও বেশ। আর আমরাও একজন কথা ব'লবার লোক পাবো। স্বজাতির মুখ তো এখানে বড় একটা দেখা যায় না। হ্যাঁ আরো শুনলাম, তুমি অর্থনীতির এম-এ। আমারও বাবা ঐ জিনিষটার ওপর বড্ড ঝোঁক কিন্তু অনেক কথাই বুঝতে পারিনে। বুড়োবয়সে কিছুদিন তোমার ছাত্র হ'তে লোভ হ'চ্ছে।

কহিলাম, তা' বেশ।

আশ্চর্য্যময়ীর আরো একটা পরিচয় পাওয়া গেল। আমি অর্থনীতির এম-এ, এ খবরটাই বা ইহার কানে আসিল কি করিয়া?

দুপুর বেলা প্রায়ই অর্থনীতি বা রাষ্ট্রনীতির আলোচনা হইত। সেদিন যুদ্ধপীড়িত ইউরোপের মুদ্রাপ্রমাদ সম্বন্ধে বিশদভাবে বক্তৃতা করা গেল। বৃদ্ধ মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিলেন। সুলতাও ছিল। শেষ হইলে পিতা গর্ব্বভরে কন্যার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, কিরে কেমন? সুলতা যেন ধ্যানে ছিল। চমকিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া নিয়া কহিল, হ্যাঁ, এ ছাই আবার লোকে পড়ে, আর ঘটা ক'রে বক্তৃতাও করে। বলিয়া উঠিয়া গেল। বৃদ্ধ যেন আহত হইলেন। কহিলেন, ওর কথায় কিছু মনে ক'রোনা বাবা। ও ঐ রকম পাগলী।

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ওর মায়ের যাবার পর থেকে ও-ভাবটা ক্রমে চলেছে।

বলিতে বলিতে সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখখানির উপর কোন্ দূরাগত স্মৃতির ছায়া ঘনাইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, কিন্তু এটা আমি ঠিক জানি, অরুণ, ও সব কথাই বুঝেছে। আমার চেয়ে ভালোই বুঝেছে।

সেদিন সুবোধ বাবুর শরীর ভালো ছিল না। দুপুর বেলা নিজের ঘরে বসিয়া মাকে চিঠি লিখিতেছিলাম। সুলতা একটা বই নিয়া প্রবেশ করিল। কহিল, কি লিখছেন? কবিতা?

হাসিয়া কহিলাম, হাঁ।

হাঁ কি রকম? আপনি কি মনে করেন কবিতা লেখা একটা অপরাধ?

মুখ না তুলিয়াই কহিলাম, অপরাধ নয়, অপব্যয়।

কিসের?

শক্তি এবং সময়ের।

মৃদু হাসিয়া কহিল, বটে? কিন্তু এই আমি বলে রাখলুম, আপনাকে আমি একদিন কবিতা লিখিয়ে তবে ছাড়বো। দেখি আপনার অর্থনীতির 'ডিমাণ্ড্ আর সাপ্লাই' কেমন করে রক্ষা করে।

তেমনি হাসিয়াই জবাব দিলাম, তাই যদি হয়, সেদিন আপনাকে ধন্যবাদ দিতে ভুলবোনা।

দেখা যাবে—বলিয়া কাছে আসিয়া কহিল, কাকে চিঠি লেখা হচ্ছে?

বলিলাম, আপনার জেনে লাভ?

মাকে? ও! আমার কথা লিখবেন না?

বলিয়াই যেন অপ্রস্তুত হইল। চাহিয়া দেখি সুন্দর মুখখানা হঠাৎ লাল হইয়া উঠিয়াছে। একটু কৌতুক লাগিল, বলিলাম, কি লিখবো? মুহূর্ত্তেই নিজেকে সামলাইয়া নিয়া কহিল, লিখবেন, এ রকম লক্ষ্মীছাড়া নির্লজ্জ মেয়ে আর দেখিনি। এর জ্বালায় দিনগুলো নেহাৎ তিক্ত হ'য়ে উঠেছে।

লিখিতে লিখিতে বলিলাম, হুঁ, তারপর?

বাঃ আপনি সত্যিই লিখছেন নাকি? না-না ছিঃ।

কলম রাখিয়া বলিলাম, তবে থাক্।

হঠাৎ যেন বহু দূর থেকে অপূর্ব্ব কণ্ঠে কহিল, সত্যি, মাকে একবার দেখতে ইচ্ছা করে।

এই চপলা মেয়েটি একমুহূর্ত্তে এমন হইয়া যাইতে পারে ভাবিতে পারা যায় না। খানিকক্ষণ পরে আবার ছিন্ন সূত্রে ফিরিয়া গিয়া কহিল, কই, আপনার চিঠি শেষ করুন। কবিতা শোনাতে হবে।

বলিলাম, শোনাতে না শুনতে?

কেন?

প্রথমটি হ'লে নমস্কার। আর দ্বিতীয়টি, তা যখন বলছেন, আচ্ছা আরম্ভ করতে পারেন।

বইটা বোধহয় চয়নিকা। যেখান সেখান থেকে পড়িয়া যাইতে লাগিল। অধীর না হইয়াই শুনিয়া গেলাম। কিন্তু কি শুনিলাম, সুকাব্য না সুকণ্ঠ বলিতে পারিব না। 'কচ ও দেবযানী' পড়িতে পড়িতে শেষের দিকে সেই আশ্চর্য্য কণ্ঠ যেন ধরিয়া আসিতে লাগিল। শেষ না হইতেই বইখানা রাখিয়া দিয়া জানালা দিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কবিতা পড়িয়া তন্ময় হইতে অনেককে দেখিয়াছি। চিরকাল হাসিই পায়। আজ দেখিলাম, পাইল না। অনেকক্ষণ পরে আমার দিকে ফিরিয়া কহিল, দেবযানীকে আপনার কেমন লাগে?

বলিলাম, অনেক দিন আগে একবার এটা শোনা গিয়েছিল। তখন রাগ হ'ত। আজ হাসি পাচ্ছে। একটু দয়াও হ'ল।

চমকিয়া উঠিল, হাসি পাচ্ছে! কেন?

বলিলাম, মেয়েটার বোকামি দেখে।

চাহিয়া আছে দেখিয়া আর একটু পরিষ্কার করিয়া কহিলাম, ওর মাথায় এটা ঢুকল না, কচ মস্ত বড় একটা দায়িত্ব নিয়ে এসেছে। এই সব ছিঁচকাঁদুনে প্রণয় ব্যাপারে দৃষ্টি দেবার তার সময় নেই।

সুলতা উঠিয়া দাঁড়াইল, এ সব আপনি সত্য বলছেন?

আপনার সন্দেহের কারণ?

দুই পা পিছাইয়া গিয়া তীব্র কণ্ঠে কহিল, আপনার এতখানি অহঙ্কার কিসের জন্য, বলুন তো?

অদ্ভুত প্রশ্ন। তাহার চোখদুটি দিয়া যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছিল। কহিল, আপনি কি মনে করেন, মেয়েমানুষ মানেই একটা হাসিঠাট্টার বস্তু। আর আপ-নারা—শেষ না করিয়াই বেগে বাহির হইয়া গেল। এ কোন্ সুলতা? এ অভিযোগই বা কাহার? কিছুই স্পষ্ট বোঝা গেল না। একটু কেমন যেন সন্দেহ লাগিল। এতখানি উষ্মাকে নিছক দেবযানীর ওকালতি বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। একটু পরেই আবার সে আসিল। আর এক দফার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, হঠাৎ অত্যন্ত সহজ হাসি-কণ্ঠে কহিল, নাঃ আপনার অবস্থা খুব কাহিল নয়। প্রথম পরীক্ষাতেই পাশ করেছেন। আমি একটু চমকে দেবার চেষ্টায় ছিলাম, নিশ্চয়ই ধরতে পারেননি?

আমি জবাব দিব কি। 'হতভম্ব' হইয়া চাহিয়া রহিলাম। আবার কহিল, দেবযানী সম্বন্ধে আমারও ঠিক ঐ ধারণা। কিন্তু লোকে কত চোখের জলই না ফেলে। এই যেমন—বাবা ডাকছেন বুঝি—যাই, বলিয়া উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি মনে মনে হাসিয়া বলিলাম, সুলতা তুমি অসামান্য বুদ্ধিমতী। কিন্তু তবু তুমি মেয়ে মানুষ। লুকাইতে পার নাই। তোমার চোখই সব বলিয়া দিয়াছে।

সুলতা এবার যতদূর সম্ভব আমাকে এড়াইয়া চলিত। আবার যখন-তখন বিনা প্রয়োজনে আমার ঘরের পাশ দিয়া অকারণ দ্রুতপদে চলিয়া যাইত। কর্ত্তার ঘরে নিয়-মিত আড্ডায়ও তাহাকে দেখা যাইত না। কিন্তু কোন কোন দিন বাহির হইতেই দেখিয়াছি, দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। কথা বলিতে গেলে, যেন দেখিতে পায় নাই, এমনভাবে চলিয়া যাইত। সেই করুণ চক্ষুদুটি মনে পড়িয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কাজেই মন দিতে পারিতাম না। আবার মাঝে মাঝে তাহাকে অত্যন্ত কঠোর দেখাইত, যেন কাহার সঙ্গে লড়িতেছে। নারী-হৃদয়ের রহস্য নিয়া কোনদিন মাথা ঘামাই নাই। আজও মাথা অঘর্ম্মাক্ত রহিল। কিন্তু কেন জানি না মনটা মাঝে মাঝে যেন কোন অলক্ষ্য বেদনায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত। ভয় হইত, কী এ? শেষকালে কি সত্যই কাব্যরোগে ধরিল? অথবা সেই বড় রোগটায়?

৪

কিছুদিন থেকে আর ভাল লাগিতেছিল না। সেদিন ভোরে উঠিয়া ভাবিতেছিলাম, এবার তল্পী বাঁধা যাক। কিন্তু সেদিকেও যেন মনটা ঠিক সরিতেছিল না। হঠাৎ সুলতা আসিয়া হাজির। সাজগোজটা খুবই বিশেষ ধরণের। মুখে একটি সজীব হাসি। অনেকদিনের মেঘলা ভাব কাটিয়া গেলে প্রভাত যেমন করিয়া হাসে তেমনি। মনটা যেন ভরিয়া গেল। হঠাৎ মুখ থেকে বাহির হইল, বাঃ। একটু লজ্জিত হইল। কহিলাম আজ কী?

আজ যে আমার জন্মদিন। শীগ্‌গির কাপড় পরে নিন, ঝর্ণার ধারে যেতে হবে। হাঁটতে পারবেন তো?

বলিলাম না পারলে আপনিই তো আছেন। হাতটা বাড়িয়ে দিলেই চলবে।

একবার চাহিয়া দেখিলাম। চোখোচোখি হইতেই দৃষ্টি নত করিল। এক ঝলক রক্ত চোখে মুখের উপর দিয়া ছুটিয়া গেল। একটু কাছে আসিয়া কহিল, জন্মদিনে আমাকে কি দেবেন বলুন তো?

বলিলাম, কি চান আপনি?

সে আমি কি জানি?

বিপদে পড়িলাম। কাব্যের ভাষায় এ সব ক্ষেত্রে কি বলিতে হয় জানা ছিলনা। একটু হাসিয়া কহিলাম, দেবার মত কিছুই তো দেখছিনে।

মনের ভেতরটা খুঁজে দেখুন, পাবেন।

হাসিয়া বলিলাম, কই, আমি তো পেলাম না। আপনি যদি পান নেবেন।

আমি ওরকম দান চাইনে। বলিয়া ছেলেমানুষের মত মাথাটায় একটা ঝাঁকানি দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। মিনিটখানেক পরে কহিল, আচ্ছা আপনার জন্মদিন কবে?

কহিলাম জানি না।

অতিমাত্র বিস্ময়ে কহিল, জানেন না!

বলিলাম, জন্মালেই একটা জন্মদিন থাকে সে জানি। কিন্তু তার সন তারিখ মনে করে রাখবার প্রয়োজন দেখিনে।

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চক্ষুদুটি, যাহাকে বলে, বিস্ফারিত করিয়া বলিল, জন্মদিনে উৎসব করেন না!

মানুষের জন্মটা কি এতই বড় যে তার জন্যে ঘটা ক'রে উৎসব ক'রতে হ'বে। হাঁ তবে মেয়েরা ক'রতে পারে। যাদের আর কিছু নেই, তাদের কাছে জন্মটাই একটা সম্বল।

বলিয়া ফেলিয়াই অপ্রস্তুত হইলাম। অভ্যাসবশতঃ আমার মুখের মেয়ে শব্দটার উচ্চারণের মধ্যেই যথেষ্ট বিদ্রূপ থাকে। সুলতা যেন আহত হইল। কিন্তু জ্বলিয়া উঠিল না। আশ্চর্য্য করুণ চক্ষে আমার মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

আধঘণ্টার মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছি। ঝি আসিয়া জানাইল, দিদিমণির অসুখ করেছে, তিনি যাবেন না বললেন।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় বেড়াইয়া ফিরিতেই সুলতা আসিল। মুখখানা অত্যন্ত বিষণ্ণ। একটা টাইম্‌টেবল রাখিয়া দিয়া কহিল, এটা আপনার। গাড়ীতে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। আর এর মধ্যে একটা চিঠি ছিল। আমি পড়েছি। বুঝতে পারছি, সেটা বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে। কিন্তু—বলিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল। এই কুণ্ঠার সুরটা মনে একটু লাগিল। কিন্তু বলিবারই বা কি আছে? চিঠিখানা আমার এক বন্ধুর। আমার নারীবিদ্বেষ ইত্যাদি লইয়া বক্তৃতা করিয়াছে। বুঝিলাম, আমার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সুলতা কোথায় পাইয়াছে। ব্যাপারটাকে সহজ রহস্যে আনিবার জন্য কহিলাম, পরের চিঠি পড়া অন্যায়, একথা বোধ হয় আপনাদের শাস্ত্রে স্বীকার করে না।

হাত জোড় করিয়া কহিল, আপনি রাগ করবেন জানলে পড়তাম না। আমাকে মাপ করুন।

হায়রে, রাগ করিলাম! একটু পরে কহিল, আপনাকে অনেকদিন ধ'রে রেখেছি ব'লে আপনার বাড়ীর সবাই নিশ্চয়ই ব্যস্ত আছেন। আপনিও বিরক্ত হ'য়ে উঠেছেন। যাতে আপনার ক্ষতি হয়, সেটা আমরা চাইনে।

অতি বিনয়টা ভাল লাগিল না। একটু শ্লেষের সঙ্গে বলিলাম, লাভ ক্ষতি বোঝবার বয়স আমার অনেকদিনই হ'য়েছে। সেটা আপনাকে কষ্ট ক'রে জানাতে হ'বে না।

আবার সেই সুর, আপনাকে এখানে নিয়ে আসাটাই ভুল হ'য়েছিল। এবার রীতিমত ঝাঁজ দিয়া বলিলাম, তার প্রায়শ্চিত্তটা মনে মনে করলেই পারতেন। এইসব মেয়েলি ভদ্রতা সবার কাছে মিষ্টি নাও লাগতে পারে।

সুলতা হঠাৎ দীপ্তকণ্ঠে কহিল, আপনার এ কি রকম কথার ধরণ, শুনি? মেয়েদের সম্বন্ধে একটু সংযত হ'য়ে কথা কইবেন।

একটু থামিয়া কহিল, জানি আমাকে আপনি ঘৃণা করেন। কিন্তু মনে রাখবেন, আমার পক্ষেও সেটা খুবই সম্ভব। নিজের দিকে একবার চেয়ে দেখেছেন?

বলিয়া ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

মুখের উপরে একটা মেয়ে স্পষ্টভাবে জানাইয়া গেল, সে আমাকে ঘৃণা করে। চেষ্টা করিয়াও রাগ করিতে পারিলাম না। কাহার উপর রাগ করিব? সেই বিক্ষত অন্তরের যে মূর্ত্তি আজ স্বচক্ষে দেখিলাম, তাহার উপরে আর অস্ত্র বসাইতে ইচ্ছা হইল না। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়াছিলাম। কি মনে করিয়া একটু হাসিও পাইল। ভাবিলাম, জাল তো আমি রচনা করি নাই। এখন যদি —নাঃ। পরক্ষণেই নিজেকে শক্ত করিয়া কহিলাম, না হোক, তবু ছিঁড়িতেই হইবে। এই কুৎসিৎ, হৃদয়হীন, নারীবিদ্বেষীর রূঢ় আকর্ষণ থেকে তাহাকে বাঁচাইব। অতএব শুভস্য শীঘ্রম্। জিনিষপত্র গুলি এখানে ওখানে পড়িয়াছিল। সুট্‌কেস্‌টা টানিয়া নিয়া তাহাই গুছাইতে লাগিয়া গেলাম।.........অবশেষে পাইলাম কিনা ঘৃণা। কিন্তু মনটা যেন শেষ পর্য্যন্ত খুসীই হইল।

দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া ছিলাম। হাতের জামাটায় একটু টান লাগিতেই ফিরিয়া দেখি সুলতা। কহিল আপনি এত নিষ্ঠুর! একটু দয়া মায়াও নেই? আমার দিকে একবার চেয়ে দেখুন তো? বলিয়া সুট্‌কেস্‌টার ভিতর হইতে সমস্ত জিনিষ পত্র টানিয়া বাহির করিয়া রাখিয়া দ্রুতপদেই চলিয়া গেল। সেইদিকে চাহিয়া

রহিলাম। মনটা যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। নারীর আর্ত্তহৃদয়ের সজল কণ্ঠ। জীবনে এই প্রথম তাহার স্পর্শ লাগিল। কোন কথাই মুখে আসিল না। সুধু মনে মনে কহিলাম, দয়ামায়া আছে সুলতা। তোমার দিকে চাহিয়াও দেখিয়াছি। দেখিয়াছি বলিয়াই আজ যাইতে হইবে।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর কর্ত্তার ঘরে গিয়া কহিলাম, কাল বাড়ী যেতে ইচ্ছা করি।

কর্ত্তা যেন আঘাত পাইলেন। কহিলেন, কেন?

মিথ্যা বলিলাম, মায়ের শরীর ভালো নয়।

সুবোধবাবু একটা ভদ্রতাসূচক সহানুভূতিও জানাইলেন না। তাঁহার চিন্তাটা কিছুদিন এমন একটা সূত্র ধরিয়াছিল, আমার কথায় যাহাতে টান পড়িল। কয়েকদিন ধরিয়া অনেক সময়ে ভাবী জামাতার সম্বন্ধে অনেক দুঃখের কথা আমায় বলিতেছিলেন। বিলাতে গিয়া সে যে তাঁহার মূল্যবান অর্থ এবং তাহার চেয়ে বড় নিজের মূল্যবান চরিত্র এমন করিয়া নষ্ট করিবে, ইহা তিনি ধারণাই করেন নাই। আজ সকালের ডাকেও বিলাতপ্রবাসী এক বন্ধুর পত্রে এমন সব কথা জানিয়াছেন, যাহা কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না। আর সে চিঠি পড়িয়াছিল স্বয়ং সুলতা। দুপুরবেলা হঠাৎ আমার ঘরে আসিয়া আজ তিনি আমার নামগোত্রাদি জানিয়া নিয়াছিলেন। এখন আমার চলিয়া যাইবার প্রস্তাবে সমস্ত মনটাকে এইদিকেই টানিয়া আনিলেন। নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছা যাও। তোমার মামাকে আমি চিঠি লিখবো। কিন্তু তার আগে তোমার নিজের মতটা একবার—। অবিশ্যি জিজ্ঞেস ক'রবার কিছুই নেই। তবু—।

আমি প্রশ্ন করিলাম, কোন বিষয়ে?

সুলতা ঘরের এক কোণে দাঁড়াইয়াছিল। সেইদিকে চাহিয়া কহিলেন, সুলতার সম্বন্ধে।

জবাব দিতে গিয়া আমিও সেইদিকে চাহিলাম। সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। একবার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। বারকয়েক ইতস্তত করিলাম। মনে পড়িল, আজই সন্ধ্যাবেলায়—। না, কোনমতেই না। যে বিরোধ আজ আমার স্পর্শে তুমুল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে আর ঘনাইয়া তুলিতে চাহি না। ধূলিলুণ্ঠিতা কাঙালিনীকে উঠাইতে গিয়া স্পর্দ্ধিতা বিজয়িনীকে অপমান করিব না। জয়মাল্য তাহারি থাক। আমি চলিলাম। হঠাৎ চোখে পড়িল সুবোধবাবু তখনো উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। কোনরকমে নিঃশ্বাস চাপিয়া বলিয়া ফেলিলাম, আমার বিবাহ স্থির হ'য়ে গেছে।

সেই সুটকেস্‌টা আবার গুছাইয়া লইয়া সুলতাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। সে আসিল, কহিল, আর আসবেন না?

মৃদু হাসিয়া কহিলাম, তোমার বিয়ের সময় চিঠি দিও। আসবো।

সহজভাবেই জবাব দিল, যাবার সময় এ খোঁচাটা না দিলেও পারতেন।

খোঁচা! খোঁচা কেন?

আমার ভাবী স্বামীকে আপনি জানেন। আর এও জানেন, তার সঙ্গে বিয়ে সুখের বিয়ে নয়।

অত্যন্ত দুঃখ লাগিল। কিন্তু কিছু একটা বলিবার মত খুঁজিয়া পাইলাম না।

সুলতা কহিল, তবু সেই বিয়েই আমাকে করতে হ'বে; বাবা যাই বলুন। আমি তো কারো দয়ার ভিখারী নই।

একটু থামিয়া আবার বলিল, আপনার উত্তরে আমি খুসীই হয়েছি। যদিও জানি ওটা মিথ্যা কথা।

আমি কহিলাম, সুলতা—

না-না। আপনাকে আর কষ্ট করে এসে দয়া দেখাতে হ'বে না। হাসিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু একী হাসি! চুপ করিয়া রহিলাম। বুঝিলাম, সুধু অভিমান নয়। এই উদ্ধত কণ্ঠের অন্তরালে একটি প্রাণপণ ব্যর্থ চেষ্টার ইতিহাস আছে। কিছুক্ষণ পরে সেই আবার কথা কহিল। কাছে আসিয়া আমার চাদরের একটা কোণ ধরিয়া তেমনি ম্লান হাসিয়া কহিল, যাবার সময় একটু কবিত্ব করতে ইচ্ছা করছে।

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কোন রকমে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলাম, কি ?

একটা আশীর্ব্বাদও করলেন না ?

কি আশীর্ব্বাদ চাও ?

এই আশীর্ব্বাদ—যেন-যেন—না থাক্, বলিয়া হঠাৎ মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম না। কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া সুট্‌কেসটায় হাত রাখিতেই যেন তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত মুখ তুলিয়া চাহিল। অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর, যেন আপনার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে আমার একান্ত বুকের কাছটিতে সরিয়া আসিয়া অশ্রুভরা চোখদুটি চোখের উপর তুলিয়া দাঁড়াইল। কি একটা বলিতে চাহিলাম, পারিলাম না। সুধু দুইহাতে তাহার মাথাটা বুকের উপর চাপিয়া ধরিলাম। তাহার সমস্ত দেহখানি কয়েকবার কাঁপিয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে, যেন সহসা চেতনা লাভ করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমিও বাহির হইয়া পড়িলাম। শীতের জ্যোৎস্না শিশিরে ভিজিয়া কুয়াসার আড়ালে মুখ লুকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম। মনে হইল, এই জ্যোৎস্না, ইহার বুকে যেন রক্ত নাই। সদ্যমৃত সুন্দরীর অধরলগ্ন হাসির মত নিষ্প্রভ, করুণ। হঠাৎ কোথা থেকে দুই চোখ ভরিয়া 'হু হু' করিয়া জল ছুটিয়া আসিল। তাহাই মুছিতে মুছিতে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া পড়িলাম।
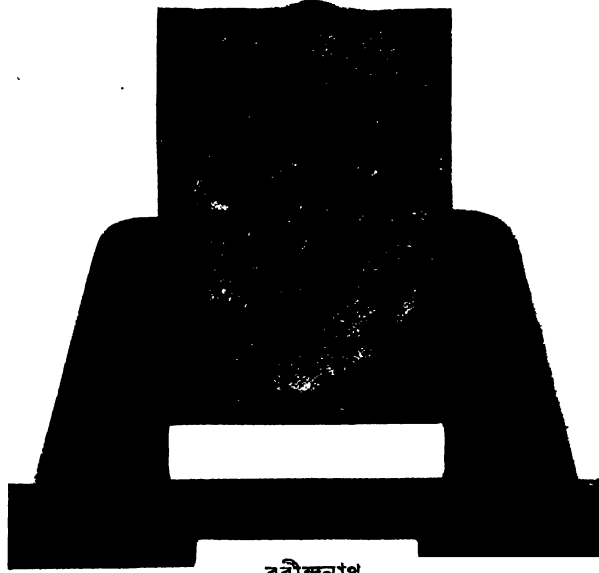
রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার
গঠিত প্লাক্ হইতে

কল্যাণীয় শ্রীমান অসিতকুমার হালদার,

আমার মূর্ত্তি পূর্ণ করি
মুক্তি পেল তোমার শক্তি ;
রেখায় রেখায় নিত্য শিখায়
দীপ্তি পেল তোমার ভক্তি।
চক্ষে তোমার প্রাণের মন্ত্র,
তাইতো তোমার ধ্যানের দৃষ্টি,
তোমার রসে আমার রূপে
রচিল এই নূতন সৃষ্টি।

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫ বৈশাখ,
১৩৩৪

১০

অপ্রত্যাশিত অনীপ্সিত বিপাক যে কেবল মাত্র বহির্জগতে পথে ঘাটে, কলে কারখানায়, রেলে জাহাজেই ঘটে তাহা নহে; বহির্জগতের মতো মানুষের মনোজগতেও তাহার একই মাত্রায় স্থান আছে। অপরিমিত সতর্কতা সত্ত্বেও সামান্য একটা পয়েণ্টের গোলযোগে যেমন এঞ্জিনে এঞ্জিনে অকস্মাৎ প্রচণ্ড সঙ্ঘাত ঘটে, ঠিক তেমনি সামান্য কোনো কারণে দুইটি মনের মধ্যে হঠাৎ একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হয় যাহার বিন্দুমাত্র অভিসূচনা পূর্ব্বাহ্নে দৃষ্টিগোচর ছিল না। বহির্জগতের বিপাক মানুষের সাধারণ বিচার বুদ্ধি বিবেচনা আত্মরক্ষাপরায়ণতার অনায়ত্ত মনে হয় বলিয়া মানুষ ইহার নাম দৈবদুর্ব্বিপাক রাখিয়া একটা সান্ত্বনার ব্যবস্থা করিয়াছে, কিন্তু মনোজগতের ব্যাপারে দেবতার প্রভাব আরোপিত করিবার সুযোগ না পাইয়া সমস্ত দুঃখটা সে নিজের অবিবেচনার ফল বলিয়া ভোগ করে।

তাই মোটরকারে কমলার পাশে বসিয়া রোহিণী যাইতে যাইতে বিনয়ের মন পরিতাপের বেদনায় ভরিয়া উঠিল। আঁকিবার তুলি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের প্রতিদিবসের সকল খুঁটিনাটির মধ্যে যে সংযমের ঐকান্তিক সাধনা সে করিয়াছে, কিছু পূর্ব্বে কমলার সহিত কথোপকথন কালে কেমন করিয়া অকস্মাৎ অত সহজে সে-সংযম সে হারাইয়া বসিল তাহা ভাবিয়া তাহার মনে বিস্ময় এবং বিরক্তি, দুই-ই, উত্তরোত্তর একই মাত্রায় বাড়িয়া উঠিতেছিল। চিত্তের নিভৃততম প্রদেশে চিন্তারও পরপারে যাহা অস্পষ্ট ছিল, এমন কি-কারণ অবলম্বন করিয়া তাহা সহসা শব্দের মধ্যে মুখর হইয়া উঠিল তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। এই যে মোটরকারখানা অপ্রশস্ত পার্ব্বত্য পথ অবলম্বন করিয়া নির্বিঘ্নে দুরন্ত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহা যেমন অপরিজ্ঞাত কারণে অকস্মাৎ যে-কোনো মুহূর্ত্তে পথচ্যুত হইয়া পড়িতে পারে, জীবন-পথেও মানুষের পক্ষে তেমন বিপদ অসম্ভব নয়—এ কথা বিনয়ের একবারও মনে হইতেছিল না।

"এ দিক্‌কার প্রাকৃতিক দৃশ্য আপনার কেমন লাগে বিনয়বাবু?"

চিন্তাবিমুক্ত হইয়া চমকিয়া বিনয় বলিল, "বেশ ভালোই লাগে মিষ্টার মিটার।"

"আমার ত' ভারী ভালো লাগে!"

গাড়ির আসনে মাঝখানে বসিয়াছিলেন দ্বিজনাথ, এবং তাঁহার ডান পাশে কমলা ও বাঁ পাশে বিনয় বসিয়াছিল। শেষ রাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, আকাশ সুনির্ম্মল ঘন নীল, বায়ু সুশীতল, রৌদ্রকরজালের মধ্যে অব্যাহত প্রসন্নতা পল্‌কাটা হীরার ভিতর বিচ্ছুরিত জ্যোতির মত ঝিল্‌মিল্ করিতেছে; বাহিরের এই উদ্দীপনার প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করিয়া দ্বিজনাথ উৎসাহ বোধ করিতেছিলেন। তাহা ছাড়া, ক্ষণকাল পূর্ব্বে কমলার সহিত কথোপকথন কালে যে নিরুৎসাহে হৃদয় একটু দমিয়া গিয়াছিল তাহা হইতে বিমুক্ত হইয়া দৃঢ়নিবদ্ধ আধারে চিত্ত ঈষৎ আলগা হইয়া

পড়িয়াছিল। মোটরের ক্রমবৃদ্ধিশীল গতির সহিত মনটাও এমন বেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল যে মনে হইতেছিল বাসনার পথেও ঠিক এমনি নির্বিঘ্নে দ্রুতবেগে ছুটিয়া যাওয়া চলে।

দুই একবার মনের মধ্যে ইতস্ততঃ করিয়া, একবার কমলার মুখের ভাবটা বক্রদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা দেখিয়া, দ্বিজনাথ বলিলেন, "তোমাকে একটা কথা বলব মনে করচি বিনয়। কিন্তু সে কথা বলবার আগে আর একটা কথা বলবার আছে।"

সমুৎসুক হইয়া আগ্রহ সহকারে বিনয় বলিল, "কি কথা বলুন।"

অপর পার্শ্বে বসিয়া কমলা তাহার পিতার এককালে এক জোড়া কথা বলিবার প্রস্তাব শুনিয়া শুধু উৎসুক নয়, উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। ব্যারিষ্টারী পেশার সওয়াল-জবাব-জেরা-জুলুমের কঠোরতার মধ্যেও পিতার প্রকৃতি-গত ভাবপ্রবণতা লুপ্ত হয় নাই, এমন কি স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্যে আক্রান্ত হইবার পর হইতে তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা বরং বাড়িয়াছে ইহা কমলা ভালরূপেই জানিত। সুতরাং চলন্ত মোটরকারে বসিয়া যে দুইটি কথা বলিবার জন্য উপক্রমণিকারও আবশ্যক হইয়াছে তাহা যে নিতান্ত, সাধারণ ধরণের হইবে না তাহা আশঙ্কা করিয়া কমলার মনে অস্বস্তির পরিসীমা রহিল না।

সহাস্যমুখে দ্বিজনাথ বলিলেন, "আমার প্রথম কথা, হঠাৎ তোমাকে তুমি ব'লে সম্বোধন করলাম ব'লে কিছু মনে করোনি ত?"

প্রশান্তস্বরে বিনয় বলিল, "করেছি বৈকি। মনে করেছি, এ কয়েকদিন আপনার দিক থেকে যে স্নেহের ইঙ্গিত পাচ্ছিলাম আজ তার প্রমাণ পেয়ে ধন্য হলাম।"

"তাই যদি মনে ক'রে থাকো তাহ'লে অবশ্য এ বিষয়ে আমার আর-কিছু বলবার নেই। আমার দ্বিতীয় কথা, যে স্নেহের ইঙ্গিত তুমি পেয়েছ বলছ, সে স্নেহের পরিমাণও বড় অল্প নয়। সেই স্নেহের দিক থেকে"—একবার একটু কাশিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া, একবার অপাঙ্গে কমলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন,—"সেই স্নেহের দিক থেকে তোমার প্রতি আমার একটা অনুরোধ আছে।"

আরক্তমুখে কমলা পথের দিকে মুখ ফিরাইয়া উৎকর্ণ হইল।

বিনয় বলিল, "আদেশ করুন।"

কিন্তু আদেশ অথবা অনুরোধ করিবার অবসর পাওয়া গেল না; অকস্মাৎ মানুষের হৃদয়ের ভিতরকার যন্ত্র বন্ধ হইয়া মানুষ যেমন স্তব্ধ হইয়া যায়, সহসা তেমনি একটা-কোনো বিপত্তি ঘটিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া মোটরকারখানা ধীরে ধীরে থামিয়া গেল।

উপর হইতে যখন কোনো উপায় হইল না তখন শোফার রাস্তায় নামিয়া পড়িল, বনেট খুলিয়া কল-কব্জা পরীক্ষা করিল, অনেক ঠোকাঠুকি, অনেক মাজা-ঘষা, অনেক অনুরোধ-উপরোধ করিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না,—পুনর্জীবনের কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। পথিকের দল চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—তাহাদের কৌতুক এবং কৌতূহলের পরিসীমা ছিল না; কিন্তু গাড়িখানাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইবার জন্য যখন পাঁচ ছয় জন লোকের সন্ধান করা হইল তখন তাহারা প্রত্যেকেই দুই চারি পা পিছাইয়া দাঁড়াইল—কৌতুক দেখিবার সময়টুকু ছাড়া তাহাদের অবসরের একান্ত অভাব।

এমনিভাবে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা সময় কাটিয়া গেল।

রৌদ্রের তাপ বাড়িয়া উঠিতেছিল; গতিশীল মোটর-কারে হাওয়া যত শীতল মনে হইতেছিল এখন আর তত মনে হইতেছে না; রোহিণী যাইবার উপায়ও নাই প্রবৃত্তিও নাই, অথচ গৃহ দুই মাইলেরও কিছু বেশি দূর হইবে। সমস্যা কঠিন বলিয়া মনে হইল।

দ্বিজনাথ বলিলেন, "বাড়ি গিয়ে পাঁজিতে দেখ্‌তে হবে মৃগশিরা নক্ষত্র যাত্রার পক্ষে অশুভ কি না। কিন্তু বাড়ি এখন যাওয়া যায় কেমন ক'রে?"

বিনয় উৎসাহের সহিত বলিল, "আপনারা গাছতলার ছায়ায় একটু অপেক্ষা করুন আমি জলিডি গিয়ে গাড়ি নিয়ে আস্‌ছি।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "সে কার্য্য তুমিই বা করবে কেন? অপেক্ষা আমরা তিনজনেই করতে পারি, মহবুব গিয়ে গাড়ি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আনতে পারে। কিন্তু ট্রেণের সময় ভিন্ন অশিডিতে সব সময়ে গাড়ি পাওয়া যায় না।"

কমলা বলিল, "দুই মাইল পথ আমরা ত' অনায়াসে হেঁটে যেতে পারি, কিন্তু তুমি ত তা পারবে না বাবা। কয়েকদিন থেকে আবার তোমার ডান পায়ে বাতের ব্যথাটা বেড়েছে।"

দ্বিজনাথ সহাস্তমুখে বলিলেন, "না, ও কাজটি আমার দ্বারা নিশ্চয়ই হবে না। কার-খানি যেমন অচল হয়েছে তোমার বাবাটিও ঠিক তেমনি অচল। বেগতিক দেখলে গাড়ির মধ্যেই আশ্রয় নোবো—সে যখন সচল হবে আমিও চল্‌তে আরম্ভ করব।"

জল্পনা কল্পনা এইরূপ অনিশ্চিতভাবে চলিয়াছে, এমন সময় দেখা গেল অদূরে শোফ্যর মহবুব একটা খাটুলি ধরিয়া তাহার আরোহীকে প্রায় বলপূর্ব্বক হাত ধরিয়া নামাইতেছে। আরোহীর বয়স বছর ত্রিশ, পরিধানে উজ্জ্বল লাল বর্ণের চেলীর ধুতি, শাদা চক্‌চকে রেশমের আচকান, পায়ে জরির কাজ করা নাগরা জুতা, গলা ঘিরিয়া কাছির মত পাক দেওয়া চাদর এবং মাথায় শাদা রংএর মৈথিলী পাগড়ী। রাস্তায় নামিয়া আরোহী যথেষ্ট আপত্তি এবং অসন্তোষ দেখাইতে লাগিল, কিন্তু মহবুব যখন তাহার গ্রীবা-বেষ্টন করিয়া ধরিয়া কানে-কানে কি বলিল তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইল। সে ত্রাস্তভাবে দ্বিজনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আভূমি নত হইয়া সেলাম করিয়া জানাইল যে, তাহার খাটুলি হুজুরের সেবায় অর্পিত করিতে পারিলে সে ধন্য হইবে, পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী নন্‌কুরিয়া গ্রামে তাহার নিবাস, তাহার নাম বিভীখন ঝা, পিতার নাম বৃথ্‌ভুখন ঝা, পেশা জমিদারী এবং গৃহস্থী। মাস দুই হইল তিন মাইল দূরবর্ত্তী মাঝিয়া গ্রামের হর্ষনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় কন্যাকে সে বিবাহ করিয়াছে, আজ শ্বশুরালয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ তাই তথায় চলিয়াছে, যথাসময়ে পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেজন্য চিন্তার কোনো কারণ নেই, হুজুরের সওয়ারী যখন বিগড়িয়াছে তখন হুজুরকে গৃহে পৌঁছাইয়া তবে অন্য কথা।

কমলা বলিল, "বাবা, তুমি খাটুলিতে ওঠ। আমরা তোমার পাশে পাশে হেঁটে যাব।"

"এই এতখানি পথ?"

"অনায়াসে।"

বিনয়ের দিকে চাহিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "কি বল বিনয়?"

বিনয় বলিল, "স্বচ্ছন্দে।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "শাস্ত্রে আছে 'আতুরে নিয়মো নাস্তি বালে বৃদ্ধে তথৈব চ'। আমি যখন আতুর এবং বৃদ্ধ দুই-ই তখন ভদ্রতার নিয়ম লঙ্ঘন করলে অন্ততঃ শাস্ত্রমতে আমার দোষ হবে না।" তাহার পর বিভীষণ ঝাকে ধন্যবাদ দিবার জন্য তাহার দিকে অগ্রসর হইতেই শুনিতে পাইলেন দ্বিজনাথ অউয়ল্ হাকিম না দোয়েম্ হাকিম জানিবার জন্য অদূরে বিভীষণ মহবুবকে পীড়াপীড়ি করিতেছে; বিপন্ন মহবুব অবান্তর কথা দিয়া বিভীষণের পক্ষে সেই অতি-প্রয়োজনীয় কথাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছে। বিভীষণের আচরণের আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ দ্বিজনাথ বুঝিলেন; একবার মনে হইল এ ছলের কারবারে বৃথা ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কি হইবে—তথাপি সামান্য মৌখিক ভদ্রতা প্রকাশ করিয়া খাটুলিতে উঠিয়া বসিলেন।

খাটুলি উঠিলে বিভীষণ ঝা নিকটে আসিয়া ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া বলিল, তাহার নাম বিভীখন ঝা, ওয়লদ্ বৃথ্‌ভুখন ঝা, সাকিন মৌজে ননকুরিয়া।

দ্বিজনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বোধ হয় মনে থাকবে।"

কিছুদূর তিনজনে একত্রে যাওয়ার পর দেখা গেল খাটুলির সহিত দ্রুতবেগে চলিতে বিনয় এবং কমলার যেমন কষ্ট হইতেছে, বিনয় এবং কমলার সহিত মন্থরগতিতে চলিতে খাটুলি-বাহকদের তেমনি অসুবিধা হইতেছে। ভার লইয়া ছুটিয়া চলা যাহাদের অভ্যাস, নিষেধ সত্ত্বেও প্রায়ই তাহারা আগাইয়া যাইতে লাগিল; তাহার ফলে, হয় তাহাদিগকে ক্ষণকালের জন্য গতিরোধ করিতে হয়, নয় কমলা এবং বিনয়কে অতি দ্রুতগতিতে চলিয়া তাহাদের সহিত একত্র হইতে হয়। বুঝা গেল উভয় পক্ষের

গতির এই অসমতা এই দীর্ঘ দুই মাইল পথ উভয় পক্ষকে শুধু পীড়ন করিবে ;—একপক্ষের সময় এবং অপর পক্ষের সুবিধা নষ্ট হইবে।

খাটুলি থামাইয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "অনর্থক এ বিড়ম্বনায় কোনো লাভ নেই। তোমাদের হেঁটেও চলতে হবে, আবার যে খাটুলির উপর চলেছে তার সঙ্গে সমান গতি রাখ্‌তে হবে,—এ দোতরফা অবিচারের পাপ থেকে আমাকে পরিত্রাণ দাও। আমি এগিয়ে চলি, তোমরা সুবিধামত ধীরে ধীরে পিছনে এস।"

অবস্থা হিসাবে এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে এমন প্রবল যুক্তি ছিল যে ইহার বিরুদ্ধে বলিবার মতো কোনো কথাই কমলা অথবা বিনয় খুঁজিয়া পাইল না। অথচ এই দীর্ঘ দুই মাইল পথ পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে একটা সুতীব্র উদ্দীপনা অবরুদ্ধ রাখিয়া পাশাপাশি বহুক্ষণ ধরিয়া চলিতে হইবে তাহার উদ্বেগও কম নয়! কিন্তু সে কথা বলিয়া ত' আপত্তি করা চলে না। এমন তৃতীয় কোনো ব্যক্তি থাকিবে না যাহাকে অবলম্বন করিয়া সহজ হওয়া যাইতে পারিবে ;—মহবুব্ থাকিলেও চলিত, কিন্তু সে রহিল গাড়ী আগলাইয়া। যে দীর্ঘকাল উভয়কে এক সঙ্গে কাটাইতে হইবে সে সময় উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ হওয়া কঠিন, চুপ করিয়া থাকা কঠিনতর ; অথচ উপায় নাই। অগত্যা বিনয় এবং কমলা উভয়েই দ্বিজনাথের প্রস্তাব মৌনর দ্বারা অনুমোদিত করিল। দ্বিজনাথের ইঙ্গিতে বাহকেরা খাটুলি লইয়া দৌড় দিল ; দেখিতে দেখিতে খাটুলি দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

পাশাপাশি চলিতে চলিতে বিনয় বলিল, "মিস্ মিত্র, আপনার কষ্ট হ'লেই বলবেন, সামান্য জিরিয়ে নেওয়া যাবে।"

কমলা কোনো কথা বলিল না, শুধু তাহার মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

তমোভেদী দৃষ্টি

বেতারের সাহায্যে বহুদূরের লোককে দেখিতে পাওয়া আমাদের পক্ষে এখন সম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছে। তরুণ বৈজ্ঞানিক জন বেয়ার্ড, 'টেলিভিসন্' সম্পূর্ণ নিখুঁত করিয়া তুলিবার পর বিজ্ঞান জগতে আর একটি সত্যের সন্ধান আনিয়া দিয়াছেন, আমাদের দৃষ্টি-শক্তি আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। গভীর অন্ধকারে বা ঘন কুয়াশার মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। ইহার তিনি নাম দিয়াছেন "নক্টোভিসন্"। মনুষ্য চক্ষের অগোচর ইন্‌ফ্রা-রেড (Infra-red) রশ্মির সাহায্যে টেলিভিসনের আদান যন্ত্রের (Receiving apparatus) দ্বারা দূরে অন্ধকারে রক্ষিত যে কোনও বস্তু বেশ স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্‌ফ্রা-রেড রশ্মি আমাদের চক্ষে ধরা দেয় না বটে কিন্তু বেয়ার্ডের যন্ত্রের যে বৈদ্যুতিক চক্ষু আছে তাহা হইতে তাহার আর লুকাইবার উপায় নাই। লেন্সের সাহায্যে সার্চ্চ-লাইট যেমন দূর হইতে ইচ্ছামত যে কোনও বস্তুর উপর প্রতিফলিত করা যায় এই অদৃশ্য রশ্মিও তেমনি ভাবে টেলিভিসনের আদানের পর্দ্দার উপর বহুদূর হইতে প্রতিফলিত করিতে পারা যায়। টেলিভিসনের যন্ত্র লইয়া পরীক্ষা করিবার সময়ে বেয়ার্ড এই নক্টোভিসনের সন্ধান পান। টেলিভিসনে যে ব্যক্তির মূর্ত্তি প্রতিফলিত করিতে হইবে, পূর্ব্বে তাহাকে অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোকে বসিতে হইত, সে আলোকের প্রখরতায় তার মনে হইত দুই চক্ষু যেন অন্ধ হইয়া আসিতেছে, সর্ব্বশরীরে তার কে যেন অগ্নিসংযোগ করিতেছে। বেয়ার্ড অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কি উপায়ে সাধারণ আলোকে এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। নানা প্রকার পরীক্ষার পর তিনি কৃতকার্য্য হন। এই পরীক্ষার সময়ে তার মনে হয় তিনি ত মাত্র তাঁর নিজের চোখের সাহায্যে দেখিতেছেন না, তাঁর যন্ত্রের বৈদ্যুতিক চক্ষু তাঁহার দেখিবার সাহায্য করিতেছে। এই বৈদ্যুতিক চক্ষু লইয়া তিনি মানব চক্ষুর অগোচর যে সব রশ্মি আছে তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথমে আল্‌ট্রা-ভায়োলেট্ (Ultra-Violet) রশ্মি লইয়া আরম্ভ করেন, কিন্তু এ রশ্মি তাঁর কাজে আসিল না, এ রশ্মি অত্যন্ত প্রখর এবং বেশী দূরে প্রতিফলিত করিতে পারা যায় না। তখন তিনি

বেয়ার্ড (দক্ষিণে) ও তাঁহার টেলিভিসন্ যন্ত্র

ইন্‌ফ্রা-রেড রশ্মি লইয়া পরীক্ষা করেন। এই রশ্মিই সর্ব্বতোভাবে তাঁর মনোমত হয় এবং ইহার আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া বেয়ার্ড নিজেই বিস্মিত হন।
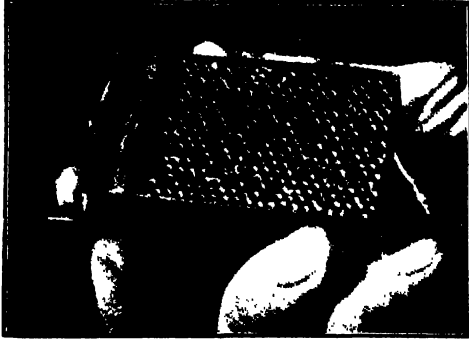
বেয়ার্ডের টেলিভিসন্ যন্ত্রের বৈদ্যুতিক চক্ষু

সর্ব্বপ্রথমে তিনি কতিপয় উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের নিকটে তাঁর কার্য্যাবলী প্রদর্শন করেন এবং তাঁহাদের উপদেশে কিছুদিন তাঁহাকে ইহা গোপনে রাখিতে হয়। প্রকাশ্যভাবে রয়েল ইন্‌ষ্টিট্যুশনেই প্রথমে নক্টোভিসন্ প্রদর্শিত হয়। উক্ত সভার পঞ্চাশ জন সভ্যকে বেয়ার্ড তাঁহার পরীক্ষা-গৃহে আমন্ত্রণ করেন। সেখানে ৫।৬ জন ব্যক্তি অন্ধকারে প্রদান-যন্ত্রের (transmitter) সম্মুখে বসিলেন অন্য সভ্যেরা আদান-গৃহে।(receiving room) রহিলেন। প্রদান-গৃহের বৈদ্যুতিক আলোকগুলি জ্বালিয়া দেওয়া হইল কিন্তু সেগুলি এমন উপায়ে ঢাকা যাহাতে অদৃশ্য ইন্‌ফ্রা-রেড রশ্মি ব্যতীত আর কোনও আলোক বাহির হইতে পারে না। ঘরটি সম্পূর্ণভাবে অন্ধকার হইয়া গেল। অপর গৃহে তখন টেলিভিসনের: আদানের কাচের উপর অন্ধকার গৃহের লোকগুলির মূর্ত্তি বেশ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত দেখা গেল। উপস্থিত সভ্যেরা তখন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন বিজ্ঞান জগতে বেয়ার্ডের ইহা এক অভিনব আবিষ্কার।

এই আবিষ্কারের কথা তখন সকলেই জানিতে পারিলেন। ব্রিটিশ, জার্ম্মান, মাকিন ও ফরাসী গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ নক্টোভিসনের যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করিতে আসিলেন, যুদ্ধের সময়ে ইহা কি ভাবে ব্যবহৃত হইত ইহাই জানা তাঁদের উদ্দেশ্য। কুয়াশার ঘন অন্ধকারে কিরূপে দূরের বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, বিমানপোত ও লাইট হাউসের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাই বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই এই যন্ত্রের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যান।

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে বেয়ার্ড লিডস্ সহর হইতে নক্টোভিসনের সাহায্যে জনকয়েক খ্যাতনামা ব্যক্তির মূর্ত্তি লণ্ডনে প্রতিফলিত করেন। লিডস্ হইতে লণ্ডন প্রায় ১৭০ মাইল দূরে। দুইটি টেলিফোনের লাইন বসান হয়—একটি লাইনে মূর্ত্তি অপরটিতে তাঁদের বক্তৃতা পাঠান হয়। বিশেষ কৃতকার্য্যতার সহিত বেয়ার্ড এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

যুদ্ধের সময়ে নক্টোভিসন্ অনেক কাজে অনেক উপায়ে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। রাত্রে শত্রুদের শিবিরের সমস্ত

এই যন্ত্রের সাহায্যে ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় মূর্ত্তি পাঠাইবার চেষ্টা হইতেছে

ঘটনা তাহাদের অগোচরে বহুদূর হইতে এয়ারোপ্লেনের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারা, রাত্রের অন্ধকারে তাহাদের আক্রমণের চেষ্টা হইতে সতর্ক হওয়া ইত্যাদি নানারূপে কাজে আসিবে।

শান্তির সময়েও কুয়াশার মধ্যে জাহাজ বা বিমানপোত পরিচালনা ও অন্যান্য অনেক উপায়ে ইহা অনেক সুবিধা আনয়ন করিবে।

এই ৩৭ বৎসর বয়স্ক যুবকের নিকট বিজ্ঞান জগত আরও অনেক আশা করেন। আরও অনেক সত্যের সন্ধান আনিয়া দিয়া তিনি মানব জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

মল্লভূমি

মধ্য ভারতের পর্ব্বতমালা ও সমতল বাংলাদেশের মধ্যস্থ সমুদয় ভূখণ্ড ভারতের মধ্যযুগে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বাঁকুড়ার সেই সময়ের রাজধানী বিষ্ণুপুরের রাজাগণই মল্লভূমে প্রভুত্ব করিতেন। ভারতে মুসলমান আক্রমণ ও মোগল শক্তির অভ্যুত্থানের মধ্যবর্ত্তী যুগে মল্লরাজগণের কৃতিত্ব সম্বন্ধে মিষ্টার জে, সি, ফ্রেঞ্চ বিলাত হইতে প্রকাশিত "ইণ্ডিয়ান আর্ট এণ্ড লেটার্সে" নিম্ন লিখিত কাহিনী সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

সেই সময়ে লউ গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁর অসামান্য বুৎপত্তি ছিল। একদিন তিনি অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন এমন সময়ে সপরিবারে এক অতিথি আসিয়া উপস্থিত। অতিথি পরিচয় দেন জয়পুরের শৌহান বংশের এক রাজপুত, তীর্থ ভ্রমণে তাঁহারা বাহির হইয়াছেন। অতিথির স্ত্রী সেই রাত্রে এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন এবং প্রসবের অব্যবহিত পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। নবজাত শিশুর পিতা ইতিমধ্যে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

ব্রাহ্মণ তখন শিশুর ভাগ্যগননা করিয়া দেখেন যে সে ভবিষ্যতে রাজা হইবে। ব্রাহ্মণ তাহাকে গোপাল বলিয়া ডাকিতেন। পণ্ডিতের গৃহেই গোপাল বড় হইতে লাগিল। পণ্ডিত তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। ব্যায়াম অভ্যাসেরও ব্যবস্থা হইল। একদিন গোপাল গোচারণে গেছে, ক্লান্ত হইয়া এক গাছের নিচে সে ঘুমাইয়া পড়ে সেই সময়ে এক বিষধর সাপ গোপালের মাথার উপর তার ফণা বিস্তার করিয়া তাহাকে ছায়া দান করিয়াছিল। আর একদিন গোপাল তার সহচরগণ সহ মাছ ধরিতে যায়। সঙ্গীদের ছিপে মাছ উঠিতে লাগিল কিন্তু গোপালের ছিপে পাথরের নুড়ি ভিন্ন কিছুই উঠিল না। নুড়িগুলি বাড়িতে আনিলে পণ্ডিত দেখেন সেগুলি এক এক হীরক খণ্ড।

বালক যখন দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করে পণ্ডিত তখন তাহাকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে আরম্ভ করিলেন। শীঘ্রই ব্যাকরণ ও ন্যায়-শাস্ত্রে সে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিল।

পণ্ডিতের সহিত গোপাল একদিন রাজ সন্দর্শনে যায়, রৌদ্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাজা স্বয়ং তাহার মাথায় ছাতা খুলিয়া ধরেন। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন ভবিষ্যতে রাজা হইবার ইহা আর এক লক্ষণ।

বালক ক্রমশঃ বিশেষ শক্তিশালী যুবায় পরিণত হইয়া উঠিল। এক ডাকাতদের দলে মিশিয়া তাহাদের দলপতির স্থান অধিকার করিয়া বসিল এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে বিশেষ ভীতির কারণ হইয়া উঠিল। রাজা গোপালকে ধরিবার নানা চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়া ক্রোধবশতঃ তখন পণ্ডিতকে বন্দী করিলেন। গোপাল প্রতিজ্ঞা করিল যেমন করিয়া হউক ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সে সাঁওতালদের সাহায্য প্রার্থনা করিল। তাহাদের সাহায্যে সে রাজাকে আক্রমণ করে, রাজা তখন ভয়ে নিরুপায় হইয়া নিকটস্থ এক পুষ্করিণীতে লাফাইয়া পড়িয়া দেহত্যাগ করে। গোপাল পুষ্করিণী হইতে রাজার মৃতদেহ উদ্ধার করিয়া তাহার সৎকারের ব্যবস্থা করিল, রাণী তখন রাজার চিতায় আরোহণ করিয়া সহমরণ করেন। গোপাল রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া রাজা হইলেন। তখন তাঁহার নাম হইল "আদিমল্ল"। তাঁহার পর তাঁহার বংশধরগণ রাজত্ব করেন।

সেই বংশের জগৎমল্ল একদিন বনে শীকার করিতে যাইয়া দেখেন যতবার চেষ্টা করিতেছেন প্রত্যেকবারই তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে। বুঝিলেন কোনও অলৌকিক শক্তি এই স্থান রক্ষা করিতেছে। তিনি তখনই স্থির করিলেন এই স্থানেই তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিবেন। ইহার নাম রাখিলেন "বিষ্ণুপুর"।

এই বন অবশেষে তিনি ইন্দ্রপুরীতে পরিণত করেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে তখন মুসলমানগণ আক্রমণ করিতেছিল কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বিষ্ণুপুরের কোনও ক্ষতি হয় নাই। মুসলমান আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল বলিয়াই বহু দিন যাবৎ পুরাতন হিন্দু শিক্ষা দীক্ষা বিষ্ণুপুরে অটুট ভাবে বর্ত্তমান ছিল। পূর্ব্ব ভারতের আর কোথাও এমন দেখা যায় না।

সে সময়ে বিষ্ণুপুরে বুদ্ধ-প্রচারিত "ধর্ম্মে"র প্রচলন ছিল। সামাজিক আচারে খুব ঔদার্য্য দেখা যায়। স্ত্রীলোকদের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। বাংলাদেশে আর কোথাও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাস্তবিক সর্ব্ব বিষয়ে বিষ্ণুপুর এত উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে অপরাপর স্থান হইতে যে সব পণ্ডিতগণ বিষ্ণুপুরে আসিতেন তাঁহাদের মনে হইত তাঁহারা যেন বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কোনও হিন্দু নগরে উপনীত হইয়াছেন।

দুর্গাপুর মন্দিরের একখানি চিত্র দেওয়া হইল। ইহা হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে মল্লভূমে প্রচলিত স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবেশপথ ইত্যাদির খিলানগুলিতে মুসলমান স্থাপত্যের প্রভাব বিদ্যমান থাকিলেও মন্দিরের সবটা দেখিলে পুরাতন হিন্দু স্থাপত্যের কথাই মনের মধ্যে রহিয়া যায়। মন্দিরের নিম্নভাগ পালবংশের রাজত্বকালের মন্দিরগুলির কথা স্মরণ করাইয়া দেয় আবার উপরের অংশে উড়িষ্যা স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষিত হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উড়িষ্যার হিন্দু রাজাগণ বহুবার মল্লভূম আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বিষ্ণুপুরের কোনও বিবরণে এ সম্বন্ধে কোনও কথা পাওয়া যায় না, উড়িষ্যার ইতিহাসে এই সব যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দুর্গাপুরের মন্দিরের উপরের অংশ নির্ব্বাকভাবে এই সব আক্রমণের সাক্ষ্য দেয়।

পঞ্চকোট পাহাড়ের উপরে উঠিলে দেখা যায় উত্তরে পরেশনাথ হইতে আরম্ভ হইয়া পশ্চিমে রাঁচির পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত মল্লভূম কেমন ভাবে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। পঞ্চকোট পাহাড়ের নীচেই রাজপ্রাসাদ ছিল। প্রাসাদের পার্শ্বেই এই সুন্দর মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কিংবদন্তী আছে বিষ্ণুপুরে এক সময়ে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। মৃণ্ময়ী দেবীর (কালী) নিকট মল্লরাজগণ নরবলি দিতেন।

পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মল্লরাজগণ প্রধানতঃ দস্যুবৃত্তি করিয়াই কাটাইতেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বিষ্ণুপুরের রাজা মুসলমান

বাঁকুড়ার একটী মন্দির

মল্লভূমি

নবাবের নিকট প্রথম বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে বীর-হাম্বির রাজা হন। যুদ্ধবিদ্যায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। একসময়ে মুসলমান সৈন্যগণ মোগল সম্রাটের উপর বিদ্রোহী হইয়া বিষ্ণুপুর আক্রমণের চেষ্টা করে সেই সময়ে বীর-হাম্বির এমন ভাবে তাহাদের আক্রমণের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন যে বিষ্ণুপুরের দুর্গ নরমুণ্ডে ভরিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে আকবরের রাজপুত সেনাপতি মানসিংহের সহিত বীর-হাম্বির যোগদান করেন।

বীর-হাম্বিরের সহিত কয়েকজন জ্যোতিষশাস্ত্রবিদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। একদিন তাহারা গণনা করিয়া দেখিলেন যে রাজধানীর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল দিয়া কয়েক জন পথিক যাইবে এবং তাহাদের নিকট বহু মূল্যবান সামগ্রী থাকিবে। বীর-হাম্বির এই সংবাদ পাইয়া সেই স্থানে লুকাইয়া রহিলেন এবং ঠিক যে-সময়ে তাহারা সেই স্থানে উপনীত হইল বীর-হাম্বির পিছন হইতে আক্রমণ করিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া শকট বোঝাই করিয়া গৃহে ফিরিলেন। পরিশেষে দেখা গেল সেগুলি বৈষ্ণব পুঁথি, বৃন্দাবনের এক বৈষ্ণবের সম্পত্তি। এই ঘটনার কিছুদিন পরে শ্রীনিবাস নামে এক বৈষ্ণব বীর-হাম্বিরের সভায় ঐ পুঁথিগুলির সম্বন্ধে আসিয়া দেখেন যে বীর-হাম্বিরকে ঐ পুঁথি হইতে পড়িয়া শুনান হইতেছে। শ্রীনিবাস তখন সেইগুলির বিষদভাবে ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া দিলেন, তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া সভাস্থ সকলের চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। বীর-হাম্বির এত মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন যে সেই সময়ে তিনি শ্রীনিবাসের নিকট হইতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার দীক্ষার পূর্ব্বে যদিও বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচলন ছিল, বীর-হাম্বিরের দীক্ষা গ্রহণের অব্যবহিত পর হইতেই বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। বিষ্ণুপুর তখন দ্বিতীয় বৃন্দাবনে পরিণত হইল।

মোগল রাজার অধীনে আসিয়া বিষ্ণুপুরের চিত্রকলা ও স্থাপত্যে কিছু পরিবর্ত্তন হয়. এই সময়ের চিত্রে ও মন্দিরের স্থাপত্যে মোগলপ্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি-স্থাপনা করিবার জন্য বীর-হাম্বির বিষ্ণুপুরে এক মন্দির স্থাপনা করিয়াছিলেন। শেষজীবনে তিনি বৃন্দাবনবাসী হন এবং সেই স্থানেই দেহ-ত্যাগ করেন।

বাঁকুড়ার ঘুৎঘরিয়ার মন্দির দেখিলে মনে হয় ষোড়শ শতাব্দীতে বীর-হাম্বিরের সময়ে ইহা নির্ম্মিত। এই মন্দিরেরও দরজাগুলির খিলানে মোগলপ্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সমস্ত মন্দিরটি প্রধানতঃ হিন্দু স্থাপত্যেরই পরিচয় দেয়।

বীর-হাম্বিরের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে বীর-হাম্বিরের রঘুবীর নামে আর এক পুত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে রাজা হন।

রঘুবীর ১৬২৬ হইতে ১৬৫৬ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। মোগলসম্রাটের নিকট তাঁহার দেয় রাজস্ব বাকি পড়িয়া যাওয়াতে রাজমহলে তাঁহাকে বন্দী হইয়া থাকিতে হয়। এই সময়ে একদিন এক নবাবের একটি দুর্দ্দান্ত ঘোড়াকে ষোলজন লোকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া রঘুবীর বিদ্রূপ করিয়া বলেন একটা ঘোড়ার পিছনে এতগুলা লোকের প্রয়োজন! এই কথা নবাবের কর্ণে উঠায় তিনি রঘুবীরকে ঐ ঘোড়ায় আরোহণ করিতে

বাংলা পুঁথি বিষয়ক প্রচ্ছদপট—অষ্টাদশ শতাব্দীর দশাবতার
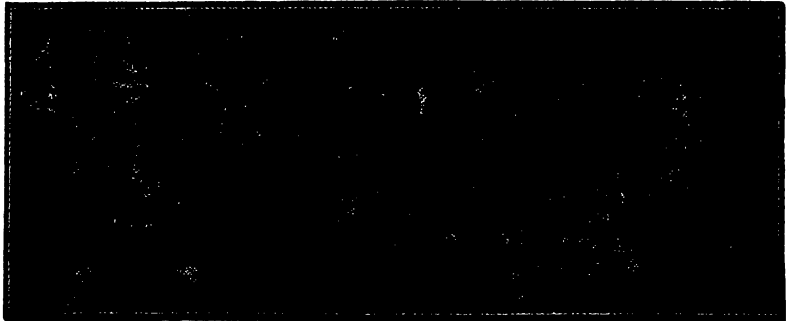
বলেন, রঘুবীর এমন দক্ষতার সহিত সেই কার্য্য সম্পন্ন করেন যে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া রঘুবীর আটদিনের পথ নয় ঘণ্টার মধ্যে পৌছিয়াছিলেন। নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁর দেয় সমস্ত রাজস্ব ক্ষমা করেন এবং তাঁহাকে "সিংহ" উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই সময় হইতে বিষ্ণুপুরের রাজবংশে "সিংহ" উপাধি চলিয়া আসিতেছে। রঘুবীরের তরবারী আজও পর্য্যন্ত অতি যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, প্রতিবৎসর সেই তরবারীর পূজা হয়।

রঘুবীর বিষ্ণুপুরে পাঁচটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী খনন করেন এবং অনেকগুলি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মন্দিরগুলির স্থাপত্যে মোগলপ্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। বীর-হাম্বিরের সহিত মোগল রাজাগণের ঘনিষ্টতাই ইহার প্রধান কারণ।

চিত্রকলা ও স্থাপত্যে মোগল ও হিন্দুপ্রথা বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছিল কিন্তু দেখা যায় কালক্রমে উভয়ের মধ্যে কেমন সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল।

রঘুনাথসিংহের সময়ে প্রচলিত চিত্রকলার উদাহরণ স্বরূপ কৃষ্ণলীলা নামক এক পুঁথির কাষ্ঠফলকে অঙ্কিত প্রচ্ছদপটের প্রতিলিপি দেওয়া হইল। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রচিত হয়।

রঘুনাথের পর তাঁর পুত্র বীরসিংহ সিংহাসন পান। ১৬৫৬ হইতে ১৬৮২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। বীরসিংহ অতিশয় নিষ্ঠুর রাজা ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতাকে তিনি বিষ প্রয়োগ করিয়া হত্যা করেন।

দামোদরের নিকট মলিয়ামার এক জমিদার একবার বিদ্রোহী হইয়াছিল, বীরসিংহ আজ্ঞা দেন যে বিদ্রোহীদের দেহ যেন যত শীঘ্র সম্ভব সহস্রখণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলা হয়, সত্যই তাহাই হইয়াছিল। কোনও এক অপরাধে তাঁহার ১৮টি পুত্রকে জীবন্ত অবস্থায় দেওয়ালের গাত্রে গাঁথিয়া দেবার হুকুম দেন, একটি পুত্র কোনও রকমে রক্ষা পায়। ভবিষ্যতে বীরসিংহের মৃত্যুর পর সেই পুত্রই রাজপদে অভিষিক্ত হন। অমানুষিক নিষ্ঠুরতা সত্বেও বীরসিংহের ধর্ম্মের দিকে বিশেষ মতি ছিল। তিনিও বিষ্ণুপুরে কয়েকটি মন্দির স্থাপনা করিয়াছিলেন।

বীরসিংহের পুত্রের রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু ঘটে নাই। তাঁহার পরে দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহ বিষ্ণুপুরের রাজা হন। সম্রাট ঔরংজেবের তাঁর প্রতি অসীম বিশ্বাস ছিল। দ্বিতীয় রঘুনাথ বিদ্রোহীগণের হাত হইতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বিষ্ণুপুর রক্ষা করিতেন। বিদ্রোহ দমনের জন্য বহুবার তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। একসময়ে কয়েকজন বিদ্রোহীকে বন্দী করিয়া আনেন, সেই সঙ্গে লালবাঈ নামে এক সুন্দরী মুসলমান যুবতীও আসিয়া পড়িয়াছিল। এই যুবতী ক্রমশঃ রঘুনাথের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। তার পরামর্শে রঘুনাথ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। লালবাঈএর আরও অভিসন্ধি ছিল রাজাকে মুসলমান করিয়া বিষ্ণুপুরে মুসলমান ধর্ম্মের প্রচলন করা। রাণী এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার পুত্রের সাহায্যে রঘুনাথকে দস্যু-দ্বারা হত্যা করিবার ব্যবস্থা করেন। রাজা একদিন অন্তঃ-পুরে আসিয়াছেন এমন সময়ে দস্যুগণ তাঁহাকে আক্রমণ

বিষ্ণুপুর রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের প্রবেশদ্বার

মল্লভূমি

করে, তাহাদের নিকট হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া হরিণ থাকিবার স্থানে আসিয়া পড়েন, সেখানে হরিণের শৃঙ্গে তাঁহার মৃত্যু হয়। লালবাঈকে রাণী বন্দী করিয়া নিকটস্থ এক পুষ্করিণীতে ডুবাইয়া দেন। সেই হইতে সেই পুষ্করিণী লালবাঁধ নামে অভিহিত হয়। রাণী মৃত স্বামীর চিতারোহণ করিয়া সহমরণ করেন।

রঘুনাথের পুত্র গোপালসিংহ রাজত্ব লাভ করেন। ইনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। ইনিও বিষ্ণুপুরে কয়েকটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সকল প্রজাকে তিনি মালা জপ করিতে বাধ্য করান। এই প্রথাকে বিদ্রূপ করিয়া লোকে বলিত "গোপালসিংহের ব্যাগার।" আজও পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুরে এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

গোপালসিংহের রাজত্বকালে মরাঠাগণ বিষ্ণুপুর আক্রমনের চেষ্টা করে। এই আক্রমণ হইতে বিষ্ণুপুর রক্ষা করিতে যাইয়া তাঁহার সৈন্যগণ পরাজিত হইতেছে দেখিয়া বিষ্ণুপুরের সমস্ত প্রজাবৃন্দ লইয়া তিনি মদনমোহন ঠাকুরের পূজার আয়োজন করেন। মরাঠাদিগকে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল।

কথিত আছে প্রজাগণ যখন পূজায় ব্যস্ত ছিল তখন দেবতাগণ দুর্গ হইতে কামান ছুঁড়িয়াছিলেন। "দলমর্দ্দন" নামে এক বৃহৎ কামান এখনও বিষ্ণুপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। কিম্বদন্তী আছে স্বয়ং মদনমোহন নাকি এই কামান ছুঁড়িয়াছিলেন।

মারাঠাগণ বিষ্ণুপুর আক্রমণে অকৃতকার্য্য হইবার পর মল্লভূমের অন্যান্য স্থানে অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করে। লুণ্ঠন, দস্যুবৃত্তি, ধানের মরাই ও শস্যক্ষেত্রে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি নানাপ্রকার নিষ্ঠুর আচরণে মল্লভূমবাসিগণকে ভীষণ কষ্ট দেয়। একসময়ে এমন অবস্থা হইয়াছিল যে প্রজাগণ কোনও প্রকার খাদ্য না পাইয়া কদলীপত্র ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিত! ইহাও নাকি ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে। অনন্যোপায় হইয়া রাজমহল হইতে মেদিনীপুর ও বালেশ্বর পর্য্যন্ত তখন মরাঠাগণের অধীনে আসিতে বাধ্য হয়।

নন্দলালজীর মন্দির হইতে এই সময়ের (১৭২০ খ্রীঃ অঃ) স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার দরজা ও বিষ্ণুপুরের মন্দিরের দরজার কারুকার্য্য তুলনা করিলে মোগল ও পুরাতন হিন্দু স্থাপত্যের মধ্যে কতটা প্রভেদ ছিল তাহা বেশ স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। এই সময় হইতে মোগল প্রভাব হইতে হিন্দু-কলা মুক্তিলাভ করিতে আরম্ভ করে। নন্দলালজীর মন্দিরে মোগল প্রভাব একেবারে অবশ্য অস্বীকার করা চলেনা কিন্তু ইহাও বেশ প্রতীয়মান হয় যে মোগল প্রথা আর তার প্রভাব বিস্তার করিয়া নাই, হিন্দু প্রথার সহিত কেমন লিপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঠিক এই সময়ে পঞ্জাবে কাংড়া উপত্যকাতেও মোগল ও হিন্দুপ্রথার মিলনের এক আন্দোলন চলিতেছিল।

চৈতন্যসিংহ মল্লবংশের শেষ রাজা। ১৭৪৮ হইতে ১৭৬০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন। চৈতন্যসিংহ অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মন্দির, বিদ্যালয় ইত্যাদির জন্য তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। তাঁহার দয়ায় তখন অনেক ব্রাহ্মণ নিষ্কর ভূমিতে বাস করিত। কোনও ব্রাহ্মণকে কর দিতে দেখিলে লোকে সন্দেহ করিত বাস্তবিক সে ব্রাহ্মণ কি না! এক বিশ্বস্ত মন্ত্রীর হস্তে রাজকার্য্য সমর্পণ করিয়া সমস্তক্ষণ তিনি ধর্ম্ম সাধনায় অতিবাহিত করিতেন।

মারাঠাদের আক্রমণ সমানভাবে চলিতেছিল। ইহার উপর আর এক বিপদ আসিয়া উপস্থিত। চৈতন্যসিংহের
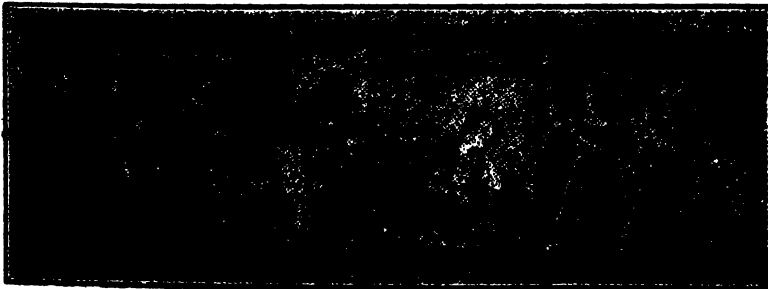
বাংলা পুঁথির কৃষ্ণলীলা বিষয়ক প্রচ্ছদপট—সপ্তদশ শতাব্দী

এক ভ্রাতা মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজদ্দৌলার সহিত চক্রান্ত করিয়া বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেন। প্রথমে তাঁহাকে বিফল হইতে হয় কিন্তু তাহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদে আসিলেন। সেখানে আসিয়া দেখেন যে তখন মীরজাফর বাংলার নবাব হইয়াছেন। মীরজাফরের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি আবার বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেন। চৈতন্যসিংহ তখন কলিকাতায় আসিয়া ক্লাইভের সাহায্যে আবার বিষ্ণুপুর ফিরিয়া পাইলেন বটে কিন্তু আর স্বাধীন রাজা থাকিতে পারিলেন না, জীবনের অবশিষ্ট কাল জমিদারের মত থাকিয়াই অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল।

বেলুট জগন্নাথের মন্দির অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নির্ম্মিত হয়। সে সময়ে মল্লভূম অশান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল, শত্রুগণের আক্রমণের আর বিরাম ছিল না। কিন্তু সমস্ত অত্যাচার ও উপদ্রব সত্ত্বেও এতবড় কার্য্য এমন সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিতে পারা মল্লভূম-বাসিগণের অসাধারণ কৃতিত্বেরই পরিচয় প্রদান করে।

মল্লভূমের ইতিহাস অসংখ্য বিচিত্র কাহিনীতে পরিপূর্ণ, সে সব কাহিনী লিখিয়া শেষ করা যায় না।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

পুস্তক সমালোচনা

গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, মূল্য দুই টাকা।

Boy Scouts Movement-এর খবর যাঁরা রাখেন তাঁদের কাছে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর নাম সুপরিচিত। বঙ্গ-সাহিত্যে তিনি নূতন ব্রতী এবং ঠিক এই জন্যেই বোধ হয় তাঁর লেখাতে একটা তাজা ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য যে-কোন নূতন লেখকের প্রথম উদ্যমে এ পরিচয়ের আশা করা যায় না এবং দ্বিজেন্দ্র বাবুর কৃতিত্ব এইখানেই। শ্রীযুক্ত জলধর সেন উত্তরা-খণ্ডের তীর্থগুলির চারিদিকে যে একটা স্বপ্নের আবেষ্টন দিয়েছেন, তাতে তীর্থের মহিমা বাড়ুক আর নাই বাড়ুক, গৃহ-কোণাশ্রয়ী বাঙ্গালী পাঠকের মন একটা বিরাট অথচ স্নিগ্ধ কল্পনার মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করবার সুযোগ পেয়েছে। জলধর বাবুর পরে আর কেহ যে হিমালয়-কাহিনী লেখেন নি এমন নয়, কিন্তু এক দ্বিজেন্দ্র বাবু ছাড়া আর কারুর লেখায় হিমালয়ের আকর্ষণী শক্তি সম্যক অনুভূত হয় না। দ্বিজেন্দ্র বাবুর রচনায় চেষ্টার লক্ষণ কিছুমাত্র দেখা যায় না—অথচ তাঁহার শব্দ-মন্ত্রে হিমালয়ের রূপের উপর যে কুহেলিকার পর্দ্দাখানি ঢাকা আছে, তা' ধীরে ধীরে অপসৃত হ'য়ে যায়, আর পাঠকের মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে—পাহাড়ের মধ্যে ধর্ম্মশালার ছবি, বক্র গতি, গিরি নদীর তুষারে ঢাকা পর্ব্বত ক্রোড়, রৌদ্রস্নাত পাহাড়ী গ্রাম, পাহাড়ের কোণে ধূমায়িত সন্ধ্যায় শঙ্খ ঘণ্টা মুখরিত উপনগর; পাহাড়ী নরনারীর আতিথ্য এবং তার ফাঁকে ফাঁকে গুটীকয়েক বন্ধুর ভ্রমণানন্দে সিঞ্চিত ছুটীর দিনগুলি! দ্বিজেন্দ্র বাবুর লিখন ভঙ্গীর সারল্য তাঁর বইখানিকে যে বাঙ্গালী পাঠকের কাছে আদৃত ক'রবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

—সোমবর্ম্মা

Printed at the Modern Art Press, 1/2 Durga Pituri Lane, Calcutta,
by Srijut Probodh Lal Mukherjee, and published by him from 51 Pataldanga Street, Calcutta.

পঞ্চ-কোট

শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঘ, ১৩৩৪

প্রথম বর্ষ, ২য় খণ্ড | মাঘ, ১৩৩৪ | দ্বিতীয় সংখ্যা

আরেক দিন

যখন বছর দুয়েক হ'ল দক্ষিণ আমেরিকায় যাত্রা করেছিলুম তখন মনের মধ্যে কোনো ভার ছিলনা। যাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁরা আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন যে, তাঁরা আমার কাছ থেকে বক্তৃতা চান না, আমাকেই চান। দেশের দিক থেকেও কোনো অনুরোধ নিয়ে আসিনি, কেবল জাহাজে ওঠবার আগে একটি বাঙালী মেয়ের চিঠি পেয়েছিলুম, সে ইচ্ছে জানিয়েছিল আমি যেন ডায়ারি লিখি। তারপরে ভেসে পড়লুম সমুদ্রে। মন অনেক দিন এমন মুক্তি পায়নি। সাম্‌নে পিছনে কর্ত্তব্যের তাগিদ নেই, আশেপাশেও তথৈবচ। বহুকাল পূর্ব্বে, তখন বয়স অল্প, ঘরে কিম্বা বাইরে খাতির করবার লোক নেই,—লেখা আরম্ভ করেছি কিন্তু সে লেখা দূরে পৌঁছয়নি। আমার কাছে দেশের লোকের বা বিদেশের লোকের কোনো প্রত্যাশা ছিল না। পাঠক জমতে আরম্ভ করেনি তা বলা যায় না, কিন্তু পাঠকমণ্ডলী নামক প্রকাণ্ড একটি শনি গ্রহ আমার জীবনকে তার উপগ্রহ দলে ভর্ত্তি করবার জন্যে টান মারেনি। তখন মাসিক পত্র দুটি চারটি, তার মধ্যে যারা প্রবলকণ্ঠশালী, তারা ছিল আমার নিয়তপ্রতিকূল। সাপ্তাহিক যে কয়টি ছিল তারা কেউ আমার প্রতি প্রসন্ন ছিল না। তাই আমার দায়িত্ব ছিল প্রধানত আমার নিজের কাছেই। তখন না ছিলেম অখ্যাত, না ছিলেম বিখ্যাত, ছিলেম প্রত্যাখ্যাত। তখন বাংলা দেশের নির্জ্জন নদীর চরে ছিল আমার যাওয়া-আসা। সম্পূর্ণ নিজের মনেই লিখে যেতুম, শোনবার লোক কেউ ছিলনা তা নয়, ছিল দুটি চারটি। আমার মন ছিল পাখী; তার না ছিল খাঁচা, না ছিল পায়ে শিকল, না ছিল তার পরে সৌখীনের দাবী, না ছিল তার জন্যে প্রশংসার বাঁধা খোরাক। তারপর চল্লিশ বছর হ'য়ে গেল। এবার চলল্ সমুদ্রযাত্রা সুদীর্ঘ; পরিচিত সঙ্গী কেবলমাত্র একজন, এল্‌ম্‌হর্ষ্ট, বাংলাভাষায় তাঁর কান ছিলনা। ডাঙার কোলাহল বহুদূরে। তার উপর শরীর হ'ল অসুস্থ, তাতে ক'রেও সংসারের দায়িত্ব আরো অনেক দূরে দিলে সরিয়ে। বহুবৎসর পরে তাই ছুট পাওয়া গেল; অল্প বয়সের হাল্কা জীবনের ছুটি। অম্‌নি কলম আপনি ছুট্‌ল কবিতার চেনা রাস্তায়। ক্যাবিনে ব'সেও কবিতা লেখা চলে এইবারে তার প্রথম আবিষ্কার। ক্যাবিনের খাঁচা বাইরের

খাঁচা, সেটা ভুলতে বেশিক্ষণ লাগে না যদি মনের মধ্যে পর্দ্দা উঠে যায়, যদি ছুটির আকাশ থেকে হুহু ক'রে হাওয়া ছুটে আসে। সেদিন শুধু কাব্য লিখিনি গদ্যও লিখেছি; সেই কবিতা আর গদ্য ছিল ভাইবোন, সগোত্র।

এইবারে সেই ছুটি ঠিক মিল্‌ল না। মন ডানা নড়াতে গিয়ে দেখে ডানার উপরে কর্ত্তব্যের ফরমাস গট হ'য়ে চেপে ব'সে; মনের আপন খেয়ালের জায়গা খুব সঙ্কীর্ণ। দূর হোক্‌গে—বোঝাটাকে নিয়ে দেশদেশান্তরে আর ব'য়ে বেড়াতে পারিনে। কাল ডেকের উপর কেদারায় ব'সে মনে মনে বল্‌লুম বিশ্বের কাছে আমার দায়িত্ব আছে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে এই কথাটা ভুলব। তাই একটা ছোটো কালো খাতা নিয়ে ঝুঁকে পড়া গেল, গৌড়জনকে নিরবধি মধু খাওয়াবো সঙ্কল্প ক'রে নয়, অদৃষ্টের কাছে আজো ছুটির পাওনা দাবী করতে পারি এইটি প্রমাণ করবার জন্যে।

তারপরে সন্ধে হ'য়ে এল। দূরে দেখা যায় তটরেখা, নীল পাহাড় ঝাপ্‌সা হ'য়ে এসেচে। হাওয়া উঠেচে, সমুদ্রে দিয়েছে ঢেউ। ডেকের উপর আলো জ্বলল। আবার একবার কলম হাতে খাতা খুললুম :—

স্পষ্ট মনে জাগে
তিরিশ বছর আগে
তখন আমার বয়স পঁচিশ;—কিছুকালের তরে
এই দেশেতেই এসেছিলেম, এই বাগানের ঘরে।
সূর্য্য যখন নেমে যেত নীচে
দিনের শেষে ঐ পাহাড়ে পাইন্ শাখার পিছে,
নীল শিখরের আগায় মেঘে মেঘে
আগুন বরণ কিরণ রইত লেগে,—
দীর্ঘ ছায়া বনে বনে এলিয়ে যেত পর্ব্বতে পর্ব্বতে;—
সাম্‌নেতে ঐ কাঁকর-ঢালা পথে
দিনের পরে দিনে
ডাক-পিয়নের পায়ের ধ্বনি নিত্য নিতেম চিনে।
মাসের পরে মাস গিয়েচে, তবু
একবারো তার হয়নি কামাই কভু॥

আর একদিন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজো তেমনি সূর্য্য ডোবে সেই খানেতেই এসে
　　পাইন বনের শেষে ;
　　সুদূর শৈলতলে
সন্ধ্যাছায়ার ছন্দ বাজে ঝরণাধারার জলে,
　　　　সেই সেকালের মতোই তেম্‌নি ধারা
　　　　তারার পরে তারা
　　আলোর মন্ত্র চুপি চুপি শুনায় কানে পর্ব্বতে পর্ব্বতে,
　　শুধু আমার কাঁকর-ঢালা পথে
　　　　বহুকালের চেনা
　　ডাক-পিয়নের পায়ের ধ্বনি একদিনো বাজ্‌বে না ॥

আজ্‌কে তবু কি প্রত্যাশা জাগ্‌ল আমার মনে,—
　　চল্‌তে চল্‌তে গেলেম অকারণে
ডাক-ঘরে সেই মাইল তিনেক দূরে।
　　দ্বিধা ভরে মিনিট কুড়িক এদিক ওদিক ঘুরে
　　　　ডাকবাবুদের কাছে
　　শুধাই এসে, "আমার নামে চিঠিপত্তর আছে ?"
　　　　জবাব পেলেম "কই, কিছুতো নেই।"
শুনে তখন নতশিরে আপন মনেতেই
　　অন্ধকারে ধীরে ধীরে
আসচি যখন শূন্য আমার ঘরের দিকে ফিরে,
　　শুনতে পেলেম পিছন দিকে
করুণ গলায় কে অজানা বল্‌লে হঠাৎ কোন্ পথিকে
　　"মাথা খেয়ো, কাল কোরোনা দেরী।"
ইতিহাসের বাকিটুকু আঁধার দিল ঘেরি।

বক্ষে আমার বাজিয়ে দিলো গভীর বেদনা সে
পঁচিশ বছর বয়সকালের ভুবনখানির একটি দীর্ঘশ্বাসে,
যে-ভুবনে সন্ধ্যাতারা শিউরে যেত ঐ পাহাড়ের দূরে
কাঁকর-ঢালা পথের পরে ডাক-পিওনের পদধ্বনির
সুরে ॥

রন্ফিউস্ জাহাজ
২৩ শে আগষ্ট, ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
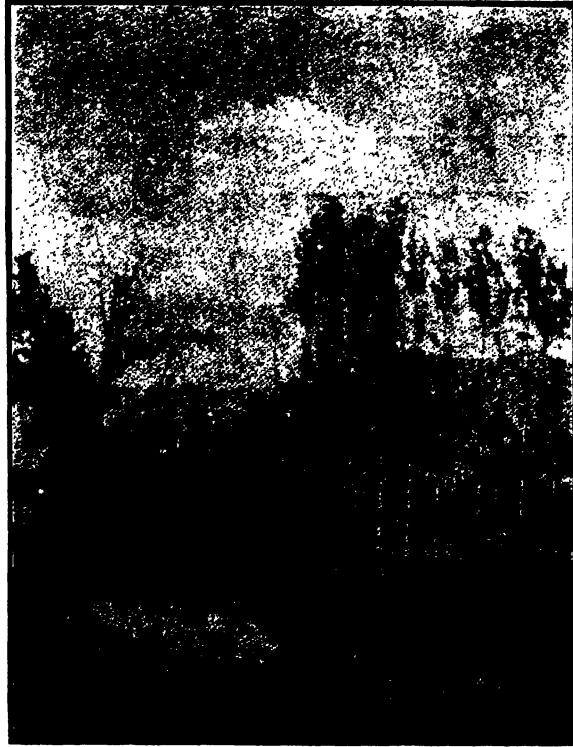
সূর্য্য যখন নেমে যেত নীচে
দিনের শেষে ঐ পাহাড়ে পাইন্ শাখার পিছে

—উপন্যাস—

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬

পরদিন ভোরে যখন কুমু বিছানায় উঠে বসেচে তখন ওর স্বামী ঘুমচ্ছে। কুমু তার মুখের দিকে চাইলে না, পাছে মন বিগ্‌ড়ে যায়। অতি সাবধানে উঠে পায়ের কাছে প্রণাম করলে, তার পরে স্নান করবার ঘরে গেল। স্নান সারা হ'লে পর পিছন দিকের দরজা খুলে গিয়ে বসল ছাদে, তখন কুয়াশার ভিতর দিয়ে পূর্ব্ব আকাশে একটা মলিন সোনার রেখা দেখা দিয়েচে।

বেলা হ'ল, রোদ্দুর উঠ্‌ল যখন, কুমু আস্তে আস্তে শোবার ঘরে ফিরে এসে দেখ্‌লে তার স্বামী তখন চ'লে গেছে। আয়নার দেরাজের উপর তার পুঁতির কাজ করা থলিটি ছিল। তার মধ্যে দাদার টেলিগ্রামের কাগজটি রাখবার জন্যে সেটা খুলেই দেখ্‌তে পেলে সেই নীলার আঙটি নেই।

সকাল বেলাকার মানসপূজার পর তার মুখে যে একটি শান্তির ভাব এসেছিল সেটা মিলিয়ে গিয়ে চোখে আগুন জ্ব'লে উঠ্‌ল। কিছু মিষ্টি ও দুধ খাওয়াবে ব'লে ডাক্‌তে এলো মোতির মা। কুমুর মুখে জবাব নেই, যেন কঠিন পাথরের মূর্ত্তি।

মোতির মা ভয় পেয়ে পাশে এসে বসল—জিজ্ঞাসা করলে, "কী হয়েচে, ভাই?" কুমুর মুখে কথা বেরল না, ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

"বলো, দিদি, আমাকে বলো, কোথায় তোমার বেজেচে?"

কুমু রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বল্‌লে, "নিয়ে গেচে চুরি ক'রে।"

"কী নিয়ে গেচে দিদি?"

"আমার আঙটি, আমার দাদার আশীর্ব্বাদী আঙটি।"

"কে নিয়ে গেচে?"

কুমু উঠে দাঁড়িয়ে কারো নাম না ক'রে বাইরের অভিমুখে ইঙ্গিত করলে।

"শান্ত হও ভাই, ঠাট্টা করেচে তোমার সঙ্গে, আবার ফিরিয়ে দেবে।"

"নেবোনা ফিরিয়ে—দেখ্‌ব কত অত্যাচার করতে পারে ও!"

"আচ্ছা, সে হবে পরে, এখন মুখে কিছু দেবে এসো।"

"না, পারব না; এখানকার খাবার গলা দিয়ে নাব্‌বে না!"

"লক্ষ্মীটি ভাই, আমার খাতিরে খাও।"

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আজ থেকে আমার নিজের ব'লে কিছুই রইল না?"

"না, রইল না। যা কিছু রইল তা স্বামীর মর্জ্জির উপরে। জাননা, চিঠিতে দাসী ব'লে দস্তখৎ করতে হবে।"

দাসী! মনে পড়ল, রঘুবংশের ইন্দুমতীর কথা,—

গৃহিণী সচিবঃ সখীমিথঃ

প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ—

ফর্দ্দের মধ্যে দাসী তো কোথাও নেই। সত্যবানের সাবিত্রী কি দাসী? কিম্বা উত্তররামচরিতের সীতা?

কুমু বল্‌লে, "স্ত্রী যাদের দাসী তারা কোন্ জাতের লোক?"

"ও মানুষকে এখনো চেনোনি। ও যে কেবল অন্তকে গোলামী করায় তা নয়, নিজের গোলামী নিজে করে। যেদিন আফিসে যেতে পারেনা, নিজের বরাদ্দ থেকে সেদিনকার টাকা কাটা পড়ে। একবার ব্যামো হ'য়ে এক মাসের বরাদ্দ বন্ধ ছিল, তার পরের দুই তিন মাস খাইখরচ পর্য্যন্ত কমিয়ে লোকসান পুষিয়ে নিয়েচে। এতদিন আমি ঘরকন্নার কাজ চালিয়ে আস্‌চি সেই অনুসারে আমারও মাসহারা বরাদ্দ। আত্মীয় ব'লে ও কাউকে মানে না। এ বাড়ীতে কর্ত্তা থেকে চাকর চাকরাণী পর্য্যন্ত সবাই গোলাম।"

কুমু একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, "আমি সেই গোলামীই করব। আমার রোজকার খোরপোষ হিসেব মতো রোজ রোজ শোধ করব। আমি এ বাড়ীতে বিনা মাইনের স্ত্রী বাঁদী হ'য়ে থাকব না। চলো, আমাকে কাজে ভর্ত্তি ক'রে নেবে। ঘরকন্নার ভার তোমার উপরেই তো,—আমাকে তুমি তোমার অধীনে খাটিয়ে নিয়ো, আমাকে রাণী ব'লে কেউ যেন ঠাট্টা না করে।"

মোতির মা হেসে কুমুর চিবুক ধ'রে বল্‌লে, "তাহলে তো আমার কথা মান্‌তে হবে। আমি হুকুম করচি, চলো এখন খেতে।"

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে কুমু বল্‌লে, "দেখ ভাই, নিজেকে দেবো ব'লেই তৈরি হ'য়ে এসেছিলুম, কিন্তু ও কিছুতেই দিতে দিলে না। এখন দাসী নিয়েই থাকুক। আমাকে পাবে না।"

মোতির মা বল্‌লে, "কাঠুরে গাছকে কাট্‌তেই জানে, সে গাছ পায় না কাঠ পায়। মালী গাছকে রাখ্‌তে জানে, সে পায় ফুল, পায় ফল। তুমি পড়েচ কাঠুরের হাতে, ও যে ব্যবসাদার। ওর মনে দরদ নেই কোথাও।"

এক সময়ে শোবার ঘরে ফিরে এসে কুমু দেখ্‌লে, তার টিপাইয়ের উপর এক শিশি লজেঞ্জস্‌। হাব্‌লু তার ত্যাগের অর্ঘ্য গোপনে নিবেদন ক'রে নিজে কোথায় লুকিয়েচে। এখানে পাষাণের ফাঁক দিয়েও ফুল ফোটে। বালকের এই লজেঞ্জসের ভাষায় একসঙ্গে ওকে কাঁদালে হাসালে। তাকে খুঁজ্‌তে বেরিয়ে দেখে বাইরে সে দরজার আড়ালে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। মা তাকে এ ঘরে যাতায়াত করতে বারণ করেছিল। তার ভয় ছিলো পাছে কোনো-কিছু উপলক্ষ্যে কর্ত্তার বিরক্তি ঘটে। মোটের উপরে, মধুসূদনের নিজের কাজ ছাড়া অন্য বাবদে তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকাই নিরাপদ, একথা এ বাড়ীর সবাই জানে।

কুমু হাব্‌লুকে ধ'রে ঘরে নিয়ে এসে কোলে বসালে। ওর গৃহসজ্জার মধ্যে পুতুল জাতীয় যা-কিছু জিনিষ ছিল সেই-গুলো দুজনে নাড়াচাড়া করতে লাগ্‌লো। কুমু বুঝ্‌তে পারলে একটা কাগজ-চাপা হাব্‌লুর ভারি পছন্দ—কাঁচের ভিতর দিয়ে রঙীন ফুল যে কি ক'রে দেখা যাচ্চে সেইটে বুঝতে না পেরে ওর ভারি তাক লেগেচে।

কুমু বল্‌লে, "এটা নেবে গোপাল?"

এত বড়ো অভাবনীয় প্রস্তাব ওর বয়সে কখনো শোনেনি। এমন জিনিষও কি ও কখনো আশা করতে পারে? বিস্ময়ে সঙ্কোচে কুমুর মুখের দিকে নীরবে চেয়ে রইলো।

কুমু বল্‌লে, "এটা তুমি নিয়ে যাও।"

হাব্‌লু আহ্লাদ রাখ্‌তে পারলে না—সেটা হাতে নিয়েই লাফাতে লাফাতে ছুটে চ'লে গেলো।

সেই দিন বিকেলে হাব্‌লুর মা এসে বল্‌লে, "তুমি করেচ কি ভাই? হাব্‌লুর হাতে কাঁচের কাগজ-চাপা দেখে বড়োঠাকুর হুলস্থূল বাধিয়ে দিয়েচে। কেড়ে তো নিয়েইচে—তার পর তাকে চোর ব'লে মার। ছেলেটাও এমনি, তোমার নামও করেনি। হাব্‌লুকে আমিই যে জিনিষ-পত্র চুরি করতে শেখাচ্চি এ কথাও ক্রমে উঠ্‌বে।"

কুমু কাঠের মূর্ত্তির মতো শক্ত হ'য়ে ব'সে রইলো।

এমন সময়ে বাইরে মচ্‌মচ্‌ শব্দে মধুসূদন আস্‌চে। মোতির মা তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলো। মধুসূদন কাঁচের কাগজচাপা হাতে ক'রে যথাস্থানে ধীরে ধীরে সেটা গুছিয়ে রাখ্‌লে। তার পরে নিশ্চিত-প্রত্যয়ের কণ্ঠে শান্ত গম্ভীর স্বরে বল্‌লে, "হাব্‌লু তোমার ঘর থেকে এটা চুরি ক'রে নিয়েছিল। জিনিষপত্র সাবধান ক'রে রাখ্‌তে শিখো।"

কুমু তীক্ষ্ণ স্বরে বল্‌লে, "ও চুরি করেনি।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"আচ্ছা, বেশ, তাহলে সরিয়ে নিয়েচে।"

"না, আমিই ওকে দিয়েচি।"

"এমনি ক'রে ওর মাথা খেতে বসেচ বুঝি? একটা কথা মনে রেখো, আমার হুকুম ছাড়া জিনিষপত্র কাউকে দেওয়া চল্‌বে না। আমি এলোমেলো কিছুই ভালো-বাসিনে।"

কুমু দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "তুমি নাওনি আমার নীলার আঙটি?"

মধুসূদন বল্‌লে, "হাঁ নিয়েচি।"

"তাতেও তোমার ঐ কাঁচের ঢেলাটার দাম শোধ হোলো না?"

"আমি তো বলেছিলুম, ওটা তুমি রাখ্‌তে পারবে না।"

"তোমার জিনিষ তুমি রাখ্‌তে পারবে, আর আমার জিনিষ আমি রাখতে পারব না?"

"এ বাড়িতে তোমার স্বতন্ত্র জিনিষ ব'লে কিছু নেই।"

"কিছু নেই? তবে রইলো তোমার এই ঘর প'ড়ে।"

কুমু যেই গেছে, ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে শ্যামা ঘরে প্রবেশ ক'রে বল্‌লে, "বউ কোথায় গেল?"

"কেন?"

"সকাল থেকে ওর খাবার নিয়ে ব'সে আছি, এ বাড়িতে এসে বউ কি খাওয়াও বন্ধ করবে?"

"তা হয়েচে কি? নূরনগরের রাজকন্যা না হয় নাই খেলেন? তোমরা ওঁর বাঁদী নাকি?"

"ছি ঠাকুরপো, ছেলে মানুষের উপর অমন রাগ করতে নেই। ওযে এমন না খেয়ে খেয়ে কাটাবে এ আমরা সহ্য করতে পারিনে। সাধে সেদিন মূর্চ্ছো গিয়েছিল?"

মধুসূদন গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল—"কিছু করতে হবে না, যাও চলে! ক্ষিধে পেলে আপনিই খাবে।"

শ্যামা যেন অত্যন্ত বিমর্ষ হ'য়ে চ'লে গেল।

মধুসূদনের মাথায় রক্ত চড়তে লাগ্‌ল। দ্রুত বেগে নাবার ঘরে জলের ঝাঁঝরি খুলে দিয়ে তার নীচে মাথা পেতে দিলে।

২৭

সন্ধে হ'য়ে এলো, সেদিন কুমুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। শেষকালে দেখা গেলো, ভাঁড়ার ঘরের পাশে একটা ছোট কোণের ঘরে যেখানে প্রদীপ, পিলসুজ. তেলের ল্যাম্প প্রভৃতি জমা করা হয় সেইখানে মেঝের উপর মাদুর বিছিয়ে ব'সে আছে।

মোতির মা এসে জিজ্ঞাসা করলে "একি কাণ্ড দিদি?"

কুমু বল্‌লে, "এ বাড়িতে আমি সেজ বাতি সাফ করব, আর এইখানে আমার স্থান।"

মোতির মা বল্‌লে, "ভালো কাজ নিয়েচ ভাই, এ বাড়ি তুমি আলো করতেই তো এসেচ, কিন্তু সে জন্যে তোমাকে সেজ বাতির তদারক করতে হবে না। এখন চলো।"

কুমু কিছুতে নড়ল না।

মোতির মা বল্‌লে, "তবে আমি তোমার কাছে শুই।"

কুমু দৃঢ়স্বরে বল্‌লে, "না।" মোতির মা দেখ্‌লে এই ভালোমানুষ মেয়ের মধ্যে হুকুম করবার জোর আছে। তাকে চ'লে যেতে হোলো।

মধুসূদন রাত্রে শুতে এসে কুমুর খবর নিলে। যখন খবর শুন্‌লে, প্রথমটা ভাব্‌লে, 'বেশ তো ঐ ঘরেই থাক্ না, দেখি কতদিন থাক্‌তে পারে। সাধ্যসাধনা কর্‌তে গেলেই জেদ্ বেড়ে যাবে।'

এই ব'লে আলো নিবিয়ে দিয়ে শুতে গেলো। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। প্রত্যেক শব্দেই মনে হচ্চে ঐ বুঝি আস্‌চে। একবার মনে হোলো, যেন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেখে কেউ কোথাও নেই। যতই রাত হয় মনের মধ্যে ছটফট করতে থাকে। কুমুকে যে অবজ্ঞা করবে কিছুতেই সে শক্তি পাচ্চে না। অথচ নিজে এগিয়ে গিয়ে তার কাছে হার মান্‌বে এটা ওর পলিসি-বিরুদ্ধ। ঠাণ্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে এসে শুলো, কিন্তু ঘুম আসে না। ছট্‌ফট্ করতে কর্‌তে উঠে পড়লো, কোনো মতেই কৌতূহল সাম্‌লাতে পার্‌লে না। একটা লণ্ঠন হাতে ক'রে নিদ্রিত কক্ষশ্রেণী নিঃশব্দপদে পার

হ'য়ে অন্তঃপুরের সেই ফরাসখানার সাম্‌নে এসে একটুক্ষণ কান পেতে রইল, ভিতরে কোনো সাড়াশব্দ নেই। সাবধানে দরজা খুলে দেখে কুমু মেজের উপর একটা মাদুর পেতে শুয়ে, সেই মাদুরের একপ্রান্ত গুটিয়ে সেইটেকে বালিস করেচে। মধুসূদনের যেমন ঘুম নেই, কুমুরও তেমনি ঘুম না থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু দেখলে সে অকাতরে ঘুমচ্চে; এমন কি তার মুখের উপর যখন লণ্ঠনের আলো ফেল্‌লে তাতেও ঘুম ভাঙলো না। এমন সময় কুমু একটুখানি উস্‌খুস ক'রে পাশ ফির্‌লে। গৃহস্থের জাগার লক্ষণ দেখে চোর যেমন ক'রে পালায় মধুসূদন তেমনি তাড়াতাড়ি পালালো। ভয় হোলো পাছে কুমু ওর পরাভব দেখ্‌তে পায়, পাছে মনে মনে হাসে।

বাতির ঘর থেকে মধুসূদন বেরিয়ে এসে বারান্দা বেয়ে খানিকটা যেতেই সাম্‌নে দেখে শ্যামা। তার হাতে একটি প্রদীপ।

"একি ঠাকুরপো, এখানে কোথা থেকে এলে?"

মধুসূদন তার কোনো উত্তর না ক'রে বল্‌লে, "তুমি কোথায় যাচ্চ বউ?"

"কাল যে আমার ব্রত, ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে তারি জোগাড়ে চলেচি—তোমারো নেমন্তন্ন রইল। কিন্তু তোমাকে দক্ষিণে দেবার মতো শক্তি নেই ভাই।"

মধুসূদনের মুখে একটা জবাব আস্‌ছিল, সেটা চেপে গেল।

সেই শেষরাত্রের অন্ধকারে প্রদীপের আলোয় শ্যামাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। শ্যামা একটু হেসে বল্‌লে, "আজ ঘুম থেকে উঠেই তোমার মতো ভাগাবান পুরুষের মুখ দেখলুম, আমার দিন ভালোই যাবে। ব্রত সফল হবে।"

ভাগ্যবান শব্দটার উপর একটু জোর দিলে—মধুসূদনের কানে কথাটা বিড়ম্বনার মতো শোনালো। কুমুর সম্বন্ধে কোনো কথা স্পষ্ট ক'রে জিজ্ঞাসা করতে শ্যামার সাহস হোলো না। "কাল কিন্তু আমার ঘরে খেতে এসো, মাথা খাও," ব'লে সে চ'লে গেল।

ঘরে এসে মধুসূদন বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল। বাইরে লণ্ঠনটা রাখলে, যদি কুমু আসে। কুমুদিনীর সেই সুপ্ত মুখ কিছুতে মন থেকে নড়তে চায় না; আর কেবলি মনে পড়ে কুমুর অতুলনীয় সেই হাতখানি শালের বাইরে এলিয়ে। বিবাহকালে এই হাত যখন নিজের হাতে নিয়েছিল তখন একে সম্পূর্ণ দেখ্‌তে পায় নি—আজ দেখে দেখে চোখের আর আশ মিটুতে চায় না। এই হাতের অধিকারটি সে কবে পাবে? বিছানায় আর টিঁক্‌তে পারে না; উঠে পড়্‌ল। আলো জালিয়ে কুমুর ডেস্কের দেরাজ খুল্‌লে। দেখ্‌লে সেই পুঁতি-গাঁথা থলিটি। প্রথমেই বেরোলো বিপ্রদাসের টেলিগ্রামখানি—'ঈশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন'—তার পরে একখানি ফটোগ্রাফ, ওর দুই দাদার ছবি—আর একখানি কাগজের টুক্‌রো, বিপ্রদাসের হাতে লেখা গীতার এই শ্লোক:—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ,
যৎ তপস্যসি, কৌন্তেয়, তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।

ঈর্ষায় মধুসূদনের মন ক্ষতবিক্ষত হ'তে লাগ্‌ল। দাঁতে দাঁতে লাগিয়ে বিপ্রদাসকে মনে মনে লোপ ক'রে দিলে। সেই লুপ্তির দিন একদা আসবে ও নিশ্চয় জানে—অল্প অল্প ক'রে স্ক্রু আঁটতে হবে; কিন্তু কুমুদিনীর যে উনিশটা বছর মধুসূদনের আয়ত্তের বাইরে, সেইটে বিপ্রদাসের হাত থেকে এই মুহূর্ত্তেই ছিনিয়ে নিতে পারলে তবেই ও মনে শান্তি পায়। আর কোনো রাস্তা জানেনা জবরদস্তি ছাড়া। পুঁতির থলিটি আজ সাহস ক'রে ফেলে দিতে পার্‌লে না—যেদিন আংটি হরণ ক'রে নিয়েছিল সেদিন ওর সাহস আরো বেশি ছিলো। তখনো জানতো কুমুদিনী সাধারণ মেয়েরই মতো সহজেই শাসনের অধীন, এমন কি, শাসনই পছন্দ করে। আজ বুঝেচে কুমুদিনী যে কী করতে পারে এবং পারে না কিচ্ছু বলবার জো নেই।

কুমুদিনীকে নিজের জীবনের সঙ্গে শক্ত বাঁধনে জড়াবার একটি মাত্র রাস্তা আছে সে কেবল সন্তানের মায়ের রাস্তা। সেই কল্পনাতেই ওর সান্ত্বনা।

এমনি ক'রে ঘড়িতে পাঁচটা বাজ্‌ল। কিন্তু শীতরাত্রির অন্ধকার তখনো যায় নি। আর কিছুক্ষণ পরেই আলো উঠ্‌বে, আজকের রাত হবে ব্যর্থ। মধুসূদন তাড়া-

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাড়ি ঘর ছেড়ে চল্‌লো—ফরাসখানার সামনে পায়ের শব্দটা বেশ একটু স্পষ্টই ধ্বনিত করলে—দরজাটা শব্দ ক'রেই খুল্‌লে—দেখলে ভিতরে কুমু নেই। কোথায় সে?

উঠোনের কলে জল পড়ার শব্দ কানে এলো। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে, যত রাজ্যের পুরানো অব্যবহার্য্য মরচে-পড়া পিল্‌সুজগুলো নিয়ে কুমু তেঁতুল দিয়ে মাজ্‌চে। এ কেবল ইচ্ছা ক'রে কাজের ভার বাড়াবার চেষ্টা, শীতের ভোর বেলার নিদ্রাহীন দুঃখকে বিস্তারিত ক'রে তোলা।

মধুসূদন উপরের বারান্দা থেকে অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। অবলার বলকে কী ক'রে পরাস্ত কর্‌তে হয় এই তার ভাবনা। সকালে উঠে বাড়ির লোকে যখন দেখ্‌বে কুমু পিলসুজ মাজচে কী ভাব্‌বে। যে চাকরের উপরে মাজাঘসার ভার, সেই বা কি মনে করবে? বিশ্বশুদ্ধ লোকের কাছে তা'কে হাস্যাস্পদ করবার এমন তো উপায় আর নেই।

একবার মধুসূদনের মনে হ'ল কলতলায় গিয়ে কুমুর সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে নেয়। কিন্তু সকাল বেলায় সেই উঠানের মাঝখানে দুজনে বচসা করবে আর বাড়িশুদ্ধ লোকে তামাসা দেখ্‌তে বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে আস্‌বে এই প্রহসনটা কল্পনা ক'রে পিছিয়ে গেলো। মেজো ভাই নবীনকে ডাকিয়ে বল্‌লে, "বাড়িতে কি-সব ব্যাপার হচ্চে চোখ রাখো কি?"

নবীন ছিলো বাড়ীর ম্যানেজার। সে ভয় পেয়ে বল্‌লে "কেন দাদা, কি হয়েচে?"

নবীন জানে, দাদার যখন রাগ করবার একটা কারণ ঘটে তখন শাসন করবার একটা মানুষ চাই। দোষী যদি ফ'স্কে যায় তো নির্দ্দোষী হ'লেও চলে,—নইলে ডিসিপ্লিন থাকে না, নইলে সংসারে ওর রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রেস্টীজ্‌ চ'লে যায়।

মধুসূদন বল্‌লে, "বড়ো বৌ যে পাগলের মতো কাণ্ডটা করতে বসেচে, তার কারণটা কি সে কি আমি জানিনে মনে করো?"

বড়ো বৌ কি পাগ্‌লামি করচেন সে প্রশ্ন করতে নবীন সাহস করলে না পাছে খবর না জানাটাই একটা অপরাধ ব'লে গণ্য হয়।

মধুসূদন বল্‌লে, "মেজোবৌ ওর মাথা বিগ্‌ড়োতে বসেচেন সন্দেহ নেই।"

বহু সঙ্কোচে নবীন বল্‌তে চেষ্টা কর্‌লে, "না, মেজোবৌ তো—"

মধুসূদন বল্‌লে, "আমি স্বচক্ষে দেখেচি।"

এর উপরে আর কথা খাটে না। স্বচক্ষে দেখার মধ্যে সেই কাগজ-চাপার ইতিহাসটা নিহিত ছিলো।

২৮

মোতির মা যখনি কুমুকে অকৃত্রিম ভালোবাসার সঙ্গে আদর যত্ন করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল তখনি নবীন বুঝেছিল এটা সইবে না; বাড়ির মেয়েরা এই নিয়ে লাগালাগি কর্‌বে। নবীন ভাবলে সেই রকমের একটা কিছু ঘটেচে। কিন্তু মধুসূদনের আন্দাজী অভিযোগ সম্বন্ধে প্রতিবাদ ক'রে কোনো লাভ নেই; তাতে জেদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

ব্যাপারটা কি হয়েচে মধুসূদন তা স্পষ্ট ক'রে বল্‌লে না—বোধকরি বল্‌তে লজ্জা করছিল; কি করতে হবে তাও রইলো অস্পষ্ট, কেবল ওর মধ্যে যেটুকু স্পষ্ট সে হচ্চে এই যে, সমস্ত দায়িত্বটা মেজোবৌয়েরই, সুতরাং দাম্পত্যের আপেক্ষিক মর্য্যাদা অনুসারে জবাবদিহীর ল্যাজামুড়োর মধ্যে মুড়োর দিকটাই নবীনের ভাগ্যে।

নবীন গিয়ে মোতির মাকে বল্‌লে, "একটা ফ্যাসাদ বেধেচে।"

"কেন, কি হয়েচে?"

"সে জানেন অন্তর্য্যামী, আর দাদা, আর সম্ভবত তুমি; কিন্তু তাড়া আরম্ভ হয়েছে আমার উপরেই।"

"কেন বলো দেখি?

"যাতে আমার দ্বারা তোমার সংশোধন হয়, আর তোমার দ্বারা সংশোধন হয় ওঁর নতুন ব্যবসায়ের নতুন আমদানীর।"

"তা আমার উপরে তোমার সংশোধনের কাজটা সুরু করো—দেখি দাদার চেয়ে তোমার হাতযশ আছে কি না।"

নবীন কাতর হ'য়ে বল্লে, "দাদার উড়ে চাকরটা ওঁর দামী ডিনার-সেটের একটা পিরিচ ভেঙেছিল, তার জরিমানার প্রধান অংশ আমাকেই দিতে হয়েচে, জানো তো,—কেন না জিনিষগুলো আমারি জিম্মে। কিন্তু এবারে যে-জিনিষটা ঘরে এলো সেও কি আমারি জিম্মে? তবু জরিমানাটা তোমাতে আমাতেই বাঁটোয়ারা ক'রে দিতে হবে। অতএব যা করতে হয় করো, আমাকে আর দুঃখ দিওনা মেজোবৌ।"

"জরিমানা বল্‌তে কি বোঝায় শুনি।"

"রজবপুরে চালান ক'রে দেবেন। মাঝে মাঝে তো সেই রকম ভয় দেখান।"

"ভয় পাও ব'লেই ভয় দেখান। একবার তো পাঠিয়েছিলেন, আবার রেলভাড়া দিয়ে ফিরিয়ে আনতে হয়নি? তোমার দাদা রেগেও হিসেবে ভুল করেন না। জানেন আমাকে ঘরকন্না থেকে বরখাস্ত করলে সেটা একটুও সস্তা হবে না। আর যদি কোথাও এক পয়সাও লোকসান হয় সে ঠকা ওঁর সইবে না।"

"বুঝলুম, এখন কী করতে হবে বলোনা।"

"তোমার দাদাকে বোলো, যত বড়ো রাজাই হোন্‌না, মাইনে ক'রে লোক রেখে রাণীর মান ভাঙাতে পারবেন না —মানের বোঝা নিজেকেই মাথায় ক'রে নামাতে হবে। বাসরঘরের ব্যাপারে মুটে ডাক্‌তে বারণ কোরো।"

"মেজ বৌ, উপদেশ তাঁকে দেবার জন্যে আমার দরকার হবে না, দুদিন বাদে নিজেরই হুঁস্ হবে। ইতিমধ্যে দূতীগিরির কাজটা করো, ফল হোক্ বা না হোক্। দেখাতে পারব নিমক খেয়ে সেটা চুপচাপ হজম করচিনে।"

•

মোতির মা কুমুকে গেল খুঁজ্‌তে। জান্‌ত সকাল বেলা তাকে পাওয়া যাবে ছাদের উপরে। উঁচু প্রাচীর-দেওয়া ছাদ, তার মাঝে মাঝে ঘুলঘুলি। এলোমেলো গোটাকতক টব, তাতে গাছ নেই। এক কোণে লোহার জাল-দেওয়া একটা বড়ো ভাঙা চৌকো খাঁচা; তার কাঠের তলাটা প্রায় সবটা জীর্ণ। কোনো এক সময় খরগোষ কিম্বা পায়রা এতে রাখা হোতো।—এখন আচার আমসত্ব প্রভৃতিকে কাকের চৌর্য্যবৃত্তি থেকে বাঁচিয়ে রোদ্দুরে দেবার কাজে লাগে। এই ছাদ থেকে মাথার উপরকার আকাশ দেখতে পাওয়া যায়, দিগন্ত দেখা যায় না। পশ্চিম আকাশে একটা লোহার কারখানার চিম্‌নি। যে দুদিন কুমু এই ছাদে বসেচে ঐ চিম্‌নি থেকে উৎসারিত ধূমকুণ্ডলটাই তার একমাত্র দেখবার জিনিষ ছিল—সমস্ত আকাশের মধ্যে ঐ কেবল একটি যেন সজীব পদার্থ, কোন্ একটা আবেগে ফুলে ফুলে পাক দিয়ে দিয়ে উঠ্‌চে।

পিল্‌সুজ প্রভৃতি মাজা সেরে অন্ধকার থাক্‌তেই স্নান ক'রে পুব দিকে মুখ ক'রে কুমু ছাদে এসে বসেচে। ভিজে চুল পিঠের উপর এলিয়ে দেওয়া,—সাজসজ্জার কোনো আভাসমাত্র নেই। একখানি মোটা সুতোর সাদা সাড়ি, সরু কালো পাড়, আর শীত নিবারণের জন্য একটা মোটা এণ্ডি রেশমের ওড়না।

কিছু দিন থেকে প্রত্যাশিত প্রিয়তমের কাল্পনিক আদর্শকে অন্তরের মাঝখানে রেখে এই যুবতী আপন হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাতে বসেছিল। তার যত পুজা যত ব্রত যত পুরাণকাহিনী সমস্তই এই কল্পমূর্ত্তিকে সজীব ক'রে রেখেছিল। সে ছিল অভিসারিণী তার মানস-বৃন্দাবনে,—ভোরে উঠে সে গান গেয়েচে রামকেলী রাগিণীতে,—

"হমারে তুমারে সম্প্রীতি লগী হৈ
শুন মনমোহন প্যারে—"

যে অনাগত মানুষটির উদ্দেশে উঠচে তার আত্মনিবেদনের অর্ঘ্য, সমুখে এসে পৌছবার আগেই সে যেন ওর কাছে প্রতিদিন তার পেয়ালা পাঠিয়ে দিয়েছে। বর্ষার রাত্রে খিড়কির বাগানের গাছগুলি অবিশ্রাম ধারাপতনের আঘাতে আপন পল্লবগুলিকে যখন উতরোল করেছে তখন কানাড়ার সুরে মনে পড়েছে তার ঐ গান:—

"বাজে ঝননন মেরে পায়েরিয়া
কৈস কর যাউঁ ঘরোয়ারে।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আপন উদাস মনটার পায়ে পায়ে নূপুর বাজ্‌চে ঝনন—উদ্দেশহারা পথে বেরিয়ে পড়েচে, কোনোকালে ফির্‌বে কেমন ক'রে ঘরে। যাকে রূপে দেখবে এম্‌নি ক'রে কতদিন থেকে তাকে সুরে দেখ্‌তে পাচ্ছিল। নিগূঢ় আনন্দ-বেদনার পরিপূর্ণতার দিনে যদি মনের মতো কাউকে দৈবাৎ সে কাছে পেতো তাহলে অন্তরের সমস্ত গুঞ্জরিত গানগুলি তখনি প্রাণ পেতো রূপে। কোনো পথিক ওর দ্বারে এসে দাঁড়ালো না। কল্পনার নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে ও একেবারেই ছিল একলা। এমন কি, ওর সমবয়সী সঙ্গিনীও বিশেষ কেউ ছিল না। তাই এতদিন শ্যামসুন্দরের পায়ের কাছে ওর নিরুদ্ধ ভালোবাসা পূজার ফুল আকারে আপন নিরুদ্দিষ্ট দয়িতের উদ্দেশ খুঁজেচে! সেই জন্যেই ঘটক যখন বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এলো কুমু তখন তার ঠাকুরেরই হুকুম চাইলে,—জিজ্ঞাসা করলে, "এইবার তোমাকেই তো পাবো?" অপরাজিতার ফুল বল্‌লে, "এই তো পেয়েচ।"

অন্তরের এতদিনের এত আয়োজন ব্যর্থ হোলো—একেবারে ঠন্ ক'রে উঠ্‌ল পাথরটা, ভরা ডুবি হোলো এক মুহূর্ত্তেই। ব্যথিত যৌবন আজ আবার খুঁজতে বেরিয়েছে, কোথায় দেবে তার ফুল! থালিতে যা ছিল তার অর্ঘ্য, সে যে আজ বিষম বোঝা হ'য়ে উঠলো! তাই আজ এমন ক'রে প্রাণপণে গাইচে, "মেরে গিরিধর গোপাল ঔর নাহি কোহী।"

কিন্তু আজ এ গান শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্চে, পৌঁছল না কোথাও। এই শূন্যতায় কুমুর মন ভয়ে ভ'রে উঠ্‌লো। আজ থেকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মনের গভীর আকাঙ্ক্ষা কি ওই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতোই কেবল সঙ্গীহীন নিঃশ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌চে?

মোতির মা দূরে পিছনে ব'সে রইলো। সকালের নির্ম্মল আলোয় নির্জ্জন ছাদে এই অসজ্জিতা সুন্দরীর মহিমা ওকে বিস্মিত ক'রে দিয়েচে। ভাবচে, এ বাড়ীতে ওকে কেমন ক'রে মানাবে? এখানে যে-সব মেয়ে আছে এর তুলনায় তারা কোন্ জাতের? তারা আপনি ওর থেকে পৃথক হ'য়ে পড়েচে, ওর উপরে রাগ করচে কিন্তু ওর সঙ্গে ভাব করতে সাহস করচে না।

ব'সে থাক্‌তে থাক্‌তে মোতির মা হঠাৎ দেখ্‌লে কুমু দুই হাতে তার ওড়নার আঁচল মুখে চেপে ধ'রে কেঁদে উঠেচে। ও আর থাক্‌তে পারলে না, কাছে এসে গলা জড়িয়ে ধ'রে ব'লে উঠ্‌ল, "দিদি আমার, লক্ষ্মী আমার, কি হয়েচে বলো আমাকে।"

কুমু অনেকক্ষণ কথা কইতে পারলে না। একটু সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লে, "আজও দাদার চিঠি পেলুম না, কি হয়েচে তাঁর বুঝতে পারচিনে।"

"চিঠি পাবার কি সময় হয়েচে ভাই?"

"নিশ্চয় হয়েচে। আমি তাঁর অসুখ দেখে এসেচি। তিনি জানেন, খবর পাবার জন্যে আমার মনটা কি-রকম করচে।"

মোতির মা বল্‌লে, "তুমি ভেবোনা, খবর নেবার আমি একটা কিছু উপায় কোরবো।"

কুমু টেলিগ্রাফ করবার কথা অনেকবার ভেবেচে, কিন্তু কা'কে দিয়ে করবে। যেদিন মধুসূদন নিজেকে ওর দাদার মহাজন ব'লে বড়াই করেছিল সেইদিন থেকে মধুসূদনের কাছে ওর দাদার উল্লেখ মাত্র করতে ওর মুখে বেধে যায়। আজ মোতির মাকে বল্‌লে, "তুমি যদি দাদাকে আমার নামে টেলিগ্রাফ করতে পারো তো আমি বাঁচি।"

মোতির মা বল্‌লে "তাই করব, ভয় কি?"

কুমু বল্‌লে, "তুমি জানো, আমার কাছে একটিও টাকা নেই।"

"কি বলো, দিদি, তার ঠিক নেই। সংসার-খরচের যে টাকা আমার কাছে থাকে, সে তো তোমারি টাকা। আজ থেকে আমি যে তোমারি নিমক খাচ্চি।"

কুমু জোর ক'রে ব'লে উঠ্‌লো,—"না, না, না, এ বাড়ির কিছুই আমার নয়, পিকি পয়সাও না।"

"আচ্ছা ভাই, তোমার জন্যে না হয় আমার নিজের টাকা থেকে কিছু খরচ করব। চুপ ক'রে রইলে কেন? তাতে দোষ কি? টাকাটা আমি যদি অহঙ্কার ক'রে দিতুম, তুমি অহঙ্কার ক'রে না নিতে পারতে। ভালোবেসে যদি দিই, তাহলে ভালোবেসেই নেবে না কেন?"

কুমু বল্‌লে, "নেবো।"

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, "দিদি, তোমার শোবার ঘর কি আজো শূন্য থাকবে?"

কুমু বল্‌লে, "ওখানে আমার জায়গা নেই।"

মোতির মা পীড়াপীড়ি করলে না। তার মনের ভাবখানা এই যে, পীড়াপীড়ি করবার ভার আমার নয়; যার কাজ সে করুক। কেবল আস্তে আস্তে সে বল্‌লে, "একটু দুধ এনে দেব তোমার জন্যে?"

কুমু বল্‌লে, "এখন না, আর একটু পরে।"—তার ঠাকুরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এখনো বাকি আছে। এখনো মনের মধ্যে কোনো জবাব পাচ্চে না।

মোতির মা আপন ঘরে গিয়ে নবীনকে ডেকে বল্‌লে, "শোনো একটি কথা। বড়ঠাকুরের বাইরের ঘরে তাঁর ডেস্কর উপর খোঁজ ক'রে এসোগে, দিদির কোনো চিঠি এসেচে কি না—দেরাজ খুলেও দেখো।"

নবীন বল্‌লে, "সর্ব্বনাশ!"

"তুমি যদি না যাও তো আমি যাব।"

"এ যে ঝোপের ভিতর থেকে ভালুকের ছানা ধরতে পাঠানো।"

"কর্ত্তা গেছেন আপিসে, তাঁর কাজ সেরে আস্‌তে বেলা একটা হবে—এর মধ্যে"—

"দেখো মেজ বৌ, দিনের বেলায় একাজ কিছুতেই আমার দ্বারা হবে না, এখন চারিদিকে লোকজন। আজ রাত্রে তোমাকে খবর দিতে পারব।"

মোতির মা বল্‌লে, "আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু নূরনগরে এখনি তার ক'রে জান্‌তে হবে বিপ্রদাস বাবু কেমন আছেন।"

"বেশ কথা, তা দাদাকে জানিয়ে করতে হ'বে তো?"

"না।"

"মেজ বৌ, তুমি যে দেখি মরীয়া হ'য়ে উঠেচ? এ বাড়িতে টিকটিকি মাছি ধরতে পারে না কর্ত্তার হুকুম ছাড়া, আর আমি—"

"দিদির নামে তার যাবে তোমার তাতে কি?"

"আমার হাত দিয়ে তো যাবে।"

"বড়ো ঠাকুরের আপিসের ঢের তার তো রোজ দরোয়ানকে দিয়ে পাঠানো হয়, তার সঙ্গে এটা চালান দিয়ো। এই নাও টাকা, দিদি দিয়েচেন।"

কুমুর সম্বন্ধে নবীনের মনও যদি করুণায় ব্যথিত হ'য়ে না থাকৃতো তাহলে এত বড়ো দুঃসাহসিক কাজের ভার সে কিছুতেই নিতে পারতো না।

(ক্রমশঃ)
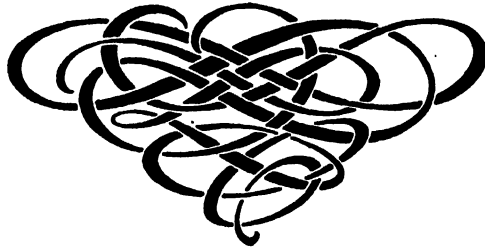
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত

৮

সুরকর্ত্তা, জাভা

কল্যাণীয়াসু—

বৌমা, বালি থেকে পার হ'য়ে জাভা দ্বীপে সুরবায়া সহরে এসে নামা গেল। এই জায়গাটা হচ্ছে বিদেশী সওদাগরদের প্রধান আখ্ড়া। জাভার সব চেয়ে বড় উৎপন্ন জিনিষ চিনি, এই ছোট দ্বীপটি থেকে দেশ বিদেশে চালান যাচ্ছে। এমন এককাল ছিল পৃথিবীতে চিনি বিতরণের ভার ছিল ভারতবর্ষের। আজ এই জাভার হাট থেকে চিনি কিনে বৌবাজারের ভীমচন্দ্র নাগের সন্দেশ তৈরি হয়। ধরণী স্বভাবত কি দান করেন আজকাল তারই উপরে ভরসা রাখ্তে গেলে ঠক্তে হয়, মানুষ কি আদায় ক'রে নিতে পারে এইটেই হ'ল আসল কথা। গোরু আপনা-আপনি যে দুধটুকু দেয় তাতে যজ্ঞের আয়োজন চলে না, গৃহস্থের শিশুদের পেট ভরিয়ে বৌবাজারের দোকানে গিয়ে পৌছবার পূর্ব্বেই কেঁড়ে শূন্য হ'য়ে যায়। যারা ওস্তাদ গোয়ালা, তারা জানে কিরকম খোরাকি ও প্রজননবিধির দ্বারা গোরুর দুধ বাড়ানো চলে। এই শ্যামল দ্বীপটি ওলন্দাজদের পক্ষে ধরণী-কামধেনুর দুধভরা বাঁটের মতো। তারা জানে কোন্ প্রণালীতে এই বাঁট কোনো দিন একফোঁটা শুকিয়ে না যায়, নিয়ত দুধে ভ'রে থাকে, সম্পূর্ণ দুইয়ে নেবার কৌশলটাও তাদের আয়ত্ত। আমাদের কর্তৃপক্ষও তাঁদের গোয়ালবাড়ী ভারতবর্ষে বসিয়েছেন; চা আর পাট নিয়ে এতকাল তাঁদের হাট গুল্জার হ'ল, কিন্তু এদিকে আমাদের চাষের ক্ষেত নির্জ্জীব হ'য়ে এসেচে, সঙ্গে সঙ্গে জিব বেরিয়ে পড়ল চাষীদের। এতকাল পরে আজ হঠাৎ তাঁদের নজর পড়েচে আমাদের ফসলহীন দুর্ভাগ্যের প্রতি। কমিশন বসেচে, তার রিপোর্টও বেরবে। দরিদ্রের চাকাভাঙা মনোরথ রিপোর্টের টানে ন'ড়ে উঠ্বে কিনা জানিনে, কিন্তু রাস্তা বানাবার কাজে যে-সব রাজমজুর লাগ্বে মজুরী মিলতে তাদের অসুবিধে হবে না। মোট কথা, ওলন্দাজরা এখানে কৃষিক্ষেত্রে খুব ওস্তাদি দেখিয়েচে, তাতে এখানকার লোকের অন্নের সংস্থান হয়েচে, কর্তৃপক্ষেরও ব্যবসা চলেচে ভাল। এর মধ্যে তত্ত্বটা হচ্চে এই যে, দেশের প্রতি প্রেম জানাবার জন্যে দেশের জিনিষ ব্যবহার করব এটা ভাল কথা, কিন্তু দেশের প্রতি প্রেম জানাবার জন্যে দেশের জিনিষ উৎপাদনের শক্তি বাড়াতে হবে এটা হ'ল পাকা কথা। এইখানে বিদ্যার দরকার, সেই বিদ্যা বিদেশ থেকে এলেও তাকে গ্রহণ করলে আমাদের জাত যাবে না, পরন্তু জান রক্ষা হবে।

সুরবায়াতে তিন দিন আমরা যাঁর বাড়ীতে অতিথি ছিলেম, তিনি সুরকর্ত্তার রাজবংশের একজন প্রধান ব্যক্তি, কিন্তু তিনি আপন অধিকার ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ ক'রে এই সহরে এসে বাণিজ্য করচেন। চিনি রপ্তানির কারবার; তাতে তাঁর প্রভূত মুনফা। মানুষটি প্রাচীন অভিজাতকুলযোগ্য মর্য্যাদা ও সৌজন্যের অবতার। তাঁর ছেলে আধুনিক কালের শিক্ষা পেয়েচেন; বিনীত, নম্র,

প্রিয়দর্শন,—তাঁরই উপরে আমাদের অতিথি-পরিচর্য্যার ভার। বড় ভয় ছিল পাছে অবিশ্রাম অভ্যর্থনার পীড়নে আরাম-অবকাশ সম্পূর্ণ নষ্ট হ'য়ে যায়। কিন্তু সেই অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছিলেম। তাঁদের প্রাসাদের এক অংশ সম্পূর্ণ আমাদের ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিরালায় ছিলেম, ত্রুটিবিহীন আতিথ্যের পনেরো আনা অংশ ছিল নেপথ্যে। কেবল আহারের সময়েই আমাদের পরস্পারের দেখাসাক্ষাৎ। মনে হ'ত আমিই গৃহকর্ত্তা, তাঁরা উপলক্ষ্য মাত্র। সমাদরের অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় জিনিষ ছিল স্বাধীনতা ও অবকাশ।

এখানে একটি কলা-সভা আছে। সেটা মুখ্যত য়ুরোপীয়। এখানকার সওদাগরদের ক্লাবের মতো। কলকাতার যেমন সঙ্গীতসভা এও তেমনি। কলকাতার সভায় সঙ্গীতের অধিকার যতখানি এখানে কলাবিদ্যার অধিকার তার চেয়ে বেশি নয়। এইখানে আর্ট সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে আমার প্রতি অনুরোধ ছিল; যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলেছি। একদিন আমাদের গৃহকর্ত্তার বাড়ীতে অনেকগুলি এদেশীয় প্রধান ব্যক্তিদের সমাগম হয়েছিল। সেদিন সন্ধ্যা বেলায় তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছিল আমার কাজ। সুনীতিও একদিন তাঁদের সভায় বক্তৃতা ক'রে এসেচেন, সকলের ভাল লেগেচে।

এখানকার ভারতীয়েরাও একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাকে অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে এখানকার রাজপুরুষ ও অন্য অনেককে নিমন্ত্রণ ক'রে চা খাইয়েছিলেন। সেদিন আমি কিছু দক্ষিণাও পেয়েচি। এইভাবে এখানে কেটে গেল, একেবারে এঁদের বাড়ীর ভিতরেই। আঙিনায় অনেকগুলি গাছ ও লতাবিতান। আমগাছ, সপেটা, আতা। যে জাতের আম তাকে এরা বলে মধু, এদের মতে বিশেষভাবে স্বাদু। এবার যথেষ্ট বৃষ্টি হয়নি ব'লে আমগুলো কাঁচা অবস্থাতেই ঝ'রে ঝ'রে প'ড়ে যাচ্চে। এখানে ভোজনকালে যে আম খেতে পেয়েচি, দেশে থাকলে সে আম কেনার পয়সাকে অপব্যয় আর কেটে খাওয়ার পরিশ্রমটাকে বৃথা ক্লান্তিকর ব'লে স্থির করতুম, কিন্তু এখানে তার আদরের ত্রুটি হয়নি।

এই আঙিনায় লতামণ্ডপের ছায়ায় আমাদের গৃহকর্ত্রী প্রায়ই বেলা কাটান। চারিদিকে শিশুরা গোলমাল করচে, খেলা করচে—সঙ্গে তাদের বুড়ী ধাত্রীরা। মেয়েরা যেখানে সেখানে ব'সে কাপড়ের উপর এদেশে প্রচলিত সুন্দর বাতির ছাপদেওয়া কাজে নিযুক্ত। গৃহকর্ম্মের নানা প্রবাহ এই ছায়াস্নিগ্ধ নিভৃত প্রাঙ্গনের চারিদিকে আবর্ত্তিত।

পরশু সুরবায়া থেকে দীর্ঘ রেলপথ ও রৌদ্রতাপক্লিষ্ট অপরাহ্ণের দু'টি ঘণ্টা কাটিয়ে তিনটের সময় সুরকর্ত্তায় পৌঁচেছি। জাভার সবচেয়ে বড় রাজ পরিবারের এইখানেই অবস্থান। ওলন্দাজেরা এঁদের রাজপ্রতাপ কেড়ে নিয়েচে কিন্তু প্রতিপত্তি কাড়তে পারেনি। এই বংশেরই একটি পরিবারের বাড়ীতে আছি তাঁদের উপাধি মঙ্কুনগরো, এঁদেরই এক শাখা সুরবায়ায় আশ্রয় নিয়েচে।

প্রাসাদের একটি নিভৃত অংশ আমরাই অধিকার ক'রে আছি। এখানে স্থান প্রচুর, আরামের উপকরণ যথেষ্ট, আতিথ্যের উপদ্রব নেই। রাজবাড়ী বহুবিস্তীর্ণ বহুবিভক্ত। আমরা যেখানে আছি তার প্রকাণ্ড একটি অলিন্দ, সাদা মার্ব্বল পাথরে বাঁধানো, সারি সারি কাঠের থামের উপরে ঢালু কাঠের ছাদ। এই রাজপরিবারের বর্ণ-লাঞ্ছন হচ্চে সবুজ ও হলদে, তাই এই অলিন্দের থাম ও ছাদ সবুজে সোনালিতে বিচিত্র। অলিন্দের একধারে গামেলান সঙ্গীতের যন্ত্র সাজানো। বৈচিত্র্যেও কম নয়, সংখ্যাতেও অনেক। সাতসুরের ও পাঁচসুরের ধাতুফলকের যন্ত্র অনেক রকমের, অনেক আয়তনের হাতুড়ি দিয়ে বাজাতে হয়। ঢোলের আকার ঠিক আমাদের দেশেরই মতো, বাজাবার বোল ও কায়দা অনেকটা সেই ধরণের। এ ছাড়া বাঁশি আর ধনু দিয়ে বাজাবার তাঁতের যন্ত্র।

রাজা ষ্টেশনে গিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে এনেছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় একত্র আহারের সময় তাঁর সঙ্গে ভা'ল ক'রে আলাপ হ'ল। অল্প বয়স, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল মুখশ্রী। ডাচ্ ভাষায় আধুনিক কালের শিক্ষা পেয়েচেন, ইংরেজি অল্প অল্প বলতে ও বুঝতে পারেন। খেতে বসবার আগে বারান্দার প্রান্তে বাজনা বেজে উঠ্‌ল, সেই সঙ্গে এখানকার গানও শোনা গেল। সে গানে আমাদের মতো

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আস্থায়ী অন্তরার বিভাগ নেই। একই ধুয়ো বারবার আবৃত্তি করা হয়, বৈচিত্র্য যা-কিছু তা যন্ত্র বাজনায়। পূর্ব্বের চিঠিতেই বলেচি, এদের যন্ত্র বাজনাটা তাল দেবার উদ্দেশ্যে। আমাদের দেশে বাঁয়া তবলা প্রভৃতি তালের যন্ত্র যে সপ্তকে গান ধরা হয় তারই সা সুরে বাঁধা, এখানকার তালের যন্ত্রে গানের সব সুরগুলিই আছে। মনে করো, "তুমি যেয়োনা এখনি, এখনো আছে রজনী" ভৈরবীর এই একছত্র মাত্র কেউ যদি ফিরে ফিরে গাইতে থাকে আর নানাবিধ যন্ত্রে ভৈরবীর সুরেই যদি তালের বোল দেওয়া হয়, আর সেই বোল-যোগেই যদি ভৈরবী রাগিণীর ব্যাখ্যা চলে তাহলে যেমন হয় এও সেই রকম। পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লে দেখা যাবে শুন্‌তে ভালোই লাগে, নানা আওয়াজের ধাতুবাদ্যে সুরের নৃত্যে আসর খুব জ'মে ওঠে।

খেয়ে এসে আবার আমরা বারান্দায় বস্‌লুম। নাচের তালে দুটি অল্প বয়সের মেয়ে এসে মেজের উপর পাশাপাশি বস্‌ল। বড়ো সুন্দর ছবি। সাজে সজ্জায় চমৎকার সুছন্দ। সোনায়-খচিত মুকুট মাথায়, গলায় সোনার হারে অর্দ্ধ চন্দ্রাকার হাঁসুলি, মণিবন্ধে সোনার সর্প-কুণ্ডলী বালা, বাহুতে একরকম সোনার বাজুবন্দ, তাকে এরা বলে কীলক-বাহু। কাঁধ ও দুই বাহু অনাবৃত, বুক থেকে কোমর পর্য্যন্ত সোনায় সবুজে মেলানো আঁটকাঁচুলি; কোমরবন্দ থেকে দুই ধারায় বস্ত্রাঞ্চল কোঁচার মতো সাম্‌নে দুলচে। কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত শাড়ির মতোই বস্ত্র-বেষ্টনী, সুন্দর বর্ত্তিকশিল্পে বিচিত্র; দেখবা মাত্রই মনে হয় অজন্তার ছবিটি। এমনতর বাহুল্যবর্জ্জিত সুপরিচ্ছন্নতায় সামঞ্জস্য আমি কখনো দেখিনি। আমাদের নর্ত্তকী বাইজি-দের আঁটপায়জামার উপর অত্যন্ত জবড়জঙ্গ কাপড়ের অসৌষ্ঠবতা চিরদিন আমাকে ভারি কুশ্রী লেগেচে। তাদের প্রচুর গয়না ঘাগরা ওড়না ও অত্যন্ত ভারি দেহে মিলিয়ে প্রথমেই মনে হয় একটা সাজানো মস্ত বোঝা। তারপরে মাঝে মাঝে বাটা থেকে পান খাওয়া, অনুবর্ত্তীদের সঙ্গে কথা কওয়া, ভুরু ও চোখের নানাপ্রকার ভঙ্গিমা ধিক্কার-জনক ব'লে বোধ হয়, নীতির দিকে থেকে নয়, রীতির দিক থেকে। জাপানে ও জাভাতে যে নাচ দেখলুম তার সৌন্দর্য্য যেমন তার শালীনতাও তেম্‌নি নিখুঁৎ। আমরা দেখ্‌লুম এই দুটি বালিকার তনু দেহকে সম্পূর্ণ অধিকার ক'রে অশরীরী নাচেরই আবির্ভাব। বাক্যকে অধিকার করেচে কাব্য, বচনকে পেয়ে বসেচে বচনাতীত।

শুনেচি অনেক য়ুরোপীয় দর্শক এই নাচের অতিমৃদুতা ও সৌকুমার্য্য ভালোই বাসে না। তারা উগ্র মাদকতায় অভ্যস্ত ব'লে এই নাচকে একঘেয়ে মনে করে। আমি তো এ নাচে বৈচিত্র্যের একটু অভাব দেখ্‌লুম না, সেটা অতি প্রকট নয় ব'লেই যদি চোখে না পড়ে তবে চোখেরই অভ্যাস-দোষ। কেবলি আমার এই মনে হচ্ছিল যে এ হচ্ছে কলা-সৌন্দর্য্যের একটি পরিপূর্ণ সৃষ্টি, উপাদানরূপে মানুষদুটি তার মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেচে। নাচ হ'য়ে গেলে এরা যখন বাজিয়েদের মধ্যে এসে বসল, তখন তারা নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তখন দেখ্‌তে পাওয়া যায় তারা গায়ে রং করেচে, কপালে চিত্র করেচে, শরীরের সমস্ত অতি-স্ফূর্ত্তিকে নিরস্ত ক'রে দিয়ে একটি নিবিড় সৌষ্ঠব প্রকাশের জন্যে অত্যন্ত আঁট ক'রে কাপড় পরেচে, সাধারণ মানুষের পক্ষে এ সমস্তই অসঙ্গত, এতে চোখকে পীড়া দেয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের এই রূপান্তর নৃত্যকলায় অপরূপ হ'য়ে ওঠে।

পরদিন সকালে আমরা প্রাসাদের অন্যান্য বিভাগে ও অন্তঃপুরে আহূত হয়েছিলুম। সেখানে স্তম্ভশ্রেণী-বিধৃত অতি বৃহৎ একটি সভামণ্ডপ দেখা গেল, তার প্রকাণ্ড ব্যাপ্তি অথচ সুপরিমিত বাস্তুকলার সৌন্দর্য্য দেখে ভারি আনন্দ পেলুম। এ সমস্ত উপযুক্ত বিবরণ তোমরা নিশ্চয় সুরে-ন্দ্রের চিঠি ও চিত্র থেকে পাবে। অন্তঃপুরে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি মণ্ডপে গিয়ে দেখি সেখানে আমাদের গৃহকর্ত্তা ও গৃহস্বামিনী ব'সে আছেন। রাণীকে ঠিক যেন একজন সুন্দরী বাঙালী মেয়ের মতো দেখ্‌তে,—বড়ো বড়ো চোখ, স্নিগ্ধ হাসি, সংযত সৌমত্যের মর্য্যাদা ভারি তৃপ্তিকর। মণ্ডপের বাইরে গাছপালা, আর নানারকম খাঁচায় নানা পাখী। মণ্ডপের ভিতরে গান বাজনার, ছায়াভিনয়ের, মুখোষের অভিনয়ের, পুতুল নাচের নানা সরঞ্জাম। একটা টেবিলে বার্ত্তিক শিল্পের অনেকগুলি কাপড় সাজানো। তার মধ্যে

থেকে আমাকে তিনটি কাপড় পছন্দ ক'রে নিতে অনুরোধ করলেন। সেই সঙ্গে আমার দলের প্রত্যেককে একটি একটি ক'রে এই মূল্যবান কাপড় দান করলেন। কাপড়ের উপর এই রকম শিল্পকাজ করতে দু-তিন মাস ক'রে লাগে। রাজবাড়ির পরিচারিকারাই এই কাজে সুনিপুণ।

এই রাজবংশীয়দের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পরিবারের যাঁরা, কাল রাত্রে তাঁদের ওখানে নিমন্ত্রণ ছিল। তাঁর ওখানে রাজ-কায়দার যত রকমের উপসর্গ। যেমন দুই সারস পাখী পরস্পরকে ঘিরে ঘিরে নানা গম্ভীর ভঙ্গীতে নাচে দেখেছি, এখানকার রেসিডেন্ট আর এই রাজা পরস্পরকে নিয়ে সেই রকম রাজকীয় চাল বিস্তার করতে লাগলেন। রাজা কিম্বা রাজপুরুষদের একটা পদোচিত মর্য্যাদা বাইরের দিক থেকে রক্ষা ক'রে চল্‌তে হয় মানি, তাতে সেই সব মানুষের সামান্যতা কিছু ঢাকাও পড়ে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করলে তাতে তাদের সাধারণতাকেই হাস্যকরভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়।

কাল রাত্রে যে নাচ হোলো সে ন'জন মেয়েতে মিলে। তাতে যেমন নৈপুণ্য তেমনি সৌন্দর্য্য, কিন্তু দেখে মনে হ'ল কাল রাত্রের সেই নাচে স্বত-উচ্ছ্বসিত প্রাণের উৎসাহ ছিল না—যেন এরা ক্লান্ত, কেবল অভ্যাসের জোরে নেচে যাচ্চে। কালকের নাচে গুণপনা যথেষ্ট ছিল কিন্তু তেমন ক'রে মনকে স্পর্শ করতে পারে নি। রাজার একটি ছেলে পাশে ব'সে আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন, তাঁকে আমার বড়ো ভালো লাগল। অল্প বয়স, দুই বছর হলাণ্ডে শিক্ষা পেয়েচেন, ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের সৈনিক বিভাগে প্রধান পদে নিযুক্ত। তাঁর চেহারায় ও ব্যবহারে স্বাভাবিক আকর্ষণী-শক্তি আছে।

কাল রাত্রে আমাদের এখানেও একটা নাচ হ'য়ে গেল। পূর্ব্বরাত্রে যে দুইজন বালিকা নেচেছিল তাদের মধ্যে এক-জন আজ পুরুষ সঙের মুখোষ প'রে সঙের নাচ নাচলে। আশ্চর্য্য ব্যাপারটা হচ্চে এর মধ্যে নাচের শ্রী সম্পূর্ণ রক্ষা ক'রেও ভাবে ভঙ্গীতে গলার আওয়াজে পুরোমাত্রায় বিদূষকতা ক'রে গেল। পুরুষের মুখোষের সঙ্গে তার অভিনয়ের কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য হোলো না। বেশভূষার সৌন্দর্য্যেও একটুমাত্র ব্যত্যয় হয়নি। নাচের শোভনতাকে বিকৃত না ক'রেও যে তার মধ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের রস এমন ক'রে আনা যেতে পারে এ আমার কাছে আশ্চর্য্য ঠেকল। এরা প্রধানত নাচের ভিতর দিয়েই সমস্ত হৃদয়ভাব ব্যক্ত করতে চায় সুতরাং বিদ্রূপের মধ্যেও এরা ছন্দ রাখ্‌তে বাধ্য। এরা বিদ্রূপকেও বিরূপ করতে পারে না—এদের রাক্ষসেরাও নাচে। ইতি ১৪ সেপ্‌টেম্বর ১৯২৭।

৯

কল্যাণীয়াসু—

বৌমা, শেষ চিঠিতে তোমাকে এখানকার নাচের কথা লিখেছিলুম, ভেবেছিলুম নাচ সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হ'য়ে গেল। এমন সময় সেই রাত্রে আর এক নাচের বৈঠকে ডাক পড়্‌ল। সেই অতিপ্রকাণ্ড মণ্ডপে আসর; বহুবিস্তীর্ণ শ্বেত পাথরের ভিত্তিতলে বিদ্যুদ্দীপের আলো ঝলমল করচে। আহারে বসবার আগে নাচের একটা পালা আরম্ভ হ'ল। পুরুষের নাচ, বিষয়টা হচ্চে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে হনুমানের লড়াই। এখানকার রাজার ভাই ইন্দ্রজিত সেজেছেন; ইনি নৃত্যবিদ্যায় ওস্তাদ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় ইনি নাচ শিখ্‌তে আরম্ভ করেচেন। অল্প বয়সে সমস্ত শরীরটা যখন নম্র থাকে, হাড় যখন পাকেনি সেই সময়ে এই নাচ শিক্ষা করা দরকার; দেহের প্রত্যেক গ্রন্থি যাতে অতি সহজে সরে, প্রত্যেক মাংসপেশিতে যাতে অনায়াসে জোর পৌঁছায় এমন অভ্যাস করা চাই। কিন্তু নাচ সম্বন্ধে রাজার ভাইএর স্বাভাবিক প্রতিভা থাকাতে তাঁকে বেশী চেষ্টা করতে হয়নি।

হনুমান বনের জন্তু, ইন্দ্রজিত সুশিক্ষিত রাক্ষস, দুই জনের নাচের ভঙ্গীতে সেই ভাবের পার্থক্যটি বুঝিয়ে দেওয়া চাই; নইলে রসভঙ্গ হয়। প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সে হচ্চে এদের সাজ। সাধারণত আমাদের যাত্রার নাটকে হনুমানের হনুমানত্ব খুব বেশী ক'রে ফুটিয়ে তুলে দর্শকদের কৌতুক উদ্রেক করবার চেষ্টা হয়। এখানে হনুমানের আভাসটুকু দেওয়াতে তার মনুষ্যত্ব আরো বেশী উজ্জ্বল হয়েচে। হনুমানের নাচে লম্ফ ঝম্ফ দ্বারা তার বানর স্বভাব প্রকাশ করা কিছুই কঠিন হ'ত না, আর সেই

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপায়ে সমস্ত সভা অনায়াসেই অট্টহাস্তে মুখরিত হ'য়ে উঠত, কিন্তু কঠিন কাজ হচ্ছে হনুমানকে মহত্ত্ব দেওয়া। বাংলা দেশের অভিনয় প্রভৃতি দেখ্‌লে বোঝা যায় যে হনুমানের বীরত্ব, তার একনিষ্ঠ ভক্তি ও আত্মত্যাগের চেয়ে তার ল্যাজের দৈর্ঘ্য, তার পোড়ামুখের ভঙ্গিমা, তার বানরত্বই বাঙালীর মনকে বেশি ক'রে অধিকার করেচে। আমাদের পশ্চিমাঞ্চলে তার উল্টো। এমন কি হনুমানপ্রসাদ নাম রাখতে বাপ মায়ের দ্বিধা বোধ হয় না। বাংলায় হনুমান চন্দ্র বা হনুমানেন্দ্র আমরা কল্পনা কর্‌তে পারিনে। এদেশের লোকেরাও রামায়ণের হনুমানের বড়ো দিকটাই দেখে। নাচে হনুমানের রূপ দেখ্‌লুম—পিঠ বেয়ে মাথা পর্য্যন্ত ল্যাজ, কিন্তু এমন একটা শোভন ভঙ্গী যে দেখে হাসি পাবার জো নেই। আর সমস্তই মানুষের মতো। মুকুট থেকে পা পর্য্যন্ত ইন্দ্রজিতের সাজ সজ্জা একটি সুন্দর ছবি। তার পরে দুই জনে নাচ্‌তে নাচ্‌তে লড়াই,—সঙ্গে সঙ্গে ঢাকে ঢোলে কাঁসরে ঘণ্টায় নানাবিধ যন্ত্রে ও মাঝে মাঝে বহু মানুষের কণ্ঠের গর্জ্জনে সঙ্গীত খুব গম্ভীর প্রবল ও প্রমত্ত হ'য়ে উঠ্‌চে। অথচ সে সঙ্গীত শ্রুতিকটু একটুও নয়; বহুযন্ত্র সম্মিলনের সুশ্রাব্য নৈপুণ্য তার উদ্দামতার সঙ্গে চমৎকার সম্মিলিত।

নাচ সে বড়ো আশ্চর্য্য। তাতে যেমন পৌরুষ, সৌন্দর্য্যও তেমনি। লড়াইয়ের দ্বন্দ্ব-অভিনয়ে নাচের প্রকৃতি একটু মাত্র এলোমেলো হ'য়ে যায়নি। আমাদের দেশের ষ্টেজে রাজপুত বীরপুরুষের বীরত্ব যে-রকম নিতান্ত খেলো এ তা' একেবারেই নয়। প্রত্যেক ভঙ্গীতে ভারি একটা মর্য্যাদা আছে। গদাযুদ্ধ মল্লযুদ্ধ মুষলের আঘাত সমস্তই ক্রটিমাত্র-বিহীন নাচে ফুটে উঠেচে। সমস্তর মধ্যে অপূর্ব্ব একটি শ্রী অথচ দৃপ্ত পৌরুষের আলোড়ন। এর আগে এখানে মেয়েদের নাচ দেখেচি, দেখে মুগ্ধও হয়েচি, কিন্তু এই পুরুষের নাচের তুলনায় তাকে ক্ষীণ বোধ হ'ল। এর স্বাদ তার চেয়ে অনেক বেশী প্রবল। যখন রূপদের নেশায় পেয়ে বসে তখন টপ্পার নিছক মিষ্টতা হাল্কা বোধ হয়, এও সেই রকম।

আজ সকালে দশটার সময়ে আমাদের এখানেই গৃহকর্ত্তা আর-একটি নাচের ব্যবস্থা করেছিলেন। মেয়ে দুজনে পুরুষের ভূমিকা নিয়েছিল। অর্জ্জুন আর সুবলের যুদ্ধ। গল্পটা হয়তো মহাভারতে আছে কিন্তু আমার তো মনে পড়ল না। ব্যাপারটা হচ্চে কোন্ এক বাগানে অর্জ্জুনের অস্ত্র ছিল, সেই অস্ত্র চুরি করেচে সুবল, সে খুঁজে বেড়াচ্চে অর্জ্জুনকে মারবার জন্যে। অর্জ্জুন ছিল বাগানের মালী-বেশে। খানিকটা কথাবার্ত্তার পরে দুজনের লড়াই। সুবলের কাছে বলরামের লাঙল অস্ত্রটা ছিল। যুদ্ধ করতে করতে অর্জ্জুন সেটা কেড়ে নিয়ে তবে সুবলকে মার্‌তে পারলে।

নটীরা যে মেয়ে সেটা বুঝতে কিছুই বাধে না, অতিরিক্ত যত্নে সেটা লুকোবার চেষ্টাও করেনি। তার কারণ, যারা নাচ্‌চে তারা মেয়ে কি পুরুষ সেটা গৌণ, নাচটা কি সেই-টেই দেখবার বিষয়। দেহটা মেয়ের কিন্তু লড়াইটা পুরুষের, এর মধ্যে একটা বিরুদ্ধতা আছে ব'লেই এই অদ্ভুত সমাবেশে বিষয়টা আরো যেন তীব্র হ'য়ে ওঠে। কমনীয়তার আধারে বীর-রসের উচ্ছলতা। মনে কর,—বাঘ নয়, সিংহ নয়, জবা-ফুলে ধুৎরা ফুলে সাংঘাতিক হানাহানি, ডাঁটায় ডাঁটায় সংঘর্ষ, পাপড়িগুলি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন; এদিকে বনসভা কাঁপিয়ে বৈশাখী ঝড়ের গামেলান বাজচে, গুরু গুরু মেঘের মৃদঙ্গ, গাছের ডালে ডালে ঠকাঠকি, আর সোঁ সোঁ শব্দে বাতাসের বাঁশি।

সব শেষে এলেন রাজার ভাই। এবার তিনি একলা নাচ্‌লেন। তিনি ঘটোৎকচ। হাস্যরসিক বাঙালী হয়তো ঘটোৎকচকে নিয়ে বরাবর হাসাহাসি ক'রে এসেচে। এখান-কার লোকচিত্তে ঘটোৎকচের খুব আদর। সেইজন্যেই মহাভারতের গল্প এদের হাতে আরও অনেকখানি বেড়ে গেল। এরা ঘটোৎকচের সঙ্গে ভার্গিবা (ভার্গবী) ব'লে এক মেয়ের ঘটালে বিয়ে। সে মেয়েটি আবার অর্জ্জুনের কন্যা। বিবাহ সম্বন্ধে এদের প্রথা য়ুরোপের কাছাকাছি যায়। খুড়তত জাঠতত ভাইবোনে বাধা নেই। ভার্গিবার গর্ভে ঘটোৎকচের একটি ছেলেও আছে, তার নাম শশিকিরণ। যা হোক আজকের নাচের বিষয়টা হচ্ছে প্রিয়তমাকে স্মরণ ক'রে বিরহী ঘটোৎকচের ঔৎসুক্য। এমন কি মাঝে মাঝে

মূর্চ্ছার ভাবে সে মাটিতে ব'সে পড়চে, কল্পনায় আকাশে তার ছবি দেখে সে ব্যাকুল। অবশেষে আর থাকতে না পেরে প্রেয়সীকে খুঁজতে সে উড়ে চ'লে গেল। এর মধ্যে একটি ভাববার জিনিষ আছে। য়ুরোপীয় শিল্পীর এঞ্জেলদের মতো এরা ঘটোৎকচের পিঠে নকল পাখা বসিয়ে দেয়নি। চাদরখানা নিয়ে নাচের ভঙ্গীতে ওড়ার ভাব দেখিয়েচে। এর থেকে মনে পড়ে গেল শকুন্তলা নাটকে কবির নির্দ্দেশ-বাক্য "রথবেগং নাটয়তি", বোঝা যাচ্চে রথবেগটা নাচের দ্বারাই প্রকাশ হ'ত, রথের দ্বারা নয়।

রামায়ণের মহাভারতের গল্প এদেশের মনকে জীবনকে যে কিরকম গভীরভাবে অধিকার করেচে তা এই কদিনেই স্পষ্ট বোঝা গেল। ভূগোলের বইয়ে পড়া গেছে বিদেশ থেকে অনুকূল ক্ষেত্রে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের নতুন আমদানি হবার অনতিকাল পরেই দেখ্‌তে দেখ্‌তে তারা সমস্ত দেশকে ছেয়ে ফেলেছে; এমন কি যেখান থেকে তাদের আনা হয়েছে সেখানেও তাদের এমন অপরিমিত প্রভাব নেই। রামায়ণ মহাভারতের গল্প এদের চিত্তক্ষেত্রে তেমনি ক'রে এসে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেচে। চিত্তের এমন প্রবল উদ্বোধন কলারচনায় নিজেকে প্রকাশ না ক'রে থাকতে পারে না। সেই প্রকাশের অপর্য্যাপ্ত আনন্দ দেখা দিয়েছিল বরোবুদরের মূর্ত্তি কল্পনায়। আজ এখানকার মেয়েপুরুষ নিজেদের দেহের মধ্যেই যেন মহাকাব্যের পাত্রদের চরিত-কথাকে নৃত্যমূর্ত্তিতে প্রকাশ করচে, ছন্দে ছন্দে এদের রক্ত-প্রবাহে সেই সকল কাহিনী ভাবের বেগে আন্দোলিত।

এছাড়া কত রকম-বেরকমের অভিনয়, তার অধিকাংশই এই সকল বিষয় নিয়ে। বাইরের দিকে ভারতবর্ষের থেকে এরা বহু শতাব্দী সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন; তবু এতকাল এই রামায়ণ মহাভারত নিবিড়ভাবে ভারতবর্ষের মধ্যেই এদের রক্ষা ক'রে এসেচে। ওলন্দাজরা এই দ্বীপগুলিকে বলে ডাচ্ ইণ্ডীস্, বস্তুত এদের বলা যেতে পারে ব্যাস ইণ্ডীস্।

পূর্ব্বেই বলেচি এরা ঘটোৎকচের ছেলের নাম রেখেচে শশিকিরণ। সংস্কৃত ভাষা থেকে নাম রচনা এদের আজও চলেচে। মাঝে মাঝে নামকরণ অদ্ভুত রকম হয়। এখানকার রাজবৈদ্যের উপাধি ক্রীড়-নির্ম্মল। আমরা যাকে নিরাময় বা নীরোগ ব'লে থাকি এরা নির্ম্মল শব্দকে সেই অর্থ দিয়েচে। এদিকে ক্রীড় শব্দ আমাদের অভিধানে খেলা, কিন্তু ক্রীড় বলতে এখানে বোঝাচ্চে উদ্যোগ। রোগ দূর করাতেই যার উদ্যোগ সেই হ'ল ক্রীড়-নির্ম্মল। ফসলের ক্ষেতে যে সেঁচ দেওয়া হয় তাকে এরা বলে সিন্ধু-অমৃত। এখানে জল অর্থেই সিন্ধু কথার ব্যবহার, ক্ষেত্রকে যে জল-সেচ মৃত্যু থেকে বাঁচায় সেই হ'ল সিন্ধু-অমৃত। আমাদের গৃহস্বামীর একটি ছেলের নাম সরোষ আর একটির নাম সন্তোষ। বলা বাহুল্য সরোষ বলতে এখানে রাগী মেজাজের লোক বোঝায় না, বুঝ্‌তে হবে সতেজ। রাজার মেয়ের নাম কুসুমবর্দ্ধিনী। অনন্তকুসুম, জাতিকুসুম, কুসুমায়ুধ, কুসুমব্রত এমন সব নামও শোনা যায়। এদের নামে যেমন বিশুদ্ধ ও সুগম্ভীর সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার এমনতর আমাদের দেশে দেখা যায় না। যেমন আত্মসুবিজ্ঞ, শাস্ত্রাত্ম, বীর-পুস্তক, বীর্য্যসুশাস্ত্র, সহস্র-প্রবীর, বীর্য্যসুব্রত, পদ্মসুশাস্ত্র, কৃতাধিরাজ, সহস্রসুগন্ধ, পূর্ণপ্রণত, যশোবিদগ্ধ, চক্রাধিরাজ, মৃতসঞ্জয়, আর্য্যসুতীর্থ, কৃতস্মর, চক্রাধিব্রত, সূর্য্যপ্রণত, কৃতবিভব।

সেদিন যে-রাজার বাড়ীতে গিয়েছিলেম তাঁর নাম সুসুহুনন পাকু-ভুবন। তাঁরি এক ছেলের বাড়িতে কাল আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল, তাঁর নাম অভিমন্যু। এঁদের সকলেরই সৌজন্য স্বাভাবিক, নম্রতা সুন্দর। সেখানে মহাভারতের বিরাট পর্ব্ব থেকে ছায়াভিনয়ের পালা চলছিল। ছায়াভিনয় এদেশ ছাড়া আর কোথাও দেখিনি, অতএব বুঝিয়ে বলা দরকার। একটা সাদা কাপড়ের পট টাঙানো, তার সামনে একটা মস্ত প্রদীপ উজ্জ্বল শিখা নিয়ে জ্বলচে, তার দুই ধারে পাতলা চামড়ায় আঁকা মহাভারতের নানা চরিত্রের ছবি সাজানো, তাদের হাতপাগুলো দড়ির টানে নড়ানো যায় এমনভাবে গাঁথা। এই ছবিগুলি এক একটা লম্বা কাঠিতে বাঁধা। একজন সুর ক'রে গল্পটা আউড়ে যায়, আর সেই গল্প অনুসারে ছবিগুলিকে পটের উপরে নানা ভঙ্গীতে নাড়াতে দোলাতে চালাতে থাকে। ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গামেলান বাজে। এ যেন মহাভারত শিক্ষার একটা ক্লাসে পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ছবির অভিনয় যোগে বিষয়টা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনে মুদ্রিত ক'রে দেওয়া। মনে কর এমনি ক'রে যদি স্কুলে ইতিহাস শেখানো যায়,—মাষ্টার মশায় গল্পটা ব'লে যান আর একজন পুতুল-খেলাওয়ালা প্রধান প্রধান ব্যাপার-গুলো পুতুলের অভিনয় দিয়ে দেখিয়ে যেতে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভাব অনুসারে নানা সুরে তালে বাজনা বাজে, ইতিহাস শেখবার এমন সুন্দর উপায় কি আর হ'তে পারে?

মানুষের জীবন বিপদ-সম্পদ-সুখ-দুঃখের আবেগে নানা প্রকার রূপে ধ্বনিতে স্পর্শে লীলায়িত হ'য়ে চল্‌চে; তার সমস্তটা যদি কেবল ধ্বনিতে প্রকাশ করতে হয় তাহ'লে সে একটা বিচিত্র সঙ্গীত হ'য়ে ওঠে; তেমনি আর সমস্ত ছেড়ে দিয়ে সেটাকে কেবলমাত্র যদি গতি দিয়ে প্রকাশ করতে হয় তাহ'লে সেটা হয় নাচ। ছন্দোময় সুরই হোক্ আর নৃত্যই হোক তার একটা গতিবেগ আছে, সেই বেগ আমাদের চৈতন্যে রসচাঞ্চল্য সঞ্চার ক'রে তাকে প্রবলভাবে জাগিয়ে রাখে; কোন ব্যাপারকে নিবিড় ক'রে উপলব্ধি করাতে হ'লে আমাদের চৈতন্যকে এই রকম বেগবান ক'রে তুল্‌তে হয়। এই দেশের লোক ক্রমাগতই সুর ও নাচের সাহায্যে রামায়ণ মহাভারতের গল্পগুলিকে নিজের চৈতন্যের মধ্যে সর্ব্বদাই দোলায়িত ক'রে রেখেচে। এই কাহিনীগুলি রসের ঝরণা-ধারায় কেবলি এদের জীবনের উপর দিয়ে প্রবাহিত। রামায়ণ মহাভারতকে এমনি নানাবিধ প্রাণবান উপায়ে সর্ব্বতোভাবে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা। শিক্ষার বিষয়কে একান্ত ক'রে গ্রহণ ও ধারণ করবার প্রকৃষ্ট প্রণালী কি তা যেন সমস্ত দেশের লোকে মিলে উদ্ভাবন করেচে,—রামায়ণ মহাভারতকে গভীর ক'রে পাবার আগ্রহে ও আনন্দেই এই উদ্ভাবনা স্বাভাবিক হ'ল।

কাল যে ছবির অভিনয় দেখা গেল তাও প্রধানতই নাচ, অর্থাৎ ছন্দোময় গতির ভাষা দিয়ে গল্প বলা। এর থেকে একটা কথা বোঝা যাবে, এদেশে নাচের মনোহারিতা ভোগ করবার জন্যেই নাচ নয়; নাচটা এদের ভাষা। এদের পুরাণ ইতিহাস নাচের ভাষাতেই কথা কইতে থাকে। এদের গামেলানের সঙ্গীতটাও সুরের নাচ। কখনো দ্রুত কখনো বিলম্বিত, কখনো প্রবল কখনো মৃদু, এই সঙ্গীতটাও সঙ্গীতের জন্যে নয়, কোনো একটা কাহিনীকে নৃত্যচ্ছন্দের অনুষঙ্গ দেবার জন্যে।

দীপালোকিত সভায় এসে যখন প্রথম বস্‌লুম তখন ব্যাপারখানা দেখে কিছুই বুঝ্‌তে পারা গেল না। বিরক্তি বোধ হ'তে লাগল। খানিক বাদে আমাকে পটের পশ্চাৎ ভাগে নিয়ে গেল। সেদিকে আলো নেই, সেই অন্ধকার ঘরে মেয়েরা ব'সে দেখ্‌চে। এদিকটাতে ছবিগুলি অদৃশ্য, ছবিগুলিকে যে মানুষ নাচাচ্চে তাকেও দেখা যায় না, কেবল আলোকিত পটের উপর অন্য পিঠের ছবির ছায়াগুলি নেচে বেড়াচ্চে। যেন উত্তানশায়ী শিবের বুকের উপরে মহামায়ার নাচ। জ্যোতির্লোকে যে সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন তিনি যখন নিজের সৃষ্টিপটের আড়ালে নিজেকে গোপন রাখেন তখন আমরা সৃষ্টিকে দেখ্‌তে পাই। সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে সৃষ্টির অবিশ্রাম যোগ আছে ব'লে যে জানে সেই তাকে সত্য ব'লে জানে। সেই যোগ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখ্‌লে এই চঞ্চল ছায়াগুলোকে নিতান্তই মায়া ব'লে বোধ হয়। কোনো কোনো সাধক পটটাকে ছিঁড়ে ফেলে ওপারে গিয়ে দেখ্‌তে চায়,—অর্থাৎ সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিকর্ত্তাকে দেখবার চেষ্টা—কিন্তু তার মতো মায়া আর কিছুই হ'তে পারে না। ছায়ার খেলা দেখ্‌তে দেখ্‌তে এই কথাটাই কেবল আমার মনে হচ্ছিল।

আমি যখন চ'লে আসচি আমাদের নিমন্ত্রণকর্ত্তা আমাকে খুব একটি মূল্যবান উপহার দিলেন। বড়ো একটি বাটিক শিল্পের কাপড়। বল্‌লেন, এই রকমের বিশেষ কাপড় রাজবংশের ছেলেরা ছাড়া কেউ পরতে পায় না। সুতরাং এ জাতের কাপড় আমি কোথাও কিন্‌তে পেতুম না।

আমাদের এখানকার পালা আজ শেষ হ'ল। কাল যাব যোগ্যকর্ত্তায়। সেখানকার রাজবাড়িতেও নাচগান প্রভৃতির রীতি-পদ্ধতি বিশুদ্ধ প্রাচীনকালের, অথচ এখানকার সঙ্গে পার্থক্য আছে। যোগ্যকর্ত্তা থেকে বোরোবুদর কাছেই; মোটরে ঘণ্টাখানেকের পথ। আরো দিন পাঁচ ছয় লাগবে এই সমস্ত দেখে শুনে নিতে, তার পরে ছুটি। ইতি ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

(ক্রমশঃ)

তাজমহাল

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

দীর্ঘনিশাস জমাট বেঁধে উঠ্‌ল পাষাণ স্তূপ,
একটি ফোঁটা অশ্রু এ কি ধ'রলে নবরূপ !
মর্ম্মরেতে রচা এ নয়—পঞ্জরাস্থি দিয়ে,
সজীব এ যে রাজ্-বিরহীর বুকের রক্ত পিয়ে !

এ সব কথা কাব্যে লেখে ; ইতিহাসে লিখা—
আধ্‌মরা এ দেশের বুকে প্রলয়-বহ্নি-শিখা
জ্বাল্‌লে তুমি নিঠুর হাতে ;—জীবন ছিল যেথা
স্মৃতিসৌধ মৃতের তরে তুল্‌বে ব'লে সেথা।

কাহার স্মৃতি ? প্রিয়ার সে কি ? রাজমহিষীর নহে ?......
পরপারের মর্‌মী আমার অন্তরেতে কহে—
প্রিয়ার নহে, নয় মহিষীর—প্রেমের সমাধি এ—
স্মৃতির গর্ব্বে কবির সৃষ্টি আছে উজলিয়ে !

* * *

সেদিন ছিল রংমহালে দিল্‌কুশেরি খেলা,
খুশ্‌রোজেরি রজনীতে তরুণীদের মেলা,
যৌবনেরি পাত্র ছিল রূপের সুরায় ভরা,
সাকী ছিল নবীন সে যে নবীন ছিল ধরা।

সুপ্ত হিয়ায় ঘুম ভাঙ্গানো কোন্ অজানার হাওয়া
ওড়্‌না খুলে দেখালে কার্ দীপ্তচোখে চাওয়া !
চাঁদ্‌নি রাতে কাঁপন্ হাতের গোপন পরশন—
আসফ্‌জাদির টুট্‌লো সেদিন লজ্জা-আবরণ !

খুরম্ ছিল বাদ্‌শাজাদা, খুরম্ ছিল কবি—
সেই ক্ষণিকের দৃষ্টি তরে বিকিয়ে দিলে সবি
নিঃস্ব করি আপনারে ;—রাজ্য ভাঙ্গাগড়া
তক্তাউস্ ছিনিয়ে নিতে ছিলনাকো ত্বরা।

* * *

তাজমহাল্

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

শুষ্ক মালা প'ড়ল খ'সে—বাসর-নিশি গত—
প'ড়ল মনে রাজ্য-আশার লুপ্ত স্মৃতি যত ; ......
ভায়ের রক্তে পিছল্ হ'ল সিংহাসনের তল—
মদির-আঁখি নূরজাহানের জ্ব'ল্‌লো কোপানল ।

সর্ব্বনাশে বাঁচিয়েছিল মম্‌তাজেরি প্রেম—
রূপের রশ্মি অন্তরালে আগুন্-গলা হেম ;
দুর্দ্দিনেরি প্রিয়া তোমার—স্নিগ্ধ দিঠি দিয়ে
নিত্য পরাজয়ের গ্লানি দিত মুছাইয়ে ।

রূপের জালে নয়কো সেদিন স্নেহের ডোরে তারি
বন্দী তোমায় ক'রলে, হে বীর, কল্যাণী সে নারী—
অন্ধকারে, তাঁবুর ছায়ে. মরুর মাঝে, ভয়ে,
অশ্রু লেখায়, রক্ত ধারায়, নূতন পরিচয়ে !

* * *

মিট্‌লো যখন রাজ্য আশা—সদ্য অরুণ ভাতি
ভাগ্যাকাশে উঠ্‌লো ফুটে—প্রভাত হ'ল রাতি—
স্বপ্ন সম মিলিয়ে গেল নারীর আঁখিপাতে
জীবন-মরণ খেলার স্মৃতি পৌরুষেরি সাথে !

শান্তি আশে ছায়া-সাকীর পূর্ণ পাত্রখানি
শূন্য ক'রি রইলে ভুলে অমৃত সে মানি' ;—
তোমার মধ্যে কবি ছিল সৃষ্টি যাহার প্রাণে
প্রিয়া তারে ঘুম পাড়ালে ঘুম-পাড়ানি গানে !

বাসর-প্রদীপ নিব্‌লো জ্ব'লে ছয়টী বরষ ধ'রে—
শেষ-চাহনি মিলিয়ে গেল শেষ-বিদায়ের ভোরে ;
মিলন-সূর্য্য প'ড়্‌লো ঢ'লে হৃদ্-গগনে যেথা—
অনিশ্চিতের সন্ধি-পরশ রইলো জেগে সেথা !

* * *

সেই বিরহের তীব্র জ্বালা অগ্নিশিখা সম
সুখের নীড়ে মরণ-ভীরুর ঘুচিয়ে দিলে তম ;—
বার্-দুয়ারে প্রজার রক্তে রুদ্র উপচার,
রংমহালে সুরাহুতি—যজ্ঞ ব্যভিচার !

লোকে তোমায় ব'ল্‌লে নিঠুর, ব'ল্‌লে ব্যভিচারী—
কেইবা বোঝে—ঝঞ্ঝা মাঝেই রয় যে শান্তিবারি ;
স্রষ্টা সে যে বাঁধনহারা—এই দুনিয়ার মাঝে
সৃজন-খেলার অঙ্গনে কি মায়ার বেড়া সাজে !

কর-পিষ্ট প্রজার ব্যথা—নীরব আত্মদান ?
বদ্ধ প্রাণের মুক্তি তরে—তুচ্ছ বলিদান !......
প্রেমের অর্ঘ্যে শেষ আহুতি স্তব্ধ যজ্ঞভূমে—
কবির সৃষ্টি—তাজমহাল—উঠ্‌লো আকাশ চুমে !

কোজাগরী চাঁদ্‌নি রাতি—শুভ্র তাজমহাল
তন্দ্রালসা নারীর মতো বিছিয়ে কুহক জাল
কবির মুগ্ধ নয়ন পাতে—ব'ল্‌ছে কানে কানে—
ফিরে-পাওয়া সুরটা এ নয় সাকীর কণ্ঠগানে।

যক্ষ-প্রিয়ার আত্মা-বিহগ্ বন্দিনী নাই হেথা,
নয়কো ইহা রাজ্-বিরহীর রক্তে আঁকা ব্যথা ;
ফাগুন্-রাতে প্রিয়তমার মঞ্জু-মুখর বাণী
মর্ম্মরেতে আঁকা এ নয় অধর পরশ খানি !

নয়কো এ কোন্ স্বপ্ন-দেবীর উজল্ রূপের ছায়া,
শ্যাম্ যমুনার আয়না বুকে ইন্দ্রজালের মায়া—
হিয়ার মাঝে লুকিয়ে রাখা স্মৃতির অভিশাপ,
কাজল্ ঘেরা সজল চোখের ব্যর্থ অনুতাপ !

* * *

তাজমহাল

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

এ যেন এক ছিন্ন পাতা—সৃজন-কাব্য-খসা—
কুড়িয়ে পেলে রাজ্-কবি এক অখ্যাত অযশা—
কঠিন-বাঁধন চতুর্দ্দশীর ছন্দে রচা গান—
শিল্পী-হাতের তুলির ছোঁয়ায় মুক্তি-পাওয়া প্রাণ!

এ যেন এক বাল-বিধবার নিটোল তনুলতা,
জ্যোৎস্নাবাসে ঢাকা যেন মূর্ত্ত পবিত্রতা,
অধর কোনে নাইকো নারীর সুলভ ছলাকলা,
ভঙ্গীতে তার শুচির গর্ব্ব—নাই কলঙ্ক মলা!

এ যেন সেই আদিম প্রাতের অনাহত সুর
শূন্যে জাগি' সৃষ্টিরন্ধ্র ক'রলে পরিপূর,—
অনাদি সেই মন্ত্রে হেরি পূর্ণ দশদিশি
মর্ম্মরেতে জীবন দিলে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি!

*   *   *

ভাব্‌ছি ব'সে সরাইখানার মুক্ত বারান্দায়—
কেমন যেন ভুল হ'ল সব লক্ষ্মী-পূর্ণিমায়;
কার্ মিনতি ফুট্‌লো সেদিন বিদায়-আঁখির পাতে—
তাজমহালে মনে কোরো কোজাগরীর রাতে?

তুচ্ছ সে নয়, ভুল সে তো নয়, স্মৃতির পরিহাস—
প্রেমের চিতায় কেনই তবু করুণ দীর্ঘশ্বাস?
জীবন-পথে হৃদয় কেনা হৃদয় বিনিময়ে—
জীবন-পারের পথে কি তার স্মৃতির কাঁটা সহে?

সন্ন্যাসী সে মহাকবির অনাসক্ত মনে
তাজের স্বপ্ন জাগ্‌লো ধ্যানের নিবিড় শুভক্ষণে;—
বিরাট মহান্ সৃষ্টি তাহার ঊর্দ্ধে আছে চাহি—
তাজমহালের শুভ্র বুকে স্মৃতির লিখন নাহি!

———:o:———

ভানুসিংহের পত্রাবলী

৪২

একটা বিষয়ে আমার মনে বড় খট্‌কা লেগেচে, তুমি চিঠিতে লিখেচ আমি নিশ্চয়ই তোমার দিদির চেয়ে বেশি ইংরেজি জানি। এটা কি উচিৎ? তোমার জ্যেষ্ঠা সহোদরা, কলেজে পড়ে, তার ইংরেজি জ্ঞানের প্রতি এত বড় অবজ্ঞা প্রকাশ কি ভাল হয়েচে? সে যদি জান্‌তে পারে তাহ'লে তার মনে কত বড় আঘাত লাগবে একবার ভেবে দেখ দেখি। আমার চিঠি পেয়েই তার কাছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কোরো।

তার মতো আমি যদি ইংরেজিতে পরীক্ষা পাশ করতে পারতুম তাহলে কি এমন বেকার ব'সে থাকতুম? তাহলে অন্ততঃ পুলিশের দারোগাগিরি জোগাড় করতে পারতুম। চিরদিন স্কুল পালিয়ে কাটালুম, কুঁড়েমি ক'রেই এমন মানব-জন্মের সাতাশটা বছর * বৃথা নষ্ট করলুম—এইজন্যে পাছে আমার কুদৃষ্টিতে তোমাদের হঠাৎ বানান-ভুলে পেয়ে বসে তাইত সহর ছেড়ে তোমাদের কাছে থেকে দূরে দূরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। এবারকার মত যা হবার তা হ'ল, আর জন্মে ম্যাট্রিকুলেশন যদিবা না পারি ত অন্তত মাইনর ইস্কুলের ছাত্রবৃত্তি নিয়ে তবে ছাড়ব। কিছু না হোক অন্ততঃ ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত অঙ্ক কষবই, আর ফার্ষ্ট সেকেণ্ড দুটো রীডার যদি শেষ করতে পারি তাহলে গাঁয়ের প্রাইমারি ইস্কুলের হেড্‌মাষ্টারি করতে পারব, আর তারি সঙ্গে সঙ্গে মাসিক সাড়ে আট টাকা বেতনে ব্রাঞ্চ পোষ্ট-আফিসের পোষ্ট মাষ্টারি পদটাও জোগাড় ক'রে নেবার চেষ্টা করব। নেহাৎ না পাই যদি, তবে জমিদারবাবুর কনিষ্ঠ ছেলেটির প্রাইভেট টিউটরের কাজটা নিশ্চয় জুটবে, ইতি ৭ই আশ্বিন, ১৩২৮।

* ভানুসিংহের বয়স যে সাতাশ বছরে এসে চিরকালের মতো ঠেকে গেছে বালিকার এই একটি স্বরচিত বয়ঃপঞ্জীর বিধান ছিল।

৪৩

আজ বুধবার—আজ ছুটির দিনে আমার বারান্দার সেই কোণটায় ব'সে তোমাকে লিখচি। মাঘের দুপুর বেলাকার রৌদ্রে আমার ঐ আমলকী বীথিকার মধ্যে দিনটি রমণীয় লাগচে। এই রকম দিনে কাজ করতে ইচ্ছে করেনা—আমার সমস্ত মনটি ঐ ডালের উপরে বসা ফিঙে পাখীটির মত চুপ ক'রে রোদ পোহায়। আজ উত্তরে হাওয়া থেকে থেকে উতলা হ'য়ে উঠচে—শালবনের পাতায় পাতায় কাঁপুনি ধরেচে—একটা মস্ত কালো ভ্রমর মাঝে মাঝে অকারণ আমার কাছে এসে গুন্‌গুনিয়ে আবার বেরিয়ে চ'লে যাচ্চে—একটা কাঠবিড়ালি এই বারান্দার কাঠের খুঁটি বেয়ে চালের কাছে উঠে কিসের ব্যর্থ সন্ধানে চঞ্চল চক্ষে এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার তখনি পিঠের ওপর ল্যাজ তুলে দুড় দুড় ক'রে নেমে যাচ্চে। এই শীতের মধ্যাহ্নে যেন আজ কারো কিছু কাজ নেই।

আমি সমস্ত সপ্তাহ ধ'রে একটা নাটক লিখ্‌ছিলুম—শেষ হ'য়ে গেছে তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা "প্রায়শ্চিত্ত" নয়, এর নাম "পথ"। এতে কেবল প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই—সে গল্পের কিছু এতে নেই, সুরমাকে এতে পাবে না।

তুমি পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছ—আমার এই কুঁড়েমির চিঠিতে পাছে তোমার জিওমেট্রির ধ্যান ভঙ্গ করে এই ভয় আছে। ৪ঠা মাঘ, ১৩২৮।

৪৪

তুমি রোজ দুটো ক'রে ডিম খেয়ে একটিমাত্র ক্লাসে পড়চ খবর পেয়েই খুসী হ'য়ে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে বসেচি। আমিও ঠিক দুটি ক'রে ডিম খাই আর একটি মাত্র ক্লাসেও

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পড়িনে। সেইটেতে আমার মুস্কিল বেধেচে, কেননা যদি আমার ক্লাস থাকত, যদি আমাকে নামতা মুখস্ত করতে হ'ত তাহলে সব সময়ই আমার কাছে লোক আনাগোনা ক'রতে পারত না; আমি বলতে পারতুম আমার সময় নেই, আমাকে এক্‌জামিন্ দিতে হবে। তোমার ভারি সুবিধে—তোমার কাছে কইম্বাটুর থেকে ত্রিম্বাকুটু থেকে কাঞ্জিভ্যারাম থেকে কামস্কাটকা থেকে মক্কা থেকে মদিনা মস্কট থেকে যখন-তখন নানালোক মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে আসেন না—তারা জানে যে মার্চ্চ মাসে তোমাকে ম্যাট্রিকুলেশন দিতে হবে। আমি তাই এক একবার মনে করি আমি ম্যাট্রিকুলেশন দেব—দিলে নিশ্চয়ই ফেল করব—ফেল করার সুবিধে এই যে কি বৎসরেই ম্যাট্রিকুলেশন দেওয়া যায় আর তাহলে ত্রিম্বাকুটু থেকে নিজনি-নবগরড থেকে বেচুয়ানাল্যাণ্ড থেকে সদাসর্ব্বদা লোক আসা বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে।

লেভি সাহেব আমার বন্ধু হ'য়েও তোমার কাছে হেমনলিনীর কথাটা ফাঁস ক'রে দিয়েচেন এতে আমি মনে বড় দুঃখ পেয়েচি—একথা সত্য যে, আমি তারই সাধনায় প্রবৃত্ত আছি। কিন্তু সেই স্বর্ণ-শতদলের পাপ্‌ড়িগুলি হচ্ছে bank notes। সাধনায় বিশেষ যে সিদ্ধিলাভ করতে পেরেছি তা মনেও কোরো না, তোমরা কামনা কোরো এই হেমনলিনী যেন আমার পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু কপালক্রমে আমার পঞ্জিকায় অকাল পড়েচে—শুভলগ্ন আর আসেই না, তাই গান গাচ্চি—

> ওগো হেমনলিনী
> আমার দুঃখের কথা কারো কাছে বলিনি।
> লক্ষ্মীর চরণতলে ফুটে আছো শতদলে
> সে পথ করিয়া লক্ষ্য কেন আমি চলিনি ?

ইতি ১০ ফাল্গুন, ১৩২৮।

৪৫

আমি নদীপথে কয়েকদিন কাটিয়ে এলুম—কাল রাত্রে ফিরে এসেচি। আজ সকালে দেখি এখানে তোমার চিঠি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তুমি জানো আমি নদী ভালোবাসি। কেন বলবো ? আমরা যে-ডাঙার উপরে বাস করি, সে ডাঙা ত নড়ে না, স্তব্ধ হ'য়ে প'ড়ে থাকে, কিন্তু নদীর জল দিনরাত্রি চলে, তার একটা বাণী আছে। তার ছন্দের সঙ্গে আমাদের রক্ত-চলাচলের ছন্দ মেলে, আমাদের মনে নিরন্তর যে চিন্তাস্রোত ব'য়ে যাচ্চে সেই স্রোতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে—এই জন্যে নদীর সঙ্গে আমার এত ভাব। বয়স যখন আরো কম ছিল, তখন কতকাল নৌকায় কাটিয়েচি, কোনো জনমানব আমার কাছেও থাক্‌ত না, পদ্মার চরের উপরকার আকাশে সন্ধ্যা-তারা আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাক্‌ত; প্রতিবেশী ছিল চক্রবাকের দল; তাদের কলালাপ থেকে আর কিছু বুঝি বা না বুঝি এটুকু জানতুম আমার সম্বন্ধে কোনো জনরব তারা রটাত না—এমন কি, আমার জয়-পরাজয় নামক গল্পের নায়ক নায়িকার পরিণাম সম্বন্ধে তারা লেশমাত্র কৌতুহল প্রকাশ করত না।

যা হোক, তেহি নো দিবসা গতাঃ,—এখন বোলপুরের শুষ্ক ধূসর মাঠের মধ্যে ব'সে ইস্কুল মাষ্টারি করচি; ছেলেগুলোর কলরব চক্রবাকের কলকোলাহলকে ছাড়িয়ে গেছে। তুমি মনে কোরো না, এখানে কোনো স্রোত নেই; এখানে অনেকগুলি জীবনের ধারা মিলে একটি সৃষ্টির স্রোত চলেচে; তার ঢেউ প্রতি মুহূর্ত্তে উঠ্‌চে, তার বাণীর অন্ত নেই। সেই স্রোতের দোলায় আমার জীবন আন্দোলিত হচ্ছে, আপনার পথ সে কাটচে, দুই তটকে গ'ড়ে তুল্‌চে। সে কোন্ এক অলক্ষ্য মহাসমুদ্রের দিকে চলেচে, দূর থেকে আমরা তার বার্ত্তার আভাস পাই মাত্র। ইতি ২২শে পৌষ, ১৩২৮।

৪৬

শিলাইদা

তুমি আমাকে চিঠি লিখেচ শান্তিনিকেতনে, আমি সেটি পেলুম এখানে অর্থাৎ শিলাইদহে।

তুমি কখনো এখানে আসনি, সুতরাং জান্‌তে পারবে না জায়গাটা কি-রকম। বোলপুরের সঙ্গে এখান-

কার চেহারার কিছুমাত্র মিল নেই। সেখানকার রৌদ্র বিরহীর মত, মাঠের মধ্যে একা ব'সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলচে, সেই তপ্ত নিশ্বাসে সেখানকার ঘাসগুলো শুকিয়ে হল্‌দে হ'য়ে উঠেচে। এখানে সেই রৌদ্র তার সহচরী ছায়ার সঙ্গে মিলেচে; তাই চারিদিকে এত সরসতা। আমাদের বাড়ির সাম্‌নে সিমু-বীথিকায় তাই দিনরাত মর্ম্মরধ্বনি শুনচি, আর কনকচাঁপার গন্ধে বাতাস বিহ্বল, কয়েৎবেলের শাখায় প্রশাখায় নতুন চিকন পাতাগুলি ঝিল্‌মিল্ করচে, আর ঐ বেনুবনের মধ্যে চঞ্চলতার বিরাম নেই। সন্ধ্যার সময় টুকরো চাঁদ যখন ধীরে ধীরে আকাশে উঠ্‌তে থাকে তখন সুপুরিগাছের শাখাগুলি ঠিক যেন ছোট ছেলের হাত নাড়ার মত চাঁদমামাকে টী দিয়ে যাবার জন্যে ইসারা ক'রে ডাকতে থাকে। এখন চৈত্রমাসের ফসল সমস্ত উঠে গিয়েচে, ছাদের থেকে দেখ্‌তে পাচ্চি চষা মাঠ দিক-প্রান্ত ছড়িয়ে প'ড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে কিছু বৃষ্টির জন্যে। মাঠের যে অংশে বাব্‌লাবনের নীচে চাষ পড়েনি সেখানে ঘাসে ঘাসে একটুখানি স্নিগ্ধ সবুজের প্রলেপ, আর সেইখানে গ্রামের গরুগুলো চরচে। এই উদার-বিস্তৃত চষা মাঠের মাঝে মাঝে ছায়াবগুণ্ঠিত এক একটি পল্লী—সেই-খান থেকে আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পথ বেয়ে গ্রামের মেয়েরা ঝক্‌ঝকে পিতলের কলসী নিয়ে দুটি তিনটি ক'রে সার বেঁধে প্রায় সমস্ত বেলাই জলাশয় থেকে জল নিতে চলেচে। আগে পদ্মা কাছে ছিল—এখন নদী বহুদূরে স'রে গেছে—আমার তেতালা ঘরের জানালা দিয়ে তার একটুখানি আভাস যেন আন্দাজ ক'রে বুঝতে পারি, অথচ একদিন এই নদীর সঙ্গে আমার কত ভাব ছিল। শিলাইদহে যখনই আস্‌তুম তখন দিনরাত্তির ঐ নদীর সঙ্গেই আমার আলাপ চল্‌ত; রাত্রে আমার স্বপ্নের সঙ্গে ঐ নদীর কলধ্বনি মিশে যেত আর নদীর কলস্বরে আমার জাগরণের প্রথম অভ্যর্থনা শুন্‌তে পেতেম। তারপরে কত বৎসর বোলপুরের মাঠে মাঠে কাটল, কতকাল সমুদ্রের এপারে ওপারে পাড়ি দিলুম—এখন এসে দেখি সে নদী যেন আমাকে চেনে না। ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি, মাঝখানে কত মাঠ, কত গ্রামের আড়াল, সবশেষে উত্তর দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্চলের নীলতর পাড়ের মত একটি বনরেখা দেখা যায়। সেই নীল রেখাটির কাছে ঐ যে একটি ঝাপ্‌সা বাষ্পলেখাটির মত দেখ্‌তে পাচ্চি জানি ঐ আমার সেই পদ্মা। আজ সে আমার কাছে অনুমানের বিষয় হয়েচে। এইত মানুষের জীবন। ক্রমাগতই কাছের জিনিষ দূরে চ'লে যায়, জানা জিনিষ ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে, আর যে স্রোত বন্যার মতো প্রাণমনকে প্লাবিত করেচে, সেই স্রোত একদিন অশ্রুবাষ্পের একটি রেখার মতো জীবনের একান্তে অবশিষ্ট থাকে।

এখন বেলা ফুরিয়ে এসেচে, অল্প একটুখানি মেঘেতে আকাশ ঢাকা, দিনাবসানেও বাগানে পাখীর ডাকে একটুও ক্লান্তি দেখ্‌চিনে। দুই কোকিলে কেবলি জবাব চলেচে, কেউ হার মান্‌তে চাচ্চে না—তাছাড়া আরও অনেক পাখী ডাক্‌চে, তাদের ডাক স্পষ্ট ক'রে চেনা যায় না। সকলের ডাক মিশিয়ে জড়িয়ে গেছে, অন্য দিনের মতো বাতাস আজ দুরন্ত নয়, ঝাউগাছগুলি স্তব্ধ এবং নিঃশব্দ হ'য়ে গেছে। আজ অষ্টমীর চাঁদ দেখ্‌চি মেঘের পর্দ্দার আড়ালে রাত্রিযাপন করবে।

আমার ঘরের দক্ষিণদিকে ঐ ছাদে একটি কেদারা পাতা আছে—ঐখানে সন্ধ্যার সময় আমি গিয়ে বসি। এ-কয়দিন দ্বিতীয়ার চাঁদ থেকে আরম্ভ ক'রে অষ্টমীর চাঁদ পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই উদয়কালে এই কবির সঙ্গে মুকাবিলা করেচে। ঐ চাঁদ হচ্চে আমার জন্মদিনের অধিপতি। আমি যখন ছাদে ব'সি তখন আমার বামে পূর্ব্ব আকাশ থেকে বৃহস্পতি আমার মুখের দিকে তাকায় আর পশ্চিম আকাশ থেকে চন্দ্রমা।—এইবার ক্রমে একটু অন্ধকার হ'য়ে আসচে—ঘরের মধ্যকার এই ঘোলা আলোয় আর দৃষ্টি চলচে না, বাইরে গিয়ে বসবার সময় হ'ল।

তুমি আমার কাছে বড় চিঠি চেয়েছিলে, বড় চিঠিই লিখলুম। লিখ্‌তে পারলুম তার কারণ এখানে অবকাশ আছে। কিন্তু এই চিঠি যখন ডাকে দেব, অর্থাৎ কাল বৃহস্পতিবারে,—কলকাতায় রওনা হব। সেখানে ট্রাম আছে, মোটর আছে, ইলেক্‌ট্রিক্ পাখা আছে; সময় নেই। তারপরে বোলপুরে যাব,—সেখানে শালের বনে ফুল ফুটেচে, আম-

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাগানে ফল ধরেচে; সেখানে মাঠ আছে বিস্তীর্ণ, আকাশ আছে অবারিত, কিন্তু সেখানেও অবকাশ নেই।

চিঠি জিনিষটা ছোট্ট, মালতী ফুলের মতো, কিন্তু সেই চিঠি যে-আকাশের মধ্যে ফুটে ওঠে সেই আকাশ মালতী লতারই মতো বড়। আমাদের যত কেজো লোকের অবকাশ টবের গাছ, তার থেকে যে-সব পত্রোদ্গম হয় সেতো পোষ্ট-কার্ডের চেয়ে বড় হ'তে চায় না। ইতি ২২ চৈত্র, ১৩২৮।

(ক্রমশঃ)

খেয়ালিয়া

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

এবার থেকে রইল তবে
　　সকল কথা মনে মনে,
খেয়ালী ফুল ফুটবে শুধু
　　মনের গভীর বনে বনে।
　　প্রাণের আড়াল নয়কো যাহা
　　চোখের আড়াল থাক্‌ল তাহা,
　　ফল্গু হ'য়ে চিত্ত-ধারা
　　　বইবে অতি সঙ্গোপনে।
এবার থেকে রইল তবে
　　সকল কথা মনে মনে!

চল্‌বে জীবন মন্দ-গতি
　　অভিমানের তীরে তীরে,
হৃদয়-বীণার ঝঙ্কৃত তার
　　থামবে এবার ধীরে ধীরে
সরসতার গভীর মূলে
　　উৎপাটিয়া ফেলব তুলে;
মুক্ত প্রাণের আলগা আবেগ
　　বাঁধব কঠোর পণে পণে।
এবার থেকে রইল তবে
　　সকল কথা মনে মনে!

হয়ত মনে ভাববে, আছি
তোমার প্রতি অন্যমনা—
ফুরিয়ে গেল এবার বুঝি
উচ্ছলিত উন্মাদনা—
এম্‌নি ধারা আরো কত
ভাববে কথা সম্ভবত;
কিম্বা কিছুই ভাববে নাকো
অবহেলার বিস্মরণে।
এবার থেকে রইল তবু
সকল কথা মনে মনে।

রইল সকল ক্ষুব্ধ-চেতন,
নিদ্রিত ও নিমীলিত,
নীরব নিলীন স্তব্ধ বিলীন
তন্দ্রাহত সঙ্কুচিত।
চিত্ত মাঝে চিন্তা সম
রইলে শুধু চিত্তে মম;
স্বপ্ন হ'লে, সত্তা তোমার
রইল নাকো জাগরণে।
রইল কথা, সকল কথা,
সকল কথা মনে মনে!

রস ও রুচি

—"পরশুরাম"

ঋগ্বেদের ঋষি আধ-আধ ভাষায় বলিলেন—'কামস্তদগ্রে সমবর্তাধি'—অগ্রে যাহা উদয় হইল তাহা কাম। তারপর আমাদের আলঙ্কারিকগণ নবরসের ফর্দ্দ করিতে গিয়া প্রথমেই বসাইলেন আদিরস। অবশেষে ফ্রয়েড সদলবলে আসিয়া সাফ-সাফ বলিয়া দিলেন—মানুষের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, কমনীয় মনোবৃত্তি, তার অনেকেরই মূলে আছে কামের বহুমুখী প্রেরণা।

সেদিন কোনো এক মনোবিদ্যার বৈঠকে প্রবন্ধ শুনিয়াছিলাম—রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সাইকো-এনালিসিস। বক্তা পরম শ্রদ্ধাসহকারে রবীন্দ্র-সাহিত্যের হাড় মাস চামড়া চিরিয়া চিরিয়া দেখাইতেছিলেন—কবির প্রতিভার মূল উৎস কোথায়। কবি যদি সেই ভৈরবী-চক্রে উপস্থিত থাকিতেন তবে নিশ্চয়ই মূর্চ্ছা যাইতেন, এবং মূর্চ্ছান্তে ছুটিয়া গিয়া তাঁর শ্রুতিভূষণের শরণাপন্ন হইতেন।

কি ভয়ানক কথা! আমরা যা-কিছু স্পৃহণীয় বরেণ্য পরম উপভোগ্য মনে করি, তার অনেকেরই মূলে একটা হীন রিপু! ফ্রয়েডের দল খাতির করিয়া তার নাম দিয়াছেন—'লিবিডো'; কিন্তু বস্তুটি লালসারই একটি বিরাট সংস্করণ। তাও কি সোজাসুজি লালসা?—তার শত জিহ্বা শতদিকে লক্‌লক্‌ করিতেছে, সে দেবতার ভোগ শকুনির উচ্ছিষ্ট একসঙ্গেই চাটিতে চায়, তার পাত্র-অপাত্র কাল-অকাল জ্ঞান নাই। এই জঘন্য বৃত্তিই কি আমাদের রসজ্ঞানের প্রসূতি? 'পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ'—মনে করিতাম এই কথাটি ভগবানকে খুশী করিবার জন্য একটু অতিরঞ্জিত বিনয়-বচন মাত্র। আমরা যে এমন উৎকট পাপাত্মা তা এতদিন হুঁস হয় নাই। ভগবান আমাদের মারিয়া রাখিয়াছেন—আমাদের আবার সুরুচি-কুরুচি!

ছ'টা রিপুর মধ্যে প্রথমটারই অত প্রতিপত্তি হইল কেন? কাব্য, সাহিত্য, চৌষট্টি কলা, ভক্তি, প্রেম, স্নেহ—সমস্তই কামজ; অতি উত্তম কথা। কিন্তু ক্রোধ হইতে কিছু ভাল জিনিষ পাওয়া গেল না কেন? গীতাকার কাম ক্রোধকে একাকার করিয়া বলিয়াছেন—'কাম এষ, ক্রোধ এষ।' লোভ মোহ প্রভৃতি অন্য রিপুও বোধ হয় তাঁর মতে কামেরই পরিণতি। ফ্রয়েডের শিষ্যগণ গীতার একটা সরল ব্যাখ্যা লিখিলে ভাল হয়।

আর একটি সংশয় আমাদের মত আনাড়িদের মনে উদয় হয়। বৈদিক ঋষি হইতে ফ্রয়েড-পন্থী পর্য্যন্ত সকলেই হয়ত একটা ভুল করিয়াছেন। আগে কাম, না আগে ক্ষুধা? ভোজন-রসই আদিরস নয় ত? কাম-কম্‌প্লেক্স যেমন নব নব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ফুটিয়া ওঠে, ভোজন কম্‌প্লেক্সেরও কি তেমন কোনো ক্ষমতা নাই?

আধুনিক 'মনোজ্ঞ'গণ বলেন—অতৃপ্তি বা নিগ্রহেই কামের রূপান্তরপ্রাপ্তি ঘটে, এবং তার ফল এই বিচিত্র মানব-চরিত্র। ভোজনেরও অতৃপ্তি আছে, কিন্তু সে অতৃপ্তি তেমন তীব্র নয়, সেজন্য মানুষের মনে তার ক্রিয়া অতি অল্প। অর্থাৎ, উপবাস অপেক্ষা বিরহেরই সৃষ্টিশক্তি বেশি। অবশ্য 'বিরহ' শব্দটির এখানে একটু ব্যাপক অর্থ ধরিতে হইবে; ন্যায্য অন্যায্য পবিত্র পাশবিক অস্বাভাবিক সমস্ত অতৃপ্তিই বিরহ, এবং তাহা মনের অগোচরেই নব-নব রূপে বিকশিত হয়।

ভোজন-কম্‌প্লেক্সের যে কিছুই সৃষ্টি করার ক্ষমতা নাই তা নয়। শোনা যায় সেকালে অনেকে খানা খাইবার জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেন,—অবশ্য তাঁরা অপরকে এবং নিজেকে আধ্যাত্মিক হেতুই দেখাইতেন। ৺ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন তিনি তুচ্ছ পাঁউরুটির লোভে দিনকতক সনাতন সমাজ বর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এখনকার ভদ্র-হিন্দুধর্ম্ম অতি উদার—অন্তত খাওয়া-পরা সম্বন্ধে; সে জন্য লুব্ধ রসনা হইতে মনে আর ধর্ম্ম-রসের সঞ্চার হয় না। কিন্তু বিবাহের বাধা এখনো সমাজে ও উপন্যাসে অঘটন ঘটাইতেছে।

ভোজন-রস আধুনিক সাহিত্যে উপেক্ষিত হইয়াছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ রসের প্রতি বিমুখ, আমরাও তাই বঞ্চিত হইয়াছি। কিন্তু তিনিও এর প্রভাব একবারে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কমলার উপর গাজিপুর-যাত্রী খুড়ামহাশয়ের হঠাৎ যে স্নেহ হইল, তার মূলে কিসের কম্‌প্লেক্স ছিল? খুড়ার বয়স হইয়াছে, কিন্তু ভোজন সম্বন্ধে তিনি নিস্পৃহ নন। ষ্টীমারে রন্ধনের সৌরভ পাইয়া বৃদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস টানিয়া বলিতেছেন—'চমৎকার গন্ধ বাহির হইয়াছে। ঘণ্টটা যা হইবে তা মুখে তুলিবার পূর্ব্বেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু অম্বলটা আমি রাঁধিব মা।' তরুণ যেমন অপরিচিতা তরুণীর একটু হাসি একটু হাঁচি একটু কাশি অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যৎ দাম্পত্য-জীবনের স্বপ্ন রচনা করে, এই বৃদ্ধও তেমনি কমলার ফোড়নের গন্ধে ভবিষ্যৎ ব্যঞ্জন-পরম্পরা প্রত্যক্ষ করিয়া অনাথা বালিকার স্নেহে বাঁধা পড়িয়াছিলেন। ফ্রয়েডের শিষ্য নিশ্চয় অন্য ব্যাখ্যা করিবেন, কিন্তু আমরা কানে আঙুল দিয়া রহিলাম।

ভোজন-রস এখন থাক,—যে রস মানুষের মনে প্রবলতম, তার কথাই হোক। কামের বিবর্ত্তনের ফলে যদি আমরা প্রেম ভক্তি স্নেহ কাব্য কলা প্রভৃতি ভাল-ভাল জিনিষ পাইয়া থাকি, তবে কিসের খেদ? রসগ্রাহী ভদ্রজন ফুল চায়, ফল চায়, গাছের গোড়ায় কিসের সার আছে খোঁজ করে না। নীরস বৈজ্ঞানিক গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেখুক, সারের ব্যবস্থা করুক, আপত্তি নাই। পচা জৈবিক সারে গাছ সতেজ হয়—ইহা সার সত্য কথা; কিন্তু ফুল ফল উপভোগ করিবার সময় কেউ তাতে সার মাখায় না।

কিন্তু অতীব লজ্জা সহকারে স্বীকার করিতে হইবে যে কেবল ফুলে ফলে তৃপ্তি হয় না, গাছের গোড়ায় যে জৈবিক রস আছে তার আস্বাদও আমরা মাঝে-মাঝে কামনা করি। সামাজিক জীবনে যা পীড়াদায়ক বা ঘৃণ্য, এমন অনেক বস্তু নিপুণ রসস্রষ্টার রচিত হইলে আমরা সাদরে উপভোগ করি। নতুবা শোক দুঃখ নিষ্ঠুরতা লালসা ব্যভিচার প্রভৃতির বর্ণনা কাব্যে উপন্যাসে চিত্রে স্থান পাইত না।

আসল কথা—আমাদের বহু কামনা নানা কারণে আমাদের অন্তরের গোপন কোণে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, এবং তাদের অনেকে উচ্চতর মনোবৃত্তিতে রূপান্তরিত হইয়া হৃদয় ফুড়িয়া বাহির হইয়াছে। ইহাতেই তাদের চরিতার্থতা। এই সকল বৃত্তি সমাজের পক্ষে হিতকর, তাই সমাজ তাদের সযত্নে পোষণ করে, এবং সাহিত্যে কলায় তারা অনবদ্য বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু যে-সব কামনা মাটি-চাপা পড়িয়াছে, তারাও অহরহ ঠেলা দিতেছে। সমাজ বলিতেছে—খবরদার, যদি ফুটিতেই চাও, তবে কমনীয় বেশে ফুটিয়া ওঠ। কিন্তু নিগৃহীত কামনা বলিতেছে—ছদ্মবেশে সুখ নাই, আমি স্বমূর্ত্তিতেই প্রকট হইতে চাই; আমি পাষাণ কারা ভাঙিব, কিন্তু করুণা-ধারা ঢালা আমার কাজ নয়। সাবধানী রসস্রষ্টা স্নেহশীল পিতার ন্যায় তাদের বলেন—বাপু সব, তোমাদের একটু রৌদ্রে বেড়াইয়া আনিব, কিন্তু সাজ-গোজ করিয়া ভদ্র বেশ ধরিয়া চল; আর বেশি দাপাদাপি করিও না। তৃষিত রসজ্ঞজন তাদের দেখিয়া বলেন—আহা, কাদের বাছা তোমরা? কি সুন্দর, কিন্তু কেউ-কেউ একটু যেন বেশি দুরন্ত। তাদের স্রষ্টা বুঝাইয়া দেন—এরা তোমার নিতান্তই আপনার; ভয় নাই, এরা কিছুই নষ্ট করিবে না, আমি এদের সামলাইতে জানি; এদের মধ্যে যে বেশি দুরন্ত, তাকে আমি অবশেষে ঠেঙাইয়া দুরস্ত করিয়া দিব; যে কম দুরন্ত, তাকে অনুতপ্ত করিব; যে কিছুতেই বাগ মানিবে না, তাকেও নিবিড় রহস্যের জালে জড়িত করিয়া ছাড়িয়া দিব। দ্রষ্টার দল খুসী হইয়া বলেন—বাঃ, এই তো আর্ট। কিন্তু দু-এক জন অরসিক এত সাবধানতা সত্ত্বেও শঙ্কিত হন।

আর একদল রসস্রষ্টা তাঁদের আত্মজের প্রতি অতিমাত্রায় স্নেহশীল। তাঁরা এই সব নিগৃহীত কামনাকে বলেন—কিসের লজ্জা, কিসের ভয়? অত সাজ-গোজে দরকার কি,—যাও, উলঙ্গ হইয়া রং মাখিয়া খেলিয়া এস। জনকতক লোলুপ রসলিপ্সু তাদের সাদরে বরণ করিয়া বলিতেছেন—এই ত চরম আর্ট। কিন্তু সংযমী দ্রষ্টার দল

পরশুরাম

বলেন—কখনই আর্ট নয়, আর্টে আবিলতা থাকিতে পারে না; আর্ট যদি হইবে তবে ওদের দেখিয়া আমাদের এত-জনের অন্তরে এমন ঘৃণা জন্মায় কেন? সমাজপতিগণ কহেন —আর্ট-ফার্ট বুঝিনা; সমাজের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতে দিব না; আমাদের সব বিধানই যে ভাল তা বলিনা—যদি উৎকৃষ্টতর বিধান কিছু দেখাইতে পার ত দেখাও; কিন্তু তা যদি না পার, তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দোহাই দিয়া উদ্দাম প্রবৃত্তির চিত্র আঁকিয়া যে তোমরা সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করিবে—আমাদের ছেলে মেয়েদের বিগড়াইয়া দিবে, সেটি হইবে না। আমরা আছি, পুলিশও আছে।

এই দুই দল রসস্রষ্টার মাঝে কোনো গণ্ডি নাই—আছে কেবল মাত্রাভেদ ও সংযমের তারতম্য। ক্ষমতার কথা ধরিব না,—কারণ, অক্ষম শিল্পীর হাতে স্বর্গের চিত্রও নষ্ট হয়, গুণীর হাতে নরক বর্ণনাও মনোহর হয়। সুরুচির সীমা কে টানিবে? এক যুগ এক দল যাকে উৎকৃষ্ট আর্ট বলিবে, অপর যুগ অপর দল তার নিন্দা করিবে। কি নকল কি আসল যতদিন নির্দ্ধারিত না হয়, ততদিন আর্ট সম্বন্ধে সমাজ অনধিকার চর্চ্চা করিবেই।

বিধাতার রচনা জগৎ, মানুষের রচনা আর্ট। বিধাতা একা, তাই তাঁর সৃষ্টি নিয়মের রাজত্ব; মানুষ বহু, তাই তার সৃষ্টি লইয়া এত বিতণ্ডা। এই সৃষ্টির বীজ মানুষের মনে নিহিত আছে—তাহাই বোধ হয় প্রতীচ্য মনোবিদের 'লিবিডো', ঋষি-প্রোক্ত 'কাম'—

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্তাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥

(ঋগ্বেদ, ১০ম ১২৯ সূ)

কামনার হ'ল উদয় অগ্রে, যা হ'ল প্রথম মনের বীজ।
মনীষী কবিরা পর্য্যালোচনা করিয়া করিয়া হৃদয় নিজ
নিরূপিলা সবে মনীষার বলে উভয়ের সংযোগের ভাব,
অসৎ হইতে হইল কেমনে সতের প্রথম আবির্ভাব।

(শৈলেন্দ্র লাহা কৃত অনুবাদ)

ঋষি অবশ্য বিশ্বসৃষ্টির কথাই বলিয়াছেন, এবং 'সৎ' ও 'অসৎ' শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থই ধরিতে হইবে। কিন্তু 'সৎ-অসৎ' এর বাংলা অর্থ ধরিলে এই সূক্তটি আর্ট সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। ফ্রয়েড-পন্থীর সিদ্ধান্ত অনুসারে অসদ্‌বস্তু কাম হইতে সদ্‌বস্তু আর্ট উৎপন্ন হইয়াছে। মনীষী কবিরা নিজ নিজ হৃদয় পর্য্যালোচনা করিয়া বোধ হয় আর্টের স্বরূপ আপন অন্তরে নিরূপিত করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু জন-সাধারণের উপলব্ধি এখনো অস্ফুট। কি আর্ট, আর কি আর্ট নয়—বিজ্ঞান আজও নিরূপিত করিতে পারে নাই, অতএব সুরুচি কুরুচি সুনীতি দুর্নীতির বিবাদ আপাতত চলিবেই। যদি কোনো কালে আর্টের সংজ্ঞা ভাষায় নির্দ্ধারিত হয়, তবে সমাজের শঙ্কা দূর হইবে; কারণ, আর্ট প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী হইলেও কল্যাণের বিরোধী কখনো হইবে না।

রস কি তা আমরা বুঝি, কিন্তু বুঝাইতে পারি না। আর্টের প্রধান উপাদান রস, কিন্তু তার অন্য অঙ্গও হয়ত আছে—তাই আর্ট আরো জটিল। চিনি বিশুদ্ধ রসবস্তু, কিন্তু শুধু চিনি তুচ্ছ আর্ট। চিনির সহিত অন্যান্য রসবস্তুর নিপুণ মিশ্রণই স্পৃহণীয়। কিন্তু যে-সব উপাদান আমরা হাতের কাছে পাই তার সবগুলিই অখণ্ড রসবস্তু নয়, অল্প-বিস্তর অবান্তর খাদও আছে। নির্ব্বাচনের দোষে মাত্রা-জ্ঞানের অভাবে অতিরিক্ত আবর্জ্জনা আসিয়া পড়ে, অভীষ্ট স্বাদে বিবাদী স্বাদ উৎপন্ন হয়। তার উপর আবার ভোক্তার পূর্ব্ব অভ্যাস আছে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা আছে, ব্যক্তিগত রুচি আছে। এত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, ভোক্তার রুচি গঠিত করিয়া, কল্যাণের অন্তরায় না হইয়া যাঁর সৃষ্টি স্থায়ী হইবে, তিনিই শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।

———০———

দেশছাড়া

—গল্প—

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

অনেক কাল পরে দেশে গিয়েছি। ফি বৎসরই পূজোর ছুটিতে পশ্চিমে যাই, সেবার সে নিয়মটা উলটে দিলুম। দেশের টান আর নাড়ীর টান এক কি না তা জানিনা, তবে খেয়াল বলে' একটা জিনিষ ত আছে। স্বদেশী বন্ধুরা কিন্তু তা বুঝলে না। তারা বাহবা দিয়ে পত্র লিখলে—'একেই ত বলে 'দেশপ্রেম।' আমিও গাঢ়গম্ভীর ভাষায় উত্তর দিলুম—'ম্যালেরিয়ায় ধরে কুইনাইন খাবো, না হয় পিলের বোঝা পেটে নিয়ে মায়ের কোলেই চোখ বুজবো। তা' বলে' অভাগিনী পল্লীমাকে আর কাঁদাতে পারি না। মা যে আমাদের শোকেই উৎসন্ন যেতে বসেছে।' সকলে একবাক্যে জানালে—'ফিরে এসো, তোমাকে দিয়ে গোলদীঘিতে বক্তৃতা দেওয়াবো।'

দু'চারদিন কাট্‌লো একরকম মন্দ নয়। আধ্‌ভোলা লোকজন, মাঠঘাট, বাগানবাড়ী সবই আমার মনের চোখে নতুন হয়ে উঠ্‌লো। তার উপর টাট্‌কা মাছ ও খাঁটি দুধ (যার মধ্যে শক্ত ও তরল জল যথাক্রমে তাদের নীরসত্ব সঞ্চার করতে পারে নি) আমার সহুরে জিভকে বেশ একটা তৃপ্তির চমক দিলে।

কিন্তু বেশী দিন এভাব রইলো না। কাজের অভাবের জন্য একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগ্‌লুম। করি কি? পাড়াগেঁয়ে লোকের সঙ্গে ক্ষেতখামার, গাই বলদ, নৌকো ডোঙা ও দলাদলির কথাবার্ত্তা নিয়ে কি দিন কাটানো চলে? আমি ছিপ নিয়ে খিড়কীর ডোবায় গিয়ে বসে পড়লুম।

সকাল বিকাল দুবেলাই মাছ ধরার বাসনে নিযুক্ত থেকে আমি বেশ আমোদের সঙ্গেই সময়কে ফাঁকি দিতে লাগলুম। এ ত কলকাতার পুকুরে মাছ ধরা নয় যে, ফাতনার দিকে চেয়ে চেয়েই চোখ ক্ষয়ে যাবে। এখানে ফেলবামাত্রই তল। বর্ষায় হাওড় বিলের জল নালা খাল দিয়ে এসে পুকুরে পড়েচে, রাজ্যের মাছ নিয়ে। তারপর বন্যার জল টেনে গেছে; নালা খাল শুকিয়ে মাঠ; পুকুর কিন্তু রয়ে গেছে মাছ-বোঝাই।

বড় মজা এই দেশের পুকুরে মাছ ধরা। ধরা বাঁধা প্রত্যাশার মধ্যে কোন রোমান্স নেই, স্থিরনিশ্চয়ের মধ্যে মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এখানে কিন্তু সবই অনিশ্চিত—কোন্‌বার কি মাছ উঠ্‌বে কে বল্‌তে পারে? পুঁটি, পাব্‌দা, টেংরা, কই, মাগুর—সকলের ইসমান সম্ভাবনা।

পুকুরের 'পাউড়ি'র উপর গুটিকয়েক দেশী আমগাছ ছিল, তাদের কারো বা নাম 'জড়ানে চারা' কারো বা নাম 'মিছরে' কারো বা নাম 'বেতবুনে' কারো বা নাম 'বগ্‌ঠুঁটো।' আমি 'বেতবুনে' আমগাছের একটা জলপ্রান্ত-চারী লম্বা শিকড়ের উপর আমার দৈনিক আসনের প্রতিষ্ঠা করেছিলুম।

সেদিন শিকড়ের পাশে 'খালই'টাকে রেখে, ছিপের ডগা দিয়ে একটা ভাসমান কল্মীর দামকে সরাতে যাচ্ছি, এমন সময় আমার খুড়তুতো ভাই গঙ্গারাম এসে সেখানে উপস্থিত—তার হাতে একটা দোনলা বন্দুক।

আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার। খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো, ও সহোদর ভাই নিয়ে আমরা প্রায় ষোল সতেরো জন। তার মধ্যে অধিকাংশই কলকাতায় থেকে পড়ে কিম্বা চাকরী করে। গঙ্গারামকেও পড়বার জন্য কলকাতায় আনা হয়েছিল কিন্তু সে যখন সাত বছরে চারটি ক্লাসের সিঁড়ি ভেঙ্গেই একেবারে হাঁপিয়ে পড়লো, তখন তার কিছু হবে না বলেই তাকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। সেই অবধি সেও বিদ্যাবিকার হাত হতে পরিত্রাণ পেয়ে মহাসুখে দেশেই বসবাস করচে। তার যে প্রতিভা লেখাপড়ায় নিজেকে প্রমাণ করতে পারেনি, তাই বৈষয়িক ব্যাপারে এত আশাতীত তেজের সঙ্গে স্ফূর্ত্ত হয়ে উঠ্‌লো যে, বুড়ো কর্ত্তারা বিষয়-আশয় রক্ষার ভার

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

এখন প্রায় তার উপরে ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত আছেন। সমস্ত জোতজমা, আদায় উসুল, কর্জ্জ-দাদন, নালিশ দলিল এখন তার নখদর্পণে। রায়েতরা তাকেই ভয়ভক্তির ষোড়শোপচারে পূজা দেয়। তাছাড়া সে এখন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এবং গ্রাম্য কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর। আবার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারীতেও সে বেশ একটু প্রতিপত্তি করে ফেলেছে—আশপাশের পাঁচসাতখানা গ্রাম হতে তার 'কল্' আসে।

গঙ্গারাম ডাক্‌লে—'দাদা!'

'কিরে, বন্দুক নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস?' ব'লে আমি ছিপের ডগা দিয়ে কল্মীর দামটাকে দূরে সরিয়ে দিলুম।

'যাচ্ছিনা কোথাও। তুমি ছুঁড়তে পার না দাদা?'

'ও আর ছুঁড়তে কি লাগে?—দেখ্, এই কল্মীর দাম গুলোকে তুলে ফেলিস্। কাল একটা এতবড় কই মাছ, তুলেছিলুম আর কি—ঐতে বেধে পড়ে গেল।'

'কেন দাদা, মিছে কষ্ট করো দুটো মাছের জন্যে? ও সব কি তোমাদের অভ্যেস আছে? তুমি বাড়ী এসেছো, মাছের ভাবনা? কি করে মাছ ধরতে হয় আজ দেখাবো'খন। একটা 'ক্ষাওন' জাল ফেলে—

'ও, জাল ফেলে! জাল দিয়ে ধরা মাছ ভাল লাগে না।'

'আচ্ছা না ধরলুম জাল দিয়ে—পোলো আছে, বোমা আছে, কেঁচা আছে, রাবাণী আছে। তুমি শুধু হুকুম করবে আর দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে। লোকে বুঝুক যে তুমি তাদের কর্ত্তাবাবুরও কর্ত্তা।'

'দেখ্ গঙ্গা, তোর ঐ এক দোষ। তুই আমাকে ব্যস্ত করে মারিস। তোর জন্যে নিজের মনে যা খুসী তা করবার জো নেই। তুই কেবলি আমাকে লোকের সামনে তুলে ধরে নাচাতে চাস্—যেন আর কারো দাদা লেখাপড়াও শেখেনি, কলকাতাতেও থাকে না। নে সরে পড়্, মাছ গুলোকে না তাড়িয়ে ছাড়বি না।'

'আচ্ছা দাদা, মাছ ধরতেই যদি তোমার এত 'হাউস্' তো বড় পুকুরে চল না। হুইল নিয়ে বসবে, সাত আট সের একটা বাধবেই—খেলিয়ে সুখ পাবে।'

'নারে না। তারা সব যেন পোষ-মানা। এক মুঠো খই ছড়িয়ে দিলে ঘাটের সিঁড়ি পর্য্যন্ত এসে কি খেলাটাই না করে।'

'আচ্ছা দাদা তুমি পাখী ভালবাস?'

'পাখী? নিশ্চয়। কি সুন্দর উড়ে বেড়ায় বল্‌তো।'

'আমি তা বল্‌চিনা। পাখীর মাংস খেতে ভালবাসো?'

'তা আর কে না বাসে? আমি তো আর বোষ্টম নই। হাড়গুলো মুচমুচ করে গুঁড়ো হয়ে যায়—পাঁঠার মাংসর চেয়ে ঢের ভালো।'

'তা পারবো তোমায় খাওয়াতে। এখনো ত মাসখানেক আছ? এই বিলে পাখী সব এসে পড়ে আর কি—এখুনি দু'একটা আসতে সুরু করেচে। তবে তাদের মারা শক্ত—খুব তফাৎ থেকে খুব নিরীখ্ ক'রে'—ফস্‌কালে আর সে দিনেও একটা পাবে না। তা আমার হাতে ফস্‌কায় কম। তোমার তাগ কেমন দাদা?'

কলকাতাতেও আমাদের একটা বন্দুক আছে কিন্তু তোলাই থাকে—ছুঁড়বো কোথায়, ছুঁড়বোই বা কেন? কাজেই হাতের 'টিপে'র চর্চ্চা করবার ও অবসর হয়নি, পরীক্ষা করবারও নয়। আমি বিজ্ঞের মতন উত্তর করলুম—

'বন্দুকের আবার তাগ! মাছি রয়েচে কি জন্যে?'

হো হো করে হাসতে হাসতে গঙ্গারাম বল্‌লে—'তবেই হয়েচে। একমাস যায় তাগ দোরস্ত করতে—তুমি মারতে পারবে না।'

আত্মাভিমানে ঈষৎ আহত হয়ে আমি নাক কুঁচ্‌কে বল্লুম—'তোদের একমাস লাগে আমার লাগ্‌বে না। এই ধর্, আমি ত কখনো ছুঁড়িনি—কিন্তু এখুনি দেখিয়ে দিতে পারি'—বলেই ছিপটাকে ফেলে দিয়ে তার হাতের বন্দুক কেড়ে নিলুম এবং উপযুক্ত শিকারের অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে লাগলুম।

অন্বেষণ ব্যর্থ হল না। চল্লিশ পঞ্চাশ হাত দূরে একটা তালগাছের মাথার উপরে একটা শকুন দেখ্‌তে পেলুম। ঐ জন্তুটাকে আমি মোটেই দেখ্‌তে পারি না, দেখলেই কেমন রাগ হয়। ও রাগটা বোধ হয় ভয়েরই রূপান্তর, কেননা

দুচার বৎসর পূর্ব্বেও ওদের দেখে বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠেচে। ওরা যখন ভাগাড়ে কিম্বা নদীর ধারের শ্মশানে গিয়ে দলে দলে উড়ে পড়ে এবং লম্বা লম্বা ডানা মেলে পরস্পরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি আরম্ভ করে দেয়, তখন সে বীভৎস দৃশ্য কোন্ তরুণ মনকে না আতঙ্কে ভরিয়ে তুল্‌তে পারে? মানুষের শেষ পরিণাম দেখে ওদের দুঃখ নেই, বৈরাগ্য নেই, ঘৃণা নেই—ওরা নিজেদের পৈশাচিক আনন্দেই উন্মত্ত। আমাদের এই এত প্রিয় এত যত্নের দেহ কি শেষে ওদের জঠরে যাবার জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল!

রাগ ত ছিলই, চিন্তার সাহায্যে তাকে আরো বাড়িয়ে নিতে লাগলুম। ওরা যে মানুষের অমঙ্গলও করে। হাঁ, ঠাকুরমা'র কাছে শুনেছি কার বাড়ীর মটকার উপরে বসে রাত্রে কেঁদেছিল, আর রাত পোয়াতে দেরী সইলো না—সেই রাত্রেই বাড়ীশুদ্ধ—দাঁড়াও আরো আছে—ওরা ঘুরতে ঘুরতে আকাশ দিয়ে নামে, কিন্তু তখন যদি কারো মাথার উপর ওদের ছায়া পড়ে, তা হলে কি যেন হয় ভুলে যাচ্ছি—একটা কঠিন অসুখ বিসুখ কিম্বা ঐরকমই কিছু। সাধে আর বিষ্ণুশর্ম্মা সেই বুড়ো শকুনটার নাম দিয়েছিলেন 'জরদ্গব'? ওরা 'জরদ্গব'ই বটে—ওদের দেখো আর মারো।

রাগের মাত্রা পূর্ণ করে নিয়েই আমি বন্দুকটাকে চোখের সামনে তুলে ধরলুম। গঙ্গারাম ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে—'বন্দুকটায় ধাক্কা দেয় দাদা, বুকে না বাধিয়ে, হাতের গুলেতে বাধাও'। গঙ্গারামের সাময়িক সতর্কীকরণ গ্রাহ্য করে নিয়ে আমি মিনিটখানেক ধরে তালগাছস্থ শকুনের প্রতি লক্ষ্য স্থির করলুম। তারপরই যেমন ঘোড়া টেপা, অমনি কানে তালা এবং চোখের সাম্‌নে ধোঁয়া। সে দুটো অবশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে গেল, কিন্তু শকুন কোথায়? আমি গঙ্গারামকে জিজ্ঞাসা করলুম 'পড়েচে নারে?' গঙ্গারাম হেসে বল্লে—'পড়লো আর কৈ দাদা? তুমি দেখ্‌তে পেলে না? সোজা মাঠ পার হয়ে উড়ে চলে গেল।'

বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে আমি বল্লুম 'হতেই পারে না। নিশ্চয় লেগেছে।' আর কেউ হলে এ কথায় উত্তর দিত, 'তাহলে বাসায় গিয়ে মরবে'; কিন্তু গঙ্গারাম ত আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে পারে না। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাতে লাগ্‌লো। আমি ঈষৎ ভৎসনার স্বরে বল্লুম—'কেন, বুঝতে পাচ্ছিস না? ডানায় লেগেছে। ডানায় লাগ্‌লে ত আর মরে না। আচ্ছা এইবার দেখ্।'

আমার রোখ চড়ে গিয়েচে দেখে গঙ্গারাম বোধ হয় কিছু কৌতুক অনুভব করছিল। সে কোন উচ্চবাচ্য না করে ছিপে সুতো গুটোতে লাগ্‌লো। বন্দুকের আওয়াজ শুনে সাম্‌নের দিগন্তপ্রসারী সবুজ ধানের ঢেউ ভেদ করে দু তিনটী চাষার মাথা চকিতের জন্য উঁচু হয়ে উঠেই আবার ডুবে গেল। কিন্তু কয়েকটি অর্দ্ধ-উলঙ্গ চাষার ছেলে, যাদের কৌতূহল অত সহজে নিবৃত্ত হবার নয়, তারা 'দ্যাওড় দিচ্ছে' বলে ক্ষেত্র-মধ্যবর্ত্তী আ'লের উপর দিয়ে দৌড়ে আসতে লাগ্‌লো।

দোনলা বন্দুক, আর একটা টোটা নিশ্চয়ই আছে এই মনে করে আমি বন্দুক কাঁধে ফেলে দু এক পা করে এগোতে লাগলুম। একটু তফাতে না গেলে ত আর নতুন শিকার মিলবে না।

সোহাগীর মা রাত্রের এঁটো থালা-বাসন নিয়ে ঘাটে আসছিল। গঙ্গারাম ছিপ ও খালুই তার জিম্মা করে দিয়ে নির্ব্বাক সহিষ্ণুতার সঙ্গে আমার পিছনে পিছনে চল্লো এবং তারও পিছনে চল্লো একদল কলভাষী চাষার ছেলে। এবার তারাও দর্শক। এবার সত্যই মান-সঙ্কট।

প্রায় এক পোয়া পথ মাঠের ভিতর দিয়ে ধীর পদক্ষেপে চল্লুম। ভোরের মিষ্টি হাওয়া মাথার চুলের মধ্যে বুলিয়ে দিতে লাগলো কোন্ অদৃশ্য মায়ের পাঁচ আঙুলের স্পর্শ। এমন টাট্‌কা তাজা হাওয়া কি মাঠের মধ্যে না এলে পাওয়া যায়? বুকপোরা নিশ্বাস আপনা হতে বইতে লাগ্‌লো। এরই নাম স্বাভাবিক প্রাণায়াম। এক জোড়া ক্ষুধার্ত্ত ফুসফুস যেন কত কাল পরে বাইরের অনন্ত প্রাণ-ভাণ্ডার হতে প্রাণ সঞ্চয় করবার ছুটি পেয়েছে।

পাখী মারার কথা ভুলে গেলুম। পায়ের জুতো খুলে একজন চাষার ছেলের হাতে দিয়ে বল্লুম—'ধর্।' ঘাসের শিশির যা জুতো ছাড়িয়ে গোড়ালির উপর দিকটা ভিজিয়ে তুলেছিল, তার প্রাণজুড়োনো ঠাণ্ডা কি সমস্ত পায়ে না

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

লাগিয়ে থাকা যায়? কলকাতার সংঘর্ষময় জীবনের যত কিছু সঞ্চিত উত্তাপ পায়ের তলা দিয়ে বেরিয়ে যাক্।

আর কি মিষ্টি লাগ্‌ছিল দু'পাশের ধানের গন্ধ! যেন সত্যই প্রকৃতি-মায়ের অঞ্চলচ্যুত অনুগ্র-মধুর সৌরভ। আমন ধানের ঝাড়গুলো থোড় অবস্থা পার হয়ে সবে শীষ ফেলেচে—এক এক শীষে কতনা সবুজ চিটে, কোনটায় দুধ হয়েচে, কোনটায় হয়নি। এ যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল, তাদের কিন্তু আমরা দেখ্‌তে পাই না—তারা যুগযুগান্ত হতে তাদের কীর্ত্তিস্তূপের আড়ালেই অবজ্ঞাত হয়ে লুকিয়ে আছে।

অনেক দূরে এসে পড়েছি—আর কিছু দূরেই বিলের অস্পষ্ট রেখা। বিল এখনো বিশেষ সঙ্কুচিত হয়নি। ওপারের গ্রামের কিনার পর্য্যন্ত তার দেহবিস্তারের আভাস। পিছনে চেয়ে দেখি আমাদের গ্রামখানা দূর-দূরান্তরের অন্যান্য গ্রামের মতই ঘন পল্লবের আড়ালে আত্মগোপন করেচে—কেবল তার শ্যামল প্রাচীরের উপর মাথা জাগিয়ে রয়েচে আমাদেরই কোঠাবাড়ির 'চাঁলে কুঠরী'টা। তার মাথার সাদা কলসীগুলো, কাঁচা রোদের স্নিগ্ধ চুম্বনে সোনার কলসীর মতো ঝল্‌মল করচে।

সৌন্দর্য্যের ভাবাবেশ ভাঙ্গিয়ে দিয়ে হঠাৎ একজন চাষার ছেলে ব্যগ্রস্বরে বলে উঠ্‌লো—'হাদ্ দেখেন্ কত্তা একটা কুঁজি বক।' চেয়ে দেখি পথের ধারের শুক্‌নো নালাটার মধ্যে এক জায়গায় একটু জল জমে আছে, আর তার উপরে যে বাব্‌লা গাছটা নিজের প্রতিবিম্ব দেখবার জন্য ঝুঁকে পড়েচে তারই একটা কণ্টকিত ডালের উপর বসে আছে একটা সাধনানিষ্ঠ বক। তার অধোনিবদ্ধ দৃষ্টির একাগ্রতা ভঙ্গ করবার মত কাছাকাছি যেতে আমি সকলকে বারণ করলুম।

হাঁ, এও একটা উপযুক্ত শিকার। ও জাতটারই উপর আমার আর কোন দয়া নেই। ওরা বড় কৃতঘ্ন। আমার বেশ মনে পড়ে ছেলেবেলায় একটা বক আঁধার রাতের ঝড়ঝাপটে ঘুরপাক খেয়ে আমাদের উঠানে পড়েছিল। আমি তাকে আদর করে ধরে খাঁচায় পুরেছিলুম। সে যে মাছ খায় তা কি আমার তখন জানা ছিল? আমি তাকে দুপুর রাতে গেলুম দুধকলা খাওয়াতে, আর সে মারলে সটান আমার ভুরুর উপর এক ঠোকর—আর একটু হলেই চোখ উপড়ে দিয়েছিল আর কি।

রাগ তেমন জম্‌চেনা দেখে আমি গঙ্গারামকে জিজ্ঞাসা করলুম—'হাঁরে, বকের মাংস কি খায়?' গঙ্গারাম তার সেই একগাল মামুলী হাসি হেসে বল্‌লে, "খাইনি তো কখনো দাদা, তবে শুনেছি বেদেরাও খায় বুনোরাও খায়। ভাল করে' রাঁধলে আর মন্দ লাগ্‌বে কেন?"

—"যা যাঃ, ও অখাদ্য। কিন্তু বকগুলো ভারি পাজি, কি বলিস?"

—"সে আর বলচো দাদা। পুকুরের অর্দ্ধেক মাছইত সাবাড় করে ওরা। মাছ হচ্চে আমাদের খাবার. ওরা কি জন্যে খাবে? ওদের মতন চোর আর আছে?"

মাছ কাদের খাবার? কারা চুরি করে খায়? আমি বিরক্ত হয়ে বল্‌লুম—"তোর কেবল বাজে কথা। বলি, খাবার যদি ওদেরই হয় তাব'লে ঐরকম করে খাবে? আগে ঠুকে আছড়ে মেরে নিক্, তা না জলজ্যান্ত মাছটা ধড়ফড় করচে আর তাকেই ধরে গিলবে! লক্ষ্মণ ঠিকই বলেছিলেন ওরা পরম দারুণ, ওরা শকুনের চেয়েও নৃশংস।"

—"ওরা একেবারে রাক্ষস দাদা—গিলচে না গিলচেই। ঐটুকুন তো পেট, ধরায় কোথায় তাই ভাবি।"

—"কিছু না, ওরা শকুনের চেয়েও নৃশংস।" আমি হাঁটু পেতে বসে বন্দুক তুলে ধরলুম। গঙ্গারাম বাধা দিয়ে বল্‌লে—"দাঁড়াও দাদা, ও একানে গুলি, একটা ছর্‌রা পরিয়ে দিই।" 'জানি'র চেয়ে 'কি-জানি'র পরিসর যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য।

টোটা বদলের পর আমি কিছুক্ষণ তাগ করে নিয়েই বল্লুম—'দেখ্ গঙ্গা', কেননা এবার শিকারের দূরত্ব মাত্র বিশ পাঁচিশ হাত। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই কোথায় বকটা মূর্চ্ছিত হয়ে ঘুরে পড়বে, তা না ক্যা ক্যা শব্দে খানিকটা সোজা উপর দিকে উঠেই আমাকে তার লম্বা পিছনের পা দুটো দেখাতে দেখাতে উধাও হয়ে গেল।

'তাইত' বলে আমি পিছন দিকে চেয়ে দেখি গঙ্গারাম মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েচে। বোধ হয় তার মুখের চেহারায় এমন

কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটেচে, যা সম্ভ্রমের খাতিরেই সে আমাকে দেখাতে পারে না। চাষার ছেলেগুলো কিন্তু হি হি করে হেসে এমন সব কথা বলাবলি করতে লাগ্‌লো যা আমার লক্ষ্যভেদের শক্তির প্রশংসা নয়।

তাদের একটা ধমক দিয়েই আমি গঙ্গারামকে বল্‌লুম— 'আর টোটা নেই ?'

গঙ্গারাম চকিতের মধ্যেই নিজেকে সংযত করে নিয়ে বল্লে,—'আছে আর দুটো, পরিয়ে দিচ্চি।'

এবার গাদা বন্দুক নিয়ে আমি হন্ হন্ করে বিলের দিকে চল্‌লুম।— ঠিক বিলের কাছ বরাবর গিয়েছি এমন সময় গঙ্গারাম আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা ফিস্ ফিস্ স্বরে বল্‌লে- -'দাঁড়াও দাদা, একটা ঘড়িয়া।'

ঘড়িয়া হয়ত কোন হিংস্র জন্তু হবে এই মনে করে আমি বিবর্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করলুম—'ঘড়িয়া কি রে ?'

—"ঘড়িয়া জান না ? নরাল, সরাল, দীঘেড়ি, কাল-কুচ, মাণিকজোড় ঘড়িয়া এই সবই ত বিলে পাখী। ঐ দেখ, জলের মধ্যে কতকগুলো লম্বা ঘাস আর শরগাছ, তারই মধ্যে—দেখতে পাচ্চো ?"

খুব নজর করে দেখতে পেলুম বটে একটা ছোট্ট হাঁস জাতীয় পাখী। চার পাশের কহ্লার ফুলের মধ্যে তার ছোট দেহটি মানিয়েছিল বেশ। আমি বসে পড়ে বন্দুক উঁচু করতেই গঙ্গারাম অনুনয়ের সুরে বল্‌লে. "দাদা, এবার না হয় আমাকে দাও, ও খুব ভালো পাখী।"

তার কথার ভিতরকার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা আমার কর্ণমূলকে লাল করে দিলে। আমি কোন কথা না বলে বন্দুকের নিশানে মনঃসংযোগ করলুম। গঙ্গারাম ও চাষার ছেলেরা প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে শুয়ে পড়লো।

বন্দুকের ডগা হতে একটা ধোঁয়ার রেখা জলের ভিতরকার শরবনের মধ্যে চলে গেল। কিন্তু ঘড়িয়া আর নেই। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে গঙ্গারাম বল্‌লে—'পালিয়েছে।'

'কোথা দিয়ে পালালো ? দেখলুম না তো। গুলি খেয়ে ডুবে গিয়েছে নিশ্চয়।'

'না দাদা, ডোবে কখনো ? ওরা হাঁসের চেয়েও হাল্কা।'

এ কথায় কি আমার সন্দেহ মেটে ? আমি লক্ষ্য স্থানে গিয়ে পুলিসের খানাতল্লাসীর চেয়েও বেশী করে জল-তল্লাস করালুম। কিন্তু সে ফেরার পাখীর সন্ধান মিললো না।

একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য নিয়ে আমি বাড়ী ফির্‌তে লাগলুম। আমার বেশ বিশ্বাস, তখন যদি স্বয়ং বিধাতা পুরুষও সাম্‌নে এসে বল্‌তেন 'বর নে', আমি পাশ কাটিয়ে বল্‌তুম—'যান্—যান্।'

মাঠ পার হয়ে, খিড়কীর ডোবার 'পাউড়ি'তে পা দিয়েই মনে হলো যে বন্দুকে আর একটা টোটা আছে। সেটা আর রাখি কেন ? যা হোক্ কিছু লক্ষ্য করে ছুঁড়ে ফেলি। এই যাহোক কিছুর উদ্দেশে ইতস্তত চাইতেই দেখি পালেদের বাড়ীর লাগোয়া বাঁশঝাড়টার উপর দুটো ঘুঘু বসে আছে। আন্দাজে মনে হল তারা শ'খানেক হাত দূরে। তাদের দিকেই ছুঁড়ি। লাগবে ত না জানা কথা। লাগবার হলে আর কুড়ি পঁচিশ হাত দূরের পাখী পালায় ?

বিশেষ কোনই তাগ না করে দিলুম বন্দুক ছেড়ে। গঙ্গারাম চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—'পড়েচে, দাদা পড়েচে।'

একটা চাষার ছেলে হাততালি দিয়ে নেচে উঠে বল্‌লে, —'কত্তাবাবু যে এবার তাগ নিলো না, নৈলে দুডোই পড়তো।'

গঙ্গারাম দৌড়ে গিয়ে আমার শিকার করা পাখীটিকে যখন নিয়ে এসে আমার সামনে ধরলে, তখন দেখলুম তার কচি বুকখানি শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেছে—চোখের উপর সাদা পরদা টানা;—লট্‌কানো গলাটির পাশ বেয়ে টাট্‌কা রক্ত ঠোঁটের ডগা দিয়ে ঝ'রে পড়চে।

গঙ্গারাম উৎফুল্লস্বরে বল্‌লে—'দাদার হাত কখনো নিষ্ফলা যায় ? এর মাংসও বড় মন্দ নয়।' আমি তাড়াতাড়ি তার হাতে বন্দুকটা দিয়ে খিড়কীর দরজার দিকে অগ্রসর হলুম।

"ওদিক দিয়ে কেন দাদা ? বৈঠকখানার সামনে দিয়ে চলো। সকলকে দেখিয়ে যাই—"গঙ্গারামের এই সোৎসাহ বাক্যের উত্তরে আমি যখন কেবল 'না, নাঃ' বলে খিড়কীর দরজা দিয়েই বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লুম, তখন সে অকথ্য বিস্ময়ে কিছুক্ষণ আমার গতিপথের দিকে চেয়ে রইলো।

দেশছাড়া

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

সেদিন দুপুর বেলা যখন খাবার ডাক পড়লো তখন গিয়ে দেখি আমার থালের সামনে একবাটি মাংস। ন'খুড়িমা পরিবেশন করছিলেন। আমি তাঁকে ডেকে বল্লুম—'মাংসের বাটি তুলে নিয়ে যান্।' গঙ্গারাম পাশেই ছিল—সে চমকিত হয়ে বল্লে—"কেন, কেন ?—ও তুমিই খাও। আমরা ঢের খেয়ে থাকি।" আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলুম 'ঘুঘুর মাংস আমি খাই না।' ন'খুড়িমা বাটি তুলতে তুলতে বল্লেন, —"আচ্ছা পাতে একটু দিয়ে যাই বাবা, তোমার নাম করে গরম মস্লা দিয়ে—রেঁধেছি।" আমি ত্রস্তভাবে দু'হাত নেড়ে বল্লুম—'না, না একটুও না—ঘেন্না করে।'

খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমি আমার উপরের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। অন্যদিন যে ইংরাজী নভেলখানার এক অধ্যায় পড়তেই ঘুমিয়ে পড়ি সেদিন তার তিনটে অধ্যায় একটানে পড়ে গেলুম। সমস্ত বাড়ী তখন নিশুতি হয়ে গেছে—সমস্ত প্রকৃতি নিস্তব্ধ। রৌদ্রক্লান্ত পৃথিবীও যেন মানুষের মতই বিশ্রাম-সুখে মগ্ন।

হঠাৎ দূর হতে ভেসে এলো একটা অতি ক্ষীণ ধ্বনি—'ঘুর্‌র্—ঘু—উ—ঘু।' এ ত ঘুঘুর ডাক। কিন্তু ঘুঘুর ডাক এত করুণ লাগ্‌চে কেন? এত করুণ ডাক তো কখনো শুনিনি। না, এ ভাল লাগচে না। উঠে গিয়ে জান্‌লা বন্ধ করে দিলুম।

তবু শোনা যাচ্ছে। 'ঘুর্‌র্—ঘু—উ—ঘু।' আরো করুণ, আরো হৃদয়বিদারক। এ অসহ্য করুণ সুরের ডাক কি থামবে না? এ ত ক্ষুধার ডাক নয়, ভয়ের ডাক নয়, মত্ত আহ্বানের ডাকও নয়—এ যেন প্রকৃতির দরবারে একটা সদ্য-বিরহের বুকফাটা নালিস। কি করলে এ ডাক থামে?

আপনা হতেই থাম্‌লো। আমি শান্তির নিশ্বাস ফেলে সিগার-কেস্ হতে একটা সিগার বের করে মুখে দিলুম। কিন্তু ওকি! আবার সেই ডাক! এবার দক্ষিণে নয় উত্তরে। একি আর একটা ঘুঘু! না, না ডাক যে সেই একই। বাড়ীর ছেলেরা সব গেল কোথায়? একটু চেঁচামেচি গোলমাল করলেও ত বাঁচতুম।

আবার ডাক থাম্‌লো। ভাবলুম আর বোধ হয় ডাক্‌বে না। কিন্তু মিথ্যা আশা। একটু পরেই আবার পূব দিক হতে ভেসে আস্‌তে লাগ্‌লো সেই অসহ্য করুণ 'ঘুর্‌র্—ঘু—উ—ঘু।'

আশ্চর্য্য! সেই একই ঘুঘুটা—এদিকে ওদিকে সবদিকে। ও কি এক জায়গায় স্থির থাকতে পারচে না? ছট্‌ফট্ করে দিকে দিকে উড়ে কেঁদে বেড়াচ্চে?

সেই দিনই সন্ধ্যার গাড়ীতে কলকাতায় রওনা হলুম সেই অবধি কলকাতাতেই আছি, আর দেশে যাই নি।

আর বছর গঙ্গারাম ওষুধ কেনবার জন্য কলকাতায় এসে বল্লে—'দাদা কি একেবারে দেশছাড়া হলে?' আমি উত্তর করলুম—"হলুম আর কৈ, করলে।"

—"কে দেশছাড়া কর্‌লে?"

—"আমি যাকে সঙ্গীছাড়া করেছি।"

গঙ্গারাম অবাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।
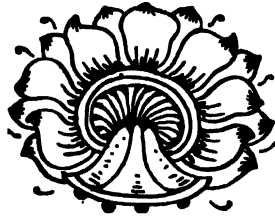
রেখা-চিত্র

শ্রীযুক্ত অসিত কুমার হালদারের
চিত্রাবলী হইতে তাঁহার সৌজন্যে

শ্রীমতী উল্লা

শ্রীমতী ফ্লাউম্

কুমারী-ক্যামরিশ

কুমারী-গ্রীন
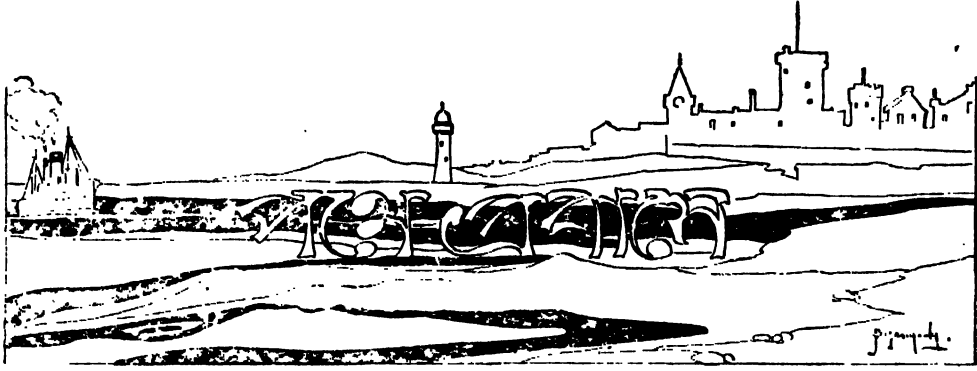
—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

৪

নতুন দেশে এলে মানুষের সব ক'টা ইন্দ্রিয় এক সঙ্গে এমন সচেতন হ'য়ে ওঠে যে, মিষ্টান্নের দোকানে শিশুর মতো মানুষ কেবলি উতলা হ'য়ে ভাবে, কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখি, কোনটা ছেড়ে কোনটা শুনি, কোনটা রেখে কোনটা নিই। একান্ত তুচ্ছ যে, সেও নবীনত্বের রসে ডুব দিয়ে রূপ-কথার দাসী-কন্যার মতো রাণীর যৌবন নিয়ে সম্মুখে দাঁড়ায়; বলে, দেখ দেখ আমাকে দেখ, আমি ভালো নই মন্দ নই, সুন্দর নই কুৎসিৎ নই, আমি রূপবান আমি নতুন। তখন মানুষের ভিতরকার রসিকটি দেহ-দুর্গের চার দেওয়ালের দশ জানালা খুলে দিয়ে জানালার ধারে বসে। সে নীতিনিপুণ নয়, সে ভালোমন্দ ভাগ ক'রে ওজন ক'রে বিচার করতে পারে না, সে কেবল দেখ্‌তে শুন্‌তে চাখ্‌তে ছুঁতে চায়; কিন্তু কত দেখ্‌বে কত শুন্‌বে কত চাখ্‌বে কত ছোঁবে! হায় আমার যদি সহস্রটা চোখ সহস্রটা কান থাক্‌ত, আর থাক্‌ত সহস্রটা—না, না, পাঁচশোটা—মন, তাহলে জগতের আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ এমন ব্যর্থ যেত না। তাহলে আমি হাল ছেড়ে দিয়ে ঘরের কোণে বাতির নীচে আগুনের দিকে পিঠ ক'রে ব'সে "বিচিত্রার" জন্যে ভ্রমণকাহিনী লিখ্‌তুম না, আমি আরেক বিচিত্রার দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী অফুরন্ত লীলা উপভোগ করতে পথে বেরিয়ে পড়তুম। কিন্তু দ্যুলোক ব্যাপী?—হায়, লণ্ডনের কি দ্যুলোক আছে! লণ্ডনের লঙ্কা-পুরীতে ভুবনের ঐশ্বর্য্য আহৃত, কিন্তু লণ্ডনের আকাশ নেই, সূর্য্য নেই, চন্দ্র নেই, তারা নেই। দিনের পর দিন যায়, সূর্য্য উঠে না, আকাশ মানিনীর মতো মুখ আঁধার ক'রে রাখে, আর আমরা নিরীহ লণ্ডনবাসীরা পিতামাতার দ্বন্দ্বে অবোধ শিশুর মতো অবহেলিত হ'য়ে আলোর ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হই। আমাদের জ্যেষ্ঠরা যাঁরা লণ্ডনের কোলে দীর্ঘকাল আছেন তাঁরা হিন্দু বিধবার মতো উপবাস সইতে অভ্যস্ত, কিন্তু আমরা কনিষ্ঠরা আলোর দেশ থেকে সদ্য আগন্তুক, ডাল ভাতের বদলে মাংস রুটি খেয়ে দেহ ধারণ করতে যদিচ পারি, তবু সূর্য্যের আলোর অভাবে গ্যাসের আলো ছুঁইয়ে মনের বৃন্তে ফুল ধরাতে পারিনে। শুনেছি রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে এলে, শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগে অর্জ্জুন যেমন গাণ্ডীব তুল্‌তে অক্ষম হয়েছিলেন, রবির বিরহে কবিতা লিখ্‌তে তেম্‌নি অক্ষম হন। আলোর দেশের মানুষের দেহ আলোর সঙ্গে ছন্দ রেখে গড়া, তার লোমকূপে-কূপে আলোর আকাঙ্ক্ষা জঠরজ্বালার মতোই সত্য। সেই দেহের ওপরে যখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ অনবচ্ছিন্ন অন্ধকারের চাপ পড়ে তখন মন বেশি দিন অস্বস্তির ছোঁয়াচ এড়াতে পারে না, সূর্য্যাস্তের পরে তরুর মতো মাথা যেন নিস্তেজ হয়ে নুয়ে পড়ে।

বাসক-সজ্জা

মিশ্‌ব ধুলোয়---তার আগেতে সময়টুকুর সদ্-ব্যভার
ক্ষতি ক'রে নাই ক'রি কোন ? দিন কয়েকেই সব কাবার !—

—ওমর খৈয়াম (কান্তিচন্দ্র)

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র

পথে-প্রবাসে

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

এক একদিন কালো কুয়াশায় দিনের ভিতর রাতের জের চলে, রাতের দুঃস্বপ্ন যেন বুকের ওপরে ব'সে ক্ষান্ত হয় না দিনের বেলা মনেরও ওপরে চাপে। এক একদিন শাদা কুয়াশায় সাম্‌নের মানুষ দেখা যায় না, পদাতিকের দল "চলি-চলি-পা-পা" ক'রে শিশুর মতো হাঁটে, মোটর গাড়ীতে ঘোড়ার গাড়ীতে মন্থরতার প্রতিযোগিতা বাধে, তবু তো শুনি গাড়ীতে গাড়ীতে মাথা ফাটাফাটি হয়, পথের মানুষ গাড়ী চাপা পড়ে মরে। হঠাৎ এক একদিন মেঘ-ধোঁয়া-কুয়াশার পর্দ্দা তুলে আকাশের অন্তঃপুরে সূর্য্যের পদপাত হয়, আমাদের মুখের ওপরে খুসীর হাসির লহর খেলে যায়। দু'দিন সপ্তাহে একদিন করে আলোর জোয়ার আসে, দু'এক ঘণ্টায় তার ভাঁটা পড়ে, তবু সেই দু'টি একটি ঘণ্টার জন্যে আমরা সমরখন্দ ও বোখারা দান করতে রাজি আছি। এক সহস্র ক্যাণ্ডল্‌পাওয়ার বিশিষ্ট বিজলীর আলোর চেয়ে এক কণা সূর্য্যের আলোর দাম যে কত বেশি তা যেদিন নয়নঙ্গম হয়, সেদিন

"না চাহিতে মোরে যা করেছ দান
আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ"

সে মহাদানের মূল্য হৃদয়ঙ্গম করে লণ্ডনের বিভবসম্ভোগ তুচ্ছ মনে হয়। দৈবাৎ এক আধবার চাঁদ দেখা দেয়। আমার বিরহী বন্ধুটি খবর দিয়ে যায়—চাঁদ উঠেছে। বাংলা দেশের চাঁদ, সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে আসা চাঁদ, কোন বিরহিনীর পাঠিয়ে দেওয়া চাঁদ। আমাদের কাছে চাঁদের মতো আশ্চর্য্য আর নেই, সে তো কেবল আলো দেয় না, সে দেয় সুধা। বিজলীর আলোর সঙ্গে তার তফাৎ ঐখানে। সভ্যতা আমাদের কেরোসিনের আলোর পরে গ্যাসের ও গ্যাসের আলোর পরে বিজলীর আলো দিয়ে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে চলেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি আমাদের দয়া করে যে সুধাটুকু দিয়েছে সভ্যতা তার পরিমাণ বাড়াতে পারেনি।

কথা হচ্ছিল নতুন দেশে এলে মানুষের সবকটা ইন্দ্রিয় একসঙ্গে এমন সচেতন হয়ে ওঠে যে, মানুষের দশা হয় সেই ভদ্রলোকের মতো যে ভদ্রলোক এক পাল আত্মীয় পরিবৃত হয়ে কাশীতে বা পুরীতে ট্রেন থেকে নামেন। দশটা পাণ্ডা যখন দশটি আত্মীয়কে ছিনিয়ে নিয়ে দশদিকে রওয়ানা হয় এবং আরো দশটা এসে কর্ত্তার দশ অঙ্গে টান মারে, তখন তাঁর যে অবস্থা হয় আমার মনেরও এখন সেই অবস্থা। ঘর ছেড়ে একবার যদি বা'র হই তো লণ্ডন সহরের সব ক'টা রাস্তা একসঙ্গে আহ্বান করতে থাকবে, "এদিকে, বন্ধু, এদিকে," সব ক'টা মাঠ উদ্যান সব কটা মিউজিয়াম আর্ট গ্যালারী থিয়েটার কন্সার্ট সমবেতস্বরে গান ক'রে উঠবে, "এখানে, বন্ধু, এখানে।" তাদের আহ্বান যদি নাই শুনি, যদি কোনো একটা রাস্তা ধ'রে ক্ষ্যাপার মতো যেদিকে খুসি পা চালাই, তবে মানব-মানবীর শোভাযাত্রা থেকে কত রঙের পোষাক কত ভঙ্গীর সাজ কত রাজ্যের ফুলের মতো মুখ আমার চোখ দু'টিকে এমন ইঙ্গিতে ডাকবে যে, মনটা হাল ছেড়ে দিয়ে ভাববে, এর চেয়ে চুপ ক'রে ঘরে ব'সে ভ্রমণ-কাহিনী লেখা ভালো, বৈরাগ্যবিলাসীর মতো সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ ক'রে সর্ব্ব প্রলোভনের অতীত হওয়া ভালো, সুরদাসের মতো দু'টি চক্ষু বিদ্ধ ক'রে ভুবনমোহিনী মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ভালো।

আমি ঘরে ব'সে লিখ্‌ছি, আমার চোখজোড়া অশ্ব মেধের ঘোড়ার মতো ভূপ্রদক্ষিণে বেরিয়েছে। প্রথমে যেখানে গেল সেটা আমাদের বাড়ীর পাশের টেনিসকোর্ট, সেখানে যুবকযুবতীরা লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে ছুটে হেসে হেসে খেলছে। যে দুটো জাতির পরস্পর থেকে শত হস্ত ব্যবধানে থাকা উচিত, সেই দুটো জাতি যে বয়সে মানুষের শিরায় শিরায় ভোগবতীর বন্যা ছোটে সেই বয়সে কেবল যে স্বাস্থ্যের জন্যে শীতবাতাসের মধ্যে আঁধার আকাশের তলে খেলা করচে তা নয়, সেই সঙ্গে এত প্রচুর হাসুচে যে, ভারতবর্ষের লোক মোহমুদ্গরের আমল থেকে আজ অবধি সব মিলিয়ে এত হাসি হাসেনি। আমার চোখ ঘরের জানালা ছেড়ে রাস্তায় নাম্‌ল। আমাদের পাড়ার বাড়ীগুলো এক-পায় দাঁড়িয়ে থাকা ঘুমন্ত বকের মতো নিস্তব্ধ, এটা একটা শহরতলী। সাম্‌নের বাড়ীর ঝি মাটিতে হাঁটু গেড়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে সিঁড়ির ওপর ন্যাতা বুলোচ্ছে, তার হাত প্রতি দেশের কল্যাণী নারীর হাত, ধুলা যার স্পর্শ পেয়ে প্রত্যহ শুচি হয়। আমার চোখ এগিয়ে চল্‌ল। এর পরের রাস্তাটা পাহাড় থেকে

নেমেছে, তার নাম্‌বার মুখে খাস লণ্ডন। নাম্‌তে নাম্‌তে দেখ্‌ছি, ছোট ছেলের দল পায় চাকা বেঁধে ফুটপাথের ওপর দিয়ে সোঁ ক'রে নেমে চলেছে, চল্‌তে চল্‌তে বাধালো হয়ত কোনো বুড়ো ভদ্রলোকের গায় ধাক্কা, বার্দ্ধক্যের চোখ তারুণ্যের দিকে কোমল ভাবে চাইল। ছোট মেয়েরা দোকানের কাঁচের বাইরে থেকে ভিতরের কেক্ চকোলেটের দিকে লুব্ধ নিরাশ দৃষ্টি ফেল্‌ছে, হয়ত দার্শনিকের মতো ভাব্‌ছে, কমল যদি এত সুন্দর তো কমলে কণ্টক কেন? চকোলেট যদি এত সুস্বাদ তো চকোলেটের চারপাশে কাঁচের বেড়া কেন? আমার চোখ পথে চল্‌তে চল্‌তে দেখ্‌ছে মদের দোকানের ওপর বিজ্ঞাপনের নামাবলী, গির্জ্জার দ্বারদেশে মুদ্রিত ধর্ম্মানুশাসন, কসাইয়ের দোকানে দোদুল্যমান হৃতচর্ম্ম পশুর শব, কেমিষ্টের দোকানে নানারোগের দাওয়াই, পোষাকের দোকানের কাঁচের একপারে হঠাৎ থামা নারীর কৌতূহল-দৃষ্টি, অন্যপারে চোখ-ভুলানো পোষাকের নমুনা ও দাম। ফলের দোকানের কর্ম্মচারিণী বাইরের কাঁচ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার কর্‌ছে। "এম্‌প্লয়মেণ্ট্ এজেন্সী"র কর্ত্রী ঝি-দের জন্যে গিন্নী ও গিন্নীদের জন্যে ঝি ঠিক ক'রে দিচ্ছে। সরকারী ইস্কুলের এক প্রান্তে ছেলেরা ও অপর প্রান্তে মেয়েরা সমান বিক্রমে মাতামাতি কর্‌ছে; তাদের ভাগ্য ভালো ভারতবর্ষে জন্মায়নি, সে দেশে জন্মালে এতদিনে ছেলেরা গোপাল হ'য়ে উঠ্‌ত মেয়েরা মেয়ের মা হতো।

আণ্ডার গ্রাউণ্ড্ রেলওয়ে ষ্টেশনের কাছে এসে আমার চোখ দোটানায় পড়েছে—ট্রেনে চড়বে, না, বাসে উঠ্‌বে? বাসেই উঠ্‌ল, দোতালার এককোণে আসন নিলো দুপাশে দোকান বাজার—দোকানে ক্রেতা ক্রেত্রীর ভীড়—কর্ম্মচারিণীদের ব্যস্ততা—উভয়পক্ষে শিষ্টাচার। রেস্ত'রাঁ—দলে দলে নরনারী আহারে রত—পরিবেশনকারিণীদের মর্‌বার ফুরসৎ নেই—ছুরী কাঁটা প্লেটের ঝনৎকার—সুখভোগ্য খাদ্যপেয়ের সুগন্ধবাহী ধোঁয়া। রেস্তরাঁর বাইরে অন্ধ ভিক্ষুক চীরধারিণী পত্নীর হাত ধ'রে দেশলাই বেচ্‌ছে বা বাজনা বাজাচ্ছে বা ফুটপাথে ছবি আঁক্‌ছে। রাস্তা মেরামত কর্‌ছে কুলীরা, তাদের পরিধান কাদামাথা ও জীর্ণ, মুখে প্রতিদেশের কুলী-মজুরের মতো সরলতাব্যঞ্জক প্রাণখোলা হাসি। জমকালো পোষাকপরা অশ্বারোহী সৈনিক চলেছে, বুড়ারা হাই তুল্‌তে তুল্‌তে নির্নিমেষে দেখ্‌ছে। গতযুদ্ধে তাদের এমনি-সব ছেলেরা তো মরেছে, তরুণীরা গৃহবাতায়ন থেকে উল্লাসধ্বনি কর্‌ছে, যৌবন যে ঠেকেও শেখেনা, হারিয়েও হার'য় না। থিয়েটারের ম্যাটিনীর সময় হলো—টিকিট্ কেন্‌বার জন্যে স্ত্রী-পুরুষ "কিউ" (queue) ক'রে দাঁড়িয়েছে—দু'জনের পেছনে দু'জন—পুরুষের চেয়ে স্ত্রী সংখ্যা বেশি। সর্ব্বত্র পুরুষের চেয়ে স্ত্রী সংখ্যা বেশি—সভাসমিতিতে স্কুলে কলেজে থিয়েটারে কন্সার্টে দোকানে আপিসে সর্ব্বত্র নারীর আক্রমণে পুরুষ পলাতক—কেরানী মানে নারী, স্কুল শিক্ষক মানে নারী, গৃহভৃত্য মানে নারী। রাস্তার মোড়ে বাস্ থাম্‌ল—শালপ্রাংশু বলিষ্ঠকায় পুলিশের তর্জ্জনী-সংকেতে শতশত বাষ্পীয় যান থেমেচে—শতশত নরনারী রাস্তা পারাপার কর্‌চে—মেয়েরা ধাক্কা দিতে দিতে ধাক্কা খেতে খেতে ভীড়ের মধ্যে ছুটে মিলিয়ে যাচ্ছে ছট্‌কে বেরিয়ে পড়্‌ছে—শিশু কাঁধে নিয়ে শিশুর বাবা তার মা'র পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হচ্ছেন—বুড়াকে ঠেলাগাড়ীতে বসিয়ে বুড়ীর ছেলে-মেয়েরা মাঠে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে—প্রেমিক যুগল হাতে হাত জড়িয়ে বাজার ক'রে ফিরছেন। বাস্ চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে—একটা পার্কের কাছ দিয়ে যাচ্ছে—পার্কের বেঞ্চিতে ব'সে কাগজ পড়্‌তে পড়্‌তে দরিদ্ররা রুটি কাম্‌ড়ে খাচ্ছে—তাদের মধ্যাহ্ন ভোজনটা দু'একখানা রুটিতেই সমাপ্ত হচ্ছে।

বাস্ কলেজের কাছে থাম্‌তেই আমার চোখ জোড়াটা তৎক্ষণাৎ নেমে প'ড়ে দৌড় দিলে কলেজের অভিমুখে। কোনো অগ্রগামিনী হয়তো দয়া ক'রে দরজাটা খুলে রাখলেন, প্রবেশ ক'রে ধন্যবাদ দিয়ে কপাটটা খুলে ধরা গেল পশ্চাদাগতের জন্যে। তারপর ক্লাশে গিয়ে আসন অধিকার করা—অধ্যাপকের আগমনের আগে মেয়েদের তুমুল ফিস্‌ফাস্—কে কি সাজ করে এসেছে অন্যমনস্কতার ভাণ ক'রে দেখা ও দেখানো—লাফ দিয়ে পেছনের চেয়ার থেকে সাম্‌নের চেয়ারে যাওয়া—অধ্যাপকের প্রবেশ—অধ্যাপকোবাচ—সুবোধ বালিকাদের কর্ত্তৃক একান্ত তন্ময়ভাবে তাঁর প্রত্যেকটি

পথে-প্রবাসে

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

কথার শ্রুতিলিখন—পলাতকমতি উন্মনা বালক কর্ত্তৃক উপন্যাসপাঠ বা কবিতাসংরচন—বার বার ঘড়ির দিকে চাতক দৃষ্টিক্ষেপ—অবশেষে ছাত্রছাত্রীদের ছত্রভঙ্গ—ধাক্কা-ধাক্কিপূর্ব্বক ক্লাস থেকে বহির্গম।

নতুন দেশে এলে কেবল যে সব ক'টা ইন্দ্রিয় সহসা চঞ্চল হ'য়ে ওঠে তা নয়, সমস্ত মনটা নিজের অজ্ঞাতসারে খোলস ছাড়্তে ছাড়্তে কখন যে নতুন হ'য়ে ওঠে তা দেশে ফিরে গেলে দেশের লোকের চোখে খট্ ক'রে বাধে, নিজের চেখে ধরা পড়ে না। মানুষ খাদ্য পেয় সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু রক্ষণশীল, দেশী রান্নার স্বাদ পেলে রসনা আর কিছু চায় না। কাঁচা বাঁধাকাপি চিবিয়ে খেতে যতখানি উৎসাহ দরকার, বাঁধাকাপির ডাল্না-চাখা রসনা কোনো-জন্মে ততখানি উৎসাহ সংগ্রহ কর্তে পারে না। কিন্তু পরিচ্ছদ সম্বন্ধে মানুষের এতটা রক্ষণশীলতা নেই। দেশে যখন এক-আধ দিন কোট্-ট্রাউজার্স পরা যেত তখন সে কী অস্বস্তি! আর সে কী সাহেব-মানসিকতা! ধুতী পাঞ্জাবী পরা বাঙালীগুলোর উপরে তখন কী অকারণ করুণা! জাহাজে থাক্‌বার সময় জাহাজী কানুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে ধুতী পাঞ্জাবী পরার স্মৃতি মনে প'ড়ে গেলে হাসি পায়। এতদিনে ইউরোপীয় ধড়াচূড়া গায়ে ব'সে গেছে, চব্বিশ ঘণ্টা এই বেশে থাক্‌তে একটুও বেখাপ্পা বোধ হয় না; এখন মনে হয় এইটেই স্বাভাবিক, যেন এই পোষাক প'রে ভূমিষ্ঠ হয়েছি। প্রতিদিন যন্ত্রচালিতের মতো টাইটা বাঁধি, ট্রাউজার্স জোড়াটার হাঁ-দুটোতে পা-জোড়াটা গিলিয়ে দিই, মনখানেক ভারি ওভারকোটটার বাহন হ'য়ে চলি। দৈবাৎ কোনোদিন ধুতী পাঞ্জাবী চাদর বার ক'রে পরি তো আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস কর্‌তে পারিনে, আমোদের অন্ত থাকে না, জগৎকে দেখিয়ে আস্‌তে ইচ্ছা করে আমাদেরও জাতীয় পরিচ্ছদ আছে। কিন্তু আমাদের জাতীয় পরিচ্ছদ কি একটা? মান্দ্রাজী ভায়াদের সঙ্গে পাঞ্জাবী ভায়াদের আপাদমস্তক অমিল, বাঙালী মুসলমান পেশোয়ারী পাঠানের যমজ ভ্রাতা নন। আমার সফেদ্ ধুতী আর সবুজ পাঞ্জাবীটার ওপরে জরীর কাজ করা নীলকৃষ্ণ উত্তরীয়খানা জড়িয়ে ঘরের বাইরে পা বাড়াই তো রাস্তায় ভীড় জমে যাবে; পুলিশ যদি বা আমাকে মানুষ ব'লে না চিন্‌তে পেরে চিড়িয়াখানার কর্ত্তৃপক্ষদের হাতে সমর্পণ না করে তো ট্রাফিক বন্ধ করার অজুহাতে সার্ব্বজনীন শ্বশুরালয়ে চালান দেবে। মজা এই যে ইউরোপের লোকের ধারণা তাদের এই অপরূপ শ্রীবেশ বুঝি ভারতীয়দেরও স্বাভাবিক বেশ! তারা ভাব্‌তেই পারে না যে, মানুষের এ ছাড়া অন্য কোন রকম বেশ থাক্‌তে পারে। ইংরেজরা দেখে ফরাসী জার্ম্মান ইতালীয়ান সকলেরই গায় এই পোষাক, সুতরাং তাদেরি মতো বিদেশী যারা সেই চীনা জাপানী ভারতীয়দের গায়ে এই পোষাক দেখ্‌লে সাহেবিয়ানাগ্রস্ত ব'লে ঠাট্টা করতে পারে না। বরং না দেখ্‌লেই ফাল্ ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে, যেমন আমাদের মেয়েদের শাড়ী পর্‌তে দেখে একটা দৃশ্য দেখ্‌ল ভাবে।

নতুন দেশে এলে নতুন আবহাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে গোটা মানুষটারই একটা অন্তঃপরিবর্ত্তন ঘ'টে যায়। যাঁরা বলেন তাঁদের পরিবর্ত্তন হয়নি তাঁরা খুব সম্ভব জানেন না কোথায় কি ঘ'টে গেছে। দেশে ফের্‌বার সময় তাঁরা সর্ব্বাংশে—এমন কি মতবাদেও—ঠিক সেই মানুষটি থেকেই ফির্‌তে পারেন, কিন্তু মনেরও অগোচরে মানুষের কোনখানে কোন প্যাঁচটি আল্‌গা হ'য়ে যায় তা মানুষ কোনোদিন না জান্‌তে পার্‌লেও সত্যের নিয়ম অমোঘ। নিজেকে জেরা কর্‌লে বুঝতে পারি দেশে ফিরে গেলে আমার যেন সেই অবস্থা হবে যে অবস্থা হয় দীঘিতে ফিরে গেলে স্রোতের মাছের। ইউরোপের জীবনে যেন বন্যার উদ্দাম গতি সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করতে পাই, ভাবকর্ম্মের শতমুখী প্রবাহ মানুষকে ঘাটে ভিড়তে দিচ্ছে না, এক একটা শতাব্দীকে এক একটা দিনের মতো ছোটো ক'রে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সব চেয়ে স্বাভাবিক বোধ হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদিনের প্রতিকাজে সংযুক্ত থেকে নারী ও নরের একস্রোতে ভাসা। নারী সম্বন্ধে এ দেশের পুরুষ দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নিয়ে মুমূর্ষুর মতো বাঁচে না, নারীর মাধুর্য্য তার দেহকে ও মনকে ভূল্যরূপ সক্রিয় ক'রে তোলে। কেবল চোখে দেখারও একটা সুফল আছে, মানুষের রূপবোধকে তা ঐশ্বর্য্যান্বিত ক'রে দেয়। নারীকে অবরুদ্ধ রেখে আমাদের দেশের পুরুষ নিজের চোখের

জ্যোতিকে নিজের হাতে নিভিয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য কোনো বার লিখ্‌ব। যা আমার কাছে তর্ক নয় রহস্য নয় সহজ অনুভূতি তাই আমাদের দেশের লোকের কাছে বাক্যের সাহায্যে বোঝাতে হবে—দুর্ভাগ্য! বেশ বুঝ্‌তে পারি দেশে ফিরে গেলে দেশটা একটা পার্টিশান্ দেওয়া ঘরের মতো ঠেক্‌বে—একপাশে পুরুষ একপাশে নারী মাঝখানে সহস্র বৎসরের অন্ধ সংস্কার।

আর একটা সহজ অনুভূতি মানুষের সঙ্গে মানুষের সমস্কন্ধের মতো মেশা; কোনো ব্রাহ্মণের কাছে নতশির থাক্‌তে হয় না, কোনো দারোগার কাছে বুকের স্পন্দন গুণে চল্‌তে হয় না, কোনো মনিবের কাছে মাটিতে মিশিয়ে যেতে হয় না, মনুষ্যমর্য্যাদাগর্ব্বে প্রত্যেকটি মানুষ গর্ব্বিত। ভারতবর্ষের মাটীতে পা দিলে এই মুক্ত মানসিকতার অভাব সমস্ত মন দিয়ে বোধ করব, ভারতবর্ষ যে প্রভু-মানসিকতার দাস-মানসিকতার দেশ, সেখানে প্রত্যেকটি মানুষ একজনের দাস অন্য জনের প্রভু।
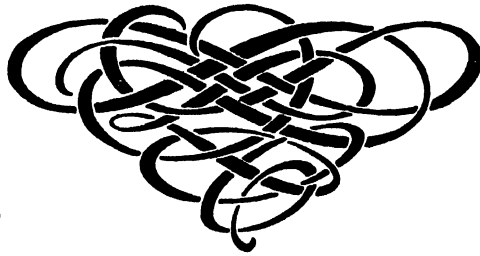
বাঁশীর ডাক

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

প্রথম দৃশ্য

[সাবেক আমোলের পাড়া-গেঁয়ে বৈঠকখানা। এক পাশে ঢালা বিছানা অপর প্রান্তে কটা চেয়ার ও একটি টেবিল রাখা আছে। রবিবর্ম্মার ছবিতে ঘরটি সুসজ্জিত। ঢালা বিছানায় তাকিয়া হেলান দিয়ে ফরসীনল মুখে নকুলেশ্বর বাবু তামাক খাচ্চেন, কেদারনাথ তাঁর সামনে বসে আর পানদানটা পাশে পড়ে রয়েচে, পীকদানটা নীচে রাখা।]

নকুলেশ্বর

কেদার, তোমায় ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলুম একটা বিশেষ কাজে।

কেদারনাথ

আজ্ঞে হাঁ, তা' আমি বেশ বুঝতে পার্‌চি, কাজ না থাকলে আপনি—

নকুলেশ্বর

না না তা' নয়, অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই, তাই ভাবলুম—

কেদারনাথ

তা' অনুমতি করুন, আপনার আদেশ পেলেই এই কলিতেই কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারি।

নকুলেশ্বর

(একটু হেসে) না হে না তা নয়, তবে শোনো, আমি এক মহা ভাব্‌নায় পড়েচি!

কেদারনাথ

ভাব্‌না? আপনার আবার ভাব্‌না কিসের, ঘরে যাঁর লক্ষ্মী বাঁধা!

নকুলেশ্বর

হাঁ এই লক্ষ্মীর সঙ্গে এক আলক্ষ্মীর যোগ হয়েচে বলেই ত এত গোলে পড়েচি!

কেদারনাথ

হাঁ, তা আমি জানি। তা' সত্যি আপনার মত ধনীর সংসারে এই এক হালফ্যাসানের কলেজ-পড়া মেয়ে এনে কি না ফ্যাসাদেই পড়েচেন!

নকুলেশ্বর

তা' কি করি বল? ছেলে ত শুনলে না, পছন্দ করে এক কাল সাপিনীকে বাড়ী আনলে।

কেদারনাথ

তাই ত, সেদিন রথতলায় দাঁড়িয়ে ওপাড়ার পদিপিসীর মামাতো ভাইয়ের পিসের খুড়তুতো বোন গেলিকে বলছিল 'এমন ছেলের কি এমন বৌ আন্‌তে আছে?

নকুলেশ্বর

কি করি বল, বৌয়ের ঘরের কাজে মন নেই, কেবল নভেল নাটক পড়বেন কবিতা আওড়াবেন। আর—

কেদারনাথ

হাঁ, শুনচি নাকি তার উপর ভারি হাত দরাজ! দুহাতে দান ধ্যান করচেন?

নকুলেশ্বর

তা' আছে। নিজে আহার নিদ্রা ছেড়ে যে কি করবে কিছুই ঠিক্ নেই। বড় খোকাকে বলি সে বলে 'তা' কি করব, ওতো আর খুকী নয় যে হাত ধরে খাইয়ে দেব।

[এক গয়লার বেগে বৈঠকখানায় প্রবেশ]

গয়লা

আজ্ঞে কর্ত্তা এর একটা বিহিত করুন !

নকুলেশ্বর

কি ? কি হল কি তোমার ?

গয়লা

হ'বে আবার কি ? আপনার পুত্রবধূ ঠাক্‌রুণ—

কেদারনাথ

আরে চুপ চুপ, কি হয়েচে চুপি চুপি বল।

নকুলেশ্বর

কেন ? কি করেচেন বৌমা ?

গয়লা

আমার গোয়াল থেকে বাছুরটাকে ছেড়ে দিয়ে শামলী গাইয়ের দুধ খাইয়ে দিয়েচেন। বল্লে বলেন, তোমরা এত নিষ্ঠুর কেন, বাছুরকে দুধ না খেতে দিয়ে তোমরা দুধ বেচ ?

নকুলেশ্বর

তাইত হে কেদার কি করি এখন বল ? দিন দিন যেমন সঙ্গীন করে তুলেচেন বৌমাটি, এঁকে এখন ঠেকাই কি করে ?

কেদারনাথ

তা' এখন বৌটির জন্যে হয় কর্ত্তাকে দেশ ছাড়তে হয়, নইলে দেশের লোকদের পাত্‌তাড়ি গোটাতে হয়।

নকুলেশ্বর

(গয়লার প্রতি) শ্রীধর তোমার দুধের দরুণ যা' লোকসান হয়েচে তা' আমার কাছ থেকে নিয়ে নিও। আমি এর একটা কিনারা শিগ্‌গীরই করচি।

গয়লা

যেজ্ঞে (প্রস্থান)

কেদারনাথ

কর্ত্তা, এ মেয়েটিকে আপনি সহজে ঠেকাতে পারবেন না। একে আপাততঃ তরিবৎ দুরস্ত করার জন্যে কিছুদিন না হয় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিন।

নকুলেশ্বর

হঁ্যা হঁ্যা মন্দ বলনি। আমিও ঠিক্ তাই ভাব্‌ছিলুম।

কেদারনাথ

ভালকথা, এবিষয় বড় খোকাবাবুর একবার মত নিন।

নকুলেশ্বর

তা বেশ। চরণ !—

চরণ (নেপথ্যে)

আজ্ঞে যাই।

(চরণের প্রবেশ)

নকুলেশ্বর

দেখ তোমায় একটা কথা অনেকদিন থেকে বলব বলব ভাব্‌ছিলুম। আজ আর না বলে থাকতে পারচি না।

চরণ

আজ্ঞে বলুন।

নকুলেশ্বর

তোমার বৌটি আমাদের স্বরূপ সনাতনের বংশের মুখে চুনকালী লাগিয়েচেন। পাড়ার লোকে তাঁর বেহায়াপনা দেখে ঘেন্নায় আমাদের বাড়ী মাড়ানো ছেড়ে দিয়েচে।

চরণ

আজ্ঞে হঁ্যা, আমারও বন্ধুমহলে মুখ দেখানো দায় হয়েচে।

নকুলেশ্বর

তা' এখন ভেবে দেখ কি করা যায়। ওঁকে বাপের বাড়ী না পাঠিয়ে আর কি উপায় আছে ?

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

চরণ

তা' বেশ, আপনি সুনীরাকে তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলে আমিও নিশ্চিন্ত হই।

কেদারনাথ

পাড়াও জুড়োয়!

নকুলেশ্বর

কিন্তু তুমি কি—

কেদারনাথ

হাঁা, তা জানি ছেলে বৌ ছেড়ে থাকতে পারুক আর না পারুক, বৌয়ের উপর কর্ত্তার যেরূপ স্নেহ—তাতে তিনি যে তাকে ছেড়ে কি করে থাকবেন সেই ভাব্না।

নকুলেশ্বর

তা' কি করা যায় সমাজ ত মেনে চলতেই হ'বে!

কেদারনাথ

তা'ত নিশ্চয়, তা'ত নিশ্চয়।

নকুলেশ্বর

ঘরের বৌ কোথায় ঘরকন্না নিয়ে থাকবেন তা নয় বনে বনে আকাশ দেখে তারা গুনে সময় কাটাবেন। বল্লে বলেন আমার ঘরে থাকতে ভাল লাগে না।

কেদারনাথ

বলেন কি কর্ত্তা অমন বারফট্কা মেয়েকে কি সমাজে একদণ্ড রাখতে আছে?

(পদীর প্রবেশ)

পদী

হাঁা গো কর্ত্তা! বলি স্বরূপ সনাতনের বংশের একি ধারা দেখ্‌চি গো!

নকুলেশ্বর

কেন? কি হ'ল কি?

পদী :—

হ'বে আবার কি! সর্ব্বনাশ হয়েচে! সর্ব্বনাশ হয়েচে! তোমার বৌটি এইমাত্তর রূপনারাণের ঘাট থেকে একটা বাগ্‌দি না ডোমের ছেলেকে কুড়িয়ে এনেচে।

কেদারনাথ

এাঁ, কুড়োনো মেলেচ্ছ ছেলেকে কোলে ক'রে এনেচেন?"

পদী

হাঁা গো, আমি স্বচক্ষে দেখে এলুম!

কেদারনাথ

তাই ত কর্ত্তা, চুপ করে থাক্‌লে আর চলবে না, পাড়ায় এ কুদৃষ্টান্ত দেখলে গাঁ উলট্‌পালট হয়ে যাবে।

নকুলেশ্বর

আচ্ছা চল আমি দেখ্‌চি কি চায় সে!

কেদারনাথ

চায় আবার কি—যমালয়ে যেতে চায়, নইলে এমন বংশের বৌ হয়েও কি ওর চেতনা নেই?

দ্বিতীয় দৃশ্য

[নদীর ধারে একটি গাছের নীচে বসে সুনীরা। তার কোলে একটি সদ্যোজাত শিশু। এমন সময় সেখানে কেদার, নকুলেশ্বর এবং পদীর আবির্ভাব।]

নকুলেশ্বর

বৌমা

সুনীরা

(চম্‌কে উঠে) কে?

নকুলেশ্বর

আমি। তোমার কি মা এই বৃদ্ধ শ্বশুরের প্রতি দয়া হ'বে না? এভাবে কাঁহাতক তুমি সমাজের মধ্যে বাস করবে?

স্নীরা

কৈ আমি ত সমাজের প্রতি কোনোই অন্যায় করিনি।

নকুলেশ্বর

অন্যায় করনি বিদ্রোহ এনেচ!

কেদারনাথ

শুধু বিদ্রোহ নয়, সমাজের মুখে চুণকালী দিয়েচো ঠাক্রুণ!

সুনীরা

তাই যদি হয় ত সে সমাজে আমার ঠাঁই নয়, এই গাছ তলাই আমার পক্ষে ভাল।

পদ্দী

তেজ রেখে ডোমেদের ছেলেকে জলে ভাসিয়ে ঘরের বৌ ঘরে এস।

সুনীরা

থাক্ তোমাদের ধর্ম্ম কথা! আমার ধর্ম্ম যা' তাই আমি করচি। আমি এই ডোমেদের ছেলেকে নিয়েই থাকব, তোমরা তোমাদের ধর্ম্ম নিয়ে থাক গিয়ে।

নকুলেশ্বর

বৌমা, আমার অনুরোধ শোন, এই ছেলেটিকে পাদ্রীদের হাতে দিয়ে দেব, তুমি আবার ঘরে ফিরে চল।

সুনীরা

পাদ্রীরা মানুষ হতে পারে আর আমাদের মানুষ বলে নিজেদের পরিচয় দিতেই যত লজ্জা—তা' হবে না। আমায় আর আপনি এই শিশুটিকে বিদায় দিতে বলবেন না।

নকুলেশ্বর

পাদ্রীরা তোমার হয়ে একে না হয় মানুষ করবে?

সুনীরা

তা বেশ! চাঁদা দিয়ে পুণ্যিসঞ্চয়, পাদ্রীদের দিয়ে অনাথ-সেবা, মন্দ নয়? তবে আমার যে, মন তা' চায় না!

নকুলেশ্বর

তবে তুমি এই গাছতলায় বসে থেকে কি করবে?

সুনীরা

আমি আমার পথ দেখে নেবো।

নকুলেশ্বর

সে কি? কুলবধূ হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে তোমার লাভ কি?

সুনীরা

যে সংসারে আমরা একটু দয়ারও প্রত্যাশা করতে পারি না, সেখানে বাস করেই বা আমার লাভ কি?

নকুলেশ্বর

তা' বেশ, তুমি এখানেই থাক আমরা চল্লুম।

পদ্দী

কর্ত্তা বল্চেন বৌ, কথাটা একবার শুনেই দেখ না, ডোম্ চামারের ছেলে আপনার হ'ল আর শ্বশুর ভাসুর হ'ল পর। ধন্যি তুমি মেয়ে যাহোক্!

সুনীরা

থাক্ বাছা, কে পর কে আপন তার বিচার আমি করব এখন।

পদ্দী

তাহ'লে তুমি থাক এইখানে। দেখি কেমন করে সমাজ তোমায় নেয়—কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে দেখে নেব'খন।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

(সকলের প্রস্থান—হাতে চিম্‌টে জটাজুটধারী এক সাধুর সেই গাছতলায় আবির্ভাব।)

সাধু

হ্যাঁ মা, তুমি এখানে কি করচ ?

সুনীরা

আমি আমার এই কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটিকে নিয়ে কি করব প্রভু !

সাধু

কি করবে ? এটিকে বিসর্জ্জন দিয়ে দাও।

সুনীরা

কি ? বিসর্জ্জন দেব ভণ্ড কোথাকার !

সাধু

এটিকে নিয়ে কি করবে ? পূজা করবে ? এত নীচ বংশের সন্তান কোথায় পেলে তুমি ?

সুনীরা

যেখানেই পাইনা তোমার মত ভণ্ড তপসির জেনে লাভ কি ?

সাধু

হ্যাঁ, আমায় তুমি ভণ্ড বল ? তোমাদের পাড়ার সকলে আমার পাদপূজা করে আর তুমি কিনা আমাকে ভণ্ড বল্‌লে ?

সুনীরা

এমন কথা বলতে আমায় সাহস কে দিলে ? তুমি সাধু, তোমার জীবে দয়া নেই, তুমি সাধু হয়েচ ?

সাধু

আমরা দণ্ডি, জান আমাদের প্রতাপ !

সুনীরা

থাক্ তোমাদের দম্ভ-প্রতাপ !

সাধু

আমি পূজা পেয়ে আসচি সবাইকার কাছে কিন্তু তোমার ব্যাভারে আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হলুম। যাক্ এখন এই শিশুটিকে নিয়ে তুমি কোথায় যাবে বল ?

সুনীরা

এই শিশুকে নিয়ে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব।

সাধু

না, তোমায় আমি পরীক্ষা করছিলুম। তুমি যথার্থ মাতৃজাতির কাজ করেচ। ওকে নিয়ে আমাদের মঠে চল।

সুনীরা

না, আমি মঠে যাব না। রূপনারাণ পার হ'য়ে পারুলডাঙ্গায় আমার বাপের বাড়ীতে চলে যাব। দেখি সেখানে আমি ঠাঁই পাই কিনা।

সাধু

রূপনারাণ নদীতে যে এখন বান এসেচে—পার হবে কি করে ?

সুনীরা

আমি মরণকে সাধু ডরাই না। যদি নদীগর্ভ আমায় নেয় ত নিক্ না। আর এই শিশু—

সাধু

হ্যাঁ ঐ শিশুকেই ত তার গর্ভ থেকেই তুমি টেনে তুলেছিলে, সে না হয় পুনরায় সেখানে চিরবিশ্রাম নেবে।

সুনীরা

আর দেরী করবনা বেলা হয়ে এল।

সাধু

আচ্ছা এস বৎসে ! তোমার মঙ্গল হোক !

স্নীরা

না না। আমায় আর আশীর্ব্বাদ কোরোনা। আমি সবাইকার অভিসম্পাত কুড়িয়ে নিয়েই চলব—তাই বিধাতার ইচ্ছা আমি জানি।

তৃতীয় দৃশ্য

[পারুলডাঙ্গায় ভবসিন্ধু বাবুর বাড়ী নদীর ধারে। স্নীরা সেই শিশুটিকে কোলে নিয়ে তার বাপের কাছে বসে আছে।]

ভবসিন্ধু

মা, তোমায় ত আমি গোড়াতেই বলেছিলুম সুখে-দুঃখে সব সময় তাদের মতন না হলে তুমি ঘর করতে পারবে না।

স্নীরা

কি করি বল বাবা? তাঁরা আমায় খাঁচায় রাখতে চান। আমি হলুম বনের পাখী—পড়াশুনা করে আমার বনের প্রীতি বেড়েচে বই কমেনি।

ভবসিন্ধু

তা দেখ, এপাড়ায়ও সবাই তোমার জন্যে আমায় খোঁটা দিচ্চে!

স্নীরা

তা আমি জানি। আমার সংস্পর্শে যিনিই আসবেন, তাঁরই এই পুরস্কার। আমার নিজের পক্ষে তিরস্কার আর পুরস্কার সব এক হয়ে গেছে!

ভবসিন্ধু

তোর এই ডোমের ছেলেটাকে নিতে ঘেন্না হয় না?

স্নীরা

ঘেন্না? কেন? মাতা ধরিত্রী তাঁর এই অপূর্ব্ব শ্যামল কোলটিতে এই সব অস্পৃশ্যদের ধারণ কি করে করেচেন? ঠিক্ তেম্নি করেই আমরা আমাদের সন্তানদের নিতে শিখব।

ভবসিন্ধু

আমরা গরীব গৃহস্থ মা, আমাদের কি আর পর প্রতিপালনের ক্ষমতা আছে?

স্নীরা

ক্ষমতা নেই জানি, মন যদি আমার থাকে ত ক্ষতি কি?

ভবসিন্ধু

আমরা দিন আনি দিন খাই। হাটবাজার নিজেদের কর্ত্তে হয়। এ সব ফেলে অপরের অপোগণ্ড পোষা কি আমাদের পোষায়?

স্নীরা

আমি বাবা কাকীমার হয়ে ধান ভেনে দেব, ঘর ধুয়ে দেব, হাটবাজার যাব। আমায় যেতে দেবে?

ভবসিন্ধু

হাঁ তা' দেব। কিন্তু তোর চিরকাল কি এভাবে কাটবে?

স্নীরা

কেন? যদি আমি দুচোখ মেলে দুনিয়াটা দেখ্‌বার অবকাশ পাই, ফুলফলের আনন্দ, সঙ্গীতের সুধা আহরণ করতে সময় পাই ত আমার জীবনে আর কিসের প্রয়োজন বাকি থাকে?

ভবসিন্ধু

আরে পাগ্‌লী ফুল শুঁখেই কি জীবন কাটবে?

(বাঁশী হাতে বরুণের প্রবেশ)

ভবসিন্ধু

এই দেখ্‌না, এই একটা ছেলে কিছু করলে না।

স্নীরা

এ যে বরু!

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

ভবসিন্ধু

হাঁা, এ সেই তোমার ছেলেবেলার বন্ধু। ওর বাপের এক ছেলে বলে শিবধন ভায়া কত না খরচপত্র করলেন। তা' সে সব ভেসে গেল, বাঁশী হাতে ঘুরে ঘুরে এর জীবন কাটচে।

সুনীরা

আহা ওকে কতদিন দেখিনি।

ভবসিন্ধু

বরু এদিকে এস!

বরুণ

যাই কাকাবাবু।

ভবসিন্ধু

এই দেখ্ তোর বোন নীরা আজ কদিন হ'ল এসেচে। ও এই ডোমেদের ছেলেটাকে নিয়ে মানুষ করচে, আমি এত বলচি ও কিছুতেই ওটাকে ফেল্‌বে না।

বরুণ

আহা! এমন দুগ্ধপোষ্য কচি ছেলেকে কুড়িয়ে পেয়ে কি কেউ কখন ফেল্‌তে পারে কাকাবাবু?

ভবসিন্ধু

এদিকে পাড়ার লোকের কথার জ্বালায় যে গেলুম।

বরুণ

তা কি হয়েচে? পাড়ার লোকে যে শেয়ালের মত কণ্ঠ মিলিয়ে একসুরে হাক্কাহুয়া হাক্কাহুয়া করে, তাই বলে আমাদেরও তাতে যোগ দিতে হবে না কি?

ভবসিন্ধু

না আমি বল্‌চি তোর বোন্‌টিকে যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করতে পারিস।

বরুণ

রাজি আবার কি করাব! উনি যা' করেচেন ওক্ষেত্রে আমি হলেও ঠিক তাই করতুম।

ভবসিন্ধু

তুই কি করতিস?

বরুণ

আমি এই শিশুটির জন্যে সংসার সমাজ সব ছেড়ে দিতুম। আর দেখাতুম যে বিধাতা আছেন।

ভবসিন্ধু

কি? তুইও তাহলে সুনীরার গোড়ে গোড় দিলি!

বরুণ

হাঁা বোন্, তুমি আমায় শিশুটিকে দিও। আমি মাঝে মাঝে ওকে এসে দেখব।

সুনীরা

তোমার বরু সত্যি এই শিশুটির উপর মায়া হয়?

বরুণ

হয় না? যে মায়া না থাকলে মানুষ এই পৃথিবী মাতার কোলে বাঁচতে পারত না সেই মায়াই আমাদের ঘেরে আছে বোন্।

সুনীরা

কিন্তু তাতে—

বরুণ

তাতে আরো আমরা বেশী বল পাই। যখন শৃগাল কুকুরের মত কেবল নিজের গর্ভজাত সন্তানকেই—প্রতি-পালন করে ক্ষান্ত না হই; যখন শিশুমাত্রই আমাদের হৃদয়ের কোণে ঠাঁই পায়।

সুনীরা

পরকে নিজের করবারও কি একটা স্বার্থ নেই ?

বরুণ

না, তা থাকে যখন আমরা কোন ধনী বা ক্ষমতাশালী বন্ধুর খোঁজে বেরোই। কিন্তু শিশুর চিত্তহরণ করতে গেলে তখন আর স্বার্থের কথা মনেই আস্‌তে পারে না।

ভবসিন্ধু

দেখ, তোমরা এতক্ষণ যা' আলোচনা করছিলে আমার মনও তাতে সায় দিয়েচে। কিন্তু তবুও—

বরুণ

যে সংস্কারের বেড়া আমাদের অলঙ্কার হয়ে গায়ে চেপে বসে আছে তার আর খোলবার উপায় নেই তাই বলুন।

সুনীরা

উপায় হয়, যদি সে উপায়কে আমরা সহজে গ্রহণ করি।

ভবসিন্ধু

সেটা কি শুনি ?

সুনীরা

না মেনে চলা।

ভবসিন্ধু

কথাটা খুব সহজ কিন্তু কার্য্যে পরিণত করা বড়ই কঠিন।

বরুণ

কার্য্যে পরিণত করতে গেলে সমাজের সাজা পাওয়াকে ভয় করলে চলে না।

(ঘোম্‌টা দিয়ে কাকীর প্রবেশ)

কাকী

নীরা, তোমরা গল্প লাগিয়েচ, এদিকে বেরালে যে দুধ খেয়ে গেল, হেঁসেলে কুকুর ঢুক্‌চে !

সুনীরা

যাই কাকীমা ! (শিশুটিকে কোলে নিয়ে নীরার প্রস্থান)

কাকী

(ঘোমটায় মুখ ঢেকে) দেখুন, পাড়ার লোকের মুখনাড়া খেতে খেতে ত প্রাণ গেল !

ভবসিন্ধু

কেন ? কি বলে তারা ?

কাকী

বলবে আবার কি ? শুনলুম হাটে যেতে পথে একটা রাখাল ছোঁড়ার বাঁশী শুন্‌তেই নীরা মত্ত। এদিকে হাট বাজার সব শেষ, কি যে খাব আমরা তার ঠিক্ নেই।

বরুণ

আমিই কাকীমা বাঁশী বাজাচ্ছিলুম স্বরূপডাঙ্গার মাঠে, রাখাল কেউ ছিল না। তুমি রাগ কোরোনা।

কাকী

তা' হোক গে, হাটবাজার করতে গিয়ে মাঝ পথে ঝুড়ি নাবিয়ে রেখে বাঁশী বাজান শোনা কি ? এমন করলে কি সংসার চলে ?

ভবসিন্ধু

হাঁ তা ছোট বৌ আমি নীরাকে বুঝিয়ে বলে দেব।

কাকী

না, আপনিই ত আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েটির মাথা খেয়েচেন। ওর মা মারা যাবার পর থেকে ওকে কলকাতার কলেজে পড়িয়েই ওর মাথাটা আরো বিগ্‌ড়ে দিলেন !

বাঁশীর ডাক

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

ভবসিন্ধু

হ্যা, তা সত্যি, কিন্তু কি করব বল ? ওযে শুন্‌লে না। মা মারা যেতেই এখানকার পাঠশালায় বৃত্তি নিয়ে ও ছাত্র-বৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করলে। তারপর ওর মারও ইচ্ছা ছিল ওকে কলেজে পড়ান।

কাকী

তা এখন তার ঠেলা সাম্‌লান্। শ্বশুরঘর কি কলেজে পড়া মেয়ে করতে পারে কখন ?

বরুণ

কাকীমা যাও, আমি জানি নীরা কখন কোনো দোষ করেনি।

কাকী

হঁ্যা তুমি যেমন তোমার বাপ মার হাড় জ্বালাচ্চ নীরাটিও আমাদের তেম্‌নি হয়েচেন।

চতুর্থ দৃশ্য

[নদীতীরে গাছতলায় নীরা আর তার পাশে বসে বরুণ বাঁশী বাজাচ্চে। নীরার জলের কলসী একধারে পড়ে আছে।]

সুনীরা

ভাই বরু, তোমার কি মনে হয় না আমাদের এই আনন্দ কেবলি ফাঁকা ?

বরুণ

আনন্দ ত সবই ফাঁকা ! যেটা ধন সেটাকেই আহরণ আর সঞ্চয় করা যায়। এই ফাঁকটাতেই ত আমরা সত্যি-কারের সুখ পাই।

সুনীরা

এই যে শিশু আমার চিত্তটিকে ভ'রে রয়েচে, তার ভিতর যে স্বচ্ছ আনন্দ পাই সেটা ত সব জায়গায় পাই না !

বরুণ

সব জায়গাতেই সেই অনুভূতি যখন জাগ্‌বে তখন আর তোমার কিছু পাওয়াই বাকী থাকবে না নীরা।

সুনীরা

কিন্তু দেখ, সেদিন আমার সেই নদীর উপর তারার আলো দেখে কেমন একটা মন উতলা হয়ে উঠ্‌ছিল। যেন তারাগুলির জল ছোঁয়ার অনুভূতি আমার মনকে এমন প্রবলভাবে নাড়া দিলে, মনে হ'ল যেন আমার সর্ব্বাঙ্গ জলে সিক্ত হয়ে উঠ্‌চে।

বরুণ

এই অনুভূতিতেই আমাদের আনন্দ। কেবল ধন আর বস্তু পুঞ্জীভূত করলে তা' হয় না।

সুনীরা

তবে ধন আর বস্তুর জন্যে মানুষ এত খেটে মরে কেন ?

বরুণ

খেটে মরে প্রধানতঃ পেটের দায়ে।

সুনীরা

তবে পেটটাকে ত বাদ দিলে চল্‌বে না ?

বরুণ

তা' চলবে না বটে, কিন্তু শেষকালে সঞ্চয়ের নেশা পেটকে ছাড়িয়ে ওঠে। মদ অল্প খেলে শরীরের রক্ত চলা-চলের অনেক সময় সহায়তা করে বটে কিন্তু সকলেই তার সীমা হারিয়ে ফেলে। এই হয় বিপদ।

সুনীরা

তুমি যখন বাঁশী বাজাও তখন মনে হয় যেন কতদূর থেকে সুর ভেসে আস্‌চে।

বরুণ

বাঁশী দূরের কথাই জানায়, আমরা নিজের নিজের কথা নিয়েই ব্যস্ত থাকি বলে।

সুনীরা

ঐ দেখ নদীর অপর পারে দুটি চিতা জ্বলে উঠ্‌ল! তার আগুনের শিখা যেন গগন স্পর্শ করচে আর নদীর কুয়াশায় একটি তরীতে দুটি প্রাণী ভেসে চলেচে—মনে হচ্চে যেন ওদেরই আত্মা কোন্ নিরুদ্দেশ যাত্রা করেচে অনন্তের পথে।

বরুণ

আমার মন এক অপূর্ব্ব সুরের রঙে ভরে উঠ্‌ল নীরা!

সুনীরা

আমাদের এই ক্ষণিকের পাওয়াকে আজ এই দূরের ছবিই স্বার্থক করলে, নয়?

বরুণ

(দুজনে দুজনেব হাত ধরে) আজ আমরা দুটি প্রাণী এই অনন্তের বাঁধনে বাঁধা রইলুম। এ বাঁধন মুক্তির বাঁধন, মুক্তিরই আস্বাদ আমাদের দিয়েচে আজ।

(কাকীমার কলসী-কাঁখে প্রবেশ)

কাকী

নীরা, নীরা, ও নীরা!

সুনীরা

যাই কাকীমা!

কাকী

এদিকে যে বেলা বয়ে যাচ্চে, জল তুলেচ?

সুনীরা

এই যে যাই কাকীমা।

কাকী

(নিকটে এসে) এঁ্যা, এই অন্ধকারে দুজনে গাছতলায় বসে বাঁশী বাজান হ'চ্চে?

সুনীরা

বরুর বাঁশী কি মিষ্টি কাকীমা!

কাকী

তাই বলে কি নাওয়া খাওয়া ভুলে যেতে হবে নাকি?

সুনীরা

না তা নয়। ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু তাই ওর কাছে বাঁশী শুনছিলুম।

কাকী

দেখ নীরা তোমার এখন বয়েস হয়েচে ওসব আদিখ্যেতা ছাড়।

বরুণ

না কাকীমা, নীরাকে ডেকে আমিই বাঁশী শোনাচ্ছিলুম। ওর কোনো দোষ নেই।

কাকী

(বরুণের প্রতি) ভর সন্ধ্যেবেলা সাপখোপ বেরুবে তাই বলছিলুম।

সুনীরা

কাকীমা তুমি রাগ কোরোনা, আমি এখুনি জল নিয়ে আসচি—তুমি এগোও।

কাকী

দেখ, আমি সংসারে একলা পেরে উঠ্‌চি না তাতে তোমার সেই কুড়োনো ছেলেটা আছে।

সুনীরা

না কাকীমা আমি গা ধোব আর জল তুলে বাড়ী যাব, তুমি এগোও।

কাকী

এমন মেয়ে দেখিনি বাপু ঢের ঢের দেখেচি(বক্‌বক্ করতে ২ প্রস্থান)

বরুণ

ভাই নীরা আজ রাত হয়ে গেছে আসি।

বাঁশীর ডাক

শ্রীঅসিত কুমার হালদার

সুনীরা

না ভাই, আরো একটু বোস। আমার ওরকম বকুনি গা-সওয়া হয়ে এসেচে।

বরুণ

তোমার বাবা যদি বকেন?

সুনীরা

না, তিনি আমায় কখনও বকবেন না তা' আমি বেশ জানি।

বরুণ

আচ্ছা বেশ!

সুনীরা

বন্ধু আমাদের এই মিলনে আমরা যে কতটা লাভ করি তা' বোধহয় কোনো যক্ষির ধন পেয়েও ধনকুবের তা স্থির করতে পারে না।

বরুণ

কিন্তু এই লাভ আমরা খতিয়ে দেখ্‌লে হিসেব মেলে না।

সুনীরা

—তার মানে?

বরুণ

তার মানে, কে কতটা যে লাভ করচি তা' বলা শক্ত। হয়ত তোমার চেয়ে আমি বেশী পাচ্চি বা আদায় করচি—বা তুমি বেশী আদায় করচ তা' বলা শক্ত।

সুনীরা

যাক্ সে অঙ্ক কসে কোনই লাভ নেই। যখন কোনো বাগানে গাঁদা ফুল ফোটে আর গোলাপও ফোটে, কে কতটা সৌন্দর্য্য-পিপাসুর কাছ থেকে ভালবাসা আদায় করে তা' তারা কি দেখে? তারা নিজের রসে নিজেই ভরপুর থাকে।

বরুণ

হাঁ ঠিক্ তাই। আমাদের রসের মাত্রা কোনো মাপ-কাঠির ভিতর না আনাই ভাল।

সুনীরা

আমি মাপকাঠি চাইনা, আমি চাই আজ তোমার কাছে ক্ষমা।

বরুণ

কেন?

সুনীরা

আমার মত পতিতা স্বামী-পরিত্যক্তাকে তুমি কেন হৃদয়ে স্থান দেবে? হৃদয় দেবতার স্থান, সেখানে কোনো দেবীকে বসিও এই আমার অনুরোধ।

বরুণ

দেখ নীরা তোমার কাছে আমি এই শাসন মান্‌তে আসিনি। আমি এসেচি এই খোলা অবাধ আকাশের মত স্বাধীন ভাবে।—এর মধ্যে কোনো সন্দেহ বা মেঘ জমে নেই এটা ঠিক জেনো।

সুনীরা

আমায়ও তুমি সেই একই পথে দেখতে পাবে। সেখানে পঙ্কিলতা ধূলা নেই। আকাশের তারার দীপের স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি যেখানে মাটির বুকে নেবে আসে সেই নীরের মত আমাকে জেনো তুমি।

বরুণ

নীরা আজ তবে আসি

সুনীরা

এস, ভুলো না—

[নীরা নদীর বাঁধান ঘাটের পৈঁঠায় বসে পদ্মের পাপড়ী জলে ভাসাচ্ছে। তার জলের কলসী আর গামছা একধারে রাখা আছে]

সুনীরা

(স্বগত) কেমন চল্‌চে কলকল ছলছল করে জল পাপড়ি গুলিকে বুকে নিয়ে।

[খানিকক্ষণ নীরব থেকে পদ্ম পাপড়ি ভাসাতে ভাসাতে থমকে গিয়ে]

কে? কে যেন আমার নাম ধরে নদীর ধারে গাছের ছায়ার ভিতর থেকে ডেকে উঠ্‌ল!

(নেপথ্যে)

সুনীরা!

সুনীরা!

কে? কে তুমি?

(নেপথ্যে)

আমায় তুমি চিন্‌তে পারবে না!

সুনীরা

কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্চে তোমায় আমি জানি।

(নেপথ্যে)

হাঁ, তুমি আমায় দেখেচ কিন্তু তুমি আমায় চিন্‌তে পারবে না।

[আগন্তুক কাছে আসতেই নীরা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল, আগন্তুক নদীর জল এনে চোখে মুখে দিয়ে দিতেই তার চেতনা হ'ল]

সুনীরা

কে তুমি?

আগন্তুক

আমি তোমার সেই অধম স্বামী—

সুনীরা

কি চাই আপনার?

চরণ

চাই তোমাকে!

সুনীরা

কেন?

চরণ

আমায় মাপ কর। তুমি আমাদের ছেড়ে যাবার পর থেকে আমিও গৃহত্যাগ ক'রে কতকাল ধরে কত দেশ বিদেশেই না ঘুরেচি।

সুনীরা

তারপর?

চরণ

কত সাধু অসাধুর তল্পী বয়ে বেড়িয়েচি তার আর ইয়ত্তা নেই। কিন্তু কোথাও আর শান্তি পেলুম না। এখন ঘুরতে ঘুরতে এই নদীর ধারে সেই মূর্ত্তিমতী শান্তিকেই আজ পেলুম।

সুনীরা

কিন্তু তোমাদের সমাজ!

চরণ

না' থাক্ সমাজ, আমি দূরে ঠেলে ফেলে তোমায় মাথায় করে নেব।

সুনীরা

এত সাহস তোমার হবে—ডোমের ছেলেকে নিয়ে—

চরণ

হাঁ হ'বে।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

স্থনীরা

কিন্তু আমায় এই নদীর জলে পাপড়ী ভাসানর খেলা খেল্‌তে দেবে?

চরণ

হ্যাঁ তা' দেব।

স্থনীরা

ধরে রাখবে না।

চরণ

না, তা ধরে রাখব না।

(এমন সময় দূরে নদীর তীরে বাঁশীর শব্দ)

স্থনীরা

না, আমি চিরদিনই এই নদীতে পদ্মের পাপড়ি ভাসাব আর বাঁশী শুন্‌ব।

চরণ

(হাঁটু গেড়ে নীরার দুটি হাত ধরে) আমার অনুরোধ ফিরে চল।

স্থনীরা

দেখ মনের যেখানে যে তারে ঘা' পড়েচে—এখন এই দেহটার জন্যে তার আর কিছুই আসে যায় না।

চরণ

তুমি যাবে না?

স্থনীরা

না।

চরণ

যাবে না?

স্থনীরা

না।
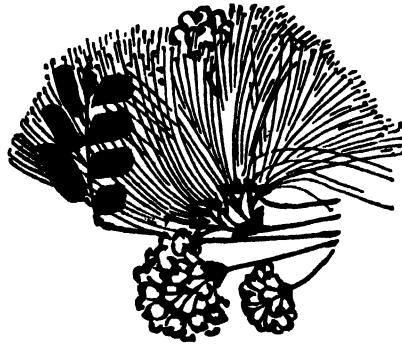
মিলন-তৃপ্তি

শ্রীমতী চারুলতা দেবী

জানি আমি—জানি প্রেমময়,
আমারি কারণে তব উদ্বেলিত বিবশ হৃদয়।
সংসারে আনন্দ আমি, প্রীতি আমি জীবনে তোমার,
আমার মুখের হাসি হরে তব হৃদয়ের ভার।

সুবিস্তৃত অদৃষ্ট সরণী—
অবিশ্রান্ত বক্ষে তার ভ্রমিতেছ দিবস রজনী।
নাহি তন্দ্রা—নাহি তৃপ্তি, মর্ম্মে নাই সংগ্রামের ভয়,
আমারি কারণে শুধু আকুলিত তেজস্বী হৃদয়।

আজ নয়—বহুদিন হ'তে
চাহিয়া আমার পথ ভ্রমিতেছ জগতে জগতে।
চলে গেছে কোটি কল্প—চলে গেছে জন্ম-জন্মান্তর,
কাল-স্রোতে ভাসে শুধু কামনার চিত্র অনশ্বর।

কর্ম্মফল এ ছবির বুকে
ইন্দ্র-ধনু-বিনিন্দিত বর্ণ ঢালে পরম কৌতুকে।
মহাব্যোম-পারাবার হিল্লোলিয়া উঠি অনুক্ষণ
এই চিত্র-প্রতিচ্ছায়া দিগন্তরে করিছে প্রেরণ।

তুচ্ছ হতে তুচ্ছতম আমি,
আবেগ-কম্পনে এই কাঁপিতেছি প্রতি দিবা যামি
তুমি চাহিয়াছ তাই আসিয়াছি চরণে তোমার,
তোমারি আকুল আশা স্পন্দমান হৃদয়ে আমার।

মিলন তৃপ্তি

শ্রীমতী চারুলতা দেবী

সৃজনের প্রথম নিশায়—
বিশ্ব চরাচর যবে লুপ্ত ছিল তমসা ধারায়,
সেইক্ষণে প্রজাপতি দুটি প্রাণ একত্র করিয়া
করিলেন সঞ্জীবিত মন্ত্রপূত শক্তি সঞ্চারিয়া।

হেরিলাম আনন তোমার,
হেরি' সে অপূর্ব্ব কান্তি ভুলিলাম সত্তা আপনার।
জ্যোতির্ম্ময় ছবি তব কল্পনার ফলকে আঁকিয়া
রূপ-লালসার স্রোতে চলিলাম ভাসিয়া ভাসিয়া।

আসক্তির সেই বহ্নিশিখা
সৃজিল হৃদয়ে মম বাসনার দীপ্তি-মরীচিকা।
পাশাপাশি বাস করি তবু যেন পরিচয় নাই!
থাকিয়া চরণতলে কর্ম্মফলে আপনা হারাই!

কত যুগ গিয়াছে বহিয়া—
মহা শূন্যে নিশিদিন ভ্রমিয়াছি তোমারে চাহিয়া।
বিরতি জানি না প্রভু, শিখি নাই প্রেমের সাধনা,
আশার বৈচিত্র্যে শুধু সুচিত্রিত করেছি কল্পনা।

তবু তুমি স্নেহভরে আজ
চরণে দিয়েছ স্থান ওগো প্রিয়, রাজ-অধিরাজ।
আমারি কারণে তব প্রতিক্ষণে হৃদয় আকুল,
জীবনের পথে তাই চলিতেছে সংগ্রাম বিপুল।

বহিয়াছে প্রবল ঝটিকা,
নিয়তি বাজায়ে বাঁশী গাহিয়াছে বিরহ-গীতিকা।
আসিয়াছে কতবার দূরতার দৃপ্ত ব্যবধান,
তুমি চির অবিকল, দেব, তব সমাহিত প্রাণ।

———o———

শিবাজী মহারাজ
—[অলক্ষিত শিল্প-জগৎ]-

অলক্ষিত শিল্প-জগৎ

—দ্রষ্টা ও স্রষ্টা—

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার মহাশয়ের সৌজন্যে

অলক্ষিত শিল্প-জগৎ

—শ্রীরমেশ বসু

১

আমরা চোখ্ চেয়ে চারিদিকে যা যা দেখে চলি সে সব আমাদের মনের পর্দ্দায় ছবি এঁকে রেখে যায়—এই ছবি কখনো বেশ স্পষ্ট হয় কখনো বা আব্ছায়া হয়ে থাকে। ঐ ছবিগুলো দেখ্তে, বা ওগুলো যে ছবি তা' বুঝ্তে আমাদের বেগ পেতে হয় না, সুধু একটু চেষ্টা কর্লে ওদের ছাপ সহজেই আমাদের মনে দাগ রেখে যেতে পারে। এই ছাপ থেকেই কবি ও শিল্পীরা আমাদের জন্য শব্দ ও বর্ণচিত্র আঁক্‌বার উপাদান সংগ্রহ করেন। রং ও রেখার সন্ধানে যাঁরা ঘোরেন তাঁদের কাছে ঐ সব ছবি থেকে অনেক লুকানো রূপ-রহস্য ধরা পড়ে যায়। প্রকৃতির বিশাল ব্যাপারে ত এমন কিছু নেই যার অভাব আমরা বোধ করতে পারি। আকাশ থেকে সুরু করে পাহাড় পর্ব্বত, বন-জঙ্গল, মরু-প্রান্তর ও জলরাশির মধ্য দিয়ে প্রকৃতির একটা রূপের বান বয়ে চলেছে;—আর, মানুষের মুখশ্রী ও দেহ-ভঙ্গীতে কত কথা ও কত ব্যথা আকুল হয়ে উঠ্ছে। যাঁরা রূপের কার্‌বারী তাঁদের ত এই প্রত্যক্ষ শোভাযাত্রাকে অনুসরণ করে চল্‌তে হয়। শিল্পীরা কল্পনার রং দিয়ে চোখে-দেখা রূপকে অপরূপ করে তোলেন বটে, কিন্তু তাঁদের কল্প-কুসুমও ঠিক আকাশ-কুসুম নয়। মনে হয়, মানুষের চির-চঞ্চল মনের হরিণটি রূপের জালে বাঁধা পড়ে আছে।

মানুষের দেখার ওপর যে শিল্পকে নির্ভর কর্‌তে হয় তা দেশে দেশে ও যুগে যুগে তফাৎ হতে বাধ্য, কারণ মানুষ দেশ ও কাল হিসাবে একই রকমে দেখ্তে পায় না। তা' হলে বৈচিত্র্যের অভাবে মানুষের অভিবিকাশও স্তব্ধ হয়ে থাকৃত। তা হয়নি বলেই কত বিচিত্র শিল্প-ধারার উদ্ভব হয়েছে তার ঠিক নেই। যতদূর মানুষের ইতিহাস যায় তার চেয়েও আগে থেকে মানুষ চিত্রচর্চ্চা করে এসেছে; তার শিল্প-পন্থা কত-রকমে এঁকে-বেঁকে ঘুরে-ফিরে গিয়েছে দেখ্তে পাওয়া যায়। যদিও সকলেই রূপ-রচনার ভিতর দিয়ে ভাব ফোটাতে চেয়েছে বলে এক জায়গায় তাদের মিল আছে, কিন্তু তাদের ধরণ ও ধারণার বিভিন্নতার জন্য এক পন্থাকে যে অন্য পন্থার পন্থীরা ঠিক রকমে ধর্‌তে পারেননি তা অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই। শিল্পকে মানুষের সাধারণ সম্পত্তি মনে করা হয় বটে, কিন্তু এক দেশের ও এক যুগের শিল্পভাষা কি অন্য দেশ ও সুদূর যুগের মনে ঠিক একই ভাব জাগিয়ে তুলতে পারে? শিল্পের একটা বিশিষ্ট অবদান এক দেশ ও এক যুগের পক্ষে যতই গৌরবের হোক্ না কেন, উহাই আবার অন্যের শিল্পকে বুঝতে গেলে যথেষ্ট বাধা দিয়ে থাকে। জাতীয় শিল্পের বড়াই কর্‌লে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু 'বিজাতীয়' শিল্প কি বল্‌তে চায় সে কথাও ত কানে তোলা চাই। শিল্পীরা যদি আমাদের চোখে ঠুলি পরিয়ে দিয়ে বিশ্ব-শিল্প-প্রদর্শনীর একটা কামরার বেশী আর কোথাও ঘুর্‌তে-ফির্‌তে দিতে না চান তবে তাঁদের সেই কাচের ভিতর দিয়ে তাঁদের নিজের জিনিষ যদিও স্পষ্ট দেখ্তে পাই তবুও অন্যের জিনিষগুলো ঘোলাটে ও বিদ্‌ঘুটে ঠেক্‌বার সম্ভাবনা থাক্‌বেই। অনেক ক্ষেত্রে এরূপ হয় যে, মানুষ যে রস পান কর্‌তে চায় কাজের বেলায় কিন্তু আমাদের পক্ষে তার পাত্রটির দিকেই বেশী করে নজর দেওয়া হয়ে পড়ে।

প্রকাশিত রূপ ও তার প্রকাশের অবদান থেকে মানুষ মুক্তি পেতে পারে এ কথা কেউ ভেবেছেন কিনা বল্‌তে পারিনে। আশা করি এ প্রশ্ন শুনেই কেউ আমাদের এ

খ্রীষ্টীয় বীর

(KNIGHT-ERRANT)

অলক্ষিত শিল্প-জগৎ

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার মহাশয়ের সৌজন্যে

অলক্ষিত শিল্প-জগৎ

শ্রীরমেশ বসু

ক্ষেত্রে রূপ-তরাসী মনে করবেন্ না। আমাদের বক্তব্য এই যে এতদিন অবধি শিল্পীরা বিশেষ একটা মনের ভাব নিয়ে রূপ-রেখার যে লীলা-খেলা দেখেছেন তাকে এড়িয়ে আর কোনো রকমে শিল্পসৃষ্টি সম্ভব কিনা। এতদিন ত এমনই হয়ে এসেছে যে বাঙ্গালী শিল্পী যা প্রকাশ করেছেন তার মানে হচ্ছে "কে খোঁজে সরস মধু বিনা বঙ্গ-কুসুমে," কিন্তু কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায় যদি তাদের কেউ হেলেনার রূপের আভা দেখ্‌তে পায় তবে তাতে আমাদের মন সাড়া দেয় কি? শিল্পীরা সাধারণতঃ দেশকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন না বলেই অন্য দেশের রূপকে নিজের দেশের রূপের ফসলের মত রস-ভাণ্ডারে তুলে দিতে পারেন না। তাই দেখ্‌তে পাওয়া যায় সাহেব শিল্পীর ভাল-মনে-আঁকা সীতা বা রাধা শাড়ী-পরা মেমই হয়ে ওঠে। তারপর জাতিগতভাবে যেমন ব্যক্তিগতভাবেও তেম্‌নি শিল্প তার স্রষ্টাকে পেয়ে বসে। অনেক শিল্পীর সারা রচনার মধ্যে একটি মাত্র মুখের প্রভাব পড়ে। যা হোক্ যে কোনো শিল্প ও শিল্পীর এই রকমের অবস্থা থেকে নিস্তার পেয়ে মুক্তি পেতে দেখ্‌লে আমরা অন্যকে ভাব্‌বার বিষয়ে অনেক বেশী মুক্তি পাবো।

২

এই প্রবন্ধে এমন কতকগুলো ছবির কথা নিয়ে আলোচনা কর্‌বার সম্ভাবনা হয়েছে যার সাহায্যে সম্পূর্ণ নতুন পথের দিকে শিল্প-সম্ভাবনার একটা দুয়ার খুলে যেতে পারে। যা আসলে বা দৃশ্যতঃ রূপ নয় তা থেকে রূপের উপাদান সংগ্রহ করা, এবং কোনো দেশের কোনো যুগের শিল্প-শৈলীর সঙ্গে মেলে না এরূপভাবে তাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা আগেও হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। আমাদের দেশের শিল্প-রসিকদের দরবারে এগুলোকে পেশ কর্‌বার উপলক্ষে এই ছবিগুলো সম্বন্ধে সামান্য করে গুটি কয়েক কথা বিশেষ বলা দরকার মনে করি।

এমন অনেক সময় আসে যখন আমরা একটু লক্ষ্য কর্‌লেই আকাশে-ভেসে-বেড়ানো খণ্ড মেঘের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল নানারকমের মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাই। ছেলেবেলায়ও এই মেঘরাজ্যে কত রকমের জীবজন্তুর মূর্ত্তি আমরা অনেকেই দেখেছি। চলন্ত মেঘের এই আপনা-হতে-গড়া মূর্ত্তিকে হয়ত শিল্পীরা নিজের কাজে লাগিয়েছেন।

এখানে আমরা আরেক ধরণের চিত্রের কথা বল্‌ব—যা আঁকাও নয়, বল্‌তে গেলে ঠিক মূর্ত্তি বা ছবিও নয়। তবু শিল্প-জগতে এদের স্থান বোধ হয় হেয় বলে গণ্য হবে না। এই শিল্প অজ্ঞাত-অখ্যাত কুল থেকে উদ্ভূত বলে ঘরগুণে না হোলেও বরগুণে উৎরে যাবে—অভিজন না হলেও অভাজন বলে অপাংক্তেয় হয়ে থাক্‌বে না। আমাদের রূপ দেখার অভ্যাসকে চরিতার্থ না কর্‌লেও এগুলোতে রূপের যে আভাস ফুটে উঠেছে তার শক্তি বোধ হয় কম নয়।

ধনীর নতুন বিলাস-ভবনের দেয়ালে কত রকমের ছবি সযত্নে আঁকা হয়ে থাকে। কিন্তু পুরানো বাড়ীর দৈন্যের মধ্যেও যে চিত্র-শিল্পের সন্ধান মেলে তা দেখ্‌তে শিল্পীর চোখের দরকার হয়। পুরাণো বাড়ীর দেয়াল বা ছাতের কোথাও ফাটা ধরে, কোথাও আস্তর ধ্বসে গিয়ে, কোথাও চুণকাম উঠে গিয়ে, কোথাও ছাতা পড়ে বা তেলচিটে ধরে এমন অবস্থা হয় যে বেশ একটু মন দিয়ে দেখ্‌লে ঐ সবের কোন একটা বা কতকগুলোর সাহায্যে দিব্যি এক একখানা ছবির উপাদান জুগিয়ে দেয়। তেম্‌নি দেয়ালের আল্‌কাত্‌রার পোঁছ ও দোর-জানালার রং একেবারে উঠে বা চটে গিয়ে অথবা বিকৃত হয়েও শিল্পীর চোখ্‌কে সাহায্য কর্‌তে পারে। মানুষ যে ছবি আঁকে তা বেশ যত্নের সঙ্গেই এঁকে থাকে, কিন্তু এগুলো যেন কালের হাতে অযত্নে-বুলানো রেখার টান ও রঙের ছোপ। এই সব জায়গায় যে রকমের ছবি দেখা যেতে পারে তার কোন বস্তুগত ভিত্তি নেই বলে একে রূপ-মরীচিকা বলে মনে করা যায়। এই প্রবন্ধে যে-সব রূপ-কর্ম্ম প্রকাশিত হল তার দ্রষ্টা ও স্রষ্টা হচ্ছেন আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ কবি ও কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার মহাশয়। তাঁকে আমরা এতদিন রূপকথার ভাণ্ডারী বলেই জান্‌তুম্ এখন দেখ্‌ছি তিনি এ কাজেও বেশ দক্ষ।

এই ধরণের চিত্র-রচনায় মজুমদার মহাশয় কি করে আকৃষ্ট হলেন তার একটু ছোটখাটো ইতিহাস আছে। তাঁর বাঙ্‌লা রূপকথার বইয়ের জন্যে ছবি আঁকবার সময় থেকে

বসন্তের রাণী
(MAY QUEEN)

জীবধারার হারাচিহ্ন
(MISSING LINKS)
—[নর-বানরের মধ্যবর্ত্তী লুপ্ত জীব]-

অলক্ষিত শিল্প-জগৎ

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার মহাশয়ের সৌজন্যে

শ্রীরমেশ বসু

রেখার দিকে নজর দেবার একটা অভ্যাস হয়ে উঠেছিল। বছর পাঁচেক আগে একবার তাঁকে খুব অসুখে ভুগে সেরে উঠ্‌বার সময়ে ডাক্তারের পরামর্শ-মত ধরাবাঁধা নিয়মে অনেকক্ষণ চিৎ ও অনেকক্ষণ কাৎ হয়ে হয়ে থাকতে হ'ত, যাতে রক্তের চলাচলের কোন অসুবিধা না হয়। এই অবস্থায় বিছানায় পড়ে পড়ে তাঁর দৃষ্টি স্বভাবতঃই দেয়ালে, ছাতে, কড়িতে, বর্গায় ও দরজায়, জানালায় বা মেজেতে ঘুরে বেড়াত, এবং হঠাৎ কোনো জায়গায় রেখার জঞ্জাল বা পেঁচ-গোছের মধ্যে থেকে যেন এক একখানা ছবির প্রথম আভাস ও ক্রমে একটা ছবির আদ্‌রা ফুটে উঠ্‌ত। শরীরের অসুখের চেয়ে এই আব্‌ছায়া-ছবিকে মনের মধ্যে ও কাগজের উপরে ধরে রাখ্‌বার জন্য তার অসোয়াস্তি বাড়্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমে এই খেয়ালকে আকার দেবার জন্য তাঁর আগ্রহের আর সীমা থাক্‌ল না ও অসুখ থেকে উঠে ইহা তাঁর মনের পক্ষে টনিকের কাজই করেছিল। জেলে আট্‌কা থাক্‌বার কালে অনেকে সাহিত্য, ইতিহাস বা দর্শনের উপর বই লিখে সমাজের জ্ঞান-বস্তুকে বাড়িয়েছেন, কিন্তু অসুখের মধ্যে এরূপভাবে সৌন্দর্য্যের মৃগয়া করতে যেয়ে আবার চোখের অসুখ সৃষ্টি আর কেউ করেছেন কি না আমাদের জানা নেই।

এবার এই চিত্রের কারিকুরি নিয়ে গুটিকয়েক কথা বলা দরকার। অতি-প্রথমে রেখার হিজিবিজির মধ্যে একটু-আধটু রূপ-সম্ভাবনাকে মনে হ'ত "স্বপ্নো নু মায়া নু মতি-ভ্রমো নু"। যে পাখী আকাশে উড়ে বেড়ায় তার ছায়াকে যেমন ধরা-ছোঁয়া যায় না, তেমনি যে রূপ কোনো বস্তুর মধ্যে নীড় বাঁধেনা তাকেও রেখা দিয়ে কায়দা করা যায় না। মনে মনে একটা আদ্‌রা আঁচতে যেয়ে আর একটা এসে তার জায়গা দখল করে নিয়ে নেয়, আর আগেরটা দেখ্‌তে না দেখ্‌তে উধাও হয়ে যায়। একটু বেশী অভ্যাস হয়ে এলে একটার খোঁজে হয়ত পাঁচটার আভাস মিল্‌তে পারে অথচ কোনটাই ঠিক রকমে পাওয়া যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে সব গুলিয়ে গিয়ে, আসলটিও হারিয়ে বা তলিয়ে যায়। অবশেষে একখানাতে এসে দৃষ্টি একটু স্থির আশ্রয় পেল। প্রথম যে ছবি-খানা কতকটা সফলতার দাবি কর্‌তে পারে তা রেখার আশ্রয়ে হয়নি, আল্‌কাত্‌রা চ'টে যেয়েই হয়েছিল। তাও দৈত্য-দানবের মতই দেখাচ্ছিল। আগে দেখে নিয়ে তারপর সুধু-হাতের টানে (freehand) আঁক্‌তে গিয়ে দেখা গেল যে ওতে আশার অনুরূপ ফল (effect) পাওয়া যাচ্ছে না। তখন ঐ সব সম্ভাবিত জায়গার উপরে কাগজ পেতে তার উপরে রেখাগুলো যেম্‌নি অনুসরণ কর্‌বার (trace) চেষ্টা করা হয়েছিল। এতে আরেক বিপদ ঘটে। যে যে রেখাগুলো দরকারী সেগুলো হারিয়ে যায়, আর যেখানে চটা আছে তা ভেঙ্গে সম্ভাবিত রূপখানি একদম্‌ নষ্ট হয়ে যায়। অবশেষে magnifying glass ধরে রেখে বা পেতে নিয়ে তার সাহায্যে ছবি তোলা অনেকটা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু চোখ বুলিয়ে যা দেখা যায় তার রেখাগুলো সব সময় মনের মধ্যে চোখের সামনে ঠিক একই ভাবে থাকে না, ওগুলো প্রায়ই জড়িয়ে যায় বা হারিয়ে যায়। এইজন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে চোখে-দেখা রেখাগুলোকে দীর্ঘদিন অনেকক্ষণ চোখ্‌ বুজে মনের মধ্যে সাজিয়ে ও গুছিয়ে নিতে হয়েছে। এইরূপ চেষ্টার ফলে যে যে রেখাগুলো কোনো একটা ছবির পক্ষে অনাবশ্যক সেগুলোকে বাতিল করা ও যেগুলো না হ'লে ঐ ছবি ছবিই হয় না সেগুলোকে হাসিল করা সম্ভব হয়েছে, আর মনের মধ্যে ঐরূপ ধারণাটা গেঁথে গেলেই বাইরে মূর্ত্তিটাকে স্থায়ী (steady) ভাবে দেখা যেতে লাগ্‌ল। রূপকথার জনমানবহীন বিশাল রাজপুরীতে যেমন কোনো একটি কক্ষে একটিমাত্র ক্ষীণ-খিন্না রাজকুমারী অঘোর ঘুমে অচেতন হয়েছিল, তার জীবনকাঠি মরণকাঠি দুটি তার অতি কাছেই পড়ে থাক্‌ত—তেমনি এক অলক্ষিত চিত্রের মায়াপুরীতেই রূপসুন্দরীকে জাগাবার বা ঘুম পাড়াবার সোনারকাঠি ও রূপারকাঠি একটু বিশেষ করে সন্ধান কর্‌লেই ক্রমে মিলে যেতে পারে। অবশ্য তা সবখানেই যে মিল্‌বে তা নয়; অনেক আভাস চেষ্টার মুখেই একেবারে লয় পেয়েও যায়। আবার হয়ত, বোঝাও যায়নি এমন এক জায়গায় একটি ধরা পড়েছে তার সোনারূপার কাঠি সুদ্ধ। সাড়ে তিন বছরের প্রয়াস অনেকরূপ মরীচিকার মধ্য দিয়ে তাঁকে এই সত্যে এনে পৌছতে পেরেছিল।

৩

প্রবন্ধের সঙ্গে যে কয়েকখানা ছবি দেখানো গেল তার সম্বন্ধেও একটু কিছু বল্‌লে বক্তব্য বিষয়টা খানিকটা পরিষ্কার হবে মনে করি।

এইগুলোকে তিন ভাগে ফেলা যেতে পারে। এবং পাওয়াও গিয়েছে এদের আদরা তিন রকমের জায়গায়। ভাঙা চটা, আল্‌কাত্‌রা লেপা ও ফাটা এবং ছাতা ধরা জায়গায়। নিবিষ্ট মন এবং চোখকে বহুবার এড়িয়ে গিয়েও অবশেষে আর ফাঁকি দিতে পারে নি।

শয়তানের ছবিগুলো নিছক্ কল্পনার খেলা। কোনো শয়তানের মুখের সঙ্গে অন্যটার মুখের সাদৃশ্য নেই, তবু সব কটাই যে শয়তান তা বুঝ্‌তে কষ্ট হয় না। "দুষ্ট শয়তান ও "সন্তপ্ত শয়তান" ছবি দুখানা একই আধার থেকে পাওয়া গিয়েছে, তবে তাদের প্রত্যেকের বিশিষ্টতা ফুটে উঠেছে কোনো কোনো রেখাকে বহাল রেখে বা বরখাস্ত করে দিয়ে। রেখা নির্ব্বাচনের জন্য যে খুবই ধৈর্য্য ও খাটুনি দরকার তা এই দো-রোখা ছবিতে বেশ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়্‌বে।

আর কয়েকখানা ছবিতে পরিকল্পনার (design) স্থান খুবই বেশী। ইহাকে আবার দুটি কোঠায় ফেলা যায়। "জীব-ধারার হারা-চিহ্ন" ছবি কখানা প্রকৃত রূপ ও অপ্রকৃত কল্পনা মিশিয়ে তৈরি হয়েছে। আর "বসন্তের রাণী", "বরাহ-অবতার", "ঠাকুরমা"ও "খ্রীষ্টীয় বীর" ছবিগুলো দেখ্‌লেই ঐ রকমের ভাব মনে আসে। এর মধ্যে "বরাহ অবতার" খানার আঁক্‌বার কৌশল ও কারচুপি (drawing) শিল্পীদের চোখে ধরা পড়্‌বে। এই ছবিতে যে গোঁফ দেখানো হয়েছে তা' কিন্তু আসলে কোনো রেখা থেকে পাওয়া যায়নি, দেয়ালের ঐ জায়গাটায় পিঁপড়ের বাসা ছিল, তার দাগটিকে আর-আর রেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখাতেই গোঁফের কল্পনা এসেছিল। ওটুকু জুটে উঠ্‌তে একটি দিনের সারাটি বিকাল প্রয়োজন হয়েছিল। এবং এইরূপ কোন কোন ছবি গুছিয়ে উঠ্‌তে ২।৩ সপ্তাহ ও কোনটিতে বা কোনটির অংশটিতে আরও বেশী কিছু সময় নিয়েছে।

মূর্ত্তি-চিত্রের দিক্ দিয়েই বোধ হয় এরকমের ছবির বিশিষ্টতা বেশী করে ধরা পড়ে। এখানে "শিবাজী মহারাজ" ও "ক্যানিউটের সমুদ্র-শাসন" ছবি দুখানা একেবারে দুরকমের। প্রথমটিতে রেখা-সমাবেশ আর দ্বিতীয়টিতে শুদ্ধ সীমারেখার নির্দ্দেশ দ্বারা ছবি খুবই জোরালো হয়ে উঠেছে। ঐ দুই রাজার পরিচিত ছবির সঙ্গে ঠিক্ না মিল্‌লেও এতে যে দুই রাজারই বিশিষ্ট ভঙ্গিটি বজায় আছে সে কথা বোধ হয় বলে দিতে হবে না।

যে সব ছবি এ প্রবন্ধে দেখানো গেল না তার সম্বন্ধে একটু কিছু বল্‌লে বোধ হয় দোষের হবে না। শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জন বাবু এমন কয়েকখানা ছবির কল্পনা পেয়েছিলেন যা কায়দা কর্‌তে পার্‌লে শিল্পের দিক থেকে অনেক লাভ হ'ত। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ও মহাবীর নেপোলিয়নের একটি করে ছবি অতি সুন্দর ভাবেই পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু ভঙ্গুর উপাদানের উপরে তার ছায়া পড়েছিল বলে তাকে আর ধরাও গেল না, রাখাও গেল না। দেয়ালের ফাটা-চটা থেকে তিনি বাউলের যে একখানা ছবির পুনর্কল্পনা করেছেন তা দেখ্‌লে শিল্পীরা এই নব-পদ্ধতির শক্তির পরিচয় পাবেন। আর একখানা চমৎকার ছবির বিষয় হচ্ছে সূর্য্যের রথ-যাত্রা। আরও একখানি চমৎকার ছবি চোখে ধরা পড়েও তাকে অঙ্কনে পাওয়ার মত কোন সুবিধা কর্‌তে না পারায় তা রাখ্‌তে পারা যায় নি। এইটির বিশেষ উল্লেখ কর্‌বার উদ্দেশ্য এই যে সেটিতে সাধারণ ছবির মত আভাস ও আদরায় এত মিল ছিল যে তা রাখ্‌তে পার্‌লে বিস্ময়ের উদ্রেক কর্‌ত। সেটি ছিল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একটি মর্ম্মরমূর্ত্তির ছায়া।

(৪)

এখন এই সব ছবি সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে দু' একটা কথা বলা যেতে পারে।

একটু লক্ষ্য কর্‌লেই দেখা যাবে আমরা যা দেখিয়েছি সবই মানুষের বা আর কিছু মূর্ত্তি-চিত্র। জল বা স্থলের প্রাকৃতিক কোন দৃশ্য (seacape, landscape) দেখানো যায় নি। রেখাঙ্কনের উপর এর ভিত্তি বলেই হোক্, কি অন্য কোন

সন্তপ্ত শয়তান
(SORROWS OF SATAN)

হৃষ্ট শয়তান
(SATAN'S SMILE)

গর্ব্বিত শয়তান
(SATAN'S PRIDE)

শয়তানের শ্যেনদৃষ্টি
(SATANIC PEEP)

অলক্ষিত শিল্প-জগৎ

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার মহাশয়ের সৌজন্যে

বরাহ অবতার

ঠাকুরমা
(GRANDMA')

অলক্ষিত শিল্প-জগৎ
শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার
মহাশয়ের সৌজন্যে

শ্রীরমেশ বসু

কারণেই হোক্ এরকমের ছবিতে মূর্ত্তিই যেন বেশী করে পাওয়া যায়। হয়ত চেষ্টা কর্‌লে অন্য রকমের জিনিষও ভবিষ্যতে মিল্‌তে পারে।

প্রচলিত পদ্ধতির ধার ধারা হয়নি বলে এগুলোকে একটু ভয়ে ভয়েই শিল্পী ও শিল্প-সমালোচকদের কাছে উপস্থিত করা গেল। শিল্পের দোষ ও গুণে অভ্যস্ত তাঁদের চোখে এগুলো কিরূপ ঠেক্‌বে তার উপরেই এক্ষেত্রে এরা নির্ভর করবে। তবে যতই দোষ থাক্ এর প্রধান গুণ হচ্ছে এই যে এগুলো অস্পষ্ট হয়েও কোনো ব্যাখ্যার ধার ধারে না—সেইজন্যে এগুলোর নাম আপনা থেকেই মনের কাছে ধরা পড়ে। আর, শিল্প-সংগ্রাহকের লুব্ধ দৃষ্টিকেও এরা এড়িয়ে চলে, কারণ শিল্পী না হলে এর সন্ধান ও সংগ্রহের কাজ আর কাউকে দিয়ে হ'তে পার্‌বে না।

এগুলি ভারতীয় বা বিদেশীয় কোনো শৈলর অন্তর্গত নয়। তাই এতে সকল দেশের, জাতির ও যুগের স্থান হ'তে পারে। গুরু ও শিষ্যের একটা পরম্পরা থাকাতেই শিল্পের শৈলী গড়ে উঠে। এখানে কেউ গুরু কেউ শিষ্য না থাকায় এতে নিত্য নব পদ্ধতি সম্ভব। মানুষের মন, চোখ ও হাত খাট্‌লে শিল্পে এক একটা ধরণ ধরে উঠাকে এড়ানো যায় না, কিন্তু এখানে তা না হওয়ায় কোনো বিশেষ দেশের মুখ ও দেহ অথবা ভাব প্রকাশের কোনো বিশেষ ঢং এক-চেটে হয়ে উঠ্‌তে পারেনি। অথচ এগুলো কোন্ জাতির, কোন্ জায়গার, এমনকি কোন্ বিশিষ্ট ব্যক্তির তা কাউকে একটুও বাত্‌লে দিতে হয় না।

মানুষের তৈরী বাগানে যেমন আমরা যেখানে যা ইচ্ছা করি তাই পাই, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু হঠাৎ জুটে যায় যা কখনও আশা করিনি বলেই বেখাপ দেখায় না, তেমনি সেইসব ছবির রেখা-সন্নিপাতের কোনো ধারা না থাকার দরুণ অনেক সময়ে এমন আকস্মিক ভঙ্গির উদ্ভব হয় যা কখনো ভেবে-চিন্তে করে-কর্ম্মে মোটেই ঘটানো যেত না। শিল্পীরা ছবি আঁক্‌তে হবে এরূপ মনোভাব নিয়ে ছবি আঁক্‌তে বসে যান, তাই তাঁদের কতকগুলো ধরা-বাঁধা আইন-কানুন মেনে চল্‌তে হয়—যা না হলে তাঁরা ভাবেন তাঁদের রচনা ছবিই হবে না। সামঞ্জস্য, আলো-ছায়া, পারিপ্রেক্ষিক প্রভৃতির সংস্কার বহুদিন থেকে মানুষের মনে গেঁথে গিয়েছে। এসব রীতি-রশুম ভেঙ্গেও যে শ্রেষ্ঠ শিল্প জন্মাতে পারে তার সাক্ষীর অভাব নেই। সুষমতা বা সামঞ্জস্যের (symetry) যে ধারণা আছে তার বাইরে যাওয়া নিশ্চয়ই বড় শক্ত কাজ। এখানে অবশ্য বুঝ্‌তে হবে সুষমতার দাবি কমে গেলেও অসমতা (Assymetry) ও বিষমতা ঠিক এক জিনিষ নয়। অসমতা দিয়ে যে শিল্প হয়—বরং উহা যে সৌন্দর্য্যের আকর্ষণের পক্ষে বিশেষ দরকার তা Klatsch নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর একখানা বইয়ে মাপ-জোখ দিয়েই দেখিয়েছেন। তারপর, আলো-ছায়া আর পারিপ্রেক্ষিকের বন্দোবস্ত না থাকা সত্ত্বেও পুরাণো ভারতীয় চিত্রকে অস্বীকার কর্‌বার সাহস কারও আছে কি না জানিনে। শরীর-তত্ত্বের (Anatomy) সঙ্গে মিলিয়ে যে ছবি হয় তাতে ছায়াচিত্র (Photogragh) হিসাবে মাহাত্ম্য থাক্‌লেও ভাব-যোজনার দিক্ থেকে কিছু না কিছু ঘাটৃতি হয়ই। যে রকমের ছবির আলোচনা আমরা এই প্রবন্ধে কর্‌ছি তাতে আমাদের মন যেন কেমন সচেতন হয়ে উঠে, তার কারণ হচ্ছে জ্যামিতির সমান সমান ত্রিকোণের মত এগুলো আমাদের মনের কোঠার সঙ্গে ঠিক্‌ঠিক্ খাপ খায় না। আর, খাপ না খাওয়ার দরুণ তা' আমাদের বোধটিকে জাগিয়ে দেয়—অসমঞ্জস সুষমার শক্তিটির প্রেরণায়।

সাধারণতঃ এই ছবি সর্ব্বাঙ্গে পরিপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় না। খুঁটিয়ে দেখ্‌লে নানা জায়গায় নানা রকমের অঙ্গহীনতা অতি স্পষ্ট-ভাবেই ধরা পড়ে। অনেকটা অস্বাভাবিক বলে এগুলোকে ছবি বল্‌তে আপত্তি কর্‌লে তার বিরুদ্ধে আপীল করা শক্ত হবে, কিন্তু এগুলির প্রকাশ-ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রকৃত শিল্প-রসিকের সঙ্গে মতভেদ হবে না বোধ করি। শিল্পীর যা-কিছু মনে আছে সব নিঃশেষ করে দেখিয়ে দেবার দাবী কর্‌লে এগুলির কোনো উপায় থাকে না বটে, কিন্তু শিল্পে ব্যাখ্যার চেয়ে ব্যঞ্জনার শক্তিই ত বেশী হওয়া উচিত—আর ব্যঞ্জনার অবসর এইরূপ চিত্রেই বেশী করে পাওয়া যায়। বরং এগুলি ব্যঞ্জনার অভিব্যক্তি দিয়েই গড়ে ও প্রকৃতপক্ষে তাই নিয়েই বেড়ে উঠেছে।

আধুনিক ইউরোপে চিত্রশিল্পের প্রাচীন প্রথার বদলে অনেক নতুন প্রথার উদয় হয়েছে। সেগুলো জন্মেই মহীরাবণের ছেলে অহিরাবণের মত "যুদ্ধং দেহি" বলে আপনার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে। মুস্কিলের কথা এই সেগুলোও ত মানুষের তৈরী, তাদেরও নানা কল-কৌশল কেতা-দুরস্ত (conventional) হয়ে উঠেছে। Cubism বা Impressionism একটু বেশী চালালেই আমরা অতিষ্ঠ হতে বাধ্য। এরা যেখানে অত্যাচার করে সেখানেও যদি আমাদের তা মেনে চল্‌তে হয়, তবে আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পের সেই "মুদ্রা," হাত, চোখ ও মুখের অস্বাভাবিক সংখ্যা এবং বর্ণ-রহস্য (colour-symbolism) মান্‌তে বাধা কি? যা হোক, এইসব আধুনিক শিল্প-প্রথার সঙ্গে আমাদের আলোচ্য চিত্রগুলির তফাৎ কতটা তা' তলিয়ে দেখ্‌লেই বোঝা যাবে। তারপর, আমাদের চিত্রগুলি বিকলাঙ্গ হলেও ব্যঙ্গ-চিত্রের (cartoon) মত ইচ্ছা করে তার মধ্যে বিদ্রূপ-বৈষম্যের কোন চেষ্টাই থাকে না। বরং অসম্পূর্ণ হয়েও কোন কোনটার মধ্যে এমন একটি ভাবের (gravity)র স্পর্শ বা আঁচ থাকে যে, তা প্রকৃত শিল্পীর হৃদয়টিকে অনায়াসেই ছুঁয়ে যেতে পারে।

মানুষের যা কিছু অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে তা সীমার মধ্যেই বেশী করে সার্থক হয়। কিন্তু আমাদের এই চিত্রের বৈচিত্র্যের যেন কোনো সীমানা নেই। তাই কথা হয়ত উঠ্‌তে পারবে এগুলো উচ্চ শ্রেণীর শিল্প-শক্তির পরিচয় এদের স্বভাব-ইঙ্গিতে দিতে গিয়েও দেবে কি না বা কোন্ পথে দেবে। এ নিয়ে আরও রচনা ও আলোচনা না হলে এখন এ কথার জবাবে বেশী কিছু বলা বোধহয় রায় না জন্মাতে রামায়ণের মত হয়ে পড়্‌বে। সুতরাং ভরসা করি এগুলোকে রেখালোকের হেঁয়ালি এবং এর শিল্পীকে রেখাছন্দের শুধু খেয়ালী মনে না করে এর মাঝে কোন রস পাওয়া যায় কিনা সুধীজনের দৃষ্টি তা'র অন্তরটিকে খুঁজ্‌বে।
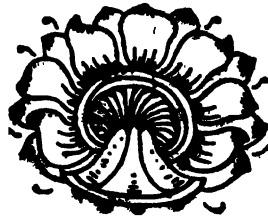
ক্যানিউটের সমুদ্র-শাসন

(KING CANUTE)

অলক্ষিত শিল্প-জগৎ
শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার
মহাশয়ের সৌজন্যে

নরসিংহ মেহতা

—শ্রীঅনাথনাথ বসু

গুজরাটী কবিগুরু নরসিংহ মেহতার সহিত আমাদের পরিচয় নাই; কিন্তু গুজরাটী সাহিত্যের সহিত সামান্য পরিচয়ও আছে অথচ নরসিংহ মেহতার নাম জানে না এমন লোক বিরল; গুজরাটের আবালবৃদ্ধবনিতা আজিও তাঁহাকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে, ঘরে ঘরে পূজাপার্ব্বণে গুজরাটের নারীগণ তাঁহার রচিত গরবা গান করিয়া মঙ্গল অনুষ্ঠান করে; গুজরাটে তিনি আদিকবি, নামে পরিচিত।

বাল্মীকিই সংস্কৃতের আদিকবি, কবিগুরু নামে পরিচিত; তাঁহার পূর্ব্বে সংস্কৃত কবিতার জন্ম হয় নাই বা কোন কবি কাব্য রচনা করে নাই এমন নহে। কিন্তু বাল্মীকিই আসিয়া সংস্কৃত কবিতায় একটি বিশেষ ঐশ্বর্য্য ও রূপ দিয়া এমন একটি অমর কাব্য রচনা করিয়া গেলেন যাহার তুলনায় পূর্ব্বরচিত কবিতা হীনপ্রভ হইয়া গেল; তাই তিনি আদি কবি।

নরসিংহ মেহতাও তেমনি নিজের সাধনা দ্বারা গুজরাটী সাহিত্যকে এমন একটি নূতন সম্পদ দান করিলেন যাহা পাইয়া তাঁহার ভাষা ও সাহিত্য অপরূপ শ্রীলাভ করিয়া নূতনরূপে প্রতিভাত হইল। তাঁহার পূর্ব্বে রচিত গুজরাটী কবিতাও আমরা পাইয়াছি; কিন্তু ভাষায় ও সাহিত্যে নরসৈয়াঁ এই যে অভিনব সৃষ্টি করিলেন তাহার পাশে সেগুলি একান্তই অকিঞ্চিৎকর। ভাবের সম্পদে, ভাষার লালিত্যে, শব্দের ব্যঞ্জনায় তিনি গুজরাটীতে এমন একটি নূতন প্রাণের সঞ্চার করিলেন যাহার ফলে এই ভাষা ও সাহিত্য নব জন্ম লাভ করিল; তাহার শৃঙ্খল ঘুচিয়া গেল। মূক নীরব ভাষাকে সঙ্গীত-মুখরিত করিয়া তুলিলেন। এই জন্যই বোধ করি তাঁহাকে আদিকবি বলিলে বিশেষ অতিশয়োক্তি দোষ হয় না।

কিন্তু কবি তাঁহার কাব্যের মধ্যে যেটুকু স্বল্প আত্মপরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন তাহার অধিক আমরা আর কিছুই পাই না। এতবড় একজন কবির জীবনের ইতিকথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; আজ তাহা ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয় হইয়াছে। এ'ত সেই সুপ্রাচীন কালের কথাও নহে যখন মানুষ ইতিহাস রচনার দিকে দৃষ্টি দিত না—সৃষ্টিই তাহার কাছে তখন বড় ছিল; সৃষ্টির হিসাব নিকাশ করিবার অবসর বা প্রবৃত্তি তাহাদের ছিল না, সেই বাল্মীকি ব্যাসের যুগের কথা নহে—নরসৈয়াঁ যে আজ হইতে প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবনের দিনগুলি কাটাইয়া গেলেন, তখন ইতিহাস রচিত হইত, দেশে ইতিহাস বোধ জাগিয়াছিল। সে যুগের রচিত ইতিহাস ত পাওয়া যাইতেছে না এমন নহে।

ব্যাপারটা পরমবিস্ময়ে বস্তুর হইয়া পড়ে; কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে এরূপ ঘটনা নূতন নহে। এদেশে কবির জীবনকাহিনীর চেয়ে তাঁহার সাধনাকে বড় করা হইয়াছে; কবি তাঁহার জীবনের ইতিহাস কাব্যেই রাখিয়া গিয়া তৃপ্তি পাইয়াছেন তাহাকে সন তারিখের নিগড়ে বাঁধিয়া অক্ষয় করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে নাই। মানুষের সাধনা মানুষের জীবন হইতে মহৎ। আমাদের দেশে রাজারাজাদের ইতিহাস পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশস্থলেই তাহাদের জীবনে এই সন তারিখগুলি ছাড়া আর কিছু স্মরণীয় থাকে না, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদের সাধনাদ্বারা নব নব যুগের পত্তন করিয়া গিয়াছেন ইতিহাস তাঁহাদের জীবনকাহিনী সম্বন্ধে একেবারেই নীরব হইয়া গিয়াছে—যাহা আছে তাহা তাঁহাদের সাধনার কথা।

নরসিংহ মেহতা তৎকালীন গুজরাটের আশা আকাঙ্ক্ষার সাধনার কাহিনী তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন; তিনি সমসাময়িক গুজরাটের ইতিহাসের একটি বিশেষ দিকের মূর্ত্ত রূপ।

তিনি শুধু কবিই ছিলেন না, সাধকও ছিলেন; মধ্যযুগের বহু কবির জীবনেই সাহিত্যসাধনা ও ধর্ম্মসাধনা এইরূপ মিলিত হইয়াছিল। তুলসীদাস কবীর প্রভৃতি সন্তকবিগণের কাব্য তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের সাধনালব্ধ সত্যের দীপ্ত জ্যোতিতে উজ্জ্বল; তাঁহাদের অন্তর্লব্ধবাণীর শব্দশরীর

রূপ। পরবর্ত্তীযুগের কবিগণের মধ্যে সাহিত্যসাধনাই বিশেষভাবে প্রকাশলাভ করিয়াছে; কিন্তু মধ্যযুগের এই সময়টিতে ভারতের ধর্ম্মজীবনে নব নব আন্দোলনের ফলে সাধনা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টি হইল;—প্রাদেশিক ভাষাগুলি এ যুগের সাধকদের সাধনাদ্বারা সাহিত্য-সম্পদ লাভ করিল; ফলে ধর্ম্মসাধনার বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্যের বিচিত্র বিকাশ মধ্যযুগে আমরা দেখিতে পাই।

নরসিংহ মেহতার কিম্বদন্তীমূলক জীবনের কথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। মেহতার রচনার যে রূপ আমরা আজ পাই-তেছি তাহা অত্যন্ত আধুনিক; তাঁহার সময়ের ভাষার যে এরূপ রূপ ছিল না তাহা প্রমাণিত হইয়াছে সেই যুগের অখ্যাতনামা কবিগণের কাব্যের আবিষ্কারে। নরসিংহের কবিতা যে এই আধুনিকরূপ লাভ করিয়াছে তাহা তাঁহার লোকপ্রিয়তার সাক্ষ্যই দিতেছে। এমনও অনেক কবিতা আজ তাঁহার নামাঙ্কিত পাওয়া যাইতেছে যাহা তাঁহার রচনা নহে; পরবর্ত্তীকালে বহু কবিযশঃপ্রার্থী নিজেদের রচিত-পদের অমরত্ব কামনা করিয়া তাহা নরসৈঁয়ার নামাঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। এমন কি তাঁহার ভণিতা দেওয়া হারমালা নামে যে কাব্য প্রচলিত আছে তাহাও বিশেষজ্ঞগণের মতে মেহতার রচিত নহে।

নরসৈঁয়া একটানা একখানা বড়কাব্য রচনা করিয়া যান নাই; তিনি পদাবলী রচনা করেন। কিন্তু এই সকল খণ্ড খণ্ড কবিতার মধ্যেও এই ভক্ত কবির একটী অক্ষয় পরিচয় আমরা পাই। পরবর্ত্তীকালে প্রেমানন্দ-প্রমুখ কবিগণ কিম্বদন্তী আশ্রয় করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কাব্যরচনা করিয়াছেন; আজ নরসিংহ মেহতার জীবনী আলোচনায় সেইগুলিই আমাদের অন্যতম অবলম্বন। মেহতার পদাবলীর নানাস্থলে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে উল্লেখ আছে কিন্তু তিনি কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কোন কথাই নাই।

যতটুকু জানা যায় তাহাতে মনে হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অনুমান ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের অন্তর্গত জুনাগড়ের নিকট তালাজা নামক গ্রামে দরিদ্র নাগর ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম হয়। শৈশবেই নরসিং পিতৃহীন হ'ন; তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে লইয়া দেবর পরবত-দাসের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শোনা যায় নাকি বাল্যকালে তিনি মূক ও জড় ছিলেন. পরে তাঁহার মাতা সাধুসেবার কল্যাণে পুত্রের বাক্‌শক্তি ফিরাইয়া পান্; গুজরাটের বিখ্যাত কবি প্রেমানন্দ সম্বন্ধেও এইরূপ একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

পিতৃব্যগৃহে নরসৈঁয়া আশ্রয় পাইলেন; কিন্তু লেখা পড়ার চেয়ে পথিক সাধুসন্তদের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া, তাহাদের নিকট গিয়া বসিয়া কৃষ্ণলীলা অভিনয়ে গোপীরাধা ইত্যাদি সাজিয়া এই সুদর্শন, সুকণ্ঠ বালকটির দিন কাটিতে লাগিল। প্রকৃতির কোলে এই ভাবেই তাহার জীবন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল; পাঠশালার পড়া তাহার ভাল লাগিত না।

নরসৈঁয়ার বিবাহের সম্বন্ধ হইল। পিতৃব্য ও মাতা তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন; কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে বাগ্‌দত্তা কন্যার পিতা এই মূর্খের সহিত বিবাহ দিতে অস্বীকার করিলেন। অপমানের এই আঘাতে নরসিংহের মাতার মৃত্যু হয়। ইহার কিছুদিন পরে পরবতদাসের চেষ্টায় তাঁহার বিবাহ হইল।

এই সময়েই বা ইহার কিছুদিন পরে পরবতদাসের মৃত্যু হয় এবং নরসৈঁয়া সস্ত্রীক ভ্রাতা বংশীধরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিত্তহীন উদাসীন যুবক সংসার পাতিয়া বসিল কিন্তু প্রতিদিনের সাংসারিক জীবন কোনদিনই তাহার মনকে বাঁধিতে পারিল না; সংসারের মধ্যে থাকিয়াও তাহার মন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত অতীন্দ্রিয়লোকে উড়িয়া বেড়াইত। বিবাহের পর অর্থের প্রয়োজন যথেষ্টই হইয়াছিল কিন্তু উপার্জ্জনের কোন চেষ্টা নাই, তিনি দিবারাত্র সাধুসঙ্গে ভজনকীর্ত্তনে কাটাইতে লাগিলেন।

এমনই সময়ে একদিন ভ্রাতৃজায়ার তীক্ষ্ণ বিষাক্ত বিদ্রূপবাক্যে তাঁহার উপার্জ্জনবিমুখ সংসারানাসক্ত জীবনে এক প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন আসিল। ভ্রাতৃজায়া বলিলেন, "রজকের পাথরও তোমার চেয়ে বেশী কাজ দেয়।" ভ্রাতৃজায়ার এই মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপে ব্যথা পাইয়া নরসৈঁয়া গৃহত্যাগ করিলেন।

কথিত আছে ইহার পর তিনি মহাদেবের আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া দেবদুর্লভদর্শন বৃন্দাবনের রাসলীলা প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহার বহু পদে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। গুজরাটীতে ভ্রাতৃজায়াকে "ভাভী" বলে। ভাভীর কল্যাণে এই যে সম্পদ তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন

মরম বচন কহ্যাঁ মুজনে ভাভীএ তে
মারা মনমাঁ রহ্যাঁ বলুধী।
শিবজী আগড় জই এক মনোরথ
স্তুত কীধী দিবস সাত সুধী।

* * *

ভাভীএ ভাগ উদে কার্য্যা
মনে কহ্যাঁ কঠন বচন।
ত্যারে নরসৈয়োঁ নিরভয় থয়ো
প্যামো তে জুগজীবন॥

ভ্রাতৃজায়া কঠিন বচনে আমার সৌভাগ্যের উদয় করিয়া দিলেন; তাই নরসৈঁয়া আজ অভয় পাইল; সে জগতের জীবন জীবননাথকে পাইল। গৃহে ফিরিয়া নরসিংহ ভ্রাতৃজায়াকে বলিলেন,

তে বজ্রবাণ জেবুঁ মহেণুঁ মার্যুঁ
নে দুখড়ুঁ মারুঁ সহেজে হর্যুঁ।
ধন্য ভাভী তমে ধন্য মাতা পিতা
কষ্ট জানী মনে দয়া কীধী।
তমারী কৃপাথকী হরিহর মেট্যা
কৃষ্ণজীএ মারী সার লীধী॥

তোমার বজ্রনিদারুণ বিদ্রূপ আমার দুঃখ হরণ করিল; ধন্য তুমি আমার সর্ব্ব দুঃখ হরণ করিলে; তোমার কৃপায় হরিকে পাইলাম; শ্রীকৃষ্ণ আমাকে তাঁহার করিয়া লইলেন।

নরসিংহ মেহতা গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু সংসার তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না; গৃহকর্ম্ম তাঁহার মন তৃপ্তি পাইল না। যুবতী স্ত্রী মানেকবাঈ তাঁহাকে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দারিদ্র্য দূর করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি সর্ব্ব চিন্তা শ্রীভগবানকে অর্পণ করিয়া কীর্ত্তনে বিভোর হইয়া গাহিলেন—

জেহনা ভাগ্যমা জে সমে জে লখ্যুঁ
তেহনা তে সমে তেজ পহোঁচে॥
জে গমে জগতগুরু দেব জগদীশনে
তে তণো খরখরো পোক করবো॥
আপণো চিংতব্যো অর্থ কাঁই নব্ সরে
উগরে এক উদ্বেগ ধরবো॥
হুঁ করুঁ হুঁ করুঁ এজ অজ্ঞানতা
শকটনো ভার জেম শান তাণে॥
সৃষ্টি মংডান ছে সর্ব্ব এনী পেরে
জোগী জোগেশ্বরা কোক জাণে॥

জগদীশ্বর যাহা দিবেন তাহাই লইতে হইবে; তবে কেন বৃথা "আমি করি" "আমি করিব" অভিমান।

স্ত্রীর একান্ত আগ্রহে নরসিংহকে পৃথগন্ন হইয়া নূতন সংসার পাতিতে হইল কিন্তু স্ত্রীকেই পিতৃগৃহ হইতে অর্থ আনাইয়া সংসার চালাইতে হইল, কারণ মেহতার উপার্জ্জনের দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নাই; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি উত্তর দেন—বৃথা চেষ্টা, যিনি জীবন দিয়াছেন—অন্ন জোগাইবেনও তিনি।

স্বামীর মতিগতি দেখিয়া ক্রমে মানেকবাঈএর জীবনে পরিবর্ত্তন আসিল; তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আর বাক্যবাণে তাঁহাকে উত্ত্যক্ত না করিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন;

নরসিংহ মেহতা

শ্রীঅনাথনাথ বসু

কিন্তু দারিদ্র্য বাড়িয়াই চলিল, উপার্জ্জনের কোন চেষ্টাই হইল না; কেহ প্রশ্ন করিলে মেহতা উত্তর দিতেন—"সকল সৃষ্টির ভার যিনি লইয়াছেন তিনি আমাদের ভারও লইবেন।"

তাঁহার এই নিশ্চেষ্টতা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নহে; অলসের কর্ম্মবিমুখতা নহে। ইহার মধ্যে একটি পরম নির্ভরশীল বিশ্বাসের ছবি ফুটিয়া উঠিত। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কেমন করিয়া তাঁহার এই একান্ত শিশুচিত্ত নির্ভরশীল ভক্তের সকল প্রয়োজন সাধন করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কয়েকটী কথা প্রচলিত আছে। এ স্থলে সেগুলির অবতারণার কোন প্রয়োজন নাই।

যে পরম প্রেম জীবনে পাইলে আত্মীয়পর ধনীনির্ধন উচ্চনীচ সকলই সাধকের কাছে সমান হইয়া যায় নরসৈয়াঁ জীবনে সেই প্রেম উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

জাত পাত পুছৈ ন কোঈ।
হরিকো ভজৈ হরিকা হোঈ॥

তাঁহার কাছে জাতিপাঁতি সকলই এক হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন অভিজাত নাগর ব্রাহ্মণ; এখনও গুজরাটে নাগর ব্রাহ্মণদের অধিকাংশই শৈবই। সেই নাগরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি যে কেমন করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছিলেন তাহার ইতিহাস জানা যায় না।

যখন নগরের অন্ত্যজ ঢেডরা আসিয়া তাঁহাকে তাহাদের পল্লীতে গিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিল তাহাদের সে অনুরোধ তিনি অস্বীকার করিলেন না, সানন্দে গ্রহণ করিলেন।

সমস্ত রাত্রি ঢেডপল্লীতে কীর্ত্তনের স্রোত বহিয়া গেল; নরসৈয়াঁ পদের পরে পদ গাহিয়া প্রহরের পর প্রহর কাটাইয়া দিলেন; ঢেডরা কৃতার্থ হইল, ভগবানের কীর্ত্তন করিয়া নরসৈয়াঁ নিজেও ধন্য জ্ঞান করিলেন। প্রভাতে যখন ব্রাহ্মণেরা এ সংবাদ শুনিল তাহারা মেহতার এই অবিবেচিত চণ্ডাল সমাগমে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; উচ্চকুলজাত নাগর ব্রাহ্মণ, তাহার একি ব্যবহার! একে ত' সে তাহার পৈতৃক শৈবধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছে, তাহার উপর আবার ঢেড চণ্ডাল প্রভৃতি অস্পৃশ্য অন্ত্যজদের সহিত কীর্ত্তন। নীতিধর্ম্ম যে সব গেল। সমাজের কয়েকজন নেতা মেহতার কাছে গেল তাঁহাকে বুঝাইতে।

তিনি উত্তর দিলেন,

এবোরে অমো এবোরে এবা
তমে কহোছো বড়ী তেবা রে;
ভক্তি করতা জো ভ্রষ্ট কহশো তো
করশুঁ দামোদরনী সেবারে।
জেনু মন জে সাথে বঁধাণুঁ
পেহেলু হতুঁ ঘর রাতুঁ রে,
হবে থকুছে হরিরস মাণু
ঘের ঘের হীড়েছে গাতুরে॥

তোমরা ত' বলিলে এরূপ, কিন্তু আমি যে জানি অন্য। আজ যদি ভক্তিসাধন করিতে গিয়া তোমরা আমাকে ত্যাগ করো আমি কি করিব। আজ আমার মন হরিরস পান করিয়াছে; তাই দ্বারে দ্বারে আমি গান গাহিয়া ফিরিতেছি।

ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গেল। তিনি আপন মনে গাহিলেন

দুরমতিয়াঁ তাহ্যা অই আবে
শানা অই সমজাবে রে;
প্রেম ভক্তিমাঁ ভংগ পড়াবে
অজ্ঞান আগড় লাবে রে।
আপনা কুলমাঁ কোইএ ন কীধুঁ
তে আপন কেম করীয়ে রে;
বেরাগী অই নাটক নাচীয়ে
তুলসী তিলক কেম ধরীয়ে রে।
কুলনে তজশে নে হরিনে ভজশে
সহেশে সংসারনুঁ মহেণুঁ রে।
ভণে নরসৈয়াঁ হরি তেনে মলশে
বাজি বাতে বাহশে বীহেণু রে॥

দুর্মতি আসিয়া কত কি বলিয়া বুঝাইয়া গেল ; তাহারা আমার প্রেমখণ্ডিত করিতে চাহে···অজ্ঞানের নিগড়ে বাঁধিতে চাহে। কুলত্যাগ করিতে হইবে ; তবেই হরিকে ভজিতে পারিবে—সংসারের কত বিদ্রূপ আসিয়া তোমাকে আঘাত করিবে, তখনই শুধু তুমি হরিকে পাইবে।

কিছুতেই কিছু হইল না, নরসৈঁয়ার জীবন পূর্ব্বেরই মত চলিতে লাগিল। গৃহে সেই অভাবের ব্যথা, অন্তরে পরম সম্পদ-লাভের পরিপূর্ণ আনন্দ। নরসিংহের এই সময়ের রচিত পদগুলির মধ্যে এমনই একটি স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য আছে যাহা এই চারিশত বৎসর ধরিয়া গুজরাটের নরনারীর শ্রান্তক্লান্ত হৃদয়ে স্নেহধারা বর্ষণ করিয়া আসিতেছে। এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধান সে সৌন্দর্য্যের কণামাত্র হরণ করিতে পারে নাই।

নরসিংহের জীবন পূর্ণ হইয়াছিল ; তাঁহার পরিবারের যে চিত্র তিনি তাঁহার কাব্যের স্থানে স্থানে রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে মাতা, পুত্র, পিতা পুত্রীর এই অতি সাধারণ সহজ স্নেহবদ্ধ শান্ত পরিবারটির ছবি আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। পুত্রী ও পুত্রের বিবাহ নরসিংহ মেহতা দিয়াছিলেন কিন্তু কিছুকাল পরেই তাঁহার স্ত্রী ও একটি যুবতী বিধবাকে রাখিয়া তাঁহার পুত্র মারা গেলেন। এই শোক, শান্ত পরিবারে মৃত্যুর এই অপ্রত্যাশিত প্রবেশ ও ধ্বংসলীলা, কিন্তু মেহতাকে স্পর্শ করিতে পারিল না ; তিনি গাহিলেন—

পত্নী নে পুত্র রে মরণ পামীয়াঁ।
নগরনা লোক করে রুদন।
অবধ জেনী ধই তে জায়ে সহী
লেশ নহি শোক করতুঁ মন॥

নগরের লোক অবোধ, তাহারা কাঁদিতেছে, কিন্তু আমার চিত্তে বিন্দুমাত্র শোক নাই।

প্রেমানন্দ কবির যে চিত্র অঙ্কণ করিয়াছেন তাহাতে তিনি কবির মুখ দিয়া বলাইয়াছেন,

ভলুঁ থয়ুঁ ভাগী ভাঙ্গাড়
সুখে ভজীশুঁ শ্রীগোপাড়।

শেষোক্ত পদ অপেক্ষা পূর্ব্বোদ্ধৃত পদে মেহতার ছবি সুন্দরতর ভাবে ফুটিয়াছে। নরসৈঁয়া ত' বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ছিলেন না, জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত সুকুমার বৃত্তিগুলি, চোখের জল শুখাইয়া দেয় নাই ; তিনি ছিলেন ভক্তিবাদী, গৃহী ; প্রেম ছিল তাঁহার জীবনের সাধনা ; সংসারের সকল সুখ দুঃখ সকল সামাজিক সম্বন্ধ তিনি অমর প্রেমের স্পর্শমণির স্পর্শে সোনা করিয়া তুলিয়াছিলেন।

তাই একদিন কন্যা কুঁবরবাঈ যখন পারিবারিক শোক সংবাদে আকুল হইয়া পিতার কাছে ছুটিয়া আসিলেন নরসৈঁয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,

ছে সুখদুঃখ সংসার
রেশো রুদিয়া ফাট্শে রে
নথী অস্যুঁ কো লোহেনার রে।

সুখ দুঃখের এই সংসার ; এখানে ত' কাঁদার অন্ত নাই। কিন্তু কাঁদিয়া শুধু বক্ষবিদীর্ণ করিবে। তোমার চোখের জল মুছাইতে পারে (এখানে) এমন কেহ নাই। তাই সমস্তই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া দাও ; তিনি তোমার ব্যথা নিজের বুকে লইবেন, তোমার চোখের জল মুছাইবেন।

এমনই করিয়া সকল দুঃখ সহিয়া তিনি কীর্ত্তনে পদরচনায় ভগবদারাধনায় তাঁহার জীবন কাটাইয়া দেন।

তাঁহার রচনাবলীদ্বারা যে সম্পদ তিনি গুজরাটকে দিয়া গিয়াছেন তাহা আজিও গুজরাটবাসী কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছে। তাঁহার রচনাবলী সংগৃহীত এবং সম্পাদিত হইয়াছে।

নরসৈঁয়া পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন ; আমাদের দেশের পদাবলীকর্ত্তাদের রচিত পদের বিশেষ বিশেষ সংগ্রহের বিশেষ নাম হইয়াছে পূর্ব্বরাগ, অভিসার, প্রার্থনাত্মক পদাবলী, তেমনি নরসৈঁয়ার পদাবলীর বিশেষ বিশেষ সংগ্রহের বিশেষ নাম রহিয়াছে, গোবিন্দগমন, বাললীলা, শৃঙ্গারমালা, হারমালা, দানলীলা, চাতুরী-ছত্রিশী

শ্রীঅনাথনাথ বসু

হিন্দোলের পদাবলী, বসন্তের পদাবলী, সুদামা চরিত্র ইত্যাদি। এগুলির কোনটিই একটি একটানা কাব্য নহে; প্রত্যেকটির মধ্যেই নরসৈঁয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতা বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের এক একটি বিশেষ ছবি নানা পদের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; কোথাও আমরা বালক কৃষ্ণের দেখা পাই; মাতা যশোদার সহিত তাঁহার সে খেলা, দুষ্টামী, লীলাচাপল্য; কোথাও বা আমরা গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের ছবি দেখি; কোথাও আবার দীন সুদামের বন্ধু সখারূপে অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণের ছবি আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। নরসৈঁয়ার সমগ্র পদাবলীর মধ্যে এইরূপ নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ছড়াইয়া রহিয়াছে।

এই পদগুলি এত সরল, সরস তাহাদের মধ্যে মানুষের ক্ষুদ্র সুখদুঃখের অতীত অথচ তাহার সহিত একান্তভাবে জড়িত অতীন্দ্রিয় রসলোকের ছবি এমনই সহজভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে সেগুলির সহিত পরিচয় বিদ্যার বা পাণ্ডিত্যের অপেক্ষা রাখে না। অতি দীনতম দীন, সাধারণ মানুষও তাঁহাদের মধ্যে নিজের অন্তরের গভীরতম সুরটি খুঁজিয়া পায় তাই সেগুলিকে ভালবাসে সেগুলিকে নিজের জীবনের ও সাধনার সহিত একান্তভাবে মিলাইয়া লয়।

আজও গুজরাটের নগরে গ্রামে গৃহে গৃহে প্রভাত নরসৈঁয়ার রচিত প্রভাতিয়ার সুরে মুখরিত হইয়া উঠে; পূর্ণিমার চন্দ্রালোকিত রজনীগুলি নারীকণ্ঠোচ্চারিত তাঁহার গরবা গানে প্রতিধ্বনিত হয়। এই ভাবেই নরসিংহ মেহেতা তাঁহার সাধনা দিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন।

———:০:———

যাবার বেলায়

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

যা কিছু মোর হাসিখুসি যা কিছু মোর ধন,
যাব যখন দিয়ে যাব তোমারে তখন।
চাঁদের আলোয় পথহারানো তারার ছড়া ছড়ি,
তারই মাঝে কে আসে যে বেয়ে সোনার তরী;
আমার প্রাণে ঢেউ লাগ্‌নো তাহার আসাটুক্
যাব যখন দিয়ে যাব ভ'রে তোমার বুক।

একটুখানি সুখের স্রোতে ডুবিয়ে দেওয়া মন,
যাব যখন দিয়ে যাব তোমারে তখন।
আঁখির জলে ভিজে ভিজে দিনটি হ'ল সারা,
তারি মাঝে চেনা মুখের চমক অথির পারা,
পড়ে আছে সোনা হ'য়ে আমার বুকের কোণে,
যাব যখন দিয়ে যাব শেষের বিদায়ক্ষণে।

পরিসমাপ্তি

— গল্প —

শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১

ছুটো পরিবারের মধ্যে বংশানুক্রমে বিবাদ চ'লে আস্‌ছিল। অর্থপ্রাচুর্য্যের দিনে মামলা মোকদ্দমা এবং অবস্থা বিপর্য্যয়ে কুৎসা রটান ও গালিগালাজ করা এ যেন ছুটো ভদ্রবংশের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। কবে কোন অশুভক্ষণে বোস্ বংশের এক অভিমানী যুবক মিত্রবংশে বিয়ে ক'রে শ্যালক কর্ত্তৃক অপমানিত হ'য়ে মানহানির নালিশ ক'রে বসেন—সেই থেকে আজ পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে এ ছুটো বংশের বৃদ্ধ বৃদ্ধা তরুণ তরুণী, এমন কি বালক বালিকা পর্য্যন্ত যেন স্বভাব-কুটিল হিংস্র বন্যপশুর স্বভাব পেয়েছিল। বোস্ বংশের কুৎসা পেলে মিত্ররা সারারাত্রি জেগে কাটাত, এবং মিত্রদের অনিষ্ট করতে পারলে বোসেরা প্রাণ দিত।

এমনি যখন অবস্থা তখন উভয় পরিবারের বড় কর্ত্তাদের ছুটী অনূঢ়া বয়স্থা কন্যা একই সময়ে যেন বিশ্বরাজের তোরণ-দ্বারে জীবনসঙ্গীর প্রার্থনা জানালে। লীলা মিত্র ও নির্ম্মলা বোসকে একসঙ্গে দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস হ'ত না যে তারা পাঠশালা থেকে আরম্ভ ক'রে কলেজের উচ্চশ্রেণী পর্য্যন্ত একসঙ্গে পড়েছে। অতি শিশুকাল থেকে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা এতই প্রবল ছিল যে গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগলেও কেউ কারো সহিত কথা ব'লত না, শুধু ভ্রুকুঞ্চনে নিজের ঘৃণা ও বিরক্তি প্রকাশ করত। লীলা সুন্দরী, কিন্তু মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা,—সে তার রূপের ছটায় ধনীকন্যা নির্ম্মলাকে উদ্‌ভ্রান্ত করত; আর নির্ম্মলা তার শ্যামশোভাকে অদ্ভুত ক'রে তুলত নিত্য নূতন সাড়ী ও গহনায় সেজে। স্কুল ছেড়ে যখন তারা কলেজে ঢুকল তখন মেয়েদের মধ্যে তারা [illegible] হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। লীলার সঙ্গিনী অনিলা [illegible] এসে বল্‌লে "ওভাই লীলা, নির্ম্মলা তোমায় ডাকছে।" অমনি লীলা তার সুন্দর মুখটিকে রাঙ্গা করে বল্‌ত, "দেখ্ অনি, ফের যদি আমার সামনে নিমির নাম করবি ত—" তরুণীর দল কলহাস্য ক'রে উঠ্‌ত। নির্ম্মলাকে দেখলেই মেয়েরা বলে "লীলা ডাকছে শোননা নির্ম্মলাদি।" আস্‌মানি রঙের জরিদার সাড়ীর আঁচ্‌লা ছুলিয়ে নির্ম্মলা উত্তর দেয় "আমার যেতে ব'য়ে গেছে।" এমনি ক'রে বুকভরা রাগ, হিংসা ও বিরক্তি নিয়ে ছুটী মেয়ে বেড়ে চলে কিজানি কোন্ সৌন্দর্য্যালোকের পানে।

২

ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রভরা গ্রীষ্মের দুপুর। নিঝুম্ নগরীর রাজপথ মুহ্যমানের মত পড়ে আছে। বোস-পরিবারের বড় বাবু নিমাই সবেমাত্র মধ্যাহ্ন তন্দ্রাটুকু উপভোগ করছিলেন এমন সময় ছোটভাই শিবচরণ একেবারে ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে বল্‌লে—"শুনেছ ছোড়দা, ললিত মিত্তির প্রোফেসার যতীনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে, পরশু পাকা দেখা।"

গুড়গুড়ির নল হাত থেকে খ'সে পড়ল—দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে নিমাই বললেন—"বলিস কি শিবু, গত রবিবার যে যতীন নিজে নির্ম্মলাকে কথা দিয়ে গেছে।" হাতের আস্তিনটা গুটিয়ে পার্শ্বস্থিত টেবিলের উপর একটা প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করে শিবচরণ বললে—পাকা জোচ্চোর, ছোড়দা, পাকা জোচ্চোর! শুনলুম যতীনটার সঙ্গে ললিত মিত্তির অনেক দিন হ'ল মেয়ের আলাপ করিয়ে দিয়েছে, আর ছোঁড়াও নাকি এতদিনে মত দিয়ে ফেলেছে। আচ্ছা আমিও দেখে নেব, কত বড় ধূর্ত্ত যতীন তা আমিও দেখে নেব।"

কি একটা কাজে নির্ম্মলা এইদিকে আসছিল, কাকার রুদ্রমূর্ত্তি দেখে সে সেইখানেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে কথাগুলি শুনলে। তার মনে হ'ল এত বড় মর্ম্মান্তিক প্রতিশোধ

শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বুঝি লীলা তাকে কোন দিন দেয় নাই। হলেও শত্রু তবুও ত সে নারী। তার নিমেষের জন্য যতীনের মুখ মনে পড়ল। কি উদার সরলপ্রাণ যুবক—কিন্তু এতটা দুর্ব্বল এতটা নির্ম্মম! পিতা ও পিতৃব্য উভয়েই বোধকরি তার মনের অবস্থাটা কল্পনা করেছিল, তাই দুজনেই বলে উঠল—"কিছু দুঃখ নেই মা—এই ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে তবে অন্য কাজ।"

ঠিক একথাটা যেন সে অত স্পষ্টভাবে আশা করেনি; গুরুজনের সাক্ষাতে নিজের অলক্ষে মনটাকে যে এমন করে মেলে দিয়েছিল তা ভেবে সে যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল, তাই নিমায়ের প্রসারিত বুকের উপর মুখটা রেখে কেঁদে বলে উঠল—" কেন বাবা, আমি ত লীলা নই।"

৩

কিন্তু এতটাই যে হবে তা নিমাইও আশা করে নাই—নির্ম্মলা ত স্বপ্নেও ভাবে নাই। যতীনকে কিছুতেই রাজি করতে না পেরে শিবচরণ তাকে লাঠির আঘাতে অচৈতন্য করে ফেরার, আর তাকে ফাঁসী কাঠে ঝোলাবার ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা নিয়ে ললিত মিত্র আদালত সমক্ষে অবতীর্ণ। আজ বসুদের বৃহৎ অট্টালিকা যেন শোকের ভারে মুহ্যমান। সকাল হ'তে হাঁড়ি চড়েনি, শিবচরণের স্ত্রী শয্যা নিয়েছেন; নিমায়ের স্ত্রী মিত্রদের উদ্দেশে অবিশ্রাম গালিগালাজ করে এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছেন; বাড়ীর ছেলেরা কে যে কোথায় সরে পড়েছে তার ঠিক নেই, শুধু পাথরের মূর্ত্তির মত নির্ম্মলা সদরের বারান্দার রেলিং ধরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তার সম্মুখে আসন্ন সন্ধ্যা যেন সন্তপ্তশোকের মত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল।

আজ নিমায়ের ঘরে আলো জ্বলেনি; ভাইয়ের সমূহ বিপদে বেচারী একেবারে আকুল হয়ে পড়েছিল হঠাৎ সম্মুখে নির্ম্মলাকে দেখে ধীরে ধীরে কাছে এসে বললে—"নিমুমা কাকার জন্য বড় ভাবনা হয়েছে না?" সে কথার কিছু উত্তর না দিয়ে নির্ম্মলা বল্লে—"না বাবা, আমি ভাবছি সেই হতভাগ্য ভদ্রলোকটির কথা যিনি বিনা অপরাধে অকালে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।"

নিমাই আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কিন্তু মা, তার কি কোন দোষ ছিল না?" অধীর হয়ে নির্ম্মলা বললে—"কিছু না বাবা, কিছু না, তাঁ'র যাকে খুশী তিনি বিয়ে করুন তাতে আমাদের বাধা দেবার কিছু নেই।" তারপর ধীরে ধীরে পিতার বুকের উপর মাথাটি রেখে গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—"একটা অনুরোধ রাখবে বাবা—একটা গাড়ী আনিয়ে দেবে, আমি একবারটী হাঁসপাতালে গিয়ে তাঁ'কে দেখে আসি।" নিমায়ের কানে নির্ম্মলার শেষ কথাগুলি যেন যুগান্তের বিরহিণীর হাহাকারের মত শোনালো। তিনি দুহাতে চোখের জল মুছে বল্লেন—"এখুনি যা মা, আজ আর তোর কোন কাজে বাধা দেবার শক্তি আমার নেই।"

৪

হাঁসপাতালে যখন সে পৌঁছল তখন অন্ধকার রাত্রি ধরণীর বুকে বেশ খানিক কালো আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে। সুবৃহৎ হাঁসপাতাল ক্ষীণ আলোকে আর গভীর স্তব্ধতায় যেন একটা অসাড় দৈত্যপুরী, যমদূতের আসর, অকাল মৃত্যুর আলিম্পনা। সে ধীরে ধীরে যতীনের ঘরের কাছে আসতেই একটী তন্বী নার্স জিজ্ঞাসা করলে—"ওঁর ঘরে এখন ওঁর ভাবী পত্নী মিস্ মিত্র রয়েছেন, আপনার যাওয়াটা উচিত হবে কি?" স্থিরভাবে কিছুক্ষণ নার্সের মুখের দিকে তাকিয়ে নির্ম্মলা উত্তর করলে—"আমি তাঁর প্রথমা স্ত্রী, আমার যাওয়ার খুবই অধিকার আছে।" তার কথাগুলো বোধ হয় লীলার কানে গিয়েছিল তাই নির্ম্মলা ঘরে ঢুকতেই সে উচ্ছ্বসিত হয়েকেঁদে নির্ম্মলার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বল্লে—"দিদি তাঁকে বুঝি আর বাঁচাতে পারলুম না।" তাড়াতাড়ি লীলাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তার কপালে একটী সস্নেহ চুম্বন করে নির্ম্মলা বল্লে—"দুঃখ কি বোন্, এস আজ দুজনে এক সঙ্গে হাতের চুড়ি ভেঙে ফেলি।"

পর দিন দুটী পল্লীর বিরোধী, হিংস্র-কুটিল, স্বার্থ-পরায়ণ পরিবার বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে দেখলে বিধবার মতো দুটী সদ্য শোকাতুরা তরুণী পরিবারের যুগান্তব্যাপী সংগ্রামের পরিসমাপ্তি করে অরুণিমার রক্তরাগের মত শান্তি-ভরা সন্ধিপত্র হাতে প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে।

ঘর ছাড়া

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

তুমি কি পারিলে রাখিতে ধরি'
হে সহচরি!
দু'টি বাহু ঘিরে' তাঁরে আঁকড়ি'
এ মোর তরী?
হায় রে অবোধ তটদেশিনী
সুনীল তমাল-তালী—কেশিনী,
তুমি কি পারিলে রাখিতে ধরি'
এ মোর তরী
বেণীপাশে এরে পাশে পাকড়ি'
হে সহচরি!

আঁখির মিনতি বাঁধিল না রে
ঘর ছাড়ারে।
এ কাঠ হৃদয় কাঁদিল না রে
ছাড়িতে কা'রে।
কূল ছেড়ে আজি চলে যে ভেসে
নাহি জানে কোথা থামিবে এসে
সাঁতারি' পাথার কোন সে পারে
লভিতে ক'রে।
আঁখিজলে ভাসা সাজে কি তা'রে
ঘর ছাড়ারে!

আজি ভেসে চলি কালের স্রোতে
মহাজগতে,
ঘাটে ঘাটে বাঁধা থাকা হতে
অকূল পথে।

আজি আমি চলি দুলে দুলে রে
মৌমাছি সম ফুলে ফুলে রে
প্রতি দিবসের শাসন হ'তে
অ-কাল পথে।
দেশ ছেড়ে চলি বিশাল রথে
মহা জগতে।

যতদূর মম নয়ন যায়
সীমা কোথায়!
এরি কোলে রবি জাগে-ঘুমায়
তারা হারায়।
ঢেউ ফুটে ওঠে ঢেউ ঝরে গো
ফেনায় ফেনায় থরে থরে গো,
বসন্ত নিতি তুলি বুলায়
দিক-সীঁথায়।
সমীরণ নিতি বাঁশি বাজায়—
'রাধা কোথায়!'

পুন কোন দেশে পড়িব বাঁধা,
নূতনা রাধা!
পুন কোন বনে বাঁশরি-সাধা,
আবার কাঁদা!
পথের কোথাও শেষ কি আছে,
পথিকের কোনো দেশ কি আছে,
ঘরের বাঁধনে নাই কি বাঁধা,
নাই কি কাঁদা!
সমাপিবে চির বাঁশরি-সাধা,
সুচিরা রাধা!

———:o:———

বাদক ও শ্রোতা

শ্রীসোভাগমল গেলোট
শান্তিনিকেতন

মাঘ, ১৩৩৪

ভ্রাম্যমাণের জল্পনা
রোমাঁ রোলাঁ

—শ্রীদিলীপকুমার রায়

সঙ্গীত ও স্বরলিপি

গান কয়টি শেষ হ'লে রোলাঁ ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীতের উচ্চকণ্ঠে তারিফ ক'রে বল্‌লেন; "কিন্তু দিলীপ, তোমার একটা মস্ত কাজ করবার আছে। সেটা তুমি কেন কর্‌ছ না? তোমাকে কতবার ব'লেছি।"

—"কি?"

—"এ গানগুলির স্বরলিপি য়ুরোপে প্রচার করা। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস য়ুরোপ ভারতীয় সঙ্গীত থেকে বিশেষ লাভবান হবে। প্যারিসের কয়েকটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত পত্রিকায় কেন তুমি তোমাদের রাগসঙ্গীত সম্বন্ধে স্বরলিপি সমেত প্রবন্ধাদি প্রকাশ করছ না?"

আমি ইতস্তত ক'রে বল্‌লাম "সত্যি কথা বলতে কি, মসিয়ে রোলাঁ, আমি এতদিন য়ুরোপে আমাদের গানের সওদা করবার কোনও সত্য প্রেরণাই অনুভব করি নি কারণ আমার বিশ্বাস ছিল যে য়ুরোপ কখনই আমাদের সঙ্গীতের ধারাটি ঠিকমত গ্রহণ করতে পারবে না।"

—"কিন্তু দিলীপ, তাতে কী যায় আসে? এ সংসারে যার যতটুকু সৃষ্টি-প্রতিভা আছে তার পক্ষে সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য হ'চ্ছে সেই প্রতিভার রসধারা দিয়ে মানুষের হৃদয়ের মাটিকে উর্ব্বরা ক'রে রেখে যাবার চেষ্টা করা—বীজ বপন ক'রে যাওয়া। বাকিটুকু ত' আমাদের ওপর নির্ভর করে না। কোন্ বীজের অঙ্কুরে কি ফসল যে ফল্‌বে সেটা ত বপনকারী আগে থাক্‌তে জান্‌তে পারে না—সে তত্ত্ব জানেন কেবল তিনি, যিনি সকল বীজের স্রষ্টা। তাই তোমাদের সঙ্গীতকে কি ভাবে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় সেটা নির্দ্দেশ করবার তোমার কি অধিকার আছে? তোমার কাজ শুধু তোমার যেটুকু দেবার আছে সেটুকু দুহাতে বিলিয়ে যাওয়া মাত্র। যোগ্য অযোগ্য বিচারের ভার আমাদের নয়।"

আমি বল্‌লাম: "কিন্তু য়ুরোপে আমাদের সঙ্গীত তার নিজস্ব বাণীটি ঠিক্ ফুটিয়ে তুল্‌তে পারবে কি?"

রোলাঁ বল্‌লেন: "প্রতি ললিত সৃষ্টির কোন্ বাণীটি যে তার নিজস্ব একথা কি স্রষ্টাই নিজে বল্‌তে পারেন? আমার জন ক্রিস্‌টফার হাজার হাজার লোককে হাজার হাজার ভাবে স্পর্শ ক'রেছে। সে সব রকম আবেদনের একটিও ঠিক আমি যা ভেবে বইটি লিখেছিলাম ঠিক তা নয়। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? আমি ত মনে করি যে, স্রষ্টার চেয়ে যে সৃষ্টি বড় কেবল সেইটাই এতে প্রমাণ হয়। শুধু অন্ধ স্রষ্টাই এতে ক্ষুব্ধ হ'তে পারেন—সত্য স্রষ্টা এতে উদ্দীপ্তই হ'তে বাধ্য। তাই এ সব সাত পাঁচ চিন্তা কর কেন বলত? তোমাদের সঙ্গীতের বীজে য়ুরোপের মাটিতে যে ফলফুল ফল্‌বে তার সৌরভ ও আস্বাদ হবে এক-রকম, ও এ বীজে তোমাদের মাটিতে যে ফসল ফলে তার গন্ধ ও রস হবে অন্য রকম। কিন্তু সেইখানেই ত আর্টের গরিমা যে তার বীজ কখন যে কি ভাবে পত্রপুষ্পে বিকশিত হ'য়ে ওঠে আগে থাক্‌তে তা কেউ জান্‌তেও পারে না, বা তার পদ্ধতি কেউ নিশ্চয়ও ক'রে দিতে পারে না। নয় কি?"

আমি কুণ্ঠিত হ'য়ে বল্‌লাম: "এবার য়ুরোপে ভ্রমণের ফলে আমার পূর্ব্ব মতের অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়েছে ও অনেক বিষয় আপনার মতে আমাকে সায় দিতে হ'য়েছে। কারণ আমি এবার দেখেছি যে য়ুরোপের সুকুমারহৃদয় মানুষের মনে আমাদের সঙ্গীত অনেক ক্ষেত্রেই একটা বিচিত্র সাড়া তোলে। তাই এখন থেকে আমি য়ুরোপের পত্রিকাদিতে

আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু লিখ্‌ব স্থির ক'রেছি। কেবল আমার মনে মাঝে মাঝে সংশয় জাগে যে স্বরলিপির মধ্য দিয়ে এ প্রকার কাজে উল্‌টো উৎপত্তি হবে কি না।

—"আমি বুঝেছি কোথায় তোমার খট্‌কা লাগ্‌ছে। কারণ স্বরলিপি করার মধ্যে যে অনেক বিপদ আছে, সে আমি খুব ভাল করেই উপলব্ধি করি। কিন্তু এ ভিন্ন অন্য উপায় যখন নেই তখন স্বরলিপির সদ্ব্যবহার না ক'রে গতি কি বল?—কিছু না পাওয়ার চেয়ে কিছু পাওয়া ত' ভাল?"

—"কিন্তু যদি এর ফলে একটা উল্‌টো বোঝা হয় তাহ'লে? কারণ আমার বার বার মনে সন্দেহ হ'য়েছে যে মোটের ওপর স্বরলিপিতে সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি ফল্‌বে কিনা—বিশেষতঃ য়ুরোপে আমাদের গানের প্রচারের ক্ষেত্রে। কারণ আমাদের রাগ-সঙ্গীতের একটা মস্ত মহিমা হচ্ছে তার স্বাধীনতায় ও তান বিস্তারে। স্বরলিপি করলেই তার তরল, স্বচ্ছ, ত্বরিতপাখা গতি একটা অনড়, বিবর্ণ ও মন্থর শৃঙ্খলে বাঁধা হ'য়ে যাবে না কি? এবং তাতে ক'রে আমাদের উচ্চ সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণাই হয়ত দেওয়া হবে। অন্ততঃ এ বিপদটা যে একটা সত্য বিপদ—"

রোলাঁ ঘাড় নেড়ে বল্‌লেন—"খুব ঠিক্ কথা এবং শুধু তোমাদের সঙ্গীতের ক্ষেত্রেই যে একথা খাটে তাই নয়। য়ুরোপীয় সঙ্গীতের—বিশেষতঃ মেনতির ধারা পর্য্যালোচনা করলে একথা আরও বেশি ক'রে উপলব্ধি করা যায়। স্বরলিপির একটা মস্ত অসুবিধে সত্যিই ঐখানে যে তাতে ক'রে সুরের সাবলীল ব্যঞ্জনাটুকুকে গজেন্দ্রগামী ক'রে ভারি জড় ও হীনপ্রভ ক'রে ফেলা হয়। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-কারদের রচনাও আজকাল তাই আমাদের কানে পুরোণো ঠেকে ও আমরা নিরন্তর নতুনের জন্যেই অতি চঞ্চল হ'য়ে উঠি। মনে আছে বীটোভ্‌নের সনাটা আমার কাছে আগে কি রকম ভাল লাগ্‌ত। কিন্তু এ বছর বীটোভ্‌নের শত বার্ষিকী শ্রাদ্ধবাসরে (centenary) দেখা গেল যে তাঁর রচনাও আমাদের কাছে কত নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে।"

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লাম:—"বলেন কি! তাহ'লে কি বল্‌তে হবে যে স্বরলিপি করার কোনো সার্থকতা নেই?"

—"না—তা আমি বলি না, যেহেতু তাতে ক'রে সঙ্গীত-রাজ্যে সঙ্গীতানুরাগীর সহজবোধকে এগিয়ে দেওয়া যে সুসাধ্য হ'য়ে ওঠে একথা অস্বীকার করা চলে না। কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রে বলি শোনো!

"এবার য়ুরোপের সর্ব্বত্র বীটোভ্‌নের শতবার্ষিকী স্মৃতি বাসরে যেটা সব চেয়ে বেশি চোখে পড়ল সেটা এই যে তাঁর সঙ্গীতের আবেদনের পরিধি আশাতীত রকমে বেড়ে গেছে। অর্থাৎ কিনা, বীটোভ্‌নের সঙ্গীতে সঙ্গীতানুরাগী আর ঠিক্ নিবিড় আনন্দ না পেলেও জনসাধারণ পাচ্ছে। অর্থাৎ কিনা জনসাধারণের সঙ্গীতরসজ্ঞতা বেড়েছে, ক্রমাগত বীটোভ্‌নের বাজনা শুনে শুনে, যেটা স্বরলিপি না থাক্‌লে হ'ত না। প্রতি সঙ্গীতকার বা ললিতকলার স্রষ্টার সম্বন্ধেই ঐ কথা। প্রথমে সে-সৃষ্টি মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে কিন্তু ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে।"

—"কিন্তু বীটোভ্‌ন যদি সঙ্গীতরসজ্ঞদের মধ্যে ইতি-মধ্যেই পুরোণো হ'য়ে গিয়ে থাকেন তবে তাতে ক'রে কি তাঁর সত্য মহিমাকে প্রকারান্তরে খানিকটা অস্বীকারই করা হ'ল না?"

—"তা কেন? বীটোভ্‌ন মানুষকে এগিয়ে দিয়েছেন এটা ভুল্‌লে ত চল্‌বে না। তিনি না জন্মালে তাঁর পরবর্ত্তী-দের জন্মানো সম্ভব হ'ত না যে। তাছাড়া ক্রমে ক্রমে দুচারজন ক'রে তাঁর প্রতিভা যে বহু মানবের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে এটা কি একটা মস্ত লাভ নয়?"

—"কিন্তু ললিত সৃষ্টির মূল্য নির্দ্ধারণে সেইটেই কি সব-চেয়ে বড় কথা মসিয়ে রোলাঁ? প্রতি প্রতিভা গৃহীতার গ্রহণ অনুপাতেই আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকে একথা যদি মানা যায় তাহ'লে অল্প রসিকের চেয়ে সুরসিকের তারিফের মূল্য কি ঢের বেড়ে যায় না? তাই বীটোভ্‌ন যদি আজকের সঙ্গীতরসজ্ঞের কাছে পাণ্ডুর হ'য়ে গিয়ে থাকেন তবে শুধু জনসাধারণের কাছে আদর পাওয়ায় কি তাঁর পূর্ব্ব ক্ষতির পূরণ হ'তে পারে?"

"তার মানে তুমি বল্‌তে চাও—"

আমি বল্‌লাম: "সাহিত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি আমার বক্তব্যটি বোধ হয় আরও পরিষ্কার করতে পারব।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

একক গেটের কাছে শেক্সপীয়রের সমাদর কি সহস্র রাম শ্যাম যদু হরির কাছে সমাদরের চেয়ে মূল্যবান্ নয়? রস-গ্রহণে গ্রহীতার সহজ বোধ ও দরদ কি অমূল্য নয়? ধরুন বীটোভ্‌নের সম্বন্ধে আপনি আজ যে-কথা বল্‌ছেন—শেক্স-পীয়রের সম্বন্ধে কি সেই কথা বলা চলে? এক কথায়, রসজ্ঞের মনে যদি তিনি আজও তেম্‌নি সাড়া তুল্‌তে না পারেন তবে জনসাধারণের মাঝে তাঁর প্রভাব বেশি ব্যাপক হ'য়েছে এতে কি কোনো সত্য সান্ত্বনা মিল্‌তে পারে?"

রোলাঁ একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌লেন: "আক্ষেপটা তোমার ভিত্তিহীন নয় একথা বল্‌তেই হবে এবং বীটোভ্‌নের এ বৎসরের শতবার্ষিকী উৎসবে একথা আমার মনেও যে উদয় হয়নি তা নয়। কিন্তু কি জান? আমার মনে হয় এখানে সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গীতের একটু প্রভেদ আছে, তাই ঠিক্ তুলনা করা মুস্কিল।"

আমি বল্‌লাম: "কি প্রভেদ বল্‌তে চাচ্ছেন আপনি?"

রোলাঁ বল্‌লেন: "সঙ্গীত তার বিশুদ্ধ আবেদনটি নিয়ে একেবারে সোজা গিয়ে আমাদের মরমে পশে। সাহিত্য বুদ্ধি ও চিন্তার মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে তবে তার বাণী আমাদের গ্রহীতা মনটির কাছে পৌঁছে দেয়। তাই সাহিত্যের আবেদন সঙ্গীতের মতন ব্যাপক হ'তে পারে না বটে, কিন্তু উল্‌টো দিকে যে বেশি স্থায়ী হয় একথা ভুল্‌লেও ত চল্‌বে না।"

আমি বল্‌লাম: "একথাটি আপনার খুবই চিন্তনীয়। কেবল আমাদের সঙ্গীতের সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণ খাটে ব'লে ত' মনে হয় না। আমি বার বার দেখেছি মসিয়ে রোলাঁ, যে আমাদের সঙ্গীতরসিক একটি পুরাতন রাগ হাজার বাজার শুনলেও তা থেকে তিনি নিত্য নতুন তৃপ্তি পান। আমাদের দেশে এদিকে specialisation এত উঁচুতে উঠেছে যে ওস্তাদি সঙ্গীতে এক একজন গায়ক গায়িকা অনেক সময়ে মাত্র দু' একটি রাগে specialise করেন। কাশীর সরস্বতীবাঈ শুধু ভৈরবীই গাইতেন, আর একজন শুধু আজীবন মালকোষই গেয়েছে, আর একজন অন্য একটা রাগ। লোকে বলে অমুক ওস্তাদ কানাড়ার ঘর, অমুক তোড়ির ঘর, অমুক খাম্বাজের ঘর ইত্যাদি। কিন্তু সঙ্গীতবোদ্ধা এখনো এতে ক্লান্ত হন নি বা ওরকম specialistএর সমাদর করতে কুণ্ঠিত হন নি। এটা আমার শোনা কথা নয়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। আমাদের বাংলা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক-কলাবিৎ রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের একটি ভৈরবী টপ্পা আমি অন্ততঃ একশবার শুনেছি, কিন্তু আজ অবধি কখনো তা আমার কানে পুরোণো ঠেকে নি। আমি এবার য়ুরোপে আমার অনেক বক্তৃতাদিতে ব'লেছি যে, আমাদের রাগের এই নিত্য নতুন বৈচিত্র্য সম্ভার যোগানোর জন্যেই সে এখনো পুরোণো হয় নি। একথা কি আপনি বিশ্বাস করেন না?"

রোলাঁ বল্‌লেন: "খুব করি। কিন্তু তার কারণ বোধ হয় যেকথা এখুনি বল্‌লাম;—অর্থাৎ তোমাদের রাগ-রাগিণীকে স্বরলিপির পিঞ্জরে আট্‌কে রেখে তার পাখাকে নিস্তেজ ক'রে দেওয়া হয় নি। আমাদের লোক-সঙ্গীতের (folk-music) সম্বন্ধে আলোচনা করলে একথা আরও স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। দেখনা কেন—আজকের দিনে নতুন লোক-সঙ্গীত য়ুরোপে একেবারে লুপ্ত হ'য়ে গেছে কেন? কারণ স্বরলিপির যাদুঘরে সে শুধু কৌতূহলোদ্দীপক পদার্থ মাত্রে পর্য্যবসিত হ'য়েছে। কারণ স্বরলিপির মানেই হচ্ছে সব লোককে বলা যে লঘুগতি সুরকে বাঁধা ধরা লেখা মাফিক গাওয়া কর্ত্তব্য। এখন যে-মুহূর্ত্তে গানকে একথা বলা হ'ল, সে-মুহূর্ত্তে তার সাবলীল গতিচ্ছন্দের পায়ে শৃঙ্খল পড়তে বাধ্য। এইজন্যেই স্বরলিপির নিগড়ে লোকসঙ্গীত অতি শীঘ্রই পুরোণো হ'য়ে যায়। Elle perd toute sa fraicheur."

আমি খুসি হ'য়ে বল্‌লাম: "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের গানের বিকাশের কোন্ ধারাটি বাঞ্ছনীয় সে সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি ঠিক্ এই কথাই একাধিক বার ব'লেছি—কিন্তু স্বরলিপি করাটার বিপদটাও যে ঠিক্ এই দিকেই তা কখনো এ রকম ক'রে ভেবে দেখি নি। গানকে অনড় অচল ক'রে গাইলে সে শীঘ্রই একঘেয়ে হ'য়ে যায়—তাকে লীলায়িত ক'রে গাইলে সে বেশি দিন জীবন্ত থাকে এ কথা নিয়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার যত মত-ভেদ, যে কথা খানিক আগে আপনাকে বল্‌ছিলাম।—তাই

হঠাৎ আপনার এ মতটি শুনে আমি উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছি। কিন্তু এ ব্যক্তিগত হর্ষটা একটু অবান্তর ব'লে পূর্ব্ব প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক্। জিজ্ঞাসা করি, যে তাহ'লে কি বল্‌তে হবে স্বরলিপি করাটা মোটের ওপর বাঞ্ছনীয় নয়?"

রোলাঁ বল্‌লেন: "তা বলা চলে না। অন্তত আমাদের হার্মনির বিচিত্র ও বিরাট ইমারত যে স্বরলিপির উপাদানের উপরই প্রতিষ্ঠিত একথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে। তাছাড়া—খানিক আগে যা বল্‌ছিলাম—কোনো সুর স্বরলিপি করা মাত্র স্রষ্টার মন বেশি চঞ্চল হ'য়ে ওঠে যার ফলে নতুন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা তিনি বেশি ক'রে উপলব্ধি করতে বাধ্য হন বলা চলে।"

—"কথাটা ঠিক্ বুঝলাম না।"

—"একটা সুর যে-মুহূর্ত্তে স্বরলিপি করা হ'ল সে-মুহূর্ত্তে সেটার প্রকাশ পূর্ণ হ'ল ত? এখন, স্রষ্টার পক্ষে তার অনুভূতির বা প্রেরণার পূর্ণ প্রকাশ হচ্ছে একটা মস্ত জিনিষ—কেননা কেবল তাতে ক'রেই তার মন ছাড়া পায়, ও সে নতুন সৃষ্টির জন্যে ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে। একটা প্রেরণাকে যতদিন না রূপ দেওয়া যায় ততদিন সে স্রষ্টাকে নিষ্কৃতি দেয় না। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে সে আমাদের মগ্ন চৈতন্য (sub-conscious) থেকে এসে জাগ্রত চৈতন্যের (conscious) মধ্যে ধরা দেয় সে-মুহূর্ত্তে স্রষ্টার মনটি পূর্ণ স্বস্তি পায়। অথচ সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টা নিজের সৃষ্ট বস্তুর প্রতি দরদটি হারায় ও ফলে নতুন সৃষ্টির জন্যে ব্যগ্র না হ'য়েই পারে না। কাজেই সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্বরলিপিকে বলা চলে—গানের এই স্বস্তিদায়ক প্রকাশ প্রবাহ ও য়ুরোপে হার্মনির অসম্ভব প্রগতির জন্যে স্বরলিপির কাছে ঋণ স্বীকার করতেই হয়। তাই স্বরলিপির সাহায্যে সৃষ্ট সুরকে তাড়াতাড়ি পুরোণো ক'রে ফেলা হ'লেও, বলা চলে যে এই স্বরলিপির জন্যেই স্রষ্টার মন মূর্ত্ত ছেড়ে অমূর্ত্তের পানে ছুটতে উন্মুখ হ'য়ে ওঠে। স্বরলিপি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যে য়ুরোপীয় হার্মনি সঙ্গীতের বিকাশ কি রকম ছুটে চ'লেছে, তা থেকে কি এ কথা প্রমাণ হয় না?"

ব'লে রোলাঁ একটু থেমে বল্‌লেন: "তাছাড়া ভাল জিনিষের সঙ্গে ক্রমাগত পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা যে লোকের রুচিকে উন্নত করার একটা প্রকৃষ্ট পন্থা একথা সর্ব্বজন স্বীকৃত। স্বরলিপির সাহায্যে রূপকার তাঁর আইডিয়াটিকে লোকের চোখে হুবহু ফুটিয়ে তুল্‌তে পেরে থাকেন। এটা একটা মস্ত লাভ। তার দুঃখ এই, মানুষ প্রতি নতুন সম্পদ অর্জ্জনের সঙ্গে কিছু-না-কিছু পুরোণো সম্পদ হারায়। এটা না হ'লে ভাল হ'ত, কিন্তু জীবনে গতিকে যদি স্বীকার ক'রে নেওয়া যায় তবে ভোলাকেও মেনে না নিয়েই উপায় নেই।—তবু তোমাদের পক্ষে সঙ্গীতে তান বিস্তারের (improvisation) ক্ষমতাটি হারানো আমি মোটের উপর অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় ব'লে মনে ক'রব।" বলে একটু থেমে চিন্তিত সুরে বল্‌লেন: "অথচ, স্বরলিপির বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই বিপদটির সম্ভাবনার প্রতি অন্ধ হ'য়ে থাকাও কঠিন। তবে হয়ত চেষ্টা করলে এ বিপদকে এড়ানো অসম্ভব হবে না।"

আমি বল্‌লাম: "আপনার এ কথাগুলি আমার ভারি ভাল লাগ্‌ল। রাসেল ও রবীন্দ্রনাথের মতন আপনি কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে আমাদের চিন্তাধারাকে যে নতুন নতুন পথের সন্ধান এনে দিয়ে থাকেন সেজন্যে আপনাদের কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ থাক্‌ব। কিন্তু সে যাই হোক্, মোটের ওপর যে আপনি আমাদের গানের লীলায়িত তানবিস্তারের (improvisation) ক্ষমতাটিকে বজায় রাখ্‌বার পক্ষপাতী এতে আমি ভারি উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছি। কারণ আমি বার বার অনুভব ক'রেছি যে আমাদের রাগ-সঙ্গীতের প্রাণটুকু ওস্তাদের পালোয়ানির চাপে রুদ্ধশ্বাস হ'য়েও যে আজ মরে নি—তার কারণ রাগ সঙ্গীতের বিকাশধারার মধ্যে একটা কিছু বড় সত্য আছেই। এবার য়ুরোপে নানা জাতীয় সঙ্গীত-রসিকদের মধ্যে বক্তৃতাদি ক'রে আমার এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হ'য়েছে যে রাগ-সঙ্গীতের জগৎকে দেবার এখনো কিছু আছে।"

রোলাঁ বল্‌লেন: "এ কথায় তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত দিলীপ। তাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি যেন তোমরা তোমাদের সঙ্গীতের বিকাশধারায় ভারতীয় গানের তানবিস্তারের (improvisation) ক্ষমতাটিকে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

না খুইয়ে বস।" (এ কথাগুলি রোলাঁ প্রায় হুবহু ব'লেছিলেন।)

ব'লে একটু থেমে বললেন : "কিন্তু এটাও ভুলো না যে নতুনের আগমনের সঙ্গে এটা ভারি কঠিন হ'য়ে উঠ্‌বেই।"

—"কেন ?"

—"বলি শোনো। সে দিন স্পেন দেশের একটি সঙ্গীতকারের সঙ্গে স্পেন দেশের সঙ্গীতে ঠিক্ তাদের এই তানবিস্তারের ক্ষমতা সম্বন্ধেই কথা হচ্ছিল। জান বোধ হয় যে তাদের দেশে সুন্দরভাবে লীলায়িত গান গাওয়ার রীতি এখনও চলিত ও শুধু চলিত নয়,—জীবন্ত। কিন্তু স্বরলিপি, বাঁধাধরা শিক্ষাপদ্ধতি, স্কুল কলেজ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সুরের নিত্য নব উদ্ভাবনী শক্তির স্ফুরণ ক'মে যাচ্ছে ব'লে সে সঙ্গীতকারটি ভারি চিন্তিত ও বিমর্ষ হ'য়ে পড়েছেন। অথচ স্বরলিপি, স্কুল কলেজ প্রভৃতিকে অনেকটা বর্ত্তমান কালের যুগধর্ম্ম বল্লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না ; অর্থাৎ তার স্রোতকে ঠেকানো অসাধ্য। তাই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রছিলেন যে কি করা যায় ? আমার মনে হয় এদিক দিয়ে তাঁদের সমস্যাটির সঙ্গে তোমাদের সমস্যাটির একটা মিল আছে।"

ব'লে আবার একটু থেমে বল্‌তে লাগ্‌লেন : "তাছাড়া তোমাদের সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যটি বজায় রাখা তোমাদের কর্ত্তব্য আরও এইজন্যে যে অসমের (unlike) অভিঘাতে জাতির ও মানুষের উভয়েরই প্রতিভার স্ফুরণ দীপ্ততর হ'য়ে ওঠে। তাই তোমাদের সঙ্গীতের স্পর্শ থেকে লাভ করা আমাদের পক্ষে খুবই সম্ভব। বর্ত্তমানে য়ুরোপীয় হার্মনির বিকাশ এত জটিল হ'য়ে উঠেছে যে বর্ত্তমান য়ুরোপের সঙ্গীতকারগণ আর এগুতে পারছেন না। এমন কি Stravinskyর প্রতিভাও ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে একটা স্রোতহীন অবস্থার মধ্যেই পড়তে চাচ্ছে। অথচ আমাদের সঙ্গীত-প্রতিভার ও উদ্ভাবনী শক্তিধারার প্রবাহকে এইবার নতুন প্রণালী কেটে দিতেই হবে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা হাত্‌ড়াচ্ছি, পথ খুঁজে পাচ্ছি না। তোমাদের সঙ্গীত থেকে এই হাত্‌ড়ানোর ফলে একটা নতুন আইডিয়া পাওয়া আমার মোটেই অসম্ভব মনে হয় না। সুতরাং তোমরা যদি তোমাদের সঙ্গীতের মূল ধারাটি এখন খুইয়ে বস, তাহ'লে সেটা বিশ্বসঙ্গীতের পক্ষে মস্ত বড় আক্ষেপের কথা হবে।" *

রোলাঁর সঙ্গে বাইরে বাগানে একটু পাদচারণ করতে বাহির হ'লাম।

আমি বল্‌লাম : "মসিয়ে রোলাঁ, খানিক আগে আপনি বল্‌ছিলেন যে বীটোভেন্ আজকের দিনে প্রকৃত সঙ্গীতরসজ্ঞের কাছে একটু সেকেলে হ'য়ে পড়ছেন। কিন্তু শেক্সপীয়র কেন আজও একটুও সেকেলে হন নি ?"

—"একটুও সেকেলে হন নি একথা বলাটা হচ্ছে গায়ের জোরের কথা। বর্ত্তমান য়ুরোপের সুধীসমাজে কি শেক্সপীয়রের আদর গিয়াস্তেলো বা বার্ণার্ড শ'র মতন বিস্তৃত ? শেক্সপীয়র আজও সত্যি সত্যি জীবন্ত—শুধু অল্পসংখ্যক রসগ্রাহীর মধ্যে।"

"বিরাট্ প্রতিভা যে চিরন্তন একথা বলাটা কি তাহ'লে কথার-কথা মাত্র ?"

—"ঠিক্ তা নয়, যেহেতু এ সম্বন্ধে মুস্কিলটা ঠিক্ আদর্শগত নয়—অনেকটা ব্যবহারিক (Practical)"

আমি বল্‌লাম : "তার মানে ?"

রোলাঁ বল্‌লেন "জীবনে নানান কাজ, কর্ত্তব্য, দায়িত্ব ও ব্যস্ততার মাঝে কম লোকেই তাদের ভিতরকার রসজ্ঞতাবৃত্তির যথাযথ অনুশীলন করবার সময় পায়। ফলে বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ দাবী দাওয়া ছেড়ে অতীতের গৌরবকে পূর্ণভাবে অনুভব করবার জন্যে যে কল্পনা দরকার সে কল্পনা তাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করে না। কিন্তু সমানে শিক্ষিতদের মধ্যে অবসর ও সুশিক্ষার গুণে মূল Value গুলি বদ্‌লে দিলেই যে আমাদের কল্পনার এ দৈন্য ঘুচ্‌বে এটা আশা করা অসঙ্গত নয়। তাই বড় প্রতিভা আসলে চিরন্তন—সকলেরই কাছে ; কেবল কার্য্যক্ষেত্রে অবান্তর কারণে এ আদর্শটির উপলব্ধি ব্যাপক হ'য়ে উঠ্‌তে পারে না।"

---

* একথা ভিয়েনায় একজন অপেরা লেখিকাও আমায় এবার ব'লেছিলেন ও আমাদের সঙ্গীত থেকে এই নতুন আলো পাবার সম্ভাবনা আছে মনে করবার কারণ আছে ব'লে মত প্রকাশ ক'রেছিলেন

—"কিন্তু তাহ'লে বীটোভ্‌ন্ কেন আজকের সঙ্গীত রসিকের কাছে জীবন্ত নন বল্‌ছিলেন?"

—"একেবারে জীবন্ত নন বলি নি। কিন্তু—ঐ যে বল্‌ছিলাম—সঙ্গীতের এ বিষয়ে সাহিত্যের কাছে একটু হার মান্‌তেই হয় দেখা যায়—উপায় কি? কিন্তু ব্যাপারটাকে একটু অন্য দিক্ থেকে দেখা যেতে পারে—সে কথাটারও উল্লেখ এর আগে ক'রেছি। অর্থাৎ—বীটোভ্‌নের রসসৃষ্টি রসিকের কাছে আর ততটা উজ্জ্বল মনে না হ'লেও—সাধারণের হৃদয়ের তন্ত্রী যে আশাতীত ভাবে কাঁপিয়ে তুলেছে তার মধ্যে একটা মস্ত ক্ষতি পূরণ আছেই। কারণ একটা ব্যাপক ভাবে মানুষের রুচিকে উন্নত করা মহনীয় নয় এ কথা বল্‌তে কে সাহস করবে?"

ব'লে একটু থেমে বল্‌লেন: "সব বড় রূপকারকেই তাই নমস্য বলা চলে—যেহেতু আমাদের মনোজগতে তাঁদের অরুণ কিরণ ঝলে ব'লেই আমরা নীচু দিকে না চেয়ে উঁচু দিকে চাই—তা সে ক্ষণেকের জন্যেই হোক্ বা জীবনভোরই হোক্। এক কথায় মানুষের বিকাশ কোন্ দিকে হওয়া বাঞ্ছনীয় সে-সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের চোখ কখনই ফুট্‌ত না যদি এই রকম দুচারটে মানুষের জীবন আমাদের মগ্নচৈতন্যর মধ্যে তাদের আদর্শের সৌরভটি না বিছিয়ে দিত।"

—"কিন্তু সাধারণ মানুষ ত কই এ আদর্শের প্রভাবে খুব বেশি এগুচ্ছে ব'লে মনে হয় না। অবশ্য আশা আমরা করতে পারি ও ক'রেও থাকি কিন্তু বাস্তব ত সাধারণের দীনতার সাক্ষ্যই চিরকাল দিয়ে এসেছে?"

—"তা ত বটেই। সাধারণ—অর্থাৎ বেশির ভাগ লোক সাধারণ ব'লেই যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অসাধারণ হ'য়ে ওঠেন এটা ত একটা truism"

—"তাহ'লে কি বল্‌তে চান যে সাধারণ মানুষ এগুবে না?"

—"কেন এগুবে না! কিন্তু যতই এগোক না কেন অসাধারণ চিরকালই ঢের বেশি এগিয়ে চল্‌বে। অর্থাৎ সাধারণ কখনও দৌড়ে অসাধারণকে হারাতে পারবে না। সাধারণ ও অসাধারণের মধ্যে যে তফাৎ সেটা চিরকাল থাক্‌বেই। কেন না সাম্য ত সৃষ্টির মূল ধর্ম্ম নয়—বৈষম্যেই জগৎ বিবৃত হ'য়ে আছে।"

—"এতে কি অনেকটা আমাদের অধিকারীভেদের সমর্থনই করা হ'ল না? ডিমক্রাসি—"

—"ডিমক্রাসির ফিলসফি বস্তুত মানুষের অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ত নয় দিলীপ। ও একটা আকাশকুসুম। অন্তত একাকার সাম্যের উপর কোনো মহৎ সভ্যতা আমি ত কল্পনা করতে পারি না। তাই তোমাকে একটা চিঠিতে লিখেছিলাম যে অসাধারণ মানুষ সাধারণকে বুঝবে, কিন্তু সাধারণ মানুষ কখনো অসাধারণকে বুঝতে পারবে না;—হয় তাকে দেবতা করবে, না হয় ক্রসে ঝুলিয়ে দেবে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতাও বারবার এই সাক্ষ্যই দিয়ে এসেছে। সহৃদয় মানুষ বারবার চেষ্টা ক'রেছে—মহৎ মানুষের উঁচু মাথাকে বিপ্লবে কেটেছেঁটে বামন ক'রে দিতে—কিন্তু আবার পরক্ষণেই একটা নতুন ভূমিকম্প এসে নতুন পাহাড় ও খাদের সৃষ্টি ক'রেছে, বৈষম্য আবার মাথা তুলে উঠেছে। তাই মনে হয় যে বড় মানুষ ও ছোট মানুষের মধ্যে যে একটা গভীর ব্যবধান থাক্‌বেই এ সত্য অস্বীকার করার ওপর কোনও স্থায়ী সমাজই দাঁড়াতে পারবে না। মানুষ যে সকলেই সমান এর চেয়ে অসার কথা মানুষ বোধ হয় আর কখনো বলে নি।"

—"কথাটা ঠিক্, মসিয়ে রোলাঁ। তবু সহৃদয়তা ও করুণা যদি বড় গুণ হয় তবে এতে দুঃখও হয়ই। কারণ যদি এই কথাই চরম সত্য হয়—তবে ছোট মানুষেরই বা সান্ত্বনা কোথায়, আর বিশ্বপ্রেমিকেরই বা ভরসা কোথায়?

রোলাঁ ম্লান হেসে বল্‌লেন: "ছোট মানুষের ক্ষুদ্রতার জন্যে বড় মানুষের পক্ষে ব্যথা বোধ করা স্বাভাবিক হ'লেও বড় না হওয়ার দরুণ যে সে মনে প্রাণে মর্ম্মাহত হ'য়েই জীবনযাপন করে এ কথা সত্য নয় দিলীপ। অবশ্য বড়কে যে ছোট কখনও হিংসা করে না তা বলি না। কিন্তু সেটা সে সচরাচর ক'রে যাবে—হয় কুশিক্ষার গুণে, না হয় উৎপীড়নের ফলে। এ দুইয়ের প্রতিষেধক আছে। এ প্রতিষেধের চেষ্টা করা বড় মানুষের একটা মহৎ কর্ত্তব্যও বটে। কিন্তু তাই ব'লে বড়র মাথা টেনে তাকে ছোট

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ক'রে দেওয়ার প্রবণতাটা কিছু মস্ত আনন্দের ও আশার কথা হ'তে পারে না।"

আমি বল্লাম: "কিন্তু ছোট মানুষ বড় হচ্ছে না এজন্যে বড় মানুষের ব্যথা ও পদে পদে আশা ভঙ্গের সান্ত্বনা কোথায় এ প্রশ্নের ত উত্তর দিলেন না?"

রোলাঁ বল্লেন "মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কেবল একটা আশা বড় মানুষ পোষণ করতে পারে। সেটা এই যে ছোট মানুষের মনেও আজকের দিনে বুদ্ধ, খৃষ্ট, সেণ্ট ফ্রান্সিস, নিউটন, শেক্ষপীয়র প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা নিহিত সম্ভ্রম শিকড় পাত ক'রে ব'সেছে। কেননা এই শ্রদ্ধাই কেবল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে যে সর্ব্ব সাধারণের মধ্যেও কোথাও না কোথাও একটা দেবত্বের প্রেরণা আছে। বাস্তবিক মহামানবত্বের মধ্যে যে একটা সত্য মহিমা আছে তার আভাস পাওয়া যায় কেবল—এই সত্যটি থেকে যে সাধারণের মনের মধ্যে অসাধারণের প্রতি নিহিত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা বিশ্বজনীন।"

আমি বল্লাম: "কিন্তু ধরুন লেনিন যে বল্ছেন যে সব মানুষকেই এখনি শিক্ষার ফলে বড় ক'রে তোলা যায় সে সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়?

রোঁলা বল্লেন, "আমার মনে হয় লেনিন নিজেই তাঁর বাণীকে অপ্রমাণ ক'রেছেন।"

আমি একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লাম, "কি রকম?"

রোলাঁ বল্লেন, "সেদিন তাঁর মহত্ত্ব ও গরিমার সাক্ষ্যে কি এই কথাই প্রমাণ করেন নি যে লক্ষ লক্ষ ছোট মানুষ তাঁর কথায় কান দিয়েছে শুধু এই জন্যে যে তিনি একজন মহামানুষ ছিলেন? কাজেই দেখ, 'individual (ব্যক্তি) বড় নয়, collectivite (সমষ্টি) বড়'—একথাও আমল পেয়েছে শুধু এইজন্যে যে একথাটা বেরিয়েছিল—একজন মস্ত মানুষের মুখ থেকে। অর্থাৎ, লেনিন যদি লেনিন না হ'তেন সাধারণ মানুষ কখনও নিজের শক্তি সামর্থ্য নিয়ে মাথা ঘামাত না।"*

—"কিন্তু রুষদেশে যে সকলকেই সমান বলা হয়েছে—"

—"সেটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু কম্যুনিষ্টদের অসামান্য লোকের সহায়তার কাছে হাত পাততেও হ'য়েছে একথা ভুলো না। তাই মুখে তারা যাই বলুক না কেন, কাজে তাদের স্বীকার করতেই হয়েছে যে শক্তিমান মানুষের সাহায্য নইলে কোনও সমাজ সংস্কারই সম্ভব নয়।"

ব'লে একটু থেমে বল্লেন, "তাই, রুষ গভর্মেণ্টের কার্য্যক্ষেত্রে হার মানার দরুণ এ কথা বোধ হয় আজ বলা চলে যে কোনও বড় জাতীয় সাধনাই সফল হ'তে পারে না যদি জাতীয় প্রচেষ্টায় ব্যক্তিকে যথাসম্ভব বড় হবার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দেওয়া না হয়। কারণ একটি ফুল লক্ষ পাতাকে সার্থক করে। কাজেই পাতা যদি ফুলকে ঈর্ষা ক'রে তাকে পাতার পংক্তিতে বসাতে চায় তাহ'লে কি তাতে ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট হবার সম্ভাবনাই পনর আনা হ'য়ে দাঁড়ায় না?"

—"কিন্তু তাহ'লে রুষদেশের প্রচেষ্টা কি আপনি ব্যর্থ হবে মনে করেন?"

রোলাঁ সম্ভ্রমের সুরে বল্লেন, "না। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে রুষদেশ যে একটা বিরাট চেষ্টা করেছে তার জন্যে কে এমন উদ্ধত আছে যে মাথা হেঁট করতে অপমান বোধ করবে? রুষদেশ যে একটা মহা সত্যের সন্ধান পেয়েছে সে কথা নিরপেক্ষ চিন্তাশীল মানুষ ক্রমেই স্বীকার ক'রেছে। বল্শেভিস্‌মের বিপক্ষে যে যাই বলুক না কেন ক্রমেই সকলে মানতে বাধ্য হ'চ্ছে যে আজকের দিনে য়ুরোপের মধ্যে রুষদেশ একটা মস্ত মানব-প্রচেষ্টার লীলাক্ষেত্র—একটা নূতন অভ্যুদয়ের অগ্রদূত! * এ বৎসর নভেম্বরে রুষবিপ্লবের দশম বার্ষিক উৎসবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবার তাই আমার খুবই ইচ্ছা ছিল।"

—"না যাওয়াই তাহ'লে স্থির করলেন কেন?"

* Prince Kropotkin ও তাঁর socialism সম্বন্ধে সব বইয়ে এই কথাই ব'লেছেন যে পণ্ডিতকে বিশ্বাস ও আত্মপ্রশ্রয় দেবে—প্রথমটার মহা মানুষ।

* রাসেল তাঁর Theory and Practia of Bolshevism এ রুষদেশের প্রতি সম্পূর্ণ সুবিচার করতে পারেন নি এ কথা আমায় এবার ব'লেছিলেন ও ব'লেছিলেন যে বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপে নানা চিন্তাধারার রুষদেশই প্রগতির অগ্রদূত এ কথা তিনি স্বীকার করেন।

—"আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা এখন ভাল নয় ব'লে। দুহামেলও কয়েক মাস আগে রুষদেশ থেকে ফিরে রুষবিপ্লবের সম্বন্ধে নানারকম চিত্তাকর্ষক কথা উৎসাহের সঙ্গে বল্‌ছিলেন। তাই আমার যাবার খুবই আগ্রহ ছিল। কিন্তু এ যাত্রা হ'ল না।"

শেষে রোলাঁর সঙ্গে অরবিন্দ সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধ'রে নানা কথা হবার পর আমি বিদায় নিলাম।

রোলাঁ আমাকে ষ্টীমার ঘাটের কাছ অবধি এগিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে বল্‌লেন; "A L'annee prochaine—" (আবার আস্‌ছে বছর দেখা হবে।)

"A L'annee prochaine" ব'লে আমি বিদায় নিয়ে ষ্টীমার চড়ে ভিল্‌নেভ থেকে লসানে ফিরে এলাম।

সারা সন্ধ্যা আমার নিহিত মনে বার বার স্নিগ্ধ অবলেপ বিছিয়ে দিয়েছিল—তাঁর সেদিন বিকেলের এই কথাটি :—

"তাই আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য আমাদের ব্যক্তিগত বিকাশের জন্যে ভাবা ও পরের জন্যে এই চিন্তাকে রূপ দেওয়া, যদিও আমাদের নিগূঢ়তম চিন্তার মাত্র খানিকটা বই কখনই বিকাশ করা যায় না।"*

* রোলাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তার রিপোর্টটি সেইখানেই যথাসাধ্য লিখে রেখেছিলাম।

ওপারে

শ্রীনরেন্দ্র বসু

(রূপার্ট্ ব্রুক্ অবলম্বনে)

তখনো তোমার 'পরে আঁখি চেয়ে রবে,
মরণ সহসা যবে লয়ে যাবে মোরে
আঁধার বিজনে আর মলিন বিভবে
পরপারে ;—আমি সেথা রব ধৈর্য্য ভরে
কবে না জাগিবে জানি শীতল মলয়ে,
পশিবে আলোক যবে পাতাল আঁধারে,
মৃতেরা উঠিবে কাঁপি—অজানার ভয়ে—
বুঝিব এসেছ তুমি মরণের পারে।
দেখিব তোমারে—যেন প্রশান্ত স্বপন,
বিচরিছ লঘুগতি তিমির সমাজে,
বিচ্ছুরি' সুস্নিগ্ধ জ্যোতি চিন্তায় মগন,
কে দীপ্ত রহস্যময়ী' প্রেতলোকে রাজে!—
তোমার পাণ্ডুর মুখ রাখি মোর বুকে,
রহিব মগন চির-মরণের সুখে!

"ডাকবাক্স"

—গল্প—

—শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বিরহী মন অপরাহ্নের অলস নিস্তব্ধতা কোনোমতেই সহ্য কর্ত্তে পার্চ্ছিল না।

আজ দশ বার দিন হ'ল তার চিঠি পাইনি—কি হ'ল কে জানে! হয়ত সে নিজের কাজেই ব্যস্ত, আমার কথা স্মরণ করবার অবকাশই পায় না। কিন্তু তাই কি সত্যি? একটা চিরন্তন সংস্কার আছে যে, প্রেমের শেষাবস্থায় মেয়েরাই বেশী ক'রে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে দেখ্‌ছি ঠিক্ তারি বিপরীত! হৃদয় মন সবই ত উজাড় করে দিয়েছি, ভালও যে বাসেনা আমায় তা নয়, তবু মনে হয় অনেকখানি পাওয়াই বাকী রয়ে গেল! কিন্তু, অপরাধও নেই! বেচারীরা ঘরের কাজ সেরে ফুরসৎ পেল ত ভাল, নতুবা ক্লান্তদেহে প্রেমচর্চ্চা করবার বড় একটা সুযোগ হ'য়ে ওঠে না।

এই বিকেল বেলায় একলা ব'সে পুরানো কাহিনী ভেবে মন বড় উদাসী হয়ে যাচ্ছে। তার চেয়ে রীতিমত পত্র রচনা সুরু করা যাক্। তার ভালবাসার ত্রুটী দেখিয়ে? না, সে সুবিধে হবে না, কারণ ফেরৎ ডাকে উত্তর আসবে, "তোমার এই অভিযোগগুলো ছাড় দেখি! 'আমিত্ব'টুকু এতদিন ধ'রে পুষে রেখেছ? আমার ভালবাসার কি একটা মর্য্যাদা নেই? ও রকম মন নিয়ে কখনো ভালবাসা যায় না—ইত্যাদি।"

থাক্, কাজ নেই; বেশী ঘাঁটলে নেবু তেতো হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। তার চেয়ে একখানা সাদাসিদে চিঠি লিখি। খুব সংযত হয়ে আরম্ভ করলুম, কিন্তু শেষ রক্ষা হ'ল না! গোড়ায় গলদ্ কিনা, তাই নিজের কথাটা কিছুতেই চাপ্‌তে পারি না। তবে নিতান্ত মন্দও দাঁড়াল না। তাতে তিরস্কারও নেই, অভিমানও নেই, রইল শুধু দুটো একটা ছোটোখাটো অভিযোগ আর একটু পুরাতন স্মৃতির উচ্ছ্বাস।

চিঠিখানা লিখে ভাবলুম্, এটাকে এখনই ডাকে দিতে হবে, নয়ত আজকের ডাকে আর যাবে না। সুতরাং, তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লুম্।

আমাদের বাসা থেকে খানিকটা দূরেই ডাকঘর। তারই পিছন দিকে একটা কোণে চিঠি ফেল্‌বার লাল পোষ্টবক্সটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন লাল পোষাক পরা একটী শান্ত্রী নীরবে পাহারা দিচ্ছে। রাস্তাটা নির্জ্জন, পিচ ঢালা, ঠিক্ ফুট্‌পাথের উপরে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের ঝরা ফুলগুলি প'ড়ে নীচের জায়গাটাকে বেশ শীতল ও মসৃণ ক'রে তুলেছে। চিঠিখানা ছাড়বার আগে মনে হ'ল ফেলে দিলেই ত চুকে গেল—সব শেষ! এতক্ষণ বেশ ছিলুম্; যতক্ষণ লিখ্‌ব লিখ্‌ব ভাবি, ততক্ষণ বেশ থাকি একটা আশার আশায়। তারপর লেখ্‌বার সময়েও একটা সুখের আমেজ পাওয়া যায়, মনে হয় যেন তার সুমুখে ব'সে নিজের মনের কথা খুলে বল্‌ছি। কিন্তু তাই কি হয়? সব চিন্তা, সব কথা কি চিঠিতে ফুটিয়ে দিতে পারা যায়? অনেক আবেগই ত পড়ে থাকে পিছনে! শুধু তাই নয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থাটি কখনো ভাষার সাহায্যে তৈরী ক'রে দেওয়া যায় না। চিঠিখানা গিয়ে তার কাছে যখন পৌঁছুবে তখন হয়ত তাঁর মনের অবস্থা অন্যরূপ। আমি এখানে সায়াহ্নের অলস নিস্তব্ধতার মাঝখানে চিঠি লিখ্‌লুম্, সেখানি গিয়ে পৌঁছুল হয়ত যখন প্রিয়া সবে সন্ধ্যার আসর জমিয়েছেন আপন বান্ধবীদের সঙ্গে! আমার জীবনের কর্ম্মহীন গতি ও নিঃসঙ্গতা দরদ দিয়ে বোঝ্‌বার মত অবস্থা তখন তাঁর নয়। এমন কি তখন চিঠিখানি তুলে রেখে যদি পরে নির্জ্জনে সেটি পাঠ করেন, তা' হলেও আমার অভিমানী হৃদয়ের অনেকখানি ব্যথাই তাঁর কাছে গোপন থেকে যাবে। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে ব'সে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস দিয়ে যে বাক্যবিন্যাস রচনা করলুম্, বাস্তবতার পরশে তা' মরীচিকার মতই মিশে গেল!

নাঃ! পোষ্ট আফিসের এই নিশ্চল প্রতিনিধির সম্মুখে দাঁড়িয়ে এ রকম অকৃতজ্ঞ চিন্তাও শোভা পায় না। চিঠিখানা ফেলে দিয়ে ডাকবাক্সের রঙ্-ওঠা চক্‌চকে মাথাটীতে হাত বুলিয়ে বল্লুম, 'না, গো না—অতটা অকৃতজ্ঞ নই। তোমারই কৃপায় ত আমার প্রিয়ার সান্নিধ্য এত নিবিড় ভাবে অনুভব করি।'

ফিরে চলে আস্‌ছি—এমন সময়ে যেন একটা অস্ফুট কাতরোক্তি শুন্‌তে পেলুম্। চারিদিকে চেয়ে দেখি কেউ ত নেই—রাস্তা একেবারে নির্জ্জন! এক বুড়ী পানওয়ালী তার পানের বাটা ও কৌটা নিয়ে অনেক আগেই উঠে গিয়েছে। কাছে স'রে এসে মনে হ'ল যেন ডাকবাক্সের ভেতরেই একটা অস্পষ্ট কোলাহল!

ডাকবাক্সের গায়ে হেলান দিয়ে তার মুখের কাছে কান পেতে শুন্‌তে লাগ্‌লুম্।

কে একজন ফোঁস্ ক'রে উঠ্‌ল—"আঃ—ইনি আবার কে এলেন জ্বালাতে! এইটুকু তো জায়গা, দম্ আট্‌কে মর্‌ব না কি? বলে—আপনার জ্বালায় মরে মন্‌সা, বর দিয়ে যা!"

বুঝ্‌লুম্ আমার চিঠিখানি এঁদের গোষ্ঠীসুখ ও বিশ্রম্ভালাপে ব্যাঘাত দিয়েছে। একসঙ্গে এতগুলো কথা শুনে আমার চিঠিখানি থতমত খেয়ে গেল। অনাহূত আগন্তুক জড়সড় হ'য়ে এক কোণে বস্‌বার মত একটু ঠাঁই ক'রে নিলে।

পরে যে সব কথোপকথন হ'ল তারই একটা নক্সা দিচ্ছি। ...লুম্, প্রাণ জিনিষটা আমাদেরই একচেটে ব্যবসা নয়। জড়ের মধ্যেও বেশ একটী সরসতা আছে।

"কি হে! তোমাদের সব কথাবার্ত্তা বন্ধ হয়ে গেল কেন? চলুক্ না!"

"হ্যাঁ ভাই সবুজ খাম, তোমার মধ্যে কি?"

"সে শুনে তোমাদের আর কি হবে?"

"তবু?"

"ব্যাপার আর কি! এই কল্‌কাতার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যারিষ্টার একটী যুবককে কাল সন্ধ্যায় চায়ের নিমন্ত্রণ কর্চ্ছেন।"

"শুধু তাই কখনো হয় কি? সবটাই ব'লে ফেলনা। শেষ কালে বলেছেন নিশ্চয়ই যে তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ প্রসঙ্গ আলোচনা করবার আছে?"

"বলি—নামটী কি হে—হেনা না মাধবী?"

"নাঃ—তোমাদের এই বাজে আর পুরানো ইয়ার্কি আমার ভাল লাগেনা। আচ্ছা, ঠাওর কর দিকি আমার মধ্যে কি আছে?"

"ভূমিকা বাদ দাওনা, ভাই নীল খাম। আসল কথাটা পাড় না!"

"হুঁ:—সে আর আন্দাজ কর্ত্তে হয়না! আমার চিঠির একটী কথাতে একসঙ্গে সাড়ে সাত হাজার টাকা পেমেন্ট্ কর্ত্তে হবে।"

"হাঃ হাঃ হাঃ—তবু যদি চেক্‌টা সঙ্গে থাকৃত! খালি পেটেই এত দেমাক্!"

হেলান দিয়ে দিয়ে আমার কোমরে ব্যথা লাগ্‌ছিল। চ'লে আস্‌ব ভাবছি এমন সময়ে শুনি নীল খাম রাগে গস্ গস্ করে বল্‌ছে—"তা বেশ! বেশ! মাটী খুঁড়লে একটা আধলা বেরোয় না তা' সাড়ে সাত হাজার— মনে রেখো!"

"ওহে On His Majesty's Service! তুমি চুপ্‌টী ক'রে কেন? এ রকম মৌনব্রত কি তোমার শোভা পায়? খাস্ গভর্ণমেণ্টের আফিস্ থেকে আস্‌ছ, নতুন দুটো একটা খবর শোনাও! কি ব্যাপার চল্‌ছে—বড় জবর রিপোর্ট দেখ্‌ছি যে?"

"না ভাই, রিপোর্টও নয়, জবর ও কিছু নয়। আমার সামান্য ইতিহাসের খবর শুনে কি আর হবে? চেক্‌ও নই, সাড়ে সাত হাজারীও নই।"

"বেশ হাসিয়েছ বটে! এখন খবর শোনাও।"

"ভালো লাগ্‌বে তোমাদের? আচ্ছা বল্‌ছি। ব্যাপার এই যে দশ দিনের বিনা নোটিশে কামাই করার অপরাধে চাক্‌রী বরখাস্তের সংবাদ যাচ্ছে। শুভ মোটেই নয়।" খানিকক্ষণ চুপ্ করার পর আবার বলতে শুন্‌লুম্—"বড় কষ্ট হে! ছোক্‌রা নাবালক ভাই দুটী ও বিধবা মাকে নিয়ে এখন অকূল পাথারে পড়ল। কি ক'রে দিন চালাবে তাই ভাবছি! আর চাকুরীর বাজার সে ত জানাই আছে।"

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

"আহা বেচারী!" একটা ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস সকলের হৃদয় মথিত ক'রে উঠল।

এই বিষাদের চাপা হাওয়া কাটাবার জন্যে কে এক পরিহাসতরল কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, "তা যেন হ'ল—কিন্তু তোমার তহবিলটা দেখ্‌ছি বেজায় ভারী! তোমারটী কিসে ভর্ত্তি? প্রেমপত্র নাকি? ইস্! বড় টান্ দেখ্‌ছি যে! তা' তোমার এতখানি উদরপূর্ত্তি না ক'রে বুক পোষ্টে পাঠালেই ত হ'ত!"

"নাও, তুমি আর জ্বালিও না!"

একটা বিজ্ঞ হাসির আওয়াজ ভেসে এল।

"না না সত্যি বল্‌ছি, একবার ভারী মজা হয়েছিল। আমি যেখান থেকে আস্‌ছি, সেই ভদ্রলোকের একটি মেয়ে ছিল। তার সম্পর্কে একজন পিস্‌তুতো ভাই তাকে কখনো দেখেনি—বিদেশে থাকৃত কিনা। একদিন ঘণ্টাখানেক আলাপের পর বাড়ী ফিরে গিয়ে একখানি বুকপোষ্টে চিঠি পাঠালেন।"

"খাসা, Enterprising cousin বল্‌তে হবে!"

"যা বলেছ! তিনি আবার কবিপুত্র, কাজেই কাব্য-শক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য এটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য ব'লে মেনে নিয়েছিলেন। তা' যাই হোক্, সে চিঠি পড়ে সকলের কি হাসি! মেয়েটী বিয়ে হলে তার স্বামীকে সেখানি দেখিয়েছিল। তার দুটো একটা কথা এখনও একটু একটু মনে আছে। ওই অচেনা, অদেখা, অছোঁয়া ভাব— বুঝ্‌লেনা! তারপর সমুদ্রের তাণ্ডবনৃত্য, পাগ্‌লা ঝোরার রিনিকিঝিনি, বৌ কথা কও—আরও কত কি ছিল, সে সব ছাই পাঁশ কি কি আর সব মনে রাখা যায়?"

পেট ফাঁপা খামখানি করুণ হেসে বল্লে, "না ঠিক্ ঐ রকমটা নয়, তবে কাছাকাছি। মোট কথা, অবস্থা দু'জন-কারই যে খুব আশাপ্রদ নয় সেটা স্বীকার্য্য।"

"কি রকমটা তবু শুনি।"

"তরুণ লেখক—মাসিক পত্রে উপন্যাস প্রেরণ—অতঃপর ধন্যবাদ সহকারে প্রত্যর্পণ।"

"একটু রঙিয়ে বলনা হে! অত সংক্ষেপে কেন?"

"এর আর কি বিশদ ব্যাখ্যা কর্‌ব? তরুণ লেখকটী যেখানেই গেছেন সেখানেই এক একটী প্রেমের জীবন্ত আদর্শের সাক্ষাৎলাভ করেছেন। প্রত্যেক তরুণীই তাঁর হৃদয় উন্মুক্ত করেছেন তাঁর কাছে। সকলেরই একটী ক'রে সুগভীর ক্ষত গুপ্ত হয়ে আছে। তাই তিনি এই ব্যথানাট্য-অঙ্কণে প্রয়াসী হ'য়েছেন আর সেইসঙ্গে প্রেমের সোনার কাঠির মাহাত্ম্য নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করেছেন। তা' কোনও কাগজেই মনোনীত হয়নি। কোনো সম্পাদক হয়ত ভদ্রভাবে ফেরৎ দিয়েছেন, কেউবা ডাকটিকিট প্রেরণ সম্বন্ধে লেখককে সাবধান ক'রে দিয়েছেন। এইবারে এক-জন সম্পাদক একখানি তথ্যপূর্ণ উপদেশপত্র সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন।"

"কি লিখেছেন?"

"লিখেছেন, আপনার প্রেমের আদর্শবাদের নিখুঁত চিত্র বাঙ্গলা সাহিত্যে সত্যিই দুর্লভ। কিন্তু দোহাই আপনার! কথায় কথায় অত বিদেশী সাহিত্যিকদের নাম আওড়াবেন না। অন্য কাগজে ওসব চলে ভাল, কিন্তু বিনীতভাবে জানাচ্ছি, আমাদের প্রথাটা একটু স্বতন্ত্র। আর দেখুন্—আপনার ভাষাটী বেশ প্রাঞ্জল। পরীর রাজ্য ছেড়ে দিয়ে একটু মর্ত্ত্যবাসীর উপযোগী ক'রে একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠালে বাধিত হবো।"

"অর্থাৎ ভদ্রভাষায় জানিয়ে দেওয়া যে মশাই! কাগজে আর কলম ছোঁয়াবেন না।"

"তা যা' বল ভাই,' এরকম একটু দরকার হয়ে পড়েছে। এ নেশা এ বয়সে বড় সাংঘাতিক! কবি বলেছেন ঠিক কথাই! সাহিত্যের কামড় ত' নয় কচ্ছপের কামড়!"

"তফাৎ এই, যে উনি মেঘের ডাক শুনলে ছাড়েন, আর ইনি ছাড়েন চোখের জল পড়্‌লে।"

"যাক, এখন ভালয় ভালয় সাম্‌লে গেলে বাঁচি।"

"তোমরা ত' তামাসা সুরু করে দিলে কিন্তু আমি ভাব্‌ছি আমার পরিণাম। বেচারী এইবার শেষ চেষ্টা করেছিল—সব আশা, সব উদ্যম একেবারে ব্যর্থ! বার বার পাঁচবার! আর নয়। জানিনা ডাষ্ট্‌বিনে কি উনুনের মাঝে আমার সৎকার হবে!"

চৌকো খামের আসন্ন দুর্গতি স্মরণ ক'রে আর নিজেদের অনতি-উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা ক'রে সকলেরই মন বিষাদে ভারী হয়ে উঠ্‌ল।

খানিক বাদে শুন্‌লুম্—"আরে! একি! লাল খাম যে! স্বয়ং প্রজাপতি ঋষি! তা বেঁচে থাক দাদা। 'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।' তবে বিবাহটা কি মতে? কোর্টশিপ্, না চোখ বুজে ঢিল ছোড়া?"

"সনাতন হিন্দুমতে—"

"তার মানেই তাই—তা মেয়েটী কত বড়?"

"বছর বারো হ'বে বোধ হয়। সে অনেক কথা। ছেলে পণ করেছিলেন—পনর বছর বয়স ও ডানাখসা রূপ,—ডানা কাটা নয়, তা হলে সেও একটা খুঁৎ থেকে যাবে। আর শিক্ষা তেমন না থাক্‌লেও চল্‌বে।"

"সে কি হে? অবাক্ কর্‌লে তুমি! বিংশ শতাব্দীর ছেলে হ'য়ে—"

"হাঁ, পাত্রের ধারণা যে পড়াশুনা কল্লে'ই মেয়েদের মন অপবিত্র হয়ে যায়। তিনি চান্ নিষ্কলুষ একটী ফুলের পাপ্‌ড়ী বিয়ের রাতে তাঁর বুকের উপর ঝরে পড়বে। বাপ বেচারী হায়রান্! অনেক কষ্টে এই পাত্রী স্থির হয়েছে।"

"তা' ভাল। তোমার পাশে উনি কে? ইস্ ওপরে যে আবার লতাপাতা আঁকা! ওটা কি? পাখী বুঝি ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে? বলি তোমার নায়কটী কি কোন স্যাক্‌রার দোকানে কাজ করেন?"

"হুঁ"

"আর নায়িকা থাকেন কোথায়?"

"দেশে, মেদিনীপুর জেলায়।"

"তোমার পেটুটীও যে ভারী দেখ্‌ছি, ভাই ফিরোজা খাম! এক গোব্দাই বোধ হয়?"

"তোমার যেমন কথা! প্রেমপত্র বটে, তবে আট পাতা চিঠির মধ্যে পাঁচ পাতা ছন্দে লেখা।"

"তা' হ'লে কবিতা বল! বলি, Quotation, না Creation?"

"না ভাই, ঘরের কথা ফাঁস কর্ত্তে নেই। মেয়েটী ভাল—সাহিত্যিক বংশে জন্ম—পাকা ঘরোয়াল। এপক্ষে মেডিকেল কলেজের ছাত্র, মহা মুস্কিল। ও সব সুকুমার কলাচর্চ্চা হয়ে ওঠেনি, তাই একটু মনের পরশ পাবার জন্য এই অনভ্যস্ত ভূমিকার অভিনয়।"

"এখন উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হলেই ভাল। বেমালুম নিজের ব'লে চালান হয়ে গেলে মন্দ নয়, তবে বুদ্ধিমতী হ'লে ধরা পড়ার বিপদ যথেষ্ট।"

"না হে, ভুল কচ্ছ। ঐখানে সবাই বোকা ব'নে যায়, বিশেষ ক'রে স্বামীর কৃতিত্বের বেলায়।"

"যাক্, কোণের দিকে উনি ম্রিয়মান হ'য়ে প'ড়ে আছেন কেন? সাদা খাম বুঝি! তা' লজ্জা কিসের? একটু স'রে এস না। ওপরে ওটা কি লেখা আবার—Stamped? হুঁসিয়ার লোক দেখ্‌ছি, পিয়নদের বিশ্বাস করেন না! এ যে অনেক দূরের পথ!"

"তা' হ'লে ভিতরে এক পূর্ব্বমেঘের সঞ্চার হয়েছে বলো!"

আমার খামখানি একটু মৃদু হেসে বল্লে "না ভাই! ও সব বড় একটা ধার ধারি না। হা হুতাশও নেই, কাব্যও নেই।"

"তবু?"

"অনেক দিন চিঠি আসেনি, তাই একটু অভিযোগ করেছে মাত্র।"

"ভাল বল্‌তে হবে ত কর্ত্তাকে! অন্য প্রভু হ'লে দেখে নিত একবার।"

"সম্বোধনগুলো শুন্‌তে পাই কি? হৃদয়েশ্বরীর যুগ ত উঠে গেছে; এখন চল্‌ছে মণি আমার, রাণী আমার! তোমারটী কি ভাই?"

"কিছুই নেই"

"বল কি? ওপরে সম্বোধন নেই?"

"না।"

"শেষের সইটা?"

"তাও নেই।"

"তবে জায়গাগুলো ফাঁকা প'ড়ে আছে নাকি?"

"হ্যাঁ, শুধু দুটো লাইন টানা।"

"পথে এস ভাই! সে ত আরও গভীর প্রেম—ওপরে টান, নীচে টান!"

একটা মৃদু কম্পনের আওয়াজ শুনতে পেলুম্। On His Majesty's Service আস্তে আস্তে বল্লে, "তোমার ধরণটা কিন্তু খুব ভাল লাগ্‌ল আমার। বাহুল্য নেই, আড়ম্বর নেই, কেমন সাদা সিদে ভাব! তোমার লেখকটি সত্যিকারের প্রেমিক, যেন মনের কথা খুলে ব'লে খালাস হয়েছেন। অনেক মেয়ে অবশ্য প্রেমের চেয়ে প্রেমপত্রই বেশী পছন্দ করেন, কিন্তু সত্যিকারের ভাল মেয়ে এই উচ্ছ্বাস আর আক্ষেপোক্তির চেয়ে প্রাণ দিয়ে লেখা চিঠিরই বেশী কদর করবে।"

আশ্চর্য্য অন্তর্দৃষ্টি! আত্মপ্রশংসা শুনে একটু গৌরব বোধ না করে পারলুম্ না।

আমার খামখানি এতক্ষণ লজ্জায় মুসড়ে ছিল। একটি সকরুণ কৃতজ্ঞ চাহনি দরদীর প্রতি নিক্ষেপ ক'রে আস্তে আস্তে পাশ ফিরে শুল।

খস্ খস্ শব্দ শুনে চমক ভাঙ্গল। দেখি, গ্যাসের আলো অনেকক্ষণ জ্ব'লে উঠেছে। ভাব্‌লুম শেষে ঐ রোগেরই ছোঁয়াচ্ লাগ্‌ল না কি? না, আর বেশীক্ষণ এই নির্জ্জনে থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়। তা ছাড়া, স্বপ্নরাজ্যে আর খানিক বিচরণ করলেই পাহারাওয়ালা একটু রূঢ় ভাবেই মর্ত্ত্যে অধিবাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।

E. V. Lucas অবলম্বনে

অরুন্ধতী

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

(প্রাচীন আসামী হইতে অনুবাদ)

শিশির-মসৃণ কেশ খুলে দাও সখি
দেখি বসে তারা ঝরা; মুক্তাস্বচ্ছ হাতে
ভীরু ভঙ্গিমায় আঁকো আকাশের পাতে
আন্দোলন আলিম্পন; উঠুক ঝলকি
তমাল তরল ঘন নয়নে ছলকি
বিরহ সঙ্কেত রেখা; বসনে, শয্যাতে,
নিজেরে ছড়ায়ে যাও সকলের সাথে
আমি তাই খুঁটে ফিরি পরখি' পরখি'।
পারাবত পদ পাণ্ডু চন্দ্রের হ'ল কি!
গলে' গেল নভপ্রান্তে! সপ্তর্ষি সভাতে
শিশির-মার্জ্জিত আঁখি জাগে বেদনাতে
একা অরুন্ধতী স্তব্ধ জগতে নিরখি'!
হে আমার অরুন্ধতী স্বপ্নহীন চোখে
দেখিছ কি সৃষ্টি চলে মোর মর্ত্ত্যলোকে!

চীনে হিন্দুসাহিত্য

—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(১)

এশিয়া অখণ্ড। এশিয়া—বিশেষভাবে পূর্ব্ব এশিয়া এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। অখণ্ড গ্রন্থী বাঁধিয়াছিল অতীত ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের ইতিহাস—সমগ্র এশিয়ার ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে আমরা এতই অভ্যস্ত যে এই প্রাচ্য-এশিয়ার অখণ্ডত্বকে সহসা বিশ্বাস করিতে সাহস পাই না। কিন্তু সত্যের সত্ত্বা ইতিহাসের পাতার মধ্যে, মানব জীবনের ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে, দর্শনে তিহাসের মধ্যে জীবন্ত। ভারতের এই মনোজগতের জয়যাত্রার ইতিহাস—'ছিন্ন ভিন্ন বিক্ষিপ্ত' এশিয়াকে 'এক ধর্ম্মরাজ্য পাশে' বন্ধনের ইতিহাস—আমরা সশ্রদ্ধ গৌরবের সহিত অনুভব করি।

হিন্দুর আর্য্যধর্ম্ম সনাতন—অপৌরুষেয়। অপৌরুষেয় ইহার অর্থ আর্য্যধর্ম্ম কোনো পুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট নহে—উহা সনাতন। হিন্দুধর্ম্ম ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য সকল ধর্ম্মই পৌরুষেয় অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষের সাধনার দ্বারা সৃজিত। বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম, ইসলামধর্ম্ম—পৃথিবীর এই প্রধান তিন ধর্ম্মই ব্যক্তি বিশেষের সাধনার ফলে হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বুদ্ধের ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। বুদ্ধের পূর্ব্বে ধর্ম্মমাত্রই Ethnic ছিল—অর্থাৎ নিজ নিজ জাতি বা tribe-এর সীমানার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও সেই জাতির আচার ব্যবহার প্রতিপালন করিলেই ধর্ম্মপালন করা হইত। নিজ নিজ Ethnic বর্গের বাহিরে তাহার প্রচার হইত না। ধর্ম্ম জাতীয় জীবনের অঙ্গীভূত ছিল; প্রচার বা Proselytizing এর ভাব বা নিজ ধর্ম্মে অন্যকে আনয়নের কথা তখনো মানবমনে আসে নাই।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বুদ্ধদেব নিজ জাতির গণ্ডী ছাড়াইয়া বিশ্বমানবের মুক্তির জন্য বাণী প্রচার করিলেন, তাঁহার বাণীর মধ্যে কোনো মতবাদ নাই—dogma বা creed নাই—তিনি বিশ্বমানবের পার্থিব বন্ধনের জটিল শৃঙ্খল শিথিল করিবার জন্য পথ নির্দ্দেশ করিলেন মাত্র—দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিলেন; তিনি তাঁহার মুক্তির বাণী নিজ শাক্যবংশের মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নাই; তিনি তাঁহার ভিক্ষুগণকে বলিয়াছিলেন "তোমরা পৃথিবীর নানাদিকে প্রচারে যাও—দুইজন একপথে যাইও না।"

মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোক সর্ব্বপ্রথম বুদ্ধদেবের বাণীর গভীরতা, ধর্ম্মের শাশ্বত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারতের ভৌগোলিক সীমানার বাহিরে, ভারতের এই ঋষির বাণী প্রচারকল্পে ভিক্ষুবর্গকে নানাদেশে প্রেরণ করেন। এই ঘটনাটি ভারত-ইতিহাসের দিক হইতে খুব বড় বিষয় নাও হইতে পারে, কিন্তু এশিয়ার ইতিহাসে ও বিশেষভাবে মানব জাতির মোক্ষধর্ম্ম-ইতিহাসে এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি চিরস্মরণীয়।

'মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস' আলোচনা কালে বিস্তৃতভাবে আমরা দেখাইব খৃষ্টজন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় ঋষি গৌতমবুদ্ধের বাণী প্রচারিত হইয়াছিল। মধ্য-এসিয়ার নানা জাতি—যেমন পার্থিয়ান্, শক বা খোটানবাসী, কুচাবাসী—শূলিকগণ বা সগ্‌ডিয়ানাবাসী প্রভৃতি নানা জাতি বুদ্ধের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। বুদ্ধের বাণীতে দীক্ষিত হইয়া মধ্য-এশিয়াবাসিগণ নিজেরাই প্রচারক হইয়া উঠিল।

চীন, বুদ্ধের কথা প্রথম শ্রবণ করে মধ্য-এশিয়ান পরিব্রাজকগণের নিকট হইতে। চীন তখন ক্ষুদ্র দেশ, মধ্য-এশিয়ার ও চীনের মধ্যে যে মরুভূমি ও মরুপর্ব্বত আছে তাহা লঙ্ঘন করিয়া যাওয়া তখনো তেমন সুকর হয় নাই। প্রাচীনতম চীনা কিম্বদন্তী অনুসারে অশোকের সমসাময়িক

চীনে হিন্দুসাহিত্য

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

চীন সাম্রাজ্যের অন্যতম সম্রাট চিহ্-হুআং-তি (Chih Huang Ti)-র সময় প্রথম বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনে উপনীত হন। এইরূপ পৌরাণিক প্রবাদ আরও দুই একটি আছে। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব্ব ২ অব্দের প্রবাদটি ঐতিহাসিক বলিয়া পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন ; চীন্ সম্রাট আই-তি (Ai-Ti)-র রাজ্যকালে মধ্য-এশিয়াস্থিত য়ু-চি (Yueh-chih) রাজার রাজধানীতে জনৈক চীনা দূতকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। এই য়ু-চি রাজ্য অক্সাস (Oxus) বা বক্ষু নদীর তীরে অবস্থিত ছিল ;—তথায় চীনা দূত বৌদ্ধ সাহিত্য অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন।

সাধারণ চীনা ইতিহাস অনুসারে হান্ (Han) বংশীয় সম্রাট্ মিং-তি (Ming-Ti)-র সময়ে (৬৫ খৃঃ অঃ) ভারতের সহিত চীনের প্রথম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্ম্মরত্ন। * চীনে প্রথম হিন্দুপ্রচারক বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত। চীনে যখন তাঁহারা উপনীত হইলেন তখনকার চীনে দুইটি মত প্রবল। চীনদেশে বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক দুইজন ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—কুং-ফু-ৎসু (Confucius) ও লাও-ৎসু (Lao-tzu)। কুং-ফু-ৎসুর মতবাদের মধ্যে নীতি উপদেশই প্রধান ; ব্যক্তি, পরিবার রাষ্ট্রের নিজ নিজ কর্ত্তব্য ও পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার, নীতি উপদেশ হইতেছে তাঁহার মতের মূল কথা। লাও-ৎসু আমাদের দেশের উপনিষদের ঋষির ন্যায় অনেক তত্ত্বকথার আলোচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং যখন ভারতের দুইজন ভিক্ষু বুদ্ধের বাণী লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন তখন চীন মনোজগতে যথেষ্ট উচ্চেই অধিরূঢ় ছিল। কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্ম্মরত্ন সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। তাঁহাদের অনুবাদিত গ্রন্থের মধ্যে একখানি মাত্র কালের উপেক্ষা হইতে বাঁচিয়া আমাদের কাছে আসিয়াছে। গ্রন্থটির নাম 'দ্বিচত্বারিংশৎসূত্র'। এরূপ কোনো গ্রন্থ সংস্কৃতে ছিল কিনা সন্দেহ। সূত্রগুলি বুদ্ধের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশাবলীর সঙ্কলন। জাপানী পণ্ডিত সুজুকি মনে করেন যে এই গ্রন্থখানি কুং-ফু-ৎসুর 'বাণী ও উপদেশ'-এর অনুকরণে লিখিত। এ খানি কোনো সম্পূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ নহে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। চীনের সম্রাট্ হিন্দু ভিক্ষুগণের নিকট হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল কথা শুনিতে চাহিয়াছিলেন ; বৌদ্ধধর্ম্মের সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার জন্য তাঁহার ব্যগ্রতা ছিল না। কাশ্যপ মাতঙ্গ এই গ্রন্থে বুদ্ধের জন্ম ও শৈশবের কাহিনীগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন ; বুদ্ধদেবের বাণী ও বৌদ্ধমতগুলি সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ভিক্ষুজীবনের পবিত্রতা রক্ষা সম্বন্ধে বুদ্ধের উপদেশ, নূতন সাধকের সন্ন্যাসসাধনের পথ সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশগুলি সাধারণভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থখানির তিব্বতী ও মোঙ্গলীয় ভাষায় অনুবাদ আছে। বর্ত্তমান যুগেও ঐ গ্রন্থখানি বহুভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

এই হিন্দু ভিক্ষুগণ আরও পাঁচখানি গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, গ্রন্থগুলির চীনা নাম ব্যতীত আর কিছুই জানা যায় না। একখানি গ্রন্থ বুদ্ধের জীবনী বলিয়া বোধ হয়। এই অনুমানের উপর পণ্ডিতদের অনেক তর্ক হইয়া গিয়াছে।

এইখানে একটি কথা আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ করিতে হইবে। আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি—তখন পৃথিবীর কোথায়ও এমন কি চীনদেশেও মুদ্রাযন্ত্র হয় নাই। সুতরাং দুইজন হিন্দুর অনুবাদিত গ্রন্থ চীনের ন্যায় বিপুল দেশে বিশেষ কোনো ফল দর্শায় নাই। লোয়াঙের 'শ্বেতাশ্ব বিহারে'র বাহিরে এই গ্রন্থের বিশেষ প্রচার হয় নাই ; সুতরাং সেগুলি যে লোপ পাইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্ম্মরত্নের আখ্যায়িকাটিকে ফরাসী পণ্ডিত ম্যাস্‌পেরো (Maspero) ও পেলিও (Pelliot) অনৈতিহাসিক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। যাহাই হউক হিন্দু ভিক্ষুগণের এই প্রথম প্রচার চেষ্টার পর সত্তর বৎসর আমরা আর কোনো বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রচারের কথা শুনিতে পাই না। এইবার মধ্য-এশিয়ার সহিত চীনের যোগ স্থাপিত হইল। যোগস্থাপনের কারণ হইতেছে রাজনৈতিক

* চু-ফা-লন—'চু' শব্দ হিন্দুদের নামের পূর্ব্বে চীনায় ব্যবহৃত হয় : 'ফা' অর্থ 'ধর্ম্ম', 'লন' শব্দটি 'রত্ন' শব্দের উচ্চারণ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

তথা অর্থনৈতিক; মধ্য-এশিয়ার পথে হিং-নু (Hing-nu) নামে একটি দুর্দ্ধর্ষ জাতি বাস করিত; তাহারা চীনা সেনাপতি পান্-চাও ও পান্-ইয়াও-এর যুদ্ধাভিযানের ফলে পরাভূত ও কিছুকালের ন্যায় ইতিহাস হইতে লুপ্ত হইয়া যায়। মরুভূমির সেই উপদ্রব দূর হওয়ায় চীনাদের পক্ষে পশ্চিম দিকে বাণিজ্য বিস্তার করা সুসাধ্য হইল। মধ্য-এশিয়ার ব্যাকট্রিয়া তখন এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যবসা-কেন্দ্র। চীনের চেষ্টা হইতেছিল এই বাণিজ্যকেন্দ্রের সহিত যোগযুক্ত হইবার জন্য, তেমনি চেষ্টা চলিতেছিল খোটান ও অন্যান্য মরুস্থানের সহরবাসীদের। মধ্য-এশিয়ার মহা বাণিজ্যকেন্দ্রে হিন্দুরা বহুপূর্ব্বেই গ্রীকদের সহিত বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিল। সুতরাং আর্থিক ও রাজনৈতিক কারণ মধ্য-এশিয়াবাসীদিগকে চীনের নিকটে আনিয়া দিল। এই নৈকট্যলাভের সুযোগে ইরাণীসভ্যতা ও চীনাসভ্যতা মিলিত হইল। এই মিলনের ফল যে কেবল ধর্ম্মজগতে—যাহার কথা আমরা এখনি বলিব—ঘটিয়াছিল, তাহা নহে; আন্তর্জাতিক মিলনের ফলে Cultureএর বহু উপাদান ইরান হইতে চীনে উপনীত হইল, চীন হইতে পশ্চিমেও গেল। জার্ম্মাণ পণ্ডিত লাউফার (B. Laufer) তাঁহার Sino-Iranica গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। গতায়াতের পথ নিরুপদ্রব হইলে প্রাচ্যএশিয়ার ও মধ্য-এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য ও জ্ঞানের বিনিময় সুরু হইল। দলে দলে মধ্য-এশিয়াবাসী বৌদ্ধ প্রচারকগণ চীনদেশে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে পার্থিয়ান্ রাজকুমার ঙান্-শি-কাও (Ngan-Shi-Kao) ছিলেন এই দলের অগ্রণী। পার্থিয়াদেশে ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে এক নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার ইতিহাস পাঠক অবগত আছেন। (Smith—Oxford History of India, p121 দ্রষ্টব্য) সেই পার্থিয়ার রাজ পরিবারে শি-কাও-এর জন্ম। ঙান শব্দ চীনাভাষায় পার্থিয়া বুঝায়। এই পার্থিয় রাজকুমার ১৪৮ খৃঃ অব্দে লোয়াঙের বিহারে আগমন করেন ও দীর্ঘ বাইশ বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ চীনা ভাষায় অনুবাদ করিতে থাকেন। বলিতে গেলে চীনে ভারতীয় সাহিত্যের যথার্থ প্রচারক হইতেছেন এই পার্থিয় রাজকুমার। পরবর্ত্তী কালের চীনা লেখকগণ এই পার্থিয় অনুবাদকের মনীষা ও শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। প্রাচীন চীনার গ্রন্থতালিকায় ঙান্-শি-কাওএর ১৭৯ খানি গ্রন্থের নাম পাই। ইহার মধ্যে মাত্র ৫৫ খানি গ্রন্থ আমরা বর্ত্তমান চীনা ত্রিপিটক সংগ্রহে পাইয়া থাকি। ঙান্-শি কাওএর অনূদিত গ্রন্থ-সমূহে অনেকগুলি হইতেছে বৌদ্ধ শাস্ত্রের আগম-সাহিত্যের বিভিন্ন সূত্রের অনুবাদ। পালি ত্রিপিটকের মধ্যে সুত্ত-পিটকের অন্তর্গত হইতেছে পঞ্চ নিকায়'—যথা দীঘ্‌, মজ্ঝিম, সংযুত্ত, অঙ্গুত্তর ও খুদ্দক। সংস্কৃতে প্রায় অনুরূপ নিকায় আছে—তাহাকে আগম বলে;—চতুরাগমই প্রসিদ্ধ, যেমন দীর্ঘ-আগম, মধ্যম আগম, সংযুক্ত আগম ও একোত্তর আগম। সর্ব্বাস্তিবাদ নামে হীনযানের যে একটি শাখা ছিল—তাহাদের লিখিত সংস্কৃত আগমগুলি সম্পূর্ণভাবে চীনাভাষায় অনূদিত পাওয়া যায়—তাহা আমরা যথাস্থানে দেখিতে পাইব। ঙান্-শি-কাও এই সুদীর্ঘ আগমশাস্ত্র হইতে কতকগুলি সূত্র অনুবাদ করেন। আগম-সূত্র ব্যতীত আরও অনেকগুলি সূত্র তিনি তর্জ্জমা করেন—ইহলোক, পরলোক, নরক, প্রেততত্ত্ব, সুকর্ম্ম, দুষ্কর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ ও বিচিত্র বিষয় সম্বন্ধে ছোট ছোট বহু সূত্র অনুবাদ করিয়া তিনি চীনাভাষাভাষীদের বৌদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাবার পক্ষে সহায়তা করেন।

ঙান্-শি-কাওএর সমসাময়িকগণ অধিকাংশই মধ্য-এশিয়াবাসী—বোধ হয় সকলেই সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ শক, কেহ শূলিক (Sogdian)। দুই একজন হিন্দুও যে ছিলেন না তাহা নহে। ধর্ম্মফল নামে একজন হিন্দু কপিলাবস্তু হইতে কিছু পুঁথি সংগ্রহ করিয়া চীনে উপনীত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। মোট কথা হান্ রাজবংশের রাজত্বকালে বার জন অনুবাদক ৩৫৯ খানি বৌদ্ধগ্রন্থ সংস্কৃত বা প্রাকৃত বা মধ্যএশিয়ার কোনো ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া চীন দেশে প্রচার করেন। ইহা ব্যতীত ২৩৭ খানি গ্রন্থের অনুবাদকের নাম জানা যায় নাই। খৃষ্টীয় ১৪৮ হইতে ২২০ অব্দ—এই ৭২ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় সাহিত্যের প্রায় ছয়শত গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল ইহা কম বিস্ময়ের ব্যাপার নহে।

চীনে হিন্দুসাহিত্য

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

দুঃখের বিষয় ইহার অনেকগুলি বর্ত্তমানে লোপ পাইয়াছে।

চীন রাজবংশ হানদের শক্তি অস্তমিত হইলে—চীন তিনটি রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল। লোয়াঙের চারিপার্শ্বে Wei, দক্ষিণ চীনে নান্‌কিংএ কেন্দ্র করিয়া Wu রাজ্য ও পশ্চিমদিকে Chang-nganএর চতুর্দ্দিকে Shuদের রাজ্য গড়িয়া উঠিল। হানরাজদের অবসান হওয়া সত্ত্বেও লোয়াঙে ভারতীয় সাহিত্যের চর্চ্চা সমভাবেই চলিতে লাগিল; তবে এই সময়ে চীনের দক্ষিণে নান্‌কিং—প্রাচীন নাম কিয়েন-য়ে (Kien-Ye)—বৌদ্ধ শাস্ত্র ও ভারতীয় সৃষ্টির এক প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। এইখানে একটি কথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। চীনের উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে আমরা আজ যে বিরোধ দেখিতে পাইতেছি—তাহা নূতন নহে। এই বিরোধ ইতিহাসের সুরু হইতে চলিয়া আসিতেছে; জাতিগত ভাষাগত (Dialect) ব্যবধান ভৌগোলিক ব্যবধানের সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণ চীনকে বিশেষ একটি রূপ দিয়াছে। উত্তর চীনে হিন্দু সভ্যতা ও সাহিত্য প্রচারিত হয় মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধদের দ্বারা; দক্ষিণ চীনেও অনুরূপ প্রভাব বিস্তৃত হয় ইন্দো-চীনের হিন্দু-ঔপনিবেশিকদের দ্বারা। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে ভারতীয় ও রোমীয় অর্ণবযান ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল বাহিয়া বাণিজ্য বিস্তার করিতে থাকে। চম্পার Vocanএর সংস্কৃত শিলালিপি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর। সুতরাং ভারতীয় সভ্যতা দক্ষিণ চীনে ঐ সময়ে প্রবেশলাভ করিয়াছিল—এটি স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

দক্ষিণচীনের এই সময়ের একজন বিশেষ চীনা পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিব—কারণ তিনি দক্ষিণের হিন্দুস্রোত হইতে তাঁহার প্রেরণা পাইয়াছিলেন। এই চীনা মহাপণ্ডিতের নাম মু-ৎসু (Mu-tsu)। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে (১৯৫ খৃঃ অঃ) এক গ্রন্থে মু-ৎসু বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিলেন। মু-ৎসু ছিলেন কুং-ফু-ৎসুর শিষ্য—পণ্ডিত ও জ্ঞানী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি যখন বুদ্ধের ধর্ম্মমত সমর্থন করিবার জন্য তাঁহার লেখনী গ্রহণ করিলেন—তখন চীনা-পণ্ডিতগণ আশ্চর্য্য হইলেন। মু-ৎসু তাঁহার গ্রন্থে একাধারে কুং-ফু-ৎসু ও লাও-ৎসুর শিষ্যগণের বৌদ্ধধর্ম্মবিরুদ্ধ মত সমূহের সমালোচনা করিলেন। সাঁয়ত্রিশটি প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রথমে মু-ৎসু অলৌকিক ঘটনাবলী যথাসম্ভব বাদ দিয়া সংক্ষেপে বুদ্ধের জীবনী বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে পৃথিবীর কেন্দ্র-ভূমি ভারতবর্ষ বুদ্ধের জন্মভূমি। আলোক-রশ্মি যেমন সমভাবে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, এই কেন্দ্র হইতে বুদ্ধদেবের বাণী বিশ্বের চতুর্দ্দিকে মুক্তির বার্ত্তা বহন করিয়া বিচ্ছুরিত হইতেছে। বুদ্ধের বাণী আনন্দের, মুক্তির পথ দর্শাইয়াছে। কুং-ফু-ৎসু প্রভৃতি চীনের প্রাচীন কবিদের সহিত ইঁহার মতের কোনও বিরোধ নাই। কুং-ফু-ৎসুর মত ও বুদ্ধের মতের উদ্দেশ্য বিভিন্ন; সুতরাং একই ব্যক্তি দুইটি মতই গ্রহণ করিতে পারে। কুং ফু-ৎসু বুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু জানিতেন না; তাঁহার মত মানিলে বৌদ্ধমত পরিত্যাগ করিতে হইবে ইহার কোনও অর্থ নাই। বরং কুং-ফু-ৎসুর মতের সহিত অপর একটি উৎকৃষ্ট মতবাদ গৃহীত হইলে—লাভ বৈ ক্ষতি নাই। যথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্থানকাল পাত্র নির্বিশেষে উৎকৃষ্ট যাহা কিছু তাহাই গ্রহণ করেন। এইরূপ ভূমিকার পর কুং-ফু-ৎসু ও লাও-ৎসুর উক্তিসমূহ তিনি একটির পর একটি উদ্ধার করিয়া উভয় পক্ষের প্রশ্নপরম্পরার উত্তর দান করিয়াছেন। সর্ব্বশেষ প্রশ্নটিতে আছে—"বৌদ্ধধর্ম্মে এমন ভাল ভাল যুক্তি যখন রহিয়াছে, তখন তুমি বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত না করিয়া কুং-ফু-ৎসু ও লাও-ৎসু হইতে যুক্তি উদ্ধার করিয়াছ কেন?" তদুত্তরে তিনি বলিতেছেন, "বৃষ বৃষের নাদেই অভ্যস্ত, মশকের গানই মশকের কাছে মিষ্ট; ইহা ভিন্ন অপর কি তোমরা বুঝিবে?"

দক্ষিণচীনের রাজধানী কিয়েন-য়ে (Kien-ye-Nanking) হিন্দু সাহিত্যানুবাদ ও সভ্যতা প্রচারের একটি কেন্দ্র হইয়া উঠিল। বু-রাজবংশের (Wu Dynasty ২২২—২৮০ খৃঃ অঃ) প্রথম রাজা স্বয়ং ছিলেন বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম পৃষ্ঠ-পোষক। তাঁহার ও পরবর্ত্তী রাজাদের রাজত্বকালে—বাহান্ন বৎসরের মধ্যে পাঁচজন পণ্ডিত ভারতীয় ভাষা হইতে ১৮৭

খানি গ্রন্থ ৪১৭ খণ্ডে অনুবাদ করেন। ইহার মধ্যে বর্ত্তমানে ৫৬ খানি ব্যতীত অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি লোপ পাইয়াছে। সেগুলির মূলও লুপ্ত অনুবাদও লুপ্ত।

এই লেখকদের মধ্যে চি-চিয়েন (Chi-Chien) বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইনি ছিলেন জাতিতে য়ু-চি। হান্‌দের রাজত্বের শেষাশেষি সময়ে তিনি মধ্য-এশিয়া হইতে চীনে প্রবেশ করেন ও তৎপরে হানদের পতনের পর তিনি দক্ষিণ চীনে বু-দের রাজধানীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বু-সম্রাট তাঁহাকে 'কু ও-শি' বা রাজ্যগুরু করিয়া দেন। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া চি-চিয়েন তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া ভারতীয় ভাষা হইতে ১২৯ খানি গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন; দুঃখের বিষয় ৪৯খানি ব্যতীত সকল গ্রন্থগুলি লুপ্ত হইয়াছে। চি-চিয়েনের একখানি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। সেটি হইতেছে অবদান-শতক। অবদান-শতক সংস্কৃতে আছে; পণ্ডিত প্রবর স্পিয়ের (Spyer) সাহেব রুশিয়া হইতে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। অবদান হইতেছে সাধারণ বোধিসত্ত্বের জীবনী। একশটি গল্প দশটি ভাগে বিভক্ত। চি-চিয়েনের অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইতেছে মাতঙ্গীসূত্র...। মাতঙ্গী এক চণ্ডালী কন্যা—বুদ্ধশিষ্য আনন্দের প্রেমে পড়ে। বুদ্ধ তাহাকে ভিক্ষুণী করিয়া লইলে সঙ্ঘমধ্যে ও রাজধানীতে এই ব্যাপার লইয়া খুব আন্দোলন হয়; তখন বুদ্ধদেব চণ্ডাল পণ্ডিত ত্রিশঙ্কু ও তদীয় পুত্র পণ্ডিত শার্দ্দূল কর্ণের উপাখ্যান বলেন, জাতিভেদ সম্বন্ধে তর্কে পরাস্ত হইয়া কিরূপে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার কন্যাকে শার্দ্দূল কর্ণের সহিত বিবাহ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সে আখ্যায়িকাটি বলেন। এই 'মাতঙ্গী সূত্র' দিব্যাবদানের একটি অবদান। চীনভাষায় চারিবার ইহার অনুবাদ হয়। চি-চিয়েন সেই অনুবাদকদের অন্যতম। তাঁহার পূর্ব্বে একবার ওান্-শি-কাও ও পরে দুইবার এই সূত্র চীনা ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছিল।

চি-চিয়েনের আর একখানি অনূদিত গ্রন্থের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—সেটি হইতেছে সুখাবতী বা অমিতায়ু বুদ্ধ সম্বন্ধে গ্রন্থের অনুবাদ। ভারতের বা বৌদ্ধজগতের চিন্তাকাশে ভাবের যে পরিবর্ত্তন চলিতেছিল, তাহা চীন দেশের অনূদিত বৌদ্ধসাহিত্যের ধারা অনুধাবন করিলে বেশ সুস্পষ্ট হয়। মহাযান মত যে কত প্রাচীন তাহা এখনো নির্ণীত হয় নাই—তবে আমাদের কাছে সুপরিচিত সিংহলী-পালি-থেরোবাদী-বৌদ্ধমত অপেক্ষা উহা অর্ব্বাচীন যে নহে ইহা প্রমাণ করা দুরূহ নহে। এই মহাযান ভাব ভারতের বাহিরে বিশালভারতে (Ser-India) বা মধ্য-এশিয়ার নানা প্রদেশে ও পার্থিয়া দেশে খুবই প্রাচীনকালে প্রচারিত হইয়াছিল সে প্রমাণের অভাব নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত সুখাবতী ব্যূহ নামক গ্রন্থখানি তাহার সবিশেষ পরিচায়ক। পার্থিয় রাজ-ভিক্ষু ওান্-শি-কাও খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গ্রন্থখানির সর্ব্বপ্রথম অনুবাদ করেন। সর্ব্বসমেত সুখাবতী ও অমিতবুদ্ধ সম্বন্ধে সূত্রের বারখানি তর্জ্জমার কথা চীনা সাহিত্যে আমরা পাই। ইহার মধ্যে অনেকগুলি লোপ পাইয়াছে; চি-চিয়েন, সঙ্ঘবর্ম্মন, কুমারজীব, হুয়েন-ৎসাঙ প্রভৃতির ছোটবড় অনুবাদগুলি চীনা ত্রিপিটকের মধ্যে রক্ষিত আছে। এই সুখাবতী ব্যূহের মূল সংস্কৃত পুঁথিগুলি ভারতে পাওয়া যায় নাই; পুঁথি পাওয়া গিয়াছে জাপানের এক বৌদ্ধবিহারের গ্রন্থাগারে। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ বড়ই বিস্মিত হইয়াছেন। পণ্ডিত আইটেল (Eitel) গ্রন্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন যে অমিতাভ বুদ্ধের ভাবনা ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে নাই। ইহা খুব সম্ভব বিশাল ভারতের বৌদ্ধদের মধ্যে উদ্ভূত হয়। কাশ্মীরের বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে জরথুস্ত্রের ধর্ম্মমত ও পারস্যের অপর ধর্ম্মস্থাপক মুনির মত প্রবেশ করিতে পারে। তাহাদের প্রভাবে অমিতায়ু বুদ্ধের ভাবনা জন্মলাভ করে।

বৃহৎ অমিতায়ু সূত্র ও ক্ষুদ্র সুখাবতী ব্যূহ হইতেছে অমিতাভ বুদ্ধ ও সুখাবতী স্বর্গলোকের ধারণা সংক্রান্ত প্রধানতম গ্রন্থ। দুইখানিই জাপানে পাওয়া গিয়াছে ও ম্যাক্‌সমূলার সাহেব তাহা প্রকাশ ও অনুবাদ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র সূত্রখানির প্রতিপাদ্য বিষয়ের মূলকথা হইতেছে বিশ্বাস ও ভক্তি। ইহার মতে মানুষ মৃত্যুর পূর্ব্বে দুই তিন চারি, পাঁচ ছয় বা অধিক রাত্রি যদি অমিতায়ু বুদ্ধের নাম

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বার বার উচ্চারণ করে—তবে তাহার মুক্তি হইবে—অথবা সে সুখাবতীলোকে জন্মগ্রহণ করিবে। ইহলোকে সদ্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই যে সে সুখলোকে জন্মিবে তাহা নহে—নামজপ হইতেছে মুক্তির একমাত্র উপায়, কারণ মৃত্যুর পূর্ব্বের চৈতসিক অবস্থাই তাহার ভবিষ্যৎ জন্ম ও কর্ম্মের নিয়ন্তা। বৃহৎ সুখাবতী ব্যূহ প্রার্থনা ও ভক্তির উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়াছেন; কিন্তু এখানে কর্ম্মফলকে একেবারে অগ্রাহ্য করা হয় নাই। সুখাবতীর এই ভক্তি-বাদ কেমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল—তাহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহাই হউক এই নামে ত্রাণের মত এককালে মধ্য-এশিয়া ও পূর্ব্ব এশিয়ায় বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। সেইজন্য এই গ্রন্থের এত প্রচার, ইহার প্রতি লোকের এত শ্রদ্ধা। এই গ্রন্থদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া জাপানে জোডো (Jodo বা Pure-land) সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে।

এই যুগের অনুবাদিত আর একখানি গ্রন্থের একটু বিশেষ পরিচয় দিব। বিঘ্ন (Wei-chi-nan) নামক জনৈক ভারতবাসী ধম্মপদের একখানি পুঁথি লইয়া চীনে উপনীত হন। বিঘ্ন তাঁহার এক হিন্দু বন্ধুর সাহায্যে এই ধম্মপদের চীনা তর্জ্জমা করেন। গ্রন্থখানি ত্রিপিটকে আছে, কিন্তু সূত্রের ন্যায় সংক্ষিপ্ত ঠাসাবাঁধা পদের চীনা অনুবাদ খুবই কঠিন। সেইজন্য প্রথমে গ্রন্থখানি তেমন আদৃত হয় নাই। কয়েক বৎসর পরে এই ধম্মপদ হইতে একশত শ্লোক চয়ন করিয়া—ও প্রত্যেক শ্লোকের একটি করিয়া আত্মকথা বা ভূমিকা সম্বলিত করিয়া ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় অপর একজন চীনা লোকের দ্বারা। এই চীনা গ্রন্থখানির ইংরাজী অনুবাদ পণ্ডিত বীল (Beal) সাহেব বহু বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিঘ্ন যে ধম্মপদ অনুবাদ করেন—তাহাতে ৩৯টি বর্গ আছে। পালি ধম্মপদ বাংলা দেশে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রচেষ্টায় বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছে। পালি ধম্মপদে ২৬টি বর্গ আছে। চীনা অনুবাদের প্রথম আটটি বর্গ, ৩৩শৎ বর্গ ও শেষ চারিটি বর্গের সহিত পালি ধম্মপদের মিল নাই। চীনা তর্জ্জমার ৯ম হইতে ৩৫শ (৩৩শ বাদ) বর্গের নাম সম্পূর্ণরূপে পালির সহিত মিলিয়া যায়। এমনকি বহু শ্লোকও পর পর মিলিয়া যায় দেখিয়াছি। চীনা তর্জ্জমার সহিত পালি ধম্মপদের এরূপ মিল থাকিবার কারণ হইতেছে যে মূল গ্রন্থখানি খুব সম্ভব পালিই ছিল। বিঘ্ন দক্ষিণ ভারত হইয়া দক্ষিণ চীনে গিয়াছিলেন, এবং এই পুঁথি তিনি সিংহলেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। উত্তর ভারতে সংস্কৃত ধর্ম্মপদ প্রচলিত ছিল; সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব। সংক্ষেপে বলিয়া রাখি যে সংস্কৃত ধর্ম্মপদের কোনো সম্পূর্ণ পুঁথি ভারতে পাওয়া যায় নাই; মধ্য এশিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে যেসব খণ্ডিত অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহার আলোচনা আমরা যথা স্থানে করিব।

ত্রি-রাজ্য বা 'সন্‌-কুও'-এর অবসানে সমগ্র চান পুনরায় এক সম্রাটের অধীন হয়। এই রাজবংশের নাম ৎসিন্ (Tsin) (২৬৫-৩১৬ খৃঃ অঃ)। লোয়াঙের বৌদ্ধবিহারে বৌদ্ধগণ সংস্কৃত আলোচনা করিতে ও সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদ করিতে থাকেন। বারজন পণ্ডিতের নাম অনু-বাদক শ্রেণীর মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁহারা ৪৪৭ খানি গ্রন্থ চীনাভাষায় তর্জ্জমা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে উক্ত সংখ্যার মধ্য হইতে ১৫৩ খানি ব্যতীত সবগুলিই লোপ পাইয়াছে। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা লেখক-দের ২০ খানি অনূদিত গ্রন্থ ত্রিপিটকে পাওয়া যায়। ৎসিন্ রাজবংশের অনুবাদকগণের গ্রন্থের মধ্যে মহাযানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিচিত্র মত-প্রতিপাদক পুঁথি, এমন কি ধারণী, মন্ত্র ও তন্ত্র গ্রন্থও দুইএকখানি—চীনে আনীত হইয়াছিল।

এই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক হইতেছেন ধর্ম্মরক্ষ বা চু ফা-হু। তিনি চীনের পশ্চিমস্থিত কাংসু প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন এবং জাতিতে ছিলেন যু-চি। বাল্যে তিনি কোনো এক 'বৈদেশিক' শ্রমণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দেশ পর্য্যটনে বাহির হন। মধ্য-এশিয়ার বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া বোধ হয় তিনি ভারতবর্ষও পরিদর্শন করিয়া যান। এই ভ্রমণ ৩৬টি ভাষা ও উপভাষা শিক্ষা করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে ২৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি লোয়াঙে আসিয়া শ্বেতাশ্ব-বিহারে আসেন ও ৭৮

বৎসর বয়সে চীনেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ধর্ম্মরক্ষ ২১১ খানি গ্রন্থ সর্ব্বসমেত অনুবাদ করেন; নব্বই খানি ব্যতীত সকলগুলি নষ্ট হইয়াছে। তাঁহার অনুবাদিত গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'বৈপুল্য' গ্রন্থরাশি। বৈপুল্য গ্রন্থরাশি এ পর্য্যন্ত চীনা ভাষায় ভাষান্তরিত হয় নাই। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক, ললিতবিস্তর উল্লেখযোগ্য। সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর হইতেছেন প্রধানতম বোধিসত্ত্ব। ধর্ম্মরক্ষ চীনে অবলোকিতেশ্বরের পূজার প্রবর্ত্তনের জন্য আংশিকভাবে দায়ী। অবলোকিতেশ্বরের চীনা হইতেছে কুয়ান্-শি-য়িন্ অর্থাৎ যিনি বিশ্বের ক্রন্দন শুনিতেছেন; জগতের অনুতাপ, প্রার্থনা কিছুই যাঁহার অগোচর নহে। অমিতাভের নিকট প্রার্থনা করিলে যেমন মুক্তি হয়, অবলোকিতেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে সর্ব্ব পার্থিব অকল্যাণ, ব্যাধি, কষ্ট হইতে ভক্ত মুক্ত হয়। অসীম করুণা সম্পন্ন অবলোকিতেশ্বর বিশ্বের ত্রাণের জন্য নানারূপে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিতেছেন; যে মূর্ত্তিতে ভক্ত মুক্তিলাভ করিতে পারে সেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে তিনি সদাই প্রস্তুত। এই পূজা প্রবর্ত্তন ব্যতীত ধর্ম্মরক্ষ চীনদেশে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পূজা প্রবর্ত্তন করিবার জন্যও দায়ী। তাঁহার অনূদিত উল্লম্বন-সূত্র এই মত প্রচারে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল। ধর্ম্মরক্ষের বিপুল গ্রন্থরাশির উল্লেখ ও সেগুলির সমালোচনা করিতে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

ৎসিন যুগের (২৬৫—৩১৬) অন্যান্য অনুবাদকগণের মধ্যে পার্থিয়াবাসী ওান্ ফা-চি'ন বিশেষভাবে স্মরণীয় তাঁহার অশোক-অবদানের অনুবাদের জন্য। অশোক অবদান সংস্কৃতে আছে; পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রলাল এই গ্রন্থের বিস্তৃত বিশ্লেষণ দিয়াছেন। চীনভাষায় দুইখানি তর্জ্জমা পাওয়া যায়। পোলীশ পণ্ডিত চিলিস্কি (J. Przyluski) চীনা অনুবাদদ্বয় ও মূল সংস্কৃত অবদানগুলি বিচক্ষণতার সহিত অধ্যয়ন করিয়া ফরাসীভাষায় এক সুবৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে এই গ্রন্থখানি মথুরায় সর্ব্বাস্তিবাদীদের দ্বারা গ্রথিত হয়।

ৎসিন যুগের অন্যান্য অনুবাদকগণের মধ্যে হিন্দু-সু-লান্ প্রবাসী ভারতবাসী ছিলেন, তাঁহার পিতা ও পিতামহ ভারত হইতে গিয়া চীনে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ফা-লি (ধর্ম্মবল ?) ফা-যু, ফা-চু প্রভৃতির নাম দেখিয়া মনে হয় যে তাঁহারা বৌদ্ধ হইয়া সাম্প্রদায়িক নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন— 'ফা' এই শব্দের অর্থ হইতেছে 'ধর্ম্ম'। ফা-লি বিঘ্নকৃত ধম্মপদের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ অথকথা সমেত প্রকাশ করেন। ফা-লির এই ধম্মপদ ও তাহার অথকথাই পণ্ডিতপ্রবর বীল (Beal) প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কয়েকজন খাশ চীনা ভিক্ষুও এই সময়ে অনুবাদ করিয়া যশস্বী হন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে চীনের রাজনৈতিক জগতে খণ্ড খণ্ড বহু ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া উঠিল; ইহাদের অধিকাংশই বৈদেশিক তাতারজাতীয়। ইহারই মধ্যে 'চাও' রাজবংশের প্রথম সম্রাট্ শি-লো (২৭৩—৩৩২ খৃঃ অঃ) বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকল্পে বিশেষভাবে সাহায্য করেন; তাঁহারই রাজসভার বিখ্যাত হিন্দু তান্ত্রিক (বুদ্ধদান্) ফো-তু'-চাও খুব সম্ভব কুচাদেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি দুইবার কাশ্মীরে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। ৩১০ খৃষ্টাব্দে তিনি চীনে উপনীত হন। বুদ্ধদান (?) যে কোনো গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া যশস্বী ও চীনা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহার অলৌকিক তান্ত্রিক শক্তি বলে তিনি চীনা সম্রাট ও জনসাধারণের মধ্যে অতিশয় লোকপ্রিয় ছিলেন। পরবর্ত্তী সম্রাট শি-হুর উপর বুদ্ধদানের প্রভাব প্রচুর ছিল। তাঁহারই প্ররোচনায় সম্রাট তাঁহার চীনা প্রজাগণকে ভিক্ষু হইবার অনুমতি দান করিয়া এক অনুশাসন প্রকাশ করেন। এইখানে একটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন; চীনে কুং-ফু-ৎসুর প্রভাব প্রবল; চীনাদের সমাজতন্ত্রের ভিত্তি হইতেছে কুং-ফু-ৎসুর দর্শন। ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্র—এই তিনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপর চীনা সভ্যতার প্রতিষ্ঠা। সেই আদর্শানুসারে প্রত্যেক অধিবাসী রাজ্যকে সেবা করিতে বাধ্য। সুতরাং শি-হুর এই অনুশাসনের মূল্য ভারতীয় কৃষ্টি প্রচারের দিক হইতে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইহার ফলে চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে 'চাও' রাজত্বকালে উত্তরপশ্চিমচীনের শতকরা নব্বইজন অধিবাসী বুদ্ধের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এইখান হইতে ৩৭২ খৃষ্টাব্দে

বনফুল

কোরিয়া দেশে বুদ্ধের বাণী চীন বৌদ্ধগণকর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। চীন বুদ্ধের বাণী গ্রহণ করিয়া স্বয়ং প্রচারকের আসন গ্রহণ করিল ও তাহারই প্রচারের ফলে কোরিয়া ও পরে জাপান ভারতের ঋষির প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল।

উত্তর চীনে তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রাজ্য—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহাদের এক রাজ্যে নব 'ৎসিন্' (Tsin) রাজবংশ কিছুকালের জন্য প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। এই রাজাদেরই একজন হিন্দুপণ্ডিত কুমারজীবের পৃষ্ঠপোষক-রূপে ইতিহাসে খ্যাত হইয়াছেন। কুমারজীব ভারতীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে অগ্রণী, তাঁহার সম্বন্ধে আগামী বারে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব, কারণ হিন্দুভারতের এত বড় একজন মনীষি-ব্যক্তির বিজয়-কাহিনী সংক্ষেপে বলিবার নয়।

সার্থকতা

আমার অতীত জীবনের দিকে চাহিয়া দেখি—আর আমার দুঃখ হয়! সে যেন একটা সুখ-স্বপ্ন ছিল! সেই আমার অতীত জীবনের স্মৃতি.....আজ সত্য সত্যই স্মৃতি-মাত্র। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার সে জীবন গেল কোথায়? সেই শোভন, সুন্দর, মোহন জীবন।

......একদিন আমার রূপ ছিল—সৌরভ ছিল—মধু ছিল। আমার সেই সুষমার দিনে কত মধুলুব্ধ ভ্রমরই না আমার কানে কানে বন্দনার স্তুতিগান তুলিয়াছে!...... তাহারা আজ কোথায়?

.....এই আকাশ বাতাস আলো একদিন কতই না ভালো লাগিয়াছে! একদিন ইহাদের লইয়া সত্যই আমি পাগল হইয়া থাকিতাম..... আজ কোথায় গেল আমার সেই পাগলামি......সেই সহজ উন্মাদনা—ছন্দময়ী ভাল-লাগার নেশা! আজ কই তারা সব?

......আজ আমি পরিপক্ক—অভিজ্ঞ। আমার সেই অতীতের তরল অনুভূতি জমিয়া যেন কঠিন হইয়া গিয়াছে।

আমার আজ কেবলই মনে হইতেছে..... আমার অতীত আর ফিরিবে না জানি—কিন্তু ভবিষ্যৎ? সে কেমন—কি জানি! আমার আনন্দময় অতীতকে হারাইয়া আজ এই যে, পরিপক্ক অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছি—ইহার পরিণতি কি?—ইহার সার্থকতা কোথায়?

*　*　*　*

গাছের একটি পাকা ফল এই সব ভাবিতেছিল। হঠাৎ বাতাসের দোলায় মাটিতে পড়িয়া গেল।......একটি পাখী আসিয়া ঠোঁটে করিয়া ফলটি লইয়া একটি ডালে বসিল এবং পরম আনন্দে ঠোকরাইয়া খাইতে লাগিল!

"বনফুল"

গোলাপের কথা

—রূপক—

এস, ওয়াজেদ আলি

বাগানে একটী গোলাপ ফুল ফুটেছিল। যেমন তার রংএর বাহার, তেমনি গন্ধ। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে এক বুলবুল খুব কাছের একটী গাছের ডালে এসে বসলো, আর প্রণয়-গদ্‌গদ্‌ ভাষায় বললে, "ওগো গোলাপ সুন্দরি, তোমায় দেখে আমি একেবারে বিহ্বল—পাগল হ'য়ে গেছি। নিশি-দিন কেবল তোমারই স্বপ্ন দেখছি, আর তোমার কথাই ভাবছি। তোমায় ছেড়ে এত দিন কি করে বেঁচে ছিলুম, আমি তা বুঝতে পারছি না। আমার মন আমায় বলছে, তোমায় ভালবাসবার জন্যই আল্লা আমায় সৃষ্টি করেছেন। এ ছাড়া আমায় সৃষ্টি করার তাঁর অন্য উদ্দেশ্য থাকতেই পারে না! প্রিয়া আমার, দয়া করে তোমার রাঙ্গা মুখখানি তুলে আমার পানে একবার চাও। তোমার হাসি-মাখা মুখ দেখে জীবন আমার সার্থক করি।"

বুলবুলের এই প্রীতি-মাখা কথা শুনে গোলাপের মুখে আপনা থেকেই হাসি ফুটে উঠলো। সে ভাবলে, কি মিষ্ট এই বুলবুলের কথা, আর কি সরস এর প্রাণ! আমার অন্তর ওকেই চায়, ওর অন্তরও দেখছি আমাকেই চায়! আল্লা নিশ্চয় পরস্পরকে ভালবাসার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এ ছাড়া তাঁর কি আর উদ্দেশ্য থাকতে পারে!

হঠাৎ বুলবুলের ডানা দুটীর উপর তার নজর পড়লো। সংশয়ের কালো মেঘ এসে ক্ষণেকের জন্য তার মনকে আচ্ছন্ন করে তুললো। সে ভাবলে, তাইতো, ওর যে ডানা রয়েছে! ওতো আমার মত এক যায়গায় বসে থাকবে না। উড়ে বেড়ানোই যে ওর স্বভাব! আজ ও আমায় ভাল বাসছে, কাল হয়তো আর কাকেও ভাল বাসবে। আমার কথা তখন ওর মনেও থাকবেনা!"

বুলবুলের দিকে তার সুন্দর মুখখানি তুলে অনুযোগের স্বরে গোলাপ বললে, "আজ আমায় অমন কথা বলচো, কাল হয়তো আর কাউকে ঠিক এই সব কথাই বলবে। আমার কথা তখন তোমার মনেও থাকবে না!"

একান্ত আদরে গোলাপের মুখে চুম্বন বর্ষণ করে আর্দ্র কণ্ঠে বুলবুল বললে, "কখনও না! তোমার এই লাল ঠোঁটের কসম, কখনও না! তুমি ছাড়া কখনও কাউকে আমি ভালবাসিনি আর কখনো বাসবও না! যতদিন বাঁচবো, ততদিন আমি তোমারই ধ্যান করবো। আর বিধিনির্ব্বন্ধে যখন এই নশ্বর জীবন আমায় ছেড়ে যেতে হবে, তখন দেখবে তোমারি কথা ভাবতে ভাবতে আমি মরেছি।"

মরণের কথায় গোলাপের প্রাণ কেমন আতঙ্কে শিউরে উঠলো! তার অভিমান সে একেবারে ভুলে গেল। প্রেম-গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে বুলবুলকে সম্বোধন করে সে বললে, "তোমায় কি অবিশ্বাস করতে পারি, প্রিয়তম? তোমার জন্য আমি জন্মেছি, আর তুমিও আমার জন্যই জন্মেছ! কেবল এই পৃথিবীতে কেন, আমাদের আত্মা যখন তাদের নশ্বর দেহ ত্যাগ করে অমর লোকে চলে যাবে, তখন সেখানেও তোমায় আমি এখনকার মতই ভালবাসবো। আমার ভালবাসায় কোন প্রভেদ হবে না। যুগ যুগ ধরে এ ভালবাসা এমনি অটুট থাকবে। তুমিও চিরকাল আমায় এমনি ভালবাসবে, প্রিয়?"

বুলবুল বললে, "গোলাপ সুন্দরী! তুমি ছাড়া আর কাউকে আমি কখনও জানিনি, আর জানবোও না। অনন্ত কাল আমি তোমারই প্রেমের দাসানুদাস হয়ে থাকবো।"

প্রেমের আবেশে তারা সব ভুলে পরস্পরের অধর-সুধা পান করতে লাগলো, বিহ্বল, বিবশ…।

বিকালে এক প্রেমিক বাগানে এল—তার প্রিয়ার জন্য একটি গুলদাস্তা (ফুলের তোড়া) তৈয়ার করতে। ফুল তুলতে তুলতে সে সেই গোলাপের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। সদ্যফোটা সুন্দর গোলাপটীকে দেখে সে বললে, "কি সুন্দর ফুল! মাশুক আমার এ ফুল পেলে কত খুশী হবে! গুলদাস্তার ঠিক মাঝখানে একে রাখতে হবে।" গোলাপ-টীকে সে ডাল থেকে ভাঙতে উদ্যত হল।

গোলাপের কথা

এস্ ওয়াজেদ আলি

"ওগো আমায় এখান থেকে সরিও না গো, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় এখান থেকে সরিও না! আমাকেও যে একজন ভালবাসে! আমায় দেখতে না পেলে সে কেঁদে কেঁদে মরে যাবে"—বলতে বলতে করুণ নেত্রে গোলাপ সেই নিষ্ঠুর প্রেমিকের দিকে চাইলে। সে কিন্তু ফুলের সে ভাষা বুঝলো না। তিল মাত্র ইতস্ততঃ না করে গোলাপটীকে ডাল থেকে ভেঙ্গে সে তার গুলদাস্তার সামিল করলে।

গুলদাস্তাটী মাশুকের সামনে পেশ করে কোমল মধুর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে প্রেমিক বললে, "প্রেয়সি! সদ্য ফোটা এই গোলাপটি দেখে তোমার টুকটুকে মুখখানির কথা আমার মনে পড়ছিল। এটিকেও তাই গুলদাস্তার সামিল করে তোমার জন্য নিয়ে এসেছি। ফুলের এ সৌন্দর্য্য একদিন বই থাকবে না; আমার ভালবাসা কিন্তু অনন্তকাল এই ফুলের মতই ফুটে থাকবে।"

মাশুক বললে, "কি বললে, প্রিয়, অনন্তকাল? হায় —দুদিন পরেই তুমি আমায় ভুলে যাবে! নূতন মাশুককে তখন নূতন গুলদাস্ত উপহার দেবে! আমার কথা তখন তোমার মনেও থাকবে না!"

আবেগ বিগলিত কণ্ঠে প্রেমিক বললে, "ছি প্রেয়সি! আমায় তুমি এমন অপদার্থ মনে কর! তুমি ছাড়া জীবনে আমি কাউকে কখনও ভালবাসিনি, আর বাসবোও না। আমার অন্তর আমায় বলছে, তোমায় ভালবাসবার জন্যই আল্লা আমায় সৃষ্টি করেছেন, আর আমায় ভালবাসবার জন্য তোমায় সৃষ্টি করেছেন। অনন্তকাল ধরে আমার অন্তরের সমস্ত ভালবাসা দিয়ে তোমায় আমি ভালবাসবো। তোমারই মোহিনী মূর্ত্তি জন্ম-জন্মান্তরে আমার হৃদয়পটে বিরাজ করবে। আর কারও সেখানে কখনও স্থান হবে না।"

ঘন কম্পমান সুরভি নিশ্বাসে প্রেমিকের প্রাণে আনন্দের এক অবর্ণনীয় হিল্লোল তুলে মাশুক তার ওষ্ঠাধরে চুম্বন রেখা অঙ্কিত করে বললে, "প্রিয়তম, অনন্তকাল ধরে তোমায় আমি ভালবাসবো—আমার অন্তরের সমস্ত ভালবাসা দিয়ে তুমিই আমার হৃদয়ের একমাত্র অধীশ্বর হয়ে থাকবে। আর কারও কথা কখনও স্বপ্নেও আমি মনে আনবো না।" হৃদয়ের আবেগে প্রেমিক দুই বাহু দিয়ে মাশুককে তার বুকের মধ্যে চেপে ধরলে।

আপন মনে গোলাপ বললে, "হায়, আমাদের ভালবাসাও ঠিক এই রকমই ছিল! কিন্তু নিয়তির কি নিষ্ঠুর বিধান! আমার প্রাণের বুলবুলের সঙ্গে এ জন্মে আর দেখা হবে না! মৃত্যুর পর, হে আল্লা, আবার যেন তাকে দেখতে পাই।" দুঃখের ভারে, গোলাপের মাথা নুয়ে পড়লো।

প্রেমিক বললে, "আহা গোলাপটী নুয়ে পড়েছে। ওকে আলাদা একটি ফুলদানিতে রেখে দেও, না হলে বেচারা শুকিয়ে যাবে।"

আনন্দের বিচিত্র তরঙ্গ তুলে সুন্দরী সেই পুষ্পগুচ্ছ নিয়ে তার শয়নাগারে চলে গেল, আর সযত্নে গোলাপটীকে একটি সুন্দর ফুলদানীতে সাজিয়ে জানালার পাশে রেখে দিলে। গোলাপ বেচারা বাগানের দিকে চেয়ে ব্যথাতুর মনে তার বুলবুলের কথাই ভাবতে লাগলো।

সূর্য্য ধীরে ধীরে অস্তাচলে গেলেন। রাত্রির অন্ধকার এসে সমস্ত বাগানের উপর তার কালো পর্দা বিছিয়ে দিলে। বিরহ-বিধুর গোলাপ অশ্রুসজল চোখে সেই ফুলদানিতে ঘুমিয়ে পড়ল। তার প্রণয়ীর সঙ্গে সেদিন আর তার দেখা হলো না।

যখন সকাল হ'ল, গোলাপের পাপড়িগুলি তখন শুকিয়ে আসছিল। মৃত্যুর তন্দ্রায় তার দুই চোখ ঢল ঢল করছিল। সেই অন্তিম তন্দ্রার ঘোরে এক এক বার তার প্রেমিকের সেই কমনীয় মূর্ত্তি চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ছিল। বেদন-বিধুর কণ্ঠে সে ডাকছিল, "হে আল্লা, মরণের আগে একবার যেন তাকে দেখতে পাই! আমার এই শেষ প্রার্থনা তুমি পূর্ণ করো, দয়াময়!"

তরুণ সূর্য্যের অরুণ রাগে বাগান যখন জল্‌জল্ করে উঠলো, প্রকৃতির মুখে যখন নূতন জীবনের নূতন হাসি দেখা দিলে, মুমূর্ষু গোলাপটীও তখন ক্ষণেকের জন্য নূতন আশায়, নূতন আকাঙ্ক্ষায় সঞ্জীবিত হল। ব্যগ্র উৎসুক নয়নে সে বাগানের দিকে চাইলে—তার প্রেমাস্পদকে দেখবার জন্য!

ঐযে, বাগানের ঐ সবুজ পাতার মধ্যে তার প্রেমাস্পদের মুকুট-শোভিত শির ঐ দেখা যায়! মরণোন্মুখ গোলাপের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। জানালা থেকেই তার প্রেমিককে উদ্দেশ করে সে বললে, "প্রিয় আমার, নিষ্ঠুর নিয়তির নির্ব্বন্ধে আমাকে অকালে তোমায় ছেড়ে যেতে হচ্ছে। তুমি কিন্তু আমায় ভুলনা প্রিয়তম, পরলোকে তোমার জন্য ব্যাকুল প্রাণে আমি প্রতীক্ষা করবো। সেখানে আবার আমাদের মিলন হবে।" বুলবুলকে ভালো করে দেখবার জন্য কষ্টে সে তার মাথা একটু উঁচু করে বাগানের দিকে চাইলে। এক মর্ম্মান্তিক দৃশ্য তার অন্তরকে শেলের মত বিদ্ধ করলে। তার সাধের বুলবুল মোহমুগ্ধ দৃষ্টিতে এক সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের দিকে চেয়ে আছে। মুখে তার লালসার আবেশ!

"একি, এর অর্থ কি!" বলতে বলতে মুমূর্ষু গোলাপ তার সমস্ত শক্তিকে ক্ষণিকের জন্য পুঞ্জীভূত করে বাগানের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। বুলবুলের কণ্ঠস্বর তার কাণে এল। বীণানিন্দিত কণ্ঠে সে সেই বাগানের সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপকে সম্বোধন করে বলছিল, "ওগো গোলাপ সুন্দরি, তোমায় দেখে আমি একেবারে পাগল হয়ে গেছি। নিশিদিন কেবল তোমারই স্বপ্ন দেখছি, আর তোমার কথাই ভাবছি। তোমায় ছেড়ে এতদিন কি করে যে বেঁচে ছিলুম, আমি তো তা বুঝতে পারি না। আমার অন্তর আমায় বলছে, তোমায় ভালবাসবার জন্যই আল্লা আমায় সৃষ্টি করেছেন। এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকতেই পারে না। প্রিয়া আমার, দয়া করে তোমার রাঙ্গা মুখখানি তুলে আমার দিকে একবার চাও। তোমার হাসিমাখা মুখখানি দেখে জীবন আমার সার্থক করি।"

জানালার গোলাপের চোখ দুটী আপনা থেকেই বুজে এল। আর্ত্তের শেষ ভরসা সেই করুণাময়কে স্মরণ করে সে বললে, "আল্লা! আর আমায় যাতনা দিও না। শীঘ্র আমায় ডেকে নাও।"

তরুণ তরুণীও ঠিক সেই সময়ে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করলে। ফুলটীকে দেখে তরুণী করুণকণ্ঠে বললে, "আহা, বেচারী মারা গেছে!"

তরুণ বললে, "ফুলের জীবন একদিনের, মানুষের জীবন দুদিনের, প্রেমেরই কেবল মৃত্যু নাই।"

তরুণের ওষ্ঠাধরে আবেগ ভরা একটী চুম্বন অঙ্কিত করে তরুণী বললে, "আমিও ঠিক ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলুম, প্রিয়! ঐ শোন, বাগানে বুলবুল কি মধুর কণ্ঠে প্রেমের মহিমা কীর্ত্তন করছে। বুলবুলই হচ্ছে জগতের আদর্শ প্রেমিক!"

অনুযোগের স্বরে তরুণ বললে, "আর আমি?"

তরুণকে তার কোমল বাহুপাশে আবদ্ধ করে তরুণী বললে, "তুমিই আমার বুলবুল!"

তরুণীর ইয়াকুতের মত ওষ্ঠাধরে তরুণ চুম্বনের পর চুম্বন বর্ষণ করতে লাগলো।

মরণোন্মুখ গোলাপটীর মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল। কষ্টে তার মুখ আকাশের দিকে তুলে "প্রভু হে, তোমার সৃষ্টির মর্ম্ম তুমিই বোঝ" বলতে বলতে মৃত্যুর অনন্ত নিদ্রায় সে তার চোখ দুটী মুদ্রিত করলে।
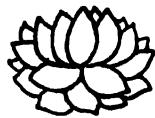
পলিটিক্স

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

পলিটিক্সটা সম্পূর্ণ বিলাতী আমদানী।

প্যারিসে ও ম্যান্‌চেষ্টারে তৈয়ারী বেণারসী কাপড়ের মতনও দেশী গন্ধ এতে নেই।

সেজন্য ওটা এদেশে হোল একটা আগাছা।

দামী বিলিতি ছাঁটের কাপড় কিনে যেমন বিপদ ঘটে। দেশী পোষাকের সঙ্গে বেমানান। আবার খুলে রাখলেও গা' থাকে নগ্ন।

পলিটিক্সও হয়েছে তেম্‌নি। না পারি তাকে রাখ্‌তে না পারি ছাড়তে।

তাই ওটা হোয়ে দাঁড়াল একটা কারবারী জিনিষ।

ওটা নিয়ে লোকে বক্তৃতা করে। খবরের কাগজে লেখা-লিখি চলে। বাদ-প্রতিবাদ হয়। চাঁদা ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে আমদানী হোল পলিটিক্স-এর নীতি।

মডারেট এক্সট্রিমিষ্ট দেখা দিল। স্বরাজ্যদলের সৃষ্টি হোল। হিন্দুসভা, মোস্‌লেম লীগ চল্‌ল।

একদল লোক বল্লেন, ইংরাজদের সঙ্গে প্রেমের বন্ধন হোক্।

কিন্তু সাধারণে দেখ্‌লে, ইংরাজেরা থাকে চৌরঙ্গীতে, চড়ে মোটর গাড়ী। বড় বড় চাকরী করেন তাঁরাই। মস্ত মস্ত কারবার গুলোও তাঁদের হাতে। সুতরাং প্রেম হোল না, হোল বিদ্বেষ।

বিদ্বেষ কিন্তু ইংরাজদের গায়ে লাগ্‌ল না। কারণ তাঁদের বন্দুক আছে, কামান আছে। পিনাল কোড আছে। পুরানো-নূতনে মিলিয়ে রেগুলেশনও অনেক গুলো।

বিদ্বেষ ফিরে এসে লাগ্‌ল নিজেদেরই গায়ে।

ফলে হোল হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া।

কোনো পলিটিক্সই তার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারলে না।

পলিটিক্স না পারল প্রেম বাড়াতে, না পারল বিদ্বেষ কমাতে। এক-তরফা প্রেম হয় না।

আর বিদ্বেষের হেতু গুলো লুপ্ত না হলে বিদ্বেষ দূর হয় না।

সুতরাং বিদ্বেষ তাড়াতে গেলে ভাল করে করতে হবে অর্থ-চর্চ্চা। এই ধর্ম্মপরায়ণ দেশে জোর গলায় ব'লে বেড়াতে হবে, অর্থ কেবল অনর্থ নয়।

ধর্ম্ম হচ্ছে অর্থকে নিয়ে, বাদ দিয়ে নয়।

পণ্ডিতদের ব'ল্‌তে হবে এটা মোটেই বিদেশে শেখা বিলিতি বুলি নয়। খাঁটি দেশী কথা।

অর্থের উন্নতি করতে গেলে শরীরটাকে প্রথমে করতে হবে ইংরাজদের মতন মজবুত। মনটাকেও করতে হবে তাদেরই মত দৃঢ়।

সাহেবী পোষাক কেতা-দুরস্ত ক'রে প'রে নয়, বিশুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণ করতে শিখে নয়। সব রকমের জড়তা ত্যাগ ক'রে।

আর প্রেম বাড়াতে গেলে আন্‌তে হবে সত্যিকারের শ্রদ্ধা।

সেটা নির্ভর করে মানসিক উৎকর্ষের উপর।

সত্য ধর্ম্ম দেশে ফিরিয়ে আন্‌তে হবে। পুঁথি-পড়া অনুষ্ঠান দিয়ে আর কাজ চল্‌বে না।

বড় সাহিত্যের সৃষ্টি করতে হবে। সতী স্বাধ্বী গণিকার জীবন চরিত লিখে নয়।

চাই শিল্প-কলার প্রচার। হাল্কা প্রেম-লীলার চিত্র এঁকে নয়। সর্ব্বাগ্রে চাই সব বিষয়ে কঠোর সংযম।

আর প্রয়োজন বিজ্ঞানের প্রসার। ল্যাবরেটরীতে কেবল রিশার্চ নয়। সমস্ত দেশে জ্ঞানের বিশেষ প্রচার।

যাতে এই অজ্ঞান দূর হবে সে জ্ঞানের কোনো দেশ নাই, জাতি নাই, সমাজ নাই।

ঐ দুই ছাড়া আর উপায় নাই। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

পলিটিক্সের দ্বারা এর সিদ্ধি নাই। কারণ পলিটিক্স হচ্ছে অবিদ্যা। আর অবিদ্যা ভজনের ফল সম্বন্ধে শাস্ত্রে উপদেশ আছে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।

পাখীর প্রাণ

(জাপানী হইতে)

শ্রীরামেন্দু দত্ত

সোণার খাঁচায়
ধরা ছিল ছোট
টুক্ টুকে পাখী রাঙা!
ছিল, সোণার খাঁচায় সে!

তরুণ প্রাতের
অরুণ কিরণ,
বিশাল-আকাশ-ভাঙা!
এলো, তা'রি জানালায় যে!

সুনীল, কোমল,
আকাশের হিয়া
কামনার শোভাময়;
তা'রি তরে পাখী
উঠে ডাকি' ডাকি'!
সুখে আরো রাঙা হয়!

তাহারে দেখিয়া
বলাবলি করে
পথের পথিক যত!
বলে, "ঐ যে পাখীটি গো!

আমাদেরো হায়
হ'ত যদি প্রাণ
ঐ পাখীটির মত!
আহা, কত সুখে আছে ও!"

তা'রা যে জানেনা
পাখীটির প্রাণ!
তাই ত একথা বলে!
পাখীর প্রাণটি
জানিবে কেমনে
পথে পথে যা'রা চলে!

১৩

ভূপতি চলিয়া গেলে সুরমা যেন অসাড় নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া পড়িল। আর সে পারে না সহিতে। যাকে সে কৈশোরের আরম্ভ হইতে দেবতা বলিয়া পূজা করিয়াছে, যাকে দেবতা জানিয়া তার হৃদয় আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে সেই প্রেমের প্রতিমা, জীবনের সেই একান্ত সাধনা—তাকে সে আজ প্রায় সাত বৎসর পায় পায় তার পূজার পীঠ হইতে সরিয়া যাইতে দেখিয়াছে। বুক পাতিয়া দিয়া সে তার গতিরোধ করিয়াছে, দুই পায় তার বুক দলিয়া পিষিয়া সে দেবতা চলিয়াছে,—পায় পায় অবনতির দীর্ঘ সোপান বাহিয়া– বুক তার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তবু সে বাঁচিয়া আছে। কিন্তু আজ তার স্বামী শুধু বাসনার কাছে আপনাকে বিকাইয়া পরিতৃপ্ত নন। আজ নীচতার অতলগহ্বরে নামিতে বসিয়াছেন, তুচ্ছ বিলাসের জন্য দেবতার মত ছোট ভাইকে তার বিষয়ে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তার বিশ্বাসের অপলাপ করিয়া তারই দেওয়া ক্ষমতার বলে তার সম্পত্তি বিলাইতে চাহেন। স্ত্রীর গহনা চুরী করিতে আসিয়াছেন। এত ছোট হইয়া গিয়াছে তার সে কৈশোরের দেবতা, এও কি তাকে সহিতে হইবে ?

আজ এক মুহূর্ত্তের জন্য তার আশা হইয়াছিল যে ভূপতির মনুষ্যত্ব বুঝি এইবার মাথা খাড়া করিয়া উঠিবে, বুঝি সে তার অপূর্ব্ব পৌরুষের পরিচয় দিয়া সকল কলঙ্ক হইতে বিমুক্ত হইবে। কিন্তু এখন সে আশা চুরমার হইয়া গিয়াছে। সে বুঝিয়াছে ভূপতি আজ জ্যোতির বিষয় বাঁধা রাখিতেই গিয়াছে—পিছল পথে সে যে পা দিয়াছে তাহা তুলিয়া লইবার সাধ্য তার নাই। তাই সে দ্বিগুণ হতাশার ব্যথা লইয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

জ্যোতি আসিতেই সুরমা সংযত হইয়া উঠিয়া বসিল। তার ব্যথা বড় কঠিন। কিন্তু ব্যথার লজ্জা যে তার চেয়েও বিষম। সে লজ্জা ঢাকিবার জন্য সে সমস্ত জগতের দিকে তার যে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ায় সে একটা কঠিন নির্ম্মমতা ও কঠোর বিদ্রোহের মুখোস—সে মুখোস তার প্রাণের ভিতর দাগ কাটিয়া বসিয়া যায়, রক্তের ভিতর তার বিষ ভরিয়া দেয় তবু নিদারুণ লজ্জায় সে তাকে ফেলিতে পারে না। জ্যোতির কাছেও সে তার অধীরতা পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত। তাই সে আপনাকে সংযত করিয়া উঠিয়া বসিল।

জ্যোতি আসিয়া বলিল, "বৌদি ডেকেছ কেন ?"

ম্লান হাসি হাসিয়া সুরমা বলিল, "না ডাকলে আস না ব'লে। জগতের আর যত দুঃখী তোমার বড় আপন ভাই, একমাত্র তোমার বৌদি ছাড়া।"

জ্যোতি বৌদির পায়ের কাছে বসিয়া বলিল, "তুমি আমার এমন কথা বলছো বউদি ?" সুরমার পায় মাথা ঠেকাইয়া সে বলিল, "তুমি তো জান তোমার চেয়ে বড় আমার কাছে কেউ নেই।"

সুরমা আবার হাসিল, বড় করুণ, বিষের ঝলকের মত সে হাসি। সে বলিল, "কই ভাই তার প্রমাণ কই ? কি করছো তুমি আমার জন্য ? কি করতে পার ?"

বিষণ্ণভাবে জ্যোতি বলিল "কিছুই কর্‌ছিনে। সে ক'রতে চাইনে ব'লে নয়, করবার কিছু খুঁজে পাইনে ব'লে। ব'লে দাও কি ক'রতে হবে। হুকুম ক'রে দেখ—কত বড় শক্ত কাজ আমি তোমার জন্য ক'রতে পারি।"

"হুকুম ক'রে দেখেছি। পথে কুড়ান ছেলেটির যত আব্দার তুমি রাখতে পার, কেবল আমার কথাই কাণে তোল না।"

"কবে কোন্ কথা শুনি নি তোমার বল ?"

"শুনবে ? আমি অনেক দিন ব'লেছি, আজ আবার বলছি। আজ আমার কথা রাখতে হবে। তুমি তোমার দাদার কাছে তোমার বিষয় বুঝে নাও, না দেন নালিশ কর।"

"ওঃ এই পুরোণো কথা। এ তো তোমার কাজ নয় বউদি,—এ আমার নিজের কাজ। তাই আমি এ করবো না। তোমার জন্য কি ক'রতে হ'বে তাই বল।"

"কিন্তু আজ এই কাজ আমার নিজের সব চেয়ে বড় কাজ হ'য়ে প'ড়েছে। আজ তোমায় এ কাজ ক'রতেই হ'বে। তুমি বিনোদবাবুর কাছে গিয়ে তাঁর পরামর্শ নিয়ে যা করবার কর ভাই।"

"মাপ কর বউদি, আমি এ কিছুতেই ক'রতে পারবো না। আমার ও বিষয়টুকু বরং তোমাকে প্রণামী দিচ্ছি।"

"শোন ঠাকুর পো ! এতদিন এ কথা তোমায় ব'লেছি তোমার দিক থেকে, আজ সত্যিই এটা আমার দরকার হ'য়ে প'ড়েছে তাই বলছি।"

"তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না—বুঝিয়ে বল।"

"তোমার দাদার ধার কত জান ?"

"কেমন ক'রে জানবো ? তবে শুনেছি অল্প নয়।"

"প্রায় সওয়া লাখ টাকা। তার মানে তাঁর যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে তবে তিনি আজ ঋণমুক্ত হ'তে পারেন। তাঁর বিষয় ত গেছেই, এখন তোমারটুকু নিয়ে তিনি টানাটানি ক'রছেন। সেটুকুও যদি যায় তবে—তবে আমি দাঁড়াব কোথায় ? খোকা দাঁড়াবে কোথায় ? তোমার দাদাই বা শেষে কোথায় আশ্রয় পাবেন !"

শুনিয়া জ্যোতি গম্ভীর হইয়া ভাবিতে লাগিল। একটু পরে সুরমা বলিল, "তিনি আজ গেছেন তোমার বিষয় বাঁধা দিয়ে আরও টাকা ধার ক'রতে। এখনো সময় আছে তাঁকে থামাবার। যাও ভাই।"

জ্যোতি একটু বিস্ময়ের সহিত বলিল, "আমার অংশ তিনি বাঁধা দেবেন কেমন ক'রে ? আমি তমঃশুক না সই ক'রলে তো হবে না।"

"তুমি নাকি তাঁকে পাওয়ার অব অ্যাটর্ণী দিয়েছ ?"

"ও—হাঁ, অনেকদিন আগে দিয়েছিলাম।"

"তবে তুমি যাও, এক্ষুনি গিয়ে সে পাওয়ার খারিজ ক'রে রাধাকিশেন বলে কে এক মাড়োয়ারী আছে তাকে খবর দেও। এখনও তবে রক্ষা করতে পারবে। বিনোদ বাবুকে ধ'রে তুমি সেই ব্যবস্থা কর গে।—তা ছাড়া তোমার আর তাঁর যে কোম্পানীর কাগজগুলো ছিল সেগুলো তিনি ভাঙ্গিয়েছেন, তারও যদি কোনও ব্যবস্থা হয় তাও কর গে।"

জ্যোতি অনেকক্ষণ ভাবিয়া শেষে বলিল, "না বউদি সে সব সুবিধা হবে না। আজ যদি দাদা আমার বিষয় বন্ধক দিতে গিয়ে থাকেন তবে সে খুব বিপদে পড়েই গিয়েছেন বোধ হয়, এ ছাড়া তাঁর অন্য কোনও উপায় নেই বলেই গিয়েছেন। এখন যদি আমি আম-মোক্তার নামা খারিজ করি তবে তিনি হয় তো বিপদে পড়বেন। হয় তো তিনি মহাজনদের ঐ সম্পত্তি দেখিয়েই টাকা নিয়েছেন, এমনও হ'তে পারে যে এখন ওটা না পেলে তারা ওঁর নামে ফৌজদারী ক'রে ওঁকে জেলে দিতে পারে।"

সুরমা এ কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। এতটা সে ভাবে নাই। কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে ব'লল, "তেমন যদি হয় তো সে পরে ভাবা যাবে। এমন যদি কিছু তিনি ক'রে থাকেন যে তাঁকে জেলে যেতে হবে, তাহ'লে আজ হ'লেও হ'বে, দুদিন বাদে হ'লেও হবে। তবু এখন তোমার সম্পত্তিটুকু রক্ষা কর"—

"কি বলছো বউদি ? আজ না হয় দাদা আমার উপর বিরূপ হ'য়েছেন, কিন্তু তিনিই যে আমাকে মানুষ ক'রেছেন। জীবনে যা কিছু বড়, সব যে আমি তাঁর কাছে পেয়েছি, তাঁকে দেখেই যে আমি চিরদিন নিজের জীবন গড়েছি।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

আজ তাঁর মতিগতি খারাপ হ'য়েছে ব'লে সে সব ভুলে যাব, নিজে গিয়ে তাঁর হাতে হাতকড়ি তুলে দেব? আশীর্ব্বাদ কর বউদিদি, এমন মতি যেন কখনও না হয়।"

সুরমার দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল। লক্ষ্মণের মত দেবর তার, রামের মত স্বামীও ছিল। হায় কেন এমন হইল?

চোখের জল মুছিয়া সুরমা শেষে বলিল, "না ভাই, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরদিন তোমারই মত থাক। আমি অতি ছোট মানুষ, ছোট্ট মন আমার—বুঝতে পারিনি তোমাকে তাই তোমাকে এমন কথা বলেছি। আমায় মাপ ক'রো।"

"ছি বউদি ও কথা ব'লে আমায় লজ্জা দিও না।" বলিয়া জ্যোতি মাথা নীচু করিল।

জ্যোতির সঙ্গে কথা কহিয়া সুরমার মনটা অনেকটা হালকা হইয়া গেল। তার মনকে খুব বেশী পীড়া দিতেছিল তার স্বামীর চরিত্রহীনতা। জ্যোতির চরিত্র-গৌরব ও মহত্ত্বের স্পর্শে তার মনের গ্লানি ধুইয়া একটা অপূর্ব্ব আনন্দের আভাস উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ সে জ্যোতির সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিল—তার সঙ্গে কথা কহিয়া যেন তার মনের দৃষ্টি ফিরিয়া গেল। টাকা পয়সাকে সে যত বড় করিয়া দেখিয়া পীড়িত হইয়াছিল, এখন তার মনে আর সেটা তত বড় তো র'হলই না, অত্যন্ত তুচ্ছ হইয়া গেল। এই ত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রফুল্লতা ও আনন্দ দেখিয়া সুরমার মনে এই ভাবটা খুব স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিল যে জগতে আর কিছুরই কোনও মূল্য নাই—কোনও কিছুর জন্যই দুঃখ নাই—এখানকার একটি মাত্র দামী জিনিষ মানুষ। নিজের ভিতর মানুষটি খাঁটি থা'কলে কারও কিছুই দরকার হয় না, কিছুর অভাবই পীড়া দিতে পারে না। জ্যোতির সঙ্গ এমনি করিয়া সুরমার মনের সব গ্লানি ধুইয়া দিল। সে অল্পক্ষণের মধ্যেই জ্যোতির আশ্রমের বিবরণে তন্ময় হইয়া ডুবিয়া গেল, আনন্দের সঙ্গে তার খুঁটি-নাটি লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

জ্যোতিকে বিদায় দিয়া সুরমা তার খোকার কাছে গেল। তাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া সে চুম্বন করিল, অনেকক্ষণ একান্তমনে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিল, ছেলে যে তার জ্যোতির মত হয়।

* * * *

এটর্ণী আফিসে বসিয়া ভূপতি তখন মরগেজ দলিল সই করিতেছিল।

* * * *

জ্যোতি সুরমার কাছে বিদায় লইয়া আশ্রমে গেল। সুরমার সান্নিধ্য হইতে দূরে গিয়া তার মনটা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, সুরমার সেই প্রথম দেখা ব্যথাকাতর মুখখানির কথা মনে হইয়া।

সে ভাবিল, ইহাই কি তার ঠিক হইতেছে? দাদার মুখ চাহিয়া সে যে আপনাকে পরিবার হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে, ভূপতির সর্ব্বনাশ চোখে দেখিয়াও তাতে বাধা দিবার কোনও চেষ্টা করিতেছে না, শুধু দুঃখ পাইতেছে। ইহাই কি উচিত? সুরমার দুঃখে শুধু সমবেদনাই কি সে দেখাইবে, তার প্রতিকারের কোনও চেষ্টা করিবে না?

মনে হইল ইহা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু কি যে কর্ত্তব্য তাও সে ভাবিয়া পাইল না। ব্যথাতুর চিত্তে বউদিদির মলিন মুখচ্ছবি বুকে বহিয়া সে কেবলি ভাবিতে লাগিল।

শেষে সে স্থির করিল বিনোদ বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করাই উচিত।

বিনোদ বাবু হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠাবান উকীল, সচ্চরিত্র, সদাশয়, বিনয়ী ও পরদুঃখকাতর। সাত বৎসর পূর্ব্বে ভূপতির তার চেয়ে বড় বন্ধু কেহ ছিল না। অনেকটা সময়ই তারা পরস্পরের সঙ্গে কাটাইত, অনেক কথাই তারা এক সঙ্গে ভাবিত, অনেক ভাল কাজ দুজনে মিলিয়া করিত। কিন্তু আজ ভূপতি তার দুয়ারও মাড়ায় না, তাকে দেখিলে এড়াইয়া পালায়।

ভূপতির অধঃপাতে জ্যোতি বা সুরমা যত ব্যথিত হইয়াছিল, বিনোদ তার চেয়ে কম ব্যথা পায় নাই। সে অনেক দিন ভূপতিকে তিরস্কার করিয়াছে, অনুনয় করিয়াছে, তাকে সঙ্গে রাখিয়া তার নেশা কাটাইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিছুই

হয় নাই। ফলে শুধু এই হইয়াছে যে ভূপতি তার ছায়া দেখিলে লুকাইয়া পড়ে। জ্যোতি যখন বিনোদের কাছে আসিল তখন বিনোদ সবে আফিস হইতে ফিরিয়াছে। জ্যোতিকে দেখিয়াই সে তাকে বলিল, "এই যে জ্যোতি, তোমাকে আমার বড্ড দরকার, আমিই তোমার কাছে যাব ভাবছিলাম। তুমি একটু বসো, আমি আসছি।"

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বিনোদ জ্যোতিকে লইয়া নিভৃত এক স্থানে বসিয়া তাকে বলিল, "আজ কাছারীতে খবর পেলাম তোমার দাদা তোমার সম্পত্তি মরগেজ ক'রে দিয়েছে। তা ছাড়া আরও খবর পেলাম যে সে তোমার নাম জাল ক'রে হুণ্ডী দিয়ে টাকাও ধার ক'রেছে। এর তো একটা প্রতিকার না ক'রলে হয় না।"

জ্যোতি বলিল, "আমিও সেই কথাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো ব'লে এসেছি। আপনি আমাকে একটা সুপরামর্শ দিন। দাদাকে আর বউদিকে রক্ষা করবার জন্য আমার কি করা উচিত? কি করতে পারি আমি?"

"আমি সে কথা ভেবেছি। প্রথম করা উচিত তোমার সম্পত্তি রক্ষা করা। তার জন্য ঐ দলিলটা বাতিল করবার জন্য একটা নালিশ ক'রতে হ'বে।"

"কিন্তু তাতে যদি দাদার কোনও বিপদ হয়।"

"তার মানে ওরা যদি মামলা ক'রে শেষে তোমার দাদাকে জেলে দেয়! সে ভালই হ'বে। একটা শক্ত রকম বিপদে না পড়লে তোমার দাদার মন ফিরবে না, এই আমার বিশ্বাস। কিছু শাস্তি তার পাওয়া দরকার হয়েছে। তা ওরা সে শাস্তি দেয় বেশ ভাল কথা, না হয়, শেষ পর্য্যন্ত তোমাকেই দিতে হ'বে।"

"তার মানে? আমি কেমন ক'রে শাস্তি দেব?"

"সেই কথাই তো বলছিলাম। ওই যে তোমার নাম জাল করে হুণ্ডী ক'রেছিলেন সেইজন্য তুমি ফৌজদারীতে একটা নালিশ ক'রতে পার। তার সাক্ষী প্রমাণ আমি সব পেয়েছি, আমারই এক মক্কেলের কাছে সে হুণ্ডী দিয়েছিল। কাজেই প্রমাণ ক'রতে বেগ পেতে হ'বে না।"

জ্যোতি উঠিয়া দাঁড়াইল। সে বলিল, "আপনি কি বলছেন বিনোদ দা', আমি করবো দাদার নামে নালিস— আমি তাঁকে জেলে দেব?"—

"আমি তো তা বলি নি। জেলে তাকে দেবার বোধ হয় দরকার হবে না। ফৌজদারী একটা হ'লেই সে শায়েস্তা হবে। তার পর এসব মোকদ্দমা আপোষে ফাঁসিয়ে দেওয়া যায়। যদি দেখতে পাই এমনি সে দুরন্ত হ'য়েছে, তবে আর জেলে পাঠাবার দরকার হবে না।"

"না দাদা, সে কাজ আমার দ্বারা হবে না।"

বিনোদ তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, বুঝাইল যে ইহা জ্যোতির কর্ত্তব্য। তার দাদা বউদিদি ও খোকার সর্ব্বনাশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলে সন্ন্যাসের গৌরব বাড়িবে না। শক্তি থাকিতে যদি সে প্রতিকার না করে তবে সে কাপুরুষ! কিন্তু কিছুতেই জ্যোতিকে বুঝাইতে পারিল না।

(১৪)

বিনোদের কাছে কোনও মনোমত উপদেশ না পাইয়া জ্যোতি রাস্তায় বাহির হইয়া আসিল। তার মন আরও অন্ধকার হইয়া গেল। বিনোদ তাহাকে বুঝাইবার জন্য অনেক কথা বলিয়াছিল, তাহা হইতে বুঝিয়াছিল যে ভূপতি এমন কতকগুলি অকার্য্য করিয়াছে যে জ্যোতি তার নামে নালিশ করুক বা না করুক, আজ হউক কাল হউক ভূপতিকে জেলে যাইতে হইবেই। এ কথা ভাবিতে সে শঙ্কিত হইল, মন বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তার মনে হইল তার আর নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিবার সময় নাই। নালিস সে করিবে না নিশ্চয়, কিন্তু সে স্থির করিল ভূপতিকে সামনা সামনি সব কথা বলিয়া তার পায় ধরিয়া হউক যেমন করিয়া হউক ফিরাইবে।

এই সকল স্থির করিয়া সে বাহির হইল ভূপতির সন্ধানে। সে থিয়েটারে গিয়া জানিল ভূপতি সেখানে নাই, খুব সম্ভবতঃ বিলাসের বাড়ীতে আছে। বিলাসের বাড়ীর ঠিকানা লইয়া সে সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

ভূপতি তখন সেখানে ছিল না। কোথায় সে, তাহা দ্বারোয়ান বলিতে পারিল না। কখন সে আসিবে তাহাও নিশ্চয় বলিতে পারিল না। সে বিলাসকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল।

বিলাস তখন তার সন্ধ্যাকালের বিলাস সজ্জা করিতেছিল। চুলের মনোরম বিন্যাস করিয়া সে রাশি রাশি সুগন্ধি উপকরণ লইয়া, চোখে মুখে ঠোঁঠে বিবিধ কৃত্রিম শোভার বিন্যাস করিতেছিল। যখন দ্বারোয়ান খবর দিল, তখন সে পাউডার পাফের শেষ পোঁচ দিয়া স্বভাবরক্ত ওষ্ঠাধরে লিপ্ষ্টিক্ দিয়া রং লাগাইতেছিল। কাপড় চোপড় পরা তখনও তার হয় নাই, একখানা সাড়ী ও ব্লাউজ পাশে গুছান রহিয়াছে।

দ্বারোয়ানের কাছে শুনিল একজন লোক বাবুর খোঁজ করিতে আসিয়াছে, বাবু কখন আসিবে জানিতে চায়। বিলাস ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, "কখন আসবে সে মুখপোড়া কে জানে? আজ আবার কোথায় কোন রঙ্গে আছেন তার ঠিকানা আছে?"—

দ্বারোয়ান মুখ ফিরাইতেই সে বলিল, "হাঁ লোকটি কে জিজ্ঞাসা ক'রে রাখ—আর কি দরকার যদি সে বলে তো জেনে রেখো।"

দ্বারোয়ান জ্যোতিকে বলিল যে মাইজী তার নাম ও তার কাম জানিতে চাহিয়াছেন।

জ্যোতির একটা খেয়াল হইল। সে বলিল, "বলগে আমি বাবুর ভাই, আমার যে কাজ আছে, তা' তাঁকে বললেই হবে।"

বিলাস এ খবর শুনিয়া খুব ব্যস্তভাবে, অসীম যত্নের সহিত প্রসাধন সারিয়া লইল। যে সাড়ী সে পরিবার জন্য গুছাইয়া রাখিয়াছিল তাহা নামঞ্জুর করিয়া আলমারী বাছিয়া একজোড়া দামী সাড়ী ব্লাউজ বাহির করিয়া পরিপাটি করিয়া পরিল। ড্রইংরুমে ততক্ষণ জ্যোতি বসিয়া রহিল।

প্রসাধন শেষ করিয়া যখন বিলাস হাসিমুখে ঘরে প্রবেশ করিল, তখন জ্যোতি চমকাইয়া উঠিল। বিলাসের তাজা ঝকঝকে প্রশান্ত মুখশ্রীর দিকে চাহিয়া তার বিস্ময়ের অবধি রহিল না যে এই মধুর নির্ম্মল রূপরাশির ভিতর এতবড় একটা কালসাপিনী লুকাইয়া আছে।

বিলাসও তাহাকে দেখিয়া একটা ধাক্কা খাইল—জ্যোতির মুখের দিকে চাহিয়া সে মুগ্ধ হইল,—তেজঃপুঞ্জ শক্তিমান পুরুষের মূর্ত্তি সে।

হাসিয়া তার ব্যবসায়-সুলভ মনোমুগ্ধকর ভঙ্গীতে বিলাস বলিল, "বড় সৌভাগ্য আমার, তোমার পায়ের ধুলো আমার বাড়ীতে প'ড়েছে ঠাকুর পো! তা যখন দয়া ক'রে এসেছ, তখন একটু মিষ্টিমুখ ক'রে যেতে হবে কিন্তু ব'লে রাখছি।" ব'লিয়া হাসিয়া কটাক্ষ করিল।

জ্যোতি অনাবশ্যক কঠোরতা প্রয়োগ না করিয়া বলিল, "দেখুন, ও সব উৎপাৎ ক'রবেন না। খাবার টাবার আমি খাই না। বসুন আপনি। আপনার কাছে আমি খুব ভারী দরকারে এসেছি, আমার গোটাকয়েক কথা আপনাকে শুনতে হবে।"

বিলাস বসিল।

জ্যোতি বলিল "দেখুন অনেক দিন অনেক নোংরা জিনিষ আমাকে ঘাঁটতে হ'য়েছে, খুব নীচ, হীন কতকগুলি মানুষ নিয়ে আমার কারবার করতে হ'য়েছে। তাতে এই অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে যে মানুষ যতই ছোট হ'ক, যতই সে কদাচার করুক, সবার ভেতরই ভগবান আছেন। সেই ভগবানকে ঠিক ক'রে ডাকতে পারলেই আধার যাই হোক তারি ভেতর থেকে তিনি সাড়া দেন। তাই, জগতের লোকে আপনাকে যতই মন্দ ভাবুক আপনাকে আমি ছোট ক'রে ভাবতে পারি না, কারণ আপনি নারায়ণ।"

এ বক্তৃতা শুনিয়া বিলাসের প্রথম খুব হাসি পাইয়াছিল। কিন্তু হাসি চাপিয়া গম্ভীর হইয়া সে শুনিল। যখন জ্যোতি বলিল, "কারণ আপনি নারায়ণ!" তখন হঠাৎ সে আপনার ভিতর একটা শিহরণ অনুভব করিল। এমন শ্রদ্ধা ক'রিয়া কেহ তাকে কোনও দিন সম্ভাষণ করে নাই। যাদের সঙ্গে তার কারবার তারা কেউ তাকে আদর করে, কেউ বা ঘৃণা করে—কিন্তু কেউ তাকে শ্রদ্ধা করে না। তাই এই তেজঃপুঞ্জ পুরুষের কাছে শ্রদ্ধা পাইয়া তার মন যেন একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা বোধ করিল। জ্যোতি বলিল, আমি আজ বড়

বিপন্ন, আমরা সবাই বিপন্ন! বৌদিদি, খোকা, এরা বেঁচে মরে আছে তার উপর তাদের চোখের সামনে এখন ভীষণ দারিদ্র্য। তাই বিপদে পড়ে আপনার কাছেই এসেছি, আপনি আমাদের রক্ষা করুণ।

মহা বিব্রত হইয়া বিলাস বলিল, "আপনি কি বলছেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কি বিপদ আপনাদের? আমি কি ক'রে রক্ষা করবো? আমাকে বুঝিয়ে বলুন। আমার যদি কিছু সাধ্য হয় অবিশ্যি করবো।"

তখন জ্যোতি বিলাসের কাছে সমস্ত ইতিহাস বলিয়া গেল। তাদের সেকালের সুখসম্পদের কথা, দেবী-প্রতিমা বউদিদির কথা, দাদার অপূর্ব্ব চরিত্রের কথা—তার পর তাদের দুঃখের কথা, ভূপতির অধঃপতনের কথা। কেমন করিয়া পদে পদে অধঃপতিত হইয়া তিল তিল করিয়া ভূপতি তাদের সুখ সৌভাগ্য উজাড় করিয়া দিয়াছে, তাদের বৃহৎ সম্পদ লুটাইয়া দিয়াছে. জ্যোতির নাম জাল করিয়া হুণ্ডী কাটিয়াছে—আর আজ তাদের যথাসর্ব্বস্ব বন্ধক দিয়া এত টাকা ধার করিয়াছে যে আর তাদের উদ্ধার হইবার পন্থা নাই। এখন তাদের মাথা রাখিবার ঠাঁইটুকুও রহিলনা।

জ্যোতি অশেষ বেদনার সহিত সমস্ত কথা বলিয়া শেষে বলিল, "এত দুঃখও আমরা দুঃখ মনে ক'রবো না, দারিদ্র্যকে এক ফোঁটা বোঝা ব'লে জানবো না, যদি সুধু আমরা আমার দাদাকে ফিরে পাই, যদি তিনি আবার ঠিক তেমনিটি হন। তাহ'লে কুঁড়ে ঘরে তাঁকে নিয়ে বাস ক'রে আমরা রাজার হালে থাকছি—বলে জানবো। আর কিছুই আমরা চাই না, সুধু দাদাকে ফিরে চাই। আপনি তাকে আমাদের কাছে ঠিক তেমনি ক'রে ফিরে দিন।"

বিলাস চুপ করিয়া জ্যোতির কথাগুলি শুনিল। জ্যোতির বর্ণনা শুনিয়া তার মনে দুঃখ হইল; কিন্তু সুরমার দুঃখের কথা যখন জ্যোতি বলিতেছিল তখন বিলাসের মনের ভিতর চারিদিক দিয়া যেন খোঁচা লাগিতে লাগিল। কারণ এই বর্ণনার প্রত্যেক অক্ষরের ভিতর সে শুনিতে পাইল তার বিরুদ্ধে একটা তীব্র অভিযোগ। তাতে তার মনটা ভয়ানক বিরুদ্ধ হইয়া উঠিল, সে মনে মনে কেবলি আত্মরক্ষা করিতে লাগিল।

মাথা নীচু করিয়া বিলাস সমস্ত শুনিয়া গেল। তার পর সে মাথা খাড়া করিয়া একটা কড়া রকম সাফাই করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু জ্যোতির মুখের দিকে চাহিয়া সে থমকিয়া গেল। জ্যোতির সমস্ত মুখের উপর এমন একটা করুণ আবেদন—এমন একটা গৌরবময় ভিখারীর ভাব সে দেখিতে পাইল যে তার শক্ত কথাগুলি তার কণ্ঠে ঠেকিয়া ফিরিয়া গেল। এমন সুন্দর, এমন তেজস্বী, এমন উদার মূর্ত্তির এ ভিক্ষার আকুলতা তার মনের ভিতর ওলট-পালট করিয়া দিল। মুখরা চপলা বিলাস ভাষা খুঁজিয়া পাইল না। তার সমস্ত অন্তর একটা অপরিচিত উত্তেজনায় কাঁপিতে লাগিল।

সে অতি মৃদুস্বরে বলিল, "আপনারা যে ভাবছেন আপনার দাদার অধঃপাতের জন্য আমিই দায়ী সে কথা কিন্তু ভুল।"

জ্যোতি বলিল, "এমন কথা আমি ব'লেছি কি? আমি তা' তো মনে করি না। অধঃপতন যার হয় সে নিজে ছাড়া অন্য কেউ তার জন্য দায়ী হ'তে পারে না।"

ব্যস্ত ভাবে বিলাস বলিল, "আমি সুধু সে কথা বলছি না—বাস্তবিক ভগবান জানেন, আমি, তাঁকে শোধরাবার জন্যে অনেক চেষ্টা ক'রেছি। একদিন আমার এইখানে ব'সে তিনি আপনার নাম জাল ক'রে হুণ্ডী কাটবার আয়োজন ক'রেছিলেন—আমিই তা' ক'রতে দিই নি, নিজে চেষ্টা ক'রে টাকা জোগাড় ক'রে দিয়েছিলাম।"

"কিন্তু তবু তিনি জাল হুণ্ডী ক'রেছিলেন—এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, যে অধঃপাতে যাবে তাকে কেউ ফেরাতে পারে না। পারে সুধু সে নিজে, আর—ভগবান।"

বিলাস অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তা' আমাকে আপনি কি ক'রতে বলেন?"

"সুধু এইটুকু আপনি ক'রবেন যে দাদা এলে আপনি তাঁকে আপনার কাছে আর আসতে দেবেন না—ব'লে দেবেন তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক শেষ।"

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

হাসিয়া বিলাস বলিল, "তাতে কিছুই হ'বে না ঠাকুর পো। আমার এখানে না আসতে পায়, ক'লকাতায় মেয়ে মানুষের অভাব নেই। আর আপনার দাদা যে সুধু আমাকেই চেনেন তাও নয়।"

জ্যোতি একটু ভাবিয়া বলিল, "দেখুন আমি এ সব কথা কিছু জানিও না বুঝিও না। আমি আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করছি—আপনি একটা যা-হয় উপায় করুন যাতে দাদাকে আমরা ফিরে পাই—যাতে তিনি আর এদিকে না আসেন। নইলে—নইলে বড় সর্ব্বনাশ হ'বে। তা ছাড়া ভেবে দেখুন, টাকা কড়ি এখন তাঁর শেষ হ'য়ে গেছে—শেষ সম্পত্তিটুকু তাঁর বাঁধা প'ড়েছে এখন আপনিই বলুন অন্ত মেয়ে মানুষই বলুন কারও তাঁকে বেঁধে রাখায় সত্যি সত্যি কিছু লাভ নেই।"

শেষের কথায় বিষাক্ত খোঁচা খাইয়া তীব্র বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বিলাস একবার জ্যোতির দিকে চাহিল—তার চোখ ছুটো ছলছল করিয়া উঠিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিল, "হাঁ তা' বটে আমাদের সম্পর্ক তো সুধু টাকা পয়সার—টাকাই যখন তার নেই তখন তাকে দিয়ে আর আমার কি দরকার?" সঙ্গে সঙ্গে তার চক্ষু গড়াইয়া জল ঝরিয়া পড়িল, সে কিছুতেই সে অশ্রুরোধ করিতে পারিল না।

জ্যোতি একটু আশ্চর্য্য হইল; সে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

বিলাস মুখ নীচু করিয়া দাঁতে ঠোঁট কামড়াইতেছিল —হঠাৎ সে মুখ তুলিয়া বলিল, "ঠাকুরপো এত বড় অপমানটা আমায় ক'রলে তুমি?" তার পর বলিল—"আচ্ছা তুমি যাও, আমি যা পারি ক'রবো—কিছু পারবো কিনা বলতে পারি না। কিন্তু দয়া ক'রে একটি কথা তুমি বিশ্বাস করো—বেশ্যাও মানুষ তাদের ভিতরও ভালবাসা মাঝে মাঝে থাকে—সুধুই তারা রক্ত-চোষা জোঁক নয়।"

তেজের সহিত মুখ ফিরাইয়া বিলাস উঠিয়া গেল। জ্যোতি কিছুক্ষণ বিস্ময়-স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর সে নামিয়া গেল।

জ্যোতি চলিয়া গেলে বিলাস তার বিলাসগৃহের ফরাসের উপর লুটাইয়া পড়িয়া মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেকগুলি কান্নাভরা কথা তার মনের ভিতর হুড়মুড় করিয়া আসিয়া তার ধৈর্য্যের সবগুলি প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিল। তার সবগুলির পশ্চাতে ছিল জ্যোতির ঐ তেজঃপুঞ্জ মদন মনোহর মূর্ত্তি।—জ্যোতি তাকে এত ঘৃণা করে! তার মনে হইল জগতে এই একটী লোকের কাছে যদি সে সম্মান পাইতে পারিত তবে সে ধন্য হইয়া যাইত। কিন্তু সম্মানের যে তার এক ফোঁটা পুঁজি নাই! যত গুণ তার আছে বলিয়া সে জানে সব সে স্মরণ করিল—মনে করিল, দয়া মায়া, সত্যনিষ্ঠা সেবাপরায়ণতা বা করুণা প্রভৃতি তার যা আছে তাতে লোকের কাছে শ্রদ্ধা সে পাইতে পারে। কিন্তু তার একটা কথারও খবর তো জ্যোতি রাখে না;—যাতে তাকে শ্রদ্ধা করিতে পারা যায় এমন একটী কথাও জ্যোতির জানা নাই—সে সুধু জানে বিলাস বেশ্যা, ভূপতিকে কে নষ্ট করিয়াছে। তা ছাড়া বিলাসের বুদ্ধি আছে, অভিনেত্রী বলিয়া তার খ্যাতি আছে, অসাধারণ কলা-নৈপুণ্য তার আছে, কিন্তু জ্যোতির কাছে তার সে গৌরবের কোনও দামই নাই—সে সুধু জানে বিলাস ঘৃণিত বেশ্যা!

কেন সে বেশ্যা হইয়াছিল? কেন তার মা তাকে এমনি করিয়া মানুষ করিয়াছিল? কেন লোকের মন হরণ করিয়া শরীরপণ্যে জীবিকা উপার্জ্জন তার ব্যবসায়? যে বুদ্ধি ও শক্তি ছিল তার, সে কি আর কিছু হইতে পারিত না? এমন কিছু হইতে পারিত না যাতে জ্যোতি তাকে ঘৃণা না করিয়া শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করিতে পারিত? তাহা যে সে হয় নাই সেজন্য তার নিজের দায়িত্ব কতটুকু?

একবার যদি পারিত সে সমস্ত অতীতটা মুছিয়া ফেলিয়া তার পরিপূর্ণ গৌরবে মাথা খাড়া করিয়া জ্যোতির সামনে দাঁড়াইতে—ওঃ—জীবন তার ধন্য হইয়া যাইত।

জ্যোতির কথা বিলাস অনেকদিন ভূপতির কাছে শুনিয়াছে। ভূপতি তার প্রশংসা করিবার জন্য কোনও কথাই বলে নাই, কিন্তু সে যাহা বলিয়াছে তাতে প্রকাশ

পাইয়াছে যে জ্যোতি এমন কিছু, যার কাছে ভূপতি কোনও অন্যায় কাজের কথা প্রকাশ করিতে ভয় পায় ;—এমন এক-জন যার পক্ষে কোনও অন্যায় কাজ করা বা অন্যায় কাজের প্রশ্রয় দেওয়া ভূপতি অসম্ভব মনে করে, তাই জ্যোতির বিষয়ে ভূপতির এত ভয়। তা ছাড়া ভূপতি ইহাও বলিয়াছে যে বড় মেধাবী ছাত্র ছিল জ্যোতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্র—তার তুল্য কেউ নাই। এমন একটা মেধা সে, ভূপতির মতে, অপব্যয় করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে, পণ্ডিতের জগতে, ধনীর সমাজে যে সম্মান সে চাহিলেই পাইতে পারিত তাহা তুচ্ছ করিয়া সে এক অখ্যাত পল্লীর মধ্যে খোলা ঘরে বাস করিয়া যত সব ছোট লোকের ছেলে মেয়েদের লইয়া কি সব কাণ্ড করিতেছে। শুনিয়া বিলাসের মন প্রশংসায় ভরিয়া উঠিত। সে কল্পনা করিত এক প্রকাণ্ড ত্যাগী কর্ম্মবীরের, যে নিজের অতুল প্রতিষ্ঠা অনায়াসে অবহেলা করিয়া দরিদ্রের সেবায় জীবন নিযুক্ত করিয়াছে। মনে মনে সে তাকে অসংখ্য প্রণিপাত করিত।

তাই জ্যোতিকে দেখিবার, তাকে জানিবার জন্য তার লোভের অন্ত ছিল না! কিন্তু সে লোভ তার মনেই সে চাপিয়া রাখিত, কেননা সে বুঝিয়াছিল জ্যোতির পক্ষে বেশ্যার সংস্পর্শে আসা অসম্ভব!

সেই অসম্ভব আজ সম্ভব হইয়াছিল। জ্যোতি আপনি আসিয়া বিলাসকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল, বিলাসের তাকে ডাকিতে হয় নাই। এ সৌভাগ্যের আনন্দে অধীর হইয়া বিলাস সাজিয়া আসিয়াছিল তার শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদে, তার রূপ যাতে শতগুণ ফুটিয়া ওঠে তেমনি করিয়া সে আপনাকে সাজাইয়াছিল।

মূঢ়া সে তাই বাহিরের সজ্জা লইয়া আসিয়াছিল জ্যোতির কাছে। তার রূপ তো জ্যোতির চোখে আনন্দের দ্যুতি ফুটাইয়া তুলিতে পারে নাই। সব সজ্জা দূর করিয়া ফেলিয়া যদি সে কোনও ইন্দ্রজাল বলে তার অন্তরের সব গোপন সম্পদ নগ্ন করিয়া অর্ঘ্যরূপে জ্যোতির সম্মুখে ধরিত তবে কি সে তাকে এমনি করিয়া অবহেলা করিতে পারিত। চোখে যদি সে সব দেখান যাইত তবে জ্যোতি কি শ্রদ্ধায় তার কাছে প্রণত হইয়া পড়িত না? কিন্তু সে সব কিছুই জ্যোতি দেখিতে পাইল না, দেখিল শুধু নির্লজ্জ সজ্জার ভারে ভূষিতা বারাঙ্গনা! হা অদৃষ্ট!

অনেক দিনের স্বপ্ন তার আজ সফল হইয়াছিল। জ্যোতিকে সে সামনে পাইয়াছিল, তার এই চোখ দুটি দিয়া দেখিয়াছিল। দেখিয়া বুঝিল স্বপ্ন তার পরাজিত। কি রূপ তার! এত রূপ কি মানুষের হয়? রূপের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে কি এক জ্যোতির্ম্ময় প্রাণ—সব রূপ ভেদ করিয়া তার ছটা যেন বিলাসের চোখ বিঁধিয়া ফেলিয়াছিল। জ্যোতির যে মানসমূর্ত্তি বিলাস মনে আঁকিয়াছিল, তাকে লজ্জা দিল জ্যোতির রক্ত মাংসের দেহ। পায়ের তলায় তার লুটাইয়া পড়িতে সাধ গিয়াছিল, কিন্তু —এমন পুরুষকে কিনা সে ভুলাইতে গিয়াছিল তার সুলভ হাস্যের দ্বারা! কি লজ্জা সে আজ পাইল! পরাজিত লাঞ্ছিত হইয়া, তার রূপ-রাশি, মনোহর বেশভূষা, তার ছলা কলা, শুধু তার অন্তরকে আগুনে দগ্ধ করিয়া মারিল। সে কেন শুধু দীনবেশে তার পায় লুটাইয়া পড়িয়া ভিখারী হইয়া তার আশ্রয় প্রার্থনা করিল না। দয়াবীর জ্যোতি তো তাহা হইলে দয়ায় কৃপণ হইত না।

সে গিয়াছিল মদনকে সহায় করিয়া শিবকে জয় করিতে —প্রতিফলে পাইয়াছে নিদারুণ লজ্জা, অসহ্য মর্ম্মপীড়া!

জ্যোতি স্নিগ্ধ মধুর ভাষায় কথা বলিয়াছিল, একটা কঠোর কথা তাকে বলে নাই, কিন্তু সব কথার তলায় বিলাস শুনিতে পাইয়াছিল শুধু এক অকরুণ তিরস্কার ও ঘৃণার সুর —সেই যেন সর্ব্বনাশ করিয়াছে ভূপতির! কি অন্যায় এ তিরস্কার। সে কি করিয়াছে ভূপতির? ভূপতি তার কাছে আসে, তাকে ভালবাসে, বিলাস প্রতিদানে তাকে ভালবাসা দিয়াছে, যত্ন দিয়াছে, বিধিমতে আনন্দ দিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই তার অপরাধ! ভূপতি তাকে অনেক সম্পদ দিয়াছে সত্য, কিন্তু সে কি চাহিয়াছিল এত? তা ছাড়া সে কি জানিত যে ভূপতি আপনাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দিয়াছে? তবে তার কি দোষ?

ভূপতিকে সে সুরমার প্রতি অবিশ্বাসী করিয়াছে, সুরমার হাত হইতে ভূপতিকে সে কাড়িয়া লইয়াছে জ্যোতির কথার ভিতর এই যে অভিযোগ, এটাও যে কত বড় অসত্য!

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

ভূপতি তাকে যাচিয়া ভাল বাসিয়াছে, সে তো তার ভালবাসা ভিক্ষা করে নাই। কেন ভূপতি তার কাছে আসিল? সে স্থরমার দোষ। বিলাস মনে মনে স্থরমা সম্বন্ধে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল এবং ভূপতির কাছেও সে এই কথাই শুনিয়াছে যে স্থরমা ভূপতিকে ভালবাসে না, তার প্রতি অযথা নিষ্ঠুর আচরণ করে আর তার খুব বড় বিপদের কথা শুনিয়াও তার কোম্পানীর কাগজ দু'দিনের জন্য দিতে অস্বীকার করিয়াছিল। এমন স্ত্রীকে যে ভূপতি ভালবাসে না, তাতে বিলাসের কি দোষ?

তবু জ্যোতি তাকে এমনি লাঞ্ছনা করিয়া গেল। মিষ্টভাষী জ্যোতি, কোনও রূঢ় কথাই সে বলে নাই। কিন্তু তবু তার কথার তলায় তলায় বিলাস যে অভিপ্রায় দেখিতে পাইল তাহা তাকে তীক্ষ্ণ খোঁচা দিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া বিলাস উঠিয়া বসিল। সে স্থির করিল যে জ্যোতির উপর সে এমন প্রতিশোধ লইবে যে তাহাকে কাঁদিয়া ভাসাইতে হইবে। ভূপতিকে সে সত্যই তাড়াইয়া দিবে। শুধু তাই নয়। বিলাসের যাহা কিছু আছে—ভূপতির যাহা গিয়াছে তার তুলনায় সে কিছুই নয়—তবু তার যা' কিছু আছে তাহা বিলাস স্থরমাকেই দান করিবে। তারপর নিঃসম্বল ভিখারিণী হইয়া সে জ্যোতির আশ্রমে আশ্রয় ভিক্ষা করিবে। তখন তার দীনবেশ ও দারিদ্র্য দেখিয়া জ্যোতির বুক ফাটিয়া যাইবে না কি? রাণীকে ভিখারিণী করিয়া অনুশোচনায় সে পুড়িয়া মরিবেনা কি?

নীচে ভূপতি ও এককড়ির কণ্ঠ শোনা গেল—বিলাস তড়্‌বড়্‌ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাড়াতাড়ি বেশ সুবিন্যস্ত করিয়া সে ভূপতির সম্বর্দ্ধনার জন্য প্রস্তুত হইল। তার প্রতিজ্ঞা শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল।

সহযোগী সাহিত্য

অধ্যাপক ব্রাউন ও পারশ্য সাহিত্যের ইতিহাস

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

East and West will never meet বলিয়া ইংরাজ কবি ধূয়া ধরিয়াছেন। মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, কাজেই "পূর্ব্ব ও পশ্চিমের" অসম্ভব দূরত্ব উতরাইয়া সে মিলিবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের উপর, এবং জগতের আদিম সভ্যতা ও 'কাল্‌চারে'র সহিত নবীন সভ্যতা ও কাল্‌চারের সমন্বয়ের উপরই, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ মঙ্গল নির্ভর করিতেছে।

যাঁহারা এই মিলন-সেতুর সৃষ্টি করিতেছেন তাঁহারাই বাস্তবিক ভবিষ্যৎ জগৎ ও মানবজাতির অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিয়া যাইতেছেন। কেহবা মানব-সেবা দ্বারা, কেহবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদান দ্বারা, কেহবা সাহিত্য-ইতিহাসের সমালোচনা দ্বারা এই কার্য্য সমাধা করিতেছেন। অধ্যাপক ই, জি, ব্রাউন সাহেব পারশ্যবাসীদের সাহিত্যের ইতিহাস, সভ্যতার ধারা, কাল্‌চারের সৌন্দর্য্য এত সুন্দর, এত হৃদয়গ্রাহী, এত ইতিহাস-বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে লোকচক্ষুর সামনে ধরিয়াছেন যে তাহাতে একটা জাতির সমগ্র পরিচয় উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। পারশ্য জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ইতিহাস একাধারে এত সুষ্ঠু করিয়া সশ্রদ্ধায় কেহ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। অধ্যাপক ব্রাউনের সমস্ত পুস্তকের Keynote (মূলমন্ত্র) যেন ভালবাসা ও শ্রদ্ধা-জনিত অধ্যয়ন।

ইতিহাস অনেক ইয়োরোপিয়ানই লিখিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশের মনই প্রাচীর প্রতি বিমুখ ও অবজ্ঞা-উদ্ভূত গোপন বিদ্বেষপূর্ণ। এই জন্য তাঁহারা প্রায়ই অবিচার করিয়াছেন তথা বিরোধের সূচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহার জন্য ভবিষ্যৎ জগতের নিকট তাঁহা-দিগকে জবাবদিহি করিতে হইবে। হয়ত কোন জাতির দোষ ত্রুটী আছে, তাহা লইয়া উহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা উচিত নহে। প্রত্যুত যিনি প্রকৃত ঐতিহাসিক তিনি সকল বিদ্রূপ, সকল বিদ্বেষ, সকল Prejudice-এর অতীত হইয়া সশ্রদ্ধায় এই মহান্ ব্রত সম্পাদনে আত্ম-নিয়োগ করেন। অধ্যাপক ব্রাউন ঠিক এই ভাবেই তাঁহার গৌরব-জনক কর্ত্তব্য সম্পাদিত করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকগুলি অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়া যেমন তাঁহার গভীর গবেষণা ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয় তেমনি পারশ্য সাহিত্যের বৈচিত্র্যময় ও অপরূপ রহস্যপূর্ণ বিবরণগুলি আরব্যোপন্যাসের ন্যায় কৌতূহলপ্রদ ও আনন্দদায়ক বলিয়া প্রতিভাত হয়। তিনি যেখানে জাতির দুর্ব্বলতা বা ভুলের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, গুণগ্রাহী ও হৃদয়বান একনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের ন্যায় অঙ্গুলি-সঙ্কেতে উহা দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহার মধ্যে স্কুল-মাষ্টারের ঔদ্ধত্য বা বিচারকের অবজ্ঞা নাই। এই সমস্তের জন্যই উহা বিরোধ সৃষ্টি না করিয়া ভবিষ্যতের দিকে মিলন-সেতু সম্প্রসারিত করিয়া দিয়াছে।

অধ্যাপক ব্রাউনের পারশ্য-সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বিধির বিশেষ ইঙ্গিত বলিয়াই মনে হয় এবং এই গুরুদায়িত্ব তিনি অতি সুচারুরূপেই সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কৃতিত্বের সহিত এম, বি, পাশ করেন। তাঁহার পিতার ইচ্ছাতেই ডাক্তারী অধ্যয়ন করেন। ডাক্তারী পড়িবার সময়ই এক গ্রীষ্মাবকাশ তুরস্কে অতি-বাহিত করেন। তুরস্কের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ তিনি তুর্কী ভাষা অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। শিক্ষক অভাবে অতি কষ্টে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে তিনি তুর্কী ভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন।

বীর তুর্কী জাতির প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

যখন বলকান যুদ্ধে ইয়োরোপীয় শক্তিসমূহ বিশেষতঃ ইংলণ্ড, বিপন্ন তুর্কীকে নির্য্যাতিত করিবার সঙ্কল্প করিল তখন অধ্যাপক ব্রাউন সাহেবের তুর্কীর প্রতি গুপ্তটান প্রকাশ ফলে এই রাজনৈতিক মতানৈক্যের জন্য অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হয়। তিনি তাহাতেও কিছু-মাত্র বিচলিত না হইয়া স্বীয় মতই পোষণ করিতে থাকেন।

পারশ্য-বেশে অধ্যাপক ব্রাউন

হইয়া পড়িল। তিনি ইংলণ্ডের এই সঙ্কল্পের প্রতিবাদ করিয়া সাময়িক পত্রিকাসমূহে সুযুক্তিপূর্ণ তীব্র পত্র প্রকাশ করেন। ইহা বলিলে তাঁহার মানসিক বলের যথেষ্ট প্রমাণ হইবে যে তৎকালীন সমস্ত রাজনৈতিক দলই "ইয়োরোপের পীড়িত

মানুষটী"কে তাঁহাদের হাসপাতাল হইতে বাহির করিয়া দিবার মতলব আঁটিতেছিলেন। শুধু ইংলণ্ড নহে সমগ্র ইয়োরোপ আমেরিকা এই একই দুরভিসন্ধি দ্বারা মিতালী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। বাহিরের দিক হইতে এই প্রকার বাধা ও নানা উত্তেজনা নিবন্ধন তাঁহার মন তুরস্কের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত ও আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

অনেক প্রাচ্যবিদই তাঁহাকে পারস্য অনুশীলনে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন "যাহারা পারস্য সংস্কৃত ইত্যাদি প্রাচ্য ভাষাসমূহ অধ্যয়ন করেন তাঁহাদের প্রতি গভর্ণমেণ্টের কোন সহানুভূতি নাই বা চাকুরী-বাকুরীতেও তাঁহাদের বিশেষ কোন সুবিধা হয় না।" কেবলমাত্র জনৈক বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "যদি তোমার জীবন ধারণের জন্য ভাবিতে না হয় তাহা হইলে তুমি ইহা ধরিয়া থাকিতে পার। জীবিকা অর্জ্জনের পক্ষে ডাক্তারীই ভাল। অবশ্য প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য আলোচনা করিলে উত্তরকালে তুমি সম্মান ও সম্পদের অধিকারী হইতে পারিবে।" যাহা হউক তিনি পারস্য শিক্ষায় শীঘ্রই অগ্রসর হন এবং গভীর মনোযোগ সহকারে ইহার আলোচনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। ইতিমধ্যে তিনি ডাক্তারী পরীক্ষা দিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন এবং অনবসর জীবনে যে মূল্যবান অবসর সময়টুকু পাইতে-ছিলেন উহা বিশ্রাম সুখে অতিবাহিত না করিয়া অতি কঠোর পরিশ্রম সহকারে উচ্চস্তরের পারশী পুস্তকসমূহ অতীব আনন্দের সহিত পাঠ করিতেছিলেন। ডাক্তার ব্রাউন সাহেব অত্যন্ত ভাবপ্রবণ মানুষ ছিলেন। মানুষের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যাইত। পাশা-পাশি অসংখ্য আমোদ-প্রমোদ ও নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-কষ্ট তাঁহাকে sceptic করিয়া তুলিয়াছিল। প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মে ততদূর আস্থা ছিল না। যখন তাঁহার হৃদয় সমবেদনায় ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ, যখন তিনি দিশাহারা ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন তখন তিনি পারস্যের সুফী কবি মৌলানা জালালউদ্দীন রুমীর বাঁশীর সুর ও প্রেমিক-কবি হাফিজের গজলের স্বর শুনিতে পান। বসন্তের মাতাল বাতাস যেন হাফিজের গজলের সুর, আর প্রভাতের স্নিগ্ধ-মলয় বাতাস যেন রুমীর বাঁশীর গান।

হাফিজ হইতে রুমী তাঁহার অধিক প্রিয় হইয়া পড়ে। ক্রমে ক্রমে তিনি সুফীধর্ম্ম অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। সুফীধর্ম্ম অনুশীলনের ফলে তাঁহার ধর্ম্মমত সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তিনি আর পূর্ব্বের ন্যায় sceptic রহিলেন না, এই সুফীধর্ম্মের সোণার কাঠি তাঁহার ভিতরকার সত্যিকার মানুষকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিল। সুফীধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, সৃষ্টিকর্ত্তা ও মানুষের মধ্যে প্রেমের মধুর সম্বন্ধ বর্ত্তমান। প্রেমের রাজ্যে কোন হিংসা নাই, কোন ভেদাভেদ বিচার নাই, শুধু প্রেমের পূত মন্ত্র সকলকে একই ভাবে অনুপ্রাণিত করিতেছে। রুমী সুফীধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, তাঁহার "মসনভী" পারস্য ভাষার কোরাণ বলিয়া অভিহিত। কাজেই ইহার অধ্যয়নে তাঁহার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে Optimist হইয়া পড়ে। আসল কথা তিনি মানসিক শান্তি ও সাম্যভাব ফিরাইয়া পান।

যাহা হউক তিনি যখন স্বতন্ত্রভাবে চিকিৎসা ব্যবসা করিবার সঙ্কল্প করিতেছিলেন এমন সময় অযাচিতরূপে ও অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার প্রিয় কলেজ হইতে ফেলো হইবার জন্য তাঁহার ডাক পড়ে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই তিনি এম, এ, ডিগ্রী গ্রহণ করেন। কাজেই তিনি সাতিশয় পুলকিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে কেম্ব্রিজে গমন করেন এবং 'প্রেমব্রোক ফেলোশিপ' প্রাপ্ত হন।

ইহার পর তিনি পারস্য ভ্রমণের সঙ্কল্প করেন। তাঁহার সঙ্কল্পের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার জনৈক বন্ধু, তাঁহার সঙ্গী হইতে ইচ্ছুক হইলেন। দুই বন্ধু পারস্য অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা কতকটা স্থলপথে কতকটা জলপথে ভ্রমণ করিয়া পারস্যে উপনীত হন এবং তথাকার দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দর্শন করেন। অধ্যাপক ব্রাউন তাঁহার যে পারস্য ভ্রমণ কাহিনী—A year amongst the Persians *—লিখিয়াছেন তাহা অনেক তথ্যপূর্ণ। পারস্যবাসীদের সহিত পারস্য বেশভূষায় মিশিয়াছেন। পারস্য পোষাকে তাঁহাকে অতি সুন্দর দেখায়। পারস্য সামাজিক জীবন,

* A year amongst the Persians. Pp. 650—XXII by Prof E. G. Browne, M. A., M. B., F. B. A. 1927. (Cambridge University Press.)

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

তাঁহাদের আচার ব্যবহার প্রভৃতি অতি গূঢ়ভাবে তাঁহার জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং এইসব কথা তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা আধুনিক পারশ্য সম্বন্ধে কিছু জানিতে উৎসুক তাঁহারা অধ্যাপক ব্রাউন সাহেবের এই মূল্যবান ভ্রমণ কাহিনীতে অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন। এই ভ্রমণ কাহিনীতে তাঁহার প্রিয় সূফীধর্ম্ম সম্বন্ধে এক অধ্যায় আছে। ইহাতে তিনি সূফীধর্ম্ম সম্বন্ধে এমন অনেক নূতন সন্ধান দিয়াছেন যাহা এ পর্য্যন্ত প্রতীচ্য জগতে অজানা ছিল; এইজন্য এই অধ্যায় প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতগণের নিকট অনেক কাঁচা মাল-মসলার (raw materials) আধার বলিয়া খুব আদর পাইয়াছে। সমগ্র ভ্রমণ কাহিনীটী যেন ছবির মত সুন্দর ও বর্ণনাভঙ্গী অতি প্রাঞ্জল ও সরস, ফলে সকলেরই উপভোগ্য। যে পুস্তকের জন্য তাঁহার খ্যাতি, তাহা তাঁহার আজীবন সাধনার ধন—A Literary History of Persia, 2 Vols * পারশ্য সাহিত্যের এত সুন্দর, সুষ্ঠু ও মূল্যবান ইতিহাস ইংরাজী ভাষায় আর দ্বিতীয় নাই। পারশ্য সাহিত্য আলোচনা করিতে হইলে অধ্যাপক ব্রাউনের শরণাপন্ন হইতেই হইবে। তিনি পারশ্য ভাষায় লিখিত প্রায় সমস্ত পারশ্য সাহিত্যের ইতিহাসগুলি—কতক মুদ্রিত কতক পাণ্ডুলিপি—অধ্যয়ন করিয়া এই ইতিহাস আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইংরাজী, জর্ম্মাণ ও ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় পারশ্য ইতিহাস সমূহ যে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন। যখন তাঁহার এই পারশ্য সাহিত্যের ইতিহাস অধ্যয়ন করা যায় তখন ধীরে ধীরে অতীতের অস্ফুট অন্ধকার হইতে একটা জাতির সত্তা ও স্বরূপ যেন চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠে। বাবিলন সভ্যতার অবসানের পর হইতে কি করিয়া মিদিয়ান সভ্যতা বিকশিত হইল, অতি প্রাচীন আসিরিয়ান লেখ হইতে কি করিয়া পারশী অক্ষরের সৃষ্টি হইল, কি করিয়া পারশ্য জাতি কবিতা লিখিতে শিখিল সমস্ত তথ্য অতি সুনিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন। তারপর মুসলমানদের আগমন ও পারশ্যবিজয়, তৎসঙ্গে পারশ্যবাসীদের দ্বারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ, পারশ্যবাসীগণেরও আরবী ভাষায় ইতিহাস-দর্শন রচনা, তৎপরে reaction এর ফলে খাঁটী পারশ্য সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন। ফেরদৌসীর শাহনামা, ওমরখইয়ামের রুবাইত, সাদির গুলিস্তাঁ-বুস্তাঁ, নেজামীর লায়লামজনু, রুমীর মসনভী ইত্যাদির ইতিহাস, মুসলমান আব্বাসীয় খলিফাদের স্বর্ণযুগের গৌরবময় কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে সেলজুক যুগের সম্পদ, শান্তির শাসনকথা অতি হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

অধ্যাপক ব্রাউন শুধু পারশ্য ভাষাতেই সুপণ্ডিত ছিলেন না প্রত্যুত আরবীভাষাতেও বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং কেম্বি্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবীরই অধ্যাপক ছিলেন। আরবী ও পারশী পরস্পর পরস্পরের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত (যেমন বাঙ্গলা ও সংস্কৃত) কাজেই পারশ্য সাহিত্য আলোচনায় তাঁহার মত সুধী পণ্ডিতেরই প্রয়োজন ছিল। তাঁহার এই ইতিহাস মানবের চিরন্তন দানের অন্যতম সামগ্রী, তাবারী, ইবনখালদুনের আরবী ইতিহাস বা গিবন মোমসেনের ইতিহাসের ন্যায় এই ইতিহাস বিশ্বমানবের সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত। অতীতের অন্ধকার রাজ্য হইতে উদ্ধার সাধন করিয়া অধ্যাপক ব্রাউন সাহেব পারশ্য জাতির ও সাহিত্যের যে আলোকবর্ত্তিকা জ্বালাইয়া রাখিয়া গেলেন চিরকাল উহা মানবযাত্রীদলের পথপ্রদর্শক হইবে।

এই দুই ভ্যলুম ব্যতীত তাঁহার Persian Literature under the Tartar Dominion * অতি মূল্যবান ও গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ। ইহা Literary History of Persia-র Supplement হইলেও একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক। তৈমুরলঙ্গ হালাবুখান প্রভৃতি ইসলামিক সভ্যতা ও কালচারের কি মহা অনিষ্ট সাধন করিয়াছে তাহার হুবহু ও জলন্ত ইতিবৃত্ত রহিয়াছে। তাহারা একটা মহামারীর ন্যায় যে অনিষ্ট সাধন করিয়া গিয়াছে এখনও সে আঘাত হইতে ইসলামিক সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে সারিয়া উঠিতে পারে নাই। এই যুগেই

* A Literary History of Persia vol I. Pp 521. A Literary History of Persia vol. II. Pp. 568 by Prof. E. G. Browne, M. A., M. B., F. B. A. (T. Fisher Unwin, London.)

* A History of Persian Literature under the Tartar Dominion. Pp. 586+xl by Prof E. G. Browne, M. A., M. B. (Cambridge University Press. 1920)

অমর কবি গোফেজের ও জামীর জন্ম হইয়াছিল তাহাও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। তৎকালীন রাজনৈতিক ও সাহিত্যের ইতিহাস অতি মনোরম করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই সিরিজের শেষ গ্রন্থ A History of Persian Literature in Modern Times * ইহাতে তিনি বর্ত্তমান পারশ্য সাহিত্যের ও রাজনীতির কথা আলোচনা করিয়াছেন। সাকাভী-বংশের রাজত্বকালে কোন বিখ্যাত কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাহার প্রধান কারণ এইযে সম্রাটগণ কবিগণের ততদূর সাহায্য ও আদর করিতেন না। ইহা বলিলে অন্যায় হইবে যে পারস্যে এই যুগে কোন বড় কবিই ছিলনা কিন্তু তাঁহারা আদর ও সম্মান না পাইয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আসেন। উরফী ও সায়েব বিখ্যাত কবি ছিলেন এবং তাঁহারা ভারতে তৈমুর রাজবংশের রাজকবি ছিলেন। এই পুস্তকখানি লিখিতেও তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ইহাতে ভারতের সহিত ও ইয়োরোপের সহিত পারস্যের যোগাযোগের ও প্রভাবের কথা সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই ধরণের আর একখানি বই এইখানি লিখিবার আগে পারশী হইতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানির নাম "The Press and Poetry of Modern Persia." ‡ ইহাতে বর্ত্তমান কালের পারস্যের সমস্ত সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের জীবনী আলোচনা করিয়াছেন। সংবাদপত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস অতি পরিষ্কার করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। বর্ত্তমান পারস্যের সাহিত্য ও সংবাদপত্রের ক্রমবিকাশের ধারা সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু জানিতে উদ্‌গ্রীব তাঁহারা এই দুই খানি বই হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইবেন। আমি যতদূর জানি আধুনিক পারস্য সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরাজীতে এই ধরণের পুস্তক নাই।

"Arabian Medicine" নামক যে ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লিখিয়াছেন উহাতে তাঁহার চিকিৎসা শাস্ত্রের গভীর জ্ঞানের সম্যক ব্যবহার হইয়াছে। ১৯১৯ ও ১৯২০ সালে College Of Physicians-এ Fitz Patrick Lectuers দেন উহা তাহারই সমষ্টি। পুস্তকখানি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, যথেষ্ট তথ্য ও গবেষণাপূর্ণ। সাহিত্যের উপমা ইত্যাদিতে পারশ্য সাহিত্যিকগণ আরব্য ঔষধ সম্বন্ধে যথেষ্ট উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। এই সমস্ত উপমা বুঝিতে হইলে তৎকালীন আরব্য ঔষধের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

সাহিত্যের ইতিহাস ব্যতীত তিনি "Materials for the study of Bahai Religion" যে গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন তাহা যথেষ্ট মালমসলা পরিপূর্ণ। পারশ্য-উদ্ভূত বাহাই ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভারতবর্ষের লোক বিশেষ অবহিত নহেন। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় এই ধর্ম্ম লইয়া যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। তাঁহাদের কেহ কেহ বাহাই ধর্ম্ম অবলম্বনও করিয়াছেন। পারস্যে এই বাহাই ধর্ম্ম লইয়া অনেক মারামারি কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে। অথচ ইয়োরোপে বাহাই ধর্ম্ম সম্বন্ধে জানিবার কোন পন্থাই ছিল না; কাজেই ব্রাউন তত্ব-জিজ্ঞাসু ছাত্রের ন্যায় এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই পুস্তক লেখেন। বাহাই ধর্ম্মের অনেক প্রচারকের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল।

এই সকল মৌলিক ও গবেষণাপূর্ণ পুস্তক ব্যতীত কতকগুলি Original Persian textsও তাঁহার নিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে "তাজকেরা তোশ শোয়ার—ই—দৌলতশাহ্" পারশ্য কবিগণের এক অমূল্য ইতিহাস। ইহা অধ্যাপক ব্রাউনের প্রসাদাৎ পাঠপোযোগী বেশ লইয়া সুফী সমাজে বাহির হইয়াছে এবং তাঁহাদের নিকট ইহা যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। "তারিখ—ই—জদীদ" ইত্যাদি মূল্যবান পারশ্য গ্রন্থগুলিও তিনি সম্পাদন করিয়াছেন।

"চাহার মাকালা" পারশ্য সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গদ্য সাহিত্য। অধ্যাপক ব্রাউন ইহার ও তাবারীর পারশ্য ইতিহাসের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন।

* A History of Persian Literature in Modern Times Pp. 530 by Prof. E. G. Browne, M. A. (Cambridge University Press, 1924)

† The Press and Poetry of Modern Persia Pp. 315+xl. by Prof. E. G. Browne, M. A. (Cambridge University Press, 1914)

বদরিকাশ্রম—প্রথম দৃষ্টিপথে

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহীত
আলোকচিত্র হইতে তাঁহার সৌজন্যে

মহম্মদ মুনস্সুরউদ্দীন

ই, জি, গিব্ মেমোরিয়াল সিরিজে যে সমস্ত অমূল্য পারশ্য মূল পাঠ (Original texts), মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে উহার মূলে ব্রাউনের মঙ্গলহস্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই সমস্ত পুস্তক প্রকাশের মূল উৎস। সার ই, জেনিসেনয়সের কথায় "He was the moving spirit of the trust" গিব মেমোরিয়াল সিরিজের পুস্তকের আদর সুধী সমাজে যে কতদূর তাহার পরিচয় দিতে যাওয়া বৃথা।

ইহা ব্যতীত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী পারশী ও তুর্কী ভাষার পাণ্ডুলিপি গ্রন্থ সমূহের যে দুই খানি descriptive catalogue প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অধিক প্রসারিত করিয়া দিয়াছে।

তিনি এশিয়াটিক সোসাইটীর একজন বিশেষ সভ্য ছিলেন। Journal of the Royal Asiatc Society-তে ওমর খইয়াম ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক মৌলিক ও মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

অধ্যাপক ব্রাউন যেমন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন তেমনি বিনয়ী ও বন্ধুবৎসলও ছিলেন। তাঁহার প্রিয়তম স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি যে আঘাত প্রাপ্ত হন তাহাতেই তাঁহার মানব-লীলা শেষ হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর ছয় মাস পরেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার জীবন আনন্দ পূর্ণ ছিল।

তিনি সারা জীবন ভরিয়া যে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়াবহ। তিনি চিরদিন মানবের এই মহা কল্যাণকর কার্য্যের জন্য শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাইয়া আসিবেন। তাঁহার অমূল্য পুস্তকগুলিই তাঁহার শাশ্বতস্মৃতিচিহ্ন।

রাঁচির পাখী *

শ্রীসত্যচরণ লাহা

ইদানীং কয়েক বৎসর আমি মানভূম, সিংভূম, হাজারিবাগের বনে জঙ্গলে, ধান্যক্ষেত্রে, নদীতীরে, পর্ব্বতের অধিত্যকায় ও সানুদেশে, দীর্ঘবিসর্পিত প্রশস্ত রাজপথের দুই ধারে বৃক্ষশিরে, হ্রদতড়াগে যে সকল পাখীর সন্ধান পাইয়াছি তাহা গঙ্গাতীরবর্ত্তী বাংলার সমতল ক্ষেত্রে সচরাচর নয়নগোচর হয় না। হয়'ত ইহার নৈসর্গিক কারণ আছে। পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে তাহা অনুধাবনযোগ্য। ঋতুবিশেষে অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে বিহঙ্গজীবন-লীলা পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ যিনি পাইয়াছেন, তিনি এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে সকল পাখী আমাদের নিকট অল্পবিস্তর পরিচিত বলিয়া মনে করি, তাহাদের সম্বন্ধে কতটুকু জ্ঞান আমাদের জনসাধারণ মধ্যে আছে, তাহা ভাবিবার অবসর পর্য্যন্ত আমাদের থাকে না। যাঁহারা পাখী শিকার করেন, প্রধানতঃ তাহাকে খাদ্যসামগ্রীতে পরিণত করিবার জন্যই তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত হয়। যাহারা পাখী ধরে, তাহারা অর্থোপার্জ্জনের জন্য শুধু সেই পাখীগুলিকে ধরিবার চেষ্টা করে, যেগুলি রূপে বা সঙ্গীতমাধুর্য্যে নাগরিকের মনোরঞ্জন করিতে পারে। দুঃখের বিষয়, এদেশে জীববিদ্যার দিক হইতে বিহঙ্গজীবন সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত আমাদের কোনও প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। অথচ, আমাদের সামাজিক জীবনের কল্যাণ পাখীর উপর কতটা নির্ভর করিতেছে, তাহা কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষ একেবারে জানে না যে এমন নয়। কিন্তু পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে শুধু যে করুণার আবেগে একদল পণ্ডিত মণ্ডলী বিহঙ্গরক্ষার জন্য বড় বড় আশ্রম গঠিত করিতেছেন, ও আইন কানুনের সাহায্যে পক্ষিহনন নিবারণ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, তাহা নহে; এই সামাজিক কল্যাণের দিক, এই Utility-র দিক হইতে বিষয়টি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা পক্ষিজীবনের সহিত কৃষিজ শস্য রক্ষার কতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা সম্যকরূপে অবগত আছেন। কাজেই পাখীর কথা সে সব দেশে কেবলমাত্র অবসর বিনোদনের গল্প মাত্র নহে। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষেও পাখীর বৈজ্ঞানিক আলোচনা অত্যাবশ্যক, ইহা বিদ্বৎ সমাজে বোধ করি স্বীকৃত হইয়াছে। অফুরান বিহঙ্গকাহিনীর কোন্ অংশটুকু আজ আপনাদের কাছে উপস্থিত করিব? বিভিন্ন ঋতুতে পাখীর বিভিন্ন চিত্র আমাদের চোখে পড়ে। একবার তাহাদের নীড়-রচনা বা গৃহস্থালীর কথা ভাবিয়া দেখুন দিকি? আজ সেই প্রজনন-ঋতু ও দাম্পত্যলীলার কথা তুলিব না। আবার এই শরৎ হেমন্তের অবসানে, হিম ঋতুতে তাহার যাযাবরত্বের কথা ভাবিয়া দেখুন দিকি? আসন্ন বর্ষায় আষাঢ়ের প্রথম দিবসে মেঘদূতের কবি 'বিসকিসলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ' রাজহংসগণকে মেঘরাজ্যের ভিতর দিয়া মানস সরোবরাভিমুখে প্রয়ান করিতে দেখিয়াছিলেন। মহাকবিবর্ণিত ব্যাপারটি নিতান্ত কবিকল্পনামাত্র নহে। প্রতি

* রায় ডাক্তার শ্রীচূনীলাল বসু বাহাদুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে রাঁচি পাব্লিক লাইব্রেরী অধিবেশনে পঠিত।

রাঁচির পাখী

শ্রীসত্যচরণ লাহা

বৎসর নিদাঘাবসানে এই হংসপ্রয়াণ হিমালয় অভিমুখে হইয়া থাকে। আবার শীতের প্রাক্কালে তাহারা হিমালয় অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসে। আপনারা হয়'ত অগ্রহায়ণ পৌষে আপনাদের দীঘি সরোবরে দলে দলে সমাগত হংস দেখিয়া আসিতেছেন। বলুন দেখি, কোন্ নিগূঢ় শক্তির প্রেরণায় ঋতুবিশেষে যাযাবর পাখীরা উত্তর এশিয়ার গোবি মরুভূমি অথবা তিব্বত প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ের উপর দিয়া ভারতবর্ষে, সিংহলে, ব্রহ্মে, যবদ্বীপে ছড়াইয়া পড়ে? তেমনি উত্তর য়ুরোপ হইতে যাযাবর বিহঙ্গ গভীর নিশীথে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির উপর দিয়া একেবারে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়া উপস্থিত হয়। নীলাম্বু-তটস্থ আলোকস্তম্ভে ধাক্কা লাগিয়া প্রতি বৎসর অনেক পাখী প্রাণ হারায়। কিন্তু এই প্রব্রজন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিতেছে। ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকা ও সিংহল, যবদ্বীপ হইতে আবার তাহার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসে। প্রকৃতির এ' কি বিপুল রহস্য! কেন আসে, কেন যায়, কেমন করিয়া তাহারা পথ চিনিতে পারে? স্তম্ভিত মানব ইহার কোন কূল কিনারা না পাইয়া মনে করে বুঝি বা ইহাদের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। যদি পক্ষিতত্ত্ব আজ আমার ব্যক্তব্য বিষয় হইত, তাহা হইলে এই সমস্ত বিষয় আলোচনা না করিলে চলিত না; কিন্তু আজ আমি সাধারণ ভাবে আপনাদের কাছে রাঁচির পাখীর কথা কিছু বলিব; কোনও বিশেষ গবেষণা ও তত্ত্বজিজ্ঞাসায় আপনাদিগকে ধৈর্য্যচ্যুত করিব না।

কিন্তু পাখীকে তাহার আবেষ্টন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায় না। এইজন্য পক্ষিতত্ত্বের সহিত ভূতত্ত্ব ও উদ্ভিজ্জ-তত্ত্ব নিবিড়ভাবে সম্বদ্ধ। মালভূমি রাঁচি সাগরাম্বু রেখা হইতে ন্যূনাধিক দুই হাজার ফুট উচ্চ; স্থানে স্থানে তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার ফুট উচ্চ পর্ব্বত বা গিরিশ্রেণী মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এই মালভূমি প্রায় সমান, পঞ্চাশ ষাট মাইলের কম নহে। কলস্বনা স্বল্পতোয়া পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী প্রায়ই পর্ব্বতের পাদ-মূলে প্রবাহিতা। বড় নদীর মধ্যে ইহার এক প্রান্তসীমায় দামোদর আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে; আর ধূর্জ্জটীজটাভ্রষ্ট গঙ্গাপ্রপাতের ন্যায় পর্ব্বতমালার মধ্যে খাদ কাটিয়া হুণ্ড্রু প্রপাতের শুভ্র ফেনপুঞ্জময়ী সুবর্ণরেখার লাস্যলীলা সমস্ত মালভূমির উপরে শাখা-প্রশাখায় বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে। স্বভাবজাত বড় হ্রদতড়াগ বড় একটা দেখা যায় না; মানুষের স্থাপত্যকৌশলে স্থানে স্থানে বাঁধ বাঁধিয়া কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। এই সুবিস্তীর্ণ মালভূমি কঙ্করপাষাণসঙ্কুল, অথচ সর্ব্বত্র, এমন কি ঘন জঙ্গলাকীর্ণ গিরিগাত্রেও, কৃষক হল চালনা করিতেছে। প্রকৃতির উপর মানুষ জয়ী হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কারণ রাঁচি সহরের চারিদিকে

শ্যামা
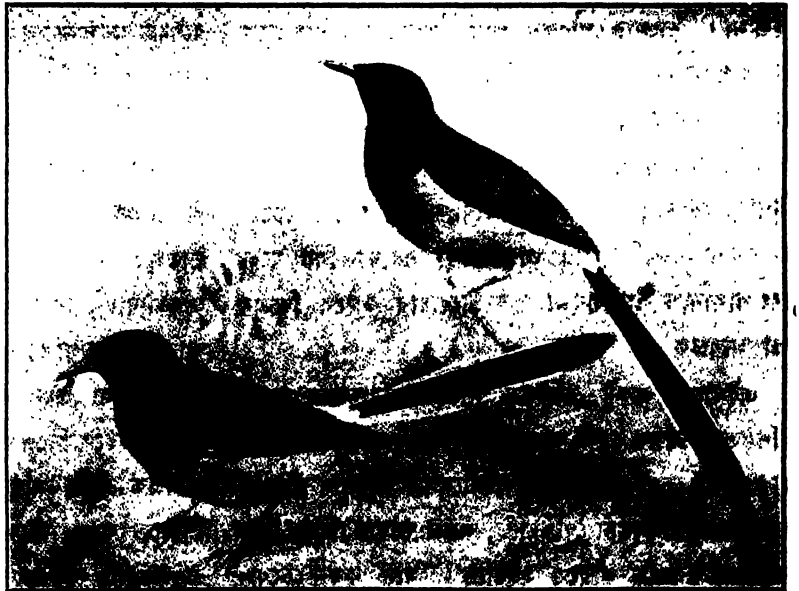
দেখিতে পাই যে বহু দূর পর্য্যন্ত বনানী একপ্রকার অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে ;—বরঞ্চ হাজারিবাগের মালভূমি অপেক্ষাকৃত অধিক জঙ্গলাকীর্ণ। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পথিপার্শ্বস্থ স্মারক পাষাণলিপি যেখানে পথিককে বলিয়া দিতেছে যে রাঁচির সীমানা শেষ হইল এবং সিংভূমে প্রবেশ করা গেল, সেই-খানেই গাছপালার তারতম্য সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আবার সিংভূম, মানভূম, হাজারিবাগ ও রাঁচিতে একই জাতীয় বহু পাদপ দেখিতে পাওয়া যায় ;—শাল, মহুয়া, কুসুম, পলাশ, কেঁদ, খদির, করঞ্জ, আমলকি, হরিতকি, বট, অশ্বথ, শিমুল, কাঞ্চন, আশান, জাম, বাঁশ, শিশু, বেল, কুর্চ্চি, কুল, ডুমুর, তেঁতুল, বকেন্ ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত বন্ধুর প্রান্তরে ছোট বড় লতাগুল্মের ঝোপ এবং জলাভূমিতে লম্বা ঘাস ও নানা জলজ উদ্ভিদ্ এই নিসর্গচিত্রকে বৈচিত্র্য দান করিতেছে। এই প্রাকৃতিক আবেষ্টনের প্রতি লক্ষ্য না করিলে পাখীর কাহিনী বিবৃত করা চলে না। এই পাষাণ-কঙ্কর, গিরিশ্রেণী, পাদপসমূহ, জলাভূমি, কর্ষিত ধান্যক্ষেত্র, পর্ব্বতসানুদেশে উপলব্যথিতগতি স্রোতস্বিনী, বাঁধের জল-রেখা,—মালভূমির এই বিশাল পটভূমিকায় রাঁচির পাখীর ছবি যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমন আর কিছুতে সম্ভবপর হইত না। বাংলার পৌরজন শ্যামা, হরেওয়া, পাপিয়াকে খাঁচার পাখী বলিয়া জানে, গৃহপালিত ময়ূরের সহিত স্নেহ-সূত্রে আবদ্ধ হয় ;—কিন্তু এই শ্যামা, ময়ূর, হরেওয়াকে প্রকৃতির মুক্তপ্রাঙ্গনে দেখিতে হইলে রাঁচি মালভূমির চুটুপালু, ইচাডাক্, রাজাডেরা, জোনা অথবা সিংভূমের টেবো হিসাডি বা হাজারিবাগের প্রত্যন্তবর্ত্তী বনানীগুলির মধ্যে এবং পালামাউ সান্নিধ্যবর্ত্তী কুরু-চাঁদোয়ার জঙ্গলে বিচরণ করা আবশ্যক।

এইখানে একটু বলিবার আছে। সিংভূমের বনের বিশিষ্টতার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি ; কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে বলা আবশ্যক যে সেখানকার জঙ্গলে যেখানে যে অবস্থায় বিশেষ বিশেষ পাখীর অবস্থান দেখিয়াছি, অন্যত্র তাহার কিছু কিছু বৈপরীত্য উপলব্ধি করিতে হইয়াছে। মনে করুন টেবো-হিসাডির উপর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া মোটরপথ চাইবাসা অভিমুখে নামিয়া গিয়াছে। পথের দুই ধারে ঘন শালবন ; নিম্নে খরস্রোতা নদী ; পরপারে ঘন বন গিরিগাত্র আচ্ছাদিত করিয়া বিরাজমান ; মধ্যে মধ্যে কচিৎ ধান্যক্ষেত্র বা কুটীর দৃষ্টিগোচর হয়। এই শালবনের একেবারে প্রান্তসীমায় বিস্তৃত রাজপথের অতিসন্নিকটে শালতরুশিরে হারওয়া শ্যামার অপূর্ব্ব সম্মিলন-সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে দিগন্ত মুখরিত হয়। রাঁচি মালভূমের রাজাডেরা অঞ্চলে ঘন জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় ; পাদদেশে পার্ব্বত্য নদী ; নদীর এ পারে সামান্য জঙ্গল ও নাতিউচ্চ পাষাণস্তূপ। বিস্তৃত দীর্ঘবিসর্পিত রাজপথ টেবো-হিসাডির মত গিরিশ্রেণীর এই অংশে নাই ; সেখানকার মত নয়নমুগ্ধকর নিরবচ্ছিন্ন শালবন স্থানে স্থানে থাকিলেও নদীর উভয় তীরের অতি সন্নিকটে ছোট বড় নানা বৃক্ষে, ঝোপের মধ্যে শ্যামাকে সঞ্চরণ করিতে দেখিতে পাই ;—আর রাঁচি-পুরুলিয়া রাস্তার উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত বন্ধুর প্রান্তরে বৃক্ষপত্রমধ্যে হরেওয়া নিশ্চিন্তমনে আত্মগোপন করিয়া থাকে। কিন্তু ইচাডাকের জঙ্গলে ঠিক টেবো-হিসাডির মত ঘন শালবনের ধারে স্বচ্ছন্দমনে শ্যামা বিচরণ করে।

আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছে কি না জানি না ; কিন্তু কখন কোথায় কি অবস্থায় কোন্ পাখী বৃক্ষশাখায় বাসযষ্ঠি অবলম্বন করিয়া দিবাবসানে অবস্থান করে, এবং প্রাতে ও মধ্যাহ্নে কোথায় কি ভাবে তাহার জীবননাট্য লীলায়িত হয়, তাহা লক্ষ্য করা আমাদের একটি প্রধান কাজ। বড় করিয়া দেখিলে পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহাকে Distribution আখ্যা দিয়া থাকেন। আমরা যদি তাঁহাদের কথা অভ্রান্ত বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লই, তাহা হইলে হয়ত সব গোল চুকিয়া যায় ; কিন্তু পক্ষিবিজ্ঞানের কঠোর তর্জ্জনী-সঙ্কেতে আমরা গতানুগতিকের মত স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে অসমর্থ হইয়া সহসা এমন প্রশ্ন করিয়া বসি যে, তাহার সদুত্তর পাইতে হইলে নিজে সতর্ক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসুকে ঠেকিয়া শিখিতে হয়। কয়েকজন পাশ্চাত্য মনীষী এ দেশের Avifauna সম্বন্ধে কিছু কিছু গবেষণা করিয়া গিয়াছেন ; তাঁহাদের একাগ্রতা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় চমৎকৃত হইতে হয় ; কিন্তু ব্যক্তিগত পরীক্ষণের ফলে বুঝিতে পার

শ্রীসত্যচরণ লাহা

শকুনি

আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু তাহা যাচাই করিবার জন্য পক্ষিহনন করিতে বাধ্য; উপরোক্ত উপকরণগুলি সংগৃহীত না হইলে তাহাকে কোন্ পর্য্যায়, কোন গণভুক্ত করা যাইবে বলা অসম্ভব। অথচ যাঁহারা পাখী লইয়া পাগল, তাঁহারা পাখীর প্রাণবিনাশ করিতে ব্যথা পান, ইহা সহজেই অনুমেয়। এদিকে মানবসমাজের বিলাসের উপকরণ যোগাইবার জন্য এত দেশে এত পাখী বিনাশ করা হইতেছে, পাখীর পালক এমন মহার্ঘ পণ্যদ্রব্যে পরিণত হইয়াছে যে পক্ষিবিশেষজ্ঞের বিশেষ আগ্রহে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ও অন্যত্র আইনের দ্বারা বিশেষ বিশেষ ঋতুতে বিশেষ বিশেষ পাখীর বিনাশ সাধন রোধ করিবার চেষ্টা হইতেছে। তাই বলিতেছিলাম, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসুকে কঠোর ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়।

যায় যে তাঁহাদের রচনার মধ্যেও ত্রুটি, বিচ্যুতি, এমন কি ভ্রম প্রমাদ আছে। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে টিকেল্, বিভ্যান্, বল্ প্রভৃতি ইংরাজ বিশেষজ্ঞ সিংভূম, মানভূম, হাজারিবাগ ও ছোটনাগপুরের অনেক স্থানের বিহঙ্গ পরিচয় যথাসম্ভব দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে আর কেহ এ পথে বৈজ্ঞানিকভাবে অগ্রসর হইবার বাসনা প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের রচনার অসম্পূর্ণতা বা পরীক্ষণের ত্রুটি থাকিলেও তাঁহারা আমাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র। হয়ত যে যে অঞ্চলে তাঁহারা কোনও বিশেষ বিশেষ বিহঙ্গ দেখিতে পান নাই, আমাদের চক্ষে সেগুলি পড়িতে পারে। হয়ত পরবর্ত্তী যুগের সূক্ষ্ম বিচারে বিহঙ্গজীবনের অথবা বিহঙ্গদেহের অনেক নূতন তথ্য বাহির হইতে পারে;—অনেক আগেই পারিত যদি তাঁহাদের মত একাগ্র সাধনা পরবর্ত্তী যুগে প্রাচ্য পাশ্চাত্য কোনও বিশেষজ্ঞের থাকিত। আমাদের প্রচেষ্টা পদে পদে ব্যথিত খণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা; অহিংসব্রত ব্যক্তিবিশেষের বা সমাজবিশেষের পক্ষে পক্ষিতত্ত্বজিজ্ঞাসা অনেক সময়ে কঠিন হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য সুধী পক্ষিবিশেষের স্ত্রীপুং ভেদে যে বর্ণবিচার, দেহায়তনের পরিমাপ প্রভৃতি দিয়াছেন,

তবে পূর্ব্বোক্ত সুধীগণের মধ্যে কেহই রাঁচি মালভূমের পাখীর কথা বিশেষ করিয়া বলিবার সুযোগ বোধ হয় পান নাই; এবং তাঁহাদের পরেও এযাবৎ কেহই এ বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই। ফলে, রাঁচির পাখীর উল্লেখ বল্, বিভ্যান্, টিকেল প্রভৃতি কাহারও রচনায় আমরা পাই না; মাত্র লোহারডাগা অঞ্চলে কয়েকটা পাখীর উল্লেখ বল্ করিয়াছিলেন। অথচ পক্ষিতত্ত্বের দিক হইতে এই বিস্তৃত মালভূমিকে একেবারে অবহেলা করা চলে না। এখানকার কোনও উল্লেখ বিদেশীয় বিশেষজ্ঞের রচনায় পাই না বলিয়া এমন মনে করা চলিবে না যে, সে সব পাখী এখানকার অধিবাসী নহে; কাজেই বিষয়টা একটু তলাইয়া দেখিতে হইবে। এ বিষয়ে কোনও চেষ্টার সাফল্য একাধিক

ব্যক্তির সহযোগিতা না হইলে সম্ভবপর হয় না এবং ইহা বহু সময় সাপেক্ষ। কিন্তু তাই বলিয়া যতটুকু সম্ভবপর হয়, তাহা না করিলে মাদৃশ সামান্য অনুসন্ধিৎসুর চিত্তে অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। যে কাজ বহু বৎসর পূর্ব্বে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছি, আজ তাহার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না; বিশেষতঃ কলিকাতার যাদুঘরের কর্ত্তৃপক্ষীয়ের অনুরোধ আমাকে কতকটা উত্তেজিত করিয়াছে। তাঁহাদের আমন্ত্রণে কলিকাতা যাদুঘরের পক্ষিবিভাগে কিছু কাল ধরিয়া সেখানকার বিহঙ্গসংস্থানের ব্যবস্থা করিবার ভার অনেকটা আমাকে লইতে হইয়াছে। বিশেষতঃ গত ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে পক্ষী সম্বন্ধে এত নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, পাখীর নামকরণের এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে জগতের অন্যান্য আধুনিক যাদুঘরের সঙ্গে সাম্য রাখিতে হইলে এখানকার যাদুঘরের, অন্ততঃ পক্ষিবিভাগের আমূল সংস্কার আবশ্যক বলিয়া অনুভূত হইয়াছে। এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া হাজারিবাগ ও রাঁচি মালভূমে সংগৃহীত নানা পক্ষী নিদর্শন স্বরূপ যাদুঘরে রক্ষিত হইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছি। মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই পক্ষিসংগ্রহ কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাদের প্রবীণ ত্বকবিশ্লেষক taxidermistকে আমার সহিত রাঁচিতে কিছুকাল অবস্থানের অনুমতি দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

রাঁচির উত্তর সীমানায় হাজারিবাগ এবং পালামৌ জিলা; ইহার পূর্ব্ব সীমানায় মানভূম; দক্ষিণ সীমানায় সিংভূম এবং পশ্চিম সীমানায় পূর্ব্বোক্ত পালামৌ জিলা, সুরগুজা এবং জাসপুর অবস্থিত। এই সব জিলাগুলিই ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত। যদিও জিলা-বিশেষে উদ্ভিজ্জ সংস্থানের কতকটা স্বাতন্ত্র্য আছে বটে,

গো-ভাগাড়ে শকুন

তথাপি সমগ্র ছোট-নাগপুর বিভাগে গাছপালা, পার্ব্বত্যভূমি, জলাশয়, স্রোতস্বিনী প্রভৃতির সংস্থান অনেকটা সমান। তজ্জন্য এই বিভাগের পাখীগুলার প্রায় অধিকাংশই প্রত্যেক জিলায় দৃষ্ট হয়। এখন স্মরণ রাখা উচিত যে, সকল পাখীর বিচরণভূমি যে একই প্রকার তাহা নহে। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে কতকগুলা পাখী মানব আবাসের সন্নিকটে বিচরণ করিতে ভালবাসে, কতকগুলা পাখী শ্মশানে, গো ভাগাড়ে চরিয়া বেড়ায়; কতকগুলা জলাশয়ে বা জলসান্নিধ্যে দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে; আমাদের ফলোদ্যানে, ছায়া-সুশীতল বৃক্ষরাজির শাখান্তরালে কতকগুলা পাখীর কল-ধ্বনি শ্রুত হয়; ধান্যক্ষেত্রের আশেপাশে কেহ বা আহার্য্য খুঁজিয়া বেড়ায়; উদ্ভিজ্জবিহীন পাষাণসান্নিধ্যে অথবা নাতি-উচ্চ গিরিগাত্রে কতকগুলা পাখীকে আমরা দেখিতে পাই। ইহাতে সহজেই বুঝা যায় যে পক্ষিবিশেষকে ভাল করিয়া চিনিতে হইলে, তাহার স্বীয় আবেষ্টনের মধ্যে তাহার সন্ধান লইতে হইবে। আমি পূর্ব্বে শ্যামা-হরেওয়ার কথা বলিয়াছি। এই রাঁচি জেলার মধ্যে শ্যামাহরেওয়ার খোঁজ অনেকেই হয়ত পান নাই।

শ্রীসত্যচরণ লাহা

বামুন শকুনি
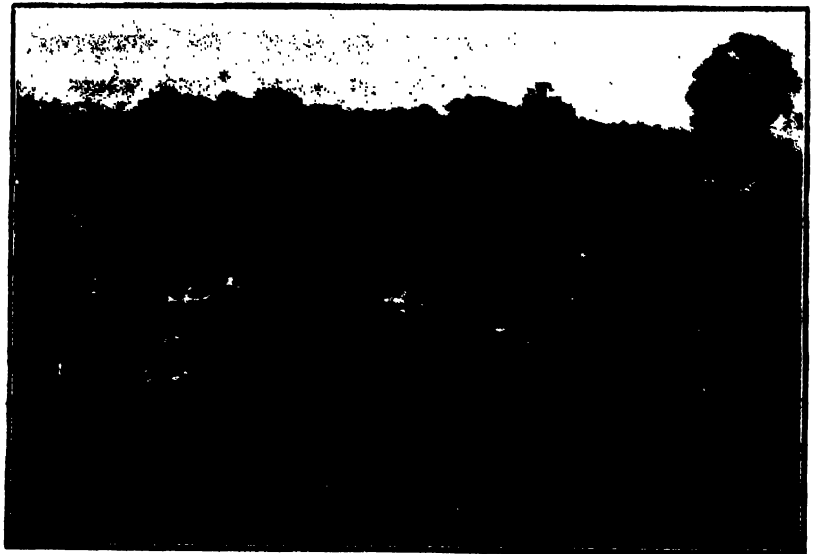
হরেওয়াকে তাহার আবেষ্টনের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে এত প্রচুর সংখ্যায় তাহাদের দর্শনলাভ হয় যে ইহাকে এই জেলার, এমন কি ছোটনাগপুর বিভাগেরও অত্যন্ত সাধারণ পাখী বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। ছোট বড় শাল বন,—যে শালগাছগুলির স্কন্ধে পুষ্পিত বড়মণ্ডাখ্য (Loranthus) লতাবল্লরী বিজড়িত—তাহাই হরেওয়ার অত্যন্ত প্রিয় বিচরণভূমি। এ অঞ্চলে এই পাখীর জন্য বড় বেশী অনুসন্ধান আবশ্যক করে না। যে সকল রাজপথ চাইবাসা, হাজারিবাগ, পালামৌ কিম্বা মানভূম অঞ্চলের দিকে বনানী বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহাদের উভয় পার্শ্বের শাল জঙ্গলে হরেওয়ার কণ্ঠস্বর সর্ব্বদাই শ্রুতিগোচর হয়। ভামার খোঁজের আবশ্যক করে বটে। সে নিতান্ত ভীরুস্বভাব; লোকচক্ষুর নিতান্ত অন্তরালে পার্ব্বত্য জঙ্গলের গভীরতম প্রদেশে তাহার আবাসভূমি। টেবো-হিসাড়ির জঙ্গলে রাঁচি-চাইবাসা পথিপার্শ্বে তাহার কখনও কখনও সন্ধান মিলে বটে; কিন্তু রাঁচি জেলার মধ্যে আমি মাত্র তাহার সন্ধান পাইয়াছি দুই জায়গায়;—রাজাডেরার নিকটবর্ত্তী ও জোন্‌হার পার্ব্বত্য জঙ্গল এবং ইচাডাগের পথে বনানীর মধ্যে।

ধনেশ ছোটনাগপুর বিভাগের একটী সাধারণ পাখী। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Lophocerous brivirostris। কিন্তু রাঁচি জেলার মধ্যে ইহা বিরলদর্শন। চুটুপালু জঙ্গলে এবং পালামৌএর পথে রাঁচির প্রান্ত সীমায় আমি ইহাকে দেখিয়াছি। জোন্‌হার পার্ব্বত্য জঙ্গলে রাজাডেরা গ্রামের কিয়দ্দূরে আমি একদিন চকিতের মত এই ধনেশের অপর একটী জাতিকে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাকে করতলগত করিতে পারি নাই।

Gazeteer পুস্তকে দেখিতেছিলাম যে ময়ূর ছোটনাগপুরের অনেক অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যায় আছে। এই জেলার মধ্যে কিন্তু আমি ইহার সন্ধান পাইয়াছি মাত্র ইচাডাগ্ সমীপস্থ গিরিপৃষ্ঠের বনানী মধ্যে। তাহার দর্শন মিলে অতি প্রত্যুষে কিম্বা সন্ধ্যার প্রাক্কালে পক্বশীর্ষ ধান্যক্ষেত্রের আশে পাশে।

বন্য কুক্কুট এই জেলার অনেক অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে আবেষ্টনের মধ্যে সে চলাফেরা করে তাহা মানবচক্ষুর অন্তরালে;—বন্ধুর পর্ব্বত গাত্রে, জঙ্গলাকীর্ণ শ্বাপদসঙ্কুল প্রাকৃতিক পটভূমিকায় তাহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। মোরগের কণ্ঠধ্বনি একবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুরুলিয়ার রাস্তায় রাজাডেরা গ্রামের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য জঙ্গলে আমি শুনিতে পাই; সেই ধ্বনি অনুসরণ করিয়া আমি অতি সন্তর্পণে পর্ব্বতগাত্রে আরোহণ করিতে থাকি; কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে আমার পদশব্দে সহসা মোরগের ডাক বন্ধ হয়; আমিও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইলাম। ভূমির উপর আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল—ঝোপে ঝাপে শিকারের সন্ধানে ছিলাম; কিছু দেখিতে না পাইয়া যেমন একপদ অগ্রসর হইলাম তৎক্ষণাৎ আমার মাথার উপরে এক বৃক্ষশীর্ষ হইতে তিনটী বন্য কুক্কুট তীরবেগে বনানীর মধ্য

দিয়া তিন দিকে উড্ডীন হইয়া আত্মগোপন করিল। আমার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, এই গাছটি তাহাদিগের রাত্রি-যাপনের নিবাসবৃক্ষ। হাজারিবাগে বিভিন্ন আবেষ্টনে আমি বন্য কুক্কুটের সন্ধান পাইয়াছিলাম;—পর্ব্বতের সানুদেশ, অসমতল বন্ধুর ভূমি, স্থানে স্থানে উহার গাত্র বিদীর্ণ করিয়া অগভীর খাদ নীচে নামিয়া গিয়াছে, ঝোপে ঝাপে কণ্টকময় উদ্ভিজ্জে সেই ভূমি জঙ্গলাকীর্ণ; সুড়ঙ্গের মত সেই বিসর্পিত খাদের মধ্যে বন্য কুক্কুটকে আমি অনেকবার দেখিয়াছিলাম। তাহার আত্মগোপন বা আত্মরক্ষার ইহা চমৎকার আবেষ্টন। হাজারিবাগের অভিজ্ঞতা এ ক্ষেত্রে কিন্তু আমার কাজে আসিল না।

এই মাত্র যে নিবাসবৃক্ষের উল্লেখ করিলাম, শুক, সারিকা বা শালিক, চটক বা চড়াই প্রভৃতি বাঙ্গালীর পরিচিত অত্যন্ত সাধারণ পাখীগুলার আচরণ যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন যে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাত্রিযাপনের জন্য দলবদ্ধ হইয়া ইহারা কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে। আমি কিন্তু সে দিন শাদা শকুনির এইরূপ একটা আচরণ লক্ষ্য করিয়াছি, যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয় না। কসাইখানার ছাদে অথবা গোভাগাড়ে এই পাখা দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে বটে। রাত্রি-যাপনের জন্য তাহারা যে দলবদ্ধ হয় তাহার পরিচয় পাইলাম জগন্নাথপুর যাইবার পথে এক প্রকাণ্ড শিমুল বৃক্ষের উপরে। অন্যত্র কিন্তু আমি অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছি যে এই পাখী একাকী দল হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া বৃক্ষশীর্ষে রাত কাটায়; তবে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে আরও দুই একটা পাখী যে দেখা যায় না, এরূপ নহে। গৃধ গোষ্ঠীর অন্তর্গত আরও কয়েকটা পাখী রাঁচি মালভূমিতে দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে বামুন শকুনি এবং পিঠশাদা শকুনির নাম করা যাইতে পারে।

শালিক বা Sturnidæ পাখীদিগের মধ্যে পাঁচটা জাতি এখানকার সাধারণ পাখী।

বুলবুলি পাখী এখানে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা বাংলার পাখী হইতে বিভিন্ন। ইহাকে একটা স্বতন্ত্র উপজাতির মধ্যে পরিগণিত করা হয়; কারণ, যদিও ইহার দৈহিক লক্ষণ প্রায় সমস্তই বাংলার কাল বুলবুলির মত, ইহা কিন্তু আকারে কিছু ছোট এবং ইহার মস্তকের কাল রং স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রসারিত; তন্নিম্নে পৃষ্ঠদেশে বাংলার কাল বুলবুলির ন্যায় বিস্তারিত নহে। আর একটা বুলবুল যাহার কর্ণে রক্তিম-রেখা লক্ষ্য করিয়া তাহার নামকরণ হইয়াছে 'কাংড়া' বুলবুল, উহা বাংলার একটা সাধারণ পাখী; কিন্তু এখানে সে এত বিরলদর্শন যে মাত্র দুই চারটা পাখীকে আমি রাজাডেরার পর্ব্বত সানুদেশে দেখিয়াছি; এখনও পর্য্যন্ত আর কোথাও এই পাখী আমার নয়নগোচর হয় নাই। অনুকূল প্রাকৃতিক আবেষ্টনের সঙ্গে পক্ষিবিশেষের অবস্থানের যে এক নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহা আধুনিক পক্ষিতত্ত্বজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করেন। ভূস্তরের গঠন-বৈচিত্র্যের ফলে উদ্ভিজ্জ বিশেষের তথায় সংস্থিতি বিশেষরূপে নিয়ন্ত্রিত; সেই উদ্ভিজ্জ বিশিষ্ট কীট-পতঙ্গের আহার্য্য অথবা আশ্রয়স্থল; সেই কীট-পতঙ্গ

কাংড়া বুলবুল

শ্রীসত্যচরণ লাহা

ঘুঘু

পাখীটার কণ্ঠস্বর কিন্তু অত্যন্ত সুমিষ্ট। পার্ব্বত্য জঙ্গলের মধ্যেই ইহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত দেখা যায়, যদিও গ্রামপ্রান্তে উন্নত বৃক্ষশীর্ষে কচিৎ দু'একটা পাখী অবস্থান করে।

রাঁচি মালভূমিতে কয়েক জাতের ঘুঘু দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে তিলে ঘুঘু অত্যন্ত সাধারণ এবং এখানকার প্রায় সর্ব্বত্র সকল আবেষ্টনের মধ্যে সে বিচরণ করে। চুটুপালু জঙ্গলে এবং জোন্‌হার পর্ব্বত সানুদেশে বন্ধুর ভূখণ্ডের মধ্যে অত্যুন্নত বৃক্ষশীর্ষে যে জাতিটাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার বৈজ্ঞানিক অভিধা Turtur risorius। ইহার দেহে ছিটে ফোঁটা নাই; পৃষ্ঠদেশে ভস্মবর্ণ লক্ষিত হয়; অধোদেশ ঈষৎ লাল্‌চে; স্কন্ধদেশের পালকের অগ্রভাগ কাল এবং তাহাদের অবস্থান এরূপ যাহাতে পাখীটার স্কন্ধদেশে একটি কৃষ্ণ রেখা অঙ্কিত করিয়া দেয়। অপর একটা জাতের ঘুঘু এখানে আছে যাহার স্বভাব সঙ্গীহীন অবস্থায় একাকী বিচরণ করা। পালামৌ যাইবার পথে "কুরু" অতিক্রম করিয়া আমি ইহার সন্ধান পাইয়াছিলাম। দেহের সাধারণ বর্ণ পিঙ্গল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালকের অগ্রভাগগুলি লাল্‌চে; তাহাতে দেহের পীতবর্ণের আধিক্য ফুটাইয়া তোলে। ঘাড়ের দুই পার্শ্বের পালকগুলিতে কৃষ্ণরেখা বিদ্যমান; চরণ লোহিত, চঞ্চু পীতাভ, দৈর্ঘ্যে সে এক ফুটেরও অধিক।

ঘুঘু পাখী গোলা পায়রার ন্যায় শস্যভুক, তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজবহুল ফলও তাহার আহার্য্য। ঘুঘু ও পায়রা আধুনিক পক্ষিবিজ্ঞান অনুসারে একই পংক্তিভুক্ত। এমন পায়রা আছে যাহারা কেবলমাত্র ফলভুক, যথা হরিয়াল। ইংরাজ শিকারীর নিকট ইহা Green pigeon নামে পরিচিত। এখানকার গ্রামবাসী ইহাকে 'হরিলা' আখ্যা দিয়া থাকে। এই হরিয়াল ঝাঁকে ঝাঁকে বট বা অশ্বত্থ শাখান্তরালে বিরাজ করে। আপনাদের অনেকেই বোধ করি এই পাখীর

আবার বিশেষ বিশেষ পাখীর খাদ্য। এতদ্ব্যতীত বিশিষ্ট উদ্ভিদের ফুলফল কীটবিশেষের যেমন আহার্য্য, পক্ষিবিশেষেরও তদ্রূপ খাদ্য বস্তু। আবেষ্টনের প্রভাব এই কাংড়া বুলবুলির উপর বাংলা দেশে তেমন বুঝা যায় না, কারণ সেখানে সে এত সাধারণ পাখী এবং সংখ্যায় এত প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান যে, স্থলবিশেষের সংকীর্ণতার মধ্যে তাহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত থাকে এরূপ মনে হয় না। রাঁচি মালভূমে যে আবেষ্টনে ইহার জ্ঞাতি কাল বুলবুলিকে এত প্রচুর সংখ্যায় দেখা যায়, তথায় কাংড়া বুলবুলি এত বিরল কেন? অথচ উভয়েরই আহার্য্য একই ধরণের এবং নীড়-রচনাপদ্ধতি একই রূপ।

ফিঙে এখানকার একটা সাধারণ পাখী, সর্ব্বত্রই বিরাজমান। লোকালয়ের সন্নিকটে, কর্ষিত ধান্যক্ষেত্রে, টেলিগ্রাফের তারে, রাজপথের ধারে বৃক্ষশাখায়, বন্ধুর উন্মুক্ত ভূখণ্ডে, গিরিগাত্রে, পর্ব্বতের অধিত্যকায় উপত্যকায় গভীর বনানীর মধ্যে ইহার দর্শন মিলে। বাংলা দেশেও এই পাখী দৃষ্ট হয়। ইহার এক নিকট আত্মীয়কে রাঁচিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার উদরদেশ শুভ্র, দেহের বাকী অংশটা কাল বটে, কিন্তু সাধারণ ফিঙের মত উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ নয়,—ফিকে।

বিশেষরূপ সন্ধান রাখেন, যেহেতু না কি ইহার মাংস একান্ত উপভোগ্য।

তিতির পাখীর মাংস অনেকে নাকি এইরূপই উপভোগ্য মনে করেন। দুই জাতের তিতির এখানকার নানা অঞ্চলে বিভিন্ন আবেষ্টনের মধ্যে বিচরণ করে, তন্মধ্যে সাধারণ তিতির পাখীটা প্রচুর সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। কাল তিতির সুরগুজা ও পালামৌ অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

একটি কথা বলিয়া রাখি। পাখীগুলির প্রাকৃতিক আবেষ্টন ও আবাসভূমির উপর ঝোঁক দিয়া আমি কয়েকটা পাখী সম্বন্ধে দুই একটি কথা শুনাইলাম; তাহাদের বৈজ্ঞানিক অভিধা ও শ্রেণীস্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে কোনও কথাই উত্থাপন করা এক্ষেত্রে সমীচীন বোধ করিলাম না। করিলে হয়ত আমার পক্ষে সুবিধা হইত; কিন্তু পাঠকগণের ধৈর্য্যরক্ষা করা কঠিন হইত। কিন্তু হরেওয়া, শ্যামা, শকুনি, তিতির, বুলবুল, শালিকের এই আল্‌গা বর্ণনা শুনিয়া ও একত্র সমাবেশ দেখিয়া কেহ যদি সহসা সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, আমার এই পক্ষিবিচারটা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক হইল, তাহা হইলে তিনি পক্ষিবিজ্ঞানের উপর একটু অবিচার করিয়া বসিবেন। পাখীর আবাসভূমিকে প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়া বিহঙ্গবিচার চলিতে পারে; বিজ্ঞানের দিক হইতে এরূপ গবেষণায় কোনও বাধা নাই;—কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টায় বিভিন্ন বিহঙ্গদেহের মধ্যে অঙ্গে অঙ্গে যে নিগূঢ় শক্তির প্রেরণায় বাহ্যিক দেহবৈলক্ষণ্য সংঘটিত হয়,—পদাঙ্গুলিতে, নখরে, চঞ্চুতে, পুচ্ছদেশে, ডানার ও পায়ের মাংসপেশীতে যে নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন ঘটে, জীববিদ্যার কাছে তাহা নিতান্ত তুচ্ছ নহে। জীবনধারণ করিতে হইলে এই সকল আবেষ্টনের মধ্যে এই সকল পাখীর এইরূপ দৈহিক সামঞ্জস্যবিধান সংঘটিত না হইলে, এই প্রকার Structural adaptation না ঘটিলে, হয়ত ইহারা লুপ্ত হইয়া যাইত। এইটুকুমাত্র ইঙ্গিত করা ছাড়া আজ এ' সম্বন্ধে বেশী কথা বলা চলিবে না।

অনেকের হয়ত ধারণা হইতে পারে যে, জঙ্গলের গভীরতম প্রদেশে বিহঙ্গকুলের যেরূপ বহুল পরিমাণে সমাগম হয়, তদ্রূপ জঙ্গলের বাহিরে খোলা জায়গায় হয় না। পর্য্যবেক্ষণের ফলে কিন্তু দেখা যায় এ ধারণা ভিত্তিহীন। তবে কতকগুলা বিশেষ বিশেষ পাখী এইরূপ গভীর বনে বিচরণ করে। এই আবেষ্টনের প্রভাব তাহাদের অঙ্গবিশেষের গঠনের উপর লক্ষ্য করিতে পারা যায়। তাহাদের Structural adaptation এরূপ যে, সেই গভীর বনের গাছপালায় বিচরণ করিয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে আহার্য্য সংগ্রহ করে;—এরূপভাবে করে যে অন্য পাখী তাহা পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ কতকগুলা পাখীর নাম করা যাইতে পারে; যথা, কাঠঠোক্‌রা Woodpeckers, Nuthatch, Wryneck (ইহাদের বাংলা নাম আমার জানা নাই), ধনেশ Hornbill, বসন্তবৌরি Barbet, দু'একটা জাতের জাঙ্গল্য পায়রা Pied Imperial pigeon। এতদ্ব্যতীত যে সকল লতাবল্লরী এখানকার বৃক্ষশীর্ষে বিলম্বিত থাকে, তাহাদের ফুলে ফলে ঋতুবিশেষে কতকগুলা ছোট ছোট মধুলোভী দুর্গাটুনটুনি জাতের পাখী অথবা একান্ত কীটভুক Fly catcher ও Flowerpecker বিহঙ্গ আকৃষ্ট হয়। ছোটনাগপুর জঙ্গলের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, গহন বনের মধ্যেও, এমন কি পর্ব্বত চূড়োও ফাঁকা জায়গা দেখিতে পাওয়া যায়;

তিতির ও উহার শাবক

রাঁচির পাখী

শ্রীসত্যচরণ লাহা

কৃষিজীবি মানব এখানকার আদিম অধিবাসী যাহারা, তাহারা কাঠ কাটিয়া জঙ্গল সাফ করিয়া চাষ আবাদ করিতেছে; এমন কি, সেই ফাঁকা জায়গাটুকুর মধ্যে একটা ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া জীবনযাপন করিতেছে। এইরূপে কৃষিজাত নানা শস্য উৎপন্ন হয় বলিয়া এখানকার জঙ্গলের মধ্যে কীটভুক অনেক পাখীরও সমাগম হয়। জঙ্গলের বাহিরে, ইহার প্রান্তদেশে, পার্ব্বত্য জঙ্গলের পাদমূলে, উপত্যকায়, পার্ব্বত্য নদীগর্ভস্থ পাষাণস্তূপে, বেলাভূমির উভয় পার্শ্বস্থ কণ্টকময় ঝোপে ঝাপে, অদূরে খণ্ডিত গ্রাম্য কুটীরের আশে পাশে, তেঁতুল, অশ্বত্থ, বট, আসান, শিমুল, বেল ও করঞ্জ বৃক্ষশীর্ষে, কর্ষিত বন্ধুর উন্নতাবনত ধান্য ক্ষেত্রের আইলে কিন্তু আরও অধিক সংখ্যায় নানা জাতীয় বিহঙ্গসমাগম দেখা যায়। এইরূপ আবেষ্টনে এই সমস্ত পাখীগুলার মনোমত খাদ্যোপকরণ বহুল পরিমাণে সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা। পাখীর পক্ষে এইরূপ আবেষ্টনের আর একটু উপযোগিতা আছে। সহসা বিপদ উপস্থিত হইলে আততায়ীর কবল এড়াইবার জন্য অদূরবর্ত্তী গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করা খুবই সহজসাধ্য।

রাঁচি সহরের অন্ততঃ দশ ক্রোশ পরিধির মধ্যে গহন কানন বা পার্ব্বত্য জঙ্গল দৃষ্ট হয় না;—কেবল খোলা মাঠ, বন্ধুর প্রান্তর, সুদীর্ঘ রাজপথ, কর্ষিত ধান্যক্ষেত্র স্তরে স্তরে সজ্জিত কৃত্রিম ঈষৎ উন্নত আইল দ্বারা সীমাবদ্ধ; দূরে দূরে গ্রামগুলির সংস্থান; কচিৎ দু'একটা নদীরেখা দৃষ্ট হয়; নৈসর্গিক জলাশয়ের একান্ত অভাব। সহজেই অনুমিত হইবে যে, এইরূপ আবেষ্টনে যে সকল বিহঙ্গ বিচরণ করে তাহাদের অধিকাংশই সামাজিক মানবের সহিত এক অলক্ষিত সূত্রে সম্বদ্ধ। কাক, বক, চড়াই, চিল, শকুনি প্রভৃতি পাখী লোকালয়ের আশে পাশে আহার্য্য সংগ্রহ করে। মানবপালিত গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি জন্তুর সহিত কতকগুলা পাখীর সম্পর্ক দেখা যায়। মাঠে বিচরণ কালে ইহাদের পদতাড়নায় অনেক কীটপতঙ্গ ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া ইতস্ততঃ লাফাইয়া পড়ে; সেই পতঙ্গ খাইবার জন্য অনেক পাখী গবাদি পশুর সঙ্গে সঙ্গে চলাফেরা করে। এই পশুগুলার আবার দেহে, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকামাকড় আশ্রয় লইয়া থাকে; সেই পোকামাকড় খুঁটিয়া খাইবার নিমিত্ত অনেক পাখী তাহাদের নিকট আকৃষ্ট হয়। কয়েকটা পাখীর নাম করা যাইতে পারে; যেমন, শালিক, গাইবক, ফিঙে প্রভৃতি। কৃষকের হলচালনার সঙ্গে অনেক কীটপতঙ্গ ভূমি হইতে বাহির হইয়া পড়ে; উহারা আবার অনেক পাখীকে আকৃষ্ট করে। শ্যেন প্রভৃতি পাখীর স্বভাব হিংস্র; ছোট ছোট পাখী মারিয়া তাহারা জীবনধারণ করে। নগরের মধ্যে ধান্যক্ষেত্রের আশে পাশে যে সকল ক্ষুদ্রদেহ

চিল

পক্ষী অবস্থান করে তাহাদের সন্ধানে শ্যেন জাতীয় পাখী মৃদু উড্ডীন ভঙ্গিতে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। মানুষ কর্ত্তৃক কর্ত্তিত খালে, পুষ্করিণী ও বাঁধে যে সকল মাছের চাষ হইয়া থাকে, মৎস্যভুক মাছরাঙ্গা, বক, শঙ্খচিল প্রভৃতি অনেক বিহঙ্গ সেই সকল জলাশয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমার সামান্য পর্য্যবেক্ষণের ফলে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয় যে রাঁচি সহরের দশ ক্রোশ পরিধির মধ্যে প্রায় এমন কিছু পাখী দেখিতে পাই নাই যাহা আমাদের বাংলা দেশে দৃষ্ট হয় না।

গো-বক

রূপে গ্রহণ করে। একবার আমার মনে পড়ে বন্দুকের ছট্‌রায় সামান্যমাত্র আহত হইয়া একটি ভস্মদেহ ধনেশ আমার হস্তগত হইয়াছিল। তাহাকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টিত হইয়া তাহার খাদ্য লইয়া আমাকে কিছু বিব্রত হইতে হয়; দুই দিন স্বেচ্ছায় কিছুই খাইতে চাহিল না, চঞ্চু ফাঁক করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার গলাভ্যন্তরে কয়েকটা ফল প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু সেই ফল সে উপর্য্যুপরি বমি করিয়া ফেলিতে লাগিল। অবশেষে দু'একটা ক্ষুদ্র মৎস্য তাহার সম্মুখে আনা গেল; তখন সে সাগ্রহে উহা গ্রহণ করিল। এইরূপ আচরণ তাহার স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না; কারণ ধনেশ মৎস্যভুক নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহা ফলভুক পাখী, কিন্তু পোকামাকড়ও সে খাইয়া থাকে।
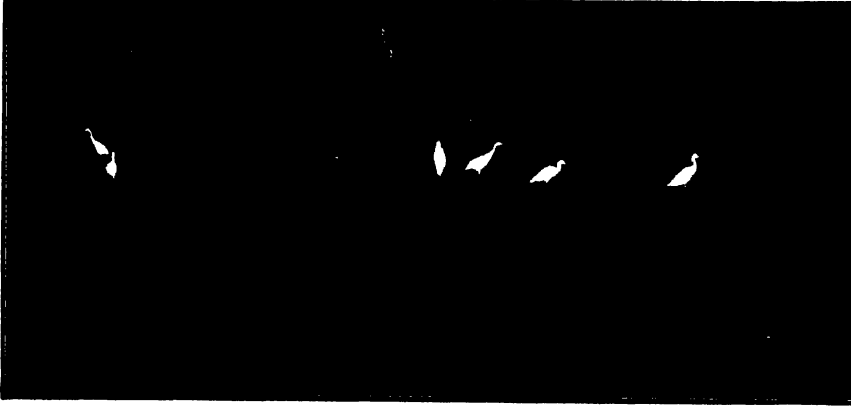
রাঁচি জেলার পাখী সম্বন্ধে বলিতে হইলে স্বভাবতঃই মনে আসে যে এখানকার যাবতীয় পাখীগুলার এক সুদীর্ঘ তালিকা উপস্থিত না করিলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বৈজ্ঞানিক পক্ষিবিশেষজ্ঞগণ নিশ্চয়ই বক্তার নিকট হইতে এইরূপ একটি তালিকার দাবী করিবেন। কিন্তু শুষ্ক, নীরস বিদেশীয় নামবহুল তালিকা সকলের হৃদয়গ্রাহী হইবে না; পরন্তু ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে এইরূপ তালিকাপ্রদান কার্য্য হইতে বিরত হওয়া আমি সঙ্গত মনে করিয়াছি। তবে বাংলা দেশে যে সকল পাখী দেখিতে পাওয়া যায় না এরূপ অনেক বিহঙ্গ এই জেলায় দৃষ্ট হয়; বিশেষতঃ জঙ্গল অঞ্চলের পাখী এবং হেমন্ত ঋতুতে যাযাবর (migratory) বিহঙ্গ যাহাদের আগমন এখন হইতে কিছু কিছু আমি লক্ষ্য করিতেছি এবং কিছুদিন পরে নিশ্চয়ই আরও এইরূপ প্রব্রজনশীল পক্ষীর আবির্ভাব হইবে; তাহাদের সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলিয়া আমি আজিকার মত আমার বক্তব্য শেষ করিব।

ধনেশ এখানকার অনেক অঞ্চলের একটি সাধারণ পাখী; দুই জাতীয় ধনেশের সন্ধান আমি এখানে পাইয়াছি। প্রথমটি ভস্মবর্ণ, দ্বিতীয়টির দেহের উপরিভাগ কৃষ্ণবর্ণ, ডানা এবং পেটে শাদা রং দেখা যায়। ধনেশ প্রধানতঃ ফলভুক পক্ষী; কাঞ্চন ফুলের পাপড়ী আমি ইহার উদরাভ্যন্তরে পাইয়াছি; তাহাতে আমার মনে হয় ইহারা ঐ ফুলও খাদ্য-

হরেওয়া ও বুলবুলের কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাংলায় সাধারণতঃ হরেওয়াকে দেখিতে পাওয়া যায় না; কারণ জঙ্গল অঞ্চলেই তাহার বাস। এখানে দুইটা উপ-জাতির হরেওয়া দেখা যায়; দুইটাই সবুজদেহ। তবে একটার কপালে কমলা লেবুর রং বিদ্যমান; অপরটার সেরূপ নাই।

ক্যার্‌ক্যাটা (Shrike) জাতীয় তিন চারটা বিভিন্ন পাখীকে এখানে দেখা যায়। বাংলা দেশে তাহাদের দুই একটা শীতকালে নবীন আগন্তুকরূপে দৃষ্ট হয়।

মক্ষিকাভুক Flycatcher গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কতকগুলা পাখী রাঁচির জঙ্গল অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসী (resident)। দুই একটা Flycatcher সম্প্রতি এখানে আগন্তুক (migra-tory) হিসাবে যে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। সারা শীতকাল হয়ত তাহারা এখানে থাকিয়া

শ্রীসত্যচরণ লাহা

যাইবে; বসন্তাগমে হিমালয়সান্নিধ্যে ঠাণ্ডা জায়গায় হয়ত তাহারা উপনীত হইয়া স্বীয় গৃহস্থালি সুরু করিয়া দিবে।

পরভৃত পাখীদের মধ্যে কোকিল, পাপিয়া এবং বৌ-কথা-কও এখানে আছে বটে, কিন্তু বাংলা দেশের মত খুব বেশী সংখ্যায় তাহারা দৃষ্ট হয় না। Coccystes Jacobinus বা শা বুলবুল পাখীও এই গোষ্ঠীভুক্ত অর্থাৎ ইহা পরভৃত, পরের বাসায় লুকাইয়া ডিম পাড়িয়া আসে; নিজে বাসা রচনা করিতে জানে না। পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, যদিও বাংলায় সে শা-বুলবুল নামে অভিহিত হয়, বুলবুল কথাটির কোন সার্থকতা নাই; কারণ বুলবুল সম্পূর্ণ বিভিন্ন পাখী; আকারে আয়তনে, দেহের গঠনে এবং অঙ্গবিশেষের সংস্থানে বুলবুলের সহিত ইহার মিল নাই। তবে এইমাত্র মিল দেখা যায় যে, সাধারণ কাল বুলবুলের মত ইহার মস্তকে পতত্রশিখা আছে। Shirkeer Cuckoo আর একটী পরভৃত পাখী—এ অঞ্চলে দৃষ্ট হয়; ইহার চক্ষু পীতাভ লাল, দেহের রং হাল্কা ধূসর।

Nightjar পাখীর দেশীয় নাম আমার জানা নাই। ইহারা নিশাচর পাখী; নিশাচর কীটপতঙ্গের সন্ধানে রাত্রিকালে ইহারা ঘুরিয়া থাকে। প্রকৃতির বিধিব্যবস্থা ইহাদের মুখের গঠন এরূপ যে, উড্ডীন অবস্থায় ইহারা ছোট ছোট কীটপতঙ্গ অনায়াসে চঞ্চুপুটে ধরিতে পারে। চঞ্চুটি ক্ষুদ্র, কিন্তু মুখের হাঁ বেশ বড়। অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, তালচোঁচ পাখীর স্বভাব দিবাভাগে ক্ষিপ্র পক্ষচালনায় উড্ডীন থাকিয়াও এইরূপে আহার্য্য সংগ্রহ করা; তাহারও মুখের গঠন ভঙ্গী এইরূপই; কিন্তু সে নিশাচর নহে। Nightjar পাখীর কয়েকটা জাতি রাঁচি মালভূমে দৃষ্ট হয়। দিবাভাগে সে ঝোপে ঝাপে ভূমির উপর উপলখণ্ডের পার্শ্বে, অপেক্ষাকৃত তামসঘন স্থানে, আত্মগোপন করিয়া বসিয়া থাকে। সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সে শিকারের সন্ধানে বাহির হয়। "শিকার" কথাটিতে মনে পড়িয়া গেল যে আজকাল শিকারী ব্যক্তিগণের একটা মহা ঝোঁক মোটরকারে প্রোজ্জ্বল বিজলি বাতির সাহায্যে রাজপথের ধারে ছোটনাগপুরের জঙ্গল অঞ্চলে হিংস্র পশু শিকার করা। পশুটার চোখের উপর প্রখর আলোকরশ্মি নিপাতিত করিয়া চলৎশক্তি রহিত অবস্থায় তাহার উপর গুলি নিক্ষেপ করা হয়। আমি কিন্তু সেদিন হণ্ড্রু-প্রপাত দর্শন করিয়া ফিরিবার কালে রাস্তার উপরে এইরূপে সন্ধ্যায় মোটরকারের Spot-light সাহায্যে কয়েকটা Nightjar পাখী সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

এই সকল পাখী লইয়া প্রায় কাহারও সহিত আমার মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে মানভূম, সিংভূম, হাজারিবাগ, পালামৌ জেলার বিহঙ্গ-গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও সুচিন্তিত মন্তব্যের সহিত একটু আধটু অনৈক্য হইতেছে। এতগুলা জেলার পাখীর আপেক্ষিক আলোচনা না করিতে পারিলে

গো-বক কীট-পতঙ্গের আশায় গবাদি পশুর সঙ্গে সঙ্গে চলাফেরা করিতেছে

অনেক তথ্য অনাবিষ্কৃত বা অপরিষ্কৃত থাকিয়া যায়। প্রথম গোল বাধে পাখীর ব্যাপ্তি ও বিহার, Distribution লইয়া। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'রাজালাল' পাখীর উল্লেখ Stuart Baker প্রমুখ অনেকের রচনায় পাই। তাঁহার Avifauna of British India একটী প্রামাণ্য গ্রন্থ। সাধারণতঃ মনে হয় তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার বেশী আর কিছু বলিবার নাই। কিন্তু এই পাখীটি সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন যে ইহাকে পাওয়া যায়—The Himalayas from the Sutlej Valley to Eastern Assam North of Brahmaputra, অর্থাৎ হিমালয়সান্নিধ্যে। অথচ আমরা ইহাকে ছোটনাগপুর মালভূমির রাঁচির জঙ্গলে পাইলাম। এইরূপ

বহু দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা যাইত। অতএব বহু ব্যক্তির সমবেত চেষ্টা ও ঐকান্তিক সাধনা না হইলে পক্ষিজীবন-রহস্য সহজে উদ্‌ঘাটিত হইবে না। প্রকৃতির কোন রহস্যই
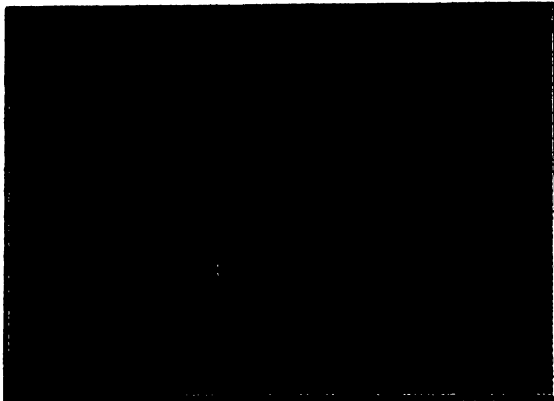
শঙ্খচিল

সহজে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। পাখীকে খাঁচায় পুষিয়া তাহার বিচিত্র জীবনলীলা আবদ্ধাবস্থায় আমাদের দেখিবার সুযোগ আছে; প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে বিহঙ্গাশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ চলিতেছে;—য়ুরোপ, মার্কিণের নানা দেশে চলিতেছে, আমাদের দেশেই বা চলিবে না কেন? আমাদের দেশের মত কোথায় এত খোলা মাঠ, কোথায় এত পার্ব্বত্য নদী, এত বড় পাহাড়, এত ঘন বন? প্রকৃতি এখানে তো কোনরূপ কৃপণতা করেন নাই! তাঁহার এই অজস্রতার, এই ঐশ্বর্য্যের, এই পরিপূর্ণ জীবন-স্রোতের সম্মুখে মূঢ় ও নিঃস্পন্দ হইয়া থাকিলে কিছুই আমাদের আয়ত্ত হইবে না। আলো চাই, হাওয়া চাই, জ্ঞান চাই; কর্ম্মবিমুখতা, অসাড়তা আমাদিগকে চিরদিনের মত কূপমণ্ডুক করিয়া রাখিবে। সুখের বিষয়, বাঙ্গালী সন্তান আজ সানন্দে বিজ্ঞানকে বরণ করিয়া লইয়াছেন; তাই মনে হয়, একদিন আমরা আলো পাইব; নবীন জীবনের বসন্ত সমীরণে আমাদের চিত্ত জাগিয়া উঠিবে; আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে। রবীন্দ্রনাথের কথায় আজিকার বক্তব্য শেষ করিলাম—

'আসিবে, সেদিন আসিবে'।

মাছরাঙা
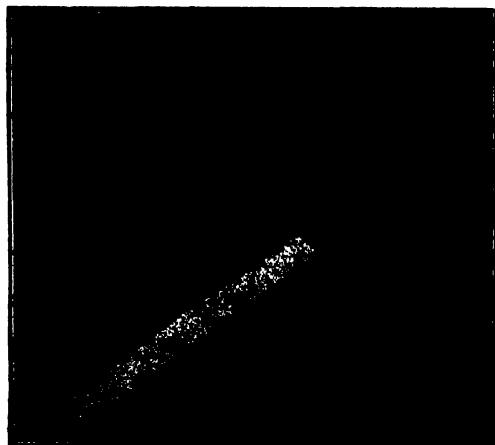
স্বরলিপি

"নটরাজ"

আসন্ন শীত

শীতের বনে কোন্ সে কঠিন
আস্‌বে ব'লে
শিউলিগুলি ভয়ে মলিন
বনের কোলে ॥
আমলকি ডাল সাজ্‌ল কাঙাল,
খসিয়ে দিল পল্লব জাল,
কাশের হাসি হাওয়ায় ভাসি,
যায় সে চ'লে ॥
সইবে না সে পাতায় ঘাসে
চঞ্চলতা,
তাইতো আপন রঙ ঘুচালো
ঝুম্‌কো লতা
উত্তর বায় জানায় শাসন,
পাত্‌লো তপের শুষ্ক আসন,
সাজ খসাবার এই লীলা কা'র
অট্টরোলে ॥

কথা ও স্থর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II{সা গা মা পা । না -া নধা -না I -র্সা -র্গা র্গা র্গর্রা । র্সা -া র্সা -না I
শী তে র ব নে • কো • • ন্ সে ক ঠি ন্ আ স্

I ধনা -া নর্সা -র্সনা । ধপা -া -া -া I পা -র্সা সা -র্সণা । ধা পা মা গা I
বে • ব • লে • • • শি উ লি গু লি ভ য়ে ম

I মা -া -া -া । সা রা গা গা I মা -া -া -া । -া -া -া -া}I
লি • • ন্ ব নে র কো লে • • • • • • •

I পা -া -না না । না -া -া -া I পা -া না না । না -া -া -া I
আ ম্ ল কি ডা • • ল্ সা জ্ ল কা ঙা • • ল্

I র্সা র্সা র্সা -া । র্সা -না র্রর্সা -া I না -া পা না । না -া -া -া I
খ সি য়ে • দি • ল • প ল্ ল ব জা • • ল্

I র্সা র্গা র্রা র্মা । র্গা -া র্গা -র্রা I -র্সা -র্রা -র্গা র্রা । -র্সা -া -া -া I
কা শে র হা সি • হা • • • • • য়্ • • •

I র্সনা র্সা -া র্রা । র্রসা -া র্সা -না I নধা -না -র্সা -া । র্সনা -া -া -া I
হাও য়া য়্ ভা। সি • যা • • • • • য়্ • • •

I নধা -না র্সা না । ধপা -া -া -া I
যা য়্ যে চ লে • • •

I পা -র্সা র্সা ণা । ধা পা মা গা I মা -া -া -া । সা রা গা গা I
শি উ লি গু লি ভ য়ে ম লি • • ন্। ব নে র কো

I মা -া -া -া । -া -া -া -া I
লে • • • • • • •

I {সা -া রা রা । গা -া -া -া I রা গা -া গা । মা -া -া -া I
স ই বে না সে • • • পা তা য়্ ঘা সে • • •

I মা -গা পা জ্ঞা । পা -া -া -া I
চ ন চ ল তা • • •

I পা -জ্ঞা ধা পা । ধা -া -া -া I ধা -া না ধা । না -া -া -র্সা I
তা ই ত আ প • • ন্ র ঙ্ ঘু চা লো • • •

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I র্সধা -না র্সা না। ধপা -া -া -া}I
ঝু ম্ কো ল তা • • •

I {পা -া পনা না। না -া -া -া I র্সা র্সা -র্রা না। র্সা -া -া -া I
উ • ত্ত র বা • • য়্ জা না য়্ শা স • • ন্

I র্সা -া গা র্রা। রর্গা -র্মা -র্গা -া I র্সা -র্রা র্গা র্রা। সা -া -া -া}I
পা ত্ ল ত পে • • র্ শু ষ্ ক আ স • • ন্

I র্সা -গা গা র্রা। র্সা -া সা -না I -ধা -না -র্সা -া। -না -া না -র্সা I
সা জ্ খ সা বা র্ হা ০ • • • • • য়্ এ ই

I র্সধা -না র্সা -না। ধপা -া -ধা -না I নধা -র্সা র্সা না। ধপা -া -া -া I
লি • লা • কা • • র্ অ • ট্ট রো লে • • ..

I পা -র্সা র্সা ণা। ধা পা মা গা I মা -া -া -া। সা রা গা গা I
শি উ লি গু লি ভ য়ে ম লি ০ • ন্ ব নে র কো

I মা -া -া -া। -া -া -া -া IIII
লে • • • • • • •

কাজাক্ জাতি

রুশীয় তুর্কীস্থানের তৃণভূমি-মধ্যে এক ভ্রাম্যমান প্রান্তরচারী জাতি বাস করে। ইহাদের স্থায়ী বাসগৃহ নাই; ইহারা দলে দলে স্ত্রী-পুত্র লইয়া আজও প্রাচীন ককেশস্-বাসীদের মতো রুশীয় তুর্কীর মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। অল্প লোকই ইহাদের পরিচয় জানে। ইহাদের প্রকৃতি অতি ভাষণ—যেমন নিবিড় বন্ধুত্ব করিতে জানে তেমনই মারাত্মক শত্রুও হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে বিচরণ করিতে হইলে প্রাণ হাতে করিয়া ফিরিতে হয়।

ইহাদের প্রধান ক্রীড়া (ব্যসন বলিলেও চলে) শিক্ষিত ঈগল-পক্ষী লইয়া শিকার করা। ইহারা অশ্বারোহণেও সুদক্ষ। কাজাকদের বালিকারা-ও প্রায় পুরুষদের মতোই নিপুণ অশ্বারোহী।

কুয়েনডিস্ক্ নামক স্থানে দুই মাস ব্যাপী একটি মেলা হইয়া থাকে। এই যায়গাটি নিকটতম রেল-ষ্টেশন হইতে তিন শত মাইলের-ও অধিক দূরে অবস্থিত। এই মেলাতে সর্ব্বপ্রকার আমোদের আয়োজনই থাকে। সুদূর স্থান হইতে লোকে আসিয়া এই মেলায় যোগ দিয়া থাকে। নানা ভাষায় নানা জাতীয় লোক কথাবার্তা কহিয়া থাকে ও সে-সমস্ত শব্দ-সংমিশ্রণে, কথা শোনা বা কথা কওয়া এক ভীষণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

যাদুকর, নাট্য-সম্প্রদায়, কুস্তিগীর, গণৎকার, নর্ত্তক-নর্ত্তকী, কিছুই বাদ যায় না। আবার স্থানীয় সপ্তদশ ভাষায় সুপণ্ডিত লোক-ও অর্থোপার্জ্জনের জন্য আসিয়া থাকে। তাহারা মেলার নিরক্ষর লোকদের হইয়া চিঠিপত্র লিখিয়া দেয়। আবার প্রয়োজন হইলে তাহারা কবিতাতেও পত্র রচনা করিতে পারে!

ইহাদের তাম্বুগুলিও দেখিবার বস্তু। প্রথমে বাঁশ ও কাঠের সুন্দর গোলাকার কাঠামো তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর মোটা কাপড় দিয়া ছাওয়া হয়। বাহিরে দেখিতে যেমনই হউক, ভিতরটি এতই সুসজ্জিত যে দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়!

ইহাদের পরিচায়ক কয়েকটি চিত্র, পরবর্ত্তি প্রবন্ধের মধ্যে মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইল।

শ্রীরামেন্দু দত্ত

গ্রীস-ইতিহাস-পুনর্গঠনে প্রত্নতাত্ত্বিকের কাজ

পঁচিশ শত বৎসর পূর্ব্বেকার যে শিক্ষাদীক্ষা একদিন বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে আলোক বিতরণ করিয়াছিল তাহার প্রত্যেকটি নিদর্শন পুনরুদ্ধার-করণ-মানসে, সেই শিক্ষা ও সভ্যতার আবাসভূমি গ্রীসের ভূমিগর্ভ, প্রত্নতাত্ত্বিকের সযত্ন কোদালীঘায়ে ওলট পালট হইতে চলিয়াছে। অনুসন্ধিৎসু'র সতর্ক-দৃষ্টি মৃত্তিকার অভ্যন্তরে জ্ঞান সম্ভার প্রাণপণে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। প্রায় দ্বাদশটী বিভিন্ন দেশ ও জাতি হইতে বিজ্ঞমণ্ডলী গ্রীস-ইতিহাসের সামান্য সামান্য অংশ সংগ্রহ করিয়া তাহার সমাবেশে ইতিহাসের পৃষ্ঠা পরিপূরণের উদ্দেশ্যে একত্রে মিলিত হইয়া সমস্ত গ্রীস্ জুড়িয়া কাজ চালাইতেছেন। ইঁহাদের কার্য্য চালাইবার পন্থা যেমন সঠিক তেম্‌নি অভিনব। যে কোন একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহারা কার্য্য আরম্ভ করেন, সেই স্থানেরই নিম্নস্তর হইতে কোন না কোন প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ অথবা কোন

গ্রীস-ইতিহাসের পুনর্গঠন

একটী কাজাক্ ও তাহার শিকারী বাজ

প্রস্তর-মূর্ত্তি পাওয়া যায়। ইহা দেখিয়া মনে হয় যেন তাহারা পূর্ব্ব হইতেই গণনা করিয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নূতন একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে যেমন প্রথমে স্থান নির্দ্দেশ করা হয়, তাহার পর ভিত খোঁড়া হয়; এই সব স্থানেও ঠিক সেই প্রণালী অনুসারেই কাজ-কর্ম্ম চালান হয়। কোন একটী স্থান প্রথমে মনোনীত করিবার পর সেই স্থান কত গভীর করিয়া খনন করিতে হইবে তাহাও তাঁহারা প্রথম হইতেই নির্ণয় করিয়া লন, তাহার পর 'ক্রেন' ইত্যাদির দ্বারা প্রথমে মৃত্তিকার কঠিন স্তরগুলিকে সরাইয়া খন্তা, কোদালী ও শাবল প্রভৃতির সাহায্যে কাজ আরম্ভ করা হয়। পরে খনন করিতে করিতে ঠিক সেই স্থানেই ২০ বা ২৫ ফিট্ নিম্নে কোন না কোন প্রাচীন ইতিহাসের নিদর্শন খুঁড়িয়া বাহির করেন। প্রত্যেকটি স্থান খনন করিবার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে সেই স্থান হইতে তাঁহারা 'মাইলোর ভেনিসের মূর্ত্তির' মত কোন মূর্ত্তি বা ইতালীর পম্পি নগরী হইতেও বৃহৎ কোন লুপ্ত নগরের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া প্রাচীন গ্রীক্ ইতিহাস পুনরায় নূতন করিয়া গড়িতে সমর্থ হইবেন। কোন স্থলে হয়ত তাঁহাদের শ্রম ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে, আবার অনেক স্থলে হয়ত মজুরের অসাবধানতায় কোদালির আঘাতে তাঁহাদের বহু পরিশ্রম-লব্ধ ফল কোন প্রস্তরমূর্ত্তি, আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বেই চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তবু তাঁহাদের নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের বিরাম নাই, সমভাবেই কার্য্য চালাইয়া যাইতেছেন। সকলেরই মনে অটল প্রতিজ্ঞা, এই স্থান হইতেই তাঁহারা গ্রীসের অলিখিত ইতিহাসের কয়েকটি পরিচ্ছেদ জগতের সম্মুখে ধরিয়া দিবেন। ইঁহাদের ধৈর্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

গ্রীসের রাজধানী এথেন্স নগরের পরিত্যক্ত বাজারের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতেই অধিকাংশ স্তম্ভ, প্রাসাদ, মন্দির, রাজবর্ত্ম ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থানের পশ্চিম দিকে 'থিসিয়সের' মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার সন্নিকটেই প্রসিদ্ধ 'ডিপাইলন গেট্' অবস্থিত এবং এই দ্বার দিয়াই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক 'পসেনিয়স্' খৃঃ পূঃ ২ শতাব্দীতে এই সকল স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ বর্ত্তমান প্রত্নতাত্ত্বিকদের কার্য্যে বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে জিনিষটীর অবস্থিতি যেখানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, খনন করিতে করিতে প্রায় সমস্তই সেই সব স্থানেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে। এথেন্সের পুরাতন বাজার এবং বিচারালয় 'অ্যাগোরা' এখনও অর্দ্ধমৃত্তিকাচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ তোরণ এবং তাহার উপরিভাগে বিখ্যাত রোমান্ নৃপতি 'হ্যাড্রিয়নের' অনুশাসন দৃষ্টিগোচর হয়। 'অ্যাগোরা'টী এত বৃহৎ যে ইহার মধ্যে 'পসেনিয়স' কুড়িটিরও বেশী প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য দেখিয়াছিলেন। যে সকল স্তম্ভ এবং প্রস্তর-প্রাচীরের অংশ এ পর্য্যন্ত মাটি খুঁড়িয়া উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই অনুমান করা যায় যে সেই স্থানের ভূগর্ভে আরও কত কি লুক্কায়িত আছে! গত একশত বৎসর যাবৎ এই বাজারের নানাস্থানে, এই সব বৃহৎ স্তম্ভ ও প্রাচীর-গুলিকে অবলম্বন করিয়া অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর নি[illegible]

প্রাসায়নক্সা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। 'আগোরার' মধ্যকার রাস্তা বাহিয়া রাজা দ্বিতীয় 'এট্রেলসের' দ্বারমণ্ডপে পৌছান যায়। এই দ্বারমণ্ডপটী চতুর্দ্দিকে ঘেরাও করা একটি প্রকাণ্ড বাজার বিশেষ। এই স্থানের প্রস্তর-প্রাচীরের উচ্চতা গড়ে প্রায় ৩৮০ ফিট। ভিতরে একুশটী বড় বড় দোকান এবং অর্দ্ধভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। ইহার সন্নিকটেই 'হ্যারডিয়নের' পুস্তকাগার অবস্থিত। এই পুস্তকাগারটী এত সুন্দর ছিল যে 'পসেনিয়স্' ইহার শতাধিক সোপানাবলী বাহিয়া উপরে উঠা যায়। প্রাচীন স্থপতি বিদ্যার নিদর্শন এই হর্ম্ম্যরাজিকে এখনও নূতন বলিয়া ভ্রম হয়, যদিও স্থানে স্থানে অনেক সংস্কার করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য সেগুলিকে একটু অশোভন দেখায়। এখানকার কতকগুলি মূর্ত্তি ও স্তম্ভ এখনও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে, কারণ এই সকল স্তম্ভ ও মূর্ত্তি সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে স্পার্টার সহিত এথেন্সের যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় কারিগরগণ কাজ শেষ করিবার অবসর পান নাই। 'অ্যাক্রোপোলিশে'র

অশ্বপৃষ্ঠে কাজাক্ বালিকা
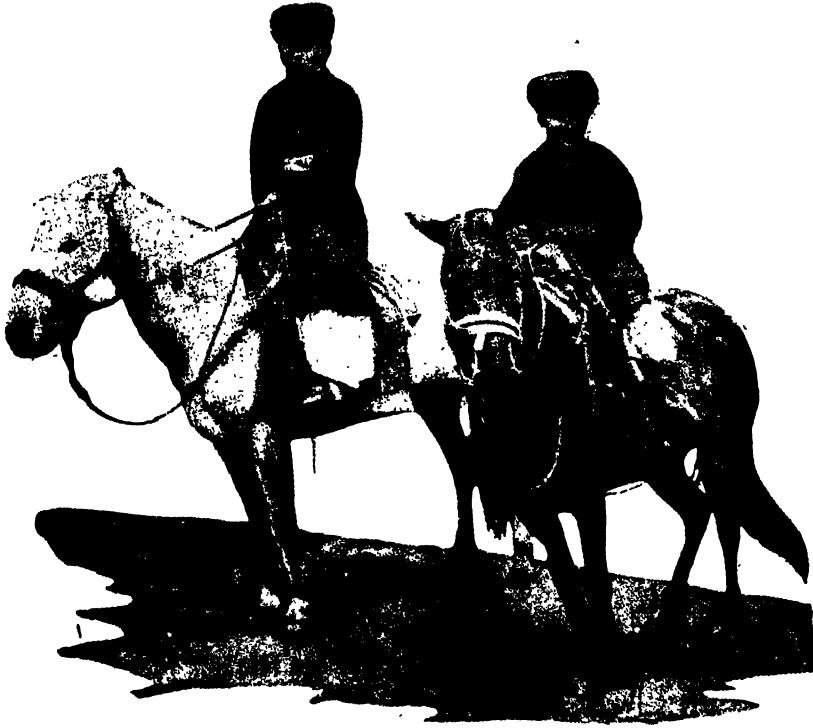
শ্বেতমর্ম্মর-স্তম্ভগুলির কারুকার্য্য বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ভিতরের সোনালি কাজ করা ছাদ, বিচিত্রিত দেওয়াল ও ক্ষুদ্রবৃহৎ মর্ম্মর মূর্ত্তিগুলি গৃহের শোভা সমধিক বর্দ্ধন করিত।

'অ্যাগোরা' বাজারের নিকটস্থ একটী উচ্চ পর্ব্বতের উপর প্রসিদ্ধ 'অ্যাক্রোপোলিস্' দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা পর্ব্বতের উপরস্থ কয়েকটী প্রাসাদ ও মন্দিরের সমষ্টি। সুন্দর প্রাসাদাদি নির্ম্মিত হইবার দুই হাজার বৎসর পর তুর্কীগণ কিছুদিন ইহার মধ্যে সৈন্যাবাস স্থাপন করিয়াছিল। সেই সময়ে ভিনিসিয়দের সহিত যুদ্ধে ইহার অনেক স্থানই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন গ্রীসের কলা-বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'এথিনা' মূর্ত্তিরও নিম্নভাগের কিয়দংশমাত্র এখন বর্ত্তমান আছে। এই মূর্ত্তির উপর সূর্য্য-রশ্মি প্রতি-ফলিত হওয়াতে প্রাচীনযুগে ইজিয়ন উপসাগরের নাবিক-

গ্রীস-ইতিহাসের পুনর্গঠন

কাজাক রমনীগণ তাহাদের তাঁবুর কাঠামো নির্ম্মাণ করিতেছে।

দিগের দিঙ্‌নির্ণয়ে বিশেষ সাহায্য হইত। 'এথিনা' মন্দিরের নিকটেই 'নিকা অ্যাপ্টেরসের' মন্দির। এই মন্দিরটি এতই সুন্দর ও এই স্থান হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য এতই মনোহর দেখায় যে দেশ-বিদেশ হইতে নর-নারীগণ আসিয়া ইহার আলোকচিত্র লইয়া যান্। কিন্তু এই সকল আলোক-চিত্রের সাহায্যে ইহার সৌন্দর্য্য অতি সামান্তই প্রকাশ পায়। এই মন্দিরের চতুর্দ্দিক শ্বেত-প্রস্তরের চত্বরে ঘেরা। নিকটস্থ একটী ঢালু পর্ব্বতের উপর 'ইরেক্‌থিয়ম' নামক হর্ম্ম্য অবস্থিত। ভার-সাম্য করার জন্য ইহার একদিকে একটী বারাণ্ডা নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রস্তর-নির্ম্মিত ছয়টী গ্রীসীয় রমণীমূর্ত্তি এই বারাণ্ডাটির খুঁটির কাজ চালাইতেছে। ইহার মধ্য হইতে একটী মূর্ত্তি লর্ড এল্‌গিন ব্রিটিশ মিউজিয়মে লইয়া যান। উহার পরিবর্ত্তে সিমেণ্টের একটী মূর্ত্তি স্থাপিত করায় দেখিতে বড়ই বিসদৃশ হইয়াছে। 'ইরেকথিয়মের' অনেক অংশই লর্ড এল্‌গিন কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হওয়াতে সেই সব স্থান পুনর্গঠিত করা হইয়াছে; কিন্তু উহা দেখিতে পূর্ব্বের স্থায় আর তেমন সুদৃশ্য হয় নাই।

'ইরেকথিয়মের' সম্মুখেই 'পাত্থেনন্' নামক প্রকাণ্ড প্রাসাদ। তখনকার যুগের ধারানুযায়ী এই প্রাসাদটীও বিশাল স্তম্ভের উপর সাধাসিধা ভাবেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার ধ্বংসাবশেষ হইতে গ্রীসীয়গণ আবার নূতন প্রাসাদ গড়িয়া তুলিতেছেন, কিন্তু নূতন অংশগুলি অতি সহজেই পুরাতন অংশ হইতে পৃথক করা যায়, যদিও তাঁহারা যতদূর সাধ্য পুরাতন আদর্শটীকে সম্মুখে রাখিয়াই নূতনটীকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

করিন্থ উপসাগরের এক মাইলের মধ্যে করিন্থ সহরের অস্তিত্বও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সহরটি প্রাচীন গ্রীসের একটী প্রধান বন্দর ছিল। করিন্থ সহরের হর্ম্ম্যাবলীর নির্ম্মাণ-প্রণালী ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন মূর্ত্তিগুলি এবং অন্যান্য চিত্রাদির সাহায্যে আমরা সেই যুগের লোকদের রুচি ও শিক্ষা-দীক্ষার অনেক বিষয় জানিতে পারি। যখন সহরটীকে পুনরুদ্ধার করা হয়, তখন কেবলমাত্র বিখ্যাত 'অ্যাপোলোর' মন্দির ব্যতীত অন্য আর কিছুই ছিল না। করিন্থের পুরাতন থিয়েটার গৃহটীও একটী দ্রষ্টব্য জিনিষ। এটী প্রায় ৩০ ফিট্ মাটির তলায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পড়িয়া ছিল। ষ্টেজ্ এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর বসিবার স্থান ইত্যাদি সবই সুন্দরভাবে এখনো বর্ত্তমান আছে।

(মেলায় সাধারণ দৃশ্য)—কুয়েনডিল্‌ক্ রেলপথ হইতে ৩০০ মাইল দূরে।

আর একটী দ্রষ্টব্য জিনিষ 'মাইসেনি' নামক স্থানের একটী পুরাতন কবরখানা। ইহা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কবরখানাটী চারিটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। একটী প্রকোষ্ঠে দুইটী নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে এবং সকলেই এই দুইটীকে রাজা ও রাণীর কঙ্কাল বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন। এই কঙ্কালগুলির চতুর্দ্দিকে মিশরের নব আবিষ্কৃত 'টুটেনখামেনের' কবরের ন্যায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার দ্রব্যসম্ভার মজুদ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। রাজার বুকের উপর একটী স্বর্ণ-নির্ম্মিত পেয়ালা এবং পেয়ালার মধ্যে রাজার চারিটি নাম-মুদ্রা আছে। রাজার নিকটে চারিখানা তরবারি এবং পায়ের কাছে দুইটি রৌপ্যের, একটী স্বর্ণের ও কতকগুলি কাঁসার পেয়ালা রক্ষিত আছে। রাণীর বুকের উপরও রাজার মতনই একটী সোনার পেয়ালা এবং গলায় ৬১টী স্বর্ণের দানাবিশিষ্ট একছড়া কণ্ঠহার আছে। অন্য প্রকোষ্ঠে আরও একটী কঙ্কালের গলাতে ৩৮টী স্বর্ণের দানাবিশিষ্ট হার এবং কোমরে স্বর্ণের মেখলা আছে। ইহা রাজকুমারীর কঙ্কাল বলিয়া সকলে স্থির করিয়াছেন।

কাজাক সুন্দরী

বৃষারোহী কাজাক্ ও শিশুপুত্র

প্রাচীন মাইসিনিয়ন কারিগরদের কারুকার্য্যের এই সব নিদর্শনগুলি দেখিতে দেখিতে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিতে হয়, তাহাদের বর্ণনা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এই কবরটী খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্থির করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার এই সব প্রাচীন গ্রীসীয় নিদর্শনগুলিকে প্রাচীন মিশরের সভ্যতার অনুকরণ বলিয়া ঘোষণা করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মিশরিয় কারুকার্য্যাদির সহিত এই সব জিনিষের সৌসাদৃশ্য অত্যন্ত অল্পই দৃষ্ট হয় এবং এই সমস্ত বিদ্যার চরম-উৎকর্ষের বহু বৎসর পরে গ্রাস্ মিশরিয়দের করতলগত হয়।

খনন করিতে করিতে সর্ব্বাপেক্ষা একটী আশ্চর্য্য জিনিষ পাওয়া গিয়াছে। ইহা একটী নরমূর্ত্তি, কিন্তু ইহার মুখাবয়ব সম্পূর্ণরূপেই যীশু খৃষ্টের মূর্ত্তির ন্যায়। দেখিলে

মনে হয় যেন যীশুখৃষ্টের একটা প্রতিকৃতি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে পারা যায় না যে যীশুখৃষ্টের জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে কিরূপে তাঁহার আকৃতির এইরূপ এক-প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর হইল।

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

চীন-রঙ্গমঞ্চের বিশেষত্ব

চীনবাসীদের নিকট রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট ব্যবহার করা, নিতান্ত "মূর্খামি ও অপ্রয়োজনীয় পণ্ডশ্রম" বলিয়া গণ্য হয়। বর্ত্তমান সভ্যজগতের উদ্যমশীল নবীন নাট্য-কলাবিদ্‌গণের পক্ষে ইহা পরম আশ্চর্য্যজনক সংবাদ, সন্দেহ নাই। আধুনিক রঙ্গমঞ্চের রূপদক্ষের নিকট যদি বলা যায় যে অত কষ্টস্বীকার করিয়া সুন্দর ও স্বাভাবিক দৃশ্যপট আঁকাইবার প্রয়োজন নাই অথবা নানাবর্ণের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ আলোক-রশ্মি ক্ষেপণের কোনই সার্থকতা নাই, তাহা হইলে হয়ত তিনি উপদেষ্টাকে উপহাসেরও অযোগ্য মনে করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইবেন। ভাবিবেন, এ সব বাদ দিলে নাট্যকলার আর রহিল কি?

কিন্তু চীন দেশীয় নাট্যমন্দিরে নট-নটীদের কৃতিত্ব-ই সর্ব্বস্ব; রঙ্গমঞ্চে, ইঙ্গিতের সাহায্যেই তাঁহারা আবশ্যক দৃশ্যের আবেষ্টনী সৃজন করেন। দর্শকের মনে কাল্পনিক দৃশ্যের চিত্রটি তাঁহারা সর্ব্ব উপায়ে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন—বিশেষত্বের মধ্যে, কেবল তাহার অনুকারী একটি দৃশ্যপট পশ্চাতে থাকেনা। নাট্যামোদীগণের কল্পনাশক্তিতে আঘাত দিয়া তাঁহারা কি করিয়া জলশূন্য স্থানে নদী ও অনাড়ম্বর, চিত্রহীন সমতল মঞ্চের উপর পর্ব্বত রচনা করিয়া থাকেন, তাহারই কথা বলিতেছি:

"কতকগুলি বাঁধা-ধরা ভাব-ভঙ্গীর সাহায্যে দৃশ্য-সৃষ্টি করা হয়। যদি কোন নটকে পর্ব্বতে উঠিতে হয় তবে সে হস্তপদের অনুরূপ ভঙ্গীর সাহায্যে একটি পাষাণ-স্তূপের উপস্থিতি জানাইয়া দিবে। যদি একটি দৃশ্যে, ফাঁসীর আসামীকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতে হয়, সে কাতর ও মৃত্যু-ভীত কণ্ঠে নিজের দোষ স্বীকার করে, তাহার পর মঞ্চের একপ্রান্তে একটি বংশদণ্ডের নিকট সরিয়া যায়। সেই দণ্ডের সহিত হয়ত একটুকরা কাপড় বাঁধা থাকে। অতঃপর দণ্ডিত ব্যক্তি উর্দ্ধে তাকাইয়া মস্তক পশ্চাৎ দিকে হেলাইয়া বিকট কাতর মুখভঙ্গীর সাহায্যে ফাঁসী-যাওয়ার কষ্ট পরিস্ফুট করিয়া তোলে।

যদি দেশান্তর গমনের দৃশ্য দেখাইতে হয়, দৃশ্যপট পরিবর্ত্তনের আবশ্যক নাই; নায়ক, চাবুকের শব্দ করিয়া রঙ্গমঞ্চের অপর প্রান্তে দ্রুতগতি-সহকারে সশব্দে আসিয়া উপস্থিত হয় ও বলে যে সে গন্তব্যস্থানে পঁহুছিয়াছে!

দাঁড়ের উপর শিক্ষিত বাজ

অশ্বারোহণ দেখাইতে হইলে সে তাহার কাল্পনিক অশ্বের সমীপবর্ত্তী হইয়া চাবুক তুলিয়া লয় ও একটি পা রেকাবের উপর উঠানোর ভঙ্গীতে ধরিয়া থাকে; যদি অবতরণ বুঝাইতে হয়, সে চাবুকটি ফেলিয়া দেয় ও অপর পদটি উলটা দিকে ঘুরাইয়া এক পায়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। নাটকের কোথাও যদি মেঘলোক হইতে পুষ্পক-রথে পরীদের নামিতে হয় তবে সুন্দর উজ্জ্বল পরিচ্ছদ-ভূষিতা এক রমণী, হস্তে দুইটি মেঘ ও রথচক্র-অঙ্কিত পতাকা সম্মুখদিকে ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকে।

রঙ্গমঞ্চের উপর, নাটকের আখ্যান বস্তুর প্রয়োজনানুসারে নায়ক, বিষ মিশ্রিত মদ্যপান করিয়া মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারে, পরে কোন মন্ত্রপূত তটিনীতে অবগাহন করিয়া যন্ত্রণামুক্তও হইতে পারে! এবং এ সমস্তের জন্য পট-পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয় না; অবশ্য, দৃশ্যপট বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার অভাবও ইহার কারণ সমূহের অন্যতম!

যাহা হউক, এই দৃশ্য-পটের অভাব কিন্তু এক দিক দিয়া পুশাইয়া গিয়াছে। পোষাক-পরিচ্ছদের নৈপুণ্য, পারিপাট্য, ঔজ্জ্বল্য ও উপযুক্ততা সময়ে সময়ে সত্যই অতুলনীয় হইয়া উঠে ও এই বিষয়ে ইঁহাদের রঙ্গমঞ্চ, যে কোন দেশের রঙ্গমঞ্চের-সমকক্ষ। প্রাচীন কালের রাজা, রাণী ও রাজ-পারিষদদিগের যে পোষাক ইঁহাদের নট-নটীরা পরিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন, সেইগুলিই তৎকালীন রাজা, রাণী ও রাজ-পারিষদেরা স্বচ্ছন্দে পরিধান করিতে পারিতেন!

দৃশ্যপটের অবর্ত্তমানে-ও, কেবলমাত্র কতকগুলি সু-সজ্জিত নট-নটী, তাহাদের মুখের ভাব, বর্ণ-বৈচিত্র্যসম্পন্ন মূল্যবান পরিচ্ছদ, বিপুল মণি-মাণিক্য-সম্ভারের উজ্জ্বল দ্যুতি, সোণারূপার জরী, বিবিধ বিহঙ্গ-পক্ষ-শোভিত শিরোভূষণ এবং সুন্দর সমর-পরিচ্ছদ-পরিহিত সৈন্যদলের সাহায্যে দর্শকের মনে যে চমৎকার উজ্জ্বল ছবিটি অঙ্কিত হইয়া যায় তাহা সহজে অপসৃত হইবার নহে।

বহু বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে, আইনের চক্ষে নটেরা ভবঘুরে অপদার্থ বলিয়া গণ্য হইত, আজকাল-ও দু'একটি বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া চীনদেশের নট-নটীরা তদপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যের অধিকারী নয়। এই ব্যতিক্রমের মধ্যে একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ নট, মি-ল্যান্-ফ্যাং-এর নাম করা যাইতে পারে।

মি ল্যান্ ফ্যাং—পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ বেতনভোগী অভিনয়কারীদের মধ্যে অন্যতম।

ইনি জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-বেতনভোগী নটদের অন্যতম। পিকিং-এর শিক্ষিত-সমাজে ও সাহিত্যিকদের মধ্যে ইঁহার যথেষ্ট আদর আছে। গত নয়-বৎসরে ইনি খ্যাতিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহার ভূমিকা-গ্রহণ সাধারণতঃ থান-কুড়ি নাটকের মধ্যে নিবদ্ধ। এবং প্রত্যেকটিতেই তিনি সাতিশয় আন্তরিকতা ও নৈপুণ্য-সহকারে স্বীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিয়া থাকেন।

শ্রীরামেন্দু দত্ত

১১

সহজ কথোপকথনের পক্ষে যেখানে কোনো কারণে কোনো বাধা থাকে সেখানে কথা কওয়ার অপেক্ষা কথা না কওয়াই বোধ হয় বেশি সঙ্কোচজনক হইয়া উঠে। কথা-বার্ত্তার মধ্যে যে জিনিষটাকে চাপা দেওয়া কঠিন, নীরবতার মধ্যে তাহাকে অপসৃত করার কোনো উপায় নাই। মনের উপর সে যদি একবার চাপিয়া বসিল ত বসিয়াই রহিল। তাহা ছাড়া, যে-সকল জিনিষ কতকটা অনির্ব্বচনীয়, বচনের তেমন অপেক্ষা যাহারা রাখে না, তাহাদের ত' কথাই নাই;—বচনের কঠিন ভূমিই তাহাদের পক্ষে বাধা,—জলের মধ্যে মাছের মতো নিঃশব্দতার মধ্যে তাহারা অবলীলার সহিত সাঁতার দিয়া বেড়ায়। তাই, ধীরে ধীরে অতিক্রম করিবার ফলে ক্রমশঃ কমিয়া আসিলেও, সুদীর্ঘ পথ এই নীরবতার উৎপীড়নে যেন দীর্ঘতরই হইয়া উঠিতেছে বলিয়া বিনয় ও কমলার মনে হইতেছিল।

অলস মন্থরগতিতে পাশাপাশি তাহারা নিঃশব্দে চলিয়াছে;—শ্রমজনিত স্বেদবিন্দুতে উভয়ের ললাট ঈষৎ সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, যত্নাবরুদ্ধ নিঃশ্বাসের শব্দ ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে, এবং কঙ্কর-নির্ম্মিত পথে উভয়ের জুতার মচ্‌মচ্‌ শব্দ বারংবার এক ছন্দে মিলিত হইতেছে। বাহিরের অবস্থা এই; ভিতরে উভয়ের মনের মধ্যে যে জিনিষ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল তাহার প্রবলতা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

"মিস্ মিত্র!"

সুনিরুদ্ধ মৌন ভেদ করিয়া সহসা-নিঃসৃত এই কণ্ঠস্বরে শুধু কমলাই নয়, বিনয়ও চমকিত হইয়া উঠিল।

কমলা কোনো কথা কহিয়া উত্তর দিল না, মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল না, পথ চলিতে চলিতেই শুধু দেহটা ঋজু করিয়া এমন একটা ভঙ্গী করিল যাহাতে বুঝা গেল বিনয়ের বক্তব্যের প্রতি সে মনোযোগী হইয়াছে।

বিনয় বলিল, "দেখুন মিস্ মিত্র, আজকালকার এই উদ্দামতার যুগে সংযমের কথা আমরা একেবারে ভুলে গেছি। এ আমাদের মনেই থাকে না যে, যে সংযম উদ্দামতাকে বেঁধে রাখে তার শক্তি সেই উদ্দামতার শক্তির চেয়ে ক নয়, বরং বেশিই। বন্যার চেয়ে বাঁধের শক্তি ততক্ষ নিশ্চয় বেশি যতক্ষণ বন্যাকে বাঁধ বেঁধে রাখ্‌তে পারে।"

এ কথারও কমলা কোনো উত্তর দিল না; ঈষৎ আরক্তমুখে নিঃশব্দে নতনেত্রে সে বিনয়ের পাশে পা চলিতে লাগিল। পথ পার্শ্বে ঘন-নিবদ্ধ ইউক্যালিপ্‌ট তরুশ্রেণীর বায়ু-হিল্লোলিত পত্র-জালে মৃদু মর্ম্মরধ্বনি উঠিয়াছিল। দূরে মুক্ত প্রান্তরে রাখাল বালকেরা গো মহিষ চরাইতেছিল, তাহাদের কণ্ঠ-নিঃসৃত গানের ক স্বর হেমন্তের শুভ্র আকাশকে বিদীর্ণ করিতেছিল। কমলা মন চকিত হইয়া উঠিল।

বিনয় বলিল, "এঞ্জিনে ঘণ্টায় ষাট মাইল গতির ব্যব করার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টায় আশী মাইল গতি রোধ করবা

মতো ব্রেক্ বসানো দরকার হয়। আমাদের মনেও যে তেমনি শক্তিশালী ব্রেক বসানো দরকার এ আমরা মনে করিনে। তাই স্টীমের ঝোঁকে মন যখন একদিকে ছুটতে আরম্ভ করে তখন তার গতি একটা কোনো বিপদ না ঘটিয়ে ছাড়ে না।"

সহসা সংযমের এ মহিমা কীর্ত্তন যে কেন, এবং ব্রেক ও বাঁধের উদাহরণ প্রয়োগই বা কিসের জন্য তাহা বুঝিতে কমলার ক্ষণমাত্র বিলম্ব ঘটিল না—কিছু পূর্ব্বে গৃহ হইতে বাহির হইবার আগে যে-মন সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল এ সমস্তই যে তাহারই উপর ব্রেক কষিবার আয়োজন তাহা সে নিঃসংশয়ে বুঝিল। মানুষের যে অবচেতন মন বিচার-বিতর্ক না করিয়া সহজ বুদ্ধির সাহায্যে কাজ করে কমলার মধ্যে সেই মন বিনয়ের অনুশোচনার দুঃখ উপলব্ধি করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য উদ্যত হইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে সে বলিল, "তা সত্যি,—কিন্তু ব্রেক ক'ষে সর্ব্বদা মনকে অচল ক'রে রাখাও ত ঠিক নয় বিনয়বাবু। মাঝে মাঝে তাকে আলগা ক'রে একটু গতি দেওয়াও উচিত।"

বিনয় বলিল, "গতি দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত। সর্ব্বদা ব্রেক্ ক'ষে মনকে পঙ্গু ক'রে রাখতে হবে সে কথা আমি বলছিনে; আমার বলবার উদ্দেশ্য, গতি যে দেবে গতি রোধ করবার ক্ষমতাও তার থাকা উচিত।"

মৃদু হাসিয়া কমলা বলিল, "বাবা বলেন,—বেশি গতির উপর হঠাৎ ব্রেক্ কষ্‌লে যন্ত্রের তাতে ক্ষতি হয়। তিনি বলেন,—যত কম ব্রেক্ ক'ষে গাড়ি চালানো যায় গাড়ি তত ভালো থাকে। আমার মনে হয় মানুষের মন সম্বন্ধেও এ কথা একই রকম খাটে।"

উত্তেজিত হইয়া বিনয় বলিল, "তা হ'লে আমি যে কথা বলছিলাম এ কথা প্রকারান্তরে ঠিক সেই কথাই নয় কি? আমি বলছি, গতির চেয়ে শক্ত ব্রেক্ হওয়া উচিত,—আর আপনি বলছেন, ব্রেকের চেয়ে সহজ গতি হওয়া উচিত। এ দু'য়ে তফাৎ কই?"

কমলা এতক্ষণে তাহার চিত্তকে অনেকটা সহজ ধারার মধ্যে লইয়া আসিয়াছিল; স্মিতমুখে বলিল, "তফাৎ এই, আপনি বলছেন ব্রেকের সাধনা করতে, আর আমি বলছি গতির সাধনা করতে।"

এই প্রতিভাবতী কলেজের মেয়েটির তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় বিনয় এ কয়েকদিন ধরিয়া তাহার সহিত কথায়-বার্ত্তায়, আলাপ-আলোচনায় বহুবারই পাইয়াছে—কিন্তু এখন তাহার এই সংক্ষিপ্ত সহজ উত্তর শুনিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। এ কথার উত্তরে সে যে কি বলিবে তাহা ভাবিয়া তাহাকে নিশ্চয়ই বিপন্ন হইতে হইত, যদি না ইত্যবসরে একটি ঘটনা ঘটিত।

পথ পার্শ্বে বৃক্ষতলায় বসিয়া একজন সন্ন্যাসী বিশ্রাম করিতেছিল, বিনয় ও কমলাকে আসিতে দেখিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। বিনয় ও কমলা দাঁড়াইয়া পড়িল।

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই?"

বিশুদ্ধ হিন্দী ভাষায় সন্ন্যাসী বলিল, "ক্ষুধিত বোধ করছি, ভোজনের জন্য কিছু পয়সা।"

বিনয় তাহার মণিব্যাগ খুলিয়া চারটি আনী বাহির করিয়া সাধুর হস্তে দিল।

সাধুর মুখমণ্ডল প্রসন্ন হাস্যে ভরিয়া উঠিল; বলিল, "তোমার জয় হ'ক বাবা!—কিন্তু এত আমার কি হবে?—একটিই আমার পক্ষে যথেষ্ট!" বলিয়া তিনটি আনী প্রত্যর্পণ করিল।

কমলা বলিল, "রাখুন না। আবার ত' কাজে লাগ্‌বে।"

সহাস্যমুখে সাধু বলিল, "তোমার মঙ্গল হ'ক মাঈ! আবার যখন দরকার হবে তোমাদের মতো সজ্জন গৃহস্থের সাক্ষাত পাব। অনর্থক ভার বাড়িয়ে কি লাভ?" তাহার পর কমলা ও বিনয়—উভয়ের প্রতি একবার ত্বরিত দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "মাঈ, তোমরা স্বামী-স্ত্রী?"

কমলার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; সে মাথা নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল, "না।"

"তবে? ভাই-ভগ্নী?"

কমলা মাথা নাড়িয়া জানাইল তাহাও নহে।

মৃদু হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিল, "বুঝেচি মাঈ। তোমাদের মঙ্গল হবে; আমি একটা ভালো জিনিষ তোমাদের

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দিচ্চি—হারিয়ো না, যত্ন ক'রে রেখো" বলিয়া ঝুলির ভিতর হইতে কয়েকটি রুদ্রাক্ষ বাহির করিয়া তাহা হইতে একটি বাছিয়া কমলার হস্তে দিতে গিয়া বলিল, "এটি পঞ্চমুখীও নয়, একমুখীও নয় ;—কিন্তু এটি সত্যিই ভালো জিনিষ।"

রুদ্রাক্ষটি গ্রহণ করিয়া কমলা যুক্ত-করে প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া উভয়ে পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিল। কিছু দূরে আসিয়া কমলা রুদ্রাক্ষটি বিনয়ের দিকে ধরিয়া বলিল, "এটি আপনি রাখুন।"

বিনয় স্মিতমুখে বলিল, "ওটি সন্ন্যাসী ত' আপনার হাতেই দিয়েছেন ;—আপনিই রাখুন।"

"কিন্তু কেবলমাত্র আমাকেইত' দেননি।"

বিনয় হাসিয়া বলিল, "তা না দিলেও, সে যুক্তিটা ত' আপনার বিরুদ্ধেও একই মাত্রায় খাটানো যেতে পারে। তা ছাড়া আমার চেয়ে আপনার কাছে ওটি বেশি যত্নে থাকবে।"

চকিত হইয়া কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

"কারণ, ও-টির গুণ সম্বন্ধে আপনার মনে কিছু বিশ্বাস হ'য়েছে ব'লে মনে হচ্চে।"

"তা, কি ক'রে জানলেন ?"

সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "এটা অবশ্য আমার বিশ্বাস।"

কমলার মুখের উপর একটা অতি-সূক্ষ্ম মলিনিমা অধিকার করিয়া বসিল। এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া সে বলিল, "কিন্তু, শুধুই কি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা ?—আর কিছু নয় ?"

"আর কি ?"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কমলা বলিল, "আচ্ছা, আমার কাছেই না হয় থাকবে, একবার আপনি এটা ধরুন ত।"

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বিনয় রুদ্রাক্ষটি হস্তে লইয়া বলিল, "কি করতে হবে ?"

কমলা দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল "খুব জোরে ওটাকে মাঠের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিন্ ত।"

"কিন্তু এ ত' একা আমার জিনিষ নয়।"

একটু অধীরভাবে কমলা বলিল, "আমার দিক থেকে আমি ত আপনাকে সে অধিকার দিচ্ছি ;—দিন্ না আপনি ফেলে।"

বিনয়ের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল ; কমলার দিকে কাতরনেত্রে চাহিয়া অনুতপ্ত-স্বরে সে বলিল, "আমাকে ক্ষমা করুন মিস্ মিত্র। আমি অপরাধী।" তাহার পর পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া সযত্নে তাহার মধ্যে রুদ্রাক্ষটি স্থাপন করিল।

কমলা বলিল, "আচ্ছা, এবার আমাকে ওটা দিন।"

"থাক্, আমার কাছেই থাক্।"

"থাক্।"

পুনরায় দুজনে নীরবে পাশাপাশি চলিল। জুতার শব্দ পুনরায় এক ছন্দে মিলিত হইয়া বাজিতে লাগিল,—মচ্ মচ্। কেহ তাহাতে ব্যাঘাত ঘটাইতে সাহস করিল না পাছে ব্যতিক্রমে মিলনের কথাটা ধরা পড়িয়া যায়।

"মিস্ মিত্র !"

অপাঙ্গে বিনয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কমলা বলিল, "বলুন।"

"একটু ব'সে জিরিয়ে নেবেন ?—বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন। ঐ দেখুন মাঠে ঐ গাছটার তলায় ঠিক আমাদের দুজনের মতই বসবার ব্যবস্থা রয়েছে।"

কমলা চাহিয়া দেখিল একটা ছায়াশীতল গাছের তলায় কাছাকাছি দুইটা পাথর রহিয়াছে যাহা স্বচ্ছন্দে বসিবার আসনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে। একবার লোভ হইল, কিন্তু তখনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "না, চলুন। চ'লেই যাওয়া যাক্।"

কমলার মনের দ্বিধা-সংক্ষুব্ধ-ভাবটুকু বিনয়ের নিকট অগোচর রহিল না ; সে অনুনয় সহকারে বলিল, "পাঁচ মিনিট জিরিয়ে নিলেই ক্লান্তি অনেকটা ক'মে যাবে, চলাও যাবে তাড়াতাড়ি। চলুন না, একটু বস্‌বেন। আপনার দরকার না হোক্, আমারও ত' বিশ্রামের একটু দরকার হ'তে পারে।"

ইহার পর কমলা আর কোনো আপত্তি করিল না ; বলিল, "তাহলে তাই চলুন।"

পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া একটা পাথর ভাল করিয়া ঝাড়িয়া নিজের গাত্রবস্ত্রটা তাহার উপর পাতিয়া দিয়া বিনয় বলিল, "বসুন।"

কমলা বলিল, "এত ক'রে আমার জন্যে সিংহাসন রচনা ক'রে আপনি নিজে বস্‌বেন ওই ময়লা পাথরটার উপর?"

সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "ময়লা পাথরটার উপর কেন? —এই দেখুন তারও ব্যবস্থা ক'রে নিচ্ছি।" বলিয়া রুমালটা সেই পাথরের উপর পাড়িয়া স্মিতমুখে বলিল, "হয়েছে ত?"

"একটু বাকি আছে। আপনার গায়ের কাপড়খানা এবার তুলে নিন্।"

সবিস্ময়ে বিনয় বলিল, "আপনি তা হ'লে কোনটাতে বস্‌চেন?"

"আমি না-হয় রুমালটারই উপর বসব, অনর্থক গায়ের কাপড় খানা নষ্ট করবার কোনো দরকার নেই।"

বিনয় বলিল, "নষ্ট যা হবার তা'তো হয়েইচে, আপনি বস্‌লে আর বেশি কি নষ্ট হবে?—এখন নিন্, বসুন।"

"তা হ'লে আপনিই বসুন," বলিয়া কমলা রুমালখানার উপর বসিয়া পড়িল।

তখন বিনয় অগত্যা গাত্রবস্ত্রখানা তুলিয়া লইয়া অনাবৃত পাথরখানারই উপর বসিল; বলিল, "বিধাতা যার কপালে পাথর লিখেচেন, পাতা রুমালও তার ভাগ্যে টেঁকে না!"

কমলা বলিল, "কাশ্মীরী আলোয়ানকে যে অবহেলা করে, বিধাতা তাকে রুমাল থেকেও বঞ্চিত করেন।"

বিনয় হাসিয়া বলিল, "তা বটে।"

মাইল দুই পথ রৌদ্র করে হাঁটিয়া আসার পর সুশীতল বৃক্ষ ছায়াতলে বিশ্রাম বড়ই তৃপ্তিদায়ক মনে হইতেছিল, তাই দশ মিনিট কাল কাটিয়া যাওয়ার পরও পাঁচ মিনিটের কথা কাহারো মনে পড়িল না।

বিনয় বলিল, "মিস্ মিত্র, মোটর বিগড়ে যাওয়ার জন্যে আপনার বাবা আমাকে তাঁর যে দ্বিতীয় কথা বল্‌বার সময় পেলেন না, সে দ্বিতীয় কথা কি—তা আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারেন?"

আরক্তমুখে মৃদুস্বরে কমলা বলিল, "না।"

"আমি বোধহয় কতকটা পারি। আমার মনে হয় তিনি আমাকে আপনাদের বাড়িতে বাস করবার জন্যে বল্‌বেন।"

মুখ তুলিয়া ঔৎসুক্যের সহিত কমলা বলিল, "এ আপনি কেন মনে করচেন?"

"কাল তিনি আমাকে এই রকম কথার একটু আভাস দিয়েছিলেন। আমার অনুমান যদি সত্যি হয়—তিনি যদি এই অনুরোধই আমাকে করেন—তাঁর অসীম স্নেহের প্রমাণে আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ব'লে মনে করব, কিন্তু আমি আপনাদের বাড়ি উঠে এলে সুকুমাররা ভারী দুঃখিত হবে।"

একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া অলস উদাস কণ্ঠে কমলা বলিল, "তা তো হবারই কথা।"

অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে বিনয় বলিল, "আমার অনুমান যদি সত্যি হয়, এই কথাই যদি তিনি আমাকে বলেন, আপনি তা হ'লে দয়া ক'রে আমার হয়ে তাঁকে একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?"

আরক্ত-স্মিত মুখে কমলা বলিল, "বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে কাজে লাগাতে চান?—আচ্ছা, তা হোক, আমি বল্‌ব।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "সুকুমার বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আপনার কোনো কথা হয়েছিল কি?"

বিনয় বলিল, "না।"

"সুকুমার বাবুর মার সঙ্গে?—কিম্বা আর কারো সঙ্গে?"

আগ্রহভরে বিনয় বলিল, "কারো সঙ্গেই নয়। আমার ত' শুধু অনুমান মাত্র—তা নিয়ে কারো সঙ্গে কথা ক'য়ে ত কোনো লাভ নেই।"

কমলা বলিল, "কারো সঙ্গে কথা ক'য়ে লাভ নেই তা বল্‌তে পারেন না—যখন আমার সঙ্গে কথা ক'য়ে লাভ আছে ব'লে এই মাত্র মনে করেছেন। এখনো ত আপনার অনুমান ছাড়া আর কিছু নেই।"

এ কথার মধ্যে যে কাঁটাটি প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহার আঘাত খাইয়া আরক্ত মুখে বিনয় বলিল, "আজ দেখ্‌চি সব কথাতেই আপনার কাছে আমার হার হচ্চে!"

"সব কথাতেই ?—এর আগেও কোনো কথায় হয়েছিল না কি ?"

"হয়েছিল।"

"বাড়িতে আজ ছবি আঁকা না হওয়া নিয়ে যে কথা হয়েছিল,—তা'তেও ?"

"তা'তেও।"

মৃদুকণ্ঠে কমলা বলিল, "তা হবে!" তাহার পর ক্ষণকাল পরে অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই বলিল, "এবার তা হ'লে চলুন।"

"চলুন।"

কমলা উঠিলে বিনয় রুমালখানা তুলিয়া লইয়া বুক-পকেটে রাখিল। তাহার পর তাহারা পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিল,—পাশাপাশি নিঃশব্দে নীরবে। বাকি অর্দ্ধ মাইল পথ কাহারো মুখে একটি কথা রহিল না, কিন্তু মনের মধ্যে অনির্ব্বচনীয় তাহার সীমা বিস্তার করিয়া চলিল দ্রুতবেগে।

গৃহে পৌছিয়া তাহারা গেটের নিকট হইতে দেখিল বারান্দায় দ্বিজনাথের পাশে বসিয়া রহিয়াছে সুকুমার এবং শোভা।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক সমালোচনা

গীতা—শ্রীব্যোমব্রহ্ম গীতাধ্যায়ী সম্পাদিত, এবং যাদব বাটী মাজু হাওড়া হইতে শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

এই গীতাখানি অন্যান্য অনেকের সম্পাদিত গীতার চেয়ে ঢের বেশী বোধগম্য। এবং সেইজন্যই ইহা সাধারণ পাঠকের কাছে আদৃত হ'বে, আশা করা যায়। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলেছেনঃ—"গীতা একটা হেঁয়ালির বই নয়- যে তাহার নিগূঢ় অর্থ বুঝাইবার জন্য মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটাইতে হইবে। গীতা নিজেই অধ্যাত্মবিষয়ক সরল কথায় পরিপূর্ণ—সুতরাং উহাই আধ্যাত্মিক। উহার আবার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কি ?" গ্রন্থাকার সেদিক দিয়ে জাননি, অথচ গ্রন্থখানিকে যথাসম্ভব সুখবোধ্য ক'রতেচেষ্টারও ক্রটী করেননি। প্রত্যেক শ্লোকের বিশুদ্ধ মূল, সরল বঙ্গানুবাদ, সহজবোধ্য অন্বয় এবং সমস্ত দুরূহ শব্দের বাংলা অর্থ বইখানিতে দেওয়া আছে। তা ছাড়া কতকগুলি প্রসঙ্গে, গীতার অধ্যায়গুলি, যোগক্রম, ছন্দ প্রকরণ ইত্যাদি গ্রন্থকার অতি সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমরা এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি, কারণ ইহাতে পাণ্ডিত্যের ভাণ নাই, অথচ প্রকৃত পাণ্ডিত্য আছে যার সুবিধা গ্রহণ করতে সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের কোনই কষ্ট হবেনা।　　　　—সোমবর্ম্মা

স্ত্রী—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৲টাকা। ছাপা বাঁধাই উৎকৃষ্ট। চারটি ছোট গল্প দিয়েই বইখানি তৈরী। ছোট গল্প লেখার আর্টটুকু অসমঞ্জ বাবু জানেন। বাজারের হাজার হাজার ছোট গল্পের ভিতর হ'তে তাঁর গল্পকে চিনে নেওয়া যায়। একটি ছোট ঘটনার ছোট পরিসরের মধ্যে কি করে একটা মস্ত বড় রসকে ফুটিয়ে তোলা যায়, তা বিশেষ করে তাঁর 'স্ত্রী' ও 'জ্যোতিষ গণনা' এই দুটি গল্প হতেই বোঝা যায়। দ্বিতীয় গল্পটার হাস্যরসও বিশেষ উপভোগ্য। সমস্ত গল্পগুলির মধ্যেই একটা সংযম ও শালীনতার আভাস সুস্পষ্ট। একখানা আড়াইশো পাতার ধাব্ড়া উপন্যাসের চেয়ে এ বই যে অনেক সারালো ও ধারালো তা কবে আমাদের উপন্যাস-খোর পাঠকবর্গ বুঝবেন ?

হাস্নাহানা—শ্রীগোলাম মোস্তাফা, বি-এ, বি-টি প্রণীত। মূল্য একটাকা মাত্র।

কবি মোস্তাফা বাংলার সাহিত্য-রসিকদের নিকট সুপরিচিত। হাস্নাহানা লিখে সে পরিচয়কে তিনি আরো ঘনিষ্ঠ করে তুলেছেন।

সহজ প্রাণের সহজ সুরটি আজকালকার কবিতায় বড় একটা মেলেনা—সবাই যেন হেমন্তের কুহেলীঘেরা ধূমাচ্ছন্ন

আকাশ। তাছাড়া একটা উগ্র বন্য প্রবৃত্তির উগ্র বন্য গন্ধ সলমা চুমকি মখমল কিংখাবের চমকদার পোষাক ভেদ করে সূক্ষ্ম নাসিকার স্নায়ুমণ্ডলীকে এমন ঝাঁজিয়ে দেয়—যে বমনোদ্বেগ না এসে যায় না। হাস্নাহানার কবির বিরুদ্ধে কিন্তু ওরকম কোনো অভিযোগের স্থান নেই। তিনি ছন্দে ও ভাষায় 'মার মার কাট্ কাট্'—এর ঝাণ্ডাও ওড়ান্‌নি, এলিয়ে-পড়া অসংযমের বিনিয়ে-কাঁদা বাঁশীও বাজান্ নি।

—চন্দ্রমৌলি

সঙ্গীত গীতাঞ্জলী—সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী, কাব্যতীর্থ, সাংখ্যতীর্থ, সঙ্গীতাধ্যক্ষ বিশ্বভারতী শান্তি-নিকেতন, ৩৬৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲ টাকা।

এখানি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গীতাঞ্জলীর হিন্দী সংস্করণ। ইহাতে গীতাঞ্জলীর সমস্ত গান ও সমস্ত গানের বিশুদ্ধ স্বরলিপি দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। গীতাঞ্জলী এখন আর কেবলমাত্র বাঙলা ভাষার সম্পদ নহে, পৃথিবীর বহু ভাষায় অনুবাদের সাহায্যে ইহা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষে কিন্তু, শুধু অনুবাদের দ্বারা নয়, বাঙ্‌লা ভাষার অপরিবর্ত্তিত পরিচ্ছদে ইহা পঠিত ও গীত হওয়ার কারণ বিদ্যমান আছে। শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তকের দ্বারা তাহার উপায় করিয়া দিয়া সমগ্র ভারতবর্ষের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এ পুস্তকের বহুল প্রচার হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গীতাঞ্জলীর গানগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি ভাল ভাল গানের স্বরলিপি এ পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শুধু বাঙলার বাহিরেই নয়, বাঙালীর ঘরে ঘরেও এ পুস্তকখানি প্রচলিত হইবে। আকার এবং উপ-যোগিতা হিসাবে মূল্য একটুও বেশি হয় নাই।

রাগশ্রেণী—শান্তিনিকেতন সঙ্গীত-বিভাগের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাস্ত্রী কাব্যতীর্থ, সাংখ্যতীর্থ প্রণীত, ১৬৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১॥০ টাকা।

ইহাও একখানি স্বরলিপির বহি, বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত। এ পুস্তকটি দেখিয়া আমরা অতিশয় সুখী হইয়াছি। ঠিক এ ধরণের আর একখানি পুস্তক যে বাঙলা ভাষায় নাই তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এ পুস্তকে শাস্ত্রী মহাশয় ভারতীয় সঙ্গীতের রাগ রাগিণীগুলিকে কয়েক পর্য্যায়ে শ্রেণী-বদ্ধ করিয়া প্রত্যেক রাগের ঠাট, চাল, বিশেষত্ব, সময় ও স্বরলিপি দিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ং উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীত-বিৎ তাঁহার নিকট হইতে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর বিশুদ্ধ স্বরলিপি সঙ্গীত-সাধকের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবে।

পুস্তকের প্রারম্ভে যন্ত্র ও কণ্ঠ সাধনের জন্য নাতি-বিস্তৃত যে স্বর প্রণালী দেওয়া হইয়াছে—আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি তাহার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে চমৎকার। স্কুলে ও গৃহে গৃহে এ পুস্তকের প্রচলন হইলে বিশেষ উপকার হইবে।

ভোরের পাখী—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল প্রণীত, ৫৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ৸০ আনা।

এখানিও স্বরলিপির বই। ইহাতে গ্রন্থকার-রচিত ২৬টি গানের স্বরলিপি আছে। আমরা আগাগোড়া গানগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি—গানগুলি সুললিত, সুরগুলিও বিশুদ্ধ, স্বরলিপি পদ্ধতিও প্রাঞ্জল। অধিকাংশ গানের রাগিণী বিশুদ্ধ চালে দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম শিক্ষার্থীগণ এ বইখানির দ্বারা উপকৃত হইবেন।

দুলালী—শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা।

সাতটি গল্প একত্রে নিবদ্ধ হইয়া এখানি একটি গল্প-পুস্তক। লেখক বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁহার রচিত কবিতা এবং গল্প মাসিক পত্রের পাঠকমাত্রেই পড়িয়াছেন। সহজ ধারা ও প্রাঞ্জল ভাষার মধ্য দিয়া গল্পগুলির গতি অব্যাহত। আমরা এ বইখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। এই বইখানি লেখকের প্রথম উদ্যম; আমরা আশা করি এই লেখক ভবিষ্যতে একজন শক্তিমান লেখক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন।

বইখানির কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই প্রশংসনীয়।

—বিষ্ণুশর্ম্মা

ইসমাইলি মতবাদ

আশ্বিন সংখ্যার 'সওগাতে' শ্রীযুক্ত মহম্মদ বরক তুল্লাহ্ ইস্মাইলী মতবাদের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। আগা খাঁর নেতৃত্ব যাঁহারা মানিয়া চলেন, তাঁহাদের সহিত এই ইস্মাইলী সম্প্রদায়ের কোন সম্পর্ক আছে কি না, তাহা লেখক বলিলে ভাল করিতেন। আমরা স্থানে স্থানে বাদ দিয়া প্রবন্ধটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"মুসলমানদিগের মধ্যে শিয়াগণ হজরৎ আলীকে তাঁহাদের ধর্ম্মগুরু ও হজরৎ মুহম্মদকে (দঃ) কোরাণের বাহকমাত্র বলিয়া মনে করেন। রাজনীতির দিক দিয়াও তাঁহারা আলীকে হজরৎ মুহম্মদের (দঃ) যথার্থ উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে আলীর পূর্ব্ববর্ত্তী তিন খলিফার নির্ব্বাচন অশুদ্ধ ও দুর্নীতিমূলক এবং তাহাতে আলীর ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ন হইয়াছিল। আলী-বংশীয় নৃপতিগণ শিয়াদের সবিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। আলীর পুত্রগণ কেহই ইসলাম্ রাষ্ট্রজগতের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহাদের বংশধরগণ মাত্র ইমাম অর্থাৎ ধর্ম্মজগতের অধিনায়ক-রূপে কিছুকাল হেজাজ ও ইমেনের নিকট শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলী গ্রহণ করিতেছিলেন। কিন্তু দামেশ্‌কের দাম্ভিক খলিফার তাহাও সহ্য হইল না। তিনি নৃশংসভাবে মদিনাস্থিত আলী-বংশের একেবারে উচ্ছেদসাধন করিলেন। তারপর সুন্নীগণ আলী-বংশের প্রণষ্ট গৌরবের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য আর কোনও উদ্যোগ করেন নাই। কিন্তু শিয়াগণ নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। তাঁহারা মিসরস্থিত ফাতেমী-বংশীয় নরপতিদিগকে আপনাদের অধিনায়ক করিয়া বহুদিন নিজেদের সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের পরিপুষ্টির জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

শিয়াদের ভিতর একটা বিশ্বাস ছিল যে ইস্‌লামের যা আধ্যাত্মিকতা, সে সমস্ত হজরৎ মুহম্মদ (দঃ) সাধারণের নিকট কিছুই প্রকাশ করেন নাই; সে শিক্ষা শুধু তদীয় জামাতা একমাত্র আলীকেই তিনি প্রদান করেন। নিজের সাধনা নিজের ফকীরী সমস্তই আলীতে অর্পিত করিয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। এই সকল শিয়ার মতে হজরতের প্রকাশ্য শিক্ষা—নামাজ রোজা ইত্যাদি শরিয়তের বিধান শুধু চরিত্রগঠনমূলক নৈতিক প্রতিষ্ঠান মাত্র। ইহাদ্বারা সংযম ও সুনীতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, মানুষের কর্ম্মে শৃঙ্খলা আনয়ন করা যাইতে পারে, চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদিত হইতে পারে ও মানুষকে আল্লাহ্‌তে আস্থাবান ও অদৃষ্টবাদী করিয়া তাহার মনের শান্তি বিধান করা যাইতে পারে,—কিন্তু মানুষের আধ্যাত্মিক প্রগতি, আত্মার মুক্তি ইহাতে কস্মিন কালেও সাধিত হইতে পারে না। আত্মার মুক্তির জন্য আত্মিক সাধনার প্রয়োজন এবং সে সাধনার পন্থা হজরৎ আলীই প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন।

এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কতকগুলি শিয়া শরিয়তের বিধান-গুলিকে কতকটা অবহেলার চক্ষে দেখিতেন, (অবশ্য সুন্নীরাও যে সকলেই শরিয়ৎ পালন করেন, তাহা নহে) এবং ফকীরীর অত্যধিক পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। ইহাদের প্রচারিত শিক্ষা কর্ম্মকঠোর আরব অপেক্ষা কবিত্ব-সুলভ পারস্যেই অধিকতর সমাদৃত হইল (সুফী শিক্ষাও পারস্যেই সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল)। পারস্যবাসী-দের মন এই শিক্ষার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। কারণ ইহার বহুপূর্ব্বে নিওপিথাগোরিয়ান ও নিওপ্লেটনিক ভাবধারায় তাঁহারা নিষিক্ত হইয়াছিলেন।

পারস্যের আবদুল্লাহ-বিন মায়মন অল কাদ্দা নামক একজন প্রতিভান্বিত প্রচারক শিয়াদের এই ফকীরীকে আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্দ্ধিত পরিবর্দ্ধিত করিয়া এক অভিনব আকার প্রদান করেন। ইহাকে সপ্তকীবাদ (The doctrine of seven) বলা যাইতে পারে। এই মত অনুসারে সমগ্র বিশ্ব সাতের ছাঁচে গঠিত। যথা—(১) জ্ঞান,

(২) বিশ্ব আত্মা, (৩) জড় প্রকৃতি (৪) দেশ (space) ও (৫) কাল (time) এই পাঁচ মৌলিক পদার্থের দ্বারাই বিশ্ব গঠিত, আর ইহার আদিতে আল্লাহ্ ও অন্তিমে মনুষ্য—এই লইয়া বিশ্বে সপ্তস্তর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ সপ্তদিবসে বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সপ্ততল আকাশ ও সপ্ততল পাতাল লইয়া বিশ্ব বিরাজিত। সপ্ত সমুদ্রে বিশ্ব অলঙ্কৃত। সপ্তশ্লোকে কোরাণের প্রথম অধ্যায় রচিত। মানুষের মেরুদণ্ড সপ্তখণ্ডে গঠিত এইরূপে বিশ্বের আয়ুষ্কালও সপ্ত মহাযুগে বিভক্ত। যথা আদমের যুগ, নুহের যুগ, এব্রাহিমের যুগ, মুসার যুগ, ঈসার যুগ, মুহম্মদের যুগ এবং সর্ব্বশেষ মুহম্মদ-বিন্ ইস্মাইলের যুগ। শরিয়ৎ ও পয়গম্বরীর যুগে যে আধ্যাত্মিকতা প্রচ্ছন্ন ছিল, মুহম্মদ-বিন্ ইস্মাইলের যুগে উহা পরিপূর্ণ ও নগ্নরূপে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে। যতদিন কোনও পয়গম্বর জীবিত থাকেন, ততদিন আধ্যাত্মিকতা তাঁহাতেই লীন থাকে বলিয়া উহা নিজরূপে প্রকাশ পাইতে পারে না। যেই পয়গম্বর অন্তর্ধান করেন, অমনি অধ্যাত্মিকতা নিজের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। উভয়ের একত্রে প্রকাশ অস্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত।

ইস্মাইলী মতে যে সাতজন মহানবী যুগপ্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের শেষেই সাতজন করিয়া ইমামের আবির্ভাব হইয়াছে এবং সনাতন নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক যুগের প্রথম ইমামই তদানীন্তন পয়গম্বরের বিশ্বস্ত পার্শ্বচর ও তদীয় গূঢ়তত্ত্বের আধার হইবার অধিকারী হইয়াছেন। হজরৎ আদমের সঙ্গে ছিলেন শিশ্ (আঃ), হজরৎ নুহের সঙ্গে ছিলেন শাম, হজরৎ এব্রাহিমের সঙ্গে ছিলেন ইস্মাইল, হজরৎ মুসার সঙ্গে ছিলেন হারুণ, হজরৎ ঈসার সঙ্গে ছিলেন সিমন পিটার, হজরৎ মুহম্মদের সঙ্গে ছিলেন আলী, আর মুহম্মদ-বিন্ ইসমাইলের সঙ্গে ছিলেন আব্দুল্লাহ্-বিন-মায়মন অল্-কদ্দা। প্রত্যেক মহানবীই নাকি তাঁহার অন্তরের যা-কিছু নিগূঢ় উপলব্ধি, তৎসমুদয় তদীয় পার্শ্বচর ঐ ইমামের নিকট ব্যক্ত করিতেন এবং নিজের আধ্যাত্মিক সাফল্যের সম্পূর্ণ প্রভাব ঐ ইমামের ভিতর সঞ্চারিত করিয়া যাইতেন। আধ্যাত্মিকতার মানস-সরোবর হইতে সাধনার পুণ্যধারা এইরূপে প্রথম ইমামের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ক্রমে উহা অপর সকল ইমামে সংক্রমিত হইয়াছে। আবার প্রত্যেক যুগেই সপ্তম ইমামের শেষে দ্বাদশ জন করিয়া গুরুর (নকীব) উদ্ভব হইয়াছে। সর্ব্বশেষ গুরুর তিরোভাবের সঙ্গেই সে জমানার সমাপ্তি ও পরবর্ত্তী পয়গম্বরের জমানার আরম্ভ হইয়াছে।

এইরূপে ষষ্ঠ যুগ অর্থাৎ হজরৎ মুহম্মদের (দঃ) যুগ শেষ হইয়াছে ঐ জমানার সপ্তম ইমাম ইস্মাইল ও তৎপরবর্ত্তী দ্বাদশ জন ইমামের পরলোকপ্রাপ্তিতে। তারপর সপ্তম যুগ আরম্ভ হইয়াছে ইস্মাইলের পুত্র মুহম্মদের (মুহম্মদ-বিন্ ইস্মাইল) আবির্ভাবে।

ইস্মাইলী দীক্ষারও সাতটী স্তর আছে। তাঁহারা বলেন, সপ্তস্তর উত্তীর্ণ হইলে তবে শিষ্য আধ্যাত্মিকতার নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। তখন তাহার নিকট প্রতীয়মান হইবে—ধর্ম্মের প্রত্যেক সংস্কার, প্রাকৃতিক জগতের প্রত্যেক বস্তু সেই রহস্যেরই মূক বহিঃ-প্রকাশ মাত্র। যদিও শরিয়তের অনুসরণকারী অন্ধ মোসলেমদের নিকট ইহা অর্থশূন্য, কিন্তু দীক্ষিতের নিকট সে সত্য বিরাট সৌন্দর্য্যময় এবং অপার ভূমা মহিমায় লীলায়িত।

এই দীক্ষার গুরুগণ অতি কৌশলে নবাগত তত্ত্বজিজ্ঞাসুকে করায়ত্ত করে। গুরু প্রথমেই তাহাকে প্রশ্ন করেন, আল্লাহ্ বিশ্বকে সপ্তদিবসে সৃজন করিলেন কেন? তিনিত এক মুহূর্ত্তে সব সমাধা করিতে পারিতেন। আকাশ সপ্ত তল কেন? পাতালই বা সপ্ততল কেন? কোরাণের প্রথম সুরাতে সাতটী আয়েত কেন? তোমার ঐ মেরুদণ্ডে সাতটী খণ্ড কেন? আগন্তুক যখন কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না এবং বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া উহার অর্থ জানিতে ব্যাকুল হয়, তখন তাহাকে বলা হয়, তুমি এই ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ কর; যখন রহস্যসাগরে ডুবিয়া যাইবে, তখন তোমার নিকট সকল প্রশ্নের সমাধান আপনি হইয়া যাইবে। কি তথ্য সে লাভ করিবে, তাহা সে কিছুই জানে না। গুরুও কিছু অগ্রিম বলিবার পাত্র নহেন। হতবুদ্ধি আগন্তুক তখন দারুণ আগ্রহে ঐ দিকে ছুটিয়া যায়। গুরুকে যদি প্রশ্ন কর, এমন একটা সাধন-পন্থা পয়গম্বরগণ প্রকাশ করেন নাই কেন? গুরু তৎক্ষণাৎ উত্তর করিবেন—ইক্ষুতে কবে রস দৃষ্ট হয়? উহা পিষিয়া নষ্ট কর, উহার ভিতরের রস আত্মপ্রকাশ করিবে।

এই দীক্ষাচক্রে যে-ই নিপতিত হয়, তাহাকেই প্রথমে একটা সত্যে আবদ্ধ হইতে হয় এই বলিয়া যে, সে নিজ গুরু ও ইমামের নিকট চিরদিন থাকিবে। অবিশ্বস্তকে কখনও মন্ত্রদান করা হয় না। সত্যগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বস্ততার নমুনাস্বরূপ গুরুকে অর্থ-ভেট দিতে হয়। অন্যথা আনুগত আন্তরিক বলিয়া গুরু বিবেচনা করেন না। এই অর্থের উপরই ইস্মাইলী সম্প্রদায়ের প্রচার-কার্য্য নির্ভর করিতেছে। আর এই প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বোপরি নেতা থাকেন একজন ফাতিমা-বংশীয় নৃপতি।

ইস্মাইলীদিগের নিকট সাতের ন্যায় বারোও একটী আধ্যাত্মিক সংখ্যা। তাঁহারা বলেন—বিশ্বের সারা গায়ে এই দুইটী সংখ্যার ছাপ অঙ্কিত রহিয়াছে। মানুষের দেহের ভিতরও সাত ও বারোতে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। যেমন সপ্ত গ্রহ—দ্বাদশ রাশি; সপ্ত অহ (সপ্তাহ)—দ্বাদশ মাস। মানুষের মুখমণ্ডলে সপ্ত দ্বার—দুই কর্ণ, দুই নাসা, দুই চক্ষু, এক মুখ। মেরুদণ্ডে সপ্ত খণ্ড ও দ্বাদশ অস্থি ইত্যাদি।

ইঁহাদের মতে গুরুর কৃপা ব্যতীত কেবল আত্মচেষ্টায় কেহ সত্যে উপনীত হইতে পারে না। গুরুর ভিতর দিয়াই মানুষ বিশ্বজনীন

চৈতন্যের সহিত আপনার সংযোগসাধন করিতে সমর্থ হয়। এই বিশ্বজনীন জ্ঞানই যুগে যুগে পয়গম্বরের রূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠে এবং তখন সে বাঙ্ময় হয়, তাঁহার বাণী তখন বিশ্ববাসীর শ্রবণে পৌঁছে। পয়গম্বরের তিরোভাবে উহা আবার মৌনী হইয়া পড়ে এবং কেবল গুরুর ভিতর দিয়া মানুষের নিকট ধরা দেয়।

সর্ব্বপ্রথমে শিষ্যকে গুরু ও ইমামের প্রতি যে বিশ্বস্ততার শপথ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা এই—গুরু বলেন, "তোমার দক্ষিণ হস্ত আমার হস্তে স্থাপন করিয়া কঠোরতম শপথ গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর যে, 'জীবনে কখনও আমাদের গোপনীয় কথা প্রকাশ করিবে না; কখনও আমাদের বিরুদ্ধাচারীদিগের সহায়তা করিবে না, বা আমাদিগকে বিপদে ফেলিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিবে না; আমাদের নিকট কখনও সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিবে না এবং আমাদের শত্রুদলে কখনও যোগদান করিবে না"। শিষ্য প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইলে পর তাহাকে বলা হয় যে, নামাজ রোজা দ্বারা কখনও আল্লাহর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না। ধর্ম্ম অতি গুহ্য বস্তু। ইমামের নিকট হইতে সাধনার ভেদ অবগত না হইলে নামাজ রোজা ইত্যাদি পালন করা বৃথা; কেননা ধর্ম্মের ঐ গুলি বাহ্যিক রূপে প্রকাশ মাত্র (Symbolic Expression). ধর্ম্মের নিগূঢ় অর্থ যা-কিছু সমস্ত শুধু ইমামের নিকটই গচ্ছিত আছে।.........

ইহাই ইস্মাইলী দীক্ষার প্রথম স্তর। দ্বিতীয় স্তরে সপ্ত মহাযুগ এবং পয়গম্বর (নাতিক্) কি, ইমাম কি, প্রথম ইমাম (আছাছ) ও তদনুসরণকারী অপর ছয় ইমামের (ছামিৎ) ভিতর কি সম্পর্ক, সেই সব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা হয়। এই সম্পর্কে ইহাও শিষ্যকে বুঝিতে দেওয়া হয় যে, হজরৎ মুহম্মদ শেষ নবী নহেন এবং কোরাণ আল্লাহর বাণীর শেষ সংস্করণ নহে। এই সময়ই শিষ্য সম্পূর্ণরূপে ইসলামের গণ্ডী হইতে বাহিরে গিয়া পড়ে। তার পর তাহাকে শিক্ষা দেওয়া হয় যে মুহম্মদ-বিন-ইসমাইলের আবির্ভাবে প্রাচীন স্থূল ধর্ম্মের (উলুম্-উল্-আউয়ালিন্) সমাপ্তি হইয়াছে ও নূতন আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের (বাতেনী বা তাবিল) সূচনা হইয়াছে।

তৃতীয় স্তরে নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত ইত্যাদি বাহ্যিক উপাসনাসমূহের অর্থ কি, কি কারণে এই সকল অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে রূপক-ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। শিষ্য তাহাতে স্থির-নিশ্চয় হয় যে, ঐ সকলের কোনও স্থায়ী সার্থকতা নাই, এবং ঐগুলির পরিহারে কোনও লোক্সান নাই—সুচতুর দার্শনিকগণ অজ্ঞ জনসাধারণের উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের জন্যই ঐগুলির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।............

চতুর্থ স্তরে সংখ্যাসমূহের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয় এবং বাতেন সাধনার সহিত সেগুলির কি সংস্রব রহিয়াছে, তাহা শিষ্যকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, সংখ্যার মাহাত্ম্য ইস্লাম কোনও দিনই স্বীকার করে নাই। ইহা গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরাস্ হইতে গৃহীত। ভারতীয় সাংখ্যদর্শনের সহিত ইহার কোনও যোগ আছে কি না, তাহা হিন্দু ভ্রাতৃগণ ভাবিয়া দেখিবেন। শিষ্য তখন হইতে হজরৎ রসুল সম্বন্ধে বেয়াদবী সহকারে কথা বলিতে শিখে ও কোরাণের সাধারণ অর্থকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া উহার ভিতর হইতে রূপক-অর্থের সন্ধানে প্রণোদিত হয়।

অপেক্ষাকৃত প্রবীন শিষ্যগণকে পঞ্চম স্তরে উন্নীত করা হয়। এই স্তরে সৃষ্টিরহস্য বিবৃত করা হয়। সৃষ্টির মূলে একটা অবিনশ্বর ও অপরিবর্ত্তনশীল নিগুর্ণ সত্তা ও একটা পরিবর্ত্তনীয় সত্তা স্বীকৃত হয় এবং এইরূপে ইস্লামের ঐক্যসূত্রের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। পুরুষ ও প্রকৃতি ব্রহ্ম ও মায়া ইত্যাদি ভারতীয় ধারণার আমেজ এইখানে দৃষ্ট হয়।

ষষ্ঠ স্তরে শিষ্যকে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, উপরি উক্ত দুই সত্তার উপর আর এক সত্তা আছে—যাহার নাম নাই, গুণ নাই, যাহাকে বর্ণনা করা চলে না এবং যাহাকে কিছু বলিয়া উপাসনা করিবারও উপায় নাই। এইখানে নিওপ্লেটনিক আদিম প্রজ্ঞার ছায়াপাত দৃষ্ট হয়। উহা ভারতীয় মহাকাল ও পারসীক "জারবন্ অকারণের" সহিতও তুলিত হইতে পারে। তারপর একে একে মহাপ্রলয়, ন্যায়বিচারের দিনের পুনরুত্থান (resurrection) পারলৌকিক পুরস্কার, ও দণ্ড ইত্যাদি যাবতীয় কথার রূপক-অর্থ প্রদান করা হয়।

সপ্তম বা শেষ স্তরে সকল প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যক্ত হয়। জগতের কোনও ধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা আর চলে না। শিষ্য তখন নাকি এক আলোক-প্রাপ্ত দার্শনিক হইয়া পড়েন। তখন যে ভাবে খুশী সেই ভাবেই জীবনযাপন করিতে শিষ্য অনুমতি প্রাপ্ত হন। কিছুতেই নাকি তাঁহাতে আর পাপ আসিতে পারে না। সর্ব্বপ্রকার নীতিবচন তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যায় এবং বিকৃত-মস্তিষ্কের দ্বারা যাহা সম্ভব, সেই সব ব্যাপারে তাঁহাকে লিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়।..................

প্রথমে শিয়া সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত হইলেও ইস্মাইলীগণ আব্দুল্লার সময় হইতে ক্রমশঃ তাঁহাদের মূল মত হইতে এতটা পৃথক্ হইয়া পড়েন যে শিয়াগণ পরে ইহাদের মতকে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অধর্ম্ম বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলেন।

প্রাচ্যশিল্পে গিরিশচন্দ্র

শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে নানা বিষয়ে তাঁর যে সব কথাবার্ত্তা হ'য়েছিল, তা' ধারাবাহিক রূপে 'বঙ্গ-

বাণী'তেলিপিবদ্ধ ক'রে আসছেন। কার্ত্তিক সংখ্যা হতে আমরা তার কিছু উদ্ধৃত করে দিলাম :—

আমি। পাশ্চাত্য শিল্পকলা ভারতীয় শিল্পকলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব'লেই কি ভারতে তার বিজয় ঘোষণা ক'রছে ?

গিরীশবাবু। না—শ্রেষ্ঠ বলে নয়। নূতন ব'লে—নবীন বলে। সবুজ রং এ তরুণদের চিরকেলে নেশা আছে। কি জান, ভারতীয় শিল্পকলা ভারতীয় জাতীর জীবনের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে অবনতির পঙ্কে ডুবে যাচ্ছিল—সব জিনিষে অবসাদ এসে যাচ্ছিল।—নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা জন্মাল না। ফলে সবই নামে মাত্র বেঁচে ছিল—এই সময় ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষে ইউরোপীয় সাহিত্য—শিল্পকলা—এক নূতন ইন্দ্রজাল চ'খের সম্মুখে ধরলে—কল্পনার নূতন কল্পলোক।—সে ঢেউ এখনও ষোল আনা টানে চলেছে। তাই ভয় হয়, পাছে এই স্রোতে আমাদের রত্নগুলি না ভেসে যায়—আমরা এই বানের জোয়ারে না তলিয়ে যাই।—কিন্তু জেনো সত্য অবিনশ্বর—আমাদের দেশের সাহিত্যকলা এই নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে নবীন রসে পুষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে জগতে ছড়িয়ে যাবে, সব বিষয়ে বিকাশ বিস্তার প্রাণেরই স্পন্দন।—মাটীর নীচে বীজ যখন থাকে—তখন কে তাকে দেখ্‌তে পায় ? সমস্ত প্রাণ-শক্তি যখন বীজাকারে নিহিত থাকে তখন সে অন্ধকারাচ্ছন্ন মাটীর তলা ভেদ ক'রে তার জীবনী-শক্তির বিকাশ দেখাবার চেষ্টা ক'রে। ধীরে ধীরে মাটী ভেদ ক'রে ওঠে। তখন আলো জল বাতাস—বিশ্বের জীবনী শক্তির স্পর্শে—সেই বীজ—ক্ষুদ্র চারা হয়ে পরে শ্যামল পল্লবে পত্রে পুষ্পে ফুলে ফলে সজ্জিত হ'য়ে আকাশ ভেদ করবার জন্য মাথা তুলে দাঁড়ায়---তার নিজের বিস্তার ও বিকাশের সঙ্গে তার প্রাণশক্তির প্রচার করে।---ভারতের সাহিত্য শিল্প—এক সময়ে নিজের গন্ধে নিজে অভিভূত হয়ে দিক্ আমোদিত ক'রেছিল—দেশ বিদেশে সে সৌরভ বিকীর্ণ হয়েছিল।—আবার কাল-প্রভাবে প্রাণশক্তি মুদিত হয়েছে—আবার ধীরে ধীরে তার প্রাণ-শক্তির স্পন্দন হচ্চে,—পাশ্চাত্যের স্পর্শে আবার তার নিজের রূপ ধরে দাঁড়াবে—বাণের জলে যেমন পলি প'ড়ে ভূমিকে উর্ব্বর করে তেমনি এই পাশ্চাত্যস্রোতে তার আবর্জ্জনা দুর্ব্বলতা ভেসে যাবে—নীচে পড়ে থাকবে পাশ্চাত্য কল্পনার নূতন কল্পলোক—তাতে ভারতীয় সাহিত্য-শিল্প নবীন যৌবনে জেগে উঠ্‌বে। Forms of expressions চিরকাল বাইরের আবর্ত্তনের সঙ্গে বদ্‌লায়।—এটা প্রকৃতির নিয়ম।—বিশেষ এই সমন্বয়ের যুগে ভারতে নূতন সমন্বয় বাণী ধ্বনিত হয়েছে—সেই ধ্বনি জলদগম্ভীর নির্ঘোষে ভারতের বাণী ঘোষণা করবে। সে শক্তিতে সমগ্র গগন কেঁপে উঠ্‌বে। ভারতে সে দিন—সেই গৌরবময় দিন—আসবে।

গিরীশ বাবুর আবেগময় মেঘমন্দ্রস্বরে এই বাণী যেন দৈববাণীর মত ধ্বনিত হ'ল। ধীরে ধীরে তাঁর নিকট বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শ্রীমতী ফজিলতন-নেশা ঢাকা আলমামুন ক্লাবে 'মুসলিম নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বিষয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, অগ্রহায়ণের সওগাতে' তাহা প্রকাশিত হয়েছে। তা থেকে কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করে দেওয়া হ'ল—

"......জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলে সমাজের কাজে লাগাবার জন্য দুটি জিনিষের সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন—শিক্ষা এবং স্বাধীনতা। স্বাধীনতা বলতে আমি অবশ্য সামাজিক স্বাধীনতার কথাই বলছি। এ দুটির মধ্যেও প্রথম এবং পরম প্রয়োজন হচ্ছে শিক্ষার ; কারণ সত্য শিক্ষা চিন্তার স্বাধীনতার ভিতর দিয়ে সামাজিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা-টিকে স্বতঃই উদ্বুদ্ধ করে তোলে। স্বাধীন চিন্তা এবং বিভিন্ন মতবাদের আবহাওয়ায় যারা গঠিত হয়েছে, সমাজের অন্ধ সংস্কার ভেঙ্গে দিয়ে গণ্ডীর বাইরে এসে আপন ব্যক্তিত্ব নিয়ে সরলভাবে মাথা তুলে দাঁড়ানো তাদের পক্ষে সহজ হ'য়ে ওঠে।

Roman Rolland, Bertrand Russel প্রভৃতি বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এই সত্যটি প্রচার ক'রতে প্রয়াস পাচ্ছেন যে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্ফূর্ত্তিই মানুষের কাম্য। এতদিন সমাজ সর্ব্বত্রই ব্যষ্টিকে সমষ্টির কাছে বলি দিয়ে এসেছে, কিন্তু সে-যুগের অবসান হ'য়ে গেছে। 'সমাজের জন্য সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে বিসর্জ্জন দেওয়া অন্যায়' --এটাই নবীন যুগের নূতন বাণী। যে সমাজ-সমষ্টির ভিতর ব্যষ্টিকে যত বেশী ফুটিয়ে তুলতে পারছে, সে-সমাজই সত্যিকার সভ্যতার পথে ততখানি এগিয়ে গেছে। এই ব্যষ্টিটিও কম-বেশী সকল সমাজেই দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু আমাদের সমাজের দিকে যখন আমরা ফিরে তাকাই, তখন আমরা কি দেখ্‌তে পাই ? ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দেওয়া ত দূরের কথা, সমাজের অর্দ্ধেক অঙ্গকেই এমন ভাবে চেপে দেওয়া হ'য়েছে যে তার অস্তিত্বও বোধ হয় কারো মনে পড়ে না। মানব-দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োজনীয়তা যেমন সমান, সমাজ দেহেও ঠিক সেইরূপ। নারী ও পুরুষ সমাজ-দেহের দুটি অঙ্গ। উভয়ের প্রয়োজনই তুল্য-রূপ। কিন্তু আমাদের সমাজ এই প্রয়োজনীয় অর্দ্ধাংশকে উপেক্ষা ক'রে উন্নত হ'তে—অগ্রসর হ'য়ে যেতে চেষ্টা ক'রছে, এর চেয়ে দুঃখের বিষয়—নিরাশার বিষয় আর কি হ'তে পারে ? নারীকে পর্দ্দার অন্তরালে রেখে দেওয়া হ'য়েছে,; বাইরের কোন সাড়া তার মনকে জাগিয়ে তুলতে পারছে না। যুগের পর যুগ এমনি ভাবে কেটে যাচ্ছে, কিন্তু এই জড়তা ঘুচিয়ে সমাজ-দেহকে সুস্থ করবার কোন চেষ্টা হয়নি। আপনাদের মধ্যে সেই প্রয়াস দেখেই আমি আমার কথা কয়টি নিয়ে সবার সামনে দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছি।

আমাদের মেয়েদের হ'য়ে তাদের অন্তরের শ্রেষ্ঠ দাবীটিকে আমি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জানাতে চাই—

"—দেবি নহি, নহি আমি
সামান্যা রমণী! পূজা করি রাখিবে মাথায়,
সেও আমি নই। অবহেলা কারি পুষিয়া
রাখিবে পিছে, সেও আমি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার যদি
অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

এখন এই দাবী সার্থক করবার, এই জড়তা ঘুচিয়ে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠে দেশের এবং সমাজের কাজে প্রাণমন সঁপে দিতে সমর্থ হবার জন্য নারীর প্রয়োজন—শিক্ষা। শিক্ষা বলতে শুধু বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডিগ্রীর কথা বলছি না। এখন প্রয়োজন সেই শিক্ষার, যা মানব মনের সঙ্কীর্ণতা দূর ক'রে মনকে প্রশস্ত ক'রে তোলে, যা নিজের স্বার্থ বলি দিতে অপরিচিত অনাত্মীয়কে আপন করতে শিখিয়ে দেয়, মানুষকে যা ন্যায়-অন্যায় বিচারে ক্ষমতা দেয়।......

......প্রথমেই একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাতে চাই যে অজ্ঞানতাজনিত অন্ধ গোঁড়ামীর প্রভাব কতদূর বিস্তৃত হ'য়েছে! ৫।৬ বৎসরের একটি ছোট ছেলে কাদতে কাঁদতে 'মা' 'মা' ব'লে মাকে ডাকছিল! মা প্রথমে ত সাড়াই দিলেন না। অবশেষে বিরক্ত ভাবে উর্দ্দুতে তিরস্কার করলেন, "মা বলছিস কেনরে বেয়াদব, আম্মা বলতে পারিস্ নে?" দেখুন, শিশু মাকে ডাকবে, তাতেও এত সঙ্কীর্ণতা! এই মায়ের কাছে শিক্ষা পেয়ে যে-ছেলে বড় হয়ে উঠ্‌বে, সে যখন আপনার শৈশবলব্ধ সংস্কারের বশে নানাপ্রকার বিরোধের সৃষ্টি ক'রে সমাজে এমন একটা বিশিষ্ট গতির স্রোত বইয়ে দিতে সাহায্য করবে, যা একে অবনতির পথেই টেনে আনবে, তখন দোষ দেওয়া যাবে কাকে? সেই ছেলেকে, না তার মাকে? অথবা সেই কর্ম্মীদের, যারা নারীশিক্ষার পথ রুদ্ধ করে দিয়ে ভবিষ্যতের আশাও নির্ম্মূল করতে ব'সেছে?

আমরা সবাই জানি, জীবনের প্রত্যূষে মানব সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে, সংসার সম্বন্ধে যে-ধারণা আমাদের মনে আঁকা হ'য়ে যায়, সেটাই অধিকাংশ স্থলে চিরজীবনের জন্য স্থায়ী হ'য়ে থাকে। শিশুকালে অর্জ্জিত বিশ্বাসের প্রভাব আমাদের জীবনের অনেক স্থলে আমাদের অজ্ঞাতেই কাজ করে। শিশুর শিক্ষা প্রধানতঃ মায়ের কোলে বসেই আরম্ভ হয়। সুতরাং এই শিক্ষাদাত্রী জননীর দায়িত্ব যে কতটা, তা' সহজেই অনুমেয়। শিশুর হৃদয়ে যে-ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে, ভবিষ্যতে সেইগুলির প্রভাবই তার মতামত, তার কর্ম্ম-প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করবে। সুতরাং এই প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি উদারতার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ভবিষ্যতে সে যেন অবনত মাতৃভূমির কার্য্যে নিজকে নিয়োজিত রাখতে পারে, সে জন্য একান্ত চেষ্টার প্রয়োজন। মুসলিম শিশুদের প্রধানতঃ এই কয়টি শিক্ষা দিতে হবে।

তাদের ভাল ক'রে বুঝাতে হবে যে, তাদের মাতৃভূমি আরব, পারস্য, তুরস্ক বা মিশর নয়। তাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ, এবং তারা ভারতবাসী। জাতীয়ত্ব গড়ে ওঠে 'সমধর্ম্মে'র ও উপর নয়, 'সমদেশিকতা' ভিত্তির উপর। ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ প্রভৃতি ইউরোপের জাতিসমূহ এবং আমেরিকবাসী সকলেই খৃষ্টান। কিন্তু সে-জন্য ফরাসী-দেশীয় কোন খৃষ্টানই আপনাকে জাতিতে জর্ম্মাণ বা ইংরেজ ব'লে পরিচিত করতে প্রয়াসী হবে না। ফ্রান্সের খৃষ্টান ফরাসী, এবং ইংলণ্ডের খৃষ্টান ইংরেজই থাকবে। ধর্ম্ম তাদের জাতীয়তার উপর আসতে পারে না। সেই রকম, ভারতবর্ষের মুসলমানও ভারতবাসী, অন্য পরিচয়ে তাদের গর্ব্ব করবার কিছুতো নেই-ই, বরং লজ্জার বিষয়ই আছে। তাদের আরও শিখাতে হবে যে, ভারতের যে-প্রদেশে তারা জন্মেছে, তার ভাষাই তাদের মাতৃভাষা, তার পরিচ্ছদই তাদের জাতীয় পরিচ্ছদ, এবং সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে ভারতবাসী তার আপনার জন। এটা শিক্ষা তাদের বিশেষভাবে পাওয়া দরকার। তাদের এ-কথা জানা চাই যে, ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম্ম বড় জিনিষ হ'লেও জাতীয় জীবনে সেটা সবচেয়ে বড় বা কাম্য-বস্তু নয়! এটা বুঝাতে হলে চাই—পরমসহিষ্ণুতা, কিন্তু উদার শিক্ষা ব্যতীত এই জিনিষটি লাভ করা অতি কঠিন।

পরিণত মনুষ্যের চিত্তে এই ভাবটির স্ফূর্ত্তি হওয়ার উপযোগী বীজ শিশুচিত্তে বপন করতে হবে। এই সত্যটি প্রত্যেক সম্প্রদায় হৃদয়ের সঙ্গে অনুভব করে যদি একে সফল করে তুলতে পারেন, তবে বোধ হয় সাম্প্রদায়িক বিরোধের সমাপ্তি অতি সহজেই হ'তে পারে।

এখন, একে সফল করতে হ'লে উপযুক্ত শিক্ষিত জননীর একান্ত প্রয়োজন। বিখ্যাত ফরাসী-বীর নেপোলিয়ন ব'লেছিলেন, "The hope of France is in her mothers." আমি আজ এই কথাটাকেই একটুখানি পরিবর্ত্তিত ক'রে বলতে চাই,—"The hope of India is in her mothers" দুঃখের সঙ্গে এই কথাটাও ব'লতে হচ্ছে যে, কথাটার যথার্থ মূল্য আজও ভারতবাসী, এবং তাদের মধ্যে বিশেষ করে মুসলমান-সম্প্রদায় দিতে শিখেনি। সন্তানকে প্রকৃতি মনুষ্যপদ-বাচ্য করবেন জননী, অথচ সেই জননীর মনুষ্যত্বই অসম্পূর্ণতার নিম্নতম স্তরে রয়ে গেছে। মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক কোন রকম শিক্ষা দিবার প্রয়াস নাই, আছে শুধু অন্ধবিশ্বাসের গোড়ামী!

এই ত গেল শিশুচরিত্র-গঠনের দিক থেকে জননীরূপিণী নারীর শিক্ষার প্রয়োজনের কথা। কন্যা-রূপে, ভগ্নী-রূপেও নারীর যে শিক্ষার কতখানি প্রয়োজন, তাও একটু ভেবে দেখ্‌লেই আমরা বুঝ্‌তে পারি।

সমাজের কোন পরিবর্ত্তন করতে গেলেই—তা যতবড় উন্নতির জন্তই হোক না কেন—সমাজের সঙ্গে বিরোধ বাঁধে। আবার সমাজ যতদিন যথার্থভাবে বেঁচে থাক্‌বে, ততদিন তাকে পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে যেতেই হবে। কারণ, যার প্রাণ আছে, সে নিশ্চল অবস্থায় থাক্‌তে পারে না। এইজন্য চিরদিনই সমাজের বুকে এমন কর্ম্মীর প্রয়োজন হয়, যাঁরা এই বিরোধের সম্মুখে দাঁড়িয়ে, পরিবর্ত্তন স্রোতের বাধা ভেঙ্গে দিতে থাকেন। এঁরা যখন বাইরের সংঘাতে ক্লান্ত হয়ে অবসন্ন হৃদয়ে গৃহে আসেন, তখন তাঁদের এই অবসাদের বোঝা নামিয়ে দিয়ে চিত্তকে উৎসাহিত ক'রে রাখতে না পারলে তাঁরা যে ভেঙ্গে পড়্‌বেন। তাঁরা তখন কামনা করেন, আন্তরিক সহানুভূতি এবং অদম্য উৎসাহ; তাঁরা চান তখন ভাবধারার আদান-প্রদান। তাঁদের এই প্রাণের কামনাকে পূর্ণতার পথে নিয়ে যেতে, তাঁদের নিরুৎসাহ চিত্তে আশা জাগিয়ে দিতে, তাঁদের পরিশ্রান্ত মনকে শক্তি দিয়ে সজীব করতে পারে কে? পত্নীরূপেই হোক, বা দুহিতারূপে বা ভগ্নীরূপেই হোক, এ কাজ সম্পন্ন করতে পারে শুধুই উপযুক্তরূপে শিক্ষিতা নারী। তাদের অভাবই আজ সমগ্র সমাজকে কর্ম্মকীর্ত্তিহীন করে রেখেছে।

এ-রকম ভাবে দেশের বা সমাজের যে-কোনো সমস্যা নিয়েই আমরা আলোচনা করি না কেন, অধিকাংশ স্থলেই দেখতে পাব যে নারীকে চেপে রেখে পুরুষ একা উঠ্‌তে চেয়েছে, এবং ফলে পঙ্গু-সমাজ নিত্য নূতন সমস্যা নিয়ে বিব্রত পড়েছে।

তাই আজ আমি দেশের তরুণদের অনুরোধ ক'রে বল্‌ছি যে, তাঁরা নারীর উন্নতির পথে এই যে শিক্ষার অভাব-জনিত বিরাট বাধা, এটা ভেঙ্গে ফেলে দিতে সাহায্য করুন। প্রয়োজন হবে শুধু সাহস ও উৎসাহের; কিন্তু নবীনের মধ্যে তো এর একটিরও অভাব নেই।

নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বল্‌বার আরও অনেক রয়েছে। কিন্তু আর বেশী অগ্রসর হ'লে আপনাদের শোনবার হয়তো ধৈর্য্য থাকবে না তাই আজ কবি Tennyson এর কথাতেই আমার বক্তব্য শেষ ক'রে আমি আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি

"The Woman's cause is Man's ; they rise or sink
Together ; dwarfed or God-like bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall Man grow ?"

রবীন্দ্রনাথের বাণী

পৌষের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত জনৈক মহিলাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের দুইখানি পত্রাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—

"হোক্‌না সংসার প্রতিকূল, সমস্ত সংসারের চেয়ে তোমার আত্মা অনেক বেশি বড়। আজ যাহার কাছে হার মানিয়া কান্নাকাটি করিতেছ হঠাৎ দেখিবে তাহা স্বপ্নের মত মিথ্যা। সে ধোঁয়ার মত তোমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে—এই ধোঁয়া বাহির হইতে দেখিতে প্রকাণ্ড কিন্তু তোমার মধ্যে যে মৃত্যুহীন শিখাটি রহিয়াছে তাহা চোখে দেখিতে ছোট হইলেও পর্ব্বতপ্রমাণ ধোঁয়ার চেয়ে বড়। আমি পুনশ্চ বলিতেছি তোমার দুঃখ-অবসাদ যতই প্রবল হোক্‌না কেন, তোমাকে তাহা যতই পীড়া দিকনা কেন, তবু আমি তাহাকে তুচ্ছ বলিয়াই মানিব। হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবেনা। তুমি জয়ী হইবেই, তীরে উত্তীর্ণ হইবেই, রক্ষা পাইবেই—ইহা ধ্রুব নিশ্চয় করিয়া জানিয়ো। তোমার জীবনের ইতিহাস একলা তোমার ইতিহাস নহে; ইহার মধ্যে সমস্ত জগতের মঙ্গলের ইতিহাস আছে, অতএব বিশ্বেশ্বর তোমাকে নষ্ট হইতে দিতে পারেন না; তোমার অন্তকার ব্যর্থতার বেদনা সমস্ত বিশ্বের তপস্যার অগ্নিকে ইন্ধন যোগাইতেছে। তুমি কেবলমাত্র একটি অন্তঃপুরের গৃহকর্ম্মরতা অখ্যাত রমণী নও, তুমি বিশ্বের মানুষ, তুমি ঈশ্বরের আপন।......"

* * *

"তোমার জীবনের মধ্যে কি কাজ চলিতেছে তাহা তুমি জান না—তিনিই জানেন। তুমি মনে করিতেছ তোমার নৈরাশ্য, তোমার ব্যর্থতা তোমার দুর্ব্বলতাই বুঝি চিরসত্য। তাহা তোমার একটা দুঃস্বপ্নমাত্র; হঠাৎ যেদিন তিনি তোমাকে জাগাইয়া দিবেন তখন দেখিবে অবসাদের আর লেশমাত্র নাই। ইতিমধ্যে যথার্থ আপনার উপর আস্থা স্থাপন কর, অবস্থা যেরূপই হউক্‌, সংসার-সংগ্রামে তুমি যতবারই পরাভূত হও তবু জানিয়ো তাহাই চরম নহে—তাহা ভেদ করিয়াও তুমি পরম চরিতার্থতা-লোকে প্রকাশিত হইবে—তোমার সকল বেদনার মধ্যে নিত্যই তুমি সেইদিকে চলিয়াছ। মাটির মধ্য হইতে বীজ অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বেও আকাশের আলোকে বাহির হইবার মুখে সে কাজ করিতেছে তাহা সে জানে না—সে আপন অন্ধকারকেই প্রবল এবং চিরন্তন বলিয়া ভুল করে। এই অকারণ দুঃখ হইতে তুমি আপনাকে নিষ্কৃতি দিয়া আনন্দিত চিত্তে সফলতার জন্য প্রতিজ্ঞা কর।"

সাহিত্যিক অভিযোগ

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় পৌষের ভারতবর্ষে লিখ্‌ছেনঃ—

"...এখন ও আমাদের দেশে খুব কম সাহিত্য-রসিকই বোধ হয়

খবর রাখেন গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি একজন কত বড় শিল্পী। আমরা আজকাল মাতোয়ারা হয়ে উঠি হামস্থন, বার্বুস, মার্গারিট, হাউপ্টমান, চেকভ্‌ প্রভৃতির নামে। কিন্তু বস্তুতঃ গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি ও হার্ডি যে এঁদের চেয়ে ঢের বড় শিল্পী সে-খবর রাখি না (অবশ্য রোমা রোলা, গর্কি ফ্রাঁস প্রভৃতি কয়েকজন সত্য শিল্পীর কথা আলাদা—কারণ তাঁরা চিরকালই নমস্য থাক্‌বেন—কিন্তু আমরা তাঁদের সঙ্গে যে পূর্ব্বোক্ত লেখকদের এক নিঃশ্বাসে নাম করতাম তাইতেই কি প্রমাণ হয় না যে আমরা এদের গুণানুরাগী হ'য়ে উঠেছিলাম বিশেষ ক'রে ইংরাজ সাহিত্যকে একটু হীন প্রতিপন্ন করবার জন্তেই)।

এ কথা হয়ত কারুর কারুর কাছে একটু বেশি বাড়াবাড়ি মনে হ'তে পারে। কিন্তু একটু ভেবে দেখ্‌লে সম্ভবতঃ অনেকেই স্বীকার করবেন যে এ-অভিযোগের মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে। নইলে গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি ও হার্ডির নাম আমাদের দেশে এত কম শোনা যায় কেন—যেখানে বয়ের, মেটারলিঙ্ক, ব্রিয়ো প্রভৃতির নাম সাহিত্য-সমালোচকের ঘরে্‌ ঘরে প্রতিধ্বনিত? কেন আমরা আজ অবধি এদের গুণ গ্রহণ করতে অক্ষম হ'য়ে উঠেছিলাম?

গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দিকে যে আমারা বাংলাদেশে এখনও ঠিকমত বুঝি নি তার প্রমাণ আমরা অনেক সময়েই ওয়েল্‌সের সঙ্গে তাঁর এক নিঃশ্বাসে নাম করি। ওয়েল্‌স্‌ টাকা-আনা-পাই বুঝদার, নাম-পিপাসু adventurer; গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি শিল্পী। ওয়েল্‌স্‌ এমন জিনিষ কখনও লেখেন না যার অর্থমূল্য নেই, গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি যা বল্‌বার প্রেরণা পান কেবল তাই লেখেন। এ বিষয়ে হার্ডি ছাড়া একমাত্র বার্ণাডশ গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দির সঙ্গে একাসনে বসবার যোগ্য।"

অশ্লীল ও অসুন্দর

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত অগ্রহায়ণের 'কালি-কলমে' লিখিতেছেন :—

"শিল্পে অশ্লীলের স্থান আছে, কিন্তু অসুন্দরের স্থান নাই।

অশ্লীল ও অসুন্দর এক জিনিস নয়—শ্লীল আর সুন্দরও এক জিনিস নয়।

যাহা শ্লীল তাহা ভব্য, তাহা সুষ্ঠু (correct) হইতে পারে; কিন্তু এই হেতুই তাহাকে যে আবার সুন্দর বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহা সঙ্গত নয়।

পিউরিটানেরা (Puritans) সুষ্ঠু ও ভব্যের শ্লীলের প্রতিমূর্ত্তি, কিন্তু সেই জন্ত তাহাদের মধ্যে সুন্দরও যে আসিয়া ধরা দিয়াছে এমন প্রমাণ পাই না। ইতিহাস বলিতেছে উল্টা কথা—শ্লীলতাও যে অসুন্দরেরই বিগ্রহ হইতে পারে তাহার উদাহরণ পিউরিটান ইংলণ্ড।

আর অশ্লীল যে অসুন্দর হইবেই, এ কথা কত বড় মিথ্যা তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ মহাকবি কালিদাস।

অশ্লীল অসুন্দর হইয়া পড়ে কখন? যে-আবরুতার একটা বিশেষ ধাপে নামিয়া আসিলে? আমি তা মনে করি না। অশ্লীলের সাথে যে-আবরুতার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু অসুন্দরের সাথে নয়। চরম যে-আবরুতাও পরম সুন্দর হইতে পারে—স্রষ্টার দেখার ভঙ্গীতে, শিল্পীর হাতের গুণে। আমি মনে করি অশ্লীল অসুন্দর হয় ঠিক সেই কারণেই যে কারণে শ্লীলও অসুন্দর হইয়া পড়ে।

শ্লীলতা অসুন্দর যখন শ্লীলতার অর্থ ছুৎ-ধর্ম্ম, রুচিবাগীশতা, "উন্নাসিকতা" (piggishness)—অর্থাৎ বস্তুকে যখন তাহার সহজ স্বাভাবিক মর্য্যাদা দেই না, বিশ্বলীলায় তাহার যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম তাহা উপলব্ধি না করিয়া, সমগ্রের মধ্যে তাহার স্বস্থান হইতে কাটিয়া তুলিয়া আলাদা করিয়া দেখি, একটা কৃত্রিম মূল্য—কখনও অত্যধিক, কখনও অতি ন্যূন—তাহার উপর আরোপ করি। জিনিষ সুন্দর হইয়া উঠিতে থাকে যখন তাহাতে ধরা দেয় বিশ্ব-ছন্দের দোল, সৃষ্টির মহানন্দের একখানি হাসি। স্বভাবের বুকে সবই সুন্দর, অসুন্দর হইতেছে যাহা কৃত্রিম, যাহা কুটিল (perverse)।

কুৎসিতকে, ক্লেদকে যে আনন্দে ভরপুর হইয়া ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন, হে শিল্পী, তুমি অনুভব করিয়াছ কি সেই আনন্দ—তোমার সৃষ্টির পিছনে আছে সেই আনন্দ, সেই আনন্দের নিরিখ? তবেই তুমি সেই পরশ পাথর পাইয়াছ অসুন্দরকেও যাহা সুন্দর করিয়া তোলে।

দুঃশাসনের হাতে আবরু-হরণ অশ্লীল এবং অসুন্দর; শ্রীকৃষ্ণের হাতে আবরু-হরণ শ্লীল না হৌক, পরম সুন্দর।

কবি বলিতেছেন, "অতি-অসুন্দরের সাথে জুড়িয়া দাও ভগবানকে, পাইবে অতি-সুন্দর। ফাঁসিকাঠে ভগবানকে যখন ঝুলাইয়া দিয়াছ তখনই তাহা হইয়া উঠিয়াছে 'ক্রশ'।"

অদ্বৈত অনুভূতি

পৌষের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র লিখিতেছেন :—

"এই আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল ১৯০৭ সালের ১০ই নভেম্বর বেলা সাড়ে দশটার কিছুক্ষণ পরে। তখন আমার বয়স ৩৯ উত্তীর্ণ হইয়াছে। স্থান আমার আপিস ঘর, ৫ নং হেষ্টিংস্‌ ষ্ট্রীট। এখন ৫নং হেষ্টিংস্‌ ষ্ট্রীটে যেখানে নূতন চারিতলা বাড়ীটি আছে, তখন সেখানি একটি পুরাতন দোতলা বাড়ী ছিল। তাহাতে আমার আপিস ছিল দোতলায়—আমার ঘর ও বসিবার স্থানের সম্মুখে চার্চ্চ লেন। সম্মুখে উত্তরে জানালার ভিতর হইতে ছোট আদালতের বাড়ী দেখা যাইতেছিল। আমি চাপকান পেন্টলুন পরিধান করিয়া একখানি ইংরাজী পুস্তকে আমেরিকার Healthy-mindedness Movement এর বিষয় পড়িতেছিলাম। বেয়ারা তামাক দিয়া গিয়াছে; কেদারায় পা তুলিয়া চেপ্যাজি খাইয়া বসিয়া পড়িতেছিলাম ও তামাক টানিতেছিলাম।

আমার সামান্য সর্দ্দি করিয়াছিল ও সামান্য মাথা ভার ছিল। বইখানি পড়িতে পড়িতে টেবিলের উপর খোলাই রাখিয়া দিয়াছি। ওই পুস্তকের যেখানে মূল কথা লেখা আছে যে, আমরা ইচ্ছা করিলে রোগমুক্ত হইতে পারি। আমি পুস্তক রাখিয়া পুস্তক লিখিত বিষয়ে একরূপ অলসভাবে ভাবিতেছি; আমার মনে হইয়াছে যে, স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়া যে বেদান্তের মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার ফলে কর্ম্মকুশল আমেরিকাবাসীরা তাহা এইরূপ সাংসারিক কার্য্যের উপযোগী করিয়া লইতেছে। আমি ভাবিতেছিলাম—বটেই ত। যদি আমি স্বরূপতঃ ব্রহ্মই হই, আমার ভিতর যদি তাঁহারই শক্তি নিহিত থাকে, তবে কেনই বা আমি ব্যাধি দৈন্য ইত্যাদি দ্বারা ক্লিষ্ট হই? আমি ঢিলেভাবেই এইরূপ ভাবিতেছিলাম—ইংরাজীতে যাহাকে Reverie বলে কতকটা সেইভাবে। এমন সময়ে হঠাৎ আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল সমস্ত শরীর প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গপ্লাবী অতুলানন্দলহরী বহিতে লাগিল। সে আনন্দের কোন তুলনাই হয় না। চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু আপনিই ঝরিতেছে। কাম উপভোগের—স্পর্শসুখের আনন্দকে কোটী কোটী গুণ বর্দ্ধিত করিয়া তাহার সহিত জ্ঞানের আনন্দ (intellectual pleasure) ও পরকে সুখী করিয়া তাহার সুখ বা আনন্দ দেখিয়া যে আনন্দ হয় তাহাও কোটীগুণ বর্দ্ধিত করিয়া একত্র করিলে কতকটা তাহার আভাষ পাওয়া যায়। প্রত্যেক রোমাগ্র পর্য্যন্ত—নখরাগ্র পর্য্যন্ত সেই আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আশ্চর্য্য অনুভূতি হইতেছিল যে আমি সর্ব্বময় সর্ব্বত্রই অনুপ্রবিষ্ট। দূরে যে ছোট আদালত বাড়ী আছে, তাহার ইষ্টকাদিরও ভিতর—ওই বাড়ীর ছাতে একটি কাক বসিয়াছিল তাহারও ভিতর চার্চলেনস্থ সমাধিক্ষেত্রে একটি বড় অশ্বত্থ গাছ ছিল তাহারও ভিতর—সমস্ত আকাশে—রৌদ্র-কিরণে অনুপ্রবিষ্ট। তাহারা—সমুদায় সূর্য্য তারকা প্রভৃতি আমারই অন্তর্গত—আমি তাহাদের অপেক্ষা বহুগুণে বৃহত্তর। আগুনের উপর বায়ু কম্পমান হইয়া যেমনভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ আমার প্রত্যেক রোমকূপ হইতে আমি যেন বহির্গত হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছি ও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছি, এইরূপ বোধ হইয়াছিল। আমার এখন স্মরণ হইতেছে (যদিও আমার সেই সময়ে লিখিত নোটে নাই,—কিন্তু আমার এই স্মৃতির কথা বিশ্বাসযোগ্য; কেন না, সেদিনকার স্মৃতি বিস্মৃত হওয়াই একরূপ অসম্ভব) যে প্রত্যেক রোমকূপের ঠিক নিকটস্থলে আগুনের উপর কম্পমান বায়ুর মতন আমা হইতে বহির্গামী আমারই প্রবর্দ্ধিত অঙ্গও যেন দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। এই অনুভূতির সঙ্গে আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছিলাম যে, পৃথিবী অমিশ্র আনন্দময় স্থান; এখানে মৃত্যু শোক ও দুঃখ কষ্ট ব্যাধি কিছুই নাই। কেহ মরে না—অন্য সকলই মনের বিকার। আমার ভিতর একটি প্রবল প্রেরণা আসিয়াছিল। সেই প্রেরণাটা এই যে, আমি এখনই রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া বৈষ্ণব বাউলদিগের মতন নাচিয়া নাচিয়া দুই হাত তুলিয়া সকলকে বলি—"ওরে, তোরা কেন মিছে দুঃখ কষ্ট শোক ব্যাধি ভোগে ক্লিষ্ট মনে করিতেছিস! এ সব মিথ্যা। মৃত্যু নাই, জরা নাই—ব্যাধি, কষ্ট সব বাজে; তোরই মনের বিকার। একবার মনে জোর করিয়া ভাব—ও সব মিছে; এই সকলই তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবে। ওরে তোরা ভুল বুঝে মিছামিছি এই সকল কষ্ট ভোগ করিতেছিস্!" এই প্রেরণায় এত জোর হইতেছে যে, আমার নিজেকে সামলে রাখাই দায়। এইরূপ করিবার প্রেরণা হইতেছে বলিয়া আমার মনে হইল, আমি কি পাগল হইয়া যাইতেছি? কতকটা কোনরূপ পাগলামি করিয়া না বসি ও কতকটা তাহাদিগকে এই আশ্চর্য্য অনুভূতির কথা বলিবার জন্য, আমি আমার কতিপয় বন্ধু এটর্ণীকে ডাকিয়া আনিতে আমার বেয়ারাকে বলিলাম। হীরেন বাবুও তাহাদের ভিতর একজন। কিন্তু কেহই তখনও আপিসে আসিয়া উপস্থিত হন নাই। তাহার পর এ কথাও মনে উদয় হইল, হউক ইহা পাগলামি, হউক ইহা মস্তিষ্কের বিকার—এইরূপ আনন্দ উপ-ভোগ যদি থাকে, লোকে আমাকে পাগলই বলুক আর যাহাই বলুক তাহাতে কি আসিয়া যায়? মনে হইল, এই আনন্দ উপভোগের প্রয়াসেই সাধু, সন্ন্যাসী, যোগীরা সংসারের সকল সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন ও সন্ন্যাসাশ্রমের সকল কষ্টই অক্লেশেই সহ্য করেন। আরও মনে হইল, এই সময়ে যদি আমি যে সকল ব্যাধিগ্রস্ত, যথা মাথার ব্যারাম, স্মরণ-শক্তির হ্রাস, চক্ষুরোগ (নিকট দৃষ্টি), দন্তরোগ, অজীর্ণ রোগের বিষয়ে চিন্তা করি, আমি এখনই এই সকল রোগ-বিমুক্ত হইতে পারি। যে যে অঙ্গের প্রতি আমার চিন্তা ধাবিত হইতে লাগিল, সেই সেই অঙ্গে একটা creeping sensation হইতে লাগিল, মাথা ধরাটা চলিয়া গেল, কিন্তু অন্য কোন রোগে কোন উপকারই পাইলাম না। আমার বিচারশক্তির কোনরূপ হ্রাস হয় নাই। তাহার পরেই মনে হইল—আচ্ছা আমি যদি সর্ব্বব্যাপ্ত—সকলেতেই অনুপ্রবিষ্ট আমি তো সকল জীবেদেরই;—অতএব সকল বস্তুরই অন্তরের জ্ঞান ও কথা আমার জানিতে পারা উচিত; দেখি তাহা জানিতে পারি কি না। বলিয়াই সেই বড় অশ্বত্থগাছের মনের কথা—এতকাল ধরিয়া সে কি কি দেখিল, কি বুঝিল, উহার প্রাণের কথা কি বুঝিল, উহার প্রাণের তাহা জানিবার নিমিত্ত মন নিবিষ্ট করিলাম। কিন্তু কিছুই পাইলাম না। আশ্চর্য্য হইলাম। মনে হইল, আমি যখন ইহার ভিতরে, ইহার প্রত্যেক অণুতে অনুপ্রবিষ্ট, তবুও কেন উহার অন্তরের কথা জানিতে পারিতেছি না? এই যে অনুভূতি ইহা কি ভ্রান্তি? নিজের দিকে চাহিয়া তাহাও তো বোধ হয় না! যদি কেহ আমাকে বলে, আমার হাত নাই, বা পা নাই, সে কথাও যেমন আমি বিশ্বাস করিতে পারি না—

আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে উড়াইয়া দিতে পারি না এই অপরোক্ষ অনুভূতিকেও তেমনই কোন প্রকারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। তাহার পর আমি ক্রমে ক্রমে ছোট আদালতের ছাতের আলিসার উপর যে কাকটিকে বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইতেছিলাম, তাহার মনের কথা জানিতে চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তাহা পারিলাম না। আমার বাড়ীতে আমার দাদা ও স্ত্রী ও অন্যান্য লোকেরা কে কি করিতেছে, জানিতে চেষ্টা পাইলাম; তাহাও কিছুই দেখিতে শুনিতে বা বুঝিতে পারিলাম না। কেন যে পারিলাম না. তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই। এই সময়েও আমার সেই অতুলানন্দের অনুভূতি চলিতেছে। এই ব্যর্থ চেষ্টার পর, এই দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি সব মিথ্যা এই তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য অন্তরে যে প্রেরণা হইতেছিল, তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করিলাম—আচ্ছা, যেন মৃত্যু নাই; তাহার জন্য শোক করা বৃথা; ব্যাধি যেন মনের জোর করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়; কিন্তু একজন যে আর একজনের উপর অত্যাচার করে, অশেষ প্রকার নির্য্যাতন করে, এও কি মিথ্যা? এই যে ইংরাজেরা আমাদের উপর নানারূপ অন্যায় ব্যবহার করে (এই সময়ে স্বদেশী আন্দোলনের দিন মনে রাখিবেন), অত্যাচার করে, এও কি মিথ্যা? ইহার মানে কি? কেন এইরূপ অত্যাচার? আশ্চর্য্যের বিষয়, এই অত্যাচারের কথাও যেমন মনে হইল, অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই, আমার মধ্যে এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অনুভূতি ছিল তাহা হইতে আমি অতি দ্রুতবেগে সঙ্কুচিত হইতে লাগিলাম; আকাশ সূর্য্য প্রভৃতি হইতে গুটাইয়া আসিতে লাগিলাম; ছেলেদের রবারের বাঁশী যেমন ফু দিয়া ফুলাইয়া ছিদ্রটি খুলিয়া দিলে যেরূপভাবে সঙ্কুচিত হয়, আমিও তেমনই ভাবে মেল ট্রেণের গতির সহস্রগুণে বর্দ্ধিত বেগে সঙ্কুচিত হইতে লাগিলাম। সঙ্কুচিত হওয়ারও একটা অনুভূতি হইতে লাগিল। আমি অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম—কেনই বা এই চিন্তা মনে উঠিবামাত্র আমি এইরূপ সঙ্কুচিত হইতে লাগিলাম। কেনই বা আমার তাৎকালিক অনুভূত আনন্দ অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল! আপনা-আপনি মনে উদয় হইল, এই যে ইংরেজ-বিদ্বেষভাব মনের ভিতর উঠিয়াছে—যাহা অদ্বৈত জ্ঞানের বিরোধী ভাব, এই বিদ্বেষভাব উঠিয়াছে বলিয়াই আমি আর এই আনন্দ উপভোগের উপযুক্ত রহিলাম না। তখন আমি নিজেকেই মনে মনে বলিলাম, আমি কি করিতে পারি? আমি ইচ্ছা করিয়া এই বিদ্বেষ তো করিতেছি না। আমার মনের এই সংশয় আছে,—আমি তো কোন রূপে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারি না এই বলিয়া এক রূপ বিহ্বলভাবেই বসিয়া রহিলাম। ইতিমধ্যেই আমার মনে হইতে লাগিল, আমি যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ছিলাম, তাহা হইতে কমিয়া আসিয়া কেবলমাত্র ৫, ৭ হাত অর্দ্ধব্যাস ((radius) পরিমিত বৃত্ত স্থান মাত্র ব্যাপ্ত আছি। আনন্দের আতিশয্যও অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। তখন আমার অধিকৃত বৃত্ত স্থানের ভিতর হইতে, কে যেন ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "আচ্ছা, দেখ্ দিখিনি, এই যে প্রবলের দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার, যাহার নিমিত্ত তোর মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কেবল তোর অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন করাইবার নিমিত্তই—তোর অন্তরস্থ দোষ দেখাইবার নিমিত্তই। এই সকল মন্দ এখনকার এই আনন্দ উপভোগের পূর্ব্বাবস্থা মাত্র। এই সকল মন্দের দ্বারাই মানুষের মন ভগবান-অভিমুখী হয়। এই বলিলে কি তোর মনের সংশয় যায় না?" আমি এই কথাটির দ্বারা, আমার মনের সকল সংশয় যায় কি না তাহা দেখিতে চেষ্টা পাইলাম। এই ইংরাজ অধিকার আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধনের জন্যই হইয়াছে—আমাদের ভিতরের পাপ মোচন করাইবার নিমিত্তই তাহাদের এখানে আগমন—প্রবলের দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার কেবল দুর্ব্বলকে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন করাইবার নিমিত্ত—তাহার সমকক্ষ হইবার চেষ্টা আনাইয়া দিবার নিমিত্তই—তাহার ভিতরের দোষও পাপের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাইবার নিমিত্তই—তাহা অপনোদন করাইবার চেষ্টা আনয়ন করাইবার নিমিত্তই বলিলে, দেখিলাম, এক রকম বেশ সমস্যা পূরণ হয়। ইহাতে তো বেশ নূতন রকমে সংশয় ভঞ্জন হইল। আমি আশ্চর্য্য হইলাম ও তৎসঙ্গে আমার দ্বারা তৎকালে অনুভূতব্যাপ্তস্থান কিছু—অর্থাৎ আর দশ বিশ হাত অর্দ্ধব্যাস পরিমিত স্থান অধিকার করিলাম মনে হইল। কিন্তু তাহার উত্তরে আপনা আপনিই মনে মনে বলিলাম, আমি একরূপ বিহ্বল অবস্থায় আছি; এখন তো আপনার কথায় কোন ভুল বা দোষ দেখিতে পাইতেছি না—মাথাটা আরও পরিষ্কার হইলে মিলাইয়া দেখিব। এইরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ কাটিল—কতক্ষণ তাহা বলিতে পারি না—তখন আমার সময় জ্ঞান ছিল না—ঘড়ি দেখিতেও ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার দেহের বাহিরের আমি যেন কিকে হইয়া উপে গেলাম—সঙ্কুচিত হইয়া পুনরায় দেহেতে ফিরিয়া আসিলাম এই অনুভূতিটা হয় নাই। সর্ব্বসমেত অর্দ্ধঘণ্টা বা ৪৫ মিনিট এই অনুভূতিটি বোধ হয় ছিল। তাহার পর দীর্ঘ বিংশতি বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে আর কখনও সে ভাব হয় নাই।"...

নানা কথা

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "রবীন্দ্র-পরিষদে" গত ২৭, শে অগ্রহায়ণ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আমন্ত্রণ ও সংবর্দ্ধনা হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠাতৃগণের পক্ষ হইতে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও প্রীতির যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল তাহা অভ্যাগতবর্গকে সত্যই তৃপ্ত করিয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত মহাশয়ের অভিভাষণ অতিশয় হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছিল।

সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার অভিভাষণে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। তন্মধ্যে একটি---কবিই তাঁহার কাব্যের শ্রেষ্ঠ টীকাকার কিনা—অর্থাৎ কাব্য-রসিক পাঠক কবি-কল্পনাকে অতিক্রম কিংবা ব্যতিক্রম করিয়া রসোপভোগ করিতে পারেন কিনা। সুরেন্দ্রনাথের মতে পাঠকের সে অধিকার আছে। অভিভাষণের উত্তর দিবার সময়ে রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথের এ মতের অনুমোদন করেন।

রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গীতাঞ্জলির কতকগুলি গানে সঙ্গীতজ্ঞ ফেলিক্স্ হোয়াইট (Felix White) সুর সংযোজন করেছিল। বিলাতে সেগুলি গীতও হ'য়েছিল। সম্প্রতি গায়িকা-শ্রেষ্ঠা শ্রীমতী ক্লারা বাট্ (Dame Clara Butt) সেগুলি কলিকাতার Empress রঙ্গমঞ্চে গান করেন এবং ইংরাজ ও ভারতীয় শ্রোতৃবর্গ সেগুলি শুনে মুগ্ধ হ'য়েছেন —বিশেষ ক'রে 'Where the mind is without fear' কবিতাটির সুর-যোজনায়। শ্রীমতী ক্লারা বাট্ বোলপুরে গিয়াছিলেন এবং সেখানে রবীন্দ্রনাথের গান শুনে তৃপ্তি লাভ করেন। তিনি নিজেও রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার ইংরাজী গানগুলি শোনান।

*　　*　　*

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি ও ঔপন্যাসিক টমাস্ হার্ডি আর ইহ-জগতে নাই। গত ১২ই জানুয়ারী রাত্রিকালে পূর্ণ ৮৭ বৎসর বয়সে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

তাঁহার কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে কিছু আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু তিনি উপন্যাসের ভিতর দিয়া সাহিত্য-জগৎকে কি সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন তাহা আগামী সংখ্যার বিচিত্রায় বিশেষভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

*　　*　　*

এডোয়ার্ড কার্পেন্টার তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে সভ্যতাকেই মানুষের দৈহিক ও আত্মিক উভয়বিধ অধঃপতনের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার মতে বর্ব্বর যুগের মানুষ কম স্বার্থপর ছিল। সে সমাজ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিত না। সভ্যতার যাদুদণ্ড স্পর্শে যেমন তাহার আমিত্বের সম্প্রসারণ হইল অমনি সে ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন স্বার্থের পূজার পূর্ণমাত্রায় ব্রতী হইল।

এ ছাড়া সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ প্রকৃতি-মায়ের স্নেহের কোল ছাড়িয়া—এমন একটা কৃত্রিম আবেষ্টনে নিজেকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে যে তাহার জীবনী-শক্তির নিয়ন্তা ইন্দ্রিয়াতীত ভিতরের মানুষটি বন্ধনের নাগপাশে ধীরে ধীরে প্রাণত্যাগ করিতেছে এবং তাহারই জন্য অসভ্য অপেক্ষা সভ্যজাতির মধ্যে সর্ব্ববিধ রোগের এত বেশী প্রাদুর্ভাব। তাঁহার গ্রন্থের ইঙ্গিত কিন্তু এই যে, মানুষের প্রকৃত সভ্যতা শিল্প বিজ্ঞানের উন্নতির উপর তত নির্ভর করে না, যত নির্ভর করে, সমগ্র মানুষের সমগ্র, সুসমঞ্জস পরিস্ফুর্ত্তির উপর।

*　　*　　*

জর্ম্মাণ কাইজারের ভগ্নী ভিক্টোরিয়া যিনি ৬০ বৎসর বয়সে একটী ২৬ বৎসর বয়স্ক যুবকের পত্নীত্ব লাভ করিয়াছেন তিনি আত্মসমর্থনে বলেন যে বয়সের কোনরূপ বৈষম্যই সে বিবাহের অন্তরায় হইতে পারে না---যাহা আদর্শ বিবাহ কারণ প্রেমের কাছে বয়স বলিয়া কিছু নাই---প্রেম বয়সের হিসাব রাখেনা। কিন্তু দুঃখের বিষয় জগৎ এখনো বিষম বয়সের বিবাহকে নিন্দা ও পরিহাসের চক্ষে দেখে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে মানুষ মুখে প্রেমের ভাণ করিলেও অন্তরে দৈহিক স্তরের উপরে উঠিতে পারে নাই। "পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা" এই নিম্ন জাতীয় উদ্দেশ্যকেই তাহারা অজ্ঞাতসারে দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া অনুসরণ করে।

Printed at the Modern Art Press 1/2 Durga Pituri Lane Calcutta,
by Srijut Probodh Lal Mukherjee, and published by him from 51 Pataldanga Street, Calcutta.

শকুন্তলা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন
চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়ের
সৌজন্যে—

প্রথম বর্ষ, ২য় খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩৩৪ | তৃতীয় সংখ্যা।

তে হি দিবসাঃ

[অপরাহ্নে আর একটা কবিতা লিখে বসেচি। কর্ত্তব্য হাতে না থাকলে অকাজের প্রাদুর্ভাব কি রকম প্রবল হয় তারি এটা প্রমাণ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্‌ যখন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে "ওড্‌" লিখেছিলেন তখন তাঁকে যদি মলোর চাষ করতে হ'ত তা'হলে অত বড়ো দুর্ঘটনা ঘটত না। পোড়ো বাড়িতেই ভূতে বাসা করে।]

এই অজানা সাগরজলে বিকেলবেলার আলো
লাগল আমার ভালো।
কেউ দেখে কেউ নাই বা দেখে, রাখ্‌বেনা কেউ মনে,
এমনতর ফেলা-ছড়ার হিসাব কি কেউ গোণে?

এই দেখে মোর ভর্‌ল বুকের কোণ;
কোথা থেকে নামলরে সেই ক্ষ্যাপা দিনের মন,
যেদিন অকারণ
হঠাৎ হাওয়ায় যৌবনেরি ঢেউ
ছল্‌ছলিয়ে উঠ্‌ত প্রাণে জান্‌ত না তা কেউ।
লাগ্‌ত আমায় আপন গানের নেশা
অনাগত ফাগুন দিনের বেদন দিয়ে মেশা।

সে গান যারা শুন্‌ত তারা আড়াল থেকে এসে
আড়ালেতে লুকিয়ে যেত হেসে।
হয়ত তাদের দেবার ছিল কিছু,
আভাসে কেউ জানায় নি তা নয়ন ক'রে নীচু।

হয়ত তাদের সারা দিনের মাঝে
পড়ত বাধা এক বেলাকার কাজে।
চমক-লাগা নিমেষগুলি সেই
হয়তো বা কা'র মনে আছে, হয়তো মনে নেই।
জ্যোৎস্না রাতে এক্‌লা ছাদের পরে
উদার অনাদরে
কাট্‌ত প্রহর লক্ষ্যবিহীন প্রাণে,
মূল্যবিহীন গানে।

মোর জীবনে বিশ্বজনের অজানা সেই দিন,
বাজ্‌ত তাহার বুকের মাঝে খামখেয়ালী বীণ,—
যেমনতরো এই সাগরে নিত্য সোনায় নীলে
রূপ-হারানো রাধা-শ্যামের দোলন দোঁহায় মিলে;
যেমনতরো ছুটির দিনে এমনি বিকেল বেলা,
দেওয়া-নেওয়ার নাই কোনো দায়, শুধু হাওয়ার খেলা,
অজানাতে ভাসিয়ে দেওয়া আলো-ছায়ার ভেলা।

মায়র জাহাজ
২ অক্টোবর, ১৯২৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—উপন্যাস—
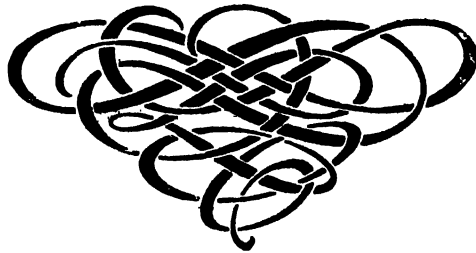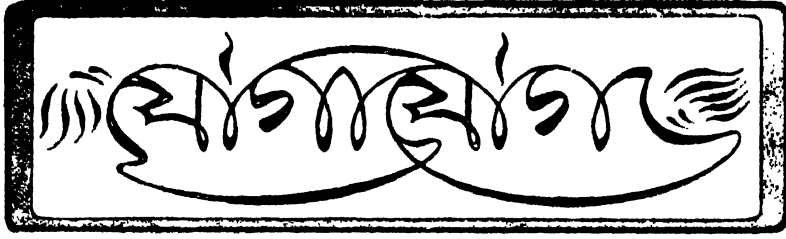
—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯

যথানিয়মে মধুসূদন বেলা একটার পরে অন্তঃপুরে খেতে এলো। যথানিয়মে আত্মীয় স্ত্রীলোকেরা তাকে ঘিরে ব'সে কেউবা পাখা দিয়ে মাছি তাড়াচ্চে, কেউবা পরিবেষণ করচে। পূর্ব্বেই বলেচি, মধুসূদনের অন্তঃপুরের ব্যবস্থায় ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর ছিলনা। তার আহারের আয়োজন পুরানো অভ্যাস মতোই। মোটা চালের ভাত না হ'লে না মুখে রোচে, না পেট ভরে। কিন্তু পাত্রগুলি দামী। রূপোর থালা, রূপোর বাটি, রূপোর গ্লাস। সাধারণত কলাইয়ের ডাল মাছের ঝোল, তেঁতুলের অম্বল, কাঁটাচচ্চড়ি হচ্ছে খাদ্যসামগ্রী; তারপরে সব শেষে বড়ো একবাটি দুধ চিনি দিয়ে শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত সমাধা ক'রে পানের বোটায় মোটা এক ফোঁটা চুন সহযোগে একটা পান মুখে ও দুটো পান ডিবেয় ভ'রে পনেরো মিনিট কাল তামাক টান্‌তে টান্‌তে বিশ্রাম ক'রে তৎক্ষণাৎ আপিসে প্রস্থান। অপেক্ষাকৃত দৈন্যদশা থেকে আজ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘকাল এর আর ব্যতিক্রম হয় নি। আহারে মধুসূদনের ক্ষুধা আছে, লোভ নেই।

শ্যামাসুন্দরী দুধের বাটিতে চিনি ঘেঁটে দিচ্ছিল। অনুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মোটা বল্‌লে যা বোঝায় তা নয়, কিন্তু পরিপুষ্ট শরীর নিজেকে বেশ একটু যেন ঘোষণা করচে। একখানি শাদা সাড়ির বেশি গায়ে কাপড় নেই, কিন্তু দেখে মনে হয় সর্ব্বদাই পরিচ্ছন্ন। বয়স যৌবনের প্রায় প্রান্তে এসেছে, কিন্তু যেন জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্ণের মতো, বেলা যায় যায় তবু গোধূলির ছায়া পড়েনি। ঘন ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ কালো চোখ কাউকে যেন সামনে থেকে দেখে না, অল্প একটু দেখে সমস্তটা দেখে নেয়। তার টস্‌টসে ঠোঁট দুটির মধ্যে একটা ভাব আছে যেন অনেক কথাই সে চেপে রেখেচে। সংসার তাকে বেশি কিছু রস দেয়নি, তবু সে ভরা। সে নিজেকে দামী ব'লেই জানে, সে কৃপণও নয়, কিন্তু তার মহার্ঘতা ব্যবহারে লাগ্‌ল না ব'লে নিজের আশপাশের উপর তার একটা অহঙ্কৃত অশ্রদ্ধা। মধুসূদনের ঐশ্বর্য্যের জোয়ারের মুখেই শ্যামা এ সংসারে প্রবেশ করেছে। যৌবনের যাদুমন্ত্রে এই সংসারের চূড়ায় সে স্থান ক'রে নেবে এমনো সঙ্কল্প ছিল। মধুসূদনের মন যে কোনো দিন টলেনি তাও বলা যায় না। কিন্তু মধুসূদন কিছুতেই হার মান্‌ল না; তার কারণ, মধুসূদনের বিষয়বুদ্ধি কেবলমাত্র যে বুদ্ধি তা নয়, সে হচ্চে প্রতিভা। এই প্রতিভার জোরে সম্পদ সে সৃষ্টি করেচে, আর সেই সৃষ্টির পরমানন্দে গভীর ক'রে সে মগ্ন। এই প্রতিভার জোরেই সে নিশ্চয় জান্‌ত ধনসৃষ্টির যে তপস্যায় সে নিযুক্ত ইন্দ্রদেব সেটা ভাঙবার জন্যে প্রবল বিঘ্ন পাঠিয়েছেন—ক্ষণে ক্ষণে তপোভঙ্গের ধাক্কা লেগেছে, বার বারই সে সাম্‌লে নিয়েচে। সুবিধা ছিল এই যে, ব্যবসায়ের ভরা মধ্যাহ্নে তার অবকাশমাত্র ছিল না। এই কঠিন পরিশ্রমের মাঝখানে চোখের দেখায় কানের শোনায় শ্যামার যে সঙ্গটুকু নিঃসঙ্গভাবে পেত তাতে যেন মধুসূদনের ক্লান্তি দূর করত। ক্রিয়াকর্ম্মের পার্ব্বণী উপলক্ষ্যে শ্যামাসুন্দরীর দিকে তার পক্ষপাতের ভারটা একটু যেন বেশি ক'রে ঝুঁকত ব'লে বোঝা যায়। কিন্তু কোনো দিন শ্যামাকে সে এতটুকু প্রশ্রয় দেয়নি অন্তঃপুরে যাতে তার স্পর্দ্ধা বাড়ে। শ্যামা

মধুসূদনের মনের ঝোঁকটি ঠিক ধরেচে, তবুও ওর সম্বন্ধে তার ভয় ঘুচ্‌ল না।

মধুসূদনের আহারের সময় শ্যামাসুন্দরী রোজই উপস্থিত থাকে; আজও ছিল। সদ্য স্নান ক'রে এসেছে—তার অসামান্য কালো ঘন লম্বা চুল পিঠের উপর মেলে দেওয়া—তার উপর দিয়ে অমলশুভ্র সাড়িটি মাথার উপর টেনে দেওয়া—ভিজে চুল থেকে মাথা-ঘসা মসলার মৃদু গন্ধ আসচে।

দুধের বাটি থেকে মুখ না তুলে এক সময় আস্তে আস্তে বল্‌লে, "ঠাকুরপো, বৌকে কি ডেকে দোবো?"

মধুসূদন কোনো কথা না ব'লে তার ভাজের মুখের দিকে গম্ভীরভাবে চাইলে। তার ভাজ শ্যামাসুন্দরী ভয়ে থতমত খেয়ে প্রশ্নটাকে ব্যাখ্যা ক'রে বল্‌লে—"তোমার খাবার সময় কাছে বস্‌লে হয় ভালো, তোমাকে একটু সেবা কর্‌তে—"

মধুসূদনের মুখের ভাবের কোনো অর্থ বুঝতে না পেরে শ্যামাসুন্দরী বাক্য শেষ না ক'রেই চুপ ক'রে গেল। মধুসূদন আবার মাথা হেঁট ক'রে আহারে লাগ্‌ল।

কিছুক্ষণ পরে থালা থেকে মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করলে—"বড়ো বৌ এখন কোথায়?"

শ্যামাসুন্দরী ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো, "আমি দেখে আসচি।"

মধুসূদন ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে আঙুল নেড়ে নিষেধ করলে। প্রশ্নের যে উত্তর পাবার আশঙ্কা আছে সেটা এর মুখে শুনলে সহ্য হবে না—অথচ মনের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল। আহার শেষে তেতলায় যখন তার শোবার ঘরে গেলো, মনের কোণে একটা ক্ষীণ প্রত্যাশা ছিল। একবার ছাদ এলো ঘুরে। পাশের নাবার ঘরে ঢুকে ক্ষণকালের জন্যে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার পরে বিছানায় শুয়ে গুড়্গুড়িতে টান দিতে লাগ্‌ল। নির্দ্দিষ্ট পনেরো মিনিট যায়—বিশ মিনিট পার হ'য়ে যখন আধঘণ্টা পূরো হ'তে চলল তখন বুকের পকেট থেকে ঘড়ি বের ক'রে একবার সময়টা দেখ্‌লে। বৎসরের পর বৎসর গেছে, আপিসে যাবার পূর্ব্বে কখনো পাঁচ মিনিট দেরি হয় নি। আপিসে একটা রেজিষ্টারি বই আছে, কে ঠিক্ কোন্ সময়ে এলো এবং গেলো সেই বইয়ে তার হিসাব থাকে—সেই হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে বেতনের মাত্রারেখা ওঠা নামা করে। আপিসের সকল কর্ম্মচারীদের মধ্যে মধুসূদনের জরিমানার অঙ্ক সব চেয়ে সংখ্যায় কম। অথচ এ সম্বন্ধে নিজের প্রতি তার পক্ষপাত নেই। বস্তুত নিজের কাছ থেকে কর্ম্মচারীদের চেয়ে ডবল হারে জরিমানা আদায় করে। মনে মনে আজ সে পণ করেচে যে অপরাহ্নে আপিসের সময় উত্তীর্ণ হ'লে অতিরিক্ত সময় কাজ ক'রে ক্ষতিপূরণ ক'রে নেবে। বেলা যতই প'ড়ে আসচে, কাজে মন দিতে আর পারে না। এমন কি আজ আধঘণ্টা সময় থাকতেই কাজ ফেলে বাড়ী ফিরে এলো। কেবলি ইচ্ছে করছিল অসময়ে একবার শোবার ঘরে এসে ঢুকতে। হয়তো কাউকে দেখ্‌তে পেতেও পারে। দিন থাকতে সে কখনই শোবার ঘরে আসে না। আজ আপিসের সাজ শুদ্ধ অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে।

ঠিক সেই সময়ে মোতির মা ছাদের রোদ্দুরে-মেলা আম্‌সিগুলো ঝুড়িতে তুল্‌ছিল। মধুসূদনকে অবেলায় শোবার ঘরে ঢুকতে দেখে একহাত ঘোম্‌টা টেনে তার আড়ালে অনেকখানি হাস্‌লে। মেজবৌএর কাছে তার এই অনিয়ম ধরা পড়াতে মধুসূদন লজ্জিত ও বিরক্ত হোলো। মনে প্লান ছিল অত্যন্ত নিঃশব্দ পদে ঘরে ঢুকবে—পাছে ভীরু হরিণী চকিত হ'য়ে পালায়। সে আর হোলো না। কৌতুক-দৃষ্টির আঘাত এড়াবার জন্যে সে নিজেই দ্রুত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। দেখ্‌লে আপিস পালানো সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েচে। ঘরে কেউ ত নেই-ই, দিনের বেলা কোনো সময়ে কেউ যে ক্ষণকালের জন্যেও ছিল তার চিহ্নও পাওয়া যায় না। এক মুহূর্ত্তে তার অধৈর্য্য যেন অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ল। যদিও সে ভাসুর, এবং কোনোদিন মেজো বৌয়ের সঙ্গে একটা কথাও কয় নি—তবু তাকে ডেকে কুমু সম্বন্ধে যা-হয় কিছু একটা বলবার জন্যে মনটা ছটফট করতে লাগ্‌ল। একবার বের হয়েও এলো কিন্তু মোতির মা তখন নীচে চ'লে গিয়েচে।

নববধূ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত শোবার ঘরে অকারণে অসময়ে একলা যাপন করবার অসম্মান থেকে রক্ষা পাবার জন্যে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাইরের ঘরের দিকে বেগে গেল হন্‌হন্ ক'রে। মস্ত একটা জরুরি কাজ করবার ভান ক'রে ডেস্কের উপর ঝুঁকে পড়ল। সামনে ছিল একখানা খাতা। সাধারণত সেটা সে প্রায় দেখে না, দেখে তার আপিসের হেডবাবু। আজ লোক-চক্ষুকে প্রতারণা করবার উদ্দেশ্যে সেটা খুলে বসলো। এই খাতায় তার বাড়ির সমস্ত চিঠি ও টেলিগ্রাম রওনা করবার দিন-খন টোকা থাকে। খাতা খুলে প্রথমেই দেখ্‌তে পেলে আজকের তারিখের টেলিগ্রামের ফর্দ্দর মধ্যে বিপ্রদাসের নাম ও ঠিকানা। প্রেরক হচ্চেন স্বয়ং কর্ত্রী-ঠাকুরাণী।

"ডাকো দারোয়ানকে।"

দারোয়ান এলো।

"এ টেলিগ্রাম কে দিয়েছিল পাঠাতে?"

"মেজবাবু।"

"ডাকো মেজোবাবুকে।"

মেজোবাবু পাংশুবর্ণ মুখে এসে হাজির।

"আমার হুকুম না নিয়ে টেলিগ্রাম পাঠাতে কে বল্‌লে?" যে বলেছিল শাসনকর্ত্তার সাম্‌নে তার নাম মুখে আনা তো সহজ ব্যাপার নয়; কি বল্‌বে কিছুই ভেবে না পেয়ে নবীন ব্যাকুল হয়ে এই শীতের দিনে ঘেমে উঠ্‌ল।

নবীনকে নীরব দেখে মধুসূদন আপনিই জিজ্ঞাসা করলে, "মেজো বৌ বুঝি?" মুখ হেঁট ক'রে নিরুত্তর থাকাতেই তার উত্তর স্পষ্ট হোলো। ঝাঁ ক'রে মাথার রক্ত গেল চ'ড়ে, মুখ হ'ল লাল টকটকে—এত রাগ হোলো যে কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরল না। সবেগে হাত নেড়ে নবীনকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ইসারা ক'রে ঘরের একধার থেকে আর এক ধার পর্য্যন্ত পায়চারী করতে লাগল।

৩০

নবীন ঘরে গিয়ে মুখ শুক্‌নো ক'রে মোতির মাকে বল্‌লে, "মেজ বৌ, আর কেন?"

"হয়েচে কি?"

"এবার জিনিষপত্রগুলো বাক্সোয় তোলো।"

"তোমার বুদ্ধিতে যদি তুলি, তাহলে আবার কালই বের করতে হবে। কেন? তোমার দাদার মেজাজ ভালো নেই বুঝি?"

"আমি তো চিনি ওঁকে। এবারে বোধ হচ্চে এখান-কার বাসায় হাত পড়বে।"

"তা চলই না। অত ভাবচ কেন? সেখানে তো জলে পড়বে না।"

"আমাকে চল্‌তে বল্‌চ কিসের জন্যে? এবারে হুকুম হবে মেজো বৌকে দেশে পাঠিয়ে দাও।"

"সে হুকুম তুমি মান্‌তে পারবে না জানি।"

"কেমন ক'রে জান্‌লে?"

"আমি কেবল একাই জানি মনে করো, তা নয়—বাড়িশুদ্ধ সবাই তোমাকে স্ত্রৈণ ব'লে জানে। পুরুষমানুষ যে কি ক'রে স্ত্রৈণ হ'তে পারে এতদিন তোমার দাদা সে কথা বুঝতেই পারত না। এইবার নিজের বোঝবার পালা এসেচে।"

"বলো কি?"

"আমি তো দেখ্‌চি তোমাদের বংশে ও রোগটা আছে। এতদিন বড়ো ভাইয়ের ধাতটা ধরা পড়েনি। অনেক কাল জমা হ'য়ে ছিল ব'লে তার ঝাঁজটা খুব বেশি হবে, দেখে নিয়ো এই আমি ব'লে দিলাম। যে জোরের সঙ্গে জগৎসংসার ভুলে টাকার থলে আঁকড়ে বসেছিল, ঠিক সেই জোরটাই পড়বে বৌয়ের উপর।"

"তাই পড়ুক। বড় স্ত্রৈণটি আসর জমান্ কিন্তু মেজ স্ত্রৈণটি বাঁচবে কাকে নিয়ে।"

"সে ভাবনার ভার আমার উপরে। এখন আমি তোমাকে যা বলি তাই করো। ওঁর দেরাজ তোমাকে সন্ধান করতে হবে।"

নবীন হাত জোড় ক'রে বল্‌লে, "দোহাই তোমার মেজ বৌ,—সাপের গর্ত্তে হাত দিতে যদি বল্‌তে আমি দিতুম, কিন্তু দেরাজে না।"

"সাপের গর্ত্তে যদি হাত দিতে হ'ত তবে নিজে দিতুম কিন্তু দেরাজটা সন্ধান তোমাকেই করতে হবে। তুমি তো জানো এ বাড়ির সব চিঠিই প্রথমে ওঁকে না দেখিয়ে কাউকে দেবার হুকুম নেই। আমার মন বল্‌চে ওঁর হাতে চিঠি এসেচে।"

"আমারও মন তাই বল্‌চে, কিন্তু সেই সঙ্গে এ ও বল্‌চে ও চিঠিতে যদি আমি হাত ঠেকাই তাহলে দাদা উপযুক্ত দণ্ড খুঁজেই পাবে না। বোধ হয় সাত বছর সশ্রম ফাঁসির হুকুম হবে।"

"কিছু তোমাকে করতে হবে না, চিঠিতে হাত দিও না, কেবল একবার দেখে এসো দিদির নামে চিঠি আছে কি না।"

মেজো বৌয়ের প্রতি নবীনের ভক্তি সুগভীর, এমন কি, নিজেকে তার স্ত্রীর অযোগ্য ব'লেই মনে করে। সেই জন্যেই তার জন্যে কোনো একটা দুরূহ কাজ করবার উপলক্ষ্য জুটলে যতই ভয় করুক সেই সঙ্গে খুসিও হয়।

সেই রাত্রেই নবীনের কাছে মেজ বৌ খবর পেলো যে কুমুর নামে একটা চিঠি ও একটা টেলিগ্রাম দেরাজে আছে।

যে উত্তেজনার প্রথম ধাক্কায় কুমু তার শোবার ঘর ছেড়ে দাস্যবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তার বেগ থেমেচে। অপমানের বিরক্তি ক'মে এসে বিষাদের ম্লানতায় এখন তার মন ছায়াচ্ছন্ন। বুঝতে পারচে চিরদিনের ব্যবস্থা এ নয়। অথচ সে-রকম একটা ব্যবস্থা না হ'লে কুমু বাঁচবে কি ক'রে? সংসারে আমৃত্যুকাল দিনরাত্রি জোর ক'রে এ রকম অসংলগ্ন-ভাবে থাকা ত সম্ভবপর নয়।

এই কথাই সে ভাব্‌ছিল তার ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে। ঘরটা বারান্দার এক কোণে, কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। প্রবেশের দ্বার ছাড়া বাকি সমস্ত কুঠুরি অবরুদ্ধ। দেয়ালের গায়ে উপর পর্য্যন্ত কাঠের থাক বসানো। সেই থাকে আলো জ্বালাবার বিচিত্র সরঞ্জাম। তৈলাক্ত মলিনতায় ঘরটা আগাগোড়া ক্লিন্ন। দেয়ালের যে অংশে দরজা সেই দিকে বাতির মোড়ক থেকে কাটা ছবিগুলো এঁটে দিয়ে কোনো এক ভৃত্য সৌন্দর্য্যবোধের তৃপ্তিসাধন করেছিল। এক কোণে টিনের বাক্সে আছে গুঁড়ো করা খড়ি, তার পাশে ঝুড়িতে শুক্‌নো তেঁতুল, এবং কতকগুলো ময়লা ঝাড়ন; আর সারি সারি কেরোসিনের টিন, অধিকাংশই খালি, গুটি দুই তিন ভরা।

অনিপুণ হস্তে আজ সকাল থেকে কুমু তার কাজে লেগেছিল। ভাঁড়ারের কর্ত্তব্য শেষ ক'রে মোতির মা উঁকি মেরে একবার কুমুর কর্ম্মতপস্যার দুঃসাধ্য সঙ্কটটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে। বুঝতে পারলে দুই একটা ক্ষণভঙ্গুর জিনিষের অপঘাত আসন্ন। এ বাড়িতে জিনিষপত্রের সামান্য ক্ষুণ্ণতাও দৃষ্টি অথবা হিসাব এড়ায় না।

মোতির মা আর থাক্‌তে পারলে না; বল্‌লে, "কাজ নেই হাতে, তাই এলুম। ভাবলুম দিদির কাজটাতে একটু হাত লাগাই, পুণ্যি হবে।" এই ব'লেই কাঁচের গ্লোব ও চিম্‌নির ঝুড়ি নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে মাজা মোছায় লেগে গেল।

আপত্তি করতে কুমুর আর তেজ নেই, কেননা ইতিমধ্যে আপন অক্ষমতা সম্বন্ধে আত্ম-আবিষ্কার প্রায় সম্পূর্ণ হয়েচে। মোতির মার সহায়তা পেয়ে বেঁচে গেলো। কিন্তু মোতির মারও অশিক্ষিত-পটুত্বের সীমা আছে। কেরোসিন ল্যাম্পে হিসাব ক'রে ফিতে যোজনা তার পক্ষে অসাধ্য। কাজটা হয় তারই তত্ত্বাবধানে, বরাদ্দ অনুসারে তেল প্রভৃতির মাপ তারই স্বহস্তে, কিন্তু হাতে কলমে সল্‌তে কাটা আজ পর্য্যন্ত তার দ্বারা হয়নি। তাই অগত্যা বুড়ো বন্ধু ফরাসকে সহ-যোগিতার জন্যে ডাক্‌বার প্রস্তাব তুল্‌লে।

হার মান্‌তে হোলো। বন্ধু ফরাস এলো, এবং দ্রুতহস্তে অল্প-কালের মধ্যেই কাজ সমাধা ক'রে দিলে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দীপ-গুলো ঘরে ঘরে ভাগ ক'রে দিয়ে আস্‌তে হয়। সেই কাজের জন্যে পূর্ব্ব নিয়ম মত তাকে যথাসময়ে আস্‌তে হবে কিনা বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে। লোকটা সরল প্রকৃতির বটে কিন্তু তবু প্রশ্নের মধ্যে একটু শ্লেষ ছিল বা। কুমুর কানের ডগা লাল হ'য়ে উঠ্‌ল।

সে কোনো জবাব করবার আগেই মোতির মা বল্‌লে, "আসবি না তো কি?" কুমুর বুঝতে একটুও বাকি রইল না যে, কাজ করতে গিয়ে কেবল সে কাজের ব্যাঘাত ঘটাচ্চে।

৩১

দুপুর বেলা আহারের পর দরজা বন্ধ ক'রে কুমু ব'সে ব'সে পণ করতে লাগল মনের মধ্যে কিছুতে সে আর

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্রোধের আগুন জ্ব'লে উঠ্‌তে দেবে না। কুমু বল্‌লে, আজকের দিনটা লাগবে মনকে স্থির ক'রে নিতে; ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ নিয়ে কাল সকাল থেকে সংসার ধর্ম্মের সত্য পথে প্রবৃত্ত হব। মধ্যাহ্নে আহারের পর তার কাঠের ঘরে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিয়ে চল্‌ল নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া। এই কাজে সব চেয়ে সহায় ছিলো তার দাদার স্মৃতি। সে যে দেখেচে তার দাদার ধৈর্য্যের আশ্চর্য্য গভীরতা; তাঁর মুখে সেই বিষাদ, যেটি তাঁর অন্তরের মহত্বের ছায়া,—তার সেই দাদা, তখনকার কালের শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত পজিটিভিজম্ যাঁর ধর্ম্ম ছিল, দেবতাকে বাইরে থেকে প্রণাম করা যাঁর অভ্যাস ছিল না, অথচ দেবতা আপনিই যাঁর জীবন পূর্ণ ক'রে আবির্ভূত।

অপরাহ্ণে বঙ্কু ফরাস যখন দরজায় আঘাত করলে, ঘর খুলে কুমু বেরিয়ে গেল। মোতির মাকে বল্‌লে আজ রাত্রে সে খাবে না। মনকে বিশুদ্ধ ক'রে নেবার জন্যেই তার এই উপবাস। মোতির মা কুমুর মুখ দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। সে মুখে আজ চিত্তজ্বালার রক্তচ্ছটা ছিল না। ললাটে চক্ষুতে ছিল প্রশান্ত স্নিগ্ধ দীপ্তি। এখনি যেন সে পূজা সেরে তীর্থস্নান ক'রে এল। অন্তর্যামী দেবতা যেন তার সব অভিমান হরণ ক'রে নিলেন; হৃদয়ের মাঝখানে যেন সে এনেচে নির্ম্মাল্যের ফুল বহন ক'রে, তারি সুগন্ধ রয়েচে তাকে ঘিরে। তাই কুমু যখন উপবাসী থাক্‌তে চাইলে তখন মোতির মা বুঝলে, এ অভিমানের আত্মপীড়ন নয়। তাই সে আপত্তি মাত্র করলে না।

কুমু তার ঠাকুরের মূর্ত্তিকে অন্তরের মধ্যে বসিয়ে ছাদের এক কোণে গিয়ে আসন নিলো। আজ সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেচে দুঃখ যদি তাকে এমন ক'রে ধাক্কা না দিত তাহলে সে আপন দেবতার এত কাছে কখনই আস্‌তে পারত না। অস্তসূর্য্যের আভার দিকে তাকিয়ে কুমু হাত জোড় ক'রে বল্‌লে, ঠাকুর, আর কখনো যেন তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ না ঘটে; তুমি আমাকে কাঁদিয়ে তোমার আপন ক'রে রাখো।

শীতের দিন দেখ্‌তে দেখ্‌তে ম্লান হয়ে এলো। ধূলি কুয়াশা ও কলের ধোঁয়াতে মিশ্রিত একটা বিবর্ণ আবরণে সন্ধ্যার স্বচ্ছ তিমির-গম্ভীর মহিমা আচ্ছন্ন। ঐ আকাশটা যেমন একটা পরিব্যাপ্ত মলিনতার বোঝা নিয়ে মাটির দিকে নেমে পড়েচে, তেমনি দাদার জন্যে একটা দুশ্চিন্তার দুঃসহভার কুমুর মনটাকে যেন নীচের দিকে নামিয়ে ধ'রে রেখে দিলে।

এমনি ক'রে একদিকে কুমু অভিমানের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মুক্তির আনন্দ আর একদিকে দাদার জন্যে ভাবনায় পীড়িত হৃদয়ের ভার—দুইই একসঙ্গে নিয়ে আবার তার সেই কোটরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। বড় ইচ্ছা, এই নিরুপায় ভাবনার বোঝাটাকেও একান্ত বিশ্বাসে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ সমর্পণ ক'রে দেয়। কিন্তু নিজেকে বার বার ধিক্কার দিয়েও কিছুতেই সেই নির্ভর পায় না। টেলিগ্রাফ তো করা হয়েচে, তার উত্তর আসেনা কেন, এই প্রশ্ন অনবরত মনে লেগেই রইল।

নারীহৃদয়ের আত্মসমর্পণের সূক্ষ্ম বাধায় মধুসূদন কোথাও হাত লাগাতে পারচে না। যে বিবাহিত স্ত্রীর দেহ-মনের উপর তার সম্পূর্ণ দাবী সেও তার পক্ষে নিরতিশয় দুর্গম। ভাগ্যের এমন অভাবনীয় চক্রান্তকে সে কোন্ দিক থেকে কেমন ক'রে আক্রমণ করবে ভেবে পায় না। কখনো কোনো কারণেই মধুসূদন নিজের ব্যবসায় প্রতি লেশমাত্র অমনোযোগী হয়নি, এখন সেই দুর্লক্ষণও দেখা দিল। নিজের মার পীড়া ও মৃত্যুতেও মধুসূদনের কর্ম্মে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটেনি একথা সকলেই জানে। তখন তার অবিচলিত দৃঢ়চিত্ততায় অনেকে তাকে ভক্তি করেচে। মধুসূদন আজ হঠাৎ নিজের একটা নূতন পরিচয় পেয়ে নিজে স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে, বাঁধা পথের বাইরে যে শক্তি তাকে এমন ক'রে টানচে সে যে তাকে কোন্ দিকে নিয়ে যাবে ভেবে পাচ্চে না।

রাত্রের আহার সেরে মধুসূদন ঘরে শুতে এল। যদিও বিশ্বাস করেনি, তবু আশা করেছিল আজ হয়ত কুমুকে শোবার ঘরে দেখতে পাবে। সেইজন্যেই নিয়মিত সময় অতিক্রম ক'রেই মধুসূদন এল। সুস্থ শরীরের চিরাভ্যাস মতো একেবারে ঘড়ি-ধরা সময়ে মধুসূদন ঘুমিয়ে পড়ে, এক মুহূর্ত্ত দেরি হয় না। পাছে আজ তেমনি ঘুমিয়ে পড়ার

পর কুমু ঘরে আসে তার পরে চলে যায়, এই ভয়ে বিছানায় শুতে গেল না। সোফায় খানিকটা ব'সে রইল, ছাদে খানিকটা পায়চারি করতে লাগ্‌ল। মধুসূদনের ঘুমবার সময় নটা—আজ একসময়ে চম্‌কে উঠে শুন্‌লে তার দেউড়ির ঘণ্টায় এগারোটা বাজ্‌চে। লজ্জা বোধ হ'ল। কিন্তু বিছানার সাম্‌নে দু'তিনবার এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, কিছুতে শুতে যেতে প্রবৃত্তি হয় না। তখন স্থির করলে বাইরের ঘরে গিয়ে সেই রাত্রেই নবীনের সঙ্গে কিছু বোঝাপড়া ক'রে নেবে।

বাইরের ঘরের সামনের বারান্দায় পৌঁছিয়ে দেখে ঘরে তখনো আলো জ্বলচে। সেও ঘরে ঢুকতে যাচ্চে এমন সময়ে দেখে নবীন লণ্ঠন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসচে। দিনের বেলা হ'লে দেখ্‌তে পেত এক মুহূর্ত্তে নবীনের মুখ কিরকম ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল।

মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, "এত রাত্রে তুমি যে এখানে?"

নবীনের মাথায় বুদ্ধি জোগালো, সে বল্‌লে, "শুতে যাবার আগেই ত আমি ঘড়িতে দম দিয়ে যাই, আর তারিখের কার্ড ঠিক ক'রে দিই।"

"আচ্ছা, ঘরে এসে শোনো।"

নবীন ত্রস্ত হ'য়ে কাটগড়ার আসামীর মতো চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

মধুসূদন বল্‌লে, "বড়বৌয়ের কানে মন্ত্র ফোস্‌লাবার কেউ থাকে এটা আমি পছন্দ করিনে। আমার ঘরের বৌ আমার ইচ্ছেমতো চল্‌বে, আর-কারো পরামর্শ মতো চল্‌বে না,— এইটে হোলো নিয়ম।"

নবীন গম্ভীরভাবে বল্‌লে, "সে তো ঠিক কথা।"

"তাই আমি বলচি, মেজো বউকে দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে।"

নবীন খুব যেন নিশ্চিন্ত হোলো এমনিভাবে বল্‌লে, "ভালো হোলো দাদা, আমি আরো ভাবছিলুম পাছে তোমার মত না হয়।"

মধুসূদন বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, "তার মানে?"

নবীন বল্‌লে, "ক'দিন ধ'রে দেশে যাবার জন্যে মেজ বৌ অস্থির ক'রে তুলেচে, জিনিষপত্র সব গোছানোই আছে, একটা ভালো দিন দেখ্‌লেই বেরিয়ে পড়বে।"

বলা বাহুল্য, কথাটা সম্পূর্ণ বানানো। তার বাড়িতে মধুসূদন যাকে ইচ্ছে বিদায় ক'রে দেবে, তাই ব'লে কেউ নিজের ইচ্ছায় বিদায় হ'তে চাইবে এটা সম্পূর্ণ বেদস্তুর। বিরক্তির স্বরে বল্‌লে, "কেন, যাবার জন্যে তাঁর এত তাড়া কিসের?"

নবীন বল্‌লে, "বাড়ির গিন্নি এ বাড়িতে এসেচেন, এখন এ বাড়ির সমস্ত ভার তো তাঁকেই নিতে হবে। মেজ বৌ বল্‌লে, আমি মাঝে থাক্‌লে কি জানি কখন্ কি কথা ওঠে।"

মধুসূদন বল্‌লে, "এসব কথার বিচারভার কি তারই উপরে?"

নবীন ভালোমানুষের মতো বল্‌লে, "কি করব বল, মেয়েমানুষের জেদ। কি জানি, তার মনে হয়েচে, কোন্ কথা নিয়ে তুমিই হয়তো একদিন হঠাৎ তাকে সরিয়ে দেবে, সে অপমান তার সইবে না—তাই সে একেবারে পণ ক'রে বসেচে সে যাবেই। আসচে ত্রয়োদশী তিথিতে দিন পড়েচে—এর মধ্যে কাজকর্ম্ম সব গুছিয়ে দিয়ে হিসাবপত্র চুকিয়ে সে চ'লে যেতে চায়।"

মধুসূদন বল্‌লে, "দেখ নবীন, মেজবৌকে আদর দিয়ে তুমিই বিগ্‌ড়ে দিয়েচ। তাকে একটু কড়া ক'রেই বোলো সে কিছুতেই যেতে পারবে না। তুমি পুরুষ মানুষ, ঘরে তোমার নিজের শাসন চল্‌বে না, এ আমি দেখতে পারিনে।"

নবীন মাথা চুল্‌কিয়ে বল্‌লে, "চেষ্টা ক'রে দেখব দাদা, কিন্তু—"

"আচ্ছা, আমার নাম ক'রে বোলো, এখন তার যাওয়া চল্‌বে না। যখন সময় বুঝব তখন যাবার দিন আমিই ঠিক ক'রে দেবো।"

নবীন বল্‌লে, "তুমি বল্‌লে কিনা মেজোবৌকে দেশে পাঠাতে হবে, তাই ভাবচি—"

মধুসূদন উত্তেজিত হ'য়ে উঠে বল্‌লে, "আমি কি বলেচি, এই মুহূর্ত্তেই পাঠিয়ে দিতে হবে?"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবীন ধীরে ধীরে চ'লে গেল। মধুসূদন একটা গ্যাসের শিখা জ্বালিয়ে দিয়ে লম্বা কেদারায় ঠেসান দিয়ে ব'সে রইল। বাড়ির চৌকিদার রাত্রে এক-একবার বাড়ির ঘরগুলোর সামনে দিয়ে টহলিয়ে আসে। মধুসূদনের অল্প একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ চমকিয়ে উঠে দেখে চৌকিদার ঘরে ঢুকে লণ্ঠন তুলে ধ'রে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। হয়ত সে ভাবছিল, মহারাজ মূর্চ্ছাই গেছে, না মারাই গেছে। মধুসূদন লজ্জিত হ'য়ে ধড়ফড় ক'রে চৌকি থেকে উঠে পড়ল। বাইরের আপিস ঘরে ব'সে সদ্যোবিবাহিত রাজাবাহাদুরের রাত্রিযাপনের শোকাবহ দৃশ্যটা চৌকিদারের কাছে যে অসম্মানকর এ কথাটা মুহূর্ত্তেই তাকে যেন মারলে। উঠেই কিছু রাগের স্বরে চৌকিদারকে বল্‌লে, "দ্বর বন্ধ্ করো।" যেন ঘর বন্ধ না থাকাটাতে তারই অপরাধ ছিল। দেউড়ির ঘণ্টাতে বাজল দুটো।

মধুসূদন ঘর ছেড়ে যাবার আগে একবার তার দেরাজ খুল্‌লে। ইতস্ততঃ করতে করতে কুমুর নামের টেলিগ্রামটা পকেটে পুরে অন্তঃপুরের দিকে চ'লে গেল। তেতালায় ওঠ্‌বার সিঁড়ির সাম্‌নে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

গভীর রাত্রে প্রথম ঘুম থেকে জেগে মানুষ আপনার সমস্ত শক্তিকে সম্পূর্ণ পায় না। তাই তার দিনের চরিত্রের সঙ্গে রাতের চরিত্রের অনেকটা প্রভেদ। এই রাত্রি দুটোর সময়, চারদিকে লোকের দৃষ্টি ব'লে যখন কিছুই নেই, সে যখন বিশ্বসংসারে একমাত্র নিজের কাছে ছাড়া আর কারো কাছেই দায়ী নয়—তখন কুমুর কাছে মনে মনে হার মানা তার পক্ষে অসম্ভব হ'লো না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে লিখিত

১০

কল্যাণীয়েষু

অমিয়, এখানকার দেখাশুনো প্রায় শেষ হ'য়ে এল। ভারতবর্ষের সঙ্গে জোড়াতাড়া-দেওয়া এদের লোকযাত্রা দেখে পদে পদে বিস্ময় বোধ হয়েচে। রামায়ণ মহাভারত এখানকার লোকের প্রাণের মধ্যে যে কিরকম প্রাণবান হ'য়ে রয়েচে সে কথা পূর্ব্বেই লিখেছি। প্রাণবান ব'লেই এ জিনিষটা কোনো লিখিত সাহিত্যের সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি নয়। এখানকার মানুষের বহুকালের ভাবনা ও কল্পনার ভিতর দিয়ে তার অনেক বদল হ'য়ে গেচে। তার প্রধান কারণ, মহাভারতকে এরা নিজেদের জীবনযাত্রার প্রয়োজনে প্রতিদিন ব্যবহার করেচে। সংসারের কর্ত্তব্যনীতিকে এরা কোনো শাস্ত্রগত উপদেশের মধ্যে সঞ্চিত পায়নি, এই দুই মহাকাব্যের নানা চরিত্রের মধ্যে তারা যেন মূর্ত্তিমান। ভালোমন্দ নানা শ্রেণীর মানুষকে বিচার করবার মাপকাঠি এই সব চরিত্রে। এই জন্যেই জীবনের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই জীবনের সামগ্রীর অনেক রকম বদল হয়েচে। কালে কালে বাঙালী গায়কের মুখে মুখে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদগুলি যেমন রূপান্তরিত হয়েচে এও তেমনি। কাল আমরা যে ছায়াভিনয় দেখ্‌তে গিয়েছিলেম তার গল্পটাকে টাইপ ক'রে আমাদের হাতে দিয়েছিল। সেটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, প'ড়ে দেখো। মূল মহাভারতের সঙ্গে মিলিয়ে এটা বাংলায় তর্জ্জমা ক'রে নিয়ো। এ গল্পের বিশেষত্ব এই যে, এর মধ্যে দ্রৌপদী নেই। মূল মহাভারতের ক্লীব বৃহন্নলা এই গল্পে নারীরূপে "কেন-বর্দ্দি" নাম গ্রহণ করচে। কীচক এ'কে দেখেই মুগ্ধ হয় ও ভীমের হাতে মারা পড়ে। এই কীচক জাবানী মহাভারতে মৎস্যপতির শত্রু, পাণ্ডবেরা এ'কে বধ ক'রে বিরাটের রাজার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিল।

আমি মঙ্কুনগরো উপাধিধারী যে রাজার বাড়ির অলিন্দে ব'সে লিখ্‌চি চারিদিকে তার ভিত্তিগাত্রে রামায়ণের চিত্র রেশমের কাপড়ের উপর অতি সুন্দর ক'রে অঙ্কিত। অথচ ধর্ম্মে এঁরা মুসলমান। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রের দেব-দেবীদের বিবরণ এঁরা তন্ন তন্ন ক'রে জানেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূ-বিবরণের গিরি নদীকে এঁরা নিজেদের দেশের মধ্যে গ্রহণ করেচেন। বস্তুত সেটাতে কোন অপরাধ নেই, কেন না রামায়ণ মহাভারতের নরনারীরা ভাবমূর্ত্তিতে এঁদের দেশেই বিচরণ করচেন; আমাদের দেশে তাঁদের এমন সর্ব্বজনব্যাপী পরিচয় নেই, সেখানে ক্রিয়া কর্ম্মে উৎসবে আমোদে ঘরে ঘরে তাঁরা এমন ক'রে বিরাজ করেন না। ইতি ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭

আজ রাত্রে রাজসভায় জাবানী শ্রোতাদের কাছে আমার কথা ও কাহিনী থেকে ক'একটি কথা আবৃত্তি ক'রে শোনাব। একজন জাবানী সেগুলি নিজের ভাষায় তর্জ্জমা ক'রে ব্যাখ্যা করবেন। কাল সুনীতি ভারতী চিত্রকলা সম্বন্ধে দীপচিত্র সহযোগে বক্তৃতা করেছিলেন। আজ আবার তাঁকে সেইটে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বল্‌তে রাজা অনুরোধ করেচেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সব কথা জান্‌তে এঁদের বিশেষ আগ্রহ।

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

১১

কল্যাণীয়েষু,

রথী, শূরকর্ত্তার মঙ্কুনগরের ওখান থেকে বিদায় নিয়ে যোগাকর্ত্তায় পাকোয়ালাম উপাধিধারী রাজার প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েচি। শূরকর্ত্তা সহরে একটি নতুন সাঁকো ও রাস্তা তৈরী শেষ হয়েচে, সেই রাস্তা পথিকদের ব্যবহারের জন্যে মুক্ত করে দেবার ভার আমার উপরে ছিল। সাঁকোর সামনে রাস্তা আট্‌কে একটা কাগজের ফিতে টাঙানো ছিল, কাঁচি দিয়ে সেটা কেটে দিয়ে পথ খোলসা করা গেল। কাজটা আমার লাগ্‌লো ভালো, মনে হ'ল পথের বাধা দূর করাই আমার ব্রত। আমার নামে এই রাস্তার নামকরণ হয়েচে।

পথে আস্‌তে পেরাম্বান ব'লে এক জায়গায় পুরোনো ভাঙা মন্দির দেখ্‌তে নাম্‌লুম। এ জায়গাটা ভুবনেশ্বরের মতো মন্দিরের ভগ্নস্তূপে পরিকীর্ণ। ভাঙা পাথরগুলি জোড়া দিয়ে দিয়ে ওলন্দাজ গবর্মেণ্ট মন্দিরগুলিকে তার সাবেক মূর্ত্তিতে গ'ড়ে তুল্‌চেন। কাজটা খুব কঠিন, অল্প অল্প ক'রে এগোচ্চে; দুই একজন বিচক্ষণ য়ুরোপীয় পণ্ডিত এই কাজে নিযুক্ত। তাঁদের সঙ্গে আলাপ ক'রে বিশেষ আনন্দ পেলুম। এই কাজ সুসম্পূর্ণ করবার জন্যে আমাদের পুরাণগুলি নিয়ে এঁরা যথেষ্ট আলোচনা করচেন। অনেক জিনিষ মেলে না, অথচ সেগুলি যে জাবানী লোকের স্মৃতিবিকার থেকে ঘটেচে তা নয়, তখনকার কালের ভারতবর্ষের লোক-ব্যবহারের মধ্যে এর ইতিহাস নিহিত। শিব মন্দিরই এখানে প্রধান। শিবের নানাবিধ নাট্যমুদ্রা এখানকার মূর্ত্তিতে পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে তার বিস্তারিত সন্ধান পাওয়া যাচ্চে না। একটা জিনিষ ভেবে দেখবার বিষয়। শিবকে এদেশে গুরু, মহাগুরু ব'লে অভিহিত করেচে। আমার বিশ্বাস, বুদ্ধের গুরুপদ শিবই অধিকার করেছিলেন, মানুষকে তিনি মুক্তির শিক্ষা দেন। এখানকার শিব নটরাজ, তিনি মহাকাল, অর্থাৎ সংসারে যে চলার প্রবাহ, জন্ম-মৃত্যুর যে ওঠাপড়া সে তাঁরই নাচের ছন্দে,—তিনি ভৈরব, কেননা তাঁর লীলার অঙ্গই হচ্চে মৃত্যু। আমাদের দেশে এক সময়ে শিবকে দুইভাগ ক'রে দেখেছিল। একদিকে তিনি অনন্ত, তিনি সম্পূর্ণ, সুতরাং তিনি নিষ্ক্রিয় তিনি প্রশান্ত; আর একদিকে তাঁরই মধ্যে কালের ধারা তার পরিবর্ত্তন-পরম্পরা নিয়ে চলেচে, কিছুই চিরদিন থাক্‌চে না, এইখানে মহাদেবের তাণ্ডবলীলা কালীর মধ্যে রূপ নিয়েচে। কিন্তু জাভায় কালীর কোনো পরিচয় নেই। কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলারও কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। পূতনা বধ প্রভৃতি অংশ আছে কিন্তু গোপীদের দেখতে পাইনে। এর থেকে সেই সময়কার ভারতের ইতিহাসের কিছু ছবি পাওয়া যায়। এখানে রামায়ণ মহাভারতের নানাবিধ গল্প আছে যা অন্তত সংস্কৃত মহাকাব্যেও বাংলাদেশে অপ্রচলিত। এখানকার পণ্ডিতদের মত এই যে, জাবানীরা ভারতবর্ষে গিয়ে অথবা জাভায় সমাগত ভারতীয়দের কাছ থেকে লোকমুখে প্রচলিত নানা গল্প শুনেছিল, সেইগুলোই এখানে র'য়ে গেচে। অর্থাৎ সে সময়ে ভারতবর্ষেই নানাস্থানে নানা গল্পের বৈচিত্র্য ছিল। আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোনো পণ্ডিতই রামায়ণ মহাভারতের তুলনামূলক আলোচনা করেন নি। করতে গেলে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে স্থানীয় ভাষায় যে সব কাব্য আছে মূলের সঙ্গে সেইগুলি মিলিয়ে দেখা দরকার হয়। কোনো এক সময়ে কোনো এক জার্ম্মাণ পণ্ডিত এই কাজ করবেন ব'লে অপেক্ষা ক'রে আছি তার পরে তাঁর লেখার কিছু প্রতিবাদ কিছু সমর্থন ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ডাক্তার উপাধি পাব।

এখানে পাকোয়ালাম লোকটিকে বড়ো ভালো লাগল। শান্ত গম্ভীর শিক্ষিত চিন্তাশীল। জাভার প্রাচীন কলাবিদ্যা প্রভৃতিকে রক্ষা করবার জন্যে উৎসুক। যোগাকর্ত্তার প্রধান ব্যক্তি হচ্চেন এখানকার সুলতান। তাঁর বাড়ীতে রাত্রে নাচ দেখবার নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে একজন ওলন্দাজ পণ্ডিতের কাছে শোনা গেল যে এই

জায়গাটির নাম ছিল অযোধ্যা, ক্রমে তারই অপভ্রংশ হয়ে এখন যোগ্যা নামে এসে ঠেকেছিল।

এখানে যে নাচ দেখলুম সে চারজন মেয়ের নাচ। রাজবংশের মেয়েরাই নাচেন। চারজনের মধ্যে দুজন ছিলেন সুলতানেরই মেয়ে। এখানে এসে যত নাচ দেখেচি সব চেয়ে এইটেই সুন্দর লেগেচে। বর্ণনা দ্বারা এ বোঝানো অসম্ভব। এমন অনিন্দ্যসম্পূর্ণ রূপসৃষ্টি দেখা যায় না। এইসব নাচের একটা দিক আছে যেটা এর বাইরের সৌন্দর্য্য, আর একটা হচ্চে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীর বিশেষ অর্থ আছে। যারা সেগুলি জানে তারাই এর শোভার সঙ্গে এর ভাষাকে মিলিয়ে সম্পূর্ণ আনন্দ পেতে পারে। এখানে নাচ শিক্ষার বিদ্যালয় আছে সেখানে নিমন্ত্রণ পাওয়া গেছে। সেখানে গেলে এদের নাচের তত্ত্ব আরো কিছু বুঝতে পারব আশা করচি।

আজ রাত্রে রামায়ণ থেকে যে অভিনয় হবে তার একটি সূচিপত্র পাঠাই। এটা পড়লে বোঝা যায় এখানকার রামায়ণ কথার ভাবখানা কি।

বৌমা ১লা আগষ্টে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন আজ দেড় মাস পরে সেটি আমার হাতে এল। আমার চিঠির কোন্‌গুলো তোমাদের কাছে পৌঁছল কোনগুলো পৌঁছল না তা কেমন ক'রে জানব? ইতি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

শ্রীমতী নির্ম্মল কুমারী মহলানবীশকে লিখিত

১২

যোগাকর্ত্তা
জাভা

কল্যাণীয়াসু

রাণী, এখানকার পালা শেষ হ'য়ে এল, শরীরটাও ক্লান্ত। এখানে যে রাজার বাড়ীতে আছি কাল রাত্রে তিনি ছায়াভিনয়ের একটি পালা দেখাবেন তার পরে আমরা যাব বরোবুদরে। সেখানে দুদিন কাটিয়ে ফেরবার পথে বাটাভিয়াতে গিয়ে জাহাজে চ'ড়ে বস্‌ব।

কাল রাত্রে এক জায়গায় গিয়েছিলুম জটায়ু-বধের অভিনয় দেখ্‌তে। দেখে এদেশের লোকের মনের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যাকে অভিনয় বলি তার প্রধান অংশ কথা, বাকি অংশ হচ্ছে নানা প্রকার হৃদয়-ভাবের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলীর প্রতিরূপ দেখানো। এখানে তা নয়। এখানে প্রধান জিনিষ হচ্ছে ছবি এবং গতিছন্দ। কিন্তু সেই ছবি বল্‌তে প্রতিরূপ নয়, মনোহর রূপ। আমরা সংসারে যে দৃশ্য সর্ব্বদা দেখি তার সঙ্গে খুব বেশী অনৈক্য হলেও এদের বাধে না। পৃথিবীতে মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে চলা ফেরা ক'রে থাকে। এই অভিনয়ে সবাইকে ব'সে ব'সে চল্‌তে ফিরতে হয়। সেও সহজ চলা-ফেরা নয়, প্রত্যেক নড়া-চড়া নাচের ভঙ্গীতে। মনে মনে এরা এমন একটা কল্প-লোক সৃষ্টি করেচে যেখানে সবাই বসার অবস্থায় নেচে বেড়ায়। এই পঙ্গু মানুষের দেশ যদি প্রহসনের দেশ হ'ত তা হলেও বুঝতুম। একেবারেই তা নয়, এ মহাকাব্যের দেশ। এরা স্বভাবকে খাতির করতে চায় না। স্বভাব তার প্রতিশোধ স্বরূপে যে এদের বিদ্রূপ করবে, এদের হাস্যকর ক'রে তুলবে তা'ও ঘট্‌ল না। স্বভাবের বিকারকেও এরা সুদৃশ্য করবে এই এদের পণ। ছবিটাই এদের লক্ষ্য, স্বভাবের অনুকরণ এদের লক্ষ্য নয় এই কথাটা এরা যেন স্পর্দ্ধার সঙ্গে বল্‌তে চায়। মনে করনা কেন, প্রথম দৃশ্যটা রাজসভায় দশরথ ও তাঁর অমাত্যবর্গ। রঙ্গভূমিতে এরা সবাই গুড়ি মেরে প্রবেশ করল। মনে হয় এর চেয়ে অদ্ভুত কিছুই হতে পারে না। ব্যাপারটাকে হাস্য-করতা থেকে বাঁচানো কত কঠিন ভেবে দেখো। কিন্তু এতে আমরা বিরূপ কিছুই দেখ্‌লুম না। এরা দশরথ কিংবা রাজামাত্য সে কথাটা সম্পূর্ণ গৌণ হয়ে গেল। পরের দৃশ্যে কৈকেয়ী প্রভৃতি রাণী আর সখীরা তেমনি ক'রেই বসা অবস্থায় হেলে দুলে নেচে নেচে প্রবেশ করলে। আট নয় বছরের ছেলেরা সব কৌশল্যা প্রভৃতি রাণী সেজেচে। এদিকে কৌশল্যার ছেলে রাম যে সেজেচে তার বয়স অন্তত পঁচিশ হবে। এটা যে কতবড়ো অসঙ্গত সে প্রশ্ন কারো মনেই

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আসে না, কেন না এরা দেখচে ছবির নাচ। যতক্ষণ সেটাতে কোনো দোষ ঘটবে না ততক্ষণ নালিশ করবার কোনো হেতু নেই। অন্য দেশের লোকেরা যখন জিজ্ঞাসা করে, এর মানে কি হ'ল, এরা বলে তা আমরা জানিনে কিন্তু আমাদের "রসম্" তৃপ্ত হচ্ছে। অর্থাৎ মানে না পাই, রস পাচ্চি। আমাকে একজন ওলন্দাজ পণ্ডিত বলেছিলেন, বালীর লোকেরা অভ্যাস মতো যে সব পূজানুষ্ঠান করে তার মানে তারা কিছুই বোঝে না কিন্তু তারাও "রসম্" তৃপ্তির দোহাই দিয়ে থাকে। অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের, সম্পূর্ণতার একটা আইডিয়া তাদের মনের ভিতরে আছে, অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সেইটিতে যখন সাড়া পায় তখন তাদের যে আনন্দ তাকে তো আধ্যাত্মিক বলা যেতে পারে।

কাল রাত্রে এই রঙ্গক্ষেত্রের বহিরঙ্গনে কত যে লোক জমেছে তার সংখ্যা নেই। নিঃশব্দে তারা দেখ্‌চে, শুধু কেবল দেখারই সুখ। তাদের মনের মধ্যে রামায়ণের গল্প আছে, সেই গল্পের ধারার সঙ্গে ছবির ধারা মিলে কল্পনা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌চে। এর মধ্যে আশ্চর্য্যের বিষয়টা হচ্চে এই যে, যে-ছবিটা দেখচে সেটাতে গল্পকে ফুটিয়ে তোলবার কোনো চেষ্টা নেই। রামের যৌবরাজ্যে কৈকেয়ী রাগ করেচে,—কিন্তু যেরকম ভাবভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরে আমাদের চোখে কানে রাগের ভাবটা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে এই ছবির মধ্যে তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। আট দশ বছরের ছেলে স্ত্রীবেশে কৈকেয়ী সাজলে তার মধ্যে কৈকেয়ীত্ব লেশমাত্র থাকা অসম্ভব। তবু এরা তাতে কোনো অভাব বোধ করে না। জিনিষটা যদি আগাগোড়া ছেলেমানুষী ও গ্রাম্য বর্ব্বর গোছের কিছু হ'ত তাহলে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই থাক্‌তো না—কিন্তু যেখানে নৈপুণ্য ও সৌষম্যের সীমা নেই, অতি সামান্য ভঙ্গীটুকুমাত্র যেখানে নিরর্থক নয়, বহুযত্ন ও বহুশক্তির দ্বারা যেখানে এই ললিত কলাটি একেবারে সুপরিণত হ'য়ে উঠেছে সেখানে একে অবজ্ঞা করা চলে না। এই কথাই বলতে হয় যে রূপের ও গতির ছন্দবোধ এদের মনে অত্যন্ত বেশি প্রবল—সেই রূপের ও গতির ভাষা এদের মনে যতখানি কথা কয় আমাদের মনে ততখানি কয় না। এদের গামেলান সঙ্গীতেও সেটা দেখ্‌তে পাই। প্রথমত যন্ত্রগুলি বহুসংখ্যক, বহুযত্নে সুশোভিত, এবং তাদের সমাবেশ সুসজ্জিত, যারা বাজাচ্চে তাদের মধ্যে সংযত শোভনতা। এই রূপদর্শন এদের কাছে অত্যাবশ্যক। চোখের দেখার সুখটুকু রক্ষা ক'রে এদের যে সঙ্গীতের আলোচনা সে হচ্চে সুরের নাচ। ছন্দের লীলা এদের কাছে গীতের ধারার চেয়ে বেশি। কিন্তু ছন্দের লীলা আমাদের দেশের ভোজপুরীয়াদের খচমচ বাদ্যের দুঃসহ অত্যাচার নয়। এদের নাচ যেমন সুন্দর সজ্জিত অঙ্গের নাচ, এদের সঙ্গীতে যে ছন্দের নাচ, সেও খোল করতাল মৃদঙ্গের কোলাহল নয়,—সুশ্রাব্য সুর দিয়ে সেই নাচ মণ্ডিত। এদের সঙ্গীতকে বলা যেতে পারে স্বরনৃত্য, এদের অভিনয়কে বলা যায় রূপনাট্য। ভারতবর্ষ থেকে নটরাজ এসে একদিন এখানে মন্দিরে পূজা পেয়েছিলেন, তিনি এদের যে বর দিয়েছেন সে হচ্চে তাঁর নাচটি,—আর আমাদের জন্যে কি কেবল তাঁর শ্মশানভস্মই রইল?

ইতি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত

১৩

ডাগো

বাণ্ডুঙ্, যবদ্বীপ

কল্যাণীয়াসু

বৌমা, আমরা একটি সুন্দর জায়গায় এসেছি। পাহাড়ের উপরে—শোনা গেল পাঁচহাজার ফুট উঁচু। হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা। কিন্তু হিমালয়ের এতটা উঁচু কোনো পাহাড়ে যতটা শীত এখানে তার কাছ দিয়েও যায় না। আমরা আছি ডীমন্ট ব'লে এক ভদ্রলোকের আতিথ্যে। এঁর স্ত্রী অস্‌ট্রিয় ভিয়েনার মেয়ে। বাগান দিয়ে বেষ্টিত সুন্দর বাড়িটি পাহাড়ের উপর। এখান থেকে ঠিক সামনেই দেখ্‌তে পাই নীল গিরিমণ্ডলীর কোলে বাণ্ডুঙ্ সহর। পাহাড়ের যে অঞ্জলির মধ্যে এই সহর, অনতিকাল আগে সেখানে সরোবর ছিল। কখন এক

সময় পাড়ি ধ'সে গিয়ে তার সমস্ত জল বেরিয়ে চ'লে গেচে। এতদিন ঘোরাঘুরির পরে এই সুন্দর নির্জ্জন জায়গায় নিভৃত বাড়িতে এসে বড়ো আরাম বোধ হচ্চে।

জাভাতে নামার পর থেকেই যিনি সমস্তক্ষণ অশ্রান্ত যত্নে আমাদের সাহচর্য্য ক'রে আসচেন তাঁর নাম সমুয়েল কোপেরবর্গ। নামের মূল অর্গ হচ্চে তামার পাহাড়। সুনীতি সেই মানেটা নিয়ে তাঁর নামের সংস্কৃত অনুবাদ ক'রে দিয়েচেন তাম্রচূড়। আমাদের মহলে তাঁর এই নামটিই চ'লে গিয়েচে—তিনি এতে আনন্দিত। লোকটির নাম বদলে তাঁকে স্বর্ণচূড় বল্‌তে ইচ্ছে করে। কিসে আমাদের লেশমাত্র আরাম, সুবিধা বা দাবী পূর্ণ হ'তে পারে সেজন্যে তিনি অসাধারণ চিন্তা ও পরিশ্রম করেছেন। অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য তাঁর। দৈহিক পরিমাণে মানুষটি সঙ্কীর্ণ, কিন্তু হৃদয়ের পরিমাণে প্রশস্ত। এতকাল আমরা তাঁকে নানা সময়ে নানা উপলক্ষ্যে দিনরাত ধ'রে দেখেছি—কখনো তাঁর মধ্যে ঔদ্ধত্য বা ক্ষুদ্রতা বা অহমিকা দেখিনি। সব সময়েই দেখেচি নিজেকে তিনি সকলের শেষে রেখেচেন। তাঁর শরীর রুগ্ন ও দুর্ব্বল, অথচ সেই রুগ্ন শরীরের জন্যে কোনো দিন কোনো বিশেষ সুবিধা দাবী করেন নি। সকলের সব হয়ে গিয়ে যেটুকু উদ্বৃত্ত সেইটুকুতেই তাঁর অধিকার। অনেকের কাছে তিনি তর্জ্জন সহ্য করেচেন কিন্তু তা নিয়ে কোনোদিন তাঁর কাছ থেকে নালিশ বা কারো নিন্দে শুনিনি। ইংরিজি ভালো বল্‌তে পারেন না, বুঝতেও বাধে। কিন্তু কথায় যা না কুলোয় কাজে তার চতুর্গুণ পুষিয়ে দেন। কোথাও যাতায়াতের সময় মোটর গাড়ীতে প্রথম প্রথম তিনি আমাদের সঙ্গ নিতেন কিন্তু যেই দেখ্‌লেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করা আমাদের পক্ষে কঠিন অমনি অকুণ্ঠিত মনে নিজেকে সরিয়ে দিয়ে ইংরিজি-জানা সঙ্গীদের জন্যে স্থান ক'রে দিলেন। কিন্তু এখন এমন হয়েছে তিনি সঙ্গে না থাক্‌লে কেবল যে অসুবিধা হয় তা নয় আমার তো ভালই লাগে না। আমাদের মান সম্মান, সুখ স্বচ্ছন্দতার চিন্তায় তিনি নিজেকে এমন সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছেন যে তিনি একটু স'রে গেলেই আমাদের বড়ো বেশি ফাঁক পড়ে। তাঁর স্নিগ্ধ হৃদয়ের একটি লক্ষণ দেখে আমার ভারী ভালো লাগে,—সর্ব্বত্রই দেখি শিশুদের তিনি বন্ধু। তারা ওঁকে নিজেদের সমবয়সী ব'লেই জানে। তাঁর হৃদয়ের আর একটি প্রমাণ, জাভার লোকদের তিনি সম্পূর্ণ আপন ক'রে নিয়েচেন। জাবানীদের নাচ গান শিল্প ইতিহাস প্রভৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তাঁর একান্ত যত্ন। আলোচনার জন্যে জাভা সোসাইটি ব'লে একটি সভা স্থাপিত হয়েচে তারই পরিচালনার জন্যে এঁর সমস্ত সময় ও চেষ্টা নিযুক্ত। আমার বর্ণনা থেকে বুঝবে, এই সরল আত্মত্যাগী মানুষটিকে আমরা ভালোবেসেচি।

বোরোবুদুরের উদ্দেশে যে কবিতা লিখেচি সেটি অন্য পাতায় তোমাদের জন্যে কপি ক'রে পাঠান গেল। ইতি ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭

(ক্রমশঃ)
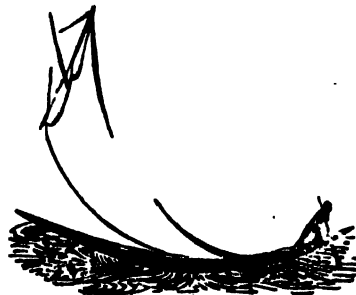
৪৭

শান্তিনিকেতন

এতদিনে তুমি কাশী পৌঁছেচ, পথের মধ্যে ভিড় পাওনি ত? এখন কেমন আছ লিখো। তোমরা যাবার পরদিন থেকেই বিদ্যালয়ের কাজ রীতিমত আরম্ভ হ'য়ে গেছে, রোজই কমিটি মিটিং এবং ক্লাসের কাজও চলচে। ছেলেরা অনাবৃষ্টির পরে আষাঢ়ের ধারার মত কলরব করতে করতে এখানকার শূন্য ঘর সব পূর্ণ ক'রে দিয়েচে। এখন আমার কাজের আর অন্ত নেই।

মেয়েরা সকলেই পরশুরাম হ'য়ে উঠেচে—কুড়ুল দিয়ে ঠকাঠক্ গাছ কাটতে লেগে গেছে। তারা আছে ভাল। এদিকে আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি সুরু হয়েচে, আর বৃষ্টি-স্নাত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল রোদ্দুর তার পরশপাথর ঠেকিয়ে সমস্ত আকাশকে সোনা ক'রে তুলেচে। আমি আমার সাম্‌নের খোলা জান্‌লা দিয়ে ঐ শাল তাল শিরীষ মহুয়া ছাতিমের দল-বাঁধা বনের দিকে প্রায় তাকিয়ে থাকি। এখন আমার ঘড়িতে সাড়ে দুপুর, অর্থাৎ সাধারণ ঘড়িতে দুপুর। ছেলেরা তাদের মধ্যাহ্নভোজন শেষ ক'রে দলে দলে কুয়োতলায় মুখ ধুতে আস্‌চে—দীর্ঘ ছুটির দুঃখদিনের পরে কাকগুলো এঁটো শালপাতার উপর শ্রাদ্ধবাড়ির ভিখিরির পালের মত এসে পড়েচে। বাতাসটি মধুর হ'য়ে বইচে, জাম গাছের চিকণ পাতার ঘনিমার উপর রৌদ্র ঝিল্‌মিল্ ক'রে উঠ্‌চে, পাটল রঙের দুটো গরু ল্যাজ দিয়ে পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে ধীর মন্দ গমনে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্চে—আমি চেয়ে চেয়ে দেখচি আর ভাবচি। ইতি ১ জুলাই ১৩২৯।

৪৮

কলকাতা

কলকাতা সহরটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে—মনে হয় যেন ইট-কাঠের একটা মস্ত জন্তু আমাকে একেবারে গিলে ফেলেচে। তার উপরে আবার আকাশ মেঘে লেপা, রাত্তির থেকে টিপ্‌টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়চে। শান্তিনিকেতনের মাঠে যখন বৃষ্টি নামে তখন তার ছায়ায় আকাশের আলো করুণ হ'য়ে আসে, ঘাসে ঘাসে পুলক লাগে, গাছগুলি যেন কথা কইতে চায়, আমার মনের মধ্যে গান জেগে ওঠে আর তার সুর গিয়ে পৌঁছোয় দিনুর ঘরে। আর এখানে নববর্ষা বাড়ির ছাদে ঠোকর খেতে খেতে খোঁড়া হ'য়ে পড়ে, —কোথায় তার নৃত্য, কোথায় তার গান, কোথায় তার সবুজ রংঙের উত্তরীয়, কোথায় তার পূবে বাতাসে উড়ে পড়া জটাজাল।

কথা হচ্চে এবার শ্রাবণ মাসে আর বছরের মতো কলকাতায় বর্ষামঙ্গল গান হবে। কিন্তু যে গান শান্তিনিকেতনের মাঠে তৈরি সে গান কি কলকাতা সহরের হাটে জমবে? এখানে অনুরোধে প'ড়ে কখনো কখনো আমার নতুন বর্ষার গান গাইতে হয়েচে। কিন্তু এখানকার বৈঠকখানায় সেই গানের সুর ঠিক মতো বাজে না। তোমাদের ওখানে এতদিনে বোধ হয় বর্ষা নেমেচে, অতএব তোমার নতুন শেখা বর্ষার গান কখনো কখনো গুন্‌গুন্ স্বরে গাইতে পারবে, কখনো বা এস্‌রাজে বাজিয়ে তুলবে। তুমি যাওয়ার পর আরো কিছু কিছু নতুন গান আমার সেই খাতায় জ'মে উঠেচে, কলকাতায় না এলে আরো জমত। এদিকে দিনুবাবুও দাঁত তোলাবার জন্যে

দু-তিন দিন হ'ল কলকাতায় এসেচেন ;—আষাঢ় মাসের বর্ষাকে এ সহরে যেমন মানায় না, দিনুবাবুকেও তেমনি। আজ সকালেই সে পালাবে স্থির করেচে।—ইতি ২৯ আষাঢ়, ১৩২৯।

৪৯

আত্রাই নামক একটি নদীর উপর বোটে ক'রে ভেসে চলেচি। বর্ষার মেঘ ঘন হ'য়ে আকাশ আচ্ছন্ন করেচে, একটু ঝোড়ো বাতাসের মতো বইচে, পাল তুলে দিয়েচে। নদী কূলে কূলে পরিপূর্ণ, স্রোত খরতর, দলে দলে শৈবাল ভেসে আস্‌চে। পল্লীর আঙিনার কাছ পর্য্যন্ত জল উঠেচে; ঘন বাঁশের ঝাড়; আম কাঁঠাল তেঁতুল কুল শিমুল নিবিড় হ'য়ে উঠে গ্রামগুলিকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেচে; মাঝে মাঝে নদীর তীরে তীরে কাঁচা ধানের ক্ষেতে জল উঠেচে, কচি ধানের মাথা জলের উপর জেগে আছে। দুই তটে স্তরে স্তরে সবুজ রঙের ঘনিমা ফুলে ফুলে উঠেচে, তারি মাঝখান দিয়ে বর্ষার খোলা নদীটি তার গেরুয়া রঙের ধারা বহন ক'রে ব্যস্ত হ'য়ে চলেচে, সমস্তটার উপর বাদল-সায়াহ্নের ছায়া। বৃষ্টি নেমে এল—দূরে মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য্যাস্তের একটা ম্লান আভা এই বৃষ্টিধারার আবেগের উপর যেন সান্ত্বনার ক্ষীণ প্রয়াসের মতো এসে পড়েচে।

আমার এই বোট ছাড়া নদীতে আর নৌকা নেই। এই জলস্থল আকাশের ছায়াবিষ্ট নিভৃত শ্যামলতার সঙ্গে মিল ক'রে একটি গান তৈরি করতে ইচ্ছে করচে, কিন্তু হয়ত হ'য়ে উঠ্‌বে না। আমার দুই চক্ষু এখন বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে চায়,—খাতার দিকে চোক রাখবার এখন সময় নয়। অনেক দিন বোলপুরে শুকনো ডাঙায় কাটিয়ে এসেচি এখন এই নদীর উপর এসে মনে হচ্চে পৃথিবীর যেন মনের কথাটি শুনতে পাওয়া যাচ্চে। নদী আমি ভারি ভালবাসি; আর ভালোবাসি আকাশ। নদীতে আকাশে চমৎকার মিলন, রঙে রঙে, আলোয় ছায়ায়,—ঠিক যেন আকাশের প্রতিধ্বনির মতো। আকাশ পৃথিবীতে আর কোথাও আপনার সাড়া পায় না এই জলের উপর ছাড়া।

আজ রাত্রের গাড়িতেই কলকাতায় যাব মনে ক'রে ভালো লাগ্‌চে না। ইতি ২ শ্রাবণ, ১৩২৯।

৫০

আজ বুধবারে সকালে মন্দিরের কাজ শেষ ক'রে যেই আমার কুটীরের সামনে উত্তর দিকের বারান্দায় বসেচি অমনি নানাবিধ চিঠি ও খবরের কাগজের সঙ্গে তোমার চিঠি এসে পৌঁছলো। এর আগে দু-এক দিন খুব ঘন বৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছিল, আজও স্তূপাকার কালো মেঘ আকাশ ক্ষেত্রের এদিকে ওদিকে ভ্রূকুটি ক'রে ব'সে আছে; এখনি তারা বৃষ্টিবাণ বর্ষণ করবে ব'লে ভয় দেখাচ্চে। কিন্তু আজ প্রথম সকালের মেঘের ফাঁক দিয়ে অরুণোদয় খুব সুন্দর হ'য়ে দেখা দিয়েছিল। আমি তখন পূবদিকের বারান্দায় ব'সে ছিলুম, আমার মনের সঙ্গে যেন তার মুখোমুখি কথা চল্‌ছিল। মন যেদিন তার চোখ মেলে, সেদিন প্রত্যেক সকাল বেলাটিই তার কাছে অপূর্ব্ব হ'য়ে দেখা দেয়। বিশ্বলক্ষ্মী তাঁর অন্দরের দ্বারের কাছে রোজই দাঁড়িয়ে থাকেন, যেদিন আমরা প্রস্তুত হ'য়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাত পাতি সেদিন তাঁর দান মুঠো ভ'রে পেয়ে থাকি। পৃথিবী থেকে যাবার সময় আমি এই কথা ব'লে যেতে পারবো যে, এমন দান আমি অনেক পেয়েচি।

সেপ্টেম্বরের আরম্ভে আমার বম্বাই যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কেননা সেপ্টেম্বরের ১৫ই তারিখে কলকাতায় আমাদের শারদোৎসবের পালা বসবে—আমাকে সাজতে হবে সন্ন্যাসী। আমার এই সন্ন্যাসী সাজবার আর কোনো অর্থ নেই অর্থ-সংগ্রহ ছাড়া। শুনে তোমরা বিস্মিত হয়ো না তোমাদের বারাণসীধামে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা সন্ন্যাসী সেজেছেন অর্থের প্রত্যাশায়, আর যাঁদের প্রত্যাশা নিরর্থক হয়নি।

এল্‌মহার্ষ্ট সাহেব এসেচেন। তাঁর কাছে শুনলুম তুমিও নাকি আসক্তি-বন্ধন ছেদন ক'রে সন্ন্যাসিনী হবার চেষ্টায় আছ। সেই জন্যেই কি লজিক পড়া সুরু করেছ? কিন্তু লজিক জিনিষটা হচ্চে কাঁটাগাছের বেড়া, তাতে ক'রে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানসক্ষেত্রের ফসলকে নির্বোধ গরু বাছুরের উৎপাত থেকে রক্ষা করা চলে; কিন্তু আকাশ থেকে যে-সব বর্ষণ হয়, রৌদ্রই বল বৃষ্টিই বল, তার থেকে নিরাপদ হবার উপায় তোমার ঐ ন্যায়শাস্ত্রের বেড়া নয়। তুমি আমাকে ভয় দেখিয়েচ যে এবার আমার সঙ্গে দেখা হ'লে তুমি আমার লজিকের পরীক্ষা নেবে। আমি আগে থাক্‌তেই হার মেনে রাখচি। পৃথিবীতে দুই জাতের মানুষ আছে। একদলকে লজিকের নিয়ম পদে পদে মিলিয়ে চলতে হয়, কেননা তারা পায়ে হেঁটে চলে,—আর একদল ন্যায়শাস্ত্রের উপর দিয়ে চ'লে যায়, উনপঞ্চাশ বায়ু তাদের বাহন, তারা এপক্ষ ওপক্ষের বিরোধ খণ্ডন করতে করতে নিজের পথ খুঁজে মরে না,—তারা এককালে নিজেরই দুই পক্ষ বিস্তার ক'রে সেই পথ দিয়ে চ'লে যায় যে-পথ হচ্চে রবিকিরণের পথ।

এই প্রসঙ্গে, এই পত্র-লেখক কোন্ জাতের লোক তার একটু আভাসমাত্র যদি দিই তাহ'লে তুমি ব'লে বসবে তিনি ভারি অহঙ্কারী। যারা লজিকের অহঙ্কার ক'রে তাল ঠুকে বেড়ায় তারাই নন্‌লজিকালদের ব্যোমপথ যাত্রার পক্ষ-বিধূননের মাহাত্ম্য খর্ব করবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে মহিমা ত যুক্তির দ্বারা আত্ম-সমর্থনের অপেক্ষা করে না;—সে আপন অচিহ্নিত পথে আপন গতিবেগের দ্বারাই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

আজ এইখানেই ইতি। ১৩ই ভাদ্র ১৩২৯।

৫১

তুমি যে তোমার লজিকের খাতার পাতা ছিঁড়ে আমাকে চিঠি লিখেচ তাতে বুঝতে পারচি লজিক সম্বন্ধে [illegible] প'ড়ে তোমার উপকার হয়েচে। লজিক যেমনি [illegible] হ'য়ে যায় অমনি তার আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। [illegible] কলাপাতায় খাওয়া হ'য়ে যায় সে কলাপাতা ফেলে দিলে ক্ষতি হয় না; কিন্তু যে তালপাতার উপর মেঘদূত লেখা [illegible]চে সেটা ফেলবার জিনিষ নয়।

আ[illegible] এবার দু-তিন দিন ধ'রে বর্ষামঙ্গল করেচি। তার ফল কি হয়েচে একবার দেখ। আজ ভাদ্রমাসের আঠারই তারিখ, অর্থাৎ শরৎকালের আরম্ভ, কিন্তু বর্ষার আয়োজন এখনো ভরপুর রয়েচে। আকাশ ঘন মেঘে কালো হয়ে আছে,—থেকে থেকে ঝমাঝম্ বৃষ্টি হচ্চে। আমার কবিত্বের এই আশ্চর্য্য প্রভাব দেখে আমি নিজেই অবাক্ হয়ে গেছি। এমন কি, শুন্‌তে পাই, আমার এই বর্ষা-মঙ্গলের জোর কাশী পর্য্যন্ত পৌঁচেছে। সেখানেও বৃষ্টি চলচে। বোধ হচ্চে আমরা যখন শারদোৎসব করব তার পর থেকেই শরতের আরম্ভ হবে। এই শারদোৎসবের রিহার্স্যালে আমাকে অস্থির করেচে। রোজ দুপুর বেলায় বিভূতি এসে একবার ক'রে আমার কাছ থেকে আগাগোড়া পাঠ নিয়ে যায়; ছোট ছেলেরা যে রকম পড়া মুখস্থ করে আমাকে তাই করতে হয়। কিন্তু এমনি আমার বুদ্ধি তবু রিহার্স্যালের সময় কেবল ভুলি—ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা পর্য্যন্ত হাসে—এত অপমান সে আর কি বলব।

যাই হ'ক যদি তুমি আমার শারদোৎসব দেখ্‌তে আস তাহ'লে বোধ হয় দেখবে ঠিক ঠিক মুখস্থ ব'লে যাচ্চি। তোমার বাবাকে শারদোৎসব দেখবার জন্যে আস্‌তে ব'লে দিয়েচি। কিন্তু যে রকম ব্যস্ত মানুষ, তাঁর মনে থাকলে হয়। ঐ বিভূতি এল—এইবার আমার পড়া দিইগে যাই। ১৮ই ভাদ্র ১৩২৯।

গৃহ হারা—রাত একটা
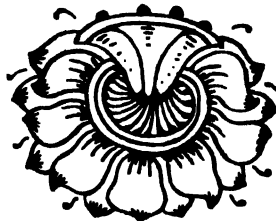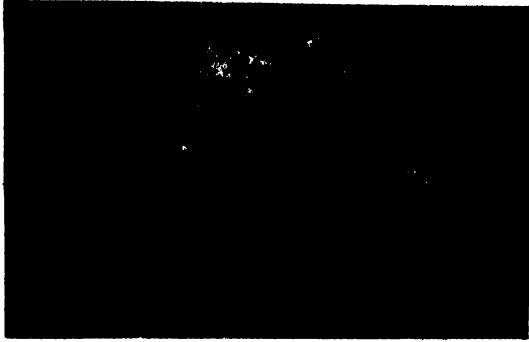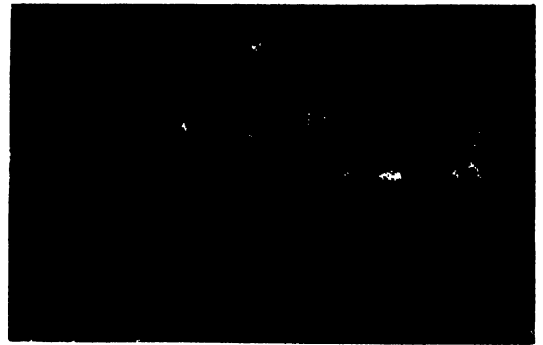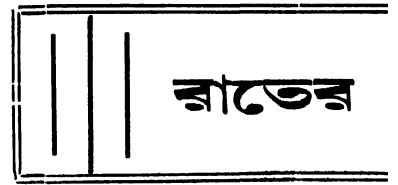
থিয়েটারের দোরগোড়ায়

দুপুর রাতের পুলিশ—রাত দুটো

ফুট-পাথের উপর "জুতা ব্রুশ" মুচি

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় কর্তৃক
নির্বাচিত ও প্রেরিত

টেম্‌স্‌ নদী—হোটেল সেসিল—ক্লিওপেট্রা'স্‌ নীড্‌ল

ট্রাফালগার স্কোয়ার—নেলসন্‌ স্তম্ভ
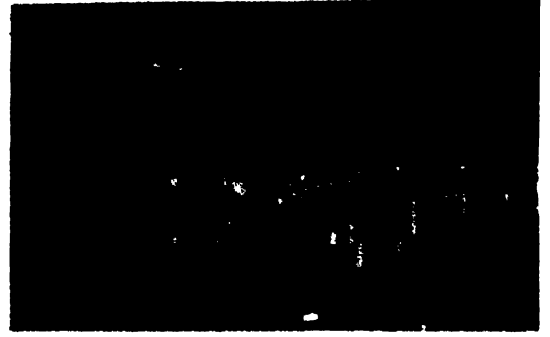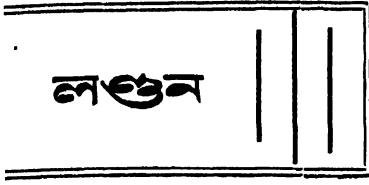
বাদল রাতে—নদীর ধার

গহনার দোকানে

কুমারী ইন্দিরা গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক
পরিসজ্জিত

জীবন-সন্ধ্যা

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১

আমি একা। এ ধরার ধূলির আসরে,
মিলিয়াছে কত কোটী! সারা দিনমান
ব্যাপ্ত করি' উদয়াস্ত, জন্ম-জয়গান
উৎসারিছে নিরবধি প্রাণপূর্ণ স্বরে!
হর্ষ-শোক, হিংসা-প্রেম—দ্বন্দ্ব-অবসরে,
মহাকবি-বিরচিত চরিত মহান,
মৃত্তিকার পৃথ্বীতল করি' স্পন্দমান
ফুটায় রোমাঞ্চ-রশ্মি নিশীথ-অম্বরে!

আমি হেথা অনাহূত অচেনা অতিথি,—
কোথা হ'তে এই সূর্য্য-চন্দ্রাতপ-তলে
আসিনু কেমনে?—প্রাণের পাথেয়-হীন,
চক্ষে শুধু স্বপ্ন, আর বক্ষে ভগ্নবীণ—
ভাবিতে লজ্জায় মরি! জীব-রঙ্গস্থলে,
বিজনে ভ্রমিনু শুধু চারু চিত্রবীথি!

২

কিবা এই অভিশাপ! দুই মুঠি ভরি'
যে ধন ধরিতে নারি—সুস্থ দেহমাঝে
যে ব্যথা শোণিত-ছন্দে হৃদ্‌যন্ত্রে বাজে,
সুপক্ব ফলের মত নখ-অগ্রে ধরি'
দশনে দংশিতে যারে একাকার করি
রসে-শাঁসে,—ধরণীর রসিক-সমাজে
সেই ব্যথা, সেই সুখ না লভিয়া, লাজে
সম্বরি' আপন দৈন্য যেতে হবে সরি'?

জানি, সত্য এ জগতে আর কিছু নহে,
সত্য শুধু প্রেম আর জীবন-পিপাসা—
সুখে-দুঃখে ভোগে-ত্যাগে আপনা-বিস্মৃতি;
যে চাহে বুঝিতে শুধু মরণের রীতি,
নাই প্রেম, আছে শুধু নিয়ম-জিজ্ঞাসা—
দেহী হ'য়ে সে যে বৃথা দেহভার বহে!

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

৩

তাই ভাবি, এ ধরার উদার অঙ্গনে
কি করিনু ? চিরদিন একি হেলা-ফেলা !
দূর হ'তে হেরি' জন্ম-মরণের মেলা
মজিনু স্বপনে শুধু !—এ বাহু-বন্ধনে
বাঁধি নাই কোন জনে ; ভেরীর নিঃস্বনে
ছুটি নাই খুলিয়া দুয়ার ; সন্ধ্যেবেলা
একটি তারার পানে চাহিয়া একেলা
হারা-মুখ স্মরি নাই অশান্ত ক্রন্দনে !

সম্মুখে বহিয়া যায় মর্ত্ত্য-তরঙ্গিণী
আবর্ত্ত-অধীর, জন্ম-মৃত্যু দুই তট
ভাঙ্গিয়া গড়িছে পুন নূতনের গানে !—
ভয়াতুর চেয়ে আছি সেই বারিপানে,
ভরিতে নারিনু মোর শতছিদ্র ঘট !—
সতী আত্মা ?—হায়, সে যে ঘোর কলঙ্কিনী !

৪

ফুরায়ে আসিছে বেলা, অপরাহ্ণ-দিন—
ঝাউ-বন ছায়া-ভরা মুমূর্ষু আলোকে ;
হেরিতেছি ক্লান্ত-কণ্ঠ পাখীর পালকে
আগামিনী যামিনীর আভাস মলিন !
উপোষিত আঁখিযুগে রূপ-রেখা ক্ষীণ—
জুড়ায় দিনের দাহ আমার ভূলোকে।
গেঁথেছিনু যেই গাথা প্রাণহীন শ্লোকে,
জীবনের বিপণিতে তা'ও মূল্যহীন !

আজ মনে পড়ে সেই প্রভাতের কথা—
বালারুণ-রশ্মিরাগ দেবদারু-শিরে,
পল্লবে প্রবালে পুষ্পে অযত্ন-সঞ্চয়
প্রাণের পুলক-মণি ! সে নিত্য-বিস্ময়
কখন হারায়ে গেছি ! দিনান্ত-সমীরে
বনের মর্ম্মরে শুনি মনেরি বারতা !

৫

এমনি কাটিল বেলা। আমি ধরিত্রীর
ক্ষীণ-প্রাণ শীর্ণ শিশু,—বসি' একধারে
দুইটি ডাগর আঁখি ভরি' জলভারে
চেয়ে আছি, আশাহীন তৃষায় অধীর।
জননী দাঁড়ায়ে হোথা,—স্তনস্রাবী ক্ষীর
পিয়িছে উল্লাসে মাতি' কাতারে কাতারে
প্রবল দুরন্ত যারা—হাস্য-অশ্রুধারে
উথলে অবোধ-প্রীতি, নয়ন মদির!

আমি শুধু চেয়ে আছি,—নারিনু ধরিতে
ধরণীর সুধাপাত্র। শুধু এক আশা!—
বঞ্চিত সন্তান তরে কিছু কি বাঁধিয়া
রাখেনি আঁচলে মাতা? যত্নেতে সাধিয়া
ধরিবে না মুঠি মোর—সর্ব্ব দুঃখনাশা
একটু প্রসাদকণা গোপনে ভরিতে?

৬

সে নহে যশের আশা!—কালের সাগরে
অম্বুমুখে ক্ষণবিম্ব বুদ্বুদ-বিলাস!
আমি চাই নিজ-প্রাণে পূর্ণ-অভিলাষ—
হৃদিপুষ্প ভরি' যাবে পরাগে কেশরে।
জীবনের সর্ব্বশেষ পূর্ণিমা-বাসরে
বাতায়নে ধরা দিবে সারাটি আকাশ!
রবে না আড়াল কোথা,—সুবর্ণ-সঙ্কাশ
নেহারিব পূর্ণশশী দিকে দিগন্তরে!

শয়ন-শিয়রে মোর নিশি কোজাগরী
দাঁড়াইবে চুপে চুপে, খুলিবে গুণ্ঠন
নিখিলের রূপলক্ষ্মী!—নয়ন-গণ্ডুষে
সে লাবণ্য-সিন্ধু লব এককালে শুষে!
যে অমৃত পিপাসায় করিনি লুণ্ঠন—
হেরিব, গোপন পাত্রে উঠিয়াছে ভরি'!

গ্রন্থাগার

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

এই কনফারেন্সের উদ্যোগকর্তারা আমাকে বঙ্গদেশের লাইব্রেরীর হিতকল্পে আহূত এই মন্ত্রণাসভার মন্ত্রণা-সভাপতির আসন গ্রহণ করতে আহ্বান করেছেন, এর জন্য আমি অবশ্য নিজেকে যথোচিত ধন্য মনে করছি। তবে এ পদ লাভ করবার আমার কি দলিল আছে তা আমার নিকট অবিদিত।

আমি বই ভালবাসি—পড়তেও, সংগ্রহ করতেও। সম্ভবতঃ সেই কারণে আপনারা আমাকে এ আসন অধিকার করবার যোগ্যপাত্র স্থির করেছেন। কিন্তু বই পড়তে ভালবাসা, ও বই সংগ্রহ করতে ভালবাসা, এ দুই এক প্রবৃত্তি নয়, যদিচ এ উভয় মনোভাবের ভিতর নাড়ীর যোগ আছে। এ দুই ভালবাসা যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে পারে তার প্রমাণ অনেকে বই পড়্‌তে ভালবাসেন, কিন্তু নিজে বই সংগ্রহ করতে ভালবাসেন না। অপর পক্ষে এ শ্রেণীর লোকও বিরল নয়, যাঁরা বই সংগ্রহ করেন কিন্তু পড়েন না। অবশ্য এই দ্বিবিধ মনোভাবের যোগাযোগ থেকেই লাইব্রেরীর সৃষ্টি হয়।

যে ব্যক্তি নিজে বই পড়তে ভালবাসে,—তার পক্ষে পুস্তক সংগ্রহ করার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। যদি তার অর্থে ও সামর্থ্যে কুলোয় তাহলে সে প্রায়ই একটি নিজস্ব লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করে। এ জাতীয় লাইব্রেরীকে ইংরাজীতে private library আখ্যা দেওয়া হয়। বাঙলায় একে খাস্ লাইব্রেরী বলা যেতে পারে। আমি হচ্ছি সেই পাঁচজনের মধ্যে একজন যার ঘরে উক্ত শ্রেণীর একটি খাস্ লাইব্রেরী আছে; এবং সেই সূত্রে আমি লাইব্রেরীর যোগক্ষেম সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। বলা বাহুল্য যে,. এ অভিজ্ঞতা publiclibrary-র গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধে মতামত দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে ব্যক্তি নিজের টাকা সুদে খাটায় সে অবশ্য ব্যাঙ্কের গঠন ও পরিচালনা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নয়।

সভামাত্রেরই সভাপতির কর্তব্য হচ্ছে সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি লম্বা বক্তৃতা করা। সে বক্তৃতা যে কতদূর লম্বা হওয়া উচিত তার পরিচয় এই সভার অনুষ্ঠান পত্রেই পাওয়া যায়। যাঁরা এ সভার অনুষ্ঠানপত্র রচনা করেছেন, তাঁরা সভাপতির বক্তৃতার কাল বরাদ্দ ক'রে দিয়েছেন পুরো এক ঘণ্টা। একথা তাঁরা ভাবেন নি যে, ব্যক্তি মাত্রেরই এত কথা বলবার নেই যা এক ঘণ্টার কম ব'লে শেষ করা যায় না। তারপর এক ঘণ্টা ধ'রে অনর্গল ব'কে যাবার মত শক্তি যাঁর দেহে আছে তাঁর বক্তৃতা ধৈর্য্য ধ'রে শোনবার শক্তি সকলের মনে নেই। মনে রাখবেন বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরাজী ভাষায় বাচালতার যতটা অবসর আছে বাঙলা ভাষায় ততটা নেই। আর আমি হচ্ছি একজন পুরোদস্তুর বাঙলা-নবীশ।

আজকের সভার উদ্দেশ্য যদি হ'ত লাইব্রেরীর আবশ্যকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে বাগবিস্তার করা তাহলে এক ঘণ্টা কেন, চব্বিশ ঘণ্টা ধ'রে সে বিষয়ে নানারূপ আলোচনা করা যেতে পারত। কারণ সে সূত্রে নানারূপ সামাজিক, দার্শনিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা করবার সুযোগ পাওয়া যেত; এবং এর প্রতি বিষয়েই এমন তর্কের সূত্রপাত করা যেত যে-তর্কের আর শেষ নেই। কিন্তু আপনারা এক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে; কি ক'রে বাঙলা দেশে লাইব্রেরীর প্রচার বৃদ্ধি করা যায় তাই হচ্ছে আপনাদের যথার্থ আলোচনার বিষয়। দেশে যে লাইব্রেরীর আবশ্যকতা আছে ও দেশময় লাইব্রেরী স্থাপন করতে পারলে যে দেশবাসীর উপকার করা হবে এ বিষয়ে আপনারা সকলেই একমত। সুধু কি

All Bengal Library Conference-এর ২১শে জানুয়ারীর অধিবেশনে পঠিত।

উপায়ে সারা দেশে লাইব্রেরীর চাষ করা যায় সেই বিষয়েই আপনারা এস্থলে পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছেন। এর জন্য চাই, কিঞ্চিৎ কাজ,—বহু কথা নয়। Public Libraryর গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে আমার কোনরূপ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। সুতরাং আপনাদের আলোচনায় রীতিমত যোগ দেবার সামর্থ্য আমার নেই। আমি যার সঙ্গে বিশেষরূপে পরিচিত সে হচ্ছে আমার ঘরাও লাইব্রেরী—সে কারণ আমি আপনাদের কাছে private libraryর গুণাগুণ সম্বন্ধে দু চার কথা বলতে চাই। আশা করি সে আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মনে রাখবেন এই ঘরাও লাইব্রেরীই হচ্ছে লাইব্রেরীর আদি বিগ্রহ—যা কালক্রমে সামাজিক লাইব্রেরীতে পরিণত হয়েছে। এ দুই মূর্ত্তির ভিতর যথেষ্ট প্রভেদ আছে, তাই আমার সময়ে সময়ে মনে হয় পৃথিবীর এমন দিন হয়ত কখনো আসবে না যখন কারও ঘরে ঘরাও লাইব্রেরী আর থাকবে না। অর্থাৎ যে কালে সরস্বতী আর কারও গৃহদেবতা থাকবেন না, সকলেরই পুরদেবতা হবেন।

ইউরোপে দেখে এসেছি যে সে দেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গির্জ্জা আছে এবং সেই সঙ্গে অনেক বাড়ীতে private chapel আছে। দেশের লোকের মনের উপর যখন ধর্ম্মভাবের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, তখন মানুষ স্বভাবতই ধর্ম্মসাধনার এই উভয়বিধ ব্যবস্থা করে। লাইব্রেরী যে সর্ব্বসাধারণ হওয়া উচিত, এই ডিমোক্রাটিক যুগে সে বিষয়ে আমরা সকলেই একমত; কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর বিরোধী নই এবং যদি কেউ নিজের মনোমত একটি নিজস্ব লাইব্রেরী সংগ্রহ করতে উদ্যত হন, তাহলে—তাঁকে নিরুদ্যম করা আমি কোন হিসেবেই সঙ্গত মনে করিনে। বরং ঘরে ঘরে ছোটখাটো লাইব্রেরীর দর্শন পেলে আমি উৎফুল্ল হই। Private Library একটি ব্যক্তি বা পরিবার বিশেষের হাতে ধীরে ধীরে গ'ড়ে ওঠে। ও শ্রেণীর লাইব্রেরী রাতারাতি আকাশ থেকেও পড়ে না, ভুঁই ফুড়েও ওঠে না। ও জাতীয় লাইব্রেরীর একটি প্রধান গুণ এই যে ওর ভিতর একটি বিশেষ ব্যক্তির আত্মার পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকাংশ লোকের মনের পরিচয় লাভ করবার জন্য অবশ্য অধিকাংশ লোক মোটেই ব্যস্ত নয়। কিন্তু পৃথিবীতে এমন লোকও অনেক জন্মগ্রহণ করে যাদের মানসিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানতে আমাদের মনে কৌতূহল আছে; এবং এ কৌতূহল চরিতার্থ করবার অন্যতম উপায় হচ্ছে তিনি কোন্ বই পড়তেন ও কোন্ বই ভালবাসতেন তার সন্ধান নেওয়া। ও জাতীয় কোন ঘরাও লাইব্রেরীর সাক্ষাৎ যদি আমরা পাই, তাহলে এ বিষয়ে আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার সুযোগ হয়। যাঁরা ইউরোপে সাহিত্যিক ব'লে খ্যাতিলাভ করেছেন, তাঁদের বিদ্যার দৌড় ও সাহিত্যরুচির সম্যক পরিচয় লাভের জন্য সে দেশে বহু সাহিত্যিক আজকাল তাঁদের লাইব্রেরী তদন্ত করছেন। প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ দার্শনিক নিট্‌সের মন ও মত কি ক'রে কার প্রভাবে গ'ড়ে উঠেছিল তার তথ্য আমরা আজ আবিষ্কার করেছি তাঁর লাইব্রেরীর দৌলতে।

বলা বাহুল্য কোনও লোকের লেখা থেকে তাঁর পড়ার পরিচয় সব সময়েই পাওয়া যায় না। কারণ সাহিত্যজগতে এর দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে, লেখক তাঁর গ্রন্থে অপর যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ করেন—সে সব গ্রন্থের তিনি সুধু নাম শুনেছেন মাত্র, কখনো চোখে দেখেন নি। যে বিদ্যে আমাদের নেই, সে বিদ্যে দেখাবার প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

বই অবশ্য লোকে কেনে পড়বার জন্য,—কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, পুস্তকপ্রীতি ব'লেও একরকম বিশেষ প্রীতি আছে যা সাহিত্যপ্রীতি হতে স্বতন্ত্র। যিনি একবার পুস্তকসংগ্রহ কার্য্যে ব্রতী হন, তাঁর মনে কালক্রমে এই পুস্তকপ্রীতি নিজের অলক্ষিতে জন্মলাভ করে। এক কথায়, তিনি পুস্তকের সুধু গুণের নয়, তার রূপেরও পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন। তখন পুস্তকের আকার, বর্ণ—এমন কি গন্ধও তাঁকে আনন্দ দেয়। বইয়েরও যে একপ্রকার সুবাস আছে তা পুস্তকভক্ত লোক মাত্রেই জানেন। সে গন্ধের বর্ণনা ভাষায় করা কঠিন, কারণ তা কতক অংশে ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আর কতক অংশে অন্তরেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সে যাই হোক, পুস্তকের যে অংশটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তা যে সর্ব্বজনপ্রিয়, তার প্রমাণ নিত্য পাওয়া যায়

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বাঙলা বইয়ের বিজ্ঞাপনে। বিজ্ঞাপনদাতারা যে ভাবে যে ভাষায় নূতন বইয়ের বর্ণনা করেন তা প'ড়ে হঠাৎ বোঝা যায় না যে—সেই অপূর্ব্ব পদার্থটি বই না ছবি। এই সর্ব্বজনীন মনোভাব পূর্ণ মাত্রায় ফুটে ওঠে সেই শ্রেণীর ব্যক্তিদের মনে যাঁরা পুস্তকপ্রীতি একটা আর্টে পরিণত করেছেন। বইয়ের ছাপা কাগজ বাঁধাই সম্বন্ধে আশা করি আপনারা কেউ উদাসীন নন্। আর পুস্তকের বাহারও দিন দিন যে সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ করছে সেও প্রধানতঃ পুস্তকবাতিকগ্রস্ত লোকের প্রসাদে। বলা-বাহুল্য এ জাতীয় লোকের সাক্ষাৎ সেই শ্রেণীর মধ্যে মেলে যাঁরা private library সংগ্রহ করেন। অপর পক্ষে public library'র স্রষ্টা মাত্রেই Utiliatrian, কারণ তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকহিতসাধন। বইয়ের রূপের দিকে তাঁরা বড় একটা নজর দিতে পারেন না। অথচ বিদ্যা ও সুন্দরের চিরবিচ্ছেদ বাঞ্ছনীয় নয়। পুস্তকপ্রণয়ী লোকদের, অর্থাৎ ইংরাজীতে যাঁদের বলে bibliophile তাঁদের মধ্যে অপর একটি বিশেষ প্রবৃত্তির পরিচয় নিত্যই পাওয়া যায়। Rare books অর্থাৎ দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ করবার দিকে এঁদের একটা আন্তরিক ঝোঁক থাকে। এর ফলে এঁরা অনেক গ্রন্থ আবিষ্কার করেন ও সযত্নে রক্ষা করেন যাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সাধারণ লোকের অগোচর। এই প্রবৃত্তির ফলে তাঁরা অনেক গ্রন্থ লৌকিক বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা করেন—যাতে দর্শন, বিজ্ঞান ইতিহাসের ঐশ্বর্য্য বেড়ে যায়। অধিকাংশ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ অপ্রাপ্য থাকাতে সাহিত্যের কিম্বা সমাজের কোনও ক্ষতি নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে এই rare books-এর মধ্যে আমরা অমূল্য রত্নের সাক্ষাৎ পাই। দু-একটি উদাহরণ দিই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও ভাসের নাটকের নাম আমরা বহুকাল থেকে শুনে আসছি কিন্তু চাণক্য ও ভাসের বই এহেন দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছিল যে, আমরা ও সব গ্রন্থের অস্তিত্ব কিম্বদন্তির কোঠায় ফেলে দিয়েছিলুম। পরে সেদিন যখন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আবিষ্কৃত হল—তখন আমরা দেখ্‌তে পেলুম যে রাজনীতি সম্বন্ধে এর তুল্য দ্বিতীয় গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে আর নেই। আর ভাসের নাটকের চাইতে উঁচুদরের নাটক এক কালিদাসের শকুন্তলা ব্যতীত সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে মেলা ভার। নাটক হিসেবে মৃচ্ছকটিকের স্থান অবশ্য খুব উচ্চে। কিন্তু ভাস আবিষ্কৃত হবার পর আমরা এও আবিষ্কার করেছি যে মৃচ্ছকটিক ভাসের রচিত "দরিদ্র চারুদত্তের" চোরাই সংস্করণ মাত্র। অপরের বই নিজের বেনামিতে চালানোর অভ্যাস সেকালের লোকেরও ছিল।

প্রাইভেট লাইব্রেরীর আর এক মহাগুণ এই যে এ জাতীয় লাইব্রেরীর অঙ্গে যে বৈচিত্র্য থাকে পাব্‌লিক লাইব্রেরীর দেহে সে বৈচিত্র্যের সাক্ষাৎ পাওয়া দুষ্কর। কারণ যাঁরা নিজের জন্য পুস্তক সংগ্রহ করেন না, করেন শুধু লোক-হিতার্থে, কোন্ জাতীয় পুস্তকের সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য সে বিষয়ে তাঁরা মনস্থির করতে বাধ্য। যুগধর্ম্ম অনুসারে লোকে নানারূপ বিভিন্ন জাতীয় সাহিত্যের অনুরক্ত হয়,—এবং এর ফলে প্রতি দেশে প্রতি যুগে পাবলিক লাইব্রেরীগুলি সমধর্ম্মী,—অর্থাৎ একধর্ম্মী হতে বাধ্য।

যে যুগে সমাজকে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়াটাই পরোপকারী ব্যক্তিরা তাঁদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ব'লে মনে করেন সে যুগে লাইব্রেরীতে ধর্ম্মকর্ম্মের পাঁজিপুঁথি সংগ্রহ করাই পুস্তকসংগ্রহীতাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। সে যুগের লাইব্রেরীতে বিজ্ঞানের বইয়ের সাক্ষাৎ লাভ করা দুর্ঘট। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের আদর অবশ্য কোন দেশেই কোন যুগেই সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায় করে না। কারণ ও জাতীয় গ্রন্থের অর্থগ্রহণ ও রসগ্রহণ করতে পারেন শুধু পণ্ডিতের দল। তবে যেকালে ধর্ম্ম সামাজিক মনের উপর আধিপত্য করত, সেকালে পলিটিক্‌সের বইয়েরও কোনও আদর ছিল না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র যে এদেশে হাজারখানেক বছর ধ'রে গা-ঢাকা দিয়ে ছিল, তার একমাত্র কারণ সে গ্রন্থ অনেককাল ব্রাহ্মণসমাজে অস্পৃশ্য হয়ে ছিল।

এযুগে পৃথিবীর লোক পলিটিক্‌স্-প্রাণ হয়ে উঠেছে। পলিটিক্‌স্ হচ্ছে একালের লৌকিক ধর্ম্ম। সুতরাং একালে যদি কেউ লোকহিতার্থে একটি সংস্কৃত গ্রন্থের স্থাপনা করতে চান, তাহলে তিনি যে মোহমুদ্গর বাদ দিয়ে

কৌটিল্যের গ্রন্থ সংগ্রহ করবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর গীতা সে লাইব্রেরীতে স্থান পাবে, প্রধানতঃ তার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বলে।

এ অবস্থায় সকল জাতীয় সাহিত্যের সংগ্রহ তাঁদের পক্ষে করাই অসম্ভব যাঁদের ব্যক্তিগত রুচি সাধারণ রুচির সম্পূর্ণ অনুগামী নয়। এ কারণেও যত বেশি লোক নিজের রুচি অনুসারে পুস্তক সংগ্রহ করেন ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। সামাজিক মনের সংকীর্ণ হবার দিকে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। সে মনকে যুগে যুগে উদার করবার ভার সেই সকল ব্যক্তিদের হস্তে ন্যস্ত থাকে, যাদের মন সামাজিক মতামতের গণ্ডিবদ্ধ নয়। আমি প্রাইভেট লাইব্রেরীর সার্থকতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছি, সুতরাং এখন এ শ্রেণীর লাইব্রেরীর ব্যর্থতা কোথায় সে কথাটাও বলা আবশ্যক।

প্রাইভেট লাইব্রেরীর প্রধান দোষ এই যে তার পরমায়ু স্বল্প। এ জাতীয় লাইব্রেরীর রচয়িতার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের স্বহস্তরচিত লাইব্রেরীও তিরোহিত হয়। কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে পুস্তকপ্রণয়ী লোকদের উত্তরাধিকারী লাইব্রেরী জিনিষটিকে আবর্জ্জনা হিসেবে দেখেন এবং যত শীঘ্র পারেন সে আবর্জ্জনাকে তাঁরা ঝেঁটিয়ে ঘর থেকে বার ক'রে দেন। তখন বহুকষ্টে বহুযত্নে একত্রে গ্রথিত সে লাইব্রেরী ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে এবং বহু বহুমূল্য পুস্তক পুরোণো কাগজের দরে বাজারে কাটে। আর যাঁর কুল-তিলকরা দশটাকা দামের পুস্তক একটাকায় বিক্রী করতে প্রস্তুত নন তাঁদের লাইব্রেরী পোকায় কাটে।

এজন্য প্রাইভেট লাইব্রেরীর মালিকদের এ পরামর্শ নিঃসঙ্কোচে দেওয়া যায় যে তাঁদের লাইব্রেরীর উত্তরাধিকার কোনও না কোনও পাবলিক লাইব্রেরীকে দেওয়াই একান্ত শ্রেয়। শাখানদীর চরম সার্থকতা মহানদীর দেহে লীন হওয়ায়। আমার জীবনেই আমি একাধিক প্রাইভেট লাইব্রেরীর সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় নিজচক্ষে দেখেছি। মালিকের অবর্ত্তমানে আমার পরিচিত যে কটি লাইব্রেরীর সদ্গতি হয়েছে সে কটিই কোন না কোনও পাবলিক লাইব্রেরীর অঙ্গে লীন হয়েছে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগৃহীত গ্রন্থাবলী এখন বোলপুর শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীর অন্তর্ভূত। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরীর ভূ-পুরুষের লাইব্রেরী এখন বেনারস হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা লাইব্রেরী স্বরূপে বিরাজ করছে, এবং কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লাইব্রেরী সাহিত্য পরিষদের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। বলা বাহুল্য যে, এ সকল লাইব্রেরীর এহেন সদ্গতি না হলে তারা দুদিনেই ধূলোয় মিশিয়ে যেত। আমি প্রাইভেট লাইব্রেরীর যে সকল সার্থকতার কথা বলেছি সে সকল কথার কোনই অর্থ থাকে না যদি না তা ভবিষ্যতে কোনও সাধারণ লাইব্রেরীর অঙ্গীভূত হয়। যা আদিতে ছিল প্রাইভেট তা অন্তে পাবলিক হয়েই জীবনধারণ করতে পারে।

বাঙলা দেশে নানাস্থানে যে আজকের দিনে নানা ছোট বড় লাইব্রেরীর জন্ম হচ্ছে, এ ঘটনা আমি বাঙালী জাতির পক্ষে নিতান্ত গৌরবের বিষয় মনে করি। কারণ এর থেকে সুধু এই প্রমাণ হয় যে, যে বস্তু মানুষের সুধু মনের বস্তু তা বাঙালী জাতির অতি প্রিয়। মনের চর্চ্চার অর্থ যে ধনের চর্চ্চা নয়, বাঙালী যে মাড়োয়ারী নয় এ ব'লে অনেককে আক্ষেপ করতে শুনেছি। আমাদের পক্ষে মনের চর্চ্চা ত্যাগ করে একান্ত মনে ধনের চর্চ্চা করা উচিত কি না সে বিষয়ে আমি মন স্থির করতে পারি নি। কারণ এ যুগে মন বাদ দিয়ে ধনের সৃষ্টি করা যায় কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। এ যুগে ধনের সৃষ্টি হয় কলে, আর কল চলে এঞ্জিনের ঠেলায়, আর এঞ্জিন চলে কিসে? চর্ম্মচক্ষে আমরা দেখতে পাই তেলে ও জলে, কিন্তু মনশ্চক্ষে দেখতে গেলেই দেখা যায় যে এঞ্জিনের যথার্থ চালক মানুষের মন—কোনও ভৌতিক পদার্থ নয়। আর যে মন এই ভৌতিক জগৎকে দিয়ে এই ভূতের বেগার খাটিয়ে নিচ্চে, সে মন বিদ্যা বুদ্ধিতে সমৃদ্ধ। কোনও কল যখনই আমার চোখে পড়ে, তখনই দেখতে পাই যে, তার অন্তরে রয়েছে একখানা বই। সংস্কৃত সাহিত্যে দু প্রকার যন্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, এক নির্জ্জীব যন্ত্র আর সজীব যন্ত্র। এ যুগের যত যন্ত্র সবই সজীব যন্ত্র। আর যন্ত্রকে সজীব করে মানুষের সজীব মন। সুতরাং আমার বিশ্বাস যে মনের চর্চ্চা ক'রে কোন জাতিই দরিদ্র হয় না। জাতীয়

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

মূর্খতা কস্মিনকালেও জাতীয় ধনাগমের উপায় ছিলনা— কস্মিনকালেও হবে না। বৈশ্যবুদ্ধি ব্রাহ্মণবুদ্ধির অধীন হয়েই উন্নতিলাভ করে। সুতরাং যে সকল প্রতিষ্ঠান জাতির মনের চর্চ্চার অনুকূল যথা, স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী ইত্যাদি সে সকল-কেই আমি শ্রদ্ধা করি। সুতরাং যাঁরা বঙ্গদেশে লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও উন্নতির জন্য চিন্তান্বিত হয়েছেন এবং সেই সঙ্গে লাইব্রেরী গঠনের সদুপায় অনুসন্ধান করছেন আমার মতে এদেশে তাঁরা যথার্থ জাতি গঠন কার্য্যে আপনাদের নিয়োজিত করেছেন। কি উপায় অবলম্বন করলে আপনাদের চেষ্টা ফলবতী হবে সে বিষয়ে আমার এমন কোনও কথা বলবার নেই যা অপরের শোনবার মত। কারণ এ বিষয়ে আমার ধারণা নিতান্ত অস্পষ্ট। আমি নিজে কখনও কোন public libraryর administrationএর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিনি, সুতরাং সে চেষ্টায় কৃতকার্য্য হতে হলে কি কি বাধা অতিক্রম করতে হয়, সে বিষয়ে আমার কোনও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে প্রাইভেট লাইব্রেরী ব্যক্তি বিশেষের হাতে গড়ে ওঠে কিন্তু public library গড়ে তুলতে হয়। একটির প্রকৃতি হচ্ছে ইংরাজীতে যাকে বলে organic, অপরটি organise করতে হয়।

কোন জিনিষকেই organise করার কৌশল আমার আয়ত্ত নয়। তবে মনে হয় যে, এ দেশে লাইব্রেরী organise করবার সহজ সঠিক উপায় অপর দেশে বা অপর কালে অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না। সে উপায় আপনাদের উদ্ভাবন করতে হবে। কেননা দেশ কালের বিভিন্নতার ফলে সে উপায়ও বিভিন্ন হতে বাধ্য। অপর দেশের লোকেরা কি কি উপায় অবলম্বন করে-ছেন, তা অবশ্য আমাদের জানা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে অপরের অর্জ্জিত জ্ঞান আমাদের উপায় উদ্ভাবনের সাহায্য করবে। অতএব সে সাহায্যে বঞ্চিত হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

আমি আপনাদের কাছে বারবার public libraryর নাম উল্লেখ করেছি। এখন এই public libraryর অর্থ কি সে বিষয়ে দু-চার কথা বলা আবশ্যক। এ জাতীয় লাইব্রেরী নিতান্ত আধুনিক, এবং এর জন্মস্থান হচ্ছে ইউ-রোপ। লাইব্রেরী পুরাকালেও ছিল এবং সম্ভবত বিপুল আয়তন-সম্বলিত ছিল। সেকালের একটি লাইব্রেরীর অর্থাৎ Alexandriaর লাইব্রেরীর নাম আমরা সকলেই শুনেছি। মিশরের মুসলমান বিজেতারা তার অগ্নিসংকার করে সে লাইব্রেরীকে অমর করে গিয়েছেন। আমার বিশ্বাস এদেশেও পুরাকালে হিন্দু রাজারা সাগ্রহে পুস্তক সংগ্রহ করতেন। কারণ অদ্যাবধি অনেক হিন্দুরাজার রাজপ্রাসাদে অতিকায় লাইব্রেরীর সাক্ষাৎ মেলে। এবং বহু সংস্কৃত গ্রন্থ যা আমরা ছাপার অক্ষরে দেখতে পাই—সে সব হিন্দু রাজার পুস্তকালয় থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সব লাইব্রেরীরই ছিল আসলে private library.

কি উদ্দেশ্যে হিন্দুরাজারা এই পুস্তক সংগ্রহ করতেন তা বলা কঠিন। হিন্দু রাজারা ছিলেন সব ক্ষত্রিয়— ব্রাহ্মণ নন। অধ্যয়ন অধ্যাপনা তাঁদের জাতিধর্ম্ম কিম্বা কুলধর্ম্ম ছিলনা। সুতরাং তাঁরা আর যে কারণেই পুস্তক সংগ্রহ করুন পড়বার জন্য যে তা করতেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে। অবশ্য এই রাজারাজড়ার মধ্যে কেউ কেউ কাব্যানুরাগী ছিলেন, কিন্তু পুস্তক সকলেই সংগ্রহ করতেন।

সে কালে লোকের পুস্তকের প্রতি অনুরাগ না থাক্ পুঁথির উপর ভক্তি ছিল। পুঁথি সংগ্রহ করা খুব সম্ভবতঃ সে কালে একটি বিশেষ পুণ্যকর্ম্ম বলে গণ্য হত। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যা যে শক্তি, এ জ্ঞান মানুষের প্রাচীন যুগেও ছিল। সুতরাং সে যুগে রাজারাজড়ার দল পুস্তক সংগ্রহ করতেন বোধ হয় যুগপৎ পুণ্য অর্জ্জন ও শক্তি সঞ্চয় করবার জন্য। সে যাই হোক, সে কালের এজাতীয় লাইব্রেরীকে কিছুতেই একালের Imperial Libaray বলা যেতে পারে না, কারণ সে সকল লাইব্রেরী জনসাধারণের ব্যবহারে আসত না; সে কালে সরস্বতীর মন্দিরে প্রবেশ করবার অধিকার কেবল মাত্র দু'চারজন উপবীতধারীর ছিল।

আর লাইব্রেরী ছিল মঠেবিহারে। ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করবার জন্যই এ সব লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসব গ্রন্থের পঠন-পাঠন ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সে কালের গৃহস্থদের দল এই সকল শাস্ত্রীদের মুখে ধর্ম্ম-কথা শুনতেন, কিন্তু শাস্ত্রালোচনায় যোগ দেবার অধিকার বা শক্তি বোধ হয় তাঁদের ছিল না।

আর এ জাতীয় পুস্তক সংগ্রহের উপায় রাজাদের ছিল লুট ও ভিক্ষুদের ছিল ভিক্ষা।

স্থধু আমাদের দেশে নয় ইউরোপেও সে কালের সব লাইব্রেরীর মালিক ছিল হয় রাজা নয় monastery। এবং ইউরোপের রাজারাজড়াও পরস্পরের লাইব্রেরী লুটে নিয়ে যেতেন। এমন কি Napolean সেদিন অর্দ্ধেক ইউরোপ লুটে ফ্রান্সের পুস্তকাগার ও চিত্রশালার দেহ ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করেছেন। আর ধর্ম্মসঙ্ঘ মাত্রেরই ধর্ম্ম হচ্ছে পরের ধনে পোদ্দারী করা; তা সে সঙ্ঘ খৃষ্টসঙ্ঘই হোক্ আর বৌদ্ধসঙ্ঘই হোক্। একালে কিন্তু লাইব্রেরী স্থাপন গার্হস্থ ধর্ম্মের একটী অঙ্গ। কারণ বিদ্যাচর্চ্চা সম্বন্ধে আমাদের মনে এখন যুগান্তর ঘটেছে। একালে বিদ্যার কোনরূপ দুর্গ প্রস্তুত করবার প্রবৃত্তি আমাদের মনের কোনও কোণে নেই এবং তা করবার জন্য সেকালে মামুলি উপায় সকল অবলম্বন করবার শক্তিও নেই। একালে আমরা মনোজগতে জাতিভেদ মানিনে, সুতরাং কোনও শ্রেণীবিশেষের জন্য পুস্তক রচনা করা ও সংগ্রহ করা আমাদের মনঃপূত নয়।

আমাদের দেশে আজও বেশির ভাগ লোক অবশ্য নিরক্ষর কিন্তু এই বিরাট অজ্ঞতা আমরা প্রসন্ন মনে বিধির নিয়ম বলে গ্রাহ্য করতে পারিনে। কাউকে জীবনে নিঃস্ব দেখলে আমরা মনে ব্যথা পাই, অপর পক্ষে কাউকে মনে নিঃস্ব দেখলে আমরা মনে সোয়াস্তি বোধ করিনে। ফলে দেশে যাতে আর নিরক্ষর লোক না থাকে সে বিষয়ে আজ বহুলোকে সচেষ্ট। এমন কি আমরা নিম্নশ্রেণীর বালকদের জোর করে লেখাপড়া শেখানোরও পক্ষপাতী।

যে মনোভাব থেকে আমরা গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপনের প্রয়াস পাই, সেই মনোভাব থেকেই আমরা গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী স্থাপনের প্রয়াস পাই। সুতরাং এযুগে বহু লাইব্রেরীর প্রয়োজন আছে এবং এসব লাইব্রেরী আমাদের শিক্ষা ও সামর্থ্য অনুসারে গড়ে তোলা আমাদের কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে অবশ্য popular লাইব্রেরীর বিশেষ কোনও অবসর নেই—কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তাও আমাদের গড়ে তুলতে হবে। আজকের দিনে দেশে যার বিশেষ প্রয়োজন তা উচ্চশিক্ষার লাইব্রেরী নয়, নিম্নশিক্ষার লাইব্রেরী নয়, কিন্তু এ দুয়ের মাঝামাঝি গোছের লাইব্রেরী অর্থাৎ সেই জাতীয় পুস্তকসংঘ যা সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকার-বহির্ভূত নয়। এ-সব লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য স্বজাতিকে পণ্ডিত করা নয় মানুষ করা। এজাতীয় লাইব্রেরীর আর একটি বিশেষ কারণে বিশেষ প্রয়োজন আছে। আজকালকার স্কুলের শিক্ষায় আমরা তাদৃশ সন্তুষ্ট নই। কেন যে নই সেকথা বলতে হলে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর বিচার করতে হয়। এক্ষেত্রে তার অবসর নেই। আমি স্থধু আপনাদের এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—যে স্কুল কলেজের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের নিজের শিক্ষার জন্য নিজেদের উপর নির্ভর করতে হবে। এক কথায় এযুগে আমাদের self cultureএর নিতান্ত প্রয়োজন। দেশময় যদি আমরা লাইব্রেরী ছড়িয়ে দিতে পারি ত আমরা স্বজাতির এই self cultureএর সহায় হব।

আমি স্কুল কলেজ বন্ধ করবার বা ভঙ্গ করবার মোটেই পক্ষপাতী নই। নেই মামার চাইতে কানা মামা ভাল, এই যুক্তি অনুসারেই আমি বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অনুমোদন করি। আমাদের দেশের শিক্ষায়তন সব অন্ধ বলে আমি তাদের পঙ্গু করবার পক্ষপাতী নই, কারণ আমি আশা করি ভবিষ্যতে তাদের চোখ ফুটবে। কিন্তু বর্ত্তমান স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে আমরা যাতে নিজ চেষ্টায় সুশিক্ষিত হতে পারি তার একটা ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। এবং এই কারণেই আমি এই লাইব্রেরী-movementএর সর্ব্বান্তঃকরণে মঙ্গল কামনা করি। লোকশিক্ষার ভার এক হিসেবে সংবাদপত্র হাতে নিয়েছে। সংবাদপত্র কিন্তু সাহিত্যের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না, কারণ সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোকের মন তৈরী করা, আর সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য মত তৈরী করা। মন আর মত যে এক জিনিষ নয়, তার প্রমাণ মনের অভাব থেকেই অনেক ক্ষেত্রে মত জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ পরমত স্বমত হয়ে ওঠে। সুতরাং লাইব্রেরীর অভাব সংবাদপত্র পূরণ করতে পারে না। এযুগে আমরা যখন বিদ্যাচর্চ্চাটা লোকসামান্য করতে চাই এবং লাইব্রেরী-প্রতিষ্ঠা এই প্রচারকার্য্যের অন্যতম উপায় হিসাবে গণ্য করি তখন এযুগের লাইব্রেরীর সর্ব্বপ্রধান সার্থকতা হচ্ছে তা সর্ব্বসাধারণ হওয়ায়; অর্থাৎ পাবলিক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

ও প্রচারের প্রতিই আমাদের বিশেষ করে মনোনিবেশ করতে হবে।

পুরাকালে লোকে পুস্তকসংগ্রহ করত, হয়ত কৃপণের ধনের মত তা স্বগৃহে জমিয়ে রাখবার জন্য, কিন্তু একালের লাইব্রেরী-গঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে পুস্তক অপরকে ধার দেওয়া। এ অবস্থায় পুস্তক সংগ্রহ করার চাইতে পুস্তক distribute করার কৌশল আয়ত্ত করা কিছু কম প্রয়োজনীয় নয়।

পাবলিক লাইব্রেরীও আবার দুজাতির হয়—এক স্থাবর লাইব্রেরী আর জঙ্গম লাইব্রেরী। কলিকাতার Imperial library হচ্ছে স্থাবর লাইব্রেরীর একটি প্রকাণ্ড উদাহরণ। পাঠককেও লাইব্রেরীর দ্বারস্থ হতে হয় ও লাইব্রেরীর কোন পুস্তক নিজের গৃহস্থ করবার জো নেই।

অধ্যয়নপ্রবৃত্তি আমাদের অধিকাংশ লোকের মধ্যে এতটা প্রবল নয় যে তারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করে ও-জাতীয় লাইব্রেরীর সাধনা করবেন। ওরকম লাইব্রেরীতে যাওয়া একরকম স্কুলে যাওয়া। অথচ এ স্কুলে পাঠ করবার ফলে কোনও উপাধি পাওয়া যায় না। কেউ যদি চাকরির দরখাস্তে উল্লেখ করেন যে তিনি Imperial libraryতে অধ্যয়ন করেছেন সে দরখাস্ত নামঞ্জুর হতে বাধ্য। এই কারণে আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের লাইব্রেরী সকল প্রধানতঃ জঙ্গম লাইব্রেরী হওয়া কর্ত্তব্য। বইয়ের পিছনে যখন পাঠক ছুটবে না তখন পাঠকের পিছনে বইয়ের ছোটা কর্ত্তব্য। কিন্তু এর ভিতর একটা মহা বিপদ আছে। সংস্কৃত ভাষার একটি উদ্ভট শ্লোক বলে যে

"লেখনী পুস্তিকা রামা পরহস্তে গতা গতা
কদাচিৎ পুনরায়াতা ভ্রষ্টা মৃষ্টা চ চুম্বিতা"

লেখনী ও রামা সম্বন্ধে যাই হোক পুস্তক পরহস্তে গেলে যে প্রায়ই ফিরে আসে না—আর যদি বা আসে ত ভ্রষ্ট ও মৃষ্ট অবস্থাতেই আসে তার চাক্ষুষ প্রমাণ আমি চির জীবন পেয়ে এসেছি। সামাজিক লোকের বই জিনিষটের উপর মায়া বাড়ানো ছাড়া এ রোগের অপর কোনও ঔষধ নেই। কোন জিনিষ ছড়িয়ে দিতে হলে পূর্ব্বে তা জড় করতে হয়। লাইব্রেরীর প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে বই জড় করা। পুস্তক-সংগ্রহ নিজের জন্যই করি আর পরের জন্যই করি আমাদের সকলকেই পুস্তক সংগ্রহ করতে হবে। যিনি যে উদ্দেশ্যেই লাইব্রেরী করুন না কেন তাঁকে বই কিনতে হবে। ইংরাজীতে বলে beg, borrow or steal। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে পূর্ব্বোক্ত সব সহজ উপায় আমরা অবলম্বন করতে পারিনে। সুতরাং লাইব্রেরীর পিছনে একটা মস্ত অর্থ-সমস্যা রয়েছে। এ সমস্যার মীমাংসা প্রতি ব্যক্তিকে নিজে করতে হবে। যেখানে জনসাধারণের উপকারার্থ লাইব্রেরীর সৃষ্টি করা হয় সেক্ষেত্রে জনসাধারণের কাছ থেকেই তার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা যে কর্ত্তব্য সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। কি উপায়ে কি কৌশলে তা করা যায় তা আমার অবিদিত। সুতরাং এক্ষেত্রে আমি পুস্তক সংগ্রহের মূল ধর্ম্মের কথা উল্লেখ করতে চাই।

যাঁরা পুস্তক সংগ্রহ করেন তাঁরা যে সকলেই ধনী ব্যক্তি তা মোটেই নয় বরং তাঁদের ভিতর অনেকেই সামান্য অবস্থার লোক। আমি এই কলিকাতা সহরে একটি প্রাইভেট লাইব্রেরী জানি যা পুস্তকের ঐশ্বর্য্যে অদ্বিতীয়। অথচ যিনি এই গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর অর্থের সচ্ছলতা ছিল না। এর থেকে আমি অনুমান করছি পুস্তকের প্রতি পরাপ্রীতিই হচ্ছে পুস্তক সংগ্রহের প্রধান উপায়। যে প্রীতি ও যে উৎসাহের বলে ব্যক্তি-বিশেষ প্রাইভেট লাইব্রেরী গড়ে তোলে সেই প্রীতি ও সেই উৎসাহের বলেই লোকে পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে তুলবে। অর্থাৎ লাইব্রেরী মাত্রেরই পিছনে এমন লোক চাই যিনি পুস্তক সংগ্রহকে জীবনের ব্রত করে তুলেছেন। এ জাতীয় মন যাঁর আছে তাঁর হাতে অর্থ-সমস্যার মীমাংসা সহজেই হয়ে যাবে। সর্ব্বশেষে আমি একটি কথা বলতে চাই যে কথাকে সকলেই আমার মনের কথা বলে গ্রাহ্য করবেন। আমি বই লিখি সুতরাং যে উপায় অবলম্বন করলে দেশে বইয়ের প্রচার ও প্রচলন বাড়বে সে উপায়ের পক্ষপাতী হওয়া আমার মত লোকের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। লাইব্রেরীর তুল্য বইয়ের ব্যবসার দ্বিতীয় সহায় নেই। সুতরাং আপনাদের বর্ত্তমান প্রচেষ্টার আমি যে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি সে ত ধরা কথা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যদি কোনরূপ অত্যুক্তি করে থাকি ত তা আপনারা উপেক্ষা করবেন এই কথা মনে রেখে যে বইয়ের হয়ে ওকালতি করা আমার জাতি-ব্যবসা।

ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস

১৫

বিলাস প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া ফেলিয়াছিল যে জ্যোতি তার কাছে আসিয়াছিল। হাসিতে গলিয়া পড়িয়া সে বলিয়াছিল "জ্যোতি বলে, দাদাকে তুমি ছেড়ে দেও। হাঁ গো, বাবু মশায়, আমি কি তোমার হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছি ?"

ভূপতি শুনিয়া তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। সে অনেক কিছু সন্দেহ করিল—তা ছাড়া জ্যোতির এই অনধিকার চর্চ্চায় তার জ্যেষ্ঠত্বগৌরব প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সুরমা জ্যোতিকে তার সব গহনা দিয়া ফেলিয়াছে—ইহাতে ভূপতির প্রাণ জ্বলিতেছিল। গহনা যে তার হাতছাড়া হইয়াছে তাহাতে কোনও দুঃখ হইবার অবসর তার ছিল না—গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল তার অন্তরে একটা নিদারুণ অপমান বোধ, একটা অসহ্য ঈর্ষ্যার পীড়ন—আর নিদারুণ সন্দেহ। হিংসায় সে পুড়িতেছিল, রাগে জ্বলিতেছিল। সেখানে তাকে এত জ্বালা দিয়া আবার জ্যোতি আসিয়াছে বিলাসের কাছে ?—মনের আগুনে তার ঘৃতাহুতি পড়িল, সে রাগে ফুলিয়া উঠিল।

ইহার তিনদিন পরে জ্যোতি সকাল বেলায় তার আশ্রমে বসিয়া বিমলার সঙ্গে কথা কহিতেছিল, তখন এক পুলিস কর্ম্মচারী একজন কনষ্টেবল লইয়া তাহার সন্ধান করিতে আসিল। জ্যোতি বিস্মিত হইয়া বাহিরে গেল। দারোগাবাবু বলিলেন, জ্যোতির নামে ওয়ারেণ্ট আছে।

"ওয়ারেণ্ট! আমার নামে! কই দেখি।"

পুলিশকর্ম্মচারী ওয়ারেণ্ট দেখাইল। জ্যোতির মাথায় যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। নালিশ করিয়াছে ভূপতি, সুরমার গহনা ও কোম্পানীর কাগজ ঠকাইয়া লইয়া আত্মসাৎ করিবার অভিযোগ! হা বিধাতা! এও কি সম্ভব!

এক মুহূর্ত্তে আত্মস্থ হইয়া সে বিমলাকে বুঝাইয়া শান্ত করিয়া আশ্রমের ভার লইতে বলিল, তারপর দারোগাকে বলিল, "চলুন হাজতে, আমি প্রস্তুত।"

দারোগা হাসিয়া বলিল, "আপনাকে এখনই হাজতে যেতে হবে তার মানে নেই। ওয়ারেণ্টে হাজার টাকার জামিনের হুকুম আছে। আপনি জামিনের জোগাড় করুন।"

"হাজার টাকার জামিন! কোথায় পাব ?"

দারোগা বলিলেন, 'হাজার টাকা লাগিবে না, সামান্য কিছু টাকা খরচ করিলে পুলিশ কোর্টের অনেক উকিল জামিন হইতে প্রস্তুত হইবে।' বিমলা শুনিয়া বলিল, "দাদা তুমি একবার বিনোদ বাবুর কাছে যাও। তিনি যা বলেন তাই করো।" জ্যোতি বলিল, "এঁরা কি আর এখন আমার যেতে দেবেন—আমি যে এখন কয়েদী।"

দারোগা বলিলেন, "তা চলুন না আপনি যেখানে যেতে চান নিয়ে যাব। জামিনের বন্দোবস্ত করবার জন্য আপনাকে আমরা নিয়ে যেতে পারি।"

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

বিনোদের কাছে জ্যোতি গিয়া সব কথা খুলিয়া বলিল। বিনোদ রাগে ফুলিয়া উঠিল।

জ্যোতিকে জামিনে খালাস করিয়া আনিয়া বিনোদ বলিল, "এখন হ'ল তো! দাদার নামে নালিশ করবে না ব'লেছিলে, এখন দাদার দাদাগিরী দেখলে তো? যাক, যা' হ'বার হ'য়েছে, এখন নিজের বুদ্ধি ছেড়ে আমার বুদ্ধি অনুসারে তোমার চলতে হবে। আজই ভূপতির নামে তুমি নালিশ ক'রে দেও তোমার নাম জাল ক'রে হুণ্ডী কেটেছে সে, আর তোমার সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে টাকা আত্মসাৎ ক'রেছে। এই নালিশ হ'লে ভূপতি আপোষ ক'রতে পথ পাবে না।"

জ্যোতি বলিল, "কেন বিনোদ দা, এ নইলে কি আমার মোকদ্দমায় আমি খালাস পেতে পারবো না?"

"তা পাবে কিন্তু ভূপতি তাতে বাধ্য হবে না। ওকে একবার কাবু ক'রে তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করাতে হ'বে—তা ছাড়া"—

"মাপ ক'রবেন দাদা, তবে আমাকে ও আদেশ ক'রবেন না। দাদা যা ক'রেছেন, সে তিনি নেহাৎ পাগল হ'য়ে গেছেন ব'লে ক'রেছেন। আমি তো পাগল হইনি।"

"না, পাগল তুমি নও, আস্ত একটি ছাগল। বাপু, মোকদ্দমায় পড়েছ, উকীলের বুদ্ধি শোন। আদালতে এসে তোমার গীতা আর হিতোপদেশ বন্ধ ক'রে আদালতের সংহিতা গ্রহণ কর। ও সব চলবে না। নালিস তোমার ক'রতে হবে।"

"না দাদা, সে হবে না। আচ্ছা আপনার উকীল সংহিতার কথাই ধরুন, নালিশ যদি আমি করি, তবে প্রমাণ ক'রবো কি ক'রে? আমার তো এসব শোনা কথা, সাক্ষী পাব কোথায়? তা ছাড়া ও আমি ক'রবোই না—ও কথা রেখে দিন।"

"সাক্ষীর জন্যও ঠেকবে না, প্রমাণও পাওয়া যাবে। হুণ্ডী দিয়ে যে টাকা নিয়ে এসেছে, সেই এককড়ি নিজে সাক্ষী দেবে—সে নিজে আমাকে সে হুণ্ডীখানা দিয়ে গেছে। আমার মক্কেল, যিনি হুণ্ডীতে টাকা দিয়েছিলেন, তিনি হুণ্ডী প্রমাণ ক'রবেন!"

জ্যোতি বিস্মিত হইয়া বলিল "এক কড়ি,—দাদার পাচাটা সেই কুকুরটা!"

"আশ্চর্য্য হচ্ছ তা ও সব কুকুরদের অভ্যাসই এই। এখন দেখেছে যে তোমার দাদার শাঁস ফুরিয়েছে; এখন সেই জাল হুণ্ডী তোমাকে দিয়ে কিছু পয়সা উপায়ের চেষ্টা হচ্ছে।"

"দেখুন বিনোদ দা, যদি আমার দাদার নামে নালিশ করবার এক ফোঁটা ইচ্ছেও থাকতো, তবে এই কথাতেই আমি ফিরে যেতাম। ওই নরকের কীটটাকে পয়সা দিয়ে কিনে, তার সাক্ষী দিয়ে মামলা প্রমাণ করার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া যে ভাল।"

বিনোদ হাসিয়া বলিল, "দেখ ও সব শুচিবাই থাকলে মামলা করা চলে না"—

জ্যোতি হাসিয়া বলিল, "কে চাচ্ছে মামলা ক'রতে দাদা। ও কথা ছেড়ে দিন, ও আমার দ্বারা হবে না। এখন আমার মামলায় আত্মরক্ষা করবার জন্য কি ক'রতে হবে তাই বলুন।"

"সব চেয়ে ভাল ডিফেন্স হ'ত এই পাল্টা মামলা। তা' যদি নাই কর তবে তোমার সাক্ষী জোগাড় ক'রতে হবে। হাঁ ভাল কথা, তোমার বউদি কি ক'রবেন বল দেখি? ভূপতি কি তাঁকে হাত ক'রতে পেরেছে ব'লে মনে হয়?"

"বউদি! কি বলছেন দাদা?"

"তোমার বউদিই তো প্রধান সাক্ষী—তাঁর সাক্ষ্য ছাড়া তো মামলা দাঁড়াবেই না। ভূপতি যদি তাঁকে না ডাকে তবে তোমার তাঁকে মানতে হবে। আর তোমরা কেউ যদি না মান তবু হয়তো কোর্ট তাঁকে ডাকতে পারে।"

জ্যোতি স্তম্ভিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া খানিকক্ষণ পায়চারী করিল। কিছুক্ষণ পর সে বলিল—"তাঁর সাক্ষী নেবার জন্য হাকিম আমাদের বাড়ী যাবে?"

"ক্ষেপেছ, ফৌজদারী মোকদ্দমা, পুলিস কোর্ট! তাঁকে কোর্টে এসে সাক্ষী দিতে হবে।"

অস্থির ভাবে জ্যোতি আবার খানিক পায়চারী করিয়া বলিল, "আপনার কি মনে হয় দাদা বৌদিকে কোর্টে আনবেন সাক্ষী দিতে।"

"নিশ্চয়; তা নইলে মোকদ্দমা তার দাঁড়ায় কোত্থেকে? এখন একমাত্র উপায় যদি বৌদি তোমার দিকে টেনে সাক্ষী দেন।"

"আচ্ছা আমি যদি কবুল জবাব দি, তবু বউদিকে আদালতে আসতে হ'বে?"

অবাক্ হইয়া বিনোদ জ্যোতির দিকে চাহিয়া রহিল। শেষে সে বলিল, "ক্ষেপেছ! কবুল জবাব দেবে কি? তা'হলে অন্ততঃ দুটি বচ্ছর জেল হ'বে তোমার। এমন নাহোক কষ্ট করা—আমি বলছি—ধর্ম্ম কিছুতেই নয় অধর্ম্ম।" "কিন্তু তা' হ'লে বউদিকে সাক্ষী দিতে হবে না তো।" "তা'ও হ'বে। তোমার জবাব পরের কথা। আগে ফরিয়াদীর সাক্ষী না নিয়ে হাকিম তোমার কথা শুনবেই না।"

"তবে—তাইতো! তা'হ'লে কি করা যায়?"

"করা যায় যা আমি বলছিলাম। তুমি যদি পাল্টা নালিশ কর তোমার দাদার নামে, তবে ভূপতি আপোষে মোকদ্দমা তুলে নেবে, তোমার বউদিকেও সাক্ষী দিতে হবে না। নইলে আর কোনও উপায় নেই। একবার তোমার বউদিকে ধ'রে দেখতে পার তিনি তোমার পক্ষে বলবেন কি না।"

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া জ্যোতি ভাবিল। তার পর সে বলিল, "দাদা আমাকে দুই হাজার টাকা ধার দিতে পারেন এখন?"

"তা পারি, কিন্তু কেন? কি ক'রবে?"

"আমার একটা দেনা শোধ ক'রতে হ'বে—আজকেই চাই।"

বিনোদ বিস্মিত হইল। হঠাৎ এ প্রসঙ্গে একথা কেন উঠিল কিছু বুঝিতে পারিল না। কিন্তু পাছে এ সম্বন্ধে বেশী জিজ্ঞাসা করিলে জ্যোতি কিছু মনে করে, সেইজন্য আর কোনও কথা না বলিয়া দুই হাজার টাকার একখানা চেক লিখিয়া দিল। চেকখানা জ্যোতির হাতে দিয়া সে বলিল:—কিন্তু একটা কথা রইলো, এ মোকদ্দমা সম্বন্ধে তুমি আমার পরামর্শ ছাড়া কোনও কিছু ক'রতে পারবে না।"

জ্যোতি নতমস্তকে বলিল, "মামলার ভার তো আপনারই রইলো দাদা, আমি আর এর কি ক'রবো। সুধু দাদার নামে আমি নালিশ করবো না এই পর্য্যন্ত।"

* * *

এদিকে জ্যোতিকে পাঠাইয়া দিয়া বিমলা একখানা গাড়ী ডাকাইয়া কমলাকে লইয়া গেল সুরমার কাছে।

সুরমা তাদের কাছে মোকদ্দমার কথা শুনিয়া একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। অনেক দুঃখ সে পাইয়াছে, রাগও সে অনেক দিন করিয়াছে, কিন্তু এমন রাগ তাকে কেউ কখনও করিতে দেখে নাই। তার মুখ চোখ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বিমলা ও কমলা ভয় পাইয়া গেল।

বিমলাকে সুরমা বলিল, "কোনও ভয় নেই, তোমরা যাও। আমি ব্যবস্থা করবো।"

সেদিন বৈকালে ভূপতি বাড়ী ফিরিল। আগের দিন রাত্রে তার বাড়ী ফিরিবার অবকাশ হয় নাই।

সুরমার অন্তর তখনও রাগে গর্জ্জন করিতেছিল। স্বামীর শব্দ পাইয়া তার অন্তর সিংহীর মত ফুলিয়া উঠিল। সে বাহিরের ঘরে গিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন তার মূর্ত্তি স্থির, অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, বর্ষা ও শ্রাবণের বিজলীভরা নিথর মেঘের মত।

সুরমা ধীরকণ্ঠে বলিল, "তুমি ঠাকুরপোর নামে নালিশ ক'রেছ!"

ভূপতি তার দিকে চাহিতে পারিল না। সে হঠাৎ আলমারীর বইগুলি নাড়িতে চাড়িতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল—নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে, অগ্রাহ্যের সুরে বলিল, "হাঁ করেছি।"

"আমার গয়না আর কোম্পানীর কাগজ ঠকিয়ে নিয়েছে ব'লে?"

ভূপতি তেমনি ভাবে অন্যদিকে চাহিয়াই বলিল, "হাঁ।"

"তুমি জান তা আমি তাকে নিজে ইচ্ছা ক'রে দিয়েছি; সে চায়ও নি?"

ভূপতি বই ছাড়িয়া হঠাৎ নিজের সজ্জা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বলিল, "জানি।" জুতার ধুলাটা সে কোঁচা দিয়া ঝাড়িতে লাগিল।

সতী

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

"তবে কি ব'লে এই মিথ্যা মোকদ্দমা ক'রেছ শুনি?"

"মোকদ্দমা মিথ্যে নয়, সত্যি। ওই যে আশ্রম টাশ্রম ভাবছ, ওসব কিছু নয়।"

"তা নয় কি না, সে কথা খোঁজ করবার তোমার কি অধিকার? জিনিষ আমার, আমি তাকে দিয়েছি—কেন দিয়েছি সে আমি জানি। তুমি তার একটি পয়সা আমায় দেওনি। তুমি এনিয়ে কথা তোল কি অধিকারে?"

এইবার ভূপতি মুহূর্তের জন্য সুরমার দিকে চাহিল, বিদ্রূপের তীব্র হাসি হাসিয়া সে বলিল, "আইনে বলে সামান্য একটু অধিকার আছে আমার। আমি তোমার স্বামী কিনা! তুমি হয়তো সে কথা ভুলে গেছ কিন্তু আইন ভোলে নি।"

সুরমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে রাগে আর কথা বলিতে পারিল না।

ভূপতি তখন অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, "যাকগে, শোন, আমি শুধু মামলা ক'রেছি তাই নয়, এতে তোমার সাক্ষী দিতে হবে।"

হঠাৎ দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিয়া সুরমা বলিল, "হাঁ দেব সাক্ষী আমি—আদালতে গিয়ে তোমার মুখের উপর আমি ব'লে আসবো তুমি মিথ্যাবাদী—বলবো জ্যোতির বিষয় তুমি ঠকিয়ে নিয়েছ—সব কথাই বলবো। এতদিন বুকের ভিতর কথা চেপে চেপে হয়রাণ হ'য়ে গেছি। এবার জগতের কাছে ঢাক পিটিয়ে বলে আসবো তোমার কীর্ত্তির কথা।"

ভূপতি গম্ভীরভাবে মাটির দিকে চাহিয়া বলিল, "তা ক'রতে তুমি পার। তাতে যে আমার হাতে হাতকড়ি পড়বে তাতে তুমি খুশী বই দুঃখিত হবেনা একথা আমি উকিলকে ব'লেছিলাম। তাতে তিনি কি ব'লেছেন জান? তা' হ'লে তিনি তোমাকে জেরা ক'রবেন। আর জেরায় বেরুবে যে আমি জ্যোতিকে বের ক'রে দিয়েছি বাড়ী থেকে আর তুমি তাকে আমার অসাক্ষাতে আদর ক'রে এনে গয়না দিচ্ছ, টাকা দিচ্ছ। আরও কত কিছু ক'রছ। কাজেই বুঝতে পারছো, ঢাক বাজবে বটে, কিন্তু সেটা তোমার সতীপণার! মোকদ্দমায় আমার কিছুই ক্ষতি হবে না।"

অধৈর্য্যের শেষ সীমা উত্তীর্ণ হইয়া সুরমা একটা অনৈসর্গিক প্রশান্ততা লাভ করিয়া বলিল, "দেখ আমি নিজের সতীত্বের ঢাকও পিটাই না, আর কোনও কাপুরুষ যদি আমি অসতী ব'লে ঢাক পিটায় তাতেও ভয় পাই না। লোকের মুখ চেয়ে যারা সতী হয় আমি সে মেয়ে নই। তোমার যা খুসী ক'রো।"

বলিয়া মুখ ঘুরাইয়া সুরমা ভিতরের দিকে চলিল, আর সে সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না।

"যেওনা বউদি, দাঁড়াও!" বলিয়া জ্যোতি আসিয়া ঘরে ঢুকিল। ভূপতি ভয়ানক চমকাইয়া উঠিল, সুরমাও বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া মুখ ফিরাইল।

জ্যোতি শান্তভাবে বলিল, "দাদা, তুমি আমার নামে নালিস ক'রেছ, বউদির গয়না কখানা আর কোম্পানীর কাগজ কখানার জন্য? আর এই সামান্য টাকার জন্য তুমি নাকি বৌদিকে আদালতে নেবে সাক্ষী দিতে? আমাকে বল্লেই হ'ত—এত কেলেঙ্কারী করতে হত না। যা'ক, ভগবান রক্ষে করেছেন যে, আমি এগুলো বেচি নি, সুধু কতক বাঁধা দিয়ে টাকা ধার ক'রেছিলাম। এই নাও বৌদি, তোমার গয়না আর কোম্পানীর কাগজ।"

বলিয়া সে সেগুলি পাষাণ মূর্ত্তির মত স্তব্ধ সুরমার পদতলে রাখিল। বিনোদের কাছে দুই হাজার টাকা ধার করিয়া সে এগুলি উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিল। তার পর সে বলিল, "দাদা, এখন আমায় মারো কাটো জেলে দাও, কোনও আপত্তি নেই—আমার মনে আর কোনও গ্লানি রইলো না। আমার সুধু একটা মিনতি, বৌদিকে সাক্ষী মেন না—আমি কবুল জবাব দেব, কথা দিচ্ছি আমি।"

ভূপতি ও সুরমা দুজনেই স্তব্ধ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কেহ কোনও কথা বলিল না। সুরমার পায়ের তলায় গহনার পুঁটুলী ও কোম্পানির কাগজগুলি পড়িয়াই রহিল।

জ্যোতি কিছুক্ষণ দুজনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তার পর সে নিঃশব্দে মুখ ফিরাইয়া পায় পায় দুয়ারের দিকে চলিল। তখন সুরমা তীব্রকণ্ঠে বলিল, "যেওনা ঠাকুরপো।"

জ্যোতি ফিরিল।

জ্যোতিকে সুরমা বলিল, "এগুলো আমি ফিরে নেবো ব'লে তোমায় দিই নি। তবে যে এগুলো ফিরে দিয়ে তুমি আমায় অপমান ক'রছ বড় ?" তারপর জ্বালাময় দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া সে বলিল, "আর তুমি—তুমি দাঁড়িয়ে সুধু দেখছো। অপমানে, লজ্জায় ম'রে যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে না ? ভাল চাও তো তুমি নিজে হাতে ক'রে এসব তুলে জ্যোতিকে দাও। নইলে,—অনেক সয়েছি—এ অপমান সয়ে আর আমি তোমার বাড়ীতে থাকবো না।"

ভূপতি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ বৃথা প্রতীক্ষায় কাটাইয়া সুরমা কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "বেশ! ঠাকুরপো, তোমার এগুলো দরকার না থাকে, বাইরে গিয়ে নর্দ্দমায় ফেলে দাও। বস্, চুকে যাক্।"

তারপর সুরমা চাকরকে ডাকিয়া বলিল, "একখানা গাড়ী ডেকে আন, খোকাবাবুকে ওপর থেকে নিয়ে আয়।"

চাকর বলিল, "কোথায় যাবে গাড়ী ?"

"শিয়ালদহ রেল।" চাকর একটু ইতস্ততঃ করিয়া উপরে চলিয়া গেল খোকাকে আনিতে। সুরমা তখন নত হইয়া ভূপতিকে প্রণাম করিয়া বলিল, "চল্লাম, এ জন্মের মত এই শেষ জন্মান্তরে যেন আর দুঃখ দিও না। জ্যোতি তুমি আমাকে বাপের বাড়ী রেখে এসো।" বলিয়া এতক্ষণে সুরমা হঠাৎ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। চক্ষের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুর বন্যা সে চাপা দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু অশ্রু বাধা মানিল না, মাটির উপর পড়িয়া মাটিতে মুখ লুকাইয়া সে ভয়ানক কাঁদিতে লাগিল।

ভূপতি তবু দাঁড়াইয়া রহিল—মাটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর হঠাৎ ধপ করিয়া ভূমি হইতে গহনার পুঁটুলী এবং কোম্পানীর কাগজগুলি তুলিয়া সে জ্যোতির হাতের ভিতর গুঁজিয়া দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

১৬

বিনোদ মনে ভাবিল, এ মোকদ্দমায় জ্যোতিকে মুক্ত করা কঠিন হইবে না বোধ হয়, কিন্তু তবু এই মোকদ্দমা লইয়া প্রকাশ্য আদালতে কেলেঙ্কারী নিবারণ করাটা তার কাছে নিতান্ত আবশ্যক মনে হইয়াছিল। তাই সে জ্যোতিকে দিয়া পাল্টা মোকদ্দমার প্রস্তাব করিয়াছিল—তার আশা ছিল, এই মোকদ্দমা রুজু করিলেই ভূপতি ভয় পাইয়া মোকদ্দমা তুলিয়া লইবে। নহিলে আদালতে মোকদ্দমা চলিলে সুরমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইবে, এবং সাক্ষীর কাঠগড়ায় ভূপতি ও সুরমাকে দাঁড় করাইলে, কত কি কেলেঙ্কারীর কথা যে উঠিবে তার ঠিকানা নাই। তাই জ্যোতি যখন কিছুতেই সে পথে ভিড়িল না তখন বিনোদ চিন্তিত হইয়া উঠিল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে সন্ধ্যাবেলায় ভূপতির সন্ধানে চলিল। সন্ধ্যাবেলায় যে ভূপতিকে বাড়ীতে পাওয়া যাইবে না—আজকাল কখনই তাকে বাড়ীতে দেখা যায় না—সেকথা সে জানিত। তবু বাড়ীতে চাকরের কাছে একবার খোঁজ লইয়া সে সোজা চলিয়া গেল বিলাসের বাড়ীতে।

তাই জ্যোতি যখন সন্ধ্যাবেলায় বিনোদের সঙ্গে দেখা করিয়া তার সেদিনকার কাজের কথা বলিতে গেল, তখন সে বিনোদকে বাড়ীতে পাইল না।

ভূপতি যখন বাড়ী গিয়াছিল, তখনই সে কিছু মদ খাইয়া গিয়াছিল। সে গিয়াছিল সুরমাকে সাক্ষ্য দিবার জন্য অনুরোধ করিতে,—অনুনয় ও মিনতিতে যদি না হয় তবে সুরমাকে শাসন করিতে। সে জানিত যে সুরমা এ কথায় চটিবে, তাকে তিরস্কার করিবে। তার সে ক্রোধ ও তিরস্কার ভূপতি সুস্থ অবস্থায় সহিতে পারিবে না, তাতে সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে। এই সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া একটু সাহসের সহিত সুরমার সঙ্গে আজ কথা কহিতে হইবে—তাই সে দুই পেগ হুইস্কি খাইয়া সুরমার সম্ভাষণে গিয়াছিল।

ব্যাপারটা যেরকম দাঁড়াইয়া গেল তাতে তার দুই পেগের নেশায় কুলাইল না। সুরমার সিংহীমূর্ত্তি দেখিয়াই তার হুইস্কী-রচিত সাহস উপিয়া গিয়াছিল। তারপর যখন তারই পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া উঠিয়া শেষে অশ্রুত্যাগ করিল, তখন ভূপতির আপনাকে একটা কেঁচোর মত মনে হইল। সে ভীরুর মত সুরমার আদেশ নিঃশব্দে পালন করিল—আর সুরমার চোখের সামনে দাঁড়াইবার সাহস তার রহিল

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

না। সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া সোজা গেল একটা হোটেলে। তার মনের বর্ত্তমান অবস্থায় একমাত্র হুইস্কি ছাড়া সে আর গত্যন্তর দেখিল না।

যথেষ্ট পরিমাণে মদ্য উদরস্থ করিয়া সে টলমল করিতে করিতে বিলাসের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

ভূপতির মত্ত অবস্থা দেখিতে বিলাস অভ্যস্ত—সে ইহা পছন্দ করে না, তবে ইহার প্রতি তার খুব অসাধারণ ঘৃণাও ছিল না। কেননা এমনি মাতাল সে জীবন ভরিয়া দেখিয়াছে, ইহাদের সে নিত্য নাড়াচাড়া করিয়াছে। মাতালকে দেখিয়া ঘৃণার চেয়ে কৌতুকই সে বরাবর অনুভব করে। কিন্তু আজ তার ভূপতিকে দেখিয়া একটা দুর্নিবার অসহ্য ঘৃণা হইল। তার মনে ভাসিয়া উঠিল ভূপতির পাশে অনেকটা এই রকমই আর একখানা মূর্ত্তি—জ্যোতির! তুলনা করিয়া তার মন একটা দারুণ বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল।

বিলাস সজ্জিত হইয়া ভূপতির প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিল, সে আসিলে তার সঙ্গে রিচার্সালে যাইবে। ভূপতি যখন আসিল তখন সে বুঝিল আজ রিহার্সাল এই পর্য্যন্তই। দারোয়ান ও চাকর ভূপতিকে ধরিয়া উপরে আনিল। অন্যদিন বিলাস অগ্রসর হইয়া গিয়া তার সাহায্য করে—আজ সে নড়িল না। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া সে ভৃত্যদের আদেশ দিল ভূপতিকে খাটের উপর শোয়াইয়া দিতে। তারপর, ভূপতিকে সম্পূর্ণ বেঁহুস দেখিয়া তার মাথায় জল ঢালিয়া তাকে সুস্থির করিবার বন্দোবস্ত করিল।

মাথায় জল পড়িতে ভূপতি নানারকম চীৎকার আরম্ভ করিল। "চোপরাও—শ-শূয়ার—বাবা—সাক্ষী দেবে—মেয়ে মানুষ সাক্ষী দেবে—জুতো মেরে তাড়াব—জুতো মারবো—এই খবরদার—জল দিস্‌নে—চোপরাও—এঃ সতী!—সতীরাণী—সোয়ামীর হাতে হাতকড়ি দেবেন সতী—রোস, দেখে নিচ্ছি—মরদের বাচ্ছা আমি—এই সবুর—আবার জল?—নিকালো শূয়ার।"

বিলাস পাশের ঘরে বসিয়া মত্তের বিকৃত কণ্ঠের এই প্রলাপ শুনিতে লাগিল। তার প্রত্যেকটা বর্ণ বিলাসের মনে একটা বিরাগের সাগর উদ্বেলিত করিতে লাগিল।

সে বসিয়া ছিল একটা আরসীর সামনে। আরসীর ভিতর তার রূপ ও সজ্জার দিকে সে চাহিল। এই সজ্জা সে করিয়াছে এই জানোয়ারটার জন্য! মনে হইল সাজ তার সার্থক হইত যদি এ ভূপতি না হইয়া জ্যোতি হইত। কি রূপ তার, কি জ্যোতিঃ—কি অপূর্ব্ব মহান সে—। জ্যোতির মূর্ত্তির প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি, তার প্রত্যেক কথার ভঙ্গী, প্রত্যেকটি অক্ষরের উচ্চারণ তিল তিল করিয়া সে স্মরণ করিল। ভূপতির মত্ত প্রলাপের পাশে সেগুলি অপরূপ সুষমায় ভরিয়া ফুটিয়া উঠিল।

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস তার অন্তর ভেদ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

ভূপতি যখন কতকটা সুস্থ হইল তখন সে বিলাসকে ডাকিল। বিলাস উঠিয়া তোয়ালে দিয়া ভূপতির মাথা মুছাইয়া, চিরুনী বুরুশ লইয়া তার মাথা আঁচড়াইয়া দিল। ভূপতি উঠিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিল।

বিলাস বলিল, "আজ আবার কোথায় মরতে গিয়েছিলে? ক পিপে খেয়েছ আজ?"

ভূপতি বলিল, "হাঁ বিলাস, মরতেই গিয়েছিলাম, আমার চিরদিনের মরণের কাছে গিয়েছিলাম। আজ যে আমি মদ খেয়েছি, সে বড় দুঃখে।"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি। দুঃখ ছাড়া কবেই বা তুমি খাও? রোজই তো শুনি বড় দুঃখ হ'য়েছিল—কেবল এমনি দুঃখটা একদিন দু'দিন অন্তরই হয় এই যা। আজ আবার কি দুঃখু হ'ল?"

"আমাকে ঠাট্টা ক'রো না বিলাস, আমি সত্যি বড় দুঃখী। তোমার মত মেয়েমানুষের ভালবাসা পেয়েছি—এই আমার সুখ,—নইলে গলায় দড়ি দিতাম। আজ সুরমা আমাকে বড় অপমান ক'রেছে।"

বিলাসের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। সুরমার নাম সে সহ্য করিতে পারিত না, আর সে যে রোজ রোজ ভূপতিকে অপমান করে ইহার জন্য তার প্রতি বিলাসের একটা ক্ষমা-শূন্য আক্রোশ ছিল।

খুব ঝাঁঝাল কথায় সে বলিল, "তবু তো যাও মরতে। পুরুষ মানুষ তুমি, লজ্জা করে না

একথা বলতে ?—যে মেয়েমানুষ রোজ তোমার অপমান ক'রছে তার পায়ের তলায় বার বার গিয়ে পড়তে ঘেন্না করে না ?"

ঝি আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, একজন বাবু এসেছে"—ভূপতি উৎকর্ণ হইয়া উঠিল—বাবু বিলাসের কাছে! বিলাস তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—বাবু! জ্যোতি কি ? ঝি বলিল "বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রতে চায়।"

বিলাস ভাবিল, নিশ্চয় জ্যোতি, সেদিন ভূপতির দেখা পায় নাই তাই আজ আসিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি বলিল, "বসবার ঘরে গিয়ে বসাগে যা।"

ভূপতি বলিল, "কে বাবু ? আজ আমার কারও সঙ্গে দেখা করবার ফুরসৎ নেই।"

বিলাস বলিল, "কে এসেছে জানা নেই শোনা নেই বলে ফুরসৎ নেই। তুই বসাগে তাকে, না হয় তুমি না যাও আমি গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে আসবো।"

ভূপতি বলিল, "না, না, যেই হোক আজ নয়, কাল আসতে বলে দে।"

ঝি বলিল, "বাবু বল্লে খুব জরুরী দরকার, এখুনি না দেখা ক'রলে নয়।"

বিলাস বলিল, "শুনছো—যা' তুই বসাগে।"

ভূপতি বলিল, "কে বাবু ?"

"নাম সে বল্লে না। বাবু বেশ কালোপানা লম্বাটে, গোঁফ আছে—একখানা বড় মটর গাড়ী চড়ে এসেছে।"

বিলাসের মন দমিয়া গেল—জ্যোতি নয় তবে।

ভূপতির কালো লম্বা ও গোঁফওয়ালা যত লোকের কথা মনে পড়িল ; সবার কথা ভাবিয়া সাব্যস্ত করিল তার এটর্ণী আসিয়াছে। তখন সে বলিল, "যা নিয়ে বসা গে।"

বিনোদ আসিয়া ড্রইংরুমে বসিল। ভূপতি বিরক্তভাবে টলিতে টলিতে সে ঘরে প্রবেশ করিয়া তাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, একটু অপ্রস্তুতও হইল। বিনোদকে ভূপতি কতকটা সুরমার মতই ভয় করিত, কেন না বিনোদের কথাগুলি সোজা সোজা এবং তার ঝাঁজ যথেষ্ট আছে।

ভূপতি বিস্মিত হইয়া বলিল, "বিনোদ ! তুমি এখানে ?"

বিনোদ বিরক্ত হইয়া বলিল, "দায়ে পড়ে আসতে হ'ল, নইলে সাধ ক'রে এ নরকে আমি আসি নি।"

"তা তুমি আমার বাড়ীতে গেলেই পারতে।"

"যেন তোমার বাড়ীতে গেলে হামেসাই তোমার সঙ্গে দেখা হয়! থাকগে ও সব বাজে কথা রাখ। যে দরকারে আমি এসেছি সেটা যত শীঘ্র সেরে ফেলতে পারি তাই ভাল। এখানকার হাওয়ায় আমার দম আটকাচ্ছে। শোন, তুমি জ্যোতির নামে নালিস করেছ ?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভূপতি বলিল, "সে তুমি অবিশ্যিই জান, ওকথা জিজ্ঞেস ক'রে আর সময় নষ্ট কর'ছো কেন ?"

"বেশ, তোমার সময়ের দাম দেখছি বড্ড বেশী। সুতরাং সময় নষ্ট করবো না। এখন কথা হ'চ্ছে এই যে, কাল তোমার মোকদ্দমাটি তুলে নিতে হবে—ও চলবে না।"

"উত্তর চাও ? আমি তুলে নেবো না, তাকে জেলে দেব আমি। বস্।"

"মিথ্যে মামলা ক'রে ভাইকে জেলে দিতে পারলে তুমি তা ক'রবে—এতখানি উন্নতি তোমার হ'য়েছে তা আমি জানি। কিন্তু আমি বলছি, তুমি পারবে না। কবে তোমার স্ত্রী তাকে গয়না আর কোম্পানীর কাগজ দিয়েছেন—আজ ছ বচ্ছর সে কথা জেনে তারপর নালিশ ক'রে তুমি তাকে জেলে দেবে এ কথা যে উকীল তোমায় বুঝিয়েছে সে জোচ্চোর। তা ছাড়া কোনও প্রমাণই তুমি দিতে পারবে না। মাঝখান থেকে তোমার স্ত্রীকে আদালতে সাক্ষীর কাটগড়ায় দাঁড় করিয়ে কেলেঙ্কারীর একশেষ ক'রবে। তুমি জাহান্নমে যাও তাতে আমার কিছু বলবার নেই, কিন্তু তোমার স্ত্রীর এমন অমর্য্যাদা আমি হ'তে দেব না।"

ভূপতির নেশার ঝোঁক তখন সম্পূর্ণ কাটে নাই। সে ভ্রূভঙ্গি করিয়া হাসিয়া বলিল, "ইস্, বড় যে দরদ দেখি ! পরের স্ত্রীর প্রতি অত দরদ ভাল নয়।"

"তুমি নরকের কীট—তাই এমনি কথা মুখে আনছো তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে! এক ফোঁটা মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট নেই কি তোমার ? ভাইকে না হয় জেলে দেবে—কিন্তু এতবড় সম্মানিত বংশের বউকে পুলিশ কোর্টে দাঁড় করাবে, এতে

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

তোমার যে অপমান তাও কি বুঝতে পার না ?"

"আমার অপমান কিছু নেই—সুরমা কেউ নয় আমার—সে আঁস্তাকুড়ের ময়লা—সে আমায় অপমান করেছে।"

"যাক্, বুঝলাম এতে হবে না। তার জন্য আমি প্রস্তুত হ'য়েই এসেছি। এখন শোন, তুমি যদি মামলা চালাও তবে জ্যোতিও তোমার নামে নালিশ করবে" বলিয়া পকেট হইতে একখানা পুরাতন হুণ্ডী বাহির করিয়া ভূপতিকে দেখাইয়া সে বলিল, "এ হুণ্ডখানার কথা মনে পড়ে—এ সইটা তুমি জাল ক'রেছিলে ?"

ভূপতির মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। সে খাঁ করিয়া হাত বাড়াইয়া হুণ্ডীখানা ধরিতে গেল, বিনোদ তাহা সরাইয়া পকেটে পুরিল।

ভূপতি চীৎকার করিয়া বলিল, "চোর তুমি চোর—চুরী ক'রেছ এ হুণ্ডী।"

বিনোদ ধীরভাবে বলিল, "চুরীই করি আর যাই করি হুণ্ডীখানা আমার হাতে এসেছে—এটা জাল করবার অপরাধে জেলে যেতে যদি না চাও তবে জ্যোতির নামে মোকদ্দমা তুলে নাও।"

ভূপতির মাথা ঘুরিয়া গেল। তার হাত অন্যমনস্কভাবে পকেটে চলিয়া গেল। পকেট হইতে ফ্লাস্ক্ বাহির করিয়া সে ঢক্ ঢক্ করিয়া খানিকটা নির্জলা হুইস্কী গলায় ঢালিয়া দিল।

ফ্লাস্কটা পকেটে রাখিয়া সে বলিল, "কিন্তু আমি তোমার নামে হুণ্ডীচুরীর মোকদ্দমা করবো। ওর টাকা অনেক দিন শোধ ক'রে দিয়েছি—হুণ্ডী আমি ফেরত নিয়েছিলাম—তুমি সেটা চুরী ক'রেছ।"

"বেশ, ক'রো। তা' হ'লেই এ হুণ্ডী যে তুমি কেটে ছিলে তা প্রমাণ ক'রতে আর আমার বেগ পেতে হ'বে না, তুমি নিজেই তা প্রমাণ ক'রে দেবে।"

"ঠিক কথা—I don't care, বাজে ধমক দেখিয়ে আমাকে কাবু করবে ভেবেছ ? সে হ'চ্ছে না। হুণ্ডী যে আমি জাল করেছি তার প্রমাণ পাবে কোথায় ? সাক্ষী দেবে কে ?"

"ও: সাক্ষী! সাক্ষীর অভাব হবে না। সাক্ষী ঢের আছে।"

"ফো: বাজে কথা, ও হুণ্ডীজালের সাক্ষী কেউ নেই—যারা আছে তারা সাক্ষী দেবে না।"

"দেবে"—বলিয়া গম্ভীর ভাবে বিলাস আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

স্তম্ভিত বিনোদ ও ভূপতি তার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

বিলাস নারীসুলভ স্বাভাবিক কৌতূহলবশে আড়ি পাতিয়া কথা শুনিতে আসিয়াছিল। দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া সে প্রথমেই শুনিল ভূপতি জ্যোতির নামে নালিশ করিয়াছে। অমনি তার পা আঠার মত আটকাইয়া গেল, চক্ষুকর্ণময় হইয়া সে ইহাদের দেখিতে ও কথা শুনিতে লাগিল।

যতই সে শুনিল ততই ভূপতির উপর তার ক্রোধ ও ঘৃণা বাড়িয়া চলিল। শেষে সে আর সহ্য করিতে পারিল না, ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "কে সাক্ষী দেবে—আমি সাক্ষী দেব উকীল বাবু, আপনি আমার নাম নিন, বিলাসিনী দাসী।" তারপর সে ভূপতির উপর দৃষ্টিতে অগ্নিবর্ষণ করিয়া চাহিয়া বলিল, তোমাকে লোকে আবার বলে ভদ্রলোক—বড় লোক! জানোয়ারের অধম তুমি। অমন ভাই তোমার—তার বিষয় ঠকিয়ে খাচ্ছ—তার বিষয় বাঁধা দিয়ে তাকে পথের ভিখারী ক'রেছ—আবার তারই নামে মিথ্যে মোকদ্দমা! নিতান্ত হারামজাদা ছোটলোক নইলে এমন কেউ পারে!"

ভূপতি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "খবরদার! আমি তোকে খুন করবো।"

বিলাস ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "ও সব মর্দ্দানী ফলাও তোমার নিজের ঘরে গিয়ে। আমি ওসবের তোয়াক্কা রাখি নে, মাতাল জোচ্চোর কোথাকার।"

ভূপতি উঠিয়া দাঁড়াইল, বিলাস চীৎকার করিয়া বলিল, "খবরদার, এদিকে এগোবে কি মরবে—যাও বেরোও তুমি। আর ফের যদি এমুখো হ'বে তবে অপমানিত হবে। বেরোও বলছি—বেরোও বাড়ী থেকে।"

অচল পা দুখানি ভূপতিকে এদিক ওদিক কোনও দিকেই টানিয়া লইতে পারিল না, সে ধপ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

বিলাস দ্বারোয়ানকে ডাকিয়া বলিল, "বাবুকে একখানা টাক্সী ক'রে বাড়ী রেখে এসো।"

ভূপতি শুইয়া শুইয়াই বলিল, "খবরদার! বাড়ী নেই যায়েঙ্গে—থিয়েটার!—বিলাস, আচ্ছা—বুঝে নেব—বুঝে নেব। আমি পুরুষের বাচ্ছা।"

দ্বারোয়ান ভূপতিকে লইয়া চলিল, বিলাস তার পশ্চাৎ হইতে বলিল, "পুরুষের বাচ্ছা যদি হও তবে আর আমার চৌকাট ডিঙ্গাতে চেষ্টা ক'রবে না।"

বিনোদ উঠিল।

বিলাস তাকে বলিল, "আমার অপরাধ নেবেন না, উকীল বাবু। আপনি হয় তো অবাক হচ্ছেন আমি এ ক'রছি কি? কিন্তু সত্যি বলছি বাবু, আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে। এইটি নিয়ে তিনটি দেখলাম। এলো আমার কাছে বড়লোক, ভাল মানুষ, দুদিন না যেতে যেতে হ'য়ে গেল জানোয়ার। হয় তো আমারই দোষ। যা'ক আর এ কাজ ক'রবো না, নাকে খত দিচ্ছি। এবার প্রায়শ্চিত্ত করবো। আপনি নালিশ করুন, আমি সাক্ষী দেব, জীবনে মন্দ কাজ তো ঢের ক'রলাম, একটা ভাল কাজ করি।"

বিনোদ এ বক্তৃতায় খুব গলিয়া গেল না। সে বুঝিল ভূপতির শাঁস ফুরাইয়াছে, তাই বিলাস তাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে চায়, এসব কেবল তার বাজে ওজুহাত। তবু তাকে একেবারে হাতছাড়া করিতে তার ইচ্ছা ছিল না, তাই সে বলিল, "নালিশ আর ক'রতে পারছি কই? আমি তো সব জোগাড় ক'রেছিলাম, কিন্তু জ্যোতি কিছুতেই ভিড়বে না, সে বলে জেলে যাই যাব, দাদার নামে নালিশ করবো না।—দেখি কি হয়।"

বিলাসের দুই চক্ষু এ কথায় উচ্ছ্বসিত অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিল, সে বলিল, "এই তো পুরুষের বাচ্ছা! উকীল বাবু আপনি তাঁকে আমার কোটী কোটী প্রণাম জানাবেন।"

বিনোদ চলিয়া গেলে বিলাস বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিল। বিনোদের শেষ কথাগুলি তার কানে একটা সুমধুর গানের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল। আর তার চক্ষের সম্মুখে সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া উঠিল জ্যোতির ক্ষণদৃষ্ট অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি। অপূর্ব্ব পুলকে ভরিয়া উঠিল তার চিত্ত—মুগ্ধ তন্ময় হইয়া সে ধ্যান করিতে লাগিল সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের কথা যে শক্তিমান হইয়াও ক্ষমাশীল, নিপীড়িত নির্য্যাতিত হইয়াও যে তার মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হইতে দেয় না।

* * * * * *

মোকদ্দমার তারিখে বাদীকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, জ্যোতি মুক্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। (ক্রমশঃ)
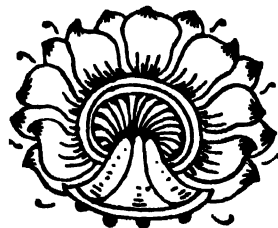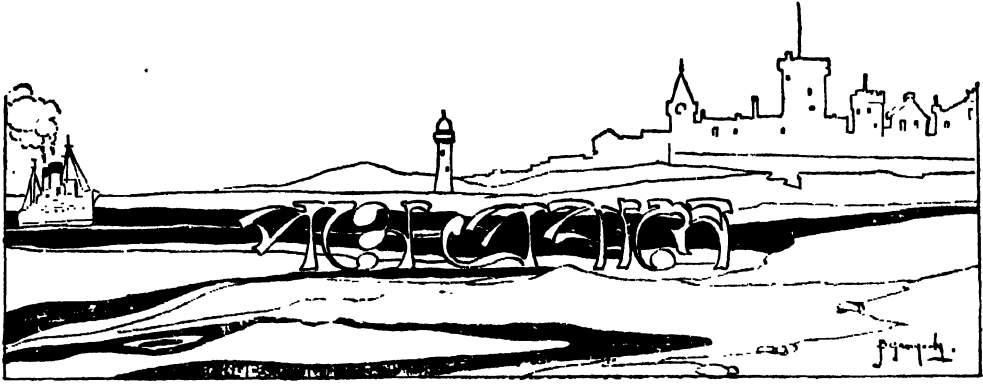
—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

৫

বড়দিনের ছুটিতে লণ্ডন ছেড়ে লেজাঁয় গিয়ে দেখি, সে এক তুষারময় স্বপ্ন, যেন নিসর্গের তাজমহল। নিবিড়-নীল অকূল আকাশে সেটি একটি পর্ব্বত-দিগলম্বিত নিরালা তুষারদ্বীপ, তার মাটি বরফের হাওয়া বরফের মেঘ বরফের, তার জলস্থল-অন্তরীক্ষের ভিৎ দেওয়াল ছাদ মর্ম্মরনিভ বরফের। যেন আকাশসিন্ধুর ঢেউয়ের পর ঢেউ পাহাড়ের পর পাহাড় হয়ে উঠেছে আর ফেনায় ফেনায় মাটির বেলা ঢেকে গেছে। সে আকাশ এত নীল আর এত উজ্জ্বল আর এত সুন্দর যে চাতকের মতো দিবারাত্র অনিমেষ চেয়ে থেকে সাধ মেটেনা, মনে হয় এ এক মহার্ঘ বিলাসিতা, শুধু এরি জন্যে এক সমুদ্র একাধিক নদী পেরিয়ে ফ্রান্সের এক সীমানা থেকে আরেক সীমানা অবধি রেল্‌দৌড় দিয়ে সুইস্ আল্পসের শাখা-শিখরে উঠতে হয়। সে তো লণ্ডনের মাথার ওপরে কালো শামিয়ানার মতো খাটানো দশহাত উঁচু দশহাত চওড়া দশহাত লম্বা আকাশ নয় যে চোখ বাড়ালেই নাগাল পাবো, মন বাড়ালেই মাথা ঠুকে মরবো, দশদিকের পেষণে ধৃতনিঃশ্বাস হবো। লেজাঁয় যেদিন নাম্‌লুম সেদিন অসহ আনন্দে নিজেকে শতধা করতে পারলে বাঁচতুম। মুক্ত আকাশের মধ্যে মানবাত্মার যে মুক্তি সে মুক্তি আর কিছুরি মধ্যে নেই কিছুরি মধ্যে নেই। সেই আকাশকে যারা কয়লার ধোঁয়া দিয়ে কালো করে দশতলা বাড়ীর ঘের দিয়ে খাটো করে তুলেছে তারা কুবের হলেও কৃপার পাত্র, তারা স্বখাদ-সুড়ঙ্গতলের যখ।

সেই উজ্জ্বল নীল প্রশস্তপরিধি আকাশে যখন এক পাহাড়ের ওপার থেকে সূর্য্য উঠি-উঠি করে, মেঘের মুখে সেই সংবাদ পেয়ে আর-পাহাড়ের এপারের বরফ হীরের মতো ঝক্‌মক্ করে, রঙের সপ্তকের ওপর আলোর আঙুল ঝল্‌মল্ ঝিল্‌মিল্ করে পিআনোর ঝঙ্কার তুলে যায়, তখন একমুহূর্ত্তের জন্যে অনুভব করতে পারি আদিযুগের ধ্যানীর চেতনায় কেমন জ্যোতি ঝল্‌সে উঠছিল, কোন আবিষ্কারের অসম্বরা বাণী তাঁর কণ্ঠভেদ করে আপনি ফুটছিল, কিসের আনন্দে তাঁকে বলিয়েছিল, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ ......বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

সারাদিন সূর্য্য কিরণ ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে চলে আর মাটির বরফ মাঠের বরফ গাছের বরফ ছাদের বরফ ঝরণার বরফ পাহাড়ের বরফ কখনো সোনা হয়ে ওঠে রূপালী রঙের মুকুরে সোনালী মুখের ছায়ার মতো, কখনো রঙা হয়ে ওঠে শ্বেত-পদ্মিনীর কপোলে অশোক-রঙা লজ্জার মতো, কখনো নীলাভ হয়ে ওঠে শ্বেত-শঙ্খিনীর নয়নতারার নীল চাউনির মতো। সূর্য্য বিদায় নিলে চন্দ্রের পালা। চাঁদের অপলক দৃষ্টির তলে তুষারময়ী পুরী বিবশার মতো শায়িতা, তার তরুণ দেহের নিটোল কঠিন চূড়ায় চূড়ায় জ্যোৎস্নার চুম্বন, তার রজত আভরণের গাত্রে তারার ঝিকিমিকি। দস্তুর পর্ব্বতের সারি পার্শ্বরক্ষীর মতো সারারাত্রি পাহারা দিচ্ছে, বিমুগ্ধা "শালে"গুলি গবাক্ষের ঘোমটা তুলে বিজলী-

আলোর উঁকি মেরে দেখ্‌ছে, টোপর-পরা পাইনগাছের দল স্থগিতযাত্রা পদাতিকের মতো খাড়া রয়েছে।

শুধু শোভা নয়, সঙ্গীত। এক নিশান্ত থেকে আরেক নিশান্ত অবধি মিষ্টিসুরের নহবৎ বাজে গ্রাম-কুক্কুটের অনবসন্ন কণ্ঠে, তার সঙ্গে সুর মিলায় স্লেজ্‌বাহী অশ্বের গলার ঘণ্টা, তার সঙ্গে তাল দেয় গিরিগৃহত্যাগিনী অভিসারিণী ঝরণার 'চল্ চল্ চল্ চল্'। দিনের কাজের সঙ্গে রাতের স্বপ্নের সঙ্গে চেতনার আড়ালে ধ্বনি মিশিয়ে রয়, যারা কাজ করে স্বপ্ন দেখে তারা হয়ত শুন্‌তে পায় না জান্‌তে পারেনা কিসে তাদের অমৃত দেয়।

কাজ? সেখানকার কাজের নাম খেলা। ডাকঘরের ছোকরা চিঠি বিলি কর্‌তে যাচ্ছে, তার গাড়ীখানার না আছে চাকা না আছে ঘোড়া, দুই হাতে একবার ঠেলা দিয়ে দুইপায়ে দিলে গাড়ীর মধ্যে লাফ, গাড়ী চল্‌ল বরফ-ঢাকা ঢালু রাস্তায় পিছ্‌লে, এক রাস্তার থেকে আরেক রাস্তায় বেঁকে, এক দরজার থেকে আরেক দরজায় থেমে। এক বাড়ীর লোক আরেক বাড়ী যাচ্ছে, যার পিঠে চড়ে বসেছে সেটার নাম লুজ্, উঁচু একখানা পিঁড়ির মতো তার আসনটা, বাঁকা দুখানা শিঙের মতো তার পায়া দুটো, চড়ে বসে পা তুলে নিয়ে হাত ছেড়ে দিলে বরফের রাস্তার ওপর ঘস্‌তে ঘস্‌তে চলে। যারা খেলাই করতে চায় তারা দুই পায়ে দুটো নৌকাকৃতি কাঠ বেঁধে হাতের লগি তুলে নিচ্চে, আর দুই নৌকায়-পা রেখে জমাট জলের ওপর দিয়ে রসাতলে নেমে যাচ্ছে। এরি নাম স্কি-খেলা (Ski-ing). শুধু খেলা করতে কত দেশ থেকে কত পুরুষ কত নারী প্রতি শীতকালে সুইজারল্যাণ্ডে আসে, বরফের ওপর দিয়ে পাহাড়ে ওঠে, স্কি করে, স্কেট্ করে, লুজে চড়ে, স্লেজে চড়ে। কী অমিতোত্তম স্বাস্থ্যচর্চা বলচর্চ্চা যৌবন চর্চ্চা! ভূতের মতন খাট্‌তে পারে শিশুর মতন খেল্‌তে পারে, যুবক যুবতীর তো কথাই নেই, বৃদ্ধবৃদ্ধাদেরও উৎসাহ দেখ্‌লে মনে হয় বাণপ্রস্থে গেলে এরা বনকে জ্বালাতো। খাটো আর খেলো আর খাও—এই হচ্ছে এদের ত্রি-নীতি। ইউরোপে এতদিন আছি, কাঁদ্‌তে কাউকে দেখিনি, কান্নাটা এদের ধাতবিরুদ্ধ। যার মুখে সহজ হাসি নেই তার অন্ততঃ হাসির ভাণ আছে, কিন্তু সহজ হাসি নেই এমন মানুষতো দেখিনে। সমগ্র সমাজটায় যৌবনের জোয়ার এসেছে। দুঃখ দ্বন্দ্ব দুশ্চিন্তার বাঁধ তাকে বেঁধে রাখ্‌তে পার্‌ছে না। আরেক দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে খুব একটা গভীরতার দাগও কারো মুখে দেখিনে; তরঙ্গহীন শান্তি অন্তঃসলিলা অনুভূতি অতলস্পর্শী তৃপ্তি কারো চোখে মুখে চলনে বলনে দেহের গড়নে লক্ষ্য করিনে। সাত্ত্বিকতার চর্চ্চা ইউরোপে নেই, কোনোকালে ছিলনা। ইউরোপের খ্রীষ্টধর্ম্ম যীশুর ধর্ম্ম নয়, সেন্ট্ পলের ধর্ম্ম—রামের ধর্ম্ম নয়, হনুমানের ধর্ম্ম। তার মধ্যে বীর্য্য আছে, লাবণ্য নেই।

কিন্তু লাবণ্য নাই থাক্, ক্লীবত্ব নেই। প্রচণ্ড শীতে যেদেশে দেহের রক্ত হিম হয়ে যায় দেহকে সে দেশে মায়া বলে কার সাধ্য? দেহরক্ষার জন্য সে দেশে এত রকমের এত কিছু তোড়জোড় চাই যে, তার আহরণে সামান্য অনবহিত হলে 'দেহরক্ষা' অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্যে দেহ থেকে দেহোত্তরে উঠ্‌তে, হয় উপনিষৎ লিখ্‌তে নয় মোহমুদ্গর লিখ্‌তে, ইউরোপের লোক কোন দিনই পারলে না। দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনকে নিয়ত উত্তপ্ত রাখ্‌তে যারা ব্যাপৃত, শীতল শান্তির সুযোগ-অবকাশ তাদের দেহ মনের আবহাওয়ায় কই? এদের ভিতরে বাইরে কেবলি দ্বন্দ্ব কেবলি ব্যস্ততা, এদের মনীষীরা সত্যকে পান্ দ্বৈরথ-সমরে, তাঁদের মনন একটা যুদ্ধক্রিয়া। এদের দেহীরা নিজের অভাব মেটায় প্রকৃতির স্তনে দাঁত বসিয়ে, তাদের জীবনধারণ প্রকৃতির ওপর দস্যুতায়। ইউরোপের মাটী বিনাযুদ্ধে সূচাগ্র পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য দেয়না, বিনা যত্নে তাতে নীবার ধান্য গজায় না, তার ঝরণার জল এত হিমেল যে ষ্টোভে গরম না কর্‌লে ব্যবহারে লাগে না। বাল্মীকি যদি এদেশে জন্মাতেন তবে ধ্যান করতে বসে বল্মীকে নয় বরফে ঢেকে যেতেন; বুদ্ধদেব যদি এদেশে জন্মাতেন তবে তপস্যায় বসে কোনো সুজাতার কল্যাণে ক্ষুধাশান্তি কর্‌তে পেতেন হয়তো, কিন্তু বেশিক্ষণ খালিগায়ে থাক্‌লে তাঁকে যক্ষ্মা-চিকিৎসালয়ের সুজাতাদের শুশ্রূষা গ্রহণ কর্‌তে হতো।

ইউরোপের সেই নিষ্ঠুরা প্রকৃতিকে মানুষ দেবী বলে পূজা করেনি, কালী বলে তার পায়ের তলায় নিজের শব

পথে প্রবাসে

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

বিছিয়ে দেয়নি, তার বিষদাঁত ভেঙে তাকে নিজের বাঁশির সুরে খেলিয়েছে, তাই একদিন যে ছিল নিষ্ঠুর আজ সেই হয়েছে কৌতুকের। তাই বরফ পড়্‌লে কোথায় ভয় পেয়ে ঘরে লুকিয়ে আগুন জ্বালবে, না, মানুষ বেরিয়ে পড়্‌লো বরফের বুকের ওপর পা রেখে কালীয় দমন করতে—স্কেট্ করতে স্কি করতে লুজে চড়্‌তে শ্লেজে চড়্‌তে।

সুইজারল্যাণ্ডের এই পার্ব্বত্য পল্লীটি জেনেভা হ্রদের অনতিদূরে ও অনতিউচ্চে। প্যারিস থেকে লোজান ছাড়িয়ে মিলানের পথে ট্রিয়েষ্টের অভিমুখে যে রেলপথটি এঁকে বেঁকে চলে গেছে এগ্লের কাছে তাকে নীচে রেখে অন্য একটি রেলপথে পাহাড়ের পর পাহাড়ে উঠ্‌তে হয়। এই রেলপথটি শীর্ণকায়, এবং এর ট্রেণগুলি ছোট। পাহাড়ের ওপর ওঠ্‌বার সময় পেছনের দিকে ঝুঁকে পড়ে শিশুর মতো হামাগুড়ি দেয়, পোকার মতো মন্থর বেগে চলে। পথের দু'পাশে দু'সারি পাহাড় কিম্বা একপাশে পাহাড় ও একপাশে খাদ। দু'পাশে পাইনের বন, বনের ফাঁক দিয়ে ঝরণা ঝরে পড়্‌ছে। পাইনের কাঁচা চুলে পাক ধরিয়ে দিয়েছে বরফ-গুড়ো, ঝরণার পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছে বরফের বাঁধ।

গ্রামটি নিকট হয়ে এলে একটি দু'টি করে "শালে" দেখা দেয়। "শালে" (chalet) হচ্ছে এক ধরণের বাড়ী, যেমন আমাদের দেশে "বাংলো"। বাড়ীর আগাগোড়া কাঠের, কেবল ছাদটা হয়তো শ্লেটের এবং ভিতটা হয়তো পাথরের। প্রত্যেকটির গড়ন স্বতন্ত্র, স্থিতি ছাড়াছাড়া, আকার বিভিন্ন এবং রঙের সমাবেশ বিচিত্র। দো-চালা ছাদ, ঝুলানো বারান্দা, ছোট্ট গবাক্ষ, জ্যামিতিক নক্সা, রঙিন আল্‌পনা, উৎকীর্ণ উক্তি, দু'তিনশো বছর বয়স—সব মিলিয়ে প্রত্যেকটি এমন একটি বিশিষ্ট দৃশ্য যে একবার চাইলে চোখ আট্‌কে যায়, ফিরিয়ে নেবার সাধ্যি থাকে না। দেশটির প্রকৃতি এত সুন্দর, তাতেও মানুষের তৃপ্তি হলোনা, সে ভাবলে এমন সুন্দর আকাশ এমন সুন্দর পাহাড় এমন সুন্দর বরফ পাইন ঝরণা, দশদিকে এমন অকৃপণ সৌন্দর্য্য, কিন্তু এর মধ্যে আমি কোথায়? এই ভেবে সে বাহিরের সৌন্দর্য্যের অঙ্গে অন্তরের সৌন্দর্য্য মাখিয়ে দিলে, সকলের অস্তিত্বের সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব জুড়ে দিলে, বিধাতার সৃষ্টি আর মানুষের সৃষ্টি, এ বলে আমাকে দেখ্, ও বলে আমাকে দেখ্। তিন dimensionএর ছবির মতো বহু কোণ "শালে", ধাপে ধাপে লাফ-দিয়ে-নামা পাথর-বাঁধানো ঝরণা, বাঁকে বাঁকে ঘুরে-ঘুরে-নামা পাহাড়-কাটা রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে গাছ, রাস্তার স্থানে স্থানে বেঞ্চি, দু'শো তিনশো বছরের বাড়ীতেও অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য, বিজলী আলো কলের জল সেণ্ট্রাল হীটিং। ইউরোপের লোক যুগোচিত পরিবর্ত্তন বোঝে। সেইজন্যে চার হাজার ফুট উঁচু পর্ব্বতশ্রেণীর পিঠে নিরালা একটি ছোট্ট গ্রামে বাস ক'রে কোনো কিছুর অভাব বোধ করে না। লেজ্যাঁর পাঁচ দশ মাইল দূরের দুটি গ্রামে বেড়িয়ে এসেছি, সে সব গ্রামেও কমবেশি এমনি স্বাচ্ছন্দ্য, অস্থায়ী পর্য্যটকদের জন্যে অন্ততঃ কয়েকটি কাফে তো আছেই।

লেজ্যাঁ গ্রামটিতে দু'তিন হাজার লোকের বাস, তাদের বোধ হয় অর্দ্ধেক নানাদিগ্‌দেশাগত যক্ষ্মারোগী। ইংরেজ আমেরিকান জার্ম্মান ওলন্দাজ হাঙ্গেরিয়ান রুমেনিয়ান পর্ত্তুগীজ ইতালিয়ান জাপানী ভারতীয়—কত নাম কর্‌বো। তাঁদের মধ্যে আমাদের এক বাঙালী ভদ্রলোকও আছেন, তাঁর ভাই "রমলা"-কার মণীন্দ্রলাল বসু মহাশয় তাঁর তত্ত্ব নেন।

যক্ষ্মারোগের সৌরচিকিৎসার পক্ষে এই স্থানটির উপযোগিতার কারণ এখানে সূর্য্যের আলো প্রচুর অথচ তার আনুষঙ্গিক তাপপ্রাচুর্য্য নেই। শীত ও রৌদ্রের এহেন সমাবেশ অন্যত্র বিরল। পার্ব্বত্য হাওয়া, মুক্ত প্রকৃতি, স্তব্ধ গ্রাম, পাখীর গান, পাইনের মর্‌মর্, ঝরণার কল্‌কল্, বাসি শেফালীর মতো অতি আল্‌গোছে মৃদু তুষারপাত। একত্র এত গুণ কোন্ শহরের ক'টা গ্রামের আছে? রোগীর জন্যে কেবল প্রাকৃতিক নয় কৃত্রিম আনন্দেরও বহুল ব্যবস্থা হয়েছে। তাদের জন্যে ছোট বড় বহুসংখ্যক ক্লিনিক, তাদের আত্মীয়দের জন্যে বহুসংখ্যক হোটেল, উভয়ের জন্যে দোকান বাজার ডাকঘর ব্যাঙ্ক্ সিনেমা গির্জ্জা কাফে। বড় ক্লিনিক ও বড় হোটেলগুলিতে নাচ-গানের বন্দোবস্ত। যারা দু'তিন বছর একাদিক্রমে

শয্যাশায়ী, যাদের পাশ ফিরে শুতেও দেওয়া হয় না, তাদের নিজের নিজের ঘরে গ্রামোফোন বাজ্‌ছে কাগজপড়া হচ্ছে খাবার পৌঁছচ্ছে নার্স পরিচর্য্যা করছে বন্ধুরা গল্প করছে। নিজের নিজের ঘর থেকে শয্যাসমেত তুলে নিয়ে তাদের সকলকে একঠাঁই একজোট করে দেওয়া হচ্ছে, সেখানে সকলে মিলে গল্প করছে কন্সার্ট্‌ শুনছে সিনেমা দেখ্‌ছে এবং তাদের বন্ধুবান্ধবীদের নাচ উপভোগ কর্‌ছে।

একটি বড় ক্লিনিকের কথা বলি। খৃষ্টমাস্‌ ইভের খৃষ্টমাস্‌ ট্রী স্থাপনা হলো, ট্রীর ওপরে শতসংখ্য মোমবাতী জ্বলে উঠ্‌ল, রোগীদের শয্যাসমেত বয়ে এনে সারি করে সাজিয়ে রাখা গেল, তাদের বন্ধুবান্ধবীরা সারি বেঁধে বস্‌লেন, কন্সার্ট্‌ চল্‌ল, ধর্ম্মোপাসনা হলো, এক প্রসিদ্ধ ফরাসী গ্রন্থকারের স্ত্রী মাদাম দুআমেল আবৃত্তি শোনালেন। নিকোলা বুড়ো সেজে একজন এসে, যতগুলি ছেলেমেয়ে সেখানে জুটেছিল তাদের সকলকে এক একটা উপহার দিলে, সকলের সঙ্গে রঙ্গতামাসা করলে। বাতী নিব্‌ল, কন্সার্ট্‌ থাম্‌ল, উৎসব শেষ হলো, রোগীরা নিজ নিজ ঘরে ফির্‌ল—অবশ্য ইতিমধ্যে সকলে মিলে কিছু পানাহার কর্‌ল।

একটি ছোটদের ক্লিনিকের কথা বলি। খৃষ্টমাস্‌ ইভ্‌, খৃষ্টমাস ট্রীর শাখায় শাখায় পুতুল ঝুল্‌ছে, ইলেকট্রিক আলোর নকল মোমবাতী জ্বল্‌ছে, ইংরেজ জার্ম্মান ফরাসী ইতালিয়ান ইত্যাদি নানাজাতের নানভাষী রুগ্ন ছেলেমেয়েগুলি এক একটি শয্যায় দু'জন করে শুয়েছে, তাদের আত্মীয়রা তাদের বিছানার কাছে বসে তাদের আনন্দে যোগ দিচ্ছেন, নার্সেরা পিয়ানো বাজাচ্ছে, প্রেমিক প্রেমিকা সেজে দুটি সুস্থ ছেলেমেয়ে গীতাভিনয় কর্‌লে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুটি রুগ্ন ছেলেমেয়েতে ডুয়েট্ হলো, দু'জন নার্স্‌ ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা সেজে রঙ্গ কর্‌ল। ছেলেরা নিকোলা বুড়োর জন্যে অধীর হয়ে উঠ্‌ল। একটি নার্স্‌ এল নিকোলা বুড়ো সেজে, "নিকোলা এসেছে" "ঐ রে নিকোলা" "নিকোলা......নিকোলা" করে গোরগোল পড়ে গেল, প্রত্যেকের জন্য নিকোলা কত উপহার বয়ে এনেছিল, বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রত্যেক উপহারের ভারে চাপা পড়্‌তে লাগ্‌ল, কত রকমের খেলনা, কত রকমের ছবির বই; একজনের একটা ক্ষুদে গ্রামোফোন এসেছিল, সেটা বার করে সে একটা ক্ষুদে রেকর্ড্‌ চড়িয়ে দিলে, সকলের তাক লেগে গেল। এতজনের এত উপহার এসেছিল যে স্বয়ং ক্লিনিকের কর্ত্রী এসে নিকোলার সাহায্য কর্‌তে লাগ্‌লেন, নার্সেরা ছুটোছুটি করে যার উপহার তার বিছানায় পৌঁছে দিতে লাগ্‌ল, কারো উপহারের পর উপহারই পৌঁছচ্ছে কারো একেবারেই পৌঁছচ্ছে না, দেরি হচ্ছে, সে বেচারা পরের উপহার নাড়াচাড়া করে সান্ত্বনা পাচ্ছে।

বৎসরের শেষ রাত্রের উৎসব (sylvester) সেই বড় ক্লিনিকে। রোগীরা সেই হলে সমবেত। প্রত্যেকেই একটা-না-একটা ফ্যান্সী পোষাক পরে এসেছে। যে রোগী দু তিন বছর এক শয্যায় সর্ব্বদা শুয়ে রয়েছেন তাঁরও কত সখ, তিনি রেড্‌ইণ্ডিয়ানের মতো মাথায় পালখ্‌ পরেছেন, কিম্বা নকল দাড়ি গোঁফ পরচুলা লাগিয়েছেন। বন্ধুবান্ধবীরাও সেজে এসেছেন—কেউ সেজেছেন দাঁড়কাক, কেউ সেজেছেন মুসলমানী, কেউ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী অভিজাত, কেউ রঙিন কাপড় পরা স্পেনদেশের পল্লীবাসিনী। বন্ধুবান্ধবীদের বল্‌নাচ হচ্ছে, বাণ্ড্‌ বাজ্‌ছে, নারীতে পুরুষে বাহু ধরাধরি করে তালে তালে পা ফেল্‌ছে, বাজনার সুরটা এমনি যে যারা নাচ্‌ছেনা তাদেরও পা নেচে নেচে উঠ্‌ছে। দু আমেল বল্‌লেন; নাচের বাজনার থেকে ইউরোপীয় সঙ্গীতের বিচার করবেন না। আমি বল্লুম, না, তা করছিনে। দুআমেল আত্মস্থ প্রকৃতির স্বল্পভাষী সুপুরুষ, রমাঁ রলাঁর দলের লোক, তাঁর "civilization" গ্রন্থখানা ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ goncourt prize পেয়েছে।

অনেকক্ষণ ধরে নাচ চল্‌ল, মাঝে মাঝে থেমে থেমে। তারপর রোগীদের খাটের কাছে কাছে বসে তাদের বন্ধুবান্ধবীদের পানাহার ও রোগীদের শুয়ে শুয়ে যোগদান। রাত বারটায় বছর বদলাল, দলে দলে গান গেয়ে উঠ্‌ল, গ্লাসে গ্লাস ঠুকিয়ে নববর্ষের স্বাস্থ্যকামনা কর্‌লে। পানাহার শেষে আবার নাচ। ইতিমধ্যে ফ্যান্সী পোষাকের উৎকর্ষ বিচার করে যে কয়জনকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল দাঁড়কাক

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

তাঁদের মধ্যে প্রথম।

এমনি করে ইউরোপীয়রা রোগশোককে তুচ্ছ করে, খেলার দাপটে জরাকে ভাগিয়ে দেয়। একাদিক্রমে তিন বছর এক শয্যায় শায়িত থাকা কী ভয়ানক দুর্ভোগ তা সুস্থ মানুষে কল্পনা করতে পারবেন না। এসত্ত্বেও রোগীদের মুখে হাসি, তাদের আত্মীয়দের মুখে ভরসা, তাদের সেবিকাদের মুখে আশ্বাসনা। মৃত্যুর কাছে ব্যাধির কাছে জরার কাছে কিছুতেই হার মান্‌বো না, তালি দিয়ে গান গেয়ে হাল্‌কা তালে নেচে যাবো—এই হলো ইউরোপের পণ। অনাদ্যন্ত জীবন প্রবাহে জরা ব্যাধি মৃত্যুর কতটুকুই বা স্থান, সেই স্থানকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা কত সহস্র বৎসর ধরে বৈরাগ্য চর্চ্চা করে আস্‌ছি, আমাদের সন্ধান সংসার হতে মুক্তি, জীবনশিখার নির্ব্বাণ, আমাদের সাধনা দুঃখকে এড়িয়ে চল্‌বার সাধনা নিজেকে নিশ্চিন্ত করবার সাধনা। বুদ্ধ-শঙ্কর-রামকৃষ্ণ কেউ তো বলেননি, "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাহি!"

স্ত্রীপুরুষের মিলিত নাচ ব্যাপারটাকে আমরা কুনীতিকর ভেবে থাকি, ইউরোপীয়েরা ভাবে না। ইউরোপে প্রতিদিন নতুন নাচের আম্‌দানী ও উদ্ভাবন চলেছে, নাচ না হলে ওদের উৎসবই হয় না। স্বাস্থ্যবান সমাজ মাত্রেই মিলিত নৃত্যের চলন আছে; আমাদের দেশের সরলপ্রকৃতি আদিমদের নাচ কতস্থানে দেখছি, তা দেখে কুনীতির কথা মনেই ওঠেনি। অনাদি কাল থেকে যে সব সমাজে উৎসব তিথিতে স্ত্রীপুরুষের যৌথনৃত্য প্রচলিত রয়েছে ও আশৈশব যারা একত্র ন'চ্‌তে অভ্যস্ত হয়েছে, পরস্পরের অঙ্গ স্পর্শ কর্‌লে তাদের চিত্তবিক্ষেপ না হবারই কথা। আমাদের দেশে নারী ও পুরুষ দুই স্বতন্ত্র জগতে বাস করেন, নিজের নিকট আত্মীয় আত্মীয়া ছাড়া এত বড় সমাজের যত পুরুষ যত নারী সকলেই পরস্পরের কাছে অলক্ষ্য অস্পর্শ্য। তার ফলে নীতির দিক থেকে অস্বাস্থ্যকর কৃত্রিম কৌতূহলের সৃষ্টি ও রুচির দিক থেকে জন্মান্ধতার উদ্ভব। আমাদের রূপবোধের দারিদ্র্য রসবোধের একদেশদর্শিতা স্পর্শবোধের অস্বাভাবিক বুভুক্ষা আমাদের সমাজকে তো ক্লীবত্বের অচলায়তন করেছেই, আমাদের সাহিত্যকেও খণ্ডিত (repressed) রিরংসার ব্যবচ্ছেদাগার করে তুলেছে। বিচিত্র রূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিচিত্র গীত শুন্‌তে শুন্‌তে বিচিত্র স্পর্শ পেতে পেতে মানুষের সৌন্দর্য্যচেতনা বাড়ে, মানুষ সৌন্দর্য্যবিচারক হয়, এসবের সুযোগ আমাদের সমাজে বিরল বলে আমাদের চিত্রকলা সঙ্গীতকলা ভাস্কর্য্যকলা মাথা তুল্‌তে পারলেনা, আমাদের পোটোরা কেবল দু'দশটি টাইপের নারীমূর্ত্তি আঁকেন, আমাদের অভিনেত্রীরা অবিদগ্ধা বাঈজী আর ভাস্কর্য্য আমাদের নেই। চিত্রকরের যেমন জীবন্ত মডেল দরকার ভাস্করেরও জীবন্ত মডেল দরকার যার গড়ন সে অনুভব করতে পার্‌বে। আমাদের ছবিই বলো কাব্যই বলো গল্পই বলো এমন কেন এমন idealistic এমন এক-ছাঁচে-ঢালা হবার কারণ কি এই নয় যে, আমাদের সমাজে একটা sex সম্বন্ধে আরেকটা sex একান্ত স্বল্পচেতন?

বল্‌ নাচ উঁচুদরের কেন কোনদরেরই আর্ট্‌ নয়। ওটা হচ্ছে সামাজিকতার একটা অঙ্গ, সমাজের দশ জন পুরুষের সঙ্গে দশ জন নারীকে পরিচিত করে দেবার একটা উপায়। যে সমাজে নিজের স্বামী বা নিজের স্ত্রী নিজে অর্জ্জন করতে হয় সে সমাজে এই প্রকার পরিচয়ের সুযোগ থাকা আবশ্যক। এমন সমাজে প্রতি পুরুষের পৌরুষের ওপরে সর্ব্বনারীর নারীত্বের দাবী যেমন প্রতি পুরুষকে বলবান প্রিয়দর্শন ও সুগঠিতদেহ হতে প্রেরণা দেয়, প্রতি নারীর নারীত্বের ওপর সর্ব্বপুরুষের পৌরুষের দাবী তেমনি প্রতি নারীকে রূপবতী স্বাস্থ্যবতী ও সুগঠিতদেহা হতে প্রেরণা দেয়। সর্ব্বপুরুষের ভিতর থেকে বিশেষ করে একটি পুরুষের দাবী এবং সর্ব্বনারীর ভিতর থেকে বিশেষ করে একটি নারীর দাবী বলবানকে করে প্রেমবান ও রূপবতীকে করে প্রেমবতী। পুরুষের সাধনা সকলকে এড়িয়ে কেবল একটি নারীর জন্য নয়, সকলকে ছাপিয়ে বিশেষ একটি নারীর জন্য। নারীর সাধনা সকলকে বাদ দিয়ে কেবল একটি পুরুষের জন্য নয়, সকলকে স্বীকার করে বিশেষ একটি পুরুষের জন্য। ইউরোপের পুরুষ একটি নির্ব্যক্তিক (impersonal) স্বামী হয়ে সুখ পায় না, সে স্বয়ম্বর সভার

জেতা। ইউরোপের নারীও একটি নির্ব্যক্তিক স্ত্রী হয়ে সুখ পায় না, সে বস্তুর মধ্যে বিশিষ্টা।

এ সমস্ত বাদ দিয়ে বল্‌নাচ একটা কসরৎ এবং অবসর বিনোদনের একটা উপায়। ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষের পা অত্যন্ত স্থূল পুষ্ট মাংসপেশীবহুল, নৃত্যকালে পরস্পরের হাত উঁচু করে ধরার ফলে বাহুরও রীতিমতো চালনা হয়। পুরুষের পক্ষে কসরৎটা কিছু বেশী, কারণ সঙ্গিনীটি যদি গুরুভার হয়ে থাকেন তো সঙ্গিনীকে মোড় ফেরাবার সময় বাহুবলের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যায়।

বল্‌নাচের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে নৈতিক আপত্তি শুন্‌তে পাই। যে দেশে পরপুরুষ বা পরনারীকে চোখে দেখ্‌লে পাপ হয় ও ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে বড় ভাইয়ের দেখা নিষেধ, যে দেশের পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে বয়স্ক ভাইয়ের সাম্‌নে বয়স্কা বোনকে ঘোম্‌টা দিতে হয়, সেদেশের লোক অনাত্মীয়ের সঙ্গে অনাত্মীয়ার মৌখিক আলাপেই যখন বিভীষিকা দেখে তখন দৈহিক সংঘর্ষে যে নরক দেখ্‌বে এর সন্দেহ নাই। যদি বলি ব্যাপারটা এত নির্দ্দোষ যে ভাইবোন বাপ-মেয়ে ও মা-ছেলে পর্য্যন্ত হাত ধরাধরি করে সকলের সাম্‌নে নাচে তবে হয়তো "উল্টো বুঝ্‌লি রাম" হবে, এদেশের পিতৃত্ব মাতৃত্ব সৌভ্রাত্রের ওপরেও সন্দেহ পড়্‌বে। মানব-চরিত্রের প্রতি যাদের সশ্রদ্ধ বিশ্বাস আছে আমাদের দেশের সেই সকল ব্যক্তিকে মনে করিয়ে দিই মিলিত নাচ সরল প্রকৃতি আদিমদের মধ্যেও আছে এবং ইউরোপীয়রা যখন আদিম ছিল সেই সময় থেকে তাদের মধ্যে চলিত হয়ে আসছে। এটা তাদের সংস্কারগত এবং কচি বয়স থেকে বালক বালিকা মাত্রেই এর অনুশীলন করতে শেখে। মানুষকে যাঁরা গ্রীন হাউসে পুরে সতী বা যতী বানাতে চান সে সব নীতিনিপুণদের বল্লে হয়তো বিশ্বাস কর্‌বেন না যে, এদেশেও সতী ও যতীর অপ্রতুলতা নেই, কিন্তু সমাজের ফরমায়েসে নয়, অন্তরের নিয়মে।

ক্লিনিকের কথায় নাচের কথা উঠ্‌ল, পাঁসিঅঁর কথায় খাওয়ার কথা বলি। আমাদের পাঁসিঅঁতে (একটু ঘরোয়া ধরণের হোটেলকে ফরাসীতে পাঁসিঅঁ বলে) আমরা অনেক দেশের লোক থাক্‌তুম, যখন খাবার ঘণ্টা পড়্‌ত তখন খাবার টেবিলে যারা সমবেত হতুম তাদের মধ্যে মণিদা ও আমি বাঙালী, অন্যদের কেউ আমেরিকান কেউ ইংরেজ কেউ জার্ম্মাণ কেউ চেকো-স্লোভাকিয়ান হাঙ্গেরিয়ান রুমেনিয়ান ফিন্ ইতালিয়ান ওলন্দাজ। এতগুলি জাতের লোক একসঙ্গে একঘণ্টা বস্‌লেই নানাদেশের কথা ওঠে। রাজনীতি অর্থনীতি আর্ট সমাজ ধর্ম্মসকল বিষয়ে আলোচনা চলে। আলোচনার ফাঁক দিয়ে জাতীয় স্বভাব ধরা পড়ে যায়, আন্তর্জ্জাতিক জানাশোনা হয়, ফরাসীরা দেখে জার্ম্মান মাত্রেই শয়তান নয়, আমেরিকানরা বোঝে ক্যাথারিণ মেয়োর বর্ণনার সঙ্গে এই দুটি হিন্দুর মেলেনা। সভাসমিতিতে সব দেশের লোক ততটা অন্তরঙ্গ ভাবে মিশ্‌তে পারে না যতটা মেশে খাবার টেবিলে। এই সত্যটা জানা থাকলে আমরা হিন্দুমুসলমানে জনসভা না করে জন-ভোজ কর্‌তুম এবং ব্রাহ্মণের ডানদিকে মুসলমানকে ও বাঁদিকে নমঃশূদ্রকে আসন দিয়ে দু'টো মহাসমস্যার মীমাংসা দু'টো দিনেই কর্‌তুম।

পরিবারের বড় ছোটতে মিলে এক টেবিলে খাবার সময় ছোটরা বড়দের কথা কান পেতে শোনে ও বড়দের রীতি চোখ বুলিয়ে দেখে॥ আমরা যা বই প'ড়ে বা মাষ্টারের উপদেশে শিখি এরা তা খেতে খেতেই শেখে। আমেরিকার মহিলাটীর সঙ্গে জার্ম্মানীর মার্ক-মুদ্রার বিনিময়-হার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে, তাঁর বালিকা মেয়ে দুটি তা সাগ্রহে শুন্‌ছে ও সে বিষয়ে প্রশ্ন কর্‌ছে, অথচ এক্স্‌চেঞ্জের মতো দুরূহবিষয় যে কী, তা আমরা মা'র কাছে শেখা দূরে থাক্ বি-এ ক্লাশের অধ্যাপক মহাশয়ের কাছে শুনেও সহজে বুঝে উঠ্‌তে পারিনে, কারণ আমাদের ঘরে ওবিষয়ের চর্চ্চা নেই, আমাদের সমাজ বল্‌তে কেরাণী-উকীল-ডাক্তার-ইস্কুল-মাষ্টারের সমাজ। আমেরিকান মহিলাটি যে বেশ একজন বিদুষী তা নয়, সম্ভবতঃ তিনিও ওসব শুন্‌তে শুন্‌তে শিখেছেন, নিজের ঘরের ব্রেক্‌ফাষ্ট টেবিলে সকলে মিলে দৈনিক পত্র পড়্‌তে পড়্‌তে কিম্বা পরের ঘরের চায়ের টেবিলে জাহাজের ব্যাপারীদের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে কর্‌তে কেবল কি টাকাকড়ির কথা? ভালোমন্দ দরকারী অদরকারী হরেক রকমের অনেক তথ্য অনেক গুজব এবং

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

অনেক মিথ্যাই মগজে জমিয়েছেন। জার্ম্মান মহিলাটির স্বামী ডাক্তার, আত্মীয়েরা কেউ চিত্রকর কেউ যোদ্ধা কেউ ব্যবসাদার। তাঁদের সঙ্গে কথা কয়ে তাঁর নিজের শিক্ষাও ঘরে ঘরে যতটা হয়েছে স্কুলে ততটা হয়নি এবং ছবি ও গান সম্বন্ধে তিনি যেরকম রসগ্রাহিতার পরিচয় দিলেন আমাদের দেশের কোনো ডাক্তারের স্ত্রী সেরকম পারতেন না। তবে স্কুলেও যে এঁরা কেবল পড়েননা সেকথাও জানিয়ে রাখতে চাই। এঁদের প্রতি স্কুলে সঙ্গীত শিক্ষা বাধ্যতামূলক, প্রতি স্কুলে কলেজে প্রতি সপ্তাহে বল্-নাচের আয়োজন আছে, স্কুল থেকে এঁরা প্রত্যেকেই দুটো একটা বিদেশী ভাষা শিখে রাখেন এবং প্রত্যেকেই কয়েকটা করে গৃহ-শিল্পের ট্রেনিং পান। ফরাসী ইংরেজী ও জার্ম্মান এই তিনটে ভাষা ব্যবসা বা সামাজিকতার খাতিরে ইউরোপের মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষই অল্পবিস্তর জানেন এবং জান্‌বার প্রধান সুযোগ পেয়েছেন নানাদেশে বেড়াবার সময় নানাদেশের লোকের সঙ্গে কাফেতে রেস্তরাঁয় হোটেলে এক টেবিলে বসে আড্ডা দিতে দিতে। এহেন আড্ডার পক্ষে সুইজারল্যাণ্ড্ যেমন অনুকূল তেমন আর কোনো দেশ নয়।

ঐ তো ছোট্ট একটুখানি দেশ, ওর লোকসংখ্যা ছত্রিশ লক্ষ, আয়তন আমাদের ছোটনাগপুরের মতো হবে, তবু টুরিষ্টদের দৌলতে এবং ঘড়ি ও চকোলেট বিক্রী করে ওদেশ বড়-মানুষ। ঐটুকু দেশে তিন তিনটে ভাষা আর দু'দুটো ধর্ম্ম চলিত, অথচ ওর ঐক্য ইতিহাসবিশ্রুত।

সুইজারল্যাণ্ডের প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক সহরে টুরিষ্টদের জন্যে হোটেল পাঁসিয়ঁ কাফে আর ব্যাঙ্ক্ ডাকঘর ঔষধালয় তো আছেই প্রত্যেক স্থানে তাদের খেলার বন্দোবস্ত ও বাজারের আয়োজন আছে। সমগ্র দেশটাই যেন টুরিষ্ট্‌দের জন্যে তৈরি একটা বিরাট পান্থশালা।

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশই এখন বিজ্ঞাপন দিয়ে অন্যান্য দেশের টুরিষ্টদের ডাক্‌ছে এবং দেশ দেখিয়ে তাদের পকেট হাল্‌কা কর্‌ছে। ভারতবর্ষ যদি সুইজারল্যাণ্ডের মতো উদ্যোগী হতো ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ঘুচ্‌ত। কিন্তু ভারত-বর্ষের এক প্রদেশের লোকই আরেক প্রদেশে সমাজ পায় না, ইউরামেরিকার টুরিষ্টদের সমাজ দেবে কে? তারা যদি ইউরোপীয় হোটেলেই থাকে ইউরোপীয়দের সঙ্গেই খায় ইউরোপীয়দের সঙ্গেই খেলে ও ইউরোপীয়দের সঙ্গেই আড্ডা দেয় তবে তাদের অর্থে ভারতবাসী ধনী হবে না এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ধারণা নিয়ে তারা দেশে ফিরবে সে ধারণা আমাদের অনুকূল হবে না। এবং দু'দশটা মুসলমান বাবুর্চ্চি হিন্দু দোকানদার ও ফিরিঙ্গী আয়া দেখে যদি তারা ভারতবর্ষের লোক সম্বন্ধে বই লেখে তবে সে বইয়ের দেশব্যাপী প্রতিবাদ কর্‌লেই আমাদের কাজ ফুরাবে না। আমাদের সমাজের সত্যিকার পরিচয় তারা পাবে কি করে? সে যে অভিমন্যুর ব্যূহের উল্টো, তার মধ্যে তাদের প্রবেশ-পথ কোথায়? ইউরোপের এক দেশের সমাজের সঙ্গে অন্য দেশের সমাজের মিল আছে, ভাষা জানা থাক্‌লে এক সমাজের লোক আর এক সমাজে যেতে পারে, জাতীয় সংস্কার (traditions) স্বতন্ত্র হলে কি হয় সামাজিক আচার সর্ব্বত্র প্রায় এক। এই বৈচিত্র্যহীনতা অনেক সময় মনকে পীড়া দেয়। আমেরিকান মহিলাটী বল্লেন তিনি আমেরিকা থেকে ইউরোপে এসে নতুন কিছু দেখ্‌বেন ভেবেছিলেন, কিন্তু এই যান্ত্রিকতার যুগে সমস্তই এমন এক ছাঁচে ঢালা যে ইউরামেরিকার সব দেশের পুরুষের একই পোষাক সব দেশের নারীর একই পরিচ্ছদ, স্থলে স্থলে এমন কি একই প্যাটার্ণের একই রঙের একই ভঙ্গীর। কোনো লীগ অব নেশন্স ফতোয়া দিয়ে এত দেশের এতগুলো মানুষকে একই রকম সাজ কর্‌তে বলেনি, কোনো মিশনারী এবিষয়ে প্রচার কার্য্য করেন নি, তবু কেমন করে যে আমেরিকার ক্যালিফর্ণিয়া থেকে ইউরোপের রুমেনিয়া অবধি প্রায় প্রতি নারীই কবরী ছেঁটে স্কার্ট ছেঁটে জামার হাত কেটে পূর্ব্ব নারীদের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সাজ্‌লে সেই এক আশ্চর্য্য! অথচ সর্ব্বত্র পুরুষ তার পূর্ব্বপুরুষের মতোই জবড়জঙ সাজে বিদ্যমান, ক্যালিফার্ণিয়া থেকে রুমেনিয়া অবধি তেমনি কোট-ট্রাউজার্স্-টুপী-ওভারকোট। অবশ্য ইতর বিশেষ আছে, তবু মোটামুটি বলতে গেলে সর্ব্বত্র সেই হোটেলমূলক সভ্যতা, গির্জ্জামূলক ধর্ম্ম, নাচঘরমূলক সমাজ এবং খাটা-খেলা-খাওয়া

নামক ত্রিনীতি। এ-হেন সমাজে খাপ খেয়ে যেতে বেশি কষ্ট হয় না, এমন কি আমরা বাইরের লোকও অল্লায়াসেই এ সমাজের মধ্যে স্থান পেতে পারি।

লেঁজার পর্ব্বতমালার নীচে জেনেভা হ্রদকে বেষ্টন করে অগণ্য পল্লী। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটাই টুরিষ্টদের জন্যে হোটেলে দোকানে ছাওয়া। এমনি এক পল্লীতে রমাঁ রলাঁ থাকেন, মনিদা ও আমি একদিন তাঁর সঙ্গে চা খেয়ে এলুম। যা দেখ্‌লুম যা শুন্‌লুম সে সব বল্‌বার সুযোগ এবার হলো না, আগামীবারে বলব।

(ক্রমশঃ)
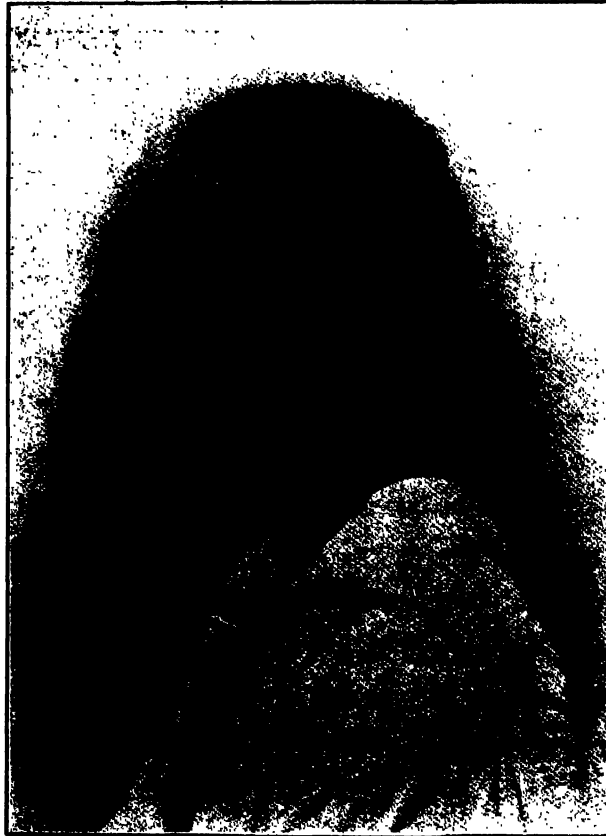
শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী

[১৯২৮ সালের পুস্তকালয় সম্মিলনের সভাপতি]

আমাদের গৃহসজ্জা

সোমবর্ম্মা

কার্জ্জনী আমলে অনেক কারণে আমাদের দৃষ্টিটা বাইরে থেকে প্রতিহত হ'য়ে ঘরের দিকে নিবদ্ধ হয়। অনেকগুলো বিষয়ে সেটা কার্জ্জন সাহেবের অনিচ্ছাসত্বেই হ'য়েছিল বটে, কিন্তু একটা বিষয়ে নয়। ভারতীয় শিল্প প্রতিভার সম্যক আদর ক'রতে তিনি অনেককেই শিখিয়ে যান—ভারতীয় গভর্ণমেণ্টকে Ancient Monuments Preservation Actএর মধ্য দিয়ে, দেশীয় রাজন্যবর্গকে ধমক দিয়ে এবং সর্ব্বসাধারণকে উৎসাহ বাণী শুনিয়ে।

Tottenham Court Roadএর বস্তাপচা গৃহসজ্জা গুলো যে কেমন ক'রে দেশীয় অভিজাতবৃন্দের রুচি বিকৃত ক'রে দিয়েছে তা তিনি এক পরিহাস-ঝাঁঝালো বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। সে বক্তৃতার কথা এখনো অনেকের মনে আছে আশা করা যায়, অতএব তার বিশদালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ইহার বৎসর কয়েকের মধ্যেই ভারতীয় কলাপদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রাবলী প্রথম সাধারণ্যে প্রদর্শিত হয়—১৯০৮ সালে। নব শতাব্দীর প্রথম থেকেই আমাদের রুচি-শিক্ষার পুনরারম্ভ হয়।
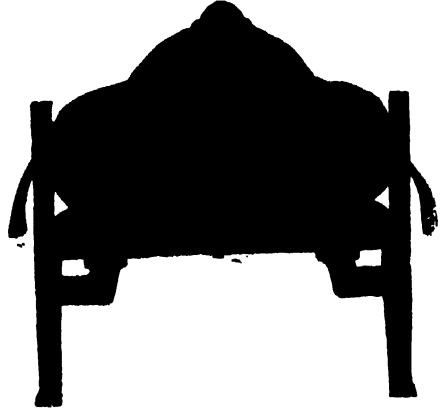
এই রেনাসাসের প্রভাব আমাদের গৃহনির্ম্মাণ ও গৃহসজ্জার উপরও ক্রমশঃ প্রসারিত হ'তে আরম্ভ হয়েছে। গৃহনির্ম্মাণ বিষয়ে একজন বাঙ্গালী স্থপতির উত্তম সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। তাঁর প্রচেষ্টার কথা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ না ক'রে ভবিষ্যতে একটা ভিন্ন প্রবন্ধে বিশেষ ক'রে উল্লেখ করা যাবে। অসিতকুমার ও লক্ষ্ণৌ কলাভবনও এ বিষয়ে উদাসীন নন্। টিহরীর মহারাজার জন্য একটা সমগ্র নগরের সৌধ-নক্সা অসিতকুমারই তাঁর সহকারীদের সাহায্যে ক'রে দিয়েছেন। গৃহসজ্জার বিষয়ে শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথই অবশ্য প্রথম পথ-প্রদর্শক। এক মাদ্রাজী তরুণ-শিল্পীর সাহায্যে তিনি এ বিষয়ে কতটা কৃতকাম হয়েছেন, তা যাঁরা Society of Oriental Artsএর আসবাব দেখেছেন তাঁরা জানেন। কিন্তু বাংলা দেশে এটা সাধারণের মধ্যে এখনও প্রচলিত হয়নি। লক্ষ্ণৌ কলাভবনে অসিতকুমারের চেষ্টায় এ জিনিসটা commercial scale এ তৈরী আরম্ভ হ'য়েছে এবং আশা করা যায়

বৎসর কয়েকের মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে দেশীয়-ভাব-প্রণোদক তক্ষণ-শিল্প সম্যক আদর লাভ ক'রবে।

এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে সব চিত্র প্রকাশিত হ'ল, সেগুলো লক্ষ্ণৌ কলাভবন থেকে পাওয়া—সেখানকার তৈরী আস-

বাবের। এগুলোর মধ্যে একটা জিনিস বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করবার বিষয়। তা হ'চ্ছে এই যে, আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসগুলো শিল্পের পুনরুত্থানের যুগেও সম্যক ভাবে বিদেশী প্রভাব অতিক্রম ক'রতে পারেনি। তার জন্য দায়ী আমাদের অভ্যাস, না কার্য্য ও আরামের স্বাভাবিক ক্রম বিকাশ পদ্ধতি, তা' বিশেষজ্ঞেরা বিচার ক'রবেন।
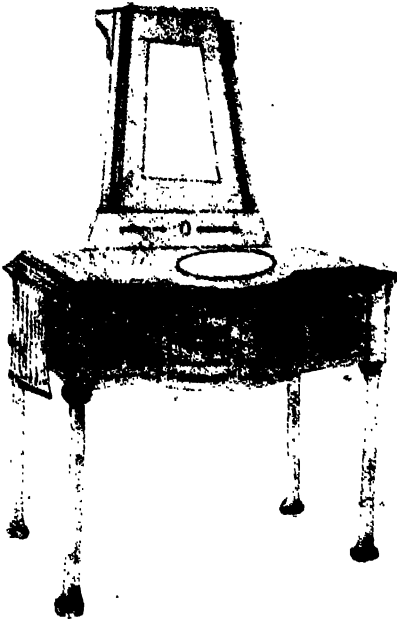
আমরা শুধু এইটুকু বুঝি যে আজকাল শীতলপাটিতে আমাদের আরাম দিলেও কাজ দিতে পারে না। কাজের জন্যে চেয়ার টেবিল না হ'লে চ'লবেনা। দুটোর সামঞ্জস্য চাই। এবং এই সামঞ্জস্যটা যে চাই তা লক্ষ্ণৌ তক্ষণ-শিল্পীরা মেনে নিয়েছেন এবং তাঁদের কাজেরও সেই অনুসারে প্রসার বৃদ্ধি হ'চ্ছে।

পুরাতন কালের নাগরিকদের গৃহসজ্জার উল্লেখ পাওয়া যায় বাৎস্যায়নের কামসূত্রে। নাগরিকের বাইরের ঘরে একটা খাটে সুপ্রশস্ত বিছানা থাকা চাই—তার উপর ধোপদস্ত চাদর বিছানো থাকবে; দুটি উপাধান—একটা শিয়রে এবং একটা পায়ের কাছে রাখা। খাটের বর্ণনা থেকে মনে হয় সেটা কতকটা খাট এবং কতকটা সোফার অনুযায়ী। ওই রকমের আর একটা বিছানা কাছেই থাকা চাই। প্রথমোক্ত বিছানার শিয়রের কাছে একটা "কুর্চ্চস্থান" (কুলুঙ্গি কিম্বা টিপয় ?) থাকবে—ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি রক্ষণার্থে। শিয়রের দিকেই একটু দূরে একটা 'বেদিকা' থাকবে—পুষ্প, চন্দন, মাল্য, গন্ধদ্রব্য, তাম্বুল ইত্যাদি রাখবার জন্যে। মেঝেতে পিকদানির মতন একটা কিছু জিনিস থাকবার ব্যবস্থা আছে। আশ্চর্য্য নয়, সেকালে পানের ব্যবহারটা আজকালকার চেয়ে বেশী বই কম প্রচলিত ছিলনা! দেয়ালে "নাগদন্তের" পেরেকে ঝুল্‌বে একটা বীণা—তা' নাগরিক মহাশয় বীণা বাজাতে জানুন আর নাই জানুন। আর দুটো ওই রকমের পেরেক থেকে ঝুল্‌বে ছবি আঁকবার যত সরঞ্জাম—যদিও সেকালে নাগরিক হ'তে হ'লে ছবি আঁকা জানা চাই, এমন কিছু অনুজ্ঞা ছিলনা। একখানি—মাত্র একখানি বই থাকবে পড়বার জন্যে এবং "কুরন্দকের" মালা
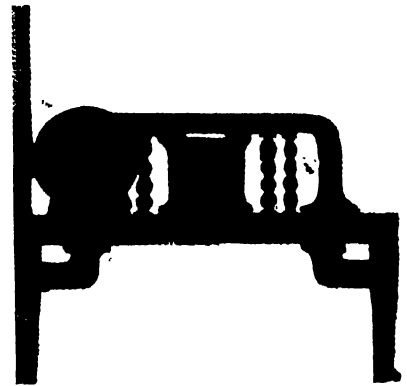
থাকবে—কোথায়, তা' বাৎস্যায়ন ব'লে দেননি। বোধ-হয় নাগরিক মহাশয়ের গলায়। মেঝেতে একটা গাল্‌চের মতন কিছু পাতা থাকা চাই—বসবার জন্যে; তার সঙ্গে একটা উপাধানও থাকবে—দরকার হ'লে ঠেশ্‌ দিয়ে বসবার জন্যে এবং আরও থাকা চাই তাস এবং অন্যান্য জুয়া খেলার সরঞ্জাম। এটা বাইরের ঘর হ'লেও নাগরিকের

শ্রীসোমবর্ম্মা

শোবার এবং বসবার ঘর উভয় রূপেই ব্যবহৃত হ'ত। সেকালে বৈঠক খানা অথবা ড্রয়িংরুম ছিল না—কেন না বাৎস্যায়নের আমলে মুসলমান বা ইংরাজ অতিথি ভারতে পদার্পণ করেননি। বন্ধু বান্ধবদের এই ঘরেই অভ্যর্থনা করা হ'ত। অন্তঃপুরিকাদের জন্য ভিন্ন প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

সেকালে অন্যান্য আসবাব-পত্রও ছিল। সুখাসন, পাদপীঠ প্রভৃতির উল্লেখ সেকালের সাহিত্যে এবং নিদর্শন সেকালের মন্দির-গাত্রে এবং ভগ্নস্তূপ ভিত্তিতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। মুসলমানী আমলে এগুলো ভিন্নরূপ নিয়েছিল মাত্র। তবে মুসলমানী আমলে আমরা রীতিমত বৈঠকখানার

ব্যবহারে অভ্যস্ত হই এবং সেখানে পাতবার জন্যে মসলন্দ, গালিচা প্রভৃতির আমদানি ক'রতে আরম্ভ করি।

ইংরাজী আমলের প্রথম যুগে আমাদের বৈঠকখানা মোটামুটি ওইরকমই ছিল। তারপর এল—সোনালী ফ্রেমওয়ালা বড় বড় আর্শী, বেলওয়ারি ঝাড় লণ্ঠন, দেয়াল-গিরি, চিত্র বিচিত্র ফ্রেমযুক্ত টানাপাখা ইত্যাদি।

তারপর নব্যতন্ত্রীদের যুগ। তাঁরা বিলাত থেকে ফিরে এসে একেবারে বিলাতী ড্রয়িংরুমের হুবহু নকল দেশে চালিয়ে দিলেন। দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে সেটাকে মানিয়ে নেবার কোন চেষ্টাই তাঁরা ক'রলেন না। এই সময়ে একমাত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিসদৃশতার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন। তিনি লেখেন—"দেশের সূর্য্যালোকের সহিত, চতুষ্পার্শ্বের ঘনায়মান প্রকৃতির সহিত আমাদের অন্তরের যুগযুগান্তরাগত শুভ ভাবের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আমাদের চিরন্তন সজ্জাকলাটিকেই আধুনিক কালোপযোগী করিয়া অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। বিসদৃশ বিলাতী ফ্যাশনের কতকগুলা আবর্জ্জনা যথেচ্ছা সংগ্রহ করিয়া একটা অশোভন পণ্যশালা সাজাইয়া বসিয়া তাহাকেই একখণ্ড দেশী গালিচার জোরে আমাদের অভ্যর্থনা গৃহ আখ্যা দেওয়া চলিবে না। আসল কথা আমরা ভুলিয়া না যাই যে, ইংরাজ দোকানের বিলাতী আসবাবগুলি নিতান্তই আমাদের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করা হয় নাই। যে দেশে দক্ষিণা বাতাসের জন্য সারাক্ষণ দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে হয় না এবং রুদ্ধ সার্সীর মধ্যে ধূলি প্রবেশের সুবিধা নাই, সে দেশে যে সকল আসবাব গৃহের শ্রী এবং শোভা সম্পাদনে নিয়োজিত হয়, আমাদের মুক্ত-বাতায়ন ধূলিবহুল প্রাচ্যগৃহে সে সকল গৃহসজ্জা সম্যক সুশোভন না হইতেও পারে।

বিশেষতঃ ইংরাজের মত টেবিল চেয়ার কৌচ কার্পেটের পশ্চাতে অহরহ লাগিয়া থাকা আমাদের পোষায় না। এবং সেরূপ ভাবে একান্ত লাগিয়া থাকিতে না পারিলেও এ সকল জিনিস অত্যল্প ধূলি সঞ্চয়েই দেখিতে দেখিতে খেলো হইয়া আসে। আমাদের আধুনিক ইংরাজের অনুকরণ ড্রয়িংরুমগুলিই ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।"

এইরূপ বিসদৃশ রুচিতে সজ্জিত ঘরের আবহাওয়া মার্জ্জিতরুচি ব্যক্তির পক্ষে কতটা পীড়াদায়ক তাও তিনি ব্যক্ত ক'রেছেন—

"যখন অগণ্য কৌচক্যাবিনেট কণ্টকিত আধুনিক কোনও নব্যতন্ত্রীর ভবনে প্রবেশ করা যায়, অনেকক্ষণ ধরিয়া
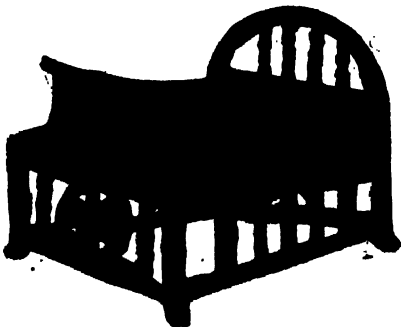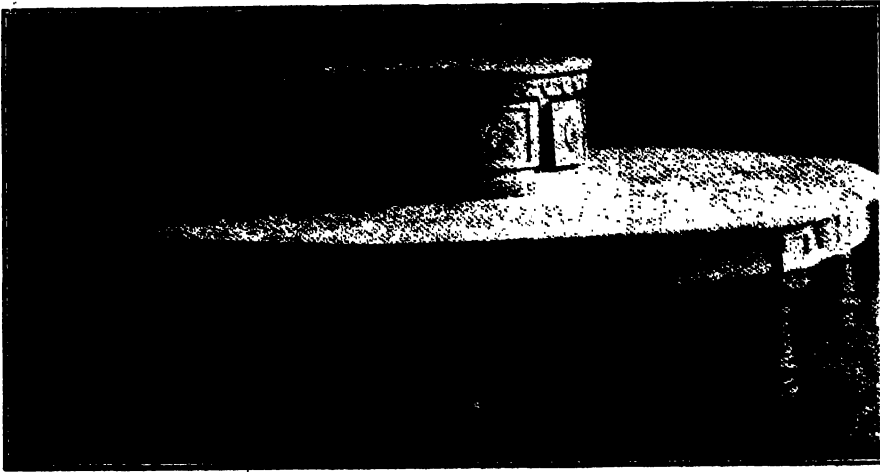
কিছুই যেন ভালরূপ ঠাহর হয় না—এমন কি, বলিতে সাহস হয় না, অনেক সময় সেই অভ্যর্থনা কক্ষের অধিষ্ঠাত্রী গৃহিণীকে দেখিয়া স্থির করিয়া উঠা যায় না যে, তিনি আমাদেরই একজন ভ্রমপ্রমাদ-সুখদুঃখমোহময়ী মানবী, না, বিলাতী সাহেবের অদৃশ্য তার বিলম্বিত কোনরূপ আশ্চর্য্য কলের পুতুল। কারণ, অনভ্যস্ত চক্ষে তাঁহাদের গতিবিধি. তাঁহাদের গুরুগাম্ভীর্য্য ও লঘু হাস্য বিকীরণ তাঁহাদের আতিথ্য ও অভ্যর্থনা সকলই কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় যান্ত্রিক বলিয়া ঠেকে। এবং খানিকক্ষণ সেই চুরোটিকা-ধূম কুণ্ডলিত আবহাওয়ার মধ্যে থাকিতে থাকিতে নিজেকেও যেন রঙ্গালয়ের অভিনেতা বলিয়া ভ্রম জন্মে। এবং সে

শ্রীসোমবর্ম্মা

অভিনয়ও বড় সহজ নহে, সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয় যে, কখন কোন্ ভঙ্গিটী বেদস্তর হইয়া পড়ে। কারণ, এ ভঙ্গীকলার মধ্যে কোনরূপ যুগযুগান্তরাগত ভাবপ্রবাহ নাই যাহাতে আমাদিগকে অবলীলাভরে পরিচালিত করে—আছে কেবল কতক পরিমাণে নেপথ্যের তারওয়ালা সাহেবের অদৃশ্য হস্ত এবং আর কতক পরিমাণে শিথিলপ্রকৃতি কয়েকটী দেশী পুত্তলিকার হস্ত পদ ও রসনা সঞ্চালন।”

কিন্তু বলেন্দ্রনাথ অনুযোগ ক'রেই ক্ষান্ত হন্‌নি এবং একেবারে নিরাশও হন্‌নি। প্রতিভার দূরদৃষ্টি তাঁর ছিল। তিনি লিখেছিলেন—“সময়ে সময়ে মনের এক কোণে একটু আশারও সঞ্চার হয় যে, হয়ত বা এই বিজাতীয় সজ্জা সরঞ্জাম সংঘর্ষে আমাদের নির্ব্বাপিতপ্রায় সজ্জাকলা সহসা একদিন পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিতে পারে। সেদিন সমস্ত দেশের সহিত একটী অখণ্ড যোগসূত্রে আমাদের আতিথ্যও সম্ভ্রম ও গৌরবের হইবে। নহিলে গান্ধ্যসমিতির নিমন্ত্রণই করি আর ইংরাজের মত ধূমধামই করি, তাহার ভিতরকার প্রচ্ছন্ন প্রহসন হইতে নিষ্কৃতি নাই।”

বহুকাল পূর্ব্বে বলেন্দ্রনাথ যা' আশা ক'রেছিলেন, আজ তা' সফল হয়েছে। এবং এবিষয়ে লক্ষ্ণৌ কলাভবনের উদ্যোগ ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে বিশেষভাবে উল্লিখিত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গত লক্ষ্ণৌ শিল্প-প্রদর্শনীর তোরণ

—শ্রীযুক্ত অসিত কুমার হালদার কর্ত্তৃক পরিকল্পিত ও লক্ষ্ণৌ কলাভবনে নির্ম্মিত—

শান্তি নিকট

ক্লান্তি দূর

শিল্পী শ্রীমনীষী দে

১২

পরস্পর মিলিত হইবার অনতিবিলম্বেই দুইটি দল পৃথক হইয়া পড়িল। বিনয় ও সুকুমার দ্বিজনাথের নিকট বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিল এবং কমলা শোভাকে লইয়া তাহার পড়িবার ঘরে গিয়া বসিল।

পথ চলিতে চলিতে বিনয়ের সহিত যে সকল কথা হইয়াছিল এবং ঘটনা ঘটিয়াছিল সে-গুলা মনকে তখনো এমন আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে, কমলা শোভার প্রতি যথোচিতরূপে মনোযোগী হইতে পারিতেছিল না। শোভার কথা শুনিতে এবং শোভার কথার উত্তর দিতে সে তাহার মনকে নাড়া দিয়া দিয়া সর্ব্বদা সজাগ রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহারই মধ্যে কখন্ যে কেমন করিয়া সন্ন্যাসীর রুদ্রাক্ষ, এঞ্জিনের ব্রেক্, মোটরকারের গতি এবং গায়ের-কাপড়-রুমালের আলোচনা লইয়া অগোচরে তাহার মন বারংবার সূক্ষ্ম জাল বুনিতে আরম্ভ করিতেছিল তাহা সে বুঝিতেই পারিতেছিল না। তাহার অন্যমনস্কতা শোভার লক্ষ্য এড়াইতেছে না,—এই উপলব্ধিই তাহাকে অধিকতর অন্যমনস্ক করিয়া তুলিতেছিল।

শোভা মনে করিতেছিল অভিপ্রায় অসিদ্ধির নৈরাশ্য এবং পথ-হাঁটার শ্রান্তির জন্যই সহজ স্বাভাবিক ধারা হইতে কমলার এই ব্যতিক্রম, মনের দুঃখ এবং দেহের ক্লেশই তাহার এই চাঞ্চল্যের জন্য দায়ী। তাই সে বলিল, "কমলা, পথ চ'লে তুমি বোধ হয় বড় বেশি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ।"

কমলা বলিল, "কই এমন ত' বেশি কিছু পথ হাঁটিনি। তা-ও মধ্যে এক জায়গায় মিনিট পনেরো কুড়ি জিরিয়ে নিয়েছিলাম।"

শোভা হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "এই দেড় মাইল পথ হাঁট্‌তে পনেরো-কুড়ি মিনিট জিরোতে হয়েছিল?" পর-মুহূর্ত্তেই বলিল, "বিনুদা কোনো গল্প ফেঁদেছিলেন বুঝি? যা চমৎকার গল্প করতে পারেন! একবার গল্প আরম্ভ হ'লে আর তা ছেড়ে উঠ্‌তে ইচ্ছে হয় না।"

"তোমাদের বুঝি রোজ গল্প বলেন?"

"রোজ। এম্‌নি ত যখন-তখন;—তা ছাড়া নিয়ম ক'রে সন্ধ্যার পর থেকে খাবার আগে পর্য্যন্ত। এক-একদিন গল্প এমন জ'মে ওঠে যে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে রাত এগারটা বেজে যায়। খাবার জন্যে যারা তাড়া দেবে তারাই সমস্ত ভুলে তন্ময় হ'য়ে ব'সে গল্প শোনে।"

টেবিল হইতে স্মেলিং সল্টের শিশিটা লইয়া ছিপি খুলিয়া শুঁকিতে শুঁকিতে কমলা বলিল, "এত গল্প করেন কোন্ বিষয়ে?"

উত্তেজিত হইয়া শোভা বলিল, "কোন্ বিষয়ে? সব বিষয়ে। শিল্প বল, সাহিত্য বল, ইতিহাস বল, বিজ্ঞান বল, দেশ-বিদেশের কথা বল।" একটু থামিয়া ঝোঁক্ দিয়া বলিল, "রাজনীতি বল। জ্ঞানী মানুষ, বুঝলে কমলা?—দস্তুর মত জ্ঞানী মানুষ।"

মৃদু হাসিয়া কমলা বলিল, "তাই ত' দেখ্ছি।"

সবিস্ময়ে শোভা বলিল, "আমি বল্চি তাই দেখ্চ? কেন? তোমাদের এখানে গল্প করেন না?"

"এখানে আর কার সঙ্গে গল্প করবেন বল। বাবার সঙ্গে একটু-আধটু করেন; আমার বিষয়ে বোধ হয় মনে করেন ছবি আঁকানো ছাড়া আর আমি কিছুই বুঝিনে।"

সবেগে মাথা নাড়িয়া শোভা বলিল, "না, না, অন্যায় কথা বোলোনা ভাই,—কাউকেই তিনি সামান্য মনে করেন না, তা তোমাকে। আমারই সঙ্গে গল্প ক'রে কত আনন্দ পান, তা তোমার সঙ্গে! তোমার ওপর বিনুদার কত উঁচু ধারণা তা যদি তুমি শুন্তে ত বুঝ্তে।"

কমলা বলিল, "তা হ'লে বুঝ্তাম বেশি জ্ঞানী মানুষরা কিছু না জেনে শুনে কত বড় ভুল ধারণাই করেন।"

শোভা হাসিয়া বলিল, "না। তা হ'লে বুঝ্তে বেশি জ্ঞানী মানুষরা কত অল্প জেনে শুনে ঠিক ধারণা করেন। তোমার ছবি আঁক্তে আঁক্তে তিনি তোমাকে যা বুঝেছেন, তুমি তার আধখানাও নিজেকে বোঝোনি।"

কমলা হাসিয়া বলিল, "এটা খুব বাহাদুরীর কথা হোলোনা শোভা, কারণ শূন্যকে দুগুণ করলে তা শূন্যই হয়। নিজের বিষয়ে ধারণার মূল্য অনেক সময়ে শূন্যর চেয়ে বড় বেশি-কিছু হয় না। সে যাই হোক্, তোমারও ত ছবি আঁক্চেন, তোমারো বিষয়ে তা হ'লে তিনি একটা ধারণা করেছেন?"

"নিশ্চয় করেছেন।"

"আর সে ধারণা ঠিক ধারণা?"

দ্বিধাশূন্য ভাবে শোভা বলিল, নিশ্চয়ই ঠিক।" তাহার পর কমলাকে আর কোনো প্রশ্ন করিবার অবসর না দিয়া বলিল, "তোমার আমার বিষয়ে একদিন বিনুদা কি বলছিলেন শুন্বে?"

"বল, শুনি।"

সহাস্যমুখে শোভা বলিল, "বল্ছিলেন তোমার মধ্যে আলোর খেলা বেশি, আর আমার মধ্যে ছায়ার।" পাছে কমলা কথাটার যথার্থ অর্থ উপলব্ধি না করিয়া থাকে সেইজন্য ব্যগ্রভাবে বলিল, "গায়ের রং-এর কথা নয়,—স্বভাবের।"

কমলা কোনো কথা না বলিয়া মৃদু হাস্য করিল,—কতকটা কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া, কতকটা শোভার অনাবিল সরলতায় মুগ্ধ হইয়া।

"কমলা!"

"কি ভাই?"

"এবার থেকে তোমাদের বিনুদার গল্প শোনবার খুব সুবিধে হবে।"

"কেন?"

"বিনুদা বোধহয় এবার থেকে তোমাদের বাড়িতে থাক্বেন।"

চকিতনেত্রে কমলা বলিল, "একথা তোমাকে কে বল্লে?"

"কাকাবাবু দাদাকে বল্ছিলেন তাঁর একা থাক্তে বড় কষ্ট হয় আর বিনুদাদাকে তাঁর বড় ভালো লাগে, তাই যাতে বিনুদা এসে তাঁর কাছে দিন কতক থাকেন।"

উৎসুক হইয়া কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার দাদা কি বল্লেন?"

"প্রথমে একটু আপত্তি করছিলেন কিন্তু কাকাবাবুর আগ্রহ দেখে পরে বল্লেন, বিনুদা যদি রাজী হন ত তিনি আপত্তি করবেন না।"

একটু চিন্তা করিয়া কমলা বলিল, "তোমার বিনুদা রাজী হবেন না শোভা।"

সবিস্ময়ে শোভা বলিল, "কি ক'রে তুমি তা জানলে?"

কমলা বলিল, "যে ক'রেই হোক আমি তা জানি।" তাহার পর শোভা আর কিছু বলিবার আগেই বলিল, "তিনি নিজেই আমাকে একটু আগে বলছিলেন।"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নিরতিশয় ব্যগ্রতার সহিত শোভা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল্‌ছিলেন ?"

"বলছিলেন, তিনি তোমাদের বাড়ি থেকে চ'লে এলে তুমি ভারী দুঃখিত হবে।"

অন্ধকার কক্ষে আলোর সুইচ্‌ টিপিয়া দিলে যেমন হয় তেমনি শোভার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ; বলিল, "তাই বলছিলেন না কি ?" তাহার পর কমলার মুখে রুদ্ধ মৃদু হাস্য লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তুমি ঠাট্টা করছ কমলা !"

কমলা বলিল, "ঠাট্টা একটুখানি করেছি কিন্তু সত্যি কথাই বেশি বলেছি। বল্‌ছিলেন, তোমরা ভারী দুঃখিত হবে।"

শোভার মুখে একটা সূক্ষ্ম ছায়াপাত হইল ; বলিল, "তাই বল।"

কমলা বলিল, "তার জন্যে দুঃখ কি ভাই ? তোমরার মধ্যেও ত' তুমি আছ।"

সহাস্য মুখে শোভা বলিল, "তা আছি।"

বেলা বাড়িয়া উঠিয়া ক্রমশঃ যে স্নানাহারের সময় উপস্থিত হইয়াছিল, সে কথা উভয় পক্ষের মধ্যে কাহারও মনে ছিল না। বারান্দায় তর্ক চলিতেছিল শিল্পকলাকে কতদূর পর্য্যন্ত বিধি-বিধানের মধ্যে বাঁধিয়া রাখা যায় এবং বাঁধিয়া রাখা উচিত তাহা লইয়া।

বিনয় বলিতেছিল, "কতদূর পর্য্যন্ত বেঁধে রাখা উচিত সে বিষয়ে কোনো হিসেব বা নিয়ম থাকা সম্ভব নয়, কারণ শিল্পী যখন প্রচলিত বিধি-বিধানকে অতিক্রম ক'রে যায় তখন সে নিজের অন্তর্নিহিত প্রতিভার বলেই করে। নিয়মকে অতিক্রম করিবার কোনো নিয়ম হ'তে পারে না কারণ যারা নিয়ম সৃষ্টি করে তারা নিয়মের ব্যতিক্রমকে প্রীতির চক্ষে দেখে না; বরং তার জন্যে দণ্ডেরই ব্যবস্থা করে। তাই কোনো প্রতিভাবান শিল্পী যখন প্রচলিত রীতি পদ্ধতিকে অতিক্রম ক'রে শিল্প সৃষ্টি করে, জন-সাধারণ বিচারক হয়ে অধিকাংশ স্থলে তার দণ্ড বিধানই ক'রে থাকে। শিল্পী শিল্প-বিদ্যার বলে রীতি-পদ্ধতি মেনে চলে, আর শিল্প-জ্ঞানের বলে রীতি-পদ্ধতিকে অতিক্রম ক'রে যায়—সেই জন্যে যে যুগে শিল্প-জ্ঞানীর একান্ত অভাব ঘটে সে যুগের শিল্প-কলা একঘেয়ে হতে বাধ্য।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "তুমি যে তত্ত্ব বল্‌লে তা সুধু শিল্প-কলার বিষয়েই নয়, যে কোনো বস্তু, যা জন্ম, বৃদ্ধি, বিনাশের অধীন, তার বিষয়ে খাটে। এক নিয়মের মধ্যে একটা জিনিষ একই অবস্থায় থাকে, তার কোনো রকম পরিবর্ত্তন হয় না, কাজেই বৈচিত্র্যের অভাব হয়।"

সুকুমার বলিল, "সে কথা ঠিক। কিন্তু আমি বলছিলাম সাধারণ মানুষের পক্ষে রীতি-পদ্ধতি মেনে চলাই ভালো, তা নইলে আমরা সুফলের পরিবর্ত্তে যা পাই তা যথেচ্ছাচারিতার ফল।"

বিনয় বলিল, "দেখ সুকুমার, নিজের স্বতন্ত্র পথ ক'রে নেবার যার শক্তি নেই বাঁধা পথ ছাড়লে সে যাবে বিলয়ের পথে—দুদিন পরে কেউ আর তাকে দেখ্‌তে পাবে না। তার জন্যে ক্ষোভ করা বৃথা। কিন্তু নিজের স্বতন্ত্র পথ যে নিজে ক'রে নিতে পারে সেই অসাধারণ পথিককে বাঁধা পথে ধ'রে রাখতে চেষ্টা করলে তাকে প্রাণে মারা হবে। কিন্তু নিয়ম-অতিক্রম করার মধ্যেও সংযম থাকা দরকার, যার থাকে সে স্বাধীন, যার থাকে না সে যথেচ্ছাচারী।"

ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে একটু ইতস্ততঃ করিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন, "কিন্তু সংযম ত সাধনার বস্তু বিনয়,—সংযম ত' প্রতিভার সঙ্গে উৎপন্ন হয় না। তাহলে নিয়ম পালনের কথাটা একেবারে"—

বিনয় বলিল, "না একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু প্রতিভা হচ্চে ঘোড়া, আর সংযম হচ্চে লাগাম ;—কিম্বা প্রতিভা হচ্চে মোটর, আর সংযম হচ্চে ব্রেক, দুইয়ের যোগে চাকা যে পথে চলে সেই হচ্চে প্রকৃত পথ। কিন্তু সুধু ব্রেকটাকেই মেনে চল্‌লে চাকা অচল হবে।" মনে মনে বলিল, 'তোমার কাছে হার মানলাম কমলা, তোমার গতির সাধনাই হচ্চে প্রকৃত সাধনা ; সংযমের সাধনাই তার কাছে গৌণ।'

উত্তরে সুকুমার কিছু বলিতে উদ্যত হইল, কিন্তু তাহার অবসর পাইল না, পদ্মমুখী আসিয়া বলিলেন, "বিনয়, অনেক বেলা হয়েচে, তোমরা তিনজনে এখন আর না গিয়ে নেয়ে খেয়ে নাও। তারপর ঠাণ্ডা পড়লে ও-বেলা যেয়ো।

কমলা একেবারে একলাটি থাকে—শোভাকে পেয়ে ওর আর গল্প ক'রে সাধ মিটছে না।"

বাঁ হাত তুলিয়া রিষ্ট ওয়াচ দেখিয়া সুকুমার বলিল, "ইস্ তাইত' সাড়ে এগারোটা বেজে গিয়েছে।"

দ্বিজনাথ প্রফুল্লমুখে বলিলেন, "পিসিমা, তোমার এ প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি,—কারণ, সুধু কমলার নয়, কমলার বাবারও গল্প করবার সাধ এখনও মেটেনি।"

কিন্তু সুকুমার ও বিনয় কিছুতেই থাকিতে সম্মত হইল না। সুকুমার বলিল, "বেশত শোভা থাকুক—আমি ও-বেলা এসে তাকে নিয়ে যাব।"

দ্বিজনাথ বলিলেন, "তারই বা দরকার কি? আমি আর কমলা শোভাকে পৌঁছে দিয়ে আস্‌ব।"

শোভা কিন্তু রাজী হইল না। একান্তে কমলাকে বলিল, "বুঝচ না? বিনুদার খাওয়ার ভারী অসুবিধে হবে।"

কমলা বিস্মিতকণ্ঠে বলিল, "মা আছেন, বৌদি আছেন, তাতে হবে না,—তুমি না থাক্‌লেই অসুবিধে হবে?"

শোভা হাসিয়া বলিল, "তা হবে। আমি দেখেচি, আমি না দেখ্‌লেই ভালো খাওয়া হয় না—ভারী অন্যমনস্ক মানুষ। আমিই সব দেখি কি না? তোমাদের এখানে যখন আস্‌বেন আমি তোমাকে সব শিখিয়ে দেবো। যেটা খেতে বলবে সেই-টেই খাবেন; যেটা বলবে না সেটা নেড়েচেড়ে রেখে দেবেন। বুঝলে না?"

কমলা অন্যমনস্কভাবে বলিল, "বুঝেচি।"

(ক্রমশঃ)

দল ঝরা

শ্রীলীলা দেবী

ফুলদানী হ'তে ঝরি পড়ে ফুল;
একটীর পর একটী দল,
যুগ-নেমি তলে দিবস-ডকুল
যেন খসি' যায় সচঞ্চল।
একটির পর একটী করিয়া
ঝরিছে পাঁপ্‌ড়ি যেতেছে মরিয়া;
নাই কাঁদা হাসা, উদ্বেগ আশা,
নাই কারো মুখে চাওয়ার ছল।
ফুলদানী হ'তে ঝরি পড়ে ফুল
একটীর পর একটি দল।

তরু হ'তে তলে ঝরি পড়ে ফুল
একটীর পর একটী দল
নাই ফেলে যাওয়া, নাই ফিরে চাওয়া,
কিবা বরেণ্য! কি নিরমল!
এ কি অপূর্ব্ব! মরণ অমল!
দ্বিধাহীন মন শান্ত অচল;
নাই বাকী থাকা, পথে ফেলে রাখা,
নাই তার তরে আঁখিতে জল!
তরু হ'তে তলে ঝড়ি পড়ে ফুল
একটীর পর একটী দল।

খুন

—গল্প—

—শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

১

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় গ্রামের রাস্তা অত্যন্ত পিছল হইয়া গিয়াছে। নবীন চাটুজ্যে মনিব-বাড়ী হইতে নগ্নপদে পা টিপিয়া টিপিয়া গৃহে ফিরিতেছিল, সহসা একটি ভগ্ন কুটীরের সম্মুখে একটি চোদ্দ পনেরো বছরের মেয়েকে দেখিতে পাইয়া বলিল—বলি ও সুকু, তোর মা কোথায় রে?

মেয়েটি সঙ্কুচিতভাবে পরিধানের শতছিন্ন বস্ত্রখানি গায়ে জড়াইতে জড়াইতে কহিল— মা ঘরে শুয়ে নায়েব-বাবু।

নবীন চাটুজ্যে ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিল—নবাবের বেটি আর কি! আমরা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে এই সবে বাড়ী চল্লাম, আর এদের দিবিা দিবানিদ্রা চলেছে!

সুকুমারী ম্লানমুখে কহিল—মার আজ তিন দিন জ্বর।

—জ্বর? তবু ভাল। কিন্তু খাজনাটা জোগাড় রেখেছে তো?

মেয়েটি বিষাদমাখা স্বরে বলিল—কোথায় আর জোগাড় হলো বাবু। দিনের মধ্যে একসন্ধ্যে খেতে পাইনে, খাজনা কোথায় পাব।

নবীন চাটুজ্যে মুখ ভ্যাঙচাইয়া কহিল—খাজনা কোথায় পাব! শোন কথা! কোথায় পাবি আমাকে বলে দিতে হবে—বটে? মাটিতে বাস করছিস্—খাজনা দিতে হবে না?

সুকুমারীর মা ইতিমধ্যে শতছিন্ন কাঁথা গায়ে জড়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া চাটুজ্যে মশায়ের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল,—ধুঁকিতে ধুঁকিতে কহিল—খাজনা দিতে হবে বৈকি বাবু। কিন্তু কিছুতে জোগাড় করতে পারি নি। জানই ত বাবা, আমার সম্বল কিছুই নেই।

সহসা কি জানি কেন চাটুজ্যে মশায়ের অত্যন্ত হাসি পাইল। খানিকক্ষণ হি হি করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিয়া কহিল—সম্বল নেই, অমন মিছে কথা বলিস্‌নে—ওতে পাপ হয়। তার চেয়ে স্পষ্ট বল না কেন, ফাঁকি দিতে চাস্। ছোট লোকের স্বভাবই ওই। দোহাই একটা দেওয়াই চাই।

সুকুমারীর মা অত্যন্ত লজ্জিত হইল, কহিল—সত্যই আমার কোন সম্বল নেই বাবা। এই কাঠা চারেক জমি আর ঐ ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর—এই তো আমার সম্পত্তি!

চাটুজ্যে মশাই একবার সুকুমারীর দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—এই তোর সম্পত্তি! ভাল কথা। কিন্তু চার কাঠা হোক আর চার বিঘে হোক—খাজনা তো একটা আছে। জমিদার—কি বলে, তোকে তো আর বিনা খাজনায় বাস করতে দেবেন না।

—আজ্ঞে না। কিন্তু দিই কি করে? লোকের বাড়ী খেটেখুটে, ধান ভেনে খাই—কিন্তু এবার এমনি দুর্বচ্ছর, লোকে নিজে খেতে পাচ্চে না, আমাকে দেবে কি? সময় ভাল হোক, ক্ষেতে সোনার ফসল ফলুক, তখন আমারও কাজ জুটবে—খাজনাও মিটিয়ে দেব।

চাটুজ্যে মশায় মুখে একরকম আওয়াজ করিয়া কহিল—বেশ কথা! সবাই যদি এম্‌নি সুর ভাঁজে তা'হলে আর জমিদারী করা চলে না!

সুকুমারীর মা কহিল—সবাই এম্‌নি করবে কেন বাবা? আমার মত অবস্থার লোক যারা তারাই শুধু কাঁদাকাটি করে। জমিদার আমাদের মত দীনদুঃখিনীর মা বাপ—তাঁর ত অভাব কিছুরই নেই।—আমাদের উপর পীড়ন করে তাঁর কি হবে?

চাটুজ্যের মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিল, ক্রোধভরে কহিল—পীড়ন? ন্যায্য খাজনা চাইলেই পীড়ন করা হ'লো?

সুকুমারীর মা অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিল, আজ্ঞে না—ও কথা আমি বলিনে। কিন্তু কি করবো বাবু, কাল থেকে

মুখে দানা নাই—তার ওপর জ্বর। মেয়েটা কাল সন্ধ্যেয় সেই যে দুটো খুদ ফুটিয়ে খেয়েছে—এ পর্য্যন্ত আর কিছু জোটে নি। তুমি জমিদারের নায়েব—আমার মনিব তুল্য। তুমিই এর বিচার কর।

চাটুজ্যে মশায় সুর নরম করিয়া কহিল—সব বুঝি। কিন্তু যার যেমন অবস্থা তেমনি ত করতে হবে? ঐ যে সুকু, বয়স তো ওর কম হ'লো না—এখনও যদি তোরই ঘাড়ে বসে খায় তাহলে কষ্ট হবে না! কেন ও কি রোজগার করে নিজের পেট্‌টা চালাতে পারে না?

সুকুমারীর মা সস্নেহে একবার কন্যার দিকে চাহিয়া কহিল—ওর বয়সই বা কি বাবু, পাঁচ বছরে বিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু এক বছর পেরোলো না, মেয়ের আমার কপাল পুড়্‌লো। এখন যতদিন আমি আছি ওর সমস্ত ভারই আমার উপর। এই বলিতেই ঝরঝর করিয়া চোখের জল ঝরিয়া পড়িল।

চাটুজ্যে মশায় গদ্‌গদস্বরে কহিল—নে, চোখ মুছে ফেল। আমি অবশ্যি হাড়ভাঙ্গা খাটুনির কথা বল্‌ছি নে। এই ধ'র না, ও যদি আমারই বাড়ীতে—কি বলে, গিন্নী আজ তিনমাস চোখ বুঁজেছেন, ছোট ছেলেকে কেই বা দেখে, পরকে দিয়ে কি আর তেমন কাজ পাওয়া যায়—সুকু যদি নিজের মত ছেলেটাকে মানুষ করে তাহলে আর আমার কোন চিন্তা থাকে না, বুঝলে না সুকুর মা? তারপর ফোঁস করিয়া একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—সংসার করার আর ইচ্ছে নেই। এতদিন তো কোনও তীর্থে টীর্থে যেতামই—তবে মনিব কিছুতে ছাড়ছেন না—নেহাৎ নাচারে পড়িছি আমি।

সুকুমারীর মা সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—সেতো বুঝ্‌তেই পারছি। কিন্তু সুকু এখনও ছেলে মানুষ—ওকে দিয়ে ওসব কাজ হবে না, শেষটায় তুমিই ডুবেবে। এখন এস বাবু, মেঘটা আবার জেঁকে আস্‌ছে। দেখি খাজনার জোগাড় কতটা করতে পারি। আয় মা সুকু ঘরে যাই। এই বলিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া কুটীরের ভিতর চলিয়া গেল।

চাটুজ্যে মশায় 'আচ্ছা মজাটা দেখাচ্ছি' বলিয়া গৃহের দিকে প্রস্থান করিল।

সুকুমারীর মা শতছিন্ন ভিজা মাদুরের উপর শুইয়া পড়িয়া ধুঁকিতে লাগিল। চালে খড় নাই, একটু বৃষ্টি হইলেই ঘরের ভিতর জলসিক্ত কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠে—এমন একটু স্থান নাই যেখানে মাদুর পাতিয়া শুইতে পারে। অগত্যা তাহাদের ঘরে থাকিয়াও ভিজিতে হয়।

সুকুমারীর মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ভগবানও বাদ সেধেছে দেখছি। গেল সন্ রোদের তাপে মাঠের ধান শুকিয়ে গেল—চারটি খড় মেগে যেচে ঘর ছেয়ে নেব, সেও হলো না। আর এবার বোশেখ থেকে দেবতা যে ঢল দিচ্ছে—তার আর বিরাম নেই। এই বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

সুকুমারী মায়ের নিকট বসিয়া মায়ের কপালে হাত বুলাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া সুকুর মা স্নেহভরে কহিল—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, না রে সুকু?

সুকুমারীর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। কহিল—কই তেমন তো বোধ করছিনে মা।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মা কহিল—বেশী ক্ষিদে পেলে পিত্তি পড়ে যায় কিনা—তাই কিছু বোঝা যায় না। আচ্ছা দেখতো মা—হাঁড়ির মধ্যে গুঁড়ো গাঁড়া ক্ষুদ টুদ—

সুকুমারী ম্লান হাসিয়া কহিল—কি করে আর থাক্‌বে মা, কাল সন্ধ্যেয় তো সব—।

মা লজ্জিত হইয়া কহিল—তাই বটে। তারপর সহসা কি যেন মনে পড়িয়া যাইতেই কহিল—আচ্ছা, দেখ দেখি খালি তেঁতুলের হাঁড়ির মধ্যে সেদিন দুমুঠো ফেলে রেখেছিলাম—সে গুলো বুঝি খরচ হয় নি।

সুকুমারী উঠিয়া দেখিয়া কহিল—আধ পোয়াটেক্ ক্ষুদ তো রয়েছে মা।

কয়েক দিন আগে সুকুমারীর মা চালের হাঁড়ি হইতে কিছু ক্ষুদ সরাইয়া অন্যত্র রাখিয়া দিয়াছিল—ভাবিয়াছিল নেহাৎ দায়ে পড়িলে ঐ সঞ্চিত ক্ষুদ ব্যয় করিবে।

খুন

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

সে কহিল—বেলা তো গড়িয়ে গেল সুকু। ঐ ঢটি না হয় তুই ফুটিয়ে নে।

সুকুমারী কহিল—আমার তো তেমন ক্ষিদে নেই। ফুটিয়ে দি, তুমি ও ক'টা খেয়ে ফেল।

মাতা হাসিয়া কহিল—শোন মেয়ের কথা। জ্বরের ওপর কি ভাত খেতে আছে রে মা—অসুখ বেড়ে যাবে যে! তার চেয়ে না হয় জল একটু বেশী করে দিস্—একবাটি ফ্যান নুন দিয়ে খেলেই আমার হয়ে যাবে। তারপর বিকেল নাগাদ যাব মিত্তিরদের বাড়ী—ধা'ন টান যদি কিছু পাই। বিষ্টিও যেন বাদ সেধেছে. আবার আরম্ভ হলো। মাদুরটা ঐ দেয়াল ঘেঁষে দে দেখি মা—সব ভিজে গেল যে।

২

দিন তিন চার পরে সুকুমারীর মার জমিদারের কাছারী বাড়ীতে ডাক পড়িল। জ্বরে তখনও তাহার শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল—সে ভীত হইয়া পাইককে কহিল—দুদিন খাওয়া নাই, তার ওপর জ্বরে ভুগ্ছি। এখন কি করে যাই বাবা?

জমিদারের পাইক মুখ খিঁচাইয়া কহিল—নে নে, আদর রাখ্—পিটিয়ে পিটিয়ে নিয়ে যাবার হুকুম আছে তা জানিস্? অপমানের ভয়ে অগত্যা সে ধুঁকিতে ধুঁকিতে উঠিল। সুকুমারী তখন বাড়ী ছিল না, চারটি চাল ধার পাওয়া যায় কিনা তাহারই সন্ধানে বাহির হইয়া গিয়াছিল।

জমিদারের কাছারী সেদিন প্রজা পাঠক, প্যায়দা পাইক, আমলা গোমস্তায় গিস্ গিস্ করিতেছে। আজ স্বয়ং জমিদার বাবু কাছারীতে বসিয়াছেন। এ বছরের আদায় উশুল ভাল হয় নাই, যাহারা খাজনা দিতে আপত্তি করিয়াছে—আজ তাহাদের তলব পড়িয়াছে।

সুকুমারীর মা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া ধুপ করিয়া কাছারীর প্রাঙ্গণে বসিয়া পড়িল। পাইক তাহার পিঠে লাঠির গুতো দিয়া কহিল—ওঠ্না, হুজুর রয়েছেন যে।

অগত্যা সুকুমারীর মা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া নায়েব নবীন চাটুয্যে জমিদারের কানে কানে কি যেন বলিল। জমিদারের মুখের ভাব সহসা কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি রক্তচক্ষু পাকাইয়া সুকুমারীর মাকে কহিলেন—তোর খাজনা বাকী কেন?

কথা বলিতে গিয়া সুকুমারীর মার স্বর কাঁপিয়া গেল। সে যুক্তকরে কহিল—খেতে পাই নে হুজুর!

মুখ ভ্যাংচাইয়া বাবু বলিলেন—খেতে পাইনে হুজুর! কেন, ব্যবসা তো চলছে বেশ।

নায়েব মাথা নীচু করিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল, আর প্যায়দা পাইক, আমলা গোমস্তা এ উহার দিকে ইসারায় চোখ টেপাটেপি করিতেছিল—তাহাদের ভাবখানা এই যে আজ একটা মজা না হইয়া যায় না। শুধু আগন্তুক প্রজার দল অপমানের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতেছিল।

জমিদারের কথার অর্থ সুকুমারীর মা বুঝিতে পারিল না, কহিল—খেতে পাইনে—ব্যবসা করবো কিসের হুজুর!

ধমক দিয়া বাবু বলিলেন—থাম্ থাম্ ন্যাকা বজ্জাত কোথাকার। আমার চোখে উনি ধূলো দেবেন! তোর একটা মেয়ে আছে না? বয়স কত তার?—তিনি যে তাহার গুপ্ত কথা সমস্তই জানেন এবং ইচ্ছা করিলে এখনই সব ব্যক্ত করিতে পারেন এই ভাব দেখাইয়া ঘন ঘন শিরঃ-সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

এইবার সুকুমারীর মা অর্থ বুঝিতে পারিল—তাহার মুখ চোখ অপমানে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। আজ মাসখানেক তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই, কি দুঃখে কষ্টে যে তাহাদের দিন যাইতেছে—একমাত্র অন্তর্যামী ভগবান ভিন্ন আর কেহই জানিত না। তাহার উপর এই কুশ্রী অপবাদের উল্লেখ তাহার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক সহ্য করিতে পারিল না। ক্রোধকম্পিত অথচ দৃঢ়স্বরে মরিয়া হইয়া সে বলিয়া ফেলিল—মেয়ে নিয়ে ব্যবসা যে ইচ্ছে করুক বাবু—ও ব্যবসা আমার নয়।

তাহার এই দৃঢ় উক্তিতে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, সকলেই মনে করিল জমিদার কখনই ইহাকে সহজে নিষ্কৃতি দিবেন না।

রোষকম্পিতস্বরে জমিদার বলিলেন—বটে, আমার মুখের উপর কথা! এর উচিত শাস্তি আমি দিচ্ছি। তারপর

একজন পাইককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—নিয়ে যা দেউড়িতে। পঁচিশ জুতো মেরে পঁচিশ টাকা জরিমানা আদায় করে তবে ছেড়ে দিবি।

পাইক সুকুমারীর মার শীর্ণ গ্রীবা ধরিয়া একরূপ হিচড়াইতে হিচড়াইতে লইয়া চলিল।

জমিদার কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—ছোটলোকের এত আস্পর্দ্ধা কোথা থেকে হলো চাটুজ্যে মশায়, আমি তো ভেবে পাই নে। কিন্তু আমিও আর চোখ বুজে থাক্‌বো না—সব ব্যাটাকে যদি শায়েস্তা না করে তুল্‌তে পারি, তা হলে আমার নাম হরলাল ঘোষই নয়। এ বছর যেন কারো কাছে একটা পয়সাও খাজনা বাকি না থাকে।

প্রায় অপরাহ্ণে সুকুমারীর মা অর্দ্ধমৃত অবস্থায় নিজের কুটীরে ফিরিয়া আসিল। সুকুমারী আজ অনেক দিন পরে প্রচুর অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া মায়ের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়াছিল—এখন তাহাকে ফিরিতে দেখিয়াআশ্বস্ত হইল। কিন্তু জননীর সমস্ত দেহে প্রহারের দাগ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়া সে আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—মা, তোমাকে ওরা মার ধোর করেছে নাকি?

মা দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল—এক ঘটি জল দেতো মা, তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

সুকুমারী তাড়াতাড়ি এক ঘটি জল আনিয়া দিতেই সে ঢক্‌ ঢক্‌ করিয়া সমস্তটা এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ মায়ের ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া সুকুমারী কহিল—মা তোমার গায়ে ওসব কিসের দাগ?

সুকুমারীর মা ম্লান হাসিয়া কহিল—ও কিছু না। তোর খাওয়া হয়েছে সুকু, চালটাল পেয়েছিলি?

—তোমার খাওয়া হয়নি, তারপর এই রোগা শরীরে কাছারী নিয়ে গেল—এ সব দেখে শুনে কি করে ভাত খাব মা? কিন্তু তোমার গায়েও শেষটায় হাত তুললে!—সুকুমারীর দু'চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

ম্লান হাসিয়া সুকুমারীর মা কহিল—না মা, ঠিক হাত দেয় নি। গোটা কত নাগরা জুতোর বাড়ি গুনে গুনে মেরেছে। খাজনা দিতে পারিনে, দিনান্তে একবারও আমাদের অন্ন জোটে না; আমরা গরীব নিঃস্ব—এসব তো আমাদের অপরাধ মা! যা হবার হয়েছে, দীনদুঃখীর দেহ আমাদের—এ সবই সহ্য হবে। কিন্তু তুই মা—এইবার তুই খেয়ে নে—তারপর সহসা ঘরের কোণে অন্ন ব্যঞ্জনের প্রাচুর্য্য দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া কহিল—এত জিনিষ কোথায় পেলিরে সুকু?

সুকুমারী কহিল—মাসী দিয়ে গেছে মা।

বিস্মিত হইয়া সুকুমারীর মা কহিল—মাসী? তোর আবার মাসী কোথায় আছে?

—সত্যি মা, আজ যে একজন এসেছিল।—সে বলে গেল—সে তোমার দিদি হয়। তারা সহরে থাকে—আমাদেরও সেখানে নিয়ে যেতে চাইলে মা। সেই তো চাল, ডাল, নুন, তেল সব কিনে দিয়ে গেছে।—

সন্দিগ্ধভাবে সুকুমারীর মা কহিল—তার পরনে ধোয়া কাপড়, মোটা সোটা চেহারা, কোমরে সোণার গোট, হাতে চুড়ি, অনন্ত—?

—হাঁ মা, সেই সেই!

সুকুমারীর মার মুখ ক্রোধে সহসা রক্তবর্ণ ধারণ করিল, কহিল—বুঝেছি, তুমিও তলে তলে ঐ বিদ্যে চালাচ্ছ! আমি মা, আমার কাছে একটা কথা জিজ্ঞেস করা নেই—যার তার কাছে হাত পাতলেই হলো! তারপর উঠিয়া সমস্ত অন্নব্যঞ্জন আস্তাকুঁড়ে ঢালিয়া দিয়া কহিল—আমার মেয়ে হয়ে তুই এমন কাজ করলি, ছিঃ ছিঃ!

জননীর তিরস্কারে সুকুমারীর চোখ ছলছল করিতে লাগিল। সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না—সে এমন কি অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে যাহাতে তাহার মা এমন বিচলিত হইয়া উঠিতে পারে। সকালবেলায় চাল ধার করিবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল—এমন সময় পথে এক বর্ষীয়সী রমণীর সহিত তাহার দেখা হয়। তাহাকে সুকুমারী কোনও দিন দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল না—অথচ সে তাহাকে 'বোন্‌ঝি' সম্বোধন করিয়া নানারূপ আদর আপ্যায়ন করিতে লাগিল। তাহার পর তাহাদের অভাবের কথা শুনিয়া নিজেই চাল ডাল প্রভৃতি কিনিয়া দিয়া গিয়াছিল। সে আরও বলিয়াছিল—তাহার বোন্‌ঝি হইয়া কেন সে এমন দুঃখকষ্টে অনাহারে

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

গ্রামে পড়িয়া থাকিবে? তাহার সহিত সহরে গেলে তাহার কোন দুঃখ থাকিবে না—তাহার কপাল একেবারে ফিরিয়া যাইবে। সুকুমারী তাহাকে তাহার মায়ের সহিত দেখা করিয়া যাইতে বলায় সে হাসিয়া বলিয়াছিল, আজ আমার বিশেষ দরকার আছে মা, আর একদিন আবার আস্‌বো। তোমার মাকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে ব'লো। সুকুমারী চাল ডাল পাইয়া অত্যন্ত খুসী হইয়াছিল এবং তাহাদের যে এমন আত্মীয়া রহিয়াছে ইহা ভাবিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিল। তাহার পর নিজের হাতে অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া সে ভাবিয়াছিল—কতদিন তাহাদের পেট পুরিয়া খাওয়া হয় নাই—আজ তৃপ্তির সহিত খাইয়া বাঁচিবে। তাহার মায়ের মুখে অনেকদিন পরে হাসি দেখিতে পাইবে ভাবিয়া সে মনে মনে স্বর্গ রচনা করিতেছিল, কিন্তু হায়রে, তাহার কল্পনার সুখ কি এম্‌নি করিয়াই ভাঙ্গিয়া গেল!—

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল, আকাশে একটি একটি করিয়া তারা ফুটিয়া উঠিল—মাতা পুত্রী ঘরের দাওয়ায় নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সুকুমারীর মা অন্ধকারে আকাশের দিকে তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া কি যেন খুঁজিতেছিল, তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কন্যার দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিল সুকুমারী বস্ত্রাঞ্চল দিয়া ঘন ঘন চোখ মুছিতেছে। অনুতপ্ত হইয়া স্নেহমাখা করুণস্বরে ডাকিল —সুকু মা, কাছে আয়।

জননীর স্নেহের ডাক শুনিয়া সুকুমারী একেবারে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।—সুকুমারীর মা কন্যার নিকটে যাইয়া তাহাকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া কহিল—অমন করে কাঁদিস নে মা, আমার যে বড় কষ্ট হয়!

সুকুমারী ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কহিল—আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি মা।

অনুতপ্তস্বরে মা কহিল—সে আমি জানি সুকু। আমার আজ মাথার ঠিক নেই মা। গরীব বলেই আজ এম্‌নি করে অপমান করছে।

তারপর পরম আদরে কন্যার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, আচ্ছা সুকু, ছেলেধরার কথা তো শুনেছিস?

সুকুমারী মাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কহিল—শুনেছি মা।

—আজ যে এসেছিল, সেও তাই—তবে এদের ব্যবসা মেয়ে ধরা।......তার পর ইহারা মেয়ে ধরিয়া লইয়া কি ভাবে তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লয়, কি করিয়া লোভ দেখাইয়া ধীরে ধীরে পাপের ব্যবসায় নিযুক্ত করে, কি করিয়া তাহাদের গৃহে ফিরিবার পথ চিরকালের মত রোধ করিয়া দেয়—তাহার কাহিনী একটু একটু করিয়া কন্যার নিকট বিবৃত করিল।—সেই অপরিচিতা স্ত্রীলোকটি যে পূর্ব্বেও দুই একবার আসিয়াছিল, সে কথাও সে জানাইল।

সুকুমারী কহিল—আমি তো কিছুই জানতাম না মা।

—তুই আর জান্‌বি কি করে। কিন্তু এইবার একটু একলা কি থাক্‌তে পারবি মা? সারাদিন কিছু মুখে যায়নি—দেখি আমি কিছু চালটাল ধার পাই কি না।

সুকুমারী উঠিয়া বসিয়া কহিল—কেউ দেবে না মা, কেউ দেবে না। তার চেয়ে আজ এম্‌নি থাকি। দুটো কলমীর শাক তোলা আছে—তাই সিদ্ধ করে—।

—আচ্ছা, তাই না হয় কর্ মা। আমার তো একেবারে ক্ষিধে নাই।

রাত্রি গভীর হইয়া আসিল—কিন্তু মাতা পুত্রীর চোখে ঘুম নাই। দুইজনেরই পেটে অসহ্য ক্ষুধা—অন্তরে নানা চিন্তার ঝড়। কন্যাকে বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মাতা কহিল—সুকু তোর বাপকে মনে পড়ে?

—একটু একটু পড়ে।

সে আর কিছু কহিল না শুধু এই কথাই ভাবিতে লাগিল—পরলোকে চলিয়া গেলে কি ভাবনা চিন্তার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না!

৩

ঝর ঝর ঝর—বৃষ্টির আর বিরাম নাই। ভাদ্র মাস শেষ হইয়া আসিল—তবু বৃষ্টি সমানভাবে চলিয়াছে। আকাশের ভাব সব সময়েই থমথমে গম্ভীর, যেন পৃথিবীকে রসাতলে না দিয়া সে ছাড়িবে না। গত বৎসর সূর্য্যের অসহ্য উত্তাপে সমস্ত শস্য পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছিল—এবার বরুণ দেবের কৃপায় ধানগাছ হাজিয়া পচিয়া গেল। গরীব লোকের দুঃখ কষ্টের সীমা নাই—এখন হইতেই অনাহার অর্দ্ধাহার কদাহার চলিতেছে। মাটমাঠের শাকপাতা ছিঁড়িয়া

সিদ্ধ করিয়া একটু নুন ফেলিয়া দিয়া খায়—সঙ্গে চারটি চাল সিদ্ধ থাকে তো ভাল—না থাকে শুধুই উদরস্থ করে।

সুকুমারী ও তাহার মায়ের দিনগুলিও ঠিক এই ভাবেই যাইতেছিল। তাহার উপর সুকুমারীও জ্বরে ভুগিতেছে—দু'দিন ভাল থাকে আবার জ্বরে পড়ে। দুঃখেকষ্টে অভাবের নিষ্পেষণে সুকুমারীর মা যেন পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছে—মেজাজ তাহার অত্যন্ত রুক্ষ, কন্যার উপর সর্ব্বদাই খিট্‌ খিট্‌ করে।

কিন্তু ধনীর গৃহে উৎসবের অভাব নাই। জমিদার বাবুর একমাত্র জামাতা শ্বশুরালয়ে প্রথম পদার্পণ করিবে—জমিদার গৃহে রীতিমত উৎসব পড়িয়া গেল। অন্তঃপুরে জমিদার গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। জামাতার সম্বর্দ্ধনার জন্য নানা দ্রব্যসম্ভার অন্দরের ভাঁড়ারে জমা হইতে লাগিল। নানারকমের ধান ভানিয়া উৎকৃষ্ট চাউলের জোগাড় করা হইল। গরীব লোকেরা একটা কাজ পাইল—তাহারা জমিদার গৃহিণীর তোষামোদ করিয়া ধান কুটিবার জন্য কিছু কিছু ধান লইয়া গেল।

গৃহিণীর কাছে উমেদারী করিয়া সুকুমারীর মা কিছু ধান পাইয়াছিল। জমিদার গৃহিণী বার বার সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন—এই চাউলের একমুষ্টি যেন নষ্ট না হয়। কারণ এ রকম উৎকৃষ্ট ধান আর নাই। চাল দিয়া গেলেই তাহার মজুরি দিয়া দিবেন।

সুকুমারীর মা গৃহে ফিরিয়া তাড়াতাড়ি ধান কুটিয়া চাল করিল—কারণ ইহার মজুরি পাইলে তবে যদি আজ তিন দিন পরে অন্ন জোটে, পীড়িতা কন্যার মুখে কিছু তুলিয়া দিতে পারে। ধান কোটা শেষ করিয়া একটা হাঁড়িতে চা'ল গুলি রাখিয়া কি একটা কাজে সে বাহির হইয়া গেল, ভাবিল, ফিরিয়া আসিয়া চা'লগুলি জমিদার গৃহে পৌছাইয়া দিবে।

সুকুমারী বিছানায় শুইয়া ছটফট করিতেছিল—আজ তিন দিন সে কিছুই খাইতে পায় নাই। তাহার মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করিতেছে—কানের ভিতর যেন অসংখ্য ঝিঁ ঝিঁ পোকা অনবরত ঝিঁ ঝিঁ করিয়া তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, ক্ষুধায় তাহার পেটের নাড়ীগুলি মোচড়াইয়া মোচড়াইয়া উঠিতেছে। তাহার শরীরের ভিতর তখন যেন এক অদ্ভুত প্রক্রিয়া চলিতেছিল। সহসা তাহার মনে হইল—তাহার চতুর্দ্দিকে মাটির দেওয়াল নাই, মাথার উপর খড়ের কোনও ছাউনি নাই! দেওয়াল গুলি যেন চা'লের দানা দিয়া তৈরী, মাথার উপর চা'লের দানার ছাউনি, আসে পাশে সর্ব্বত্র যেন চা'লের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দানা ছড়াইয়া আছে, এমনকি তাহার মুখও যেন চা'লের দানায় বোঝাই হইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখ আপনিই নড়িয়া উঠিল—যেন সে কোন কঠিন পদার্থ চর্ব্বণ করিতেছে।

অথচ তাহার যে জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল তাহা নয়। তাহার মা যে একটি হাঁড়িতে চা'ল রাখিয়া গেল সে দেখিতে পাইল। তাহার মা চলিয়া গেলে সে কোনও রকমে উঠিল, হাঁড়ির মুখ খুলিয়া মুষ্টি বোঝাই চাল লইয়া মুখে পুরিয়া দিয়া চিবাইতে লাগিল। শুষ্ক কণ্ঠনালী দিয়া চাল গলিতে চাহিল না—তবু সে চেষ্টার ত্রুটি করিল না। তার পর উনুনে কাঠ গুঁজিয়া দিয়া হাঁড়িতে জল বোঝাই করিয়া সমস্ত চালগুলি তাহাতে তুলিয়া দিল।—

ভাত অর্দ্ধসিদ্ধ হইতে না হইতেই সে হাঁড়ি নামাইয়া থালে ঢালিয়া লইল, তার পর উত্তপ্ত অর্দ্ধসিদ্ধ অন্নগুলি গিলিতে লাগিল। তখন তাহার জ্ঞান ছিল না—কোনও রকমে উদর-পূর্ত্তি করিতে পারিলে যেন সে রক্ষা পায়!

ঠিক এমনি সময় সুকুমারীর মা কুটীরে প্রবেশ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। এক থাল অন্ন লইয়া সুকুমারী বসিয়া বসিয়া গিলিতেছে—অন্নের সুগন্ধে ঘরখানি আমোদিত হইয়া গেছে। সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। সে তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল—এ কি করেছিস্‌ হতভাগী! তারপর রাগ সামলাইতে না পারিয়া একখানি কাঠের চেলা তুলিয়া লইয়া সজোরে তাহার পিঠে আঘাত করিল। সুকুমারীর সমস্ত শরীর থর থর করিয়া প্রবলভাবে কাঁপিয়া উঠিল। সে একবার কোটরগত তীব্রোজ্জ্বল চক্ষুর দৃষ্টি দিয়া জননীর দিকে চাহিল, পরক্ষণেই মাটিতে গড়াইয়া পড়িল। ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া সুকুমারীর মা—'মাগো, এ কি করলাম আমি' এই বলিয়া চীৎকার করিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

তাহার বীভৎস চীৎকারে পাড়া-প্রতিবেশী দৌড়িয়া আসিয়া কুটীরের দৃশ্য দেখিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। সুকুমারী নিস্পন্দ অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার মা পলকহীন দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া আছে, উনুনে আগুন গন্ গন্ করিতেছে, থালায় স্তূপীকৃত অন্ন, কিছু কিছু চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। সুগন্ধি অন্নের ঘ্রাণে চারিদিক আমোদিত হইয়া আছে। সমস্ত দেখিয়াই তাহারা ব্যাপার অনেকটা অনুমান করিয়া ফেলিল। কিন্তু এত কোলাহলেও সুকুমারীর মা কিছুই বলিল না—সে তেমনি একদৃষ্টিতে ভূতলশায়িনী কন্যার দিকে চাহিয়া রহিল।

তখনই একদল জমিদার বাড়ী এবং আর একদল থানায় খবর দিতে ছুটিল। যথা সময়ে পুলিশের লোক এবং জমিদারের লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। এমন কি সমস্ত সংবাদ শুনিয়া স্বয়ং জমিদারেরও দীনের কুটীরে পদধূলি পড়িল। সমস্ত স্থানটা জুড়িয়া রীতিমত একটা উৎসব বাধিয়া গেল।—

সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জমিদার দারোগা বাবুকে বলিলেন—এ মাগীর যে কি শাস্তি হওয়া উচিত আমি তো ভেবে পাচ্ছি না। নিজের মেয়েকে মা হয়ে এমনিভাবে হত্যা করতে পারে এ তো আমরা ধারণায় আনতেও পারিনে।—

দারোগা বাবু অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি প্রকাশ করিলেন —ছোট লোকের ক্রোধ জিনিষটা এমনি বেয়াড়া রকমের। তিনি এই সমস্ত দেখিয়া দেখিয়া মাথার চুল পাকাইয়া ফেলিলেন, সুতরাং তিনি আর কিছুতেই বিস্মিত হন না। তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—এ সব অপরাধের শাস্তির ব্যবস্থা খুবই কঠিন হওয়া উচিত—কারণ ফাঁসিতে ঝুলাইলে অনায়াসে প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যায়। তাঁহার মতে মাটিতে অনেকটা পুতিয়া কুকুর দিয়া খাওয়াইলে তবে কতকটা শাস্তি হইতে পারে বটে। কিন্তু ইংরাজের আইনটা এদিকে ভারী কোমল রকমের।

জমিদার বাবু বলিলেন—জীয়ন্তে পুড়িয়ে ছাল ছাড়িয়ে নেওয়ার প্রথাও কোনও কোনও দেশে আছে শুনেছি। আমার মনে হয় এ সব ব্যাপারে সে ব্যবস্থাও মন্দ নয়। কিন্তু আর কেন, এইবার চালান দিন।—

নায়েব চাটুজ্যে মশায় সেখানে উপস্থিত ছিল, কহিল—এ হুজুরের বাড়ীর চাল দেখ্‌ছি, কুট্‌তে নিয়ে এসেছিল বোধ হয়। মেয়ে দুটি খেয়ে ফেলেছে বলেই এতবড় কাণ্ডটা করে বসেছে। যেন দুটি চাল নষ্ট হলে হুজুর একেবারে ফতুর হয়ে যাবেন।.........এই বলিয়া সে ইহার মাঝেই হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।—তারপর হাসি থামাইয়া সে বলিতে লাগিল—মাস দুই তিন আগে সুকুমারীকে আমার বাড়ীতে কাজের জন্য বলেছিলাম।—শুনে আমার ওপর কি রাগ! যেন আমিই প্রস্তাব করে অপরাধী হয়ে পড়েছি। ছোটলোকের কোনও কালে উপকার করতে নেই—বুঝলেন না দারোগা সাহেব।

দারোগা সাহেব একজন কনেষ্টবলকে আদেশ করিলেন —হাতকড়ি লাগা। দেখ্‌না, কেমন ন্যাকামি করে বসে আছে, যেন কিছুই জানে না!

কনেষ্টবলটি সুকুমারীর মাকে রুলের গুঁতা দিয়া কহিল—ওঠ্‌না মাগী।

কিন্তু সে উঠিল না। গুঁতা খাইতেই তাহার নিস্পন্দ দেহ সুকুমারীর গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িল। সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—তখনও সে তাহার স্থির তারকা দিয়া পলকহীন দৃষ্টিতে সেই একই ভাবে চাহিয়া আছে।

শেষ-বাসনা

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

জননী বসুন্ধরা !
ম্লান হয়ে আসে হের অস্তগামীতপনের ক্ষীণ রেখাটুকু
নয়নের পরে।
মিশে যায় বাসনার শেষ তপ্ত শ্বাস
আকাশের ভালে।

লহ মাতা, লহ মোর শেষ নমস্কার।
তোমার শ্যামল-স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়া-ক্রোড়ে
লালন করেছ মোরে অতি সযতনে—
গোপনে রাখনি তব লীলান্বিত রসের ভাণ্ডার-
ভ্রমিয়াছিলাম যেথা দিশাহারা লুব্ধ শিশুসম
আনমনে।

সূর্য্য ছিল ভাই,
ভগিনী সে ফুলবালিকারা,
সখা ছিল দুরন্ত পবন,
নিদ্রাহারা চন্দ্রতারা সকলেই বেসেছিল ভাল ;
সে সবারে আজ মোর শেষ নমস্কার।

জানিনা তো ভাগ্য মোর
কি রেখেছে করিয়া সঞ্চয়।
কিন্তু যদি কোনো দিন সুকৃতির ফলে
জন্ম লভি পুনরায় মানবের গেহে,
তাহলে আবার যেন ফিরে আসি এই
সুধাময়ী ধরণীর শ্যামল প্রাঙ্গণে।
সফল করিয়া লব—
এ জনমে যাহা কিছু রহিল বিফল।

নবভারত নারী-প্রচেষ্টা

প্রাচ্য জাতিকে জানিবার, বুঝিবার আগ্রহ সম্প্রতি পাশ্চাত্য জগতে পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রাচ্য দেশের জ্ঞানী গুণীরা প্রাচ্যের বার্ত্তা বহন করিয়া এতকাল পরে এ সম্বন্ধে তাঁহাদের সচেতন করিয়া তুলিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতনারীর সম্বন্ধে কোন কথা পাশ্চাত্য দেশে এখনও তেমন পৌঁছে নাই। অন্ততঃ জ্ঞান ও চিন্তার রাজ্যে প্রাচ্য প্রতীচ্যের যে মিলন সূচিত হইতেছে, তাহাতেও তাঁহার বিষয় কাহারও ততটা মনে আসে নাই। ভারতনারীর সম্বন্ধে পাশ্চাত্যেরা ভারতীয় পুরুষের কাছ হইতেই যাহা কিছু শুনিয়া আসিতেছেন। বলা বাহুল্য ইহাতে ঠিক জিনিষ পাইবার সম্ভাবনা কমই। জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও প্রতীচ্যসভ্যতার মর্ম্মে ভারতীয় সুধীজনেরাই যেমন এদেশের জ্ঞানতত্ত্বের বিষয় জানাইতে সক্ষম, ঐরূপ গুণবিশিষ্ট ভারতনারীই তেমনি কেবল তাঁহাদের বিষয় বলিতে পারেন। কিন্তু সেরূপ নারীর অভাবেই পাশ্চাত্যেরা ভারতনারীর কথা ঠিক জানিতে পারেন না। উপযুক্ত দেশীয় মনীষার অভাবেই ভারতবর্ষের সত্য পরিচয়ও এতদিন পাশ্চাত্যের অপরিজ্ঞাত ছিল।

কিন্তু সম্প্রতি যুগধর্ম্মের তরঙ্গ ভারতের দৃঢ়বদ্ধ অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার আঘাতে বহুগুণভূষিত হইলেও ভারতনারীর জড়ত্বপ্রাপ্ত হৃদয় জাগিয়া উঠিতেছে। এতদিনও এদেশে নারীর মধ্যে অনেকে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা পান নাই এমন নয়। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের পাশ্চাত্যভাবাপন্ন পিতা ও পতির অভিমতেই তাহা লাভ করিয়া তাঁহাদের সন্তোষসাধনেই ব্যাপৃত ছিলেন। সে শিক্ষা তাঁহাদের আত্মচৈতন্য জাগাইতে সমর্থ হয় নাই। তাই একদিকে এই মুষ্টিমেয় পাশ্চাত্যভাবাপন্ন পাশ্চাত্য শিক্ষিত নারীগণ,—অপরদিকে দেশের বিস্তৃত নারীসমাজ ঘোর অশিক্ষা ও মধ্যযুগের তমসাতেই আচ্ছন্ন থাকিয়া পরস্পর সম্পূর্ণ যোগরহিত ও বিদ্বেষাপন্নভাবেই অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি ইহার পরিবর্ত্তনের আভাস পাওয়া যাইতেছে। আর এই পরিবর্ত্তন ঐ বদ্ধ, বৃহৎ নারী সমাজের মধ্য হইতেই আসিতেছে। পুরুষের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বহুল প্রচারে তাঁহারা প্রথমে অতিরিক্ত পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইলেও পরে আবার প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সমন্বয়ও করিয়া লইতে লাগিলেন। কিন্তু নারীর ভাগ্য ও অবস্থা প্রায় অপরিবর্ত্তিতই রহিয়া গেল। এই সব দেখিয়া দেখিয়া এবং পাশ্চাত্য চিন্তা ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে ও একটু একটু করিয়া প্রবেশ করিতে থাকায় আপনাদের অবস্থা পরিবর্ত্তনের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আসিতেছে।

জাতীয় জাগরণে নারীর সাহায্য অপরিহার্য্য হইয়া উঠায় পুরুষের আহ্বানে জাতীয় কাজে যোগদান করিতে গিয়া মেয়েদের বন্ধন আপনিই কতকটা শিথিল হইয়া পড়িতেছে। জাতীয় কাজে প্রবৃত্ত হইয়া অনেকস্থলে তাঁহাদের আত্মচৈতন্যও জাগিয়া উঠিতেছে। কিন্তু গোঁড়া রক্ষণশীল সম্প্রদায় ব্যতীত নূতন জাতীয় ভাবের মোহেও অনেকে আবার নারীর এই জাগরণ পাশ্চাত্যের অনুকরণ মাত্র মনে করিয়া অপ্রসন্ননেত্রে দেখিতেছেন। ইঁহারা ভুলিয়া যান, এখনকার প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকল নরনারীই এক বর্ত্তমান যুগেই জন্মিয়াছেন। সুতরাং অনেক বিষয়ে তাঁহাদের সাদৃশ্য ত থাকিবেই। ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা যেমন প্রতীচ্যের বহু শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াও ক্রমেই আপনাদের জাতীয় সম্পদের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতেছেন,—নবজাগ্রত ভারতনারীও তেমনি সম্পূর্ণ ভারতীয় থাকিয়াও পাশ্চাত্য জাতির এবং পাশ্চাত্য নারীর বহু বিষয়ই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। তবে এ বিষয়ে নারীর বড়ই দুর্ভাগ্য। কারণ প্রাচীন বৈদিক

"Messages d'orient" নামে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া হইতে নবপ্রকাশিত একখানি সাময়িকপত্রের জন্য লিখিত। তাহাতে ইহার ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতে নারীর অবস্থা এখানকার অপেক্ষা অনেক উন্নত থাকিলেও সমগ্রভাবে নারীর বিষয়ে মানুষের ধারণা সম্প্রতি-মাত্র ন্যায়ের দিকে আসিতেছে। বহুপূর্ব্বকালের ভাব এখন আনা সম্ভবও নয়। কাজেই মুক্তিলাভ করিতে হইলে তাঁহাকে অতীত অপেক্ষা বর্ত্তমানের উপরই বেশী নির্ভর করিতে হয়। তাই জাতীয়তায় নারীরও যতই অনুরাগ থাকুক, প্রচলিত আচার, অনুষ্ঠান, রীতিনীতিগুলি আরও অনেক পরিমাণে সংস্কৃত, মার্জ্জিত না করিয়া তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না। সেইজন্যই অসতর্ক দৃষ্টিতে দেশীয় ও জাতীয়ভাবের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য যেন বেশী বলিয়া মনে হয় এবং তাঁহারা শুধু পাশ্চাত্যের অনুকারী বলিয়া প্রতীত হন। কিন্তু নারীপ্রচেষ্টাকে ত ঠিক পাশ্চাত্য বলা যায় না। কারণ উহা পাশ্চাত্যদেশেও ছিল না। নারীপ্রচেষ্টার বর্ত্তমান যুগসত্য ও যুগধর্ম্ম আছে বলিয়াই ভারতনারীকেও তাহা গ্রহণ করিতে হইলেও জাতীয়তা বা ভারতের সারসত্য কিছুই অবশ্য তিনি বর্জ্জন করিতে পারেন না।

পাশ্চাত্যের মধ্যেও অনেকে ভারতনারীর নবজাগরণ তেমন সুনজরে দেখেন না। তাঁহারা ভাবেন উহাতে শুধু তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইতেছে। কিন্তু কেবল মাত্র অর্থহীন বৈশিষ্ট্যের ত কোন মূল্য নাই। তাহা কতটা শ্রেষ্ঠ, ন্যায় ও যুক্তিযুক্ত তাহাতেই তাহার পরিচয়। কোন ক্ষেত্রে কতটা বিশেষত্ব আছে, মাত্র তাহাই দেখিবার বিষয় নয়;—জগতের সকল ধর্ম্ম, সভ্যতা হইতে কে কতটা খাঁটি জিনিষ গ্রহণ করিবার চেষ্টা পাইতেছে তাহাও দেখিতে হইবে। ভারতনারীও তাই বৈদেশিক কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য চিরদিন জীবিত পিরামিড হইয়া থাকিতে পারেন না। তিনি যখন সজীব মানুষ, যুগধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহাকেও চলিতে হইবেই। আর শুধু তাহার সঙ্গে চালিত না হইয়া নিজে তাহাকে চালিত করাতেই ত তাহার মনুষ্যত্ব, বিশেষত্বের পরিচয়।

ভারতনারী পাশ্চাত্যের সারসত্য গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের স্বাধীন গতিতেই এমন একটা রং আপনিই ফুটিয়া উঠিবে যে তাহাতেই বিশ্বমানবতায় বিশেষতঃ নারীপ্রচেষ্টায় বিশেষ একটি পরিণতি নিশ্চয়ই দিতে সমর্থ হইবে। তাই ভারতনারীর মধ্যে এই নবারুণোদয়কেই সকলের সম্ভ্রমের সহিত গ্রহণ করা উচিত। তাহাতে প্রথমে যতই পাশ্চাত্যভাব থাকুক ও বৈচিত্র্যের অভাব মনে হউক তাহা হইতেই জগতের একটা নূতন সত্যের স্ফূর্ত্তি এবং নারীর মুক্তি সমগ্রতা লাভ করিবার সম্ভাবনা।

ভারতনারী ত যুগ যুগ হইতেই বদ্ধ হইয়া আছেন। তাহাতে তাঁহারা জগতকে কতই বা দান করিতে পারিয়াছেন, আপনারাই বা ভারতের সারসত্য কতটুকু লাভ করিতে পারিয়াছেন? জাগ্রত হইয়াই তিনি যেমন প্রতীচ্যের কাছেও শিক্ষালাভ করিতে উন্মুখ হইতেছেন, তেমনি আপনাদের জন্মগত অধিকারে ভারতীয় জ্ঞানধর্ম্মের সারসত্যও আপনাদের আয়ত্তে আনিতে সমুৎসুক হইয়াছেন।

ইহার ফল দেখিতে পাওয়ার সময় এখনও আসে নাই। তাঁহারাও আপনাদের দান বিশ্বমানবকে দিবার উপযুক্ত এখনও হইয়া উঠেন নাই। গৃহকোণে আপনাদের শিকল খুলিতে এবং প্রাচ্য, প্রতীচ্যের দান লইয়া পরিপুষ্টি লাভের প্রয়াসেই তাঁহারা এখনও ব্যাপৃত আছেন।

অনেকে আবার নারীকেই আপনাদের গৌরবের হেতু মনে করিয়াও মেয়েদের এখনকার অবস্থাতেই রাখিতে চাহেন। কিন্তু নারীর অবস্থাই যে দেশের অগৌরবের একটা প্রধান কারণ তাহা তেমন করিয়া ভাবিয়া দেখেন না। তাই নিজেদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া জাতীয় উন্নতি কামনাও ভারতনারী-প্রচেষ্টার মধ্যে রহিয়াছে।

ইহাও বলিতে হয় ভারতনারী পাশ্চাত্য নারী অপেক্ষা অনেক বিষয়ে পরাধীন হইলেও অন্য কতকগুলি বিষয়ে অপেক্ষাকৃত মুক্তও আছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তুতন্ত্রতায় নারীর রূপযৌবন মাত্রকেই সর্ব্বপ্রধান স্থান দেওয়ায় তাহা তাঁহার প্রতি অপমান, অন্যায়ের কারণ হইয়া আছে;—ভারতীয় সভ্যতায় কিন্তু নারীকে সেভাবে দেখা হয় না। তাঁহাকে মাতৃভাবে ও মঙ্গলের মূর্ত্তিরূপেই দেখিবার বিধি। ইহার অনেক অযথা ব্যবহার ঘটিয়াছে এবং ইহা হইতেই নারীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার কম হয় নাই। আর অন্য সকল বিষয়ে তাঁহাদের পাশ্চাত্য নারীর অধিকার না

দেওয়া হইলেও এবিষয়ে পাশ্চাত্য অপচার প্রাচের মধ্যেও যথেষ্টই আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। তথাপি ভারতনারী স্বাধীনতা লাভ করিলে এসকল বিষয়ে পাশ্চাত্যনারী অপেক্ষা তাঁহার মুক্ত থাকাই সম্ভব।

বঙ্গনারী

ব্রহ্মপুত্র নদী যবে

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

(প্রাচীন আসামী হইতে অনুবাদ)

ব্রহ্মপুত্র নদী যবে মাজুলির চরে
অকস্মাৎ বাধা পেয়ে চমকিয়া উঠি
কুঞ্চিত অঞ্চল হ'তে মুক্তা মুঠি মুঠি
ছড়ায় বিস্মিত আধো-সঙ্কোচের ভরে—
পুষ্প-লঘু হাস্য তব বেপথু-অধরে
তেমনি একান্ত রস-আবেশেতে ফুটি
ঝ'রে যায় ম'রে যায় প'ড়ে যায় লুটি
হঠাৎ পথের বাঁকে দেখো যবে মোরে।

সাতাশ তারার গাঁথা রাশি-চক্র সম
বন মল্লিকার মালা তব কুন্তলেরে
ঘেরে ঘন আলিঙ্গনে ; বক্ষ নিরুপম
উলসিয়া ওঠে ক্রমে ; ঘিরিয়া দেহেরে
কিঙ্কিনী কঙ্কণ কাঞ্চী করে কানাকানি
চক্রান্ত বিরুদ্ধে মোর জানি তাহা জানি

জ্ঞান

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে আদিম মানবদম্পতি স্বর্গচ্যুত হয়েছিলেন এ কথা বাইবেলে লেখা আছে, সুতরাং বাইবেল যদি আপ্ত বাক্য হয় তাহলে বুঝতে হবে দেহের পক্ষে বিষ যতটা মন্দ আত্মার পক্ষে জ্ঞানও ঠিক ততটা। ও জিনিষ ঈশ্বর হাতে করে দেননি—দিয়েছিল সয়তান। তাই সহৃদয় জ্ঞানীরা কথায় কথায় বলে থাকেন—'সব দিও, আক্কেল দিও না'।

জ্ঞান সকলের পক্ষেই মন্দ, কিন্তু নারীর পক্ষে বেশী। ও জিনিষ তাদের মস্তিষ্কের পাকস্থলীতে একেবারেই জীর্ণ হয় না। সয়তান তা জানতো। সে আগেই জ্ঞান-ফল খাওয়ালে ইভকে—ইভের মাথা ঘুরে গেল। তারপর ইভের দেখাদেখি এ্যাডামও ফল খেলে কিন্তু তার মাথা ততটা ঘুরলোনা। সে একটু পরেই তার দোষ বুঝ্‌তে পেরে ইভকে তিরস্কার করতে লাগলো, কিন্তু নিষিদ্ধরসাস্বাদিনী ইভের তখন কুচ-পরোয়া-নেই ভাব। জ্ঞানোন্মত্ত দৃষ্টিতে সে তার নগ্ন সৌন্দর্য্যকে দেখ্‌লে কুৎসিত এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার মনের মধ্যে গজিয়ে উঠলো সেই ভীষণ কৃত্রিম ভাব, যার নাম হচ্ছে দৈহিক লজ্জা। সে দৈহিক লজ্জায় অভিভূত হয়ে গাছের পাতায় নিজেকে স্বল্পাচ্ছাদিত করলে, বুঝলেনা ও লজ্জা তার জ্ঞান-জন্য দুর্ব্বলতারই রূপান্তর। শ্লীলতা আর সুরুচির ধূয়া আজও জ্ঞানীদের মধ্যেই অতিরিক্ত।

জ্ঞানের মধ্যে এমন একটা প্রলোভনী শক্তি আছে যাতে করে সে আমাদের মনে কেবলই জাগিয়ে তুলচে জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসা হচ্ছে একটা প্রবল ক্ষুধা, যার জন্য জ্ঞানকেই মনে হয় সুমিষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু আমাদের জ্ঞানপুষ্ট মন কি দিন দিন রাক্ষসের মতই ভীষণতায় বেড়ে উঠ্‌চে না? বিশ্বজগতের কোমল শিশু সত্যকে রহস্যের মাতৃকোল হতে ছিনিয়ে নিয়ে লোহার দাঁতে চিবিয়ে খাচ্ছে না? কিন্তু আশ্চর্য্য! সে যতই খাচ্ছে তার জঠরানল ততই দাউ দাউ করে জলে উঠচে—তার খাঁই খাঁই রব কিছুতেই মিটচেনা।

জ্ঞাননিন্দা-অসহিষ্ণুরা বলতে পারেন জীবনের উন্নতির সিঁড়িই জ্ঞান। যে জীব যত জ্ঞানবান সে জীব তত উন্নত। মানুষ সর্ব্বোন্নত জীব বলেই সমস্ত প্রাণীর উপর তার আধিপত্য।

বেশ কথা। কিন্তু এই একরাট্‌ মানুষ যে সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান জীবজগতের আদর্শ তা কে বল্লে? সৌন্দর্য্য, সংবাদ ও সমৃদ্ধি এই তিনটেই আদর্শ জীবনের লক্ষণ। কে বলবে মানুষ ফুলের চেয়ে বেশী সুন্দর? কে বলবে পিপড়ে মৌমাছির মধ্যে যে সংবাদ আছে মানুষের মধ্যে তার চেয়ে বেশী আছে? কে বলবে মানুষ ব্যাঘ্র হরিণের চেয়ে স্বাস্থ্য-সম্পদে সমৃদ্ধ?

যদি বল মানুষ জ্ঞানের জন্যই পরার্থপর যা অন্য জীবজন্তু নয়—অর্থাৎ তার বুদ্ধির কব্জা যতই ঘুরচে তার হৃদয়ের দ্বার ততই উন্মুক্ত হচ্চে, তাহলে বলি ওটা আমাদের দেখবার ভুল। দরজাও খুলচে কব্জাও ঘুরচে, কিন্তু দরজাটা কব্জার উপর খাটানো নেই। বিচার করে কে কবে বড় আত্মোৎসর্গ করতে পেরেছে? জ্ঞান দিয়ে মাতৃ-স্নেহকে ঝালিয়ে তোলা আর চাঁপা ফুলকে গিল্‌টি করা একই কথা। তাছাড়া এ দৃশ্যও ত বড় বিরল নয় যে, একই লোক যে শৈশবে এক পয়সার ভিখারীর হাতে এক টাকা দিয়ে ফেলে বাপ মার বকুনি খেয়েচে, সেই জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ে ন্যায্য পাওনাদের পিছনেও কুকুর লেলিয়ে দিয়েচে। হয়ত ঐ পাওনাদারের পরিবারবর্গ সাত দিন ধরে উপবাসী, কিন্তু তাহলে কি হয়? দেনদারের যে অধিকার-জ্ঞান স্ফুরিত হয়েচে। সে অত্যাচারিতের মত মুখভঙ্গী করে

জ্ঞান

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

কঠোর স্বরে বলে উঠেচে—'ভাগো হিঁয়াসে—আদালতমে যাও—মাৎ দিক্ করো।'

জ্ঞানের দোষ কি? অনেক। জ্ঞান মনুষ্যকে চতুর কুটিল করে। যে পূর্ব্বে শিশুর মত সরল ছিল, সেই জ্ঞানের প্রভাবে পরের চক্ষে ধূলা দেয়। অবিশ্বাস ও সন্দেহ জ্ঞানের নামান্তর মাত্র। সংসার-বৃদ্ধ জ্ঞানীরা সমস্ত জগৎকেই দ্বিধার চক্ষে দেখেন, অতি-ভক্তিকে চোরের লক্ষণ বলে অনুমান করেন, এবং দীন দুঃখীর কাতর ক্রন্দনেও তাঁদের জমাট হৃদয় গলে না। সমাজ-নীতির জ্ঞান তাঁদের সহানুভূতির উৎসের মুখে পাথর চাপিয়ে রাখে এবং অধিকারী ভিন্ন অপরের দিকে তাঁদের দানের হস্ত প্রসারিত হয় না।

একটা প্রবচন আছে—"অজ্ঞতা যদি সুখের হয়, বিজ্ঞ হওয়া মূর্খতা।" আমি প্রবচনটাকে ঈষৎ সংশোধিত করতে চাই—"অজ্ঞতাই সুখের—বিজ্ঞ হওয়া মূর্খতা।" বিজ্ঞতা যে দুঃখের কারণ তা কে অস্বীকার করবে? জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ে সন্দেহ, সংশয়, সঙ্কোচ, দ্বিধা, উদ্বেগ, আশঙ্কা, অসন্তোষ, অভাব, ও দায়িত্ব—এবং এদের প্রত্যেকটিই যে দুঃখের বোঝা পিঠে নিয়ে বেড়িয়ে বেড়ায়. পর্য্যটকের তল্পীদারের মত এবং দুঃখ বিতরণে তেম্নি মুক্তহস্ত যেমন পাদ্রিরা মথি ও লুক লিখিত সুসমাচার বিতরণে, তা কে না জানে? যার যত বেশী জ্ঞান সেই তত বেশী ভাবে এ কাজ করলে ভাল হবে কি মন্দ হবে, পাপ হবে কি পুণ্য হবে। জ্ঞানীর দায়িত্বও তেমনি বেশী। সক্রেতিস্ ও বুদ্ধকে শাকচুরির জন্য ভগবানের কাছে যে জবাবদিহি করতে হবে, বিশু সর্দ্দারকে মানুষ খুনের জন্যও ততটা করতে হবে না।

জ্ঞানী ব্যক্তি অনাগত অমঙ্গলের চিন্তাতেই অধীর। তাঁর দৃষ্টি অদৃশ্য ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত। বিজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ তিন দিন ধরে লগারিথম্ কষে বের করলেন যে হ্যালির ধূমকেতুর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষ হওয়া খুবই সম্ভবপর, অম্নি তিনি নির্দ্দিষ্ট দিনের ছ মাস আগে হতেই দিন গুনতে আরম্ভ করলেন, দারুণ দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের সঙ্গে, কিন্তু আমরা নিশ্চিন্ত মনেই দিন কাটাতে লাগলুম। আবার পাশ্চাত্য মহাযুদ্ধের ভাবী ফল গণনা করতে গিয়ে আমরা যখন একটা কাল্পনিক দৈন্য দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ চিত্র দেখে আঁৎকে উঠেছি, তখন আমাদেরই কত নিরক্ষর কৃষক প্রাণ খুলে গান গেয়েছে আর লাঙ্গল চালিয়েছে—কেননা 'যার নেই উত্তর পুব তার মনে সদাই সুখ।'

জ্ঞানীরা সব বিষয়েই কেন কেন করে অস্থির। তাঁরা প্রত্যক্ষ নিয়ে কোন দিনই সন্তুষ্ট ন'ন—তার পিছনে যে একটা পরোক্ষ আছে—সেই পরোক্ষের জন্যই উদ্‌গ্রীব। অজ্ঞানীর সে বালাই নেই। সে অস্পষ্ট পূর্ব্ব-সূচনার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত নিয়ে সন্দেহ-দোলায় দোলেনা। তার মনের মধ্যে একটা পূর্ব্ব পক্ষ একটা উত্তর পক্ষকে ডেকে কূট প্রশ্ন করে না। সে সত্যের পূর্ণ আলোকে একদিন হঠাৎ চমকিত ও জাগরিত হয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। সত্য যত বড়ই অপ্রিয় হোক্ না, সে তিল তিল করে তার পূর্ব্বস্বাদ নিতে শেখেনি। সে তার সমস্ত তিক্ত রসটুকু এক মুহূর্ত্তে গলাধঃকরণ করে নিঃশেষ করে। জানি, বাস্তবের ক্লেশ আছে—কিন্তু আশঙ্কার ক্লেশের চেয়ে তা অনেক কম। যে সাপকে বিষধর বলে জানে না, সে একবারই সাপের মুখে হাত দেয় ও ভবলীলা সাঙ্গ করে, কিন্তু যে জানে তার প্রাণটা সাপ দূরে থাক, যখনই সাপের মত কিছু দেখে, তা সে এক গাছা দড়িই হোক্ আর খড়ই হোক্—তখনই গলা পর্য্যন্ত লাফিয়ে উঠে আছড়াতে থাকে।

বাসনাই দুঃখের মূল আর বাসনার বস্তু আমাদের চারিদিকেই ছড়ানো। জ্ঞানের বস্তু যতই বেড়ে যাচ্ছে ততই নতুন নতুন কাম্যবস্তু তার মধ্যে ঢুকে পড়চে। যে অসভ্য এখনও ঘর তৈরী করতে শেখেনি, সে গাছ তলায় শুয়েও ততটা অসুখী নয় যতটা অসুখী আমি রায় বাহাদুর খেতাব না পেয়ে বা আমার শিক্ষিতা স্ত্রী নতুন বায়স্কোপটা না দেখে।

অবশ্য কতকগুলো সুখ আছে জ্ঞানীই যার একমাত্র অধিকারী, অজ্ঞানী নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে আমি যে সুখ উপভোগ করি, মুদী বিশ্বম্ভর তা অনুভব করতে পারে না—কিন্তু দাশু রায়ের পাঁচালী আর গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর পড়ে বিশ্বম্ভরের মুখপদ্ম যেমন আনন্দে বিকসিত হয়ে ওঠে আমার তা হয় কি? তুমি বলবে আমার সুখটা

বিশ্বম্ভরের সুখ হতে উচ্চজাতীয়? আমি তা মানিনা—সুখের জাতিভেদ নেই। তীব্রতা আর স্থায়িত্বের ওজনেই তার মাপ।

কূট তার্কিকেরা হয়ত এখানে বলে বসবেন, না-ই হোক্ জ্ঞান সুখের কারণ, তবু তা অজ্ঞানের চেয়ে ভাল। জ্ঞান স্বতই বাঞ্ছনীয়, জ্ঞানই জ্ঞানের যথেষ্ট পুরস্কার। কথাটা শুনতে খুবই ভাল কিন্তু কজন লোক সুখ বেচে জ্ঞান কিনতে চাইবেন? যাদের আন্তরিক বিশ্বাস আছে যে জ্ঞানই সুখের বাহন, তারাই ছেলেদের জ্ঞানলালসা উদ্দীপিত করবার জন্য বলে—"লেখা পড়া করে যেই, গাড়ী ঘোঁড়া চড়ে সেই" কিন্তু যে সব ছেলেরা তাদের অভিভাবকদের চেয়েও তত্বজ্ঞ তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে 'লিখিবে পড়িবে মরিবে দুঃখে, মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে।"

অনেকে বলেন জ্ঞানই সত্য, সুতরাং জ্ঞানের উপাসনা করা মানেই সত্যের উপাসনা করা। কিন্তু সে কোন্ জ্ঞান? যে জ্ঞান অব্যয় অবিনশ্বর। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিশলে জল হয় এ জ্ঞান কি তাই? কে বলবে বৃহস্পতি গ্রহে ও দুটো জিনিষ মিশে চিনি হয় না? কে বলবে অশ্বিনী নক্ষত্রে দুই আর দুই মিলে পাঁচ হয় না?

আমাদের সব জ্ঞানই আপেক্ষিক কিন্তু আপেক্ষিক জ্ঞান নিরপেক্ষ সত্য হতে পারে না। যা নিরপেক্ষ সত্য নয়, তা শিবও নয় সুন্দরও নয়—কেন না শিব মানেই যা চিরন্তন, সুন্দর মানেই যা 'Never passes to nothingness'।

জ্ঞান যে অশিবত্বের মূল তা চোখের উপরেই দেখতে পাই। অর্থগৃধ্নু জ্যোতির্ব্বিদ গ্রহশান্তির দোহাই দিয়ে অজ্ঞানীর পকেট মারচেন, নরহন্তা বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অজ্ঞানীদের জীবন সংহার করে শান্তিকে ফাঁকি দিচ্ছেন—দুশ্চরিত্র দার্শনিক দার্শনিক শঠতায় ভ্রান্তি উৎপন্ন করে নিরীহ অজ্ঞানীকে অধর্ম্মের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।

তবে জ্ঞানকে আলো বলে কেন? জানি না। আলোর পাবনী শক্তির চেয়ে প্রকাশিকা শক্তিটাই আমরা বেশী চিনেছি। কিন্তু এই প্রকাশিকা শক্তির বলেই—আমরা এত বেশী আত্মপ্রকাশ ও বলপ্রকাশ করচি যে, দুর্ব্বল আত্মাগুলি একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। জ্ঞানের আলো আছেই বলেই আমরা বৃক্ষশিশুদের মত পাশাপাশি দাঁড়িয়েও ঠেলাঠেলি করে মরচি। তবে আমরা আমাদের নারী-জাতিকে ও-আলো হতে যথাসম্ভব বঞ্চিত রেখে কথঞ্চিৎ স্বস্তিতে আছি। তাদের আমরা নাকি বড়ই ভালবাসি, তাই পাছে জ্ঞানের অসহ্য আলোকে তাদের বাদুড়-কোমল মনশ্চক্ষু ঝলসে যায়—তাই তাদের জন্য স্নিগ্ধ অন্ধকারের ব্যবস্থা। তা ছাড়া সত্য বলতে কি, তাদের অশিক্ষিতপটুত্বই এত প্রলয়ঙ্কর যে তার উপর এক পোঁচ জ্ঞানের বার্নিস টানতেও ভয় হয়।

যীশু খ্রীষ্ট বারবারই বলেচেন যে স্বর্গরাজ্য শিশুর জন্য। আমাদের দেশের সাধু মহাত্মাদেরও সেই মত। কেন? শিশু অজ্ঞান—সংসারের পাপ এখনো তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। সে সরল। দু পয়সার জিনিষ হাতে দিয়ে চার পয়সা তার কাছ থেকে কেড়ে নেও, সে কথাও বলবে না। সে অনাসক্ত। এই সে একটা লাল কাঠের ঘোড়ার জন্য বায়না ধরলে—এমন উচ্চৈঃস্বরে ককিয়ে উঠলো যে বৃদ্ধা মাতাও পুত্রশোকে তেমন করে কাঁদেন না—আর এই একটা কমলা লেবু হাতে পেয়ে সব ভুলে গেল—কচি লাল ঠোঁট দুটি ফুলের পাপড়ীর মত হাসিতে ভরে উঠ্‌লো।

হে জ্ঞানী, তুমি শিশুর মত বিশ্বাসী হও—নৈলে তোমার পারত্রিক ভরসা অতি কম। তুমি হয় আবার ঠাকুরমার কথায় বিশ্বাস করতে শেখ যে চাঁদের বুড়ী হরিণ কোলে নিয়ে কাট্‌না কাট্‌চে—মেঘেরা শালপাতা খাবার জন্য দিগ্বিদিকে ছুটে যাচ্চে—নৈলে চেয়ে দেখ স্বর্গের লোহার দরজায় হুড়কো পড়লো।

খাঁটি খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে বলে যে, যে সংসারে এসে পুণ্য করলে সে অনন্ত কাল স্বর্গে থাকবে, যে পাপ করলে সে অনন্ত কাল নরকে পচবে। চমৎকার! মানুষ যত দিন শিশু থাকে ততদিন মোটেই পাপ করে না—সুতরাং শৈশবে যার পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি হয়, তার মত ভাগ্যবান আর কে আছে? এই হিসাবে কংশ ও হিরডের মত মহাপুরুষ অতি দুর্লভ। তাঁরা অনেক শিশুকে অক্ষয় স্বর্গে বসিয়ে দিয়েচেন। তবে আশ্চর্য্য এইটুকু যে তাঁরাও অপর শিশুহন্তাকে প্রাণদণ্ড দিতেন। মহাপুরুষত্বে

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

সকলের অধিকার কি ?

শিশুর ন্যায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকা বড়ই সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু এই দুই গুরুর উপদ্রবে আমরা ইচোড়েই জ্ঞানপক্ক হয়ে উঠি। শাসনকর্ত্তাদের উচিত গুরু-সম্প্রদায়কে একেবারে লোক-চক্ষুর অন্তরালে নির্ব্বাসিত করা।

যিনি যথার্থ জগতের হিতেচ্ছু—যিনি বিশ্বপ্রেমিক বলে পরিচিত হতে চান্—তিনি যেন বিলকুল জ্ঞানের পথ রুদ্ধ করে দেন—স্কুল কলেজ উঠিয়ে দেন ও লাইব্রেরীগুলিতে অগ্নিসংযোগ করেন। বিশ্বপ্রেম দেখাবার এর চেয়ে সহজ পন্থা আর নেই।

এইখানেই প্রবন্ধ শেষ করলুম। এখন জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয় শ্রেণীর পাঠকবর্গই বিচার করে দেখুন যে আমার কথাগুলি নিখাদ সত্য কি নিছক মিথ্যা, উৎকট তত্ত্ব কি বিকট পরিহাস।

মনের মানুষ

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

মনের মানুষ মনেই থাকে,
মিথ্যে তারে বাইরে খুঁজি'
খুব খোয়ালেম আয়ুর পুঁজি !
চোখের পাতায় যত্নে ঢাকি'
রাত্রে যারে গোপন রাখি
মধ্যদিনে পাতার ফাঁকে
মিথ্যে তারে বাইরে খুঁজি'
খুব খোয়ালেম আয়ুর পুঁজি !
মনের মানুষ মনেই থাকে,
স্বপ্ন দেখি নয়ন বুঁজি'।

আমার আপন সৃষ্টি সে জন,
মনের মানুষ আমার একা,
বাইরে কি তার মেলে দেখা
আমার মনের স্তন্যরসে
দেহ যে তার গড়চি বসে ;

মায়ের কোলে শিশুর মতন
মনের মানুষ আমার একা,
বাইরে কি তার মেলে দেখা !
আমার আপন সৃষ্টি সে জন,
গায়ে যে তার আমি লেখা।

আমায় আমি বাইরে খুঁজি'
বাহিরকে যে দেখনু না রে ;
দূরে দূরে রাখনু তারে।
বিচিত্র তার চোখের চাওয়া,
কেশের গন্ধ, শাড়ীর হাওয়া,
বিচিত্র তার পরশ বুঝি !
—বাহিরকে যে দেখনু না রে,
দূরে দূরেই রাখনু তারে !
আমায় আমি বাইরে খুঁজি'
নাই চিনিলাম বিচিত্রারে।

বাহিরকে তাই লবো যেচে
নাই হলো বা মনের মতো,
হয়তো মনোহর সে কত !
এবার আমি রইনু আশে—
আপন মানুষ কখন আসে।
মন যে এত মরছে বেছে
মন কি আমার মনের মতো ?
নয়কি মনোহর সে কত ?
বাহিরকে তাই লবো যেচে
রইবো না সে আত্মরত।

মুণ্ডমালিনী প্রেস

—গল্প—
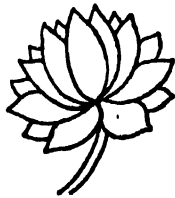
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

সেদিন কি একটা কারণে ১টার সময় ইস্কুলের ছুটি হয়েছিল। সকাল সকাল বাড়ী ফিরে এসে একখানা চটি বই হাতে করে বিছানার উপর শুয়ে পড়লুম। গরমের দিন দুপুর বেলায় এরকম একখানা বই মানুষের পুচ্ছের অভাব অনেকটা দূর করে দেয়। কারণ বাতাস খাওয়া ও মাছি তাড়ানো এ দুই কাজই ও দিয়ে চলে।

অন্তর্যামী ব'লে যদি যথার্থ কেউ থাকে ত সে মাছি। যতক্ষণ চঞ্চল চোখে লাইনের পর লাইন পড়ে যাচ্ছিলুম, ততক্ষণ মাছির দৌরাত্ম্য ছিলনা বল্লেই হয়, কিন্তু যেই চোখের তারা দুটি আধবোজা হয়ে স্থির হয়ে এসেচে অমনি কানের কাছে শব্দ হলো 'ভন্'। তারপর লাইন গুলোও যেমন চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগ্‌লো, আর তাদের অর্থগুলো অসংলগ্ন আব্‌ছায়ার মতন মস্তিষ্কের ছানাবাড়ীর মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগ্‌লো অমনি নাকের ডগায় করে উঠ্‌লো সুড়সুড়। তন্দ্রালুতার প্রথম আবেশের ভিতর দিয়েও যে অনুভূতিটা খুব অপরিচিত বলে মনে হ'লনা। নাসারন্ধ্র বা তার নিকটবর্ত্তী কোন স্থান যে কারো পথ বা গৃহ হতে পারে না, এইটুকু বুঝিয়ে দেবার জন্য বইখানাকে ঠিক বাগিয়ে ধরবো মনে করচি, এমন সময় কেন জানিনা হাতের মুষ্টি আরো শিথিল হয়ে গেল এবং বইখানা তির্য্যকভাবে হেল্‌তে হেল্‌তে বুকের উপর সটান উপুড় হয়ে পড়লো। যেই উপুড় হয়ে পড়া অমনি সঙ্গে সঙ্গেই শব্দ হলো 'বন্ বন্ ভোঁৎ' এবং কি, যেন দুটো ক্ষুদ্রকায় জিনিষ জড়াজড়ি করতে করতে আমার ঘাড়ের কাপড়ের মধ্যে সেঁদিয়ে গেল। এবার অবশ্য আমার স্বাধিকারপ্রমত্ত হাত চকিতের মধ্যেই বইখানাকে তুলে নিয়ে তার পূর্ব্ব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করালে।

বাঁধা-মলাট বই দিয়ে ছেলেদের উপদ্রব থামানো যার অভ্যাস আছে তার পক্ষে এ জিনিষ দিয়ে অশিষ্ট মাছিদের সায়েস্তা করতে আর কত দেরী লাগে? কিন্তু ঘরের মধ্যে এত জিনিষ থাক্‌তেও কেন যে তারা আমার শরীরটাকেই তাদের লীলাক্ষেত্ররূপে পছন্দ করলে এইটেই হ'ল সমস্যা। আমার শরীরে ত এমন কোনই 'ব্রণ' ছিলনা যা তাদের ইচ্ছার বিষয় হ'তে পারে; আর ইতর ব'লে যদি মিষ্ট রসেই তাদের অভিরুচি হয় তাহ'লেও আমি হলপ করে বলতে পারি আমার শরীরে মিষ্ট রস দূরে থাক্ রসের লেশমাত্রও ছিলনা। যা ছিল তা ছাত্র এবং গৃহিণী এই দুই প্রাণীতে পালা ক'রে ব্লটিং-এর মত শুষে নিয়েচে।

শেষে বুঝলুম ব্যাপারখানা কি। খুব সম্ভব আমার গাঁটবেরোনো লম্বা দেহটাকে তারা খেজুর গাছ ব'লে ভুল করে থাক্‌বে—বিশেষ করে যখন আমার উস্কো খুস্কো চুল একমাথা ঝাঁকড়া পাতার মতোই। অতএব আমার কপালের ঘর্ম্মবিন্দুকে যে তারা চাঁচে উপরকার রসবিন্দু বলে ভুল করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? এর জন্য হয়ত তাদের রুচির নিন্দা করতে পারি কিন্তু তর্কশক্তির নিন্দা করতে পারি না।

মাছিদের বুদ্ধি বেশী কি বোধ বেশী, তাদের মনোবিজ্ঞান মানুষের মনোবিজ্ঞান হ'তে কতটা পৃথক—এই সব তত্ত্ব ভাবতে ভাবতে আবার কখন ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি তা জানিনা। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গের কাহিনী হচ্চে এই। হঠাৎ মনে হল যেন শান্তিময় অজ্ঞানতার ক্ষেত্র কে চৈতন্যের লাঙ্গল দিয়ে চষচে। পরমুহূর্ত্তেই বুঝলুম সে লাঙ্গল আর কিছুই নয় মাছির শুঁড় এবং সে ক্ষেত্র আর কিছুই নয় আমার কপাল। এরূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য তা ভেবে ওঠবার আগেই আমার প্রভুভক্ত হাত আমার অজ্ঞাতসারেই বইখানাকে খুঁজে নিয়ে সবন্দে আমার গালের উপর বসিয়ে দিলে—আমাকে ধড়মড় করে উঠে বসতে হলো।

'নাঃ ঘুমোতে দেবেনা' বলে আমি কোঁচার মুড়ো দিয়ে

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে দাঁড়িয়ে উঠলুম এবং চোখ রগড়াতে রগড়াতে পশ্চিম দিকের জান্‌লাটা খুলে দিলুম। সূর্য্য তখন জান্‌লার সঙ্গে প্রায় মুখোমুখি হয়ে নেবে দাঁড়িয়েছে, খুলে দিতেই একরাশ সোনালি আলো প্রতীক্ষাকাতর অতিথিদের মত হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

"ঘুমোলুম কৈ? অথচ বেলা কাবার!"—মনে মনে একটা সন্দেহ হল যে সূর্য্য আজ সকাল সকাল অস্ত যাচ্চে। কিন্তু ঘড়ি দেখে সে সন্দেহ মেটাবার পূর্ব্বেই নীচে থেকে কলের জল, বালতি আর বাসনের শব্দ এসে কানে পৌছাল —বুঝতে পারলুম গৃহিণী তাঁর পাকরাজ্যে প্রবেশ করেছেন, বা জ্যোতিষের ভাষায় বল্‌তে গেলে রন্ধন-রাশিতে সংক্রমিত হয়েচেন। গা মোড়ামুড়ি দিয়ে, হাই তুলে, চোখমুখ ধোবার জন্যে নীচে নাবলুম।

আমার বিশ্বাস ছিল ঘুম থেকে উঠ্‌লে আমার চেহারাটা খুব ভারিক্কী ধরণের হয়, যদিও গৃহিনীর কাছে সে বিশ্বাস অনেকবারই চূর্ণ হয়ে গেছে। আমাকে নাবতে দেখেই তিনি ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি ঘুম ভাঙ্‌লো?' কল্পিত রাশভারিত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমি গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলুম—"ওঃ অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি —না?"—"না, এমন আর কি? এখনো সন্ধ্যে হবার দেরী আছে।"—হ্যাঁ একটু বেশীই ঘুমিয়েছি বটে—তা তুলে দিতে হয়।"

একটু ঝঙ্কার দিয়ে গৃহিণী বলে উঠ্‌লেন—"লোকের ত আর কাজ কর্ম্ম নেই—সবাই তোমার মত শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্চে কি না।"

তাঁর অনলস কর্ম্মশীলতার প্রতি হয়ত অবজ্ঞা দেখিয়ে ফেলেছি এই আশঙ্কায় আমি তাঁর তৃপ্তিজনক দু-একটা কথা এই ভাবে বল্‌তে গেলুম—"আহাহা—আমি কি তাই বল্‌চি—আমি কি জানিনা তুমি—"

কলের পাশে একটা ঘড়াকে দুম্‌ করে বসিয়ে দিয়ে গৃহিণী বল্লেন—"নাও নাও, মুখ ধোওয়া হয়েচে ত—যাও, এবার আড্ডা দিতে বেরোও।"

ঈষৎ হেসে আমি বল্‌তে যাচ্ছিলুম—'কোন্ আড্ডা তোমার চেয়ে মিষ্টি' কিন্তু 'কোন্ আড্ডা' এইটুকু মুখ দিয়ে বের হতেই তিনি বাধা দিয়ে বল্লেন—'যে আড্ডা হোক্ একটাতে গেলেই হ'ল কিন্তু একটা কথা বলে রাখি শোনো; সেই যে রাত দুপুর পর্য্যন্ত হাঁড়ি হেঁসেল নিয়ে বসে থাকবো, তা পারবোনা—মানুষের শরীর তো।' এই বলে ঘড়াটাকে একটা ঝাঁকির সঙ্গে তুলে নিয়ে গেলেন।

রান্নাবান্না এবং ঘরের কাজকর্ম্মে গৃহিণী আমাকে দ্রৌপদীর কথা মনে করিয়ে দিতেন এবং তাঁকে দেখে আমি এটাও কতক অনুমান করতে পারতুম, কি রকম বাক্য প্রয়োগ ক'রে দ্রৌপদী তাঁর স্বামীদের যুদ্ধে পাঠাতেন।

গৃহিনী রান্নাঘরে প্রবেশ করলেন দেখে আমি ধীরে ধীরে বাইরে যাবার উপক্রম করচি, এমন সময় তিনি হঠাৎ ঘাড় বেঁকিয়ে বল্লেন—'এখুনি বেরোচ্চ নাকি?—তা দাঁড়াও, কিছু জলটল খেয়ে যাও।'

এই জল খাবার কথায় আমার ধাঁ করে মনে পড়ে গেল যে আজ নিমন্ত্রণ আছে। গৃহিণীকে ত কিছুই বলা হয়নি—হয়ত এতক্ষণ অর্দ্ধেক রান্না শেষ হয়ে গেল।

মাথা চুলকোতে চুলকোতে আমি বল্লুম—'না, আজ যে— দেখ, আজ আর কিছু খাবনা।'

গৃহিনী জানতেন 'ক্ষিদে নেই' বলা আমার একটা রোগ, ওর কোন মানে নেই। তিনি মসলার পাত্র হ'তে খানিকটা হলুদ তুল্‌তে তুল্‌তে বল্লেন—'তার চেয়ে বিকেলে জল খাওয়া তুলে দাও—কাজ কি অত ঝঞ্ঝাটে? কম খেয়েই যদি ভা'ল থাকো, থাকোনা—আমার কি?'

এ রকম অবস্থায় লোকের হয় একেবারে মতিচ্ছন্ন হয়, কিছু বল্‌তে পারেনা, না হয় বরাত ঠুকে সব ব'লে ফেলে। আমার হল এই দ্বিতীয় দশা। আমার অতিরিক্ত ভয়টাই হাসি হয়ে ঠেলে বেরুলো। আমি হাসতে হাসতে বল্লুম —"আমি আজ মোটেই খাবোনা—আজ ভূপেনের বাড়ীতে নেমন্তন্ন—তার মেয়ের বে।"

থপ্ করে হলুদের ডেলা একখানা থালার উপর ফেলে দিয়ে গৃহিনী আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন—শেষে একটা হলুদ মাখা আঙুল চিবুকের নীচে ঠেকিয়ে বল্লেন— "খুব লোক যা হোক্—এখুনি বল্লে কেন? আরো খানিক-ক্ষণ নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও। ভাত চড়েচে, ডাল চড়েচে

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

কুটনো বাট্‌না সব তৈরী, এখন বল্লে কিনা নেমন্তন্ন!"

আমি কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলুম কিন্তু গৃহিণীর গলার সুর দেখ্‌তে দেখ্‌তে কড়ি-মধ্যমে চড়ে উঠ্‌লো—'পরের গতর কিনা, একটু মায়া দয়া নেই—আর পয়সার ছেরাদ্দই কি কম?—আমি যে কি করে চালাই সে আমিই জানি।'

আর দাঁড়িয়ে থাকা বা কোন রকম উত্তর দেবার চেষ্টা করা যে নিতান্ত মূঢ়তার কাজ এবং তাতে-ক'রে যে কড়ি-মধ্যম, কোমল রেখাবে না নেবে. তীব্র ধৈবতেই ঠেলে উঠ্‌বে তা অভিজ্ঞতার বলে বুঝে নিয়েই আমি সুড়সুড় করে দোতলায় উঠলুম।

উপরে এসে বিচার করতে বসলুম কোন্‌টা করা ঠিক্‌, নিমন্ত্রণ খাওয়া না বাড়ীতে খাওয়া। বাড়ীতে খাওয়ার বিপক্ষে অবশ্য বিস্তর যুক্তি ছিল—যেমন সে ত রোজই খাই, সে আর এমন কি হবে কিন্তু এই সমস্ত যুক্তি মিলেও তার স্বপক্ষের একটিমাত্র যুক্তিকে কাবু করতে পারছিল না। সে যুক্তিটি হচ্চে গৃহিণীর গলার ঝঙ্কার।

আধঘণ্টা কেটে গেল, তখনো ভাবচি যাব কি না, এমন সময় গৃহিণী সশরীরে উপরে উঠে এলেন। তিনি এসেই বল্লেন—'বসে রৈলে যে?' মনে হ'ল সুর কোমল রেখাবে না নাবুক্‌ গান্ধারের কাছ বরাবর নেবেইচে। তবু একটু কিন্তু মিস্ত হয়ে বল্লুম—'যাব কিনা তাই ভাবচি।'

নথ এবং নোলক দুয়েরই অভাবে নাক নাড়া দিয়ে গৃহিণী বল্লেন—'না, তা আর গিয়ে কাজ কি?' এবং তারপরেই ভৎর্সনামিশ্র উপদেশের স্বরে বল্লেন—'আচ্ছা তোমার কি রকম বুদ্ধি? লৌকলৌকতা না রাখলে চলে?'

"কিন্তু—এদিকে বাড়ীর ভাত নষ্ট হবে, সেটাও ত একটা ভাববার কথা।" ব'লেই আমি মনে করলুম খুব একটা উল্টো চাপ দিয়েছি।

গৃহিণী তীক্ষ্নস্বরে বল্লেন—"ওঃ তোমার ত সেই ভাবনায় ঘুম হচ্চে না। তোমার জন্যে ত আর কোন দিন কিছু ফেলা যায় না? ওসব ছেলেমানুষি রাখো। ভূপেন তোমার কতকালের বন্ধু—তার মেয়ের বে'ত আর একবার বই দুবার হবে না। সে কি মনে করবে? তার চেয়ে তোমার ভাত নষ্ট হওয়াটাই বড় হ'ল? এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ছেলে পড়াও কি ক'রে?"

গৃহিণী জানতেন না যে ছেলে পড়ানোর জন্য বিশেষ কোন বুদ্ধিরই দরকার হয়না—রক্তচক্ষু ধমক এবং বেত, বুদ্ধির অভাবকে বেশ ঢেকে রাখতে পারে কিন্তু এ বিষয়ে তাঁকে আলোকিত করা কর্ত্তব্য মনে করলুম না, ধীরে ধীরে উত্তর করলুম—'তবে যাই আর কি হবে।'

যাত্রার উদ্যোগ-পর্ব্ব যে এত শীঘ্র এসে যাবে তা ভাবতেই পারিনি, কাজেই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রথমেই জুতার খোঁজে প্রবৃত্ত হলুম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একপাটি আলমারির তলা থেকে এবং অপর পাটি বারান্দার জঞ্জালের ভিতর থেকে আবিষ্কৃত হলো।

বাড়ুন দিয়ে জুতো জোড়াকে একটু ঝেড়ে পুঁছে নিয়েই আলনা থেকে একটা তিলেধরা সার্ট পেড়ে ফেল্লুম। সার্টটা অবশ্য কাপড়ের চেয়ে কিঞ্চিৎ কম ফরসা বলে মনে হল কিন্তু ওরকম সামান্য গরমিল ত ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়, এই মনে ক'রে সবে সার্টটা গায়ে দিয়েছি এমন সময়ে নজর পড়লো গৃহিণীর খরদৃষ্টির দিকে। বুঝলুম কাজটা ভাল হচ্চে না। তাড়াতাড়ি সার্টের উপর একটা জীনের কোট চাপিয়ে—এবং অনিচ্ছুক জুতোজোড়ার মধ্যে সজোরে পা চালিয়ে দিয়ে—বেরিয়ে পড়তে গেলুম। কিন্তু সবে চৌকাঠ ডিঙিয়েছি এমন সময় গৃহিণী বলে উঠলেন—'মাগো, তোমার কি একটু ঘেন্নাপিত্তি নেই—এই বেশে যাচ্চ ভদ্রলোকের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে!' আমি ত্রস্তনেত্রে একবার নিজেকে আপাদবক্ষ নিরীক্ষণ করে বল্লুম—"তা এমন কি?"

সে কথার উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক মনে করে গৃহিণী একটা তোরঙ্গের সুমুখে হাঁটু পেতে বসলেন এবং পিঠের উপর থেকে আঁচলে বাঁধা চাবির গোছটাকে ঝনাৎ ক'রে ঘুরিয়ে নিয়ে তোরঙ্গের মুখে লাগালেন। তারপর তোরঙ্গের ভিতর হতে যে সব জিনিষ আমার জন্য টেনে বের করলেন—তার সম্বন্ধে এই বল্লেই যথেষ্ট হবে যে নিতান্ত ভয়ে ভয়েও আমাকে বল্‌তে হলো—"এ বয়সে আর এ সব কেন?"—বয়স কথাটার উল্লেখে বোধ হয় কোন দোষ হয়ে থাকবে—তাই গৃহিণী দমাস্‌ করে তোরঙ্গের ডালা বন্ধ করে বল্লেন—

"তবে আর কোন্ বয়সে পরবে? আমি মরে গেলে একটা দোজপক্ষে বিয়ে করে?" মুখে নির্বাক থাক্‌লেও মনে মনে আমি হেসে উত্তর দিলুম—"বিয়ের সাধ এই পক্ষেই মিটে গেছে।"

স্বহস্তে বেশবিন্যাস সমাপ্ত ক'রে যখন গৃহিণী আমাকে ছড়ি ও রুমালের 'ফিনিসিং টাচ্' দিয়ে ছেড়ে দিলেন, তখন সত্যই মনে হল আমি আর পচা পুরোণো মাষ্টার নই, ফালফিল কলেজের ছোক্‌রা বায়স্কোপ দেখ্‌তে যাচ্ছি—কিম্বা আরো কবিত্বের ভাষায় বলতে গেলে গড়ের মাঠের ফুরফুরে হাওয়া, যা ইডেন গার্ডেনের লতাকুঞ্জের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। একবার ইচ্ছা হচ্ছিল গৃহিণীর চুলবাঁধা আয়নাখানাকে চট্ করে খুলে নিয়েই মুখের সামনে ধরি কিন্তু ততটা প্রগল্‌ভতা করবার সুযোগ না দিয়েই গৃহিণী বল্লেন—"নাও এবার এসো —তোমার ত নড়তে চড়তেই ছমাস। শেষে কি বরযাত্রীর মত গিয়েই খেতে বসবে নাকি?—আর হাঁ দেখো—সেখানে ত কেউ খাও খাও বলে সাধবেনা—পারো ত আধপেটা খেয়ে এসো।" আমি হেসে বল্লুম—"বিলক্ষণ, আধপেটা যদি খাই ত সে এক-পেটার উপর।"

*   *   *   *

ভূপেনের বাড়ীর সামনে গিয়ে আমি একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে অথচ বিয়ের বাড়ী বলে মনে হচ্চেনা। ভূপেনের অবস্থাও ভাল, সে কঞ্জুসও নয় কিন্তু না বাজছে সানাই, না জলছে দৈনিক বরাদ্দের বেশী একটা আলো। একটু থতমত খেয়ে সদর দরজার সামনে পায়চারি করতে লাগলুম। কৈ? রাস্তার ধারে মাছের আঁশ জড় করা কৈ? আর লুচিভাজার গন্ধও ত পাচ্ছি না।

হয়েচে! বোধ হয় বেশী রাত্রে লগ্ন, লোকজন এখনো আসেনি। লোকজনও আসতে সুরু করবে, দেবে দুটো পাম্প্‌লাইট্ তুলে। সানাইওয়ালারা বোধ হয় সারাটা দিন বাজিয়ে এখন একটু ঘুমিয়ে নিচ্চে—এরপর ত আর ঘুমোতে পাবেনা। আর খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত? সে বোধ হয় এ বাড়ীতে জায়গা কম বলে গলির মোড়ের পুরোণো বাড়ীটাতেই হচ্চে।

মনে মনে এই রকম সওয়াল জবাব করচি এমন সময় বৈঠকখানা হতে ভূপেন আমাকে দেখতে পেয়েই বেরিয়ে এসে বল্লে—"আরে বিনোদ যে। এসো, এসো—দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কি করচো? বাড়ী চিন্‌তে পারচো না নাকি?" আমি হেসে বল্লুম—"কোনদিন চিনতে ভুল হয়নি আর আজ হবে? তাহলে যে আপ্‌শোষের সীমা থাক্‌বে না!"

ভূপেন রসিক লোক, হাঁ করলেই কথা বোঝে কিন্তু আজ যেন আমার কথার ভাবার্থটা ঠিক ধরতে পারলে না। ঈষৎ বিস্মিতভাবে আমার দিকে চেয়ে বল্লে—"আরে ব্বাপ্‌রে —এ আবার কি? ময়ূর কোথায় গেল?" ভূপেনের কথার খোঁচায় বুঝতে পারলুম গৃহিণী একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেচেন—বিয়ের নিমন্ত্রণের পক্ষেও মাত্রাটা ছাপিয়ে গেছে। যাই হোক্ অপ্রতিভ না হয়ে আমি হেসে বল্লুম—"পৌছে দিয়েই চরতে গেলো। এখানে ত তার ভক্ষ্য কিছু মিলবে না।" ভূপেন সগর্ব্বে মাথা নেড়ে বল্লে—"আলবৎ মিলতো, আমার পুকুরে কি শুধু রুই মাছই আছে। ইয়া বড় বড় জলঢোঁড়া—হাঁ ভালকথা বিনোদ, আমি মনে করচি, সেদিন পুকুরের মাছ দিয়েই সারবো। রেলের মাছের চেয়ে সে আরো ভালই হবে, কি বল?"—

সেদিন—কোন্‌দিন্! ওঃ বোধ হয় মেয়ে জামাই ফিরে এলে একটা প্রীতিভোজও হবে। আমি উৎসাহের সঙ্গে বল্লুম—"তার আর কথা। সেদিন সব বিশিষ্ট লোক আসবে।" ভূপেন মাথা চুলকে বল্লে—"বিশিষ্ট আর কি—এ পক্ষে আমার বন্ধুবান্ধবরা আর ওপক্ষে মাত্র শখানেক—তাও ছেলেছোক্‌রাই বেশী।'

এ রকম কথাও ত কখনো শুনিনি। বিয়ের পর প্রীতিভোজ—তাতে আবার ওপক্ষের লোক কেন? কিন্তু কর্ত্তার ইচ্ছে কর্ম্ম, আমার কথা বলা ভাল দেখায় না—তবে এটা ঠিক যে সেদিন যদি ওপক্ষের একশো আসে ত আজ কোন্ পাঁচশো না আস্‌বে? এ যে এলাহি কাণ্ড!—

আমাকে চিন্তাগ্রস্ত দেখে ভূপেন বল্লে—'অত ভাবচো কি?' আমি উত্তর করলুম—'না, ভাবচি, সব বসাবে কোথায়?' ভূপেন হেসে বল্লে—'কি বলচো হে—একশো

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

লোক বৈ ত নয়—আমার হু'চুটো বৈঠকখানায় কুলোবে না! নাও এসো—বাইরে দাঁড়িয়ে হিম খাওয়া ঠিক নয়।'

তা হলে আজও একশো। তাইত বলি। এর বেশী বরযাত্র হলে যে তাদের খাওয়াতেই রাত কাবার। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বল্লুম—"তারপর যোগাড় যন্ত্র আর কিছুই বাকি নেই ত?" "আছে বৈ কি—এর মধ্যেই কি সব হয়ে ওঠে—সেই সবই ত দেখাশুনো করছিলুম—এসোনা, খগেন গজেনও আছে—আমার ত তোমরাই ভরসা।"

বুঝলুম খগেন গজেন যথার্থ বাল্যবন্ধুর মতই তদ্বির করছে, লোক খাটাচ্চে এবং খুব সম্ভব পরিবেশনেও লেগে যাবে। আমি একটু লজ্জিত হয়ে বল্লুম—"দেখ ভুপেন আমার উচিত ছিল বটে এর আগেই চু, একবার আসা কিন্তু কি জানো তুমি ত বুঝতেই পারচো"—

"হ্যাঁ হ্যাঁ সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে না। তোমার সময় কোথায়? দিনের বেলায় স্কুল, রাত্রে পরীক্ষার কাগজ; —তবু যে তারই মধ্যে আজ সময় করে এসেছ—যাক্ এসেছ না খুব ভালই হয়েচে—দু'একটা বুদ্ধি পরামর্শ—আর এক কাপ্ গরম চাও খেয়ে যাবে।"—আবার মাথাটা গুলিয়ে গেল। শুধু এক কাপ চা! আজকের দিনে ভুপেন বলে কি!

ভুপেনর সঙ্গে তার বৈঠকখানায় ঢুকতেই গজেন লাফিয়ে উঠে বল্লে "এই যে বিনোদ তোমার কথাই হচ্ছিল,—তোমরা ত ভাই নাটোরের লোক?' আমি হাঁ-সূচক মাথা নাড়তেই সে খগেনের দিকে চেয়ে বল্লে 'দেখ্লি খগেন? তুইত বল্‌ছিলি রংপুর। আমার অমন ভুল হয় না।'

খগেনের হাতে একটা 'ষ্টিলপেন' এবং সামনে এক ফর্দ্দ লম্বা কাগজ ছিল। পেনের মাথাটাকে ফুর্ত্তির সঙ্গে কাগজের উপর ঠুকে সে বল্লে—"তবে ত ক্যাপিটাল—বিনোদ, এ ভারটা ভাই তোমাকেই নিতে হচ্চে—ভুপেন, এ তোমার ভীমনাগের বাবা—আমি এখুনি ভীমনাগ কেটে নাটোর, আর কালাকাঁদ কেটে কাঁচাগোল্লা বসিয়ে দিচ্ছি।'

গজেন বাধা দিয়ে বল্লে—'দাঁড়াও কাঁচাগোল্লাই যদি কর, তাহলে দইটাও চাই মোল্লার চকের। আচ্ছা বিনোদ—চণ্ডী গয়লাকে সেদিন তোমার বাড়ী দেখলুম না? —তোমার সঙ্গে বুঝি জানাশুনো আছে?"

আমি ঢোক গিলে উত্তর দিলুম—'না, জানাশুনো আর কি? আমাদের একটা হাঁপানির মাতুলী আছে না? কারো বা সারে কারো সারেনা। তা ওর ছেলেটার হয়েছিল হাঁপানী, কার কাছ থেকে খবর পেয়ে'—

'বুঝেছি বুঝেছি—ঠিক লেগে গেছে—ছোট লোক কিনা একটুতেই উপকার হয়। তা তাই এসেছিল এক হাঁড়ি দই দিতে?'—

'হাঁ, মাতুলীর দাম ত কিছু নিইনি।'

'বাস্ বাস্ এরই নাম যোগাযোগ—ভগবান ঘটিয়ে দেন।—তুমি কালই মোল্লার চকে যাও—বরং কিছু বায়না দিয়ে এসো—মোদ্দা এমন দই চাই যে ছুরি দিয়ে কাটা যায়; উপুড় করলে পড়েনা—তোমার কথা ফেলে এমন নেমকহারাম সে নয়।'

এবার ভুপেন আমার হয়ে একটা আপত্তি তুলে সবেমাত্র বলেছে—'কিন্তু বিনোদের ত সময়'—অমনি গজেন বাধা দিয়ে বল্লে—'কাল ত শনিবার—একখানা 'উইক-এণ্ড' নিয়ে চ'লে যাক্—পরশু আসতে পারে ভালই, না হয় সোমবার সকালে এলেও ক্ষতি নেই—স্কুল ত সাড়ে দশটায়।'

'কিন্তু ওকেই ত আবার নাটোরের বন্দোবস্ত" এই ব'লে ভুপেন আর একবার আমার ভার লাঘবের চেষ্টা করতেই গজেন একটি কথার তোপে সে চেষ্টাকে উড়িয়ে দিলে —"আরে না, না—সে জন্যেত আর ওকে নাটোরে যেতে হবে না—ওর কাকা দেশে আছেন—কাল বারো গণ্ডা পয়সা খরচ করে একখানা টেলিগ্রাম—কি যা ও ভাল বোঝে—বাস্, নিশ্চিন্দি।"

ভুপেনকে সম্যকরূপে নিরস্ত করেই সে আমার দিকে চেয়ে বল্লে—"তাহলে দই আর সন্দেশের ভার তোমার উপর রইলো, কেমন?" তার এই আদেশসূচক প্রশ্নের উত্তরে

কাজেই আমাকে মাথা চুল্‌কে বল্‌তে হলো—'হাঁ—তা আচ্ছা, দেখিতো।'

অল্প একটুখানি জিভ কেটে গজেন বল্লে—"সে কি কথা বিনোদ ?—সময় সংক্ষেপ, এখন কি আর দেখি-তো বল্লে চলে ? এই যে আমি পানের ভার নিয়েছি—তোমরা চোখ বুজে ঘুমিও, সন্ধ্যের আগে যদি সাতশো পানের একটি কম এসে পৌছয়—আমার যা খুসী তাই—কি আর বল্‌বো ?"

ফর্দ্দ হ'তে কলম তুলে খগেন বল্লে—"তুই চুপ্‌ কর্‌ গজেন—বিনোদ ত আর 'না' বলেনি। ও একটা 'রেস্‌পন্‌সিবল্‌' লোক—ওর 'দেখিতো' মানেই আলবৎ—মোদ্দা বিনোদ আর একটু কাজও তোমার করতে হবে ভাই—বোঝার উপর শাক আঁটি—সে তুমি ছাড়া কেউ পার্ব্বে না—দিব্বি করে গুছিয়ে একটি প্রীতি-উপহার—"

ভূপেন বাধা দিয়ে বল্লে—"অবার প্রীতি-উপহার কেন ? গুচ্চার ত ছাপানো হবে।"

খগেন উত্তেজিত হয়ে বল্লে—"সে গুচ্চারের সঙ্গে আমাদের কি ? এ হবে আমাদের তরফের আশীর্ব্বাদ—অর্থাৎ পিতৃ-স্থানীয় লোকের। আর গুচ্চার বাজে কাগজ বেরোবে বলেই ত একখানা ভাল কাগজ বেরোনো দরকার। না না বিনোদ, এ চাই-ই। তুমি বরং এখনি এখানে বসে লেগে যাও, তোমার আর কতক্ষণ লাগবে ?"

এতক্ষণে আমার হুঁস হল। বুঝলুম বিয়ের রাত্তির আজকে নয়, দু'চার দিন পরে। কিন্তু কি রকম হোলো ! আজ শুক্রবার এবং ১০ই সে বিষয়ে ত কোনই ভুল নেই। নিশ্চয়ই একটা কোন গণ্ডগোল হয়েচে।

যাই হোক্‌ ব্যাপার যে বড়ই গুরুতর হয়ে দাঁড়ালো। আমি যে জীবনে রাত-উপোষ করিনি, পেটে কিছু না পড়লে যে আমার ঘুম হয় না। আমি উদ্বিগ্নস্বরে বল্লুম 'কই ভূপেন তোমার চায়ের কি হলো ?' অভিপ্রায়, যে তাতেও যদি খানিকটা পেট ভরে, বা তার সঙ্গে যদি পেট ভরবার মত কিছু এসে পড়ে।

'ঐ যাঃ ভুলে গিয়েছিলুম' বলে ভূপেন চাকরকে ডেকে চা আনবার হুকুম দিলে কিন্তু আমার অদৃষ্টক্রমে চা এলেন অভিসারিকার মত একাকী। অগত্যা ঢক্‌ঢক্‌ করে তাই গলাধঃকরণ করে আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে গেলুম, কেননা এরপর খাবারের দোকানগুলোও বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু খগেন আমার কোমর জাপটে ধরে বল্‌লে, 'বোস বিনোদ, ব্যস্ত কি ? অনেকদিন পরে দেখা, তুমি ত খাও রাত বারোটায়; ও রাতটুকু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা তাঁর অভ্যাস আছে। নাও চট্‌ করে কবিতাটি লিখে ফেল।"

আমি কোনদিনই তেমন মুখফোঁড় নই—চেপে ধরলে যা হোক্‌ কিছু ব'লে লোকের উপরোধ এড়াতে পারি না। কিন্তু ওটা যে মানুষের একটা কতবড় সদ্‌গুণ তা বুঝলুম যখন রাত্তির সাড়ে এগারোটার সময় কবিতা লিখে এবং সন্দেশ ও দইএর দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বাড়ী ফিরলুম। 'পেটে খেলে পিঠে সয়' এ প্রবচনের মধ্যে যে কতখানি সুগভীর ও সুচিন্তিত সত্য নিহিত আছে তাও সেদিন যেমন হৃদয়ঙ্গম করলুম এমন পূর্ব্বে কখনো করিনি।

সদর দরজা বন্ধ ক'রে ধীরে ধীরে চোরের মত নিজের শয়ন-কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলুম। দেখলুম গৃহিণী তখনও জাগ্রত, একটি হ্যারিকেন টেবিলের উপর মিট্‌মিট্‌ ক'রে জ্বলচে। কোন কথা না ব'লে হ্যারিকেনটাকে উস্কে দিয়ে কাপড় ছাড়তে লাগলুম।

নীরবতা ভঙ্গ করে গৃহিণীই প্রথম জিজ্ঞাসা করলেন—'খাওয়ালে কেমন ?' আমি উত্তর করলুম 'ঐ একরকম—তুমি এখনো শোওনি যে ?'

"শুইনি, ইচ্ছা হয়নি তাই—বলি, আমার কথাটার উত্তর দাও না—কি কি খাওয়ালে ?"

"ঐ যেমন লোকে খাইয়ে থাকে—এখনো মশারি খাটাওনি ?" "কেন ঘুম পাচ্ছে বুঝি ? ঘুমিয়ো এখন—রাত ত ফুরিয়ে যাচ্ছে না। তুমি খেয়ে এলে আমার কি শুন্‌তেও নেই ?"

মুণ্ডমালিনী প্রেস

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

গৃহিণী ভাবছিলেন আমার ঘুম পাচ্চে বলেই আমি তাঁর শ্রবণ-লালসা চরিতার্থ করচি না। কিন্তু সত্য কথা বল্‌তে গেলে, আমার যা পাচ্ছিল, সে ঘুম নয়—কান্না। একে পেটের নাড়ীগুলো বিদ্রোহী হয়ে উঠে পরস্পরকে গ্রাস করবার চেষ্টা করচে, তার উপর মাথার মধ্যে দুর্ভাবনার দাবানল। কোথায় সপ্তাহের হাড়ভাঙ্গা খাঁটুনির পর শনি রবি দুটো বার ঘুমিয়ে এবং সরকারদের পুকুরে ছিপ ফেলে কাটিয়ে দোব—তা নয় দৌড়তে হবে মোল্লার চক আর নাটোর। অতিকষ্টে মনের ভাবের বাহ্যিক চিহ্নগুলোকে দমন ক'রে আমি বল্লুম—'কি আর শুন্‌বে? তেমন কিছু নয়।' ক্রুদ্ধ অভিমানের সঙ্গে গৃহিণী বল্লেন—'কেমন কিছু তা বল্লে দোষ আছে? সে ত হাতী ঘোড়া নয় যে মুখে বেধে যাবে।'

আর পাশ কাটানো চলে না। মনে মনে একটা খাদ্য-তালিকা তৈরী করে নিয়ে আউড়ে যেতে হলো। কিন্তু আবৃত্তির সময়ে যে দু'একটা পদ মুখে বেধে যাচ্ছিলনা তা নয়। গৃহিণীর চোখের কোণে একটা অনিশ্চিত কৌতুকের আলো জলছিল—তিনি ঈষৎ হেসে বল্লেন—'বলি, আসল কথাই ত বল্লে না—লুচি করছিল না পোলাও?' থতমত খেয়ে আমি বলে ফেল্লুম—'পোলাও'।—সমস্ত মুখে অপার বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি বল্লেন 'আশ্চর্য্যের কথা বটে—পোলাও এর সঙ্গে বেগুন ভাজা!" দু'একটা ঢোক গিলে নিয়ে আমি বল্লুম—'গোড়ার দিকে লুচিও দু'একখানা দিয়েছিল কি না।'—'আচ্ছা তা নয় দিয়েছিল, বলি ভুপেনবাবুর কি আক্কেল! এই শীতকালে কপির ছক্কা না করে, কর্‌লেন আলু কুমড়োর? এ ত গরীব মানুষও করে না।' এই কথা বলেই গৃহিণী এমন মর্ম্মভেদী জেরার দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন যে আমার মনে হল তিনি সরকারি ব্যারিষ্টার, আমি কাঠগড়ার আসামী। সামঞ্জস্যের খাতিরে অগত্যা আমাকে বল্‌তে হল—'না, না—কপির ছক্কা ত করেইছিল, তবে সেটা বরযাত্রদের দিতেই ফুরিয়ে গেল কি না—তাই শেষকালে"—বাধা দিয়ে গৃহিণী বল্লেন—"হ্যাঁ, হাঁ তা বুঝেছি—তা দেখো দেখো পা দিয়ে ওগুলো যেন উল্টে ফেলো না।" চম্‌কে উঠে পায়ের দিকে চেয়ে দেখি—কি যেন সব থালা চাপা রয়েছে। 'ও আবার কি?' বলেই আমি সরে দাঁড়ালুম! 'ও তোমার খাবার' বলে গৃহিণী থালার আবরণ উন্মোচন করলেন। দেখি একটা থালায় ভাত ও তিনটি বাটিতে যথাক্রমে ডাল, মাছের ঝোল, দুধ, অন্যদিনের মতই সাজানো রয়েচে। গুরু-ভোজনের নিদর্শনস্বরূপ একটা ঢেঁকুর তুলে আমি বল্লুম—'ও আর কি হবে?'—আসন পাত্‌তে পাততে গৃহিণী সংক্ষেপে উত্তর দিলেন 'খেয়ে ফেল।' 'পাগল নাকি?'—বলে আমি লুব্ধ দৃষ্টিতে খাদ্য-সম্বলিত থালার দিকে চেয়ে রইলুম। সে দৃষ্টি লক্ষ্য করে গৃহিণী মৃদুহাস্যের সঙ্গে বল্লেন—'নাও নাও বসে পড়ো—ভরা পেটের উপরেও ত মানুষ খেয়ে থাকে—আর তুমি যে লাজুক কথ্‌খনো পেট ভরে খাওনি।' আসনের দিকে এক পা এগিয়ে আমি শুষ্ক হাসি হেসে বল্লুম—"আচ্ছা ধরলুম পেট ভরে খাইনি—তা বলে কি আর অত"—হাতে ধরে আমাকে আসনের উপর বসিয়ে গৃহিণী বল্লেন—'অত আর কৈ? পার্কে এখন—আচ্ছা যা পার তাই খাও।"

অতঃপর গৃহিণী মশারি খাটাতে ব্যাপৃত হলেন এবং আমিও মৌখিক ইচ্ছার বিপরীত অনুপাতে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে নিযুক্ত হলুম। বলা বাহুল্য পাতে বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। মুখ ধোয়ার পর হাতে পান দিয়ে গৃহিণী বল্লেন—'এই ক্ষিদেটা নিয়ে ত থাক্‌তে।' আমি দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বল্লুম—'ক্ষিদে আর কৈ ছিল—তবে রেঁধে ফেলেছ, নষ্ট হবে, তাই জোর জার ক'রে—" মুখের উপর আঁচল চাপা দিয়ে গৃহিণী যেন একটা হঠাৎ এসে-পড়া কাশির উদ্বেগ দমন করতে করতে বল্লেন—'দয়ার অবতার—কত বিবেচনা!' এবং তার পরই টেবিলের উপর হ'তে একখানা লাল পোষ্টকার্ড এনে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—"আচ্ছা তুমিত বেশ লোক—ভুপেনবাবুর যে দুই মেয়ে তাত কোনদিন বলোনি। এক মেয়ের ত বিয়ে হয়ে গেল আজ, আর এক মেয়ের বিয়ে হবে দেখচি আস্‌চে শুক্রবার। ভাগ্যে ধোপার বাড়ীর কাপড় দিতে গিয়ে নেমন্তন্নর চিঠিখানা পকেট থেকে বেরিয়ে পড়লো

তবে না জান্‌লুম।" এক মুহূর্ত্তে বুঝতে পারলুম গৃহিণীর চাতুরী।—তিনি সবই বুঝতে পেরেচেন। এতক্ষণ আমাকে নিয়ে খেলাচ্ছিলেন মাত্র। কটমট করে চিঠিখানার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আমি দাঁতে দাঁত ঘসে বল্লুম—"মুণ্ড-মালিনী প্রেস! ওর মুণ্ড ছিঁড়লে তবে রাগ যায়। সাতের ছেপেছে একেবারে দশের মতন। সাতের তলার দিকটা নেই বল্লেই হয়!" হাসতে হাসতে গৃহিণী বল্লেন—"শোও, শোও, মাথা গরম করলে ঘুম আস্‌বে না।"

—:০:—

গতি

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

শৈলে প্রহত বজ্রের রবে চমকিয়া জাগে বেদনা;
সিন্ধুতাড়িত ঊর্ম্মি-লীলায় স্পন্দিত ঘন চেতনা।
ভেদিয়া ভেদিয়া জটিল সন্ধি,
ছেদিয়া ছেদিয়া কঠোর গ্রন্থি
ধীর জাগরণে যুগ যুগান্তে ছুটেছি অসীমে অবাধে;
মরি নাই আমি—জরি নাই আমি, গতি আবর্ত্তে অগাধে।
ফুটাইয়া যাই জ্যোতির বিশ্ব রোদনে সিক্ত হাসিতে,
প্রসারিয়া যাই স্নিগ্ধ আঁধার উজ্জ্বল-জ্বালা শাসিতে।
মূঢ় জড়তার পাষাণ-শাসন গূঢ় বেদনায় গলিছে,
দেশ-কাল-জয়ী মহা জাগরণ অসীম অঙ্গে জ্বলিছে।

বঙ্গীয় ভৌমিকগণের স্বাধীনতা-সমর

উপক্রমণিকা

—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

মেবার-গৌরব, ভারতের গৌরব, ক্ষুদ্র মেবার রাজ্যের অধিপতি মহাবীর প্রতাপ সিংহ তাঁহার পর্ব্বতসঙ্কুল অল্পায়তন দেশের স্বল্প জনবল লইয়া তখনকার পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট মহামতি আকবর শাহের সহিত আজীবন সংগ্রাম করিয়া স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়া গিয়াছেন। টড্ হইতে ভিন্সেণ্ট স্মিথ্ পর্য্যন্ত সমস্ত বিদেশী ঐতিহাসিক এক বাক্যে ধন্য ধন্য করিয়া মহাবীর প্রতাপের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, আর আমরা আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের অধিবাসী-বৃন্দ—বিশেষ করিয়া কাপুরুষতার অপবাদ-ক্ষুব্ধ বীরত্ব-লোলুপ নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ,—আমরা তো প্রতাপকে বীর্য্য-দেবতার আসনে বসাইয়া নিয়ত তাঁহার পূজা করিতেছি—গাথায়, গানে, কাহিনীতে, প্রতাপের বীরত্ব-কাহিনী বাঙ্গালার নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া দিয়া বাঙ্গালার বীরত্বের উদ্বোধন করিতেছি। মেবার অপেক্ষাও আজ বোধ হয় বাঙ্গালায় প্রতাপের কাহিনী অধিক পরিচিত।

কিন্তু অলীক কাপুরুষতা-অপবাদ দ্বারা নিতান্তই অন্যায় রকমে লাঞ্ছিত এই বাঙ্গালা দেশেরই অধিবাসিগণ, এই দেশেরই ভূম্যধিকারিগণ, প্রতাপের প্রতিদ্বন্দ্বী সেই আকবর বাদশাহেরই সহিত ত্রিংশবর্ষকাল কি অশ্রান্ত সমর করিয়া স্বাধীনতা-প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখিয়াছিল তাহা কি এই বাঙ্গালা দেশেই প্রতাপের কাহিনীর মত সুপরিচিত? প্রতাপের কীর্ত্তি কল্পান্তস্থায়ী হউক, কিন্তু বাঙ্গালী যে তাহাদের বীরগণকে সমুচিত সমাদর করে না এ দুঃখ রাখিবার যে স্থান নাই। ঈশা খাঁ ও কেদার রায়ের কীর্ত্তি আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। তাঁহাদের রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। তাঁহাদের সামরিক শক্তি, তাঁহাদের জীবনব্যাপী স্বাধীনতা-সমরের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের অল্পই ধারণা আছে। বাঙ্গালী ঐতিহাসিক তাঁহাদের ইতিহাস উদ্ধারে ব্রতী হইয়া Wise ও Beveridge-এর কথিত পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। পূর্ণাঙ্গ বিবরণের অভাবে আমরা এই পর্য্যন্ত উহাই পাঠ করিয়া আরও জানিবার আকাঙ্ক্ষায় অধীর হইয়া উঠিয়াছি।

প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস উদ্ধারের এ পর্য্যন্ত দুইটি প্রশংসনীয় উদ্যম হইয়াছে। প্রথম উদ্যম প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায়ের। তিনি রামরাম বসু প্রণীত এবং ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত প্রতাপাদিত্য চরিত্র নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থের নূতন সংস্করণ সম্পাদন উপলক্ষে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে আরও বহুবিধ উপাদান টীকা টীপ্পনি সহ তাহাতে জুড়িয়া দিয়া এবং বসু মহাশয়ের গ্রন্থেরও বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করিয়া "প্রতাপাদিত্য" নামে যে পুস্তক মুদ্রিত করেন, তাহা তাঁহার অতীব প্রশংসনীয় অনুসন্ধিৎসা ও পরিশ্রমের নিদর্শন স্বরূপ বহুকাল তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের যশোহর-খুলনার ইতিহাসে প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস সঙ্কলন আমাদের কথিত দ্বিতীয় প্রশংসনীয় উদ্যম। নিখিল বাবুর পুস্তক যখন প্রণীত হইয়াছিল (১৩১৩) তখন বাঙ্গালা দেশ স্বদেশী আন্দোলন প্রসূত প্রবল দেশাত্মবোধের বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে—দক্ষ শিল্পী ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য'' নাটকে প্রতাপাদিত্য তখন স্বাধীন প্রয়াসের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কল্পনার প্রতাপাদিত্য তখন বাঙ্গালা দেশের হৃদয়কে এমনি অধিকার করিয়াছিল, তথায় এমনি ভাবের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিল যে ঐতিহাসিক বিচাররূপ ঐরাবতের সাধ্য ছিলনা সেই স্রোতের সম্মুখীন হয়। তাহা

সত্বেও নিখিল বাবু যে আশ্চর্য্য বিচার ক্ষমতার নিদর্শন তাঁহার পুস্তকে রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়। মনে হয় শুধু যুগধর্ম্মেই বোধ হয় তিনি ঐতিহাসিকের একান্ত অবলম্বনীয় নির্ব্বিকার নিরপেক্ষ বিচার সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সতীশ বাবু অপেক্ষাকৃত স্থির আবহাওয়ায় তাঁহার একান্ত প্রশংসনীয় পুস্তক দুই-খণ্ডে সঙ্কলন সমাপ্ত করিয়াছেন। তিনি খাঁটি ঐতিহাসিক মাল মশলাও, প্রবীন ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের কৃপায় অধিকতর পরিমাণে ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। বিচার ক্ষমতার পরিচয় এবং সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা তাঁহার পুস্তকেও আছে। কিন্তু এই দুই জন সুযোগ্য ঐতিহাসিকই সেই স্বদেশী যুগের প্রতাপ-মোহ হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারেন নাই এবং তাহার ফলে প্রতাপ সম্বন্ধে তাঁহাদের সমস্তগুলি সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক বিচারে টিকিবে কিনা সন্দেহ।

বস্তুতঃ ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য বড় নির্ম্মম। তাঁহার সত্যানুসন্ধান চেষ্টায় বিন্দুমাত্র ইচ্ছাকৃত, মোহপ্রসূত বা অসতর্কতা-উদ্ভূত ত্রুটী থাকিলে চলে না। সতীশ বাবু ও নিখিল বাবু, উভয়ের পুস্তকেই প্রতাপাদিত্যের প্রতি একটা "বাহ্বা" "বাহ্বা" ভাব দেখা যায়। "আহা আমাদের বাঙ্গালার প্রতাপ, তাঁহার আদর্শ, তাঁহার চরিত্র বড়ই উচ্চ ছিল—তিনি মধ্যে মধ্যে দুষ্কার্য্য করিয়াছেন বটে, সে গুলি না করিলে নিতান্তই চলিতনা তাই করিয়াছেন,—আমরা সে গুলির সমর্থন করিতেছিনা—তবু"—ইত্যাদি। সত্যকথন-সম্বন্ধে স্নেহান্ধ আত্মীয়ের মত এই যে দুর্ব্বলতা, ইহা ঐতিহাসিককে বর্জ্জন করিতে হইবে। জাতীয় চরিত্র গঠনের জন্য আদর্শের দরকার। বীরত্বের আদর্শ চাই, মহত্বের আদর্শ চাই, দৃঢ়তার আদর্শ চাই। অতীতের মধ্যে যদি তাহা খুঁজিয়া না পাই তো আমরা আত্মবলে ঐ সকল গুণ অর্জ্জন করিয়া ভবিষ্যের আদর্শস্থল হইব। মিথ্যা অতীতের উপর যদি আমরা আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই তবে তাহার ফল মঙ্গলময় হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।

বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে ঢাকার বিখ্যাত ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবই বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩য় সংখ্যায় প্রথম বঙ্গীয় ভৌমিকগণের ইতিহাস উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন। কর্ণওয়ালিসের শাসন কালে বঙ্গে রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রস্তাবে যখন ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীগণের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ চলিতেছিল তখন তর্কের এক প্রধান বিষয় হইয়াছিল এই যে আকবর যখন বঙ্গ বিজয় করেন তখন বঙ্গভূমির প্রকৃত মালিক ছিল কে? মিঃ রাউজ (C. W. B. Rouse) নামক এক ভদ্রলোক এই সময়ে Dissertation Concerning the Landed Property of Bengal নামে একখানা পুস্তক রচনা করেন এবং ঐ পুস্তক খানা ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। মিঃ রাউজই এই পুস্তকে প্রথম প্রচার করেন যে বঙ্গভূমিতে ঐ সময় বার-ভূঞার অধিকার ছিল এবং তাঁহাদের পাঁচ জন পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে রাজত্ব করিতেন। ওয়াইজ সাহেব এই ইঙ্গিতের অনুসরণ করিয়া প্রশংসনীয় উদ্যমের সহিত তাঁহার উল্লিখিত প্রবন্ধে নিম্নলিখিত পাঁচ-ভূঞার ইতিহাস উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

১। ভাওয়ালের ফজল্ গাজী
২। বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়
৩। ভুলুয়ার লক্ষণ মাণিক্য
৪। চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্প নারায়ণ
৫। খিজিরপুরের মসনদ্-ই-আলি

ওয়াইজের সংগৃহীত মাল মশলাই ভৌমিকগণ সম্বন্ধে লিখিত পরবর্ত্তী লেখকগণের সমস্ত লেখার ভিত্তি।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার ১৮১-১৮২ পৃষ্ঠায় একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ওয়াইজ সাহেব আবার বার-ভূঞার প্রসঙ্গের অবতারণা করেন এবং মেনরিক পার্কাস্ ইত্যাদি ঐ যুগের পাশ্চাত্য লেখকগণের লেখার আলোচনা করিয়া আরও কিছু নূতন তথ্য দিতে চেষ্টা করেন। এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গের মুসলমান যুগের খাঁটি ইতিহাসের উদ্ধার কর্ত্তা প্রসিদ্ধ ব্লখ্ম্যান সাহেব তৎকৃত আইন-ই-আকবরী অনুবাদের ৩৪২ পৃঃ পাদটীকায় এবং অন্যান্য স্থানে

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

এবং তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ Contributions towards the History and Geography of Bengal-এর বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার ১৮৭৩ সনে প্রকাশিত প্রথম কিস্তিতেও নানা স্থানে বার-ভূঞা-প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

এই পত্রিকারই ১৯০৪ সনে প্রকাশিত ৫৭ পৃষ্ঠায় পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত, বাখরগঞ্জের ইতিহাস-লেখক আকবর-নামা ও অন্যান্য পারস্য ইতিহাসের অনুবাদক শ্রীযুক্ত বেভারিজ সাহেব দ্বাদশ ভৌমিকের প্রধান ভৌমিক ঈশা খাঁ সম্বন্ধে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লেখেন। স্থানীয় ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাবে যদিও তিনি ঈশা খাঁর তথা-কথিত রাজধানী "কত্রাভূ" নগরীর নাম ও অবস্থান লইয়া বিবিধ আলোচনা করিয়াও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, তবু তিনিই প্রথম আকবর-নামার সাহায্যে ঈশা খাঁর কাহিনীকে দৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে প্রয়াস পান। ঈশা খাঁর জীবনব্যাপী স্বাধীনতা-সমরের মর্য্যাদা দুর্ভাগ্য ক্রমে বেভারিজ সাহেবও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। করিলে তিনি ঈশাখাঁর কাহিনী এমন তাচ্ছিল্যের সহিত আলোচনা করিয়া আকবর-নামার কোন্ কোন্ পৃষ্ঠায় ঈশাখাঁর কাহিনী আরও পাওয়া যাইবে তাহার উল্লেখ মাত্র করিয়া নানা অবান্তর বিষয়ের আলোচনায় মূল বিষয় ভুলিয়া যাইতেন না। আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য, গতানুগতিকার প্রভাব এতই প্রবল, যে বেভারিজ কথিত আকবর-নামার পত্রাঙ্ক গুলি উল্টাইয়া দেখিবার লোকও এ পর্য্যন্ত জুটে নাই, বেভারিজ কর্ত্তৃক উল্লিখিত পৃষ্ঠা গুলি ছাড়া অন্য আর কোন পৃষ্ঠায় ঈশা খাঁ বা অন্য ভৌমিকগণ সম্বন্ধে আর কিছু পাওয়া যায় কি না, তাহাও যে কেহ দেখেন নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকারই ১৯১৩ সনে (৪৩৭-৪৪৯ পৃঃ) আবার পাদ্রি হোষ্টেন সাহেব বার-ভূঞা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি পাশ্চাত্য পর্ত্তুগীজ লেখক-গণের লেখা আলোচনা করেন এবং তাঁহাদের কথিত সলিমনবাস্ (Salimanvas) কট্রাবো (Catrabo) এবং চেণ্ডিকান্ (Chandican) এই স্থান ত্রয়ের অবস্থিতি নির্ণয়ের জন্য যত্নবান হ'ন্। বার-ভূঞা কাঁহারা ছিলেন এবং তাহাদের সংখ্যা দ্বাদশ হইল কেন এই আলোচনা দ্বারা তিনি প্রবন্ধের পরি-সমাপ্তি করেন। হোষ্টেন সাহেবের প্রবন্ধ হইতেই প্রথম জানা যায় যে প্রতাপাদিত্য ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তো বাঁচিয়া ছিলেনই ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দেও তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। এবং সম্ভবতঃ ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তাঁহার পতন হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শ্রীযুক্ত যদু বাবু, অথবা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়, এই দুই জনের একজনও এই কথাটি লক্ষ্য করেন নাই।

পাশ্চাত্য লেখকগণের মধ্যে আর একজন লেখকের লেখা উল্লেখযোগ্য। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ জে-জে-এ-কেম্পোস্ নামক এক সাহেব History of the Portuguese in Bengal নামে একখানা পুস্তক প্রকাশিত করেন, এই পুস্তকেও বার-ভূঞাদের প্রসঙ্গ আছে। কেম্পোস্ সাহেব নূতন কথা বড় কিছু বলেন নাই তবে নিখিল বাবু তাঁহার প্রতাপাদিত্যের পরিশিষ্টে ডুজ্যারিক হইতে উদ্ধৃত অংশের যে অনুবাদ দিয়াছেন তাহাতে এই সাহেব কিছু কিছু ভুল দেখাইয়াছেন, (P. 68, foot note.)

"সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকে স্বরূপচন্দ্র রায় মহাশয় যে ঈশা খাঁর বিবরণ সঙ্কলন করেন, বাঙ্গালী লেখকগণ কর্ত্তৃক বার-ভূঞার ইতিহাস উদ্ধার চেষ্টার মধ্যে তাহাই বোধ হয় প্রথম উল্লেখযোগ্য উদ্যম (১২৯৬ সন, ইং—১লা নভেম্বর, ১৮৯০)। ১৩১২ সনে কেদার নাথ মজুমদার মহাশয়ের "ময়মনসিংহের" ইতিহাস প্রকাশিত হয়। ঈশা খাঁর ইতিহাস,ইহাতেও মোটামুটি আছে। এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের "মহারাজ প্রতা-পাদিত্য" প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে ঐতিহাসিক বিচারান্তে সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা বড়ই অল্প, প্রকৃতপক্ষে ইহা রামরাম বসু প্রণীত "প্রতাপাদিত্য চরিতের" উচ্ছ্বাস-পূর্ণ বিবৃতি মাত্র। ১৩১৩ সনে নিখিল নাথ রায় মহাশয়ের "প্রতাপাদিত্য" প্রকাশিত হয়। ইহার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তক নিখিল বাবুর অসাধারণ পরিশ্রম-ক্ষমতার নিদর্শন, ঐতিহাসিক বিচার-শক্তিও ইহাতে যথেষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে।

দুর্ভাগ্য ক্রমে এই চমৎকার পুস্তকখানাও স্বদেশী যুগের প্রতাপাদিত্য-মোহ হইতে মুক্ত নহে।

১৩০৭ হইতে ১৩১৩ সন পর্য্যন্ত "নির্ম্মাল্য" ও "নব্যভারত" পত্রিকায় আনন্দ নাথ রায় মহাশয়ের বার-ভূঞা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৩১২ সনে এই পুস্তক মুদ্রনার্থ প্রেরণ করা হয় এবং ১৩১৮ সনে বার-ভূঞা পুস্তক প্রকাশিত হয়। বার-ভূঞার ইতিহাস উদ্ধারের জন্য রায় মহাশয় নানা ক্ষতি-পূর্ণ ঘটনার মধ্যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং বিবিধ নূতন তথ্যও সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু গাল-গল্প ও জন প্রবাদের প্রমাণ এবং খাটি ঐতিহাসিক প্রমাণ, পুস্তকের অনেক স্থানেই সমান মর্য্যাদা লাভ করায় পুস্তক খানি খাঁটি ইতিহাসপদবাচ্য হইয়া উঠে নাই।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত "কেদার রায়" ১৩২০ সনে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে কেদার রায় সম্বন্ধে ঐতিহাসিক নূতন খবর বিশেষ কিছুই নাই তবে দেশ-প্রচলিত কিংবদন্তি অবলম্বনে, কেদার রায়ের বংশ পরিচয়, কেদার রায়ের পার্শ্বচরগণের পরিচয়, স্মৃতিসম্পর্কিত স্থানসমূহের বর্ণনা ইত্যাদি যথাসম্ভব দেওয়া আছে। গ্রন্থখানা পড়িয়া মনে এই ধারণা আসিয়া যায় যে কেদার রায়ের ইতিহাস উদ্ধারে গ্রন্থকার যথোপযুক্ত পরিশ্রম করেন নাই।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের "যশোহর খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড" ১৩২৯ সনে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের কথাও পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তক সতীশবাবুর অসাধারণ পরিশ্রমের ফল, কিন্তু সতীশবাবু পরিশ্রমের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, বিচারক্ষমতার তেমন পরিচয় দিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারিলে আনন্দিত হইতাম। আগামী ও তৎপরবর্ত্তী সংখ্যার প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধে আলোচনার সময় এই সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করা যাইবে।

স্ত্রী

—গল্প—

—শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১

প্রসন্ন দাশের স্ত্রী মনোরমা যেদিন স্বামীর ঘর করিতে আসে সেদিন তাহাদের অবস্থা ভাল ছিল না। সেই থেকে কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্নর উপর ক্রমে প্রসন্নই হইয়াছেন। সে মনে করিত এসব তাহার স্ত্রীর পুণ্যে। পাড়ার লোকেও অস্বীকার করিত না। কিন্তু লক্ষ্মীর সঙ্গে নাকি যমরাজের বিরোধ আছে। তাই সহসা একদিন সামান্য একটু সর্দ্দিজ্বর উপলক্ষ্য করিয়া, স্বামীপুত্র, পুকুর, বাগান, তিনটি ধানের গোলা, দুইটি দুগ্ধবতী গাভী, এই সকলের সুমুখে হাসিতে হাসিতে মনোরমা চক্ষু বুজিল। পাড়ার লোকে এবারেও তার কপালের জোর দেখিয়া খুসীই হইল। কিন্তু প্রসন্ন তাতে আর যোগ দিতে পারিল না।

প্রসন্ন স্ত্রীকে ভালবাসিত। সে কান্নাকাটা করিল না, কাহারও কাছে দুঃখও জানাইল না। শূন্যঘরের বারান্দায় বসিয়া দিনদুই কি ভাবিল। তারপর আগের মতই চাষবাস দেখিবার কাজে লাগিয়া গেল। পাড়ার তরুণীর দল বলাবলি করিল লোকটা কি কাঠখোট্টা!

প্রসন্নর আত্মীয় স্বজনের মধ্যে এমন লোকের অভাব ছিলনা যাহারা তাহার তিন বছরের ছেলের ভার নিতে পারে। কিন্তু প্রসন্ন কাহারও কাছেই গেল না। সকালবেলা রাঁধিয়া খাইয়া, ছেলেকে খাওয়াইয়া, সঙ্গে করিয়া মাঠে চলিয়া যাইত। যতক্ষণ কাজ দেখিত, রাখাল গাছের ছায়ায় কখনো ঘুমাইয়া থাকিত, কখনো অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলা করিত। বেলা গড়াইয়া গেলে আবার বাবার কাঁধে চড়িয়া বাড়ী আসিত। পথে দেখা হইলে কেহ হয়তো বলিত, 'আহা হা, ছেলেটাকে মেরে ফেললি, প্রসন্ন। নিয়ে আয় না ওর মাসীকে, সে তো আসতেই চায়।' প্রসন্ন জবাব দিত না। বাড়ী আসিয়া রোদে পোড়া ছোট্ট শুষ্ক মুখখানির দিকে চাহিয়া থাকিত। দুই ফোঁটা জল চোখের কোণে গড়াইয়া আসিত। নিঃশ্বাস ফেলিয়া, উপরের দিকে চাহিয়া বলিত, 'তার হাতের ধন, একি আমি আর কারো হাতে দিয়ে স্থির থাকতে পারি? বাপরে!'

সেদিন সকাল থেকেই রাখাল কেন যেন ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রসন্ন যত জিজ্ঞাসা করে, জবাব দেয়না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া বাপের চোখে তাকায় আর কেবল কাঁদে। প্রসন্নর মনের ভিতরটাও শুষ্ক ছিল না, হয়তো একই কারণে। সেদিন আর মাঠে যাওয়া হইল না। রাখাল কাঁদিতে কাঁদিতে ধূলার উপরেই ঘুমাইয়া পড়িল। বাহিরে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। তাহারি মধ্যে চক্ষুদুটি ডুবাইয়া দিয়া প্রসন্ন বসিয়া ভাবিতেছিল। বৃদ্ধ রামদাস চাটুয্যে প্রাত-র্ভ্রমণ শেষ করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া বারান্দায় উঠিলেন। অন্যদিন প্রসন্ন তাঁহাকে সশ্রদ্ধভাবে অভ্যর্থনা করিত; কিন্তু আজ যেন লক্ষ্যই করিল না। চাটুয্যে মনে মনে রাগিলেন কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করিলেন না। কিছু ধানের প্রয়োজন ছিল। নিজেই আসন গ্রহণ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'বুঝতে পারছি, প্রসন্ন, সব বুঝ্‌তে পারছি। কিন্তু কিছু লাভ নেই। শুধু শরীর ক্ষয়। সতীসাধ্বী নিজের পুণ্যে স্বর্গে গেছেন। তাঁর এই সোনার সংসার যেন ভেসে না যায়, এইটে দেখাই তোমার কর্ত্তব্য। আমি বলি, একটি বিয়ে কর। ছেলেটা বাঁচুক।', প্রসন্ন মৃদু হাসিয়া কহিল, 'ঐ হুকুম আর করবেন না, চাটুয্যে মশাই। যার জন্যে বিয়ে সে তো আমার আছেই। আশীর্ব্বাদ করুন সেইটুকুই যেন আমার কপালে বজায় থাকে। এর বেশি আর আমি কিছুই চাই না।' বলিতে বলিতে তাহার সমস্ত শরীরটা যেন একবার চমকিয়া উঠিল। রাখালকে আর একটু কাছে টানিয়া নিয়া ধীরে ধীরে গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

দিন পাঁচ ছয় পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা অঘোর ডাক্তার বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। প্রসন্ন ঝড়ের মত ছুটিয়া গিয়া তাহার পা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ডাক্তার বাবু, সর্ব্বনাশ

হ'য়েছে।" ডাক্তার, কি হইয়াছে বুঝিবার জন্য খানিকটা বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে প্রসন্নর বাড়ী পৌছিয়া দেখিলেন রাখালের পায়ের তলা থেকে একটা প্রকাণ্ড বেলের কাঁটা খোলা হইয়াছে। একজন প্রতিবেশী তাহার মাথায় তেলজল দিয়া হাওয়া করিতেছে। মাঠে কিছু কলাই কাটা ছিল। তাহাই আনাইবার বন্দোবস্ত করিতে প্রসন্নকে হঠাৎ বিকালে বাহিরে যাইতে হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখে এই ব্যাপার।

ডাক্তার ও প্রতিবেশীরা একে একে চলিয়া গেলে প্রসন্ন চাকরকে ডাকিল। কহিল, 'কাল ভোরে হাট। গরুগুলো নিয়ে রাত এক প্রহরের মধ্যেই বের হওয়া চাই। শীগ্‌গির খেয়ে নেগে।' বৃদ্ধ রামচরণ অনেক দিনের চাকর। প্রভুর কথা বুঝিতে না পারিয়া চাহিয়া রহিল। প্রসন্ন ধমক দিয়া কহিল, 'কি, কথা বুঝি মাথায় ঢোকেনা? আর চাটুয্যে মশাইকেও একবার ডেকে দিয়ে যাস। জমিগুলোরও একটা বিলি ব্যবস্থা করতে হবে।' সেদিন রাত্রে প্রসন্ন বিছানা স্পর্শও করিল না। একবার শূন্য গোয়ালঘরে, একবার পুকুরঘাটে, একবার রাখালের কাছে ছুটোছুটি করিতে লাগিল। ভোরের দিকে বারান্দার খুঁটি হেলান দিয়া বোধ করি একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছিল। হঠাৎ একটা অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠে চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, ক্যালো গোরুটা প্রাণপণে ছুটিয়া বাড়ী ঢুকিতেছে। অবোলা পশু প্রভুর গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের দিকে ক্যাল্ ক্যাল্ করিয়া চাহিয়া হাঁপাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে রামচরণ অন্য গোরুগুলি নিয়া আসিল এবং সংক্ষেপে কহিল, 'এগুলো একরকম নেওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু এটাকে আর সামলানো গেলনা। দড়ি ছিঁড়ে ছুটে এল।' প্রসন্ন অবাধ্য বলদের ঘর্ম্মাক্ত দেহে হাত বুলাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে কহিল, 'ফের যদি তুই আমার গোরু কোন-দিন হাটে নেবার নাম করিস্ তোকে দেখিয়ে দেবো।' রামচরণ জবাব দিল না।

রাখালের মাঝে মাঝে জ্বর হইত। এবার একটু বেশি দিনের ভোগে পড়িয়াছিল। সকাল থেকে সেই যে ভাতের জন্য বায়না ধরিয়াছে, কিছুতেই থামিতেছিল না। প্রসন্ন কহিল, 'ওরে তোর মায়ের কাছে যাবি?' শিশু [illegible] উঠিয়া বসিল,—'যাবো বাবা'—'যাস্। তোর নতুন মা আসবে, তার কাছে যাস্। পারবি তো থাকতে?'

ছেলে খুসী হইয়া কহিল, 'পারবো বাবা'। সেদিন রাখাল আর ভাত চাহিল না। বিনা আপত্তিতে একবাটি বার্লি খাইয়া ফেলিল, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল।

কিছুদিন পরে প্রসন্নর বাড়ীতে ঘনঘন অচেনা লোকের আনাগোনা চলিল। পাড়ার লোকে মানে বুঝিল না। আরো কিছুদিন পরে, এবং পাড়ার লোককে মানে সম্বন্ধে তেমনি অজ্ঞ রাখিয়াই সহসা, একদিন প্রসন্ন একাই কোথায় চলিয়া গেল। কিন্তু ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল, সঙ্গে একটি পাল্‌কি, এবং তাহার মধ্যে থেকে বাহির হইল, একটি ঘোমটাঘেরা সতেরো আঠারো বছরের মেয়ে, সঙ্গে একরাশ রূপ এবং একবোঝা গয়না। সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। ঠাট্টার সম্পর্কে দুই একজন কহিল, 'আরে ভায়া এত লুকোচুরির কি দরকার ছিল? আমরা কি কেউ কেড়ে নিতাম?' কেহ বলিল, 'যাইহোক, এবার বৌভাতের খাওয়াটা যেন—ইত্যাদি।' প্রসন্ন কথা কহিল না। আগাগোড়া কেমন বেমানান ভাবে গম্ভীর হইয়াই রহিল।

২

প্রসন্ন স্ত্রীর শুধু একটি জিনিষই দেখিয়াছিল। সে বয়স। তাহার রাখালের জন্য এইটুকুই যে সবচেয়ে দরকার। কিন্তু আরও একটি জিনিষ যে না-চাহিতেই তাহার ঘরে আসিল, তাহা সে আগে দেখে নাই। সে তাহার স্ত্রী ললিতা। একদিন আড়াল থেকে সহসা তাহার উপর চোখ পড়িল। প্রসন্ন মুগ্ধ হইল না। অজ্ঞাতসারে মনটা যেন একবার চমকিয়া উঠিল। রাখাল চলিয়া যাইতেছিল, তাহাকে কাছে ডাকিয়া কহিল, 'তোর মাকে দেখেছিস?' বালক কথা কহিল না। কিসের অজ্ঞাত আশঙ্কায় প্রসন্নর বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। ছেলের হাত ধরিয়া দ্রুতপদে স্ত্রীর ঘরের দিকে চলিতে লাগিল। ললিতা দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিল। সুমুখে একটা প্রকাণ্ড আয়না। চারিদিকে প্রসাধনের সম্ভার। বিপর্য্যস্ত

বানলো স্কুলে পিঠ ঢাকিয়া পড়িয়াছে।' প্রসন্ন ছেলেকে তাহার মায়ের হাতে সঁপিয়া দিতে আনিয়াছিল। দ্বারের পাশে আসিয়া কিসের একটা সংশয় যেন তাহার পা দুটি চাপিয়া ধরিল। সহসা মনে হইল, এ কে? আয়নায় স্বামীর ছায়া পড়িতে ললিতা সলজ্জ মৃদুহাস্যে উঠিয়া দাঁড়াইল। ফিরিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে যেন পরক্ষণেই তাহার মুখের সমস্ত দীপ্তি এক নিমেষেই কে ফুঁ দিয়া নিবাইয়া দিল। সেই কুৎসিৎ-সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া প্রসন্ন ভয় পাইল, কিন্তু কিছুই বলিল না। ধীরে ধীরে তেমনি ছেলের হাত ধরিয়াই সরিয়া গেল।

ললিতার বেলায় উঠিবার অভ্যাস ছিল। স্বামীর ঘরে যখন আসিল, সে অভ্যাস নিয়াই আসিল, এবং তাহা ছাড়াইবার জন্য কেহই চেষ্টা করিল না। ভোর হইতেই রাখালের ভাত চাই। প্রসন্ন স্ত্রীর কাছে তাহার কোন দাবী জানাইল না, আগেকার মত নিজের হাতেই সে ভার রাখিয়া দিল। ললিতা তিন দিন দেখিল। চতুর্থ দিন রান্নাঘরে আসিয়া কহিল, 'আমি তো সকাল বেলা মরে থাকিনা। ডেকে দিলে উঠতেও পারি, এবং ভাতরান্নার কাজটাতেও অপমান বোধ করি না।' প্রসন্ন কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, 'না, না, এ কিছু না, এ রাখালের ভাত। ও আবার সকাল না হ'তেই—' স্ত্রী বাধা দিয়া কহিল, 'রাখালের ভাত! কিন্তু সেটা আমি রাঁধলেই কি রাখালের পক্ষে বিষ হ'য়ে দাঁড়াত?'

প্রসন্ন চমকিয়া উঠিল, জবাব দিতে পারিল না। জবাবের জন্য কেহ অপেক্ষাও করিল না। শোবার ঘরের দরজা সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ললিতার কানে গেল, প্রসন্ন বলিতেছে, 'কৈরে, আবার কোথায় গেলি? মাঠে যাবিনে?' রাখাল আনন্দে ছুটিয়া আসিল, বলিল 'চল, বাবা।' দুই শক্তির বিদ্যুৎ একসঙ্গে মিলিলেই যেমন আগুন জ্বলিয়া উঠে, পিতার হাতে পুত্রের হাত ঠেকিতেই, জানালায় দাঁড়াইয়া একজনের চক্ষু থেকে তেমনি আগুন ঠিকরিয়া পড়িতে লাগিল। প্রসন্ন দেখিল, কিন্তু তাকাইতে পারিল না। সমস্ত পথটা একবারও পিছনে চাহিল না। কেবলই মনে হইতে লাগিল যেন সে চক্ষু দুটি তাহার পিঠের অতি নিকটেই দাঁড়াইয়া আছে।

ললিতার মা ছিল না। কিন্তু বাপ তাহাকে সে অভাব কখনো বুঝিতে দেন নাই। নিজে লেখাপড়া বিশেষ শেখেন নাই, কিন্তু সহরের কাছে বাস করিয়া, এবং চাকরির কল্যাণে সহরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়া এ জিনিষটির মূল্য বুঝিতেন। তাই ললিতা লেখাপড়া ভালই শিখিয়াছিল। তাহার বাবা প্রায় রোজই বাড়ী ফিরিবার সময় মেয়ের জন্য গল্পের বই, কাপড়, গয়না, যাহা সে চাহিত, নিয়া আসিতেন। মেয়ের উপর এতটা দৃষ্টি ছিল, কিন্তু মেয়ের বয়সটা কোনদিন দেখিবার অবসর পান নাই। পাড়ার লোক এবং ছেলের চেষ্টায় এদিকে যখন তাঁহার চক্ষু পড়িল, তখন চক্ষু বুজিবার সময় আসিয়াছে। ললিতার দাদা হরিদাস আফিসের বড় কেরানি। সে ছোট বোনটিকে ভালবাসিত। তাই প্রসন্নর ঘটককে সে প্রথমবারেই কথা দিয়াছিল। সে দেখিল, পাত্র দোজবরে বটে, কিন্তু মেয়েরও ত বয়স হইয়াছে। শাশুড়ি ননদের জ্বালা নাই; ঘরে খাইবার পরিবার ভাবনা নাই। সকলে খুসীই হইল; কিন্তু ললিতার মনের মধ্যে যে কল্পনা ছবি আঁকিত সেই কেবল চুপ করিয়া রহিল। তাহার চিত্রিত কলিকাতার সেই নির্জ্জন রাস্তাটি, যেখানে দুপুর বেলায় ক্লান্ত কাঁসারী কাঁসর বাজাইয়া যায়; সেই সুসজ্জিত দ্বিতল ঘর, একটি সুন্দর তরুণ হাস্যোজ্জ্বল মুখ, আর তাহাকে ঘেরিয়া—যাক্, সে কেবল ছবি বইত নয়। গোপনে ছিল, গোপনেই রহিল। ললিতার বিবাহ হইয়া গেল।

কিন্তু স্বামীর ঘরে যখন আসিল, ললিতা নিতান্ত বিমুখ মন লইয়া আসিল না। যাহাকে পাইয়াছে তাহাকেই ধরিবার জন্য মন স্থির করিয়া লইল। কিন্তু ধরা গেল কই? মাঝখানে যে একটা একফোঁটা পরের ছেলে তাহার ক্ষুদ্র দেহ দিয়া তাহার স্বামীকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। আর তাহার পাশেই একটি সু-উচ্চ সংশয়ের প্রাচীর। প্রথম বাধাটাকে হয়তো একদিন জয় করা যাইত, কিন্তু দ্বিতীয়টিকে ডিঙাইবার কোন উপায় ললিতা কোন দিক থেকেই দেখিতে পাইল না। ইচ্ছাও হইল না। এই অবিশ্বাসের অপমানকে সে অদৃষ্টের ফল বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিল না। সে শিক্ষা সে পায় নাই, তাহার সমস্ত বিদ্রোহী

মন স্বামী এবং তাহার ছেলের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল।

চাষী গৃহস্থ। বাড়ীময় ধানের পালা। কতক উঠানে গোরুর সাহায্যে মাড়াই হইতেছে। রাখাল লাঠি দিয়া গোরু তাড়াইতেছে, এবং প্রসন্ন বারান্দায় বসিয়া তামাক টানিতেছিল। সহর-পালিতা ললিতার চক্ষে এ দৃশ্য মধুবর্ষণ করিল না। সুতরাং সহসা কি মনে করিয়া যখন উচ্চৈস্বরে 'রাখাল' বলিয়া হাঁক দিল, সে কণ্ঠও মধুবর্ষণ করিল না। রাখাল চমকিয়া উঠিল। প্রসন্নও ভয় পাইল। কিন্তু পরক্ষণেই রাখালকে ডাকিয়া কহিল, 'তোর মা ডাকছে রে।' মায়ের নামে পুত্রের মনে পুলকসঞ্চার কোনদিনই হয় নাই, আজও হইল না। সে নড়িবার লক্ষণ দেখাইল না। প্রসন্ন স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'ওকে কি কোন—' কথাটা শেষ হইতে পারিল না। স্ত্রী গর্জ্জন করিয়া উঠিল, 'ভয় নেই, তোমার ছেলেকে আমি ফাঁসে দেবো না।' বলিয়া সবেগে চলিয়া গেল। প্রসন্ন বেগতিক দেখিয়া আবার হুঁকাতেই মনোনিবেশ করিল। কিন্তু স্ত্রীর কণ্ঠস্বর দূর থেকে তখনো কাণে আসিতেছিল—'লেখা নেই, পড়া নেই, চাষার ছেলেদের মত কেবল গোরু নিয়ে থাকলেই ছেলের মানুষ হ'তে বেশি দেরি হবে না। নেহাৎ চোখের উপর থাকলে দুই একটা কথা না বলেও পারা যায় না। না হ'লে পরের ছেলের জন্য মাথা ঘামাবার সময়ও নাই, প্রবৃত্তিও নাই' ইত্যাদি। চুপ করিয়া থাকার বিদ্যাটা প্রসন্ন ভাল করিয়াই শিখিয়াছিল। আজও তাহার ব্যতিক্রম হইল না।

মনোরমার মৃত্যুর পর রাখালের সমস্ত ভার প্রসন্ন নিজের হাতেই নিয়াছিল। ললিতাকে ঘরে আনিয়া সে ভার কমিল না, ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। আজ তাহার সমস্ত জাগ্রত দৃষ্টি তাহার স্বর্গগতা প্রিয়তমা স্ত্রীর এই একমাত্র চিহ্নটিকে যেন বর্ম্মের মত ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। আর বাহির হইতে ললিতার মন ক্রমাগত তাহারই উপরে প্রহত হইয়া না-পাওয়ার নিষ্ফল আক্রোশে দুর্দম হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময়ে একদিন গাছ থেকে পড়িয়া রাখালের হাত ভাঙিয়া গেল। ললিতা খবর পাইয়া ছুটিয়া যাইতেছিল, স্বামীকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিল। প্রসন্ন স্ত্রীকে ডাকিল না। প্রতিবেশীরা বিছানা পাতিয়া দিল। ছেলেকে শোয়াইয়া দিয়া প্রসন্ন ডাক্তার ডাকিতে গেল। পাড়ার সকলে ছিঃ ছিঃ করিতে লাগিল। কিন্তু ললিতা সেই যে ঘরে গিয়া ঢুকিল আর বাহির হইল না।

সমস্ত রাত্রি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া ভোরের দিকে রাখাল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সেই সুযোগে প্রসন্নও একটু সরিয়া গিয়া ঘরের এক কোণে একটা মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। সমস্ত দিন পরিশ্রম, এবং সমস্ত রাত্রি জাগরণ। তাহার ঘুম আসিতে দেরি হইল না। ললিতা পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে ঢুকিল। যেমন তেমন করিয়া বিছানা পাতা। মাতৃহীন পীড়িত শিশু এলাইয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সুন্দর কচি মুখখানির উপর যন্ত্রণার ছায়া তখনো ফুটিয়া রহিয়াছে। চোখের কোণ বাহিয়া কয়েক ফোঁটা জল গণ্ড পর্যন্ত আসিয়া শুকাইয়া গিয়াছে। কেহই তাহা মুছাইয়া দেয় নাই। ললিতার বুকের ভিতরটা কেমন জ্বালা করিয়া উঠিল। ইহাকে যেন আজ প্রথম দেখিল। মনে হইল ইহার ঠোঁটের ঐ বিশেষ রেখাটি, কপালের উপরে অযত্নে লুটানো চুলগাছি, নিমীলিত চোখের কোণে ঐ অশ্রুবিন্দু যেন সমস্বরে 'মা' বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল কাছে গিয়া বুকে তুলিয়া লয়। সহসা একটা নিঃশ্বাসের শব্দে চাহিয়া দেখে অদূরে স্বামী ঘুমাইতেছেন। অমনি সমস্ত মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল। সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দেই চলিয়া গেল।

ললিতাকে যেন এক নেশায় পাইয়া বসিয়াছিল। সমস্ত দিনে একশ'বার বিনাকারণে রাখালের ঘরের পাশ দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া যাইত, কিন্তু প্রসন্ন ঘরে আছেই। ক্রমে রাখাল ভাল হইয়া আসিল। প্রসন্ন তাহার মাঠের কাজে যাইতে আরম্ভ করিল। ললিতা এই সময়টির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিত। রাখাল প্রথম কয়দিন ধরা দিতে চায় নাই। ক্রমে সে ভাব কাটিয়া গেল। 'মা' বলিয়া ডাকিল। অবশেষে মায়ের কোলের মধ্যে গুটিগুটি হইয়া শুইয়া গল্প না শুনিলে তাহার দিন কাটিত না। কিন্তু বেশিক্ষণ এ সুযোগ ছিল না। বাবা আসিবার সময় হইলেই, মা যে কেন উঠিয়া

পলাইত, সে বুঝিত না। প্রসন্ন হয়তো আসিয়া দেখিত, রুগ্ন ছেলে ঘুম ভাঙিয়া 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিতেছে। কাহার কথা মনে করিয়া তাহার চোখদুটি জলে ভরিয়া আসিত। অন্যঘরে ললিতাও কোন রকমে দাঁতে দাঁত চাপিয়া পড়িয়া থাকিত।

রাখাল অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছে। প্রসন্ন হাটে গিয়াছিল। সেই সুযোগে মায়ে-ছেলের সভা জমিয়াছে। সহসা পিতার কণ্ঠস্বরে চমকাইয়া উঠিয়া রাখাল মাকে ঠেলিয়া দিয়া চাপা গলায় কহিল, 'বাবা এসেছে'। ললিতাও শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িল। নিজের ঘরে গিয়া এই কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় তাহার মাটির সাথে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল। ছিঃ ছিঃ! এই লুকোচুরি ঐ একফোঁটা শিশুর কাছেও লুকানো নাই! যেন তাহার অধিকার নাই। যেন সে চুরি করিতে গিয়াছে। কিন্তু কেন? ললিতার সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, কেন, কিসের জন্য এই লাঞ্ছনা?—এখানে সে কেউ নয়? ছেলের উপরে তাহার কোন দাবী নাই? আর তাহার এই সত্য স্বাভাবিক অধিকারের যিনি পথ আটকাইয়া দাঁড়াইলেন, তিনিই তাহার স্বামী! ঘরে আলো ছিল না। অন্ধকারে তাহার চোখ জ্বলিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে ছেলের কান্না কানে আসিল। আরো কিছুক্ষণ পরে শুনিল যেন স্বামী তাহাকে ডাকিতেছেন। ললিতা উঠিয়া বসিল। প্রসন্ন কহিল, 'আমাকে একটু ও-পাড়ায় একটা দরকারে যেতে হবে। ও কিছুতেই তো ছাড়ছেনা। একটু যদি ঠেকিয়ে রাখতে পারো—'। এইমাত্র তাহার মন জ্বলিতেছিল। তাহার উপর পুত্রের এই পিতৃ-প্রীতির ন্যাকামি অসহ্য বোধ হইল। বিশেষ করিয়া এই অনুরোধের ভঙ্গী। কটু কণ্ঠে কহিল, 'কেন? আমার কাছে আবার কেন? সারাদিন তো ল্যাজে ল্যাজেই রাখা হয়। আমি কে যে পরের ছেলের দায় ঘাড়ে করতে যাবো?' প্রসন্নর অসাধারণ ধৈর্য্যের বাঁধ আর টিঁকিতে চাহিল না, কহিল, 'ললিতা, শুনেছি তুমি লেখাপড়া শিখেছ। হয় তো হবে। কিন্তু মানুষ হ'তে শেখোনি। তুমি নিতান্ত ছোট।'

ললিতা হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া, বিশাল চক্ষু মেলিয়া কহিল—'কি আমি?'

প্রসন্ন ছেলেকে বলিল, 'চল্‌রে'।

ললিতা সুমুখে সরিয়া আসিয়া দীপ্ত কণ্ঠে কহিল, 'আমি নিতান্ত ছোট, আর তুমি—?'

আর বলিতে পারিল না। রাখাল ভয় পাইয়া পিতার কোলের মধ্যে মিশিয়া যাইতেছিল। সে দিকে চাহিয়া আর সহ্য হইল না। ছুটিয়া গিয়া ছেলের হাত ধরিয়া এক টান মারিয়া, বলিল 'হতভাগা ছেলে, আবার আদর জানানো হচ্ছে!'

রাখালের দুর্ব্বল শরীর সে প্রবল আকর্ষণ সহিতে পারিল না। সে মাটিতে পড়িয়া গেল। ভাঙা হাতখানা নীচে পড়ায়, উৎকট যন্ত্রনার একটা তীব্র চিৎকার করিয়াই সে অজ্ঞান হইয়া গেল।

ললিতা ধরিতে যাইতেছিল। প্রসন্ন তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

৩

অনেক রাত্রে রাখাল সুস্থ হইয়া অন্য ঘরে ঘুমাইতেছিল। প্রসন্ন ললিতার ঘরের সুমুখে আসিয়া দেখিল, সে তেমনি করিয়া মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। মাথার কাপড়খানি সরিয়া গিয়াছে। এক বোঝা রুক্ষ চুল পিঠে মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছে। মনে হইল যেন তাহাতে অনেকদিন চিরুণি পড়ে নাই। অথচ বেশভূষার বিষয়ে ললিতার কোনদিনই ত্রুটি ছিল না। সেই কাঁচাসোনার মত রং যেন অনেকটা মলিন দেখাইল। প্রসন্ন অনেককাল স্ত্রীর দিকে চাহিয়া দেখে নাই। মনে হইল যেন আগের চাইতে অনেকটা রোগাও হইয়া গিয়াছে। অজ্ঞাতসারে তাহার মনের ভিতরটা যেন একটু দুলিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সমস্ত দুর্ব্বলতা ঠেলিয়া ফেলিয়া প্রসন্ন কহিল, 'শুনতে পাচ্ছ?'

ললিতা মাথা না তুলিয়াই জবাব দিল, 'কি?'

প্রসন্ন একটু থামিয়া বলিল, 'আমি ভাবছিলাম, তোমার কিছুদিন অন্য কোথাও গিয়ে থাকলেই ভালো হয়। অথবা আমরাই—'

ললিতা অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে কহিল, 'বেশ যাবো।'

প্রসন্ন আবার বলিল, 'তোমার যত টাকা লাগে আমি পাঠিয়ে দেবো'।

ললিতা সংক্ষেপে কহিল, 'না'।

প্রসন্নর মন অত্যন্ত রুক্ষ হইয়াছিল। এই মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বরে তাহার উত্তাপ বাড়াইয়া দিল। তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল, 'বেশতো, আমার তাতে ভারী এসে যাবে! তাই ব'লে আমার ছেলেটাকে চোখের উপর কেউ মেরে ফেলুক, সেটা হ'তে দেবোনা। তাতে লোকে ভালোই বলুক আর মন্দই বলুক।'

ললিতার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। ক্ষীণ আলোকেও তাহা প্রসন্নর দৃষ্টি এড়াইল না। কিন্তু সে আর কোন কথা না বলিয়াই দ্রুতপদে সরিয়া গেল।

* * *

অনেকদিন পরে ভগিনীকে ঘরে ফিরিতে দেখিয়া হরিদাস খুশী হইল। কিন্তু কি যেন একটা হইয়া গিয়াছে এই সন্দেহে মনটা তাহার স্থির হইতে পারিল না। একদিন একা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁরে, প্রসন্ন এলনা কেনরে?'

'সে কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করে এলেই পারো।'

হরিদাস আর একটু সরিয়া আসিয়া ভগিনীর মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া সস্নেহে কহিল, 'কি হয়েছে বল দিকিন্'।

ললিতার চোখে জল আসিয়া পড়িল, কথা কহিতে পারিল না। তাহার দাদার মুখেও আর কথা যোগাইল না। সে অনেক আশা করিয়া বোনটিকে বড় ঘরে দিয়াছিল। কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে তাহার রুক্ষ চুলগুলির উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাকিল, 'ললিতা!'

ললিতা মাথা না তুলিয়াই কহিল, 'কি?'

'দাদার কাছে কিছুই লুকোস্‌নে। জানিস তো বাবা আর নেই।'

বাবার নাম করিতেই ললিতার চোখের জল গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে শান্ত হইয়া কহিল, 'তুমি দুঃখ ক'রোনা দাদা। দোষ বোধ হয় আমার কপালেরই। কিছুই পেলাম না।'

হরিদাস রীতিমত অবাক হইয়া বলিল, 'সে কিরে? কিছুই পেলিনে? স্বামী পেয়েছিস, ছেলে পেয়েছিস, এর উপরে মেয়ে মানুষের আর কি আছে?'

এবার ললিতা হাসিল। মুখ তুলিয়া কহিল 'তুমি তো দেখছ পেয়েছি। কিন্তু কই আর পেলাম? স্বামীকে যখন ধরতে গেলাম, মাঝে এসে দাঁড়াল তার ছেলে; আর ছেলেকে যখন ধরতে গেলাম মাঝখানে দাঁড়াল তার বাবা। *আমার ভাগে শেষ পর্য্যন্ত শূন্যই রয়ে গেল'*—বলিয়া হাসিতে লাগিল।

হরিদাস সে হাসিতে যোগ দিল না। তাহার এই লেখাপড়াজানা ছোট বোনের কথাটা হয়তো বুঝিল না, কিন্তু ব্যথাটা বুঝিল। অনেক দিন ইহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল।

ললিতা তাহার সেই আগেকার ঘরেই আশ্রয় পাইল। কিন্তু আগেকার মত আর প্রবেশ করিতে পারিল না। বা'বার দেওয়া বইগুলি সবই ছিল। তাহাদের সঙ্গেও ভাব জমিল না। জানালায় বসিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকিত। মনে হইত, ঐ ছেলেটি যেন ঠিক রাখালের মত। কাছে আসিলে দেখিত—নাঃ, তাহার নাকটা যে আরো সুন্দর। আর চোখদুটিও আর একটু টানা টানা। এমনি করিয়া কয়েক মাস গেল। একদিন সকাল বেলা হঠাৎ দাদার ঘরে ছুটিয়া গিয়া কহিল,—"দাদা, দাদা, ঐ লোকটাকে ডাকো। ডাকোনা দাদা! চলে গেল।"

হরিদাস কোনমতে ছুটিয়া গিয়া লোকটিকে ডাকিয়া আনিল। লোকটি প্রসন্নর প্রতিবেশী। হরিদাস ভগিনীর নির্দ্দেশমত প্রশ্ন করিল, 'রাখাল কেমন আছে?'

'কে, প্রসন্নদার ছেলে? অবস্থা তেমন ভালো নয়। অনেকদিন জ্বর তার উপরে নিমুনিয়া। হবেনা? একা মানুষ। ছেলেটাও তেমনি। সামলায় কার সাধ্যি? জলে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে অসুখ শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ডাক্তার তো এক রকম—'

ললিতা অধীর হইয়া হরিদাসকে দিয়া বলাইল, 'আচ্ছা, আপনি আসুন' এবং লোকটি চলিয়া গেলেই বলিল, 'দাদা, আজই—এখনই।'

প্রসন্নর বাড়ীতে যখন পাল্কী আসিয়া পৌছিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ললিতার পা কাঁপিতে লাগিল। ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া দেখে তাহার রাখালের পুষ্ট দেহ আজ একেবারে

বিছানার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। কোন সাড়া নাই, শুধু মাঝে মাঝে একটু ক্ষীণ কাতর অস্ফুট স্বর—'উঃ'। প্রসন্ন পাশে বসিয়া ঝিমাইতেছিল। বোঝা গেল, অনেক রাত এ জিনিষটার সহিত তাহার পরিচয় হয় নাই। ললিতা বিছানার পাশে বসিতেই সে চমকিয়া উঠিয়া এমন-ভাবে চাহিয়া রহিল, যেন চিনিতেই পারে নাই। ললিতা ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল, 'রাখাল, বাবা!' রাখালের চোখদুটি ছলছল করিয়া উঠিল। কি যেন বলিতে গেল, পারিল না। শুধু একবার ফিস্‌ফিস্ শব্দে শোনা গেল, 'মা'। শীর্ণ হাত দুখানি দিয়া মাকে ধরিতে গেল। ললিতা আর থাকিতে পারিল না; পুত্রের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

প্রসন্নর চোখের উপর থেকে একটা কালো পরদা যেন এতদিন পরে উঠিয়া গেল। সমস্ত জীবন যাহার কাছ থেকে ছেলেকে সে দু'হাতে আগলাইয়া রাখিয়াছে, আজ মৃত্যুর দুয়ারে তাহারই হাতে তাহাকে সঁপিয়া দিয়া তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। কিন্তু ছেলে এ সমর্পণের মর্যাদা রাখিল না। মাকে কেবল তিনটি দিন প্রাণপণে টানিবার সুযোগ দিয়া একদিন গভীর রাত্রে নিঃশব্দে চলিয়া গেল। প্রসন্ন বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু ললিতার কণ্ঠে একটি স্বরও ফুটিল না। পাড়ার দশজনে, কেহ সান্ত্বনা দিল, কেহ বলিল 'ও রাক্ষসী তো ঐ চায়।' সে কাহারও কথারই কোন জবাব দিল না।

তিন চারদিন এই ভাবে গোলমালে কাটিয়া গেল। তাহার পর প্রসন্ন মাঝে মাঝে স্ত্রীর কাছে গিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। কি যেন একটা তাহার বলিবার আছে। না বলিলে বুকের বোঝা নামিবে না। হয়তো সে বলিবে, ললিতা, আমি বুঝতে পারিনি; কিংবা হয়তো ক্ষমা চাহিবে; কিংবা অন্য কিছু। কিন্তু কিছুই বলা হইল না। সপ্তম দিনে প্রসন্ন দেখিল, পালকি আসিয়াছে। ছুটিয়া ঘরে আসিল। দেখিল, ললিতাও প্রস্তুত। কহিল, 'ললিতা, তুমি যাচ্ছ?'

সহজ কণ্ঠে জবাব আসিল, 'হাঁ'।

ইচ্ছা হইল একবার জিজ্ঞাসা করে, কেন? সাহস হইল না। ললিতা নিঃশব্দে স্বামীকে প্রণাম করিল। সহজ কণ্ঠেই কহিল, 'আমার একটা অনুরোধ রেখো।'

প্রসন্ন ভারী গলায় কহিল, 'কি?'

—'আমাকে কোনদিন আনতে যেওনা। আমি আসবোনা।' প্রসন্ন আর্ত্তকণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিল, 'বেশ, সবাই যাও। আর আমি কেমন করে থাকবো, একবার দেখোওনা!'

কেহ জবাব দিল না। পালকি চলিয়া গেল। প্রসন্ন সেইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, যেন কিছুই বোঝে নাই।
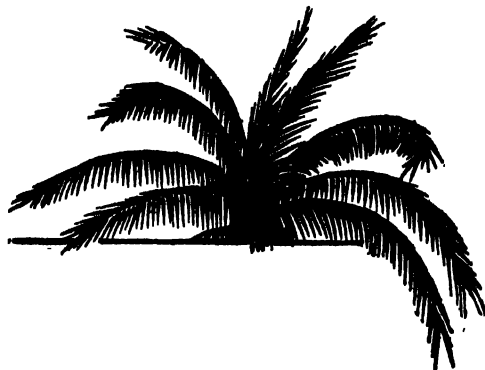
শেষের আগে

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য

শীতের রাতের স্তিমিত তারার নিমীল চোখের স্বপন টুক
নব প্রভাতের আলোর পরশ ঝ'রে ঝ'রে ভরে ধরার বুক,
ঘন কুয়াসার ধূসর মায়ার বসন ছিঁড়ে
রঙের তুফানে আকুল করে এ ধরিত্রীরে
মরণ সায়র মথিত প্রেমের চুমায় চুমায় এলায়ে পড়া
জাগেরে ফাগুন হাজারো যুগের মিলন সুখের আবেগভরা।

হ'ল কত কাল, এমনি আকুল ফাগুন দিনের স্বপন দিয়া
চকিতে যে দিন আমার পরাণ-খানিরে রঙীন ক'রলে প্রিয়া।
তোমার হাতের এক পলকের ছোঁয়ার মাঝে,
সবখানি প্রাণ কাঁপিল সেদিন বুকের কাছে ;
এই জীবনের দিগন্তরের স্তব্ধ নিবিড় সীমার শেষে
বুকের সে মোর ইন্দ্রধনুর সাত-রঙা সুর যায়নি ভেসে।

সেই তো তোমার প্রথম চুমার স্বর্ণবরণ নিমেষ খানি
হয়নি মলিন, রঙীণ সে মোর সকল শিরার রক্ত টানি,
ফাল্গুনে আজ রঙটা যে তার দ্বিগুণ রাঙা
যদি এ আমার মুদিত দিবার তন্দ্রা ভাঙা
সন্ধ্যাকালের এই টলোমল অবাক অধীর লগ্নটীরে
শিউরে ওঠাও একটী চুমায় মোর জীবনের প্রান্ত তীরে,—

সবখানি প্রাণ করবো উপুড়,—এক ফোঁটা রস নিংড়ে নিতে
শেষ শোণিতের টক্‌টকে লাল জ্বলবে গো সেই নিমেষটীতে,
তার পরও হায়, ফাগুন যেথায় আর না চলে,
পথ ভুলে যায় যেই দিশাহীন তিমির তলে
সেইখানে সেই মরণ পারের অন্তরালের আব্‌ছা দিয়া
নিদ্‌-নীলিমায় উড়বে সে মোর জন্ম যুগের স্বপ্ন নিয়া।

অনুবাদতত্ত্ব

শ্রীনবেন্দু বসু

বাঙলা সাহিত্যে ওমর খৈয়ামের প্রচলিত অনুবাদগুলির মধ্যে কোন্‌টি ভাল এই নিয়ে মধ্যে মধ্যে পাঠকসমাজে একটা তর্ক উঠতে দেখা যায়, যদিও অনুবাদকদের মধ্যে কেউ লিখেছেন কাব্যরস পিপাসার বশবর্ত্তী হ'য়ে আর কেউ বা লিখেছেন বিশেষ ক'রে একখানি নিখুঁত আর মূলের অনুরূপ অনুবাদ প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে। তর্কটা আরো জটিল হ'য়ে ওঠে দুটো কারণে। প্রথমতঃ সবগুলিরই নাম মোটের ওপর "ওমর খৈয়াম" অথচ তার মধ্যে আছে দুরকম—ফিট্‌জেরাল্ডের ইংরাজীর অনুবাদ আর মূল ফারসীর অনুবাদ, আর ফিট্‌জেরাল্ডের ইংরাজী রুবাইয়াৎ যে মূল ফারসীর অনুরূপ মোটেই নয় সে কথা সর্ব্বজনবিদিত। দ্বিতীয়তঃ কাব্যের অনুবাদের আদর্শ কি সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে বাংলা ওমর খৈয়ামগুলিকে উপলক্ষ করে শেষোক্ত প্রশ্নটির আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'তে চাই। বিশ্বসাহিত্যের সংস্পর্শে বাংলা সাহিত্যের এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দিনে আর অনুবাদ সাহিত্যের পুষ্টি আর শ্রীবৃদ্ধি কামনায় এই আলোচনা নিতান্ত অবান্তর নাও হ'তে পারে।

বহুপূর্ব্বে Homer এর অনুবাদ সম্পর্কে সমালোচক প্রবর Matthew Arnold এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেন যে অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদক কোন্ আদর্শে চালিত হবেন সে বিষয়ে দুটো মত আছে। এক দলের মত যে অনুবাদ যথাসম্ভব এমন হবে যাতে পাঠক সেটাকে অনুবাদ ব'লে জানতে পারবে না বরং তার একটা ভ্রমাত্মক বিশ্বাস জন্মাবে যে কোন মূল লেখাই সে পড়ছে। সেই আনন্দটাই তার প্রাপ্য যা মূলের পাঠকেরা পেয়েছিল। দ্বিতীয় দল বলেন যে, অনুবাদে মূলের সব বিশেষত্ব আর ভঙ্গীগুলি পর্য্যন্ত বজায় থাকবে আর অনুবাদ হবে মাত্র ভিন্ন ভাষায় অনুকরণ। এ দুটো মতেই হয়ত একটু বাড়াবাড়ি থাকতে পারে, তবে দুটোতেই একটা সত্য স্বীকৃত যে অনুবাদ যেমনই হোক না কেন সেটা মূলের অনুযায়ী (faithful) হবে। কিন্তু মূলের অনুযায়ী হওয়ার আদর্শ বা মাপকাঠি কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আরও শক্ত, বিশেষ ক'রে কাব্যের পদ্যানুবাদে। "মূলের অনুযায়ী হওয়া" কথাটির স্বরূপ আর ব্যাপকতা কতকগুলি বিশেষ কারণের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং সেগুলি কাব্যের অনুবাদে ন্যায়তঃ কি আশা করা যেতে পারে তার নিরূপক।

স্থূলভাবে "অনুবাদ" বলতে বুঝি একটা লেখাকে ভিন্ন ভাষার পরিচ্ছদ দান করা। তবে প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে সাধারণতঃ, এবং কাব্যের অনুবাদে বিশেষ ক'রে, অনুবাদ করতে গেলেই কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন ঘটে যায় কারণ ঐ ভাষান্তরিত করাতেই নিহিত এবং সেই জন্যে সেগুলি থেকে রক্ষা পাওয়া দুস্কর। অবশ্য কথাটা সাধারণ ভাবেই বলা চলে। দৈবাৎ এমন একটি দুটি অনুবাদ চোখে পড়তে পারে যা উপরোক্ত দুটি দলকেই সন্তুষ্ট করবে, তবে তা নিয়ে আলোচনা চলতে পারে না। আর সেখানেও লক্ষ্য ক'রে দেখলে দেখা যায় যে তাতে নিয়মের পরিপোষণই হয়। এ প্রবন্ধে কাব্যের অনুবাদই আমাদের লক্ষীভূত বিষয় আর ওমর খৈয়াম উদাহরণস্থল।

অনুবাদ মূলের অনুযায়ী হবে এ আদর্শে অনুবাদ করতে গিয়ে দেখি যে মূল কাব্যের গঠনে দুটি জিনিষ বর্ত্তমান—তার ভাব (idea) আর তার রূপ (form)। আবার ভাবটি রূপটিতেই পর্য্যবসিত আর সপ্রকাশ কেননা কাব্য শিল্প সৃষ্টির একটা অঙ্গ। এমন কি ভাষার পরিবর্ত্তন না ক'রেও যদি রূপের পরিবর্ত্তন ঘটানো সম্ভব হয় তাহ'লেও ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে। ভালো হতে পারে, মন্দ হ'তে পারে, কিন্তু যা ছিল ঠিক তা থাকে না। একজন বর্ত্তমান সাহিত্য সমালোচক (Gerald Bullett) বলেছেন—"Content and form are identical as a man

is identical with his body : they can be separated in theory, for the purposes of talk, but not in practice. Neither man nor poem can exist for us, without material symbol." কাব্যে ভাব আর রূপের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কেন? তার উত্তরও আবার এই যে কাব্য শিল্পসৃষ্টি, আর সেই কারণে স্বতঃস্ফূর্ত্ত (spontaneous)। ভাব বেছে নিয়ে তারপর তার উপযোগী ভাষা খুঁজে বার ক'রে সেই ভাষায় সেই ভাবটিকে প্রকাশ করা—এ উপায়ে কাব্য বা অন্য কোন শিল্পসৃষ্টি হয় না। কোন সুন্দর দৃশ্য দেখে যখন হর্ষ প্রকাশ করি তখন তা করি বলেই বুঝি যে সেটা সুন্দর। আমার দৃশ্যটা সুন্দর লেগেছে অতএব এমন একটা কথা ভেবে ঠিক করি যেটা বল্লে আমার অনুভূতিটুকুর সঠিক প্রকাশ হবে, আর সেইজন্যে আমার যতগুলি ভাব প্রকাশক অব্যয় শব্দ (interjection) জানা ছিল সেইগুলি হাত্ড়ে হাত্ড়ে "বাঃ" কথাটি মনোনীত করে বল্লুম "বাঃ"। এ উপায়ে আর যাই হোক কাব্যসৃষ্টি হয় না। কথিত আছে যে, কবি Wordsworth তাঁর কোন কবিতার অতিরিক্ত সংশোধন ও পরিমার্জ্জন ক'রেছিলেন ব'লে Rossetti বলেছিলেন যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিই নন, কেননা ওরকম করা মানে কবি কয় লাইন লিখবেন প্রথমে তাই সাব্যস্ত ক'রে প্রত্যেক লাইনের শেষের মিলের কথাগুলি বসিয়ে নিলেন, তারপর ভাবলেন এই শূন্য লাইনগুলি কি দিয়ে ভরান যায়; পরে মাত্র তাঁর অসামান্য প্রতিভা বলেই, 'কোন কাব্য প্রেরণায় নয়' এমন ভাবে সামঞ্জস্য করে লিখে গেলেন যে কবিতাটী আর কষ্টকল্পিত ব'লে বোধ হ'ল না; ভাবে আর রূপে ওতপ্রোত মিলন হয়ে গেল। আবার Keats, Swinburne প্রভৃতি কবিদের বিষয় গুলি যে মিলের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ছবিটি তাঁদের চোখের সামনে যেন ভেসে উঠ্তো। প্রকৃত শিল্পীর সেই লক্ষণই বেশী সম্ভব। কারণ লেখবার মুহূর্ত্তটিতে তিনি ভাবপ্রকৃতি (temperament) দিয়েই বেশী প্রণোদিত হন, সজ্ঞান চেতনা (consciousness) দিয়ে ততটা নয়। ভাবের প্রকাশ বক্তার প্রথম প্রকৃতির (elemental self) অনুভূতির কাঁপন লীলা আত্মপ্রকাশ মাত্র। এই প্রথম প্রকৃতি কোন্ ভাষায় আত্মপ্রকাশ ক'রবে তার প্রেরণা স্বতঃই পায়, যেটা শিক্ষা, স্মৃতি বা বিচারক্ষমতার আবশ্যক করে না। জীবজগতে ভাষা তো ভাবচালিত শব্দ ব্যবহার মাত্র অথবা বলতে পারি ভাষা ভাবের শব্দিত রূপ। কোন বিশেষ ভাবের প্রতিরূপ কোন বিশেষ শব্দের মধ্যে পাওয়া যায়। অতএব ভাব যখন ভাষায় একটা বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ ক'রলে তখন তাকে ভাষান্তরিত করতে হ'লে ভিন্ন ভাষায় সে ভাবটির যা অবিকল প্রতিরূপ সেটা ছাড়া অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে না, আর তা না করতে পারলে অনুবাদও মূলের অনুরূপ হোলো একথা বলি কেমন ক'রে?

কিন্তু শিল্পীর প্রথম প্রকৃতির নগ্ন আত্মপ্রকাশই সব নয়। শিল্প জিনিষটা তার ওপর আর কিছু। শুধু ঐটুকু হলেই অনুবাদকার্য্য শক্ত ছিল না। কারণ নগ্ন আত্মপ্রকাশে যে ভাবটি প্রকাশ পায় সেটা জীবজগতে সার্ব্বজনীন আর দেশভেদে ভাষাভেদে তার কোন পরিবর্ত্তন নেই। শব্দে মাত্র ভাবটুকুর প্রতিরূপ ভিন্ন ভাষাতে মেলে। সূর্য্যোদয় দেখে এস্কিমোতেও হর্ষপ্রকাশ করে আর আমাদের দেশের সাঁওতালেও করে। দুজনের ভাষাতেই সে ভাবের প্রকাশক দুটো বিভিন্ন শব্দ বা কথা আছে, যেটার একটা অন্যটার অনুবাদ ব'লে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু শিল্পীর প্রথম ভাবপ্রকাশ আদিম মানবের আত্মপ্রকাশ নয়। Elemental (প্রথম) যা' তা' সব সময়ে primitive (আদিম) নয়, আর Art (শিল্প) Nature (প্রকৃতি) থেকে অনেক তফাৎ। তা' না হ'লে সঙ্গীত হ'ত সব চেয়ে primitive যদিও সেটা সব শিল্প অপেক্ষা elemental, আর natureএর পাশে সেটাই সব চেয়ে বেশী art, এই কারণে কাব্যশিল্পেরও অনুবাদ এত কঠিন কাজ হ'য়ে পড়ে। গোল বাধে প্রথম ভাব প্রকাশ ছাড়া ঐ "আর কিছু" টাকে নিয়ে। কারণ সেটা আর কিছুই নয়, শিল্পীর ব্যক্তিত্ব বা নিজস্ব (Personality)। জিনিষটা বিশেষভাবে মানুষটাতেই সংলগ্ন আর তার প্রকাশ একটা বিশেষ আবেষ্টনের (environment) মধ্যে। সবের অনুবাদ হয়ত হ'তে পারে কিন্তু আবেষ্টনের অনুবাদ হয় না, সুতরাং তাইতে পুষ্ট ব্যক্তিত্বটুকুও

শ্রীনবেন্দু বসু

ভিন্ন পরিচ্ছদে আত্মপ্রকাশ ক'রতে পারে না। পূর্বোক্ত সমালোচকের কথায় আবার বলি "A translated man is a new man; and of a translated poem the best that we can ever say is that it is a new poem inspired by the original, the old light seen through the prism of a new personality"। অথচ অনুবাদের পাঠক চান the old light through the unrefracted medium of the old personality! তিনি জানেন না যে সমান্তরাল আলো রেখাটি অতসী কাঁচের ভিতর দিয়ে যেতে গেলেই বেঁকে যায়।

অনুবাদতত্ত্বের স্বরূপ আর ব্যাপকতা কি ভাবে সীমাবদ্ধ এইখানে তার একটা প্রধান কারণ জানতে পারলুম—শিল্প-সৃষ্টির দুটি প্রকৃতিগত নিয়মে। যখনই কাব্য শিল্পপর্য্যায়ভুক্ত তখনই তাতে অনুবাদের অতীত দুটি জিনিষ বর্ত্তমান—ভাব আর রূপের একীভূত স্বতঃস্ফূর্ত্ততা আর সেই স্বতঃস্ফূর্ত্ততার প্রাণস্বরূপ শিল্পীর নিজত্ব।

এই স্বতঃস্ফূর্ত্ততা আর শিল্পীর আবেষ্টন-পালিত নিজত্বের বাহ্যিক লক্ষণগুলি কাব্যের কোন্ অংশে প্রকাশ পায় যে জন্যে অনুবাদ অসম্ভব হ'য়ে ওঠে? এক কথায় বলতে গেলে রূপে। অতএব কাব্যের রূপের লক্ষণগুলি আর একটু বিশদ ভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

প্রথমে শিল্পীর আবেষ্টনের কথাই ধরা যাক। তার কাব্য তার ব্যক্তিত্ব বা নিজত্বের আত্মপ্রকাশক আর সেটা তার আবেষ্টনের মধ্যে ধৃত ও বর্দ্ধিত। আবেষ্টন বলতে বুঝি কবির দেশ, কাল, পাত্র, ইতিহাস ও চিন্তাধারা নিরূপিত সংস্কার, ঐতিহ্য, কবির নিজের শিক্ষা, দীক্ষা, আর অর্জ্জিতজ্ঞান, আর সবার উপরে তাঁর সমবর্ত্তী কালের প্রভাব (Spirit of the age)।

Edward Fitzgeraldকেই উদাহরণ স্বরূপ নিলে দেখতে পাই তাঁর ওমর খৈয়ামও কেমন এই যুগধর্ম্ম প্রসূত আবেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ। আধুনিক কবি নাট্যকার আর সমালোচক John Drinkwater তাঁর Victorian Poetryতে স্পষ্টই দেখাতে পেরেছেন যে ফিটজেরাল্ড তাঁর প্রাচ্যজ্ঞান আর রীতিনীতির চর্চ্চা সত্ত্বেও, এবং তাঁর কাব্য পারস্য গঠনপ্রণালীতে অনুপ্রাণিত হ'লেও, তিনি বিশ্বাসক্ষেত্রে তর্ক আর জল্পনা প্রাধান্যের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি, কারণ সেটা ছিল তৎকালীন ভিক্টোরীয় যুগের একটা কালধর্ম্ম। ফিটজেরাল্ডের পক্ষে সে প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা তেমন শক্ত ছিল না কেননা তিনি ছিলেন একজন মস্ত রুচিবাগীশ, নির্জ্জন জ্ঞানান্বেষী, সমকালীন গণে উদাসীন, আর সৃষ্টিকার্য্যে অপেক্ষাকৃত অলস। এই কালপ্রভাবের ফলেই Tennysonএর Idylls of the Kingএ ভাবের দিক থেকে চরিত্রমাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ থাকলেও তা Maloryর চরিত্রসংঘ থেকে তফাৎ। অবশ্য স্বীকার্য্য যে টেনিসন অনুবাদ করেন নি, সুতরাং তাঁর এ বিষয়ে স্বাধীনতাও একটু বেশী ছিল। মূল থেকে পরিবর্ত্তনে, ইচ্ছাকৃতই হোক বা অনিচ্ছাকৃতই হোক, ভালো মন্দের কথা আসে না। মূলের অনুরূপ হবেনা ব'লে যে চরিত্রসৃষ্টি থেকে বিরত থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। পুরাতন কথা নূতন ভাবে ব'লতে পারা মৌলিকতারই নিদর্শন। আর যুগধর্ম্ম মেনে চলা অনেক সময়ে sincerityরই পরিচায়ক। অতএব আধুনিক বাংলা রঙ্গমঞ্চে "সীতা" নাটকের রাম চরিত্র রামায়ণের রামের অনুরূপ হয়নি ব'লে চীৎকার করা তারস্বরে হ'লেও অলস, ব্যর্থ আর মূল্যহীন।

যাহোক, অন্যদিক থেকে দেখলেও অনুবাদে এই পারিপার্শ্বিক জনিত অন্তরায়টুকুরই আভাস পাই। যেখানে মাত্র বর্ণনা বা তালিকা সেখানে অনুবাদকার্য্য সহজতর, কারণ তাতে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তত কম, কিন্তু যেখানে সেটা যে পরিমাণে কল্পনাপ্রাচুর্য্যে উজ্জ্বল অথবা দৃষ্টিভূত (objective) না হ'য়ে আত্মনিবদ্ধ (subjective) সেখানে সেই পরিমাণে অনুবাদ কঠিন, কেননা সেইখানেই ততবেশী রূপের প্রাধান্য। সেই জন্যই বৃত্তান্তমূলক (narrative) কবিতা অপেক্ষা গীতিকবিতার (lyric poetry) অনুবাদ কঠিনতর, আবার সঙ্গীত বা সুরের অনুবাদ একেবারেই অসম্ভব।

এই তো গেল কবির ব্যক্তিত্ব আর আবেষ্টনের কথা। কিন্তু কাব্যের অন্যান্য লক্ষণও আছে কিন্তু সবেতেই প্রমাণ হয় একই কথা—কবিতার ভাব প্রকাশ পায় একেবারে রূপ-

লাবণ্যের সুষমায় জড়িত হ'য়ে সমুদ্রমন্থনের ফলে উর্ব্বশীর উত্থান মতো। রূপের মধ্যেই ভাবের প্রকাশ এবং সে রূপের কোন অনুরূপ নেই। অতএব "নূতন বেশে" আসা একরকম অসম্ভব।

কাব্যে ছন্দ আর প্রবাহ তার রূপের প্রাণস্বরূপ। যে ভাবটিকে নিরলম্ব হ'য়ে ধ্বনিরাজ্যে সঙ্গীতে মূর্ত্ত হ'তে দেখি তাকেই কথারাজ্যে দেখি কাব্যরূপে। সঙ্গীত আর কাব্যের এই মূলগত ঐক্য ছন্দে আর প্রবাহেই প্রকাশ পায় সবচেয়ে বেশী। আর সঙ্গীত অনুবাদের অতীত। অতএব কাব্যের অনুবাদে যখন ছন্দ বা প্রবাহে পরিবর্ত্তন ঘটাই তখন কাব্যের প্রাণসত্তাটিও সমূহ বিচলিত হয় তা বুঝতে পারি। যেক্ষেত্রে মূলের গতি, ছন্দ, মিল, রীতি, অনুবাদে ভিন্ন রূপে দেখা দিতে বাধ্য সেখানে মূলের ধ্বনিটুকু আর কানে বাজে না; তখন সেই পরিচিত ধ্বনি প্রসূত পরিচিত ভাবের আবেদন আর খুঁজে পাই না। প্রতিধ্বনিতে যে একটা সমর্থনজনিত তৃপ্তি আছে সেটুকু থেকে বঞ্চিত হই আর পরিচিতের সাক্ষাৎ না পেয়ে নিরাশ হ'তে হয়। ভাবের সঙ্গে ছন্দের এই একীভূত হবার কারণ এই যে সঙ্গীত যেমন প্রয়োজনানুযায়ী সুর আপনি বেছে নেয় তেমনি কাব্যের কবির বিশিষ্ট ভাবোন্মাদনটি (Emotional passion) আপনিই রসরাজ্যের মধ্যে গিয়ে তার ছন্দ বেছে নেয়। অনেক কবির অনেক কবিতায় তো ছত্রের শেষের মিলের কথাটিকে বজায় রাখতে গিয়ে কবিতার ভাব ধারা সম্পূর্ণ ভাবে বা আংশিকভাবে বদলে গেছে। অনেক সময়ে আবার প্রথমেই একটি সুললিত ছন্দ, পদ বা ছত্র মনে আসাতে সেইটিকে অবলম্বন ক'রে সম্পূর্ণ কবিতাটি গ'ড়ে উঠেছে। অতএব ভাবকে ছন্দসম্পর্ক থেকে ভিন্ন করা যায় কেমন করে? সুতরাং অনুবাদক যদি ভাবের আবেগটুকু (emotional quality) ধ'রতে চান তাঁকেও সেই ছন্দেই ছন্দিত হতে হবে। অথচ ভাষাভেদে সে ছন্দ পরিত্যাগ ক'রে যদি অন্য ছন্দ ব্যবহার ক'রতে হয় সেটা যে কতটা নৈরাশ্যকর তা হয়ত অনুবাদকের প্রাণের একটা গোপনীয় ইতিহাস তবে তার কতকটা পরিমাপ পাঠকের নৈরাশ্য থেকে পাওয়া যেতে পারে।

কাব্যের আর একটি রূপ প্রকাশক লক্ষণ ভাবচিত্রণ (Imagery)। কাব্যের উপমালঙ্কার তো ভাব চিত্রণেরই খেলা, কিন্তু তাতেও এক কালে এক ভাষায় যা' স্বাভাবিক, দেশ কাল পাত্রভেদে, হয়ত বা সেই দেশেই ভিন্ন কালে, অস্বাভাবিক। কাব্যে এই যুগপ্রবাহের ছাপ পদে পদে। John Drinkwater প্রকৃতই বলেন যে "There are two governing influences in all poetry of any consequence, the poet's own personality, and the spirit of the age. অবশ্য ভাবচিত্রের নির্ব্বাচন কবির মনোভাব, প্রকৃতি, জীবন আর জ্ঞানের উপর যথেষ্ট নির্ভর করে, কিন্তু সে সবই তো তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ আর যুগধর্ম্মের দ্বারা নিরূপিত। একটা উদাহরণ দি। ফিট্‌জেরাল্ডের ইংরাজী ওমরে "And this delightful Herb whose tender Green" ছত্রটিতে কোন বিশেষ ছবি দেখা যায় না, কিন্তু কান্তিচন্দ্রের বাংলায় ছত্রটির নূতন রূপ এই—"এই যে কোমল দূর্ব্বা যাহার বুকের ঘেরা আঁচলটুক।" এই বুকের ঘেরা আঁচলের কথা আসে কোথা থেকে? মাত্র ছন্দ বা ছত্র পূরণের জন্যে এতদূর যেতে হয়নি তা বোঝা যায়। পরিবর্ত্তন ইচ্ছাকৃত, সন্দেহ নেই। কারণও সহজ। বাঙালী কবির পক্ষে আঁচলের মোহ কাটান শক্ত আর তিনি যেভাবে জিনিষটির সঙ্গে পরিচিত মূল লেখক তেমন নন, অতএব প্রথমোক্তের পক্ষে সুপ্রযুজ্য স্থানে এই নূতন ছবিটির লোভ সংবরণ করা কঠিন হয়, বিশেষতঃ লেখক নিজেকে যখন যথার্থ অনুবাদক ব'লে প্রচার ক'রতে ব্যস্ত নন। আবার ইংরাজীতে মাত্র "Bough" কথাটি থেকে বাংলায় "সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়" পূর্ণ কুঞ্জকাননটি সৃষ্টি হয় কেন? কারণ, যে কবির দেশে বৃন্দাবনের কুঞ্জকাকলীতে এখনও কাব্যকানন মুখরিত, তাঁর পক্ষে ওই একটু উপলক্ষই যথেষ্ট।

Imagery প্রসঙ্গে দূর নির্দ্দেশাত্মক (allusive) উপমা, ছবি বা কথাও লেখকের ভাবপ্রবণতা, ঐতিহ্য আর যুগধারা পুষ্ট। লেখকের মনে সেটা যে আবেগময়ী সাড়া জাগিয়েছে সেটা ভিন্ন দেশবাসী বা ভিন্ন ভাষাভাষীর মনে না

শ্রীনবেন্দু বসু

জাগাতে পারে। জ্ঞানের রাজ্যে সেটার সঙ্গে পরিচয় থাকলেও ভাবের রাজ্যে ঘনিষ্ঠ অনুভূতি না থাকতে পারে। তাই মনে হয় ইংরাজিতেই হোক বা বাংলাতেই হোক জামশিদের স্মৃতি "অতীত স্মৃতিই", কৈকোবাদ আর কৈখসরুর ইতিহাসেই নামটা থাকে, আর রুস্তম আর হাতেম-তাইয়ের কল্পকথা "স্মৃতির ফাঁশ" মাত্র। নামগুলির উল্লেখেই একটা রসের উৎস ছোটে, কিন্তু সে উৎস বহুকাল পূর্ব্বে নৈশাপুরেই একবার ছুটেছিল, ভিন্ন দেশে তার স্রোত বয়নি।

With her five handmaidens, whose names
Are five sweet symphonies,
Cecily, Gertrude, Magdalen,
Margaret and Rosalys.

এই নামগুলিতে প্রকৃত রসের সন্ধান রসেটি বা তাঁর দেশবাসীরাই পেয়েছিলেন। আবার

"প্রিয়সখীর নামগুলি সব
ছন্দ ভরি' করিত রব
রেবার কূলে কলহংসের
কলধ্বনির মতো।
কোন নামটি মন্দালিকা
কোন নামটি চিত্রলিখা,
মঞ্জুলিকা মঞ্জারিণী
ঝঙ্কারিত কত।"

এই নামগুলিতে ছন্দের ঝঙ্কার আর মাধুর্য্য রবীন্দ্রনাথের দেশবাসীর কাছেই উদ্ঘাটিত। বাংলায় যখন পড়ি এই পূর্ণ দৃশ্যের ছবি—

"সে তো কভু দেখে নাই রাধিকার সনে
কুঞ্জে বসি' সারা বিশ্ব শুধু শ্যামময়,
বাঁশীটি বাজে নি যার হৃদি বৃন্দাবনে
সে কভু বুঝিতে পারে প্রেম কারে কয়?"
(কান্তিচন্দ্র)

তখনই বুঝি বাংলা বা ভারতের বাইরে কোনো হৃদিবৃন্দাবনে এ বাঁশী একরূপ অসম্ভব।

কাব্যে ব্যবহৃত কথার অনেক সময় একটা স্মৃতি উত্তেজক মূল্য (value of associations) থাকে। তাই বাংলা কাব্যে "অভিসার" বা "শ্রাবণ" কথাগুলির ইংরাজী প্রতিরূপ tryst আর August হলেও বাংলা কথাগুলির পিছনে যে কালিদাস আর বৈষ্ণব কবিতার রসধারা বয়ে যায়, বাংলায় শ্রাবণে যে "ঘন গহন মোহে"র সৃষ্টি হয়, তার সন্ধান বা আভাস ইংরাজী কথাগুলিতে পাই না।

আবার প্রকৃত কবিতায় যেখানে স্বরসাদৃশ্য (assonance) দেখি সেটা সব সময়ে কবির কেরামতি দেখাবার জন্যে নয়। শব্দরাজ্যে ভাবের যে স্বাভাবিক প্রতিরূপ থাকে সেটা কি তাই নয়? টেনিসনের

The moan of doves in immemorial elms
The murmuring of innumerable bees.

এই দুটি লাইনই ভাব প্রণোদিত আর ভাবপুষ্ট। অর্থানুযায়ী এগুলির অনুবাদ করাও হয়ত শক্ত নয়, কিন্তু তার যে অংশটুকু ঐ 'ম' কারের মূর্চ্ছনার মধ্যে পরিস্ফুট অনুবাদে সেটা তো পাই না।

অনুপ্রাসও এমনি একটি জিনিষ। প্রকৃত কাব্যে সেটা সম্পূর্ণরূপে ভাবপ্রণোদিত অতএব তাতে থাকে একটা অনিবার্য্যতা যেটা কবিতার স্বতঃস্ফূর্ত্ততার একটা প্রমাণ। মোহিতলালের একটি সনেটের একটি ছত্র "হেরিয়াছি সেই রঙ্গ রূপসীর প্রহরে প্রহরে।" এখানে এই 'র'য়ের অনুপ্রাস কি নিরর্থক? রঙ্গের পাশে রূপসী কথাটি কেন? সুন্দরী ব'ল্‌লে চল্‌তো না কি? অভিধানমতে রূপসী আর সুন্দরীর অর্থ একই। কিন্তু যে নারী রঙ্গনিরতা, প্রহরে প্রহরে হাবভাবময়ী, সে কি সুন্দরী না রূপসী? সুন্দরী বলতে তো বুঝি তিলোত্তমার শান্ত সৌন্দর্য্য, চন্দ্রশীতল, জুঁই ফুলের মৃদুকোমলতাময়। কিন্তু রূপসী ব'ললে তবেই বুঝি রোহিণীর তীব্র বিদ্যুৎ-ছটা, চাঁপাফুলের উন্মাদনাময় উগ্রতা। আর প্রহরে প্রহরে না ব'ললে কেমন ক'রে বুঝি যে এ ক্ষণে ক্ষণে ঈষৎ উত্তেজনা আর নীরবতাময় সুকুমার কোমলতা নয়, এ পূর্ণ গঠিতা নারীর দীর্ঘরাত্রিব্যাপী লাস্যলীলা। অতএব অনুবাদের ভাব থেকে এই 'র'কারের রেশ বিচ্ছিন্ন করবার সঙ্গত কারণ কোথায়? Rupert Brooke-এর "A white

tremendous daybreak"এরও অনুবাদ করা এমনি শক্ত। ভোরের কোমল গোলাপী গোধূলির পর মাঠ প্লাবিত ক'রে হঠাৎ সূর্য্যোদয়ের ভাবটিই কি সুস্পষ্ট নয়? "white" কথাটির শব্দধ্বনিতে কি "হঠাৎ" কথাটির প্রতিধ্বনি পাই না? আর ভাবটি কি daybreakএর ঐ 'r' ও 'k'র কর্কশ শব্দে আর কথাটির হসন্তে আরো তীক্ষ্নতর হয় না? যার জন্যে প্রস্তুত নই সেটা হঠাৎই এসে লাগে একটা তীক্ষ্ণ আঘাতের মত। সে ভাব প্রকাশের জন্যে কর্কশ শব্দই প্রশস্ত। প্রচলিত বাংলায় যখন বলি "চড়াক্ ক'রে রোদ্দুর উঠ্‌লো," তাতেও তো ঐ 'র'-কার 'চ'-কার। দুঃখের বিষয় 'চড়াক্' কথাটি সম্ভবতঃ কাব্যভাষায় অব্যবহার্য্য।

এই থেকে কাব্যের বিশেষ ভাষার (Poetic Diction) কথা এসে পড়ে। এ সম্বন্ধে কোন মতবাদের আলোচনা করা এখানে উদ্দেশ্য নয় তবে অনেক সময়ে একটা কথার স্বল্প ব্যবহার আর পুরাতনত্বে (archaism) অপরিচিতের একটা আকর্ষণ থাকে, আর সেই অনুপাতে কথাটা কাব্য-গ্রাহ্য হ'য়ে ওঠে। অবশ্য কথা-নির্ব্বাচনের এই একমাত্র কষ্টিপাথর নয়। Rupert Brooke, John Masefield প্রভৃতি তো "damn it", "bloody" ইত্যাদি দৈনিক ব্যবহৃত গ্রাম্য কথাগুলিও ব্যবহার ক'রেছেন আর হয়ত স্থান আর অর্থানুযায়ী সঙ্গত ব্যবহারই করেছেন। তবুও archaic কথাগুলি অনেক সময়ে কাব্যের পক্ষে মূল্যবান। সেইজন্যে যদি

"আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণসখা বন্ধু হে আমার"

পদটি অনুবাদ ক'রতে চেষ্টা পাই তো ঐ "পরাণসখা" কথাটি নিয়ে বিপদ ঘটে। যে অনুবাদই করি সেটা হয় "প্রাণসখা"র অনুবাদ, "পরাণসখা"র নয়। কিন্তু প্রাণসখা তো পাশে পাশে চলে। অথচ উক্ত পদটিতে ছন্দের লীলায়, ভাবের সম্পূর্ণতায় আর কথাটির দীর্ঘতর উচ্চারণে "পরাণ-সখা" ব'লতে বুঝি সেই সখা যায় পায়ের ধুলো চোখের জলে ভিজিয়ে দিতে চাই।

এত বাধা সত্ত্বেও যদি অনুবাদ সঠিক হয় তো দেখি যে মূলের স্মরণীয়তা টুকু (memorableness) শেষ পর্য্যন্ত রাখা গেল না যেটা উচ্চাঙ্গের কবিতাকে সময়ের খাতায় অমর ক'রে রাখে। ফিটজেরাল্ডের ওমরের জনপ্রিয়তার একটি প্রধান কারণ তার স্মরণীয় পদপ্রাচুর্য্য। প্রায় অনুরূপ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কান্তিচন্দ্র তাঁর বাংলা অনুবাদে। ফিটজেরাল্ডের শেষ রুবাই—

"And when thyself with shining
Foot shall pass
Among the Guests Star-scatter'd on the Grass
And in thy joyous Errand reach the spot
Where I made one—turn down an empty Glass.'

কান্তিচন্দ্রের শেষ রুবাই—

"বিভোর প্রাণে আসবে যেদিন আকুল মিলন প্রতীক্ষায়
তৃণাসনে অতিথ্-সভা ছড়িয়ে যেথা তারার প্রায়;
উজল পায়ে আসবে যখন আমার যেথায় ছিল স্থান,
উপুড় ক'রে রেখো সেথায় আমার শূন্য পাত্রখান।"

দুটির মধ্যে কোন্‌টি স্মরণীয়তাগুণে অধিকতর গরীয়ান সেটা বলা বোধ হয় খুব সহজ নয়। কিন্তু অবিকল অনুবাদ আদর্শ হ'লে এ কৃতিত্ব মোটেই সম্ভব নয় আর সে হিসাবে নীচে লেখা পদগুলির অনুবাদ করা তো অসাধ্য ব'লেই মনে হয়, যথা Keats এর:

"Charmed magic casements opening on the foam
Of perilous seas in fairy lands forlorn."

কিম্বা রবীন্দ্রনাথের

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়!
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়।"

বাধার আর একটি কারণ আছে যেটা অনেক সময় অনুবাদকের মধ্যেই নিহিত। অর্থাৎ অনুবাদকেরও একটা নিজস্ব বা Personality থাকতে পারে। এবং তা থাকলে সেটা অন্যান্য আনুসাঙ্গিকগুলির সঙ্গে মিশে অনুবাদ-টিকে প্রভাবিত করে। যে অনুপাতে এই ব্যক্তিত্ব সতেজ হয়

শ্রীনবেন্দু বসু

সেই অনুপাতে অনুবাদও তার ছাপ বহন করে। ফলে অনুবাদ গিয়ে ওঠে সৃষ্টির কোঠায়। অনুবাদক নিজেই কবি হতে পারেন। তখন তিনি মূলানুগতিক অনুবাদকের চেয়ে হ'ন বিভিন্ন। মূল প'ড়ে কবি-অনুবাদকের যে হর্ষ তা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব আর তাঁর অনুবাদ চেষ্টায় প্রেয়সীকে ফুলসাজ পরানর সাধনাই বেশী প্রবল,—পূর্ব্ব-পুরুষের স্মৃতিতর্পণ ততটা নয়। কবি-অনুবাদকের মনে মূল কাব্যটি সৌন্দর্য্যের তরঙ্গচাঞ্চল্য উপস্থিত করাতে তাঁর প্রাণে উচ্ছ্বাসের সমতন্ত্রী বেজে উঠ্‌লেই তিনি বলেন, "ক্ষণেক দাঁড়াও তোমা ছন্দে গেঁথে লই।" তাঁর প্রার্থনা যেন "তুবি নব নবরূপে এস প্রাণে।" ফলে তিনি তাঁর নিজস্ব যন্ত্রটিতেই সুর বাঁধেন, যদিও তিনি জানেন যে পিয়ানোর ঝঙ্কার বীণায় ফোটে না। কিন্তু তজ্জন্য তিনি মোটেই ব্যস্ত নন, কারণ বীণায় প্রতিরূপটি দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। এরূপ করার বিপদটুকু ভাল শিল্পী বাঁচিয়ে চলতে জানেন। তিনি জানেন যে পাত্র-পাত্রীদের নামগুলো বাংলা করলেই Woman in White "শুক্লবসনাসুন্দরী"তে পরিণত হয় না, যদিও তা মহিলা-রঞ্জন উপন্যাস হ'তে পারে আর গুটিকতক দেশীয় নাম বা কথা italics এ লিখে কবিতার অন্তর্ভুক্ত করলে তাতে প্রাচ্যভাব (orientalism) আসে না, তা হয় যাকে বলে প্রাচ্য কৃত্রিমতা (pseudo-orientalism)। মূল লেখকের আর অনুবাদকের এই ভাবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওমর খৈয়াম থেকে একটা উদাহরণ দিই।

ফিট্‌জেরাল্ড প্রকৃতই কবি ছিলেন একথা সকলে স্বীকার ক'রবেন। তাঁর প্রথম সংস্করণে ১১ নং রুবাইটি এই—

Here with a loaf of Bread beneath the Bough
A flask of wine, a Book of verse and Thou
Beside me Singing in the wilderness—
And Wilderness is paradise enow.

এই রুবাইটি লিখতে ফিট্‌জেরাল্ড মূল ফারসীর দুটি রুবাইকে মিশিয়ে তার সুবাসনিষ্কাসন করেছেন। প্রথমটি Ousely পাণ্ডুলিপির ১৫৫ নং যা'র নিছক আর প্রায় সঠিক গদ্যানুবাদ এই—

If a loaf of wheaten bread be forthcoming,
A gourd of wine, and a thigh bone of mutton,
And then, if thou and I be sitting in the wilderness,—
That were a joy not within the power of any sultan.

(E. Heron-Allen's translation.)

অন্যটি ঐ পাণ্ডুলিপিরই ১৪৯ নং—

I desire a flask of ruby wine and a book of verse,
Just enough to keep me alive and half a loaf is needful,
And than that thou and I should sit in the wilderness,
Is better than the kingdom of a sultan.

(E. Heron-Allen's translation)

এই মূলের সঙ্গে ফিট্‌জেরাল্ডের রুবাই তুলনা ক'রলেই দেখতে পাই যে প্রথমতঃ একটি ইংরাজী রুবাইয়ের জন্ম হ'ল দুটি ফরাসী রুবাই থেকে; দ্বিতীয়তঃ, মূল রুবাইগুলি অপেক্ষা নূতন রুবাইটি অধিকতর কবিত্বপূর্ণ। ফিটজেরাল্ডের কবি-অনুবাদক বাংলায় কান্তিচন্দ্র। তাঁর রুবাইটি এই—

সেই নিরালা পাতায় ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায়,
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে, ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়!
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু সুর—
সেই তো সখি স্বপ্ন আমার, সেই বনানী স্বর্গপুর।

এ অনুবাদ ফিটজেরাল্ডের রুবাই থেকে আরো দূরে চলে গেছে প্রথমোক্ত কারণগুলির স্পর্শে, এবং সম্ভবতঃ আরো কবিত্বময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যায় ফিট্‌জেরাল্ডেই হোক বা কান্তিচন্দ্রেই হোক ফারসীর মূল বক্তব্যের ভাবার্থটি এখনও অক্ষুণ্ণ; রুবাই মধ্যস্থ বৈজ্ঞানিক সত্যটুকুর কিছুমাত্র অপলাপ হয় নি, যা পরিবর্ত্তন হয়েছে সেটা কেবল বেশ বা রূপের। অবশ্য শেষোক্ত কারণে কবিতার শিল্পেরদিক থেকে পরিবর্ত্তন যে ঘটেনি তা বলি না।

এইবার অপর দিকে দেখা যাক্। যেখানে অনুবাদক মূলের ঐতিহাসিকতা মাত্র বজায় রাখতে যত্নবান সেখানে আমরা পাই সদ্যপ্রকাশিত শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রমোহন বসুর অনুবাদ—

কপালে এমন ঘ'টে যায়—আমি রুটি পাই কিছু হাতে—
মাংসও কিছু জুটে যায়, আর সুরা থাকে তার সাথে,
এ হেন সময়ে তুমি আর আমি বসি নিরালায় কাননে—
এ সুখ সকল সুলতানেরও জুটিয়া উঠে না বরাতে।

এখন প্রশ্ন এই যে, দু রকম অনুবাদের মধ্যে কোন্‌টা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য পূর্ব্বেই বলেছি যে প্রথম শ্রেণীর অনুবাদক অনুবাদ-কৃতিত্ব দাবী ক'রতে ততটা ব্যস্ত নন যতটা স্বাধীন সৃষ্টি ক'রতে; কিন্তু যদিই তাঁকে সে আসন দেওয়া অভিপ্রেত হয় তাহ'লে তাঁর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কি বলবার আছে? উত্তরে বলা যায় যে, প্রথম দর্শনে তাঁকে অনুবাদকের আসন দেওয়া যতটা অন্যায় মনে হয় বাস্তবিক ততটা হয়ত নয়। তাঁর কবি-মন ব'লেই মূলের সঠিক ভাবধারাটি তাঁর কাছে ধরা প'ড়বে। পরে সেটাকে তিনি স্থানচ্যুত বা ভিন্ন আকার দান ক'রতে পারেন অন্যান্য তথ্যগুলিতে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যটুকুর মর্য্যাদা হানি না ক'রে। এই ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত তথ্যপরিবর্ত্তনের হাত থেকে তো বৈজ্ঞানিক অনুবাদকেরও নিস্কৃতি নেই, দেখতে পাই। হিতেন্দ্রবাবুর বৈজ্ঞানিক অনুবাদই কি সম্পূর্ণ ভাবে মূলের অনুরূপ হয়েছে? উদ্ধৃত রুবাইটি একটা খুব গন্ধময় রুবাই। মূলে যেখানে আছে "গর দস্ত দেহদ্ জমগজ গন্দুম নানে" তার অনুবাদে হিতেন্দ্রবাবু লিখেছেন "কপালে এমন ঘটে যায়—আমি রুটি পাই কিছু হাতে"। কিন্তু মূলানুরূপ অনুবাদ হচ্চে এই—"যদি হাতে দেওয়া হয় গমের মগজ থেকে (অর্থাৎ গমের অন্তরতম সার পদার্থের) তৈরী করা রুটি।" গমের মগজের রুটী বলতে বুঝি যে কবি সেই নিরালা কাননে প্রিয়ার কাছে বসে উৎকৃষ্টতম খাদ্যই চান। রুটি ব'লেই যে যা-তা রুটি খেয়ে তাঁর সেই মিলন সুখটুকু খর্ব্ব করবেন তা নয়। তেমনি "জগোস ফন্দে রানে" অর্থ ছাগলের রাণের মাংস, শুধু "মাংস" হ'লেই হবে না। কবি মাত্র উদরপূর্ত্তি ক'রতে চান না। তিনি চান একজন রুচিবাগীশের আহার, তবেই সব দিক থেকে তাঁর মনের মতন হবে। হিতেন্দ্রবাবুর অনুবাদে এই ঘনীভূত ভাবসামঞ্জস্য ফোটে না। অতএব তাঁর অনুবাদে আর কান্তিচন্দ্রের "খাদ্য কিছু"তে বিশেষ কোন প্রভেদ দেখি না। মূলে পদটি এতই মামুলীআর কাব্য-বিশিষ্টতাবর্জ্জিত যে সেটার অবিকল অনুবাদ করা হয়ত তেমন শক্ত ছিল না তবে এসব স্থলে সেটা না হ'তে পারার পথে প্রধান বাধা—এক ভাষার বাক্যরীতি (idiom) আর গঠনপ্রণালীর (Construction) সকল সময়ে অন্যভাষায় হুবহু প্রতিরূপ দেওয়া যায় না, অথচ ওগুলি থেকেও অর্থটি রূপ পায় যথেষ্ট। আবার দেখি ফারসীতে যেখানে একটি মাত্র কথা "গর" ("অগর" বা "যদি") তার অনুবাদ ক'রতে হোলো "কপালে এমন ঘ'টে যায়" ব'লে। বাংলা "যদি" কথাটি যে অনুবাদকের জানা ছিল না তা নয়, তবে ছন্দ আর ছত্র পুরণের জন্যেই ওরকম ক'রতে হয়েছে বলে মনে হয়। একটি কথার স্থানে একটি লাইনের অর্দ্ধেক ঐ ভাবটুকু আনবার জন্যে ব্যয় করতে হয়েছে। কিন্তু একটি পদে কোন অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক ছবি বা ভাব প্রকাশ করবার খাতিরে অতখানি স্থান অধিকার ক'রলে, কোন প্রধানতর ছবি বা ভাবকে অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিসরে সঙ্কুচিত ক'রে আনতে হয়, কারণ সমস্ত পদটির আয়তন সীমাবদ্ধ, আর তাতে ক'রে মূল কল্পনায় বা ভাবে যে পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে সেটা বুঝতে পারা যায়। তেমনি আবার অনুবাদে স্থান খালি প'ড়লে কখন কখন দুটি একটি অবান্তর বা আমদানি-করা কথার ভরাট দিয়ে স্থানপূর্ত্তি ক'রতে হয়। এই সকল কারণে অনুবাদ মূলের অনুরূপ হয় না। সেইজন্য "যদি"র স্থানে যদি "কপালে এমন ঘটে যায়" ব'লতে হয় তাহ'লে সে স্থলে "সেই তো সখি স্বপ্ন আমার" বলায় দোষের গুরুত্বটা তেমন বাড়ে না। "যদি" কথাটা ইচ্ছাভাবের প্রকাশক, যে ইচ্ছা এখনও পূর্ণ হয় নি, আর সেই কারণে সে ইচ্ছাটাকে কপালের হাতে ছেড়ে দেওয়ায় বা স্বপ্ন ব'লে অভিহিত করায় কোন হানি দেখি না। অতএব এ দুটি অনুবাদের মধ্যে দ্বিতীয়টিকেই মনোনীত করায় বাঞ্ছায়

শ্রীনবেন্দু বসু

কিছু নেই, কেননা তুল্য মূল্যে শোভন সংস্করণটির প্রতি লোভ হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। অতএব কবি-অনুবাদকের হাতে হুবহু অনুবাদের জন্যে হা-হুতাশ করবার কিছুই নেই। মাত্র ঐ কারণেই বৈজ্ঞানিক অনুবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কান্তিচন্দ্রের অনুবাদে অবিকল অনুবাদ করবার কোন দাবী বা প্রতিশ্রুতি নেই, সুতরাং তাঁর অনুবাদ ছেড়ে দিয়ে ঐ রকম প্রতিশ্রুতিপূর্ণ একটি অনুবাদ ধরা যাক্। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব তাঁর অনুবাদের ভূমিকায় বলেছেন, "অনুবাদের মধ্যে আমি সাধ্যমত কোথাও নিজের কবিত্ব ফলাবার চেষ্টা করি নি, মাত্র দু এক স্থানে ঈষৎ একটু পরিবর্ত্তন ছাড়া একেবারে হুবহু অক্ষরানুবাদেরই প্রয়াস পেয়েছি.........মূলের ভাববৈশিষ্ট্য যাতে কোথাও ক্ষুণ্ণ না হয় আদ্যোপান্ত সেই চেষ্টাই করেছি।" নরেন্দ্রবাবু সম্ভবতঃ ফিট্‌জেরাল্ডেরই অনুবাদক কারণ তিনি ভূমিকায় ব'লেছেন, "ফিট্‌জেরাল্ডের মোহপাশ কাটিয়ে উঠতে পারিনি......আমি তাঁর পরিবর্ত্তন সমস্তই মেনে নিয়েছি।" উপরোক্ত রুবাইটির নরেন্দ্র বাবুর কৃত অনুবাদ এই—

এইখানে এই তরুতলে;
　তোমায় আমায় কুতুহলে
এ জীবনের যে কটা দিন কাটিয়ে যাব প্রিয়ে,
　সঙ্গে রবে সুরার পাত্র
　অল্প কিছু আহার মাত্র
আর একখানি ছন্দ মধুর কাব্য হাতে নিয়ে,
　থাকবে তুমি আমার পাশে
　গাইবে সখী প্রেমোচ্ছ্বাসে
মরুর মাঝে স্বপ্ন স্বরগ করবে বিরচন,
গহন কানন হবে গো সেই নন্দনেরই বন।

সুললিত কবিতা সন্দেহ নেই, তবে পাঠক উদ্ধৃত রুবাই-গুলির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারেন যে অনুবাদক অন্যান্য অনুবাদকদের তুলনায় সমান দোষী কিনা। মনে হয় অধিকতর। নরেন্দ্রবাবু স্থান নেন সকলের চেয়ে বেশী, এবং বেশী কথা বলার বিপদ তো আছেই।

সমস্যা তাহ'লে কোথায়? অনুবাদকের উদ্দেশ্যের সাধুতা বা অসাধুতা, কিম্বা তাঁর ক্ষমতা বা অক্ষমতায় সব সময়ে নয়। দোষ বা ব্যর্থতা যাই বলি সেটা কবিতার কবিত্বতেই অনুবাদ করবার প্রচেষ্টায়। মূলের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক প্রতিরূপ পাওয়াই যদি উদ্দেশ্য হয় তো সেটা গদ্যানুবাদেই কতক পরিমাণে সম্ভব। Sophocles এর পদ্যানুবাদের চেয়ে এ বিষয়ে Sir Richard Tebb কৃত বা অন্য কোন উৎকৃষ্ট গদ্যানুবাদই প্রশস্ত ব'লে মনে হয়। কারণ গদ্যের ভাষা একটা ন্যায়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আর মাত্র অনুকরণীয়তা ও যাথার্থ্য রক্ষা করবার পক্ষে অনুকূল। সেই কারণেই গদ্যের গদ্যানুবাদ পদ্যের পদ্যানুবাদ অপেক্ষা সহজসাধ্য ব্যাপার, যদিও গদ্যও যখন বেশী পরিমাণে কল্পনাপ্রবল হ'য়ে ওঠে তার অনুবাদও সেই অনুপাতে কঠিনতর হয়। Stevenson-এর Ordered South, Pater-এর Mona Lisa ছবিটির সম্বন্ধে লেখা, বা Oscar Wilde-এর De Proundis-এর অবিকৃত অনুবাদ করা খুব সহজ ব'লে মনে হয় না। অর্থই সব নয়, আর হ'লেও বাক্যযোজনা ও শব্দরীতি প্রভৃতির কাঠিন্য তো থেকেই যায়।

পদ্যানুবাদে পাঠক কাব্য আর সঙ্গীতরসের আশা করবেই এবং কাব্যের কাব্যানুবাদে মূলের সেই রসটিকে প্রকট করা যে কাব্য ব'লেই একরকম অসম্ভব এতক্ষণ আমি সেইটে দেখাইবারই প্রয়াস পেয়েছি। কবিতা যে মুহূর্ত্তে প্রকৃত কবিতাবাচ্য হয় সেই মুহূর্ত্তেই সে একটা নিজস্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তা সে লেখকের স্বকল্পিতই হোক আর অনুবাদই হোক, অবশ্য লেখাটিকে যদি প্রকৃত কবিতা ব'লে স্বীকার করা যায় তবেই। আর বৈজ্ঞানিক পদ্যানুবাদ যে মূলানুরূপ হবেই এমন কথাও নিশ্চিত ক'রে বলা যায় না। লাভের মধ্যে তার আভরণহীনতাটুকু চোখে মনে বড় বেশী পীড়া দেয় এবং সেইজন্য সেটা ব্যর্থও হয়। ফলকথা, অনুবাদে খুঁটিনাটি, ভাষাভঙ্গিমা বা চিন্তাক্রমের অবিকল নকলের জন্যে ব্যস্ত হইলে খুব বেশী সাফল্যের আশা নেই, আর তদভাবে হতাশ হবারও কোন কারণ দেখি না। মাত্র "Sitting in the wilderness"-এ যদি "Singing in the wilderness'-এ ভাবটিও যোগ ক'রি তো মূল ভাবের বিশেষ কোন শ্রীহীনতা ঘটে না,

কারণ ও অবস্থায় "sitting" নীরব হ'লেও সে "singing" এরই প্রতিরূপ। তখন সেটা একটা "Eloquent silence", তখন কানে কোন বিশিষ্ট কণ্ঠস্বর না গেলেও মর্ম্মে গিয়ে পশে যাকে বলে "ditties of no-tone।" অর্থাৎ অনুবাদক যদি নিজে কবি হ'ন তো ক্ষতি অপেক্ষা লাভেরই বেশী সম্ভাবনা, কারণ ব্যথার ব্যথী ব'লে কবির মনের খবর কবিই সহজে পান আর তাই তিনি কবিত্বের প্রকৃত মূল্য আর মাধুর্য্য রক্ষা ক'রতে যতটা যত্নবান হ'ন অন্যের কাছে তা' আশা করা যায় না। অতএব মনে হয় যে মূলের সঙ্গে পরিচিত কাব্যরসের সমঝ্‌দার কোন পাঠকের মনকে অনুবাদ যদি সাধারণ ভাবেই (in its general effect) অনুরণিত ক'রতে পারে আর তা' মূলানুবর্ত্তী হয় তবেই কাব্যের পদ্যানুবাদ হিসাবে সেটাকে সার্থক আর সফল অনুবাদ ব'লে মনে করা যেতে পারে।

স্মৃতি

শ্রীবিষ্ণু দে

[ফরাসী Villanelle ছন্দে রচিত]

বিজন ঘরে নিভৃত রাতে তোমারে স্মরি
তিমির কালো ঘোমটা খুলি' এসেছ মনে,—
দেখিয়াছিনু তোমারে মোর এ ঘর ভরি'।

মনে যে আসো প্রেমের আলো নয়নে ধরি,'
আধেকফুট কথা ও লীলা অধর কোণে,—
বিজন ঘরে নিভৃত রাতে তোমারে স্মরি।

কাব্য পড়ি' সন্ধ্যা যেত গল্প করি'—
মাথাটী বুকে চাহিতে মুখে ক্ষণে ক্ষণে,—
দেখিয়াছিনু তোমারে মোর এ ঘর ভরি'।

বরষা রাতে তন্ত্রী পরে টানিতে ছড়ি—
গুমরে সুর বাদলহাওয়া মেঘের স্বনে,—
বিজন ঘরে নিভৃত রাতে তোমারে স্মরি।

স্নিগ্ধশ্রী ও তনুটী ঘেরি' নীলাম্বরী,
গৃহের কাজে ব্যস্ত—শুন, পড়িছে মনে—
দেখিয়াছিনু তোমারে মোর এ ঘর ভরি'।

মূরতি নাই, স্মৃতি যে শুধু রহিল পড়ি'
ঘুরিছে কত কথা ও ছবি মনের বনে!
বিজন ঘরে নিভৃত রাতে তোমারে স্মরি—
দেখিয়াছিনু তোমারে মোর এ ঘর ভরি'॥

বুলবুল

—গল্প—

—শ্রীপরেশনাথ ভৌমিক

দুটি বুলবুল—থাকে খায় একসঙ্গে এক বাজীকর চিড়িমারের খাঁচায়। বাজীকর তাদের নাম রেখেছে,—কোরক ও কুঁড়ি।

বাজীকরের ইঙ্গিত বুঝে পরস্পর লড়াই করা তাদের কাজ। বাজীকর তাদের বাঁ হাতের উপর বসিয়ে ডান হাতে তুড়ি দিয়ে দিয়ে যখন শীষ্ দিতে সুরু কর্‌ত তখন তারা বুঝে নিত লড়াই করার সময় এসেছে। তাদের বুক দুর দুর ক'রে উঠ্‌ত—কী যে শয়তান পেয়ে বস্‌ত তাদের তা তারা বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ত না। লড়াই ক'রে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়্‌ত তখন তাদের হুঁস হ'ত কি অন্যায়টা তারা ক'রে ফেলেছে। তারা পরস্পরের কাছে এগিয়ে গিয়ে সস্নেহে ঠোঁটে ঠোঁট্ মিলিয়ে চুম্বনের আড়ালে সমস্ত দোষ ত্রুটী ঢেকে ফেল্‌ত। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের সমস্ত হিংসা দ্বেষ ভুলে মিলনের আনন্দে তাদের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ত।

দিন যায়। একদিন বাজীকরের শিষের সম্মোহন তাদের এমন ক'রে মাতিয়ে দিল যে সেদিনকার লড়াইএ উভয় উভয়কে আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে ফেল্‌ল। লড়াইএর শেষে তারা শপথ কর্‌ল—দুষ্ট বাজীকরের পাগল-করা নেশায় তারা আর ভুল্‌বে না, চোখ কান বুজে তার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ কর্‌বে। স্নেহ ভালবাসায় জলাঞ্জলি দিয়ে এতদিন তারা বাজীকরের পেটের খোরাক যুগিয়ে এসেছে—আজ হ'তে এ মমতাহীন কাজে তারা কিছুতে যোগ দেবে না; না খেতে পেয়ে মরে সেও ভাল।

প্রতিজ্ঞা রহিল না। পরের দিন বাজীকরের তুড়ির তালে তালে কোরক আগের মত ক্ষেপে উঠ্‌ল—লড়াইএর বিপুল উৎসাহে। কুঁড়ি এতক্ষণ নীরব ছিল, সে ভাব্‌ছিল এ বুঝি কোরকের যুদ্ধের ভাণ মাত্র। তাই সে নিশ্চিন্ত মনে চুপ ক'রে রইল, আত্মরক্ষার সমস্ত চেষ্টার বিনিময়ে। তবুও তার নিস্তার নাই। সে আঘাত এড়াবার চেষ্টায় যতই এলোমেলো উড়ে বেড়ায়—সঙ্গী তার ততই কঠিন আঘাত দেয়। অভিমানে রাগে অন্তর তার ভ'রে উঠ্‌ল। এক একবার তার ইচ্ছা কর্‌ছিল কোরকের টুঁটি চেপে তার নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রতিশোধ নেয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞার কথা মনে প'ড়ে তাকে ব্যাকুল ক'রে দিল। চোখ বুজে সমস্ত অত্যাচার সে স'য়ে গেল। খেলার শেষে বাজীকর সস্নেহে কোরকের মাথা চাপড়ে লড়াইএর সমস্ত বাহাদুরীটুকু তাকে দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—"বাহারে ছোক্‌রা, আচ্ছা খেল্ দেখায়া।"

সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসমান দর্শকগণের সুমিষ্ট ফলের উপঢৌকনে কোরকের পদতল ভ'রে উঠ্‌ল।

সেদিনকার লড়াইএর পর যখন তারা খাঁচায় ফিরে এল চির-অভ্যস্ত মিলনে সংশয়ের প্রথম ছায়াপাত হোল কোরকের বুকে। সে কুঁড়ির দিকে চাইতেই শিউরে উঠ্‌ল—তার সর্ব্বাঙ্গ লালে লাল। সে খাঁচার এক কোণে ধ্যাননিরতা তাপসীর মতো নিবিষ্টভাবে বসেছিল—তার সমস্ত শরীর ছাপিয়া কী এক অব্যক্ত ব্যথা। কোরকের অন্তর ব্যথায় ভ'রে উঠ্‌ল। হায় হায় সমস্ত প্রতিজ্ঞা ভুলে কী অত্যাচার না সে তার উপর করেছে, স্বার্থপর মায়াবীর সুরের নেশায় অনুশোচনায় তার অন্তর বুঝি জ্ব'লে যাচ্ছিল। কুণ্ঠিতভাবে সে কুঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। বিপুল আগ্রহে ঠোঁট্ দুখানি কুঁড়ির ঠোঁটে ছুঁইয়ে মিনতির স্বরে সে শিষ্ দিয়ে উঠ্‌ল—ক্ষমা কর প্রিয়ে, ক্ষমা কর। আমার সব দোষ মার্জ্জনা কর।

হিংসার ব্যথার সমস্ত দহন-বিষ কুঁড়ির অন্তর হ'তে কে যেন এককালে শুষে নিল। সে একান্ত নির্ভরতায় চুম্বনের মায়ায় আত্মসমর্পণ ক'রে কোরকের বুকে ঢলে পড়্‌ল।

মিলনের আনন্দে দিন কয়েকের মাঝে কুঁড়ির শরীর মন সতেজ হয়ে উঠ্‌ল। সেই সেদিনের নিষ্ঠুর ঘটনার পর চিড়িমার কোথায় চ'লে গেছে। অতীতের সব কিছু জঞ্জাল অন্তর হ'তে ধুয়ে মুছে কুঁড়ি তার স্নেহা-বেষ্টনীর মাঝে কোরককে নূতন ক'রে ঘিরে ঘিরে কারা-সংসার রচনা ক'রে ফেলেছে। কোরকের স্মৃতিকাতর মন সে ছন্দে-গানে ভ'রে দিয়েছে।

বসন্তের শেষ প্রভাত। পূর্ব্বাকাশের কোল ঘেঁসে পাণ্ডুর মেঘস্তূপ ক্লান্ত গতিতে আসন্ন নিদাঘের আগমনবার্ত্তা নিয়ে নগাধিরাজের সন্ধানে চল্‌ছিল। তারই ফাঁকে ফাঁকে আলোর আবির নীলাম্বুবক্ষে বারুণীর স্তনহার-চ্যুত মুক্তাফলের মত রংঙের ঝিলিক হান্‌ছিল। নীচে নিদ্রালস বনানীর আঁধারঘেরা বুকে বসন্তবাতাস গুমরে গুমরে হাতছানি দিয়ে প্রভাতের আলোকে ডাকছিল।

এই সুন্দর প্রভাতের প্রথম প্রেরণা এসে ঠেক্‌ল খাঁচাগৃহে কুঁড়ির বুকে—ছন্দের বিপুল পুলকহিল্লোলে। সে ঘুমন্ত কোরকের ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকিয়ে দিবসের প্রথম চুম্বন নিবেদন কর্‌ল। তারপর কম্পিত সুরে গান ধর্‌ল—বন্ধু ওঠ জাগ। আকাশধরিত্রীর শূন্যদোলায় আমাদের এ কারাকুলায় বসন্ত প্রভাতের সবুজ আলোয় স্নান করি।

এরূপ ক'রে দিনের পর দিন কুঁড়ির গানে কোরক জেগে এসেছে। আজ কি জানি শৈশবের স্মৃতিতে তার দেহমন কাতর হয়ে উঠ্‌ল। ঠিক এমনই এক বসন্তপ্রভাতে পৃথিবীর আলোর সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়।

বনানীর বুকে লতাপাতায় ঘেরা ক্ষুদ্র তন্তুগৃহে সে কী আনন্দেই ছিল। কোয়েল, দোয়েল, চন্দনা কত সব সঙ্গী তার ছিল—কে জানে আজ তারা কোথায়, এতদিনে হয়ত তারা তাদের বুলবুল মিতার কথা ভুলে গেছে। তার শালিক দিদির খোকা এতদিনে কত বড় হয়ে গেছে—এখন হয়ত সে তার বুলবুল মামাকে চিন্‌তেই পার্‌বে না। দ্রাক্ষাবনে গান গেয়ে গেয়ে ফলের রস খাওয়া, পাহাড় কোলে ঝর্ণার বুক ছুঁয়ে ছুঁয়ে আকাশপথে বাজী রেখে দৌড়ান। আজ সে চিড়িমারের খাঁচায়, ডানার জোর কে তার কেড়ে নিয়েছে, কণ্ঠের সুর কোথায় উবে গেছে। ছাতার এসে খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে তাকে এখন টিট্‌কিরী দিয়ে যায়। এমনিই দুর্ভাগা সে—। তার চোখ সজল হয়ে উঠ্‌ল।

কোরকের চোখে জল দেখে কুঁড়ি চঞ্চল হল। সে জিজ্ঞাসু চোখে তার সাম্‌নে এসে বস্‌ল।

কোরক গলা ঝেড়ে বলল—'কি দেখছ কুঁড়ি?'

—'তুমি কাঁদ্‌ছ?'

—'কই না',—একটু থেমে সে আবার বল্‌ল—'কুঁড়ি আজ আমাদের শেষ দিন।'

কুঁড়ি কিছু বুঝতে না পেরে তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল।

কোরক মুখে মিথ্যা হাসি ফুটিয়ে বলল,—'আজ খাবারের বাড়াবাড়ি দেখ্‌ছ না? কত ফল খেতে দিয়েছে দেখ। আজ আমাদের আবার লড়াই কর্‌তে হবে।'

লড়াইএর কথায় কুঁড়ি শিউরে উঠ্‌ল। সে কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—'কে বল্‌ল? চিড়িমার এখনও ফেরেনি।'

—'এসেছে নিশ্চয়, ক'দিন কাজ ছিলনা—খাবার পাইনি। এক ফোঁটা জলের অভাবে গলা শুকিয়ে গেছে। আজ খাবার দিয়েছে কাজ করতে হবে।'

কুঁড়ি বলল 'আজ তুমি কি কর্‌বে?'

—'আর লজ্জা দিও না কুঁড়ি। তুমি এক কাজ করো, বাজীকর যখন শিষ্ দিতে সুরু করবে তুমি তখন তোমার গান সুরু করো। তাহলে শয়তান আমার নাগাল পাবে না।'

—'তা না হয় হ'ল, চিড়িমার আমাদের কিছু বল্‌বে না?'—কুঁড়ি কোরকের পাশ ঘেঁসে বস্‌ল।

'বলে বলুক দুজনে একসঙ্গে মর্‌ব।' কুঁড়ি ব্যথায় আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল।

চিড়িমার ভিন্ গাঁ হ'তে শিকার ক'রে ফিরে কুঁড়ি ও কোরককে নিয়ে খেলা দেখাতে বেরিয়ে পড়্‌ল। যাওয়ার সময় স্ত্রীকে ডেকে ব'লে গেল—বৌ, তুমি ঘুঘুগুলোকে ভাল

শ্রীপরেশনাথ ভৌমিক

ক'রে চড়চড়ি রেঁধে রেখো—নাড়ীভুঁড়িগুলো ফেলে দিও না একটু কষ্ট ক'রে পরিষ্কার ক'রে নিও। ততক্ষণ খেলা দেখিয়ে কিছু রোজগার ক'রে চাল কিনে আনি। আমি এলে ভাত চড়বে।

"বুলবুলকা লড়াই—ক্যা মজাদার"—হেঁকে হেঁকে সে একটা বড় রাস্তার মোড়ে অনেক লোক জড় ক'রে ফেল্‌ল। তারপর পাখী ছুটাকে বাঁ হাতের উপর বসিয়ে "আসমানকা খেল্ লাগাও" ব'লে তাদের মাথায় বার কয়েক হাত চাপড়ে তুড়ি দিয়ে দিয়ে শিষ্ দিতে সুরু ক'রে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কুঁড়িও শিষ্ জুড়ে দিল। আধ ঘণ্টায় নানান্ কসরতেও যখন লড়াই বাধ্‌লনা—চিড়িমার রেগে কোরকের ঠ্যাং ধ'রে বারকয়েক আছাড় দিয়ে ফের্ শিষ্ দিতে সুরু কর্‌ল।

কোরকের অবস্থায় কুঁড়ির চোখে জল আস্‌ছিল। চিড়িমার শিষ্ দিয়ে চল্‌ল তবুও কোরকের হুঁস নেই। এবার চিড়িমার ক্ষেপ্‌লে তাকে আর জ্যান্ত রাখবে না। কুঁড়ি গান বন্ধ ক'রে উড়ে উড়ে কোরকের বুকে পিঠে আঘাত দিতে আরম্ভ ক'রে দিল। চিড়িমার নূতন উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "বাহা বিট—বাহা বিট"। উৎসুক দর্শকগণের মাঝে একটা উৎসাহের সাড়া প'ড়ে গেল।

কোরক কিন্তু পাল্টা আক্রমণের কোন চেষ্টাই না ক'রে আগের মত চুপ ক'রে রইল। ব্যর্থ প্রয়াসে ক্লান্ত হয়ে কুঁড়ি কোরকের গা ঘেঁসে তার ঠোঁটে ঠোঁট্ মিলিয়ে ব'সে পড়্‌ল।

ব্যগ্র জনতার অপ্রিয় মন্তব্য কোনমতে হজম ক'রে বাজীকর কুঁড়ির চেষ্টায় একটু খুসী হয়ে উঠ্‌ছিল। সেও যখন কোরকের মত চুপ ক'রে ব'সে পড়্‌ল—বাজীকর আর রাগ সাম্‌লাতে পারল না। খপ্ ক'রে পাখী ছুটার গলা ডান হাতের মুঠার মধ্যে চেপে ধ'রে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"দোস্ত্ বন গিয়া, জাহান্নম মে যাও"।

জীবনের শেষ স্পন্দন তাদের পালক সঞ্চালনে বারকয়েক ঝটপট্ ক'রে জনতার উচ্চ হাস্যে রাস্তার বিক্ষুব্ধ বাতাসে মিলিয়ে গেল।

তুমি ও আমি

কমলিনী নহ তুমি নিশীথে মলিন
কুমুদিনী নহ তুমি দিবসে বিলীন।
নিশীথে কুমুদ তুমি, কমল প্রভাতে ;
দিবসে তপন আমি, চন্দ্র সখি, রাতে

চীনে হিন্দুসাহিত্য

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(১)

ভারতসম্রাট্ প্রিয়দর্শী অশোকের সমসাময়িক চীনসম্রাট্ চি-হুয়াং-তি চীনকে উত্তরের বর্ব্বর জাতির উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা জগদ্বিখ্যাত। এমন সুদৃঢ় ও সুবৃহৎ প্রাচীরও উত্তর-চীনকে উত্তরের উৎপাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। একদিন প্রাচীরের বাধা উদ্ধত যাযাবর শক্তির নিকট পরাভূত হইল; দলে দলে তাতার জাতীয় লোক আসিয়া উত্তর চীন অধিকার করিল; ক্ষুদ্র, বৃহৎ, ক্ষণস্থায়ী, যুগস্থায়ী বহু রাজ্য ও রাজা কয়েক শতাব্দীর মধ্যে উঠিল পড়িল; সেই চঞ্চলতার বিস্তৃত ইতিহাস আমাদের পক্ষে অবান্তর। মোটকথা এই তাতারগণ যদিও জয়ীর আসন গ্রহণ করিল, তথাচ চীনের সভ্যতার নিকট পরাভব মানিয়া চীনের ভাষা, চীনের সাহিত্যই গ্রহণ করিল; এবং সেই সঙ্গে গ্রহণ করিল ভারতের ধর্ম্ম। বুদ্ধের বাণী এই অর্দ্ধসভ্য, অর্দ্ধযাযাবর তাতার জাতির মনকে দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করিল। উত্তরের ৎসি'ন (৩৮৪—৪১৭ খৃঃ অঃ) রাজবংশ তাতার বংশোদ্ভব হইলেও সর্ব্বতোভাবে চীনা হইয়া গিয়াছিল। সম্রাট্ ইয়াও ভাঙ্ (৩৮৪—৩৯৫ খৃঃ অঃ) ও তাঁহার পুত্র ইয়াও-হিঙ্ ছিলেন নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ। ৎসি'ন রাজত্বকালে বৌদ্ধপ্রভাবের স্বর্ণময় যুগ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ৎসি'ন রাজবংশের রাজত্বের পরমায়ুও যে দীর্ঘ, তাহা নহে; অথচ এই কয়েক বৎসরের মধ্যে আট জন পণ্ডিত বহুশত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া নিজেদের জন্য অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, চীন-সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়া ধন্য হইয়াছেন, ও ভারতের চিন্তা-ধারাকে পৃথিবী হইতে একেবারে লুপ্ত হইতে না দিয়া আজ জাগ্রত ভারতের কৃতজ্ঞতা আহরণ করিতেছেন।

এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক হইতেছেন কুমারজীব—ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নদের অন্যতম। আজ বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ভারতের দ্রষ্টাগণ যেমন সম্মানিত—তেমনি একদিন ভারতের চিন্তাধারা বহনের দূতগণ এশিয়া মহাদেশে সমাদৃত হইয়াছিলেন। ভারতের এই চিন্তারসধারা কুমারজীবের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্য্যন্ত সমভাবে ধরিত্রীর বক্ষোপরি সিঞ্চিত হইয়া আসিতেছে। এই অখণ্ড স্রোতধারা কখনো পূর্ব্ব এসিয়ার জাতিরা গ্রহণ করিয়াছে, কখনো গ্রহণ করিয়াছে মধ্য-এশিয়ার অধিবাসীরা;—আবার সমুদ্রপারে তাহারই ধ্বনি অস্ফুট হইলেও শোনা যাইতেছে না,—একথা কোনো বধির বলিবে না।

কুমারজীব চীনসাহিত্যকে কি দিয়াছেন—তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতে গেলেও একখানি গ্রন্থ হইয়া পড়িবে; কিন্তু সেকথা বলিবার পূর্ব্বে কুমারজীবের জীবনের ইতিহাসটুকু সংক্ষেপে নিবেদন করিতে চাহি। কুমারজীবের পিতা ও পিতামহ ভারতের হিন্দু ছিলেন; বংশানুক্রমে রাজমন্ত্রীত্ব ছিল তাঁহাদের পেশা। পিতামহ কুমারদত্ত অসীম কার্য্যকুশলতার জন্য খ্যাত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার পুত্র কুমারায়ণ রাজসম্মান ত্যাগ করিয়া দেশত্যাগী হন। উত্তরভারতের সহিত মধ্য-এশিয়ার যে ব্যব-ধান আজ আমাদের কাছে অজ্ঞতা, আলস্য, ভীরুতার বশে পর্ব্বত ছাড়াইয়া পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়াছে—হিন্দুভারতের গৌরবের যুগে সে ব্যবধানগুলি আজকের ন্যায় তেমনি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় হিন্দুরা বিশাল ভারতের দেশে দেশে গতায়াত করিতেন। তেমনি যাইতে যাইতে কুমারায়ণ 'কুচা' দেশে উপস্থিত হইলেন। কুচা রাজ্য মধ্য এশিয়ার এক মরুস্থানে অবস্থিত—চীনের সীমানা হইতে অধিক দূরে নয়। এখানকার কথা আমরা 'মধ্যএশিয়া'

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

আলোচনা কালে বিস্তৃত ভাবে বলিব। এই কুচাই কি পৌরাণিক সাহিত্যের কুশদ্বীপ? তাহার উত্তর এখনো পাওয়া যায় নাই। সংক্ষেপে বলিয়া রাখি কুচার অধিবাসীরা আর্যজাতিসম্ভূত ও আর্যভাষাভাষী। কুমারায়ন এই কুচার আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজা এই হিন্দু পাণ্ডিতকে বহু সম্মানের পদ দিতে চাহিলেন কিন্তু তিনি রাজপুরোহিতের পদ ব্যতীত অন্য কোনো পদই গ্রহণ করিলেন না। রাজভগ্নী জীবা এই হিন্দুপণ্ডিতের পাণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের সন্তান কুমারজীব—পিতার নামের কুমার ও মাতার নামের জীব—উভয় মিলিয়া তাঁহার নাম হইল কুমারজীব। তদ্দেশীয় একজন বৌদ্ধ অর্হৎ সাধ্বী জীবাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার গর্ভে বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; অর্হতের বাণী সফল হইয়াছিল।

কিছুকাল পরে জীবা স্বামীর অনুমতিক্রমে কুমারের সহিত ভিক্ষুণী হইলেন, ও বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া পুত্রের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই দেশভ্রমণ ছিল হিন্দুশিক্ষার একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান; একস্থানেই চারি দেওয়ালের মধ্যে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার আহরিত তখনো হয় নাই। তখন ছাত্রকে এক অধ্যাপকের নিকট হইতে অপর অধ্যাপকের নিকট, এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইতে হইত বিদ্যার জন্য। পণ্যের বিপণীতে প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য বিদ্যাকে তখনো আশ্রয়বার্তা হইতে হয় নাই। ঘুরিতে ঘুরিতে মাতাপুত্রে কাশ্মীরে আসিলেন। তথায় কুমারজীব হীনযান-সর্বাস্তিবাদ অধ্যয়ন করিলেন কাশ্মীর রাজভ্রাতা বন্ধুদত্তের নিকট। বিশেষভাবে পাঠ করিলেন সর্বাস্তিবাদের সূত্রগ্রন্থ যাহাকে আগম বলে। কথিত আছে বালক কুমারজীব রাজসভায় তর্কযুদ্ধে এক ব্রাহ্মণকে পরাভূত করেন।

ফিরিবার পথে কুমারজীব সুলে (Kashgar) নগরীতে বুদ্ধের এক পাত্রকে পূজা করেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই পাত্রের কথা ফাহিয়ান তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখ করিয়াছেন। মধ্য এশিয়ার এই নগরীতে এখন হিন্দুসভ্যতার কোনো চিহ্ন নাই। সমগ্র দেশ সহস্র বৎসরাধিক ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত। কিন্তু যে যুগের কথা আমরা বলিতেছি খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে তুর্কীস্থানের এই সকল নগরী তখন হিন্দুসভ্যতার হিন্দুশিক্ষার কেন্দ্র। এই কাশগড় নগরীতে কুমারজীব সর্বাস্তিবাদের দার্শনিক গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিলেন। কুমারজীবের জীবনী হইতে জানিতে পারি যে মধ্য-এশিয়ায় কেবলমাত্র বৌদ্ধগ্রন্থই যে অধীত ও অধ্যাপিত হইত তাহা নহে, এই কাশগড়েই কুমারজীব ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রও অধ্যয়ন করিলেন,—চতুর্বেদ, পঞ্চকলা, দর্শন, জ্যোতিষ। কাশগড়ের বৌদ্ধরাজা এই কিশোর হিন্দু পণ্ডিতকে তাঁহার রাজধানীর ভূষণ করিয়া রাখিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অপরদিকে কুচারাজ বার বার দূত পাঠাইতেছেন এই কিশোর ভিক্ষুকে নিজ নগরীতে ফিরাইয়া পাইবার জন্য।

কাশগড় ত্যাগ করিয়া কুমারজীব যারখণ্ডে আসিলেন। এইখানেই কুমারের জীবন পরিবর্ত্তিত হইল। কুচাবাসীরা সাধারণতঃ সর্বাস্তিবাদ হীনযানপন্থী; কুমারজীবও তাঁহার জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন সর্বাস্তিবাদ মতে। কাশ্মীর ও কাশগড়ে তিনি সর্বাস্তিবাদীদের সূত্র বা আগম, অভিধর্ম্ম বা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। যারখণ্ডে কুমারজীব রাজভ্রাতা সূর্যসোমের নিকট সর্বপ্রথম মহাযানের বাণী শ্রবণ করিলেন; এইখানেই তিনি সর্বপ্রথম মহাজ্ঞানী নাগার্জুন ও তদীয় শিষ্য আর্যদেবের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিয়া মহাযানের মতে দীক্ষিত হইলেন। এই হইতেই তাঁহার জীবনের কাজ হইল মহাযান প্রচার। কুচায় পৌছিয়া তিনি বৌদ্ধসাহিত্য প্রচারে বিশেষভাবে মন দিলেন। ত্রিশ বৎসর মাতৃভূমির সাহিত্যের পুষ্টি ও ধর্ম্মের উন্নতিতে অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু কুমারজীবের নাম, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা পর্বত মরু অতিক্রম করিয়া চীনের রাজসভায় পৌছিল; তাওআন নামে একজন সম্ভ্রান্ত চীনা বৌদ্ধ কুমারকে চীনে আসিবার জন্য কয়েকবার অনুরোধও করেন।

চীনসম্রাট কুমারজীবকে আনিবার জন্য দূত পাঠাইলেন; কুচারাজ তাঁহাকে ছাড়িতে অস্বীকৃত হইলেন। চীনা ইতিহাসকারেরা বলেন সেইজন্যই নাকি কুচারাজের সহিত চীনা সেনাপতির যুদ্ধ বাধে। চীনা ইতিহাসের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। অনেক পরি-

বর্ত্তনের পর কুমারজীব রাজধানী চাওঙ্গানে আসিয়া রাজা-গুরুর পদে অভিসিক্ত হইলেন। চীন সম্রাট্ এই মহা-পণ্ডিতের অভ্যর্থনা ও সমাদরের জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিলেন।

কুমারজীবের পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। সংস্কৃত বা চীনা কোনোটিই তাঁহার মাতৃভাষা না হইলেও দুইটি ভাষাতেই তাঁহার সমান দখল ছিল। বিদেশীদের মধ্যে বিশুদ্ধ চীনা লিখিতে পারিয়াছেন এমন পণ্ডিত খুবই কম, কি প্রাচীনকালে, কি আধুনিক সময়ে। কিন্তু কুমারজীব চীনা লিখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। চীনা সাহিত্যিকগণ যে ভাষা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, কুমারজীব সেই সাহিত্যিক ভাষায় তাঁহার গ্রন্থাদি লিখিয়া গিয়াছেন।

কুমারজীব সংস্কৃতের প্রাচীন অনুবাদগুলি মূলের সহিত স্বয়ং মিলাইতে আরম্ভ করিয়া দেখিলেন যে অধিকাংশ স্থলে অনুবাদ মূলের ভাব রক্ষা করিতে পারে নাই—অনুবাদ আক্ষরিক হইয়াছে, কিন্তু তাহা চীনাদের নিকট অর্থশূন্য। ইহার কারণ অধিকাংশ হিন্দু ভিক্ষুগণ দো-ভাষীর সাহায্যে অনুবাদ করিতেন একজন চীনা প্রতিশব্দ দিতেন, এক-জন লেখক সেগুলি লিখিতেন—তৃতীয় একজন সেগুলিকে সংবদ্ধ করিতেন। হিন্দুভিক্ষু উত্তমরূপে চীনা জানিতেন না, তৃতীয় ব্যক্তি হিন্দু দর্শন বা তত্ত্ব বুঝিতেন না। এই মনি-কাঞ্চন যোগ হইয়াছিল কুমারজীবে—একাধারে সংস্কৃতজ্ঞ ও চীনজ্ঞ। রাজা ইয়াও-হিংএর অনুরোধে কুমারজীব এইসকল অশুদ্ধ অনুবাদকে শুদ্ধ ও সরল করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। এই কার্য্যেই তাঁহার জীবনের শেষ কয়েক বৎসর চাওঙানে অতিবাহিত হইল। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য রাজাদেশে আট সহস্র শ্রমণ নিযুক্ত হইল। রাজা স্বয়ং অনেক সময়ে সংশোধন কার্য্যে সহায়তা করিতে আসিতেন। আট বৎসরের মধ্যে কুমারজীব যাহা করিলেন—তাহা অসাধ্যসাধন—৯৮ খানি গ্রন্থ—৪২১ খণ্ডে অনূদিত হইল। দুঃখের বিষয় ৫০ খানি মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ৪০৯ খৃষ্টাব্দে কুমারজীব চীনদেশের রাজধানীতে দেহরক্ষা করিলেন।

কুমারজীবের নিকট সাহিত্য হিসাবে চীনা বৌদ্ধগণ যে কতটি ঋণী তাহার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করিতে গেলে প্রবন্ধের স্থানে গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইবে। সুতরাং অতিব্যাপ্তি না করিয়া সংক্ষেপেই সে কথাটি বলিতে চেষ্টা করিব; কিন্তু আমি জানি সংক্ষেপে বলিতে গিয়া এই মহাপুরুষের প্রতি আমি অবিচারই করিব।

এ পর্যন্ত চীনে যে সকল গ্রন্থ নীত হইয়াছিল ও যে সবের অনুবাদ হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ হীনযানের গ্রন্থ—সূত্র, বিনয় ইত্যাদি পাঁচমিশালী সাহিত্য। মহাযানের পাঁচরকম সূত্রও আসিয়াছিল; কিন্তু এ পর্যন্ত মহাযানের যথার্থ সম্পদ চীনাভাষাভাষীদের হস্তে প্রদত্ত হয় নাই। কুমারজীবের কাছে চীনাবাসীরা সেই সম্পদের জন্য ঋণী, ও সেগুলি চীনায় রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া কুমারের নিকট ভারত আজ কৃতজ্ঞ।

মহাযানের মধ্যে নানা ভাগ কালে গড়িয়া ওঠে—প্রধান হইতেছে মাধ্যমিক ও যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ। তাহার মধ্যে মাধ্যমিক দর্শনই চীনে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হইলেন নাগার্জ্জুন। শূন্যতাবাদ হইল এই দর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই শূন্যতার নানারূপ অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু Dr. Suzuki. ইহার সুন্দর একটী ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন, "শূন্যতার অর্থ সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুর ক্ষণস্থায়িত্ব। শূন্যতা অনিত্য বা প্রতীত্যেরই অপর একটী প্রতিশব্দ। মহাযানপন্থী বৌদ্ধদিগের নিকট শূন্যতা বলিলে বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির অস্থায়ীত্ব বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে জগতের সকলই পরিবর্ত্তনশীল; এখন যাহা কার্য্য, পরমুহূর্ত্তে তাহা কারণ—এইরূপে একটী অখণ্ড গতিশীলতা জগতের মূলে রহিয়াছে ইহাই হইতেছে শূন্যতার অর্থ। সম্পূর্ণ বিলয় বা অভাব ইহা দ্বারা বুঝায় না। বৌদ্ধধর্ম একদিকে যেমন জড়বাদ স্বীকার করে না; অপর দিকে পূর্ণ বিলয় তেমনই অস্বীকার করে।"

বুদ্ধ সম্বন্ধে পূর্ব্বকার যে ধারণা ছিল নাগার্জুন তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার **অধ্যমক-সূত্রে** তিনি একটীর পর একটী করিয়া 'তথাগতের' প্রত্যেকটী রূপকে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়া-ছেন যে বুদ্ধের কোনও পার্থিব দেহ নাই, তাঁহার মনও নাই। তিনি অচিন্ত্য, সুতরাং তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন। সৎ

বা অসৎ কোনও গুণই তাঁহার উপর আরোপ করা চলে না, কারণ ঐ দুইটী গুণই মায়া মাত্র। বস্তুতঃ তাঁহার কোনও সত্তা নাই, তিনি আত্মভব। এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিরই কি জীবনে কি মরণে বিশেষ কোনও সত্তা নাই। কিন্তু গৌতম শাক্যমুনি বলিয়া যে কেহ ছিলেননা এক থা নাগার্জুন বলেন নাই। ঐতিহাসিক বুদ্ধ ও আধ্যাত্মিক বুদ্ধ—এই দুইটী বিভাগ তিনি সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে দেখাইয়াছেন। তাঁহার **মহাপ্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রে** তিনি প্রথমে হীনযানবাদীদিগের মতটী সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার পর মহাযানের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির আদর্শে এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। শাক্যমুনি বুদ্ধের জীবনের প্রত্যেকটী ঘটনা, তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন মত, তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহার গ্রন্থ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের বহুতথ্য সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু পরিশেষে নাগার্জুন দেখাইয়াছেন যে এই সকল পার্থিব ঘটনা বুদ্ধের **জাতকায়েরই** প্রকাশ। বুদ্ধের **ধর্ম্মকায়** আত্মভবকায় বা প্রজ্ঞাকায় কোনও বিশেষ স্থান কালে সীমাবদ্ধ নয়। ইহার শক্তি অসীম, অনন্ত। অনন্তকাল ধরিয়া **ধর্ম্মকায়** বুদ্ধ নানাউপায়ে জীবকে নির্ব্বাণের দিকে লইয়া যাইতেছেন। বুদ্ধের **জাতকায়** নানাপ্রকার হইতে পারে; সেই নানা প্রকারের মধ্যে শাক্যমুনির **জাতকায়** একটী মাত্র।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে কুমারজীব মহাযানের চিন্তাধারা চীনবাসীর নিকট উপস্থিত করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে এক অপূর্ব্ব সম্পদ-ভাণ্ডার খুলিয়া ধরিয়াছেন। নাগার্জুনের মহাযান দর্শন তিনিই প্রথম চীনবাসীকে উপহার দেন। কুমারজীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইতেছে **মহাপ্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র**। ইহা নাগার্জুনের টীকা সমেত পঞ্চবিংশতি সহস্রিকার অনুবাদ। ১০০ খণ্ডে এই গ্রন্থটী বিভক্ত। পালী সুত্তগুলিতে যে পূর্ব্বানুবৃত্তিগুলি অতিশয় ক্লান্তিকর হইয়া উঠে, যতদুর সম্ভব অর্থ অক্ষুন্ন রাখিয়া কুমারজীব সেই সকল পূর্ব্বানুবৃত্তি পরিহার করিয়াছেন। এই গ্রন্থেরই প্রথম অধ্যায়ে শূন্যতাবাদ সম্বন্ধে যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা দ্বারা চীনবাসীদিগের মনে এই মতটী সুস্পষ্টভাবে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

উপরোক্ত গ্রন্থটী ব্যতীত কুমারজীব আরও কয়েকটী গ্রন্থের অনুবাদ করেন; সেগুলির মধ্যেও শূন্যতাবাদ পরিস্ফুট আকার ধারণ করিয়াছে। গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব। একটী হইতেছে **দশসহস্রিকা**, আর একটীর নাম **বজ্রচ্ছেদিকা-প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র**; অপর একটীর নাম **প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়সূত্র**। প্রত্যেকটী গ্রন্থই চীনবাসীদিগের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। এই গ্রন্থগুলি ব্যতীত কুমারজীব সংক্ষিপ্ত সুখাবতীব্যূহের প্রথম অনুবাদ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বৃহত্তর সুখাবতী ব্যূহের অমিতাবাদ প্রতিপাদক বহুসূত্রের অনুবাদ হয়। কিন্তু বৃহত্তর সুখাবতীব্যূহের ও সংক্ষিপ্ত সুখাবতীব্যূহের মধ্যে বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্ব্বে দুইদিন, তিনদিন, চারদিন, পাঁচদিন, ছয়দিন বা ততোধিক দিন রাত্রে অমিতাভ বুদ্ধের নাম জপ করে সেজীবন্মুক্ত হইয়া স্বর্গ লাভ করে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচলিত মত এই যে ইহজন্মের সুকৃতির ফলেই মানব স্বর্গলাভ করে। সেই মত এখানে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হইয়াছে। কর্ম্মফল-বাদ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া মুক্তির একটী নূতন পথ এখানে দেখান হইয়াছে। প্রার্থনার বলে মানুষ পরিত্রাণ লাভকরিতে পারে। কর্ম্মফলে নয়, বিশ্বাসেই মুক্তি—এই মতটী সংক্ষিপ্ত সুখবতীব্যূহের মধ্যে নূতন পাওয়া যায়। বৃহত্তর সুখাবতীতে অমিতাভের প্রতি ভক্তি ও প্রার্থনার মূল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা হইয়াছে, কিন্তু একমাত্র পুণ্যের ফলেই মুক্তি পাওয়া যায়; মুক্তি আর কিছুতে নাই ইহাই বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে। কুমারজীবের সুখাবতীব্যূহ পূর্ব্বাঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে একটী নূতন ধারা আনিয়া দিল। জাপানে যে সুখাবতী সম্প্রদায় আছে কুমারজীবের গ্রন্থখানি তাহার একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের অপর একটী প্রধান গ্রন্থ হইতেছে **সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক**। কুমারজীবের পূর্ব্বেও এই গ্রন্থের চীনভাষায় কয়েকটী অনুবাদ হয়; কিন্তু কুমারজীবের সরল স্বাভাবিক ভাষার জন্য তাঁহার অনুদিত গ্রন্থই চীনে অধিক সমাদর লাভ করে।

বিমলকীর্ত্তিনির্দ্দেশ নামক অপর একটী মূল্যবান বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া কুমারজীব চীনবাসীদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া রহিয়াছেন। বৌদ্ধ অবৌদ্ধ নির্বিশেষে চীনবাসী পণ্ডিতমণ্ডলী কুমারজীবের এই গ্রন্থখানি সযত্নে পাঠ করিয়া থাকেন।

বৈশালী নগরে এক ধনী গৃহস্থ ছিলেন বিমলকীর্ত্তি। জীবনের আদর্শ তাঁহার খুব বড় ছিল। এই আদর্শ গ্রন্থখানির মধ্যে অতি সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"তিনি সাধারণ এক গৃহী মাত্র, তথাপি তিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন; তিনি গৃহে বাস করেন তথাপি কিছুর আকাঙ্ক্ষা তাঁহার নাই; তাঁহার স্ত্রীপুত্র আছে তথাপি তিনি পবিত্রভাবে জীবন কাটান। পরিবার পরিজন তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে তথাপি পার্থিব সকল সুখ হইতে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছেন। মণিমাণিক্যের গহনা তিনি ব্যবহার করেন, কিন্তু অন্তর তাঁহার অপার্থিব ঐশ্বর্য্যে ভূষিত। পানাহার তাঁহাকে করিতে হয় কিন্তু ধ্যানের আনন্দে তিনি মগ্ন। দ্যূতক্রীড়া স্থলে তিনি উপস্থিত হন, কিন্তু ক্রীড়ারত ব্যক্তিদিগকে যথার্থ সত্যপথ অবলম্বন করিতে বলেন। বিধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিলেও তাঁহার বিশ্বাস অটুট থাকে। পার্থিব জ্ঞান তাঁহার যথেষ্ট আছে কিন্তু বুদ্ধের অপার্থিব বাণীতেই তিনি আনন্দ লাভ করেন। সম্মানার্হ ব্যক্তিদিগের মধ্যে সকলে সর্বাগ্রে তাঁহাকেই সম্মান প্রদর্শন করে। বৃদ্ধতরুণ নির্বিশেষে ন্যায়বান বিচারকের ন্যায় তিনি সকলকে শাসন করেন। ব্যবসা করিয়া লাভবান্ হইলেও, তাহার মধ্যে তিনি ডুবিয়া যান না। যেখানে যাইতে ভাল লাগে সেখানেই তিনি যান, সকলের মঙ্গলসাধন করেন, ন্যায়পরায়ণতার দ্বারা সকলকে রক্ষা করেন। আলোচনাদ্বারা তিনি সকলকে মহাযানমতে উপনীত করেন। কোনও সভাস্থলে যাইলে অজ্ঞ অর্বাচীনদিগকে উপদেশ দান করেন; কুচরিত্র লোকদিগকে ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার দোষ দেখাইয়া দেন; উচ্চতর আদর্শের সন্ধানে যাইবার জন্য সকলকে উৎসাহিত করেন। মদ্যবিক্রেতার দোকানে তিনি ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন। ধনীদিগের মধ্যে তাহাদেরই একজন বলিয়া নিজেকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদিগকে লোভ ত্যাগ করিতে বলেন, ক্ষত্রজনোচিত ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে বলেন এবং দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে নিজেকেও তাহাদের দলভুক্ত করিয়া তাহাদিগকে ন্যায়পরায়ণ হইতে বলেন, রাজার প্রতি ভক্তিমান হইতে বলেন। রাজসভার মহিলাদিগকে সততা অবলম্বন করিতে বলেন। জনসাধারণ যাহাতে গুণের মূল্য বুঝিতে পারেন তাহার জন্য প্রয়াস পান। ধনী গৃহী বিমলকীর্ত্তি এইরূপে সকলের মঙ্গলসাধনে রত থাকিতেন। এই পরিশ্রমের ফলে অবশেষে তাঁহাকে রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। রোগশয্যায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য রাজা, পুরোহিত, ধনী, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বহুলোক তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন। তখন রোগ উপলক্ষ্য করিয়া যে তাঁহার কাছে আসিত তাহাকেই দেহের নশ্বরত্ব, বস্তুর ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি উপদেশ দিতেন। এইরূপে উপদেশ দিয়া বিমলকীর্ত্তি অসংখ্য লোককে মহাজ্ঞানের জন্য পিপাসিত করিয়া তুলিতে। বুদ্ধদেব ছিলেন তখন বৈশালীর আম্রকুঞ্জে। বিমলকীর্ত্তির রোগের সংবাদ পাইয়া বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যগণকে যাইয়া বিমলকীর্ত্তির তত্ত্ব লইতে বলিলেন। প্রত্যেক শিষ্যই তখন একে একে জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে বিমলকীর্ত্তির বিশেষ বিশেষ উপদেশ বিবৃত করিয়া বলিলেন যে তাঁহারা ঐ মহাপুরুষের নিকট যাইবার উপযুক্ত নন। অবশেষে মঞ্জুশ্রী তাঁহার নিকট যাইতে সম্মত হইয়া বলিলেন প্রভু, জ্ঞানে তিনি সিদ্ধ, তথাপি বুদ্ধের অনুরোধে তাঁহার তত্ত্ব লইতে আমি যাইব।' গ্রন্থখানির অবশিষ্টাংশে মঞ্জুশ্রী ও বিমলকীর্ত্তির মধ্যে যে সূক্ষ্ম আলোচনা হইয়াছিল তাহাই বিবৃত করা হইয়াছে। এই আলোচনার মধ্য দিয়া বিমলকীর্ত্তির জীবনের যথার্থ অর্থ উপলব্ধির আশ্চর্য্য ক্ষমতা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।"

সম্ভবত নাগার্জুনের (২য় শতাব্দী) বহুপূর্ব্বে **বিমলকীর্ত্তিনির্দ্দেশ** সংস্কৃতে অথবা অপর কোনও ভারতীয় ভাষায় লিখিত হয়; কারণ নাগার্জুন তাঁহার প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্রের মধ্যে ইহা হইতে বহুসূত্র উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। কোনও গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলিয়া তাহা উদ্ধার করিলে বুঝা যায়

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

যে অন্তত কিছুকাল ধরিয়া তাহার প্রভাব চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং নাগার্জুনের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বেই ইহা রচিত হওয়া সম্ভব।

এই পুরাতন সূত্রগ্রন্থখানি প্রাচীনতর হীনযান গ্রন্থগুলি হইতে এক নূতন ধারা আনিয়া দিয়াছে। মহাযান গ্রন্থগুলির মধ্যে বোধিসত্ত্বের কল্পনা ধীরে ধীরে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। মহাযানে বোধিসত্ত্বের আদর্শ হইতেছে যে বৃহত্তর উদ্দেশ্যে বোধিসত্ত্ব আপনার সুখ বিসর্জ্জন দিবেন; এই আত্মত্যাগের নিমিত্তই তাঁহার সকল প্রয়াস নিয়োজিত। হীনযানে যেমন সকল ইন্দ্রিয়-বোধ দমন করিবার উপদেশ আছে, মহাযানে তাহা নাই। বরং বোধিসত্ত্ব তাঁহার ইন্দ্রিয়-বোধ একেবারে দমন করিবেন না। ইন্দ্রিয়বোধ বিনষ্ট করিলে অপরের দুঃখ কেমন করিয়া তিনি উপলব্ধি করিবেন, দুঃখ দূর করিবেনই বা কেমন করিয়া? প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এমনকি ঔষধির মধ্যেও বোধিসত্ত্ব আপনার স্বরূপ প্রবেশ করাইতে পারেন। যেরূপে অপরের মুক্তিসাধন করা যায় সেইরূপই তিনি গ্রহণ করিতে পারেন। হীনযানের মধ্যে এই আত্মত্যাগের আদর্শ নাই বলিলেই চলে। বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার প্রথম সোপান হইতেছে ছয়টী পারমিতা। হীনযান-পন্থীগণের লক্ষ্য বুদ্ধত্ব নয়, অর্হত্ব; সুতরাং ছয়টী পারমিতার প্রয়োজনীয়তা হীনযানের মধ্যে নাই। বিমল-কীর্ত্তি নির্দ্দেশের মধ্যে এই পারমিতাগুলির উপর বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে। বাস্তবিকই হীনযান ও মহাযানের প্রভেদের সূত্রপাত ইহার মধ্যে পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বজীবে করুণাকে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। শ্রাবক বা প্রত্যেক বুদ্ধ নিজের উন্নতির দিকেই কেবল লক্ষ্য রাখেন, তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য হইল নির্ব্বাণ—এই নির্ব্বানের অর্থ সম্পূর্ণ বিলয়। কিন্তু বোধিসত্ত্ব অন্যের দুঃখমোচন চাহেন, মুক্তিসাধনের জন্য নির্ব্বাণ চাহেন না। এই গ্রন্থে অনাসক্তিকে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে বটে; কিন্তু অনাসক্তির দিকে অত্যধিক ঝোঁক দিতে যাইলে আবার তাহাই আসক্তি হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃত অনাসক্তির অবস্থা ভাষাদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। সকল প্রকার আসক্তি হইতে মুক্তিলাভ করিলেই অনাসক্তি লাভ করা হইল না; অনাসক্তির বন্ধন হইতেও মুক্ত হওয়া চাই। এ ক্ষেত্রে বোধিসত্ত্বের যে মুক্তির কল্পনা রহিয়াছে; হীনযানে তাহা নাই। এইরূপে হীনযানের অর্হত্বের আদর্শের বিপক্ষে এই গ্রন্থে বোধিসত্ত্বের জীবনকেই আদর্শ বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা হীনযানের বিপক্ষে মহাযানের আদর্শ লোকসম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। পূর্ব্বের ভিক্ষুর কঠোর ধর্ম্মের স্থানে সাধারণ ব্যক্তির ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করা হইয়াছে।

মহাযান শাখার বিনয় গ্রন্থগুলির মধ্যে একটী হইতেছে **ব্রহ্মজালসূত্র**; কুমারজীব চীনভাষায় এই গ্রন্থের প্রথম অনুবাদ করেন। ইহা ব্যতীত বহুসূত্রের অনুবাদ তিনি করেন। তাহার মধ্যে **সুরঙ্গম সূত্রটী** চীনে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

নাগার্জ্জুনের গ্রন্থ ব্যতীত কুমারজীব অশ্বঘোষ প্রভৃতি অপর কতিপয় ভারতীয় শ্রেষ্ঠকবি ও দার্শনিকের গ্রন্থও অনুবাদ করেন। অশ্বঘোষের **সূত্রালঙ্কার** গ্রন্থের অনুবাদ তিনি করেন। এই মূল সংস্কৃত গ্রন্থখানির সন্ধান এখন পর্য্যন্ত কোথাও মিলে নাই। সাহিত্যের দিক দিয়া গ্রন্থখানি যে কত মূল্যবান তাহা আমরা অনুবাদ হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারি। ইহা ব্যতীত ভারতীয় সাহিত্য ও সভ্যতার ধারার কতকটা আভাস ইহা হইতে পাওয়া যায়। মহাযান মতটী ইহাতে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। একদিকে সাংখ্য ও বৈশেষিক মতকে ইহাতে যেমন খণ্ডন করা হইয়াছে তেমনই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও জৈনধর্ম্মেরও ত্রুটি দেখান হইয়াছে। এইরূপে প্রসঙ্গক্রমে বহু ধর্ম্মগ্রন্থও তদানীন্তন শিল্পকলার উল্লেখ ইহাতে রহিয়াছে।

বুদ্ধযশ ছিলেন কুমারজীবের সমসাময়িক। ভারতবর্ষ হইতে কুচায় প্রত্যাবর্ত্তনের সময় পথে যখন কুমারজীব কাশগড়ে থামেন তখন সেখানে বুদ্ধযশের নিকট কিছুকাল বিনয় অধ্যয়ন করেন। তাহার কিছুকাল পরে বুদ্ধযশ, চীনে আগমন করেন। কুমারজীবের আগ্রহের ফলে তিনি চাঙ্‌-আনে আসিয়া চীনবাসী শ্রমনদিগকে বিনয় শিখাইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ হইল **আকাশগর্ভ**-

বোধিসত্ত্বসূত্র। মহাযান গ্রন্থাবলীর মধ্যে আকাশগর্ভ একটী প্রধান গ্রন্থ।

চতুর্থশতাব্দীর শেষভাগে ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে চীনবাসী বৌদ্ধদিগের মধ্যে বিনয় সম্বন্ধে জানিবার জন্য একটী বিশেষ আগ্রহ দেখা দিল। ফা-হিয়েন প্রধানত বিনয় অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে আসিলেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবাসী হিন্দুদিগের সহিত চীনবাসীদিগের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটিয়া উঠে নাই। উত্তরভারত ও মধ্য-এশিয়ার শ্রমণগণই এতকাল বুদ্ধের বাণী চীনে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। ফা-হিয়েনের সময় হইতে চীন ও ভারতের এই সাক্ষাৎ পরিচয়ের সূত্রপাত হইল। ফা-হিয়েনের জন্ম হইয়াছিল শান্সি প্রদেশে। তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে শৈশবাবস্থাতেই এক মঠে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি প্রকাশ্য ভাবে ভিক্ষুর ব্রত গ্রহণ করিলেন। বিনয় দ্বারা তিনি জীবনকে এমনই নিয়ন্ত্রিত করিয়া তুলিলেন যে অন্য সকল ভিক্ষুকে তাঁহার নিকট হার মানিতে হইল। চীনদেশের বিহারগুলিতে কিন্তু বিনয়ের সূত্রগুলি যথাযথ ভাবে মানিয়া চলা হইত না। বিনয় সম্বন্ধে চীনা পুস্তকের অভাব ছিল না। কিন্তু এ সম্বন্ধে চীনা শ্রমণদিগের জ্ঞান অল্প ছিল এবং কার্যত সেগুলি সম্পূর্ণ প্রতিপালিত হইত না। ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ফা-হিয়েন ভারতবাসী শ্রমণদিগের জীবনযাত্রা কিরূপ দেখিবার জন্য চীন হইতে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। মধ্য এশিয়ার খোটানে (Khotan) আসিয়া তিনি একটি বৌদ্ধবিহার দেখিয়া চমৎকৃত হন। তিন হাজারেরও অধিক শ্রমণ সেই মঠে থাকিতেন। তাঁহাদের শান্ত নীরবতা, সুসংযত জীবনযাত্রা তাঁহার নিকট অপূর্ব্ব মনে হইল। খোটানের বিহার দেখিবার পর তাঁহার ভারতীয় ভিক্ষুদিগের বিষয় জানিবার জন্য কৌতূহল আরও বাড়িয়া গেল। খোটান হইতে বাহির হইয়া তিনি চলিলেন। ৫৪টি জায়গায় থামিয়া থামিয়া অবশেষে লাদাক-এ আসিয়া পৌছিলেন। লাদাক হইতে সিন্ধুনদীর তীর দিয়া যাইতে যাইতে পঞ্জাবে আসিলেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের ৩০টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্য দিয়া তিনি চলিলেন। প্রত্যেক তীর্থ, প্রত্যেক বিহার মনোযোগ সহকারে দেখিলেন, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের রীতিনীতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, পুস্তকাগারে প্রবেশ করিয়া গ্রন্থগুলি দেখিয়া শুনিয়া লইলেন। অবশেষে গঙ্গানদীর মোহনার নিকট আসিয়া সমুদ্র পার হইয়া সিংহলে আসিলেন। সিংহল তখন স্থবিরবাদী বৌদ্ধদিগের কেন্দ্রভূমি। সেখানে কয়েক বৎসর থাকিয়া তিনি গভীর ভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এইরূপে পঞ্চদশ বৎসর ধরিয়া ভারতের নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া ৪১৪ খৃষ্টাব্দে একটী ভারতীয় পোতে তিনি স্বদেশের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পথে এই জাহাজটী মগ্নপ্রায় হয়। তখন ভার কমাইবার জন্য এই বিদেশী পরিব্রাজকের মহামূল্য গ্রন্থগুলি কিরূপে ভারতীয় মাল্লাগণ ফেলিয়া দিতে চহিয়াছিল সে কাহিনী সর্বজনবিদিত। ফা-হিয়েন জাভাতে পাঁচ মাস থাকেন। সেখানে আর একটী হিন্দু জাহাজ তিনি দেখেন। সেই জাহাজও চীনে যাইতেছিল। শাণ্ডতাং এ জাহাজ থামিল। সেখানকার গভর্ণর তাঁহাকে বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। পরে তাঁহাকে নানকিং পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। দেশে ফিরিয়া গিয়া ফা-হিয়েন জীবনের অবশিষ্টকাল চীনের বিহারগুলির সংস্কারকার্য্যে কাটাইয়া দিলেন। যাহাতে ভিক্ষুদিগের মধ্যে বিনয়ের অধিক চর্চ্চা হয় তাহার জন্য তাঁহার চেষ্টার অবধি ছিল না। ৮৬ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান।

Giles তাঁহার Travels of Fa-hien গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে "বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব যে কত গভীর ভাবে চীনবাসীদিগের মনে মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। এই বৌদ্ধধর্ম্ম উত্তমরূপে জানিবার জন্য ইহার জন্মভূমি ভারতবর্ষে আসিবার জন্য কত চীনা শ্রমণ কত না প্রয়াস পাইয়াছেন। অবশেষে ফা-হিয়েন এই বিপদসঙ্কুল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ভারতে আসিলেন। তাঁহার এই জয়যাত্রা St Paulএর অভিযানকেও ম্লান করিয়া দিয়াছে। গোবি মরুভূমি পার হইয়া, হিন্দুকুশ পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া কিরূপে ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে আসিলেন, ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে ঘুরিয়া কিরূপে হুগলীনদীর মোহনায় পৌছিয়াছিলেন, সেখান হইতে জাহাজ ধরিয়া

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

আবার কিরূপে চীনে ফিরিয়া গেলেন—এই সকল কাহিনী পাঠ করিতে করিতে বাস্তবিকই শরীর রোমাঞ্চিত হয়। চীনে তিনি শূন্য হস্তে ফিরিয়া যান নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রামাণ্য বহু গ্রন্থ ও বোধিসত্ত্বের নানা মূর্ত্তি তিনি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। সিংহলে বহু অনুসন্ধানের পর বিনয়ের একটি গ্রন্থ, দীর্ঘ আগমের কয়েকটি গ্রন্থ ও অন্যান্য আরও কতিপয় গ্রন্থ তিনি সংগ্রহ করেন। এ সকল গ্রন্থ তাঁহার পূর্ব্বে চীনে লইয়া যাওয়া হয় নাই।”

ফা-হিয়েনের ভ্রমণকাহিনী যখন প্রকাশিত হইল, তখন চীনের যুবকদিগের মধ্যে প্রাণের সাড়া পড়িয়া গেল। ইহার পর কতশত চীন পরিব্রাজক যে তাঁহাদিগের গৃহ ছাড়িয়া মরুপথে ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। যে ভূমিতে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যেস্থলে তিনি নির্ব্বাণলাভ করিয়াছেন সেই পবিত্র ভারতভূমিকে অন্তরের পূজা দিবার জন্য চীনবাসী শ্রমণগণ দলে দলে সঙ্কটময় পথ অতিক্রম করিয়া ভারতে আসিতে লাগিলেন। ইঁহাদিগের কথা যথাস্থানে বলিব।

ফা-হিয়েন কর্ত্তৃক লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা অধিক নহে। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ব্যতীত অন্য গ্রন্থগুলির প্রভাব চীন সাহিত্যে তেমন গভীর ছাপ দিয়া যায় নাই। তাঁহার একটী গ্রন্থ হইতেছে **মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র**। পালি মহাপরিনির্ব্বানের সহিত ইহার কোন মিল নাই। Beal তাঁহার Catena গ্রন্থের একস্থানে এই গ্রন্থের কিয়দংশের অনুবাদ দিয়াছেন। চারিটী সত্য সম্বন্ধে এই গ্রন্থে যাহা বলা হইয়াছে তাহারই অনুবাদ করিয়াছেন। চারিটী সত্য হইতেছে দুঃখ, সঞ্চয়, বিনাশ ও পথ।

ফা-হিয়েনের ভ্রমণকাহিনীই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। মধ্যএশিয়ায়, উইগুরদিগের মধ্যে কাশ্যপ হ্রদের নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহে, আফগানিস্থান ও মধ্যভারতের নানাস্থানে ও সিংহলে ভ্রমণ করিয়া সে-সকল স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব তিনি কিরূপ দেখিয়া গিয়াছেন এই গ্রন্থে তাহারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। এই গ্রন্থই চীনে যুবকদিগের মধ্যে প্রাণের প্রেরণা আনিয়া দিল তাহার আভাস আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি।

(ক্রমশঃ)

সহযোগী-সাহিত্য

১

গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা

শ্রীপ্রমথনাথ রায়

গত নভেম্বর মাসে ইতালীর বিখ্যাত লেখিকা গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। এ সংবাদ ইতিপূর্ব্বে রয়টারের তারে পৃথিবীর সকল স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। সকল দেশেরই সাহিত্য-রসিকদিগের দৃষ্টি আজ এই লেখিকার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। এ সময় আমরাও কয়েকটি কথা বলিয়া তাঁকে বঙ্গসাহিত্যের পাঠকদিগের সহিত পরিচিত করিয়া দিতে চাই।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সার্দ্দিনিয়া দ্বীপে নুয়োরো নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে তাঁর বয়স ৫২ বৎসর। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁর জীবনের দিনগুলি তিনি স্বীয় জন্মস্থানে রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মাঝে স্বজাতীয় কৃষক ও মেষপালকদের ভিতর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই মনোহর দ্বীপ-প্রকৃতি ও ইহার অধিবাসী-দিগের আদিম অনাড়ম্বর জীবন তাঁর আজন্মরসপিপাসু মনকে এমনভাবে প্রভাবিত করিয়াছে যে, তাঁর অধিকাংশ গল্প ও উপন্যাসের দৃশ্য ও ঘটনা তিনি এই স্থান হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

কোন স্কুল কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ তাঁর ভাগ্যে ঘটে নাই। শৈশবে সার্দ্দিনিয়ার এক প্রাথমিক স্কুলে তিনি কিছুকাল যাতায়াত করিয়াছিলেন, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সার্দ্দিনিয়াবাসীদিগের কুসংস্কার বশতঃই হোক কিংবা পারিবারিক কারণ বশতঃই হোক তিনি অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাঁর যা কিছু শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই স্বচেষ্টায় গৃহে অধ্যয়ন দ্বারা অর্জ্জন করিয়াছেন। সার্দ্দিনিয়ার ভাষাও সম্পূর্ণ ইতালীর ভাষা নয়। সুতরাং ইতালীর ভাষা শিখিবার জন্য তিনি প্রথমে অভিধানের সাহায্যে রাত্রি জাগিয়া পড়াশুনা করিতেন এবং বিবাহের পরে তাঁর ছেলেদের সঙ্গে একত্রে পাঠগ্রহণ করিতেন। এজন্য তিনি মাঝে মাঝে উপহাস করিয়া বলিয়া থাকেন তাঁর কোন কাল্‌চার নাই, কারণ শুধু শব্দকোষের সাহায্যে কেহ কোনদিন প্রকৃত কাল্‌চার অর্জ্জন করিতে পারে না।

চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। সেই কিশোর বয়সের স্বপ্নগুলি তিনি মাতৃভাষায় রচনা করেন এবং পরে নিতান্ত কাঁচা লেখা মনে করিয়া সেগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলেন। ভবিষ্যতে তিনি যে সুলেখিকা হইতে পারিবেন পূর্ব্বে এরূপ আশা তাঁর ছিলনা। তাঁকে লিখিতে দেখিলে তাঁর পিতামাতা সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট হইতেন, এবং যাতে কন্যার এই অদ্ভুত খেয়াল বাড়িতে না পারে সেজন্য সর্ব্বদাই তাঁকে লেখার অভ্যাস হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁদের ধারণা ছিল লেখিকা হইলে কোন যুবক তাঁর পাণিপ্রার্থী হইবে না, কারণ লেখিকা-জীবনের সহিত মাতৃজীবনের কিছুতেই সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে না। এজন্য তাঁর পিতামাতাকেও দোষ দেওয়া যায় না। সার্দ্দিনিয়ার সমাজে স্ত্রীলোকের পক্ষে কুমারী থাকা অত্যন্ত নিন্দার বিষয়। ভারতবর্ষের ন্যায় সেখানেও গৃহধর্ম্ম পালন করাকেই স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য মনে করা হয়। যেখানে স্ত্রীলোকের এইরূপ আদর্শ, সেখানে যে এই দুই প্রকার জীবনের ভিতর বিরোধ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সুখের বিষয় গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা পিতামাতার এই আশঙ্কাকে মিথ্যায়

শ্রীপ্রমথনাথ রায়

পরিণত করিতে পারিয়াছেন। তিনি অতিশয় গর্ব্বের সহিত বলিয়া থাকেন—"এই দুই পরস্পরবিরোধী জীবনের ভিতর আমি এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছি। আর্টের দাবী আমি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি, কিন্তু জননী ও জায়া-জীবনের কর্ত্তব্য হইতে কিছুমাত্র চ্যুত হই নাই।"

দেলেদ্দার পারিবারিক জীবন খুবই সুখের। তিনি একজন মান্তুয়াবাসীকে ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছেন এবং জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া স্বামীপুত্রসহ রোমের পোর্ত্তো মাউরিৎসিয়ো (Porto Maurizio) নামক রাস্তার উপরে একটী নিভৃত সুন্দর গৃহে বাস করিতেছেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী সহজ ও সরল। প্রাতঃকালে তিনি গৃহের কাজে ব্যস্ত থাকেন, দ্বিপ্রহরে লেখেন, রাত্রে পাঠাভ্যাস করিয়া থাকেন। বাড়ীর বাহিরে তাঁকে বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি বলিয়া থাকেন পৃথিবীকে একটু দূর হইতে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে বাগানের মত সুন্দর মনে হয়, কিন্তু কাছে গেলে আর সেরূপ থাকে না। সংসারকে তিনি দূর হইতেই দেখিতে ভালবাসেন। কিন্তু তা বলিয়া যে তিনি অসামাজিক এমন নয়। গৃহাগত অতিথিদিগের প্রতি অনাড়ম্বর সৌজন্যে কেউ তাঁকে অতিক্রম করিতে পারে না।

১৭ বৎসর বয়সে তিনি Fior di Sardegna (সার্দ্দিনিয়ার ফুল) নামক উপন্যাস লিখিয়া প্রকাশিত করেন। ইহাই তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা। তখন হইতে তিনি যে-সমস্ত ছোট গল্প ও উপন্যাস লিখিয়া আসিতেছেন তার অনেকগুলি বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া বিদেশী পাঠক-দিগেরও মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে। আমরা নিম্নে তাঁর উপন্যাসগুলির নাম ও প্রকাশের তারিখ উল্লেখ করিতেছি। Anime oneste (সাধু আত্মা) ১৮৯৬; Il vecchio della montagna (বৃদ্ধ পাহাড়ী) ১৯০০; Elias Portolu (এলিয়াস পর্ত্তোলু) ১৯০৩; L'edera (আইভি) ১৯০৪; Cenere (ছাইভস্ম) ১৯০৪; Nostalgie (গৃহ-উতলা) ১৯০৫; I giuochi della Vita (জীবনের খেলা) ১৯০৫; La via dei male (পাপের (পথ) ১৯০৬; Il nostro padrone (আমাদের মনিব) ১৯০৯; Sino al confine (সীমান্ত পর্য্যন্ত) ১৯১০; Nel deserto (মরুভূমে) ১৯১১; Colombe e sparvieri (কপোত ও চিল) ১৯১২; Chiaroscuro (গোধূলি) ১৯১২; Canne al vento (নলখাগড়া) ১৯১৩; Le colpe altrui (পরের খুঁত) ১৯১৪; Mariana Sirca (মারিয়ানা সির্কা) ১৯১৫; Il fanciullo nascosto (পলাতক বালক) ১৯১৫; L' incendio nell'oliveto (জলপাইবনে আগুন) ১৯১৮; Il ritorno del figlio (পুত্রের প্রত্যাবর্ত্তন) ১৯১৯; La madre (মা) ১৯২০; Il segreto dell' uomo solitario (সঙ্গীহীন লোকের রহস্য) ১৯২১; Il dio dei viventi (জীবিতের দেবতা) ১৯২২; Il flauto nel bosco (অরণ্যে মুরলী) ১৯২৩; La danza della collana (কণ্ঠহারের নৃত্য) ১৯২৪। La fuga in Egitto (ইজিপ্টে পলায়ন) ১৯২৫; Il sigillo d' amore (প্রেমের চিহ্ন) ১৯২৬; Annalena Bilsini (আন্নালেনা বিল্‌সিনি) ১৯২৭।

ইতালীর বর্ত্তমান সাহিত্যে দেলেদ্দার স্থান যে শুধু উচ্চ এমত নহে, তাঁর বলিবার ভঙ্গী এবং বক্তব্য বিষয়ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বর্ত্তমানে যে অতিরিক্ত মানসিক বিশ্লেষণের ও বাস্তবজীবনের নানাপ্রকার কঠোর সমস্যা নিয়া নাড়াচাড়া ও সমাধান করিবার ব্যাধি উপন্যাস লেখকদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, দেলেদ্দা অনেকাংশে ইহার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যজগতের আবহাওয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাঁর নরনারীদের ভাষাও সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। মানব জীবনের দীনতা, হীনতা, নৈরাশ্য ও বিষাদের চিত্রই তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁর রচনার ভিতর সর্ব্বত্র এক ধর্ম্মভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, যা সচরাচর অন্য লেখকের লেখায় খুঁজিয়া পাওয়া দুর্লভ। এই ধর্ম্মভাব দুইদিক হইতে আসিয়াছে—প্রথমতঃ দেলেদ্দা নিজে বাল্যকাল হইতেই অতি ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীলোক, দ্বিতীয়তঃ যাদের জীবন তিনি আঁকিয়াছেন সেই সার্দ্দিনিয়া-বাসীগণের ভিতর ধর্ম্মভাব অতি প্রবল। ব্যক্তিগত জীবনে যদিও তারা অন্যপ্রকার তথাপি খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাদের প্রগাঢ় অনুরাগ ও অটল বিশ্বাস। তাঁর একটী ছোট গল্পের

মূল বিষয় খৃষ্টমাস সায়াহ্নে দুইজন বৃদ্ধের সম্মুখে সহসা যীশু-মূর্ত্তির আবির্ভাব। এই ঘটনাটী তিনি এমন সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে অনেকে মনে করেন এইটাই তাঁর ছোট গল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু দেলেদ্দার বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি নীতি ও আর্টের ভিতর একটী চমৎকার সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আর্টের দোহাই দিয়া যাঁরা নগ্নজীবন চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন দেলেদ্দা সে দলের একজন নন, অপরদিকে যাঁরা শুধু মনে করেন লোকশিক্ষাই আর্টের উদ্দেশ্য তিনি তাঁহাদেরও বিরোধী। তাঁহার রচনা যেমন সরস ও সুন্দর তেমনি তাহা মানব-মনের আদিম ও মহৎ ভাবসমূহের অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। তিনি প্রকৃতি হইতে মানব-জীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই, পরন্তু প্রকৃতির সহিত মানব-জীবনের একটী যোগসূত্র আবিষ্কার করিয়া ইহার অংশরূপেই দেখিয়াছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি সংসারের প্রতিকূল ঘটনাসমূহের ঘাতপ্রতিঘাতে এক অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধান পাইয়া বিমুখ অদৃষ্টের সহিত লড়াই করিয়া জয়ী হইবার চেষ্টা করে এবং পরিণামে পরাভূত হইলেও নব আশাপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া পরাজয়ের লজ্জাকে নত মস্তকে বরণ করিয়া লয়। দেলেদ্দার অনেকগুলি পুস্তকে এই আশাপূর্ণ মনোভাব অল্পবিস্তর বিদ্যমান আছে, কিন্তু 'কণ্ঠহারের নৃত্য' 'ইজিপ্তে পলায়ন' 'ম্যালেনা বিলিগিনি' প্রভৃতি পুস্তকে ইহা পূর্ণ-বিকাশ লাভ করিয়াছে। এই মনোভাব যে কোনপ্রকার বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেলেদ্দা মানবজীবনকে প্রকৃতির অংশস্বরূপেই দেখিয়া থাকেন। এই আশাবাদও প্রকৃতি হইতেই গৃহীত। যে শক্তির বলে মহতী প্রকৃতি অলক্ষ্যে অবিলম্বে মানুষ কিংবা বিভিন্ন ঋতু দ্বারা অনুষ্ঠিত ধ্বংসচিহ্নগুলি দূর করিয়া চিরকাল ধরিয়া নবজীবনের উন্মেষ সাধন করিয়া আসিতেছে, মানুষের ভিতরেও সেই নবসৃষ্টির শক্তি নিহিত আছে, সেও আপনার জীবনের ধ্বংসস্তূপ হইতে মালমসলা সংগ্রহ করিয়া এই শক্তির বলে নূতন সৌধের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে।

কিন্তু তিনি যে সহসা এই মনোভাবে উপনীত হইয়াছেন তাহা নয়। ইহা লেখিকার দীর্ঘকালব্যাপী মানসিক ক্রম-বিকাশের ফল। তিনি প্রথমে সার্দ্দিনিয়াকে নিয়াই গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। অবশ্য যে সার্দ্দিনিয়াকে আমরা দেলেদ্দার উপন্যাসে দেখিতে পাই ('এলিয়াস পর্ত্তোলু' 'কপোত ও চিল', 'নলখাগড়া' প্রভৃতি) তাহাই প্রকৃত সার্দ্দিনিয়া কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন দেলেদ্দা প্রকৃত সার্দ্দিনিয়াকে অনেক বেশী রূপান্তরিত করিয়া লোকসমক্ষে ধরিয়াছেন—সে দেশের অধিবাসীগণ এত হিংসাপরায়ণ কিংবা এমন উচ্ছৃঙ্খল নয়। এ সম্বন্ধে আমরা শুধু এই বলিতে পারি কোন কল্পনাশালী লেখকই কোন জিনিষের অবিকল বর্ণনা করেন না, উচিত ও নয়। আর্টের খাতিরে অভিজ্ঞতা দ্বারা সমাহৃত বিষয়-গুলির মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন, অনেক নূতন যোগসাধনা করিতে হয়, অনেক বিষয় বাদ দিয়া এবং অনেক বিষয় বাড়াইয়া ও জোর দিয়া বলিতে হয়। Delacroix বলিয়াছেন—Art is exaggeration in the right place। অতি খাঁটি কথা। শুধু দেখিতে হইবে এরূপ করিতে গিয়া জিনিষের আসল স্বরূপটী রক্ষা পাইয়াছে কি না—তাহা হইলেই যথেষ্ট। এই মাপকাটীতে দেখিলে দেলেদ্দা যে সার্দ্দিনিয়ার স্বরূপকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাছাড়া সার্দ্দিনিয়ার সুন্দর স্বভাবশোভা ও উদ্দাম মানবজীবনের উপর কল্পনার সুবর্ণরশ্মিপাত করিয়া তিনি যে এদেশকে দশের কাছে অধিকতর সুন্দর ও আদরণীয় করিয়া তুলিয়াছেন তাহা সার্দ্দিনিয়াবাসীগণও স্বীকার না করিয়া পারিবেনা।

সে যাই হোক, তাঁর এই সময়কার নায়ক নায়িকারা পূর্ব্বোক্ত অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তির আভাস পায় নাই। তারা বাহিরের জীবন যাপন করে, ভিতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছা কিংবা অবসর তাদের নাই। তারা এই শস্পাচ্ছাদিত সিন্ধুমেখলা পৃথিবীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ। তাদের শিরা উপশিরার ভিতর দিয়া প্রবল উষ্ণ রক্তস্রোত বিভিন্ন বাসনার তাড়নায় হিল্লোলিত হইয়া প্রবাহিত হয়। রক্তের নিয়মকে তারা মানিয়া চলে। ভালবাসিতে তারা

শ্রীপ্রমথনাথ রায়

বিলম্ব করে না, প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। সকল প্রকার অনুভূতির ক্রিয়াই তাদের ভিতর অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও এদের পুরুষাকার জ্ঞানের বড়ই অভাব। সকল বিষয়েই এরা অদৃষ্টকে মানিয়া চলে। এই অদৃষ্টই তাদের সুখদুঃখ পাপপুণ্য— এক কথায় সকল প্রকার কর্ম্মফলের কারণ। সুতরাং জীবনে যখন তারা ব্যর্থ-মনোরথ হয় তখন পুনরায় অভীষ্ট সাধনে প্রয়াসী হইতে তারা সাহস পায় না। ফলে সহজেই গভীর বিষাদ তাদের চিত্ত অধিকার করে। বাস্তবিক এই অদৃষ্টপীড়িত জীবগুলি এমন বিষাদগম্ভীর যে দেলেদ্দা বিশ্বপ্রকৃতির সব প্রফুল্লতা, সকল মাধুর্য্যের মাঝখানে তাহাদিগকে স্থাপিত করিয়াও তাদের চিত্তভার লঘু করিতে পারেন নাই। ইহা প্রথমতঃ বিসদৃশ ঠেকিতে পারে, কারণ রক্ত যাদের উষ্ণ ও সবেগে প্রবাহিত তারা যে বিষণ্ণ হইবে ইহা স্বাভাবিক নহে, কিন্তু বস্তুতঃ তাই সত্য। যে মানুষ যত বেশী অদৃষ্টবাদী তার ভিতর বিষাদও তত অধিক।

দেলেদ্দার প্রথম বয়সের অনেক পুস্তকে আমরা এই প্রকার আত্মপ্রত্যয়হীন চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই। ইহাতে পাঠকের মন ক্লান্ত না হইলেও বৈচিত্র্যের অভাবে বিরক্তি বোধ করে। সর্ব্বদাই মনে হয় এইপ্রকার মেরুদণ্ডহীন নরনারীর সংস্পর্শ হইতে পলাইতে পারিলে বাঁচি। গঠন-রীতির দিক দিয়াও এই উপন্যাসগুলি দোষ-ত্রুটিতে পরিপূর্ণ। সকল বিষয়েই এগুলির ভিতর অতিশয় প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। পাতায় পাতায় বর্ণগন্ধের ছড়াছড়ি, সুবিস্তৃত প্রাকৃতিক বর্ণনা,—সর্ব্বত্র এক প্রকার অলস মন্থর ভাব। এ জগতে অধিকক্ষণ বিচরণ করিলে গন্ধভারাক্রান্ত বাতাসে শ্বাস যেন রোধ হইয়া আসিতে চায়। মনে হয় লেখিকার ঐশ্বর্য্য আছে কিন্তু এখনো তিনি সে ঐশ্বর্য্যের সদ্ব্যবহার করিতে শিখেন নাই। কিন্তু ক্রমে তাঁর রচনাপ্রণালীতে পরিবর্ত্তন হয়। সংযমই যে আর্টের সর্ব্বপ্রধান গুণ, অপব্যয় করিতে করিতে ক্রমে তিনি এ জ্ঞানের অধিকারী হন। তাঁর নূতন বইগুলি আকারে যেমন পূর্ব্বাপেক্ষা ছোট হইয়াছে, লেখাও তেমনি পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে, তাঁর মনোভাবেরও বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল প্রকার অভিব্যক্তিতেই অদৃষ্টের যে প্রভাব পরিলক্ষিত হইত এক্ষণে আর তাহা নাই। তাঁর আধুনিক চরিত্রগুলির ভিতর গতি অধিক, জীবনের চিহ্নও অধিক। লক্ষ্যাভিমুখে তারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়, আত্ম-বিশ্বাসের বলে তারা বলীয়ান্। অধিকন্তু এখন আর তারা সার্দ্দিনিয়ার মানুষ নয়, দেশকালের প্রভাববর্জ্জিত মানুষ মাত্র। তাদের মনে যে সমস্যা উপস্থিত হয় তা সকলের মনেই উপস্থিত হয়, তারা যে সমস্যায় পড়ে সকলেই সে সমস্যায় পড়িতে পারে। লেখিকার দৃষ্টি এক্ষণে এতদূর সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ হইয়াছে যে তাহা অনায়াসে অন্তরের অন্তঃস্তলে পৌঁছিয়া নিমেষে সকল রহস্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ। এখন তিনি নিজেকে তাঁর সৃষ্ট নরনারী হইতে পৃথক করিয়া তাদের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতে শিখিয়াছেন। সেইজন্য তাঁর সাহিত্য-জগতের সীমাও অনেকখানি বাড়িয়াছে, বিশেষতঃ গল্পাংশে নাটকীয় ভাব অধিক পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। দেলেদ্দার আর্টের এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলিয়াছেন—"L'arte si fa piú essenziale e cosciente; e la scrittrice vede gli nomini e le loro passioni, i loro drammi, la piazza minacciosa di cristiano, l'avarizia di zebedro, la carnalita di Pietro con l'occortezza di chi intenda a untempo la voce e l'eco, serga a un tratto il gesto e l'ombra. Non ha piú bisogno di partecipare per commento e per simpatia alla vita delle sue creature; lascia ch'esse vivano secondo la legge che loro ha imposto, staccate da sé. Ma sui loro atti, sui loro pensieri, ella ora posa un occhis nuovo, quasi una seconda vista."

'মা' 'সঙ্গীহীনের রহস্য' 'কণ্ঠহারের নৃত্য' 'অন্নালেনা বিল্‌সিনি' প্রভৃতি উপন্যাস এই পরিবর্ত্তনের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই উপন্যাসগুলিতেও পূর্ব্বের ন্যায় জীবনের ব্যথা ও বেদনা, প্রেম ও কামনার ছবি অঙ্কিত করা হইয়াছে। কিন্তু

তফাৎ এই যে, এই ব্যথা ও বেদনা, এই প্রেম ও কামনা এখন জীবনে একটী কেন্দ্রের, একটী সত্যের সন্ধান পাইয়াছে। তাঁর অপর একটী আধুনিক উপন্যাসের নাম "জীবিতের দেবতা।" এই দেবতা কে? খ্রীষ্টান সাধু মার্ক বলিয়াছেন—"আমাদের দেবতা মৃতের দেবতা নন, জীবিতের দেবতা।" দেলেদ্দা এই উক্তির অর্থ করিয়াছেন প্রত্যেক মানুষের ভিতর যে এক গোবেচারী প্রাণী আছে—যে বিনা শাসনে প্রতিনিয়ত আমাদের কাজকর্ম্মের বিচার

শ্রীমতী গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা

করে, অথচ যার শাসনের কঠোরতার তুলনা নাই, যাকে আমরা বিবেক বলি, এ দেবতা সেই। ইহাই জীবনের কেন্দ্রীয় সত্য। এই দেবতা যখন জাগ্রত হয়, এই কেন্দ্রের যখন সন্ধান পাওয়া যায় তখন মানুষ তার সকল কর্ম্মেই একটা শৃঙ্খলাসূত্র আবিষ্কার করে, সে বুঝিতে পারে পৃথিবীতে যে-পাপ অনুষ্ঠিত হয় পৃথিবীতেই তার ক্রিয়া প্রকাশ পায়,—হয় নিজের ভিতর, নয় পুত্রপৌত্রাদি বংশ-পরম্পরায়। সেইরূপ পুণ্যফলরাশিও পৃথিবীতেই থাকিয়া যায়। দৈবের উপর বিশ্বাস কমিয়া গিয়া মানুষের নিজের উপর আস্থা তখন অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যায়। দেলেদ্দার আধুনিক নায়ক নায়িকাদের ভিতর তাহাই ঘটিয়াছে। তারা পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, ইন্দ্রিয় জয় করিতে প্রয়াস পায়, পরাজিত হইলেও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারায় না। তাঁর শেষ গ্রন্থের নায়িকা আন্নালেনা বিল্‌সিনি এই নূতন আদর্শের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেলেদ্দার আর্টের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই আর্ট গঠনে যেমন মনোজ্ঞ, ইহার প্রভাবও তেমনি নির্ম্মল। আজকাল আমাদের দেশের লেখকদিগের ভিতর জীবনকে নগ্নভাবে চিত্রিত করিবার অতিরিক্ত আসক্তি দেখা দিয়াছে। দেলেদ্দাও জীবনের কদর্য্যতা অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু রচনা প্রণালীতে তাহাদের সহিত এঁর কত প্রভেদ! একই বস্তু বলিবার ভঙ্গীতে কিরূপ বিভিন্ন আকার ধারণ করে আমাদের লেখকগণের রচনার সহিত দেলেদ্দার রচনা তুলনা করিলেই তাহা অনুভূত হয়। গেটের উক্তি মনে পড়ে—"Art does not consist in what a man says, but how he says it." বাংলার আধুনিক সাহিত্যিকদের লেখায় এই গঠন-পারিপাট্য, এই বলিবার ভঙ্গীর একান্ত অভাব। দেলেদ্দার নিকট হইতে তাঁরা ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। তিনি যখন লিখিতে বসেন তখন যেন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছেন এইরূপ মনে করিয়া লেখনী গ্রহণ করেন—আর্ট তাঁর কাছে এমনি পবিত্র জিনিষ। তিনি বলেন—"আমি যা বলিতে চাই তা ভাল করিয়া বলিতে চেষ্টা করি, সফল না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই নিরস্ত হই না। sento I' arte come dovere—আর্টকে আমি কর্ত্তব্যের ন্যায় বোধ করি।"

২

মার্কিন মহিলা কবি ও স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

সম্প্রতি সঙ্গীতসাধক দিলীপকুমার,—টল্‌ষ্টয়, রোমাঁ রোলাঁ ও ফরাসী গায়িকা (সম্ভবতঃ) মাদাম কাল্‌ভের উপর বিবেকানন্দের প্রভাব সম্বন্ধে বাঙ্গালী পাঠককে কিছু জানাইয়াছেন। বর্ত্তমানে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা আমেরিকার মহিলা কবি এলা হুইলার উইল্‌কক্সের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিতে চাই; তাঁহার সঙ্গে স্বামীজির পরিচয় ঘটিয়াছিল এবং সে পরিচয় তাঁহার পক্ষে নিতান্ত ব্যর্থ হয় নাই।

মার্কিণ কবি মিসেস্ এলা হুইলার উইলকক্সের (Ella Wheler Wilcox) নাম এদেশে নিতান্ত অজ্ঞাত নয়; অনেকেই তাঁহার রচিত কবিতা বাল্যে ও কৈশোরে পড়িয়াছেন; তাঁহার Poems of Cheer, Poems of Pleasure ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ সুকুমারমতি কিশোরকিশোরীর সমূহ উপযোগী। উন্নত চিন্তা তাহাদের সরল ছন্দের ঝঙ্কারের মধ্য দিয়া বহুজনের জীবনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি যেরূপ ওজস্বিনী ভাষায় পবিত্র কর্ম্ম ও সাধুচিন্তার কথা কাব্যে বলিয়াছেন, তাহাতে কিশোর অবস্থায় জীবনের উপর একটা কল্যাণের রেখা পড়িয়া যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা। চিকাগো ধর্ম্মমহাসভার পর স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় অবস্থিতি করিয়া সাধারণের মধ্যে যোগশিক্ষা দিতেছিলেন তখন এই মহিলা কবি তাঁহার সংস্পর্শে আসেন। মিসেস উইল্‌কক্স আত্মজীবনী লিখিতে গিয়া সে কথা বলিয়াছেন।

যেবার চিকাগো সম্মিলনী ও ধর্ম্মমহাসভা হয় তাহার পর বৎসর স্বামীজি নিউইয়র্কে আসিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। মিসেস উইলকক্সের স্বামী তখন ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাপারে বড়ই বিব্রত ছিলেন, তাঁহার মনের অবস্থা তখন বড় ভাল ছিল না, কিন্তু সব দিক বজায় রাখিতে গেলে মনস্থির করিতে হয়, এই কারণে সে সময় তাঁহার প্রভূত সাহসের প্রয়োজন ছিল। একদিন সন্ধ্যাকালে আহারাদির পর অপ্রত্যাশিতরূপে মিসেস উইলকক্সের নামে একখানি পত্র আসিয়া উপস্থিত; স্বামীজি কবে ও কোথায় বক্তৃতা দিবেন তাহা উল্লেখ করিয়া একজন অপরিচিত ব্যক্তি কবিকে জানাইয়াছেন,—"আপনার কবিতা পড়িয়া আপনার সম্বন্ধে আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহাতে মনে হয় আপনার এসব বিষয় জানিবার ও বুঝিবার ইচ্ছা ও উৎসাহ আছে।" পত্রখানি তিন জায়গা ঘুরিয়া ও ঠিকানা বদল হইয়া আসিয়াছে। যখন এই সংবাদ আসিল তাহার এক ঘণ্টা পরেই অতি নিকটে বক্তৃতার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল; হাতে বিশেষ কোনও কাজ না থাকায় স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে সেই বক্তৃতা শুনিতে গেলেন।

সন্ন্যাসী বেশে সজ্জিত গৈরিক উষ্ণীষ শিরে বিবেকানন্দ ধীরপদক্ষেপে বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহারা বক্তৃতাগৃহে উপস্থিত হইলেন। আসন তখন বড় শূন্য ছিলনা, ঘর প্রায় লোকে ভরিয়া গিয়াছিল। বক্তা যখন ধর্ম্মসম্বন্ধে গম্ভীর স্বরে বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার কথাগুলি দম্পতীর মন স্পর্শ করিল; বক্তৃতা শেষে স্বামী বলিলেন, "আমরা ভগবান সম্বন্ধে যতটুকু জানি ইনি যে তার চেয়ে অনেক বেশী জানেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আরও একবার শুনিতে হইবে।"

তারপর বহুদিন বহুবার এই দম্পতী স্বামীজির পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার অমৃতময় বাণী শুনেন, আধ্যাত্মিক জগতের যে সত্য তাঁহাদের কাছে এতদিন আবৃত ছিল তাঁহাদের সম্মুখে তাহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দিনের কর্ম্মকোলা-

হলের মধ্যে অফিসের শত কাজকর্ম্ম ফেলিয়াও উইলকক্স স্বামীজির কথা শুনিতে আসিতেন। তিনি বলিতেন, "এই লোকটি আমাকে পার্থিব বিষয়কর্ম্মের তুচ্ছ গণ্ডগোলের ঊর্দ্ধে নিয়া যান; জীবনকে জড়ভাবে দেখা যে কত হেয়, প্রকৃতপক্ষে জীবন যে চৈতন্যময়, তাহা আমি ইঁহার প্রসাদে ও শক্তিতে উপলব্ধি করিতে পারি; তখন আমি নব বলে বলীয়ান্ হইয়া আবার জীবন সংগ্রামে ঝাঁপ দিতে পারি।" তিনি স্বামীজির বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনোভাব সহকর্ম্মীদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।

মনঃসংযমের একটা স্বাভাবিক শক্তি অনেকের মত মিসেস উইলকক্সেরও ছিল; ঘরে হয়ত অনেক লোক,—কেহ কথা বলিতেছে, কেহ গাহিতেছে, কেহ বা নাচিতেছে—নিজের ভাবে বিভোর হইয়া তিনি নিজের কাজ করিয়া যাইতেন, তাঁহার কাব্যরচনা বা গ্রন্থপাঠ অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকিত; কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কি ভাবে যে মনকে সংযত করিতে ও একাগ্র করিতে পারা যায় সে শিক্ষা তাঁহার স্বামীজির নিকটে হয়। স্বামীজির নিকটে তিনি শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া মনঃসংযম বা যোগ অভ্যাস করেন। স্বামীজি শিক্ষাদান কালে বলিতেন, যোগের মূলসূত্র ধরিতে পারিলে শুধু যে আত্মসংযমের শক্তি আসিবে তাহা নয়, দৃশ্যাদৃশ্য, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের মধ্যে আধো আলো আধো ছায়ায় ঘেরা দেশ আছে তাহাও জানিবার এবং আয়ত্ত করিবার শক্তি আনিয়া দিবে। প্রতিদিন যোগ বিষয়ে স্বামীজির উপদেশ শুনিবার পর একাকী ১৫ মিনিট কি আধ ঘণ্টা নিবিষ্ট চিত্তে বসিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেন, মন চাহিত ছুটিয়া যাইতে, সংযমের রাশ টানিয়া তাহাকে বাগ মানাইবার চেষ্টা করা হইত; একমাত্র ঈশ্বর চিন্তা বিনা, জগন্নিয়ন্তার চিন্তা বিনা অন্য সকল চিন্তা সে সময়ে মন হইতে দূর করিবার চেষ্টা করিতেন, তাঁহারই প্রীতি-বারিতে নিজ আত্মা ধৌত ও পবিত্র করিতে চাহিতেন। মিসেস উইলকক্স লিখিয়াছেন, এই ভাবে যতবার চলিয়াছেন, প্রত্যেক বারেই নূতন শক্তি ও পরম শান্তি লইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন।

এইরূপে যখন যোগ অভ্যাস বা শিক্ষা করিতেছিলেন তখন একরাত্রে মিসেস উইলকক্সের জীবনে একটা ঘটনা ঘটে; তাঁহার মনে একটা প্রেরণা আসে, সে প্রেরণার ফল তাঁহার Illusion নামে কবিতা। নিজের হাত তাঁহার যেন সেদিন বশে ছিল না; যেন আর কাহারও রচনা, আর কাহারও কথা শুনিয়া তিনি নিজের কলমে লিখিয়া চলিয়াছেন, আর কেহ যেন তাঁহার কলম ধরিয়া লিখিয়া চলিয়াছে। এমন অবস্থা তাঁহার আর কখনও হয় নাই; তাঁহার নিজের লেখা কবিতা, কতই ত লিখিয়াছেন, আর কখনও অন্তরে গাঁথা হইয়া যায় নাই,—নানা অবস্থার বিপর্য্যয়ে এই কবিতাটি চিরদিন তাঁহার মনে রহিয়া গিয়াছে। কবিতাটি বহুদিন অপ্রকাশিত ছিল, কোনও মাসিক পত্রিকাই এই নূতন ধরণের সৃষ্টিটি গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত করিতে সম্মত হয় নাই।

আজকাল যে সকল মনীষী পাশ্চাত্য জগতের চিন্তানায়ক তাঁহাদের জীবনকথা জানিতে পারিলে পাশ্চাত্যের উপর স্বামী বিবেকানন্দের বা প্রাচ্য আদর্শের প্রভাব পূর্ণতরভাবে জানিতে পারা যাইবে। ভবিষ্যতে যাঁহারা স্বামীজির জীবনচরিত লিখিবেন তাঁহারা যেন একথা একেবারে ভুলিয়া না যান; আর যাঁহারা পাশ্চাত্যের উপর প্রাচ্য আদর্শের প্রভাব আলোচনা করিতে চাহিবেন, ইহা তাঁহাদেরও দ্রষ্টব্য ও আলোচ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বামিজী ত শুধু আমাদের—শুধু ভারতের নহেন, তিনি জগতের। অভয়ের কথা জগতকে শুনাইতে গিয়া তিনি আমেরিকা ধর্ম্মমহাসভায় যে বীরবাণী উচ্চারণ করেন তাহার হুঙ্কারে কতশত দুর্ব্বল হৃদয়ে সাহসের ও শক্তির সঞ্চার হয়, কতশত নরনারীর দৃষ্টিভূমি আমূল পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত হইয়া যায়, তাহার সন্ধান আমরা পাইও না, রাখিও না। তাঁহার কর্ম্মজীবনের যে কয় বৎসর বিদেশে কাটিয়াছিল, সে কয় বৎসরে তিনি অক্লান্তভাবে নরনারী নির্ব্বিশেষে সাদা কালোর বিচার না করিয়া মুক্তহস্তে জ্ঞান বিতরণ করেন; একদিকে অন্তর্গূঢ় দেশপ্রেম, অন্যদিকে জীবমাত্রে চৈতন্যের বিকাশ এই জ্ঞান, ও আত্মজ্ঞান উন্মেষের

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

স্বামী বিবেকানন্দ

কাজ করিয়া থাকে, প্রাচ্য প্রভাবও তাহা হইলে কিয়ৎপরিমাণে পাশ্চাত্যের উপর কাজ করিবে, এরূপ ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত নয়। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে ঈদৃশ ভাবসংঘাত নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয় না। বহুপথে পাশ্চাত্য ভাবপ্রবাহ আমাদের জীবনস্রোতে আসিয়া পড়িতেছে। আমরা যদি জগতের সম্মুখে ভিখারী না থাকিয়া দাতার আসন পরিগ্রহ করি তবে দেখিব যে মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে আমাদেরও দিবার বস্তু আছে; যে অমৃত জ্ঞান অধ্যাত্ম বিদ্যার পূর্বপুরুষানুক্রমে আমরা অধিকারী, সেই জ্ঞান সেই বিদ্যা জগৎ আমাদের নিকট হইতে শিখুক, বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষেরা একথা বারম্বার বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য সমাজে যাঁহারা মনস্বী, তাঁহারা এই প্রাচ্য ভাবপ্লাবনে কিছু আলোড়িত হইয়াছেন ইহার পরিচয় পাইতেছি। সাধারণ লোকে অবশ্য এইভাবে ভাবিত হয় নাই, সেরূপ সম্ভাবনাও কিছু নাই, কারণ রাজনৈতিক ও অন্য বহুবিধ কারণে আমাদের দেশে বিদেশী ভাবস্রোতের যেরূপ অনুকূলতা করিতেছে, পশ্চিমে সেরূপ হইবার কথা নয়। তথাপি ইংরাজ কবি "এ, ই" মার্কিণ চিন্তাবীর এমার্সন, এবং নবচিন্তাধারার প্রবর্তক র‍্যাল্‌ফ্‌ ওয়াল্‌ডো ট্রাইনের রচনায় প্রাচ্য আদর্শ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

চেষ্টা, ভাবুক পণ্ডিত রসিক ও সাধকের লক্ষ্য করিবার মত।

আর একটি কথা। ঘাত প্রতিঘাত সংসারের নিয়ম; তুমি যদি আমাকে আঘাত কর, তবে সে আঘাতের প্রতিঘাত হইবেই। পাশ্চাত্য প্রভাব যদি প্রাচ্যের উপর

বিবিধ সংগ্রহ

মুক্তার কথা

মুক্তা সর্ব্বপ্রথম কে আবিষ্কার করিয়াছিল কবেই বা লোকে ইহার সন্ধান পায় এ সব তথ্য মুক্তার মতই রহস্যময়। এই মাত্র জানা যায় যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ইহা মূল্যবান বস্তু বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে এবং বহু শতাব্দী হইতে মানুষ ইহার অনুসন্ধানে প্রভূত পরিশ্রম করিতেছে। ইহার উৎপত্তি, জীবন ও মৃত্যু রহস্যে পরিপূর্ণ। ইহার মূল্য সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করে। মুক্তার নানাপ্রকার আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। মুক্তা যে অবস্থায় প্রথমে পাওয়া যায় তাহা দেখিয়া ইহার মূল্য নিরূপণ করা দুরূহ। প্রথম অবস্থায় ইহা একপ্রকার চর্ম্মের মত পদার্থে আবৃত থাকে, তখন ইহার মূল্য বেশী হয় না। সেই চর্ম্মের মত পদার্থ খুব সাবধানে খুলিয়া

মুক্তা-আহরণ-কারীগণ

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
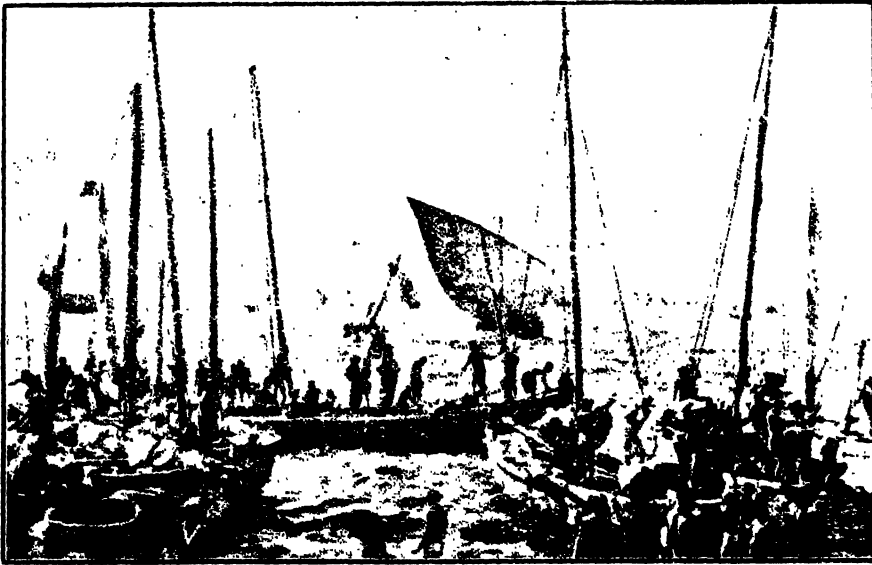
মারি আঁতোয়া-নেতের মুক্তাহার

লইতে হয় এবং ঠিকভাবে ও কৃতকার্য্যতার সহিত খুলিতে পারিলে আকারে ইহা ছোট হইয়া যায় বটে কিন্তু ইহার মূল্য অনেক বাড়িয়া যায়।

পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুক্তা পূর্ব্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র হইতে সংগ্রহ করা হয়। সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া, পারশ্য উপ-সাগর ইত্যাদির দ্বীপপুঞ্জে ইহা প্রথমে আহরণ করা হয় এবং তৎপরে এইসব স্থান হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিক্রয়ার্থ পাঠান হয়।

মুক্তা আহরণের নির্দ্ধারিত সময় আছে,—সাধারণতঃ বৎসরে দুইবার করিয়া। এই সময়ে পৃথিবীর নানা স্থান হইতে মুক্তাব্যবসায়ীগণ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সমুদ্র হইতে আরব ডুবারীগণ মুক্তা লইয়া উঠিবামাত্র ইহার ক্রয়বিক্রয় আরম্ভ হইয়া যায়। সিংহল ও পারশ্য উপ-সাগরে মুক্তা আহরণ সলোমনের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং আহরণের প্রথা তখনও যে রকম ছিল এখনও সেই রকমের আছে, কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।

মুক্তাআহরণকারীগণের প্রত্যাবর্ত্তন

সলোমনের সময়ে যে সকল ডুবারী মুক্তা আহরণ করিত এখনও তাহাদের বংশধরগণ ঐ কার্য্যই করিয়া আসিতেছে,—ইহাতে তাহাদের যেন বংশগত অধিকার জন্মিয়াছে। এই সকল ডুবারীগণ অসাধারণ সাহসী। সমুদ্রের মধ্যে মুক্তা আহরণের সময়ে নানাপ্রকার হিংস্র প্রাণীগণের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয় এবং অনেক সময়ে তাহাদের সহিত লড়াই করিতে হয়। কথিত আছে সময়ে সময়ে অতিকায় ও বীভৎস আকৃতির প্রাণীগণ আক্রমণ করিতে আসে এবং বিশেষ দক্ষতার সহিত তাহাদের আঘাত করিয়া এবং কখনও বা তাহাদের বধ করিয়া উদ্ধার পাইতে হয়।

মুক্তা আহরণের প্রথার ও বহুমূল্য মুক্তার কণ্ঠহারের কয়েকটি চিত্র এই প্রবন্ধের সহিত দেওয়া হইল।

মেরি "কুইন্ অব স্কট্সে"র মুক্তাহার

মহেঞ্জো-দারো ও হরপ্পা

ছয় বৎসর হইল মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেই সময় হইতে নিয়মিত ভাবে খনন কার্য্য চলিতেছে। আজ পর্য্যন্ত যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ডাইরেক্টর স্যর জন মার্শাল তাহার একটি বিশদ বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রায় ৪০ বিঘা জমির উপর কার্য্য চলিতেছে, এই পরিধির মধ্যে তিনটি সহরের সন্ধান পাওয়া যায়। তৃতীয় সহরটিতে সুন্দরভাবে নির্ম্মিত অট্টালিকা ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। বাড়িগুলি পোড়া ইটের সহিত মাটি দিয়া গাঁথা, কোথাও বা মাটির পরিবর্ত্তে প্যারিস প্লাষ্টারের মত কোনো জিনিষ ব্যবহৃত হইয়াছে।

সহরের উত্তর পশ্চিম কোণে একটি বৌদ্ধস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, এই স্তূপের নিকট সহরের সর্ব্বপ্রধান মন্দির ছিল। এই মন্দিরের চারিদিকে আরও অনেক ছোট ছোট মন্দির ছিল বলিয়া মনে হয়।

এইস্থানে একটি বৃহৎ জলাধার দেখিতে পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ ইহাতে নিকটস্থ মন্দিরগুলির পূজার্থীগণ পূজার পূর্ব্বে স্নান করিত। জলাধারটি ৩৯ ফিট লম্বা, প্রস্থে প্রায়

শ্রীঅনাথ নাথ ঘোষ

২৩ ফিট এবং ৮ ফিট গভীর। ইহার চারিদিক গবাক্ষযুক্ত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। জলাধারের দুই দিকে ইটের বাঁধান সিঁড়ি। সম্মুখে একটি বেদী এবং পিছনে ছোট ছোট ঘর। ছোট প্রাচীরের পর বড় দেয়াল, দেয়ালগুলি প্রস্থে প্রায় ছয় ফিট। দক্ষিণে দুটি বড় প্রবেশদ্বার, উত্তর ও পূর্ব্বদিকের প্রবেশপথ দুইটি অপেক্ষাকৃত ছোট। পূর্ব্বদিকের একটি ঘরে একটি বৃহদাকার কূপ ছিল, ঐ কূপ হইতে জল আসিয়া জলাধারটি সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিত। তলদেশ ইট দিয়া গাঁথা। যাহাতে কোনও প্রকারে জল বাহির হইতে না পারে এমন ভাবে চারিপাশের দেয়ালগুলি নির্ম্মিত। এই দেয়ালগুলি প্রস্থে প্রায় দশ ফিট এবং তিনভাগে বিভক্ত। ভিতর ও বাহিরের দিক পোড়া ইটে নির্ম্মিত এবং মধ্যস্থল ছোট ছোট ইট দিয়া গাঁথা। জলাধারটি সম্পূর্ণভাবে জলাভেদ্য করিবার জন্য ইটগুলির সহিত প্যারিস প্লাষ্টার ব্যবহৃত হইয়াছে। দেয়ালের ভিতরের দিক বিটুমেন নামক

মহেঞ্জোদারো হইতে মার্ব্বেলের মস্তক

পদার্থে আবৃত। জলাধারের সিঁড়িগুলিও বিটুমেন দিয়া গাঁথা। বিটুমেন মেসোপটেমিয়াতেও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। জলাধারটির জল-নিকাশের নালা ইহার আর একটি বিশেষত্ব। নালাটি প্রায় ছয় ফিট উচ্চ। এই নালার সাহায্যে জলাধার হইতে জল একেবারে সহরের বাহিরে চলিয়া যাইত।

জলাধারটির দক্ষিণে রাস্তার অপরদিকে একটি বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার সম্মুখভাগ ১২০ ফিট লম্বা। ইহার নিকট আরও অনেকগুলি বাড়ি আছে, সেগুলি এখনও সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা হয় নাই। এই সব বাড়িগুলি হইতে ধারণা করিতে পারা যায় সে সময়ে মহেঞ্জোদারোতে কিভাবে গৃহ নির্ম্মাণ হইত।

মহেঞ্জো-দারোতে প্রাপ্ত মৃন্ময় পাত্র

উপরোক্ত ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত আরও অনেক বাসগৃহ দোকানঘর ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব বাড়িগুলির নির্ম্মাণপ্রণালী হইতে মনে হয় মহেঞ্জোদারোর অধিবাসীগণ সেই সময়ের ব্যাবিলনিয়া অথবা নাইলের তীরের অধিবাসীগণ অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল।

মিষ্টার উলি সম্প্রতি উরে যেসকল পুরাতন অট্টালিকা ইত্যাদির সন্ধান পাইয়াছেন তাহা হইতে ইহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় যে সে সময়ে সিন্ধুদেশের সহিত দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার শিক্ষাদীক্ষা ও ভাবের আদানপ্রদান চলিত।

উরের বাড়িগুলির নির্ম্মাণপ্রণালী মহেঞ্জোদারো হইতে অনেক নিকৃষ্ট। ড্রেণ নির্ম্মাণ ব্যাপারেও মহেঞ্জোডারোর অধিবাসীগণ ঢের বেশী দক্ষ ছিল।

হরপ্পা মহেঞ্জোদারো হইতে ৪৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে মিষ্টার ভাট্‌সের তত্ত্বাবধানে খননকার্য্য চলিতেছে। হরপ্পায় যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা মহেঞ্জোদারো হইতে

মহেঞ্জো-দারোতে রজত-পাত্রে প্রাপ্ত অলঙ্কার

হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ এত খণ্ড বিখণ্ডভাবে পাওয়া যাইতেছে যে তাহা হইতে সব জিনিষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া দুঃসাধ্য। একটি অট্টালিকা এখনও অনেকটা ভাল অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকারের অট্টালিকা মহেঞ্জোদারোতে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। উত্তর হইতে দক্ষিণে ইহা ১৬ ফিট্ এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ১৩৬ ফিট। ইহার মধ্যে কতকগুলি দরদালান ও কতকগুলি অপ্রশস্ত কক্ষ। অনুমান হয় কর আদায়ের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইত। মুদ্রা প্রচলনের পূর্ব্বে দ্রব্যাদির দ্বারা কর আদায় করা হইত এবং এই সকল দ্রব্যাদি এই প্রকার অট্টালিকায় রাখা হইত।

মেসোপটেমিয়ার সহিত মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার বাণিজ্যের আদান-প্রদান চলিত এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন স্থানে ভারতবর্ষীয় শীল মোহর পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি খ্রীঃ পূঃ ২৭০০ সনের বলিয়া অনুমান হয়। এই প্রকারের মোহর মহেঞ্জোদারোর তিনটি নগরে পাওয়া গিয়াছে,। ইহা হইতে আন্দাজ করিতে পারা যায় এই সব নগর সার্দ্ধ পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন। এই সকল নগরের নির্ম্মাণ ও ধ্বংসের পর কত শত বৎসর যে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে তাহা ঠিক করিয়া নিরূপিত করা কঠিন।

ধ্বংসাবশেষের বিভিন্ন স্তরের বাড়িগুলির নির্ম্মাণ প্রণালী বিভিন্ন প্রকারের। তিনটি স্তরের বাড়িগুলির নির্ম্মাণ ও ধ্বংসের মধ্যে প্রায় ছয় শতাব্দী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। প্রথম স্তরের সহরগুলি খ্রীঃ পূঃ ২৭০০ সনের, দ্বিতীয়টি ৩০০০ এবং তৃতীয়টি ৩৫০০ সনের বলিয়া অনুমান করা যায়।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর সহরের অধিবাসীবৃন্দ কৃষিকার্য্য ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে জীবন ধারণ করিত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাহারা যে কৃষিকার্য্য করিত

আরও পূর্ব্বের। একটি তামার পাত্র পাওয়া গিয়াছে তার মধ্যে তামার অস্ত্রাদি ও হাতের কাজ করিবার নানাপ্রকার যন্ত্র, যথা একটি আশাশোঁটা, একটি কুড়ালি সাতখানি ছোরা, ষোলটি বর্শা, একুশখানি কুঠার, একটি করাত ও তেরখানি বাটালি ছিল। দুইখানি ছোরা ও দুইখানি কুঠারে উৎকীর্ণ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

সেই সময়ের ধ্বংসাবশেষের স্তরের মধ্যে প্রায় দেড়শত শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে, এই গুলি উপরের স্তরে যে মোহরগুলি পাওয়া গিয়াছিল তদপেক্ষা ছোট এবং ইহাদের আকারও অন্য প্রকারের। একটি মোহরের চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় সাতটি লোক জাঙ্গিয়া ও শিরস্ত্রাণ পরিয়া যেন দক্ষিণ হইতে বামদিকে অগ্রসর হইতেছে। আর একটিতে এক ব্যক্তি একটি ব্যাঘ্র শীকার করিতেছে, তৃতীয়টিতে এক ব্যক্তি একটি চিত্রিত পতাকা লইয়া যাইতেছে।

এই নিম্নস্তরের মধ্যে দ্বিচক্রযানের একটি তাম্র নির্ম্মিত প্রতিরূপ পাওয়া গিয়াছে, ইহা দেখিতে অতি সুন্দর। বোধহয় সে সময়ের প্রচলিত যানের আদর্শে নির্ম্মিত। উরে মিষ্টার উলি যেসকল রথ-অঙ্কিত ইস্পাতের টুকরা পাইয়াছেন ইহা তাহা হইতে অনেক পূর্ব্বের। কোনও প্রকার যান নির্ম্মিত হইবার সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উরে রথের প্রচলন ছিল। হরপ্পায় তাহারও অনেক পূর্ব্বে দ্বিচক্র যান ব্যবহৃত হইত।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

এমন প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় মহেঞ্জোদারোতে যে গমের নমুনা পাওয়া গিয়াছে বর্ত্তমান সময়ে পাঞ্জাবে যেপ্রকারের গম উৎপন্ন হয় ঠিক সেই প্রকারের।

সিন্ধুদেশে ও পশ্চিম পাঞ্জাবে সেই সময়ে এখন অপেক্ষা অনেক বেশী বৃষ্টিপাত হইত। ইহা ব্যতীত তখন সিন্ধুদেশের দুই পার্শ্বে দুইটি বড় বড় নদী ছিল (এখন একটি নদী আছে)। এই সকল কারণে ঐ দেশ বিশেষ উর্ব্বর ছিল।

সিন্ধুতীরের অধিবাসীগণ প্রধানতঃ রুটি ও দুগ্ধ খাইত। গোরু, ভেড়া, শূকর, কচ্ছপ, ঘুঘুর মাংসও খাইত। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত অস্থি ও অর্দ্ধদগ্ধ মাংস ইহার প্রমাণ দেয়।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে গোরু, ছাগল, ভেড়া, শূকর, কুকুর, ঘোড়া ইত্যাদির প্রমাণ পাওয়া যায়। উট অথবা বিড়ালের সন্ধান পাওয়া যায় না।

বন্য পশুর মধ্যে ব্যাঘ্র, গণ্ডার ও হস্তীর সন্ধান পাওয়া যায়। এই সকল পশু থাকিত বলিয়া মনে হয় যে সেই সময়ের আবহাওয়া এখন অপেক্ষা আর্দ্র এবং জমি অনেক উর্ব্বর ছিল। সিংহের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না।

বাড়ীগুলির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে চরকা পাওয়া গিয়াছে, ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে সুতা কাটা ও বয়নের প্রচলন ছিল। ইহা ব্যতীত স্থানে স্থানে সূক্ষ্মভাবে বোনা কাপড়ের টুকরাও পাওয়া গিয়াছে।

উচ্চজাতীয় পুরুষগণ জাঙ্গিয়া ও শাল পরিধান করিত। মাথার চুল বড় রাখিয়া খোঁপা করিত। একটি মাত্র স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মাথার লম্বা চুল পিছনে এলাইয়া দেওয়া। এই রকম বড় চুল রাখা তখন প্রচলিত ছিল কিনা তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না।

নীচ জাতীয় পুরুষগণ সাধারণতঃ উলঙ্গ অবস্থায় থাকিত। স্ত্রীলোকেরা কটিবাসমাত্র পরিত। একটি নটীর প্রস্তর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সেটুকুও নাই, সম্পূর্ণ উলঙ্গ।

পরিধানের বস্ত্র অত কম হইলেও গহনার কিছু কম ছিল না। সর্ব্বশ্রেণীর লোকেই গহনা পরিত। কণ্ঠহার ও আংটী স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই অলঙ্কার ছিল। কানফুল, বালা, মল ইত্যাদি স্ত্রীলোকেরা পরিত।

ধনীদিগের গহনা সোণা, রূপার অথবা তাম্রের উপর স্বর্ণমণ্ডিত হস্তিদন্তের, রুধিরাক্ষের অথবা বহু বর্ণের প্রস্তরমণ্ডিত হইত। সাধারণ স্ত্রীলোকেরা শঙ্খ, কড়ি অথবা টেরাকোটার গহনা ব্যবহার করিত।

ছোট ছোট গহনাগুলি এমন সুন্দরভাবে প্রস্তুত যে, সেরকম গহনা বর্ত্তমানকালের স্বর্ণকারদিগেরও গৌরবের জিনিষ।

মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত শীল মোহর

স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত সিন্ধুতীর অধিবাসীদিগের মধ্যে সীসা লোহের ব্যবহারও ছিল। পশ্চিমে বেলুচিস্থান, পূর্ব্বে রাজপুতানা, এবং উত্তরে আফগানিস্থান হইতে তাম্র খুব সহজেই পাওয়া যাইত। টিন তামার মত অত সহজে পাওয়া যাইত না, সম্ভবতঃ খোরাসান হইতে অথবা আরও পশ্চিমে সুমের হইতে আমদানি হইত। টিন খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যাইত না, উহার সহিত তামা মিশান থাকিত।

টিনের সহিত তামা মিশাইয়া ব্রোঞ্জ দ্বারা ক্ষুর, বাটালি, করাত ইত্যাদি শাণিত অস্ত্র বা যন্ত্র নির্ম্মিত হইত। মূর্ত্তি গঠন কার্য্যেও ব্রোঞ্জ ব্যবহৃত হইত। ইহা ব্যতীত ব্রোঞ্জে বোতাম, মালা, গহনা ইত্যাদি প্রস্তুত হইত।

ব্রোঞ্জ খুব ভাল অবস্থাতেই পাওয়া যাইত কিন্তু তাহা সত্বেও ব্রোঞ্জ অপেক্ষা তামার জিনিষ বেশী পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ টিন সহজে পাওয়া যাইত না সেইজন্য তামার জিনিষ বেশী ব্যবহৃত হইত।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো উভয় স্থলেই অস্ত্রাদি খুব অল্পই পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যুদ্ধ বিগ্রহ তখন বিশেষ হইত না।

নীলবর্ণের একপ্রকার চিত্রিত এবং কাচের সূক্ষ্ম-স্তরাচ্ছাদিত মৃৎপাত্রাদি অনেক পাওয়া যায়।

গৃহকার্য্যের জন্য সাধারণতঃ মৃৎপাত্রাদি ব্যবহৃত হইত। নানা আকারের পাত্রাদি পাওয়া যায় প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য। অধিকাংশ পাত্র সাধারণ পোড়া মাটির

মহেঞ্জো-দারোর স্নানাগার

প্রস্তুত; চিত্রিত মৃৎপাত্রাদিও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। পাত্রগুলিতে সাধারণতঃ কালো রং দ্বারা লতাপাতা চিত্রিত হইত, পশু চিত্রও দেখিতে পাওয়া যায়।

উত্তর বেলুচিস্থানে ও ওয়াজিরিস্থানের সীমান্ত প্রদেশে শুর অরেল ষ্টাইন সিন্ধুতীর দেশে প্রস্তুত অনেক মৃৎপাত্র পাইয়াছেন। সাইস্তানেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। মহেঞ্জোদারোতে কতকগুলি পাত্র পাওয়া গিয়াছে সেগুলি সাদা, লাল, কালো ইত্যাদি নানা বর্ণে চিত্রিত। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো উভয় স্থানেরই মৃৎপাত্রের গঠন দেখিয়া মনে হয় বেলুচিস্থান ইলাম ও মেসোপটেমিয়ার সহিত সম্বন্ধ ছিল।

মহেঞ্জোদারোর প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই উৎকীর্ণ শীল-মোহর পাওয়া যায়; ইহা হইতে অনুমান হয় ব্যবসা ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য লেখার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু কিসের উপর যে লিখিত তাহা ঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ কাঠের উপর অথবা ভূর্জ্জপত্রে অথবা প্রাচীন মিশরবাসীগণ কর্ত্তৃক প্যাপিরস নামক তৃণ হইতে প্রস্তুত কাগজের উপরে। এই প্রকার কাগজ বহু প্রাচীন কালে ব্যবহৃত হইত।

শীল প্রায় এক সহস্র পাওয়া গিয়াছে। শীলগুলি তাহারা সুতা দিয়া গাঁথিয়া গলায় অথবা মণিবন্ধে পরিয়া থাকিত। শীলগুলি সম্ভবতঃ পুলিন্দা ইত্যাদিতে ও বাণিজ্যদ্রব্যে ব্যবহৃত হইত। ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল হইতে এই প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এমনও হইতে পারে শীলগুলি তাহাদের কবজ ছিল। কারণ শীলগুলি ধর্ম্ম-বিষয়ক চিত্রে উৎকীর্ণ। কতকগুলিতে প্রাচীন সুমেরীয় চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু এমন কোনও প্রমান পাওয়া যায় না যে চিত্রগুলির অর্থ দুই দেশে একই বুঝাইত বা দুই দেশের ভাষা একই ছিল।

সিন্ধুতীর দেশের শিল্প নিকটবর্ত্তী দেশ সমূহ হইতে বিভিন্ন ধরণের। মোহরগুলিতে যে সব চিত্র উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত। ইলাম বা মেসোপটোমিয়া বা মিশরের শীলের চিত্র উহা হইতে অনেক নিকৃষ্ট ধরণের।

মৃৎপাত্রের উপর যে সব পশু ইত্যাদির চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলিও খুব উচ্চাঙ্গের। খৃঃ পূঃ তিন বা চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের যে ভাবের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় এগুলি তদপেক্ষা উচ্চাঙ্গের। কতকগুলি পাথরের, মাটির ও ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে সেগুলি অতিশয় কদাকার।

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

মহেঞ্জো-দারোর একটী রাজপথ ও উভয় পার্শ্বের গৃহশ্রেণী

মহেঞ্জোদারোর এক বাড়িতে ও একটি রাস্তায় কতকগুলি মনুষ্য কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহারা অন্য কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল অথবা কোনও মড়কের সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। মৃত ব্যক্তিদের কি প্রকারে সৎকার করা হইত তাহার কোনও আভাষ পাওয়া যায় না।

তাম্রনির্ম্মিত নর্ত্তকীর (?) মূর্ত্তি

মহেঞ্জোদারোতে এক অমানুষিক ও বর্ব্বরোচিত কার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, মৃত দেহের আংশিক কবর। বেলুচিস্থানের নালে এবং পশ্চিম পারস্যের মুসিয়ানে এই প্রকার কবরের প্রচলন ছিল। মৃতদেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। মহেঞ্জোদারোর ইহা নিয়মিত প্রথা ছিল বা বিশেষ কোনও কারণের জন্য কোনও সময়ে হয়ত বাধ্য হইয়া এই রকম ভাবে কবর দেওয়া হইয়াছিল তাহা এখনও স্থির করিতে পারা যায় নাই।

হরপ্পায় মৃতদেহের কবরের প্রথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে হিন্দু সমাধিমন্দিরের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার মধ্যে অস্থি ও ভস্ম ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা উভয় স্থলেই মৃতদেহের অস্থি ও ভস্মপূর্ণ বিশেষ একপ্রকারের পাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর বেলুচিস্থানেও প্রাগৈতিহাসিক যুগে অস্থি ও ভস্মপূর্ণ এই প্রকারের পাত্র পাওয়া গিয়াছে।

ইহাদের জাতি ও ধর্ম্ম কি ছিল তাহা ঠিকভাবে নিরূপিত করা যায় না। ধর্ম্ম বিশ্বাসে কতকগুলি বিষয়ে সিন্ধুতীরদেশ ও মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীগণ একমত ছিল। বৃষ, মেষ, হস্তী ইত্যাদি কতকগুলি পশু তাহাদের ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত। শীল মোহরে ঐ সব পশুদিগের প্রতিকৃতিও ইহার প্রমাণ দেয়। কতকগুলি কাল্পনিক পশুর প্রতিকৃতি মোহরের উপর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে গর্দ্দভের মত একপ্রকার পশুর দুইটি মুণ্ডবিশিষ্ট শীল অনেক পাওয়া গিয়াছে। এই প্রকারের শীল গ্রীসে প্রসিদ্ধ মাইসেন রত্নের উপর উৎকীর্ণ থাকিত। শীলগুলিতে উৎকীর্ণ প্রতিকৃতিগুলি ধর্ম্ম বিষয়ক তাহার আরও প্রমাণ স্বরূপ একটি প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে একব্যক্তি উপবিষ্ট এবং তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি সর্প ফণা তুলিয়া যেন তাহাকে পূজা

করিতেছে। তিন সহস্র বৎসর পরের যুগে এই ভাবে বুদ্ধ-পূজা প্রচলিত ছিল।

কাঠের বা প্রস্তরের উপর এই প্রকারের চিত্র দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

সিন্ধুতীরদেশের সভ্যতা যে বেলুচিস্থান, ওয়াজিরিস্থান, সিন্ধুদেশ ও পঞ্জাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আরও প্রমাণিত হয় যে কচ, কাথিয়াড় ও দাক্ষিণাত্যেও ঐ সভ্যতা প্রচলিত ছিল। অন্যান্য স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল কি-না তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তাম্রনির্ম্মিত যন্ত্রাদি উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে সিন্ধুতীরদেশের এই মহান সভ্যতা ভারতবর্ষে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের অনেক স্থানে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে মনে হয় তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে এই সভ্যতা প্রচলিত ছিল।

নানাপ্রকার দৃষ্টান্তের দ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে, কোনও সভ্যতা কোনও বিশেষ দেশে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, বাণিজ্যের দ্বারা উহা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারে বিস্তৃতি লাভ করে। প্রত্যেক দেশই নানাপ্রকারে উন্নতিতে সাহায্য করে।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
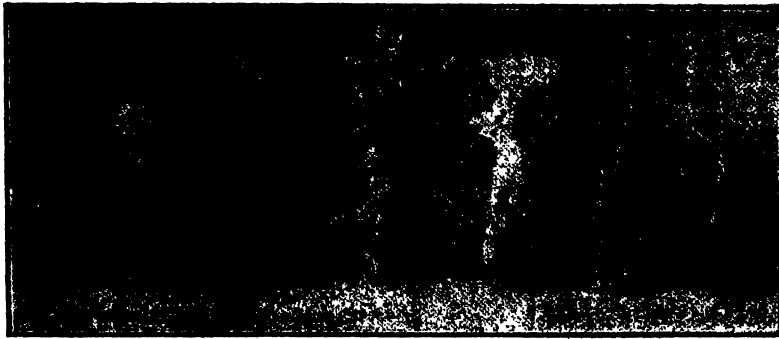
মহেঞ্জো-দারোর মাটির মূর্ত্তি ও খেলার জিনিষ

পুস্তক সমালোচনা

স্বপ্ন-সাধ—হুমায়ুন কবীর প্রণীত ; মূল্য একটাকা। প্রকাশক, শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, ৯০।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

হুমায়ুন কবির বাঙ্গলার পাঠকসমাজের কাছে অপরিচিত নন। এই বইখানি তাঁর কবিতার প্রথম সংগ্রহ। তিনি তরুণ, কিন্তু নূতনত্বের কোন উৎকট প্রয়াস তাঁর নেই ; তিনি রসপিপাসু তাই দেশী বিদেশী সাহিত্যের নব নব ধারার সন্ধান রাখেন, তথাপি যা চির-পুরাতন অথচ চির-নবীন সেই সব একান্ত সাধারণ অভিজ্ঞতা ও সহজ অনুভূতিকে তাঁর কাব্যের ভিত্তি করতে কুণ্ঠিত হন নি। তিনি যথার্থ কবি, তাই দেশে কবিতার আদর নেই জেনেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে চমকপ্রদ হবার চেষ্টামাত্রও করেন নি।

এই বইখানিতে তিন রকমের কবিতা চোখে পড়ে। প্রথম শ্রেণীতে পাই "পদ্মা", "তাজমহল", "আকবর", "শাহজাহাঁ", "জাহানারা"র মতন কবিতা,—যেগুলি ঠিক লিরিক নয়, কেননা কবির নিজের কোন একটি অনুভূতি বা মনের কোন বিশেষ অবস্থার প্রকাশ তাতে নেই। উল্লিখিত কবিতাগুলির প্রথমটীতে পাই পদ্মার বিচিত্র ছবি— মেঘাচ্ছন্ন বৈশাখ সন্ধ্যায় তার প্রলয়নর্ত্তন, শ্রাবণে তার ক্ষুব্ধ রুষ্ট উর্ম্মিরাশি, শরতে তার শান্ত অচঞ্চল পূর্ণবারি, কূলে কূলে তার কাশরাশি আর বনফুল। অন্যগুলিতে পাই প্রখ্যাত কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্রের কথা ;—তাদের রাজ্য ভাঙ্গা-গড়ার কথা নয়, তাদের ঐশ্বর্য্যগৌরবের কথা নয়, তাদের মর্ম্মবেদনা, তাদের স্বপ্নসাধ। যেখানে কত হাসি কত গান, জীবন-তরঙ্গ যেখানে উদ্বেল, সেই সম্ভোগ-বিভবের প্রাসাদপুরীতে জাহানারা ও সাজাহানের করুণ চিত্র কবি নিপুণ তুলিকায় এঁকেছেন :—

নৃত্যপরা চটুল চরণে
বরণে বরণে
ঝলকিয়া ওঠে পেশোয়াজ,
মণিময় সাজ
ঠিকরে নয়ন,
বর্ণ-গন্ধ-হাসি-রূপ-গানে-ভরা নিখিল ভুবন।
তারি অন্তরালে চলে জীবনের সুগভীর ধারা।

সেথা আমি বাক্যহারা
মুখর চপল সুখদুখ।
শুধু দুটী হৃদয় উন্মুখ
গোপনে রেখেছে সেথা সাধনার ধন
যতনে সঞ্চয় করি।
একজন
বাহিরের বিশ্ব হতে মাণিক আহরি

আপনার হৃদয়ের বেদনারে দিল নিত্যকায়া
অমলিন অশ্রুকণা তাজ তার হৃদয়ের ছায়া।

জাহানারা গভীর গোপনে
লুকায়ে রাখিল ব্যথা আপনার মনে
হাসি দিয়া অশ্রুরাশি ঢাকি
সহিল গহন ব্যথা একান্ত একাকী
রাজ্যচ্যুত রাজপিতা সম্রাটেরে গভীর আদরে,

জননীর মত স্নেহভরে,
টানি নিল বুকের ছায়ায়।

মুছাতে চাহিল তার নয়নের জল,—
সর্ব্বহারা রিক্ত নিঃসম্বল
ভিখারিণী যেন চায়
ঘুচাইতে জগতের দারিদ্র্যবেদনা।

আর একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়ে কবির এই জাতীয় কবিতার কথা শেষ করি। পদ্মার কূলে সন্ধ্যা নামছে, তখনও আকাশে অনুরাগ। কবি দুচারটী রেখায় দিনশেষের ক্লান্তি ও মন্থরতা কি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন :—

ঘরে ফিরে আসে ক্লান্ত বিহগ
তরু ফেলে দুখশ্বাস,
অলস আকাশে আলসে ভাসিছে
অলস জলদরাশ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতাগুলি পুরাপুরি লিরিক, কবির আপন প্রাণের কথা। তাতে তাঁর মনের দ্বন্দ্ব, সংশয়,

গভীর ভাবনা ও সন্দেহ সবই কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছে ; কিন্তু এ সবের চেয়ে আরও যা অনেক বেশী পাই তা তাঁর কল্পনার খেলা, তাঁর স্বপ্নজালবোনা। বইখানি প্রধানতঃ কবির কোন কঠিন সাধনার ইতিহাস নয়, এ শুধু তাঁর নানা অবস্থার নানা সাধ ও স্বপ্নের পাঁচমিশেলী ফুলের একটা মালা। সবের মধ্যে দিয়ে বইছে একটা সুকুমার হৃদয়ের, একটা মুক্ত প্রাণের হাওয়া।

তাঁর মায়ার প্রাসাদ তিনি কি ভাবে আর কি দিয়ে গড়েন তা তিনি একস্থানে বলেছেন :—

আপনার অন্তরের অন্তরালে বসিয়া একাকী
গহন গোপনে,
মায়ার প্রাসাদ রচি হৃদয়ের আশা দিয়া আঁকি
সোনার স্বপনে।
তাহারি নিভৃত কক্ষে সবাকার আঁখির আড়ালে
সযত্ন প্রয়াসে,
আপনার মানসীরে সাজাই কাঞ্চন মণিজালে
অপরূপ বাসে।

দেখেছিনু পথে যেতে কবে কোথা নীল আঁখি দুটী,
কার হাসিখানি,
অশান্ত অলকচূর্ণ পড়িয়াছে আঁখিপরে লুটি
কেন নাহি জানি।
চকিত চোখের তারা চেয়েছিল বুঝি মোর পানে
কৌতূহল ভরে,
সকল জীবন মম স্মৃতি তার ভরি দিল গানে
গভীর অন্তরে।

তৃতীয় শ্রেণীর কবিতাগুলি ইংরাজী থেকে ভাবান্তরিত। এই জাতীয় কবিতায় মূলের পূর্ণ আবেদন বা সৌন্দর্য্য অটুট আছে কিনা বিচারের বিষয় নয়, দেখতে হবে আহৃত উপাদান দিয়ে নূতন সৃষ্টি হয়েছে কিনা। আমাদের বিশ্বাস এই পরদেশী কবিতার অনেকগুলিতেই তা হয়েছে, বিশেষতঃ Browning ও Keats থেকে গৃহীত কবিতায়।

সারাটী জীবন ভরিয়া শিখিনু তোমারে বাসিতে ভালো
আজি ফাল্গুনে তোমার দুয়ারে হৃদয় আনিনু বহি,
ইঙ্গিতে তব নিভাইতে পারো আমার জীবন আলো,
স্বরগ রচিতে পারো এ জীবনে শুধু দুটী কথা কহি।

এ লাইনগুলিকে অনুবাদ বলব, না নূতন সৃষ্টি? স ন স

শকুন্তলায় নাট্য-কলা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, ১৫৮ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা। প্রকাশক, বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

আমরা এই বইখানি পাঠ করিয়া অতিশয় তৃপ্ত হইয়াছি। কালিদাসের নাট্য-কাব্য অবলম্বন করিয়া এ বইখানি সংস্কৃত নাট্যের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও লক্ষণাদি সম্বন্ধে একটি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ মূল্যবান সন্দর্ভ হইয়াছে। সংস্কৃত নাট্য-কাব্যের প্রবেশিকা স্বরূপ এই পুস্তকখানি কাব্যানুরাগী পাঠকের বিশেষ উপকারে আসিবে—নাট্য-কলা সম্বন্ধে একটা নূতন আলোক আনিয়া দিবে। গল্পাংশকে কেমন করিয়া নাটকের কাঠামোয় চড়াইতে হয়,—বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী এবং কার্য্য আখ্যান-বস্তুর এই পঞ্চ উপাদানকে কেমন করিয়া মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি এই পঞ্চ সন্ধির প্রণালী দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে হয়, এই সকল নাট্যকলার নিগূঢ় কৌশল অতি বিশদ এবং নিপুণ ভাবে দেখানো হইয়াছে। ইহা ছাড়া, কাব্য উপন্যাস ও নাটকের প্রকৃতি, নায়ক-নায়িকার লক্ষণ, কালিদাসের সমগ্র কাব্য ও নাটকের আলোচনা, গ্রীস ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের নাট্যকাব্যের ইতিহাস, শকুন্তলা নাটকের আখ্যান-বস্তুর উৎপত্তি-সন্ধান, কালিদাসের সময়-নির্ণয় প্রভৃতি বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়েরও বিস্তারিত আলোচনা আছে।

ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয়-বিধ নাটকে সুপণ্ডিত দেবেন্দ্রবাবু উভয়-বিধ নাটকের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইংরাজী নাটক প্রধানতঃ ঘটনামূলক এবং সংস্কৃত নাটক প্রধানতঃ রস-মূলক ; এবং সেই প্রসঙ্গে তিনি বিশেষ পারদর্শিতার সহিত রস-স্বরূপের নির্ণয় করিয়াছেন।

সাধারণ পাঠক ছাড়া এই বইখানি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদেরও পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে ; সুতরাং এ পর্য্যন্ত যদি না হইয়া থাকে ত' অবিলম্বে পাঠ্য-পুস্তক শ্রেণী-ভুক্ত হওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি।

—বিষ্ণুশর্ম্মা

রবীন্দ্রনাথের বাণী

মাঘের প্রবাসীতে প্রকাশিত জনৈক মহিলাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি পত্র হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

প্রতিমা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো বিরুদ্ধতা নেই। অর্থাৎ যদি কোনো বিশেষ মূর্ত্তির মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে বিশেষ সত্য ব'লে না মনে করা যায় তাহ'লেই মুস্কিল থাকে না। তাঁকে বিশেষ কোনো একটি চিহ্নদ্বারা নিজের মনে স্থির ক'রে নিয়ে রাখলে কোনো দোষ আছে একথা আমি মনে করিনে। কিন্তু এসম্বন্ধে কোনো মূঢ়তাকে পোষণ করলেই তার বিপদ আছে। ঠাকুরের বিবাহ দেওয়া, তাঁকে খাওয়ানো পরানো, ঔষধ খাওয়ানো ইত্যাদি নিরতিশয় খেলা। ঠাকুরকে খাওয়াতে পরাতে হয় বটে, কিন্তু সে হচ্ছে যেখানে তিনি খান পরেন—সে কেবল মানুষেরই মধ্যে, জীবের মধ্যে। তাঁর সেবা তিনি সেইখান থেকেই সত্যভাবে গ্রহণ করেন; অন্যকোনো রকমে দিতে গেলে তাঁকে ফাঁকি দেওয়া হয়। যাই হোক, আজ আর এসব কথা নিয়ে তর্ক করব না।

হৃদয় আপনার কাজ আপনার নিয়মে করে; তাহার সঙ্গে বুদ্ধির নিয়ম মেলে না এবং না মিলিলে কোনোই দোষ নাই। কিন্তু সে-স্থলে সত্যভাবেই হৃদয়টি থাকা চাই; নহিলে তেমন মূঢ়তা আর কিছুই হইতে পারে না। মা ছেলেকে আদর করিবার সময় আধ-আধ করিয়া প্রলাপ বকিয়া থাকে, কিন্তু তাহা মিষ্ট এবং সত্য। কিন্তু মাতৃস্নেহ হইতে বাদ দিলে তেমন অদ্ভুত অসঙ্গত আর কি আছে। মাতাকে শিশুর আদর করার প্রণালী শিখাইতে হয় না—শিশুকে ভুলাইবার যে-সমস্ত প্রচলিত অর্থহীন ছড়া আছে তাহাও মা যখন স্নেহের স্বরে ব্যবহার করে তখন তাহা নূতন ও সার্থক হইয়া উঠে। কিন্তু যদি কেহ শাসনের দ্বারা এই প্রণালীকে কৃত্রিমতা দ্বারা নির্বিচারে সর্ব্বজনের ব্যবহার্য্য করিয়া তুলে তাহা হইলে মূঢ়তায় দেশ আচ্ছন্ন হইয়া যায়। কারণ ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক ভক্তি দুর্লভ অথচ কেবলমাত্র স্বভাবভক্তই যে-পদ্ধতিতে সত্যভাবে চলিয়া তাহার সফলতা সহজে লাভ করিতে পারে তাহাকেই সর্ব্বসাধারণের একমাত্র পন্থা করিলে জ্ঞানের পথ ত রুদ্ধ হয়ই, হৃদয়ের কার্য্যও বিকৃত হইতে থাকে। একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে—জ্ঞানের বিষয়ে নকল চলে, এমন কি, নকল করিয়াই তাহাকে আয়ত্ত করিতে হয়; কিন্তু হৃদয়ের বিষয়ে নকল চলে না, নকল করিলেই তাহা অসহ্য ভাণ হইয়া পীড়ার সৃষ্টি করে। এইজন্যেই আমাদের দেশে ভক্তির যে-প্রণালী তাহা হৃদয়বান সাধকের পক্ষেই উপযোগী—কিন্তু তাহা সাধারণের পক্ষে অনিষ্টকর; তাহারা তাহার মধ্য হইতে যেটুকু রস পায় তাহার চেয়ে মূঢ়তাই বেশি সঞ্চয় করে। ইহাতে কেবল অল্প কয়জনের উপকার হয়, কিন্তু সমস্ত জাতিকে অন্ধ ও স্বাধীনবুদ্ধিবিচারহীন করিয়া নষ্ট করে। সেই দুর্গতি কি সমস্ত দেশের মধ্যে দেখিতেছ না? এখানকার লোকে যে কোনো-মতেই কোনো মঙ্গলকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না, কেবল সমাজশাসনের দ্বারা বলপূর্ব্বক চালিত হইয়া স্বজাতিকে জড়ত্বে ও চির-দাসত্বে আবদ্ধ করিয়াছে, তাহার মূলে কি এই পূজার্চ্চনাবিধি নাই? তাহারা দেবতাকে যে-ভাবে গ্রহণ করে, দেবকাহিনী সকলকে যেরূপ অত্যন্ত ক্ষুদ্রভাবে বিশ্বাস করে এবং ধর্ম্মের নামে যেরূপে মনুষ্যত্ববিরুদ্ধ দুর্নীতিকেও বরণ করিয়া লয়, তাহাতে কি সমস্ত জাতির মর্ম্মস্থলে মৃত্যুবাণ বাজে নাই? দেশের মানুষকে কি এইরূপে অজ্ঞতার মধ্যেই ফেলিয়া রাখিব?

যেখানে হৃদয় আপন স্বভাবের পথে চলে সেখানে সে সত্য পরিণামেই যায়—কিন্তু সেই স্বভাবের পথ অল্প লোকেরই। সে লোকেরা জ্ঞানী না হইতে পারেন, পণ্ডিত না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারাই সত্যের অধিকারী—তাঁহারা নিরক্ষর চাষা বা সরলপ্রাণ স্ত্রীলোক হইলেও আমাদের সমালোচনার বাহিরে। আমরা যখন এসম্বন্ধে বিচার করি তখন জাতির দিক দিয়া করি।

আদর্শ বঙ্গলক্ষ্মী

[শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী পৌষের 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে বর্ত্তমান নারী-সমস্যার বিষয় একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন। তা' থেকে কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করা হ'ল :—

প্রথমেই বলে' রাখি যে, মেয়েদের মেয়ে হওয়া দরকার—পুরুষ-জাতির একটা নিকৃষ্ট সংস্করণ নয়। এই অতি পুরাতন সত্যটির পুনরুক্তি অনাবশ্যক হ'ত, যদি না দেখ্‌তুম যে, বিলেতের অনুকরণ এবং পুরুষদের অনুকরণ আমরা কেউকেউ এক সঙ্গেই করতে প্রবৃত্ত হ'য়েছি;—হয়ত' দুয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বর্ত্তমান—অবশ্য মেয়েও মানুষ, পুরুষও মানুষ, সে হিসেবে কতকগুলো বিষয়ে উভয় জাতির সমান অধিকার,—যথা আলো-বাতাস, শিক্ষা-দীক্ষা, আরাম-বিরাম ইত্যাদি। এবং সেই মনুষ্যজন্মগত অধিকার থেকে যদি কোন দেশে দুর্ব্বলা নারীকে গায়ের জোরে বঞ্চিত করা হ'য়ে থাকে ত' তার জন্য তারা লড়্‌লে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু যে সব মেয়ের সে অভাব অভিযোগ নেই, তারা যদি পুরুষরা যা করে কেন করব না বা যা পায় কেন পাব না বলে' তারস্বরে আব্‌দার ধরে (কতকটা সাদা জেতৃ জাতির কাছে কালো বিজিত জাতির মত)—তা হ'লে একটু আপত্তি তোলা আবশ্যক মনে করি। ভগবান গোড়ায় এই যে এক স্ত্রী-পুরুষের জাতিভেদ করে' রেখে দিয়েছেন, কোনরূপ সমাজসংস্কারে বা চীৎকারে তা তুলে দেবার উপায় ত' দেখিনে; সুতরাং সে প্রভেদ মাথা খুঁড়ে' ভাঙবার চেষ্টা না ক'রে মাথা পেতে মেনে নেওয়াই সুবুদ্ধির কাজ। শ্বেতাঙ্গও যেমন আমরা হব না' অর্দ্ধনারীশ্বরও তেম্‌নি আমাদের পক্ষে হওয়া অসম্ভব।

এই গোড়াটুকু বেঁধে' নিয়ে তারপর সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে আমাদের দেশের মেয়েদের প্রথমতঃ "বঙ্গ" এবং দ্বিতীয়তঃ "লক্ষ্মী হওয়া চাই।

বাইরের চেহারা বর্ণনা করতে গেলে, লালপেড়ে-সাড়ীশাঁখা-সিঁদুরআলতা-পরিহিতা সেবারতা পতিব্রতা কোমলা মাতৃমূর্ত্তিই মনশ্চক্ষে ভেসে' উঠে। এ চিত্র বহু যুগের বহু মানবের মনগড়া মূর্ত্তি, কোন বিশেষ কবি বা শিল্পীর নয়। সুতরাং এর মধ্যে কিছু সত্য আছে বলে' ধরে' নেওয়া যেতে পারে। এই ধ্যান-মূর্ত্তি বিশ্লেষণ করলে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, বাঙালী মেয়েকে আমরা কেবল মাত্র মেয়ে বলে' কল্পনা করিনে স্বভাবতঃই তাকে কোন না কোন পারিবারিক সম্বন্ধে আবদ্ধ করে দেখি; সে হয় মা, কি বোন, কি মেয়ে, কি স্ত্রী। প্রত্যেক সম্বন্ধের মধ্যে দুই পক্ষেরই কর্ত্তব্য এবং অধিকার উভয় থাকে। দুঃখের বিষয়, বাঙালী মেয়ের কপালে কর্ত্তব্য যত জুটেছে, অধিকার সে পরিমাণ জোটেনি। তাই বলে' কি আমরা একেলে শিক্ষিত মেয়েরা সে কর্ত্তব্য-ভার ফেলে দিয়ে তার শোধ তুলব? তার চেয়ে যেমন দুর্গতিনাশিনী দুর্গা এক হাতে বর, অপর হাতে অভয় দান করেন, আমরাও তেম্‌নি এক হাতে কর্ত্তব্যপালন, আর এক হাতে অধিকার আদায়ের চেষ্টা করিনে কেন? তা হ'লে দুদিকই রক্ষা হয়। যেমন চাঁদ নিজের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে,—তেমনি নিজের পদবী ঠিক রেখেও পরের সেবা করা যায়। হয়ত' বেশী ভাল করে' করা যায়। নিজেকে দায়ে পড়ে' বিলীন ক'রে দেওয়া এবং ইচ্ছে করে' নিবেদন করে' দেওয়ার মধ্যে যে প্রভেদ, সেটা একেবারে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য, দেবত্ব ও দাসত্বের প্রভেদ।

এইত' গেল প্রথম ভাগের ভাষ্য। দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ লক্ষ্মী বলতেও সেই গৃহলক্ষ্মীই আমরা বুঝি। গৃহলক্ষ্মীর প্রচলিত গুণাবলী সম্বন্ধে বেশী বলা বাহুল্য, কারণ শাস্ত্র ও সংস্কার, পরিবার ও সমাজ ছেলেবেলা থেকে আমাদের মেয়েদের কানে সেই মন্ত্র দিতে এতই ব্যস্ত যে, তা ছাড়া আর কিছু তাদের মনে পৌঁছল কি না সে বিষয়ে খেয়াল থাকে না। সে মন্ত্র যখন ছিল "সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব" তখন তার ভাব ও ভাষায় গৌরব ছিল। কিন্তু যখন সেটা "মা, তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি" রূপে বাঙলায় অনুদিত হ'ল, তখন শুনেই বোঝা যায় যে, আমরা অনেক ধাপ নেমে' গেছি। আমাদের গৃহলক্ষ্মীকে সেই কয় ধাপ আবার টেনে' তুলে' তাঁর পূর্ব্ব সিংহাসনে বসাতে হবে। সেখানে তিনি শুধু গৃহের লক্ষ্মী নন, সমাজেরও লক্ষ্মী; শুধু ধনের অধিষ্ঠাত্রী নন, মনেরও অধিষ্ঠাত্রী; শুধু সহধর্ম্মিণী নন, সহকর্ম্মিণী। তবে লক্ষ্মী তিনি সমানই থাক্‌বেন, নইলে যে সংসার লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে যাবে।

উক্ত ব্যাখ্যায় আশা করি এই কথাটুকু স্পষ্ট হ'য় উঠেছে যে, "বঙ্গ" থেকে এবং "লক্ষ্মী" থেকেও আমাদের মেয়েদের যুগধর্ম্মের উপযোগী করে' তুলতে বা হ'য়ে উঠ্‌তে হবে। সে কাজে পরের সাহায্যও চাই, নিজের চেষ্টাও চাই। পাবার মত জিনিষ কেউ কাউকে হাতে তুলে দিতে পারে না, যদি অন্ততঃ হাতটা ইচ্ছে করে' পেতে' না দি; যেমন দাতা ও গ্রহীতা দুই না থাকলে দান সম্পূর্ণ হয় না। এখন আমাদের মেয়েদের মধ্যে সেই পাবার ইচ্ছে, সেই ঠিক পথে যাবার ইচ্ছেটা জেগেছে বলে' মনে হয়। কারণ স্ত্রীশিক্ষা ও-কাজ আরম্ভ করেছে বহুদিন। তবে আমাদের দেশের পুরুষেরাও যেমন উপযুক্ত নেতার অভাবে ইতস্ততঃ দোদুল্যমান, মেয়েরাও অনেকে তেমনি আজো কিংকর্ত্তব্য স্থির করে' উঠ্‌তে পারেন নি। নকল করা, বিশেষতঃ নিকৃষ্ট জিনিষ নকল করা সব চেয়ে সহজ বলে' প্রথমে আমরা, অর্থাৎ আমাদের পুরুষ অভিভাবকেরা যা কিছু বিলিতী তারই পুরাদস্তুর নকল করা এবং করানোকেই পরম পুরুষার্থ লাভের প্রকৃষ্ট উপায় মনে করেছিলেন আর আমরাও বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁদের অনুসরণ করেছিলুম। কিন্তু কিছু দূর এগিয়ে এখন দু' পক্ষেরই অগ্রগামী দলের মনে প্রশ্ন উঠ্‌ছে—কঃ পন্থা? য়ুরোপ তার কৃতিত্ব, প্রভুত্ব

ও ধনমদমত্ত মূর্ত্তি ধরে' অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক সোৎসাহে বল্‌ছে—"এগোও"; প্রাচীন ভারত তার লুপ্তগৌরব ও ত্যাগের দীপ্তিমণ্ডিত অস্পষ্ট রূপ ধরে' ক্ষীণ কণ্ঠে বল্‌ছে—"দাঁড়াও, ফিরে' চাও"। এই উভয় সঙ্কটে পড়ে' আমরা একবার কেম্ব্রিজে (বা গার্টনে ?) ছুটছি, একবার গুরুকুলে (বা বিশ্বভারতীতে ?) দৌড়চ্ছি। এ রকম অব্যবস্থিতচিত্ততা এ অবস্থায় স্বাভাবিক হ'লেও প্রগতির অনুকূল যে নয় তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আর বেশী দেরী না করে' আমাদের জনকতকের মতি স্থির পূর্ব্বক ভেবে চিন্তে ঠিক করে' নিতে হবে—কোথায় যেতে ও কি পেতে চাই। চাইলেই যে তখনি পাব, তা নয়; তবু গম্যস্থান ঠিক্ করতে পারলে পথ অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে, চলতে চলতেই তৈরী হ'য়ে উঠ্‌বে; আমাদের কালের কষ্টে-কাটা "পাকডাণ্ডি" পরবর্ত্তী কালের প্রশস্ত রাজপথে পরিণত হবে। আমাদের যেটুকু এগিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, আমাদের মেয়েদের যেন আমরা তার মায়া চেয়ে বেশী এগিয়ে দিয়ে যেতে পারি, এই লক্ষ্যই প্রত্যেক বঙ্গলক্ষ্মীর থাকা উচিত।

তবে এগোতে গেলে সময় সময় পিছোতে হয়। পণ্ডিতেরা বলেন, সভ্যতা সোজা পথে এগোয় না, সাপের মত বেঁকে-চুরে আগু-পাছু করতে করতে এগোয়। আমার মনে হয়, যেন এই মোড়ের মাথায় আমাদের একটু পিছবার সময় এসেছে। য়ুরোপের দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ (দুই দুই) টাটিয়ে গেছে; দেখা যাক্ না একটু নিজের দেশের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালের দিকে চেয়ে,—তবেই বুঝতে পারব "কি ছিল, কি হ'ল, কি হ'তে চলিল";—এবং সেই "হ'তে চলিল কে নিয়ন্ত্রিত করতে পারব। "কি ছিল' ভাল করে' জানতে হ'লে সংস্কৃত পড়া চাই—শুধু পরীক্ষার উদ্দেশ্যে রীত্ রক্ষা জানা নয়, রীতিমত পড়া। "কি হ'ল" ভাল করে' জানতে হলে ভাল করে' ইংরাজি পড়া চাই, শুধু কড়্‌কড়্ ক'রে ইংরাজি বলা বা দু'টো নভেল পড়া নয়। এবং "কি হ'তে চলিল" তা বুঝে' সাহায্য করতে হ'লে স্বদেশের সমাজ ও সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রাখা চাই, শুধু শ্যাওলার মত ভেসে বেড়ানো বা প্রজাপতির মত উড়ে' বেড়ানো নয়।

গৃহস্থালী ও লৌকিকতার শত কাজের মধ্যে সাধারণ শিক্ষিত মেয়ের পক্ষে এতগুলো সাধনা সহজ নয় তা মানি, কিন্তু বাজে কথা ও বাজে সময় নষ্ট না করলে অসাধ্য নয় বোধ হয়। ফলকথা, সেকালের ভালোর সঙ্গে একালের ভালো, স্বদেশের ভালোর সঙ্গে বিদেশের ভালোর ঘটকালি এ দেশের মেয়েদের করতেই হবে। "বলিতে সহজ বটে করিতে তা নয়" জানি—তবু চেষ্টা করতে হবে, হার মানলে চলবে না। চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। যে ধৈর্য্য, যে পরিশ্রম, যে সময় ও সেবা আমরা পরিবারকে অকাতরে দিই, তার শতাংশের একাংশও কি সমাজকে দিতে পারব না? যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। সেই কৌশলী হ'তে পারলে, তবে আবার হবে রাম, আবার হবে অযোধ্যা।

তরুণ সাহিত্য

শ্রীযুক্ত বলাইক নন্দী মাঘ মাসের "শনিবারের চিঠি"তে লিখিয়াছেন:—

আমি ইঁহাদের (তরুণদের) ভাষা বুঝি না তাহা স্পষ্টই স্বীকার করি। না বুঝিবার একটু কারণও আছে। 'তরুণ' সমালোচক বলিতেছেন, আধুনিকদের রচনা-ভঙ্গীর জন্য continental লেখকদের প্রভাব, বিশেষ ক'রে হামসুন ও গর্কীর প্রভাব দায়ী।" তাই বলুন। শুধু ইংরেজী ও বাংলা জানার ফলেই আমরা ইংরেজী লিখিতে গিয়া বাংলা লিখি, বাংলা লিখিতে গিয়া ইংরেজী লিখি। ইহার উপর যদি কাহারও আবার নরওয়েজিয়ান ও রুশভাষা জানা থাকে তবে তাঁহাদের ভাষা যে Esperantoর মত ভাষার তিলোত্তমা হইয়া উঠিবে তাহা আর বিচিত্র কি? আমি নরওয়েজিয়ান জানি না সুতরাং অতি আধুনিক ভাষার নরওয়েজিয়ান ভঙ্গী আমার চোখে ধরা পড়িবার নয়। একবার রুশভাষা শিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু 'প্রেডি-জেমনাভো মোরিয়া মালেঙ্কোয়ে ক্রোশেচ্‌নোয়ে টুনারসুটভো মানাখো"র বেশী অগ্রসর হইতে পারি নাই। এইটুকু বিদ্যার জোরে গোর্কীর প্রভাব যাচাই করা সম্ভবপর নয়। তাই আমি একটা সাংঘাতিক ভুল করিয়া বসিয়াছিলাম। অতি আধুনিকদের ভাষার মধ্যে "বুক্তি দিয়ে পোক্ত করা," "রোদনের দিনে বোধন," "কাদু ও কাবার," "ধন উচ্ছের তুচ্ছ পাতা," "কাম-বেদানার দানা", "পদ্মার জলে পদ্ম ভাসান," প্রভৃতি প্রয়োগ দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম ইঁহাদের ভাষার উপর দাশুরায়ের প্রভাব অত্যন্ত বেশী।

'অতি-আধুনিক'দিগকে উপদেশ দিতে যাইব এরূপ সাহস আমার নাই। তবে ইঁহারা নিজেই যখন গোর্কীকে ইষ্ট-দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন সেই জন্যই গোর্কীর গুরু চেখভের দুই একটা কথা তুলিয়া দিতে ভরসা পাইতেছি। চেখভ একবার গোর্কীকে লিখিয়াছিলেন—

"তোমার যতটুকু সংযম থাকা উচিত ততটুকু সংযম নাই। থিয়েটারে একশ্রেণীর দর্শক দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা বাহবা ও হাততালি দিবার উৎসাহে অভিনয় অপরকে শুনিতে দেয় না, নিজেও শুনে না। তুমি অনেকটা তাহাদের মত। তুমি কথাবার্ত্তার ফাঁকে ফাঁকে স্বাভাবিক দৃশ্যের যে সব বর্ণনা দাও, তাহাতেই বিশেষ করিয়া এই সংযমের অভাব দেখিতে পাই। তোমার বর্ণনা পড়িতে পড়িতে মনে হয় এইগুলি আরও একটু সংযত, আরও একটু সংক্ষিপ্ত হইলে ভাল

হইত। বারবার কঙ্কণ, নূপুরগুঞ্জন, পেলব, এই শব্দগুলি ব্যবহার করার জন্ত তোমার বর্ণনাগুলি কৃত্রিম ও একঘেয়ে বলিয়া মনে হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই পাঠকের মন অসাড় ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে।"

এতকথা বলিতে বলিতে আসল কথাটা বলিতেই ভুলিয়া গিয়াছি। ষ্টাইল কি? সাধারণ লোকের ধারণা ষ্টাইল ভাষার অলঙ্কার অথবা পোষাক। যে সমাজে মিশিতে যাইতেছি তাহার রুচি ও মর্য্যাদা অনুযায়ী পরিয়া নিলেই হইল। তাই কথা কহিবার গেঞ্জি-পরা ভাষা হইতে আরম্ভ করিয়া, সাধারণ প্রবন্ধের খদ্দরপরা ভাষা, গল্প ও উপন্যাসের ১১ নম্বর গ্লাসগোপরা ভাষা, কবিতার মুগার পাঞ্জাবী ও শাল পরা ভাষা, 'অতি-আধুনিক' সাহিত্যের আদ্দির ঘুন্টিদার পাঞ্জাবী ও লপেটা পরা, আতর মাখান, সুরমা আঁকা, ঘাড় ও কাণের উপরের চুলছাটা ভাষা পর্য্যন্ত একটা ক্রমোন্নতিশীল পর্য্যায় দেখিতে পাই। কিন্তু আসলে পোষাকে ও ভাষাতে একটা গুরুতর প্রভেদ আছে। ঘুন্টিদার পাঞ্জাবী পরা ব্যক্তিটির যখন ঘাড় ও কাণের উপর চুল গজায় তখন সে ইচ্ছা করিলে শাল দোশালা পরিয়া ভদ্রসমাজে যাইতে পারে। ঘুন্টিদার পাঞ্জাবী পরা ভাষার লেখক এই সুবিধাটুকু হইতে বঞ্চিত। তাহার মনই ঘুন্টিদার ফিন্‌ফিনে পাঞ্জাবী ও লপেটা-পরা, আতর-মাখানো, সুরমা আঁকা, ঘাড় ও কাণের উপরের চুলছাটা গাড়োয়ানি ছাঁদের হইয়া গিয়াছে।" সেই জন্যই বুফোঁ বলিয়াছেন, মানুষটা যা ষ্টাইলও তাই (le style c'est l'homme meme) আর ফ্লোবেয়ারও সেই কথাটা মানিয়া লইয়াছেন। এই কথাটির টীকা স্বরূপ রেমিঁ গুর্মোঁ ও আনাতোল ফ্রাঁসের দুইটী উক্তি তুলিয়া দিতেছি। "ষ্টাইল গলার স্বর অথবা চুলের রঙের মত জন্মগত ধর্ম। লিখিবার ক্ষমতা চেষ্টা করিয়া আয়ত্ত করা যায়, ষ্টাইল আয়ত্ত করা যায় না। ইচ্ছা করিয়া একটা ষ্টাইল ধরা চুলে কলপ লাগাইবার মত। রোজ স্নানের সময় উঠিয়া যাইবে আবার নূতন করিয়া লাগাইতে হইবে।" "ষ্টাইল একটা জন্মস্বত্ব। আমরা যেমন গলার স্বর লইয়া জন্মাই, তেমনি ষ্টাইলও লইয়াই জন্মাই। নবীন লেখকদের ষ্টাইল ভাল না হইবার প্রধান কারণ তাহারা সহজ, স্বাভাবিক সরল হইতে জানে না। sincerityর অভাব অলঙ্কার দিয়া ঢাকিতে চায়। কিন্তু শুধু গরম মশলা দিয়া রান্নার মত, শুধু অলঙ্কার দিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার প্রচেষ্টাও একান্তই নিষ্ফল।"

নানাকথা

এবারের 'বিচিত্রা'র 'শকুন্তলা' শীর্ষক চিত্রখানি যাঁহার অঙ্কিত তিনি তিনজন বাঙ্গালী A. R. C. A. র মধ্যে অন্যতম। ইহাই বিলাতের শিল্পবিদ্যার্থীদের উচ্চতম উপাধি। জয়পুর কলাভবনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায় বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম এই উপাধি লাভ করেন; তিনি মূর্ত্তিনির্ম্মাণে বিশেষজ্ঞ। শ্রীযুক্ত মুকুল দে দ্বিতীয়; Etchingএর সৌকুমার্য্যের জন্য ইনি বিলাতেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া এখন লক্ষ্ণৌ কলাভবনে শিক্ষকতার কার্য্যে ব্রতী আছেন।

* * * *

গতসংখ্যা 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত 'বাঁশীর ডাক' নামক নাটিকাখানি লেখক শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের তত্ত্বাবধানে লক্ষ্ণৌ স্থানীয় বাঙ্গালী বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে অভিনীত হইয়াছিল। বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়ে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন।

অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের "জমাখরচ" গল্পটি কলিকাতার ব্রড্‌কাষ্ট্‌ কোম্পানী 'বিচিত্রা'র কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুমোদনে বেতার যন্ত্রের সহযোগে চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়াছেন। বাঙ্গালী শ্রোতৃবৃন্দের নিকট গল্পটীর যথেষ্ট আদর হইয়াছে।

* * * *

অতীব দুঃখের বিষয় স্পেনের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ব্লাস্কো ইবানেস্ (Blasco Ibanez) সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। বাস্তব বর্ণনায় তাঁহার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ—এ বিষয়ে তিনি ফরাসী ঔপন্যাসিক জোলার (zola) শিষ্য ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বৎসর কয়েক পূর্ব্বে তিনি ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন। রাজনৈতিক অপরাধে তিনি মাতৃভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া ফ্রান্সেই বসবাস করিতেন। স্পেনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি প্রচুর অর্থব্যয় ও অন্যান্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন।

Printed at The Modern Art Press, 1/2, Durga Pituri Lane, Calcutta.
by Srijut Probodh Lal Mukherjee, and published by him from 51 Pataldanga Street, Calcutta.
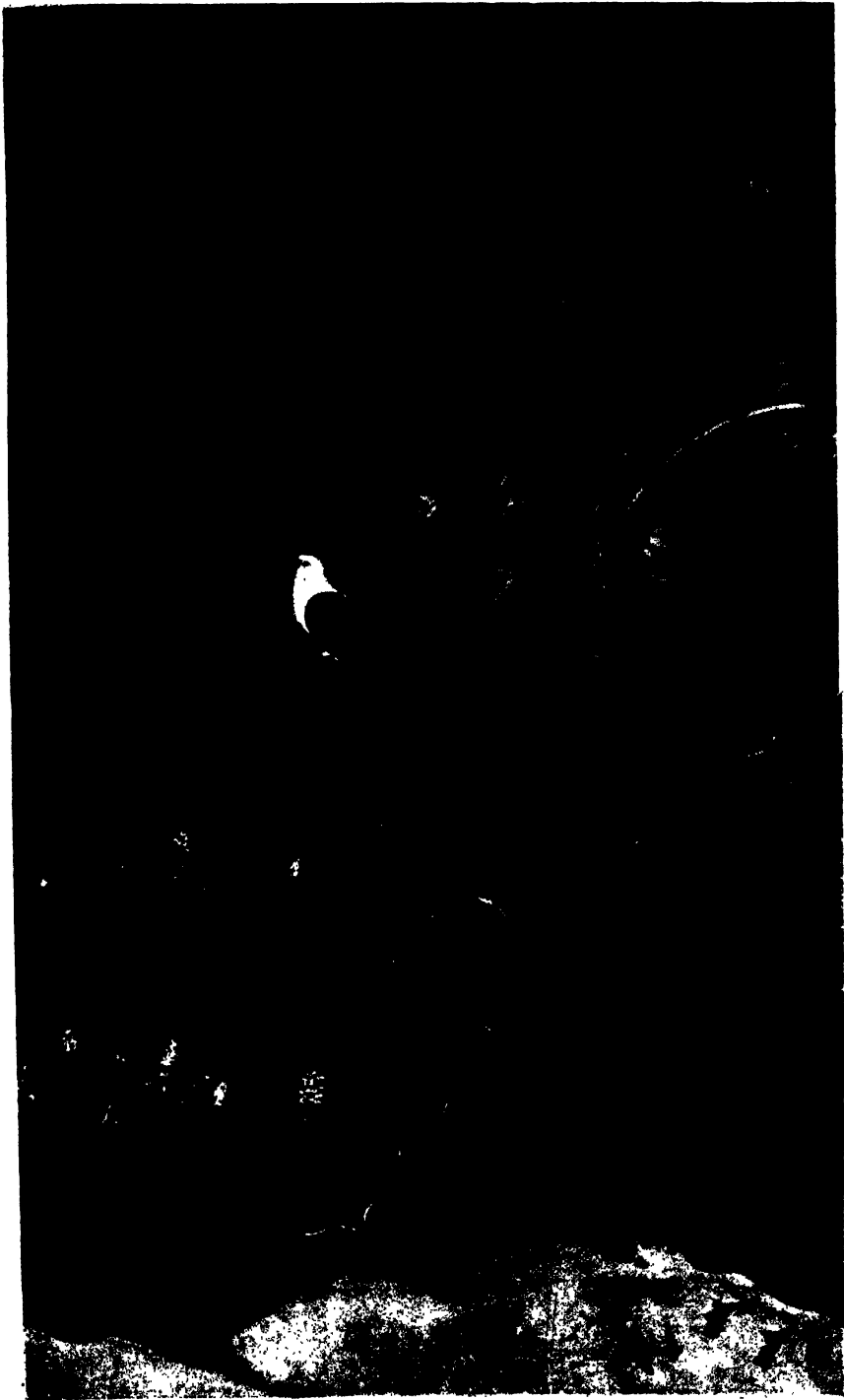
নিরালায়

চৈত্র, ১৩৩৪

শিল্পী—শ্রীপ্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম বর্ষ, ২য় খণ্ড | চৈত্র, ১৩৩৪ | চতুর্থ সংখ্যা

শাল

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাহিরে যখন ক্ষুব্ধ দক্ষিণের মদির পবন
অরণ্যে বিস্তারে অধীরতা ; যবে কিংশুকের বন
উচ্ছৃঙ্খল রক্তরাগে স্পর্দ্ধায় উদ্যত ; দিশিদিশি
শিমুল ছড়ায় ফাগ ; কোকিলের গান অহর্নিশি
জানেনা সংযম, যবে বকুল অজস্র সর্ব্বনাশে
স্খলিত দলিত বনপথে, তখন তোমার পাশে
আসি আমি হে তপস্বী শাল, যেথায় মহিমারাশি
পুঞ্জিত করেছ অভ্রভেদী, যেথা রয়েছ বিকাশি'
দিগন্তে গম্ভীর শান্তি। অন্তরের নিগূঢ় গভীরে
ফুল ফুটাবার ধ্যানে নিবিষ্ট রয়েছ ঊর্দ্ধশিরে ;
চৌদিকের চঞ্চলতা পশে না সেথায়। অন্ধকারে
নিঃশব্দ সৃষ্টির মন্ত্র নাড়ী বেয়ে শাখায় সঞ্চারে ;
সে অমৃত মন্ত্র-তেজ নিলে ধরি সূর্য্যালোক হ'তে
নিভৃত মর্ম্মের মাঝে ; স্নান করি আলোকের স্রোতে
শুনি নিলে নীল আকাশের শান্তিবাণী ; তার পরে
আত্মসমাহিত তুমি, স্তব্ধ তুমি,—বৎসরে বৎসরে

বিশ্বের প্রকাশ যজ্ঞে বারম্বার করিতেছ দান
নিপুণ সুন্দর তব কমণ্ডলু হ'তে অফুরান
পুণ্যগন্ধী প্রাণধারা ; সে ধারা চলেছে ধীরে ধীরে
দিগন্তে শ্যামল উর্ম্মি উচ্ছ্বাসিয়া, দূর শতাব্দীরে
শুনাতে মর্ম্মর আশীর্ব্বাণী। রাজার সাম্রাজ্য কতশত
কালের বন্যায় ভাসে, ফেটে যায় বুদ্বুদের মতো,
মানুষের ইতিবৃত্ত সুদুর্গম গৌরবের পথে
কিছুদূর ধায়, আর বারম্বার ভগ্নচূর্ণ রথে
কীর্ণ করে ধূলি। তারি মাঝে উদার তোমার স্থিতি,
ওগো মহা শাল, তুমি সুবিশাল কালের অতিথি ;
আকাশেরে দাও সঙ্গ বর্ণরঙ্গে শাখার ভঙ্গীতে,
বাতাসেরে দাও মৈত্রী পল্লবের মর্ম্মর সঙ্গীতে,
মঞ্জরীর গন্ধের গণ্ডূষে। যুগে যুগে কত কাল
পথিক এসেছে তব ছায়াতলে, বসেছে রাখাল,
শাখায় বেঁধেছে নীড় পাখী ; যায় তারা পথ বাহি'
আসন্ন বিস্মৃতি পানে, উদাসীন তুমি আছো চাহি'।
নিত্যের মালার সূত্রে অনিত্যের যত অক্ষগুটি
অস্তিত্বের আবর্ত্তনে দ্রুতবেগে চলে তা'রা ছুটি' ;
মর্ত্ত্যপ্রাণ তাহাদের ক্ষণেক পরশ করে যেই
পায় তা'রা রূপ-নাম, তার পরে আর তা'রা নেই,
নেমে যায় অসংখ্যের তলে। সেই চ'লে-যাওয়া দল
রেখে দিয়ে গেছে যেন ক্ষণিকের কলকোলাহল
দক্ষিণ হাওয়ায় কাঁপা ওই তব পত্রের কল্লোলে,
শাখার দোলায়। ওই ধ্বনি স্মরণে জাগায়ে তোলে
কিশোর বন্ধুরে মোর। কতদিন এই পাতা ঝরা
বীথিকায়, পুষ্পগন্ধে বসন্তের আগমনী-ভরা
সায়াহ্নে দুজনে মোরা ছায়াতে অঙ্কিত চন্দ্রালোকে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফিরেছি গুঞ্জিত আলাপনে। তার সেই মুগ্ধ চোখে
বিশ্ব দেখা দিয়েছিল নন্দন-মন্দার রঙে রাঙা ;
যৌবন-তুফান লাগা সেদিনের কত নিদ্রা-ভাঙা
জ্যোৎস্নামুগ্ধ রজনীর সৌহার্দ্দ্যের সুধারসধারা
তোমার ছায়ার মাঝে দেখা দিল, হয়ে গেল সারা।
গভীর আনন্দক্ষণ কতদিন তব মঞ্জরীতে
একান্ত মিশিয়াছিল একখানি অখণ্ড সঙ্গীতে
আলোকে আলাপে হাস্যে, বনের চঞ্চল আন্দোলনে,
বাতাসের উদাস নিঃশ্বাসে।

প্রীতিমিলনের ক্ষণে

সেদিনের প্রিয় সে কোথায়, বর্ণে বর্ণে দোলা দিত
যাহার প্রাণের বেগ উৎসব করিয়া তরঙ্গিত।
তোমার বীথিকাতলে তার মুক্ত জীবন প্রবাহ
আনন্দ-চঞ্চল গতি মিলায়েছে আপন উৎসাহ
পুষ্পিত উৎসাহে তব। হায়, আজি তব পত্র-দোলে
সে দিনের স্পর্শ নাই। তাই এই বসন্ত-কল্লোলে,
পূর্ণিমার পূর্ণতায়, দেবতার অমৃতের দানে
মর্ত্ত্যের বেদনা মেশে।

চাহি আজ দূর পানে

স্বপ্নচ্ছবি চোখে ভাসে, আর কোন ফাল্গুনের রাতে
দোল-পূর্ণিমায়, সাজাতে আসিছে কা'রা পদ্মপাতে
পলাশ বকুল চাঁপা, আলিম্পন-লেখা এঁকে দিতে
তব ছায়া-বেদিকায়, বসন্তের আবাহন গীতে

প্রসন্ন করিতে তব পুষ্প-বরিষণ। সে উৎসবে
আজিকার এই দিন পথপ্রান্তে লুণ্ঠিত নীরবে।
কোলে তার প'ড়ে আছে এরাত্রির উৎসবের ডালা।
আজিকার অর্ঘ্যে আছে যতগুলি সুরে-গাঁথা মালা,
কিছু তার শুকায়েছে, কিছু তার আছে অমলিন ;
দুয়েকটি তুলে নিল যাত্রীদল ; সে-দিন এ-দিন
দোঁহে দোঁহা মুখ চেয়ে বদল করিয়া নিলো মালা,—
নূতনে ও পুরাতনে পূর্ণ হোলো বসন্তের পালা ॥

৭ ফাল্গুন, ১৩৩৮।

—উপন্যাস—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২
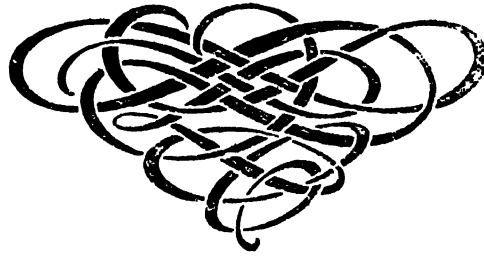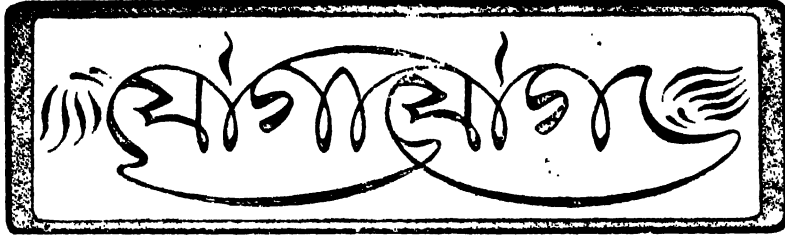
সিঁড়ির তলা থেকে মধুসূদন ফিরল, বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করতে লাগল। একটা কোন্ রুদ্ধ ঘরের সামনে কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছিল। সেইটে তুলে নিয়ে চুপি চুপি তেলবাতির কুঠরির বাইরে এসে দাঁড়ালো। আস্তে আস্তে দরজা ঠেলতে গিয়ে দেখ্‌লে দরজা ভেজানো; দরজা খুলে গেলো। সেই মাছুরের উপর গায়ে একখানা চাদর দিয়ে কুমু গভীর ঘুমে মগ্ন—বাঁ হাতখানি বুকের উপর তোলা। দেয়ালের কোণে লণ্ঠন রেখে মধুসূদন কুমুর মুখের দিকে মুখ ক'রে বাঁ-পাশে এসে বস্‌ল। এই মুখটি যে মনকে এমন প্রবল শক্তিতে টানে তার কারণ মুখের মধ্যে তার একটি অনির্ব্বচনীয় সম্পূর্ণতা। কুমুর আপনার মধ্যে আপনার কোনো দিন বিরোধ ঘটেনি। দাদার সংসারে অভাবের দুঃখে সে পীড়িত হয়েচে কিন্তু সেটা বাহ্য অবস্থাঘটিত ব্যাপারে, সেটাতে তার প্রকৃতিকে আঘাত করেনি। যে সংসারে সে ছিল সে সংসার তার স্বভাবের পক্ষে সব দিকেই অনুকূল। এই জন্যেই তার মুখভাবে এমন একটি অনবচ্ছিন্ন সরলতা, তার চলাফেরায় তার ব্যবহারে এমন একটা অক্ষুণ্ণ মর্য্যাদা। যে মধুসূদনকে জীবনের সাধনায় কেবল প্রাণপণ লড়াই করতে হয়েচে, প্রতিদিন উদ্যত সংশয় নিয়ে নিরন্তর যাকে সতর্ক থাক্‌তে হয়, তার কাছে কুমুর এই সর্ব্বাঙ্গীণ সুপরিণতির অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য পরম বিস্ময়ের বিষয়। সে নিজে একটুও সহজ নয়, আর কুমু যেন একেবারে দেবতার মতো সহজ। তার সঙ্গে কুমুর এই বৈপরীত্যই তাকে এমন প্রবল বেগে টান্‌চে। বিয়ের পরে বধূ শ্বশুর বাড়িতে প্রথম আসবামাত্রই যে কাণ্ডটি ঘটল তার সমস্ত ছবিটি যখন সে মনের মধ্যে দেখে তখন দেখতে পায় তার নিজের দিকে ব্যর্থ প্রভুত্বের ক্রুদ্ধ অক্ষমতা, অন্যদিকে বধূর মনের মধ্যে অনমনীয় আত্মমর্য্যাদার সহজ প্রকাশ। সাধারণ মেয়েদের মতো তার ব্যবহারে কোথাও কিছুমাত্র অশোভন প্রগল্‌ভতা দেখা গেল না। এ যদি না হোতো তাহলে তাকে অপমান করবার যে স্বামিত্ব তা'র আছে সেই অধিকার খাটাতে মধুসূদন লেশমাত্র দ্বিধা করত না। কিন্তু কি যে হোলো তা সে নিজে বুঝতেই পারে না; কি একটা অদ্ভুত কারণে কুমুকে সে আপনার ধরাছোঁয়ার মধ্যে পেলে না।

মধুসূদন মনে স্থির করলে, কুমুকে না জাগিয়ে সমস্ত রাত্রি ওর পাশে এমনি ক'রে জেগে ব'সে থাক্‌বে। কিছুক্ষণ ব'সে থেকে থেকে আর কিছুতেই থাক্‌তে পারল না,—আস্তে আস্তে কুমুর বুকের উপর থেকে তার হাতটি নিজের হাতের উপর তুলে নিলে। কুমু ঘুমের ঘোরে উস্‌খুস্ ক'রে হাতটা টেনে নিয়ে মধুসূদনের উল্‌টো দিকে পাশ ফিরে শুলো।

মধুসূদন আর থাক্‌তে পারলে না, কুমুর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বল্‌লে, "বড়ো বউ, তোমার দাদার টেলিগ্রাম এসেচে।"

অমনি ঘুম ভেঙে কুমু দ্রুত উঠে বসল, বিস্মিত চোখ মেলে মধুসূদনের মুখের দিকে অবাক হয়ে রইল চেয়ে। মধুসূদন টেলিগ্রামটা সামনে ধ'রে বল্‌লে, "তোমার দাদার কাছ থেকে এসেচে।" ব'লে ঘরের কোণ থেকে লণ্ঠনটা কাছে নিয়ে এলো।

কুমু টেলিগ্রামটা প'ড়ে দেখলে, তাতে ইংরেজিতে লেখা আছে, "আমার জন্তে উদ্বিগ্ন হোয়োনা; ক্রমশঃই সেরে উঠ্‌চি; তোমাকে আমার আশীর্ব্বাদ।" কঠিন উদ্বেগের নিরতিশয় পীড়নের মধ্যে এই সান্ত্বনার কথা প'ড়ে এক মুহূর্ত্তে কুমুর চোখ ছল্ ছল্ ক'রে উঠ্‌ল। চোখ মুছে টেলিগ্রামখানি যত্ন ক'রে আঁচলের প্রান্তে বাঁধলে। সেইটেতে মধুসূদনের হৃৎপিণ্ডে যেন মোচড় লাগালো। তার পরে কি যে বলবে কিছুই ভেবে পায় না। কুমুই ব'লে উঠ্‌ল, "দাদার কি চিঠি আসেনি ?"

এর পরে কিছুতেই মধুসূদন বল্‌তে পারলে না যে চিঠি এসেচে। ধাঁ ক'রে ব'লে ফেল্‌লে, "না, চিঠি তো নেই।"

এই ঘরটার মধ্যে রাত্রে দুজনে এমন ক'রে ব'সে থাক্‌তে কুমুর সঙ্কোচ বোধ হোলো। সে যখন উঠ্‌ব-উঠ্‌ব করচে, মধুসূদন হঠাৎ ব'লে উঠ্‌ল, "বড়ো বৌ, আমার উপর রাগ কোরোনা।"

এ তো প্রভুর উপরোধ নয়, এ যে প্রণয়ীর মিনতি, আর তার মধ্যে যেন আছে অপরাধীর আত্মগ্লানি। কুমু বিস্মিত হয়ে গেলো, তার মনে হোলো এ দৈবেরি লীলা। কেন না, সে যে দিনের বেলা বারবার নিজেকে বলেচে, "তুই রাগ করিসনে।" সেই কথাটাই আজ অর্দ্ধরাত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে কে মধুসূদনকে দিয়ে বলিয়ে নিলে।

মধুসূদন আবার তাকে বল্‌লে, "তুমি কি এখনো আমার উপরে রাগ ক'রে আছ ?"

কুমু বল্‌লে, "না, আমার রাগ নেই, একটুও না।"

মধুসূদন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। ও যেন মনে মনে কথা কইচে; অনুদ্দিষ্ট কারো সঙ্গে যেন ওর কথা।

মধুসূদন বল্‌লে, "তা হ'লে এঘর থেকে এসো তোমার আপন ঘরে।"

কুমু আজ রাত্রে প্রস্তুত ছিল না। ঘুমের থেকে জেগে উঠেই হঠাৎ মনকে বেঁধে তোলা কঠিন। কাল সকালে স্নান ক'রে দেবতার কাছে তার প্রতিদিনের প্রার্থনা-মন্ত্র প'ড়ে তবে কাল থেকে সংসারে তার সাধনা আরম্ভ হবে এই সঙ্কল্প সে করেছিল। তখন ওর মনে হোলো, ঠাকুর আমাকে সময় দিলেন না, আজ এই গভীর রাত্রেই ডাক দিলেন! তাঁকে কেমন ক'রে বলব যে, "না।" মনের ভিতরে যে একটা প্রকাণ্ড অনিচ্ছা হচ্ছিল তাকে অপরাধ ব'লে কুমু ভয় পেলে। এই অনিচ্ছার বাধা তাকে টেনে রাখছিল ব'লেই কুমু জোরের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালে, বল্‌লে, "চলো।"

উপরে উঠে তার শোবার ঘরের সামনে একটু থম্‌কে দাঁড়িয়ে সে বল্‌লে, "আমি এখনি আস্‌চি, দেরি করব না।"

ব'লে ছাদের কোণে গিয়ে ব'সে পড়ল। কৃষ্ণপক্ষের খণ্ড চাঁদ তখন মধ্য আকাশে।

নিজের মনে মনে কুমু বার বার ক'রে বল্‌তে লাগ্‌ল, "প্রভু তুমি ডেকেচ আমাকে, তুমি ডেকেচো। আমাকে ভোলোনি বলেই ডেকেচ। আমাকে কাঁটাপথের উপর দিয়েই নিয়ে যাবে,—সে তুমিই, সে তুমিই, সে আর কেউ নয়।"

আর-সমস্তকেই কুমু লুপ্ত ক'রে দিতে চায়। আর-সমস্তই মায়া, আর-সমস্তই যদি কাঁটাও হয় তবু সে পথেরি কাঁটা, আর সে তাঁরই পথের কাঁটা। সঙ্গে পাথেয় আছে, তার দাদার আশীর্ব্বাদ। সেই আশীর্ব্বাদ সে যে আঁচলে বেঁধে নিয়েচে। সেই আঁচলে-বাঁধা আশীর্ব্বাদ বার বার মাথায় ঠেকালে। তার পরে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করলে। এমন সময় হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌ল, পিছন থেকে মধুসূদন ব'লে উঠ্‌ল,—"বড়ো বৌ, ঠাণ্ডা লাগ্‌বে, ঘরে এসো।" অন্তরের মধ্যে কুমু যে বাণী শুন্‌তে চায় তা'র সঙ্গে এ কণ্ঠের সুর তো মেলে না। এই তো তার পরীক্ষা, ঠাকুর আজ তাকে বাঁশী দিয়েও ডাক্‌বেন না। তিনি রইবেন আজ ছদ্মবেশে।

৩৩

যেখানে কুমু ব্যক্তিগত মানুষ সেখানে যতই তার মন ধিক্কারে ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় ভ'রে উঠচে, যতই তার সংসার সেখানে আপন গায়ের জোরের রূঢ় অধিকারে তাকে অপমানিত করচে ততই সে আপনার চারিদিকে একটা আবরণ তৈরি করচে। এমন একটা আবরণ যাতে ক'রে নিজের কাছে তার ভালোলাগা মন্দলাগার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সত্যতাকে লুপ্ত করে, অর্থাৎ নিজের সম্বন্ধে নিজের চৈতন্যকে কমিয়ে দেয়। এ হচ্চে ক্লোরোফরমের বিধান। কিন্তু এ তো দুতিন ঘণ্টার ব্যবস্থা নয়, সমস্ত দিন-রাত্তির বেদনা-বোধকে বিতৃষ্ণা-বোধকে তাড়িয়ে রাখ্‌তে হবে। এই অবস্থায় মেয়েরা যদি কোনোমতে একজন গুরুকে পায় তবে তার আত্মবিস্মৃতির চিকিৎসা সহজ হয়; সে তো সম্ভব হোলো না। তাই মনে মনে পূজার মন্ত্রকে নিয়তই বাজিয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা করলে। তার এই দিন রাত্রির মন্ত্রটি ছিল:—

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বাম্ অহমীশমীড্যং
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্।

হে আমার পূজনীয়, তোমার কাছে আমার সমস্ত শরীর প্রণত ক'রে এই প্রসাদটি চাই যে, পিতা যেমন ক'রে পুত্রকে, সখা যেমন ক'রে সখাকে, প্রিয় যেমন ক'রে প্রিয়াকে সহ্য করতে পারেন, হে দেব, তুমিও যেন আমাকে তেমনি ক'রে সইতে পারো। তুমি যে তোমার ভালবাসায় আমাকে সহ্য করতে পারো তার প্রমাণ এ ছাড়া আর কিছু নয় যে, তোমার ভালোবাসায় আমিও সমস্ত ক্ষমা করতে পারি। কুমু চোখ বুজে মনে মনে তাঁকে ডেকে বলে, "তুমি ত বলেচ, যে মানুষ আমাকে সব জায়গায় দেখে, আমার মধ্যে সমস্তকে দেখে সেও আমাকে ত্যাগ করে না, আমিও তাকে ত্যাগ করিনে। এই সাধনায় আমার যেন একটুও শৈথিল্য না হয়।"

আজ সকালে স্নান ক'রে চন্দন-গোলা জল দিয়ে তার শরীরকে অনেকক্ষণ ধ'রে অভিষিক্ত ক'রে নিলে। দেহকে নির্ম্মল ক'রে সুগন্ধি ক'রে সে তাঁকে উৎসর্গ ক'রে দিলে—মনে মনে একাগ্রতার সঙ্গে ধ্যান করতে লাগ্‌ল যে, নিমিষে নিমিষে তার হাতে তাঁর হাত আছে, তার সমস্ত শরীরে তাঁর সর্ব্বব্যাপী স্পর্শ অবিরাম বিরাজমান। এ দেহকে সত্যরূপে সম্পূর্ণরূপে তিনিই পেয়েছেন, তাঁর পাওয়ার বাইরে যে শরীরটা সে তো মিথ্যা, সে তো মায়া, সে তো মাটি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাটিতে মিশিয়ে যাবে। যতক্ষণ তাঁর স্পর্শকে অনুভব করি ততক্ষণ এ দেহ কিছুতেই অপবিত্র হ'তে পারে না। এই কথা মনে করতে করতে আনন্দে তার চোখের পাতা ভিজে এল—তার দেহটা যেন মুক্তি পেলে মাংসের স্থূল বন্ধন থেকে। পুণ্য-সম্মিলনের নিত্য-ক্ষেত্র ব'লে আপন দেহের উপর তার যেন ভক্তি এল। যদি কুন্দফুলের মালা হাতের কাছে পেত তা'হলে এখনি আজ সে পরত গলায়, বাঁধত কবরীতে। স্নান ক'রে পরল সে একটি শুভ্র সাড়ি, খুব মোটা লাল পাড়-দেওয়া। ছাদে যখন বস্‌ল তখন মনে হোলো সূর্য্যের আলো হ'য়ে আকাশপূর্ণ একটি পরম স্পর্শ তার দেহকে অভিনন্দিত করলে।

মোতির মার কাছে এসে কুমু বল্‌লে, "আমাকে তোমার কাজে লাগিয়ে দাও।"

মোতির মা হেসে বল্‌লে, "এসো তবে তরকারী কুট্‌বে।"

মস্ত মস্ত বারকোষ, বড় বড় পিতলের থোরা, ঝুড়ি ঝুড়ি শাক সব্‌জি, দশ পনেরোটা বঁটি পাতা,—আত্মীয়া আশ্রিতারা গল্প করতে করতে দ্রুত হাত চালিয়ে যাচ্চে, ক্ষত বিক্ষত খণ্ড বিখণ্ডিত তরকারীগুলো স্তূপাকার হ'য়ে উঠ্‌চে। তারি মধ্যে কুমু এক জায়গায় ব'সে গেল। সাম্‌নে গরাদের ভিতর দিয়ে দেখা যায় পাশের বস্‌তির একটা বৃদ্ধ তেঁতুল গাছ তার চিরচঞ্চল পাতাগুলো দিয়ে সূর্য্যের আলো চূর্ণ চূর্ণ ক'রে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্চে।

মোতির মা মাঝে মাঝে কুমুর মুখের দিকে চেয়ে দেখে আর ভাবে, ও কি কাজ করচে, না, ওর আঙুলের গতি আশ্রয় ক'রে ওর মন চ'লে যাচ্চে কোন এক তীর্থের পথে? ওকে দেখে মনে হয় যেন পালের নৌকো, আকাশে-তোলা পালটাতে হাওয়া এসে লাগ্‌চে, নৌকোটা যেন সেই স্পর্শেই ভোর, আর তার খোলের দুধারে যে জল কেটে কেটে পড়চে, সেটা যেন খেয়ালের মধ্যেই নেই। ঘরে অন্য যারা কাজ করচে তারা যে কুমুর সঙ্গে গল্প গুজব করবে এমন যেন একটা সহজ রাস্তা পাচ্চে না। শ্যামাসুন্দরী একবার বল্‌লে "বৌ, সকালেই যদি স্নান কর, গরম জল ব'লে দাও না কেন। ঠাণ্ডা লাগবে না তো?"

কুমু বল্‌লে, "আমার অভ্যেস আছে।"

আলাপ আর এগোলো না। কুমুর মনের মধ্যে তখন একটা নীরব জপের ধারা চলচে :—

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্।

তরকারী কোটা ভাঁড়ার দেওয়ার কাজ শেষ হ'য়ে গেল, মেয়েরা স্নানের জন্যে অন্দরের উঠোনে কলতলায় গিয়ে কলরব তুললে।

মোতির মাকে একলা পেয়ে কুমু বললে, "দাদার কাছ থেকে টেলিগ্রামের জবাব পেয়েচি।"

মোতির মা কিছু আশ্চর্য্য হ'য়ে বললে "কখন পেলে?"

কুমু বললে, "কাল রাত্তিরে।"

"রাত্তিরে!"

"হাঁ, অনেক রাত। তখন উনি নিজে এসে আমার হাতে দিলেন।"

মোতির মা বললে, "তা হ'লে চিঠিখানাও নিশ্চয় পেয়েচ।"

"কোন্ চিঠি?"

"তোমার দাদার চিঠি।"

ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠল, "না, আমি তো পাইনি! দাদার চিঠি এসেচে নাকি?"

মোতির মা চুপ ক'রে রইল।

কুমু তার হাত চেপে ধ'রে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বললে, "কোথায় দাদার চিঠি, আমাকে এনে দাও না।"

মোতির মা চুপি চুপি বললে "সে চিঠি আনতে পারব না, সে বড়োঠাকুরের বাইরের ঘরের দেরাজে আছে।"

"আমার চিঠি আমাকে কেন এনে দিতে পারবে না?"

"তাঁর দেরাজ খুলেচি জানতে পারলে প্রলয় কাণ্ড হবে।"

কুমু অস্থির হ'য়ে বললে, "দাদার চিঠি তাহলে আমি পড়তে পাব না?"

"বড়ঠাকুর যখন আপিসে যাবেন তখন সে চিঠি প'ড়ে আবার দেরাজে রেখে দিয়ো।"

রাগ তো ঠেকিয়ে রাখা যায় না। মনটা গরম হ'য়ে উঠল। বললে, "নিজের চিঠিও কি চুরি ক'রে পড়তে হবে?"

"কোন্‌টা নিজের কোন্‌টা নিজের নয়, সে বিচার এ বাড়ীর কর্ত্তা ক'রে দেন।"

কুমু তার পণ ভুলতে যাচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ মনের ভিতরটা তর্জ্জনী তুলে ব'লে উঠল, "রাগ কোরো না।" ক্ষণকালের জন্যে কুমু চোখ বুজলে। নিঃশব্দ বাক্যে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল, "প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম।"

কুমু বললে, "আমার চিঠি কেউ যদি চুরি করেন করুন, আমি তাই ব'লে চুরি ক'রে চুরির শোধ দিতে চাইনে।"

ব'লেই কুমুর তখনি মনে হ'ল কথাটা কঠিন হয়েচে; বুঝতে পারলে, ভিতরে যে রাগ আছে নিজের অগোচরে সে আপনাকে প্রকাশ করে। তাকে উন্মূলিত করতে হবে। তার সঙ্গে লড়াই করতে চাইলে সব সময় তো তার নাগাল পাওয়া যায় না। গুহার মধ্যে সে দুর্গ তৈরি ক'রে থাকে বাইরে থেকে সেখানে প্রবেশের পথ কই? তাই এমন একটি প্রেমের বন্যা নামিয়ে আনা চাই যাতে রুদ্ধকে মুক্ত ক'রে বদ্ধকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মনকে ভুলিয়ে দেবার ওর একটি উপায় হাতে ছিল, সে হচ্ছে সঙ্গীত। কিন্তু এ বাড়ীতে এসরাজ বাজাতে ওর লজ্জা করে। সঙ্গে এসরাজ আনেও নি। কুমু গান গাইতে পারে, কিন্তু কুমুর গলায় তেমন জোর নেই। গানের ধারায় আকাশ ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছা করল, অভিমানের গান। যে গানে ও বলতে পারে, "আমি তো তোমারি ডাকে এসেছি. তবে তুমি কেন লুকোলে? আমি তো নিমেষের জন্যে দ্বিধা করিনি। তবে আজ আমাকে কেন এমন সংশয়ের মধ্যে ফেললে?" এই সব কথা খুব গলা ছেড়ে গান গেয়ে ওর বলতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, তাহলেই যেন সুরে এর উত্তর পাবে।

৩৪

কুমুর পালাবার একটিমাত্র জায়গা আছে, এ বাড়ির ছাদ। সেইখানে চ'লে গেল। বেলা হয়েচে, প্রখর রৌদ্রে ছাদ ভ'রে গেছে, কেবল প্রাচীরের গায়ে একজায়গায় একটুখানি ছায়া। সেইখানে গিয়ে বসল। একটি গান মনে পড়ল, তার সুরটি আসাবরী। সে গানের আরম্ভটি হচ্চে "বাঁশরী হমারি রে"—কিন্তু বাকিটুকু ওস্তাদের মুখে মুখে বিকৃত বাণী—তার মানে বুঝতে পারা যায় না। কুমু ঐ অসম্পূর্ণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অংশ আপন ইচ্ছামতো নূতন নূতন তান দিয়ে ভরিয়ে পাল্‌টে পাল্‌টে গাইতে লাগল। ঐ একটুখানি কথা অর্থে ভ'রে উঠ্‌ল। ঐ বাক্যটি যেন বলচে, "ও আমার বাঁশি, তোমাতে সুর ভ'রে উঠ্‌চে না কেন? অন্ধকার পেরিয়ে পৌঁচচ্চে না কেন যেখানে দুয়ার রুদ্ধ, যেখানে ঘুম ভাঙলো না?" "বাঁশরী হমারি রে, বাঁশরী হমারি রে!"

মোতির মা যখন এসে বল্‌লে, "চলো ভাই খেতে যাবে" তখন সেই ছাদের কোণের একটুখানি ছায়া গেছে লুপ্ত হ'য়ে, কিন্তু তখন ওর মন সুরে ভরপুর, সংসারে কে ওর পরে কি অন্যায় করেচে সে সমস্ত তুচ্ছ হ'য়ে গেচে। ওর চিঠি নিয়ে মধুসূদনের যে ক্ষুদ্রতা, যে ক্ষুদ্রতায় ওর মনে তীব্র অবজ্ঞা উদ্যত হ'য়ে উঠেছিল সে যেন এই রোদ-ভরা আকাশে একটা পতঙ্গের মতো কোথায় বিলীন হয়ে গেল, তার ক্রুদ্ধ গুঞ্জন মিলিয়ে গেল অসীম আকাশে। কিন্তু চিঠির মধ্যে দাদার যে স্নেহ-বাক্য আছে সেটুকু পাবার জন্যে তার মনের আগ্রহ তো যায় না।

ঐ ব্যগ্রতাটা তার মনে লেগে রইল। খাওয়া হ'য়ে গেলে আর সে থাকৃতে পারলে না। মোতির মাকে বল্‌লে, "আমি যাই বাইরের ঘরে, চিঠি প'ড়ে আসি।"

মোতির মা বল্‌লে, "আর একটু দেরি হোক, চাকররা সবাই যখন ছুটি নিয়ে খেতে যাবে, তখন যেয়ো।"

কুমু বল্‌লে, "না, না, সে বড়ো চুরি ক'রে যাওয়ার মতো হবে। আমি সকলের সাম্‌নে দিয়ে যেতে চাই, তাতে যে যা মনে করে করুক্‌।"

মোতির মা বল্‌লে, "তাহলে চলো আমিও সঙ্গে যাই।"

কুমু ব'লে উঠ্‌ল, "না সে কিছুতেই হবে না। তুমি কেবল ব'লে দাও কোন্‌ দিক দিয়ে যেতে হবে।"

মোতির মা অন্তঃপুরের ঝরকা-দেওয়া বারান্দা দিয়ে ঘরটা দেখিয়ে দিলে। কুমু বেরিয়ে এলো। ভৃত্যেরা সচকিত হ'য়ে উঠে তাকে প্রণাম করলে। কুমু ঘরে ঢুকে ডেস্কের দেরাজ খুলে দেখলে তার চিঠি। তুলে নিয়ে দেখলে লেফাফা খোলা। বুকের ভিতরটা ফুলে উঠতে লাগ্‌ল, একেবারে অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ল। যে বাড়িতে কুমু মানুষ হয়েচে সেখানে এরকম অবমাননা কোনোমতেই কল্পনা পর্য্যন্ত করা যেত না। নিজের আবেগের এই তীব্র প্রবলতাতেই তাকে ধাক্কা মেরে সচেতন ক'রে তুল্‌লে। সে ব'লে উঠ্‌ল—"প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্‌"—তবু তুফান থামে না—তাই বারবার বল্‌লে। বাইরে যে আরদালি ছিল, আপিস ঘরে তাদের বৌ-রাণীর এই আপন মনে মন্ত্র আবৃত্তি শুনে সে অবাক হ'য়ে গেল। অনেকক্ষণ বল্‌তে বল্‌তে কুমুর মন শান্ত হ'য়ে এল। তখন চিঠিখানি সাম্‌নে রেখে চৌকিতে ব'সে হাত জোড় ক'রে স্থির হ'য়ে রইল। চিঠি সে চুরি ক'রে পড়বে না এই তার পণ।

এমন সময়ে মধুসূদন ঘরে ঢুকেই চমকে উঠে দাঁড়াল— কুমু তার দিকে চাইলেও না। কাছে এসে দেখলে, ডেস্কের উপর সেই চিঠি। জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি এখানে যে!"

কুমু নীরবে শান্ত দৃষ্টিতে মধুসূদনের মুখের দিকে চাইলে। তার মধ্যে নালিশ ছিল না। মধুসূদন আবার জিজ্ঞাসা করলে, "এ ঘরে তুমি কেন?"

এই বাহুল্য প্রশ্নে কুমু অধৈর্য্যের স্বরেই বল্‌লে, "আমার নামে দাদার চিঠি এসেছে কিনা তাই দেখতে এসেছিলেম!"

সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন, এমনতর প্রশ্নের রাস্তা কাল রাত্তিরে মধুসূদন আপনি বন্ধ ক'রে দিয়েচে। তাই বল্‌লে, "এ-চিঠি আমিই তোমার কাছে নিয়ে যাচ্ছিলুম, সে জন্যে তোমার এখানে আসবার তো দরকার ছিল না।"

কুমু একটুখানি চুপ ক'রে রইল, মনকে শান্ত ক'রে তারপরে বল্‌লে, "এ চিঠি তুমি আমাকে পড়তে দিতে ইচ্ছে করনি, সেই জন্যে এ চিঠি আমি পড়ব না। এই আমি ছিঁড়ে ফেল্‌লুম। কিন্তু এমন কষ্ট আমাকে আর কখনো দিয়ো না। এর চেয়ে কষ্ট আমার আর কিছু হ'তে পারে না।"

এই ব'লে সে মুখে কাপড় দিয়ে ছুটে বেরিয়ে চ'লে গেল।

ইতিপূর্ব্বে আজ মধ্যাহ্নে আহারের পর মধুসূদনের মনটা আলোড়িত হয়ে উঠছিল। আন্দোলন কিছুতে থামাতে পারছিল না। কুমুর খাওয়া হ'লেই তাকে ডাকিয়ে পাঠাবে ব'লে ঠিক ক'রে রেখেছে। আজ সে মাথার চুল আঁচড়ানো সম্বন্ধে একটু বিশেষ যত্ন নিলে। আজ সকালেই একটি ইংরেজ নাপিতের দোকান থেকে স্পিরিট-মেশানো সুগন্ধি

কেশতৈল ও দামী এসেন্স কিনিয়ে আনিয়েছিল। জীবনে এই প্রথম সেগুলি সে ব্যবহার করেচে। সুগন্ধি ও সুসজ্জিত হ'য়ে সে প্রস্তুত ছিল। আপিসের সময় আজ অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেতেই মধুসূদন চমকে উঠে বসল। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে একখানা পুরোনো খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের পাতাটা নিয়ে এমন ভাবে সেটাকে দেখতে লাগ্‌ল যেন তার আপিসেরই কাজের অঙ্গ। এমন কি পকেট থেকে একটা মোটা নীল পেন্সিল বের ক'রে দুটো একটা দাগও টেনে দিলে।

এমন সময় ঘরে প্রবেশ করলে শ্যামাসুন্দরী। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে মধুসূদন তার মুখের দিকে চাইলে। শ্যামাসুন্দরী বল্‌লে, "তুমি এখানে ব'সে আছ ; বৌ যে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্চে।"

"খুঁজে বেড়াচ্চে! কোথায় ?"

"এই যে দেখ্‌লুম, বাইরে তোমার আপিস ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল। তা এতে অত আশ্চর্য্য হচ্চ কেন ঠাকুর পো—সে ভেবেছে তুমি বুঝি"—

তাড়াতাড়ি মধুসূদন বাইরে চলে গেল! তার পরেই সেই চিঠির ব্যাপার।

পালের নৌকায় হঠাৎ পাল ফেটে গেলে তার যে দশা মধুসূদনের তাই হল। তখন আর দেরি করবার লেশ মাত্র অবকাশ ছিল না। আপিসে চ'লে গেল। কিন্তু সকল কাজের ভিতরে ভিতরে তার অসম্পূর্ণ ভাঙা চিন্তার তীক্ষ্ণ ধারগুলো কেবলি যেন ঠেলে ঠেলে বিঁধে বিঁধে উঠ্‌চে। এই মানসিক ভূমিকম্পের মধ্যে মনোযোগ দিয়ে কাজ করা সেদিন তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। আপিসে জানিয়ে দিলে উৎকট মাথা ধরেচে, কার্য্য শেষের অনেক আগেই বাড়ি ফিরে এলো।

৩৫

এদিকে নবীন ও মোতির মা বুঝেচে এবারে ভিৎ গেল ভেঙে, পালিয়ে বাঁচবার আশ্রয় তাদের আর কোথাও রইল না। মোতির মা বল্‌লে, "এখানে যে রকম খেটে খাচ্চি সে রকম খেটে খাবার জায়গা সংসারে আমার মিলবে। আমার দুঃখ এই যে, আমি গেলে এ বাড়িতে দিদিকে দেখবার লোক আর কেউ থাক্‌বে না।"

নবীন বল্‌লে, "দেখ মেজবৌ, এ সংসারে অনেক লাঞ্ছনা পেয়েচি, এ বাড়ির অন্নজলে অনেকবার আমার অরুচি হয়েছে। কিন্তু এইবার অসহ্য হচ্চে যে, এমন বৌ ঘরে পেয়েও কি ক'রে তাকে নিতে হয়, রাখতে হয় তা দাদা বুঝলে না—সমস্ত নষ্ট ক'রে দিলে। ভালো জিনিষের ভাঙা টুক্‌রো দিয়েই অলক্ষ্মী বাসা বাঁধে।"

মোতির মা বল্‌লে, "সে কথা তোমার দাদার বুঝতে দেরি হবে না। কিন্তু তখন ভাঙা আর জোড়া লাগবে না।"

নবীন বললে, "লক্ষ্মণ দেওর হবার ভাগ্য আমার ঘটল না, এইটেই আমার মনে বাজচে। যা হোক, তুমি জিনিস পত্তর এখনি গুছিয়ে ফেল, এ বাড়িতে যখন সময় আসে তখন আর তর সয় না।"

মোতির মা চ'লে গেল। নবীন আর থাক্‌তে পারলে না, আস্তে আস্তে তার বৌদিদির ঘরের বাইরে এসে দেখলে কুমু তার শোবার ঘরের মেঝের বিছানার উপর প'ড়ে আছে। যে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলেচে তার বেদনা কিছুতেই মন থেকে যাচ্চে না।

নবীনকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বস্‌ল। নবীন বল্‌লে, "বৌদিদি, প্রণাম করতে এসেচি, একটু পায়ের ধুলো দাও।"

বৌদিদির সঙ্গে নবীনের এই প্রথম কথাবার্ত্তা।

কুমু বল্‌লে, "এসো, বোসো।"

নবীন মাটিতে ব'সে বল্‌লে, "তোমাকে সেবা করতে পারব এই খুসিতে বুক ভ'রে উঠেছিল। কিন্তু নবীনের কপালে এতটা সৌভাগ্য সইবে কেন? কটা দিন মাত্র তোমাকে পেয়েচি, কিছুই করতে পারিনি এই আপশোষ মনে র'য়ে গেল।"

কুমু জিজ্ঞাসা করলে, "কোথায় যাচ্চ তোমরা ?"

নবীন বল্‌লে, "দাদা আমাদের দেশেই পাঠাবে। এর পরে তোমার সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা হবার সুবিধা হবে না, তাই প্রণাম ক'রে বিদায় নিতে এসেচি।" ব'লে যেই সে প্রণাম করলে মোতির মা ছুটে এসে বল্‌লে, "শীঘ্র চ'লে এসো। কর্ত্তা তোমার খোঁজ করচেন।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবীন তাড়াতাড়ি উঠে চ'লে গেল। মোতির মাও গেল তার সঙ্গে।

সেই বাইরের ঘরে দাদা তার ডেস্কের কাছে ব'সে; নবীন এসে দাঁড়ালো। অন্যদিনে এমন অবস্থায় তার মুখে যে-রকম আশঙ্কার ভাব থাকত আজ তা কিছুই নেই।

মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, "ডেস্কের চিঠির কথা বড় বৌকে কে বল্‌লে?"

নবীন বল্‌লে, "আমিই বলেচি।"

"হঠাৎ তোমার এত সাহস বেড়ে উঠ্‌ল কোথা থেকে?"

"বড়োবৌরাণী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর দাদার চিঠি এসেচে কি না। এ বাড়ির চিঠি তো তোমার কাছে এসে প্রথমটা ঐ ডেস্কেই জমা হয়, তাই আমি দেখতে এসেছিলুম।"

"আমাকে জিজ্ঞাসা করতে সবুর সয়নি?"

"তিনি ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছিলেন তাই—"

"তাই আমার হুকুম উড়িয়ে দিতে হবে?"

"তিনি তো এ বাড়ির কর্ত্রী, কেমন ক'রে জানব তাঁর হুকুম এখানে চলবে না? তিনি যা বলবেন আমি তা মান্‌ব না এত বড়ো আস্পর্দ্ধা আমার নেই। এই আমি তোমার কাছে বলচি, তিনি তো শুধু আমার মনিব নন্ তিনি আমার গুরুজন, তাঁকে যে মান্‌ব সে নিমক খেয়ে নয়, সে আমার ভক্তি থেকে।"

"নবীন, তোমাকে তো এতটুকু বেলা থেকে দেখচি, এসব বুদ্ধি তোমার নয়। জানি তোমার বুদ্ধি কে জোগায়। যাই হোক্, আজ আর সময় নেই, কাল সকালের ট্রেণে তোমাদের দেশে যেতে হবে।"

"যে আজ্ঞে" ব'লেই নবীন দ্বিরুক্তি না ক'রেই দ্রুত চ'লে গেল।

এত সংক্ষেপে "যে আজ্ঞে" মধুসূদনের একটুও ভালো লাগ্‌ল না। নবীনের কান্নাকাটি করা উচিত ছিল; যদিও তাতে মধুসূদনের সঙ্কল্পের ব্যত্যয় হোতো না। নবীনকে আবার ফিরে ডেকে বল্‌লে, "মাইনে চুকিয়ে নিয়ে যাও, কিন্তু এখন থেকে তোমাদের খরচপত্র জোগাতে পারব না।"

নবীন বল্‌লে, "তা জানি, দেশে আমার অংশে যে জমি আছে তাই আমি চাষ ক'রে খাব।"

ব'লেই অন্য কোন কথার অপেক্ষা না ক'রেই সে চ'লে গেল।

মানুষের প্রকৃতি নানা বিরুদ্ধ ধাতু মিশাল ক'রে তৈরী, তার একটা প্রমাণ এই যে মধুসূদন নবীনকে গভীর ভাবে স্নেহ করে। তার অন্য দুই ভাই রজবপুরে বিষয় সম্পত্তির কাজ নিয়ে পাড়াগাঁয়ে প'ড়ে আছে, মধুসূদন তাদের বড়ো একটা খোঁজ রাখে না। পিতার মৃত্যুর পরে নবীনকে মধুসূদন কলকাতায় আনিয়ে পড়াশুনো করিয়েচে এবং তাকে বরাবর রেখেচে নিজের কাছে। সংসারের কাজে নবীনের স্বাভাবিক পটুত্ব। তার কারণ সে খুব খাঁটি। আর একটা হচ্চে তা কথাবার্ত্তায় ব্যবহারে সকলেই তাকে ভালোবাসে। এ বাড়িতে যখন কোনো ঝগড়াঝাঁটি বাধে তখন নবীন সেটাকে সহজে মিটিয়ে দিতে পারে। নবীন সব কথায় হাসতে জানে, আর লোকদের শুধু কেবল সুবিচার করে না, এমন ব্যবহার করে যাতে প্রত্যেকেই মনে করে তারি পরে বুঝি ওর বিশেষ পক্ষপাত।

নবীনকে মধুসূদন যে মনের সঙ্গে স্নেহ করে তার একটা প্রমাণ, মোতির মাকে মধুসূদন দেখতে পারে না। যার প্রতি ওর মমতা তার প্রতি ওর একাধিপত্য চাই। সেই কারণে মধুসূদন কেবল কল্পনা করে মোতির মা যেন নবীনের মন ভাঙাতেই আছে। ছোটো ভাইয়ের প্রতি ওর যে পৈতৃক অধিকার, বাইরে থেকে এক মেয়ে এসে সেটাতে কেবলি বাধা ঘটায়। নবীনকে মধুসূদন যদি বিশেষ ভালো না বাসত তাহলে অনেক দিন আগেই মোতির মার নির্ব্বাসন দণ্ড পাকা হোতো।

মধুসূদন ভেবেছিল এইটুকু কাজ সেরেই আবার একবার আপিসে চ'লে যাবে। কিন্তু কোন মতেই মনের মধ্যে জোর পেলে না। কুমু সেই যে চিঠিখানা ছিঁড়ে দিয়ে চ'লে গেল সেই ছবিটি তার মনে গভীর ক'রে আঁকা হ'য়ে গেছে। সে এক আশ্চর্য্য ছবি, এমনতরো কিছু

সে কখনো মনে করতে পারত না। একবার তার চিরকালের সন্দেহ করা স্বভাববশত মধুসূদন ভেবেছিল নিশ্চয়ই কুমু চিঠিখানা আগেই প'ড়ে নিয়েচে, কিন্তু কুমুর মুখে এমন একটি নির্ম্মল সত্যের দীপ্তি আছে যে, বেশিক্ষণ তাকে অবিশ্বাস করা মধুসূদনের পক্ষেও অসম্ভব।

কুমুকে কঠিনভাবে শাসন করবার শক্তি মধুসূদন দেখতে দেখতে হারিয়ে ফেলেচে, এখন তার নিজের তরফে যে সব অপূর্ণতা তাই তাকে পীড়া দিতে আরম্ভ করেচে। তার বয়স বেশি, এ কথা আজ সে ভুলতে পারচে না। এমন কি তার যে চুলে পাক ধরেচে সেটা সে কোনো মতে গোপন করতে পারলে বাঁচে। তার রংটা কালো বিধাতার সেই অবিচার এতকাল পরে তাকে তীব্র ক'রে বাজচে। কুমুর মনটা কেবলি তার মুষ্টি থেকে ফসকে যাচ্চে, তার কারণ মধুসূদনের রূপ ও যৌবনের অভাব, এতে তার সন্দেহ নেই। এইখানেই সে নিরস্ত্র, সে দুর্ব্বল। চাটুজ্জেদের ঘরের মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল কিন্তু সে যে এমন মেয়ে পাবে বিধাতা আগে থাকতেই যার কাছে তার হার মানিয়ে রেখে দিয়েচেন, এ সে মনেও করেনি। অথচ এ কথা বল্‌বারও জোর মনে নেই যে, তার ভাগ্যে একজন সাধারণ মেয়ে হ'লেই ভাল হ'ত যার উপরে তার শাসন খাটত।

মধুসূদন কেবল একটা বিষয়ে টেক্কা দিতে পারে। সে তার ধনে। তাই আজ সকালেই ঘরে জহরী এসেছিল। তার কা'ছ থেকে তিনটে আঙটি নিয়ে রেখেচে, দেখতে চায় কোনটাতে কুমুর পছন্দ। সেই আঙটির কৌটা তিনটি পকেটে নিয়ে সে তার শোবার ঘরে গেল। একটা চুনি, একটা পান্না, একটা হীরের আংটি। মধুসূদন মনে মনে একটি দৃশ্য কল্পনা-যোগে দেখতে পাচ্ছে। প্রথমে সে যেন চুনির আংটির কৌটা অতি ধীরে ধীরে খুললে, কুমুর লুব্ধ চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। তার পরে বেরোলো পান্না, তাতে চক্ষু আরো প্রসারিত। তার পর হীরে, তার বহুমূল্য উজ্জ্বলতায় রমণীর বিস্ময়ের সীমা নেই। মধুসূদন রাজকীয় গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বল্‌লে, তোমার যেটা ইচ্ছে পছন্দ ক'রে নাও। হীরেটাই কুমু যখন পছন্দ করলে তখন তার লুব্ধতার ক্ষীণ সাহস দেখে ঈষৎ হাস্য ক'রে মধুসূদন তিনটে আংটিই কুমুর তিন আঙুলে পরিয়ে দিলে। তারপরেই রাত্রে শয়নমঞ্চের যবনিকা উঠ্‌ল।

মধুসূদনের অভিপ্রায় ছিল এই ব্যাপারটা আজ রাত্রের আহারের পর হবে। কিন্তু দুপুরবেলাকার দুর্য্যোগের পর মধুসূদন আর সবুর করতে পারলে না। রাত্রের ভূমিকাটা আজ অপরাহ্ণে সেরে নেবার জন্যে অন্তঃপুরে গেল।

গিয়ে দেখে কুমু একটা টিনের তোরঙ্গ খুলে শোবার ঘরের মেঝেতে ব'সে গোছাচ্চে। পাশে জিনিস পত্র কাপড় চোপড় ছড়ানো।

"একি কাণ্ড? কোথাও যাচ্চ না কি?"

"হাঁ।"

"কোথায়?"

"রজবপুরে।"

"তার মানে কি হল?"

"তোমার দেরাজ খোলা নিয়ে ঠাকুরপোদের শাস্তি দিয়েচ। সে শাস্তি আমারই পাওনা।"

যেয়ো না ব'লে অনুরোধ করতে বসা একেবারেই মধুসূদনের স্বভাববিরুদ্ধ। তার মনটা প্রথমেই ব'লে উঠল—যাক্‌না দেখি কতদিন থাক্‌তে পারে। এক মুহূর্ত্ত দেরি না ক'রে হন্ হন্ ক'রে ফিরে চ'লে গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমতী মীরা দেবীকে লিখিত

১৪

বাণ্ডুঙ্, জাভা

কল্যাণীয়াসু—

মীরা, এখানকার যা কিছু দেখবার তা শেষ করেছি। যোগ্য থেকে গিয়েছিলুম বোরো-বুদুরে; সেখানে একরাত্রি কাটিয়ে এলুম।

প্রথমে দেখলুম, মুণ্ডুং ব'লে এক জায়গায় একটি ছোটো মন্দির। ভেঙেচুরে পড়ছিল; সেটাকে এখানকার গবর্ণমেণ্ট সারিয়ে দিয়েচে। গড়নটি বেশ লাগ্‌ল দেখ্‌তে। ভিতরে বুদ্ধের তিন ভাবের তিন বিরাট মূর্ত্তি। স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লেম। মনের ভিতরে কেমন একটা বেদনা বোধ হয়। একদিন অনেক মানুষে মিলে এই মন্দির এই মূর্ত্তি তৈরি ক'রে তুলছিল। সে কত কোলাহল, কত আয়োজন, তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল মানুষের প্রাণ। এই প্রকাণ্ড পাথরের প্রতিমা যে-দিন পাহাড়ের উপর তোলা হচ্ছিল, সেদিন এই গাছপালার মধ্যে এই সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল আকাশের নীচে মানুষের বিপুল একটা প্রয়াস সজীব ভাবে এইখানে তরঙ্গিত। পৃথিবীতে সে দিন খবর চালাচালি ছিল না, এই ছোটো দ্বীপটির মধ্যে যে প্রবল ইচ্ছা আপন কীর্ত্তি রচনায় প্রবৃত্ত, সমুদ্র পার হ'য়ে তার সংবাদ আর কোথাও পৌছয়নি। কলকাতার ময়দানের ধারে যখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তৈরী হচ্ছিল তার কোলাহল পৃথিবীর সকল সমুদ্রের কূলে কূলে বিস্তীর্ণ হয়েছিল।

নিশ্চয় দীর্ঘকাল লেগেছিল এই মন্দির তৈরী হ'তে; কোনো একজন মানুষের আয়ুর মধ্যে এর সৃষ্টির সীমা ছিল না। এই মন্দিরকে তৈরী ক'রে তোলবার জন্যে যে প্রবল শ্রদ্ধা সেটা তখনকার সমস্ত কাল জুড়ে সত্য ছিল। এই মন্দির নির্ম্মাণ নিয়ে কত বিস্ময়, কত বিতর্ক, সত্য মিথ্যা কত কাহিনী তখনকার এই দ্বীপের সুখদুঃখ বিক্ষুব্ধ প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত হয়েচে। একদিন মন্দির তৈরী শেষ হ'ল, তারপরে দিনের পর দিন এখানে পূজার দীপ জ্বলেচে, দলে দলে পূজার অর্ঘ্য এনেছে, বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে পার্ব্বণ হয়েচে, এর প্রাঙ্গণে তীর্থযাত্রী মেয়ে পুরুষ এসে ভিড় করেচে।

তারপরে সেদিনের ভাষার উপর ভাবের উপর ধূলো চাপা পড়ল; সেদিন যা অত্যন্ত সত্য ছিল তার অর্থ গেল হারিয়ে। ঝরণা শুকিয়ে গেলে যেমন কেবল পাথরগুলো বেরিয়ে পড়ে, এই সব মন্দির আজ তেমনি। একে ঘিরে যে প্রাণের ধারা নিরন্তর ব'য়ে যেত সে যেমনি দূরে স'রে গেল, অমনি এর পাথর আর কথা কয় না, এর উপর সেদিনের প্রাণস্রোতের কেবল চিহ্নগুলি আছে, কিন্তু

তার গতি নেই তার বাণী নেই। মোটর গাড়ি চ'ড়ে আমরা একদল এলুম দেখ্‌তে, কিন্তু দেখবার আলো কোথায়! মানুষের এই কীর্ত্তি আপন প্রকাশের জন্য মানুষের যে দৃষ্টির অপেক্ষা করে, কতকাল হ'ল সে লুপ্ত হ'য়ে গেছে।

এর আগে বোরোবুদুরের ছবি অনেকবার দেখেছি। তার গড়ন আমার চোখে কখনই ভালো লাগেনি। আশা করেছিলুম হয়ত প্রত্যক্ষ দেখ্‌লে এর রস পাওয়া যাবে। কিন্তু মন প্রসন্ন হ'ল না। থাকে থাকে একে এমন ভাগ করেছে, এর মাথার উপরকার চূড়াটুকু এর আয়তনের পক্ষে এমন ছোটো, যে যত বড়ই এর আকার হোক এর মহিমা নেই। মনে হয় যেন পাহাড়ের মাথার উপরে একটা পাথরের ঢাকনা চাপা দিয়েচে। এটা যেন কেবল মাত্র একটা আধারের মতো, বহুশত বুদ্ধমূর্ত্তি ও বুদ্ধের জাতক কথার ছবিগুলি বহন করবার জন্যে মস্ত একটি ডালি। সেই ডালি থেকে তুলে তুলে দেখ্‌লে অনেক ভালো জিনিষ পাওয়া যায়। পাথরে খোদা জাতক মূর্ত্তিগুলি আমার ভারি ভালো লাগ্‌ল,—প্রতিদিনের প্রাণলীলার অজস্র প্রতিরূপ, অথচ তার মধ্যে ইতর, অশোভন বা অশ্লীল কিছুমাত্র নেই। অন্য মন্দিরে দেখেছি সব দেব-দেবীর মূর্ত্তি, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীও খোদাই হয়েচে। এই মন্দিরে দেখ্‌তে পাই সর্ব্বজনকে—রাজা থেকে আরম্ভ ক'রে ভিখারী পর্য্যন্ত। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবল হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে, এর মধ্যে শুদ্ধ মানুষের নয় অন্য জীবেরও যথেষ্ট স্থান আছে। জাতক কাহিনীর মধ্যে খুব একটা মস্ত কথা আছে, তাতে বলেছে যুগ যুগ ধ'রে বুদ্ধ সর্ব্বসাধারণের মধ্য দিয়েই ক্রমশঃ প্রকাশিত। প্রাণীজগতে নিত্যকাল ভালোমন্দর যে দ্বন্দ্ব চলেচে সেই দ্বন্দ্বের প্রবাহ ধ'রেই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বুদ্ধের মধ্যে অভিব্যক্ত। অতি সামান্য জন্তুর ভিতরেও অতি সামান্য রূপেই এই ভালোর শক্তি মন্দর ভিতর দিয়ে নিজকে ফুটিয়ে তুলচে। তার চরম বিকাশ হচ্চে অপরিমেয় মৈত্রীর শক্তিতে আত্মত্যাগ! জীবে জীবে লোকে লোকে সেই অসীম মৈত্রী অল্প অল্প ক'রে নানা দিক থেকে আপন গ্রন্থি মোচন করচে, সেই দিকেই মোক্ষের গতি। জীব মুক্ত নয়, কেন না আপনার দিকেই তার টান; সমস্ত প্রাণীকে নিয়ে ধর্ম্মের যে অভিব্যক্তি, তার প্রণালী পরম্পরায় সেই আপনার দিকে টানের পরে আঘাত লাগ্‌চে। সেই আঘাত যে পরিমাণে যেখানেই দেখা যায় সেই পরিমাণে সেখানেই বুদ্ধের প্রকাশ। মনে আছে ছেলেবেলায় দেখেছিলুম দড়িতে বাঁধা ধোপার বাড়ীর গাধার কাছে এসে একটি গাভী স্নিগ্ধ চক্ষে তার গা চেটে দিচ্চে; দেখে আমার বড়ো বিস্ময় লেগেছিল। বুদ্ধই যে তাঁর কোনো এক জন্মে সেই গাভী হ'তে পারেন এ কথা বল্‌তে জাতক কথা লেখকের একটুও বাধ্‌ত না। কেন না গাভীর এই স্নেহেরই শেষ গিয়ে পৌচেছে মুক্তির মধ্যে। জাতক কথায় অসংখ্য সামান্যের মধ্যে দিয়েই চরম অসামান্যকে স্বীকার করেছে। এতেই সামান্য এত বড়ো হ'য়ে উঠ্‌ল। সেই জন্যেই এতবড়ো মন্দিরভিত্তির গায়ে গায়ে তুচ্ছ জীবনের বিবরণ এমন সরল ও নির্ম্মল শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত। ধর্ম্মেরই প্রকাশ-চেষ্টার আলোতে সমস্ত প্রাণীর ইতিহাস বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে মহিমান্বিত।

দুজন ওলন্দাজ পণ্ডিত সমস্ত ভাল ক'রে ব্যাখ্যা করবার জন্যে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের চরিত্রে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সরল হৃদ্যতার সম্মিলন আমার কাছে বড়ো ভালো লাগ্‌ল। সব চেয়ে শ্রদ্ধা হয় এঁদের নিষ্ঠা দেখে। বোবা পাথরগুলোর মুখ থেকে কথা বের করবার জন্যে সমস্ত আয়ু দিয়েচেন। এঁদের মধ্যে পাণ্ডিত্যের কৃপণতা লেশ মাত্র নেই—অজস্র দাক্ষিণ্য। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ ক'রে জেনে নেবার জন্যে এঁদেরই গুরু ব'লে মেনে নিতে হবে। জ্ঞানের প্রতি বিশুদ্ধ নিষ্ঠা থেকেই এঁদের এই অধ্যবসায়। ভারতের বিদ্যা, ভারতের ইতিহাস এঁদের নিকটের জিনিষ নয়—অথচ এইটেই এঁদের সমস্ত জীবনের সাধনার জিনিষ। আরো কএকজন পণ্ডিতকে দেখেচি—তাঁদের মধ্যেও সহজ নম্রতা দেখে আমার মন আকৃষ্ট হয়েচে। ইতি ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭।

যাভাযাত্রীর পত্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিলিটন

শ্রীমতী নির্ম্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখিত

১৫

কল্যাণীয়াসু—

রাণী, জাভার পালা সাঙ্গ ক'রে যখন বাটাভিয়াতে এসে পৌছলুম, মনে হ'ল খেয়াঘাটে এসে দাঁড়িয়েছি, এবার পাড়ি দিলেই ওপারে গিয়ে পৌছব নিজের দেশে। মনটা যখন ঠিক সেই ভাবে ডানা মেলেচে এমন সময় ব্যাঙকক্ থেকে আরিয়ামের টেলিগ্রাম এল যে, সেখানে আমার ডাক পড়েছে, আমার জন্যে অভ্যর্থনা প্রস্তুত। আবার হাল ফেরাতে হ'ল। সারাদিন খাটুনির পর আস্তাবলের রাস্তায় এসে গাড়োয়ান যখন নতুন আরোহীর ফরমাসে ঘোড়াটাকে অন্য রাস্তায় বাঁক ফেরায় তখন তার অন্তঃকরণে যে ভাবের উদয় হয় আমার ঠিক সেই রকম হ'ল। ক্লান্ত হয়েছি একথা মানতেই হবে। এমন লোক দেখেছি (নাম করতে চাইনে) ভাগ্য অনুকূল হ'লে যারা টুরিস্ট্ ব্রত গ্রহণ ক'রে চিরজীবন অসাধ্য সাধন করতে পারত, কিন্তু তারা হয়ত পটলডাঙার কোন্ এক ঠিকানায় ধ্রুব হ'য়ে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত। আর আমি দেহটাকে কোণে বেঁধে মনটাকে গগনপথে ওড়াতে পারলে আরাম পাই অথচ সাত ঘাটের জল আমাকে খাওয়াচ্চে। অতএব চল্লুম শ্যামের পথে, ঘরের পথে নয়।

এখানকার যে সরকারি জাহাজে সিঙাপুরে যাবার কথা সে জাহাজে অত্যন্ত ভিড়, তাই একটি ছোট জাহাজে আমি আর সুরেন স্থান ক'রে নিয়েচি। কাল শুক্রবার সকালে রওনা হওয়া গেছে। সুনীতি ও ধীরেন একদিনের জন্য পিছিয়ে র'য়ে গেল, কেননা কাল রাত্রে ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে সুনীতির একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। জাভার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সুনীতি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেচেন। তার কারণ তাঁর পাণ্ডিত্যে কোনো ফাঁকি নেই, যা-কিছু বলেন তা তিনি ভালো ক'রেই জানেন।

আমাদের জাহাজ দুটি দ্বীপ ঘুরে যাবে তাই দুদিনের পথে তিন দিন লাগ্‌বে। এই জায়গাটাতে বিশ্বকর্ম্মার মাটির ব্যাগ ছিঁড়ে অনেকগুলো ছোট ছোট দ্বীপ সমুদ্রের মধ্যে ছিট্‌কে পড়েচে। সেগুলো ওলন্দাজদের দখলে। এখন যে দ্বীপে জাহাজ নোঙর ফেলেছে তার নাম বিলিটন। মানুষ বেশী নেই; আছে টিনের খনি, আর আছে সেইসব খনির ম্যানেজার ও মজুর। আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'সে ব'সে ভাবচি এরা সমস্ত পৃথিবীটাকে কি রকম দোহন ক'রে নিচ্চে। একদিন এরা সব ঝাঁকে ঝাঁকে পালের জাহাজে চ'ড়ে অজানা সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েছিল। পৃথিবীটাকে ঘুরে ঘুরে দেখে নিলে, চিনে নিলে, মেপে নিলে। সেই জেনে নেওয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাস কত সাংঘাতিক সঙ্কটে আকীর্ণ। মনে মনে ভাবি ওদের স্বদেশ থেকে অতি দূর সমুদ্রকূলে এই সব দ্বীপে যে দিন ওরা প্রথম এসে পাল নামালে, সে কত আশঙ্কায় অথচ কত প্রত্যাশায় ভরা দিন। গাছপালা জীবজন্তু মানুষজন সেদিন সমস্তই নতুন। আর আজ! সমস্তই সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত, সম্পূর্ণ অধিকৃত।

এদের কাছে আমাদের হার মানতে হয়েচে। কেন, সেই কথা ভাবি। তার প্রধান কারণ, আমরা স্থিতিবান জাত, আর ওরা গতিবান। অন্যোন্য-তন্ত্র সমাজ-বন্ধনে আমরা আবদ্ধ, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যে ওরা বেগবান। সেই জন্যেই এত সহজে ওরা ঘুরতে পারল। ঘুরেছে ব'লেই জেনেচে আর পেয়েচে। সেই কারণেই জানবার ও পাবার আকাঙ্ক্ষা ওদের এত প্রবল। স্থির হ'য়ে ব'সে ব'সে থেকে আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষাটাই ক্ষীণ হ'য়ে গেছে। ঘরের কাছেই কে আছে, কি হচ্চে, ভাল ক'রে তা জানিনে, জানবার ইচ্ছাও হয় না। কেন না ঘর দিয়ে আমরা অত্যন্ত ঘেরা। জানবার জোর নেই যাদের, পৃথিবীতে বাঁচবার জোর তাদের কম। এই ওলন্দাজরা যে শক্তিতে জাভা দ্বীপ সকল রকমে অধিকার ক'রে নিয়েচে, সেই শক্তিতেই জাভা দ্বীপের পুরাতত্ত্ব অধিকার করবার জন্যে তাদের এত পণ্ডিতের এত একাগ্রমনে তপস্যা। অথচ এ পুরাতত্ত্ব অজানা নতুন দ্বীপেরই মতো তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্বন্ধশূন্য। নিকট সম্পর্কীয় জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধেও আমরা উদাসীন, দূর সম্পর্কীয় জ্ঞান সম্বন্ধেও এদের আগ্রহের অন্ত নেই। কেবল বাহুবলে নয়, এই জিজ্ঞাসার

প্রবলতায় এরা জগৎটাকে অন্তরে বাহিরে জিতে নিচ্চে। আমরা একান্ত ভাবে গৃহস্থ। তার মানে আমরা প্রত্যেকে আপন গার্হস্থ্যের অংশ মাত্র, দায়িত্বের হাজার বন্ধনে বাঁধা। জীবিকাগত দায়িত্বের সঙ্গে অনুষ্ঠানগত দায়িত্ব বিজড়িত। ক্রিয়াকর্ম্মের নিরর্থক বোঝা এত অসহ্য বেশি যে অন্য সকল যথার্থ কর্ম্ম তারই ভারে অচলপ্রায়। জাতকর্ম্ম থেকে আরম্ভ ক'রে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত যে-সমস্ত কৃত্য ইহলোক পরলোক জুড়ে আমাদের স্কন্ধে চেপেচে তাদের নিয়ে নড়া চড়া অসম্ভব, আর তারা আমাদের শক্তিকে কেবলি শোষণ ক'রে নিচ্চে। এই সমস্ত ঘরের ছেলেরা পরের হাতে মার খেতে বাধ্য। এ কথাটা আমরা ভিতরে ভিতরে বুঝ্‌তে পারচি। এইজন্যে আমাদের নেতারা সন্ন্যাসের দিকে এতটা ঝোঁক দিয়েচেন। অথচ তাঁরা সনাতন ধর্ম্মকেও ধ্রুব সত্য ব'লে ঘোষণা করেন। কিন্তু আমাদের সনাতন ধর্ম্ম গার্হস্থ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সস্ত্রীকং ধর্ম্মমাচরেৎ। আমাদের দেশে বিস্ত্রীক ধর্ম্মের কোনো মানে নেই।

যাঁরা সনাতন ধর্ম্মের দোহাই দেন না, তাঁরা বলেন, ক্ষতি কি? কিন্তু বহু যুগের সমাজ-ব্যবস্থার পুরাতন ভিত্তি যদি বা ভাঙা সহজ হয় তার জায়গায় নতুন ভিত্তি গড়্‌বে কত দিনে। কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রত্যেক সমাজ কতকগুলি নীতিকে সংস্কারগত ক'রে নিয়েচে। তর্ক ক'রে বিচার ক'রে অল্প লোক সিধে থাক্‌তে পারে—সংস্কারের জোরেই তারা সংসারের পথে চলে। এক সংস্কারের জায়গায় আর এক সংস্কার গড়া তো সোজা কথা নয়। আমাদের সমাজের সমস্ত সংস্কারই আমাদের বহুদায়গ্রন্থিল গার্হস্থ্যকে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ রাখবার জন্যে। য়ুরোপীয়দের কাছ থেকে বিজ্ঞান শেখা সহজ, কিন্তু তাদের সমাজের সংস্কারকে আপন করা সহজ নয়।

আমাদের জাহাজে ছিলেন টিন খনির এক কর্ত্তা,—বল্‌লেন ষোল বৎসর এইখানেই লেগে আছেন। টিন ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই। তবু এইখানেই তাঁর বাসা বাঁধা। বাটাভিয়াতে সিদ্ধি বণিকেরা দোকান করেছেন। দুবছর অন্তর বাড়ি যাবার নিয়ম। জিজ্ঞাসা করলুম স্ত্রী পুত্র নিয়ে এখানে বাসা বাঁধতে দোষ কি? বল্‌লেন, স্ত্রীকে নিয়ে এলে চল্‌বে কেন, স্ত্রী যে সমস্ত পরিবারের সঙ্গে বাঁধা, তাঁকে সরিয়ে আন্‌তে গেলে সেখানে ভাঙন ধরে। বোধ করি রামায়ণের যুগে এ তর্ক ছিল না। টিনের কর্ত্তা বালককাল কাটিয়েচেন সাশ্রম বিদ্যালয়ে, বয়ঃপ্রাপ্ত হতেই কাজের সন্ধানে ফিরেচেন, বিবাহ করবামাত্র নিজের শক্তির পরেই সম্পূর্ণ ভার দিয়ে বসেচেন। বাপের তবিলের উপরে তাগিদ নেই, মা মাসী পিশেমশায়ের জন্যেও মন খারাপ হয় না। সেই জন্যেই এই জন-বিরল নির্ব্বাসনেও টীনের খনি চল্‌চে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এরা ঘর বাঁধতে পারল তার কারণ এরা ঘরছাড়া। তারপরে মঙ্গল গ্রহের দিকে দূরবীণ তুলে যে এরা রাতের পর রাত কাটিয়ে দিচ্চে তারও কারণ এদের জিজ্ঞাসা-বৃত্তি ঘরছাড়া। সনাতন গৃহস্থরা এদের সঙ্গে কেমন ক'রে পারবে? তাদের প্রচণ্ড গতিবেগে এদের ঘরের খুঁটিগুলো পড়্‌চে ভেঙে; কিছুতে বাধা দিতে পারচে না। যতক্ষণ চুপ ক'রে আছি ততক্ষণ যত রাজ্যের অহেতুক বোঝা জ'মে জ'মে পর্ব্বত প্রমাণ হয়ে উঠলেও তেমন দুঃখ বোধ হয় না, এমন কি ঠেস দিয়ে আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু ঘাড়ে তুলে নিয়ে চল্‌তে গেলেই মেরুদণ্ড বাঁকে। যারা সচল জাত, বোঝাই সম্বন্ধে তাদের কেবলি সূক্ষ্ম বিচার কর্‌তে হয়। কোন্‌টা রাখবার কোন্‌টা ফেলবার, এ তর্ক তাদের প্রতি মুহূর্ত্তের, এতেই আবর্জ্জনা দূর করবার বুদ্ধি পাকা হয়। কিন্তু সনাতন গৃহস্থ চণ্ডীমণ্ডপে আসন পেতে ব'সে আছেন, তাই তাঁর পঞ্জিকা থেকে তিনশো পঁয়ষাট্টি দিন ভরা মূঢ়তায় আজ পর্য্যন্ত কিছুই বাদ পড়্‌ল না। এই সমস্ত রাবিশ্‌ যাদের অন্তরে বাহিরে কানায় কানায় ভরপুর, হঠাৎ কংগ্রেসের মাচার উপর থেকে তাদের পরে হুকুম এল লঘুভার মানুষের সঙ্গে সমান পা ফেলে চল্‌তে হবে, কেন না দুচার দিনের মধ্যেই স্বরাজ চাই। জবাব দেবার ভাষা তাদের মুখে নেই, কিন্তু তাদের পাঁজরভাঙা বুকের ব্যথায় এই মূক মিনতি থেকে যায়, "তাই চলবার চেষ্টা করব, কিন্তু কর্ত্তারা আমাদের বোঝা নামিয়ে দেন।" তখন কর্ত্তারা শিউরে উঠে বলেন, "সর্ব্বনাশ, ও যে সনাতন বোঝা।" ইতি ১ লা অক্টোবর, ১৯২৭।

মায়ুর জাহাজ

সম্পূর্ণ

বুদ্ধ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

জরা মৃত্যু — বিভীষিকা, জীব-জন্ম তাহার নিদান—
সেই ব্যাধি, মহাদুঃখ দূর করি' মানবে নির্ভয়
করেছিলে হে তাপস, পৃথিবীর প্রথম সন্ন্যাসী!
বিষের ঔষধ বিষ পিয়াইলে, ভিষক-প্রধান!
ধরার পীড়িত জনে,—কামনার অঙ্কুশ দুর্জ্জয়
ভাঙ্গিলে কৌশলে বীর, কামনার অঙ্কুর বিনাশি'!

হেরি মূর্ত্তি মঠে মঠে, দেশে দেশে, শিলাধাতুময়—
অধরে মূর্চ্ছিত হাসি, অবনত আঁখির পল্লবে
মুদিত উদ্ধগ দৃষ্টি; ঋজু দেহ, স্কন্ধ, গ্রীবামূল—
অনিন্দ্য আসন-ভঙ্গি! চিত্ততলে সে কি অসংশয়
জয়োল্লাস — জগতের মহাবৈরী-নিধন-উৎসবে!
নির্ব্বাণ মমতা-বহ্নি,—সে কি তৃপ্তি—নাহি তার তুল!

বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধ—একি দৃশ্য অলোক-সম্ভব!—
প্রকৃতির নৃত্য নাই, মুখ তার গুণ্ঠনে আবরি'
সরিয়া দাঁড়ায় নটী—কুলবধূ লজ্জায় মলিন!
মহাকাল আছে স্তব্ধ!—পুরুষের পৌরুষ-গৌরব
মানবের ইতিহাস যুগ-যুগ রহিয়াছে ভরি'—
সর্ব্ব ভয়, সর্ব্ব আশা, সর্ব্বসুখে সে যে উদাসীন!

সেই বার্ত্তা ওই মুখে আজও হেরি, বিস্ময় বিহ্বল—
একটি মানুষ কবে একবার হয়েছে নাস্তিক!
নিবারি' নরক-ভয়, তুচ্ছ করি' স্বর্গসুখ-লোভ,
ধ্যানে বসি' দৃঢ়াসনে জরা-মৃত্যু করেছে নিষ্ফল!
তার মুক্তি সুখ নয়,—জীব-জন্মে দুঃখ মর্ম্মান্তিক,
তাহারি নিবৃত্তি শুধু—দূর করি' বাসনা-বিক্ষোভ।

সে দুঃখ-দমন-মন্ত্র একদিন শ্রমণ গৌতম
বিতরিল সারনাথে, তারপর আর্ত্ত নর-নারী—
সকল আশার শেষ, মমতার সুচির নির্ব্বাণ,
তৃষ্ণা, রতি, অরতির উচ্ছেদের পন্থা অনুত্তম
লভিতে আসিল ধেয়ে।—ত্রৈলোক্যের মুক্তির ভিখারী
আপামর সর্ব্বজনে শান্তিবারি করিল প্রদান।

* * * *

শ্রাবস্তির 'জেতবনে' শ্রেষ্ঠী-শিষ্য কোটী কার্ষাপণ
স্বর্ণমুদ্রা রাখি' ভূমে রচি' দিল সৌধ সঙ্ঘারাম;
মগধের রাজগৃহে মহারাজ সেন-বিম্বিসার
পাদ্য-অর্ঘ্য লয়ে নিজে নিবেদিল বুদ্ধে 'বেণুবন';
বেশালির বেশ্যা মহাভিক্ষুপদে করিয়া প্রণাম
কৃতার্থ হইল সঁপি' 'আম্রবণ'—বিপুল বিহার!

অশীতি-সহস্র মঠ নিরমিল নৃপতি অশোক
'বুদ্ধের শরণ' লাগি,' ভিক্ষুদের কাষায়-চীবর
পৃথ্বীরে করিল পাণ্ডু; প্রিয়দর্শী দেবতার প্রিয়
অরণ্যে গুহায় শৈলে স্তম্ভগাত্রে ধর্ম্মসূত্র শ্লোক
প্রকৃতি-শাসন তরে লিখাইল, মহামহীশ্বর—
রাজ-পুণ্যে শ্রমণ গৌতম হ'ল বিশ্ব-বরণীয়!

তারপর?—প্রাণ ছিল উপবাসী বর্ষ পঞ্চশত,
(জীবনের পথ শেষ হয় নাকি উপসম্পদায়?)
দশশত বর্ষ সেই বুভুক্ষার করিল পারণ—
মানুষ দেবতা হ'য়ে আরম্ভিল পিশাচের ব্রত!
মন্দিরে, মঠের ভিতে, তোরণের স্তম্ভ-পীঠিকায়
উন্মাদ মিথুন মূর্ত্তি— যতী পূজে রতির চরণ!

আত্মার অন্তিম দীপ্তি প্রকাশিল দেহ-রসাতলে,
আয়ুক্ষয়-সাধনায় ধরা প'ল মহা আয়ুর্ব্বেদ!
কাম-যজ্ঞে দেহ সঁপি' হ'ল তায় হবিঃশেষ-পান—
মিথ্যারে মন্থন করি' তার সেই তীব্র হলাহলে
কণ্ঠ নীল, ললাটের নেত্রে তবু হ'ল না নিষেধ
যোগীর অদ্বৈত-দৃষ্টি!—তার পর ভারত শ্মশান!

বুদ্ধ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বৈশাখী পূর্ণিমা-রাত্রে একদিন নিরঞ্জনা-তীরে
প্রহরে প্রহরে শুনি' তব কণ্ঠে গম্ভীর 'উদান',
সেই যে পড়িল খসি' 'মার'-হস্তে বাসনার বাঁশী,
সে আর তেমন সুরে সাধিল না ধরা-বধূটীরে—
আর সে কামনা-লক্ষ্মী উদিল না পূর্ণ করি' প্রাণ,
তন্ত্রে মন্ত্রে শিহরিয়া হাসিল সে উদাসীন হাসি!

*   *   *   *

দাঁড়ায়ে প্রাসাদ-শিরে, হেরি' তব রূপ মনোহর,
মুগ্ধা কিসা-গোতমীর কণ্ঠে সে কি প্রাণের উচ্ছ্বাস—
"হেন পুত্র যার ঘরে, কিবা তার সুখ নাহি জানি,
কত সুখী তার প্রিয়া!"—শুনি' সেই বাণী সকাতর,
চকিতে উদিল মনে—"সেই সুখী যে জন উদাস!"—
দীক্ষা-গুরু বলি' তারে পাঠাইলে মুক্তামালাখানি!

নারী তায় পরি' গলে, সারারাত আধেক স্বপনে
জাগিল বাসর একা—রাজপুত্র বাসিয়াছে ভালো!
তুমি কিন্তু সেই দিন সত্য-সুখ বাসনা-নির্বাণ
লভিতে ত্যজিলে গৃহ,—পশি' নিজ শয়ন ভবনে
পত্নীপুত্র-মুখ হ'তে নিবাইয়া শিয়রের আলো,
না বলি' বিদায়-বাণী, চিরতরে করিলে প্রস্থান।

প্রেমের লাঞ্ছনা সেই, মমতার সেই অপমান
জয়ী হল! পণ শুনি' দেবতারা কাঁপিল তরাসে,
"শীর্ণ হোক স্নায়ু শিরা, রক্ত শুষ্ক, অস্থি ক্ষয় হোক্—
এ আসন ত্যজিব না, না লভিয়া পূর্ণ পরাজ্ঞান!"—
কল্পবন্ধ, ভবভয় ভেদ করি' প্রাণান্ত প্রয়াসে
দাঁড়াইলে বোধিমূলে, দূরে ফেলি' কামনা-নির্মোক!

সেই মূর্ত্তি আজও হেরি, শুনি সেই মানুষের কথা,
ভাঙ্গিতে চাহিল যেই দেবতারো দেবত্ব-শৃঙ্খল!—
তার বেশী আর কিছু তোমা মাঝে হেরি না যে আজ!
'মার' কি মেনেছে বশ? ঘুচিয়াছে ধরিত্রীর ব্যথা?
তোমার সে আত্মজয়ে ফুরায়েছে মৃত্যুর সম্বল?
ফোটেনা কি রাধাপদ্ম কৃষ্ণ অশ্রু-সায়রের মাঝ?

অচল সে ধর্ম্মচক্র মৃগদাব ঋষিপতনের,
যুগান্ত-সঞ্চিত ধূলি ঢাকিয়াছে শত চৈত্য-স্তূপ,
শুধু তুমি, ভূতসাক্ষী ভগবান শাক্য তথাগত !
মানস-মন্দিরে কভু দেখা দাও জগত-জনের ;—
তোমারি মহিমা স্মরি, স্মরি তব অমিতাভ-রূপ,
তোমারি উদ্দেশে মাথা শ্রদ্ধাভরে করি অবনত।

তবু সে নির্ব্বাণ ধর্ম্ম বহুদিন হয়েছে নির্ব্বাণ,
আছে শুধু ক্ষীণ মর্ম্ম মৈত্রী আর অহিংসার নীতি,
যে রাজ্য বিস্তার করি' মন-মাঝে শাসিলে একেলা
বিশাল মানব গোষ্ঠী,—করাইলে আত্ম বলিদান
শূন্য সুখ তরে শুধু, ঘুচাইয়া প্রাণের পীরিতি,—
সে কি নহে দুর্ব্বলেরে ল'য়ে সেই সবলের খেলা !

বোধিদ্রুমতলে বসি' সেই স্বপ্ন দেখিলে সন্ন্যাসী,
তোমারি সে,—সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্—তুমি দ্রষ্টা তার;
বিশ্বজনে সেই স্বপ্ন দেখাবারে করিলে প্রয়াস—
রুদ্ধ করি' আঁখিজল, ম্লান করি' অধরের হাসি,
প্রাণ হত্যা করিবারে কেবা তোমা দিল অধিকার ?—
তার চেয়ে ক্রূর সে কি—তৈমুরের লক্ষ জীব-নাশ ?

মানবের সর্ব্ব কীর্ত্তি কালগর্ভে নিমেষে মিলায়—
ধর্ম্ম-রাজ চক্রবর্ত্তী ! তব রাজ্য তেমনি বিলীন !
হিংসা প্রেম খরস্রোতা প্রকৃতির প্রাণ কল্লোলিনী
বহে শুধু নিত্যকাল, জন্মমৃত্যু লহরী-লীলায় !
তুষারে ফুটিছে ফুল, মিথ্যা-সুখে হাস্য অমলিন !—
দুঃখ সত্য, —অমৃত-সমান তবু তাহার কাহিনী !

* * * *

আজ আর নাহি ভয়, দুঃখ সুখ দুয়েরি সমান
সাধক আমরা সবে, জানি জন্ম আর হেথা নাই—
স্বর্গ-লোভ করি না যে, নরকের নাহি যে নিশানা !
কৈশোর যৌবন জরা, জীবনের যত কিছু দান
আগ্রহে লুটিয়া লই—যাহা পাই অমূল্য যে তাই !
ভুলেছি আত্মার কথা, মানি শুধু দেহের সীমানা।

বুদ্ধ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

ওই যে ফুটেছে ফুল বৃতিপাশে, বিচিত্র-বরণ,
হরিৎ ব্রততী-শিরে,—ঊর্দ্ধে নীল আয়ত আকাশ—
প্রভাতের হিমবিন্দু, মধ্যাহ্নের রবিরশ্মিপানে
হৃদয়ে ভরিছে মধু!—তার সেই জীবন-মরণ
ফুরাইবে ক্ষণপরে, কেন বৃথা করি হা-হুতাশ
আদি-অন্ত ভাবনায়?—কেন ফিরি অদৃষ্ট-সন্ধানে?

আছে কাঁটা? হায়, সে যে বৃন্ত-মূল করেছে কঠিন—
মধু'র মাধুরীটুকু বেদনায় করেছে দুর্ল্লভ!
কীট?—সে ত' চিন্তা-শূল!—মর্ম্মকোষে পরাগের ব্যাধি—
শীর্ণদল, তিক্তমধু, পুষ্পপুট রাগরক্তহীন!
চারিপাশে বিকসিত স্নেহশ্যাম চিকণ পল্লব—
এত শোভা!—তবু সে শিহরি' উঠে মৃত্যুভয়ে কাঁদি'!

দেহ মিথ্যা, প্রাণ মিথ্যা,—একমাত্র দুঃখ সত্য হবে?
বাসনায় আছে বিষ?—আছে সাথে বিষের ঔষধি!
অমৃত-বল্লরী সে যে, সঞ্জীবনী বিস্মরণী সুধা!—
কামেরই সে ভিন্ন রূপ—নাম তার জানে বটে সবে
প্রাণের রহস্য তবু এক সেই!—জন্মান্ত অবধি
তাহারি বিহনে কারো মিটেনা যে মরণের ক্ষুধা!

সেই প্রেম!—জন্ম-জন্ম তারি লাগি' ফিরিছে সবাই!
এই দেহ-পাত্র ভরি' যেই দিন উঠিবে উছলি'—
ঘুচিবে দুরন্ত দুঃখ, মৃত্যু-ভয় র'বে না যে আর!
বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধ আর বসি' র'বে না সদাই,
সুজাতা আনিবে অন্ন, পূর্ণা তিথি উঠিবে উজলি'—
'মার' দিবে হাসিমুখে হাতে তুলি' বাঁশীখানি তার!
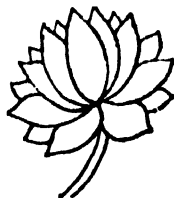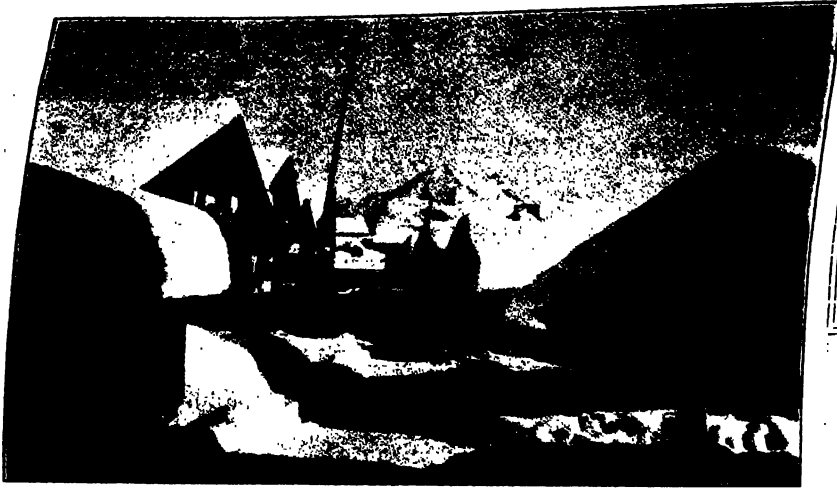
রাস্তায় বরফ— ছাদে বরফ
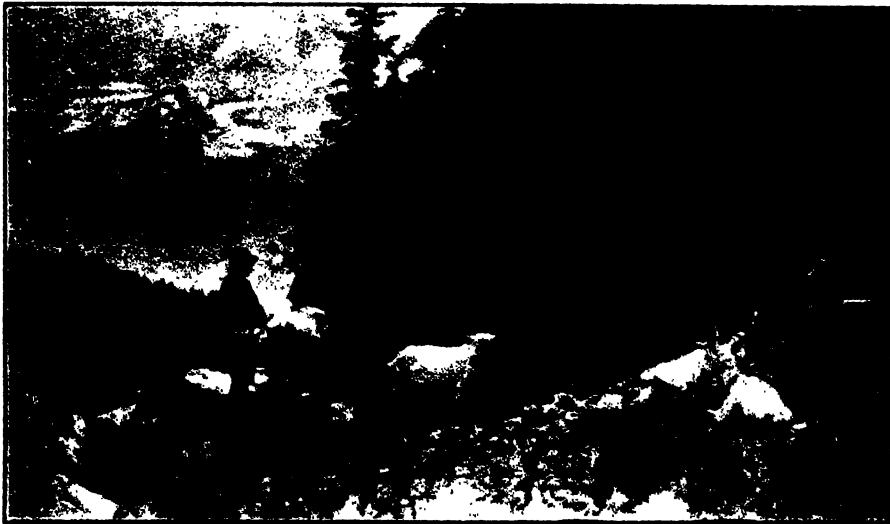
রাখাল বালক

রোগীদের ব্যায়াম

ঘোড়ার সাহায্যে স্কি-খেলা

লুজে চড়া

এ-ও একরকম খেলা

চিত্র সংগ্রহ

স্কি—খেলা

লাফ্ দেওয়া

স্কেটিং

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় কর্ত্তৃক প্রেরিত

ভানুসিংহের পত্রাবলী
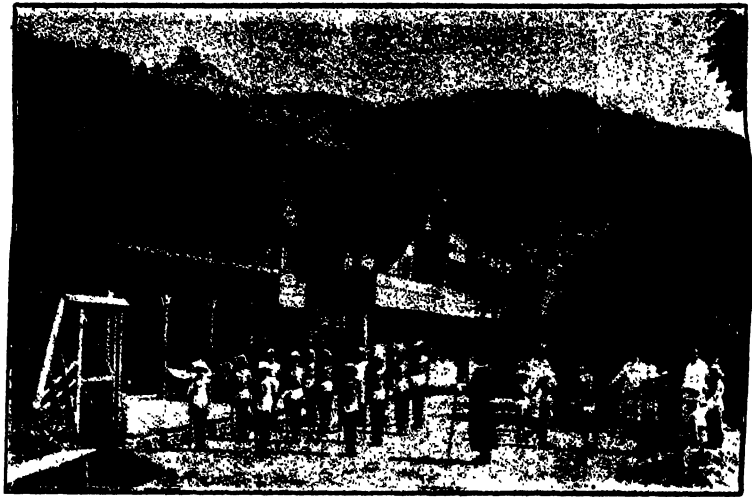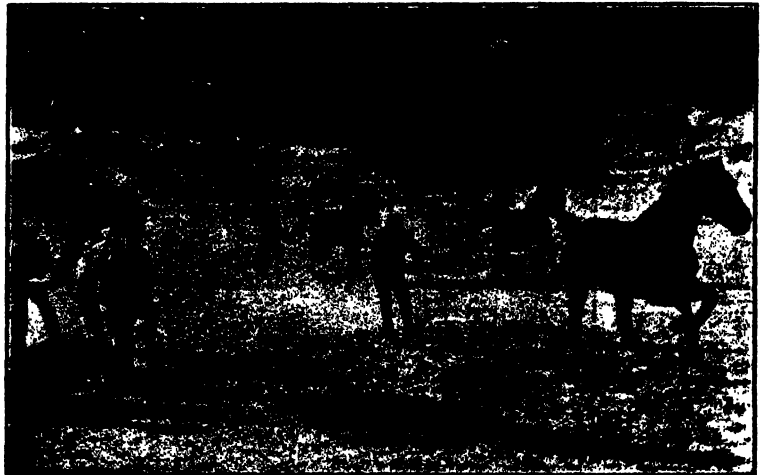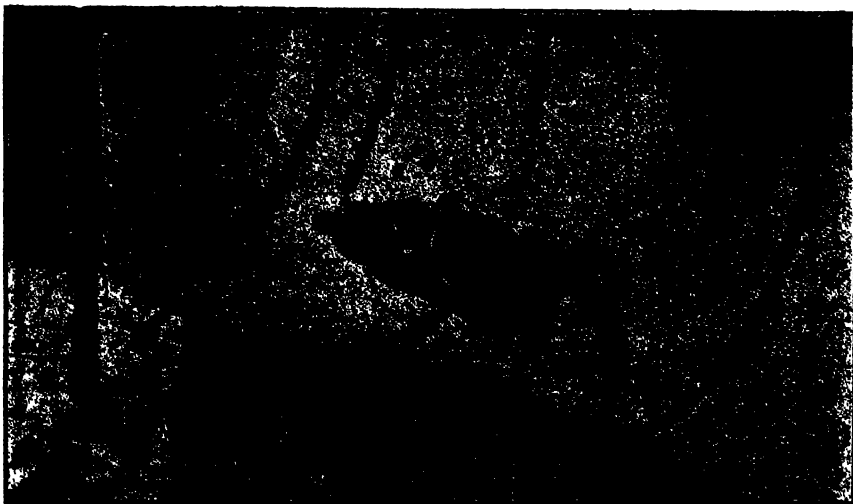
৫২

কলিকাতা

কলকাতায় সব দলবল নিয়ে উপস্থিত হয়েচি। আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ি একতলা থেকে তিনতলা পর্য্যন্ত কলরবে মুখরিত হ'য়ে উঠেচে; পা ফেলতে সাবধান হ'তে হয় পাছে একটা না একটা ছেলেকে মাড়িয়ে দিই, এমনি ভিড়। আমি অন্যমনস্ক মানুষ, কোন্ দিকে তাকিয়ে চলি তার ঠিক নেই। ওরা যখন-তখন কোনো খবর না দিয়ে আমার পায়ের কাছে এসে প'ড়ে প্রণাম করে। কখন্ তাদের মাটির সঙ্গে চ্যাপ্টা ক'রে দিয়ে তাদের উপর দিয়ে চ'লে যাব এই ভয়ে এই কদিন ধূলোর দিকে চেয়ে চেয়ে চলচি।

মেয়ের দলও এবার নেহাৎ কম নয়। মুটু থেকে আরম্ভ ক'রে অতি সূক্ষ্ম অতি ক্ষুদ্র লতিকা পর্য্যন্ত। ননীবালা তাদের দিনরাত সামলাতে সামলাতে হয়রাণ হ'য়ে পড়চে। কিন্তু আমাকে দেখবার লোক কেউ নেই; স্বয়ং এণ্ড্রুজ সাহেব পাঞ্জাবে আকালীদের নাকাল সম্বন্ধে তদন্ত করতে অমৃতসরে চ'লে গেচে। লেভি সাহেবেরা গেচেন বোম্বাই; বৌমা আছেন শান্তিনিকেতনে। সুতরাং আমাকে ঠিকমত শাসনে রাখতে পারে এমন অভিভাবক কেউ না থাকাতে আমি হয়ত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যেতে পারি এমন আশঙ্কা আছে। আপাতত যা-তা বই পড়তে আরম্ভ করেচি, কেউ নেই আমাকে ঠেকায়। তার মধ্যে লজিকের বই একখানাও নেই। এমনি ক'রে পড়া ফাঁকি দিয়ে বাজে পড়া প'ড়ে সাতাশ বছর কেটে গেল, এখন চেতনা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তার কোন লক্ষণ নেই।

আমি ভেবেছিলুম সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তোমাদের ছুটি; তা যখন নেই তখন শারদোৎসব দেখা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব; কারণ ওটা হচ্ছে ছুটির নাটক। ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েচে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েচে পাঠশালা থেকে। তাদের আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই কেবল একমাত্র হচ্ছে—"বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশী কাটবে সকল বেলা।" ওর মধ্যে একটা উপনন্দ কাজ করচে, কিন্তু সেও তার ঋণ থেকে ছুটি পাবার কাজ।

তোমরা যখন ছুটি পাবে আমরা তখন বোম্বাই অভিমুখে রেলপথে ছুটচি। কিন্তু সে পথ মোগলসরাই দিয়ে যায় না, সে হচ্ছে বেঙ্গল নাগপুর লাইন। তারপরে বোম্বাই হ'য়ে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ হ'য়ে মালাবার, মালাবার হ'য়ে সিংহল, সিংহল হ'য়ে পুনশ্চ বোম্বাই। এমনি বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরপাক খেতে খেতে অবশেষে একদিন নভেম্বর মাসের কোন্ তারিখে শান্তিনিকেতনে এসে একখানা লম্বা কেদারার উপর চিৎ হয়ে পড়ব। তার পরেই আবার সুরু হবে সাতই পৌষের পালা। তার পরে আরো কতকি আছে তার ঠিক নেই। ছুটির নাটক লিখলেই কি ছুটি পাওয়া যায়? আমি ইস্কুল পালিয়েও ছুটি পেলুম না, ইস্কুলের আবর্ত্তের মধ্যে লাটিমের মত ঘুরতে লাগলুম। অঙ্ক কষতে ঢিলেমি করলুম, আজ চাঁদার অঙ্কের ধ্যান করতে করতে আহার নিদ্রা বন্ধ। ইংরেজি প্রবাদে এই রকম ব্যাপারকেই ব'লে থাকে ভাগ্যের বিদ্রূপ।

এতদিন পরে আমাদের এখানে রৌদ্রোজ্জ্বল চেহারা দেখা দিয়েচে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু সে শরতের ক্ষণিক বৃষ্টি। দিন সুন্দর, রাত্রি নির্ম্মল, মেঘ রঙিন, বাতাস শিশির-

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্নিগ্ধ। এহেন কালে অতলস্পর্শ অকর্ম্মণ্যতার মধ্যে ডুবে থাকাই ছিল বিধির বিধি, কিন্তু ভাগ্যের লিখন বিধির বিধি-কেও অতিক্রম করে এই কথা স্মরণ ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এই পত্র সমাপন করি। ইতি, ২৪ ভাদ্র, ১৩২৯।

৫৩

শান্তিনিকেতন

ইতিমধ্যে আমার দৈনিক কার্য্যকলাপের একটুখানি scene বদলে গেছে। সেই বড় ঘরটা ছেড়ে দিয়েচি, সেটা রাস্তার ধারে থাকাতে যখন-তখন যে-সে এসে উৎপাত করত। এখন এসেচি দক্ষিণের বারান্দার পূর্ব্ব কোণে, নাবার ঘরটার ঠিক বিপরীত প্রান্তে, একটি ছোট ঘরে। এ ঘরটার গোড়াপত্তন তুমি বোধ হয় দেখেছিলে। আমার সেই কালো স্লেট-বাধান লেখবার টেবিলে ঘরের প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়ে গিয়েচে, কেবল আর একটিমাত্র চৌকি আছে। ঘরের মধ্যে লোকের ভিড় হবার জায়গা রাখিনি।

এখন মধ্যাহ্ন, কটা বেজেছে ঠিক বল্‌তে পারিনে কারণ আমার ঘড়ি বন্ধ। বন্ধ না থাকলেও যে ঠিক সময় পাওয়া যেত তা নয়; তুমি আমার সেই ঘড়ির পরিচয় জানো। এইটুকু বল্‌তে পারি কিছু পূর্ব্বেই একখানা পরোটা ডাল ও তরকারী সংযোগে আহার ক'রে লিখতে বসেচি।

রৌদ্র প্রখর, শরতের শাদা মেঘ স্তরে স্তরে আকাশের যেখানে-সেখানে স্ফীত হ'য়ে পড়ে আছে, বাইরে থেকে শালিখ পাখীর ডাক শুনতে পাচ্ছি, বামের রাস্তা দিয়ে কাঁচ ক্যাঁচ করতে করতে মন্দগমনে গোরুর গাড়ি চলেচে, আমার ডানদিকের দক্ষিণের জানলা দিয়ে কচি ধানের ক্ষেতের প্রান্তে সুদূর তাল গাছের সার দেখা যাচ্চে, তন্দ্রালস ধরণীর দীর্ঘনিশ্বাসটি নিয়ে আতপ্ত হাওয়া ধীরে ধীরে আমার পিঠে এসে লাগ্‌চে।

এ রকম দিনে কাজ করতে ইচ্ছে করে না, এই মেঘগুলোর মতই অকেজো হাওয়ায় মনটা বিনা কারণে দিগন্ত পার হ'য়ে ভেসে যেতে চায়। জানলার বাইরে মাঝে মাঝে যখন চোখ ফেরাই তখন মনে হয় যেন সুর-বালকেরা স্বর্গের পাঠশালা থেকে গুরুমহাশয়কে না ব'লে পালিয়ে এসেচে। আকাশের এ-কোণ ও কোণ থেকে সবুজ পৃথিবীর দিকে তা'রা উঁকি মারছে। হাওয়ায় হাওয়ায় তাদের কানাকানি শুনে আমার মনটাও উতলা হ'য়ে দৌড় মারবার চেষ্টা করচে।

কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর ভারাকর্ষণের টানে বাঁধা; মাটি আমাদের পা জড়িয়ে থাকে, কিছুতেই ছাড়তে চায় না। অতএব মনের একটা ভাগ জানলার বাইরে দিয়ে যতই উড়তে থাক, আর একটা ভাগ ডেস্কের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে পত্ররচনায় ব্যস্ত। দূরে কোথাও যদি যাবার ব্যবস্থা হয় মনটাকে রেলভাড়ার কথা ভাবতে হয়; দেবতার মত শরতের মেঘের উপর চ'ড়ে মালতী সুগন্ধী হাওয়ার হিল্লোলে বেণুবনের পাতায় পাতায় দোল খেয়ে খেয়ে বিনা ব্যয়ে ভ্রমণ ক'রে বেড়াতে পারে না। ইতি, ৩১ ভাদ্র, ১৩৩০।

৫৪

মান্দ্রাজ

এইমাত্র মান্দ্রাজে এসে পৌঁচেচি। আজ রাত্রে কলম্বো রওয়ানা হব। ইন্ফ্লুয়েঞ্জা ও নানা দুর্বিপাকের আঘাতে দেহ মন ভেঙে ছিঁড়ে বেঁকে চুরে গিয়েছিল, ক্লান্তি ও অব সাদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এসে বেরিয়েছিলুম।

গাড়ি যখন সবুজ প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে চলছিল তখন মনে হচ্ছিল যেন নিজের কাছ থেকে নিজে দৌড়ে ছুটে পালাচ্চি। একদিন আমার বয়স অল্প ছিল; আমি ছিলুম বিশ্বপ্রকৃতির বুকের মাঝখানে; নীল আকাশ আর শ্যামল পৃথিবী আমার জীবন-পাত্রে প্রতিদিন নানা রঙের অমৃত রস ঢেলে দিত; কল্পলোকের অমরাবতীতে আমি দেবশিশুর মতই আমার বাঁশী হাতে বিহার করতুম।

সেই শিশু সেই কবি আজ ক্লিষ্ট হয়েচে, লোকালয়ের কোলাহলে তার মন উদ্‌ভ্রান্ত, তারই পথের ধূলায় তার চিত্ত ম্লান। সে আপন ক্লান্ত বিক্ষত চরণ নিয়ে তার সেই সৌন্দর্য্যের স্বপ্নরাজ্যে ফিরে যেতে চাচ্চে। তার জীবনের মধ্যাহ্নে কাজও সে অনেক করেচে, ভুলও কম

করেনি ; আজ তার কাজ করবার শক্তি নেই, ভুল করবার সাহস নেই। আজ জীবনের সন্ধ্যাবেলায় সে আর-একবার বিশ্বপ্রকৃতির আঙিনায় দাঁড়িয়ে আকাশের তারার সঙ্গে সুর মিলিয়ে শেষ বাঁশী বাজিয়ে যেতে চায়। যে রহস্যলোক থেকে এই মর্ত্ত্যলোকে একদিন সে এসেছিল সেখানে ফিরে যাবার আগে শান্তিসরোবরে ডুব দিয়ে স্নান করতে চায়। তেমন ক'রে ডুব দিতে যদি পারে তা হ'লে তার জীর্ণতা তার ম্লানতা সমস্ত ঘুচে যাবে ; আবার তার মধ্য থেকে সেই চিরশিশু বাহির হয়ে আসবে।

সংসারের জটিলতায় ঘিরে ঘিরে আমাদের চিত্তের উপর যে জীর্ণতার আবরণ সৃষ্টি করে সেটা ত ধ্রুব সত্য নয়, সেটা মায়া। সেটা যে-মুহূর্ত্তে কুহেলিকার মত মিলিয়ে যায় অমনি নবীন নির্ম্মল প্রাণ আপনাকে ফিরে পায়। এমনি ক'রে বারে বারে আমরা নূতন জীবনে নূতন শিশুর রূপ ধরি। সেই নূতন জীবনের সরল বাল্যমাধুর্য্যের জন্যে আমার সমস্ত মন আগ্রহে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেচে।

আজ আমি চলেচি সমুদ্র পারে কাজের ক্ষেত্রে ; যখন সেই কাজের ভিড়ে থাক্‌ব তখন হয়ত আমার ভিতরকার কর্ম্মী আর-সকল কথা ভুলিয়ে দেবে। কিন্তু তবু সেই সুদূর গানের ঝরণাতলায় বাঁশীর বেদনা ভিতরে ভিতরে আমাকে নিশ্চয়ই ডাকবে। ডাকবে সেই নির্জ্জন নির্ম্মল নিভৃত ঝরণাতলার দিকেই। সেই ডাক আমার সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদের ভিতর দিয়ে আমার বুকের মধ্যে আজ এসে কুহরিত হচ্চে। বলচে, সেখানে ফিরে যাবার পথ এখনো সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি, এখনো আমার সুরের পাথেয় সম্পূর্ণ নিঃশেষ হ'য়ে যায়নি, এখনো সেই নব নব বিস্ময়ে দিশাহারা বালককে কোনো এক ভিতরমহলে খুঁজে পাওয়া যায়।

তাই, যদিও আজ চলেচি পশ্চিম সমুদ্রের তীরে, আমার মন খুঁজে বেড়াচ্চে আর এক তীরে সকল-কাজ-ভোলা সেই বালকটাকে। পূরবী গানে সে আপন লীলা শেষ করতে না পারলে সন্ধ্যা ব্যর্থ হবে ; এখন সে কোথায় ঘুরে মরচে। ফিরে আয়, ফিরে আয়, ব'লে ডাক পড়েচে। একজন কে তার গান শুনতে ভালবাসে। আকাশের মাঝখানে তার আসন পাতা, সেই ত শিশুকালে তাকে বাঁশীর দীক্ষা দিয়েছিল, নিশীথরাতের শেষ রাগিণী বাজানো হ'লে তার পরে তার বাঁশী ফিরে নেবে। আজ কেবলি সেই কথাই আমার মনে পড়চে। ইতি, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪।

(ক্রমশঃ)

শিল্পী শ্রীমতী সুনয়নী দেবী

শ্রীমতী নোরা পুরসার উইডেনব্র্যাক্ রচিত

বংশীবাদন শ্রীকৃষ্ণ

[গত ১লা অক্টোবর ১৯২৭ লণ্ডন সহরে Women's International Art Club-এর উদ্যোগে এক শিল্পপ্রদর্শনী খোলা হয়। তথায় শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর কতকগুলি ছবি দেখান হইয়াছিল। নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি সেই ছবি গুলির উদ্দেশে লেখিকা কর্তৃক জার্ম্মাণ ভাষায় লিখিত। লেখিকা লণ্ডন সহরে ভূতপূর্ব্ব অষ্ট্রীয়ান্ রাজদূতের কন্যা। ইঁহার অনেকগুলি চিত্র মিউনিক, ভিয়েনা এবং ফ্লরেন্স নগরীতে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে ইনি লণ্ডনে বাস করিতেছেন। লেখিকার রচিত কবিতা নাটক ও উপন্যাস অনেকগুলি আছে।]

বহুদূরের এক প্রান্তর থেকে সুনয়নী দেবীর এই চিত্রগুলি আমাদের নিকট উপস্থিত। নানাদিক হ'তে বিভিন্নভাবে আমাদের এই ছবিগুলিতে মন মুগ্ধ করেছে। চিত্রদর্শনে এক অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার বেদনা মনে জেগে থাকে। ইচ্ছা হয় চ'লে যাই সেই পরীর দেশে যেখানে ঐ শ্যামকান্তি, শান্তশ্রী, পদ্মআঁখি দেবতারা বাস করেন। এই ধ্যানমগ্ন দেবতারাই তাঁদের নিজেদের রূপ দিয়ে জগতের বিচিত্র রূপের প্রলয়ের মধ্য থেকে সৃষ্টির আসলরূপটি ফুটিয়ে তুলছেন। তাই সীমাহীন ক্ষীণ রেখাটুকুর মধ্যেও সেই দেবতাদের প্রশান্ত স্তব্ধ কল্পমূর্ত্তি ধরা দিয়েছে।

শুধু একমাত্র ছন্দের গতিতে রচিত এই চিত্রগুলির মৃদু রেখাকম্পনে আর সীমাহীন অনন্ত মায়ারূপ সৃষ্টিতে বর্ত্তমান যুগের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির খানিকটা মিল দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু কেবল সাদা আর কালোয় সমস্ত রং ছাপিয়ে এই ছবিগুলিতে যে অপূর্ব্ব রং ফুটে উঠেছে, সে ভোলবার নয়। মনে হয় যেন এইগুলি সেই পুরাকালের জল ঝড়ে জর্জ্জরিত দেয়ালের গায়ে আঁকা প্রাচীন চিত্রাবলী। মাঝে মাঝে হঠাৎ ভাগ্যলক্ষ্মীর অযাচিত দানের মতন কখনও কখনও স্নিগ্ধ লাল রং গভীর নীল রং এর মাঝ দিয়ে শোভা পাচ্ছে। আর তারি মধ্যে দেবতাদের প্রশান্ত চোখের চাহনি আর বিচিত্র অলঙ্কারের জ্যোতি জল জল করছে।

এই ছবিগুলি আকারে ছোট হলেও ভাবগৌরবে যেন সমস্ত দেওয়াল জুড়ে আছে। বহু যুগ আগেকার নিঃশ্বাস ইহাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে। যেন এক অপার্থিব গৌরবের

বলরাম

বৃষ্টিধারা ছবিগুলি থেকে ঝরে পড়েছে। নানা রকমের রচনার ভিতর থেকে একটি অখণ্ড ভাব এই চিত্রগুলিতে অপ্রতিহতভাবে প্রকাশ। সেই ভাবটি হচ্ছে বিশ্বের উপরে আসীন একমাত্র পরম দেবতার উপর ঐকান্তিক নিষ্ঠা। নূতন কিছু করবার বৃথা প্রয়াস বা সাধারণ প্রচলিত ধারা থেকে জোর ক'রে বিচ্ছিন্ন হবার চেষ্টা সুনয়নী দেবীর শিল্পে একেবারেই নাই।

সুনয়নী দেবী রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং আধুনিক বাংলা শিল্প-পদ্ধতির প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগিনী। সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁহার জন্ম। শান্তিময় অন্তঃপুরই তাঁহার কর্ম্মস্থল। এই অন্তঃপুরের প্রত্যেকটি ছোটখাট জিনিষও সম্পূত ধর্ম্মভাবে উজ্জ্বল; সব মিলে যেন একটি সুরের ধারা বইছে। এই সুর যখন মৃদুগতি থেকে উচ্চগ্রামে ওঠে, কণ্ঠস্বর যখন মুর্চ্ছনায় কাঁপে তখন সুপ্ত অন্তরাত্মা এক আকুল

গৌরীশঙ্কর

শ্রীমতী নোরা পুরসার উইডেনব্যাক্ রচিত
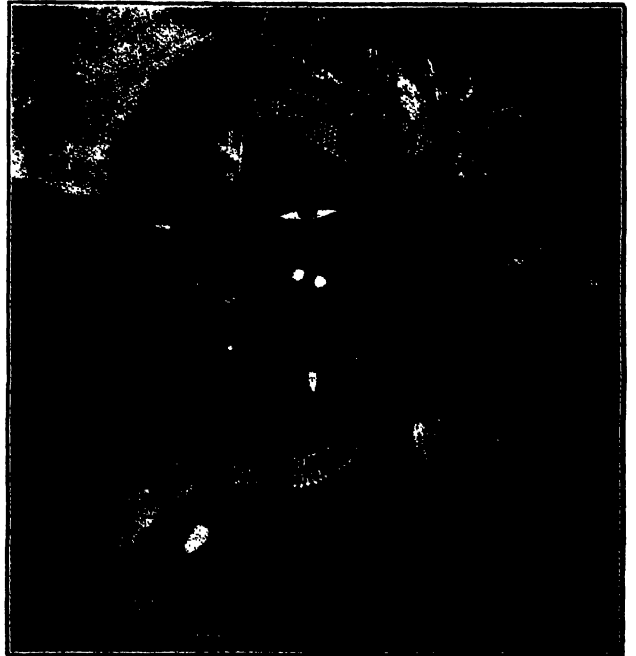
আবেগে চঞ্চল হয়ে ওঠে। অজানা কানেও সেই অপরিচিত সুর চিরকাল বাজ্‌তে থাকে।

সুনয়নী দেবীর ছবিগুলিতেও এই সুরেরই গভীর অনুভূতির প্রকাশ। বংশীবাদন শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর পাশে বিকশিত পুষ্পের মতন বলরামের প্রতিমূর্ত্তিতে এই সুরেরই তাল বাজ্‌ছে। গৌরীশঙ্কর নামে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে এই সুরের ছন্দের সমাবেশ অতিশয় কঠিন কাজ—কিন্তু তাহাও এই চিত্রে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে।

ছবিগুলির মধ্যে কেবল একটিমাত্র চিত্র পার্থিব ব্যাপার নিয়ে রচিত। শিল্পী ইহার নাম দিয়াছেন "প্রসাধন।" কিন্তু এই কিশোরী কন্যার নয়নকোণের কাজলরেখা এবং রহস্যময় ক্ষীণ হাসিটুকু এ জগতের নয়—কোনো এক মায়া জগতের ছায়া মাত্র।

সুনয়নী দেবীর শিল্পে দেবতায় মানুষে প্রভেদ সামান্যই। মনের আবেগ যেমন পরপারের সঙ্গীতে ক্ষণিকে মিলিয়ে যায়, চকিতে যেমন মৃদুহাসি মুখে ফুটে ওঠে—প্রভেদ সেই-রকমই অল্প মাত্রার।

প্রসাধন

বাগানে

—গল্প—

—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুরোণো বাগানের বুড়ো মালী সকালে সন্ধ্যায় কাজে লেগেই থাকে—বাগানের কাজে বাগিচার কাজে। ফল-ধরাতে ফুল ফোটাতে ওস্তাদ সে মালী। মালীর হাতের বাগানখানি রঙীন ফুলে সবুজ পাতায় রসালো ফলে ভরাই থাকে ছয় ঋতু বারো মাস!

সে কত কী স্বপ্ন—রঙের স্বপ্ন রসের স্বপ্ন আলোর স্বপ্ন ছায়ার স্বপ্ন দিয়ে গড়া সেই বাগানের ভিতরেই বুড়ো মালীর মাটির ঘর, সেখানে থাকে তার কুট্‌ফুটে ছেলেটি—সে যেন আকাশের পাখীটি খাঁচায় ধরা! সুন্দর বাগানে সেই সুন্দর বালক ঘোরে ফেরে হাসে কাঁদে খেলে, দেখায় সে কেমন তা মনই জানে, সে বনই জানে, ও সে ওস্তাদ সেই বুড়ো মালীর পুরোণো বাগানই জানে।

ঝড়বাদলে সে একদিন ফুলে ফুলে ফুলন্ত এতটুকু একটি নতুন গাছের কচি ডাল ভিজে ঘাসে এলিয়ে পড়েচে,—সে যেন অঘোরে ঘুমিয়ে আছে সবুজ ঝর্ণাটি। একেই নিয়ে কথা বুড়োতে ছেলেতে।

বৃষ্টি-ধোয়া সকালের আকাশখানি, সোনালি রোদের স্পর্শ যেন পদ্মমধুর মত মিঠে হলুদবর্ণ, নতুন গাছের বাসিন্দা পাখী ঝড়ে-এলিয়ে-পড়া কচি ডালে ব'সে আছে চুপটি ক'রে, ভাঙা ডালের ফুলের উপর ব'সে আছে প্রজাপতি—সেও নড়ে না চড়ে না— পাখী প্রজাপতি দুজনেই বাসা হারিয়ে দুঃখ বাসে।

এই সময় মালীর ঘরের দরজা খোলে—একটুখানি শব্দ দিয়ে বা'র হয় মালিনী, ফুলের খোঁজে চায় এধার ওধার। দেখে স্থলপদ্মের ঝাড় হেলে-পড়া, ছেলেকে ডেকে বলে—একে তুলে দে মাচানে।

ছেলে তুলে ধরতে চায় গাছ—পারে না; ফুলগাছ যেন ঘুমঘোরে ঢুলে ঢুলে পড়তেই চায়! ছেলে দুই হাতে গাছকে জড়িয়ে ধ'রে বলে— ওঠো ওঠো। গাছ বলে— না না, ঘুম-ঘুম করে আমার পাতা!

এতে ওতে জড়াজড়ি— ডালে পালায় ফুলে পাতায় আর ছেলেতে মিলে ঝিলিমিলি খেলা; এর চোখের আলো ওর শিশির ভেজা ফুলের রঙে মিলে যায়। ফুলগাছ আপনার বোঝা নিয়ে ছেলের কাঁধে দেয় ভর—ফুলে ফুলে ফুলন্ত ভার—ঘুমে ঘুমে ঘুমন্ত পাতার জলে-ধোওয়া সবুজ রঙের ভার; ছেলের মুখে ভার বইতে আনন্দ, বুকে ভার সইতে বেদনা। আলোছায়া এরি উপর ঝিলিমিলি ঢেউ টেনে চলে।

দুয়োরে দাঁড়িয়ে মালিনী দেখে শোভা। এ যেন বাগানে দুই মায়ের দুই ছেলেতে খেলা— ঘরের মা বাইরের মা, ঘরের ছেলে, বাইরের ছেলে, দুয়ে মিলে গলাগলি লুটোপুটি খোলা আঙিনায় রৌদ্র ছায়ার বাদলধোয়া মাটির উপরে।

মালিনী চলে রাতে ঝ'রেপড়া ফুলে ফুলে সাজি ভ'রে নিতে, মালী বার হয় বাগানের তদারকে কাটারি-বাঁশ দড়ির বোঝা হাতে।—ছেলে খেলা থেমে যায়, কাজ সুরু হয় বাগান পরিষ্কারের, ছোটো ছেলের হাতেও ওঠে খোন্তা। ছেলেকে ডেকে বলে মালী—উপড়ে ফেল ওটাকে, গাছটা মরেছে। ভেঙেপড়া ফুলগাছের গোড়ায় গোড়ায় পড়ে তখন ক্ষুর-ধরে অস্ত্র বিদ্যাতের সমান ছোট হাতের তালে তালে—উপড়ে ফেলে গাছ মালী।

আধুনিকতম সাহিত্য

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?"—

স্বর্গ হইতে পৃথিবীর উপরে কবি বৈষ্ণবের গান নামাইয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে আমরা আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া গিয়াছি—আমরা চাহিতেছি পৃথিবী হইতেও বৈষ্ণবের গান নামাইয়া, পৃথিবীর নীচে পাতালে বা রসাতলে কোথাও তাহার জন্য আসর করিয়া দিতে।

দেবতার লীলা অবশ্য বহুপূর্ব্বেই আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। তারপরে এতদিন আমরা ধরিয়া ছিলাম মানুষের খেলা। এখন মানুষকেও বাতিল করিয়া দিতেছি, মানুষকে ছাড়িয়া বর্ত্তমানে আমরা ব্যস্ত পশুকে লইয়া। লাতিন কবি তেরেন্স (Terentius) যে মন্ত্রে মানবিকতার আদর্শ দিয়া গিয়াছিলেন, "মানুষ আমি, মানুষের সম্পর্কিত যাহা তাহা কিছুই আমার পর নয়," * অথবা বিদেশে বিভূঁইয়ে যাইতে হইবে কেন, আমাদেরই ঘরের সাধক কবি চণ্ডীদাস যে মন্ত্র দিয়াছেন—

> শুনহ মানুষ ভাই
> সবার উপরে মানুষ সত্য
> তাহার উপরে নাই—

সেই মন্ত্রই আজও আমাদের, তবে যেখানে যেখানে 'মানুষ' কথাটি আছে তাহা ভুলিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতেছি "পশু"।

এক যুগে দেবতা আর দেবত্বই ছিল সৃষ্টির সকল রহস্য, তাহার মূল সত্য ও শক্তি; তারপর আর এক যুগে দেবতা অন্তর্দ্ধান করিল, আসিল মানুষ—মানুষ আর মানুষত্বই হইল সৃষ্টির সকল রহস্য, তাহার মূল সত্য ও শক্তি। এখন আবার তৃতীয় এক যুগ আসিয়াছে দেখিতেছি, মানুষ ও মানুষত্ব তাহার প্রাধান্য হারাইয়াছে; এখন সৃষ্টির সকল রহস্য তাহার মূল সত্য ও শক্তি স্থাপিত পশু ও পশুত্বের মধ্যে।

অবশ্য আমরা মানুষেরই জগতের কথা বলিতেছি—মানুষই ছিল দেবতা, মানুষই হইয়াছিল মানুষ, আবার মানুষই এখন হইতে চলিয়াছে পশু। মানুষের অন্তরের চেতনার বিবর্ত্তন তাহার শারীর বিবর্ত্তনের বিপরীত পথে চলিয়াছে দেখিতেছি।

* * * * * *

প্রাচীনতর প্রাচীনতম সাহিত্যে—মানুষভাবের দেবভাবের সাহিত্যের মধ্যে পশুর প্রভাব কি ছিল না? ছিল, যথেষ্টই ছিল—নতুবা বৈদিক ঋষির মুখ দিয়া কখন বাহির হইতে পারিত না—

> যত্র দ্বাবিব জঘনাধিষবণ্যা কৃতা।
> উলূখল সুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ॥ (ঋগ্বেদ ১।২৮।২)

কিম্বা কালিদাসের হাত দিয়া "শৃঙ্গারতিলক"ও রচিত হইত না। অতদূরের দেশে কালে কেন, আমাদের ভারতচন্দ্র মানুষের লীলার যে চিত্র দিয়া গিয়াছেন তাহা স্পষ্টতায়, বে আব্রুতায় অতি আধুনিকেরও সহিত সমানে টক্কর দিয়া চলিতে পারে। চুম্বন আলিঙ্গন কেবল একালের সাহিত্যের কথা নয়, তাহা চিরকালের সাহিত্যের কথা। তবে আধুনিকের দোষ কোথায়? দোষ কি না, আপাতত সে বিচার আমরা করিতে বসি নাই, বলিতেছি আধুনিকের বিশেষত্বের কথা। প্রাচীনের শৃঙ্গার বা আদিরস যতই স্থূল যতই রূঢ় হৌক না কেন—তাহা আধুনিকের Freudian libido বা "কামায়ন" নহে।

আধুনিক কামায়নের বিশেষত্ব কি? আধুনিক কামায়নের পিছনে আছে গোটা একটি দর্শন, সমস্ত মানুষটিকে দেখিবার ও বুঝিবার একটি বিশিষ্ট ধারা, তাহার আকৃতি প্রকৃতি ধর্ম্মকর্ম্ম বিষয়ে, তাহার সামাজিক ও পারিবারিক সম্বন্ধ বিষয়ে একটা সম্পূর্ণ শাস্ত্র বা থিওরি। সেই শাস্ত্রের মূল সূত্র এই—মানুষ প্রথমতঃ ও শেষতঃ হইতেছে পশু। পাশবিক এষণা ও প্রেরণাই তাহার ব্যক্তিগত ও

---

* "Homo sum : humani nil a me alienum puto."

গোষ্ঠীগত সমস্ত জীবনকে গঠিত নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহার অন্তরের বাহিরের অভিব্যক্তি আনিয়া দিতেছে। উপরে উপরে অন্যরকমের যাহাকিছু রঙচঙ দেখি না কেন, তাহা শুধু—বিষকুম্ভং পয়োমুখম্. পশুটিকে ঢাকিয়া চাপা দিয়া রাখিবার প্রয়াস। কবিতাই রচনা কর, দেশোদ্ধার করিতেই থাক, আর অধ্যাত্মেরই সাধনা কর, মূলতঃ সেই পশুসুলভ যৌনবৃত্তিটাই ধরিয়া তুমি চলিয়াছ, তাহাকেই একটা ভদ্র পোষাক দিতে চেষ্টা করিতেছ। মানুষের সমস্ত সভ্যতাই হইতেছে—কার্লাইল যে অর্থে বলিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অনেক গভীরতর ও গুরুতর অর্থে—"পোষাকী" সভ্যতা। আসল খাঁটি দিগম্বর সত্যের আবরণ আচ্ছাদন অবগুণ্ঠনেরই অন্য নাম সভ্যতা। ধরিয়া একটু টানাটানি করিলেই উহা খসিয়া পড়ে—হাজার সভ্য হোক একটু আঁচড়েই মানুষের ভিতর হইতে তাহার শাশ্বত পশুটি বাহির হইয়া আসে।

বিজ্ঞান তাহার রূঢ় আলোক-শলাকা দিয়া আমাদের জ্ঞানের চক্ষু এইভাবে খুলিয়া দিয়াছে; তাই সত্যকে যথাযথ দেখিতে ও দেখাইতে আমাদের ভয় নাই, কুণ্ঠা নাই—সত্যমেব জয়তে নানৃতং।

প্রাচীনতর যুগ মানুষকে, মানুষের কামবৃত্তিকে এমন করিয়া দেখে নাই। প্রথমতঃ, কাম ছাড়া মানুষের মধ্যে প্রাচীনেরা আরও অন্যান্য বৃত্তি দেখিয়াছিলেন; কামকে তাঁহারাও একটা প্রধান বৃত্তি বলিয়াই অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সেই হেতু অপরাপর প্রধান বৃত্তিকে অস্বীকার করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। আর কামবৃত্তির মত এই সকল বৃত্তিরও প্রত্যেকেরই আছে যে স্বতন্ত্র সার্থকতা, এ কথাও তাঁহারা বিস্মৃত হন নাই। মানুষের সকল অঙ্গ সোজাসুজি একটিমাত্র অঙ্কে "সরল" করিয়া ধরিতে তাঁহারা চেষ্টা করেন নাই। দ্বিতীয় কথা এই, যৌন-আবেগকে অতি-প্রধান স্থান দিলেও তাঁহারা ও জিনিষটিকে কেবলি একটা পাশব বৃত্তি হিসাবে দেখিতেন না, উহা ছিল তাঁহাদের কাছে একটা প্রতীক—আনন্দের, ঐক্যের, নিবিড়তার, গভীরতার প্রতীক। বৈষ্ণব কবি যখন বলিতেছেন—

মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া
বঁধুয়া করল কোলে।
চরণ উপরে চরণ পসারি
পরাণ পাইনু বলে॥

তখন শুধু শারীর মিলনটিই একান্ত সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া বোধ করি কি? না, শরীরকে আশ্রয় করিয়া যে গভীরতর মিলন, প্রাণের অন্তরাত্মার মিলন প্রকাশ পাইতেছে সেইটিই আমরা সকলের উপরে বিশেষ করিয়া অনুভব করি? পক্ষান্তরে শুনুন আধুনিকের কথা—

তার নিধুবন-উন্মন
ঠোঁটে কাঁপে চুম্বন
বুকে পান যৌবন
উঠিছে ফুঁড়ি',
মুখে কাম-কণ্টক ব্রণ
মহুয়া কুঁড়ি!

এখানে সকল আনন্দ কেবল শরীরের মধ্য হইতেই কবি খুঁড়িয়া বাহির করিতে চাহিতেছেন; শরীর ছাড়া মানুষের আর যে কিছু আছে তাহার ইঙ্গিতও কিছু পাই না।

আরও কথা আছে। প্রাচীনেরা শৃঙ্গারবৃত্তিকে দেখিতেন একটা সুস্থ সুন্দর প্রফুল্ল প্রেয়, এমন কি শ্রেয় বৃত্তি রূপে। কিন্তু আধুনিক যুগে জিনিষটিকে যেভাবে দেখান হইয়া থাকে, তাহাতে মনে হয় ইহা যেন একটা দারুণ ব্যাধি, অথচ তাহা শোধরাইবার সামর্থ্য মানুষের নাই (হয়ত বা সে চেষ্টা করাও মানুষের কর্ত্তব্য নয়)—কারণ, এ ব্যাধি মানুষের অস্থিমজ্জাগত, মানুষের স্বভাব ও স্বরূপগত; কিম্বা তাহা যেন একটা বিরাট ক্ষুধা, তবু তাহার পরিতৃপ্তিতে সুখ নাই; এ যেন একটা কঠিন নিয়তি, তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই, অবশ হইয়া মানুষ তাহার কুম্ভীপাকে ঘুরিয়া মরিতেছে—ভ্রাময়ন্ যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।

বৃত্তিটির স্বভাব ও স্বরূপ যেরকম একটা কঠোরতায় নিরানন্দে গঠিত, তেমনি যে আবহাওয়ায় তাহা খেলিতেছে তাহাও তদনুরূপ বিষাক্ত। দৈন্য, দারিদ্র্য, দ্বেষ, নৃশংসতা, বীভৎসতা—সকল রকম ক্লেদ ও দুস্থতাই যেন হইয়াছে

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

মানুষের স্বাভাবিক ভূষণ, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা সত্যকার আপনকার বিত্ত, তাহার অঙ্গেরই অঙ্গ।

পশুর কথা বলিতেছিলাম—কিন্তু পশুও নয়, পশুর বিকৃতি এ যেন একটা পিশাচ প্রমথের ডাকিনী যোগিনীর জিনদানার জগৎ। প্রকৃতির মধ্যে কোথাকার একটি অজানা অচেনা অন্ধকার গহ্বরের মুখ, কোন দিককার আশেপাশের একটা চোরা কুঠরীর দুয়ার—একটা কি নিষিদ্ধ পথ—যেন হঠাৎ খুলিয়া গিয়াছে, তাহারই মধ্যে আমরা বিষম ঔৎসুক্যে লোভে লালসায় মত্ত হইয়া ধাইয়া চলিয়াছি।

জোলা (Zola) বা মোপাসাঁ (Maupassant) যে রকম মানুষ দিয়া তাঁহাদের জগৎ গড়িয়াছেন তাহারা পশু অপেক্ষা খুব বেশি উপরের স্তরে নয়; কিন্তু সে পশুতে আছে একটা সরলতা, একটা স্বাস্থ্য, একটা অসংস্কৃত হৌক স্থূল হৌক তবুও একটা আনন্দ। আর আজ Camille Mauclair বা Rene Maran মানুষ-পশুর যে রূপ দিয়াছেন তাহাতে বে-আব্রুতার পরাকাষ্ঠা নাই বটে, কিন্তু উহাই তাহার বৈশিষ্ট্য নয়। সে বৈশিষ্ট্য বাহিরের স্থূলত্বে নয়, কিন্তু প্রাণেরই একটা বিশেষ ছন্দে। আধুনিকের প্রাণের গতিতে অভাব- সরলতার, অভাব স্বাচ্ছন্দ্যের—তাহা কুটিল জটিল, তাহা আত্মপীড়নে জর্জ্জরিত; প্রতি আবেগে সে অতিমাত্র সাহস দেখাইতে চাহে বটে, কিন্তু সে সাহসের অন্য নাম দুঃসাহস; নির্ব্বিবাদে চলা নয়, সে বাধা বিপত্তিকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের সাথে যুদ্ধ করিতে করিতে চলিতে চায়; সহজ জ্ঞান সহজ আনন্দ নয়, কিন্তু নিষিদ্ধ যাহা কিছু, যাহা কিছু খোলাখুলির এপাশে ওপাশে তেমন জিনিষের উপর তাহার লোলুপ দৃষ্টি।

জাঁ জিরোদু (Jean Giraudoux) বা দ্রিয়া লা রোশেল (Drieu La Rochelle) বে-আবরু মানুষ-পশু বিশেষ কিছু আঁকিয়া দেখান নাই; অথচ তাঁহাদের মধ্যেই আধুনিকত্ব স্পষ্ট হইয়া ধরা দিয়াছে।* তাঁহাদের জগতে যখন প্রবেশ করি তখন বোধ হয় যেন কি একটা অস্বস্তি, অস্পষ্টতার মধ্যে নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে—শরীরের স্থূল রূপ সেখানে বড় কথা নয়, কিন্তু শারীর চেতনার উপাদান, তাহার মূলতত্ত্বই হইতেছে যেন বুভুক্ষা, অস্বাস্থ্য, হতাশ, হাহাকার—জীর্ণ দীর্ণ দুঃস্থ সত্তা সেখানে কি সব লুকান জগতের দুর্ব্বার কামনা লইয়া অশনায়া-তাড়িত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সময় সময় মনে হয় এ যেন শ্মশান-কালীর বীভৎস বিকট নৃত্য। চিত্রকলার জগতে আধুনিক শিল্পের এই ভিতরের দিকটা বোধ হয় খুব স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে। Georges Rouault, Modigliani প্রভৃতি ফরাসীর আধুনিকতম কয়েক জনের ছবি দেখিয়া আমার মনে পড়িয়াছে কেবলই ডাকিনী যোগিনীর কথা; এমন কি, নিকলাস রোরিক (Nicholas Roerich) পর্য্যন্ত এমন ধারা জগতেরই অধিবাসী বলিয়া আমি বোধ করি।

কবি দান্তের নরকেরই মত আধুনিক সাহিত্য-জগতেরও দুয়ারে যেন লেখা আছে—"সকল আশা বিসর্জ্জন দাও, কে তোমরা এখানে প্রবেশ করিতেছ"—তবে দান্তে যন্ত্রণার লাঞ্ছনার যতরকম প্রকারভেদই আবিষ্কার করিয়া থাকুন না, আধুনিকের চেতনার, অনুভূতির মধ্যে যে সূক্ষ্ম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার তরঙ্গ সব চলিয়াছে তাহার কোন সন্ধান তাঁহার যুগে তিনি পান নাই। আধুনিকের অন্তরাত্মা মূর্ত্ত ট্র্যাজেডি; এই ট্র্যাজেডি বাহিরের রূপের বা ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করিতেছে না—তেমন ট্র্যাজেডি ত আরোপ মাত্র। ট্র্যাজেডির বস্তু জমাইয়াই যেন আধুনিকের অন্তরাত্মা গড়া হইয়াছে, সেই অন্তরাত্মার স্বাভাবিক চলনে বলনেই ট্র্যাজেডি ফাটিয়া পড়িতেছে। আধুনিকে জানিয়া শুনিয়া যেন সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় দুঃখ-ক্লেশের হাতে আপনাকে তুলিয়া দিয়াছে। প্রাচীনের অন্ধকার হইতেছে অজ্ঞানের অন্ধকার; আধুনিক চেতনার অন্ধকার—তাহার অপেক্ষা আরও অন্ধকার, কারণ তাহা জ্ঞানের অর্থাৎ অতিজ্ঞানের অন্ধকার—

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

*** ***

মানুষের—কবির কণ্ঠে আজ যে রসাতলের বাণী মুখরিত, তাহার গোড়া খুঁজিতে সুদূর অতীতেরই মধ্যে যাইতে হয়।

---

* ইংরাজী সাহিত্য সংযমের শ্লীলতার শালীনতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া চলিতে খুবই গররাজী। আধুনিকদের মধ্যে যাঁহারা এই দিক দিয়া কিছু চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে Sinclair, Beresford, Joyce প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

কিন্তু উষ্ণ প্রস্রবণের মত এ দেশে সে দেশে একালে সেকালে কখন কদাচিৎ পৃথিবীর আবরণ দীর্ণ করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিলেও, জিনিষটা ছিল আকস্মিক আর তাহার ধরণ ধারণও ছিল অন্য রকমের।* কিন্তু বর্ত্তমানে রসাতল যেন একটা বিকট আগ্নেয়গিরির মত ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে—ধূমে ভস্মে গলিত ধাতুস্রাবে মানুষের সমস্ত চেতনার ক্ষেত্র অভিক্রত করিয়া চলিয়াছে।

ব্যষ্টি হিসাবে নয়, কিন্তু সমষ্টি হিসাবে একটা অগ্ন্যুৎপাত, সামাজিক একটা ভূকম্প সুরু হয় ফরাসী বিপ্লব দিয়া। 'বুরবন' সিংহাসনের পতনের সাথে সাথে, আভিজাত্য জিনিষটাও ধ্বসিয়া গেল—আর সমাজের তলা হইতে উঠিয়া আসিল দুঃস্থতা কদর্য্যতা, যত ক্লেদ যত ময়লা (Les miserables)। সেই বিপ্লবের নেতা যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদেরই দিকে একটু দৃষ্টিপাত করুন, কেমন ধারা লোক ছিলেন তাঁহারা। Marat, Danton এমন কি Mirabeau পর্য্যন্ত সকলেই সাধারণ অবস্থায় থাকিলে, ব্যক্তিগত মর্য্যাদার দিক দিয়া apaches (ফরাসী গুণ্ডা)হইতে খুব দূরে আসন পাইবার যোগ্য কি না সন্দেহ। কিন্তু তবুও, এই বিপ্লবের যুগে বা তাহার ফলে সমাজের মনোময় ক্ষেত্র আক্রান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে নাই, কাব্যের শিল্পের জগৎ কিছু ধাক্কা খাইলেও তাহার সমুচ্চ সৌন্দর্য্য, আভিজাত্য অনেকখানি অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছিল।

শিল্প সমাজে পঞ্চম বর্ণ সম্পূর্ণ জাগিয়াছে গত ইউরোপীয় যুদ্ধের পর হইতে। সারা জগতে আজ "বোলশেভিক" বা "প্রোলেটেরিয়াট্" সাহিত্য মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ, রুষ যে আধুনিক এই সৃষ্টিধারার নেতা হইয়া উঠিবে, তাহা খুবই স্বাভাবিক। মোটের উপর রুশ-সাহিত্য গোড়া হইতেই ছিল নিপীড়িতের দীনের হতাশের অভিশপ্তের দীর্ঘশ্বাস। সমাজের মধ্যে যে সব আদর্শ মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে পারে নাই, যে সকল আশা আকাঙ্খা কারাগারে দূর বনবাসে বৃথা আক্রোশ করিয়া মরিয়াছে, যে সকল প্রেরণা যে সকল আবেগ, যে সকল শক্তির ধারা চাপে পড়িয়া মাটির নীচে চেতনার তলদেশে আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদেরই অভিব্যক্তি-প্রয়াস হইতেছে রুশ-সাহিত্য। তাহারই বীজ সারা জগতে সকল দেশের সাহিত্যে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। আজকালকার সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যই হইতেছে এই যে, তাহাতে আলো অপেক্ষা উত্তাপ বেশি, উত্তাপ অপেক্ষা দাহ বেশী—আনন্দ অপেক্ষা ব্যথা বেশী, ব্যথা অপেক্ষা জ্বালা বেশি—প্রসারতা অপেক্ষা তীব্রতা বেশি, তীব্রতা অপেক্ষা কুটিলতা বেশি—স্থৈর্য্য অপেক্ষা গতি বেশি, গতি অপেক্ষা ঘূর্ণী বেশি।

*** ***

বাংলা সাহিত্যের গায়ে এই বিশ্বের হাওয়া লাগিয়াছে। তবে ইউরোপে এই হাওয়া হইতেছে একটা তুফান বা দারুণ ঝাপ্‌টা—অনেক কিছুই ইহার ফলে ভাঙ্গিতেছে চুরিতেছে, ওলট হইতেছে, পালট হইতেছে। আমাদের দেশে ব্যাপার এখনও ততদূর গড়ায় নাই। আধুনিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, ইউরোপেরই মনের প্রাণের একটা বিপর্য্যয়ের ফলে, ইউরোপের চেতনার ধারার সহিত তাহার রহিয়াছে জীবন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। আমাদের দেশের চেতনায় সে সকল জিজ্ঞাসা সজীব সার্থক হইয়া দেখা দেয় নাই—এখনও তাহারা অনেকখানি আমাদের খোসখেয়ালের কথা, জীবনের প্রয়োজন হইতে বা অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি হইতে তাহারা উঠিয়া দাঁড়ায় নাই। তাই দেখি আমাদের মধ্যে অধিকাংশের হাতে আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে, একটা ঢঙে পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে।

তবুও স্বীকার করিব, আজ যাঁহারা বঙ্গবাণীর জন্য নৈবেদ্য আহরণ করিতে গিয়া পাতাল রসাতল চুঁড়িতেছেন, সাহিত্যের সাধক যাঁহারা সত্য সত্যই হাতে হাতিয়ারে "লজ্জা ঘৃণা ভয়" এই তিনকে বিসর্জ্জন দিয়া বসিয়াছেন, এই যে সব অবধূতমার্গী অঘোরপন্থী তাঁহাদের সকলেই স্রষ্টা হিসাবে যে অক্ষম অপটু তাহা নয়। একাধিকে হয়ত শিল্প রচনায়

* আমার এখানে মনে হইতেছে ফরাসী কবি বোদেলের-এর কথা। বোদেলের রসাতলের মুখ কিছু উন্মুক্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি রসাতলের অধিবাসী ছিলেন না, মনে হয় পথ ভুলিয়া হোক, ইচ্ছা করিয়া হোক স্বর্গেরই এক অধিবাসী (এঞ্জেল) রসাতলে গিয়া পড়িয়াছে। তা ছাড়া, তাঁহার কথার মধ্যে যাহাই থাকুক, ভাবে ভঙ্গিমায় ওতঃপ্রোতঃ একটা আভিজাত্য, একটা classicism আছেই।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

দিক দিয়াই দেখাইয়াছেন বিশেষ ক্ষমতা ও নৈপুণ্য—বাংলা সাহিত্য, ভাষা ও ভাব উভয় হিসাবে, তাঁহাদের হাতে পাইয়াছে একটা বিশেষ পুষ্টি ও ঋদ্ধি ; তবে কথা এই, এই শিল্প হইতেছে মুখ্যতঃ ও মূলতঃ পশু-পিশাচের, প্রেত-প্রমথের হিন-দানার * শিল্প, দেবতার শিল্প মানুষের শিল্প যাহা, তাহা অন্য ধরণের বস্তু।

* কথাগুলি সদর্থেই আমি গ্রহণ করিয়াছি, গালাগালি হিসাবে ব্যবহার করা আমার অভিপ্রায় নয়।

প্রশ্ন

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

বিদায় বেলা শেষে
 পিছন ফিরে চাওয়া,
কুঁড়িটী ঝ'রে যেতে
 বরষা ধারা পাওয়া,
রেশেতে মূরছিয়া
 সুরেতে ফিরে আসা,
স্বপনে ফিরে পাওয়া
 হারানো ভালবাসা।

সারাটা পথ চলি
 যাহার দেখা নাই,
কেন যে মনে হয়
 তাহারে তবু চাই ?
কে জানে একি খেলা
 আশা ও নিরাশায়,
সুখের জল-রেখা
 দুখের শাহারায় !

রঙ্গনা

—গল্প— —শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১

মহানগরী পাটলীপুত্রে বাসন্তী পূর্ণিমার রজনীতে বসন্তোৎসব শেষ হ'য়ে গেল। বসন্তোৎসবের পক্ষকালব্যাপী উল্লাসের অবসানে সমস্ত নগরী বিগত যৌবনা-সুন্দরী নারীর মতো প্রতীয়মান হচ্ছিল। সেদিন অপরাহ্ণের দিকে ক্লান্ত মগধেশ্বর প্রৌঢ় মহানন্দ আপনার অন্তঃপুরিকা সংলগ্ন উদ্যানে একটী পুষ্পবাটিকায় আরাম-আসনে অর্দ্ধশায়ন অবস্থায় বিশ্রাম করছিলেন। তাঁর ডান হাতের কাছে স্বর্ণ-ভৃঙ্গারে রক্ষিত সুবর্ণ-বর্ণ সুরা। তাই তিনি স্ফটিক পাত্রে ঢেলে তৃষ্ণা নিবারণার্থ মাঝে মাঝে পান করছিলেন। এমন সময়ে মগধেশ্বরের প্রধানা নর্ত্তকী সেই পুষ্পবাটিকায় প্রবেশ করে' মহারাজ মহানন্দের কাছে নতজানু হ'য়ে বল্‌লে—"মহারাজ!"

মগধের সিংহাসনের কাছে নর্ত্তকীর দেহই নত হ'ল। কিন্তু এই পরিপূর্ণ-যৌবনা তড়িৎ-দৃষ্টি কাঁচুলি-বদ্ধ-বক্ষ মুক্ত-নাভি নর্ত্তকীর পায়ের কাছে প্রৌঢ় মহানন্দের জীবন মন নত হ'ল কিনা কে জানে—যেন অনুগ্রহ-প্রার্থীর কণ্ঠে উত্তর করলেন—"কি রঙ্গনা?"

নর্ত্তকী বল্‌লে—"মহারাজ, আমি অবসর প্রার্থনা করি।"

মগধেশ্বর বললেন—"রঙ্গনা! জাননা কি তোমার ইচ্ছাই আমার আদেশ। বেশ, আজ থেকে মগধের রাজ-সভা তোমার নৃত্যপটু চরণের দর্শন-আশা করবে না।"

নর্ত্তকী বল্‌লে—"মহারাজ! আমি এই রাজ-প্রাসাদ ছেড়ে যেতে চাই।"

মহানন্দ চকিত হ'য়ে আরাম আসনে উঠে বস্‌লেন—কাতরকণ্ঠে বল্‌লেন—"সেকি রঙ্গনা! মগধের রাজসভা তোমার নৃত্যপটু চঞ্চল চরণের শিঞ্জিনী-নিক্কণ, তোমার চটুল নয়নের বিদ্যুৎ-ক্ষেপ, বেণু বীণার সুরে সুরে তোমার দেব-ঈপ্সিত তনুলতার চিত্তদ্রবকারী গতিভঙ্গী, নৃত্যের তালে তালে তোমার সুরম্য সুপুষ্ট জঙ্ঘা-রেখার সুপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা না হয় নাই করল, কিন্তু মগধেশ্বরের এই রাজ-প্রাসাদ তুমি ছেড়ে গেলে যে চতুর্দ্দিক আঁধার হ'য়ে উঠ্‌বে। জান না কি রঙ্গনা, তোমার ঐ আঁখির তারায়, তোমার ঐ অধরের কোণে, তোমার গ্রীবার ভঙ্গীতে যে জ্যোতি আছে এই বিশাল মগধরাজ্যে তা আর কোথাও নেই। রঙ্গনা! মগধেশ্বরের রাজপ্রাসাদে তোমার কোন্ আকাঙ্ক্ষাটী বিফল হচ্ছে?"

নর্ত্তকী ক্ষণকাল মৌন থেকে তারপর ধীরে ধীরে বল্‌তে লাগ্‌ল—"মহারাজ! আজ ষষ্ঠ বর্ষ পূর্ব্বে সুদূর বহ্লীক থেকে মগধেশ্বরের রাজধানী এই ঐশ্বর্য্যশালী পাটলী-পুত্রে অনেক দুরাশা—বহু দুরাকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছিলেম। আর আজ মহারাজ এই পাটলীপুত্রে রঙ্গনার নাম কে না জানে? কোন্ যৌবনের আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টি এই দেহের উপরে সোহাগ-স্পর্শ বুলিয়ে যায়নি? এই গ্রীবাকে লাজ-রক্তিম করেনি? এই আঁখিদ্বয়ের একটি দৃষ্টিবিনিময়ের আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকেনি? কার দেহ এই ভুজদ্বয়ের আলিঙ্গন-স্পর্শ-কল্পনায় রোমাঞ্চিত হয়নি? কার বক্ষ-শোণিত এই চরণের নূপুর-গুঞ্জরণের তালে তালে আন্দোলিত হয়ে ওঠেনি? মহারাজ! অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি যা আজ আমার লাভ হ'য়েছে তা যে বহ্লীকের সেই অজ্ঞাতনামা বালিকার আশার আকাঙ্ক্ষার কল্পনারও অতীত। এ সবই সত্যি—কিন্তু—"

"কিন্তু কি রঙ্গনা?"

"কিন্তু সুখ ত এখানে নেই মহারাজ।"

রঙ্গনার কথা শুনে মহানন্দ ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভাব ধারণ ক'রে রইলেন। যেন এমন কথা তিনি নর্ত্তকীর কাছ থেকে প্রত্যাশা করেননি। তারপর বল্‌লেন—"সত্যি কথা রঙ্গনা, সুখ এখানে নেই। কিন্তু একথা তোমাকে কে শেখালে?"

রঙ্গনা

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

রঙ্গনার কর্ণমূল আরক্তিম হ'য়ে উঠ্‌ল—তাড়াতাড়ি উত্তর কর্‌ল—"কেউ শেখায়নি মহারাজ—শিখিয়েছে আমার এই অন্তর।"

মহানন্দ যেন অর্দ্ধ-স্বগত ভাবে বলে' উঠ্‌লেন—"এক জোড়া তেমন চোখ ছাড়া ত এ-কথা কেউ শেখাতে পারে না"—তারপর রঙ্গনাকে সম্বোধন করে' বললেন—"কিন্তু রঙ্গনা এত দিনও কি তুমি আমার অন্তর বোঝনি—আমার এই হৃদয়—"

রঙ্গনা আর মহানন্দকে বেশীদূর অগ্রসর হ'তে দিলে না—বাধা দিয়ে স্থির অথচ কোমল কণ্ঠে বল্‌লে—"মহারাজ, যৌবন যৌবনকেই চায়। প্রৌঢ় যেখানে যৌবনের রাজ্যে ভাগ বসাতে আসে সেখানে কেবল একদিকে অতৃপ্তি আর একদিকে নিষ্ফলতা।"

মহারাজ লজ্জিত হয়ে নয়ন নত করলেন।

নর্ত্তকী অর্দ্ধ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে যেতে লাগ্‌ল—"মহারাজ, গেল ছ' বছর ধরে আমি কায়মনপ্রাণে নৃত্য-কলার পরিচর্চ্চা করেছি। আপনার রাজসভায় প্রমোদ-ভবনে, নাগরিকদের রঙ্গশালায় নটরাজের নব নব ছন্দকে দেহের সঙ্গীতে শরীরী ক'রে তুলেছি। আমার চরণের ছন্দে ছন্দে সহস্র সহস্র হৃদয় স্পন্দিত করেছি—দেহের ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে সহস্র সহস্র মানস-লোকে সঙ্গীতের সৃষ্টি করেছি—নূপুর গুঞ্জনে গ্রীবার হেলনে বেণীর দোলনে সহস্র সহস্র দৃষ্টির আগে এই মর্ত্ত্যের অতিরিক্ত এক জগতের রূপ প্রকাশ করেছি, আর আমার মনে হয়েছে আমি মানুষ নই—মনে হয়েছে উর্ব্বশীর দেহভঙ্গী এই দেহে ফুটে উঠ্‌ছে, তার নৃত্যপটু চরণের নৃত্যচ্ছন্দ আমার পা দুটীতে প্রকট হচ্ছে—মনে হয়েছে মহারাজ, যেন অশরীরী উর্ব্বশী আমার এই দেহকে আশ্রয় করেছে—আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছে, কি এক বিপুল আনন্দ-সঙ্গীতের সুরজাল চতুর্দ্দিক বিচ্ছুরিত হ'য়ে গেছে—মনে হয়েছে অনন্তকালের মাঝে এই সঙ্গীতসুর মহীয়ান্ গরীয়ান্ হয়ে থাক্‌বে। কিন্তু এই দ্বাবিংশ বর্ষ বয়সে আমি ক্লান্ত—মহারাজ, আমি মানবী, আর কিছু নয়। আমার বিশ্রামের প্রয়োজন।"

মহানন্দ চোখ তুলে চেয়ে দেখলেন—বল্‌লেন—"কিন্তু এই রাজপ্রাসাদে কে তোমার বিশ্রামকে মিথ্যা ক'রে তুল্‌বে রঙ্গনা?"

শান্ত কণ্ঠে রঙ্গনা উত্তর দিলে—"মগধেশ্বর মহানন্দ।"

মগধেশ্বর আবার দৃষ্টি নত করলেন। তারপর প্রচুর ক্লেশে যেন আপনার মনে একটা দুঃসাধ্য সঙ্কল্পকে প্রতিষ্ঠা ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—"আবার বহ্লীকে ফিরে যাবে?"

নর্ত্তকী উত্তর কর্‌লে—"মহারাজ, বহ্লীক আমার মাতৃভূমি কিন্তু অনাত্মীয়ের দেশ—বহ্লীকে কোথায় ফিরব।"

"তবে কোথায় যাবে?"

"এই পাটলীপুত্রেরই উপান্তে কোন নির্জ্জন আবাসে।"

মগধেশ্বর ক্ষণকাল চিন্তা করলেন। তার পর হৃষ্ট কণ্ঠে বল্‌লেন—"নর্ত্তকী! গত পঞ্চ বর্ষ ধ'রে মগধেশ্বরকে তুমি তোমার নৃত্যে পরিতুষ্ট করেছ,—তোমার অবসর গ্রহণের সময় কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মগধেশ্বর তোমাকে যৎসামান্য পুরস্কৃত করবে। পাটলীপুত্রের পশ্চিম সীমান্তে গঙ্গাতীরে চম্পারণ্য নামে যে আমার বিশ্রাম-কুঞ্জ আছে আজ থেকে তা তোমার। কাল দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে আমার আদেশ-পত্র তোমার হাতে পেঁছবে।"

নর্ত্তকী মগধেশ্বরের সম্মুখে আভূমি প্রণত হয়ে অভিবাদন ক'রে বললে—"মহারাজ মগধেশ্বরের জয় হোক্।"

২

রঙ্গনা সত্য কথাই বলেছিল যে, যৌবন যৌবনকেই চায়।

রঙ্গনা মিথ্যা কথা বলেছিল যে, সুখ এখানে নেই এ-কথা তাকে কেউ শেখায় নি—শিখিয়েছিল কেবল তার অন্তর।

বাসন্তী পূর্ণিমা। বসন্তোৎসবের শেষ রজনী। রাজ-প্রাসাদের প্রশস্ত নাট্যমন্দিরে মনোহর নৃত্য-সভা রচিত হয়েছে। হাজার দীপশিখা নৃত্য-সভাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। নিপুণহাতে গাঁথা পুষ্পমালিকা থেকে বিচ্ছুরিত সুরভিতে চতুর্দ্দিক উল্লসিত হ'য়ে উঠেছে। অশরীরী উৎসব-দেবতা যেন তাঁর সমস্ত উচ্ছ্বসিত হাস্যরাশি সভার অন্তরে জল-কল্লোলের মতো কল্লোলিত করে' তুলেছে।

তাই এর কোনখানে একটু দুঃখের আভাস—একটি আঁধার-রেখার ইঙ্গিত নেই। আজ জীবন এখানে যৌবনের মতো-অশিষ্ট, অকুতোভয়, অনির্দ্দেশ্যযাত্রী। পরিণাম পরিমান করবার জন্তে আজ কেউ তুলাদণ্ড ধরে' বসে' নেই। হিসাবের বোঝা আজ নয়—আজ সবই বে-হিসাবী বেপরোয়া ব্যবহারাতিরিক্ত।

মগধেশ্বর মহানন্দ তাঁর পাত্রমিত্র অমাত্য নিয়ে নৃত্য-সভা অলঙ্কৃত করে বসেছেন। তাঁদের উষ্ণীষের মাণিক্য-রাজি দীপরশ্মির আঘাতে আঘাতে তাদের অন্তর থেকে ঝলকে ঝলকে বিদ্যুৎচমক উদ্গিরণ করছে—মস্তকের ঈষৎ দোলনে, গ্রীবার ঈষৎ হেলনে, তাঁদের কর্ণকুণ্ডল চক্ মক্ ক'রে উঠছে, তাঁদের কণ্ঠ-বিলম্বিত মণিহার ঝক্ ঝক্ করে' উঠ্‌ছে। আমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত নাগরিকেরা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে আপন আপন আসন পরিগ্রহণ করেছে। তাঁদের চক্ষে উৎসব আলোক, আননে উৎসব-দীপ্তি, অন্তরে উৎসব-দেবতার স্পর্শ। আজ মন্ত্রের কোন মন্ত্রণা নয়—আজ অমরাবতীর নৃত্য-গীতের আপনা-ভোলা মত্ততা।

নৃত্যরতা রঞ্জনা—বেণুবাদকের বাঁশীর সুর উচ্ছ্বসিত উল্লসিত বিচ্ছুরিত হ'য়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে! বাঁশীর সুর যেন বল্‌ছে—

বসন্ত ও যৌবন—বসন্ত ও যৌবন যৌবনের কণ্ঠে যে বিজয়মাল্য তারি ফুলে ফুলে বসন্তের হৃদয় ছেয়ে গেল—বসন্তের অন্তরে যে রহস্য তারি স্পর্শে স্পর্শে যৌবনের বক্ষ স্পন্দিত হ'য়ে উঠল —যৌবন বসন্তের—যৌবনের বসন্ত বসন্ত ও যৌবন—

বসন্ত ও যৌবন বসন্ত ও যৌবন বসন্ত যৌবনকে ডাকে তার সবুজ ওড়না উড়িয়ে, 'ওরে আয় আয় আয়—বসন্ত যৌবনকে ডাকে তার ফুল-কাননের হাসি ছড়িয়ে, 'ওরে আয় আয় আয়'—বসন্ত যৌবনকে ডাকে তার নীল গগনের দৃষ্টি বাড়িয়ে, 'ওরে আয় আয় আয়'—বসন্ত ও যৌবন—যৌবন ও বসন্ত—যৌবন বসন্ত—

বসন্ত ও যৌবন—বসন্ত ও যৌবন—যৌবন বলে 'এই যাই যাই যাই'—তোমার ঐ সবুজ ওড়নার অন্তরালে কি আছে? স্নেহ? প্রেম? অনুরাগ?—তোমার ঐ ফুল-কাননের হাসির অন্তরালে কি আছে? ছলনা? অবহেলা? মরীচিকা?—তোমার ঐ নীল গগনের দৃষ্টির আড়ালে কি আছে? বিরহ? অভিমান? অশ্রু?—যৌবন বলে, 'এই যাই যাই যাই'—বসন্ত ও যৌবন—যৌবন ও বসন্ত—যৌবন বসন্ত—

বসন্ত ও যৌবন—বসন্ত ও যৌবন—বসন্ত যৌবনকে ডাকে তার সারা বছরের চেয়ে থাকা অপেক্ষা নিয়ে, 'ওরে আয় আয় আয়'—তার সারা অন্তরের গুমরে-মরা অশ্রু-ধোওয়া-সুর নিয়ে, 'ওরে আয় আয় আয়'—তার নানা পুলকের থমকে-থাকা প্রাণ নিয়ে 'ওরে আয় আয় আয়'—যৌবন বলে, 'এই যাই যাই যাই'—তোমার সারা বছরের চেয়ে-থাকা অপেক্ষা নিঃশেষ হ'বে কি একটী মাত্র দীর্ঘশ্বাসে? তোমার সারা অন্তরের গুমরে-মরা অশ্রু-ধোওয়া সুর ক্ষান্ত হ'বে কি একখানি মাত্র গানে? তোমার নানা পুলকের থমকে-থাকা প্রাণ তৃপ্ত হবে কি একটী মাত্র দৃষ্টি-বিনিময়ে?—যৌবন বলে 'এই যাই যাই যাই—বসন্ত ও যৌবন যৌবন ও বসন্ত—যৌবন বসন্ত—

এই বেণুরই তালে তালে নৃত্যরতা রঞ্জনা। নৃত্যের তালে তালে একটা স্পন্দন-ছন্দ দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হ'য়ে যাচ্ছে, সে ছন্দ যেন কেবলি বল্‌ছে, এই বিশ্বজগতে আর কিছু নেই কিছু নেই কিছু নেই—আছে কেবল সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্য। রঞ্জনার নৃত্যশীল চরণ যেখানে যেখানে পড়্‌ছে প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হ'তে লাগল যেন সেই সেই খানে পদ্মবিকসিত হ'য়ে উঠবে। তার দেহের কখনও ঋজু কখনও দ্বিভঙ্গ কখনও ত্রিভঙ্গ নানা বিলাসে, তা'র বাহুদ্বয়ের নানা ভঙ্গীতে, তার বেণীর দোলনে, গ্রীবার হেলনে সৌন্দর্য্যের দেবতা যেন তাঁর পুলক-ভরা প্রাণ চারিদিকে বিস্ফুরিত করে দিয়ে শরীরী হ'য়ে উঠল। বৃত্তাকারে, অর্দ্ধবৃত্তাকারে, ঋজুরেখায়, ত্রিকোণ চতুষ্কোণ নানা আকারে যেন মন্ত্রপূত চরণ দু'খানি শিঞ্জিনী-গুঞ্জনের তালে তালে বিশ্বের পুলকরাশি উজাড় করে সভাতলে ছড়িয়ে দিতে লাগল। যেন দেশ কাল পাত্র একটা সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীতের গহন চেতনার মাঝে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল। চিত্রার্পিত দর্শকবৃন্দ, বেণুর একটী সুর, আর তারি মাঝে একটী সৌন্দর্য্য-প্রাণের গতিভঙ্গী। রঞ্জনার

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চক্ষু দুটী অর্দ্ধনিমীলিত অন্তর্ম্মুখীন—যেন তার অন্তশ্চেতনা কোন্ নেপথ্য জগৎ থেকে প্রাণ আকর্ষণ করে নিচ্ছে।

সহসা নর্ত্তকীর অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু দুটী ধীরে ধীরে উন্মীলিত হ'ল আর ঠিক সেই সময় আর দুটী চক্ষুর নিবিড় গভীর যেন মর্ম্মনিষ্পেষিত একটী দৃষ্টি তার আঁখির তারা দুটীকে আকর্ষণ ক'রে নিল। নর্ত্তকীর মর্ম্মস্থল কেঁপে উঠল—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে যেন তার অন্তর-লোকে নটরাজের আশীর্ব্বাণীর স্পর্শ অস্পষ্ট হ'য়ে উঠল—যেন তার চরণ যুগলের লঘুতা কোন্ দ্রব্যগুণে গুরুভার হ'য়ে উঠল—তার সমস্ত দেহে একটা অবসাদ ভাব চারিয়ে গেল। কিন্তু সে কেবল নিমেষের জন্যে। পরমুহূর্ত্তে রঙ্গনা দ্বিগুণ বল সঞ্চয় করে শিঞ্জিনী-তালে দ্বিগুণ ঝঙ্কার তুলে বৃত্তাকারে একটা শেষ আনন্দ-কম্পন সৃষ্টি কর্‌ল—তারপর শিঞ্জিনী-নিক্কনে একটা মধুর মোলায়েম সোহাগ-মন্থন তুলে ধীরে ধীরে এঁকে এঁকে বেঁকে বেঁকে মগধেশ্বর মহানন্দ যেখানে সিংহাসনে বসেছিলেন সেইখানে গিয়ে তনুলতা আনত ক'রে নতজানু হ'য়ে সভাতলে কপোল স্পর্শ ক'রে অভিবাদন কর্‌ল। মুহূর্ত্তে সহস্র লোকের করতালিতে আনন্দ-কোলাহলে নাটমন্দির প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌ল। স্মিত হাস্যে মহানন্দ রঙ্গনাকে উঠ্‌বার ইঙ্গিত করলেন। যখন কল-কোলাহল স্তব্ধতা ধারণ কর্‌ল তখন নতজানু রঙ্গনা মগধেশ্বরকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লে—"মহারাজ, আপনার অন্য নর্ত্তকীদের নৃত্য করবার আদেশ করুন—আমি ক্লান্ত, বিশ্রামের প্রয়োজন।"

নৃত্যসভা অন্য নর্ত্তকীর নূপুর-ঝঙ্কারে মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ল। রঙ্গনা তার প্রিয় সখী সুছন্দাকে আহ্বান ক'রে নাট-মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল।

নিজ আবাসে উপস্থিত হ'য়ে শয়ন-কক্ষের একটী বৃহৎ মুকুরের সামনে রঙ্গনা ক্ষণকাল স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আপনাকে নিরীক্ষণ কর্‌ল, তারপর সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রিয় সখীকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লে—"সুছন্দা! আজ নৃত্য-সভায় একটী যুবককে লক্ষ্য করেছিলি—মাথায় যার আকাশের মতো নীল উষ্ণীষ—সেই উষ্ণীষের নীচে একখানি মুখ যেন চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল—ললাটের নীচে দুইটী চোখ যেন তাতে জন্ম-জন্মান্তরের অপেক্ষা—দুইটী ঠোঁট যেন শৈশবের মতো অমলিন অথচ যৌবনের মতো উদ্‌গ্রীব—লক্ষ্য করেছিলি তাকে সুছন্দা?"

সুছন্দা উত্তর কর্‌ল—"লক্ষ্য করেছি বৈ কি রঙ্গনা। অমন রূপবান যুবক ত দিনে দু'বার ক'রে চোখে পড়ে না।"

"কে ও যুবক জানিস্?"

"ওর নাম সুমন্ত।"

"সুমন্ত কে?"

"শ্রেষ্ঠীপুত্র—মহাশ্রেষ্ঠী ধনপতের একমাত্র বংশধর।"

একখানি আরাম-আসনে রঙ্গনা আপনার ক্লান্ত তনুকে এলায়িত ক'রে দিয়ে আপনার পদযুগল থেকে নূপুর উন্মোচন করতে করতে যেন একটা অনন্ত ক্লান্তির সুর কণ্ঠস্বরে ফুটিয়ে বল্লে—"সুছন্দা, আজ নর্ত্তকী রঙ্গনার মৃত্যু হ'ল।"

সুছন্দা চকিত দৃষ্টিতে তার প্রিয়সখীর দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে। পরক্ষণে রঙ্গনা আরাম-আসনে যেখানে দেহ এলায়িত ক'রেছিল সেখানে এসে কক্ষতলে নতজানু হ'য়ে ব'সে প্রিয়সখীর একখানি হাত আপনার হাতে নিয়ে উৎকণ্ঠিত স্বরে ব'ল্‌লে—"সে কি কথা রঙ্গনা!"

"সত্যি কথা, সুছন্দা। রঙ্গনার মধ্যে এতদিন নটরাজের আশীর্ব্বাণীর যে স্পর্শ ছিল সে স্পর্শকে অন্য দেবতা আজ হরণ করলে। সঙ্গে সঙ্গে নর্ত্তকীরও মৃত্যু হয়েছে।"

দু'চোখ বিস্ফারিত ক'রে সুছন্দা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—"কোন্ দেবতা সে?"

রঙ্গনা উত্তর ক'র্‌লে—"সে এক দেবতা যে আদিম কাল থেকে মানব মানবীর অন্তর-লোকের আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই দেবতার স্পর্শ মানব মানবীর চিত্তলোককে আর একটী চিত্তলোকের বিনিময়ের জন্যে ব্যাকুল ক'রে তোলে, আকুল ক'রে তোলে। এ দেবতা কেবলই ব'ল্‌তে থাকে—বৃথা বৃথা বৃথা—রূপ যশ মান ঐশ্বর্য্য সব বৃথা যদি না একটী হৃদয় আর একটী হৃদয়কে অভিনন্দিত কর্‌লে, আপনার কর্‌লে—যদি না একটী জীবন আর একটী জীবনে মিলিত হ'ল—যদি না একটী জীবন আর একটী জীবনে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মিশে গেল।"

সুছন্দার বিস্ফারিত চোখ দুটী আলোকোজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল—বল্‌লে "ওঃ তাই বল—আমি বলি না কি—এই দেবতার নাম প্রেম।"

রঙ্গনা প্রতিধ্বনি ক'রলে—"এই দেবতার নাম প্রেম।"

ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে সুছন্দা জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে রঙ্গনার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলে—"সুমন্ত ?"

রঙ্গনার ক্লান্ত তনু যেন আরও ভারক্লান্ত হ'য়ে উঠ্‌ল—শুধু বল্‌লে—"হাঁ সুমন্ত।"

সুছন্দা তৎক্ষণাৎ কক্ষান্তরে গিয়ে একটা হস্তিদন্তখচিত চন্দন কাষ্ঠের পেটিকা নিয়ে এলো, এবং সেই পেটিকার ভিতর থেকে একখানি লিপি বের ক'রে রঙ্গনার সাম্‌নে ধরলে।

রঙ্গনা জিজ্ঞাসা করলে—"কি এ ?"

"লিপিকা।"

"কার ?"

"রঙ্গনার।"

"সেটা বোধহয় অনুমান ক'র্‌তে পার্‌ছি! কিন্তু লিখিত কার ?"

"সুমন্তের।"

আরাম-আসনে ক্লান্ত এলায়িত-তনু রঙ্গনা চক্ষের পলকে উঠে বস্‌ল—তার গণ্ড কপোল গ্রীবায় একটা অত্যুজ্জ্বল রক্তিমা ক্ষণকালের জন্য সহস্র হোলি-উৎসবের উৎসব রাগ অঙ্কিত ক'রে গেল—পর মুহূর্ত্তে তার সমস্ত মুখমণ্ডল শবদেহের ন্যায় ফ্যাকাসে হ'য়ে উঠ্‌ল—আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভয়-মিশ্রিত কণ্ঠে রঙ্গনা কেবল উচ্চারণ কর্‌লে—"সুমন্তের !"

সুছন্দা উত্তর ক'র্‌লে—"হাঁ সুমন্তের। আজ ছ'মাস হ'ল লিপিকা এখানে প্রেরিত হ'য়েছে !"

"এ লিপি আমাকে দিস্‌নি কেন ?"

সুছন্দা বল্‌লে—"ছ'মাস পূর্ব্বে নর্ত্তকী রঙ্গনাকে শিল্পী রঙ্গনাকে এ লিপিকা দিয়ে লাভ কি হ'ত ?" তারপর ওষ্ঠাধরে হাস্যের বিজলী-চমক্ খেলিয়ে ব'ল্‌লে—"আর এ তো এক সুমন্তের একখানি লিপি নয়—শত সুমন্তের শত লিপি এই পেটিকায় জমা হ'য়ে উঠেচে। শত সুমন্তের শত হৃদয়ের শত আবেদন—কিন্তু সেই এক সুর—এক ছন্দ এক মর্ম্ম—শাপভ্রষ্টা অপ্সরী রঙ্গনাকে প্রণয়-অর্ঘ্য নিবেদন।"

রঙ্গনা লিপিকা গ্রহণ ক'রে পাঠরত হ'ল। পাঠ ক'র্‌তে ক'র্‌তে ক্লান্ত তনুলতা নবীন প্রাণের স্পর্শে যেন পল্লবিত হ'য়ে উঠ্‌ল, তার শ্রান্ত চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। তার ঠোঁটে অলক্ষিতে একটা অতি মৃদু হাসির রেখা ফুটে তার কুন্দশুভ্র দন্তপাঁতির আভাস প্রকাশ কর্‌ল—সুন্দরী রঙ্গনা অনিন্দ্য সুন্দরী হ'য়ে উঠ্‌ল।

লিপি পাঠ শেষে রঙ্গনা বল্‌লে—"সুছন্দা, আমরা এই রাজপ্রাসাদ ত্যাগ ক'রে যাব।"

সুছন্দা জিজ্ঞাসা করলে—"কোথায় ?"

রঙ্গনার চোখ দুটী জ্বল্‌জ্বল্ কর্‌ছে। বল্‌লে- "দূরে—বহুদূরে—এই রাজপ্রাসাদ, এই লোকালয়, এই কলকোলাহল থেকে অনেক দূরে—দৈনন্দিন জীবনের হিসেব যেখানে পৌঁছবে না।"

"তারপর ?"

"তারপর অনন্ত অবসর—অনন্ত স্বপ্ন—নারী অন্তরের একটা অফুরন্ত কাহিনীর শেফালিকা-সৌরভ পরিব্যাপ্ত সুরজালের ধীর শান্ত মন্থর প্রকাশ-গতির সুখাবেশ।"

সুছন্দা আর কোন কথা ব'ল্‌লে না। শুধু একটা মৃদু হাসির রেখা ওষ্ঠাধরে ফুটিয়ে অনিন্দ্যসুন্দরী রঙ্গনার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

তার পরদিন অপরাহ্ণের দিকে ক্লান্ত মগধেশ্বর প্রৌঢ় মহানন্দ যখন আপন অন্তঃপুর-সংলগ্ন উদ্যানে একটা পুষ্পবাটিকায় আরাম-আসনে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় বিশ্রাম ক'রছিলেন তখন তাঁর প্রধানা নর্ত্তকী রঙ্গনা সেই পুষ্পবাটিকায় প্রবেশ ক'রে মহারাজ মহানন্দের কাছে নতজানু হ'য়ে বল্‌লে—"মহারাজ !"

* * * *

মহানন্দ ঠিকই অনুমান করেছিলেন যে, সুখ এখানে নেই, একজোড়া তেমন আঁখি ছাড়া একথা কেউ শেখাতে পারেনা।

৩

দেখ্‌তে দেখ্‌তে চম্পারণ্যে রঙ্গনার ছ'মাস কেটে গেল যেন একটা রূপকথার রাজ্যের স্বপ্নের মতো। এতদিন নর্ত্তকীর জীবন ছিল বাহিরের উৎসবের, কিন্তু এই চম্পারণ্যের

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

নিভৃতে রঙ্গনার জীবন অন্তরের উৎসবে গরীয়ান্ হ'য়ে উঠ্‌ল। এখানে কেবলমাত্র অন্তরের উৎসব আনন্দের সুর-বর্ণ-রেখায় তার জীবনকে একটা ঐশ্বর্য দিয়ে ঘিরে দিলে, যে ঐশ্বর্য্যের আভাস মাত্র রাজপ্রাসাদের বিপুল দ্রব্যসম্ভারে রাজনগরীর যশঃগৌরবে রঙ্গালয়ের প্রশংসমান জয়ধ্বনিতে কোন দিনও ধরা পড়েনি। কি বিপুল দান এই ঐশ্বর্য্যের! দিন রাত্রির প্রতিটী মুহূর্ত্তকে এ পরিপূর্ণ ক'রে রাখে—উষাকে স্নিগ্ধতর ক'রে তোলে, গোধূলিকে অনির্ব্বচনীয় ক'রে তোলে, দিবসকে অপেক্ষার মোহে মাতাল ক'রে রাখে, নিশীথকে মিলন-ব্যথায় অসহনীয়প্রায় ক'রে তোলে!

বারবার শতবার সহস্রবার নারী তার কালো চোখের গভীর দৃষ্টি আর দুটী চোখের দিকে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করে—"সুমন্ত, আমায় ভালবাস?"

বারবার শতবার সহস্রবার সুমন্ত বলে—"ভালবাসি?—হাঁ ভালবাসি রঙ্গনা,"—তারপর আর কোন কথা খুঁজে পায়না, তার কণ্ঠস্বর গদগদ হ'য়ে ওঠে, আঁখি-পল্লব সিক্ত হ'য়ে ওঠে, কি একটা মত্ত মদিরা তার সমস্ত অন্তরকে মোহবিহ্বল ক'রে তোলে। বারবার শতবার সহস্রবার শৈশবের মতো অমলিন দুইটী ঠোঁটের দিকে আর দুইটী ওষ্ঠাধর অগ্রসর হ'য়ে আসে—বার বার শতবার সহস্রবার একটা নিবিড় গভীর চুম্বনে যেন অনাদি কাল থেকে বিচ্ছিন্ন দুইটী অন্তর-দেবতা অনন্তকালের তরে মিলিত হ'তে চায়—বারবার শতবার সহস্রবার চির-অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দু'জোড়া ওষ্ঠাধর ফিরে যায়।

এম্‌নি ক'রে দিন কাটে চরম তৃপ্তির সন্ধানে একটা চির অতৃপ্তির ভিতর দিয়ে।

এদিকে মহানগরী পাটলীপুত্রের নাগরিক হৃদয় ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠ্‌ল—উৎসব রজনীর অন্তরে যেন সেই গহন আনন্দ-স্পর্শ আর কিছুতেই ধরা পড়ে না। কোথায় গেল রঙ্গনা—সেই রঙ্গনা যে দেহের ললিত ভঙ্গিমায় ভঙ্গিমায় নৃত্যচপল চরণযুগলের ছন্দে ছন্দে রঙ্গালয়ের মঞ্চে মঞ্চে স্বপ্নলোকের সৃষ্টি ক'রেছে, উৎসব-দেবতার মর্ম্মতলকে হেলায় উন্মুক্ত ক'রেছে আনন্দ-দেবতার অন্তরকে নিঃশেষে আকর্ষণ ক'রে এনেছে। কোথায় গেল সেই রঙ্গনা যে মহারাজ মগধেশ্বরের নৃত্য সভা সহস্র দীপের আলোরশ্মিতে উজ্জ্বলতর ক'রেছে, যার সান্নিধ্য মাত্র উৎসব সভায় একটা নব বসন্তের একটা নব যৌবনের রঙ ও স্বপ্নের বিলাস বিচ্ছুরিত ক'রে দিয়েছে। মহানগরী পাটলীপুত্রের উৎসব দেবতার প্রাণ অপহরণ করে' নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল সে রঙ্গনা! আজও রঙ্গশালার উৎসব-রজনী নৃত্যগীতে মুখর হ'য়ে ওঠে কিন্তু তাতে আর সেই সূক্ষ্ম অশরীরী অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-ধারার স্পর্শ জেগে ওঠে না। মহানগরী পাটলীপুত্রের উৎসব-দেবতার সেই আনন্দধারা গুটিয়ে নিয়ে কোথায় অন্তর্দ্ধান হ'ল সে রঙ্গনা? বিশাল মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী মহানগরী পাটলীপুত্রকে তার উৎসব থেকে তার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবার কি অধিকার আছে রঙ্গনার! পাটলীপুত্রের নাগরিক হৃদয় দুঃখে ও অভিমানে ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠ্‌ল।

অবশেষে ক্রমে নাগরিকেরা জানলে যে, রঙ্গনা অবসর গ্রহণ ক'রেছে।

চারিদিক থেকে তখন প্রশ্ন উঠল কেন? কেন? কেন?

তার উত্তর লাভ ক'রতেও বেশী দিন লাগ্‌ল না। শোনা গেল যে নর্ত্তকীর প্রতিভাকে নারীর আত্মা জয় ক'রেছে। নটরাজের আশীর্ব্বাণী অন্য দেবতার স্বপ্নাবেশে ঢাকা প'ড়েছে।

ধীরে ধীরে সবাই জান্‌লে যে রঙ্গনা আপনার প্রিয় সখী সুছন্দাকে সঙ্গে নিয়ে চম্পারণ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

কিন্তু এইখানেই নাগরিক হৃদয়ের প্রশ্ন থেমে গেল না। সে প্রশ্ন ক'রলে—তারপর?

তারপর? তারপর একটী রূপবান্ যুবককে চম্পারণ্যের পথে প্রায়ই দেখা গিয়েছে।

—কে সে? কে সে?

—সুমন্ত। মহাশ্রেষ্ঠী ধনপতের একমাত্র পুত্র।

—ওঃ—নাগরিক হৃদয় হতাশায় পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। উৎসব-সম্রাজ্ঞী রঙ্গনাকে কি কোন ক্রমেই আবার তার স্বরাজ্যে ফিরিয়ে আনা যায় না?

অবশেষে নাগরিক ভারুদত্ত ব'ল্‌লে—"নিশ্চয় যায়।"

চারিদিক থেকে সমস্বরে প্রশ্ন উঠ্‌ল—"কেমন করে? কি উপায়ে?"

ভারুদত্ত ব'ল্‌লে—"সোজা কথা—প্রথমতঃ দরকার প্রণয়ী প্রণয়িনীর বিচ্ছেদ ঘটান।"

—'তা' হবে কি ক'রে?

কবিতা প্রিয় ভারুদত্ত উত্তর দিলে—"প্রণয়-কুসুমে ঈর্ষা কাঁটের জন্ম দিয়ে।"

সবাই জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে ভারুদত্তের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ভারুদত্ত ব'ল্‌লে—"আমি সুমন্তের প্রণয় ইতিহাসের কিছু কিছু খবর রাখি। রঙ্গনাই তার জীবনের প্রথম প্রণয়িনী নয়—এবং আশা করা যাক যে শেষও নয়।"

"কে তার প্রথম প্রণয়িনী?"

"নটীকুলেশ্বরী বসন্ত-শ্রী।"

নগরিক-হৃদয় জিজ্ঞাসা ক'রলে "তারপর?"

ভারুদত্ত উত্তর দিলে—"বসন্ত-শ্রীর সঙ্গে সুমন্তের এই প্রণয় ব্যাপারকেই কাজে লাগাতে হবে। যদি সফল হওয়া যায় তবে রঙ্গনাকে আবার তার পরিত্যক্ত সিংহাসনে ফিরিয়ে আনা কঠিন হবে না।"

নাগরিক-হৃদয় উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"আর যদি সফল না হওয়া যায়?"

ভারুদত্ত একটু হেসে কেবল মাত্র ব'ল্‌লে—"কর্ম্মণ্যেবাধি কারস্তে——"

নাগরিক-হৃদয় তার উত্তর ক'রলে—"পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ—"

ভারুদত্ত ব'ল্‌লে—"সিংহের এখানে কাজ নয়।"

নাগরিক-হৃদয় জিজ্ঞাসা ক'রলে—"তবে কার?"

ভারুদত্ত হেসে ব'ল্‌লে—"শৃগালের";

৪

সেদিন চম্পারণ্যের একটী কক্ষে সুমন্ত ও রঙ্গনা ব'সে ছিল। সুকোমল বিশ্রাম-আসনে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় সুমন্ত, আর তারি সম্মুখে কক্ষতলে গালিচার উপরে যেন লতিয়ে পড়া লতার মতো অবসন্ন রঙ্গনা। অস্তাচলগামী রক্তিমাভ সূর্য্য অস্তাচলের আড়াল থেকে পশ্চিমাকাশের ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত মেঘের গায়ে গায়ে যেন রঙশালার বিপণি খুলেছে। তারি মোলায়েম আভা গবাক্ষ-পথে প্রবেশ ক'রে সমস্ত কক্ষকে যেন একটা স্বপ্ন-লোকের আভাসে মণ্ডিত ক'রে দিয়েছে। সেই স্বপ্ন-লোকের আভাষে এই পৃথিবী, এই সংসার এই মর্ত্ত্যালোক থেকে বহু বহু দূরে সুমন্ত ও রঙ্গনা—প্রণয়ী প্রণয়িনী—যেন কপোত কপোতী। এই মর্ত্ত্যে—অথচ মর্ত্ত্য এখানে তার স্পর্শ হারিয়েছে—আর কোন প্রয়োজন নেই আকাঙ্ক্ষা নেই সংগ্রাম নেই—প্রগাঢ় মিলন দুইটী মর্ম্ম-তলের একটা গাঢ় জমাট অনুভূতি দুইটী হৃদয়ের, দুইটী জীবন দেবতার, দুইটী অন্তরাত্মার। এই জমাট অনুভূতির গায়ে সূক্ষ্মা-দপি সূক্ষ্ম একটা আঁচড় লাগ্‌লে বুঝি এদের প্রাণসংশয় হবে।

রঙ্গনা কথা বল্‌ছিল। ধীর গম্ভীর তার কণ্ঠস্বর। যেন সে কণ্ঠস্বর জীবনের ওতঃপ্রোতভাবে পরিপূর্ণ কোন অতল তল থেকে বিরাট শান্তিমণ্ডিত হ'য়ে ছন্দিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। রঙ্গনা বল্‌ছিল—"সুমন্ত! জীবনে অর্থ আছে যশ আছে মান আছে নানা কর্ম্ম নানা ভোগ নানা লিপ্সা নানা আকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু যেখানে একটা অন্তরাত্মা আর একটী অন্তরাত্মার গভীর স্পর্শ লাভ ক'রেছে সেখানে ও সমস্তই কত ক্ষুদ্র কত তুচ্ছই না হ'য়ে ওঠে। আজ যদি আমার একদিকে মগধের সিংহাসন আর একদিকে তুমি থাক তবে জান কোন্‌দিকে ভারী হয়, সুমন্ত?"

"কোন্ দিকে রঙ্গনা?"

সুমন্তের একখানি হাত গভীর আবেগে আপনার হাত দুটী দিয়ে আবৃত ক'রে প্রগাঢ় অনুরাগে রঙ্গনা উত্তর দিলে—"এইদিকে—যার চিত্তলোকের স্পর্শ আমার নিষ্ফল জীবনকে অমূল্য ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত ক'রেছে—একটা বিপুল অনির্ব্বচনীয়তায় পূর্ণ ক'রেছে—একটা—"

সহসা একটা উচ্চ কলহাস্যের হিল্লোল কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে রণিত হ'য়ে উঠ্‌ল এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু নারীকণ্ঠের কলকোলাহলে চম্পারণ্যের নিভৃত নীরবতা বিঘ্নিত হ'য়ে উঠ্‌ল। গভীর বিস্ময়ে রঙ্গনা উঠে দাঁড়াল। যেন প্রতি দিনের ক্রুর বাস্তবতার কঠোর স্পর্শে একখানি সযত্ন-রচিত স্বপ্ন-জাল ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেল।

এমন সময় ত্রস্তে সুছন্দা সেই কক্ষে প্রবেশ ক'রে ব্যস্ত-কণ্ঠে ব'ল্‌লে "রঙ্গনা—একপাল মেয়ে এসেছে পাটলীপুত্র থেকে।"

হিমাদ্রি-সমান বিস্ময় কণ্ঠস্বরে ফুটিয়ে রঙ্গনা ব'লে উঠ্‌ল—"একপাল মেয়ে? পাটলীপুত্র থেকে! কেন? কারা তারা?"

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সুছন্দা উত্তর দিলে—"কেন? তার সঠিক উত্তর দিতে পারিনে। বোধহয় তোরই অনুসন্ধানে। তবে কারা তারা তা বল্‌তে পারি—দেখলেম তাদের মধ্যে আছে—আর্দ্রা, ধনিষ্ঠা, নিশীথ-শ্রী, রেবতী, রঙ্গভদ্রা, অসিতাক্ষী, বিদ্যুৎপর্ণা, মৃদুল-শ্রী—"

"সে কি! মাগধী রাজধানীর এই বর্ষা-উৎসবের মরসুমে পাটলীপুত্রের রঙ্গালয় ত্যাগ ক'রে তারা এখানে!—কোথায় তারা?"

"এইদিকেই তারা আস্‌ছে।"

কলহাস্য কলকোলাহল নারীকণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন ধ্বনিতে ক্রমশঃ পরিণত হয়েছে—এবং সে গুঞ্জনধ্বনি ক্রমে নিকটতর হ'য়ে আস্‌ছে। রঙ্গনা তাড়াতাড়ি আরাম-আসনে অর্দ্ধ-শয়ান সুমন্তের হাত ধ'রে টেনে তুলে ব্যস্তকণ্ঠে বল্‌লে—"সুমন্ত তুমি পাশের কক্ষে যাও—দেখি ওরা কোন্ প্রয়োজনে এখানে এসেছে।"

দ্বার দিয়ে সুমন্ত কক্ষান্তরে প্রবেশ কর্‌তে না কর্‌তে অন্য একটা দরজা দিয়ে একদল কিশোরী তরুণী যুবতী উচ্ছ্বসিত-গতি কলস্বন স্রোতস্বিনীর মতো সেই কক্ষে প্রবেশ করলে। একদল কিশোরী তরুণী যুবতী—লোধ্ররেণু তাদের গণ্ডে, হিঙ্গুলরাগ তাদের ওষ্ঠাধরে, ধূপের ধোঁয়ায় সুরভিত তাদের কেশকলাপ। বন্ধ-কাঁচুলির আবেষ্টনে বক্ষ তাদের সুপরিস্ফুট নিটোল হ'য়ে উঠেছে, মুক্ত নাভির নিম্নে নিবীবন্ধের বন্ধন-কৌশলে তাদের সুপুষ্ট জঙ্ঘারেখা দৃষ্টি-সুলভ হ'য়ে উঠেছে। বাহুতে প্রকোষ্ঠে তাদের কেয়ূর কঙ্কণ, শ্রোণিতটে ঝিকিমিকি স্বর্ণ-মেখলা, কর্ণে দ্যুতি-ঝলমল্ মণিকুণ্ডল। কারো হাতে একটী অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত রক্তকমল, কারো কণ্ঠ-রেখায় সোহাগ-জড়ানো চম্পক-কলির উগ্রগন্ধ মালিকা, কারো কুন্তল-জালের সুদীর্ঘ বদ্ধ বেণীতে রক্তকরবীর গুচ্ছ। একদল কিশোরী তরুণী যুবতী—হাস্যে লাস্যে পরিহাসে আপনাভোলা—এরা এই দীন মর্ত্ত্যলোকের কেউ নয়—তাদের অধরোষ্ঠের রক্তরাগ, তাদের আঁখিতারা থেকে নিঃসৃত বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ স্বর্গলোকেরও কোন সন্ধান দেয় না।

কৃত্তিকা ব'লে উঠ্‌ল—"এই যে রঙ্গনা!—কি লো! সমস্ত পাটলীপুত্রকে কাঁদিয়ে সমস্ত পাটলীপুত্রের যৌবন-বক্ষে বিরহের তপ্ত-নিশ্বাস পূর্ণ ক'রে একি বানপ্রস্থ অবলম্বন ক'র্‌লি এই বয়সে? আমাদের শাস্ত্রে আছে পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ—তাও সে কেবল পুরুষদের জন্যে—মেয়েদের পক্ষে যদ্দিন তাদের ওষ্ঠাধরে রক্তরাগ থাক্‌বে, তাদের বাহুলতা নিটোল থাক্‌বে, আঁখির তারায় বিদ্যুৎস্পর্শ থাক্‌বে, তদ্দিন তাদের পক্ষে বনং ন ব্রজেৎ—অবশ্য পুরুষদের—পক্ষে অন্য নিয়ম।"

কৃত্তিকার উচ্চ হাস্যের সঙ্গে তার সঙ্গিনীদের মিলিত কলহাস্য সমস্ত কক্ষকে রণিত ক'রে তুলল। হাস্যরণন্ কতকটা প্রশমিত হলে আর্দ্রা ব'লে উঠ্‌ল—"ঐ দরজা দিয়ে কাকে না কক্ষান্তরে যেতে দেখ্‌লেম—তুই দেখিস্ নি নিশীথ-শ্রী?"

নিশীথ শ্রী উত্তর দিলে—"দেখেছি বই কি! তুই কি মনে করিস্ আজই আমার চোখ দুটো ঘোলাটে হ'য়ে উঠেছে—বিশেষ এমন একটা বিখ্যাত লোক—জানিস্ কে ও?"

আর্দ্রা একটা চাপা হাসি তার অধর কোণে মিশিয়ে নিয়ে বল্‌লে—"না, কে ও?"

নিশীথ-শ্রী উত্তর দিলে—"ওর নাম সুমন্ত।"

বিদ্যুৎপর্ণা ব'লে উঠ্‌ল—"কোন্ সুমন্ত? সেই যে বসন্ত-শ্রীর—"

নিশীথ-শ্রীর কণ্ঠ থেকে একটা হাসির গিট্‌কিরি উঠে সারা কক্ষে যেন একটা কৌতুক-তরঙ্গের বান ডেকে গেল—নিশীথ-শ্রী বল্‌লে—"হাঁ লো, হাঁ সেই বসন্ত-শ্রীর—ফুলে ফুলে উনি মধু খুঁজে বেড়ান।" তারপর আপনার পা দুটোকে নৃত্যচঞ্চল ক'রে গান ধর্‌লে—

"আমার শুধুই ফুল-বালাদের মুখ খোলাবার নেশা—"

নিশীথ-শ্রীর নৃত্যচঞ্চল পাদুটী হঠাৎ থম্‌কে গেল, তার গানের সুরের যেন কে কণ্ঠরোধ ক'র্‌লে—সবাই দেখ্‌লে সহসা রঙ্গনার দেহ বনস্পতি শাখা হ'তে ঝড়-বিচ্ছিন্ন লতার মতো গালিচার উপর লুটিয়ে প'ড়্‌ল। কিশোরী তরুণীর দল সবাই "কি হোল" "কি হোল" ব'লে অবলুণ্ঠিত রঙ্গনার

দিকে অগ্রসর হ'য়ে এলো কিন্তু তার পূর্ব্বেই চক্ষের পলকে সুছন্দা এসে রঙ্গনার কক্ষতল-লুণ্ঠিত মাথাটা আপনার কোলের উপর তুলে নিয়েছে। সুছন্দা দেখলে রঙ্গনার চক্ষু দুটো নিমীলিত, মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ, ওষ্ঠাধর কঠিন—রঙ্গনা সংজ্ঞাহীন।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সুছন্দার সযত্ন শুশ্রূষায় রঙ্গনা ধীরে ধীরে চোখ মেল্‌লে—চোখ মেলেই তার দৃষ্টিগোচর হ'ল তাকে চতুর্দ্দিকে ঘিরে উপবিষ্ট কিশোরী তরুণী যুবতীর দল। রঙ্গনা সুছন্দার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মৃদুকণ্ঠে ব'ল্‌লে—"সুছন্দা, ওদের সবাইকে এখান থেকে যেতে বল্।"

সুছন্দাকে আর সে কথা পুনরাবৃত্তি করতে হ'ল না। রঙ্গনার কথা শুনে কিশোরী তরুণী যুবতীর দল তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল। তারপর কেউ বা ঠোঁটের কোণে একটা চাপা হাসি টেনে, কেউবা চোখের কোণে একটা কৌতুক হাসি ফুটিয়ে, কেউ বা বদ্ধ-বেণীতে একটা দোলা দিয়ে, কেউ বা মুক্ত কুন্তলে একটা 'অমন ঢের দেখেছি' ভাব দোলন খেলিয়ে ঝটিতি সেই কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল।

কিশোরী তরুণীদের হাস্য পরিহাসের কোন সাড়া না পেয়ে সুমন্ত ধীরে ধীরে দ্বার উন্মুক্ত ক'রে কক্ষান্তর থেকে বেরিয়ে এলো—বেরিয়ে এসেই অনুভব করলে যেন কি একটা ঘ'টে গিয়েছে। সুমন্ত দেখ্‌লে গালিচা স্থানে স্থানে বারিসিক্ত, সারা কক্ষ উগ্রগন্ধী আরকের গন্ধে ভার হ'য়ে উঠেছে, কক্ষতলে ভৃঙ্গার ব্যজনী ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত প'ড়ে আছে। আরাম-আসনে শয়ান রঙ্গনার দিকে এক নিমেষের দৃষ্টি দিয়েই সুমন্ত বুঝ্‌লে এ রঙ্গনা সে রঙ্গনা নয়—এই কয়েক মুহূর্ত্ত আগে যে রঙ্গনাকে সে দেখে গিয়েছে পুলক হিল্লোলে পুলকিত জীবন-প্রতিমা এ রঙ্গনা সে রঙ্গনা নয়—রঙ্গনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জড়ের মতো কঠিন হ'য়ে উঠেছে, সারা মুখমণ্ডলে কে যেন ছাইয়ের রঙ লিপ্ত করে দিয়েছে—তার চক্ষু দুটি নিমীলিত, আর সেই নিমীলিত চক্ষু দুটীর নীচে দুটি বিন্দু অশ্রু মুক্তাফলের মতো টল্ টল্ করছে।

মুহূর্ত্তে সুমন্ত নতজানু হ'য়ে রঙ্গনার একখানি হাত আপনার হাতে তুলে নিল—আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে ডাকল—"রঙ্গনা।"

চক্ষের পলকে যেন তড়িৎ-স্পৃষ্ট হ'য়ে রঙ্গনা উঠে দাঁড়াল—সুমন্তের হাত থেকে আপনার হাত ছিনিয়ে নিয়ে কয়েক পদ দূরে গিয়ে দণ্ডায়মান হ'ল—চক্ষে তার ক্রোধবহ্নির জ্বালা, অধরোষ্ঠে তার দুর্নিবার ঘৃণার অবলেপ—রঙ্গনা কঠোর কণ্ঠে বল্‌লে—"সুমন্ত—এই শেষ—যাও—আর চম্পারণ্যে এসো না।"

বিস্ময় বেদনা হতাশা পরে পরে সুমন্তের চোখ দুটাতে খেলে গেল—আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে সুমন্ত ব'লে উঠ্‌ল—"কি রঙ্গনা—কি হয়েছে? কেন এই অর্থহীন আদেশ!—কেন—"

সম্রাজ্ঞীর মতো শির উন্নত ক'রে আপনার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী নির্গমন-দ্বারের দিকে প্রসারিত ক'রে রঙ্গনা বল্‌লে—"কোন কথা নয়—যাও।"

অশ্রু উদ্বেলিত চক্ষে সুমন্ত ব'ল্‌লে—"কোথায় যাব রঙ্গনা—জান না কি তোমার ঐ চম্পককলির মতো অঙ্গুলি আমার হৃদ্‌পিণ্ডের উপর চির জীবনের মতো ছাপ অঙ্কিত ক'রে দিয়েছে।"

উচ্চ একটা অবজ্ঞার হাসি রঙ্গনার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে সমস্ত কক্ষকে ধ্বনিত ক'রে তুল্‌ল—কণ্ঠস্বরে নিষ্ঠুর পরিহাসের সুর ঢেলে দিয়ে রঙ্গনা ব'ল্‌লে—"বিশাল মহানগরী পাটলীপুত্রে বহু বহু চম্পককলির আঙুল মিল্‌বে তোমার হৃৎপিণ্ডের উপর ছাপ অঙ্কিত করবার। আর যদি কেউ নাও থাকে বসন্ত-শ্রী ত আছেই।"

সহসা বসন্ত-শ্রীর নাম শুনে ক্ষণকালের জন্য সুমন্তের দৃষ্টি নত হ'য়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণে চোখ তুলে কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা ফুটিয়ে ব'ল্‌লে—"শোন রঙ্গনা—"

উচ্চকণ্ঠে রঙ্গনা ব'লে উঠ্‌ল—"কিছু শুনবার নেই সুমন্ত—যাও আর এই চম্পারণ্যে পদার্পণ কোরো না।" তারপর নিমেষ মাত্র থেমে ব'ল্‌লে—"না পদার্পণ কোরো যদি বসন্ত-শ্রীর সেই বিখ্যাত ময়ূরকণ্ঠী মণিহার নিয়ে আস্‌তে পারো।"

রঙ্গনার দুই চোখে ঈর্ষার বহ্নি ঝক্‌ঝক্ ক'র্‌ছে।

সুমন্ত ধীরে ধীরে উঠে মাতালের মতো টল্‌তে টল্‌তে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল।

সুমন্ত কক্ষ ত্যাগ করবা মাত্র দারুণ তিক্তকণ্ঠে রঙ্গনা বলে' উঠ্‌ল—"ছন্দা, ছন্দা, আমার এ বাইশ বছরের বক্ষ

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

রেখালেশহীন জীবন আমার এ শিশুর মতো নির্ম্মল হৃদয় এ কাকে দান ক'রেছি!—একটা লম্পটকে—মানুষের আকৃতি কি তার প্রকৃতিকে এমন ক'রেই মিথ্যার পোষাক পরিয়ে দিতে পারে!"

সুচন্দা ব'লে উঠ্‌ল—"কিন্তু এ কি করলি রঙ্গনা—বসন্ত-শ্রীর সেই ময়ূরকণ্ঠী মণিহার—সে কি কেউ কাউকে দেয়—যে মণিহারের জুড়ি মগধেশ্বরের রত্নাগারে নেই—যে মণিহার বসন্ত-শ্রীর শেষ জীবনের সম্বল—যে মণিহার এক মুহূর্ত্তের আত্ম-বিস্মৃতিতে মহারাজ মহানন্দের রাজ-মুকুট থেকে বসন্ত-শ্রীর কণ্ঠে এসে প'ড়েছিল সেই মণিহার কেউ কাউকে প্রাণ ধ'রে দেয়?"

রঙ্গনা উত্তর করলে—"জানি সুচন্দা সে মণিহার কেউ কাউকে দেয় না—"

রঙ্গনা আরও কি ব'লতে যাচ্ছিল কিন্তু পর মুহূর্ত্তে যেন মন্ত্রবলে সমস্ত উত্তেজনা তার মন প্রাণ দেহ হ'তে নিমেষে কোথায় অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। শিথিলতনু রঙ্গনা আকুল হ'য়ে এসে আরাম আসনে লুটিয়ে প'ড়্‌ল। দুই চক্ষু হ'তে অশ্রুপ্লাবন নেমে এসে তার বক্ষ-বসন সিক্ত ক'র্‌তে লাগ্‌ল।

৫

এমনিই সংসার। একটা মাত্র দাঁড়ি কিন্তু তারই এক দিকে জীবন আর একদিকে মৃত্যু।

এই কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র পূর্ব্বে এই পৃথিবী রূপসী ছিল। এর আকাশে বাতাসে সুখের উন্মাদনা—এর বৃক্ষ বল্লরীতে এর প্রান্তরে কান্তারে, এর লোকালয়ে, এর নদীসৈকতে কোন্ আনন্দের পুলকহিল্লোল, কিন্তু হঠাৎ কোন্ ভগ্নলোচনের দৃষ্টিসম্পাতে সমস্তই রসহীন, রূপহীন কুৎসিৎ হ'য়ে উঠ্‌ল। জীবনের সরসতাকে কোনদিকেই বাঁচিয়ে রাখবার উপায় রইলো না।

পাটলীপুত্রের পথে পথে যে কেমন ক'রে কোথায় দিয়ে রাত কেটে গেল তা সুমন্ত্র জানতেও পারল না। সারা মন ঘিরে তার অসংবদ্ধ প্রলাপের মতো চিন্তা—সারা প্রাণ ঘিরে তার বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো উত্তেজনা। আর ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে নানা চিন্তার মাঝে গানের ধুয়ার মতো তার মনে নিঃশব্দ ঝঙ্কারে ধ্বনিত হচ্ছে "ময়ূরকণ্ঠী মণিহার" "ময়ূরকণ্ঠী মণিহার" "ময়ূরকণ্ঠী মণিহার!" যেন তার জীবনসূত্রের সঙ্গে ঐ মণিহারের কোথায় এক অচ্ছেদ্য গ্রন্থি প'ড়েছে।

কিন্তু তাও কি সম্ভব! সে মণিহার কি কেউ কাউকে দেয়! আর কি ব'লেই বা সে সেই মণিহার চাইবে—সে কি গিয়ে ব'ল্‌বে—"বসন্ত-শ্রী, আমি একদিন তোমায় ভালবাসতেম—আর আজ অন্য একজনকে ভালবাসি।—কিন্তু আমার পূর্ব্ব ভালবাসার প্রায়শ্চিত্তের জন্য তোমার ঐ ময়ূর কণ্ঠী মণিহার আমার চাই?"—একটা অর্থহীন উন্মাদের অট্টহাসির হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ যেন তার সমস্ত অন্তর বাহির ব্যঙ্গ কৌতুকে ভ'রে দিলে। জীবনের প্রাণবস্তু দেখা যাচ্ছে কিন্তু সেদিকে হাত বাড়াবার কোন উপায় নেই।

পূর্ব্বাকাশ ফরসা হ'য়ে আস্‌ছে; সুমন্ত্রের যখন হুঁস্ হ'ল তখন সে দেখ্‌লে তার পাদুটা কখন তাকে বসন্ত-শ্রীর বাসভবনের কাছে এনে ফেলেছে।

সুমন্ত্র গিয়ে দ্বারে করাঘাতের পর করাঘাত ক'র্‌তে লাগ্‌ল।

অবশেষে দ্বার উন্মুক্ত হ'ল। উন্মুক্ত দ্বারে দাঁড়িয়ে বসন্ত-শ্রী।

বসন্ত-শ্রী চম্‌কে উঠ্‌ল। সুমন্ত্রের চক্ষু দুটা রক্তবর্ণ কোটরগত, গণ্ড বিশুষ্ক, অঙ্গ ধূলিধূসরিত, কেশকলাপ অযত্নবিন্যস্ত, উত্তরীয় স্থানে স্থানে ছিন্ন। কয়েক মুহূর্ত্ত বসন্ত-শ্রীর কণ্ঠ দিয়ে কোন স্বরই নির্গত হ'ল না। অবশেষে সহসা আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বসন্ত-শ্রী ব'লে উঠ্‌ল—"সুমন্ত্র—সুমন্ত্র জানি তুমি আস্‌বে—একদিন ফিরে আস্‌বেই আস্‌বে"—সুমন্ত্রের হাত ধ'রে বসন্ত-শ্রী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ ক'র্‌লে।

গৃহে প্রবেশ ক'রেই সুমন্ত্র যেন ভেঙ্গে পড়্‌ল—নিতান্ত অসহায় শিশুর মতো সে কক্ষতলে ব'সে পড়ল—দুই চক্ষু বেয়ে তার দরবিগলিতধারা অশ্রুপ্রবাহ।

অবশেষে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সুমন্ত্র ব'ল্‌লে—"বসন্ত-শ্রী—বসন্ত-শ্রী—আমার জীবন রক্ষা করো—আমাকে ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও তোমার ময়ূরকণ্ঠী মণিহার!"

বসন্ত-শ্রী বিস্ময়ের কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌ল—"ময়ূরকণ্ঠী মণিহার! কেন কি ক'র্‌বে তা দিয়ে সুমন্ত্র?"

তখন ধীরে ধীরে অশ্রুসজল কণ্ঠে সুমন্ত ব'লে যেতে লাগ্‌ল আপনার কথা—রঙ্গনার কথা, চম্পারণ্যের কথা—আপনার প্রণয়কাহিনী—আর ধীরে ধীরে বসন্ত-শ্রীর অন্তর-লোকে আনন্দ-আলোক মলিন হ'য়ে আসতে লাগল। সুমন্ত যখন তার কাহিনী শেষ করলে তখন বসন্ত-শ্রীর অন্তরে বাহিরে গাঢ় অন্ধকারের যবনিকা নেমে এসেছে।

নিমেষের পর নিমেষ কেটে যেতে লাগ্‌ল। তু'জনের মুখে কোন কথা নেই। সুমন্ত আপনার তুঃখভারে আপনি কাতর—আর বসন্ত-শ্রীর স্থির গম্ভীর পলকহীন দৃষ্টি-- তার অন্তরলোকে কি হচ্ছে কে জানে? কে বুঝ্‌তে পারে নারীর অন্তর-রহস্য? আদিমকাল থেকে যে রহস্যের পরিচয় কেউ পায় নি।

অবশেষে বসন্ত-শ্রী ধীরে ধীরে উঠ্‌ল। ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে গমন করলে। ধীরে ধীরে ফিরে এলো—হাতে তার ময়ূরকণ্ঠী মণিহার।"

মণিহার সুমন্তের দিকে প্রসারিত ক'রে ধ'রে বসন্ত-শ্রী ব'ল্‌লে—এই নাও সুমন্ত ময়ূরকণ্ঠী মণিহার।"

চক্ষের পলকে সুমন্ত উঠে দাঁড়াল—বসন্ত-শ্রীর হাত তুখানি আকর্ষণ ক'রে চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন ক'রে দিলে—তারপর ময়ূরকণ্ঠি মণিহার তুলে নিয়ে বসন্ত-শ্রীর বাসভবন থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

বসন্ত-শ্রী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে কক্ষতলে দাঁড়িয়ে রইল—ধীরে ধীরে তার চোখ তুটীতে তুটী মুক্তার মতো অশ্রুবিন্দু জেগে নীরবে তার তুটী গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে প'ড়্‌ল।

৬

সন্ধ্যা। কিন্তু চম্পারণ্যের কক্ষে কক্ষে দীপরশ্মিতে আর সে আনন্দের সুর বাজে না—রজনীর বক্ষ জুড়ে আর সে আসন্ন-উৎসবের আয়োজন নেই। বাতাসে বাতাসে যেন কার দীর্ঘনিশ্বাস গুমরে ম'র্‌ছে—নিঝুম নিশুতির মাঝে যেন কোন্ মৃত্যুর শব্দহীন ক্রন্দন-রোল ভেসে আসচে।

কার পদশব্দ পেয়ে রঙ্গনা মাথা তুল্‌ল—দেখ্‌লে দ্বার-দেশে দাঁড়িয়ে সুমন্ত। চকিতে রঙ্গনা উঠে দাঁড়াল—তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ল--কঠোর কণ্ঠে বল্‌লে--"আবার এসেছ সুমন্ত--মনে নাই কি? বলি নাই, কি তোমাকে যে চম্পারণ্যে পদার্পণ কোরো না—তবুও—"

সুমন্ত অগ্রসর হ'য়ে এলো তারপর রঙ্গনার সম্মুখে নতজানু হ'য়ে যেমন ক'রে পূজারি দেবতা'র কাছে যুগ্মকরে পুষ্পাঞ্জলি তুলে ধরে তেম্‌নি ক'রে ময়ূরকণ্ঠী মণিহার তুলে ধ'র্‌লে।

মুহূর্ত্তে রঙ্গনার মুখের কথা মিলিয়ে গেল—তার তু' চোখের দৃষ্টি সেই মণিহারের প্রতি নিবদ্ধ হ'য়ে গেল—যেন সে আপনার দৃষ্টিকে বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌ছে না।—তারপর আপনা আপনি তার কণ্ঠ থেকে যেন বিস্ময়ে ত্রাসে উচ্চারিত হ'ল—"ময়ূরকণ্ঠী মণিহার!"

চারিদিকে নিস্তব্ধতা। কেবল দূর চম্পকবীথির অন্ধ-কার থেকে একটা ঝিল্লীর কর্কশ রব সেই নিস্তব্ধতাকে আরও নিবিড় ক'রে তুল্‌ছে। নির্ব্বাক রঙ্গনা, নির্ব্বাক সুমন্ত। মণিহার দীপরশ্মির স্পর্শে ময়ূরকণ্ঠের মতো চিক্ চিক্ ক'র্‌ছে।

রঙ্গনা যখন প্রকৃতিস্থ হ'ল তখন শত প্রশ্ন তার মনে একসঙ্গে ভিড় ক'রে উদিত হ'ল--কিন্তু শান্ত কণ্ঠে কেবল জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—"বসন্ত-শ্রী তোমাকে এ মণিহার দিলে সুমন্ত?"

"হাঁ রঙ্গনা।"

তারপর কিয়ৎক্ষণ মৌন থেকে রঙ্গনা ব'ল্‌লে--"আমাকে সব কথা বল সুমন্ত।"

সুমন্ত ধীরে ধীরে তখন ব'লে যেতে লাগ্‌ল আপনার এক রজনীর আশাহীন অশ্রুহীন নিষ্ঠুর মৃত্যুকাহিনী, তারপর সে-মৃত্যু কি ক'রে ঊষার আলোকে বসন্ত-শ্রীর দানের স্পর্শে এক মুহূর্ত্তে জীবন শতদলের রঙ্গিমায় সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠ্‌ল।

সব কথা যখন বলা শেষ হ'য়ে গেল তখন রঙ্গনা নতজানু সুমন্তকে হাত ধ'রে তুল্‌লে, তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে আপনার বিশ্রাম-কক্ষে গিয়ে প্রবেশ ক'র্‌লে! কণ্ঠে তা'র ময়ূরকণ্ঠী মণিহার—চক্ষে তার কিসের আলোকরেখা তার মানে বোঝা যায় না।

কিন্তু সেই আনন্দ-রাগিনী আর বাজ্‌ল না।

চম্পারণ্যের কক্ষে কক্ষে দীপমালা কখন নিভে গিয়েছে। ক্লান্ত তনু সুমন্ত শয্যায় গভীর নিদ্রায় বিভোর। আপন

বিজয়িনী

বিদেশী চিত্র

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শয়ন কক্ষে সুছন্দা নিদ্রামগ্না। কিন্তু সেদিন রঙ্গনার চোখে আর ঘুম নেই। মুক্ত বাতায়নে সে হাতের উপর চিবুক ন্যস্ত ক'রে একাকী দাঁড়িয়ে। বাহিরে নিবিড় বিরাট অন্ধকার। রঙ্গনার দৃষ্টি সেই বিরাট অন্ধকার ভেদ ক'র্‌তে চায়। নিমেষের পর নিমেষ দণ্ডের পর দণ্ড কেটে যেতে লাগ্‌ল কিন্তু রঙ্গনা সেই এক ভাবে মুক্ত বাতায়নে। নিবিড় বিরাট অন্ধকারে দৃষ্টি মেলে দিয়ে রঙ্গনা কিসের সন্ধান করছে কে জানে!

রাত্রির দ্বিতীয় যাম অতীত। রঙ্গনা বাতায়ন ত্যাগ ক'র্‌লে। তারপর নিঃশব্দ পাদসঞ্চারে সুছন্দার শয়নকক্ষে প্রবেশ ক'র্‌লে - মৃদু সতর্ক কণ্ঠে নিদ্রামগ্না সুছন্দাকে ডাক্‌লে --"সুছন্দা সুছন্দা!"

* * * *

পরদিন সুমন্তের যখন নিদ্রাভঙ্গ হ'ল তখন পূর্ব্বগগনে রঙের খেলা শেষ হ'য়ে গেছে। নিদ্রা ভঙ্গ হতেই সুমন্ত অনুভব ক'র্‌লে যেন চম্পারণ্য শূন্য—সে শয্যায় উঠে বসল—ব্যস্তকণ্ঠে ডাক্‌লে—"রঙ্গনা রঙ্গনা।"

কোন উত্তর না পেয়ে সুমন্ত শয্যাত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়াল তারপর কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে রঙ্গনার নাম ডেকে ডেকে ফির্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু রঙ্গনা কোথাও নেই—সুছন্দাকেও দেখা গেল না।

সুমন্ত কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে আবার যখন তার শয়ন-কক্ষে ফিরে এলো তখন হঠাৎ তার শয্যায় উপাধানের পাশে তার দৃষ্টি পড়ল—দেখ্‌লে সেখানে ময়ূরকণ্ঠী মণিহার আর তারই পাশে একখানি লিপি। ত্রস্তে এসে সুমন্ত লিপি তুলে নিলে—দেখ্‌লে লিপি তার নামে।

কম্পিত হাতে লিপি খুলে সুমন্ত পাঠ ক'রলে। রঙ্গনা লিখেছে—

সুমন্ত!

বসন্ত-শ্রীর কাছে ফিরে যাও। আমি চম্পারণ্য ত্যাগ ক'রে চল্‌লাম। এতদিন ভালবাসার নামে যা ক'রছি সে কেবল আত্মাদর। যে সম্পদে বসন্ত-শ্রী ঐশ্বর্য্যময়ী সেই সম্পদের সন্ধান যদি কোন দিন পাই তবেই দেখা হবে, নইলে এই শেষ। বিদায়।

রঙ্গনা

সুমন্ত লিপি হাতে করে' বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল। মনে হ'ল যেন তার মস্তিষ্ক পাথরে পরিণত হচ্ছে।
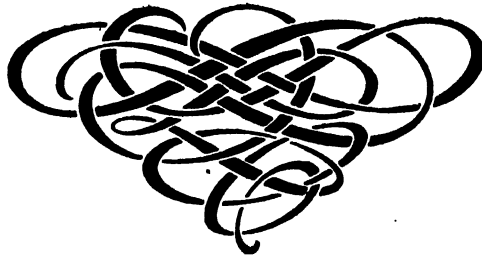
চিত্রাঙ্গদা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

রবীন্দ্র পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীমান সোমনাথ মৈত্র আমাকে আপনাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সম্বন্ধে দুচার কথা বলবার জন্য বক্তবার অনুরোধ করেছেন। তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে আমি সদাই প্রস্তুত কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি বরাবরই ইতস্তত করেছি। কারণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সমালোচনা করতে আমি ভয় পাই।

এ বিষয়ে যখনই কিছু বলবার প্রবৃত্তি মনে জেগে ওঠে, তখনি এ প্রশ্নও আমার মনে উদয় হয় যে কাব্য সমালোচনা করবার সার্থকতা কি? আমি জানি যে, সমালোচনা জিনিষটে সাহিত্য-জগতের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। বরং আমাদের স্কুল কলেজে কবির চাইতে সমালোচকেরই প্রাধান্য বেশি। প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক টেন-এর "ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস" আমরা অনেকেই পড়েছি; কেননা ইংরাজি সাহিত্যের M. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য সে বই আমরা অধ্যয়ন করতে ও যথাসাধ্য কণ্ঠস্থ করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু উক্ত বিপুল সাহিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমাদের ক'জনের আছে? এক্ষেত্রে সমালোচনা কাব্যের রসাস্বাদ করবার পক্ষে একটি অন্তরায় মাত্র। কোনও বিশেষ ভাষার সমগ্র কাব্যের ইতিহাসের কথা ছেড়ে দিলেও, একটি বিশেষ কবির কাব্যের রসাস্বাদ করবার পক্ষেও তার উক্তরূপ সমালোচনা তেমন অনুকূল নয়। Gervinus অথবা Dowden এর সমালোচনা পড়ে কজন পাঠক Shakespeare এর কাব্যের রসগ্রাহী হয়েছেন। আমরা যখন Taine পড়ি অথবা Gervinus পড়ি, তখন আসলে সমাজ ও সংসার সম্বন্ধে তাঁদের ফিলজফিই পড়ি। এ জাতীয় ঐতিহাসিক-দার্শনিক সমালোচনার গলদ এই যে, কাব্যের আত্মা দেশকালের মধ্যে আবদ্ধ নয় আর কাব্যরসিক মাত্রই জানে যে, কাব্য হচ্ছে ফিলজফির বহির্ভূত, কারণ মানবাত্মার যে মূর্ত্তির সাক্ষাৎ কাব্যে পাওয়া যায়, তার সাক্ষাৎ দর্শনে মেলে না।

২

আমার কথা ভুল বুঝবেন না। আমি এ কথা বলতে চাইনে যে, কবি ফিলজফর হতে পারে না, আর ফিলজফার কবি হতে পারে না। পৃথিবীতে এমন কবিও আছেন যাঁকে লোকে মহা দার্শনিক মনে করে, অপর পক্ষে এমন দার্শনিক আছেন যাঁকে লোকে মহাকবি মনে করে। প্লেটোর দর্শন ত কাব্য বলে ইউরোপে বহুকাল থেকে গণ্য হয়েছে। এমন কি Spinozaর Ethics জিওমেট্রির পদ্ধতিতে লেখা হলেও তা অনেকের কাছে একখানি মহাকাব্য।—অপর পক্ষে Shelly, Shakespeare এর ফিলজফি নিয়ে ইংলণ্ডে কত না আলোচনা হয়েছে। এমন কি রবীন্দ্রনাথ as a philospher নামক একখানি গ্রন্থ আছে। অপর পক্ষে উপনিষদ্ কাব্য কি দর্শন তা মনীষিবৃন্দ আজও ঠিক করতে পারেন নি। কবির সঙ্গে দার্শনিকের প্রভেদ কোথায়, intuition এর সঙ্গে concept এর প্রভেদ কি সে তর্ক আজ তুলতে চাইনে কেননা, সে আলোচনা হবে আগাগোড়া দার্শনিক;—অতএব অপ্রাসঙ্গিক। উপরন্তু আমার পক্ষে সে চর্চ্চা নিতান্তই অনধিকার চর্চ্চা।

আমি সুধু এই সত্যটি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, কাব্য-সমালোচক মাত্রেই কতক অংশে ফিলজফার হতে বাধ্য। আমাদের দেশের অলঙ্কার শাস্ত্র দর্শন শাস্ত্রের একটি শাখাবিশেষ। গ্রীসে আরিষ্টটল্ যে শ্রেণীর লোক ছিলেন, এদেশে অভিনব গুপ্তও সেই শ্রেণীর লোক। উভয়েই নৈয়ায়িক।

আগে একটা দার্শনিক মত খাড়া করে তারপর সেই মতানুসারে কাব্যের হীনতা বা শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করবার চেষ্টা যে বৃথা, সে জ্ঞান আজকের লোকের হয়েছে। তাতেই ফরাসীদেশের নব যুগের সমালোচকরা নিজেদের impressionist বলে পরিচয় দেন—অর্থাৎ তাঁদের মতে কাব্য বস্তু

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

হচ্ছে সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা এ আশাও করেন যে তাঁদের মতামতের universal validity আছে। কোনও সমালোচকের পক্ষে এ আশা ত্যাগ করা অসম্ভব। কারণ আমি যখনই কোনও মতকে সত্য বলে মনে করি, তখনই মনে করি যে, তা সকলের পক্ষে সত্য। তেমনি যখনই বলি এ বস্তু সুন্দর তখনই এ কথাটা উহ্য রয়ে যায় যে, তা সকলের কাছেই সুন্দর। Universal validity অবশ্য দর্শনের বিষয়। সুতরাং আমি রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে যতই অদার্শনিক কথা বলি না কেন একটা না একটা ফিলজফি তার মধ্যে থেকে উঁকি মারবে। আর সে ফিলজফি যে কত কাঁচা অথবা পচা তা ধরা পড়বে আপনাদের দার্শনিক চূড়ামণি president এর কাছে। অথচ কি করা যায়? কাব্য magic হতে পারে কিন্তু সমালোচনা লজিক হতে বাধ্য।

৩

আর এক জাতীয় সমালোচনা আছে যার reason এর সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নেই, যা ষোল আনা unreason এর ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এ জাতীয় সমালোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনও কাব্য-বিশেষের নিন্দা কিম্বা প্রশংসা করা। প্রায়ই দেখা যায় এ নিন্দা প্রশংসার মূল হচ্ছে রাগ দ্বেষ। কোনও কারণে কবি নামক মানুষটির উপর বিরক্ত হলে সমালোচক তাঁর কাব্যের নিন্দা করেন এবং অনুরক্ত হলে প্রশংসা করেন। এ অনুরাগ বিরাগ কাব্য জগতের কথা নয়; আমাদের এই চিরদিনের সমাজ সংসারের কথা। এরকম সমালোচনার জন্ম স্থান হচ্ছে হৃদয়। আলঙ্কারিকরা যে হৃদয়ের কথা বলেন এ সে হৃদয় নয়, রক্তমাংসে গড়া সেই হৃদয় যা প্রাণীমাত্রেরই বুকের ভিতর দিবারাত্র ধড়ফড় করছে। সুখের বিষয় এই মাংসপিণ্ড হতে আমি কোনওরূপ মতামত উদ্ধার করতে পারিনে। তা যে পারিনা তার প্রমাণ, সাহিত্যিক হিসাবে কেউ কেউ আমার সুখ্যাতি করেন কেউ কেউ বা অখ্যাতি। কিন্তু এ বিষয়ে সবাই একমত যে, আমার অন্তরে হৃদয় বলে পদার্থটি নেই। আপদ্‌শান্তি।

এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন যাঁরা কাব্যের বিচারক। এই সব কাব্য-জগতের ধর্ম্মাধিকরণের দল, কোন্ কবি কাব্যের কোন্ বিধি পালন করেছেন ও কোন্ নিষেধ অমান্য করেছেন, সেই অনুসারেই কাব্যের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে রায় দেন। আমি কাব্যের এরূপ বিচারক হতে পারিনে কারণ কাব্য-জগতের অলঙ্ঘ্য নিয়মাবলীর অস্তিত্ব আমি মানিনে। কাব্যেরও অবশ্য law আছে কিন্তু প্রতি যথার্থ কবিই হচ্ছেন তাঁর rulesএর স্রষ্টা। যে নিয়মের সাক্ষাৎ কালিদাসের নাটকে দেখতে পাই—সে নিয়মাবলীর সাহায্যে সেক্সপিয়ারের নাটক বিচার করা যায় না। Bergson যাকে বলেন Creative Evolution কাব্য-জগতে সৃষ্টির মূল পদ্ধতি যে তাই সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। তা ছাড়া আপনারা আমাকে রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপর জজিয়তি করবার জন্য আহ্বান করেননি, কারণ সে কাজের ভার ত মাসিক, সাপ্তাহিক, ও দৈনিক পত্রেরাই অযাচিত ভাবেই নিয়েছে।

৪

রবীন্দ্র পরিষদের প্রস্তাবে সম্মত হবার পূর্ব্বে আমার ইতস্ততের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আমাকে বক্তৃতা করতে হবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে। আমাকে কি এক্ষেত্রে প্রমাণ করতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ একজন কবি? জগদ্বিখ্যাত ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচে কাব্য সমালোচকদের বিদ্রূপ করে বলেছেন, 'পৃথিবীতে, কোনও দেশে কোনও কালে মানবজাতি কি তোমাদের সার্টিফিকেটের উপর আস্থা রেখে কাউকে কবি বলে স্বীকার করেছে?—না লোকমতে যারা কবি বলে গণ্য ও মান্য হয়েছে, তাদের সম্বন্ধেই তোমরা মুখর হয়ে উঠেছ? ইতালিতে দান্তে ও বিলাতে সেক্সপিয়ার লোকমতে বড় কবি বলে গণ্য হবার পরেই না তোমরা তাঁদের বিষয়ে বক্তৃতা করতে আরম্ভ করেছ?' এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হচ্ছে হাঁ তাই। একথা যে সত্য তার প্রমাণের জন্য সাগর লঙ্ঘন করবার প্রয়োজন নেই। রামায়ণ ও মহাভারত যে মহাকাব্য সে বিষয়ে লোকমত সমালোচকের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

এ থেকে এই প্রমাণ হয় যে, কবিবিশেষ যে কবি, এই কথাটা মেনে নিয়েই তাঁর কাব্যের আমরা আলোচনা করতে পারি। কারণ, কবিত্ব-শক্তি বস্তু যে কি, তা লজিকের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না। তা যে যায় না তা মানুষ বহুকাল পূর্ব্বে বুঝ্‌তে পেরেছে। আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিক বামনাচার্য্য বলেছেন যে, "কবিত্ববীজং প্রতিভানম্" এবং উক্ত সূত্রের তিনি বক্ষ্যমানরূপ ব্যাখ্যা করেছেন—"কবিত্বস্য বীজং কবিত্ববীজং জন্মান্তরাগতসংস্কার-বিশেষঃ।" এ ব্যাখ্যা কি খুব পরিষ্কার? "জন্মান্তরাগত সংস্কারবিশেষঃ" বলায়, সুধু বলা হয় যে, কবিত্বশক্তি অলৌকিক শক্তি অর্থাৎ mysterious। আমরা অপরের প্রতিভা থাক্‌লে তা চিন্‌তে পারি কিন্তু তা যে কি তা স্পষ্ট করে বল্‌তে পারিনে। এর কারণ প্রতিভা স্ব-প্রকাশ। কিন্তু তা প্রকাশ করে বলবার প্রয়াস বৃথা। এই চেষ্টা যে ব্যর্থ তার প্রমাণ আরিষ্টটল্ থেকে হেগেল্ পর্য্যন্ত সকল দার্শনিকই দিয়েছেন। প্রতিভার সন্ধান যে psychology নামক বিজ্ঞানের মধ্যে পাওয়া যায় না তার প্রমাণ, ও বস্তুর মূল কারণ একালের বৈজ্ঞানিকরা physiologyর অন্তরে খুঁজেছেন। প্রতিভা যে একরকম insanity এ মতও ইউরোপে প্রাদুর্ভূত হয়েছে। সে মত সত্য কি মিথ্যা সে কথা আমি বল্‌তে পারিনে। আমার বক্তব্য এই যে প্রতিভা যদি একরকম insanity হয় তাহলে এ জাতীয় insanity অনেকেই বরণ করে নেবেন, অন্তত আমি ত নেবই। এই প্রতিভার স্পষ্ট কার্য্য হচ্ছে আমাদের মনকে উদ্দীপ্ত ও আলোকিত করা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের স্পর্শে যাঁদের মন আলোকিত হয়ে ওঠে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নিজেই realise করেছেন আর সে আলোক যাঁদের অন্তরে প্রবেশ করেনি, লজিকের সাহায্যে তাঁদের অন্তরের রুদ্ধ বাতায়ন উন্মুক্ত করে দিতে আমি পারব না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ একজন কবি ও মহাকবি এই কথাটি মেনে নিয়েই তাঁর একটি বিশেষ কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করব।

৫

কোনও কবিকে বড় কবি বলে স্বীকার করতে বাধ্য হলেও তাঁর কাব্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার জিজ্ঞাসা আমাদের মনে উদয় হয়। এক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন হচ্ছে কাব্যের প্রয়োজন কি? এ প্রশ্ন বহু পুরাতন। আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকরা এ প্রশ্নের যাহোক একটা না একটা উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমি তাঁদের দু একটা মতের উল্লেখ করব। এ স্থলে বলে রাখা আবশ্যক যে আমি ফাঁক পেলেই যে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতামত পাঁচজনকে ফুর্ত্তি করে শোনাই, তার কারণ এ নয় যে আমি তাঁদের কথা এ বিষয়ে চূড়ান্ত বলে বিশ্বাস করি কিম্বা তাঁদের মতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করি। আলঙ্কারিক হিসাবে আরিষ্টটল্ বড় কিম্বা দণ্ডী বড়, হেগেল্ বড় কিম্বা বিশ্বনাথ বড়, সে বিচার করবার শক্তিও আমার নেই প্রবৃত্তিও আমার নেই। আমি যে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের দোহাই দেই তার একমাত্র কারণ আমি বাঙলা ভাষায় কথা কই। আর সংস্কৃত কথা বাঙলা ভাষার মধ্যে যত সহজে বেমালুম খাপ খায়, গ্রীক ও জার্ম্মাণ কথা ততই সহজে স-মালুম বেখাপ্পা হয়।

এখন প্রস্তুত বিষয়ে ফিরে আসা যাক্। বামনাচার্য্য বলেছেন।

"কাব্যং সদ্‌দৃষ্টাদৃষ্টার্থম্ প্রীতিকীর্ত্তিহেতুত্বাৎ।" বামন নিজেই উক্ত সূত্রের বক্ষ্যমান ব্যাখ্যা করেছেন। "কাব্যং সচ্চারু দৃষ্টপ্রয়োজনম্ প্রীতিহেতুত্বাৎ। অদৃষ্টপ্রয়োজনম্ কীর্ত্তিহেতুত্বাৎ।" সংস্কৃত শাস্ত্রকারেরা এত সাঁটে কথা কন্ যে আমাদের পক্ষে তাঁদের রচিত সূত্র যেমন সহজবোধ্য তার ব্যাখ্যাও প্রায় তদ্রূপ। আমি অনুমান করছি যে, বামনাচার্য্যের কাব্যের দৃষ্ট প্রয়োজন হচ্ছে কাব্য ভোক্তার প্রীতি আর তার অদৃষ্ট প্রয়োজন হচ্ছে কাব্য-কর্ত্তার কীর্ত্তি। এখন এই অদৃষ্ট প্রয়োজনের কথা মুলতবি রেখে দৃষ্ট প্রয়োজনের কথাটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করা যাক্, কারণ আজকের সভায় যারা একত্র হয়েছি তাদের কেউই কাব্যের কর্ত্তা ন'ন্—সবই ভোক্তা। কর্ত্তা যে আমরা নই তার প্রমাণ কবিকীর্ত্তি আমরা কেউই লাভ করিনি, যদিচ আমরা কেউ কেউ পদ্য লিখেছি।

৬

কাব্য-রস আস্বাদ ক'রে যে আমরা প্রীতি লাভ করি এ তো প্রত্যক্ষ সত্য সুতরাং এ সম্বন্ধে আর তর্ক নেই। কেননা যা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

দৃষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষ তা স্বতঃসিদ্ধ। তবে মনে রাখবেন,যে বিষয়ে তর্ক নেই—সেই বিষয়েই মানুষের তর্কের শেষ নেই। তাই এই প্রীতিকথা নিয়ে দেদার তর্ক করা যেতে পারে কেননা যুগ যুগ ধরে করা হয়েছে। প্রীতি অর্থ যদি হয় pleasure তাহলেই বামনাচার্য্যের মতকে hedonism এর কোঠায় ফেলে দেওয়া যায়। কাব্য সম্বন্ধে ও মত অগ্রাহ্য কেননা ও মতানুসারে কাব্য বিলাসের একটি উপকরণ হয়ে পড়ে অর্থাৎ মাল্যচন্দন বনিতার দলে পড়ে যায়। এ তর্ক ইউ-রোপীয় পণ্ডিতরা দেদার করেছেন। বোধ হয় তাঁদের সমধর্ম্মী পণ্ডিতের দল এদেশে সেকালেও ছিলেন। সে কারণ নব্য আলঙ্কারিকরা প্রীতির বদলে "আনন্দ" শব্দের উপরেই ঝোঁক দিয়েছেন। এমন কি নব্য আলঙ্কারিকদের আদি গুরুর নাম আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য। এ আনন্দ যে কোনও লৌকিক আনন্দ নয় সেকথা নব্য আলঙ্কারিকরা স্পষ্টাক্ষরে লিখে গেছেন। আনন্দের ইংরাজি pleasure নয় joy। "A thing of beauty is a joy for ever"—কবি Keats-এর এ বাণী তাঁরা বিনাবাক্যে শিরোধার্য্য করে নিতেন কারণ নিরানন্দ হওয়াটাই সংসারের দাসত্বের ফল আর আনন্দই মুক্তি। প্রীতি দৃষ্ট প্রয়োজন একথা বলার অর্থ কাব্যামৃত রসাস্বাদ করার আনন্দ ব্যতীত, কাব্যের অপর কোনও দৃষ্ট প্রয়োজন নেই। মানবমনের প্রীতিসাধনই কাব্যের একমাত্র utility।

একথা প্রসন্নমনে মেনে নেওয়া অনেকের পক্ষে পুরা-কালেও কঠিন ছিল, আর একালে একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কারণ একালে মানুষের রক্তমাংসের যা প্রয়োজন তাই মানবজীবনের একমাত্র প্রয়োজন বলে গণ্য হয়েছে এবং সেই প্রয়োজনের কায়মনোবাক্যে সাধনা করাই জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং কাব্যের সার্থকতা আমরা মানুষের সাংসারিক প্রয়োজনের মাপ-কাঠিতে যাচাই করতে সদাই প্রস্তুত।

৭

কাব্যামৃত-রসের আস্বাদ যে মুক্তির আস্বাদ এ মতে সায় দেওয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের পক্ষে অতি সহজ ছিল, কেননা তাঁদের মতে জীবনটা হচ্ছে নিছক ভবযন্ত্রণা। জীবনের ধর্ম্ম হচ্ছে আত্মাকে তার দাস করা, আর মনের এই দাসত্ব হতে মুক্তির প্রসাদেই মানবাত্মা আনন্দ লাভ করে। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, সকল দেশে সকল যুগেই অলঙ্কার-শাস্ত্র হচ্ছে দর্শন-শাস্ত্রের একটি শাখা মাত্র। সুতরাং আমাদের দেশের দর্শন-শাস্ত্রের মুক্তির সঙ্গে কাব্যচর্চ্চার মুক্তির জ্ঞাতিত্ব আছে ও উভয়েই স্বজাতীয়।

একালে জীবনের প্রতি আমাদের দার্শনিক অবজ্ঞা নেই আছে অন্ধভক্তি। কারণ জীবন আমাদের পক্ষে এখন আর নিরর্থক নয়। আমরা এখন জানি যে জীবন হচ্ছে ক্রমবর্দ্ধনশীল এবং তার চরম সার্থকতার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে ভবিষ্যতে। মর্ত্ত্যকে স্বর্গে পরিণত করবার শক্তি মানুষের হাতেই আছে সুতরাং আমাদের কাম্য পদার্থ মোক্ষ নয় ভূস্বর্গ। জীবন আজও দুঃখময় কিন্তু আমাদের পক্ষে পরম পুরুষার্থ হচ্ছে এই দুঃখময় জীবন থেকে পলায়ন করা নয় তাকে জয় করা। কামনাকে বশ করা জীবনী শক্তির হ্রাস করা কারণ সে শক্তির যথার্থ কার্য্য হচ্ছে কাম্য বস্তুকে বশীভূত ও আয়ত্ত করা। এখন আমরা evolution নামক নূতন বিশ্বকর্ম্মার সন্ধান পেয়েছি তাই আমরা progress নামক তার চাকা ঘোরানোকে পরম পুরুষার্থ বলে মনে করি। কাল আগে ছিলেন প্রলয়কর্ত্তা, evolution-এর দৌলতে তিনি হয়ে উঠেছেন সৃষ্টিকর্ত্তা। সুতরাং মানুষের যত প্রকার সাংসারিক প্রয়োজন আছে তার সাধনা করাই এযুগে যথার্থ মানবধর্ম্ম। ফলে অর্থ কাম আমাদের আরাধ্য বস্তু হয়ে উঠেছে। তাই এযুগে আমরা সবাই হয় economical নয় political নয় social সমস্যার হাতে কলমে মীমাংসা করবার জন্য ব্যগ্র। ফলে কাব্য আমাদের এই সব প্রচেষ্টার কতদূর সহায় কি অন্তরায় সেই হিসেব থেকে কাব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করবার প্রবৃত্তি আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তবে দুঃখের বিষয় এই যে,এ সব দিক থেকে কাব্যের সমালোচনা করায় সুধু অল্পবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়। কারণ এ জাতীয় সমালোচকের মনের কথা হচ্ছে কাব্য থেকে কি শিক্ষা লাভ করলুম কি আনন্দ লাভ করলুম তা নয়। এ জাতীয়

সমালোচক সেকালেও ছিল এবং তাদের লক্ষ্য করে দশরূপকার ধনঞ্জয় বলেছেন—

আনন্দনিস্যন্দিষু রূপকেষু
ব্যুৎপত্তিমাত্রং ফলমল্পবুদ্ধি
যোঽপিতিহাসাদিবদাহ সাধুঃ
তস্মৈ নমঃ স্বাদুপরাঙ্মুখায়।

এ সংস্কৃত মত আমি শিরোধার্য্য করি, কেননা এই হচ্ছে অতি আধুনিক মত। যে মত অতি পুরাতন এবং সেই সঙ্গে অতি নূতন সে মত যদি ভুল হয় তো তা নাছোড় ভুল অর্থাৎ সত্য।

৮

রবীন্দ্রনাথ আজকের দিনে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় কবি, সুতরাং তাঁর কাব্যে আমরা সুশিক্ষা অশিক্ষা কি কুশিক্ষা কোন্ জাতীয় শিক্ষা লাভ করি এ প্রশ্ন অনেক সমালোচক করেছেন এবং সে সব প্রশ্নের উত্তর নিজেরাই দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর একখানি কাব্যের উল্লেখ করব যার উপর অল্পবুদ্ধি সাধু লোকেরা বহু বাণ বর্ষণ করেছেন যদিচ তাঁদের মধ্যে অনেকে সেখানি যে যথার্থ কাব্য তা অস্বীকার করতে পারেননি। সে কাব্যের নাম চিত্রাঙ্গদা। এই চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে প্রতিকূল সমালোচনার সার সংগ্রহ করেছেন—Thomson নামক জনৈক ইংরাজ মিসনারী। তাঁর প্রথম বক্তব্য হচ্ছে

"It is his loveliest drama ; a lyrical feast, though its form is blankverse."

"It is almost perfect in unity and conception, magical in expression."

যাঁরা কাব্যের রস উপভোগ করেন তাঁরা এর বেশি কোনও কাব্য সম্বন্ধে আর কি জানতে চান? কিন্তু সাধু ব্যক্তিদের আরও একটি বলবার কথা আছে। এ কাব্য সাধু কি অসাধু তার বিচার তাঁরা না করে থাকতে পারেন না। তাই Thomson বলেছেন—

"The play was attacked as immoral, and to this day offends many readers, not all of whom are either fools or milksops."

"The purpose of the play has been represented as the glorification of sexual abandonment."

"The play in these earlier passages repeatedly trembles on the edge of the bog of lubricity." তারপর এর চাইতেও এ কাব্যের নাকি একটি বড় দোষ আছে। Thomson বলেন "The most serious charge that can be brought against Chitrangada is against its attitude."

Thomson সাহেবের কৃত চিত্রাঙ্গদা কাব্যের দোষগুণ বিচারের বিচার করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমি কবির উপর জজিয়তি করতে ভয় পাই কিন্তু সমালোচকের সঙ্গে ঝগড়া আমি সানন্দে করতে পারি।

৯

চিত্রাঙ্গদা একটি স্বপ্নমাত্র, মানব মনের একটি অনিন্দ্য-সুন্দর জাগ্রত স্বপ্ন। এ চিত্রাঙ্গদা সেকালের মণিপুরের রাজকন্যা নন, সর্ব্বকালের মানুষের মন-পুরীর রাজরাণী, হৃদয়-নাটকের রত্নপাত্রী। আমরা যাকে আর্ট বলি তা হচ্ছে মানব মনের জাগ্রত স্বপ্নকে হয় রেখায় ও বর্ণে, নয় সুরে ও ছন্দে, নয় ভাষায় ও ভাবে আবদ্ধ করবার কৌশল বা শক্তি।

অনঙ্গ-আশ্রম হচ্ছে একটি কল্পলোক, যেমন মেঘদূতের অলকা ও কুমার সম্ভবের শৈল আশ্রম একটি কল্পলোক মাত্র। জিওগ্রাফিতে এ সব লোকের সন্ধান মেলেনা কারণ মাটির পৃথিবীতে তাদের স্থান নেই, তাদের সৃষ্টি স্থিতি সুধু মানুষের মনে।

মানুষের মন অবশ্য এই পৃথিবী হতে মনোমত উপাদান সংগ্রহ করে, এই কল্পলোক রচনা করে; যেমন মানুষে গুটিকতক পার্থিব উপাদান দিয়েই স্বর্গলোক অর্থাৎ সর্ব্ব-লোক-কাম্য একটি অপার্থিব কল্পলোকের সৃষ্টি করেছে।

এই কল্পলোক বাস্তব জগৎ থেকে বিভিন্ন হলেও বিচ্ছিন্ন নয়। ভাল কথা, আমরা যাকে বস্তু-জগৎ বলি সে বস্তুই বা কি? সে জগৎও ত মানুষের মন রচনা করেছে। কবিতার কল্পলোক ও বুদ্ধির প্রকৃত লোক দুইই মানব মনের সৃষ্টি। এ দুয়ের ভিতর যথার্থ প্রভেদ এই যে এ দুটি মানব মনের দুটি বিভিন্ন শক্তির রচনা। কথাটা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

শুনে চম্‌কে উঠবেন না। আপাতঃ দৃষ্টিতে যা বাহ্যবস্তু বলে মনে হয় তাকে যাচিয়ে দেখতে গেলে দেখতে পাওয়া যায় তার অন্তরে রয়েছে logical mind। আমরা যাকে object বলি তা যে subjectএরই বিকার তা স্বয়ং লজিকই মানতে বাধ্য।

এই বস্তুজগৎ ওরফে মানুষের কর্ম্ম-ভূমির যথার্থ স্রষ্টা হচ্ছে মানুষের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি। কর্ম্মজগৎ ও কল্পজগৎ এ দুই জগৎই সমান সত্য কেননা আমাদের মনে যেমন কর্ম্মের প্রতি আসক্তি আছে তেমনি কর্ম্ম-জগৎ থেকে মুক্তি পাবারও আকাঙ্ক্ষা আছে। এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় আমাদের স্বকপোলকল্পিত ধর্ম্মে ও আর্টে। সুতরাং চিত্রাঙ্গদা যে-জাতীয় স্বপ্ন সে স্বপ্নেরও আমাদের আন্তরিক প্রয়োজন আছে। এ প্রয়োজনের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন সুধু সেই জাতীয় বুদ্ধিমান লোকেরা যাঁদের অন্তর একান্ত বিষয় বাসনার গণ্ডীবদ্ধ, সে বিষয়-বাসনা ব্যক্তিগতই হোক আর জাতিগতই হোক। এঁদের মনে কর্ম্ম-জিজ্ঞাসার অতিরিক্ত জিজ্ঞাসা নেই। এই এক-চক্ষু হরিণের দল ভুলে যান যে, মানুষ-মাত্রই বাস করে কতকটা কর্ম্মজগতে আর কতকটা স্বপ্নলোকে।

১০

এই স্বপ্নকে যাঁরা সম্পূর্ণ সাকার করে তুলতে পারেন, অর্থাৎ সমগ্র ও পরিচ্ছিন্ন রূপ দিতে পারেন, তাঁরাই হচ্ছেন পূর্ণ আর্টিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্য মানুষের যৌবন-স্বপ্নের একটি অপূর্ব্ব এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র।

ছবি গান ও কবিতার বিষয় আলোচনা করতে হলেই আমরা "সুন্দর" শব্দটি বার বার ব্যবহার করতে বাধ্য হই যেমন দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনা করতে বসলে আমরা বার বার সত্য শব্দটি ব্যবহার করতে বাধ্য হই। অথচ beauty ও truthএর বাচ্য পদার্থের মত অনির্দ্দেশ্য বস্তু আর ভুভারতে নেই। তাই আমরা সৌন্দর্য্য শব্দের বদলে সৌন্দর্য্যের নানারকম উপকরণের উল্লেখ করি যথা মাধুর্য্য, ঔদার্য্য, কান্তি, দীপ্তি, সুষমা সৌকুমার্য্য, লালিত্য, লাবণ্য, চমৎকারিত্ব, মনোহারিত্ব ইত্যাদি। এ সব নামই সৌন্দর্য্যের বেনামি হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। ফলে এ সবের প্রসাদে সৌন্দর্য্যের অর্থ স্পষ্টতর হয় না, কিন্তু সৌন্দর্য্য নামক গুণটির অনুভূতি লোকসামান্য। সুতরাং সেই অস্পষ্ট অনুভূতির উপরই আমার এ আলোচনা প্রতিষ্ঠিত করব। আর তা করায় ক্ষতি নেই। কারণ যে সকল দার্শনিকরা beauty, truth প্রভৃতি শব্দের চুলচেরা বিচার করেন, তাঁরা অনেকেই সোনা ফেলে আঁচলে গিঁট দেন; অর্থাৎ নামের সন্ধান করতে রূপের সন্ধান হারিয়ে ফেলেন।

কোনও কাব্যের আত্মার পরিচয় দেওয়ার চাইতে তার দেহের পরিচয় দেওয়াটা ঢের সহজ, কেননা দেহ জিনিষটে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পরিচ্ছিন্ন। আর সকলেই জানেন যে ভাষা হচ্ছে ভাবের দেহ। নীরব কবি বলে পৃথিবীতে কোনও প্রকার জীব নেই, কেননা এ পৃথিবীতে ভাষাহীন ভাব নেই। সুতরাং আমি যদি চিত্রাঙ্গদার ভাষার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি তাহলে আশা করি তার আত্মার সাক্ষাৎকার আপনারা আপনা হতেই পাবেন। আমাদের দেশে লোকে ভগবানকে কায়াহীন সত্ত্বা হিসাবে ধারণা করতে পারতেন না, তাই বৌদ্ধরা তাঁকে ধর্ম্মকায় ও বৈষ্ণবেরা মনোকায় বলে উপলব্ধি করতেন।—সুতরাং কাব্যকে ভাষাকায় বলায় আমরা কাব্যের আত্মা সম্বন্ধে নাস্তিক অথবা দেহাত্মবাদী বলে অন্তত এদেশে গণ্য হবো না।

১১

কবিকঙ্কন বলেছেন যে, চণ্ডী-কাব্য তিনি লেখেননি কিন্তু চণ্ডী তাঁর হাত ধরে লিখিয়েছেন। ভারত-চন্দ্রও ঐ একই কথা বলেছেন। তিনিও অন্নপূর্ণার আদেশে ও প্রসাদে, অন্নদামঙ্গল রচনা করেছিলেন। বলা বাহুল্য এ চণ্ডী এ অন্নপূর্ণা সরস্বতী ব্যতীত অন্য কোনও দেবতা নন। কবিকঙ্কণ সরস্বতীর গুণবর্ণনা করতে একটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করেছেন যে তাঁর "বীণাগুণে তরল অঙ্গুলি"।

কবিকঙ্কণের অঙ্গুলি কিন্তু তরল নয় স্থূল। আর ভারতচন্দ্রের অঙ্গুলি লঘু হলেও সে অঙ্গুলি কখনো বীণাগুণ স্পর্শ করেনি, কারণ তাঁর অঙ্গুলি ছিল মেজরাপ-মণ্ডিত। চিত্রাঙ্গদার কবির অঙ্গুলি যে বীণাগুণে পূর্ণমাত্রায় তরল

তা যাঁর ভাষার সুরের কান আছে তিনি চিত্রাঙ্গদার দু-লাইন পড়লেই বুঝতে পারবেন। চিত্রাঙ্গদা একটি সম্পূর্ণ রাগিনী। এর কোথায়ও একটি বেসুরো কথা নেই আর এ ভাষার গতি যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি সলীল। ও কাব্যের অন্তরে যেমন একটিও বেসুরো কথা নেই তেমনি একটিও উচ্ছৃঙ্খল ছত্র নেই। এ কাব্যের ধ্বনি একমুহূর্ত্তের জন্যও বাণীকে ছাপিয়ে কিম্বা ছাড়িয়ে ওঠেনি। ভাষার সমতা ও ধ্বনির মসৃণতা গুণে চিত্রাঙ্গদা মেঘদূত ও কুমার-সম্ভবের স্বজাতীয় ও সমকক্ষ। এ ভাষা যেমন প্রসন্ন তেমনি সপ্রাণ, যেমন উজ্জ্বল তেমনি স্নিগ্ধ। এ ভাষা পরিপূর্ণ প্রাণের আবেগে মুক্তছন্দে অবলীলাক্রমে বয়ে যাচ্ছে। এ প্রবাহিনীর সুর ললিত, তাল মধ্যমান। এ কাব্য সরস্বতী নিজ হাতে লিখেছেন বল্লে আমরা সে কথায় অবিশ্বাস করতুম না।

ভারতচন্দ্র স্থানান্তরে বলেছেন যে, অন্নদা তাঁকে ভরসা দিয়েছিলেন যে :—

"যে কবে সে হবে গীত, আনন্দে লিখিবে।"

চিত্রাঙ্গদার কবি, যার মুখ দিয়ে যা বলেছেন তা সবই গীত হয়েছে। এ ভাষা কবির মুখে স্বয়ং বসন্ত দিয়েছিলেন। চিত্রাঙ্গদা বসন্তের নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে

"বড়
ইচ্ছা হয়েছিল, সে যৌবন-সমীরণে
সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে
অপূর্ব্ব পুলকভরে উঠে প্রস্ফুটিয়া
লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মের মতন।
হে বসন্ত, হে বসন্তসখে! সে বাসনা
পুরাও আমার সুধু দিনেকের তরে।"

বসন্ত-সমীরণের স্পর্শে চিত্রাঙ্গদার দেহের অনুরূপ চিত্রাঙ্গদা কাব্যেরও দেহ অপূর্ব্ব পুলকভরে ফুটে উঠেছে। —এ ভাষা নবীন প্রাণের স্পর্শে আগাগোড়া মুকুলিত ও পুলকিত।

১২

আমাদের নিত্যকর্ম্মের ভাষার সঙ্গে কবির ভাষার যে একটি স্পষ্ট প্রভেদ আছে, তা সকলেই জানেন। দৈনিক সংবাদ-পত্রের ইংরাজী ভাষা ও সেকস্‌পিয়ারের ভাষা যে এক নয়, তা যে কোনও সংবাদ-পত্রের এক পৃষ্ঠা পড়বার পর সেক্‌সপিয়ারের নাটকের এক পৃষ্ঠা পড়লেই সকলের কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। প্রভেদ যে ঠিক কোথায় তা বলা অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে উপায়ান্তরের অভাবে আমরা নানারূপ বিশেষণের আশ্রয় নিই। কিন্তু সে সব বিশেষণের সার্থকতাও অনুভূতিসাপেক্ষ। যে কোনও বিষয়ের আমরা ব্যাখ্যা সুরু করিনে কেন, লজিকের সাহায্যে কতকদূর অগ্রসর হবার পর আমরা দেখতে পাই যে লজিকের হাত ধরে আর বেশিদূর এগোনো চলে না। কেননা তখন আমরা এমন একটি সত্যের সাক্ষাৎলাভ করি যার নাম mystery। এর কারণ ভগবান কৃষ্ণ বলে দিয়েছেন "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।" এই ব্যক্তমধ্যই লজিকের এলাকা। আমরা যদি বলি কবির ভাষায় প্রাণ আছে তাহলে বলা হয় যে কবির ভাষা অনির্বচনীয়, কেননা প্রাণ পদার্থটিও একটি mystery,—তবে উপমার সাহায্যে ব্যাপারটি একটু পরিষ্কার করা যায়। আমাদের কর্ম্মের ভাষা static অর্থাৎ পদার্থের নামকরণ করেই তার কর্ম্মের অবসান হয়। কবির ভাষা dynamic অর্থাৎ সে ভাষার অন্তরে গমক আছে, অকবির ভাষার অন্তরে তা নেই। আলঙ্কারিকরা বলেছেন—

"ইদমন্ধম্ তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ং
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে"

কবির মুখনিঃসৃত এই শব্দাখ্য জ্যোতি মনের নানাদেশে সঞ্চারিত হয় এবং নানাভাবকে অঙ্কুরিত করে; ফলে, আমাদের মনোজগতের প্রাণের ঐশ্বর্য্য বাড়িয়ে দেয়। কবির বাণী তার অন্তর্গূঢ় শক্তির বলে কি বাহ্যজগৎ কি অন্তর্জগতের বিরাট অব্যক্ত অংশের রহস্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। চিত্রাঙ্গদার ভাষা সেই জাতীয় যাদুকরী ভাষা যার সাক্ষাৎ আমারা ইংরাজ কবি Keats-এর কবিতায় পাই। এক কথায় এ হচ্চে লৌকিক ভাষার অলৌকিক সংস্করণ। এ ভাষার মোহিনীশক্তির মূল হচ্ছে কবির আত্মায়। সে যাই হোক ভাষার সঙ্গে কাব্যের

চিত্রাঙ্গদা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

এতটা আত্মীয়তা আছে যে, ইউরোপে অনেকে কবিকে a great voice বলে আখ্যা দিয়েছেন।

১৩

প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতে কাব্যের সৌন্দর্য্য নগ্ন নয় অলঙ্কৃত। এমন কি তাঁদের মতে কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ। যে অলঙ্কারের গুণে কাব্য গ্রাহ্য সে গুণটি কি? বামনাচার্য্য বলেছেন যে "সৌন্দর্য্যমলংকারঃ"।

সৌন্দর্য্য অর্থ অলংকার আর অলংকার অর্থ সৌন্দর্য্য, এ রকম ব্যাখ্যা শুনে এ বিষয়ে আমরা যে তিমিরে আছি সেই তিমিরে থেকে যাই। আমি বালক কালে একটি বঙ্গদেশীয় মুসলমানের মুখে একটি "হররা" ঘোড়ার কথা শুনি। "হররা"র অর্থ কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করলেন "বোরা"। তারপর "বোরা" কাকে বলে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন "মুসকি"। এইরূপ ব্যাখ্যা শুনে আমি অবশ্য তাঁর আরবী ও ফার্সি ভাষার পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট তারিফ করি কিন্তু সেই সঙ্গে আমার ধারণা হয় ভদ্রলোক কি বলতে চান তা তিনি নিজেও জানেন না, কেন না যদি জানতেন ত, ও রঙের বাঙলা নামটাই বলে দিতেন।

সুতরাং বামনাচার্য্য যখন অলংকার শব্দ কি connote করে তা বলতে না পেরে কি denote করে তাই বললেন তখন তাঁর বক্তব্য বোঝা গেল। যখন শুনলুম "পুনরলংকার শব্দোঽয়মুপমাদিষু বর্ত্ততে" তখন নিশ্চিন্ত হলুম।

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত "কাব্যজিজ্ঞাসা" নামক একটি অতি সুন্দর ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাঙ্গলায় লিখেছেন। সে প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে নব্য আলঙ্কারিকদের মতে উপমাদি অলংকারের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও বাক্য কাব্য হয় না অপর পক্ষে বহু অনলংকৃত বাক্য চমৎকার কাব্য! এর প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যে দেদার আছে। কিন্তু অলংকার যে কাব্যকে শোভাহীন করে এমন কথা কোনও আলংকারিক বলতে পারেন না তা তিনি যতই নব্য হোন না কেন। কেননা, উপমাদি যদি কাব্য-দেহের কলঙ্ক হত তাহলে কালিদাসের কাব্য পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কলঙ্কিত। অতএব কোন্ স্থলে কিরূপ উপমাদি প্রকৃতি-সুন্দর কাব্যের শোভা বৃদ্ধি করে, সে সম্বন্ধে দু চার কথা বলা আবশ্যক।

আমি এ স্থলে সুধু দুটি মূল অলংকারের কথা বলব— একটি অনুপ্রাস অপরটি উপমা। সংস্কৃত মতে একটির নাম শব্দালঙ্কার অপরটির নাম অর্থালঙ্কার! কিন্তু এ উভয়ই মূলত সমধর্ম্মী! দণ্ডী বলেছেন —

"যথা কয়াচিচ্ছ্রুত্যা যৎ সমানমনুভূয়তে।
তদ্রূপাহি পদাসত্তিঃ সানুপ্রাসা রসাবহা॥"

তারপর

"যথাকথঞ্চিৎ সাদৃশ্যং যত্রোদ্ভূতং প্রতীয়তে
উপমা নাম সা তস্যাঃ প্রপঞ্চোঽয়ং নিদর্শ্যতে।"

অর্থাৎ এক অলঙ্কারের প্রসাদে কানের কাছে শব্দসমূহ সমান অনুভূত হয় অপর অলংকারের প্রসাদে মনের কাছে বস্তু সদৃশ প্রতীয়মান হয়।

এ বিশ্বে আমাদের আপাতঃ দৃষ্টিতে যা বিভিন্ন তার সমীকরণ করাই হচ্ছে কাব্যের ধর্ম্ম অর্থাৎ যা কিছু পরস্পর বিচ্ছিন্ন তাদের নিরবচ্ছিন্ন রূপ দিতে আর প্রক্ষিপ্ত জগৎকে সংক্ষিপ্ত করতে পারে সুধু কবি-প্রতিভা। পরাবিদ্যা যেমন আমাদের লৌকিক ভেদবুদ্ধি নষ্ট করে, কাব্যও তেমনি আমাদের লৌকিক ভেদ-দৃষ্টি নষ্ট করে। এই বিশ্বে বস্তুর সমপ্রাণতা ও আত্মীয়তার অনুভূতিই হচ্ছে মুক্তির রসাস্বাদ। কারণ যে মুহূর্ত্তে ভেদবুদ্ধি অপসারিত হয়, সেই মুহূর্ত্তে অহং আত্মা হয়ে ওঠে।

আমার এ ধারণা যদি সত্য হয় ত বলা বাহুল্য যে অনুপ্রাস ও উপমা দুইই কাব্যের বিশেষ অন্তরঙ্গ। কারণ দৃশ্যজগৎ ও শব্দজগতের নিগূঢ় সত্য ব্যক্ত করাই এদের ধর্ম্ম। এ দুই যখন কাব্যের অন্তরঙ্গ না হয়ে বাহ্য অলঙ্কার হয় তখনই তা অগ্রাহ্য। ভাষার ও ভাবের খেলো জমির উপর উপমা অনুপ্রাসের চুমকি বসানো সুধু মন্দ কবির কারদানি। চিত্রাঙ্গদা কাব্যের অনুপ্রাস ও উপমা উভয়ই ও কাব্যের অন্তরঙ্গ। এ কাব্যে এমন একটিও অনুপ্রাস কিম্বা উপমা নেই যা এ কাব্য-অঙ্গে প্রক্ষিপ্ত, এবং অন্তর থেকে উদ্ভূত নয়। সঙ্গীতে যেমন সেই তানের চমৎকারিত্ব আছে যে তান রাগিনীর প্রাণ থেকে স্বতঃ উৎসারিত

তেমনি চিত্রাঙ্গদারূপ রাগিনীর অন্তরে বহু অনুপ্রাস আছে যা উক্ত রাগিনীর অন্তর থেকে স্বতঃ স্ফূর্ত্ত হয়েছে।

"সেই সুপ্ত সরসীর স্নিগ্ধ শষ্পতটে
শয়ন করেন সুখে নিঃশঙ্ক বিশ্রামে।"
"শেফালিবিকীর্ণ তৃণ-বনস্থলী দিয়ে"
"ধন্য সেই মুগ্ধ মূর্খ ক্ষীণ তনুলতা
পরাবলম্বিতা লজ্জাভরে লীনাঙ্গিনী
সামান্য ললনা।"

এসব অনুপ্রাস যে চমৎকার তার সাক্ষী কান! কিন্তু এ সব অনুপ্রাস অযত্নসুলভ। ধ্বনি আপনিই দানা বেঁধে উঠেছে সমগ্র সঙ্গীত-প্রাণ কাব্যের অন্তর হতে। টমসন সাহেব বলেছেন যে এ কাব্য 'magical in expression, যদিচ তা অমিত্রাক্ষরে রচিত। এ কাব্যে যে অন্ত-অনুপ্রাস নেই তার কারণ সমগ্র কাব্যখানিই একটি একটানা অনুপ্রাস।

১৫

আসল কথা এই যে অলঙ্কার হচ্ছে কাব্যের একরূপ ভাষা। নব্য আলঙ্কারিকরা অলঙ্কারের জাতিভেদ স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে অতিশয়োক্তি হচ্ছে একমাত্র অলঙ্কার। প্রাচীনেরাও এ অলঙ্কারকে সর্ব্বোত্তম অলঙ্কার বলে, গণ্য করেছেন। এ অলঙ্কার যে কি তা প্রাচীন অলঙ্কারিকদের মুখেই শোনা যাক—

"বিবক্ষা যা বিশেষস্য লোকসীমাতিবর্ত্তিনী
অসাবতিশয়োক্তি স্যাদলঙ্কারোত্তমা যথা।"
(কাব্যাদর্শ)

"লোকসীমাতিবৃত্তস্য বস্তুধর্ম্মস্য কীর্ত্তনম
ভবেদতিশয়ো নাম সম্ভবোঽসম্ভবো দ্বিধা।"
(অগ্নিপুরাণ)

চিত্রাঙ্গদা কাব্যের উপমা রূপকাদি উক্ত অর্থে অতিশয়োক্তি অর্থাৎ তাদের গুণে বর্ণিত বিষয় সব লোকসীমা অতিক্রম করে, ইংরাজীতে যাকে বলে transcend করে। এই সর্ব্বোত্তম অলঙ্কারের স্পর্শে সমগ্র কাব্য-শরীরের রূপলাবণ্যও লোকোত্তর হয়ে উঠেছে অর্থাৎ যা natural তা supernatural বলে প্রতিভাত হয়। আমি নিয়ে চিত্রাঙ্গদা থেকে দুচারটি ঐ জাতীয় উক্তি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তাদের নাম উপমাই হোক, রূপকই হোক আর উৎপ্রেক্ষাই হোক তার প্রতিটি যে অপূর্ব্ব অতিশয়োক্তি সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। চিত্রাঙ্গদা মদনের বরে ক্ষণিকের জন্য ফুলের মত ফুটে উঠে বলেছেন :—

"যেন আমি ধরাতলে
একদিনে উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের
পিতৃমাতৃহীন ফুল, একটি প্রভাত
শুধু পরমায়ু, তারি মাঝে শুনে নিতে
হবে, ভ্রমর-গুঞ্জনগীতি বসন্তের
আনন্দ মর্ম্মর, তার পরে নীলাম্বর
হ'তে নামাইয়া আঁখি, নুমাইয়া গ্রীবা
বায়ুস্পর্শভরে টুটিয়া লুটিয়া যাব
ক্রন্দনবিহীন, মাঝখানে ফুরাইবে
কুসুমকাহিনীটুকু আদিঅন্তহারা।"

এমন সুন্দর এমন মর্ম্মস্পর্শী পরিপূর্ণ যৌবনের কুসুম-কাহিনী আর কোনও কবির মুখে কেউ কখনো শুনেছেন?

১৬

পুষ্পরাজ্যেও আবিষ্কৃত আর একটি উপমার পরিচয় দিই। চিত্রাঙ্গদা যেদিন তাঁর সদ্য-প্রস্ফুটিত অলোকসামান্য রূপের প্রথম সাক্ষাৎ পান :—

"সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।
শ্বেত শতদল যেন কোরক বয়স
যাপিল নয়ন মুদি'—যেদিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেইদিন
হেলাইয়া গ্রীবা নীল সরোবর-জলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে।"

এই শব্দচিত্রের দিকে সহৃদয় ব্যক্তি চিরকাল 'রহিবে চাহিয়া সবিস্ময়ে।'

অলঙ্কারিকদের মতে কবির যে যাদুমন্ত্রের বলে সাদৃশ্য সাযুজ্যে similarity identityতে পরিণত হয় সেই উক্তিই অতিশয়োক্তি। তাঁরা উদাহরণ স্বরূপ বক্ষ্যমান শ্লোকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

চিত্রাঙ্গদা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

"মল্লিকামালভারিণ্যঃ সর্ব্বাঙ্গীনাদ্রচন্দনাঃ
ক্ষৌমবত্যো ন লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নায়ামভিসারিকাঃ"

অর্থাৎ অভিসারিকা জ্যোৎস্নার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে, কেননা তিনি মল্লিকার মালা ধারণ করেছেন, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন করেছেন, এবং ক্ষৌমবাস পরিধান করেছেন। এখন চিত্রাঙ্গদার বিষয় কবির একটি উক্তি শোনা যাক্।

"উষার কনক মেঘ দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায়; পূর্ব্ব পর্ব্বতের
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভা করি
বিকাশিত, তেমনি বসনখানি তার
অঙ্গের লাবণ্যে মিলাতে চাহিতেছিল—
মহাসুখে।"

এ কবির সাক্ষাৎ পেলে প্রাচীন আলঙ্কারিকদের যে দশা ধরত সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। এরূপ উক্তির চিত্রাঙ্গদায় আর অন্ত নেই। এ ক্ষেত্রে আমি আলঙ্কারিকদের ভাষায় বলতে বাধ্য হচ্ছি "স্বয়ং পশ্য বিচারয়।" এখানে আর দুটি মাত্র উপমার উল্লেখ করবার লোভ সংবরণ করতে পারছিনে। চিত্রাঙ্গদা সুপ্ত অর্জ্জুনের সম্বন্ধে বলেছেন—

"শ্রান্ত হাস্য লেগে আছে ওষ্ঠপ্রান্তে তার
প্রভাতের চন্দ্রকলা সম, রজনীর
আনন্দের শীর্ণ অবশেষ।"

দ্বিতীয়টি অর্জ্জুনের উক্তি

"তুমি ভাঙ্গিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি
যেমন নিমেষে ভেঙ্গে দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা অন্ধকার।"

উক্ত কথা ক'টিতে কবির বাণী তার চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। সনৎকুমার নারদকে বলেছিলেন, "অতিবাদী হও আর লোকে যদি তোমাকে অতিবাদী বলে ত ব'লো যে হাঁ আমি অতিবাদী। কবিমাত্রই অতিবাদী। আর এই "অতি" শব্দের মর্ম্ম যিনি গ্রহণ করতে পারেন তিনিই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করবেন যে চিত্রাঙ্গদার কবি চরম কবি।

১৭

আমি পূর্ব্বে বলেছি চিত্রাঙ্গদা একটি সম্পূর্ণ রাগিনী। Thomson সাহেব এ কথা অস্বীকার করেন নি, কেননা তিনি বলেছেন যে "it is a lyrical feast" কিন্তু উক্ত feast উপভোগ করে নাকি মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। কারণ উক্ত রাগিনীর অস্থায়ি erotic এবং অন্তরা immoral।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে কবিতা সঙ্গীতের স্বজাতীয় তাহলে জিজ্ঞাসা করি কানাড়া moral এবং কেদারা immoral, ভূপালী শ্লীল ও ভৈরবী অশ্লীল এরকম কথা বলায়, ছন্নতা ও মূর্খতা ছাড়া আর কিসের পরিচয় দেওয়া হয়?

যদি এ মত কেবলমাত্র শ্রীযুক্ত Thomson এর মত হ'ত তাহলে এবিষয়ে কোনও কথা বলবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আর্টের moralityর বিচার করতে অনেকে সদাই উৎসুক। আমাদের ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে morality অত্যাবশ্যক। এবং সেই কারণে জীবনের এই অত্যাবশ্যক বস্তুটি আমরা সর্ব্বত্রই খুঁজতে চাই। চুরি করা যে অধর্ম্ম এবিষয়ে আমরা সকলেই একমত। যাঁর নিজে চুরি করতে আপত্তি নেই, তিনিও তাঁর জিনিষ পরে চুরি করলে তাকে পুলিসে ধরিয়ে দেন।

মৃচ্ছকটিক নাটকে, পরের ঘরে সিঁদ কেটে চুরির একটি চমৎকার বর্ণনা আছে এবং শর্ব্বিলকের মুখে চুরিবিদ্যার একটি সরস গুণকীর্ত্তন আছে। যা মানুষ মাত্রেরই মতে immoral সেই বিষয় নিয়ে কবি তাঁর কল্পনা খাটিয়েছেন অথচ অদ্যাবধি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি সংস্কৃত সাহিত্য হতে মৃচ্ছকটিকের ও-অংশ বহিষ্কৃত করবার প্রস্তাব করেন নি। এর কারণ কি? এর কারণ সমাজে যা অধর্ম্ম কাব্যে তা রসে পরিণত হয়েছে। ফলে মৃচ্ছকটিক পড়ে কারও মনে চুরি করবার প্রবৃত্তি জন্মায় নি। Morality হচ্ছে মানুষের ব্যবহারিক আত্মার জিনিষ আর কাব্য তার অন্তরাত্মার। এই অন্তরাত্মার সঙ্গে ব্যবহারিক আত্মার প্রভেদ কি তা যদি জানতে চান ত দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করুন। কাব্যের যে জীবনের উপর কোনও প্রভাব নেই, একথা অবশ্য আমি

বলতে চাইনে ; কাব্যের আবেদন মানুষের moral sense-এর কাছে নয় spiritual sense এর কাছে। যা spiritual হিসাবে অমৃত তা যে moral হিসাবে বিষ একথা শোভা পায় শুধু জড়বুদ্ধির মুখে। বরং মানুষে চিরকাল এই বিশ্বাস করে এসেছে যে মনের spiritual খোরাক মানবাত্মার সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি সাধন করে : এ বিশ্বাস ভ্রান্তি নয় :

১৮

চুলোয় যাক্ অন্তরাত্মা : ব্যবহারিক আত্মার দিক থেকেই দেখা যাক্। কবির স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ধারণা (attitude) কি হিসেবে জঘন্য ? তা যে ঘৃণ্য সে কথা Rollo নামক অপর একটি অধ্যাপক স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন। তাঁর কথা হচ্ছে এই —"One hates the view" এবং Thomson এ কথা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। কবির মতে নাকি "woman exists for mans sake." । চিত্রাঙ্গদার শেষ কথাগুলিই নাকি কবির মনের কথা। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক্ যে তাই।

চিত্রাঙ্গদার শেষ নিবেদন এই যে—তিনি অর্জ্জুনের শুধু প্রণয়িনী নয় তাঁর সহধর্ম্মিনীও হতে চেয়েছিলেন। এই সহধর্ম্মিনীর আদর্শ নাকি সেকালের অসভ্যদের আদর্শ—হিন্দুদের আদর্শ। কিন্তু একালের সভ্য মানবের অর্থাৎ ইংরাজের আদর্শ হচ্ছে স্ত্রীলোকের পুরুষের সমধর্ম্মী হওয়া। পিতা যখন চিত্রাঙ্গদাকে পুত্র করেছিলেন তখন অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য ছিল তাঁকে ভ্রাতা করা। তাহলেই Thomson এবং Rollo র কাছে এ কাব্য জঘন্য না হয়ে বরেণ্য হ'ত।

যখন এঁদের মুখে এসব বুলি শুনি, তখনই মনে হয় যে বর্ত্তমান সভ্যতার বুলিগুলি যেমন সাধু তেমনি ভুয়ো। Equality of the sexes বহুলোকের মুখে একটি সম্পূর্ণ নিরর্থক কথা, কেননা এক্ষেত্রে সাম্যের সঙ্গে ঐক্য শব্দের অর্থের প্রভেদের প্রতি তাঁরা নজর দেন নি। woman exists for man's sake এ কথাটা তেমনি হাস্যকর যেমন man exists for woman's sake কথাটা হাস্যকর। সত্য কথা এই যে এই দুটো কথাই আংশিক হিসাবে সত্য। Thomson পরে বলেছেন যে individual rights of women-এ চিত্রাঙ্গদার কবি বিশ্বাস করেন না। যদি তিনি না করেন তার কারণ অপরের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত individual বলেও কোন জীব নেই।. অতএব তার কোনও rights নেই। অধিকার কর্ত্তব্য ইত্যাদি সামাজিক মানবের কথা, সুতরাং প্রতি অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই অসংখ্য কর্ত্তব্য বন্ধন আছে। স্ত্রীজাতিকে তার মনের ও জীবনের নানারূপ বন্ধন থেকে মুক্ত করে আমরা womanকে man করতে পারব না, পারব সুধু তাকে female করতে, কারণ instinct এর বন্ধন থেকে কোনও জীবকে মুক্ত করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। Thomson যে সভ্যতার মুখপাত্র সে সভ্যতার বোধ হয় এই বিশ্বাস যে, স্ত্রীলোককে কোনও রকমে দ্বিতীয় পুরুষ করতে পারলেই বিশ্বমানব উত্তম পুরুষ হয়ে উঠবে।

স্ত্রীজাতি যে মানুষ হিসেবে পুরুষজাতির equal, খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা এ সত্যের সন্ধান যুগযুগান্তরের পরে পেয়েছে। বাইবেলের মতে নারী আদিম মানবের একখানি পাঁজরার হাড় হতে সৃষ্ট। যুগ যুগ ধরে তারা এ কথা বেদবাক্য জ্ঞানে মেনে এসেছে। অতঃপর তাদের যখন জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হল তখন তারা সেই অস্থিজ জীবকে আবার মানুষ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো এবং তাদের কাছে যথার্থ মানুষ হচ্ছে পুরুষ মানুষ। তাই তারা কাজে না হোক্ কথায় বিধির নিয়ম উল্টে দিতে চায়। হিন্দুর কল্পনা কিন্তু চিরকালই বিভিন্ন। কালিদাস বলেছেন

"স্ত্রীপুংসাবাত্মভাগৌ তে ভিন্নমূর্ত্তেঃ সিসৃক্ষয়া।
প্রসূতিভাজঃ সর্গস্য তাবেব পিতরৌ স্মৃতৌ ॥"

এ সুধু কবি-কল্পনা নয়, ধর্ম্মশাস্ত্রের ঐ একই কথা। মনু বলেছেন—

"দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষো ঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎপ্রভুঃ ॥"

১৯

মদন চিত্রাঙ্গদাকে বলেছিলেন

"আমিই চেতন করে দিই
একদিন জীবনের শুভ পুণ্যক্ষণে
নারীরে হইতে নারী, পুরুষে পুরুষ।"

এই কাব্য এই শুভ পুণ্যক্ষণের কল্পনা। এবং কবি-প্রতিভার বলে এ পুণ্য-মুহূর্ত্ত একটি অনন্ত মুহূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

যা জীবনে ক্ষণিকের, তাকেই মনোজগতে চিরদিনের করবার কৌশলের নামই আর্ট।

বসন্ত বলেছেন

"একটি প্রভাতে ফুটে অনন্ত জীবন
হে সুন্দরী"

আর মদন—

"সঙ্গীতে যেমন ক্ষণিকের তানে,
গুঞ্জরি কাঁদিয়া উঠে অন্তহীন কথা।"

চিত্রাঙ্গদা কাব্যের মর্ম্মকথা মদন ও বসন্তই অমর বাণীতে বলে দিয়েছেন।

যে দেব "নারীরে হইতে নারী পুরুষে পুরুষ" চেতন করে' দেয় তাঁর গ্রীক নাম eros এবং এই কারণেই পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর সমালোচকরা এ কাব্যকে erotic বলেন।

এখন ইংরাজী ভাষায় এ শব্দটি হীন অর্থে ব্যবহৃত হয়। erotic love এর বাঙলা আমি জানিনে, সম্ভবত তাঁরা যাকে platonic love বলেন, এ love তার উল্টো। এবং এই জাতীয় সমালোচকদের কাছে উক্ত কারণে চিত্রাঙ্গদা অশ্লীল। এখন এ কাব্য শ্লীল বা অশ্লীল সে বিচার করবার একটি বাধা আছে। চিত্রাঙ্গদা যে অশ্লীল নয় তা প্রমাণ করতে হলে আমার যুক্তি সব অশ্লীল হয়ে পড়্‌বে আর আমি যখন দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনা করছি নে, তখন শ্লীলতার সামাজিক বন্ধন লঙ্ঘন করবার আমার কোনও অধিকার নেই। আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সৌন্দর্য্য, সত্য নয়—সুতরাং এক্ষেত্রে রুচির কথাটা বড় কথা।

Love বিষয়ে শ্লীলতা রক্ষা করে, আলোচনা করা যে অসম্ভব, তার সাক্ষী স্বয়ং Plato। তাঁর যে পুস্তক থেকে platanic love এর কিম্বদন্তী জন্মগ্রহণ করেছে সেই Banquet নামক অপূর্ব্ব দার্শনিক বিচার বাঙলায় কথায় কথায় অনুবাদ করা চলে না, কারণ আদর্শনিক পাঠকদের কাছে তা ঘোর অশ্লীল বলে গণ্য হবে। প্লেটনিক loveএর বিচারই যদি এতাদৃশ ভয়াবহ হয়, ত অ-প্লেটনিক loveএর বিচার যে বীভৎস হবে তা বলাই বাহুল্য।

২০

প্লেটনিক love একটী আকাশ-কুসুম। সুতরাং এক দলের লোকের কাছে তা' যেমন বিদ্রূপের বিষয়, অপর আর একদল লোকের কাছে তা তেমনি শ্রদ্ধার বিষয়। এখন উক্ত মতের ভক্তদের জিজ্ঞাসা করি, কুসুম মাত্রই কি আকাশ-কুসুম নয়? গাছের মূল থাকে মাটীতে কিন্তু তার ফুল ফোটে আকাশে। ফুল দেখবামাত্র যে লোকের তার মূলের কথাই বেশী করে মনে পড়ে, সে ফুলের যথার্থ সাক্ষাৎ পায় না—পায় শুধু মাটীর। সুন্দরের হিসেব থেকে ফুল আকাশ-কুসুম মাত্র—এবং তাতেই তার সার্থকতা কিন্তু সত্যের হিসেব থেকে তা সমগ্র সৃষ্টি-প্রকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে অনুস্যূত। আমরা যাকে প্রেম বলি, তাও মনোজগতের বস্তু হ'লেও দেহের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত নয়। যেমন পার্থিব ফলের রূপ তার একমাত্র গুণ নয়, উপরন্তু তার প্রাণ আছে তেমনি মানব-প্রেম শুধু চিদাকাশের কুসুম নয়, দেহ ও মন উভয় জগৎ অধিকার করেই তা বিরাজ করে। তার পর দেহ মনের বিভাগটা কি তেমন সুনির্দ্দিষ্ট? দেহের কোথায় শেষ ও মনের কোথায় আরম্ভ তা কি আমাদের প্রত্যক্ষ?

ভারতচন্দ্র বলেছেন :—

"ভূতময় দেহ নবদ্বার গেহ নর-নারী কলেবরে।
গুণাতীত হয়ে নানা গুণ লয়ে দোঁহে নানা খেলা করে॥
উত্তম অধম স্থাবর জঙ্গম সব জীবের অন্তরে
চেতনাচেতনে মিলি দুই জনে দেহিদেহ রূপ ধরে।
অভেদ হইয়া ভেদ প্রকাশিয়া এ কি করে চরাচরে॥"

যদি কোনও কবির কল্পনায় দেহ-দেহীর ভেদাভেদ জ্ঞান মূর্ত্ত হয়ে ওঠে—তাহলে সে কবির কল্পনাকে কি শুধু দৈহিক বলা চলে? যা কেবলমাত্র দৈহিক তার অন্তরে সত্য আছে কিন্তু সৌন্দর্য্য নেই। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করতেন যে, কাম-লোকের উপরে রূপ-লোক বলে আর একটী লোক আছে। যে ব্যক্তি তাঁর বর্ণিত বিষয়কে কাম-লোক থেকে রূপ-লোকে তুলতে পারেন—তিনিই যথার্থ কবি। চিত্রাঙ্গদা যে রূপ-লোকের বস্তু কাম-লোকের নয় তা যাঁর অন্তরে চোখ আছে তিনিই প্রত্যক্ষ

করতে পারেন। যাঁদের তা নেই—অর্থাৎ যাঁরা অন্ধ, তাঁদের সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা।

অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

"কিছু
তার নাই কি বন্ধন পৃথিবীতে? এক
বিন্দু স্বর্গ শুধু ভূমিতলে ভুলে পড়ে
গেছে?"

চিত্রাঙ্গদা। "তাই বটে।"

এ কাব্য সম্বন্ধে এই শেষ কথা। Erotic কাব্য বলে কোনও বস্তু নেই কেননা যে মুহূর্ত্তে কবির কল্পনা কাব্য আকার ধারণ করে সেই মুহূর্ত্তেই তা eroticism অতিক্রম করে। আমি পূর্ব্বে বলেছি চিত্রাঙ্গদা, মেঘদূত ও কুমার-সম্ভবের স্বজাতি এবং মেঘদূত ও কুমারের মতই তা কাব্য-জগতে অমর। চিত্রাঙ্গদা একাধারে কাব্য, চিত্র ও সঙ্গীত—অতএব তা চরম কাব্য কেননা চিত্রাঙ্গদায় আর্টের ত্রিধারার পূর্ণ মিলন হয়েছে। আর্ট হিসাবে চিত্রাঙ্গদার আর একটি মহাগুণ তার পরিমিত ও পরিচ্ছিন্ন আয়তন, এর অস্থায়ী অন্তরার পর যদি আভোগ সঞ্চারী থাকত অর্থাৎ এ স্বপ্ন যদি আরও বিস্তৃত হত তাহলে পাঠকের মন স্বপ্নলোক হতে সুপ্তিলোকে চলে যেতো।

খেয়ালয়া

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৩

খেয়ালী সুরে সুরে যে গীতি উঠেছিল
গমকে মীড়ে মীড়ে তাহা কি হারাইল!
মধুর মৃদু তান
যাহার ছিল প্রাণ,
মাধুরী-কুশলতা তারে কি বিনাশিল!

আলোকে সমীরণে যে-লতা দিত ফুল
অসার সারে সারে মরিল তার মূল।
শিশিরে হিমে ভিজে
আসিত আপনি যে,
অধীর উপরোধে হ'ল সে প্রতিকূল!

তোমারি তরে যাহা রচিত করিলাম
জানি না কেন তাহা সবারে ধরিলাম!
যে-সভা মাঝে একা
তোমারে যেত দেখা,
পথের লোকে লোকে কেন তা ভরিলাম!

যে গান গাহিতাম তোমারে পরশিতে
সে গান গাহিলাম সবারে হরষিতে!
খ্যাতির দীপ-শিখা
রচিল মরীচিকা;
কমল শুকাইল মানস-সরসীতে!

জাতক মালা

—গল্প

ক্রোধবোধি-জাতক

—শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য

ক্রোধকে বশীভূত করলে শত্রুরা উপশমিত হয়, অন্যথায় তারা বেড়েই ওঠে। লোকমুখে শোনা যায় যথা—

একদা বোধিসত্ত্বরূপী মহান সত্ত্ব বিদ্যাবিনয়াদি গুণের খ্যাতিযুক্ত পরম সমৃদ্ধ এক মহা ব্রাহ্মণকুলে নরজন্ম পরিগ্রহণ করেন। রাজসৎকৃত সেই কুলের প্রতি দেবতারাও প্রসন্ন ছিলেন। ক্রমে উপযুক্ত বয়সে তাঁর সংস্কার কর্ম্মাদি হলো, তারপর বেদাভ্যাস আর বিনয় প্রভৃতি গুণের জন্যে তিনি বিদ্বৎ সমাজে প্রথিতনামা হলেন।

যেমন—বীরের পরীক্ষাগার সমর অঙ্গন,
রত্নজ্ঞ সমীপে হয় রত্ন নিরূপণ;
সেই মত পরিচিত হয় ধরাতলে
বিদ্বানের কীর্ত্তি যত বিদ্বান মণ্ডলে।

ধর্ম্ম ছিল তাঁর সুঅভ্যস্ত, মতি ছিল প্রজ্ঞা-পরিচ্ছন্ন, তার উপর পূর্ব্বজন্মে প্রব্রজ্যা-পরিগ্রহণের ফলে প্রব্রজ্যার প্রকৃত স্বরূপের সঙ্গে সুপরিচিত সেই মহাত্মার গৃহের প্রতি আর রতি রৈলো না। তিনি একথা ভালরকমই জানতেন যে, সংসারে কামনার বিষয় যা কিছু সে সবই সাধারণতঃ প্রচুর বিবাদ বৈরিতার হেতু, অগ্নি জল চোর ডাকাত ও দুষ্ট পরিজনের দ্বারা যখন তখনই নষ্ট হ'তে পারে; তা ছাড়া সে সমুদায়কে আরো অনেক রকম দোষের আধার বলে জেনে আত্মকামনাকে তিনি অতৃপ্তিকর বিষাক্ত অন্নের মতন পরিত্যাগ করলেন। সংসারের ভোগ বিলাসে তাঁর আর কিছুমাত্র আসক্তি রৈলোনা। অবশেষে দেহ তাঁর কেশ শ্মশ্রুর শোভাবিহীন হলো, গৃহ বেশ-বিভ্রম পরিত্যাগ করে কাষায় বিবর্ণ বাস ধারণপূর্ব্বক বিনীত বেশে তিনি যথারীতি প্রব্রজ্যা পরিগ্রহণ করলেন। এদিকে তাঁর প্রতি অনুরাগের বশবর্ত্তিনী তাঁর স্ত্রীও নিজের কেশ কলাপ কেটে ফেলে দেহের বিলাস ভূষণ যা কিছু সব বর্জ্জন করলেন, অঙ্গের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ছাড়া যত্নসাধ্য শোভার চিহ্নমাত্রও তাঁর দেহে আর রৈলো না। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও কাষায় বাস পরিধান করে স্বামীর অনুপ্রব্রজিতা হলেন।

বোধিসত্ত্ব যখন দেখলেন যে তাঁর স্ত্রী তপোবন পর্য্যন্তও তাঁকে অনুগমন করতে উদ্যত, তখন সুকুমার স্ত্রীদেহ বনবাসের কঠোর ক্লেশ সইতে অপটু জেনে পত্নীকে ডেকে বল্লেন,—ভদ্রে, আমার প্রতি তোমার অনুরাগ যে কত গভীর তাতো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু তবু বলচি— তপোবন পর্য্যন্ত আমার অনুগমন করবার সংকল্প থেকে বিরত হও। সাধারণতঃ যেখানে তন্বী প্রব্রজিতারা বাস করেন, তাঁদের সঙ্গে তাঁদেরই মতন হয়ে সেখানেই তোমারও থাকা উচিত। তাছাড়া অরণ্যায়তন সকল স্বভাবতই নানান্ বিপৎ সঙ্কুল।

যথা—শ্মশান মশান বন পর্ব্বত পাহাড়
বসতির চিহ্নহীন বিজন আগার,
হিংস্র শ্বাপদেরা শুধু চরে যেই স্থানে
যতিরা কাটায় রাতি দিবা অবসানে।

আরো দ্যাখো—

ধ্যানেরত যতি চায় নিত্য একা থাকিতে
নারীর ছায়াটী যেন নাহি পড়ে আঁখিতে।
কহি তাই ছাড় মতি মোর অনুগমনে
কিবা লাভ হবে তব মিছে হেন ভ্রমনে!

তখন নিয়তই তাঁর অনুগমনে কৃতনিশ্চয়া বাষ্পোপরুদ্ধমান নয়না সেই নারী এই উত্তর করলেন :—

যদি এই তব অনুগমনের উৎসবে মোর বাসনা জাগে,
তার কাছে তব বিরাগের ভয় দুখের ভাবনা কোথায় লাগে,
তোমারে ছাড়িয়া থাকিব যে একা হেন সামর্থ্য নাহিক মম,
ক্ষমিও আমারে আজিকে তোমার আদেশের এই অতিক্রম।

পত্নীকে অনুগমনে নিরস্ত হবার জন্যে আরো দু তিন বার করে বুঝিয়ে বলেও যখন দেখা গেল যে কিছুতেই তিনি তাঁর

সংকল্প থেকে নিবৃত্ত হতে রাজী হলেন না, বোধি-সত্ব তখন তাঁর প্রতি উপেক্ষা-নীরব ভাব অবলম্বন করলেন।

তারপর তাঁদের যাত্রা সুরু হলো। চক্রবাক-বধূর অগ্রগামী চক্রবাকের মতন সেই অনুগামিনী নারীর অগ্রবর্ত্তী হয়ে তিনি পথ চলতে লাগলেন। চলে চলে কত সব গ্রাম নগর হাট বাজার অতিক্রম করবার পর নানা তরু গুল্মো-পশোভিত কোন এক বনদেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ঘন-প্রচ্ছায় সেই বনের পুষ্পরেণুসমাকীর্ণ পবিত্র ভূমিতলে মাঝে মাঝে সূর্য্যের কিরণ নেমে এসে জোৎস্নার মতন স্নিগ্ধ হয়ে পড়তো আর নিজেকে যেন উপকৃত বোধ করতো। একদিন আহারান্তে, বোধিসত্ব সেই বনের এক বিজন দেশে ধ্যানবিধির অনুষ্ঠানের পর বেলাশেষের দিকে উঠে বসে একখানা জীর্ণ চীর সেলাই করছিলেন। তাঁর অনতিদূরে স্বীয় সৌন্দর্য্যের প্রভাবে সন্নিহিত বৃক্ষমূলটাকে পর্য্যন্ত সুশোভিত করে দিয়ে তাঁর সেই প্রব্রজিতা পত্নী তাঁরই উপদিষ্ট বিধিমত ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। তখন অপূর্ব্ব দেহ-শোভায় বিরাজিতা সেই নারীকে দেখে বোধ হচ্ছিল যে তিনি দেবতা।

তখন বসন্তকাল। গাছে গাছে নতুন পাতার অপূর্ব্ব শোভা, অসংখ্য ফুলের গন্ধে বনের বাতাস আকুল হয়ে উঠেছিল, বিকশিত পদ্ম কুমুদের ভূষণপরা জলাশয়গুলি সকলেরই চোখে তখন পরম অভিলাষের বস্তু। ভ্রমরকুল চারদিকে উড়ে উড়ে কেবলি গুঞ্জন করছিল, ওদিকে মত্ত কোকিলের কুহুরবের একটুও বিরাম ছিল না, —এমন সময় সে দেশের রাজা শ্রেষ্ঠতম বনশোভা দেখবার জন্যে ঘুরে ঘুরে সেইখানটীতে এসে উপস্থিত হলেন।

তখন—

শিখী আর কোকিলের গানের নাহিক ছিল শেষ,
পদ্মের হাসিতে যত জলাশয় সেজেছিল বেশ।
বিবিধ ফুলেরা মিলে বুনে দিয়েছিল আচ্ছাদন
বসন্ত লক্ষ্মীর তরে মিলাইয়া বিচিত্র বরণ।
মেতেছিল সারা বন, ভ্রমরের গুঞ্জনের গানে,
নরম নতুন তৃণে কোমলতা মূর্ত্ত সেইখানে,
মনসিজ মদনের সে যেন নিজেরি নিকেতন
দেখিতে পরাণে কার জাগেনা পুলক শিহরণ!

রাজা সেইখানে এসে বোধিসত্বকে দেখবামাত্রই বিনীত বেশে তাঁর কাছে এলেন, এবং তাঁকে যথারীতি প্রীতিসম্ভাষণ জানিয়ে একটু পাশে সরে উপবেশন করলেন। তারপর অতি মনোহরদর্শনা প্রব্রজিতার দিকে চোখ পড়তেই তাঁর দেহের শোভায় রাজার হৃদয় উদ্বেলিত হ'তে লাগলো, আর তিনি যে বোধিসত্বেরই সহধর্ম্মচারিণী একথা মনে মনে নিশ্চিত জেনেও নিজের লোভপরায়ণ স্বভাবের তাড়নায় কি উপায়ে এঁকে হরণ করা যায়—রাজা মনে মনে তারই একটা ফন্দী আঁটতে লাগলেন।

—কিন্তু যখন তখন অভিশাপ দিতে তপস্বীকুল পটু সদাই,
তাদের ক্রোধের হুতাশন মাঝে পড়লে যে কারো রক্ষা নাই,
রাজা জানিত তা, তাইতো সহসা উপেক্ষিতে সেই তাপসবরে,
হলোনা সাহস যদিও মনের ধৈর্য্য আহত কামের শরে।

তখন তাঁর এই বুদ্ধি হলো—আগে এঁর তপের প্রভাব কতখানি সেইটা জেনে নিই; তারপর যদি যুক্তিযুক্ত বুঝি একাজে প্রবৃত্ত হবো, অন্যথায় হবো না। যদি এই নারীর প্রতি এঁর অতিমাত্র অনুরাগের ভাব প্রকাশ পায় তাহলে বোঝা যাবে যে তপোজনিত প্রভাব এঁতে নাই আর একেবারে বীতরাগ হলেতো কথাই নাই, এমনকি যদি অল্প অনুরাগের ভাবও দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে যে তপো-প্রভাব আর মহাপ্রাণতা এঁর ভিতরে বেশ রয়েছে। মনে মনে এই রকম চিন্তা করে নিয়ে বোধিসত্বের তপস্যার প্রভাব পরীক্ষা করবার জন্য রাজা হিতৈষীর মতন তাঁকে বল্লেন — হে পরিব্রাজক এই পৃথিবী যখন চতুর আর দুঃসাহসিক লোকে পরিপূর্ণ, তখন এই রকম বিজন বনে যেখানে শত চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবেনা,—এই প্রতিমার মতন রূপ-শালিনী সহধর্ম্মচারিণীকে নিয়ে এই ভাবে ঘুরে বেড়ানো আপনার পক্ষে তো ঠিক কাজ হচ্ছে না। তা ছাড়া দুষ্টদের

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য

কেউ এসে যদি এঁর কোন কিছু অনিষ্ট-সাধন করে বসে সে জন্যে লোকে আমাকেও যে অনুযোগ দেবে। সেইরকম কিছু একটা যখনই ঘটবে—

আস্‌বে তখন রোষের প্রভাব তোমার পর,
জানে সকলেই ক্রোধরিপু কত ভয়ঙ্কর
ক্রোধের পরশে মানুষের মন বিনাশ পায়,
ধর্ম্ম দলনকারী সে, যশেরও হন্তা হায়।
অতএব কোনো লোকালয়ে এঁর উচিত থাকা,
যতি যে তারিই বা কেন আর নারী সঙ্গে রাখা!

বোধিসত্ব বল্লেন, মহারাজ আপনি ঠিকই বলেছেন; তবে শুনুন,—ওরকম কিছু ঘটলে আমিও নাকি যা করবো—

অহংকারের আবেশে অথবা হয়ে অবিবেকে স্পর্দ্ধাবান,
প্রতিকুলাচারি যেবা হবে মোর, যতদিন দেহে থাকিবে প্রাণ,
তারে কভু নাহি করিবো মোচন, র'বে সে তেমনি মুক্তি হারা,
জ'মে ঘন হওয়া মেঘের যেমন অভ্ররেণুটী পায়না ছাড়া।

তাঁর এই উক্তির পর কামশরের বশগত রাজা ভাবলেন এঁর এই রমণীর প্রতি তীব্র আকাঙ্খা রয়েছে, অতএব তপের প্রভাব এঁতে কিছুই নাই। তখন বোধিসত্ব হ'তে কোন রকম অনিষ্টপাতের আশঙ্কা রাজার মনে আর রৈলো না, সঙ্গে সঙ্গে সেই মহান সত্বাকে অবজ্ঞা করে তিনি তাঁর অন্তঃপুররক্ষীদের বল্লেন—"এই সন্ন্যাসিনীকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাও।"

রাজার সেই আদেশ শোনবামাত্র হিংস্র পশুর আক্রমণে হরিণীর মতন সেই প্রব্রজিতা নারী ভয় বিষাদে বিহ্বল হয়ে পড়লেন, ভাবনায় মুখ তাঁর শুকিয়ে গেল, চোখ দুটো জলে ভরে উঠ্‌লো, তখন সেই ঘোর বিপদে পড়ে তিনি বিলাপ করতে লাগলেন—

মানুষ যখন মানে পরাজয় যুঝি বিপদের সনে,
রাজার গোচরে খোঁজে আশ্রয়, পিতা তিনি ভাবি মনে,
নৃপতি যেখানে নিজেই বসেন হয়ে অনিষ্টকারী
কাঁদিবে সে আর কাছে কার কেবা ঘুচাবে অশ্রুবারি?

লোকপালেরা কি ভ্রষ্ট হয়েছে হ'তে নিজ অধিকার,
হয়তো তাহারা ছিলোনা কখনো, অথবা গেছে কি মরে?
আসলে ধর্ম্ম বলে' কিছু নাই, শুধু নাম আছে তার,
তা না হলে কেন এসে আর্ত্তেরে উদ্ধার নাহি করে!

অন্য সকল দেবতারে
বৃথা আমি ডাকি বারে বারে।
ভাগ্যবিধাতা মোর যিনি
এখনো মৌন বসে তিনি,
অথচ নেহাৎ পর যে জন,
অকারণে তারে এসে পীড়ন,
কোন নরাধম করে যদি,
রক্ষনীয় সে নিরবধি।

"হয়ে যা ধ্বংস," শুধু এই কথা একবার মুখে আসিলে যার,
সে অভিশাপের অশনি আঘাতে পর্ব্বত অতি বিপুলাকার
হয়ে যায় গুঁড়া, আজিকে আমার হেন দশাতেও নীরব সে যে,
চোখের উপরে এসব দেখেও অভাগিনী আছি এখনো বেঁচে।

হয়তো আমি অতীব পাপী সেই কারণ,
এ বিপদেও নহি গো কারো কৃপাভাজন,
কিন্তু একি তাপসদেরই ধর্ম্ম নয়
আর্ত্তজনে করুণা করা সব সময়!

এখন এই শঙ্কা শুধু জাগিছে মোর মনে
বারণ সেই না শুনিয়া যে আসিনু তব সনে
আজিও তুমি ভোলনি তাহা, হায়রে হতভাগী
নিষেধ ঠেলি আসিলি সেকি এই সুখেরই লাগি!

এইরূপে তিনি কেবল সকরুণ বিলাপ করতে আর কাঁদতে লাগ্‌লেন। কান্না ও বিলাপ করা ছাড়া যখন সেই সন্ন্যাসিনীর আর কিছু করবারই উপায় ছিলোনা, তখন রাজার আদিষ্ট অনুচরেরা সেই মহান সত্বার চোখের উপরেই তাঁকে ধরে একটী উপযুক্ত যানে আরোহন করিয়ে রাজান্তঃপুরে নিয়ে গেল। বোধিসত্ব প্রতিসংখ্যা নামক যোগবলের সাহায্যে উদ্ধত ক্রোধকে থামিয়ে দিয়ে ক্রুদ্ধ

প্রশান্ত চিত্তে সেই জীর্ণ চীরখানা সেলাই করে যেতে লাগলেন। তখন রাজা তাঁকে বলে উঠ্‌লেন—

এইনা এখনি গর্জ্জিয়া রোষে, উচ্চ রোলে
করিলে দম্ভ, বলী যেন তুমি কতই বলে,
চোখের উপরে এ বরাননারে নিচ্ছে হরি,
রহিলে যে বড় দীনের মতন চুপটী করি!

দেখাওনা তব রোষ, ভুজবল, অথবা আপন তপের প্রভাব
ক্ষমতা না বুঝে যারা করে পণ ঢাকা নাহি রয় তাদের স্বভাব।

বোধিসত্ব বল্লেন—মহারাজ আমাকে অব্যর্থপ্রতিজ্ঞ বলেই জানবেন।

এখানে আমার প্রতিকূলাচারী হলো যে
কতনা প্রয়াস করিল পেতে সে মুক্তি
সবলে তাহারে রুখেছি, বাঁধাই র'লো সে
ব্যর্থ নহে গো আমার শপথ-উক্তি।

তখন বোধিসত্বের সেই ধৈর্য্যাতিশয়-ব্যঞ্জক শান্তভাব রাজার মনে এই ধারণা এনেছিল যে তাপসজনোচিত গুণ বোধ করি এঁর ভিতর রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে এই চিন্তা হলো নিশ্চয়ই এই ব্রাহ্মণের অভিসন্ধি ছিল অন্য কিছু, আর সেইটা ঠিকমত ধরতে না পেরে আমি এতটা চপলতা প্রকাশ করে ফেলেছি। মনে মনে এই সব পর্য্যালোচনা করে রাজা বোধিসত্বকে ফের জিজ্ঞাসা করলেন—

পতনোন্মত বিন্দু যেমন জমে ওঠা মেঘ টেনে রাখে,
সেই মত করি উন্মেষকালে থামিয়ে রেখেছ তুমি যাকে
বহু প্রয়াসেও তোমা হতে হেথা কিছুতে মুক্তি পেলোনা যে
তোমার এহেন প্রতিকূলাচারী এখানে সে তবে বলনা কে?

বোধিসত্ব বল্লেন, মহারাজ তবে শুনুন—
ঘটে মানুষের দৃষ্টি বিলোপ জনমে যার
না থাকিলে যেবা দেখে ঠিকমত আঁখি সবার
যে নাকি নিজের আশ্রয়টীকে পীড়ন করে,
ক্রোধ সে, তারেই করিনি মুক্ত নিমেষ তরে।

জন্মিলে যেবা মানবের যারা অহিতকামী
চিত্তে তাদেরই আসে হরষের উচ্ছাস নামি,
ক্রোধ সে যে, সেই রিপুনন্দনে ভ্রমেও আজ
করিনি মুক্ত, কহিনু তোমারে হে মহারাজ।

উদ্ভব যার সাথে আনে তমো অন্ধকার,
সদর্থ তায় ফুটিতে নাহিক পারে,
সে আজি আমার পূরা বশীভূত, যদি তাহার
চাহ পরিচয়, ক্রোধ বলে জেনো তারে।

যাতে অভিভূত হলে মানুষের সব শুভ যায় ছেড়ে,
সম্পদ রাশি নাশ হয়, যাহা আগে উঠেছিল বেড়ে,
রোষ তারি নাম, রাহুর সমান উগ্র সে অতিশয়,
এহেন রোষেরে উচিত সবার অঙ্কুরে করা ক্ষয়।

ঘন ঘরষণ ফলে কাষ্ঠে হয় অগ্নি উৎপাদন
জন্ম তার করিবারে কাষ্ঠেরি সে বিলোপ সাধন।
ভ্রান্তি হ'তে মানুষের মনে হয় ক্রোধের উদয়,
আত্ম বিনাশেরই শুধু হেতু সে যে অন্য কিছু নয়।

আপনার শুভ সাধনের পথ ভুলায়ে দিয়ে
রোষ মানুষেরে কেবলি বিপথে নেয় চালিয়ে
কৃষ্ণ পক্ষে চাঁদ যথা হয় জ্যোৎস্নাহারা
ক্রোধী মানুষের যশের দশাও তেমনিধারা।

ক্রোধের প্রভাবে হিতাহিত জ্ঞান হয় নিহত
বিদ্বেষ-বিষে মন হয়ে পড়ে জড়ের মত,
দুর্ব্বিপাকেরই পথে ক্রোধীজন ছুটিয়া চলে
সুহৃদেরা যত বারণ করে তা কানে না তোলে।

ক্রোধের কবলে পড়ে পাপকর্ম্ম করি আচরণ
শতবর্ষ ধরে' পরে অনুতাপ করে ক্রোধীজন
অতিমাত্র অপকারী শত্রু বলে মনে হয় যারে,
এর চেয়ে কিছু আর সেও কিগো ঘটাইতে পারে!

এহেন যে রোষ সে যে চির অরি মনেরই ভিতরকার
সে কথা আমার ভালমত জানা আছে,
এমন পুরুষ কে আছে সহিতে চাহে প্রসারণ তার
তাইতো আজিকে আমার চিত্ত মাঝে

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য

—মহা অনর্থকারী রিপু সেই উদিত যদিও তবু,
বন্দী করেই রেখেছি তাহারে মুক্ত করিনি কভু।

তখন রাজা তাঁর সেই অদ্ভুত শমগুণ আর হৃদয়গ্রাহী বাক্যের প্রভাবে হর্ষ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলে উঠলেন—

তোমার শমেরি অনুরূপ ওগো এ তব বচনরাজি
বেশী কি কহিব জানিলনা যারা বঞ্চিত তারা আজি।

বোধিসত্ত্বের এই রকম গুণ কীর্ত্তন করবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা উঠে এসে তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলেন, তারপর প্রব্রজিতকে মুক্তিদান করে ছেড়ে দিয়ে নিজেকেও বোধিসত্ত্বের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করলেন।

তাহলেই দেখা গেল যে ক্রোধকে বশীভূত করলে শত্রুরা উপশমিত হয়, অন্যথায় তারা বেড়েই ওঠে। অতএব ক্রোধ দমনের জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য।

প্রভাতী

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আকাশ, তোমার জ্যোতির শিখা
স্থির আলোকে জ্বলে,
প্রভাত সূর্য্য আগুন তোমার
ভরল হোমানলে।
পূজাঘরের নিবেদিতা
রচল আসি ফুলের গীতা,
পসাদ দীপ্তি রূপের আভায়
মুক্তি হ'য়ে ঝলে।
প্রণাম তব, আকাশ আজি
স্থির আলোকে জ্বলে॥

পরম প্রাতে জাগি একা
মন্দির-দুয়ারী,
এই আলোকের শুভ্র ছবি
আশীষ পেলেন তাঁরি
চির-রাতির অন্তে এসে
বাণী আমার জাগল ভেসে,
এইত স্বপন ধন্য হ'ল
সকল সাধনারি।
জেগেছি আজ পরম প্রাতে
মন্দির-দুয়ারী॥

গভীরে আজ লোকালয়ে
দেখ্‌ব যাওয়া-আসা,
এই প্রভাতী মন্ত্র দিয়ে
বিশ্ব প্রাণের বাসা।
সকল আমার গেল খুলে
চাইল আমায় আঁখি তুলে,
মিলে গেল যুগল ধ্যানে
নিবেদনের ভাষা।
গভীরে আজ লোকালয়ে
দোঁহার যাওয়া-আসা॥

—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

লেজ্যাঁর অনতিদূরে রম্যা রলাঁর বাস। বন্ধু মণীন্দ্র লাল বসু ও আমি একদিন তাঁর দর্শন লাভ করে এলুম।

রলাঁর কুটীরটির একদিকে হ্রদ অপর দিকে পর্ব্বত। হ্রদের শাড়ীটির পাড় ধ'রে যেমন পর্ব্বতের পর পর্ব্বত চ'লে গেছে, হ্রদের জল থেকে সোপানের মতো তেমনি পর্ব্বতের ওপর পর্ব্বত উঠে গেছে। হ্রদের কূলে কূলে পর্ব্বতের মূলে মূলে পল্লীর পর পল্লী। রলাঁদের পল্লীটির নাম Villeneuve, আর রলাঁর কুটীরটির নাম Villa Olga.

ভিলনভের অদূরে Chateau de Chillon নামক দ্বাদশ শতাব্দীর একটি প্রসিদ্ধ দুর্গ, বাইরনের কাব্যে এর বর্ণনা আছে, Bonnivardকে এখানে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। দুর্গটির তিন দিকে জল, এক দিকে পর্ব্বত। Bonnivard-এর কারা-কক্ষটির গবাক্ষ থেকে যতদূর চোখ যায়, কেবল জল, আর আকাশ, আর উভয়ের হস্তগ্রন্থির মতো দিগ্বলয়। দেহকে যারা বেঁধেছিল কতটুকুই বা তারা বেঁধেছিল! আসল মানুষটি যে চোখের ফাঁক দিয়ে সারাক্ষণই ফাঁকি দিত। বরং বন্দী ছিল তাঁর প্রহরীটা।

ভিলা অলগার একপাশে Hotel Byron নামক বৃহৎ হোটেল। রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে রবীন্দ্রনাথ নাকি এইখানে ছিলেন।

রলাঁর কুটীরটির বাহিরটা নিঃস্ব। দেখ্‌লে প্রত্যয় হয় না যে এতবড় একজন সাহিত্যিক এ রকম একটা অসুন্দর ছোট জরাজীর্ণ 'শালে'তে থাকেন। কিন্তু ভিতরটি সাজানো—বস্‌বার ঘরে বই ভরা শেল্‌ফ্, বই-ছড়ানো টেবিল, ফুলের সাজি ফুল গাছের টাব্, দেয়ালে দেয়ালে ছবি ও দেয়ালজোড়া পিয়ানো।

রলাঁর সাক্ষাৎ পাবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মনেই জাগেনি যে, তাঁর ঘরের অন্তর বাহির তাঁর নিজের অন্তর বাহিরের প্রতিরূপক!

দীর্ঘ দেহ ন্যুব্জপৃষ্ঠ মানুষটি, মুখখানি লাজুকের মতো ঈষৎ নত, মুখের গড়ন উল্টো ক'রে ধরা পিয়ার ফলের মতো চওড়া সরু উঁচু নীচু। প্রশস্ত উন্নত ললাট, সুদীর্ঘ শাণিত নাসা, ক্ষুধিত শীর্ণ কপোল, উদগ্র সংকীর্ণ চিবুক। চোখ দু'টিতে কতকালের ক্লান্তি, হরিণ শিশুর নিরীহতা। ঠোঁট দু'টিতে গান্ধীর চেয়েও সরল হাসি, বেদনায় পাণ্ডুর। সাদাসিদে পোষাক, নীলকৃষ্ণ সুট, টাই নেই, পাদ্রীসুলভ কলার। এক হাতে দারিদ্র্যের সঙ্গে, অন্য হাতে অসত্যের সঙ্গে জীবনময় যুদ্ধ ক'রে এসেছেন, তবু ক্লান্তি নেই, কঠিন খাট্‌ছেন, সকাল বেলাটা বিছানায় শুয়ে শুয়ে লেখেন; রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী রচনায় এমন ব্যাপৃত যে, L'Ame Enchantee—(মন্ত্রমুগ্ধ আত্মা)র চতুর্থ ভাগ এখনও লেখা হয়ে উঠ্‌ল না।

মণীন্দ্রলাল বসুর "পদ্মরাগে"র সুখ্যাতি কর্‌লেন, Wagner-কৃত জার্ম্মান অনুবাদ পড়েছিলেন। শরৎচন্দ্র

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

চট্টোপাধ্যায়ের "শ্রীকান্তে"র ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁর সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন, "শ্রীকান্তে"র ইতালিয়ান অনুবাদ হয়েছে, ফরাসী অনুবাদ হচ্ছে। দিলীপকুমার রায়ের কণ্ঠে ভারতীয় সঙ্গীত শুনে প্রীত হয়েছেন, মধ্যযুগের ইউরোপীয় ধর্ম্মসঙ্গীতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু মধ্য যুগের পরে উভয় সঙ্গীতের ধারা বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হওয়ায় ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় সঙ্গীতের বহুদূর ছাড়াছাড়ি ঘ'টে গেছে, এখনকার ইউরোপ ও-সঙ্গীত গ্রহণ করবে কি না নিশ্চয় ক'রে বলতে পারলেন না।

এতক্ষণ সহজ ভাবে কথা বলছিলেন, আপনার লোকের মতো ঘরোয়া ভাবে মৃদুমিষ্ট হেসে। যেই ভাবী যুদ্ধের সম্ভাবনার প্রসঙ্গ উঠল অমনি উত্তেজিত হ'য়ে পড়লেন রাজা লীয়ারের মতো। নির্ব্বাণোন্মুখ শিখার মতো স্তিমিতনেত্রে আবেগ জ্বলে উঠল। দক্ষিণ হস্ত আবেগে উঠতে পড়তে লাগল, বেগময়ী ভাষার সঙ্গে তাল রেখে। তন্ময় হয়ে চেয়ার থেকে স'রে স'রে এসে খ'সে পড়েন বুঝিবা। গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে তাঁর হৃদয়ের একস্থলে একটি ক্ষত আছে, সেই ক্ষতটিতে আঙ্গুল ছোঁয়ালে যাতনায় অধীর হয়ে ওঠেন।

প্রতীতির সহিত বল্লেন, নেশনরা যতদিন না ঠেকে শিখছে যে এক নেশনের ক্ষতিতে সব নেশনের ক্ষতি যুদ্ধ ততদিন থাকবেই; কাতর স্বরে বল্লেন, মানুষের ইতিহাসে যুদ্ধের দেখছি অবসান হলো না! তবু অসীম ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখলে আশার আমেজ থাকে। উদ্দীপ্ত হয়ে বল্লেন, আলো জ্বালান, আলো জ্বালান, দিকে দিকে আলো জ্বালিয়ে তুলুন। যুদ্ধের প্রতিষেধ—শিক্ষা।

শিক্ষা-সম্বন্ধে আর্টিষ্টের কর্ত্তব্য নিয়ে কথা উঠল। আর্টিষ্ট কি কেবল চিরকালের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি নিয়েই থাকবে, না, স্বকালের সমস্যা-সমাধানেও সাহায্য করবে; বল্লেন, দুইই করবে। সকল যুগের জন্যে কিছু, নিজের যুগের জন্যে কিছু। মানুষের মধ্যে একাধিক self আছে—কোনোটার কাজ আর্টের পূজা, কোনোটার কাজ সমাজের সেবা। যে-মানুষ আর্টিষ্ট সে-মানুষ কেবল আর্ট চর্চ্চা ক'রে ক্ষান্ত হবেনা, সে ভালোর স্বপক্ষে ও মন্দের বিপক্ষে প্রপাগাণ্ডা করবে, Voltaire ও Zola-র মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধ চালাবে। এর জন্যে যে তার যুগোত্তর সৃষ্টির ক্ষতি হবে এমন নয়, কেননা তার যুগোত্তর সৃষ্টির ভার তার যে-selfটির হাতে সে-selfটি কিছু সর্ব্বক্ষণ সজাগ নয়।

মানুষের একাধিক self আছে একথা রলাঁর রচনার অনেক স্থলেই পড়েছি, তবু মানুষের অখণ্ড ব্যক্তিত্বটাকে এমন খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখার প্রস্তাবে মন সায় দিলে না। তা ছাড়া সমস্যা তো প্রতি যুগেই আছে, প্রতিযুগেই থাকবে, সেজন্য ভাববার ও খাটবার লোকও যুগে যুগে অবতীর্ণ হন্। আর্টিষ্ট তাঁদের কাজ কেড়ে নেবে কেন? তাঁদের বাহন হবে কেন? বিশুদ্ধ আর্টের দেবী কি বড় সহজ দেবী? অসপত্ন পূজা না পেলে কি তিনি বরদান করেন? কালিদাসের যুগের সমস্যার জন্যে কালিদাস কি করেছিলেন? গেটের যুগের সমস্যার জন্যে গেটে কি করেছিলেন? জিজ্ঞাসা করলুম, Shakespeare-এর যুগেও তো সমস্যা ছিল, তাঁর সৃষ্টিতে তার ছায়া দেখিনে কেন? তাঁর স্বকালের প্রতি তাঁর দায়িত্ব দেখিনে কেন? উত্তরে বল্লেন, কিছু কিছু দেখি বৈকি; কিন্তু তাঁর যুগে হয়ত এযুগের মতো বড় কোনো সমস্যা ছিল না।

মন না মানলেও প্রতিবাদ করলুম না। এই যথেষ্ট যে, আর্টিষ্টকে রলাঁ দেশকালের অনুরোধে বিশুদ্ধ আর্ট চর্চ্চা মুলতুবি রাখতে বলছেন না, বিসর্জ্জন দিতে বলছেন না, বলছেন শুধু তাই ক'রে নিরস্ত না হ'তে, তাইতেই আবদ্ধ না রইতে। রুশনায়কদের মতো ফরমায়েস দিচ্ছেন না যে, "হে আর্টিষ্ট, তুমি যুগের মনোরঞ্জন করো, গণতন্ত্রের জয়গান করো, বলো বন্দে গণম্", কিম্বা ভারত নায়কদের মতো ফতোয়া দিচ্ছেন না যে, "ঘর যখন পুড়ে যাচ্ছে তখন হে কবি, তোমার কাব্যবিলাস ছাড়ো, ফায়ার ব্রিগেডে ভর্ত্তি হও, নেহাৎ যদি তা না পারো তো অন্যদের কর্ত্তব্য-সচেতন করতে সব রস ছেড়ে কেবল ঝাল রসের কবিতা লেখো।" তিনি যা বলছেন তার মর্ম্ম এই যে, মানুষের সমস্তটা যখন আর্টিষ্ট নয় তখন বিশুদ্ধ আর্ট সৃষ্টির অবসরে সে অপর কিছুও করতে পারে, এবং যেহেতু তার অস্ত্র হচ্ছে লেখনী কিম্বা

তুলিকা সে-হেতু তারি সাহায্যে সে ধর্ম্মবন্ধ করলে ভালো হয়। এইটে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, তিনি আর্টিষ্টকে অন্‌-আর্টিষ্ট হয়ে সংসার-ঋণ শোধ করতে বল্লেও অন্‌-আর্টকে আর্ট বলেননি, প্রোপাগাণ্ডাকে আর্টের থেকে পৃথক ক'রে যথাযথ জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

কথায় কথায় বল্লেন, টাকার জন্যে আর যাই করুন বই লিখ্‌বেন না। টাকার জন্যে অন্য খাটুনি, আনন্দের জন্যে বই-লেখা।...... তাঁর নিজের যৌবনে তিনি দারিদ্র্যদায়ে শিক্ষকতা করেছেন, আরো কত কী ক'রে স্বাস্থ্য হারিয়েছেন, কষ্টাৰ্জ্জিত স্বল্পপরিমিত অবসর-সময়কে ফাঁকি দিয়ে সরস্বতীর সেবা করেছেন, কিন্তু সরস্বতীকে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্মীর সেবা করেননি।

সমাজের প্রতি আর্টিষ্টের দায়িত্বপ্রসঙ্গে বল্লেন, প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য কিছু-ক'রে manual labour করা, আর্টিষ্টও যখন ব্যক্তি তখন আর্টিষ্টেরও এই কাজ করা উচিত।

ম্যাদ্‌লীন রলাঁ টিপ্পনী দিলেন, স্বয়ং manual labour করবার অবসর পাননি ব'লে রলাঁর একটা আক্ষেপ থেকে গেছে—তাঁর শরীর ভেঙে পড়্‌বার ওটাও একটা কারণ।

কিন্তু যে-মানুষ জগৎকে জাঁ ক্রিস্তফ্‌ দিতে পারেন সে-মানুষের শক্তি manual labourএ অপচিত হলে কি জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হতোনা? আর্টিষ্ট্‌ যদি manual labourএ হাত দেয় তো "ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টে"র আশঙ্কা থাকে না কি?

ম্যাদ্‌লীন রলাঁ বল্লেন, এমন কোনো কথা নেই। এই যে তিনি অর্থাভাবে ছেলে পড়িয়ে সময় ক্ষয় করতে বাধ্য হলেন এর বদলে যদি manual labour করলে চল্‌ত (অর্থাৎ অন্নবস্ত্রের জন্যে আবশ্যক অর্থ জুটত) তবে তাঁর স্বাস্থ্যের এদশা হতো না, তিনি আরো কত সৃষ্টি করতে পারতেন। তা ছাড়া তাঁর বিশ্বাস এই আত্যন্তিক specialisationএর যুগে সর্ব্বমানবকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত রাখ্‌বার জন্যেও একটা-কিছু দরকার, নইলে উচ্চশ্রেণীর মানুষ নিম্নশ্রেণীর মানুষকে বুঝ্‌বে কি সূত্রে? যারা গতর খাটিয়ে খায় তাদের ওপর থেকে যারা মাথা খাটিয়ে খায় তাদের অবজ্ঞা ঘুচ্‌বে কি ক'রে?

বুঝ্‌লুম মহাত্মাজীর সর্ব্বভারতীয় যোগসূত্র যেমন চরকা, রলাঁর সর্ব্বমানবিক মিলনসূত্র তেমনি manual labour। উভয়ের মনের এই ভাবটি টলষ্টয়ের সুরে বাঁধা। শ্রমীদের ওপরে বিশ্রামীদের পরগাছাবৃত্তি পৃথিবীশুদ্ধ মানব-শ্রমিককে ভাবিয়ে তুলেছে। সমাজের যে সব দাস-মক্ষিকা এতযুগ ধ'রে সমাজের রাণী-মক্ষিকাদের জন্যে আনন্দহীন খাটুনি খেটে এসেছে, সেই সব দলিত মানব আজ ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। এটা হচ্ছে শূদ্র বিদ্রোহের যুগ। তারা বল্‌ছে, পেটের দায় তো প্রতি মানুষেরই আছে, একলা আমরা কেন খেটে মরব? এসো, সকলে মিলে দায় ভাগ করে নিই, manual labour তোমরাও করো আমরাও করি। শূদ্রবিদ্রোহের এই মূল-ধুয়াটার এখন জগৎ জুড়ে মহালা চলেছে, বৈশ্যরা ভয়ে কাঁপ্‌ছেন, ক্ষত্রিয়রা ঘটা ক'রে গোঁফে তা দিচ্ছেন, ব্রাহ্মণরা রক্ষার উপায় খুঁজ্‌ছেন।

সাময়িক একটা রক্ষার দিক থেকে রলাঁ-গান্ধীর প্রস্তাব মতো প্রতি মানুষের আংশিক শূদ্রীকরণের মূল্য আছে, সন্দেহ নেই। এঁরা না বল্লেও ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে শূদ্র ধর্ম্ম স্বীকার করতেই হবে সকলকে। ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে সকলেই একদিন ক্ষাত্রধর্ম্ম স্বীকার করেছিল। ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে সকলকেই আজ বৈশ্যধর্ম্ম স্বীকার করতে হচ্ছে। এখনকার দিনে এমন কোন আর্টিষ্ট্‌ আছেন—ব্রাহ্মণ আছেন—যিনি অন্ন-বস্ত্রের জন্যে অর্থ উপার্জ্জন করছেন না? কেউ আর্টের বিনিময়ে করছেন, কেউ অন্যকিছুর বিনিময়ে করছেন। আর্টের বেশ্যাবৃত্তি যাঁর কাছে নীতি-বিরুদ্ধ আর্টেতর বৈশ্যবৃত্তি তাঁর ভরসা। রলাঁ টাকার জন্যে বই লেখেননি, কিন্তু ইস্কুলমাষ্টারী করেছেন, রবীন্দ্রনাথ টাকার জন্যে বই লেখেননি, কিন্তু জমীদারী করেছেন। দায়ে প'ড়ে পরধর্ম্মের শরণ না নিয়ে যখন উপায় নেই তখন শূদ্রোচিত manual labour ভালো, না, বৈশ্যোচিত মস্তিষ্ক-বিক্রয় ভালো? রলাঁর মতে প্রথমটা। যদিও কার্য্যতঃ তিনি দ্বিতীয়টার আশ্রয় না নিয়ে পারেননি। কারণ হাতের দাসত্বের চেয়ে মাথার দাসত্বের বাজারদর বেশি—এক বোল্‌শেভিক রাশিয়া ছাড়া সর্ব্বত্র।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

কিন্তু একটা না একটা দাসত্ব কি করতেই হবে চিরকাল? এমন দিন কি আসবে না যেদিন মানুষমাত্রেই সর্ব্বতোভাবে স্রষ্টা হবে নিজের নিজের ক্ষেত্রে, বিচ্যুত হ'তে বাধ্য হবে না স্ব-স্ব-ধর্ম্ম থেকে? শূদ্রত্বের অগৌরব সকলে মিলে ভাগ করে নিলে তো রোগের জড় মরে না, সকলে মিলে রোগে ভোগা যায় মাত্র। Labourএর dignity প্রমাণ করবার জন্যে সকলে মিলে manual labour করলে তো বেগার খাটার নিরানন্দ অপ্রমাণ হয় না, কর্ম্মের দাসত্বকে "কর্ত্তব্য" আখ্যা দিয়ে নিজেদের ভোলান হয় মাত্র। প্রতিভার প্রেরণায় যে-মানুষ চাষ করে সুতো কাটে, সে-মানুষের শূদ্রত্বে দাসত্বের গ্লানি কোথায় যে, তাই ভাগ করে নেবার জন্যে রলাঁকে চাষ করতে হবে, রবীন্দ্রনাথকে চরকা কাটতে হবে? সমাজ ধনী হবে, যদি প্রতি মানুষের প্রতিভা পায় আপন চরিতার্থতা। বিকচ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য স্বীকার ক'রে যে জটিল সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হবে সেই সামঞ্জস্যই তো সমাজের আদর্শ, সেই তো সনাতন, সেই তো সম্পূর্ণ। চাতুর্ব্বর্ণের সাঙ্কর্য্য ঘটিয়ে দিয়ে বৈচিত্র্যধ্বংসী বহিঃসাম্য স্থাপনা করলে সাময়িক একটা রক্ষা হয় তো হয়, কিন্তু এতে মানুষের তৃপ্তি নেই। মানুষ চায় স্রষ্টৃত্বের স্বাধীনতা, এ ছাড়া আর সমস্তই তার পক্ষে দাসত্ব। শূদ্রকে দাও স্রষ্টৃত্বের স্বাধীনতা, তার শ্রম হোক তার কাছে গান গাওয়া ছবি আঁকার মতো আনন্দময়, তার শ্রমের পুরস্কারে সে রাজা হোক—কিন্তু অশূদ্রকে স্বধর্ম্মচ্যুত ক'রে পূর্ণতঃ হোক অংশতঃ হোক শূদ্র কোরো না; তার বীণা তুলি কেড়ে নিয়ে তাকে কাস্তে হাতুড়ী ধরিয়ো না; মাত্র আধঘণ্টার জন্যে হলেও তাকে দিয়ে চরকা কাটিয়ো না।

Manual labour সম্বন্ধে আমার এই সব ধারণা আমি রলাঁকে জানাইনি। জানালে সম্ভবতঃ তিনি বলতেন যে, একই মানুষ কি ব্রাহ্মণ শূদ্র দুই হ'তে পারে না? প্রতি মানুষের মধ্যে যে একাধিক self আছে! Maeterlinck নাটক লেখেন, লাঙল ঠেলেন, মৌমাছি ও পিপড়েদের তদারক্ করে প্রামাণ্য বিজ্ঞান-গ্রন্থ লেখেন—তাঁর তা হ'লে গোটা তিনেক self। কোনোরকম manual labourএর প্রতি যার একটাও selfএর একটুও রুচি নেই এমন মানুষ সম্ভবতঃ একজনও পাওয়া যাবে না।

এমন যদি তিনি বলতেন তবে আমি আপত্তি করতুম না। নিজেকে নানাদিকে কুশলী করবার সাধ মানুষমাত্রেরই আছে। এই সাধ যদি মানুষ মাত্রকেই সুতো কাটা নামক কাজটিতে কৃতী হ'তে প্রেরণা দেয় তবেই সে চরকা ধরবে। নতুবা specialisation এর প্রতীকার স্বরূপ কিম্বা সর্ব্বতো-ভাবে আত্মবশ (self-contained) হবার দুরাশায় কিম্বা সকল মানবের সঙ্গে যুক্ত হবার ধারণায় যদি ধরে বা ধরতে বাধ্য হয় তবে সেটা হবে তার সৃষ্টির সতীন, তার অন্তরের দাসত্ব। আধ ঘণ্টার জন্যে হলেও সেটা তার স্বাধীনতার শ্বাসরোধী। সার্ব্বজনীন দাসত্বের দ্বারা সর্ব্বমানবের যে একীকরণ সে মন্ত্রের উদ্গাতা যদি রলাঁ-গান্ধী-টলষ্টয়ও হন্ তবু সেটা ছদ্মবেশী জড়বাদ।

মণীন্দ্রলাল জিজ্ঞাসা করলেন, এ যুগের লোক কাব্য পড়েনা কেন? রলাঁ বল্লেন, এ যুগের লোকের দুঃখ সুখের কথা কেউ কাব্যে লেখেনা ব'লে। Victor Hugo এর মতো জনসাধারণের কবি থাকলে জনসাধারণ কাব্য পড়ত বৈকি।

এবার তাঁর মনের আরেকটা কোণ ছোঁয়া গেল। তাঁর কাছে আর্টের অভীষ্ট সমঝদার, চরম (Ultimate) সমঝদার —জনসাধারণ। জনসাধারণের জন্যেই আর্ট। তিনিই এক-দিন People's Theatreএর পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। যা-কিছু সুন্দর যা-কিছু শিব তা থেকে যদি একজন মানুষও বঞ্চিত থাকে তবে আর্টিষ্টের আনন্দ অপূর্ণ থেকে যায়। তা-ব'লে তিনি কোথাও এমন বলেননি যে জনসাধারণের আর্ট জনসাধারণের দিকে নেমে যাবে। অন্যত্র তিনি বলেছেন খাঁটি আর্টের আবেদন এমন গভীর যে, নিম্নতম অধিকারীর হৃদয়ও তাতে সাড়া দেয়। প্রমাণ, Shakespeareএর নাটক। ও-জিনিষ বোঝবার জন্যে বৈদগ্ধ্যের দরকার থাকতে পারে, কিন্তু বোধ করবার পক্ষে প্রকৃতি যা দিয়েছে তাই যথেষ্ট। সেইজন্যে Shakespeare দেখবার জন্যে ইতর সাধারণের আগ্রহ শিক্ষিতদের আগ্রহকে ছাড়িয়ে যায়।

চা খেতে খেতে শেষ কথা হলো সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে। সাহিত্যের প্রভাবে যদি নৈতিক অরাজকতা ঘটে তবে তার জন্যে কি সাহিত্যিক দায়ী হবে? বল্লেন, ধর্ম্মের

প্রভাবে জগতে কত যুদ্ধই ঘ'টে গেছে, তার জন্যে কি কেউ ধর্ম্ম সংস্থাপকদের দায়ী করে? সাহিত্যিক যদি সুস্থমনা হ'য়ে থাকে তবে সমাজের সত্যিকার আদর্শের সঙ্গে সাহিত্যের সত্যিকার আদর্শের বিরোধ হবে না; আর যদি সুস্থমনা না হ'য়ে থাকে তবে তার রচনাকে সাহিত্য নাম দিয়ে সাহিত্যকে সাজা দেওয়া সাজে না।

অর্থাৎ সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা করতে যাওয়া হচ্ছে সুস্থ দাঁতকে উপড়ে ফেলতে যাওয়া। স্বাস্থ্যরক্ষক মহাশয়েরা সাহিত্য ভ্রম ক'রে যে-জিনিষের চিকিৎসা করতে চান সেটা হয়তো ড্রেন্ ইনস্পেক্টারের রিপোর্ট এবং সে রিপোর্ট লেখবার সময় হয়তো লেখক মহাশয় নেশা করেছিলেন। এহেন রিপোর্টারকে সাহিত্যিক পদবী দেওয়াটাই প্রথমতঃ সাহিত্যের ওপরে লাইবেল, আর উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা করতে চাওয়াটা দ্বিতীয়তঃ "অব্যাপারেষু ব্যাপারম্।" নীতিধ্বজী সমালোচকদের যদি হাতে কাজ না থাকে তো নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃদের পোড়া কপালে অঙ্কুশ না মেরে বেচারাদের উদরপূর্ত্তির কিনারা ক'রে দিন্ ও ক্রনিক ম্যালেরিয়া সারান্। সাহিত্যিকদের পিত্তরক্ষা হ'লে সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা আপনি হবে।

রলাঁর কথাগুলির প্রতিলিপি দিতে পারলুম না, ভাবছায়া দিলুম। এইখানে ব'লে রাখি যে, এই আলাপ-আলোচনার অধিকাংশই হয়েছিল মণি-দা'তে ও রলাঁতে; এবং আমি ফরাসী ভালো না বুঝ্তে পারায় তথা রলাঁ ইংরেজী আদৌ না বল্তে পারায় মণি-দা'র ও কুমারী রলাঁর ওপরে আমাকে এতটা নির্ভর করতে হয়েছে যে, এই লেখায় অনেক ভুলচুক থেকে গিয়ে থাকতে পারে। তবু মোটের ওপর এতে কিছু এসে যাবে না এই জন্যে যে, এই আলাপ-আলোচনার আগে ও পরে বহুবার আমি রলাঁর মতবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-পরিচিত হয়েছি। এসব তাঁর মুখে নতুন শুনলুম এমন নয়। আমরা তো তাঁর কথা শুন্তে যাইনি, আমরা গিয়েছিলুম তাঁকে শুন্তে—ও তাঁকে দেখ্তে। কাব্য প'ড়ে যেমন ভাবি কবি তেমন কি-না, এইটি জান্বার জন্যে প্রত্যেকেরই একটি স্বাভাবিক কৌতূহল থাকে। সৃষ্টি দেখে স্রষ্টার যে-কল্পমূর্ত্তিটি গড়া যায় বাস্তবের সঙ্গে তার তুলনা ক'রে না দেখা পর্য্যন্ত যেন সৃষ্টিটাকেই পূর্ণরূপে দেখা হয় না।

জঁা ক্রিস্তফের স্রষ্টাকে তাঁর ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে মনে মনে যে-কল্পমূর্ত্তিটি গড়েছিলুম সে-মূর্ত্তিটিকে ভেঙে ফেল্তে হলো ব'লে দুঃখ হলো, কিন্তু মানুষটিকে ভালোবাস্তে বাধ্ল না। বলিষ্ঠমনা পুরুষের বাহিরটা বলিষ্ঠদেহ পুরুষের মতো হয়ে থাক্লে শ্রদ্ধা বাড়্ত, কিন্তু ঐশ্বর্য্যময় মনের বাহিরটা শিশু ভোলানাথের মতো দেখে মমতা জন্মাল। দেহেমনে সুসমঞ্জস personality বল্তে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি; গান্ধীকে দেখে নিরাশ হয়েছিলুম, রলাঁকে দেখে হলুম। এঁদের দেহ এঁদের মনের আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে ও আগুনকে ঢেকেছে; সন্ন্যাসীর গায়ের বিভূতি যেমন তার অন্তরের তপস্যাকে ঢাকে। কিন্তু যেমন গান্ধীর প্রতি তেমনি রলাঁর প্রতি এমন একটি মমতা জাগ্ল যেমনটি নিছক্ গুণীব্যক্তির প্রতি জাগেনা। ভালোবাসা ও ভালোলাগার মধ্যে কোনখানে যে একটি সূক্ষ্মরেখা আছে চিন্তা ক'রে তার নিরিখ পাইনে, বোধ ক'রে তার অস্তিত্ব জানি। এক-একটা বিরাট personalityর সংস্পর্শে এলে এই বোধ-ক্রিয়াটি একান্ত সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

চিন্তা

শিল্পী—ই, কে, পেরেন্‌কস

রূপকলার বিশ্বরূপ

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

সেকালকে এতকাল জান্‌বার উপায় ছিল জীবতত্ত্বের ও ভূতত্ত্বাদির ভিতর দিয়ে—তা'তে করে' অনেক কিছু পাওয়া গেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা'তে পাওয়া যায়নি সেকালের মানবচিত্তের স্পন্দন, মানুষের ব্যথা-বীথিকার ছায়া এবং নিবিড় আনন্দের মুকুলিত কোরক-কাকুতা! অথচ মানুষের গোটা জীবনটা যে এই সুখদুঃখের প্রবহমান তরঙ্গে একান্তভাবে আশ্রিত ছিল—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কাব্য, কবিতা, চিত্র, সঙ্গীতের অশ্রান্ত পথে মানুষ সে বাণী প্রচ্ছন্নভাবে রেখে গেছে। মানবের সেই পরম হৃদয়-গীতার পাঠোদ্ধার করার দরকার হয়েছে।

একাল আজ সেকাল থেকে দূরে স'রে' গিয়ে সেকালের একটা নূতন ঐশ্বর্য্য দেখ্‌তে পাচ্ছে—এই নূতন ভেদজ্ঞান একটা নূতন আবিষ্কারের পথ খুলেছে। একাল ও সেকালের মাঝে একটা দাঁড়ি পড়ে' গেছে স্পষ্টভাবে—তাতে করে' সেকাল আমাদের কাছে সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিয়ে আজ সুস্পষ্ট হওয়ার অধিকার পেয়েছে। সেকাল মাটির ভঙ্গুর শরীর নিয়ে অবগুণ্ঠিত প্রাচ্য রমণীর মত অস্পষ্ট সন্ধ্যায় মলিন প্রদীপটির আলোকে আজ আমাদের চোখে পড়ছেনা—আজ সে তার সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে মুক্ত করে' রূপগর্ব্বের পাত্র নিয়ে অপ্সরীর মত নৃত্যবিহ্বল হয়ে উঠ্‌ছে, আরণ্যশিখীর মত কলমুখর হয়ে পড়ছে, এবং সূর্য্যাস্তের বিচিত্র বর্ণপুঞ্জে বোনা রঙীন অঞ্চল উড়িয়ে সে কখনও বা দেখা দিচ্ছে লুপ্ত উজ্জয়িনীর স্মৃতি-পর্য্যবসিতা বসন্তসেনার মত, কখনও বা দাক্ষিণাত্যের মদমত্তা মন্দির-নর্ত্তকীর জাগ্রত জীবনবন্যার মত!

এ সব সম্ভব হয়েছে শুধু অতীতের চৈন-প্রাচীরের একটা মর্ম্ম-দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে ব'লে। সে দ্বার হচ্ছে ললিতকলার—অতীত ও বর্ত্তমানের দূরত্বের অন্তরালে এই একটি মাত্র দ্বার উজ্জল, জাগ্রত ও হিল্লোলিত হ'য়ে লোকের সাম্‌নে উপস্থিত হচ্ছে। আর সমস্ত দরজার উপর মরচে প'ড়ে গেছে—এবং সে সব ঠেলে দেখা যায় কোথাও বা কীটদষ্ট খাতাপত্র কোথাও বা গলিত ও জীর্ণ স্মৃতির টুক্‌রো মালগুদামের ভাঙা স্মৃতি বহন ক'রে আছে! বিশ্বকর্ম্মা হাতুড়ি দিয়ে নূতনকে রচনা করতে গিয়ে অতীতের পুঞ্জীভূত সমস্ত জটিলতার দুর্গজালকে চূর্ণ করে' চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। আজ সে সমস্ত অনুশীলনের উপর বিজ্ঞদের বিজ্ঞতা নির্ভর করছে! মাকড়সার জালের মত তার ভিতরকার লুপ্ত সূক্ষ্মতাকে পরখ কর্‌তে গিয়ে পাণ্ডিত্য মুহুর্মুহুঃ পথ হারাচ্ছে। সেকালের সভ্যতা মৃত্যুকে কবলিত কর্‌তে pyramid রচনা করেছে—একালের সভ্যতা মৃতসৎকারের জন্য তা ভেঙে যাদুঘর রচনা করে' নিজের কর্ত্তব্যকে একান্ত সমাপ্ত মনে করে' আশ্বস্ত হচ্ছে!

এমনিভাবে দেশকাল ঠেলে যার উর্জ্জিত অভিযান শেষ হয় নি—যার পতাকা ভূলুণ্ঠিত হয় নি—অনাগত কালেও যার ইঙ্গিতে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে নব নব রাজ্য ও দুর্গজয়ের জন্য ছুট্‌তে হবে—তার ক্ষুরধার ক্ষমতা এখনও কেউ ভাল ক'রে পরখ করে দেখেনা ইহাই পরম বিস্ময়ের বিষয়। কালিদাসের কাব্য-নটীর নূপুর-শিঞ্জনে ভারতের সুকুমার চিত্ত এক সময় শৃঙ্খলিত হয়েছিল—কিন্তু ঐখানেই কি তা শেষ হয়েছে? কবির জয়ের অধিকার ত' বেড়েই চলেছে! কবির বিশ্বজিৎ যজ্ঞ এখনও সমাপ্ত হয়নি—তার অশ্বমেধের অশ্ব আজ বিশ্বময় ঘুরে' বেড়াচ্ছে—গম্ভীর জর্ম্মনী, লঘু ফরাসী, ব্যস্ত আমেরিকায় তা অধীত হচ্ছে। ললিতকলা পরিক্রমার এটাই রহস্য! এই হচ্ছে ললিতকলার অভিযানের প্রসারধর্ম্ম। শুধু কাব্য নয়,—চিত্র, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য—বিশ্বময় এসবের অধিকার বেড়েই চলেছে—তর্ক ও অভিমান, রেষারেষি ও আভিজাত্যের বর্ব্বরতা শুধু এ রাজ্যেই নিঃশব্দ হয়ে আস্‌ছে। রাষ্ট্রবিচারে তা কেউটের মত ফোঁস ক'রে ওঠে, ধর্ম্মের বিচারে তা' রক্তাক্ত পরিণতিতে

এলিয়ে পড়ে, সমাজতত্ত্বের বিচারে আলাদিনের দৈত্যের মত এক নিমেষে তা' নূতন চৈনিক প্রাচীর তৈরী করে' শ্বেত ও কৃষ্ণ, পীত ও লোহিত মানবত্বের দুর্ভেদ্য অন্তরাল সৃষ্টি করে, নীতিতত্ত্বের বিচারেও তা স্থান, কাল, পাত্র প্রভৃতির নানা উপকরণকে লক্ষ রেখায় পরিণত ক'রে একটা ভোজের ধাঁধায় পরিণত করে।

এতটা প্রসার ও ব্যাপকতার ত্রিপুণ্ড্রক রেখা যে ললাটে বহন করে' এসেছে—সে কোথা থেকে এল? তার ভিত্তি কোথা? সে দেশ কাল-জয়ী শক্তির উৎসই বা কোথা, আসনই বা কি? তার বরাভয় মুদ্রার লক্ষণই বা কি? এ সব প্রশ্ন অত্যন্ত স্বাভাবিক—বিশেষতঃ যেখানে তার সঞ্চার অপ্রত্যাশিত, অজ্ঞাত, এমন কি অবগুণ্ঠিত! কলার কলরোলে জগৎ ঝঙ্কৃত—এই কলামাতৃকার অঙ্কে ক্লান্ত জগৎ শিশুর মত ঘুমিয়ে পড়ে' তার স্পর্শ পেয়ে ধন্য হলেও এই দেবীর বিশ্বরূপ কেউ দর্শন করেনি, শুধু অনুভব করেছে :—

সে যে আসে, সে যে আসে, সে যে আসে
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী
সে যে আসে, সে যে আসে, সে যে আসে।

এটা সম্পূর্ণ জান্‌বার অধিকার কখনও আদিমকালে হয়নি। নানা অন্তরালে গুণ্ঠনে, ছত্রে হট্টে ও দেবালয়ে প্রাসাদের লালিত্য-তরঙ্গে তা ফল্গুরাসের মত কখনও কখনও কারও চোখে পড়েছে এ অঞ্চলে! যে তার কিছুমাত্র পেয়েছে সে তা মাথায় রেখে বলেছে যে তা' 'অনির্ব্বচনীয়' —বুকে রেখে বলেছে তা ব্রহ্মাস্বাদের মত এবং রসিক সমাজে প্রকাশ করেছে তা "চমৎকার!"

কিন্তু তা প্রকাশিত হয়েছে বিশেষের মধ্য দিয়ে—এজন্য তার অবিশেষাত্মক বা নির্ব্বিশেষাত্মক রূপ বা বিশ্বরূপ তার চোখে পড়েনি—হয়ত তার প্রয়োজনও হয়নি। এজন্য নানাদেশের জটিল প্রকাশের মধ্যে তার শিকড় খোঁজবার অবকাশ হয়নি। শুধু একটি অনুকূল সভ্যতার বা প্রতিকূল সভ্যতার ভিতর তার সম্পূর্ণ স্বরূপ খোঁজবার চেষ্টায় আর সমস্ত চেষ্টা পঙ্গু হয়েছে। চিত্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে বা খণ্ডস্বরূপ দেখে কষ্ট হয়েছে। বার বার পশ্চিম ও পূর্ব্বের ইতিহাসে সৌন্দর্য্য ও কলাশক্তিকে আসুরিক মনে করে' দশদিক হতে জগতের দশহস্ত তাকে সংহার কর্‌তে উদ্যত হয়েছে—আজকেও যে হ'চ্ছেনা তা' নয়! আজকের রাষ্ট্রীয় উত্তেজনার কবিযশঃপ্রার্থীরা বিশিষ্ট কলালালিত্যকে দেশের উন্নতির পরিপন্থী মনে করে' তার বিরুদ্ধে এমনি বাক্য রচনা ক'রছেন যে যদি কলমের গোড়াটির দ্বারা গ্রীবাচ্ছেদ সম্ভব হ'ত তবে কলালক্ষ্মী ছিন্নমস্তা হতেন! অথচ তা এমনি ছন্দে ও এমন ভাবে করা হয়েছে যে, মনে হয় লেখক পদলুণ্ঠিত হয়ে' দেবীর স্তবই কর্‌ছেন। এদেশের অনেক গীতকার যেমন সংসার হলাহলময় বা বৈরাগ্য-মেবাভয়ম্ বলে' গান রচনা করেন এবং তাতে এমন সুর যোগ করেন যে তার লঘুলালিত্য, বিচিত্র আবেশ, ও বিক্ষিপ্ত রাগ যেন সৌন্দর্য্যের কুঙ্কুম চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়, যেন গানের সুর বারবার ব'লে দেয়—তা নয়, তা নয়, তা নয়, সংসার অমৃতেরই আকর, বৈরাগ্যেই ভয়।

এই রূপপ্রকাশের ভিতর কলাদেবী মৃদুহাস্যই করে' থাকেন। এ হচ্ছে যাকে বলে শত্রুভাবে উপাসনা! রাষ্ট্রীয় সমাজপতি ধর্ম্মাধিকরণের ব্যবহারজীবীদের কাছে গেলে তাঁরা এমনিভাবে উত্তেজনার সহিত সুমিষ্ট ও সুপ্রযুক্ত বাগ্মিতায় বল্‌বেন যে কলা জিনিষটা শুধু অলসের খেয়াল। অনভিজ্ঞেরা কেউ কল্পনাও করবেনা যে তাঁরা আর্টের বিরুদ্ধে সমস্ত শাণিত অস্ত্র হাতে নিয়ে আর্টের কণ্ঠেই জয়মাল্য দিচ্ছেন। এমনি ভাবেই প্রতিবাদীরা আর্টের আবেষ্টনে মগ্ন হয়ে আর্টের প্রতিবাদ করেন! যে ভাষায় করেন তা আর্টের ভাষা, যে কলমে লেখেন তা আর্টের একটা জিনিষ, যে বসনভূষণে সজ্জিত হয়ে উদ্যতমূর্ত্তি হয়ে থাকেন তা' আর্টের দান, যে আরাম আসনে তাঁরা উপবিষ্ট তা'র প্রত্যেক রেখা-ভঙ্গী, গঠন-সৌকুমার্য্য আর্টের মৃণালের উপরই বিকশিত, যে গৃহের প্রকোষ্ঠে ব'সে অভিশাপ দিয়ে থাকেন তার প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে আর্টের অনেক সুর রেখাকারে ঘুরছে। কালিদাস গাছের ডালে বসে শাখার গোড়া কেটেছিলেন—একথাটি কলার বিচারে রূপকের ভাবে বল্‌তে গেলে নেহাৎ অবিশ্বাস্য হয় না।

রূপকলার বিশ্বরূপ

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

প্রতি মুহূর্ত্তে দুর্লক্ষ্য অথচ স্বপ্রকাশ, ইতি ও নেতির মধ্যে প্রবহমান এই যে কলালালিত্য, তা' এই জন্যই জয়যুক্ত হয়েছে —দেশকালকে অতিক্রম করে' চলেছে। মানুষ রুষ্ট হয়ে যখন কার্ত্তবীর্য্যের মত সহস্র হস্তে কলার গতি রোধ করতে গেছে—তখন হঠাৎ ভেবে বসেছে বুঝি সে সফল হয়েছে, সম্ভবতঃ কলাদেবী অদৃশ্য হয়ে গেছেন, ময়ূরকণ্ঠী রূপের মত তার রঙ্ বদ্‌লে গেছে—অথচ তিনি চলেই এসেছেন জয়যুক্ত হয়ে অব্যাহত গতিতে। অষ্টম শতাব্দীতে পশ্চিমে পাদরীদের Nicean Councilএর অধিবেশন হয়েছিল— তাতে পাদরীরা আদেশ জারী করেছিলেন যে তাঁদের হুকুমের বা নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতির বাইরে কেউ খ্রীষ্টের মূর্ত্তি রচনা করতে পারবে না। কি দুরন্ত শাসন! খ্রীষ্টই সেকালের রূপ-সৌরমণ্ডলের মধ্যবিন্দু ছিলেন। সেকালে এমনি একটা দম্‌কা হাওয়া উৎসাহের পালকে ছিঁড়ে ফেল্‌তে পার্‌ত—কিন্তু এ সোনার তরীর পাল ছেঁড়েনি কারণ এ মাঝিকে জলে ডোবান যায়না—শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়, রুদ্র মধ্যাহ্নের বা জ্যোত্স্নাপুলকিত শুভ্র রজনীর নিঃশব্দ সঞ্চারে এ তরণী চলে এসেছে ও চল্‌বে।

খ্রীষ্টীয় আদর্শ বল্‌লে—"Flesh is death, spirit is life." প্যাগান আদর্শ তা' শুনে মাথা ঘুরে' বজ্রাহত হয়ে যেন ক্ষণিকের জন্য মরে' গেল! কিন্তু এ হুকুম মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে চল্‌বেনা, কারণ তার উপর আরও একটা বড় হুকুম আছে। Orcagna, Fra Angelico, Fra Filippo Lippi, Alesso, Botticeli প্রভৃতি শিল্পীরা এম্‌নি ভাবে বর্ণ ও রেখার লালিত্যে খ্রীষ্টমূর্ত্তিকে বেষ্টন করলে যে পাদরীর হুকুম উড়ে গেল—'They crammed their pictures with ornaments in so prodigal a manner that the human portion of them assumed quite a subordinate place." কলা লালিত্যকে দুর করতে গিয়েও দুর করা সম্ভব হ'লনা। ক্রমশঃ পাদ্রীদের রাজার প্রধান আড্ডা Vaticanএও এমনি ছবি রচিত হল যাতে প্রমাণিত হয়—আর্ট এ রকমের হুকুম মেনে চলে না—আর্টের গতিকে রুদ্ধ করা অসম্ভব। অর পর দেখা যায় পাদরীরাই প্রচারের খাতিরে কলার অস্ত্র শস্ত্র সম্পূর্ণ ব্যবহার করে' সমগ্র উরোপকে মন্ত্রদীক্ষা দান করতে চেষ্টা করেছে। কোন লেখক বলেন— "All the art of the organizer, of the orator, of the painter, sculptor, architect was speedily orderd into the service of spiritual Rome."

পূর্ব্বাঞ্চলে বৌদ্ধ জগতের শিল্পেতিহাসে বুদ্ধমূর্ত্তি অঙ্কন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল—অন্ততঃ এরকম একটা অনুশাসন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু সে নিষেধবিধি কলার কোন বিশিষ্ট ভঙ্গীকে লক্ষ্য ক'রে হয়নি, কলার পক্ষে সেই অপরূপ রূপের ব্যঞ্জনা অসম্ভব ছিল বলে। তা' না হ'লে পরবর্ত্তীকালে বুদ্ধের ভারতবর্ষীয় মূর্ত্তি রচিত হ'তনা। কিন্তু বুদ্ধমূর্ত্তি না থাকলেও অন্য সকল মূর্ত্তিই রচিত হয়েছে। দিব্যাবদানে আছে মগধাধিপতি বিম্বিসার বস্ত্রখণ্ডের উপর বুদ্ধের চিত্র অঙ্কনের* আদেশ করেন—শিল্পী ব্যর্থ হয়। তারপর বুদ্ধদেব বস্ত্রোপরি তাঁর ছায়া নিক্ষেপ ক'রে শিল্পীকে তার সীমান্ত রেখা পূর্ণ করতে এবং বর্ণ প্রয়োগ করতে বলেন। দেখা যাচ্ছে ব্যর্থতার একটি কথা এখানে অনেকটা স্পষ্টভাবেই উঠেছে! সে যাক্। রূপশিল্পের ধারাকে রুদ্ধ করা হয়নি ব'লে যখন মূর্ত্তিবাদের খাতিরে বাস্তবিকই বুদ্ধের ভারত-বর্ষীয় মূর্ত্তি রচিত হ'ল তখন অন্তর্গূঢ় ভাবধারা তাকে অবলম্বন ক'রে এমন এক রূপ দিলে যার দোসর জগতে মেলা ভার! পশ্চিম খ্রীষ্টের একটা প্রামাণ্য মূর্ত্তি রচনা করতে পারেনি। হরেক রকম খেয়ালের ভিতর রুদ্ধস্রোত হয়ে কলাকারুতা কোন গভীর ভাবকে জমাট ক'রে উঠ্‌তে পারেনি—এই ব্যর্থতার অভিশাপ য়ুরোপকে আজ বহন করতে হচ্ছে। এজন্য এ যুগের Sir Edward Burnes Jones বলেছেন:—"যতবার আমি খ্রীষ্টমূর্ত্তি আঁকতে গেছি ততবার বুঝতে পেরেছি যে আমি কত বিফল হয়েছি।"

ইসলাম সভ্যতা ললিতকলার একটা দিক্ রুদ্ধ করতে বারবার চেষ্টা করেছে। বিশিষ্ট মূর্ত্তি অঙ্কন নিষিদ্ধ করতে গেছে, রূপ রস গন্ধের আয়োজনকে ব্যর্থ করতে ইতস্ততঃ করেনি। কিন্তু তার ফলে জগতের ইতিহাসে এমন এক আর্ট সৃষ্ট হয়েছে যে তার রম্য কুহকে জগৎ আজ মুগ্ধ হয়ে

গেছে। Arabesque কথাটি আজ ভাষারও একটা সম্পদ হয়ে গেছে। একদিকে মূর্ত্তিরচনা নিষিদ্ধ হ'ল অন্যদিকে Illuminated manuscriptএ সুবর্ণ ও রক্তরাগের রম্য বিক্ষিপ্তির বিপুল প্রাচুর্য্যে মানুষ অবাক্ হয়ে গেল। কবির গজলগানের অন্তরালে মদিরার রক্তিম ছায়া, গোলাপের গৌরব, হেনার গন্ধ ও বুলবুলের ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। নীল আকাশ ভেদ করা রৌপ্যতীরের মত মসজিদের চূড়া দিকে দিকে ছেয়ে ফেলল। কলার জয়ধ্বনিতে ইসলাম জগৎ মুখরিত হ'ল, কলা গৌরবে পরিপূর্ণ হল। পশ্চিমে আল্‌হামরার বিপুলতা, মধ্যদেশে St. Sophiaর গরিমা এবং পূর্ব্বাঞ্চলের তাজমহালের শুভ্র হিমানি মূর্ত্তি—ইস্‌লাম শিল্পের ভিতর দিয়ে কলালক্ষ্মীর মুকুটে দুর্লভ সম্ভার দান করলে। মূর্ত্তি অঙ্কনেও এমন ভাবে ইসলাম এমনি একটা অপরূপতা দেখিয়েছে যা' আজও অপরাজেয় হয়ে আছে!

কলা প্লাবনের ধারা এমনিভাবে ছুটে এসেছে। যারা ঐরাবতের মত সে পথ প্রতিহত করতে গেছে, তারা ভেসে গেছে।

এ সমস্ত বিধিনিষেধের মূলে একটা পরম মানস-ছন্দ কাজ করছে। জগতের যাবতীয় গতিই ছন্দে গ্রথিত—রাত্রিদিন, বর্ষ-ঋতু প্রভৃতি যেমন, তেমনি মনের সমস্ত বৃত্তিই একটা ললিতছন্দের প্রবাহে স্পন্দিত হচ্ছে। মনের গতি কতকটা রাগিনীরই মত। মানুষের মনের এই বিচিত্রতা একবার তাকে নেতির দিকে এবং একবার ইতির দিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে; বিশ্বের সমস্ত রূপ রস গন্ধের সামনে যাকে সে পেয়েছে তাকেই এক-একবার অস্বীকার করছে, তারপর আর একবার গভীরতর ভাবে স্বীকার করছে। তাতে করে একবার রচিত হচ্ছে প্রতীক—আর একবার প্রতিমা। অথচ এই প্রতিমা ও প্রতীকের ইতিহাসে মানুষের মনের খোঁজই নেওয়া হয় না! কলার ভিত্তি খুঁজতে গিয়ে মানুষের ভিত্তি খোঁজবার প্রশ্ন উঠছে! মানুষের ভিত্তি কোথা?

জীবতত্ত্ব মানুষের আদিম সন্ধান সামান্যই দিতে পেরেছে এজন্য ভূতত্ত্ব তার সাহায্যে এসে দাঁড়িয়েছে। Postglacial বা neolithic যুগের কবলে নিহিত প্রস্তর ও ধাতুজ যন্ত্রাদির ইঙ্গিতের পশ্চাতে Quarternary বা Pleistocene যুগ বা তৎপূর্ব্বের Tertiary যুগের pliocene ও miocene প্রভৃতির অবশেষের ভিতর মানুষের টুক্‌রো খুঁজে পাওয়ার প্রবল চেষ্টা হয়েছে। অন্যদিকে মানুষের মনোজগতের গহন অরণ্যে ঢুকে তার সনাতন বা আদিম উৎস তন্ন তন্ন করা হচ্ছে। আশ্চর্য্যের বিষয় মানুষের টুক্‌রো যেখানে পাওয়া গেছে স্পষ্টভাবে, সে সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগেও দেখা যাচ্ছে মানুষের মন কখনও টুক্‌রো হয়নি। Dordogne-এ প্রাপ্ত mammoth মূর্ত্তি, ভিয়েনার চাফো (chaffaud) গুহায় প্রাপ্ত হরিণের চিত্র প্রভৃতিতে সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কোন মানস আবিলতা দেখা যায় না। কোন লেখক এজন্য বলেছেন "The paleolithic period ended with the quaternary age at least 121000 years before us and the art of the troglodytes at that distant epoch had already attained the summit of its curve" আলটা মাইরা গুহায় হরিণ ও বুনো গোরুর চিত্র, Gourdan caveএর হরিণের সারি, Mas-d' Azil (মা দাজিল) গুহায় বুনো ছাগল—এসব আশ্চর্য্যভাবে সুসম্পূর্ণ। এরকম যেখানে আদিম কোন মনের কোন রম্য কাহিনী পাওয়া গেছে সেখানে কোথাও তাকে গলিত বা রুগ্ন দেখা যায়নি—এটা একটা প্রবল সত্য। এ সমস্ত কেন আঁকা হয়েছে সে প্রশ্ন অবান্তর। Animistic বা Theistic idea হতেই হোক্, শত্রুহনন বা সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই হোক্, টোটেমিজমের ফলই হোক্, কিম্বা চিকিৎসা শাস্ত্রের আদিজনক Shamanismএর মন্ত্রাত্মক মূর্ত্তি দ্বারা আরোগ্যের ব্যবস্থার জন্যই হোক—মূর্ত্তি অঙ্কন চলে এসেছে বহুকাল হ'তে এবং আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে এসব মূর্ত্তি একেবারে ব্রহ্মার মানস পুত্রের সসজ্জ সম্পূর্ণতার ধর্ম্মে আক্রান্ত হয়ে এসেছে।

মানুষের মন যখন প্রতিমা বা form রচনা করতে গেছে তখন তা পুরোপুরি প্রতিমাই রচনা করেচে, আধখানা করেনি—ওর ভিতর evolutionএর বক্রতা বা রুগ্নতা কোথাও আসেনি। আর্ট ঠেকে ঠেকে

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

হাতপা গুছিয়ে ভাঙ্গাচোরার পথে এসে অকূল হতে কূলে ঠেকা ভাঙা জাহাজের মত রসবস্তু সৃজন করেনি। জাতির ইতিহাসে আধখানা গান বা গানের ভগ্নাংশ চিত্রের ভগ্নাংশ কখনও হয়নি; যা হয়েছে তা একটি whole বা সম্পূর্ণতার সৃষ্টি। পরিণামবাদীর ভিতর হ্যাডন প্রমুখ কেউ কেউ বলেন যে প্রাকৃতিক বস্তু হ'তে অনেক সময় রূপ গ্রহণ করে' অনেক ঘষে মেজে নানা পরীক্ষণেরএর সাহায্যেই আর্টের নক্সা তৈরী হয়। Reigl, Lipps, Dr. Worringer প্রভৃতি সুপ্রমাণিত করেছেন যে তা নয় বরং ব্যাপারটি ঠিক বিপরীত। একটা design গোড়া হ'তে বোনা হয় মনের তাঁতে; সেটা যখন পরিপক্ক হয়ে একটা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে তখন মনে যে প্রাকৃতিক animal বা vegetable formএর উদ্দীপনা করে তেমনি রূপ তাকে দেওয়া হয়। এজন্য কোনও ভাবুক বিদ্রূপ করে বলেছেন "The creative act of making an ornamental design based upon a pot-hook unit, such as the frigate birds beak is, bears no causal relation whatsoever to the original fact in the artists' environment and to write books in order to show that it does, is as futile as to try and show that pneumonia, bronchitis or pleurisy was the actual cause of Poe's charming poem "Annabel See."

এ প্রসঙ্গেই Dr. Worringer লক্ষ্য করেছেন যে মানুষের "art will" বলে একটা জিনিষ আছে। ওটা মানুষের একটা আদিম বৃত্তি, ওটাই তাকে সৌন্দর্য্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করে।

মানুষের শরীরের ইতিহাসের ঘাঁটাঘাঁটির সঙ্গে মনের ইতিহাস ঘাঁটবারও Search warrant বেরিয়েছে! তা'তে ক'রে পশ্চিমে একান্তভাবে গভীর বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে—সে বিপ্লবের সঙ্গে একবার বোঝাপড়া করতে হচ্ছে আর্টের ভিত্তি খোঁজবার জন্য। আধুনিক যুগে মানুষের সত্তা সম্বন্ধে অয়কেন অতি সংক্ষেপে পশ্চিমের এই বিপ্লববাণী সংক্ষেপে বিবৃত করে' বলেছেন—"Is human life a mere addition to nature, or is it the beginning of a new world"? "মানুষ কি সৃষ্টির পরিণাম,—না, সে নূতনতর সৃষ্টির আদিমবস্তু? Historico-comparative method মানুষের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা স্বীকার করে না বলে তা সমস্ত জটিল আলোচনায় ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, এজন্য ফরাসী দেশে আধুনিক যুগে—যাকে বলে Le Neo criticism—তার রানুভিয়ে সূত্রপাত করেছিলেন। তাঁর মূলকথা হচ্ছে—মানুষের নূতন সৃষ্টি করবার অধিকার বা ক্ষমতা আছে, সে জড়পিণ্ড নয়। মানুষের আধ্যাত্মিক মনন ও সাধনা কার্য্যকারণের শৃঙ্খলকে ভেঙে নূতনত্বের দিকে অগ্রসর হতে পারে—"New beginnings may come in—causes which are not in their turn effects."

প্রসঙ্গত বলতে হচ্ছে এই neo-criticismএর দিক্ হতে আমাদের দেশের আধুনিক সাহিত্য ও সাধনা কেউ তলিয়ে দেখতে কৌতূহলী হননি।

এসমস্ত কথার মূল হচ্ছে মানুষের মনের ভিতরকার এই প্রচ্ছন্ন স্বাধীনতা এবং এই সোঽহং ভাবই তাকে সৃষ্টিকার্য্যে প্রলুব্ধ করেছে। সে অখণ্ডভাবেই সৃষ্টি করেছে—এজন্য সকল কালে ও যুগে অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি বা তর্কের উপর সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি, নির্ভর করেনি। এজন্য সকল দেশের কলারচনা পরিপূর্ণ স্বরূপযুক্ত। কাজেই তা' বর্ব্বরজাতিতে ব্যাহত হয়নি এবং আদিমযুগেও কলঙ্কিত হয়নি। এজন্যই সর্ব্বত্র কলার আদিতম প্রকাশেও তাকে সুলক্ষণযুক্ত পাওয়া গেছে।

অধ্যাত্মদিক থেকে মানুষের ভিত্তি কোথা এ-প্রশ্নই উঠতে পারে না। সে অমৃতের পুত্র, এই প্রাচীন বাণী আজ নানাদেশের কলাসমুচ্চয়ের উন্মুক্ত প্রদর্শনীতে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। ঋকের গীতিকা, বৌদ্ধযুগের শ্রমণগণের গাথা, তিব্বতীয় কবি মিলরাপার লক্ষগীতিকা, চৈনিক কবি লিপোর কাব্য, জাপানী চিত্তের Genzimonogatoria অলস স্বপ্ন প্রভৃতি কি কাব্যহিসাবে অ্যারোপ্লেন বা তারহীন যন্ত্র যুগের কাব্য কবিতা হ'তে কম লোভনীয়?

এইখানেই বিশ্বমানবের ঐক্য! নিগ্রোই হোক্, চৈনিকই হোক্, পূর্ব্বেরই হোক্, পশ্চিমেরই হোক্, মানুষের ভিতরকার

এই সমতলভূমিতে একটা পরম মিলনের পথ উন্মুক্ত আছে! আদিমই হোক্ আধুনিকই হোক্ সৌন্দর্য্যের চন্দ্রাতপতলে মানুষের চিত্তলক্ষ্মী প্রতিযুগেই বারবার স্বয়ম্বরা হ'তে আসে! সে বিচা'রে এর পরেই আস্‌ছি। কিন্তু তার আগে নানাদেশের ভাবরাজ্যে মানুষ যে অনেকটা একরকমের ব্যাকুলতার ভিতর দিয়ে গেছে তা দেখ্‌তে হচ্ছে! যেখানেই মানুষের এরকমের একটা অখণ্ডতা কাজ করেছে সেখানেই মানুষের ভিতরকার ঐক্য উপলব্ধি হবে—মানুষের solidarity ধরা পড়্‌বে।

পূর্ব্বাঞ্চলে চৈনিক চিত্ত ত্যায়ো ধর্ম্মের মন্ত্রকে শিরোধার্য্য করেছে—এই অখণ্ড চিত্তলীলার আন্দোলনে। চ্যাংসো ব'লেন, ত্যায়ো ছিলনা এমন সময়ই হ'তে পারেনা। লেওজু বলেন "It is all-pervasive; there is no place where it is not found—yet it is so subtle that it exists in all its plenitude in the tip of a thread of gossamer, formless it is the source of all forms—inaudible it is the source of every sound we hear, invisible it is that which lies behind every external object".

দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে অতি দুর্ব্বোধ্য মানবচিত্ত চৈনিকের মাঝেও সেই রূপ হ'তে রূপাতীতের দিকে একটা হিল্লোলিত অভিযান সৃষ্টি করেছে। যে সভ্যতা অতীত ও বর্ত্তমানের প্রত্যেক টুক্‌রোকে সমাজবিধানের চক্রের ভিতর অনুস্যূত করে অমরতা দিতে চেষ্টা করেছে—সম্রাট, পিতৃপিতামহ ও অনাগত যুগকে যা'রা করতলগত আমলকের মত স্পষ্ট ও আয়ত্ত করে' তৃপ্ত হয়েছে এবং এই সমস্তকে মুখ্য করে' যে বিধান-চক্র হয়েছে তারই মধ্যমুখী একটা কেন্দ্রানুগ চৌম্বক-শক্তি সঞ্চার করে' যে সভ্যতা কাকেও একচুলও বাইরে যাওয়ার অধিকার, ঔৎসুক্য বা অবকাশ দেয় নি—তাদের ভিতর রূপ ভেঙে রূপাতীতকে খোঁজবার অন্তর্বিপ্লব হয়েছে।

চৈনিকের ভিতর জাগ্রত এই রূপ-মৌলিক প্রশ্ন দেখে মনে হয়—তার মনের ভিতর রূপের দোলা দুলেছে! এক একবার সে 'না'এর দিকে গিয়ে পরে 'হাঁ' করতে হাঁপিয়ে উঠেছে। সেও আর্টের ভিতর মুক্তি চেয়েছে। মিশরসভ্যতাও এই অরূপকে অনুভব করে তাকে রূপ দেওয়ার জন্য যে বিপুল শিল্পোদ্যম ক'রেছে তা'তে মনে হয় কি আশ্চর্য্য সম্ভারই রূপোৎসের অর্ঘ্যরূপে অর্পণ করা যায়! মিশরের শিল্প তো প্রত্যক্ষভাবে অরূপকে রূপ দেওয়ার এক একটা বিশিষ্ট চেষ্টা হ'তেই হয়েছে। মিশর দেশের লোকেরা পূর্ব্বেই মনে করত জীবন্ত মানুষ তিনটি জিনিষে তৈরী; একটা হচ্ছে শরীর—একটা "কা" বা ভূতযোনি এবং একটা হচ্ছে 'বা' বা আত্মা। তারা মনে করত মৃত্যুর পরে "কা" আবার ফিরে আস্‌বে এবং দেহ পরিগ্রহ কর্‌বে—এজন্য তারা মানুষের শরীরের প্রস্তরপ্রতিমূর্ত্তি তৈরী কর্‌ত—কিম্বা মৃত শরীরকে মশলা দিয়ে রক্ষা কর্‌ত; ইহাই হচ্ছে mummy রচনার কারণ! Book of the Dead নামক বইতে এরকম disembodied spirits বা বিগ্রহ-মুক্ত আত্মার নানা অবস্থার কথা দেওয়া আছে।

শুধু তা নয়। তারা Osiris, Ra, Khons, Thothএর পেছনে একটা গুপ্ত দেবেরও সন্ধান পায়, তার নাম হচ্ছে "Ammon"। কোন কোন জাতির ভিতর, জীবনের সম্বন্ধে যেমন নানা প্রশ্ন ঘনীভূত হয়েছে যেমন আসীরীয় বা বাবিলোনীয় জাতির—তেমন কারও কাছে মৃত্যুর প্রশ্ন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মিশর আর্টের ভিতর দিয়ে তার জীবনের পক্ষে যে সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্ন—মৃত্যুকে জয় করা—তা সফল কর্‌তে সাহসী হয়েছে—একেবারে রূপহীন লোকের স্বপ্নজালকে কলাললিতের অপূর্ব্ব ঝরোকায় পরিণত করেছে!

নানাজাতিতে নানা দেববাদ নানা রকমের হয়ে প'ড়েছে। সকল দেশের দেবতার ধর্ম্ম এক রকমের নয়—কাজেই দেববিগ্রহ বল্‌লে একরকমের জিনিষ হয় না। হিন্দু দেবতা, গ্রীক্ দেবতা, মিশরীয় দেবতা, মাইকিনীয় দেবতা বা নিগ্রো দেবতা এসবের মূলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবের উদ্দীপনা রয়েছে—এজন্য আর্টের ক্ষেত্রে যারা লঘুভাবে তুলনা করতে যায় তারা মানবতত্ত্বই বোঝেনা।

অথচ সব কিছুর মূলেই একটা রূপাতীতকে গ্রহণের বেদনা ও উৎকণ্ঠা আছে। সৃষ্টিতে যা' মানুষ পাচ্ছে তাতে

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

তৃপ্ত না হয়ে সে তার বাইরে যেতে চায় এবং সেখানে সে এমন এক সংস্পর্শ পায় যে মন তাকে রূপের বাঁধনে আনতে গিয়ে কত কি রূপের অরণ্য সৃষ্টি করে' বসে তা'র ইয়ত্তা নাই! যথাক্রমে আমি তার উল্লেখ করব।

মিশর দেশ ঘনীভূত মৃত্যুর অন্ধকারেও এমনি রূপ-দীপালী রচনা করেছে যে মনে হয় ও'দেশের দেখ্‌বার ভঙ্গীই প্রতিমার ভিতর দিয়ে, প্রতীকের ভিতর দিয়ে নয়। বাস্তবিকই তাই হয়েছে। সেখানে ভাব মাত্রই একটা রূপের সাহায্যে প্রকাশ করা হ'ত। তা'তে করে' Hieroglyphic সাহিত্যের জন্ম। "Abstract ideas are easily rendered by concrete forms: the concepts of dominion and justice were rendered by figures of material objects the crook, the whip or the ostritch feather"—এ হল এ সাহিত্যের গতিধারা।

আসীরীয় ও বেবিলনীয় চিত্তও এই ঝড় উঠেছে। বেবিলনীয় জাতি অরূপকে রূপ দেওয়ার সাহস কর্‌তে পারেনি—লুভ্রেতে যে Boundary stone রক্ষিত আছে তাতে দেখা যায় দেবতাদের মূর্ত্তি দেওয়া হয়েছে 'ছড়ি' 'টুপী', 'চন্দ্রকলা' প্রভৃতি দিয়ে। একেবারে যে দেবমূর্ত্তি নেই তা নয়; Nimrud এর reliefএ দেবমূর্ত্তি বহন করে নেওয়া হচ্ছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে, মৃত্যুর পরপার হতে আসীরীয় চিত্ত নিজেকে দূরে রেখেছে কারণ এদেশে Funerary art নেই। এদেশের মহাকাব্যের নায়ক Gilgamesh মৃত্যুকে ভয় করেছে—জীবনের সহস্র কণ্টকও শ্রেয়ঃ তবুও মৃত্যুর পথে যাওয়া হবে না এই হ'ল মনের ভাব। হিন্দুর ন্যায় অমৃতের দ্বারা মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হওয়া বা মিশরের মত ভোগবাহুল্যের সম্ভারে মৃত্যুর পরপারকে নিষ্কণ্টক করার কল্পনা এদের হয়নি। এজন্য এদের আর্ট শীর্ণ ও সামান্য। এদের মন এজন্যই নক্ষত্রলোকে বিচরণ ক'রে astrotheology রচনা ক'রে তৃপ্ত হয়েছে।

গ্রীক্‌দের কথা পরে আস্‌বে। গ্রীকজাতি ব'লে একটা অখণ্ড জাতি ছিল এখন আর কেউ এরূপ মনে করে না। নানা ধারা এসে নানা ভাবের আবেষ্টনে সেখানে একটা culture সৃষ্টি করেছিল। সেখানে Aristotleএর মতবাদ যেমন রয়েছে Platoর অধ্যাত্মবাদও বর্জ্জিত হয়নি; Lysippusএর ভোগাত্মক লক্ষ্য যেমন দেখতে পাওয়া যায় Praxeiltesএর ভোগবিমুখী উন্মাদনাও পাওয়া যায়। গ্রীক্‌দেবতার স্থান অতি সীমাবদ্ধ। তারা জগৎ সৃষ্টি করেনি এজন্য অরূপলোকের তত্ত্বের খাতির বাইর হ'তে এসেছে। রহস্যবাদ Orphism এবং কোন কোন প্রাচ্য cult এজন্য গ্রীক্‌চিত্তে আশ্রয় নিয়েছে। তাতে করে' দুটো ধারার সৃষ্টি সেখানে হয়েছে এবং এ দুটো ধারা মিশ খায়নি। কোন লেখক বল্‌ছেন:—"These gods of Greece had not created the world, nor did they preside permanently over their phenomena; it was therefore necessary to investigate the causes of its existence and of its constitution. The gods had exhausted their activities in fighting and lovemaking. It was therefore necessary to seek out the principle by which men were to regulate their action, and so metaphysics or ethics were created by philso-phical speculation."

ভিতরে বিরোধ থাকাতেই গ্রীকশিল্পে রূপবাহুল্য এত সামান্য—type এত কম! এজন্য তাদের পরলোকতত্ত্বও অতি নির্জ্জীব ও রসহীন। সেখানে Nekyaর কথা আছে বটে কিন্তু জীবনের যবনিকার অন্তরালের কথা গ্রীককে কখনও তেমন ব্যস্ত করেনি। রোমক ধর্ম্মে ত মৃত্যুসম্বন্ধে একটা পরিস্ফুট ধারণাই নেই। Erebusএর যন্ত্রণা এবং Elysiumএর আনন্দও যে অলীক সে তা' জানত। এজন্য ভূয়িষ্টপরিমাণে তাদের ভিতর রূপ-ধারা সৃষ্টির প্রসার বাড়তে পারেনি।

ভারতবর্ষের কথা বলব। এমন পরিস্ফুটভাবে কেউ জীবনের ভিতর অরূপলোকের সন্ধানে চিত্তকে মথিত করেনি। মানুষ নিজকে নিয়ে গেছে বহু পশ্চাতে—জন্ম জন্মান্তরের অসীম দোলায়! নিজের অসংখ্য জাতক-কাহিনী কল্পনা করে তৃপ্ত হয়নি—একেবারে নিজকে কখন বিশ্বস্রষ্টা ও অনাদি বলেও ধারণা করেছে—অন্যদিকে ভবিষ্য কোটি

জন্ম কল্পনা করেও তার চিত্ত শ্রান্ত হয়নি! কতবড় জগৎ সে নিজের জন্য রচনা করেছে, আয়ত্ত করেছে ও তাকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করেছে—তাতে বিস্মিত হতে হয়! এজন্য এত বিচিত্র, এত বহু, এত ঐশ্বর্য্যবান্ বিপুল আর্ট আর কোথাও জন্মেনি। অল্পদিন হল Rothenstein উরোপের পক্ষ হতে এ কথা বহুকাল পরে স্বীকার করেছেন। সমস্ত phenomenal world বা প্রাতিভাষিক জগতের মূল কথা অতি সুন্দর ভাবে শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হয়েছে। প্রতীক ও প্রতিমায় পর্য্যবসিত জগতের মাঝে নাম ও রূপে ধৃত বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিমা যে প্রতিরূপক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর্ট যে symbolism অপেক্ষা বড়, তা সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করে পরার্দ্ধ ও সত্যলোকে গিয়ে কি ভাবলেন তাই কিছু উল্লেখ করছি—একটা ইংরাজি অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত করছি—তা'তে বোধ হবে লেখকের এর ভিতর কোন কষ্ট কল্পনা নেই :—

"Having gone to that higher sphere he considered. 'How now can I pervade them with two things—with form and with name. Whatever has a name that is name. And then that which has no name—that which he knows by its form that such is its form—that is form, *this universe is so much as is coextensive with form and name*—These are the two great magnitudes of Brahma. He who knows these two great magnitudes becomes himself a great magnitude—Of these one is the greater viz form, for whatever is a name is also a form." XI.2.3.2ff.

ধর্ম্মসাধনার চরমপ্রান্তে আবার এই নাম ও রূপের অতীতে চলে যেতে হয় এরূপ উক্ত হয়েছে।

> "যথা নদ্যঃ স্পন্দমানাঃ সমুদ্রে
> অস্তং গচ্ছন্ নামরূপে বিহায়
> তথা বিদ্বান নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
> পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি"।

ভাবের এদুটি সুমেরু-কুমেরুর ভিতর রূপের কি বিচিত্র ব্যঞ্জনাই হয়েছে। রূপ, রূপক, সূক্ষ্মরূপ, বিরাট-রূপ ও বিশ্বরূপের ভিতরে আত্মা স্বপ্রকাশ হতে চেয়েছে। একেবারে আদিম প্রতীক বা নামরূপ হতে সুরু করে, পরিণত তান্ত্রিকযুগের অশাঙ্গ-প্রমুখ যোগাচার্য্যদের উন্মত্ত ও কল্লোলিত কল্পনা যে বিচিত্র বহুকে ও অতি-ভূতকে সৃষ্টি করেছে—তা' কলারাজ্যের বিপুল সম্পত্তি হয়ে গেছে! সে আলোচনা এখনও হয়নি। কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে এ দেশে দেবরচনা ও মূর্ত্তিকল্পনা মোটেই আড়ষ্ট হয় নি। পশ্চিম সম্বন্ধে একথা বলা কঠিন হয়ে পড়ে। সেখানে এক একটা জায়গায় রূপকল্পনা আটকে গেছে—তাতে করে' কলালঙ্করণ মূর্চ্ছিত হয়েছে এবং জাতীয় জীবনবন্যা শুকিয়ে গেছে। এক একটা সভ্যতাই তাতে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আধুনিক নেপালে ও তিব্বতে ভারতের রূপ-মরীচিকার সমস্ত ছায়া বর্ত্তমান আছে। আমি মনে করি অরূপরাজ্য সম্বন্ধে যে দেশের কল্পনা গভীর ও প্রবল—সে তা' প্রকাশের জন্য রূপজগতে নব নব সৌন্দর্য্য-রচনা সার্থক করে তুলবে; তান্ত্রুরে ও সাধনমালার বিধানে নানা ভাবাবেশ ও লক্ষণ অনুসারে সীমাহীন দেবরচনার ব্যবস্থা রয়েছে—নেপালী শিল্পীরা এখনও এরকমের দেবরূপ তৈরী করছে। আর পশ্চিমে কি হয়েছে? অতীত কালের যে ধারাটি এখনও জাগ্রত ও বর্ত্তমান আছে তা' রুষীয় ও বুলগেরীয় খ্রীষ্ট ও ম্যাডোনার চিত্রাঙ্কনে ব্যস্ত; সে সব চিত্র কোন পশ্চিমের লেখকের মতে "artificial spectres of sacred personages rather than works of art. Mons. Didron দিদ্রোঁ গ্রীসের এথস পাহাড়ে এরূপ অনেক monk-artist দেখতে পান। তিনি বলেন :—"At this place thousands of sacred pictures on wood are painted and exported to Russia, Turkey, Greece and the Balkan States". Byzantine Manualএর সূত্র এমনি ভাবে একটা "rigid petrifying element" সঞ্চার করে উরোপের দেবরচনার পথকে জীর্ণ ও চিত্তকে শুষ্ক করে' তুলেছে—আর এদিকে সাধনমালা নূতন নূতন পথ খুলে

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

রূপলোকের বৈচিত্র্যের একটা বৈশাখী ঝড়ের সূত্রপাত করেছে!

এদেশেও যে মূর্ত্তি রচনা কখনও কখনও আড়ষ্ট হয়নি তা' নয়। পূজার কঠোর বিধান যেখানে জাগ্রত থাকে সেখানে আর্ট সহজেই আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। মন সেখানে একটা প্রামাণ্য মূর্ত্তির কবলে দারুভূত হয়ে যায়। পশ্চিমে Rome, Ravenna, প্রভৃতি অঞ্চলের mosaic আর্টে খ্রীষ্টের চিত্রের এরকমের অবস্থা হয়েছে। All the mosaics and frescoes of the Graeco-Oriental countries—the mosaic of the Sicilian churches of the Norman period—all the relief decorations of the Romanic churches of Italy, of the Gothic churches of France and the Rhenish provinces and the polychrome glass of these same churches come under the influence of the iconolatrous principle."

কিন্তু এ দুটি দেশের ভিতর তফাৎ এই যে পূর্ব্বাঞ্চলে এখনও মূর্ত্তির পরম্পরা রক্ষিত হয়ে তাকে নূতন নূতন অবস্থার সঙ্গে যোগ রাখার পক্ষে বাধা দিচ্ছে না। এজন্য এ জাতিকে একেবারে নিহত করা পশ্চিমের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

ভারতবর্ষের আর্ট আলোচনা করতে সহজেই নানা বাধা উপস্থিত হয়। পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসে ইহাই একমাত্র আর্ট যা জগতের কাছে একেবারে দুর্ব্বোধ্য। এ আর্ট বুঝতে গেলে সকল আর্টের ভিত্তি এবং আর্টের সমস্ত ভিত্তি আলোচনা করা দরকার হয়ে পড়ে। কারণ আর্ট জাতির মনস্তত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ভারতবর্ষের চিন্তাধারা, সাধনা, এবং গতি-বেগ সম্বন্ধে একটু পরিষ্কার ধারণা না হ'লে এ আর্ট বোঝা যাবে না। অথচ যাঁরা এ পর্য্যন্ত আলোচনা করছেন, তাঁরা কেউ এ অধিকারের দাবী করতে পারেন না। এজন্য কেউ বলছেন এ আর্ট animistic, কেউ বলছেন ইহা sensual, কেউ বা বলছেন ইহা spiritual, কেউ বা বলছেন symbolic, কেউ বা বলছেন obscene ইত্যাদি—এঁদের সকলের পক্ষে ভারতবর্ষের ভিতর যে বিচিত্র বহুর একতা হয়েছে সে তত্ত্ব খোঁজ করা দরকার।

এদেশে নাস্তিকতা হতে আরম্ভ করে একেবারে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী দেবত্ববাদ পর্য্যন্ত ভাবের বিস্তৃতি হয়েছে। এ জায়গায় যত কল্পনা ও আলোচনা হয়েছে তাতে সকল রকমের চিন্তা ও তত্ত্বের ভিত্তি রয়েছে; এজন্য ভারতবর্ষকে শুধু যে ভৌতিক হিসাবে পৃথিবীর প্রতিরূপক বা mirror বলা যায় তা নয়, অধ্যাত্ম দিক থেকেও এখানে সকল রকম আন্দোলন হয়ে গেছে দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু সে বিচারের এ জায়গা নয়।

আর্টের ভিত্তি খুঁজতে হলে নানা দিক দেখতে হয়। প্রথম কথা মানুষের বেষ্টনী বা atmosphere কে লক্ষ্য করতে হবে। মিশরেই পিরামিড সম্ভব, গ্রীক দেশেই পার্থিনন সম্ভব, ভারতবর্ষেই অজান্তা ও দাক্ষিণাত্যের হয়েশলেশ্বর মন্দির বা রমানাথ স্বামীর মন্দিরের মত গভীর ও বিরাট ব্যাপার সম্ভব। দেশের আবহাওয়া এবং চারিদিকের বর্ণ গন্ধ ও ছায়ার সহিত প্রত্যেক আর্ট ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। বহির্জগতের লীলায়িত তরঙ্গের সহিত সকল আর্টের যোগ দেখতে হবে, কারণ প্রত্যেক জাতির মনোভাবের সহিত আর্টের গতি হিল্লোলিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ দেখতে হবে জাতির মনস্তত্ত্বের তন্তুজাল, ও তৃতীয়তঃ দেখতে হবে জাতির গতিবিধি, ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, এমন কি বিজ্ঞানের বিধান। আর্টকে কেউ একান্ত ও এককভাবে সেকালে আহ্বান করেনি—অথচ প্রতি গতিতে আর্টের সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে। এর ভিতরও সেকালের চিন্তাধারা ও একালের বিচারপদ্ধতির পার্থক্য অনুধ্যান করতে হবে। আধুনিক জগতের নব্য বিপ্লবের সঙ্গে প্রাচীন জগতের উদ্বোধনের কলরবের তুলনা করে আর্টের ঐক্য অথণ্ডতা প্রতিপাদনও দরকার হয়ে পড়ে।

গোড়াতেই বলেছি অতীত আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হচ্ছে কারণ এ যুগ অতীতের ভাবের নোঙর অনেকটা ছিঁড়ে ফেলেছে বলতে হবে। কালিদাস ও সেক্সপীয়র, মলিয়ার ও গেটে আমাদের কাছে একান্ত সেকেলে—এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারাও একেবারে গলিত-পলিত হয়ে গেছে। নূতন মত, নূতন ধারা, নূতন আলো-

চনাপদ্ধতির সূত্রপাত হয়েছে। নূতন কবির নূতন শ্লকের রিনিঝিনি রব শোনা যাচ্ছে, নূতন নাট্যকার সমস্ত গ্রীক আদর্শ ধূলিসাৎ করেছে, নূতন চিত্রকর উনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত বাতুলতাকে একেবারে চিত্রপট হ'তে মুছে ফেলেছে— নূতন ঔপন্যাসিক হবসেন ও Zolaকেও আরণ্যযুগের লেখক মনে করছে—যদিও আমরা এখানে তাদের নকলনবিশী করছি স্থান কাল পাত্র তুচ্ছ করেই। নূতন রঙ্গকলা জার্ম্মানী ও রুশিয়াতে একেবারে সমস্ত সঙ্কর পদ্ধতিকে ত্যাগ করতে উৎসাহিত করেছে। নাট্যকলা শীর্ষক বক্তৃতায় আমি সে বিষয় আলোচনা করেছি। সম্প্রতি নূতন বাণী হচ্ছে Pure art এর। রচনার ক্ষেত্রে German soul-painterরা এসে দাঁড়িয়েছেন—Wedekind ও Eulenberg নূতন ফানুস উড়িয়েছে!

যান্ত্রিক যুগ হঠাৎ যেন তার একটা নূতন মূর্ত্তি আবিষ্কার করেছে! Should not the tremendous changes which our entire mode of life is undergoing find an echo in art? The technical revolution, the expansion of all dimensions our electric existence, the discovery of society as a living organism, the re-awakened joy in the struggle to conquer the elements, the heightened consciousness of physical power, the love of nature and cosmos, the growth of a new mythology, should nothing of these find expression?

এতে নূতন কাব্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের সূত্রপাত হয়েছে—না হ'য়ে যায় না। এটা Law of Relativityর যুগ হয়ে পড়েছে একথা স্বীকার করলেই সেটা রূপলীলায় ধরা পড়বে। আধুনিক যুগের Archipenko ও Kandinsky এক মুহূর্ত্তও এগিয়ে আসতে ইতঃস্তত করেনি এবং যদিও এদের আর্ট স্থায়ী হয়নি তবুও সমস্ত আর্টের ভিতরেই একটা বিরূপ রূপলীলা সঞ্চার করেছে—পশ্চিমে।

আমাদের দেশে যাঁরা উরোপের ভাবের স্রোতে কতকটা নেবেছেন—এ অবস্থায় তাঁদের গত্যন্তর নেই— পরিধেয় বস্ত্র ভিজ্‌বার ভয়ে তাঁদের আর এগিয়ে না গেলে চল্‌বে না; হয়ত ওদের এই তরঙ্গে ডুব দিতে হবে—না হয় কূলে উঠে আস্‌তে হবে—কিন্তু তারও হয়ত যো নেই।

এ জলে খানিকটা ডুবেও যাঁরা প্রাচ্য অঞ্চলের গভীর ভাবাবেষ্টনের সঙ্গে নিজের যোগ রেখেছেন তাঁরা দেখ্‌তে পাবেন আর্টের এ সমস্ত নেতিমূলক লক্ষণ দেখে বিচলিত বা বিব্রত হওয়া কোন কাজের কথা নয়। এই জন্যই এই সন্ধিক্ষণে আর্টের স্বরূপ লক্ষণ নির্ণয় করা উচিত। আর্টের গোড়াকার ভিতর দিকে নজর করা ভাল তা'হলে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে—যেমনিভাবে অতীতের ধর্ম্ম-ব্যবস্থায় বহু চক্রের নেমিতে তা আবির্ভূত হয়েছে, মধ্যযুগের সমাজ-কল্লোলে যেমন তা' হয়েছে, মুখর বৈজ্ঞানিক যুগের মাঝে আর্টের তেমনি অদৃশ্য লীলাচঞ্চল রূপ একই কারণে হয়ত নূতন ভাবে দীপ্যমান হচ্ছে। সে আলোচনার সূত্রপাত করতে গিয়ে বৃহৎ আরণ্যক উপনিষদের একটা উক্তি মনে পড়্‌ছে। বীণা বাজ্‌লে বাইরে হতে সে ঝঙ্কার আয়ত্ত করা চলে না বীণাটিকে হাতে করতে হয়; শঙ্খের আওয়াজ শুনে আয়ত্ত করা চলে না—তাকে করতলগত করলে সে আওয়াজ বশীকৃত হয়। তেমনি ভাবে বলা যায়, সাহিত্য, ধর্ম্ম, সমাজ, জীবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব, নীতি ও বিজ্ঞানের অলিগলির ভিতর গিয়ে বিক্ষিপ্ত না হয়ে রূপবিদ্যাকে যদি উপলব্ধি কর্‌তে হয়, তবে তার ভিতরকার বাহনকে প্রত্যক্ষভাবে আয়ত্ত কর্‌তে হয়, তবেই আর্টের মন্ত্রমূর্ত্তি চোখে পড়্‌বে। বিস্ময়ের বিষয় আধুনিক ইউরোপের Neo-criticism এর বেশী কিছু চায় না! তা' বিজ্ঞানের দিক হতে হয়ত অতিরঞ্জক, কিন্তু সত্যের দিক হ'তে উচ্চতর। কলালোচনার আর দ্বিতীয় পন্থা নেই। বিজ্ঞান আলোচনার পথ ও কলা সাধনার পথ এক রকমের নয়! এজন্য পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তর ও দক্ষিণে মানবের অপরূপ হ্লাদিনী বৃত্তি বিশ্বময় যে রাগিণী ঝঙ্কৃত করেছে, যে রসমূর্ত্তির লীলাভঙ্গে পুলক সঞ্চার করেছে, যে কাব্যের কুহকে সকল দেশের হর্ষ ও ক্রন্দনকে ঘনীভূত করেছে, যে স্থাপত্যের শিখরশৃঙ্গে মেঘদূতের বাণী মুহুর্মুহু পাঠিয়েছে, যে চিত্রের উন্মুক্ত উজ্জ্বল

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

সহস্ররাগে বিশ্বময় হোলির উল্লোল নৃত্যের উন্মাদনা সঞ্চার করেছে—অশনে বসনে ভূষণে-রাগে মানুষকে জড়িয়ে পারস্ত গালিচার মত বর্ণখচিত যে অপূর্ব্ব আবেষ্টনের আলো সৃষ্টি করেছে তাকে অনুভব করতে হলে ভগবানের অসীম প্রসাদ বলে শিরোধার্য্য করতে হ'বে সৌন্দর্য্যের চিরজাগ্রত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির ব্যঞ্জনাকে, স্বীকার করতে হবে নতশিরে ব্যাপ্তিকে অখণ্ড রূপবাহুল্যের দিকে দেখে,—তবেই সমস্ত সাধনা সার্থক হবে।

রজনী গন্ধা

হুমায়ুন কবির

তারকার স্নিগ্ধ আলো, আঁধারের করুণ পরশ
প্রথম প্রণয়মুগ্ধ মলয়ের কোমল চুম্বন,
তোমার হৃদয়দ্বারে ভীরু মৃদু প্রাণের গুঞ্জন,—
তারি মাঝে ফুটিয়াছ ধরণীর প্রাণের হরষ।
তোমার কিশোরী হিয়া কত স্বপ্ন বরষ বরষ
রচিয়াছে হিয়াতলে—কামনার স্বরগভুবন,
আকাঙ্ক্ষা আবেগমেশা চিত্ত ভরি' গন্ধ উন্মাদন,
ক্ষণিকের পরশনে তনু তব উন্মন বিবশ।

আঁধারের চিত্রপটে শুভ্র পূত আলোকের রেখা
গন্ধভারে অবসন্ন আঁখিপাতা কঠিন প্রয়াসে
ক্ষীণতন্বী বালা সম রাখিয়াছে মেলি সকরুণ,
প্রিয়হারা সারা নিশি বিরহিণী রহিয়াছ একা,
স্মৃতির সৌরভসম গন্ধ ভাসে নিশীথ বাতাসে,
হৃদয়ে তুলিয়া লয় প্রীতি ভরে প্রভাত অরুণ।
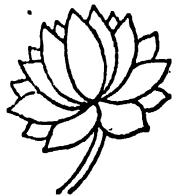
আমার দেশ

—শ্রীবিমল সেন

এক

সবে সন্ধ্যা হয়েছে। দারুণ শীত; লোকের হাত পা যেন অবশ হয়ে আসে। পথের লোকেরা কোন মতে হাত পা, কান, মাথা, যথাসম্ভব ঢেকে নিয়ে হি হি করতে করতে যে যার গন্তব্যপথে দ্রুতপদে চ'লে যাচ্ছে। রাস্তা ঘাট সব যেন ধোঁয়ায় ঢাকা।

ছেঁড়া কম্বলটা সর্ব্বাঙ্গে ভাল ক'রে জড়িয়ে ধীরে ধীরে ভবানীপুরের একটা পার্কের ভিতর প্রবেশ করলুম।

মস্তবড় পার্ক। তারি এক অন্ধকার কোণে অতি সন্তর্পণে গিয়ে বসলুম। কোণ্‌টা আমার অনেক দিনের চেনা। কতদিন—কত সুখঃদুঃখের বোঝা নিয়ে এখানে ব'সে ব'সে সময় কাটিয়েছি। হায় সেদিন!

সে সব কথা আজ আর ভেবে লাভ নেই। সুখ-দুঃখের বাহিরেই যে আজ এসে দাঁড়িয়েছি। আজ মনে কোন ক্ষোভ নেই, কারো প্রতি কোন অভিমান নেই, ব্যথা নেই—আছে শুধু একটিমাত্র কথা—

কম্বলের নীচে হাতের শিশিটা শক্ত ক'রে ধরলুম।

অদূরে বেঞ্চির উপর একটা লোক অনেকগুলো জামা কাপড় নিয়ে ব'সে ব'সে কি যেন লিখছিল। দেখে ফেলে নি তো?

কিন্তু সে লিখেই চলেছে।

লোকটির দিকে পিছন ফিরে কম্বলটা ভাল ক'রে গায়ে জড়ালুম। অন্ধকারে আমার আর কিছুই দেখা যায় না। আর কেন? এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার আমার হুকুম নেই। তাই আজ সব দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে এখান থেকে বিদায় নেব। আঃ, মাগো, এই ভবানীপুর—একে যেন মায়ের মতই ভাল লেগেছে। কোথা থেকে দুটি অদৃশ্য স্নেহমাখা হাত যেন আমায় বুকে টেনে নিতে চেয়েছে।

চোখের সামনে সব যেন ঝাপ্‌সা হয়ে আসতে লাগল। চোখ বুজে শিশিটার ছিপি খুলে মুখের কাছে তুললুম। আমার সোনার ভবানীপুর! আসি!

হঠাৎ শিশি-সমেত হাতটা কে যেন বিপুল শক্তিতে চেপে একেবারে পিছন দিকে ঘুরিয়ে দিলে! ভয়ানক চম্‌কে পিছন ফিরেই দেখি সেই লোকটা। সে যে কখন উঠে এসেছে চিন্তার মাঝে ডুবে আমি তা' টের পাই নি। ভাবনায়, ভয়ে, অনাহারে, তখন মরিয়া হয়ে উঠেছিলুম। সমস্ত শক্তি এক ক'রে তার হাতটা চেপে ধ'রে শিশি ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলুম। পাগলের মত বল্‌লুম—খবরদার, ছেড়ে দাও বলছি—ভাল হবে না।

কিন্তু লোকটা এক ঝট্‌কায় শিশিটা কেড়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিলে।

আমি বাঘের মত তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে প'ড়ে টুঁটি টিপে ধ'রে বল্‌লুম—পুলিশের লোক বুঝি? দাঁড়াও!

লোকটা এক হাতে আমাকে ঠেকিয়ে বল্‌লে—আঃ থামো, থামো, আমি পুলিশের লোক নই। এসো আলোতে।

আমাকে হাত ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে সে সেই বেঞ্চিতে নিয়ে গিয়ে বসাল।

শরীর থর্ থর্ ক'রে কাঁপছিল। ভগবান, একি হল! আজই ত সব ল্যাঠা চুকে যেত, আবার কেন এ বাধা?

লোকটিকে একবার ভাল ক'রে দেখে নিলুম। বয়স প্রায় পঞ্চাশ, কালো, কাঠঃখোট্টা গোছের চেহারা। সারা মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফ আর দাড়ী গজিয়েছে। একটা অপরিষ্কার ফতুয়া তার গায়ে—পায়ে জুতো নেই। তার চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত;—এক মুহূর্ত্তও সে দিকে চেয়ে থাকা যায় না। তার সেই প্রখর দৃষ্টি দিয়ে সে যেন আমার অন্তরের সব-কিছু দেখে ফেলছিল।

আমার দেশ

শ্রীবিমল সেন

লোকটাও আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বল্‌লে—কী সর্ব্বনাশ তুমি করতে যাচ্ছিলে বল দিকি? তোমার মত একজন ইয়ংম্যান, হাত আছে, পা আছে—ছি, ছি, ছি—একটু লজ্জা করল না? কেন, ফলেন্ ইন্ লভ্?—ডিস্‌এ্যাপয়েন্টেড্? না আর কিছু?

বল্‌লুম—কি যে তা' শুনে আপনার লাভ নেই!

—বটে! তবে মাথারই কিছু গোল আছে!

বল্‌লুম—আমার কষ্ট আপনি বুঝতে পারবেন না মশাই। আমাকে যেতে দিন এখন।

লোকটা আমার হাত চেপে ধ'রে দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌লে—কোথাও যেতে পারবে না। বল কি হয়েছে!

তার সেই জ্বলন্ত দৃষ্টি! কথাগুলো যেন আদেশ, না মেনে উপায় নেই। অগত্যা বল্‌লুম—বিষ খেয়ে মর্‌তে গিয়েছিলুম সাধে? আমার মত লোকের যে বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা। আপনার বল্‌তে কেউ নেই। এক কাকা ছিলেন—তাঁরই পয়সায় কোন প্রকারে এখানে পড়াশুনা করছিলুম, এবার বি, এ দেবার কথা—তা' তিনিও সেদিন মারা গেছেন। তারপর থেকেই পয়সার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। চাকরি বাকরিও জুটল না, টিউশানিও পেলুম না। দুদিন হ'ল মেস থেকে সকলে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে। এ দুদিন পেটে অন্ন পড়েনি!

দুদিন পুর্ব্বেকার সেই দৃশ্যটা স্মরণ ক'রে চোখে জল এল। আর কিছু বল্‌তে পারলুম না।

লোকটা বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লে—শুধু এই জন্যে? কেউ যার নেই—দুনিয়ায় বেঁচে থাকৃতে তারই যে সব চেয়ে বেশি সুবিধে!

আমি চুপ ক'রে রইলুম।

—তোমরা যুবক, তোমরা দেশের নূতন যুগের অগ্রদূত, কোথায় দেশের যত পঙ্গু অসাড় জিনিসগুলোকে ভেঙ্গেচুরে সেখানে তোমাদের আসন প্রতিষ্ঠিত ক'রে নেবে—তা' না বিষ খেয়ে মরতে বসেছিলে? এই দুনিয়ায় তোমার কত কাজ প'ড়ে আছে তার খোঁজ রাখ কিছু? জান, আজ খেতে পাচ্ছ না, কালই তুমি দশটা লোকের উপকার ক'রে বেড়াতে পার?

সব দিকেই হতাশ হয়েছে যে, তার কাছে এসব কথার কোন মূল্যই নেই। নীরব হ'য়ে রইলুম।

লোকটা বল্‌লে—থাক্, এখন এসব কথা তোমার ভাল লাগবেনা। এটা সর্ব্বদা মনে রেখো পৃথিবীতে যখন জন্মেছ, তখন তোমার এখানে বেঁচে থাকবার অধিকার আছে। বেঁচে থাকবার জন্যে যে-কোনো বাধা তোমার সামনে পড়বে, তাকে বিনা বিচারে চূর্ণ ক'রে দিয়ে যাবে—এই হচ্ছে নিয়ম, এটা মেনে চোলো।

তার এই গুরুগম্ভীর স্বরের ভিতর একটা তেজ ছিল। কান খাড়া ক'রে শুনতে লাগলুম।

—লেখাপড়া যা শিখেছ তাই-ই যথেষ্ট হয়েছে। তার চেয়ে আমি এখন যদি তোমায় কোন কাজের ভার দিই তুমি করতে রাজি আছ?

বল্লুম—কাজ পেলে কেন করব না!

—যে-রকম কাজই হোক? মুটেগিরি করতে পারবে?

হতাশ হলুম। সেই একঘেয়ে কথা। বল্লুম—ও কথা সবাই ব'লে থাকেন বটে, কিন্তু মুটেগিরি কি ক'রে—

লোকটা বাধা দিয়ে বিরক্ত ভাবে বল্‌লে—আঃ, এখনও তোমার ঐ লেখা-পড়ার গর্ব্ব? বল্‌তে লজ্জা হ'ল না?

একটু থেমে নিজেকে দেখিয়ে বল্‌লে—এই যে লোকটাকে দেখছ, একদিন এরও তোমার মত অবস্থা হয়েছিল। অথচ এ অধম এম,এ পাশ ক'রে নাম কিনেছিল। কিন্তু উপযুক্ত চাকরি আমার মেলেনি—না খেয়ে শুকিয়ে মরি আর কি! অবশেষে এখন আমি আমার পথ খুঁজে পেয়েছি। বল, রাজি আছ আমার সঙ্গে এমন কোন কাজ করতে?

বিস্মিত হয়ে চাইলুম। এম, এ পাস? লোকটির কথায় কেমন যেন একটু আশাও পেলুম। সত্যিই তো—মুটেগিরি কেন পারব না? আজ কেনই বা আমার বিদ্যার গর্ব্ব, কেনই বা আমার জাত্যাভিমান। বল্লুম—হাঁ, আমি রাজি আছি!

—বেশ, এসো তা'হলে আমার সঙ্গে। এখনও তোমার বয়েস কম। দেশটাকে একটু বুঝতে শেখ। তোমার চেয়ে অনেক বেশি দুঃখ-কষ্টের ভিতরে থেকেও যারা বেঁচে

আছে কি ভাবে তারা দিন গুজ্‌রান করে সে সব ভাল ক'রে দেখে নাও ; বুঝবে।

দুই

ভদ্রলোকটি সেই বেঞ্চির উপর রাশিকৃত ছোট বড় নতুন ফ্রক, পেনি, সেমিজ, হাফ্‌প্যান্ট, রুমাল প্রভৃতি একটা বোঁচ্‌কায় বেঁধে উঠে দাঁড়ালেন। বল্‌লেন—শুধু দেখে যাও আমি কি করি। তোমার ভার আজ থেকে আমি নিলুম।

বোঁচ্‌কা কাঁধে ক'রে লোকটি পার্ক থেকে বেরিয়ে জগুবাবুর বাজারের মোড়ে এসে দাঁড়ালেন। সে মোড়ে লোকজনের ভিড় সব সময়েই একটু বেশি। ভদ্রলোকটি ফুটপাথের এক পার্শ্বে বোঁচ্‌কাটা খুলে জামা-কাপড়গুলো সাজিয়ে রাখলেন, তারপর বেছে বেছে একটা ভাল পেনি বার ক'রে দুই হাতে তুলে ধ'রে ঘুরে ঘুরে চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগলেন—আসুন, এক টাকা ক'রে ছেলে-মেয়েদের পেনি! একটাকা, একটাকা, একটাকা ক'রে ভাল পেনি!

আমি বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

একজন এসে পেনিটা দু'বার নেড়ে চেড়ে দেখে আবার নিঃশব্দে ফিরে গেল। কেউ এসে বল্‌লে—আট আনায় হবে? ব'লেই আর দ্বিরুক্তি না ক'রে ফিরে দাঁড়াল। শেষে একজন এসে ঐ একটাকা দিয়েই পেনিটা কিনে নিয়ে গেল।

লোকটি এবার একটা ফ্রক তুলে ধ'রে বলতে লাগলেন—ফ্রক চাই, মেয়েদের ভাল ফ্রক, পাঁচ সিকে। চ'লে আসুন মশাই; পাঁচ সিকে ক'রে—

কিছুক্ষণ পরে ফ্রকটাও বিক্রী হয়ে গেল।

তারপর প্রায় তিন চার ঘণ্টা ধ'রে অবিশ্রান্ত চীৎকার ক'রে ক'রে তাঁর সমস্ত জিনিষ শেষ হ'ল। বোঁচকার কাপড়টা তুলে ঝেড়ে কাঁধের উপর ফেলে আমার কাছে এসে বল্‌লেন—উঠে এসো, আমার আরও একটু কাজ বাকি আছে।

তাঁর সঙ্গ নিলুম। কিছুক্ষণ হেঁটে ভদ্রলোক একটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গলির ভিতরে প্রবেশ করলেন। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে। দূষিত গন্ধে নাক জ্বালা করতে থাকে। একটি পুরোনো একতলা বাড়ীর সামনে এসে ভদ্রলোক কড়া নাড়লেন। অবিলম্বে একটি ছোট মেয়ে বেরিয়ে এল।

—জ্যাঠামশাই? আসুন।

তিনি আমাকে আসতে ব'লে ভিতরে প্রবেশ ক'রেই হেঁকে বল্‌লেন—আশা কই গো! এদিকে এসো মা, আজ একটু দেরী হয়ে গেল।

ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে উত্তর এল—যাই জ্যাঠামশাই!

একটি বিধবা যুবতী এসে দাঁড়াল। পরণে অত্যন্ত ময়লা, এবং ততোধিক জীর্ণ, একখানি পাড়হীন কাপড়। মুখটি শুষ্ক, শ্রীহীন—তার সারা দেহে যেন দারিদ্র্য ফুটে বেরুচ্ছে। আমাকে দেখে নিতান্ত সঙ্কুচিত হয়ে থম্‌কে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক বললেন—ওকে লজ্জা করতে হবে না, মা, এসো এখানে।

তারপর পকেট থেকে পয়সা, টাকা গুণে বার ক'রে মনে মনে হিসেব করতে করতে বললেন—তোমার ছিল দুটো পেনি, আর চারটে রুমাল; না মা? একটা পেনি একটাকা, আর আর-একটা পাঁচ সিকে হয়েছে। রুমাল গুলো দশ পয়সা ক'রে ছেড়েছি। এই নাও।

ব'লে বিক্রয়লব্ধ অর্থ সেই তরুণীর হাতে দিলেন। টাকা হাতে পেয়ে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ভদ্রলোক বল্‌লেন—নতুন কাপড় আজ আর আনলুম না, মা। সকালে বলছিলে, হাতে খরচের টাকা নেই, এই দিয়ে আপাতত চালাও। তোমার আরও দুটো পেনি আমার বাড়ীতে রয়েছে। সে দুটো কাল বিক্রী করে নতুন কাপড় কিনে নিয়ে যাব।

তরুণীটি একটু ঘাড় নেড়ে যেন ছোট্ট খুকিটির মত আবদার ক'রে বল্‌লে—তাহলে এবেলা আপনি এখানে খেয়ে যান জ্যাঠামশাই! আপনি অন্য সব বাড়ীতে খান, কিন্তু আমাদের এখানে একদিনও খেতে চান না কেন?

তার ঠোঁট ফুলে উঠল। ভদ্রলোকটি স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললেন—এই দেখ পাগলি বলে কি! তোদের এখানে যে কতদিন খেয়েছি রে বেটি! আজ আর থাক মা, কাল না হয় দেখা যাবে।

শ্রীবিমল সেন

তরুণী আর কিছু না বলে চা'র আনা পয়সা ভদ্রলোকটির হাতে দিল ;—ভদ্রলোকটি পকেটে রেখে উঠে দাঁড়ালেন।

তারপর অনেক অলি-গলিতে ঘুরে, ভাঙ্গা পুরোন আরও তিন চারটে বাড়ীতে গিয়ে ভদ্রলোক ঐভাবে কয়েক জনের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিলেন। প্রত্যেক বাড়ী থেকেই তাঁর খাবার নিমন্ত্রণ হল। তিনিও প্রত্যেক স্থানে ঐ ভাবে আপত্তি করলেন।

বড় রাস্তায় আবার যখন এসে দাঁড়ালুম, প্রায় দশটা বেজেছে। ছেঁড়া জামা আর কম্বলের ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা এসে গায়ে যেন ছুঁচের মত বিঁধছে। হাত পা বরফ হয়ে আসতে চায়।

রাস্তায় এসে ভদ্রলোক বললেন—আমার এই সব কাজ বড় বিসদৃশ ঠেকছে, কেমন, তাই না ? কিন্তু আমার সারা দিনের আরও হাজার রকমের কাজের ভিতর এই যে সামান্য কাজটুকু দেখলে, এটা কিসে মন্দ ? এম, এ ডিগ্রি আমায় খেতে দেয় নি—এ আমি কখনও ভুলব না! দেখলে তো, এক বাড়ীতে তিনটি বিধবা, আর এক বাড়ীতে চারটি কালো কালো মেয়ে—বিয়ে হয়না, অবস্থা খারাপ। ঐ বাড়ীতে শুধু ঐ এক বুড়ো ত্রিশটি টাকা রোজগার করে অথচ ঘরে দু'টি পোষ্য—এক বেলা খেয়ে কাটায়। এঁদের বাড়ীর মেয়েরা দুটো চারটে যা পারেন ফ্রক্ পেনি তৈরি ক'রে দেন, আর আমি সেগুলো বিক্রি ক'রে দিই। এতে অন্তত দুবেলা দুটো ডাল ভাতের ভাবনা এদের দূর হয়েছে। নিজেরও কিছু লাভ হয়। তা'ছাড়া খাবার ভাবনা ত' আমার নেই—সে'ত দেখতেই পেলে। পেটের ভাত মেলে না, অথচ বাইরে ভণ্ডামী ক'রে বেড়াবার চেয়ে এ কি মন্দ ?

কোন জবাব দিলুম না। মন আমার শ্রদ্ধায় ভ'রে এল।

অনেক ঘুরে ঘুরে, হাজরা রোডের কাছে জঙ্গলে ঢাকা একটা খড়ো ঘরের সামনে এসে ভদ্রলোক দাঁড়ালেন। বল্‌লেন—ইটি হচ্ছে আমার প্রাসাদ! এইখানে আজ কতদিন হল বাস করছি!

ঘরে আসবাব-পত্র বিশেষ কিছুই নেই। এক কোণে কতকগুলো ধোয়া বাসন উপুড় করা রয়েছে। আর এক কোণে মেঝেতে বিছানা পাতা। পাশে একটা বড় ষ্টীল-ট্রাঙ্ক—তার উপর খানকয়েক বই কাগজ দিয়ে ঢাকা। এক কোণে দড়িতে খানকয়েক জামাকাপড় আর গামছা ঝুলছে।

মেঝেতে মাদুর পেতে আমাকে বসতে ব'লে তিনি বল্‌লেন—আজ থেকে তুমি আমার এখানেই থাকবে। ব্যর্থ ভেবে জীবনটা বিসর্জ্জন দিতে বসেছিলে—কিন্তু দেখলে তো, তোমার এখানে কত কাজ; তোমার মত লোকেরই এখানে সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন।

বললুম—কিন্তু, ভগবানই যেন আমার প্রতি বিমুখ। যাতে হাত দিই—তাই যে বিফল হয়ে যায়।

ভদ্রলোক হঠাৎ বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লেন।—ভগবান, ভগবান, ভগবান!—সব তাতে ভগবানকে ডেকে এনো না! ঐ ক'রেই তো আজ এই অবস্থা হয়েছে। ও দুর্ব্বলতাটা ছেড়ে দাও; নিজের উপর একটা মস্ত-বড় বিশ্বাস রাখতে চেষ্টা কর!

একটু থেমে তিনি বল্‌লেন—আজ থেকে শুধু দুটি জিনিষকে তুমি সবচেয়ে বড় ক'রে দেখো। একটি হচ্ছে তুমি নিজে—দ্বিতীয়টি হচ্ছে তোমার দেশ। এদের চেয়ে বড় আর তোমার কোনো দেবতা নেই, কোন বড় সাধনা নেই, কোন চিন্তা নেই—এইটুকু মনে রেখো।

তাঁর দুই চোখে যেন একটা জ্যোতি ঠিকরে বেরুতে লাগল! লোকটি অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ। বিস্মিতনেত্রে চেয়ে রইলুম।

হঠাৎ তিনি হেসে বললেন—দুদিন খাওনি—তার উপর ঘুরলেও ঢের; এবার একটু দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার দরকার। যাও ঐ ধামাটা তোলগে। ঘরের কোণে উপুড়-করা একটা ধামা ছিল। সেটা তুললই দেখি দুটো কাগজের ঠোঙা—একটাতে মুড়ি আর একটাতে চিড়ে—পাশেই একটা ঝুনো নারকোল। ভদ্রলোক আদেশের স্বরে বললেন—সব দুভাগ করো—একভাগে দশআনা, এক ভাগে ছআনা—আজ বড় ভাগটা তোমার—কাল থেকে কিন্তু সমান সমান।

যথারীতি তাঁর আদেশ পালন করা গেল। বাঁচলুম।

ক্ষুধা দূর ক'রে তত নয়, যত—বাঁচবার উৎসাহ পেয়ে। সেদিন তাঁর কথাবার্ত্তা মনে এক নতুন উৎসাহ এনে দিলে। মনে হল, সত্যিই তো আমি সুস্থ, সবল, তরুণ যুবক,—পৃথিবীর বুকে আমার কত কাজ। ভাবলুম—এই ভাল হ'ল। আজ এই এক নতুন পথে জীবনতরী ভাসিয়ে দিই। মনে হল, আমি বাঁচব, বেঁচে সুখে থাকব, দশজনকে সুখী করব, এতে যে আমার অধিকার আছে।

তিন

পরদিন সকালে আনন্দবাবুর ডাকে উঠে বসলুম। আমার নতুন জীবনের আশার বার্ত্তা ব'য়ে নিয়ে সূর্য্যদেব জানালায় এসে উঁকি মারলেন।

আনন্দবাবু এক টুক্‌রো কাগজ আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন—এই নাও সুরেশ, এই কটা বাড়ীতে গিয়ে কাগজখানা দেখিও—তাঁরা যে যা দেন, সব কাপড় চোপড় এখানে এনে একটা লিষ্ট্ ক'রে রেখো। কে কি দিলেন—তার হিসেবও যেন থাকে। আজ এবেলা শুধু তোমার এই কাজ।

একটু থেমে বল্‌লেন—আর আমি কি কাজে বেরব, শুনবে?

বলেই বেড়া-ঘেরা ছোট এক কোণ দেখিয়ে দিলেন। চেয়ে দেখলুম, সেই কোণে একটা রিক্‌স, কাপড়ে ঢাকা রয়েছে। কোন অর্থ না বুঝতে পেরে তাঁর দিকে চাইতেই তিনি আমায় বল্‌লেন—যেদিন আমার এদিককার কোন কাজ থাকে না—রোজ তো আর কেউ কাপড় তৈরী ক'রে দিতে পারেন না—সেদিন ঐ হচ্ছে আমার জীবিকা অর্জ্জনের উপায়। ঐ নিয়ে পথে পথে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াই।

নিতান্ত বিস্মিত হ'য়ে চেয়ে রইলুম। এম, এ পাশ রিক্‌সওলা? এমনটি কখনও শুনিনি, ধারণাও করিনি। ভাবলুম,—কিন্তু, এই কি ভাল? এত লেখা-পড়া করা, সে কি রিক্‌স টেনে বেড়াবার জন্যে? এ কি দেশের দুর্ভাগ্যের পরিচয় নয়?—কিন্তু আনন্দবাবু আমার মনের এই অব্যক্ত প্রশ্নের জবাব দিলেন। বল্‌লেন—লোকে বলে, বি,এ পাশ করে অমুক লোকটা ট্রামের কণ্ডাক্টরি করতে গেল?—আমি বলি, দেশের ছেলেদের দরকার হ'লে মুটেগিরি পর্য্যন্ত করতে শিখে রাখা উচিত। আর, একদিন তাই করতেও হবে, দেখে নিও।

দড়ির উপর থেকে একটা ময়লা আটহাতি ধুতি প'রে, মাথায় গামছা বেঁধে তিনি রিক্‌স নিয়ে যখন বেরিয়ে পড়লেন, আমি শুধু বিস্মিত স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলুম। দুনিয়ায় এমন লোকও আছে!

মনে একটা বিষম খট্‌কা লেগেছিল। তবু নিজের দিকে চেয়ে মনে হ'ল, সত্যিই তো, আমার মত অনাহারী, বেকার কত বি,এ, এম,এ পথে পথে গড়াগড়ি যাচ্ছে। সত্যিই তো তারা পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে পারে না। তবে কিসের জন্যে এত লেখা-পড়া, কিসের জন্যে এত অর্থব্যয়?

আন্দোলিত মনে আনন্দবাবুর কাজ সেরে, এক গাদা জামা-কাপড় নিয়ে যখন বাড়ী ফিরলুম—তখন বেলা দেড়টা। এঁদেরই একজনের বাড়ীতে চারটি ভাত খেয়ে নিয়েছিলুম। মন আমার একটা অনাবিল আনন্দে ভ'রে উঠেছিল। কাজ করছি, পরের কাজ—যাতে দশজনের উপকার হবে!

চার

সন্ধ্যা হ'ল। হাতের কাজ ফুরিয়েছিল। এতক্ষণ নীরবে ব'সে ব'সে আকাশ-পাতাল ভাবছিলুম। ভেবে ভেবে মস্তিষ্ক যেন ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে।

সামনের সেই ষ্টীলট্রাঙ্কটার উপর কতকগুলো বই সাজান ছিল। কাছে গিয়ে সেগুলো নাড়াচাড়া করতেই একখানা অনেকদিন পূর্ব্বেকার ডায়েরি চোখে পড়ল। উপরে আনন্দবাবুর নাম লেখা। দেখেই একটুখানি প'ড়ে দেখবার জন্যে আমার মনে একটা অদম্য কৌতূহল জেগে উঠ্‌ল। যে লোক প্রথম থেকে আমার কাছে মস্তবড় হেঁয়ালী হ'য়ে আছে, তার সম্বন্ধে যদি কিছু জানতে পারি।

পাতা ওল্টাতে প্রথমেই নজর পড়ল—'বিবাহ-পর্ব্ব'। একবার একটু ইতস্ততঃ করলাম, কিন্তু শেষে কৌতূহলই জয়ী হল। পড়তে লাগলুম—

—"সমস্ত দিন ধ'রে চারটি ছেলে পড়িয়ে পথে পথে ঘুরে রাত্রে যখন মেসে ফিরি, বিছানায় শ্রান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে

শ্রীবিমল সেন

ভাবি জীবনের অর্দ্ধেক উৎসাহ, আর বিপুল অর্থব্যয় ক'রে যে এম,এ পাশ করলুম, সে কি শুধু ছেলে পড়িয়ে, ছুবেলা ছুটো খেয়ে বেঁচে থাকবার জন্মে? মাঝে মাঝে মনে হয়—দূর, সব ছেড়ে দি। কিন্তু, খাব কি? বাঁচব কি ক'রে? তাইতো!

এমনি সময়ে একদিন আমার এক ছাত্রের জন্য বাড়ী খুঁজবার ভার আমার উপর পড়ল। তাদের সময়ও নেই, লোকও নেই, বাড়ী বদ্‌লাতে চায়—তাই আমাকে অনুরোধ করলে এই ভবানীপুরেরই কোথাও একটা বাড়ী খুঁজে দিতে।

যেটুকু সময় পথে পথে থাকি 'বাড়ীভাড়া', 'To Let' গুলোতে নজর রাখি। একদিন ছেলে পড়িয়ে বাড়ী ফিরছি; রাত হয়েছে। আলোর থামে একটা বাড়ীর বিজ্ঞাপন দেখলুম। সা'নগরে একটা গলির মধ্যে সে বাড়ী। এই পথে অম্‌নি বাড়ীটা দেখেই যাই ভেবে ঠিকানা অনুযায়ী সা'নগরে এলুম। দেখলুম, অন্যান্য বাড়ীগুলোর চেয়ে একটু দূরে, গাছ-পালায় ঢাকা একটা ছোট দোতালা বাড়ী। উপরের ঘরে আলো জ্বলছে।

রাস্তার সাম্‌নেই একটা দরজা। দেখে মনে হল ওটা বাড়ীর খিড়কি দরজা। তবু রাস্তার উপর ব'লে এগিয়ে গিয়ে কড়া নাড়লুম।

কোন সাড়া পেলুম না।

আবার বার ছুই কড়া নাড়তে একটি বুড়ী ধীরে ধীরে দরজা খুলে এসে দাঁড়াল। প্রথমেই যতদূর দৃষ্টি যায়, রাস্তার ছুইদিক দেখে নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বল্‌লে—এসো বাবু।

ভিতরে প্রবেশ করলুম। আমাকে এক ঘরে বসতে ব'লে বুড়ী ভিতরে চ'লে গেল। ঘরের এক কোণে একটা হ্যারিকেন সর্ব্বাঙ্গে কালি মেখে মিটমিট্‌ ক'রে জ্বলছে। তিনখানা চেয়ার, একটা পুরোনো টেবিল, আর ছুটো আলমারিতে পুরোনো কতকগুলো বই—এই ছিল ঘরের আসবাব।

মিনিট পনের পরেই বুড়ী আবার ফিরে এল। তেমনি চাপা কণ্ঠে বল্‌লে—এসো বাবু।

আবার উঠে তার পিছু নিলুম। ভিতরে ও-পাশের বারান্দায় একটা আলোর সাম্‌নে বঁটি পেতে একটি গৌরবর্ণা স্ত্রীলোক ব'সে কুটনো কুটছিলেন। তাঁর নিকটেই এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে গামছায় মুখ মুছছিলেন। ছুজনে একসঙ্গে আমার দিকে একটু চেয়ে মুখ ফেরালেন। বুড়ী আমাকে বল্‌লে—ঐ যে বাবু, ঐ ঘরে যাও।

ঘরে প্রবেশ করলুম। সেখানেও একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। সামনেই খাটে ধবধবে বিছানা পাতা। নীচে মেঝেতে মাদুর পেতে, পুরোনো একটা হারমোনিয়ম সামনে নিয়ে একটি উনিশ কুড়ি বছর বয়সের মেয়ে ব'সে আছে। তার গায়ের রঙ কালো। আমাকে দেখে সে হেঁট মুখে ব'সে রইল।

ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত ঠেক্‌ল। এর সঙ্গে কথা কইতে হবে? ঘরে আর কেউ আছে কিনা দেখবার জন্য চারিদিক চেয়ে দেখি কেউ নেই।

মেয়েটি হারমোনিয়মের উপর হাত রেখে হেঁটমুখে কুণ্ঠিত ভাবে ধীরে ধীরে বল্‌লে—আজকে আমার বড্ড অসুখ করেছে। গান গাইতে বড় কষ্ট হবে।

আমি হতভম্বের মত চেয়ে রইলুম। গান? মনের মধ্যে একটা বিশ্রী সন্দেহ উঁকি মেরে গেল। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ!

কিন্তু চেয়ে দেখলুম, ঘরের ভিতর সাধারণ গৃহস্থ বাড়ীর মত অগোছাল ভাবে হাজার রকমের জিনিষ পত্র; ঘরের দেওয়ালে নানান দেবদেবীর ছবি। দেখলুম মেয়েটি যেন লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছে—চটুল চাহনি নেই, নির্লজ্জ হাসি নেই।

নিতান্ত বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লুম—গান? গান কি হবে?

মেয়েটি এবার চোখ তুলে চাইলে। বড় বড় সুন্দর চোখ ছুটি! মাথা নত ক'রে বল্‌লে—তবে?

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা বাহির থেকে দড়াম্‌ ক'রে বন্ধ হ'য়ে গেল। আরও বিস্মিত হলুম। বল্‌লুম—এ সবের মানে কি?—এ বাড়ীর কর্ত্তা কোথায়?

মেয়েটি চঞ্চল হ'য়ে উঠল। চোখ তুলে হঠাৎ কাতর ভাবে বল্‌লে—ক্ষমা করুন, কর্ত্তাকে আর ডাকবেন না। আমি গাইব না—এমন কথা তো বলিনি। জ্বর হয়েছে, বিছানায় শুয়ে ছিলুম, তাই বল্‌ছিলুম একটা গান শুনে

আজ আমাকে মাপ করুন। আমি সত্যিই মাথা তুলতে পারছি নে।

তার চোখ দিয়ে বড় বড় অশ্রুবিন্দু মা'টিতে ঝ'রে পড়তে লাগল।

আমি বললুম—আমি তো তোমাকে গান গাইতে বলিনি!—এ বাড়ী ভাড়া দেবার কথা আছে না?

—হ্যাঁ।

—সেই জন্যেই তো এসেছিলুম। বাড়ীর কর্ত্তা কে?

—ঐ যে বাইরে আছেন।

—কি করেন তিনি?

—আগে আপিসে কাজ করতেন। এখন চাকরি নেই।

তারপর তার মুখ থেকে যে-সব কথা শুনলুম, তা আমার ধারণার অতীত ব্যাপার! কখনও এমন হ'তে পারে ব'লে আমার বিশ্বাস ছিল না।

কর্ত্তার চাকরি নেই, অনেকদিন। সংসার চলে না, দুবেলা ভাত মেলে না। অন্য কোথাও কাজ পান নি। মেয়েটি এঁদের এক আত্মীয়ের মেয়ে—তার আপনার বলতে কেউ নেই—তাই এদের সংসারে তার আশ্রয় মিলেছিল। গান গাইতে জানে। এঁদের অর্থ আর মেয়ের রূপের অভাবে আজও তার বিয়ে হয়নি।

এমনি ক'রে দিন যাচ্ছিল। এমন সময়ে সন্ধ্যার আঁধারে অত্যন্ত গোপনে কর্ত্তা এক ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছিলেন। সে এসে গান শুনে দুটো টাকা দিয়ে গিয়েছিল। সেদিন থেকে রোজই দুই একজন ক'রে লোক, দূর পাড়া থেকে চুপি চুপি আসে; মেয়েটিকে তাদের গান শুনিয়ে সন্তুষ্ট করতে হয়। তারপর, তারা দুটো ক'রে টাকা দিয়ে তেমনি চুপি চুপি ঐ খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়?—এই ভাবে দিন চলছে। অসুখ হোক, বিসুখ হোক, সুবিধা অসুবিধা যাই থাক্, ঐ সব অপরিচিত লোকের পাপ চখের দৃষ্টির সামনে তাকে আসতেই হয়! নইলে সেদিন এ বাড়ীতে তার আহার বন্ধ, এবং আরও নানা রকমের অত্যাচার সহ্য করতে হয়। বাড়ীর লোকে সর্ব্বদা তাকে কড়া পাহারায় রাখে, তাই অনেকদিন চেষ্টা ক'রেও সে বিষ খেয়ে না ম'রে আজও বেঁচে আছে।

এই ব'লে সে অঝোরে কাঁদতে লাগল। শুনে আরও বিস্মিত হলুম যে এরা আমারি স্বজাতি—বাহিরে ভদ্রলোক ব'লে পরিচিত।

রাগে ঘৃণায় আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল। ছি, ছি, এমনও কখন হয়? ভদ্রতার আবরণের আড়ালে পৃথিবীতে কত বীভৎস কাণ্ড, কত পৈশাচিক তাণ্ডবলীলাই না হ'য়ে থাকে। এই ব্যাপারটা লোকের কাছে বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, আমি নিজে অন্যের মুখে শুনলে হয়ত তাকে মেরেই বসতুম! লজ্জায় মাথা নুয়ে এল।

কাঁপতে কাঁপতে বাইরে বেরিয়ে এলুম। বারান্দায় বঁটি পেতে সেই স্ত্রীলোকটা একটা শুক্‌নো ঘেয়ো বেগুনের পোকা ফেলছিল। অদূরে দাঁড়িয়ে সেই লোকটা একখানা ধবধবে ফর্সা অথচ চতুর্দ্দিকে ছেঁড়া কাপড় নিয়ে অত্যন্ত যত্নের সহিত কায়দা ক'রে পরছিল—যাতে বাইরে ছেঁড়া না দেখা যায়।

আমাকে ঘর থেকে বেরোতে দেখেই স্ত্রীলোকটা বললে—এই যে বাপু, টাকাটা এইখানে রেখে যাও।

মাথার ভিতর যেন আগুন জ্ব'লে উঠল। ছুটে গিয়ে একেবারে লোকটার টুঁটি টিপে ধরলুম। বললুম—শয়তান, তোমার বেঁচে থাকবার সুখ আজ আমি বার ক'রে দিচ্ছি, দাঁড়াও!

লোকটা যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। আমার কাছে এমন ব্যবহার তার পক্ষে বোধহয় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। বললে—কেন, হয়েছে কি? অন্যায় কথা কিছু বলেছে?

তার গলায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে দূরে ফেলে দিলুম। বললুম—কি হয়েছে? ভদ্রলোক হ'য়ে তোমার এই কাজ? আজ তোমাদের ঝাড় সমেৎ থানায় না পাঠাই তো কি বলেছি।

লোকটা ভয় পেল। মুখ গুঁজে বললে—কি কোরব? খেতে পাইনা—

চিৎকার ক'রে বললুম—রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করতে পারো না?

শ্রীবিমল সেন

স্ত্রীলোকটা কি যেন বক্ বক্ করতে লাগল। আর ওদিকে সেই মেয়েটি ভীত দৃষ্টিতে অচল পাষাণ প্রতিমার মত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরের বাতাস আমার কাছে দূষিত ব'লে মনে হচ্ছিল। বল্লুম—আর কিছুক্ষণ সবুর কর—তোমাদের ব্যবস্থা আমি করছি। খবরদার, মনে রেখ—আমার হাত থেকে পালিয়ে নিস্তার পাবে না।

ব'লে বাইরে যাবার জন্যে যেমনি পা বাড়িয়েছি মেয়েটি ছুটে এসে একেবারে উপুড় হ'য়ে পড়ল। কাতরভাবে কেঁদে বল্লে—দয়া করুন, দয়া করুন, এর উপর আবার নতুন কোনো সাজা আমার সত্যিই সইবে না। আপনার—

তার মাথায় হাত রেখে বল্লুম—তোমার কোনো ভয় নেই। কিন্তু ঐ দুটো শয়তানকে তাদের পাপের উপযুক্ত শাস্তি না দিয়ে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। এইভাবে জীবিকা অর্জ্জনের সুখটা ওরা ভাল ক'রে বুঝুক!

আমার কথা শুনে সে আবার আমার পায়ে মাথা খুঁড়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—না, না, ক্ষমা করুন, ওরা বড় অভাগা, ওদের ছেড়ে দিন। আপনার অসীম দয়া, আমাকে দয়া ক'রে কোন অনাথ আশ্রমে রেখে আসুন, তাহলেই ওরা আবার ভাল হবে। না হয় আমায় আপনি এ বাড়ী থেকে যেখানে হোক চ'লে যেতে দিন। আমি ম'রে জুড়োই!

দারুণ ক্রোধের ভিতরেও মেয়েটার কথা শুনে চোখে জল এল। তার জন্যে দুঃখে, সমবেদনায় আমার বুকের একটা কোণ যেন ভেঙ্গে পড়ছিল। হায়রে অভাগিনী নারী! আর কবে, কত যুগে তোমার উপর এই অবাধ অত্যাচারের শেষ হবে? মনে হল, ওদের জেলে দেবার চেয়ে ঐ মেয়েটার কোন উপায় করা আমার পক্ষে বেশি প্রয়োজনীয় কাজ।

হঠাৎ মাথায় একটা খেয়াল এল। বেশি ভেবে চিন্তে কোন কাজ করা আমার স্বভাব নয়। পকেটে মাইনের কিছু টাকা ছিল। একখানা পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে লোকটার মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্লুম—এই নাও, এই নিয়ে আজকের দিনটা সুখে থাক। আমি কাল আবার আসব! কিন্তু খবরদার যদি পালাবার চেষ্টা কর, কিংবা ঐ মেয়েটির উপর কোন রকমের অত্যাচার করতে চেষ্টা কর, তা'হলে তোমাদের আর নিস্তার নেই, মনে রেখ!

মাথা ঘুরছিল। ছুটে বেরিয়ে এলুম। সেদিন সমস্ত রাত আমার ঘুম হয় নি। শুয়ে শুয়ে শুধু এদের কথা ভেবেছি আর মাথার রক্ত গরম হয়ে উঠেছে!

* * *

তারপর, তার প্রায় দিন দশেক পরে সেই মেয়েটিকে বিয়ে ক'রে যেদিন আমার নতুন ভাড়া-করা ছোট্ট বাড়ীতে নিয়ে এলুম, সেদিন মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করছিলুম। যা' সত্যিকার আনন্দ, যার জোড়া বুঝি আর কিছুই নেই। অনেক টাকা ধার ক'রে কলকাতায় একটি বাড়ী ভাড়া করেছিলুম। সেই খানেই বিয়ের জন্যে মেয়ে সমেৎ ওদের নিয়ে এলুম। স্থির হল বিয়ে দিয়েই তারা আবার নিজেদের বাড়ীতে ফিরে যাবে। তাদের ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলুম—তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই থাকবে না; তারা না খেতে পেয়ে মরুক, বাঁচুক, আমি কোন প্রকারেই তাদের আর কিছু সাহায্য করতে পারব না।

কিন্তু অদৃষ্টে সইল না। বৌ আমার সঙ্গে কথা কইতেই সাহস পেত না, আমার মুখের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারত না। মাঝে মাঝে শুধু অবাক হয়ে মুখের পানে চেয়ে থাকত, আর কি যেন ভাবত।

তিনদিন পরে ছেলে পড়িয়ে ফিরে এসে দেখি সে ম'রে জুড়িয়েছে। তার বুকের মধ্যে একখানা চিঠি,—তার সার মর্ম্ম এই—আমি মানুষ নই, দেবতাও বুঝি এত বড় নয়। তাই তার মত ঘৃণিতা নারীকে বিয়ে করতে আমার বাধল না। জীবনে সে অনেক পাপ করেছে, আমার মত দেবতার স্ত্রী হয়ে আমাকেও পাপী ক'রে তুললে তার আর নরকেও স্থান হবে না। তাই এই তিন দিনের পুণ্যস্মৃতি নিয়ে স্বর্গের আশা ক'রেই সে আমাকে ছেড়ে চলল।

পাগল কি আর গাছে ফলে!

অভিনয়ের শেষ যবনিকা পড়ার মত আমার সব খেলা

ফুরিয়ে গেল—এ যেন রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে বিয়ের অভিনয় করলুম। এখন আর কোন বন্ধনই নেই। শুধু মাঝে মাঝে মনে পড়ে একখানি বিষাদমাখা মুখ, আর তার বড় বড় করুণ চোখ দুটি!"

"বিবাহ পর্ব্ব" পড়া শেষ হল! ডায়রির এই কটা পাতা যেন এক নিঃশ্বাসে পড়েছি। আমার বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গেল। আমার বুকের ভিতরকার আরও অনেকখানি স্থান দখল ক'রে নিলেন এই আনন্দবাবু।

ঘরে ব'সে থাকা দায় হল। তাই রাস্তায় বেরিয়ে হাজার রকমের কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চললুম। রাত হয়েছে, রসা রোডে যখন এসেছি, হঠাৎ চোখে পড়ল,—মাথায় গামছা জড়িয়ে, ছেঁড়া নোংরা ফতুয়া গায় দিয়ে, হাঁটু পর্য্যন্ত ছেঁড়া কাপড়টা তুলে, ধূলো পায়ে, শুষ্ক মুখে আনন্দবাবু শূন্য রিক্স-খানা টান্‌তে টান্‌তে আপন মনে একটা হিন্দি গান গাইতে গাইতে বাড়ীর পথে ফিরে চলেছেন।

স্থির হয়ে দাঁড়ালুম। শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুয়ে এল। হাত দুটো এক ক'রে কপালে ঠেকালুম।

বসন্তের দূত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বসন্ত এসেছে, তোর—
অন্তরের দেবতা যে আজো তবু দিল না ক সাড়া!
থাকুক দেবতা মৌন,
তুই হাসি গান নিয়ে আয় আজি বাহিরেতে দাঁড়া।

পারস্য কবি "সাদেব"-এর একটি কবিতা অবলম্বনে।

বুদ্ধের জন্ম

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল

খৃষ্ট-পূর্ব প্রায় ৫৫০ বৎসর পূর্বে ভগবান বুদ্ধ এই ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে হিমালয়ের পাদদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুর মতে তিনি অবতার; সুতরাং গীতায় ভগবানের উক্তি অনুযায়ী, দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্য ভগবান স্বয়ং মানবদেহ ধারণ পূর্বক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধের জন্ম সম্বন্ধে নানাপ্রকার উক্তি আছে। আমরা এখানে তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে যাহা লিখিব তাহার প্রধানতম অংশ 'জাতক' হইতে সংগৃহীত। আর যেটুকু জাতকের সাহায্যেও স্পষ্ট হয় নাই সেখানে আমরা বড় বড় ঐতিহাসিকগণের আশ্রয় গ্রহণ করিব।

বৌদ্ধগ্রন্থ মতে জগতে তিন প্রকারের মহাপরিবর্তন হয়,

১। প্রলয়—'The Cyclic uproar'.

২। বুদ্ধযুগান্তর—'The Buddha uproar'.

৩। শতবার্ষিক রাজযুগান্তর—"The universal Monarch uproar.'

১। প্রতি লক্ষবর্ষ পরে জগতে একবার মহাপ্রলয় ঘটে। পৃথিবী ধূলিময় হয়, বিরাট বিরাট মহাসাগর মরুভূমিতে পরিণত হয়, বৃক্ষলতা পাহাড় পর্ব্বত ভস্ম হইয়া যায়, কেবল ব্রহ্মা জীবিত থাকেন, অন্যান্য দেবতা জনপ্রাণী সমস্তই লয় প্রাপ্ত হয়;—ইহাকেই বলে প্রলয়।

২। প্রতি হাজার বৎসর পরে বুদ্ধযুগান্তর উপস্থিত হয়;—ভগবান বুদ্ধ হাজার বৎসর অন্তর এক একবার জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাকে বুদ্ধ যুগান্তর কহে।

৩। প্রতি একশত বৎসর পরে একবার রাজযুগান্তর হয়। জগতে একজন প্রতাপশালী রাজা অবতীর্ণ হন; তিনি শান্তির সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করেন।

বৌদ্ধশাস্ত্র মতে বুদ্ধ 'তুষিত' নামক স্বর্গে বাস করেন। হাজার বৎসর পরে যখন মানব সমাজে জরা মৃত্যু, রোগ শোক, আত্মকলহ, হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা পরচর্চ্চা প্রভৃতি মানব সমাজের ধ্বংসকারী ব্যাধিগুলি সমাজে দেখা দেয়, তখন বুদ্ধযুগান্তরের সময় হইয়াছে বলিয়া স্বর্গের সমস্ত দেবতাগণ একত্র মিলিত হইয়া ভগবানের (বুদ্ধের) নিকট গিয়া হাজির হন এবং তাঁহাকে বুদ্ধরূপে জগতে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করেন।

যখন সমস্ত দেবতাগণ তাঁহাকে অনুরোধ করেন; তখন তিনি সে অনুরোধ পালনের পূর্বে পাঁচটি বিষয় বিশেষভাবে দেখিয়া লন:—সময়, দেশ, বংশ, মাতা এবং মাতার গুণাবলী।

হাজার বৎসর পরে যখন বুদ্ধযুগান্তরের সময় আসিল, তখন সমস্ত দেবতাগণ "তুষিত" স্বর্গে গিয়া ভগবান বুদ্ধকে জন্মগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। দেবতাগণের অনুরোধে তিনি পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জন্মগ্রহণের ঠিক সময় কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখিলেন যে, মনুষ্য সমাজে জরা, মৃত্যু রোগ, শোক প্রভৃতি ব্যাধিগুলি যেরূপ প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে তাহাতে উহা তাঁহার জন্মের প্রকৃষ্ট সময় বটে।

সময় ঠিক হইলে, তিনি বিচার করিলেন কোন দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করিবেন। চার মহাদেশ এবং নানাপ্রকার ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তিনি দেখিলেন। যত বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এইজন্য তিনি ভারতবর্ষের মত পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করিতে বাসনা করিলেন। ভারতবর্ষ তাঁহার জন্মস্থান ঠিক হইলে, বিচার করিলেন ভারতের

কোন্ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিবেন। অনেক বিবেচনার পর ভারতের মধ্যদেশে জন্মগ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন।

মধ্যদেশ সম্বন্ধে 'বিনয় পীঠকে'র বর্ণনা এইরূপ—"মধ্যদেশের পূর্ব্বে কজঙ্গল অবস্থিত এবং অদূরে মহাশাল। মহাশালের অদূরে অন্যদেশের সীমা। মধ্যদেশের পূর্ব্ব-দক্ষিণে সলালবতী নদী, তাহার অদূরে অন্যদেশের সীমা। মধ্যদেশের কিছু দক্ষিণে শ্বেত কনিকা সহর; তাহার অদূরে অন্য দেশের সীমা। মধ্য দেশের অনতিদূরে ব্রাহ্মণ প্রধান থানা সহর; তাহার অদূরে অন্য দেশের সীমা। মধ্যদেশের উত্তর দিকে উষীরধ্বজ পর্ব্বত; তাহার পরই অন্য রাজ্যের সীমা।"

মধ্যদেশ তৎকালে লম্বায় তিন শত লিগ্, প্রস্থে দুইশত পঞ্চাশ লিগ্ এবং পরিধিতে নয় শত লিগ্ বিস্তৃত ছিল। এই দেশের রাজধানী ছিল কপিলবস্তু। এই সহরে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের লোক বাস করিত। ভগবান বুদ্ধ এই কপিলবস্তু সহরে জন্মগ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন।

স্থান ঠিক হইলে কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। শূদ্র বা তদ্রূপ অনুচ্চ জাতির গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না। হয় ক্ষত্রিয়, না হয় ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিবেন। অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন তখনকার দিনে ব্রাহ্মণের চেয়ে ক্ষত্রিয় অধিক প্রভাবাপন্ন। তিনি নিজে নিজেই বলিলেন, "আমি ক্ষত্রিয়ের বংশে জন্মগ্রহণ করিব এবং রাজা শুদ্ধোধন আমার জন্মদাতা হইবেন।'

শুদ্ধোধনের ঔরষে জন্মগ্রহণ করিবেন স্থির করিয়া তিনি উপযুক্ত মাতার নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সে নারী বুদ্ধের মাতা হইতে পারেন না। রাজা শুদ্ধোধনের অনেক স্ত্রী ছিল বলিয়া অনেক লেখক মত পোষণ করেন। বুদ্ধ কোন্ রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন সে সম্বন্ধে মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"বুদ্ধের মাতা কখনও অসতী এবং মদ্যপায়ী হইতে পারে না। তিনিই বুদ্ধের মাতা হইতে পারেন, যিনি লক্ষজন্মে পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন এবং জন্মের পর পাঁচটি ব্রত অভঙ্গ অবস্থায় পালন করিয়াছেন। রাণী মহামায়াই কেবল এইরূপ গুণসম্পন্না এবং তিনিই আমার মাতা হইবেন।" দশ মাস সাত দিন তিনি মাতৃগর্ভে অবস্থান করিবেন তাহাও ঠিক করিলেন।

বৌদ্ধগণের মতে স্বর্গ একটি নহে, অনেক। প্রত্যেক স্বর্গে একটি করিয়া 'নন্দনকানন' আছে। বুদ্ধ যখন মহামায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন মনস্থ করিলেন, তখন অন্যান্য স্বর্গের সমস্ত দেবতাগণকে বিদায় দিয়া 'তুষিত' স্বর্গের দেবতাদিগকে লইয়া নন্দন-কাননে প্রবেশ করিলেন। দেবতাগণ তাঁহাকে তাঁহার আগামী জন্মের কথা বলিয়া দিতে লাগিলেন এবং তিনি যে ভবিষ্যৎ জন্মে নির্ব্বাণ লাভ করিয়া জগতে এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিবেন তাহা তাঁহাকে বার বার স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। দেবতাগণ দ্বারা উৎসাহিত হইয়া বুদ্ধ নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ এই নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিয়া হঠাৎ দেহ পরিত্যাগ করিয়া মহামায়ার গর্ভে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রাণহীন দেহ 'নন্দনকাননে' পড়িয়া রহিল। দেবতাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন।

কপিলবস্তু যে নেপাল রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত ছিল সে বিষয়ে এক্ষণে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সকলেই একমত। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে নেপাল রাজ্য মধ্যে লুম্বিনি ও নিগ্লিভার অশোকস্তম্ভ ও ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পিপরাবাস্তূপ মধ্যে শাক্যগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত বুদ্ধদেবের ভস্মাবশেষ আবিষ্কারের ফলে গোরক্ষপুর বা বস্তি জেলার মধ্যে কপিলবস্তু বা লুম্বিনি প্রভৃতি প্রাচীন স্থানসমূহের অবস্থান নির্দেশ সম্পূর্ণরূপেই ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পিপরাবার ১০ মাইল উত্তর পশ্চিমে নেপালরাজ্যের মধ্যে ২৭°৩৭´ এবং ৮৩°১১´ রেখার মধ্যে অবস্থিত তিলৌড়াকোটের নিকটবর্ত্তী বিশাল ধ্বংসরাশিই কপিলবস্তু নগরের নিদর্শন বলিয়া আজকাল পণ্ডিতসমাজে গৃহীত হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বে যাহাকে মধ্যদেশ বলিয়াছি, সেই দেশের রাজধানীই কলিবস্তু নগর। সে যুগে তেমন বড় করিয়া সহরের পত্তন হইত না। যেখানে দেশের রাজা বাস করিতেন, সেখানে নানাদেশের লোক আসিয়া বসবাস করিত এবং রাজকর্ম্মচারীগণ পরিবার লইয়া থাকিত বলিয়াই

বুদ্ধের জন্ম

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল

একটি সহরের পত্তন হইত। তবে সে সহর আজকালকার কলিকাতা বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি সহরের মত বড় ছিল না। সহরগুলি বড় না হইলেও সহরের বন্দোবস্ত বেশ মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক ছিল।

আমরা অনেক ইতিহাসেই, বিশেষ করিয়া স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকে দেখিতে পাই যে, শুদ্ধোধন একজন রাজা ছিলেন। কথাটা সত্য নহে। শুদ্ধোধন রাজা ছিলেন না। যে যুগের কথা বলিতেছি, সে যুগে ভারতের নানাদেশে অনেক গণতন্ত্র রাজ্য ছিল। দেশের বড় বড় প্রধানগণ এই সকল রাজ্য শাসন করিতেন। গণতন্ত্র সাধারণতঃ দুই প্রকারের। প্রথমতঃ, যাহাতে দেশের প্রধান ব্যক্তিগণ নিজেদের সুখ সুবিধার জন্য প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া রাজ্য শাসন করেন—যাহাকে ইংরেজীতে বলে 'অলিগার্কি'; দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে প্রধানগণ অধিকাংশ স্থানেই প্রজাদ্বারা মনোনীত হন, এবং প্রজাদের মতানুসারে তাদের হিতের জন্য রাজ্য শাসন করেন; অবশ্য কখন কখন প্রধানগণ পূর্ব্বমনোনীত প্রধানগণের বংশধররূপে রাজ্য শাসনের অধিকার প্রাপ্ত হন। এই শ্রেণীর গণতন্ত্রকে ইংরাজীতে বলে 'এ্যারিষ্টোক্রেসি'। শুদ্ধোধনের সময়ে মধ্যদেশে গণতন্ত্র রাজ্যই প্রচলিত ছিল। শুদ্ধোধন প্রধানবর্গের অন্যতম ছিলেন এবং প্রধানগণ কপিলবস্তু নগরে বাস করিতেন।

শুদ্ধোধন গৌতম ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যে ক্ষত্রিয় ছিল, ইতিহাস তাহা স্বীকার করে এবং জাতকেও দেখিতে পাই বুদ্ধ স্বয়ং ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন। শুদ্ধোধন কতগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই। তবে কপিলবস্তুর আট দশ মাইল দূরে দেবদহ নামে একটি ক্ষুদ্র জনপদ ছিল—সেই জনপদের ক্ষত্রিয়বংশের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার নামই মহামায়া এবং তিনিই ভগবান বুদ্ধের মাতা।

মহামায়ার পিতৃগৃহ দেবদহ নামক জনপদে অবস্থিত ছিল, ইহা আমরা জাতকে দেখিতে পাই। কিন্তু ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, মহামায়ার পিতৃগৃহ 'কোলি' নামক জনপদে ছিল। কানিংহাম সাহেবও কোলি জনপদ স্বীকার করিয়াছেন এবং উহার সহিত আরও বলিয়াছেন যে, কোলি জনপদকে 'ব্যাঘ্রপুর' বলা হইত। এই সম্বন্ধে নানা প্রকার মতভেদ থাকিলেও সকলেই একবাক্যে কপিলবস্তু এবং দেবদহের মধ্যবর্ত্তী লুম্বিনী উপবনের কথা স্বীকার করিয়াছেন।

সে যুগে কপিলবস্তু নগরে প্রতি বৎসর-গ্রীষ্ম-উৎসব হইত। সেবারও গ্রীষ্ম-উৎসবের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ হইতে উৎসবের বাণী ঘোষণা করা হইয়াছে। চারিদিক হইতে দলে দলে স্ত্রীপুরুষ উৎসবে যোগদান করিবার জন্য রাজধানীতে আসিয়াছে। রাজধানীতে এক নূতন শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাণী মহামায়া কোন প্রকার অন্যায় আমোদ প্রমোদে যোগ না দিয়া, নানাপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, এবং নানাপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য শরীরে মাখিয়া উৎসবের প্রথম ছয়দিন বেশ আনন্দের সহিত কাটাইলেন। সপ্তম দিবস ছিল পূর্ণিমা রজনী, উৎসবের শেষ এবং প্রধান দিন। পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যদেব প্রথম উঁকি দিবার পূর্ব্বে যখন দিগন্তে একটি সোনালী আলোর আভা ফুটিয়া উঠে সেই সময়ে রাণী শয্যা পরিত্যাগ করিয়া সুগন্ধি জলে স্নান করিয়া পবিত্র হইলেন। তারপর স্বহস্তে হাজার হাজার দরিদ্রের মধ্যে বহু মুদ্রা বিতরণ করিলেন। অর্থদানের পর তিনি বহুমূল্য পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিলেন, চন্দনাদি পবিত্র সুগন্ধি দ্রব্য মাখিলেন, তাঁহার ইচ্ছামত সুখাদ্য আহার্য্য ভক্ষণ করিলেন এবং আটটি ব্রত পালনার্থে সুসজ্জিত শয়নকক্ষে গিয়া তৃপ্তিদায়ক রাজকীয় পালঙ্কে শয়ন করিলেন। শয়ন করিবার পর ধীরে ধীরে কিসের মোহে যেন তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। রাজপ্রাসাদে তখনও জ্যোৎস্নালোকে গ্রীষ্ম-উৎসব ধুমধামের সহিত চলিয়াছে; রাণী স্বপ্ন দেখিলেন:—

চারজন প্রধান স্বর্গীয় দূত আসিয়া পালঙ্কের সহিত তাঁহাকে তুলিয়া হিমালয় পর্ব্বতের এক সুন্দর স্থানে লইয়া গেল। ষাট লিগ পরিমিত 'মানসিলা' নামক উপত্যকার মধ্যে সাতলীগ দীর্ঘ একটি শাল বৃক্ষের নীচে তাঁহাকে রাখিয়া একদিকে তাহারা সকলে আসন গ্রহণ করিল। তাহার পর ক্রমশঃ এই চারিজন স্বর্গীয় দূতের স্ত্রী আসিল। তাহারা তাঁহাকে 'আনটাটা' নামক হ্রদে লইয়া গিয়া স্নান করাইয়া

তাঁহার শরীর হইতে মনুষ্যরূপ দূর করিল; তাঁহার শরীরে এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। তৎপরে তাহারা তাঁহাকে স্বর্গীয় বস্ত্র পরাইল, তাঁহার দেহে নানা প্রকার গন্ধদ্রব্য চর্চ্চিত করিল এবং সুগন্ধি পুষ্পদ্বারা তাঁহাকে সজ্জিত করিল। অনতিদূরে ধবলগিরি অবস্থিত। তাহার উপর একটি স্বর্ণময় রাজপ্রাসাদ। স্বর্গীয়দূতগণের স্ত্রীগণ সেই রাজপ্রাসাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশে একখানা স্বর্গীয় শয়নাসন পূর্ব্বদিকে শিয়র করিয়া স্থাপন করিল, নানাপ্রকার স্বর্গীয় বস্ত্র তাহার উপর বিস্তীর্ণ করিয়া রাণীকে শয়ন করাইল। তখন ভগবান বুদ্ধ একটি শ্বেত হস্তীর আকার ধারণ পূর্ব্বক অনতিদূরে স্বর্ণপর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি স্বর্ণপর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া ধবলগিরিতে আসিলেন এবং উত্তর দিক হইতে আসিয়া একটি শ্বেতপদ্ম মুখে তুলিয়া লইলেন। তারপর ভীষণ গর্জ্জন করিয়া ধীরে ধীরে স্বর্ণময় প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তৎপরে তাঁহার ভবিষ্যৎ মাতার পালঙ্ক দক্ষিণদিকে রাখিয়া তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া রাণীর দক্ষিণ পার্শ্ব স্পর্শ পূর্ব্বক গর্ভে প্রবেশ করিলেন।

এইরূপে গ্রীষ্ম-উৎসবের দিনে মহামায়ার গর্ভ হইল।

ভগবান বুদ্ধ যখন মহামায়ার গর্ভে প্রবেশ করিলেন, তখন সপ্তস্বর্গের দেবতাগণ মিলিত হইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন; স্বর্গ হইতে অবিশ্রাম পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল; স্বর্গীয় বাদ্য বাজিয়া উঠিল; পৃথিবীর তরুলতা সজীব হইল; মরা গাছে ফুল ফুটিল; অন্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করিল; হিংস্র-জন্তু হিংসা ভুলিয়া গেল; গাছে গাছে লতায় পাতায় ভাব বিনিময় হইতে লাগিল; পাহাড়ে পর্ব্বতে মরুভূমিতে শ্যামল তরু জন্মিল; নদীসকল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; ভীষণ গ্রীষ্মে মলয় পবন বহিয়া ধরিত্রীতে বিগত বসন্ত ফিরাইয়া আনিল। সেই অপূর্ব্ব শুভ মুহূর্ত্তে সমস্ত বিশ্বজগৎ হাসিয়া উঠিল; সকলেই ভগবান বুদ্ধকে বরণ করিয়া লইবার জন্য আনন্দ প্রকাশ করিল।

পরদিন প্রত্যূষে রাণী মহামায়া নিদ্রাভঙ্গে তাঁহার স্বপ্ন বৃত্তান্ত রাজাকে বলিলেন। রাজা এই অপ্রত্যাশিত শুভ সংবাদে আনন্দিত হইলেন, এবং চতুঃষষ্টি পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহাদের জন্য ৬৪ খানা আসন সুসজ্জিত করিলেন এবং তাহার উপরিভাগ নানাপ্রকার পত্র ও পুষ্প দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। তাঁহারা আগমন করিলে, রাজা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে তাঁহাদিগকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। স্বর্ণ থালিতে নানাপ্রকার সুখাদ্য দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিলেন। কেবল তাহাই নহে,—ধন, বস্ত্র এবং অপরাপর বিবিধ দ্রব্য-সম্ভারে তাঁহাদিগকে দক্ষিণান্ত করিলেন। এইরূপ ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বতোভাবে পরিতুষ্ট করিয়া রাজা স্বপ্নের কথা তাঁহাদের গোচর করিলেন এবং স্বপ্নের ফল কি হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন।

স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ হৃষ্টচিত্তে বলিলেন,—"হে মহারাজ, আপনি উতলা হইবেন না। রাণীর গর্ভে এক শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে স্ত্রী নহে, পুরুষ। আপনি একটি পুত্র সন্তান লাভ করিবেন। সেই রাজপুত্র যদি সংসারে থাকেন তবে তিনি জগতের সম্রাট হইবেন; আর যদি তিনি সংসার-জীবন পরিত্যাগ করেন, তবে তিনি বুদ্ধ হইবেন এবং তাঁহার প্রভাবে জগতের পাপ ও জড়তা দূর হইবে।"

যেদিন মহামায়ার গর্ভে বুদ্ধ প্রবেশ করিলেন, সেদিন হইতে চার জন স্বর্গীয় দূত অদৃশ্যভাবে রাণীকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। সেদিন হইতে আর কখন রাণীর মনে কাম ভাবের উদয় হয় নাই।

বৌদ্ধ শাস্ত্র মতে, যে নারী গর্ভধারণ করিবার পর কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করেন না এবং যাঁহার গর্ভ মন্দিরের চূড়ার মত উন্নত হয় তিনিই নাকি গর্ভে বুদ্ধকে ধারণ করেন। আর যে নারী গর্ভে বুদ্ধকে ধারণ করেন তিনি দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হন না। মহামায়ার এইসব লক্ষণ গুলি পূর্ণমাত্রায় ছিল।

রাণীর যখন প্রসব করিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইল, তখন তাঁহার বড় ইচ্ছা হইল, তিনি একবার পিতৃগৃহে গমন করেন। তিনি রাজাকে বলিলেন, "দেখুন, আমি এই সময় একবার দেবদহে আমার পিতৃগৃহে গমন করিতে অভিলাষ করি।"

বুদ্ধের জন্ম

শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল

রাণীর অভিপ্রায় পূরণার্থ রাজা বলিলেন "তথাস্তু", এবং রাণীর পিত্রালয় হইতে কপিলবস্তু নগর পর্য্যন্ত পথ বৃক্ষ ও জলকুম্ভ দ্বারা সজ্জিত করিলেন। যথাসময়ে হাজার হাজার লোকের সহিত স্বর্ণ-নির্ম্মিত পাল্কীতে চড়িয়া রাণী পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন।

দেবদহ এবং কপিলবস্তুর মধ্যস্থলে 'লুম্বিনি' উপবন অবস্থিত। সময় সময় দুই নগরের অধিবাসীগণ আসিয়া এই উপবনে উৎসব করিতেন। দুই নগরেরই লোকদিগের ইহাতে পূর্ণ অধিকার ছিল। মাঝে মাঝে উপবন লইয়া দুই-দলে বিরোধও বেশ চলিত। এই উপবন ইন্দ্রের 'চিত্রলতা' উপবনের মত সুন্দর ও সজ্জিত ছিল। বারমাস এখানে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইত। উপবনের মধ্যে নানাপ্রকার কুঞ্জ ছিল। তাহার উপরিভাগ চন্দ্রাতপের মত সবুজ লতা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। এই উপবনের অভ্রভেদী বৃক্ষসকল বহু দূর হইতে দেখা যাইত। উপবনের স্থানে স্থানে ফোয়ারা ছিল এবং রাত্রিতে আলোকমালায় উপবন উজ্জল হইয়া উঠিত। দর্শক মাত্রই এই উপবনের শোভা দেখিয়া বিমোহিত হইত।

রাণী মহামায়া পিত্রালয়ে গমনের পথে এই উপবনের শোভা দেখিয়া বিমোহিত হইলেন এবং এই উপবনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, শিবিকা বাহকগণ তাঁহাকে উপবনের মধ্যে লইয়া গেল। রাণী শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া উপবনের বৃহত্তম শালবৃক্ষের নিকট গিয়া তাহার একখানা শাখা ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। শালবৃক্ষের শাখা অনেক উচ্চে ছিল, কিন্তু শালবৃক্ষ তাঁহার ইচ্ছা জানিতে পারিয়া তাহার শাখা নত করিয়া দিল এবং শাখা রাণীর হাতে আসিয়া স্পর্শ করিল। তিনি শালবৃক্ষের শাখা ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় সহসা প্রসবসুখ অনুভব করিলেন। তৎক্ষণাৎ পরিচারিকা আসিয়া রাণীর চারিদিক আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া দূরে চলিয়া গেল।

সাধারণ নারীগণের উপবেশন অথবা শয়ন অবস্থায় প্রসব হয়। কিন্তু বৌদ্ধগণের মতে দেখা যায় যে, বুদ্ধ যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার মাতা দণ্ডায়মানা অবস্থায় তাঁহাকে প্রসব করেন। ইহাই বুদ্ধের জন্মের বিশেষত্ব। শাল বৃক্ষের শাখা ধরিয়া দণ্ডায়মানা অবস্থায় রাণী বুদ্ধকে প্রসব করিলেন। এরূপ অবস্থায় প্রসব করিলে সন্তান নীচে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে পারে এইজন্য মহাব্রহ্মার চারজন পরিচারিকা আসিয়া কোমল জাল দ্বারা বুদ্ধকে জালের ভিতর ধারণ করিয়া আঘাত হইতে রক্ষা করিলেন।

নারীরা যখন সন্তান প্রসব করে তখন সন্তানের সহিত কতকগুলি অপবিত্র জিনিষ গর্ভ হইতে নির্গত হয়। কিন্তু বুদ্ধ যখন জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার মাতার গর্ভ হইতে কোন অপবিত্র দ্রব্য বাহির হইল না। একটি দেব-পুত্রের মত বুদ্ধ মাতার গর্ভ হইতে নামিয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ হইতে দুইটি শীতল জলের ধারা নামিয়া আসিয়া বুদ্ধ এবং বুদ্ধের মাতাকে স্নাত করিল।

তারপর সেই স্বর্গের পরিচারিকা চতুষ্টয় বুদ্ধকে তাঁহার মাতার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "রাণী, আনন্দ করুন! আপনার গর্ভে এক অলৌকিক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে।"

স্বরলিপি

"নটরাজ"

১

অহৈতুক

মনে র'বে কিনা র'বে আমারে
সে আমার মনে গাই।
ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে
অকারণে গান নাই।

চ'লে যায় দিন, যতখন আছি
পথে যেতে যদি আসি কাছাকাছি,
তোমার মুখের চকিত সুখের
হাসি দেখিবারে পাই
তাই অকারণে গান গাই॥

ফাগুনের ফুল যায় ঝরিয়া
ফাগুনের অবসানে।
ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া
আর কিছু নাহি জানে।

ফুরাইবে দিন, আলো হবে ক্ষীণ,
গান সারা হ'বে, থেমে যাবে বীণ,
যতখন থাকি ভ'রে দিবে নাকি
এ খেলারি ভেলাটাই;
তাই অকারণে গান গাই॥

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বরলিপি—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পা ধা II ধপা পর্সা র্সণা ধা । পা পমা গা মা I পা -া -া -া । -া -া গা মা I
ম নে র বে কি না র বে আ মা রে ০ ০ ০ ০ ০ সে আ

I মা -ধা -া -া । -া -া ধা ণা I ণধা -র্সা র্সণা ধা । পা -া পা ধা I
মা ০ ০ ০ ০ র্ ম নে না ই ম নে না ই ম নে

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I ধপা পর্সা র্সণা ধা । পা পমা গা মা I পা -া -া -া । -া -া -া -া I
র বে কি না র বে আ মা রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পনা না না না । না না র্সা না I র্সা না র্রর্সা -া । -া -া পা -ধা I
ক্ষ ণে ক্ষ ণে আ সি ত ব দু য়া রে ০ ০ ০ অ ০

I ণা -ধা -র্রা র্সা । ণা -া গা -মা I গা -মা -পা -ধা । -ণা -র্সা র্সণা ধা I
কা ০ ০ র ণে ০ গা ন্ গা ০ ০ ০ ০ ই ম নে

I ধপা পর্সা র্সণা ধা । পা পমা গা মা I পা -া -া -া । -া -া মা গা I
র বে কি না র বে আ মা রে ০ ০ ০ ০ ০ চ লে

I মা -ণা ণধা -া । ধা ধা ধা -না I না -া র্সা -া । -া -া র্সা না I
যা য়্ দি ন্ য ত খ ন আ ০ ছি ০ ০ ০ প থে

I র্সা র্সর্মা র্গা র্মা । র্রা র্জ্ঞা র্রা র্সা I না -া র্সা -া । -া -া -া -া I
যে তে য দি আ সি কা ছা কা ০ ছি ০ ০ ০ ০ ০

I র্সর্রা র্সা ণা ধা । ণা -া -া -া I ধা র্সা ণা ধা । পা -া পা পা I
তো মা র মু খে ০ ০ র্ চ কি ত সু খে র্ হা সি

I পা পণা ণধা পা । মা -া গা -মা I গা মা -া গা । মা -া পা -া I
দে খি বা রে পা ই তা ই অ কা ০ র ণে ০ গা ন্

I গা -মা -পা -ধা । -ণা -র্সা র্সণা ধা I
গা ০ ০ ০ ০ ই ম নে

I ধপা পর্সা র্সণা ধা । পা পমা গা মা I পা -া -া -া । -া -া সা সা I
র বে কি না র বে আ মা কে ০ ০ ০ ০ ০ ফা গু

I রা -া রা -গা । মা -ধা ধপা গা I মা -া গা মা । পা -া পা ধা I
নে র্ ফু ল্ যা য্ ঝ রি য়া ০ ফা গু নে র্ অ ব

I ধপা -ধণা ধা -া । -া -া ধা ধা I ধা -ণা ণা ণা । ণধা -র্সা র্সা র্সনা I
সা ০০ নে ০ ০ ০ ক্ষ ণি কে র্ মু ঠি দে য্ ভ রি

I র্রর্সা -া ণা -ধা । পা পণা ণধা পা I মা -গা মা -া । -া -া মা গা I
য়া ০ আ র্ কি ছু না হি জা ০ নে ০ ০ ০ ফু রা-

I মা মণা ধা ধা । ধা -া ধা -না I না না র্সা -া । র্সনা -া -র্সা -া I
ই বে দি ন্ আ ০ লো ০ হ বে ক্ষী ণ্ গা ০ ন্ ০

I র্সনা -া র্সা -া । না -া র্সা -র্রা I র্রধা -র্সা -র্সণা -ধা । পা পর্সা র্সণা ধা I
সা ০ রা ০ হ ০ বে ০ গো ০ ০ ০ পে মে যা বে

I পা -া -া -া । ধা ধা ধা -া I ধা -া ধা -ণা । ণধা ণা ধা ধর্সা I
বী ০ ০ ণ্ য ত খ ন থা ০ কি ০ ভ রে দি ব

I র্সণা -ধা পা পা । পা -ধা পা -র্সা I র্সণা -া ধা ধা । পা -া গা -মা I
না ০ কি এ খে ০ লা ০ রি ০ ভে লা টা ই তা ই

I গা মা -া গা । মা -া পা -া I গা -মা -পা -ধা । -ণা -র্সা র্সণা ধা I
অ কা ০ র নে ০ গা ন্ গা ০ ০ ০ ০ ই ম নে

I পা পর্সা র্সণা ধা । ধপা মা গা মা I পা -া -া -া । -া -া -া -া II
র বে কি না র বে আ মা রে ০ ০ ০ ০ ০ ০

স্বরলিপি

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিলাপ

চরণ রেখা তব
যে পথে দিলে লেখি
চিহ্ন আজি তারি
আপনি ঘুচালে কি ?

অশোক রেণুগুলি
রাঙালো যার ধূলি
তারে যে তৃণতলে
আজিকে লীন দেখি ?

ফুরায় ফুল ফোটা,
পাখীও গান ভোলে,
দখিন বায়ু সেও
উদাসী যায় চ'লে।

তবু কি ভ'রি তারে
অমৃত ছিল নারে ?
স্মরণ তারো কি গো
মরণে যাবে ঠেকি ?

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II সা -া ঋা । ঋামজ্ঞমজ্ঞা -রজ্ঞা ঋা I সা -া -া । -া -া -া I
চ ০ র ণ ০০ রে খা ০ ০ ০ ০ ০

I দ্া ণ্া সা । সা -ঋা -ণ্া I সা -জ্ঞা ^জ্ঞরা । মজ্ঞা -া -ঋা I
চ র ণ রে ০ ০ খা ০ ত ব ০ ০

I সা -া ঋা । ঋমা -া -া I জ্ঞরা মজ্ঞা ঋা । সা -া -া I
যে ০ প থে ০ ০ দি লে লে খি ০ ০

I সা -া দা । ^দপা -া পা I পা -দা মপা । মজ্ঞা -া -া I
০ চি ০ ০ হ্ন ০ আ জি ০ তা রি ০ ০

I জ্ঞা -া মা । মা -ণা -া I ণদা পা মা । রজ্ঞা -মজ্ঞা -রজ্ঞা I
আ ০ প নি ০ ০ ঘু চা লে কি ০০ ০০

I সা -া ঋা । ঋামজ্ঞমজ্ঞা -রজ্ঞা ঋা I সা -া -া । -া -া -া I
চ ০ র ণ ০০ রে খা ০ ০ ০ ০ ০

I দা দা মা । দা -া -ণা I ণা -র্সা র্সণা । র্সা -া -া I
অ শো ক রে ০ ০ ণু ০ গু লি ০ ০

I ণা -া -র্সা । র্সণা -া জ্ঞ´ঋ´া I ণর্সা -া -ণা । -দা -া -ণা I
রা ০ ০ ঙা ০ ০ ০ লো ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -জ্ঞ´া জ্ঞ´ঋ´া । র্সা -া -ণা I
বা র্ ধূ লি ০ ০

I দা -া -ণা । র্সঋ´া -জ্ঞ´ঋ´া র্সণা I র্সা -া -া । -া -া -া I
রা ০ ০ ঙা ০০ ০০ লো ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -ঋ´া ঋর্সা । ণা -া -া I পা পণা ণদা । পা -া -দা I
তা ০ রে যে ০ ০ তৃ ণ ত লে ০ ০

I মপা -মা জ্ঞরা । জ্ঞা -া -া I জ্ঞমা মজ্ঞা ঋা । সা -া -ণ্া I
আ ০ জি কে ০ ০ লী ন দে খি ০ ০

I সা -া ঋা । ঋামজ্ঞমজ্ঞা -রজ্ঞা ঋা I সা -া -া । -া -া -া I
চ ০ র ণ ০ রে খা ০ ০ ০ ০ ০

I সা -া -া । সা -া -ঋা I জ্ঞা -মা মা । মা -া -া I
ফু ০ ০ রা ০ র্ ফু ল্ কো টা ০ ০

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I মা -া -পা । পমা -ণা দপা I মপা -মা জ্ঞরা । জ্ঞা -া -া I
পা ০ ০ খী ০ ও গা ন্ ভো লে ০ ০

I মা -া -পা । পমা -ণা দপা I মপা -পমা জ্ঞরা । জ্ঞা -া -া I
দ ০ ০ খি ন্ বা য়ু ০ সে ও ০ ০

I জ্ঞমা -া -া । সা -ঋা ঋমা I মজ্ঞঋা -জ্ঞা ঋা । সা -া -া I
উ ০ ০ দা ০ সী যা য়্ চ লে ০ ০

I দা -া -া । দা ণদা ণা I ণা র্সা র্সনা । র্সা -া -া I
ত ০ ০ বু ০০ কি ভ রি তা রে ০ ০

I ণা -া -র্সা । র্সণা -া জ্ঞ্র্ঋা I ণর্সা -া ণা । -দা -া -ণা I
অ ০ ০ মৃ ০ ০০ ত ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা র্সজ্ঞা জ্ঞ্র্ঋা । র্সা -া -ণা I
ছি ল না রে ০ ০

I দা -ণা -র্সা । র্ঋজ্ঞা -র্ঋজ্ঞ্র্ঋা -র্সণা I র্সা -া -া । -া -া -া I
অ ০ ০ মৃ ০০০ ০০ ত ০ ০ ০ ০ ০

I র্সঋা র্সা র্সা । ণা -া -দা I দপা -ণা ণদা । পা -া -া I
স্ম র ণ তা ০ ০ রো ০ কি গো ০ ০

I পা দা দপা । মা -া -পমা I মজ্ঞা -া রা । মজ্ঞা -া -ঋা I
ম র ণে যা ০ ০০ বে ০ ঠে কি ০ ০

I সা -া ঋা । ঋমজ্ঞমজ্ঞা -রজ্ঞা ঋা I সা -া -া । -া -া -া II
চ ০ র ণ ০০ রে খা ০ ০ ০ ০ ০

পরিণয়মঙ্গল

উত্তরে তুষার-রুদ্ধ হিমানীর কারাদুর্গতলে
প্রাণের উৎসবলক্ষ্মী বন্দী ছিল তন্দ্রার শৃঙ্খলে।
যে নীহারবিন্দু ফুল ছিঁড়ি তার স্বপ্নমন্ত্রপাশ
কঠিনের মরুবক্ষে মাধুরীর আনিল আশ্বাস,
হৈমন্তী নিঃশব্দে কবে গেঁথেছে তাহারি শুভ্রমালা
নিভৃত গোপন চিত্তে; সেই অর্ঘ্যে পূর্ণ করি ডালা
লাবণ্য-নৈবেদ্যখানি, দক্ষিণ সমুদ্র-উপকূলে
এনেছে অরণ্যচ্ছায়ে, যেথায় অগণ্য ফুলে ফুলে
রবির সোহাগগর্ব্ব বর্ণগন্ধমধুরস ধারে
বৎসরের ঋতুপাত্র উচ্ছলিয়া দেয় বারে বারে।
বিস্ময়ে ভরিল মন, একি এ প্রেমের ইন্দ্রজাল,
কোথা করে অন্তর্দ্ধান মুহূর্ত্তে দুস্তর অন্তরাল,—
দক্ষিণপবনসখা উৎকণ্ঠিত বসন্ত কেমনে
হৈমন্তীর কণ্ঠ হ'তে বরমাল্য নিল শুভক্ষণে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১লা পৌষ, ১৩৩৪
শান্তিনিকেতন
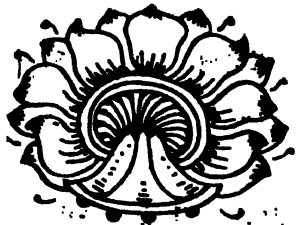
১৭

ভূপতি ভাবিয়াছিল বিলাস তাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবে, কিন্তু তার কোনও আভাস পাওয়া গেল না। তারপর সে বিলাসের কাছে নিজে লোক পাঠাইল, কিন্তু বিলাস তাকে হাঁকাইয়া দিল। সেই লোকের কাছে ভূপতি সংবাদ পাইল যে বিলাস এখন প্রসিদ্ধ মাড়োয়ারী ধনী রাধাকিশেন বাবুর আশ্রিতা।

শুনিয়া ভূপতির ভিতর যা কিছু বিকৃত পৌরুষ অবশিষ্ট ছিল তাহা দীপ্ত হইয়া উঠিল। বিলাস জ্যোতিকে যাহা বলিয়াছিল তাহাই হইল, কলিকাতায় বারনারীর অভাব নাই, ভূপতি ঘরে তো ফিরিলই না, দুহাতে জীবনটাকে ছারখার করিয়া ফেলিতে লাগিল।

সেই রাত্রি হইতে বিলাস বিজলী থিয়েটারের সম্পর্ক ছাড়িয়া দিয়াছিল। ভূপতির থিয়েটারে পশার প্রতিপত্তির অন্ততঃ অর্দ্ধেকটা ছিল বিলাসের জন্য, কাজেই বিলাস ছাড়িয়া যাওয়ায় তার টিকিট বিক্রী অনেক কমিয়া গেল। তার উপর ভূপতির স্বভাবের অধিকতর বিকৃতিতে এখন রীতিমত লোকসান হইতে লাগিল।

প্রভা নামে পোনেরো ষোল বছরের পরমা সুন্দরী একটি মেয়ে তখন বিনায়কের থিয়েটারে নর্ত্তকীর দলে ভর্ত্তি হইয়াছিল। তার রূপ ও গানের খ্যাতি খুব রটিয়া গিয়াছিল। ভূপতি একদিন তার অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইল। তার পরেই সে তার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। তার মনে হইল ইহাকে তৈয়ার করিতে পারিলে এ বিলাসের গৌরব ম্লান করিয়া দিবে। তা ছাড়া এ রূপসী, হাবভাবে অতুলনীয়া—ভূপতির প্রীতির অযোগ্য নয়। ভালবাসিয়া সে প্রভাকে পাইবে—আর প্রভাকে পাইলে বিজলী থিয়েটার জমিয়া উঠিবে।

প্রভা খুব সহজলভ্য ছিল না। সে ধনবতী, নিজের মটরে আসে যায়। তার সঙ্গে তার মা আসে, এবং সমস্তক্ষণ তার মা তাকে আগলাইয়া বসিয়া থাকে। থিয়েটার হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় তার গাড়ীতে রোজই একজন ধনী ভদ্রলোক যায়, তাকে সকলেই চেনে। অতবড় লোকের হাত হইতে প্রভাকে ছিনাইয়া লওয়া যার-তার কাজ নয়।

কিন্তু প্রভার একটা দুর্ব্বলতা ছিল—থিয়েটারের নেশা। রোজগারের জন্য থিয়েটারে আসিবার তার কোনও প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তার ভিতর যেমন স্বাভাবিক শক্তি ছিল অভিনয় করিবার, তেমনি ছিল প্রবল আকাঙ্ক্ষা। থিয়েটারে অভিনয়ে যারা খ্যাতিলাভ করিয়াছে, তাদের উপর প্রভার অসামান্য শ্রদ্ধা ছিল—তাদের নামে সে মাতিয়া উঠিত। সেইজন্য সাধারণের অলভ্য প্রভা, খুব সহজে বা অল্পমূল্যে না হইলেও ভূপতির দুরধিগম্য হয় নাই।

যখন গভীর রাত্রে ভূপতি গিয়া প্রভার ঘরে অতিথি হইল প্রভা আসিয়া তাকে দুয়ার হইতে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইয়া গেল। ভূপতি মুগ্ধ হইয়াই আসিয়াছিল, এখন তার

গৃহসজ্জা হইতে আচার ব্যবহার প্রভৃতি সব-কিছুর মধ্যে অনন্য-সুলভ চারুতা দেখিয়া একেবারে তন্ময় হইয়া গেল।

অপরূপ রূপসী প্রভা—প্রতি অঙ্গে রূপলাবণ্য তার অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছড়াইয়া আছে। তবে এ রূপের ভিতর ভদ্রনারীসুলভ সম্ভ্রম ও লজ্জাশীলতা নাই—আছে একটা তীব্র নির্লজ্জতা। তার সমস্ত রূপ ভূপতির চক্ষুকে আঘাত করিতে লাগিল, প্রখর রূপ ও নির্লজ্জ ভোগ-লিপ্সা চক্ষের ভিতর দিয়া বহিয়া উন্মাদক আসবে ভূপতির সারা চিত্ত ভরিয়া দিল। বিলাসের সংসর্গে যে একটা প্রশান্ত স্নিগ্ধতা ছিল তাহাতে ভূপতি কখনও কখনও ক্লান্তিবোধ করিত; প্রভার ভিতর সে পাইল তীব্র উন্মাদনা। চাহিয়া চাহিয়া ভূপতি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। প্রথম সম্ভাষণের যে সামান্য সঙ্কোচটুকু তাকে শান্ত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা হাওয়ায় উড়িয়া গেল যখন পানপাত্র আনাইয়া প্রভা দুটি শ্যাম্পেন গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালিয়া একটি ভূপতিকে দিল, আর একটি নিজে লইল। ইংরাজী কায়দায় গ্লাসে গ্লাসে ঠেকাইয়া প্রভা বলিল, "To our love." নিমিষে ভূপতির পাত্র শূন্য হইয়া গেল। প্রভা আর এক পেয়ালা ঢালিতে লাগিল। অসহ্য আবেগে ভূপতি তাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া মাখনের মত নরম, গোলাপের মত রঙিন, অপরূপ লতার মত সুন্দর প্রভার বাহুতে চুম্বন করিল ঠিক তার ঝলমলে হীরার তাবিজটার উপরে।

কিন্তু সেদিকে আবার চাহিতে ভূপতি চমকিত হইল—বাহুবন্ধন তার শিথিল হইল। ভূতাবিষ্টের মত কিছুক্ষণ ভূপতি ঠিক সেইখানে চাহিয়া রহিল—তখন প্রভা শ্যাম্পেন ঢালিতেছিল।

হীরার তাবিজের পাশে একটা সূক্ষ্ম সোনার তারে বাঁধা তামার একটা বড় মাদুলী হঠাৎ ভূপতির চোখে যেন কাঁটার মত বিঁধিয়া গেল। একটা বিদ্যুতের ঝলক যেন তার সারা চিত্তের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল। মাদুলীটি দেখিয়া মনে হইল খুব পুরাতন। কলিকাতার সাধারণ মাদুলী যেরকম হয় এটা সেরকম নয়, ভূপতিদের দেশের সেকরারা করবী ফুলের বীচির মত অদ্ভুত আকারের এক প্রকার মাদুলী করে, এটা ঠিক সেই রকম।

দুই হাত দিয়া ভূপতি প্রভাকে বুকের কাছে টানিয়া ধরিয়াছিল। তার হাতদুটী শিথিল হইয়া পড়িয়া গেল। প্রভারও শ্যাম্পেন ঢালা শেষ হইয়াছিল, সে ছাড়া পাইয়া উঠিয়া একগ্লাস ভূপতিকে দিয়া আর একগ্লাস নিজে লইল। এবারও ভূপতি তাহা পান করিল, কিন্তু নীরবে—হঠাৎ কিসে যেন তার উৎসাহ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল।

নিঃশব্দে শ্যাম্পেন পান করিতে করিতে সে কিছুক্ষণ পরে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "তোমার,—তোমার এই তাবিজের পাশে এ মাদুলীটা প'রেছ কেন?"

হাসিয়া প্রভা বলিল, "এ মাদুলীটা অনেক দিনের—আমার খুব ছেলেবেলার।"

"এ কিসের মাদুলী।"

"এটা হ'চ্ছে বুড়াঠাকুরাণীর নির্ম্মাল্য।"

ভূপতি চমকাইয়া উঠিল। বুড়াঠাকুরাণীর পূজা এদেশের নয়, পূর্ব্ববাঙ্গলায় তাঁর পূজা আছে—তাঁর নির্ম্মাল্য মাদুলী করিয়া ভূপতিদের সবাই ছেলেবেলায় পরিয়াছে;—ভূপতির গা ঘামিয়া উঠিল।

সে বলিল, "বুড়াঠাকুরাণীর মাদুলী! এ কোথায় পেলে?"

"আমার মা দিয়েছিলেন। তাঁর হাতের জিনিস তাই ফেলতে পারিনি।" প্রভার গলাটা একটু গম্ভীর হইল, একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস সে ফেলিল।

"তা হ'লে—ইনি তোমার আপনার মা নন!"

"দূর, তা হ'তে যাবে কেন? আমাদের যেমন মা হয় তাই। আমাকে মানুষ ক'রেছে তাই মা বলি।"

ভূপতি উঠিয়া দাঁড়াইল। তার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া প্রভাও বিস্মিত হইয়া তার দিকে চাহিল।

ভূপতি কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "তা হ'লে তুমি বেশ্যার মেয়ে নও?"

মাথা নীচু করিয়া ম্লানমুখে প্রভা বলিল, "না।"

ভূপতির যেন দম আটকাইয়া গেল, সে বলিল, "তুমি—তুমি—তোমার নাম কি তরলা?"

প্রভা চমকাইয়া উঠিল। সে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, কিছুক্ষণ পরে সে বলিল, "আপনি কেমন ক'রে জানলেন?"

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত

আর এক মুহূর্ত্ত ভূপতি সে ঘরে অপেক্ষা করিল না, পাগলের মত ছুটিয়া রাস্তায় গেল। সামনে যে ট্যাক্সি পাইল তাহা লইয়া সে একেবারে বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল।

* * * *

সুরমা স্বামীর মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইল—ঠিক যেন পাগলের চেহারা। তার ব্যবহার দেখিয়া আরও বিস্মিত হইল। ভূপতি গাড়ী হইতে নামিয়া কারও সঙ্গে কোনও কথা না বলিয়া সোজা তার শুইবার ঘরে ছুটিয়া গিয়া দুয়ারে খিল দিল।

ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া সুরমা একটা জানালার খড়খড়ি তুলিয়া ঘরের ভিতর চাহিয়া দেখিল। দেখিতে পাইল, যেখানে ভূপতির মার ছবিখানা টাঙান আছে তার নীচে দাঁড়াইয়া ভূপতি অশ্রুপূর্ণ নয়নে তার দিকে চাহিয়া বিড়্‌বিড়্ করিয়া কি বলিতেছে। তারপর সেই ছবির নীচে দেয়ালে মাথা ঠেকাইয়া সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

সুরমার মনে বড় ভয় হইল, কিন্তু এ অবস্থায় ভূপতিকে বাধা দিতেও তার ইচ্ছা হইল না। তার মনে এমন সব আশা হইল যাহা তার তখনি অসম্ভব বলিয়াও মনে হইল—আশা হইল বুঝিবা স্বামীর মন ফিরিয়াছে তাই তিনি মায়ের ছবির কাছে মাথা ঠুকিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছেন। সে মনে মনে সকল ঠাকুর-দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিল যেন তাই হয়, মায়ের ছবির দিকে চাহিয়া সেও মনে মনে বলিল, "মাগো, রক্ষা কর তোমার সন্তানকে।"

বাধা দিতে তার মন সরিল না বটে, কিন্তু সেই খড়খড়ির ফাঁক হইতে চোখও সে ফিরাইতে পারিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া সেইখানে চক্ষু পাতিয়া বসিয়া রহিল।

তারপর ভূপতি মাথা উঠাইয়া ধীরে ধীরে নতমস্তকে তার খাটের উপর গিয়া শুইয়া পড়িল। সুরমা দেখিল বড় ক্লিষ্ট ক্লান্ত ব্যথাতুর তার মুখ। সুরমার অন্তর কাঁদিয়া উঠিল।

সুরমা তখন গিয়া দুয়ারে আস্তে ঘা দিল। তিনবার ঘা দিবার পর ভূপতি উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিয়া আবার খাটের উপর শুইয়া পড়িল। সুরমা দুয়ারটা আবার বন্ধ করিয়া নিঃশব্দে আসিয়া ভূপতির মাথার কাছে বসিল ও তার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। একদৃষ্টে সে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তার মনের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিল। সে মুখে যে অপরিমেয় বেদনার ছাপ সে দেখিল তাতে তার বুক ফাটিয়া গেল।

সুরমা ভূপতির কপালে হাত বুলাইল, তার গণ্ডের উপর স্নিগ্ধ করস্পর্শে তার দুঃখের ছাপ মুছাইতে চেষ্টা করিল। তার পর তার মুখের উপর পড়িয়া—আজ সাত বৎসর পরে—সে স্বামীকে চুম্বন করিয়া বলিল, "ওগো, কি হ'য়েছে তোমার আমাকে বল।"

ভূপতির চক্ষু গড়াইয়া জল পড়িতে লাগিল। তার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। পরম স্নেহভরে সুরমা আঁচল দিয়া তার চোখের জল মুছাইয়া বলিল, "বল আমাকে, অমন ক'রে মনের দুঃখ চেপে থেকো না—আমাকে বল।"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভূপতি বলিল, "এ বলবার নয় সুরমা—এ কথা নিজের মনের ভিতর উঠ্‌তেই যে লজ্জার বিষে শরীর জ্বলে উঠছে! তোমাকে বলবো কি? ওঃ—মা রক্ষা ক'রেছেন সুরমা—নইলে—ভাবতে প্রাণ শিউরে ওঠে।" ভূপতি সত্য সত্যই শিহরিয়া উঠিল।

সুরমা ভূপতির কম্পিত দেহ দুই বাহু দিয়া বেষ্টিত করিয়া বলিল, "থাক, তবে ওসব কথা ভেবে আর কাজ নেই। তুমি শুধু আমায় বল তোমার কোনও বিপদ আপদ ঘটেছে কি? কোনও বিপদের ভয় আছে কি?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভূপতি বলিল, "না সুরো, বিপদ আর নেই—বিপদ থেকে জন্মের মত রক্ষা ক'রেছেন আমার মা।"

সুরমা বলিল, "তবে আর ভেবে কাজ নেই। এসো, ওঠো তুমি, বড় ক্লান্ত হ'য়েছ মনে হ'চ্ছে; মুখ হাত ধুয়ে ব'স, একটু চা' ক'রে দি খাও। তার পর খাবার যোগাড় ক'রে দি। খেয়ে দেয়ে সুস্থ হ'য়ে যা কথা বলবার বোলো।"

সে উঠিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া উঠাইল।

১৮

পর দিন সকালে থিয়েটারের লোক ভূপতির খোঁজ করিতে আসিল। পূর্ব্বের রাত্রে ভূপতি থিয়েটারে না

যাওয়ায় তাহারা ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আজ একটা নূতন নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনী, ভূপতির তাতে প্রধান পার্ট, অথচ ভূপতি একাই কাল রিহার্সালে যায় নাই। তাই আজ সকালে প্রধান কর্ম্মচারী ভূপতির কাছে আসিয়াছে।

ভূপতি তার সঙ্গে দেখা করিল না। উপর হইতে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল সে অসুস্থ, অভিনয় করিতে পারিবে না, আর একজনকে দিয়া অভিনয় চালাইতে আদেশ দিল।

সুরমা বলিল, "তুমি যদি থিয়েটার না কর তবে আর মিছামিছি ও হাতী পোষবার দরকার কি, থিয়েটার বেচে দাও। পাপ শান্তি হোক।"

ভূপতি বলিল, "কে নেবে এখন ও থিয়েটার, তাই ভাবছি।"

সুরমা বলিল, "তুমি যদি কিছু না মনে কর তবে একটা কথা বলি। জ্যোতিকে আর বিনোদবাবুকে ডেকে তাদের সঙ্গে একটা পরামর্শ কর না।"

ভূপতি সুধু বলিল "না।" সে ভয়ানক গম্ভীর হইয়া গেল।

কিন্তু সাত দিনের মধ্যে এ সমস্যা সহজে সমাধান হইয়া গেল। একদিন রাধাকিশেন বাবু আসিয়া ভূপতির সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন যে ভূপতি যখন তার টাকার সুদ কিছুই দিতেছে না টাকাটা বেশীদিন ফেলিয়া রাখা অসম্ভব হইবে।

ভূপতি কেবল মাথায় হাত দিয়া দীন নয়নে চাহিয়া রহিল।

রাধাকিশেন বলিলেন, "আপনি থিয়েটারে এতনা হাজার হাজার টাকা রোজগার ক'রছেন, তো সুদ কেন না দিচ্ছেন?"

ভূপতি বলিল, "একটু মুস্কিলে পড়েছি বাবুসাহেব। আমি এখন থিয়েটার নিজে দেখতে পারছি না।"

"তা বেশ তো, আপনি দেখতে না পারেন হামাদেরকে সব রেহেন ক'রে দিন। হামার লোক বৈসে যে দিন যা আমদানী হ'বে লিয়ে যাবে, আর টাকা দরকার যে হোবে সে দিবে।"

ভূপতি একটু ভাবিয়া বলিল, "তা বেশ, তাই করুন।"

রাধাকিশেন বাবু বলিলেন তাহা করিতে হইলে থিয়েটারের খাতাপত্র একবার দেখা দরকার। ভূপতিকে লইয়া তিনি সব খাতাপত্র পরীক্ষা করিলেন, তার পর রাধাকিশেন তাকে এটর্নী বাড়ী লইয়া তাকে দিয়া একটা দলিল লেখাপড়া করিয়া লইলেন। সেই দলিলের দ্বারা ভূপতি তার দেনা শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত রাধাকিশেনকে বিজলী থিয়েটারের লীজ দিয়া দিল। মুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ভূপতি বাড়ী ফিরিল—থিয়েটারটা যে তার হাত হইতে এত সহজে গেল সেজন্য সে আপনাকে খুব হাল্‌কা বোধ করিল।

রাধাকিশেন এ কাজটা করিয়াছিল বিলাসের পরামর্শে। বিলাসের অভিনয় দেখিয়াই রাধাকিশেন প্রথম তার প্রতি অনুরক্ত হয়। তাই সে একদিন বিলাসকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি এখন থিয়েটারে যাও না কেন?"

বিলাস বলিল, "কোথায় যাব? বিজলী থিয়েটার ছাড়া কোথাও প্লে ক'রতে ইচ্ছা হয় না। সেখানে ঐ ভূপতিটা থাকতে আমি যাব না।"

রাধাকিশেন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা তুমি তো এত থিয়েটার করলে, ওতে সত্যি লাভ হয় কিনা বলতে পার?"

"কেন হবে না, অনেক লাভ হয়। যারা থিয়েটার করে তারা বেকুব, আর টাকা নষ্ট করে, তাই, নইলে বুঝে শুনে ক'রতে পারলে অনেক লাভ হয়।"

আর একদিন প্রসঙ্গক্রমে বিলাস বলিল "তুমি একটা থিয়েটারের ব্যবসা কর না, তুমি তো অনায়াসে পার। তোমার এক পয়সাও খরচ ক'রতে হবে না।"

"কেমন ক'রে?"

"কেন ভূপতি তো তোমার এত টাকা ধারে, তুমি তাকে বলনা কেন যে যে-পর্য্যন্ত দেনা না শোধ হয় থিয়েটার তোমার হাতে ছেড়ে দিক।"

কথাটা রাধাকিশেনের মনে লাগিল। তাই সে বিজলী থিয়েটারের লীজ লইল।

রাধাকিশেন থিয়েটার লইয়াই বিলাসকে ফিরাইয়া আনিল, প্রভাকেও ধরিয়া আনিল, তা ছাড়া আরও কয়েকজন বড় অভিনেতা আনিয়া চটু করিয়া থিয়েটার ভয়ানক

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত

জমাইয়া ফেলিল। মাসে বিশ পচিশ হাজার টাকা লাভ দাঁড়াইতে লাগিল। থিয়েটারের নেশাটা তাকে বিষম পাইয়া বসিল।

প্রভার সঙ্গে থিয়েটারে বিলাসের খুব আলাপ হইল। প্রভা বিশেষ চেষ্টা করিয়াই বিলাসের সঙ্গে আত্মীয়তা করিল।

একদিন সে বিলাসকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ভাই, ভূপতি বাবুর এখানে কে কে আছে জানো?"

"আছে তার এক ছোট ভাই জ্যোতি, আর তার স্ত্রী—তার নাম সুরমা—ভারী দজ্জাল সে, আর তার ছোট একটা ছেলে।"

প্রভা বা তরলা ভূপতি চলিয়া যাইবার পরই ঠিক করিয়াছিল যে ভূপতি তার বড়দা। তখন তারও ভয়ানক কান্না পাইয়াছিল, একবার মনে হইল ছুটিয়া যাইয়া তার পায়ে জড়াইয়া ধরে। কিন্তু নিদারুণ লজ্জা তার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। সে যে কি হইয়াছে, সে বোধ তার যথেষ্ট ছিল, আর তার এ লজ্জা লইয়া যে আত্মীয় স্বজনের কাছে দাঁড়াইবার পথ আর তার নাই তাও সে জানিত। তাই সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তবু এতদিন পর ভূপতিকে দেখিয়া তার মনে বড় সাধ হইল একবার তাদের সবাইকে দেখিতে,—তাদের খবরাখবর জানিতে। ভূপতির ঠিকানা পাওয়া তার কঠিন ছিল না। কিন্তু ঠিকানা জানিয়া কি করিবে সে? একবার সে আশা করিয়াছিল যে বড়দা যখন তার খবর জানিয়া গেলেন তখন হয় তো তার উদ্ধারের কোনও ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু ভূপতি যখন তারপর তার কোনও খোঁজই করিল না, তখন সে কি সাহসে তাদের কাছে যাইবে? তাকে তো সবাই দূর করিয়াই দিবে। তাই সে চুপ করিয়াই রহিল।

বিলাসের সঙ্গে ভূপতির ভাবের কথা তার জানা ছিল, তাই সে বিলাসের সঙ্গে ভাব করিয়া ভূপতিদের নানা খবরাখবর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ভূপতি বিলাসের কাছে যখন যেটুকু বলিয়াছিল তাহা বিলাস বলিত। শুনিয়া প্রভার কান্না পাইত—সে কষ্টে আবেগ দমন করিত।

বিলাস খুব বেশী করিয়া বলিত জ্যোতির কথা। তার কথা বলিতে বিলাস আবেগ দমন করিতে পারিত না, তার কীর্ত্তির কথা সে একখানাকে দশখানা করিয়া বলিত। একদিন সে বলিল, "তাকে দেখলে বুঝতিস সে কি!—একটা জীবন্ত দেবতা! কি মূর্ত্তি, যেন সাক্ষাৎ মহাপ্রভু! আর কি মিষ্টি তার কথা, কি উদার অন্তর! তাকে দেখলে ইচ্ছা হয় না যে তার পায়ের তলা ছেড়ে কোথাও যাই।"

জ্যোতির আশ্রমের কথা বিলাস অল্পই জানিত, কিন্তু যাহা জানিত তাহাকেই সে মানসমূর্ত্তিতে মহীয়ান করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল—শতমুখে সে প্রভার কাছে তার ব্যাখ্যা করিত।

প্রভা বলিল, "যাবে দিদি, একদিন তার আশ্রমে? চল না দেখে আসি কি রকম?"

বিলাস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "এখন নয়, এখন আমার যাবার সময় নয়। সময় যদি হয় কোনও দিন তবে যদি যেতে চাস তোকে নিয়ে যাব।"

১৯

একদিন রাধাকিশেন বাবুকে বিলাস কিছু চিন্তিত দেখিল। বিলাস জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছেন?"

"ভাবছি—হাঁ সে কথাটা তোমার সঙ্গেই পরামর্শ ক'রতে হ'বে। আমি ভাবছি কি—থিয়েটারের এ লীজটা ক'রে বড় ঠকে গেছি।"

"কেন আপনার লোকসান হ'চ্ছে নাকি?"

"না, না, লোকসান হ'বে কি? রাধাকিশেন যাতে হাত দেয় তাতে লোকসান হয় না। ভাবছি কি—এ থিয়েটার তো এক বছর না যেতে ঐ ভূপতি বাবু কাড়িয়ে লিবে। যেমন আদায় হোচ্ছে এতে তো এক বচ্ছর মে বিলকুল দেনা শোধ হ'য়ে যাবে। আর লীজের মেয়াদ ত বস্ সেই তক। তার চেয়ে যদি দশ বৎসরের মেয়াদ করিয়ে লিতাম।"

বিলাস বলিল, "তার চেয়ে এক কাজ করুন না, ভূপতিকে গিয়ে বলুন যে আমি তোমার জমীদারীর মর্‌গেজ ছেড়ে দিচ্ছি দেনাও ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি থিয়েটার আমাকেদিয়ে দাও।"

"আরে বাপরে বাপ, অত টাকা কি অমনি ছেড়ে দেওয়া যায়!"

"কিন্তু সে টাকা তো বলছেন এক বছরে শোধ হ'য়ে যাবে।"

"সেই তো মুস্কিল। তখন যদি ব'লতাম দশ বছরের লীজ ক'রে দাও তবে তাই দিত। এখন কি করা যায়?"

তারপর পরামর্শ করিয়া এই স্থির হইল যে ভূপতির কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখা কর্ত্তব্য।

রাধাকিশেন বাবু পরের দিন ভূপতির কাছে গিয়া কথা পাড়িলেন এই ভাবে যে, থিয়েটারে এখন মোটের মাথায় লোকসান যাইতেছে। ইহার পিছনে আরও অনেক টাকা ফেলিলে তবে ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে লাভবান করা যায়। রাধাকিশেন বাবু টাকা ফেলিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু লীজের সর্ত্তটা বদলাইয়া দশ বছরের পাকা লীজ করিয়া দিতে হইবে, ইহার মধ্যে লাভ হউক লোকসান হউক, সব রাধাকিশেনের, তবে লাভের টাকা সব ইরশাল হইবে ভূপতির দেনা বাবদ।

ভূপতিকে এই প্রস্তাবে রাজী করিতে বোধ হয় বেশী কষ্ট পাইতে হইত না, কিন্তু রাধাকিশেন আসিবার এক মুহূর্ত্ত পরে সেখানে আসিয়া জুটিল বিনোদ। সে ভূপতির পক্ষ হইতে কথা বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত রাধাকিশেনকে এই প্রস্তাব দিল যে, রাধাকিশেন জমীদারীটা সম্পূর্ণ ছাড়িয়া বন্ধকী তমঃসুকের পৃষ্ঠে ওয়াশীল লিখিয়া ফেরত দিবেন, এবং তার পাওনা টাকার বিনিময়ে থিয়েটারটা কিনিয়া লইবেন। রাধাকিশেন তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি হইল না, দুই দিন সময় লইল। পরে আরও নানারকম প্রস্তাব করিল, কিন্তু বিনোদ ব্যাপারটা নিজের হাতে লইয়া তাকে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল। সুতরাং দুই দিন পরে সেই রকম লেখাপড়া হইয়া গেল। ভূপতি পৈতৃক সম্পত্তি দায়মুক্ত অবস্থায় পাইয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

তারপর সন্ধ্যাবেলায় বিলাস প্রভার বাড়ী গিয়া বলিল, "চল্ প্রভা আজ আমার দিন এসেছে—আজ জ্যোতি বাবুর আশ্রম দেখে আসি।"

প্রভা একটু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, যে বিলাসের সাজ সজ্জার চটক্ থিয়েটার মহলে বিখ্যাত, সে পরিয়া আসিয়াছে মোটা একখানা ফিতে পেড়ে ধুতি ও সাদা একটি ব্লাউজ—গহনা গায়ে নাই বলিলেই হয়, চুল শুধু আলগা করিয়া বাঁধা।

প্রভা নিজে সন্ধ্যার প্রসাধন সমাপ্ত করিয়া খুব দামী কাপড় চোপড় পরিয়াছিল। সে বলিল, "এ কি দিদি, এমনি ক'রে যাবে? আমিও তবে কাপড় চোপড় ছেড়ে আসি।"

বিলাস তাড়াতাড়ি বলিল, "না, না, তোর কিছু ছাড়তে হ'বে না। আমি বুড়ো মানুষ, এমনি যাওয়াই আমার ভাল। তাই বলে কি তোরও এমনি ক'রতে হবে? চল্।"

প্রভা বলিল, "আ মরি কি বুড়ী রে!"

প্রভাকে গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া বিলাস নারিকেলডাঙ্গায় গেল।

জ্যোতি তখন আশ্রমে ছিল না, তার বউদিদির তলবে বাড়ী গিয়াছিল। বিমলা তাহাদিগকে সমাদর করিয়া ঘরের ভিতর মাদুর পাতিয়া বসিতে দিল।

বিলাস একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আমাদের এত আদর ক'রে বসাচ্ছ দিদি, জান না তো আমরা কে?—ঘরের ভিতর মাদুরে বসবার যোগ্য আমরা নই। চল আমরা এমনি বাইরে থেকে ঘুরে দেখি।"

বিমলা বলিল, "আপনারা কে তা জানবার নিয়ম এ আশ্রমে নেই। এ আশ্রম যাঁর তাঁর কাছে সব মানুষ নারায়ণ, সবার এখানে সমান আদর। আমি যেদিন প্রথম এসেছিলুম এখানে, দিদি, তখন আমিও আপনার মত ভেবেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে একটিবার জিগেগেস করেন নি আমি কে বা কি? বসুন আপনারা।"

বিলাস আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বসিল। প্রভারও চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

তার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া বিমলার সঙ্গে তারা আলাপ করিল। বিমলা খুঁটিয়া খুঁটিয়া জ্যোতির সব কার্য্যকলাপ, তার চরিত্র গৌরবের কথা বর্ণনা করিয়া গেল, বিলাস প্রশ্ন করিয়া তাকে বার বার করিয়া একই কথা বলাইল—প্রভা শুধু পিছনে বসিয়া এক একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত

তারপর তারা ঘুরিয়া আশ্রম দেখিতে লাগিল। প্রত্যেকটি আশ্রমবাসীর পরিচয় ও ইতিহাস বিমলা বলিতে লাগিল, কেমন করিয়া জ্যোতি কখন কাকে কুড়াইয়া পাইয়াছে, কেমন করিয়া তাকে সে ক্রমে ক্রমে মানুষ করিয়া তুলিয়াছে, বলিতে বলিতে বিমলার চক্ষু আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হইতে লাগিল; বিলাস ও প্রভারও চক্ষু সিক্ত হইল, তারা চোখের জল মুছিতে ভুলিয়া গেল।

শেষে বিলাস বিমলাকে একটু অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া তার হাতে জ্যোতির নামের লেখা একখানা খাম দিল, বলিল, "তুমি এখানা আমরা চ'লে গেলে তোমার দাদাকে দিও, আমরা থাকতে দিওনা কিন্তু।" বিমলা খামখানা বুকের ভিতর রাখিয়া দিল।

দেখা শেষ হইলে বিলাস বলিল, "আমরা আর একটু বসি ভাই, যদি পারি তোমার দাদাকে একটা প্রণাম ক'রে যাব।"

বিমলা তাহাদিগকে বসাইয়া কার্য্যোপলক্ষে একটু বাহিরে গেল। কমলা নার্সের কাজে বাহিরে গিয়াছিল, ঠিক তখনই ফিরিয়া আসিল—সে চমকিত দৃষ্টিতে আগন্তুক-দের দিকে চাহিয়া বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এরা কারা দিদি?"

বিমলা বলিল, "চুপ, ওকথা জিজ্ঞাসা ক'রো না বোন? আমি জানিনা এরা কারা।"

"না, আমি তা বলছিনা। ছোটটি দেখতে ঠিক সেন বাবুর মতন, না? তাই—জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

বিমলা কথাটা শুনিয়া ফিরিয়া একবার প্রভার দিকে চাহিল। এতক্ষণ সে তাকে তেমন ভাল করিয়া দেখে নাই। দেখিয়াই মনে হইল কমলার কথা মিথ্যা নয়, প্রভার মুখের সঙ্গে জ্যোতির অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

যে ঘরে বিলাস ও প্রভা বসিয়াছিল বিমলা যখন ফিরিয়া তাহার দরজার কাছে আসিল তখন জ্যোতি মহা উৎফুল্ল-ভাবে আসিয়া বিমলাকে বলিল, "বড্ড ভাল খবর বিমলা—দাদার সব দেনা শোধ হ'য়ে গেছে।"

আনন্দোৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া বিমলা বলিল, "তাই নাকি? কেমন ক'রে হ'ল?"

"সেই মাড়োয়ারীটা থিয়েটার কিনে নিয়ে আমাদের সব দেনা ছেড়ে দিয়েছে।"

এ কথা শুনিয়া ঘরের ভিতর বিলাস অথপা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কথাটা তার জানাই ছিল—কিন্তু ইহাতে জ্যোতির মুখে এতটা আনন্দ দেখিয়া বিলাসের অন্তর আনন্দে গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল।

বিলাস ও প্রভা তাড়াতাড়ি উঠিয়া জ্যোতির পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল।

বিস্মিত জ্যোতি তাদের দিকে চাহিয়া বিমলার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল।

বিমলা বলিল, "ওঁরা তোমার আশ্রম দেখতে এসেছিলেন, দাদা। অনেকক্ষণ এসেছেন, তোমাকে দেখবার জন্য এতক্ষণ ব'সে আছেন।"

জ্যোতি তাদের দিকে ফিরিয়া চাহিল—বিলাস তার মুখের কাপড় সরাইয়া দিয়া নতনয়নে চাহিয়াছিল। কিছুক্ষণ তার দিকে চাহিয়া জ্যোতি তাকে চিনিল।

"ও! আপনি! আমি এ বেশে আপনাকে চিনতেই পারিনি। তা বেশ, দেখেছেন সব?"

"হাঁ, বিমলাদি আমাদের সব দেখিয়েছেন। শুধু আপ-নাকে প্রণাম করবার জন্য আমরা ব'সেছিলাম—আসি এখন।" বলিয়া বিলাস আবার প্রণাম করিল।

তারপর "চল প্রভা" বলিয়া প্রভাকে ডাকিল।

প্রভা নড়িলনা। বিলাস বলিল, "কিরে তোর যাবার সময় হ'ল না?"

প্রভা তখন হঠাৎ জ্যোতির পায়ের উপর মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া বলিল, "ছোড়দা, আমি তরলা।"

* * * *

এক মুহূর্ত্ত সবাই বিস্ময়ে স্তব্ধ হইল। জ্যোতি বিস্ময়ের আতিশয্যে আড়ষ্ট হইয়া গেল—তারপর সে তরলাকে পায়ের তলা হইতে উঠাইয়া লইয়া তফাতে ধরিয়া দেখিল—তারপর বুকের ভিতর তাকে টানিয়া লইয়া বলিল, "তরী, তরী—এত দিন কোথায় ছিলি বোন?"

জ্যোতি তরলাকে লইয়া তার ঘরে বসাইল, তার কাছে সব কথা খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

তরলা বলিল, যে-দিন সে হারাইয়া যায় সেদিন একলা আসিতে গিয়া সে পথ ভুলিয়া গিয়া বড় রাস্তায় পড়ে। সেখান হইতে সে কাঁদিতে কাঁদিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছিল জানেনা। পথে কয়েকজন ভদ্রলোক তাকে তার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সে বলিতে পারে নাই। তখন তারা তাহাকে লইয়া ঘুরিতে লাগিলেন। এমন সময় যে গোয়ালা তাদের বাড়ীতে দুধ দিত তাকে সে দেখিতে পাইয়া ডাকিল। গোয়ালা বলিল, "এই যে দিদিমণি, তুমি এখানে কি ক'রছো?" তারপর সে গোয়ালার সঙ্গে চলিল। সে লোকটির গুণ্ডা বলিয়া কিছু খ্যাতি ছিল। সে তরলাকে লইয়া গেল নিজের বাড়ীতে। বলিল, "একটু বোস এখানে, আমি কাজটাজ সেরে নিয়ে ফিরে আসবো।" কিন্তু সে তাকে পৌছাইয়া দিল না। এঁদো গলির মধ্যে এক অন্ধকার বাড়ীতে সে তরলাকে প্রায় ছয় মাস' আটকাইয়া রাখিয়া শেষে যখন সব খোঁজাখুঁজি থামিয়া গেল তখন একদিন এক বেশ্যার কাছে বিক্রয় করিল। অনেক দিন তরলা অনেক চেষ্টা করিয়াছিল দাদাদের খবর পাঠাইবার, কিন্তু পারে নাই। এমনি করিয়া কয়েক বছর পার হইয়া গেলে সে বেশ্যাবৃত্তি আশ্রয় করিল।

তরলা বলিল, "ছোড়দা, তোমার এখানে কত লোক আশ্রয় পাচ্ছে, আমাকে একটা আশ্রয় ক'রে দাও। ঘরে আমার ঠাঁই নেই জানি, কিন্তু এখানে স্থান হবে না কি?"

জ্যোতি বলিল, "স্থান নেই কিরে? যেখানে আমার এককোঁটা ঠাঁই আছে, তার অর্দ্ধেক যে তোর। চল— তোকে বৌদির কাছে নিয়ে যাই।"

তরলা মিনতি করিয়া বলিল, "না দাদা, তাঁর কাছে' কি বড়দার কাছে আমি মুখ দেখাতে পারবো না—শুধু তোমার কাছে থাকবো আমি। দয়া ক'রে আর কোথাও নিয়ে যেয়ো না।"

কিন্তু জ্যোতি শুনিল না। তাহাকে লইয়া গেল।

এই হট্টগোলের ভিতর বিলাস যে কখন চুপ করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গেল তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না। জ্যোতি যখন তরলাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিতে গেল, তখন বিমলা বলিল, "দাদা, উনি এই চিঠিখানা তোমাকে দেবার জন্য দিয়ে গেছেন।"

জ্যোতি অন্যমনস্কভাবে চিঠিখানা পকেটে পুরিয়া চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

ফাল্গুনী

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস

হাজার যুগের ফাগুন রাঙা
মন্দিরে,
বাজ্‌ছে আবার পুষ্প রাগের
ছন্দারে!
নীল-জোড়া ঐ বিশ্বপাতায়,
সবুজ স্বপন দৃশ্য সে তায়,
উঠ্‌ছে মেতে নীরব কবির
মন ধীরে!

টুক্‌রো আলোর চা টনি রাশির
ভঙ্গীতে,
বন্-গরবী অরুণ স্নানের
সঙ্গীতে।
কিশোর বিভোর বক্ষি জ্বলে,
তরুণ তরল তন্বী চলে,
ফুলের ফাঁসে ফুলের মালা
বন্দীরে!

বঙ্গীয় ভৌমিকগণের স্বাধীনতা-সমর

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

২

বঙ্গে দ্বাদশ ভৌমিক-প্রথার উদ্ভব

এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের লেখার সার উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেনঃ—

"প্রবাদ এই যে, মোগলদিগের বঙ্গ বিজয়ের প্রাক্কালে বা পরে এইরূপ বার জন ভূঞা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে এক প্রকার তাঁহারাই বঙ্গদেশকে বা নিম্ন বঙ্গের দক্ষিণ ভাগকে নিজেরা ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন, এই জন্য বাঙ্গালাকে তখন "বার ভূঞার মুলুক" বা "বার ভাটি বাঙ্গালা" বলিত। কিন্তু তাঁহারা যে সংখ্যায় ঠিক বার জনই ছিলেন এবং সেই বার জন ঠিক এক সময়েই ছিলেন, তাহা বলা যায় না।

দ্বাদশ সংখ্যাটি যেমন হিন্দুর নিকট প্রিয় ও পবিত্র দ্বাদশ জন রাজার সম্মিলনও তেমনি ভারতের একটী বিশেষত্ব। অতি প্রাচীন কাল হইতে দ্বাদশ জন সামন্ত-রাজের প্রসঙ্গ চলিয়া আসিতেছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে প্রধান বা মণ্ডলেশ্বর রাজার পার্শ্ববর্ত্তী নানা সম্বন্ধযুক্ত দ্বাদশ প্রকার নৃপতির উল্লেখ আছে। (মনুসংহিতা সপ্তম অধ্যায় ১৫৫-৫৬ শ্লোক)। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থেও যে সকল প্রধান রাজার উল্লেখ আছে তাঁহারা রাজ-সভায় আসিলেই সাধারণতঃ বার ভূঞা বেষ্টিত হইয়া বসিতেন। "বার ভূঞা বেষ্টিত বসেছে নরপতি।" (মানিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল, সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ ১৫১ পৃঃ) বাঙ্গালার মত আসামেও বার জন রাজা বা বার জন মন্ত্রী না হইলে রাজ্য-শাসন হইত না। * * * আরাকান, শ্যাম প্রভৃতি দেশেও প্রধান রাজার রাজ্যাভিষেককালে, বার-জন সামন্তরাজা বা ভূঞার আবশ্যক হইত এবং উহাদের অভিষেক এক সময়ে সম্পন্ন হইত। এখনও আমাদের দেশে বারজনে ভিন্ন কোন কাজ হয় না। বহুজনকে লইয়া যে কাজ হয় তাহাকে বার-ইয়ারী বা বারোয়ারী কার্য্য বলে। উহাতে ঠিক বারজনই থাকিবে, এমন নিয়ম নাই। বাঙ্গালার বার ভূঞার কাণ্ডটিও ঐ একই প্রকারের। কতকগুলি প্রধান প্রধান ভূঞা বঙ্গে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই উহাদিগকে বার ভূঞা বলিত। প্রকৃত পক্ষে তাঁহারা যে সংখ্যায় ঠিক বারজন ছিলেন এমন বোধ হয় না। প্রধান একটা কারণ এই যে বহুজনে বার ভূঞার কথা লিখিয়াছেন কিন্তু কেহই ঠিক ভাবে বারজনের নাম বা বিভিন্ন লেখক একই বারজনের নাম দিতে পারেন নাই। প্রত্যেকেই কোন মতে বার সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই।

(যশোহর খুলনার ইতিহাস—২য় খণ্ড, ২০-২২ পৃঃ।)

সতীশ বাবুর উদাহরণগুলির উপর—"বারভূতের অত্যাচার"—"বারভূতে লুটিয়া খাওয়া" ইত্যাদিতে অনির্দ্দিষ্ট সংখ্যা অর্থে 'বার'-র ব্যবহারের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বার ভূঞা প্রথার উদ্ভব এবং তাহাদের সংখ্যা সম্বন্ধে অদ্যাবধি যাহা বলা হইয়াছে সতীশ বাবু অল্প কথায় তাহার মর্ম্ম বেশ গুছাইয়া বলিয়াছেন। ভৌমিকের 'বার' সংখ্যা এদেশে চল্‌তি কথায় দাঁড়াইয়াছিল, সমসাময়িক পাশ্চাত্য ভ্রমণকারী বা লেখকগণও বলিয়াছেন 'বার', আবুল ফজলও লিখিয়াছেন 'বার', (Akbarnama; Beveridges Translation, Vol III, p 648) দেশেও অদ্যাবধি প্রবাদ প্রচলিত আছে 'বার'। কিন্তু এক্ষেত্রে আরও একটু বিচার আবশ্যক।

মনু অধিরাজের অধীনে ১২ জন ক্ষুদ্রতর সামন্ত রাজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্যবহারে কিন্তু সেই বার জন সামন্তের দেখা পাই না। গুপ্তদের আমলে দেশ কতকগুলি ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল এবং ভুক্তিগুলি কতকগুলি বিষয়ে বিভক্ত ছিল। বিষয়গুলির কর্ত্তার নাম বিষয়পতি, তাহাদের উপরে ভুক্তি-

পতি বা উপরিক প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পাল, সেন, বর্ম্ম, চন্দ্র-দের তাম্রশাসনে ও উপরিক এবং বিষয়পতির পরিচয় পাওয়া যায়, তখন পর্য্যন্তও তাহারা রাজপাদোপজীবিগণের মধ্যে গণ্য ছিলেন। ক্রমশঃ রাজ্যের আয়তন কমার সঙ্গে সঙ্গে উপরিক অদৃশ্য হইয়াছিলেন, অথবা নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিষয়পতিগণ মুসলমান আগমনের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত তাঁহাদের আসন বজায় রাখিয়াছিলেন। এই বিষয়-পতিগণের কোন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল না. প্রাগ্ মুসলমান যুগে বিষয়পতি যে বারজনই মাত্র ছিলেন এমন কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানি না।

মুসলমানগণ যখন দেশ অধিকার করিলেন, যখন ইলি-য়াস্ শাহ, সেকন্দর শাহ অথবা হুসেন শাহের আমলে সুনিয়ন্ত্রিত শাসনযন্ত্রে বাঙ্গালা শাসিত হইতে লাগিল তখন হিন্দু বিষয়পতিগণের স্থান মুসলমান সেনাপতিগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধীনে দেশময় military station বা থানা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার বহু প্রমাণ আছে। প্রাগ্-মুঘল যুগে রাজস্ব সংগ্রহের কি ব্যবস্থা ছিল তাহার ভাল পরিচয় পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই থানাদারগণের উপরেই সেই ভার অর্পিত ছিল। মুঘলদের বাঙ্গালা দখলের পূর্ব্বে এই তো ছিল দেশের শাসন ব্যবস্থা, হিন্দুযুগেও বার জন বিষয়পতির প্রসঙ্গ পাই না, প্রাগ্মুঘল যুগেও ১২ জন থানাদারের পরি-চয় পাই না। তবে হঠাৎ মুঘল যুগের প্রারম্ভে মনুকথিত বার সামন্ত বা বার ভূঞার অভ্যুত্থান ঘটিল কেমন করিয়া? ভূঞাদের সমস্ত বা অধিকাংশ যদি হিন্দু হইত, তবুও বুঝি-তাম যে, একটা Hindu Revival হইয়াছিল এবং মনুর ব্যবস্থা অনুসরণ করিয়া ভূঞাগণ নিজেদের সংখ্যা "বার"তে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক লেখক-গণের মতেই ভূঞাগণের ৯ জনই মুসলমান ছিলেন। তবে এই বার সংখ্যা আসিল কোথা হইতে?

আমার মনে হয়, আসামের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা বাঙ্গালার ভূঞাগণের সংখ্যা 'বার'তে নির্দ্দেশের কারণ বুঝিতে পারি। আমাদের খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতিহাস অত্যন্ত কুহেলিকাচ্ছন্ন। এই শতাব্দীর মধ্য ভাগে সুকাফা নামক স্বনামধন্য শান-বীরের অধি-নায়কত্বে আহোমগণ আসামের পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া আসামে গমন করে। আহোম জাতির ইতিহাস-সঙ্কলনস্পৃহা বেশ প্রবল ছিল এবং আদিকাল হইতে তাহারা তাহাদের ইতি-হাস বুরুঞ্জিতে লিপিবদ্ধ করিয়া আসিতেছে। বুরুঞ্জিতে গোড়ার দিক দিয়া অবশ্য অনেক রকম গাল-গল্পই আছে কিন্তু ঐতিহাসিক যুগের যে সকল ঘটনা এবং তারিখ বুরুঞ্জিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার অনেকগুলিই যে বেশ নির্ভরযোগ্য, তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। বুরুঞ্জিমতে আহোমদের আসাম প্রবেশ কালে পূর্ব্ব আসামে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে একটি ছুটিয়া রাজবংশ রাজত্ব করিতেছিল এবং দক্ষিণ তীরে একটি কাছাড়ী রাজ্য ছিল। এদিকে বর্ত্তমান রঙ্গপুর, কুচবিহার ইত্যাদি স্থান ব্যাপিয়া কামতা রাজ্যের অবস্থান ছিল। পশ্চিমে কামতা রাজ্য এবং পূর্ব্বে ছুটিয়া ও কাছাড়ী রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণ রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহারা বারভূঞা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এই ভূঞাগণ প্রায় ৭০ বৎসর কাল নিজে-দের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (Social History of Kamrup by N. Bose, Vol I, p.246)

এই ভূঞাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই রকম প্রবাদ প্রচলিত আছে। এক প্রবাদ এই যে, ক্ষত্রিয়বংশীয় শেষ রাজা অরিমত্তের পুত্র রত্নদিনই অরিমত্তের মন্ত্রী সমুদ্র কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলে (১২৩৮ খ্রী) কামরূপ রাজ্য সমুদ্রপুত্র মনো-হরের হস্তগত হয়। মনোহরের কন্যা লক্ষ্মী সূর্য্যের বরে শান্তনু এবং সামন্ত নামে দুই পুত্র লাভ করে এবং এই দুই জনের প্রত্যেকের বারটি করে ছেলে হয়। ক্রমান্বয়ে শান্তনুর পুত্রগণ ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে নাওগাঙ্গ জেলা অধিকার করে এবং সামন্তের পুত্রগণ বর্ত্তমান লখিমপুর জেলার অধিপতি হয় এবং এই উভয় দলই বারভূঞা নামে পরিচিত হয়। আহোমরাজ সুখাঙ্গফার আমলে (১২৯৩—১৩৩২ খ্রীঃ) বারভূঞাগণ আহোম রাজের বশ্যতা স্বীকার করে। এই ভূঞাগণ আদি ভূঞা নামে পরিচিত।

ভূঞাদের উৎপত্তির অন্য বিবরণ মতে জানা যায় যে ১৩১৪ খৃঃ (Social History of Kamrup by N. Bose,

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টাশালী

Vol II, p. 6.) কামতা রাজ্যে দুর্লভনারায়ণ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি আহোম রাজগণের আক্রমণ হইতে তাঁহার রাজ্যের পূর্ব্ব সীমান্ত রক্ষার জন্য কতকগুলি কায়স্থ এবং ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। ইহারা দুর্লভ-নারায়ণের রাজ্যকালেই অর্দ্ধ-স্বাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, দুর্লভের মৃত্যুর পরে তাহারা একেবারেই স্বাধীন হইয়া দাঁড়াইল এবং বারভূঞা নামে বিখ্যাত হইল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন বিশ্বসিংহ কুচবিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি ক্রমে ক্রমে এই ভূঞাগণকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৫১৫ খ্রীঃ কাছাকাছি বিশ্বসিংহ প্রবল হইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পুত্র নরনারায়ণের যত মুদ্রা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের সকলগুলিই ১৪৭৭ শকাব্দা বা ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দের। কাজেই বিশ্বসিংহের বারভূঞা দলন ১৫২০—১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সংসাধিত হইয়াছিল। এই শেষোক্ত ভূঞাগণ যে সমুদ্রবংশীয় ভূঞাগণ হইতে ভিন্ন এবং পরবর্ত্তীকালের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বাঙলায় বারভূঞাগণের অভ্যুত্থান ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দায়ূদের পতনের পরে ঘটিয়াছিল। আসামের ইতিহাসে দেখা গেল যে অধিরাজ বংশ লুপ্ত হইলে বা অধিরাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে যে সামন্ত রাজগণ রাজ্যময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন হইয়া বসিতেন তাঁহাদেরই সাধারণ নাম ছিল বারভূঞা। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে বাঙলায় যখন ঠিক ঐ রকম অবস্থাতেই ভূঞাগণের অভ্যুত্থান ঘটে, তখন পর্য্যন্ত বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক দলিত আসামের বারভূঞাগণের স্মৃতি তাজা ছিল এবং সমান অবস্থায় সমুত্থিত বাঙলার ভূঞাগণও আসামের ভূঞাগণের অনুকরণেই বারভূঞা আখ্যা পাইয়াছিলেন, এই নির্দ্ধারণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

আরাকানে বারভূঞা প্রথার উদ্ভব সম্ভবতঃ মনুর বিধি অনুসরণ করিয়াই হইয়াছিল। আরাকানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রচার অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালে হইয়াছিল এবং তাই হয়ত রাজার দ্বাদশ সামন্তাধিপ ছিল বলিয়া গণ্য হওয়া রাজ্যশাসন বিধানের এমন একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। অরাজকতার সহিত যে বারভূঞা উদ্ভবের সম্পর্ক আরাকানে নাই, বরং সুশৃঙ্খল রাজ্যশাসন ব্যবস্থারই তাঁহারা সুপরিচিত অঙ্গ, ইহা লক্ষ্য করিয়াই উপরি লিখিত অনুমান করা হইল। (ক্রমশঃ)

দোলের ছুটি

শ্রীরামেন্দু দত্ত

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকটায় ১৯২৬ সালে আসানসোলে তখনো শীতের তীক্ষ্ণতা কিছুমাত্র কমেনি। দু'দিন দোলের ছুটির সঙ্গে দশ দিন ম্যাট্রিক পরীক্ষার ছুটি যোগ হ'য়ে স্কুলটাকে যখন বারো দিনের জন্যে বন্ধ করে' দিলে তখন, শিক্ষক হ'লেও, শিক্ষক-দুর্লভ চঞ্চলতায় আমার সমস্ত মনটা ভরে' উঠ্‌লো। মোটে এক বছরের মাষ্টারী—তখনো গাঁঠে গাঁঠে জড়তা রাজ্য বিস্তার করে নাই। তার ওপর রেলের স্কুল বলে' যখন একটা "পাস্" পর্য্যন্ত পাওনা হয়ে পড়েছে শুনলুম, তখন সস্তায় কিস্তি পেয়ে ফরাক্কাবাদ যাবার ইচ্ছাটা নিতান্তই অদম্য হয়ে উঠ্‌লো।

আকবরের সমাধির "জাহাঙ্গীর" ফটক্

আকবরের সমাধি (সেকেন্দ্রাবাদ)

'ই, আই, আরে' লম্বা পাড়ি দেওয়ার কথা ওঠাতেই ঠিক হ'ল দিল্লী, আগ্রা,—মথুরা, বৃন্দাবন; পলাণ্ডু ও মালপোয়া'র গন্ধ যেন যুগপৎ নাসিকাগ্রে ভেসে এল! তা'র ওপর দোলের সময় বৃন্দাবন! এবং দোল-পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্রালোকে তাজমহল! কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা দেখি!

একদিন সকালে দু'তিনটে মাথা একত্র করে' নগদ তিন ঘণ্টা লাগ্‌লো যাত্রা সম্বন্ধীয় পন্থার স্থিরী-করণে! তারপর আসানসোলের নৈশ-ধূম্রাবরণ ভেদ করে' প্রায় বারোটায় দু'টি ছাত্রের 'অছি' হয়ে ষ্টেশন-পথে অগ্রসর হতে লাগ্‌লাম। পূর্ব্বকালে ঋষি-আচার্য্য-গুরুদেবেরা সশিষ্য ভ্রমণে বহির্গত হ'তেন, এই ভেবে একটি বারো ও একটি ষোল সতর বছরের বালককে সঙ্গে নিতে আপত্তি করি নাই। তাদের দু'জনেরই পিতা রেলের কর্ম্মচারী, গাড়ী ভাড়া দেওয়ার হাঙ্গাম নাই। সুতরাং ছেলেদের আবদার রক্ষা করতে তাঁদের বিশেষ বাধা ছিলনা। আর সঙ্গে রইলো একটি সংসার! চাল, ডাল, নুন, তেল—ইস্তক জলের বাল্‌তী এবং "ইক্‌মিক্"।

যাত্রাটা আরম্ভ করা হয়েছিল পাঁজি পুঁথি না দেখেই। ফলং—ট্রেণ 'লেট্'। বেহারের গভর্ণরের 'স্পেশাল্', তারপর ভাইস্‌রয়ের 'সেলুন,' শেষে আমাদের মথুরা-এক্সপ্রেস্! কুগ্রহের মতো সেগুলো বহুদূর আমাদের পিছু-পিছু ধাওয়া

শ্রীরামেন্দু দত্ত

বিরক্ত মনকে প্রবোধ দিয়েছিলুম যে আমাদের মতন ক্ষুদ্র ব্যক্তির পশ্চাদনুসরণকারী স্বয়ং বড়লাট !
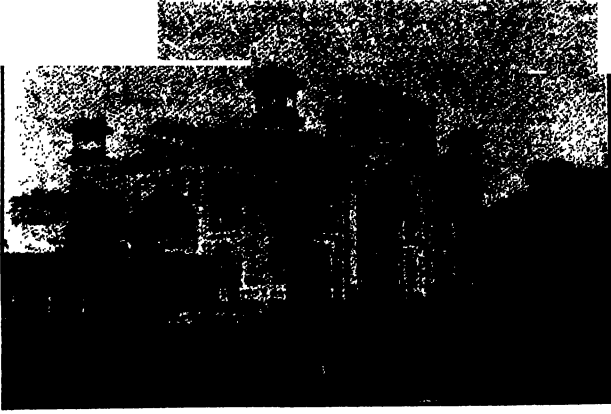
সে যাক্, সমস্ত রাত্রি একটি সেকেণ্ড-ক্লাস কক্ষের অন্ধকার কুক্ষিমধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে, বিজ্ঞানের কৃপায় নিদ্রিতাবস্থাতেই বহু বেগে দেড়শ মাইল অতিক্রম করে' যখন চোখ মেল্‌লাম, তখন ভোর হয়েছে—এবং আমরা মোকামা-ঘাট জংশনে। এসব জায়গা পূর্ব্বে বহুবার দেখা আছে, নতুন কিছু লাগ্‌ল না। কি করে' এখানে চা-পান পর্ব্ব সমাপ্ত করা হয়েছিল, এবং ছাত্রদের মধ্যে একজন, তণ্ড-

তাজমহলের প্রধান প্রবেশ-তোরণ

করেছিল। আগ্রায় তাজমহল দেখ্‌ছি, পুলিশ ও গোরা-সার্জেণ্ট্ এসে হুকুম দিলে 'সরো সরো'—কারণ, ভাইস্‌রয় ভারতপরিত্যাগের আগে তাজ দেখ্‌তে আসবেন। আমরা যদি-বা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, একটিবার এতদূর এলুম, তা-ও তৃষ্ণার তৃপ্তি হওয়ার বহুপূর্ব্বে মুখের পানীয় কেড়ে নেওয়া হ'ল ! গরীবের নসীব্ এমনই হয়ে থাকে ! আবার দিল্লীতে নাম্‌তেই তাড়াতাড়ি ষ্টেশন থেকে তাড়িয়ে দিলে, কারণ সেই সময়েই ভাইস্‌রয়ের সেলুন দিল্লী প্রবেশ করছে ! আমরা কিন্তু এই বলে'

সন্ধ্যার তাজ (ফটক হইতে)।

পলক্ষে যে খরচটা করা হ'ল তাই দেখে কি করে' সবিস্ময়ে জানালে যে এভাবে খরচ-পত্র করলে তাকে এইখান থেকেই ফিরতে হ'বে, কেননা সে মাত্র তিনটি টাকা সঙ্গে নিয়ে দিল্লী ভ্রমণে বেরিয়েছে, এ সবের বিরক্তিকর ইতিহাস দিয়ে পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাবো না।

বেলা প্রায় আটটায় আমরা পাটনা জংশনে এসে পৌঁছলাম। এইখান হ'তে পূর্ব্ব ব্যবস্থামত আমার এক প্রিয়বন্ধু আমাদের সঙ্গে যোগদান করলেন।

"যন্তর্ মন্তর্"—(পার্শ্বদৃশ্য)।

তারপর আরম্ভ হ'ল অনতিক্রান্ত-পূর্ব্ব ভারত-ভূমি। এখন-যে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিনা তা' রেল লাইনের দু' পাশের শস্য-ক্ষেত্র দেখেই 'মালুম্' হচ্ছিল। কোথায় বঙ্গ জননীর স্নিগ্ধ সবুজ রঙের মখমলের মতো চোখ জুড়ানো ধানের চারা, আর কোথায় এই উচ্চাবচক্ষেতভর্ত্তি মস্ত মস্ত গাঢ় রঙের যব, গম, শর্ষপ, অড়হরের লালিত্যহীন ওষধিবর্গ! তামাকের চাষও চোখে পড়ল। বাঙ্গালীর অনভ্যস্ত চোখে সেই ঢল ঢল বড় বড় তামাক পাতায় ঢাকা জমিগুলো যেন একটানা মস্ত বড় একটা বেগুন ক্ষেত বলে মনে হচ্ছিল! এইখানে আমার মত ঔদরিকের আশীর্ব্বাদ কুড়োবার আশায় একট খবর জানিয়ে রাখি। দানাপুর প্রভৃতি রেল-ষ্টেশনে টাঁটি করে' রাব্ড়ি বিক্রী হয়। টাঁটির ও রাব্ড়ির মলিন চেহারা দেখ্লেই কিন্তু আর তা'র রসাস্বাদন সম্বন্ধে কোনরূপ আগ্রহ থাকেনা, কিন্তু সে দুর্ব্বলতা অতিক্রম করে' যখন একটা টাঁটি কিনে ফেল্লাম তখন দেখি যে বর্ণচোরা আমের মতো অথবা প্রকৃত মহাপুরুষের মতো, বহিরাকৃতি দেখে ভেতরের জিনিষ চেনা যায় না!

ভিটা ও আরা ষ্টেশনের মাঝে ই, আই, আরের একটা সেতু আছে সেটা ৪,৭২৬ ফিট (অর্থাৎ ১ মাইল হ'তে ১৮৫ গজ কম) লম্বা। ট্রেনটা যখন এর ওপর দিয়ে ছুটে
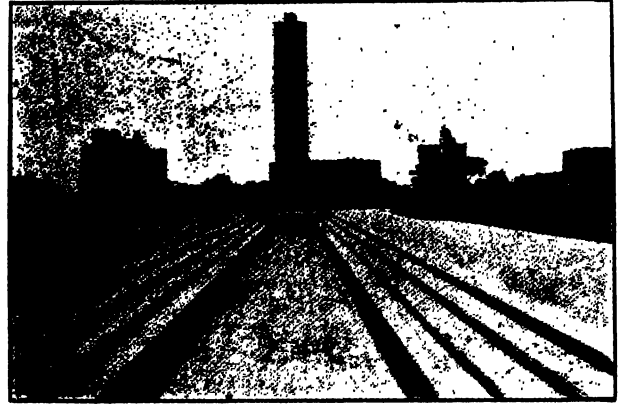
"যন্তর্ মন্তর্"—সম্মুখে প্রকাণ্ড সূর্য্য ঘড়ি, দুইপার্শ্বে তারকা, গ্রহ-উপগ্রহ ও পশ্চাতে চন্দ্র পর্য্যবেক্ষণের যন্ত্র (সম্মুখ হইতে গৃহীত)।

চল্ছিল তখন নীচের বালুময় নদীবক্ষে অনেকগুলো ছোট ছোট ছেলে একটা পয়সা পাবার লোভে ট্রেনের সঙ্গে প্রাণ-পণে ছুটছিল। দু' একটা পয়সা ফেলে দিতেই কী অভ্যস্ত ক্ষীপ্রতা ও নিপুণতা সহকারে তারা সেই বালির মধ্য হ'তে সেগুলো কাড়াকাড়ি করে' খুঁজে নিচ্ছিল!

তারপর ট্রেণ ছোটা ও ধূলো ওড়ার মধ্যে আর কিছু

নব-দিল্লী বা রায়সিনার দৃশ্য (যন্ত্রমন্ত্রের উপর হইতে গৃহীত)।

কুতব মিনার (একটি ধ্বংসস্তূপের উপর হইতে)।

শ্রীরামেন্দু দত্ত

আমরা ঠিক করেছিলাম যে, প্রথমে আগ্রা যাবো ; পথে কোথাও নাম্‌বোনা। আগ্রা থেকে মথুরা, বৃন্দাবন, এবং ফেরবার সময় আলাহাবাদ, বারাণসী. দেখে যাওয়া হবে। আমাদের ট্রেন হাওড়া হ'তে বরাবর আগ্রা হয়ে মথুরা যায়। পূর্ব্বেই চিঠি দিয়ে আগ্রা-ষ্টেশন হ'তে আমাদের নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। তাই গাড়ী বদলের দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেয়ে আমরা চড়ুইভাতির সুচিন্তায় মনোনিবেশ করলাম্‌। প্রবাস ও রেলগাড়ী অরণ্যতুল্য ভেবে নিয়ে তাকে বনভোজনও বলা চল্‌তে পারে। আলাহাবাদ ষ্টেশনে যখন পৌছলাম তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। সেখানে বৈকালীন জলযোগ সেরে নিয়ে একটা সোরাই (কুঁজো) কিনে জল নেওয়া হ'ল।

এখানে মামুলী রসগোল্লা পুরী, আলুর দম, চা, কেক, টোষ্ট সবই পাওয়া যায় কিন্তু 'যস্মিন্‌ দেশে যদাচারঃ' এই ঋষিবাক্য স্মরণ করে' খেজুরা, ঘিওর, দালমোট, চানা ইত্যাদি খোট্টাই খাবার কেনা হ'ল। এই উপলক্ষে একটা ব্যাপার ঘটেছিল। একজন খাবারওয়ালা এল ; তার সব খাবারই দেখ্‌তে সুন্দর, কিন্তু কোনটারই নাম জানিনা ; তা'কে আঙুল দেখিয়ে ঐটে দু'আনার, এইটে এক আনার বল্‌তে হচ্ছিল আর সে আমাদের খা'বার ইচ্ছের সঙ্গে বুদ্ধির দৌড়ের বহর দেখে সহাস্যমুখে সেটা উপভোগ কর্চ্ছিল।

দিল্লী দুর্গ

মনোরম বর্ণনার সুযোগ রাখে নাই। কেবল যখন মোগল সরাই ষ্টেশন ছাড়িয়ে আমাদের গাড়ী বারাণসী অভিমুখে ছুট্‌লো তখন আমরা একটা দর্শনীয় দৃশ্যের আশায় সচেতন হয়ে অপেক্ষা কর্‌তে লাগলাম। ধীরে ধীরে ট্রেন বংশীধ্বনি করে' গঙ্গার পুলের আগমন সূচিত কর্‌লে, আর যাত্রীর দল জয়ধ্বনি করে উঠ্‌লো ! কবি সত্যেন্দ্রের ভাষায় :—

যাত্রীরা সবে বলিয়া উঠিল দেখা যায় বারণসী,
চম্‌কি চাহিনু, স্বর্গ-সুষমা মর্ত্ত্যে পড়েছে খসি'
এপারে সবুজ বজরার ক্ষেত, ওপারে পুণ্য পুরী
দেবের টোপর দেউলে দেউলে কাঁপিছে কিরণ ঝুরি
আধ-চাঁদখানি রচনা করিয়া গঙ্গা রয়েছে মাঝে
স্নেহ-সুশীতল ছাওয়াটি লাগায় তপ্ত দিনের কাজে।

এই পংক্তি ক'টি স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে থাকায় অধ্যাপনার সময় মনের মধ্যে যে ছবি কল্পনা করে' নিয়েছিলাম তা'র পূর্ণতর, সুন্দরতর প্রতিরূপ আজ দৃষ্টিকে মুগ্ধ ও তৃপ্ত করে দিলে ! ট্রেনটা পুলে প্রবেশ করবার আগে এই কবিতা-বর্ণিত দৃশ্যের একটা ফটো—snap-shot—তোলবার চেষ্টা করেছিলুম ; কিন্তু গঙ্গার অপর পারের মন্দির-খচিত বারাণসী তখনো স্পষ্ট হয় নাই ; যখন নিকটতর হচ্ছি, তখন পুলের রেলিংগুলি আলোকচিত্র গ্রহণের একান্ত প্রতিকূল হয়ে পড়্‌লো। পরবর্ত্তী সংখ্যার চিত্রসমূহের মধ্যে এই আগের ছবিটি থাকবে।

দেওয়ানী খাস্‌ (দিল্লী)।

এমন সময় ছোট ছাত্রটি আগ্রহবশে “ঐটে!” ব'লে একটা ঘৃতপক্ক জিনিষে অঙ্গুলি সংযোগ করে' ফেলতেই খাবারওয়ালা চম্‌কে বল্লে, “বাবু সব ঝুটা কর্‌ দিয়া।” সত্যি তার হাতে তখনো আধ-খাওয়া একটা দই-বড়া! আর যায় কোথা! এই আচারনিষ্ঠ খাবারওয়ালাকে কিঞ্চিৎ গঙ্গাজলের বাবদ নগদ ধরে' দিয়ে মিটমাট কর্‌তে হ'ল। সে নাকি গঙ্গাজল ছিটিয়ে তবে খাবারটা বিক্রী কর্‌বে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মূর্ত্তি যথারীতি ট্রেণের কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে ঘুরতে দেখা গেল! আগেই আমরা একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছোট ইণ্টার-ক্লাস কামরায় একচ্ছত্র দখল বিস্তার করে' নিয়েছিলাম। আমাদের লট্‌বহরে সেটা মেঝে থেকে ওপরের বাঙ্ক পর্য্যন্ত বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, চায়ের তৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠ্‌ল। আমার বন্ধুটীর ভাত না হ'লে এক বছর চল্‌তে পারে কিন্তু সময়ে চা না হ'লে এক বেলা চলে না। প্রায় দুই বৎসর কাছ-ছাড়া, এতটা নেশা হয়েছে জান্‌লে মাটির ভাঁড়ে “হিন্দু-চা” কিনেই দেওয়া যেত। কিন্তু তখন নিজে চা ক'রে নিয়ে স্বাবলম্বন দেখানো ছাড়া উপায় নাই। 'চা' হওয়ার পর ঠিক্‌ হ'ল বনভোজনে খিচুড়ি খাওয়ার পদ্ধতি আছে; অতএব খিচুড়ি চড়াতে হবে। এইখানে বলে' রাখি যে আমি রন্ধন-বিদ্যায় একজন পারদর্শী, তাই হেঁসেল আমাকেই সবাই বিনা ওজরে ছেড়ে দিয়েছিল; তার-ওপর রেঁধে-খাওয়ার একটা আত্ম-প্রসাদ-জনিত আনন্দ আছে সত্য, কিন্তু না রেঁধে রাঁধুনীর প্রসাদ খাওয়ার অভ্যাসও আবার অধিকাংশেরই আছে! কিন্তু সব রাঁধুনীই যে রন্ধনশালায় ভোজ্যদ্রব্যকে প্রসাদে পরিণত করেন, এমন কথা বল্‌ছিনা। সে যাক্‌, যখন খিচুড়ির জন্যে সব তৈরী হচ্ছে এমন সময় আবিষ্কার কর্‌লাম যে নুন, হলুদ, মশলা-গুঁড়ো, এমন কি আলু পর্য্যন্ত মজুত কিন্তু ঘিয়ের টিন্‌টা আনতে ভুল হয়ে গেছে! কি আর হ'বে, প্রধানের অভাবে প্রতিনিধির দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করা শাস্ত্রের বিধি এই ভেবে “মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ”-কে 'ঘৃতাভাবে তৈলং দদ্যাৎ' করে' রান্না চড়িয়ে দিলাম।
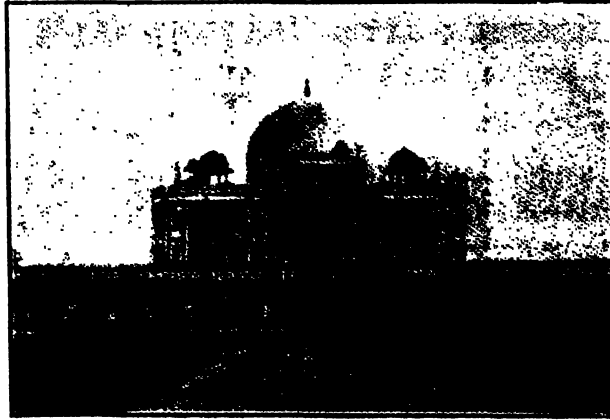
তারপর একটা ঘটনা ঘট্‌ল যা'তে আমাদের এই যাত্রাটি শেষ পর্য্যন্ত মনোরম হয়েছিল; সেটা হচ্ছে একটি বন্ধুলাভ। অপ্রত্যাশিতভাবে এবং অতি হঠাৎ এটা ঘটেছিল। এবং ব্যাপারটা মূলতঃ নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং স্বকীয় হ'লেও, অপূর্ব্বতার খাতিরে উল্লেখ কর্‌তে বাধ্য হ'লাম।

হুমায়ুনের সমাধি।

বন্ধুবর আমাকে সেই ভোর আটটা, অর্থাৎ যখন থেকে ট্রেনে উঠেছেন, তখন থেকে বল্‌ছেন “ওহে, তোমার আবার হঠাৎ গোঁফ রাখ্‌বার খেয়াল হ'ল কেন, ওটার উচ্ছেদ সাধন কর; তোমায় ওইটের জন্যে অত্যন্ত বিশ্রী, দারোয়ানের মতো দেখাচ্ছে!”

আমি তাকে যত বোঝাবার চেষ্টা করি, “নাহে তোমার ও চোখের ভুল, আমার এ গুম্ফ আমার বড় আশা ও গর্ব্বের স্থল; আমার ত মনে হয় এর জন্যে আমাকে “কাইজারের” মতো দেখাচ্ছে।” সংবেগে মস্তক-সঞ্চালন করে' বন্ধু আমার ততই তাঁর রূঢ় ধারণাকে ভাষা দেন এবং বলেন যে রাজত্ব'র পরিবর্ত্তে আমি দারোয়ানত্বের নিকটবর্ত্তী হ'য়ে পড়েছি। এইভাবে আত্ম-অমর্য্যাদার সর্পদংশনে মানুষ আর কতক্ষণ স্থির থাক্‌তে পারে? রাত যখন প্রায় আটটা, 'টাইম্‌ টেবল্‌' দেখ্‌তে বসলুম; পরে একটা ষ্টেশন ছিল সেখানে দশ মিনিট গাড়ী থামে। সেকেণ্ডক্লাস্‌ একটা পাস্‌ পকেটে করে' ক্ষৌরকার্য্যের জন্য উচ্চশ্রেণীর কাম্‌রার একটা গোস্‌লখানায়

শ্রীরামেন্দু দত্ত

ঢুকে পড়লাম। যখন ক্ষৌরকার্য্য সমাধা হ'ল তখন গাড়ী কানপুর অভিমুখে সবেগে ছুটেছে। আমি "বাথরুম্" থেকে বেরিয়ে এসে যখন এক ভদ্রলোকের একটা রিজার্ভ করা বার্থের একপাশে অনুমতি নিয়ে কানপুরের অপেক্ষায় বসে আছি সেই সময় সে ভদ্রলোক আমার প্রতি চেয়ে ফেলে, হেসে, আর ভদ্রতার খাতিরে আলাপ না করে' থাক্‌তেপারলেন না। এঁর পরিধানে পায়জামা মিহি 'মির্জ্জাই', পায়ে জরীর নাগ্‌রা, এবং মুখে "দুরস্ত্ উদ্দু জবান্" দেখে আমি প্রথমে অত্যন্ত ভ্রমে পড়েছিলাম। এর পূর্ব্বে বেনারসের পর হ'তেই দিবানিদ্রার জন্যে আমরা পালা করে' দু' একবার এই কামরায় এসেছিলাম ও বরাবরই সন্দেহের দোলায় দু'লে এঁর জাতি নিরূপণের জন্য ব্যর্থপ্রয়াস করে' গিয়েছি। ভদ্রলোক তখন এমন চোস্ত ভাষায় একজন যুক্তপ্রদেশবাসী মুসলমানের সঙ্গে আলাপ জমিয়েছিলেন যে আমি তখনই এই প্রিয়দর্শন সহাস্য-আনন যুবকটির সঙ্গে বন্ধুত্ব-স্থাপনের আশা পরিত্যাগ করি, কিন্তু মনে সামান্য একটু ভরসাও ছিল। ইনি সস্ত্রীক চলেছিলেন, ও এঁর স্ত্রীকে বঙ্গবালা বলেই মনে হচ্ছিল। এখন এই রাত্রে চোখে পড়ল যে এঁদের "বার্থ" দুটির ওপর লেখা এঁদের নাম বাঙ্গালীরই নাম। এমন সময় পরিষ্কার বাংলায় ইনি আমায় হেসে জিগ্যেস করলেন "আপনি যে বহুরূপীর মতন এক মুহূর্ত্তে একেবারে নিজের চেহারা বদ্‌লে ফেল্লেন?" উত্তরে আমিও বল্লাম "আর আপনি? জবানটাকে একেবারে গাজীপুর থেকে ছুঁড়ে বাংলার পানা-পুকুরের পাড়ে এনে ফেল্লেন যে?" তারপর উভয়ে উভয়ের অবস্থা বুঝে নিয়ে প্রবল হাস্য-হিল্লোলের মধ্যে মিটমাট করে' ফেলা গেল। এইরূপে বিচিত্রভাবে যে

দেওয়ানী আম (দিল্লী)

আলাপ হয়ে গেল তা'র জেরটা বেশ ভাল করেই চলেছিল। তিনি যখন শুন্‌লেন যে আমরা দেশভ্রমণে বেরিয়ে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাত্রা কর্‌ব মনস্থ করেছি তখন তিনি সাদরে আমাকে বৃন্দাবনে তাঁর শ্বশুরালয়ে আশ্রয় নিয়ে মন্দিরাদি দেখবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। আমিও বেঁচে গেলাম; কেননা বৃন্দাবনে কোন ধর্ম্মশালায় উঠে পাণ্ডার হাতে আত্ম-সমর্পণ করবার কল্পনা, আমার মনের মধ্যে বিভীষিকা সৃজন করছিল। যাক্, কানপুরে ট্রেণ থামতেই আমি আমাদের সেই একচ্ছত্র রাজত্বে খিঁচুড়ির পরিণতি দর্শনার্থে ত্বরিতপদে নেমে গেলাম। যেতে যেতে ভাবছিলাম —নাম বলেছেন, বাঙ্গালীর; পরিচয় দিয়েছেন প্রসিদ্ধ এক পুরাতন মন্দিরের প্রধান পুজারীর ছোটজামাই; স্ত্রী বাঙ্গালীর মেয়ে। কি করে, বিবাহ হ'ল জামাতা মহাশয়ত আমাদের দিকের লোক। এই সব প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবন দর্শনটা যে সফল হ'বে সে কল্পনাও করতে পারা গিয়েছিল। জামাতৃ-বন্ধুরূপ লোভনীয় অবস্থাটা কি কম পুণ্যফলে লাভ করা যায়?

(ক্রমশঃ)
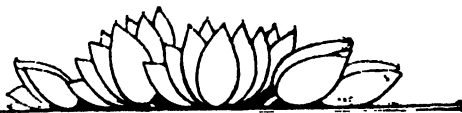
চীনে হিন্দুসাহিত্য

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

(৩)

ফাহিয়েন ভারতভূমি দেখিবার আশায় কিরূপে দুর্গম মরুপর্ব্বতসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্বকার প্রবন্ধে দেখিয়াছি। অতঃপর ৪০৪ খৃষ্টাব্দে সি চিমং নামক জনৈক চীনবাসী যুবক চৌদ্দজন বন্ধুর সহিত, মহাপ্রভুর জন্মভূমি দেখিবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে লইয়া পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হিমালয়ের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে নয়জন ফিরিয়া গেলেন; একজন পথে প্রাণত্যাগ করিলেন। অগত্যা চিমং অপর চারিজনের সহিত পাটলীপুত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে ফা-হিয়েন যে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে কতিপয় পুঁথি লইয়া যান, সেই ব্রাহ্মণের গৃহ হইতেই নির্ব্বাণসূত্র, মহাসঙ্ঘিক বিনয় প্রভৃতি কয়েকটী গ্রন্থ তিনিও সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। ফিরিবার পথে তাঁহার তিনজন সহচর প্রাণত্যাগ করেন। একজন মাত্র বন্ধুর সহিত তিনি লিয়াংচুতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে **নির্ব্বাণ সূত্রটী** তিনি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন ২০ অধ্যায়ে তিনি তাহার অনুবাদ করেন। এই অনুবাদটী কিন্তু এখন আর পাওয়া যায় না।

সি-হুই নামক লিয়াংচুবাসী অপর এক যুবক ধর্ম্মগ্রন্থসংগ্রহের উদ্দেশে কতিপয় বন্ধুর সহিত পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করেন। খোটানে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন সেখানে **পঞ্চবার্ষিক** উৎসব চলিতেছে। ফা-হিয়েন কাশগড়ে এইরূপ একটী উৎসবের কথা বলিয়া গিয়াছেন। এই উৎসবে নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে শ্রমণগণ মিলিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি-সাধন কল্পে বিনয় ও সূত্রের ব্যাখ্যা করিতেন। সি-হুই ও তাঁহার বন্ধুগণ সংস্কৃত জানিতেন। শ্রমণদিগের মুখ হইতে শুনিয়া তাঁহারা সেই সকল মূলসূত্রের চীনা অনুবাদ করিয়া লইলেন। সেখানে যাহাকিছু দেখিলেন, শুনিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া আনিলেন। দেশে ফিরিয়া সেইগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। **দানমুক-নিদানসূত্র** নামক অবদানের একটী গ্রন্থ তাঁহারা খোটানে সংগ্রহ করেন। চীনা ও তিব্বতী ভাষায় ইহার অনুবাদ পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি 'Tales of the Wise and the Fool' বলিয়া পরিচিত।

ধর্ম্মক্ষেম নামক মধ্যএশিয়ার অধিবাসী জনৈক শ্রমণ হীনযান ও মহাযান উভয় সাহিত্যেই সুপণ্ডিত ছিলেন। কাশ্মীর যাইয়া তিনি তথায় কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। সেখান হইতে কুচায় যান; কুচা হইতে তুর্ফানে (Tourfan) ও তুর্ফান হইতে অবশেষে চীনে আগমন করেন। যে কয়টী গ্রন্থ তিনি চীনভাষায় অনুবাদ করেন তাহার মধ্যে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের অনুবাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থ তাঁহাকে চীন সাহিত্যের ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইৎসিং ভারতবর্ষে আসেন। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন যে অতি সংক্ষিপ্ত ভাষায় অশ্বঘোষ এমনভাবে ইহাতে নানাপ্রকার গভীর বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন যে ইহা পাঠ করিয়া পাঠকগণ ক্লান্ত হননা। এই গ্রন্থপাঠ একটী পূণ্যকর্ম্ম বলিয়া মনে করা হয়। ভারতবর্ষের পঞ্চদিকে এই গ্রন্থ পড়া হয়, দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলের প্রদেশ সমূহেও (সুমাত্রা, জাভা ও নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে) ইহার সমাদর।

এই যুগের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক হইলেন গুণভদ্র। তিনি ছিলেন মধ্যএশিয়াবাসী ব্রাহ্মণ। পঞ্চবিদ্যা, জ্যোতিষ, লিপি, গণিত, আয়ুর্ব্বেদ, তন্ত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণোপযোগী সকল শিক্ষাই তিনি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অভিধর্ম্মেই তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। মহাযান সম্বন্ধে তাঁহার মতকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা হইত। তাঁহার পিতামাতা ও

শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

আত্মীয়স্বজন তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা বিশেষ অনুমোদন না করায় গৃহত্যাগ করিয়া তিনি শ্রমণ হইলেন। হীনযানের সকল গ্রন্থ তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়া তিনি দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মন তৃপ্তি মানিল না। তাহার পর এক মহাযান গুরুর নিকট যাইয়া তিনি বিশেষভাবে অবতংসক অধ্যয়ন করেন। ভ্রমণ করিতে করিতে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া তিনি সিংহলে যাইলেন; সেখান হইতে আবার পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে বহুবাধা অতিক্রম করিয়া অবশেষে ৪৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি চীনে আসিয়া পৌছিলেন। গুণভদ্র যে সকল গ্রন্থ অনুবাদ করেন তাহার মধ্যে **লঙ্কাবতার সূত্র** অন্যতম। মূল গ্রন্থখানি এখনও পাওয়া যায়। বৌদ্ধদর্শনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইহা একটী। যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ নামক দার্শনিক মতের ইহা একটী প্রামাণ্যগ্রন্থ। বিজ্ঞানবাদীদিগের অতীন্দ্রিয়বাদ, সর্ব্বাস্তিবাদীদিগের বস্তুতন্ত্রবাদ (Realism) এর সম্পূর্ণ বিরোধীমত, সহসা এইরূপই মনে হয়। সর্ব্বাস্তিবাদীগণ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে জড়-জগতের ও মানসিক ধর্ম্মগুলির একটী স্থায়ী সত্ত্বা আছে, যোগাচারীগণ বলেন যে, পৃথিবীর সকল বস্তুই আমাদের বিজ্ঞানের (consciousness) প্রকাশমাত্র। সর্ব্বাস্তিবাদীগণ বস্তু ও মন উভয়কেই সত্য বলিয়া মানিয়াছেন, বিজ্ঞানবাদী বলেন কেবল মনই সত্য। মাধ্যমিকগণ যে শূন্যতাবাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন, বিজ্ঞানবাদী তাহাতে তৃপ্ত নহেন। শূন্যতাবাদে বস্তুর সত্ত্বা অস্বীকার করা হয়না, বস্তু ক্ষণস্থায়ী, অনিত্য ইহাই বলা হয়। বিজ্ঞানবাদে বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করা হয়। বিজ্ঞানবাদে আলয় বিজ্ঞানের মতটী সুস্পষ্ট করিয়া তোলা হইয়াছে। আলয় বিজ্ঞানের অর্থ এই যে বিজ্ঞানের একটী নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ ক্রমাগতই বহিয়া চলিয়াছে। একটীর পর একটী করিয়া বিজ্ঞান ক্রমাগতই পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিতেছে। হিন্দুদর্শনে আত্মা অপরিবর্ত্তনীয় বলা হয়, বিজ্ঞানবাদে বলা হইতেছে বিজ্ঞান পরিবর্ত্তনশীল, ক্রমাগতই তাহার পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই বিজ্ঞানবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের চিন্তাধারারই বিবর্ত্তনের ফল। সর্ব্বাস্তিবাদীগণ ছয়টী বিজ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন— চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মানস। যোগাচারীগণ আরও দুইটী বিজ্ঞান যোগ করিয়াছেন—মনোবিজ্ঞান ও আলয়-বিজ্ঞান। এই আলয়বিজ্ঞানের মতটী অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙনাগ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পরিপুষ্ট ও সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিতদিগের মতামত সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া আমরা এবিষয়ে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করিব।

অন্যান্য মহাযান সূত্রের সহিত লঙ্কাবতার সূত্রের কয়েকটী বিষয় প্রভেদ আছে। প্রথমত ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়টী সুস্পষ্ট ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ফুটাইয়া তোলা হয় নাই। একটীর পর একটী করিয়া কতকগুলি প্রস্তাবনা দ্বারা বিষয়টী ইঙ্গিত করা হইয়াছে মাত্র। দ্বিতীয়ত, ইহাতে কোনও অলৌকিক শক্তির প্রভাব দেখান হয় নাই; গভীর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বে ইহা পূর্ণ। তৃতীয়ত ইহাতে কোনও ধারণা বা মন্ত্র নাই। গ্রন্থখানির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইল বোধিজ্ঞান বা মহাযানের সত্য সম্বন্ধে বুদ্ধের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। প্রধানত পাঁচটী ধর্ম্মের কথা, বস্তুর তিনটী রূপের বিষয়, আটটী বিজ্ঞান সম্বন্ধে ও অহংভাব দূরীকরণের দুইটী উপায় সম্বন্ধে ইহাতে বলা হইয়াছে। যোগাচার দর্শনের প্রাথমিক গ্রন্থগুলির মধ্যে লঙ্কাবতারসূত্র একটী। নেপালে বৌদ্ধগণ এই গ্রন্থটীকে তাহাদের নয়টী ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে একটী মনে করেন ও ইহার যথেষ্ট সমাদর করেন।

গুণভদ্র **মিলিন্দপঞ্হো** নামক একটী প্রসিদ্ধ পালী গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুবাদ আমরা পাই না। যে অনুবাদটী আমরা পাই তাহার নাম **নাগসেনভিক্ষুসূত্র**; অনুবাদকের নাম জানা যায় নাই। গ্রন্থখানিতে ভিক্ষুনাগসেন ও গ্রীকরাজা মিলিন্দের (Menander) কথোপকথন প্রসঙ্গে **সর্ব্বমনাত্মম্** এই তত্ত্বটী ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে আত্মা অর্থে সাধারণত পরমাত্মার স্বরূপ বা প্রকাশ বুঝায়। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনে আত্মা বলিতে ভূতাত্মা, অহংভাবাপন্ন স্থূল জীবাত্মাকে বুঝায়। বৌদ্ধগণ এই স্থূল আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। রাজা মিলিন্দ যখন ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার নাম কি?" ভিক্ষু বলিলেন, "আমাকে সকলে "নাগসেন" বলিয়া জানে। আমার পিতামাতা সম্বোধনের সুবিধার জন্য আমাকে

"নাগসেন" আখ্যা দিয়াছেন; যেমন নাগসেন, তেমনি সুরসেন বা বীরসেন এরূপ অপর কোনও নাম দিতে পারিতেন, কারণ ঐগুলি কেবল আখ্যামাত্র; বস্তুতঃ ইহার পশ্চাতে কোনও স্থায়ী সত্ত্বা নাই।" এই উত্তরে বিস্ময়ান্বিত হইয়া রাজা ভিক্ষুকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, "তবে আত্মা কোন্‌টী? যে সকল বস্তু ভোগ করিতেছে, যে নির্ব্বাণ আকাঙ্ক্ষা করিতেছে সে যদি আত্মা নাহয় তবে আত্মা কে? নাগসেন কে?" ইহার পর তিনি দেহের প্রত্যেকটী অঙ্গ বিচ্ছিন্ন ভাবে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাকেই কি নাগসেন বলা চলে।" নাগসেন সকল প্রশ্নের উত্তরেই "না" বলিলেন। তাহার পর নাগসেন রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তুমি যে রথে আসিয়াছ, সেই রথের দণ্ড, চক্র বা সূত্র—কোন্‌টাকে রথ বলা যায়?" রাজা বলিলেন, "কোনটীকেই রথ বলা যায় না। এই সকল উপকরণের সমাবেশই রথ।" ভিক্ষু প্রীত হইয়া বলিলেন, "ইহাই সত্য। এই দেহের বিভিন্ন দ্বাত্রিংশৎ উপকরণ ও জীবের পাঁচটী স্কন্ধ বা রূপের সমাবেশই এই আত্মা—এই সমষ্টিকেই আমরা "নাগসেন" বা অন্য সাধারণ একটী আখ্যা দিয়া থাকি।" গ্রন্থটীর চীনা ও পালী দুইটী সংস্করণ মিলাইয়া দেখা যায় যে প্রথম দিকে ভূমিকার অংশটুকুর মধ্যে ইহাদের যথেষ্ট প্রভেদ আছে; কিন্তু মূল অংশে প্রায় সম্পূর্ণ মিলে। Sprecht ও Leiv বলেন যে এই দুইটী গ্রন্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কিন্তু Pelliot দেখাইয়াছেন যে একই গ্রন্থের ঐ দুইটী বিভিন্ন সংস্করণ। এখন এই দুইটী সংস্করণের মধ্যে কোনটী অধিক পুরাতন ও প্রামাণ্য তাহা বলা কঠিন। পালী গ্রন্থটী অপেক্ষা চীনা গ্রন্থটী আকারে ক্ষুদ্র।

গুণভদ্র ব্যতীত এই যুগে আরও দুইজন হিন্দুশ্রমণ চীনে আসিয়াছিলেন—ধর্ম্মমিত্র ও কালযশ। ধর্ম্মমিত্র ছিলেন কাশ্মীরের অধিবাসী। শৈশবকাল হইতেই তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পিতামাতার অনুমতি লইয়া তিনি কাশ্মীরে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধপণ্ডিতদিগের নিকট বৌদ্ধ ধর্ম্ম শিক্ষা করিলেন। তাহার পর বুদ্ধের বাণী প্রচারার্থে ভারতের বাহিরে যাত্রা করিলেন। কুচায় আসিয়া কিছুকাল বাস করার পর তিনি টুংমিয়াংএ আসিলেন ও তথায় এক বিহার নির্ম্মাণ করাইলেন। তাহার পর পুনরায় দক্ষিণা-ভিমুখে চলিলেন। অবশেষে চীনের রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১২টী গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেন, তাহার মধ্যে ৬টী পাওয়া যায়। তাঁহার **হস্তিকাখ্যায়** নামক গ্রন্থের উল্লেখ শান্তিদেবের শিক্ষাসমুচ্চয়ে রহিয়াছে।

কালযশ ৪২৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে চীনে আসেন। তিনি দুইটী গ্রন্থ অনুবাদ করেন; তাহার মধ্যে একটীর প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে সুখাবতী—গ্রন্থটীর নাম **বুদ্ধভাষিত অমিতায়ুবুদ্ধসূত্র**। গ্রন্থটীর প্রথমে ৬০ পংক্তিতে একটী চীনা কবিতা রহিয়াছে—কবিতাটী বুদ্ধ অমিয়তায়ুর স্তোত্র। কোনও সম্রাট্ কবিতাটী রচনা করিয়াছেন এইমাত্র বলা হইয়াছে। সম্রাটের নাম দেওয়া হয় নাই। সম্ভবতঃ লিউ-সুং বংশের সম্রাট্ বাই (Wei) ইহার রচয়িতা; কারণ তিনি এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

লিউ সুং রাজাদিগের সময় অন্যান্য যে সকল অনুবাদকের নাম পাওয়া যায় তাঁহারা সকলেই চীনবাসী। সি-চে-ইয়েন ও পাও-ইয়েন নামক দুই জন শ্রমণ ফা-হিয়েনের সহিত ভারতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু কাশ্মীর পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহারা আর অগ্রসর হইলেন না। কাশ্মীরে তিন বৎসর থাকিয়া তাঁহারা বৌদ্ধগ্রন্থ সমূহ আলোচনা করেন। অবশেষে সেখান হইতে কতকগুলি পুঁথি সংগ্রহ করিয়া লইয়া চীনে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে যাইয়া তাঁহারা ১৪টী গ্রন্থের অনুবাদ করেন, তাহার মধ্যে ৪টী রহিয়াছে। এইরূপ প্রবাদ যে চে-ইয়েন পুনরায় কাশ্মীরে যান, সেখানে ৭৯ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ফাহিয়েনের ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশিত হইবার পর চীনের যুবকদিগের মধ্যে ভারতভূমি দেখিবার একটি প্রবল আগ্রহ দেখা দিল। ৪২০ খৃষ্টাব্দে ২৫ জন তরুণ শ্রমণ ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন; চি-ফা-ইয়ং তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান। উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া গঙ্গা পার হইয়া তাঁহারা দক্ষিণে আসেন। সেখান হইতে পুনরায় এক জাহাজে করিয়া তাঁহারা ক্যাণ্টনে আসিয়া পৌঁছেন।

শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

এই যুগের যে সকল চীনা শ্রমণ অনুবাদক ছিলেন তাঁহাদের সকলের সম্বন্ধে বলা নিষ্প্রয়োজন। অনেকেরই কাহিনী এখন আর জানিবার কোন উপায় নাই, বহু গ্রন্থও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সিউ-কিউ-কিংচেংএর নাম এস্থলে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি শ্রমণ ছিলেন না, ছিলেন গৃহপতি। কিংচেং যখন যুবক মাত্র তখন খোটানে যান, সেখানে গোমতী মহাবিহারে থাকিয়া বুদ্ধসেনের নিকট কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। বুদ্ধসেন ছিলেন মহাযান সম্বন্ধে সুপণ্ডিত। খোটান হইতে কিং-চেং তুর্ফানে যান। এই দুই স্থান হইতেই তিনি কয়েকটী সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করেন। তারপর দেশে ফিরিয়া আসিয়া ধ্যানের গভীরতা প্রতিপাদক একটী গ্রন্থ অনুবাদ করেন; গ্রন্থটী এখন আর পাওয়া যায় না। তৎপরে তিনি ক্রমান্বয়ে ৩৫টী গ্রন্থ অনুবাদ করেন, তাহার মধ্যে ১৬টী মাত্র পাওয়া যায়!

৫০২ খৃষ্টাব্দে উ-তি (Wuti) নামক এক সম্রাট্ দক্ষিণ চীনে লি-য়াং রাজত্ব স্থাপন করেন। নানকিংএ তাঁহার রাজধানী ছিল। জীবনের প্রথম দিকে তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। কিন্তু পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি কি যুদ্ধ, কি রাজকার্য্য সকল বিষয়ে উদাসীন হইয়া গেলেন। ৫১০ খৃষ্টাব্দে পাও-চি নামক এক তান্ত্রিক শ্রমণের নিকট তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। নূতন ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ এমনই প্রবল হইল যে, কেবল পশুবলি বন্ধ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, কারুকার্য্যের মধ্যেও পশুর চিত্র অঙ্কণ করিতে দিতেন না। তিনি বলিতেন যে সেই সকল চিত্র কাটিতে কাটিতে প্রাণীজীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধে লোকদিগের বোধশক্তি অসাড় হইয়া যাইবে। সম্রাট্ অশোকের আদর্শ তিনি সম্মুখে রাখিতেন। ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতাতে তাঁহার সমকক্ষ হইতে না পারিলেও ধর্ম্মানুরাগে তিনি অনেকেরই সমকক্ষ ছিলেন। সভা করিয়া তিনি সূত্র সমূহ ব্যাখ্যা করিতেন। বৌদ্ধ অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। তিনবার বৌদ্ধ মঠে যাইয়া রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন, মন্ত্রীগণের অনুযোগে ও অনুরোধে তিনবারেই তাঁহাকে ফিরিয়া আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

এই লি-য়াং রাজত্বের সময় ভারত হইতে চার জন অনুবাদক চীনে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এই যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় শ্রমণ হইলেন বোধিধর্ম্ম। তিনি অনুবাদক ছিলেন না; বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্যানশাখার তিনি প্রবর্ত্তক। চীনে এই শাখার নাম হইল চান্ (Chan), জাপানে বলে জেন্ (Zen)।

জেন পণ্ডিতগণ বলেন যে, বুদ্ধের সময় হইতেই এই শাখার অভ্যুদয়। চীনে 'চান' সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ বলেন যে বুদ্ধের পরে ২৮ জন গুরু ক্রমান্বয়ে এই দর্শন ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছিলেন। অষ্টাবিংশতিতম গুরু হইলেন বোধিধর্ম্ম; তিনি ৫২০ খৃষ্টাব্দে চীনে আসেন। বোধিধর্ম্ম হইলেন দক্ষিণ ভারতের হিয়াংসি নামক এক রাজার তৃতীয় পুত্র। কেহ কেহ অনুমান করেন বোধিধর্ম্ম পারস্যের লোক। কথিত আছে যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ভিক্ষুর ব্রত অবলম্বন করিলেন ও প্রজ্ঞাতার নামক গুরুর নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করিতে লাগিলেন। গুরুর মৃত্যুর পর তিনি কিছুকাল ধ্যানে শ্রদ্ধাবিহীন অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিজমত প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে গুরু যেরূপ আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন তদনুসারে চীন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহার তিন বৎসর কাটিয়া গেল। চীনে পৌছাইলে লি-য়াং বংশের রাজা উ (Wu) তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার রাজধানী নান-কিংএ লইয়া গেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজা এই ভিক্ষুর বাণীর মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইলেন না। বোধিধর্ম্ম ইহা বুঝিতে পারিয়া লিয়াং রাজ্য ছাড়িয়া উত্তরে উই (Wei) দিগের রাজ্যে চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি শাওলিন্ বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইরূপ কথিত আছে যে নয় বৎসর অহরহ তিনি প্রাচীর গাত্রে লীন হইয়া নীরবে ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। এই কারণে তাঁহাকে "প্রাচীরাবলম্বীশ্রমণ" বলা হইত। প্রবাদ এই যে ৫২৮ খৃষ্টাব্দে ১৫০ বৎসর বয়সে বোধিধর্ম্মের মৃত্যু হয়। বোধিধর্ম্ম উত্তর চীনেই বহুকাল যাপন করেন

ও তথায় মারা যান; কিন্তু ধীরে ধীরে দক্ষিণেও তাঁহার বাণীর প্রভাব বিস্তৃত হইতে লাগিল। কোনও গ্রন্থ বোধিধর্ম্ম লিখিয়া যান নাই। তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মে গ্রন্থের স্থান ও মূল্য সম্বন্ধে তেমন আস্থাবান্ নহেন। তাঁহাদের মতে মনই একমাত্র জ্ঞানের আধার, মনই একমাত্র আলোচ্য বিষয়। গ্রন্থ হইতেছে মনেরই পরোক্ষ অনুভূতির ফল। ধ্যান সম্প্রদায়গত ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, তাঁহাদের মত বুদ্ধের বাণীর একটী বিশেষ প্রকাশ; অন্যান্য প্রামাণ্য ধর্ম্মগ্রন্থের সহিত ইহার কোনই যোগ নাই। ইহার একমাত্র লক্ষ্য হইল মনকে উপলব্ধি করিয়া বুদ্ধত্বলাভ। সূত্র, অভিধর্ম্ম প্রভৃতি গ্রন্থের উপর তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্ভর করেন না, আত্মার প্রতি আস্থাই (ধ্যানই) তাঁহাদের নিকট একমাত্র প্রামাণ্য, বাহিরে কিছুই প্রামাণ্য নাই। ধর্ম্মগ্রন্থগুলির একমাত্র মূল্য এই যে তাহারা ধর্ম্মসাধনের পথ নির্দ্দেশ করে মাত্র; ইহার অধিক তাহাদের মূল্য নাই। অতীতের মত না লইয়া নিশ্চিন্ত না থাকিয়া বর্ত্তমান বাস্তবের দিকেই অধিক মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য ধ্যানশাখার ইহাই মত।

লিয়াংশুতে অর্থাৎ লিয়াংদিগের ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায় যে সেই সময় ইন্দোচীনের (Further India) সহিত বিশেষত ফুনানের (Funan)এর সহিত চীনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ফুনানে একটী হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয়। পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও শৈবধর্ম্ম উভয়ই সমভাবে এখানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। চীনা ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায় যে এই রাজ্য হইতে কয়েকজন শ্রমণ চীনে যান। ৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ফুনানের রাজা বুদ্ধের এক গাছি কেশ চীনে প্রেরণ করেন, সেই কেশ সেখানে মহাসমারোহের সহিত গৃহীত হয়। ফুনান হইতে যেসকল হিন্দুশ্রমণ চীনে যান তাঁহাদিগের মধ্যে দুইজন হইলেন মন্দ্রসেন ও সঙ্ঘভদ্র। মন্দ্র তিনটী গ্রন্থ অনুবাদ করেন, তাহার মধ্যে একটী হইল **সপ্তশতিকাপ্রজ্ঞা-পারমিতা**। সঙ্ঘভদ্রও ইহার অনুবাদ করেন এবং পরে হুয়েনসাং পুনরায় ইহার আর একটী অনুবাদ করেন। মূল সংস্কৃত গ্রন্থখানি এখন পাওয়া যায় না। মন্দ্রসেনের **রত্নমেঘসূত্রের** অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখ্য করা প্রয়োজন। পরবর্ত্তীকালে বোধিরুচি পুনরায় ইহার একটী অনুবাদ করেন। শিক্ষাসমুচ্চয়ে যেরূপ বারবার নানাপ্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ আছে তাহাতে গ্রন্থখানির মূল্য কতখানি তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। মনঃসংযম, অসৎসঙ্গ পরিহার, নৈরাত্ম্য পরিত্যাগ, ভোগের পবিত্রতা ও অপবিত্রতা—এই সকল বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া শান্তিদেব শিক্ষাসমুচ্চয়ে রত্নমেঘসূত্র হইতে অংশবিশেষ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে বলা হইয়াছে যে অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিরও উপকার করিবে ও সকলের মুক্তির জন্য অর্ঘ্য প্রদান করিবে। শিক্ষাসমুচ্চয় মূল সংস্কৃত গ্রন্থখানি হইতে একটী অংশের অনুবাদ দিতেছি:—

"তিনি তথাগতের স্তূপ বা মূর্ত্তির সম্মুখে ফুল, সুগন্ধী দ্রব্য স্থাপন করিয়া প্রার্থনা করেন যে, সকল মানবের মন হইতে কালিমা মুছিয়া যাক্ ও তিনি তথাগতের স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি নিজেকে শোধন করিয়া আচরণের অশোভনতা দূর করেন ও সমগ্র মানবের আচরণ যাহাতে শোভন হয় তাহার জন্য প্রয়াস পান। ফুলের সৌরভে পরিপূর্ণ একটী আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়া তিনি সকল মানবের মোহ ও দুঃখ দূর করিবার একটী প্রশস্ত পথ দেখাইয়া দেন। যখনই কোনও বিহারে গমন করেন, তিনি মনে মনে প্রার্থনা করেন যেন আমি সকল ব্যক্তিকে নির্বাণের দ্বারে লইয়া উপনীত করিতে পারি। যখন তিনি বাহির হইয়া যান তখন মনে মনে ভাবেন যেন আমি পুনর্জন্মের পথ দিয়া সকল লোকের মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতে পারি। গৃহের দ্বার খুলিবার সময় তিনি বলেন, যেন আমি অধ্যাত্মজ্ঞান দ্বারা নির্বাণের যে প্রশস্ত পথ সমগ্র লোকের সম্মুখে তাহার দ্বার খুলিয়া ধরিতে পারি; যখন তিনি দ্বার বন্ধ করেন তখন বলেন, যেন সকল লোকের নিকট হইতে পাপের দ্বার রোধ করিয়া দিতে পারি; যখন তিনি বসেন, তখন মনে করেন জ্ঞানের আসনে সমগ্র মানবকে যেন আমি বসাইতে পারি; যখন দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকেন তখন মনে করেন সকল লোককে যেন নির্বাণে লীন করিয়া দিতে পারি; যখন গাত্রোত্থান করেন তখন মনে করেন যে, সকল মানবকে যেন

শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে পারি। এইরূপে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে প্রত্যেক কর্ম্মে তিনি সমগ্র মানবের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন। যখন তথাগতের স্তূপের সম্মুখে ভক্তিভরে প্রণাম করেন তখন তিনি মনে মনে প্রার্থনা করেন যে, সকল মানব যেন স্বর্গে, মর্ত্ত্যে এইরূপে অভিনন্দিত হয়।" বোধিসত্ত্বের এই সর্ব্বমানবের কল্যাণকামনায় যে সুন্দর জীবনযাপনের আদর্শ ইহার উপর কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। এই আদর্শ সম্মুখে উপস্থিত করার জন্য রত্নমেঘের এত সমাদর।

সঙ্ঘভদ্র ছিলেন অভিধর্ম্মে সুপণ্ডিত। দক্ষিণ এশিয়ায় তাঁহার খ্যাতি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ৫০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি চীনে আসেন। ১৭ বৎসর ধরিয়া কার্য্য করিয়া ১১টী গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেন। ৫২৪ খৃষ্টাব্দে ৬০ বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। তাঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে একটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; সেটী হইল **বিমোক্ষ-মার্গ সূত্র**। ইহার চীনা নাম হইল Cie-to-Tao অর্থাৎ মুক্তির পথ। পালী বিমুক্তি মার্গের সহিত ইহা মিলে। বিশুদ্ধি ও বিমুত্তি দুইএরই প্রকৃত অর্থ নির্ব্বাণ বা অর্হত্ব; শব্দেতেও দুটী প্রায় মিলে। দুইটীর বিষয় সূচী মিলাইয়া বুঝা যায় যে বিশুদ্ধিমার্গ অপেক্ষা বিমুত্তিমাগ্‌গই অধিক পুরাতন ও প্রকৃত অর্থের সহিত ইহার যোগ অধিক। শীল, জ্ঞান, পুণ্য ও বিমুত্তি—এই চারিটী বিষয় গ্রন্থটীতে বিবৃত করা হইয়াছে। চীনা গ্রন্থটি কিন্তু সাধারণভাবে বিশুদ্ধি-মাগ্‌গের সহিত মিলে। সিংহলে উপতিস্স কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বিমুত্তিমাগ্‌গ প্রথম সঙ্কলিত হয়। বহুদিন পর্য্যন্ত ইহাকে বৌদ্ধসাহিত্যের একটী অভিধান (Encyclopaedia) বলিয়া মনে করা হইত। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দলের হস্তে পড়িয়া মূল সংস্করণ হইতে কোনও কোনও স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। মধ্যভারতবাসী গুণভদ্র ৪৩৫ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ চীনে লইয়া যান, না কম্বোজবাসী সঙ্ঘভর ৫০৫ খৃষ্টাব্দে ইহা আনেন, অথবা ইঁহাদের পূর্ব্বেই গ্রন্থখানি চীনে লইয়া আসা হয়,—সে সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না কিন্তু গুণভদ্রের শিষ্য সঙ্ঘভরই ইহার অনুবাদ করেন। অপরদিকে বুদ্ধঘোষ ৪২০ খৃষ্টাব্দে সিংহলে আসেন ও সমগ্র বৌদ্ধসাহিত্য সঙ্কলন করিতে আরম্ভ করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সঙ্কলিত বিশুদ্ধিমাগ্‌গ উপতিস্সের বিমুত্তিমাগ্‌গেরই সংশোধিত সংস্করণ। বিমুত্তিমাগ্‌গের বিষয় সূচী হইতে দেখা যায় যে বৌদ্ধ অভিধর্ম্মরই উহা সঙ্কলন মাত্র। বিশুদ্ধিমাগ্‌গ ও বিমুত্তিমাগ্‌গ দুইটী মূলত একই গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ।

(ক্রমশঃ)

সহযোগী-সাহিত্য

ভিসন্ত্ ব্লাস্কো ইবানেজ্

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

ব্যক্তির মতো জাতিরও মানস-সত্তা আছে। দুটি ব্যক্তির অন্তরে একই মানব-মন বাস করলেও পরস্পরের শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক ও জন্মগত সংস্কার মর্ম্মগত বৈলক্ষণ্যের সৃষ্টি করতে পারে; দুটি জাতির অন্তরাত্মা তেম্নি মূলত একই উপাদানে গঠিত হলেও গঠনপ্রক্রিয়ার ভিন্নতা বশত তাদের বিভিন্নতা-লাভ স্বাভাবিক। জাতীয় জীবনে এই জন্য পূর্ব্ব পশ্চিমের উৎপত্তি। জাতি ভেদের সহিত সাহিত্যেও বিভেদ আসে অর্থাৎ ও বস্তুর বিশ্বজনীতা সত্ত্বেও প্রতি জাতি স্বরচিত সাহিত্যে স্বীয় মনের ছবি চিত্রিত করে দিয়ে থাকে। এই সকল চিত্রসংযোগেই বিশ্ব সাহিত্য প্রদর্শনীর বৈচিত্র্য। রুষ সাহিত্য দুঃখ ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধির প্রয়াসী; ফরাসী সাহিত্য দৈহিকতার দেহে অধ্যাত্মিক আত্মা দর্শনোৎসুক; ইংরাজি সাহিত্য জানায় শতসহস্রের পায়ে চলা জনবহুল রাজপথই তার পথ। শেষোক্ত সাহিত্য গ্রহণ করার পূর্ব্বে অত্যন্ত সাবধানে পরীক্ষা এবং প্রয়োজনানুসারে বর্জ্জন করে নেয়; এবং বার্ণার্ড শ'য়ের মত যে সকল লেখক বিশ্বের প্রাণ-শক্তির ঠিক মাঝখান হতে নিশ্বাস গ্রহণ করেন, তাঁদের প্রতি বহুদিনযাবৎ তীব্র সন্দেহ-কুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করতে থাকে।

আধুনিক বিশ্বসাহিত্যরাজ্য গণতান্ত্রিক, সেই জন্য যে সকল সাহিত্যের যুগাগত আভিজাত্য-গৌরব ছিল না, তাদের আকস্মিক কৌলিন্যলাভে বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক হলেও সঙ্গত নয়। নরওয়ের সাহিত্য সেদিনের সৃষ্টি, যেহেতু তার পৌরাণিক ভাণ্ডারের মণিরত্ন সাহিত্যের পরীক্ষায় সামান্য পাথরের সামিল। নরওয়ের মত সুইড ও পোলিস সাহিত্যও এতদিন অকুলিন ছিল, এখন কৌলিন্যের মর্য্যাদা লাভ ক'রে এই গণতন্ত্রের প্রাধান্য সপ্রমাণ করছে। স্প্যানিস্ সাহিত্যের গৌরব ছিল, কিন্তু আভিজাত্য ছিল না; যেহেতু গৌরবের জন্য বহুর প্রয়োজন হয় না, একের দ্বারাও ও বস্তু লব্ধ হয়, কিন্তু আভিজাত্য পেতে হলে একাধিকের প্রয়োজন অনিবার্য্য। Cervantis ভিন্ন স্প্যানিশ সাহিত্যে ইতিপূর্ব্বে ইবানেজের মত শক্তিমান অন্য কোনো লেখকের আবির্ভাব হয়নি।

"The passionate flame of a deeply human purpose welds the man's literary labours into a larger unity. His pen, as his person, has been given over to humanity." ইবানেজের কোনো পুস্তকের ভূমিকাকার উপরোক্ত কথাগুলি লিখেছেন। সচরাচর ব্যবহৃত বিশেষণ রাশির যেমন বিশেষ কিছু অর্থ থাকে না, এ কথার প্রথমাংশেরও তেম্নি কোনো অর্থ নেই, কারণ সব দেশের সব বড় লেখকের সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য। উক্ত কথার শেষাংশ কিন্তু গভীর অর্থ নিহিত আছে; এবং পৃথিবীর যে সব লেখকের সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে তাঁদের সংখ্যা অধিক নয়। মানবতার জন্য লেখনী-নিয়োগ জগতে সুলভ; মানবতার জন্য আত্মনিয়োগ জগতে অত্যন্ত দুর্লভ। সাধারণ আর্টিষ্টের আদর্শ সচরাচর আকাশচারী হয়, কারণ মাটির সংস্পর্শ লাভের সাহস সে আদর্শের নেই। এই সাহস যে শিল্পীর আদর্শের আছে, সে শিল্পী শুধু

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

সৌন্দর্য্য সৃজনে তৃপ্ত নয়, নিজেকে সুন্দর ক'রে সৃষ্টি করার আগ্রহ, অর্থাৎ জীবনটাকে শিল্পে পরিণত করার আকূতি, তাঁর তীব্র। সৃষ্টির পূর্ব্বে দৃষ্টির প্রয়োজন; শিল্পী যে দৃষ্টিতে জগতকে দেখে থাকেন, সেই দৃষ্টির আলোয় তিনি আত্মগঠন করেন। আধুনিক ফ্রান্সের ইতিহাসে এর প্রমাণ স্পষ্ট। তার দু'জন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর একজন গত মহাযুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং আর একজন তার সমর্থনে তাঁদের শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন। রোমাঁ রোলাঁ ও আনাতোল ফ্রাঁস্ দুজনের এই দুইরূপ আচরণের মূলে ছিল একই মনোভাব,—স্বদেশপ্রীতি। এই প্রীতির জন্য তাঁরা শুধু লেখনী নিয়োগ করেননি; রোলাঁ নির্ব্বাসন দণ্ড বরণ ক'রে নিয়েছিলেন, এবং আনতোল সেই বৃদ্ধ বয়সে সৈনিকের কার্য্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। একই বস্তু বিভিন্ন ভাবে দেখলে বিভিন্ন দেখায়। দৃষ্টির এই বিভিন্ন ভঙ্গী বশত শিল্পীর আত্মসৃষ্টি কার্য্যেও প্রভেদ আসে, অর্থাৎ একই উদ্দেশ্যে প্রতি শিল্পী তাঁর একান্ত নিজস্ব, অন্য সকলের হতে পৃথক, পথ অবলম্বন করে থাকেন।

আত্মসৃষ্টির প্রয়োজন বোধ হতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর স্থাপনা করেছেন। কথাটা অবশ্য নূতন, কিন্তু নূতন কথাও সত্য হয়। তরুণী প্রথম যখন সন্তানের জননী হয়, তখন তার ভিতরে বাহিরে ঝড়ের মত দ্রুত যে পরিবর্ত্তন ব'হে যায় তা লক্ষ্য করবার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। এ পরিবর্ত্তন আসলে পরিবর্দ্ধন অর্থাৎ সৃষ্টি। শিশুর সৃষ্টির সহিত মা নিজেকেও সৃষ্টি করতে থাকে। এইজন্য মা যেমন শিশুর স্রষ্টা, শিশু তেম্নি মায়ের স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের মানস সন্তান বিশ্বভারতী কবির সৃষ্ট এবং তাঁর স্রষ্টা। সেইজন্য জগতের কাছে বিশ্বভারতীর যা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের কাছে সে প্রয়োজন তদধিক। এইরূপই একটা প্রয়োজন-বোধ ইবানেজকে কল্পলোকের বাহিরে কর্ম্মলোকে আনয়ন করেছে। তাঁর কর্ম্মলোক স্বভাবত অন্যান্য শিল্পীদের কর্ম্মলোক হতে পৃথক; সমাজনীতি ও রাজনীতির ভিত্তির উপর তার স্থিতি।

ইবানেজের শিল্প তাঁর এই জীবনের একটা দিক্। জীবনে যে শ্রান্তিহীন সংগ্রাম তাঁর চক্ষে অগ্নির সঞ্চার করত, সে অগ্নির দীপ্তি তাঁর শিল্পের বক্ষে আভা ফেলেছে। ব্রাউনিং লিখেছেন, "I was ever a fighter", ইবানেজের জীবন নীরবে এই কথা জ্ঞাপন করে। আধুনিক স্পেনের রাজনৈতিক আকাশের বর্ণ যে নীল নয়, কালো—একথা সর্ব্বজনবিদিত; এই কৃষ্ণতার সহিত সংগ্রামে ইবানেজের ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু স্পেনের সমাজ-সৌধ যে জঞ্জালে ভরে আছে এ কথা সর্ব্বজনবিদিত নয়। উক্ত সৌধের সংস্কারার্থে স্পেনের যৌবনশক্তি অভিযান করেছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানুষের মন স্বভাবত রক্ষণশীল; তাই স্পেনের তরুণ সংস্কারকদের বিপক্ষে যে শত শত কণ্ঠ গর্জ্জন করে উঠবে, সে বিচিত্র নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে দয়া নেই, ক্ষমা নেই, বিশ্রাম নেই; একপক্ষের পতনে ও অপরপক্ষের বিজয়হুঙ্কারে তার অবসান। ইবানেজ বহুপূর্ব্বে তাঁর তারুণ্য অতিক্রম করেছিলেন, কিন্তু তিনিই হয়েছিলেন এই তরুণ দলের নেতা, যেহেতু কর্ম্ম ছিল তাঁর শিল্পীজীবনের ধর্ম্ম, এবং যোদ্ধারূপে নিজেকে সৃষ্টি করার আগ্রহ ছিল তাঁর এই কর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রকৃত স্বরূপ।

নরওয়েজিয় ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে এইখানে ইবানেজের তফাৎ,—ন্যুট হাম্‌সুন্ বা বোয়ারের উপন্যাসে সর্ব্বত্রই জীবনের পরিপূর্ণতা—অর্থাৎ তার এপিঠ ওপিঠ, বেদনা ও হর্ষ—প্রকাশমান। কিন্তু সে বেদনায় রক্ত ঝরে না, এবং সে হর্ষ রোমাঞ্চকর নয়। হাম্‌সুন্ ও বোয়ারের চরিত্র-চিত্রণ রবীন্দ্রনাথের নিখিলেশের চিত্রণের মত; নিবিড় পরম-সংগত ভাব। ইবানেজের পরিকল্পিত বেদনা মানুষকে ক্ষিপ্ত ক'রে তোলে, এবং তাঁর হর্ষ নিজেকে শতধা বিদীর্ণ করে দিতে চায়; গোরার বোধশক্তির মত। কার পরিকল্পনা বড় সে প্রশ্ন এখানে অনর্থক, কারণ তার উত্তর নেই। এ শুধু দেখবার দুটি বিভিন্ন ভঙ্গী। ছেলেদের পত্রিকায় মাঝে মাঝে এমন ছবি ছাপা হয় যা দুদিক্ থেকে দেখলে দুটি বিভিন্ন ছবির মত দেখায়। জীবনের সর্ব্ব অঙ্গেই এইরূপ রহস্য-চিত্র মুদ্রিত; তাদের সবগুলিই সত্য অথবা সবগুলিই মিথ্যা। সত্য মিথ্যার মধ্যে সাদা ও কালোর মত কোনো তফাৎ মানুষ এ যাবৎ আবিষ্কার করতে পারেনি। হাম্‌সুন তাঁর দৃষ্টিভূমি থেকে মানুষের মধ্যে ভবিষ্যৎ মানবের ছবি দেখেন, এবং তার গাত্রে হস্তার্পণ ক'রে তার অন্তরস্থ আনন্দের উষ্ণতা অথবা ব্যথার ঈষৎ শৈত্য অনুভব করেন।

ইবানেজের কাছে আধুনিক মানুষ আদিম মানবের প্রতিচ্ছবি। তার দেহ উষ্ণ নয়, উত্তপ্ত, তার শিরায় অনুভূতির উন্মত্ত উচ্ছ্বাস প্রবাহিত ; অর্থাৎ সে শিরার রক্ত কখন অগ্নিস্রোতের মত এবং কখনো তুষারের প্রবাহ। "Education, laws and traditions do nothing but disguise the barbaric foundations of human nature"—এ ইবানেজের কথা। এই ভাব তাঁর লেখার বহুস্থলে বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "Sangre Y arene"র (রক্ত ও বালুকা) অংশ বিশেষ ধরা যাক। ও পুস্তক ইবানেজের শ্রেষ্ঠ রচনা না হলেও অত্যন্ত typical রচনা।

স্পেনের সমাজ-মনে যে সব কলঙ্কচিহ্ন আছে তার মধ্যে bull-fight-এর প্রতি অনুরক্তি প্রথমেই চোখে পড়ে। মানুষ ও দুর্দ্দান্ত পশুর সংগ্রাম ওদেশে জাতীয় ক্রীড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। সভ্যতাভিমানী ইউরোপের সুসভ্য স্পেন দেশে নানা স্থানে নিত্যই ও ক্রীড়া হয়ে থাকে এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি থিয়েটার, সার্কাস দেখার মত ও বস্তু দেখবার জন্য সমবেত হয়ে থাকেন। Bull-fight যাদের জীবিকা তাদের টরেডোর বলা হয়। 'রক্ত ও বালুকা' এইরূপ একজন টরেডোরের জীবন-কাহিনী। ও কাহিনী পাঠকালে কবির 'what man has made of man'-এর মত কোনো দার্শনিক উক্তি মনে পড়ে না, কারণ তার মধ্যে গভীরতার চেয়ে নিবিড়তা অধিক ; তার appeal দর্শনেন্দ্রিয়ের চেয়ে স্পর্শনেন্দ্রিয়ের প্রতি অধিক। ইবানেজের টরেডোর জীবিকার্থে জীবনপণে পশুর সহিত সংগ্রামে দর্শকদের তৃপ্তিসাধনে প্রবৃত্ত ; কৌশলে ও দৈহিক শক্তিবলে সে স্পেনের টরেডোরদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লে পরিগণিত। শত শত মুখে তার নাম মুখরিত। মাঝে মাঝে পশুর দংষ্ট্রাঘাতে তার দেহ হতে রক্তধারা নির্গত হয়, রঙ্গভূমির শুষ্ক, তৃষিত বালুকা সে রক্ত শুষে নেয়। গৌরবের শিখরে একদিন যখন সে ক্রীড়াক্ষেত্রে ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহে প্রাণ দিল, চারিদিকের জনতা সমস্বরে প্রবল চীৎকার করে উঠ্‌ল,—তার মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশার্থে নয়, এত শীঘ্র সেদিন্‌কার খেলা শেষ হয়ে গেল ব'লে। আরো কিছুক্ষণ তাদের দর্শনলিপ্সা তৃপ্ত হবার পর টরেডোরের মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল! তাদের অর্থব্যয় অসার্থক হতে চলেছিল, তাই তারা গর্জ্জন করে উঠল, অন্য নূতন টরেডোরের খেলা দেখ্‌বার জন্য। এ স্পেনের নিত্যকার ঘটনা। গভীর স্বদেশ-প্রীতি বশত স্বদেশের কোনো পাপ ইবানেজ গোপন করেননি, তাই তাঁর লেখায় ও-কাহিনী পাঠ-কালে দর্শকদের সে চীৎকারে যেন রক্তের আস্বাদলাভে উন্মত্তপ্রায় পশুর গর্জ্জন শোনা যায়। মনে হয়, আধুনিক মানুষ ক্ষুধার্ত্ত, বন্য, আদিম মানবাত্মার বাসভূমি। সভ্যতার ছদ্মসাজে সে আত্মগোপন ক'রে থাকে, কিন্তু সহসা অসতর্ক মুহূর্ত্তে তার সে মুখের মুখোস খ'সে যায়। ছদ্মবেশী মানব-পশুর সর্ব্ব-দেহে তখন উত্তেজনা-স্ফীত মাংসপেশী শত শত তৃষ্ণাতুর জিহ্বার মত আত্মতৃপ্তি সাধনের বাসনায় প্রকাশলাভ করতে থাকে।

জীবনের সাধারণ ঘটনার ভিতর গভীর অর্থ পাঠ আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের বিশেষত্ব,—একথা সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্য পাঠ না ক'রেও বলা চলে। ইউরোপীয় বাস্তব বস্তুকণার দ্বারা রচিত। বনস্পতির প্রতি তার লোভ নেই, ক্ষুদ্র তৃণ শষ্প হতে সে বাস্তব আপন খাদ্য সংগ্রহ করে। দূরবীক্ষণের চেয়ে অণুবীক্ষণের ব্যবহার আধুনিক সাহিত্যে অধিক। মেটারলিঙ্কের মত 'মিষ্টিকের' লেখায় অবশ্য বীক্ষণের এই উভয়বিধ যন্ত্রই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম জাতীয় যন্ত্র সাহিত্যে বহুযুগযাবৎ প্রচলিত ; কিন্তু সাহিত্যিক অণুবীক্ষণের আবিষ্কার এ যুগের ঘটনা।

ততোধিক সুস্পষ্ট আর এক বিশেষত্ব এ-সাহিত্যের দেহে দেখা যায়। এই দৈহিক বিশেষত্ব কিন্তু আসলে মানসিক ; অর্থাৎ মনের ছায়া দেহের উপর পড়েছে, এবং এ ছায়াকে কায়া ব'লে ভ্রম হয়। আধুনিক সাহিত্যের একেবারে নিজস্ব একটি form আছে। ইব্‌সেনের লেখায় তার আশ্চর্য্য পরিণতি। অন্য সাহিত্যিকরা এ form ইব্‌সেনের লেখা থেকে ধার করেননি, করেছেন যুগধর্ম্মের কাছ থেকে। বিদ্যুতের যুগে যুগধর্ম্ম যে বৈদ্যুতিক হবে তা' স্বাভাবিক। বৈদ্যুতিক অর্থে বুঝায় শক্তি, অর্থাৎ আলোক এবং উত্তাপ। কিন্তু ও শব্দের বিকল্পে আর এক অর্থ হয়। বিদ্যুতের জন্ম মানুষের চিন্তায় ; এবং তার অর্থ—একটা idea। আধুনিক ইউরোপীয় উপন্যাসে idea আছে এবং action আছে;

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

এই দুই বস্তু বিদ্যুতের উত্তাপে পরস্পরে সংযুক্ত ও একত্রীভূত হয়ে উক্ত উপন্যাসের form অর্থাৎ নিজস্ব দেহ গঠন করে। ভ্য আমুন্‌জিওর লেখার সহিত যাঁরা সুপরিচিত তাঁরা স্বীকার করবেন, এই একান্ত রোমান্টিক (বাস্তববাদী আধুনিক ইউরোপে হয়তো একমাত্র) লেখকের উপন্যাসেও idea-in-action বহমান। শুধু হাম্‌সুনের লেখায় এর কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখা যায়; যুগধর্ম্মের মোহ শুধু হাম্‌সুন অতিক্রম করেছেন। বোয়ারের উপন্যাসে ও বস্তুর প্রভাব সুস্পষ্ট; ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনায় ততোধিক সুস্পষ্ট। ইবানেজের লিখনরীতি এ যুগের বিশিষ্ট চিন্তা-প্রীতির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

কোনো নারীর বিষয়ে যখন কথিত হয়, 'সারা মুখ তার আরক্ত হয়ে গেল', একথা অবশ্য জ্ঞাপন করা হয় না যে উক্ত মুখের সুকৃষ্ণ ভ্রূদ্বয় এবং শ্বেতকৃষ্ণ অথবা শ্বেতনীলিম চক্ষুও রক্তিমাভা ধারণ করল! এতে শুধু এইটুকু বলা হয়, সে মুখের যে অংশের রাঙা হওয়া সুষ্টু এবং স্বাভাবিক, সেই অংশের বর্ণ বৈলক্ষণ্য সাধিত হল এবং এ বৈলক্ষণ্য ক্ষীণ দৃষ্টিরও দৃষ্টিগোচর। ইবানেজের লেখার তথা ইউরোপীয় কথাসাহিত্যের যে স্বধর্ম্মের কথা উপরে কথিত হয়েছে সে ধর্ম্ম তার সমস্ত প্রাণ নয়; এযুগের মানুষ ধর্ম্মপ্রাণ হওয়া জীবনের সার্থকতা ব'লে মনে করে না। নারীর মুখের রক্তাভার মত এ যুগের সাহিত্য-সরস্বতীর মুখেও অন্তরস্থ তীব্র ধীশক্তির ঈষৎ রক্তিমা ছায়াপাত করেছে, এবং সে মুখের নিত্যকালের গঠনের চেয়ে ক্ষণিকের এই রক্তিমাই আমাদের বেশি ভাল লাগে, যেহেতু ক্ষণিকের প্রতি প্রীতি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। নারীধর্ম্ম যেমন নারীর মুখে রক্তিমা আনে, যুগধর্ম্মও তেমনি ইবানেজের লেখায় ideaর বর্ণমাধুর্য্য নিক্ষেপ করেছে; এই মাধুর্য্য তার সমগ্র শোভা নয়, কিন্তু এ বস্তু বাদ দিয়ে ইবানেজের লেখার আলোচনা করলে তার পরিপূর্ণ প্রভা রক্তহীন পাংশুবর্ণ লাভ করবে।

এযুগের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকরা দুঃখবাদী; জীবনের ট্র্যাজেডি দেখাতে তাঁরা উৎসুক। বেদনার চিত্র অঙ্কনে ইবানেজ রোমা রোলাঁর পন্থা গ্রহণ করেছেন ব'লে মনে হয়। তাঁর কাহিনী অত্যন্ত ধীর প্রবাহে চলতে সুরু করে; ক্রমশ সে প্রবাহ দ্রুত হতে দ্রুততর হয়, তারপর বন্যার মত ক্ষিপ্রবেগে ছুটে চ'লে লক্ষ্যস্থ'নের কাছাকাছি উপস্থিত হয়। সে স্থানে মুহূর্ত্তের জন্য প্রবাহের বিরতি; যেন শেষবারের মত দেহের সব শক্তি সংগ্রহ ক'রে নেয়। আর্টের ভাষায় একে climax বলে! এই climax-এই সহসা কাহিনীর সমগ্র ট্র্যাজেডি অনাবৃত হয়ে ওঠে; তার পরেই দু'চার কথায় শেষ। রচনারীতির এই ধারা ইবানেজের 'বসন্তপুষ্প' (Flor De Mayo) নামের একটি ক্ষুদ্র উপন্যাসে সুপরি-স্ফুট। উক্ত উপন্যাসের ঘটনাভূমি স্পেনের সাগরোপকূল; নায়কনায়িকাদের মাছধরা জীবিকা। সমুদ্রের ঢেউ তাদের খেলার সাথী; ঝড়ের সহিত যুদ্ধ ক'রে তারা জীবিকা আহরণ করে। সাগরের তল তাদের সমাধিস্থল হয়। এই অর্দ্ধসভ্য মানব-সমাজের চিত্রাঙ্কনে ইবানেজ যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, সেই শক্তিই 'নারীর শত্রু' উপন্যাসে সভ্যতার চরম শিখরে আরূঢ় রুষ প্রিন্সের পরি-কল্পনা করেছে। 'বসন্ত পুষ্প' ও 'নারীর শত্রু' এই দুই উপন্যাস পাশাপাশি পড়লে ইবানেজের প্রতিভার একটা দিক্ বোঝা যায়,—তার প্রসার। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার ক্যালিবানের কল্পনা করেছেন, আবার ক্লিয়োপেট্রাকেও সৃষ্টি করেছেন। প্রসারের এ এক আশ্চর্য্য নিদর্শন। ইবানেজ্ অবশ্য সেক্‌স্‌পীয়র নন্; কিন্তু তিনি সেক্‌স্-পীরিয়ান্!

ইবানেজের রচিত বহু উপন্যাসের মধ্যে 'নারীর শত্রু'র দ্বিতীয় নেই। ও পুস্তক কেন অদ্বিতীয় তা দু'কথায় বলা যায় না, এবং মামুলি প্রশংসাবাক্যের দ্বারা তার শিল্পসৌন্দর্য্যের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু উপমার দ্বারা ও পুস্তকের পরিচয় এক কথায় দেওয়া যায়। সে উপমা,—তাজমহল। তাজমহলের বিষয়ে বহু কাব্য লিখিত হয়েছে; তাদের প্রকাশভঙ্গী বিভিন্ন, কিন্তু মূলকথা এক। তারা বলে, তাজমহলে দু'টি বস্তু আছে, অশ্রু এবং মর্ম্মর। উক্ত দুই বস্তুই 'নারীর শত্রুর' মধ্যে বিদ্যমান। তার প্রাণ অশ্রুর দ্বারা এবং দেহ মর্ম্মরের দ্বারা গঠিত। আপাতবিভিন্ন এই দুই বস্তুর সমন্বয়-সাধন কঠিন; এবং সে সমন্বয়ের অভাবে তাজমহল প্রস্তরস্তূপের রূপ লাভ করে,—শিল্পের

ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। ইবানেজ এই কঠিনের সাধনায় জয়ী হয়েছেন। তাঁর এই পুস্তক অদ্বিতীয়, যেহেতু জীবনে বারবার তাজমহল রচনা করা যায় না।

জনসমাজে কিন্তু 'নারীর শত্রু'র চেয়ে 'অশ্বারোহী চতুষ্টয়ে'র অনেক বেশি আদর। এর কারণ বোঝা কঠিন নয়। বিংশ শতাব্দীর সকলের চেয়ে বড় ঘটনা গত ইউ-রোপীয় মহাযুদ্ধ। উন্মত্ত হত্যালীলার জন্য এ মহাযুদ্ধ স্মরণীয় নয়; স্বামীপুত্রহীনার বেদনার দহনের জন্যও নয়। ছোট একটি শিক্ষার জন্য এই যুদ্ধ স্মর্তব্য; সে শিক্ষার উৎপত্তি সামান্য একটি প্রশ্ন থেকে,—'Quo Vadis',—কোথায় যাও? প্রতি জাতি যুদ্ধাবসানে পরস্পরের মুখের প্রতি চেয়ে এই প্রশ্ন করেছিল। ইবানেজ এর উত্তর দিয়েছেন 'অশ্বারোহী চতুষ্টয়ে'। সে উত্তর এই;—মানুষ তার আদিম বন্য প্রপিতার কাছে ফিরে চলেছে। স্বরচিত ক্ষীণপ্রাণ সভ্যতা তার অন্তরস্থ পশুপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি করেনি; সে প্রবৃত্তি সুপ্ত হয়ে আছে; সহসা সে কোনো মুহূর্ত্তে জেগে উঠে পৈশাচিক লীলা সুরু করতে পারে। এ লীলা শুধু ভয়ঙ্কর নয়,—প্রলয়ঙ্কর, কারণ মানুষ যদি ভিতরের এই পশুটাকে হত্যা করতে না পারে তাহলে বারম্বার রাক্ষসের মত পরস্পরের রক্তপানে একদিন তার মনুষ্যত্বের পূর্ণ অবসান হবে। কথাটা thesisএর মত শোনায়। কিন্তু চিন্তার এই শুষ্ক অস্থির গাত্রে ইবানেজ্ রক্তমাংস সন্নিবিষ্ট করেছেন; সেইজন্য 'অশ্বারোহী চতুষ্টয়' থিসিস্ নয়, জীবন্ত সৃষ্টি।

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু, মড়ক এই চারজন অশ্বারোহীর সহিত মানুষের যে প্রবলতর সংগ্রাম অনিবার্য্য, ইবানেজ তার উপর জগতের ভবিষ্যৎ কল্যাণ-অকল্যাণ দেখতে পেয়েছেন। সে বস্তু দেখবার জন্য তিনি যে বাস্তব চিত্রের অবতারণা করেছেন, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মনে সে চিত্র ভয়ের সঞ্চার করবে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে বহু পুস্তক লিখিত হয়েছে, কিন্তু এত বড় প্রতিবাদ এযাবৎ ইবানেজ ভিন্ন অন্য কোনো গ্রন্থকারের লেখনী হতে এসেছে ব'লে আমাদের জানা নেই। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, বায়স্কোপের জন্য উক্ত পুস্তকের নায়কের চরিত্র অভিনয় ক'রে রুডল্ফ্ ভালেন্টিনো প্রথম নিজেকে জগদ্বিখ্যাত করেছিলেন।

মানুষের সমগ্র কদর্য্যতা ইবানেজের কাছে নগ্নদেহে দাঁড়িয়েছে, তথাপি তিনি এজাতির ভবিষ্যতে আস্থা হারাননি। তার কারণ, মানুষের মধ্যে তিনি শুধু পূর্ব্বোক্ত পশুসত্তাই দেখেননি, দেবতাকেও দেখেছেন। মানবাত্মাকে আত্মগত করবার জন্য অন্তর্লোকে পশু, ও দেবতার ঘোরতর দ্বন্দ্বের ছবি 'অশ্বারোহী চতুষ্টয়ে' আছে। নারীজাতির উপর ইবানেজের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা কত গভীর তার প্রমাণার্থে বলা যায়, তিনি নারীর অন্তরে দেবতার জয় ও পশুর পরাজয় দেখিয়েছেন।

যুদ্ধের প্রবল প্রতিবাদ এই উপন্যাস ভিন্ন ইবানেজের লেখার অন্যত্রও আছে। তার মধ্যে 'রাক্ষস' ও 'সার্ভিয়ায় একরাত্রি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছোট গল্পের ক্ষুদ্র অবয়ব যে কেমন ক'রে প্রাণে প্রাণে ভরিয়ে তোলা যায়, এই দু'টি ছোট গল্প পড়লে তা সহজে বোধগম্য হবে। ইবানেজের আরো কয়েকটি ছোট গল্প; যেমন 'The Mad Virgins', 'The Generals', 'Motor-car', 'The Sleeping-car Porter' পাঠ না করলে তাঁর আর্টের আস্বাদ লাভ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ইবানেজের শিল্পের সৌন্দর্য্য তার শৌর্য্যে,—একথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। তাঁর লেখায় পুষ্প নেই, বজ্র আছে। আমাদের আধুনিক সাহিত্য পুষ্পের গন্ধে ভারাক্রান্ত। সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর শতদলের প্রতি আমাদের লোভ, তাঁর হৃদয়ের প্রতি নয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের চেয়ে অন্তরেন্দ্রিয়ের ক্ষুধা কিন্তু স্বভাবতঃ প্রবলতর। দীর্ঘ উপবাসে প্রাণ যখন শুষ্ক, দেহের খাদ্য তখন তাকে সরস করতে পারে না, শতদলের গন্ধ তখন তার অপ্রিয় বোধ হয়। বাংলার মনে এরূপ অবস্থা যদি কোনোদিন আসে, তখন সে মনের মঙ্গলের জন্য যে সকল শৌর্য্যধর্ম্মী লেখকের বাণী প্রচার করা আবশ্যক হবে, সেই লেখকদের মধ্যে ইবানেজ একজন।

আধুনিক পাশ্চাত্য নাট্যশালা

বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে পাশ্চাত্য জগতে নানা বিষয়ে নানা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পাশ্চাত্য নাট্যশালাগুলিরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে য়ুরোপের প্রায় সমস্ত নাট্যশালাতে জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটকের অভিনয় হইত। এই সব নাটকগুলিতে প্রত্যেক দেশেরই নূতন ভাব গড়িয়া উঠিবার প্রয়াস লক্ষিত হইত।

কিছুদিন যাবৎ আর একদিকে পরিবর্ত্তন দেখা যায়। নাট্যশালাগুলিতে নগ্নতা এখন রঙ্গমঞ্চের প্রধান বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। প্যারিসের নাট্যশালাগুলিকে অভিনেতৃবৃন্দের নগ্ন অবয়বের প্রদর্শনী বলিলেও চলে। নাটকের বিষয়গুলিও অত্যন্ত লঘু। শ্লীলতার সীমা কোনও রকমে রক্ষা করা হয়। বার্লিনে ম্যাক্স রাইনহার্ডটের নাট্যশালা যাহা এক সময়ে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত এবং জার্ম্মানির শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আদরের স্থান ছিল তাহাও এখন নগ্ন অবয়বের প্রদর্শনী-মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। ভিয়েনা, প্রাগ্‌ ইত্যাদি সর্ব্বত্রই এই ভাব।

রোমিও ও জুলিয়েটের দৃশ্য

প্রোগ্‌ ন্যাশনাল থিয়েটারে সিম্‌বেলিন নাটকের দৃশ্য

মহাযুদ্ধের পর হইতে য়ুরোপীয় জাতিসমূহের মনোভাবের পরিবর্ত্তনই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। প্যারিসের আধুনিক নাট্যকারগণও এ বিষয়ে

মস্কোর মেয়ারহোল্ড্ থিয়েটারে "চায়না রোর"-এর একটি দৃশ্য

কামান-জাহাজের এক অংশ ঘূর্ণী চক্রের উপর স্থাপিত যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। জর্জ অরিয়ল, পল গেরার্ডি, লেনরমণ্ড, বিখ্যাত ইতালিয়ন নাট্যকার পিরাণ্ডেলো ইত্যাদি নাট্যকারগণই এই ভাবের নাটকের জন্য বিশেষভাবে দায়ী।

প্যারিসের নাট্যশালাগুলির আর এক বিশেষত্ব সার্ব্বজনীন ভাবোদ্দীপক নাটকের অভিনয়। কিছু-দিন পূর্ব্বে জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটকের অভিনয় হইত, কিন্তু সম্প্রতি দেখা যায় জাতীয়তার সহিত সর্ব্বজনীনতার মিলনভাবোদ্দীপক নাটকগুলি বিশেষ-ভাবে আদৃত হইতেছে। বার্লিনের নাট্যশালাগুলিতেও এই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়।

জার্ম্মানিতে বিদেশী নাটকের বিশেষ আদর আছে। বার্ণার্ডশ, ও নিল, পিরাণ্ডেলো, গ্যাল্স্ওয়ার্দি, শেকভ্ ইত্যাদি নাট্যকারগণের পুস্তকগুলি প্রায়ই অভিনীত হয়।

অভিনয়ে ভাবের অভিব্যক্তি বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বপ্রধান স্থান লাভ করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে দৃশ্যপটের সৌন্দর্য্যের দিকেও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা হয়।

জেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগ্ সহরেও বিদেশী নাটকেরই বেশী অভিনয় হয়। ইংরাজী, ফরাসী, ও মার্কিণ নাটকের অভিনয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাগে কিন্তু জার্ম্মান নাটকের আদর নাই।

প্রাগে নাট্যকলা সাধনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সুন্দর ম্যুসিয়ম স্থাপিত হইয়াছে এবং শিক্ষার্থীগণের জন্য অনেক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সাহায্য করা হয়। আমেরিকা ও জার্ম্মানির বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতেও নাট্যকলা শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে।

য়ুরোপের নানা স্থানের আধুনিক নাট্যশালার কতক-গুলি দৃশ্যপটের প্রতিলিপি দেওয়া হইল। এই দৃশ্যপট-গুলি আমাদের নিকট অভিনব বলিয়া মনে হয়।

"চায়না-রোরে"র আর একটি দৃশ্য
একজন চীনা কুলি একজন আমেরিকানকে ডুবাইয়া মারিতেছে

শ্রীঅনাথ নাথ ঘোষ

শ্রীরামেন্দু দত্ত

যাহা নাই ভারতে তাহা নাই জগতে

"যাহা নাই ভারতে তাহা নাই জগতে" ইহা নিছক শব্দ-চাতুর্য্য নহে। কে কবে ভাবিয়াছে যে পাশ্চাত্য দেশের বরফের উপর প্রচলিত "স্কেটিং" খেলা ভারতবর্ষের মত গ্রীষ্ম-প্রধান দেশেও খেলা হয়। তুষারের উপর তুষারপাত হইয়া পথ ঘাট আচ্ছন্ন হইয়া গেলে, উপরস্থিত তুষার-স্তর পায়ে পায়ে কাঁচের মত মসৃণ ও কঠিন হইয়া উঠে; তখন পায়ে একপ্রকার ইস্পাতের মসৃণ খড়ম পরিয়া নরনারী ও
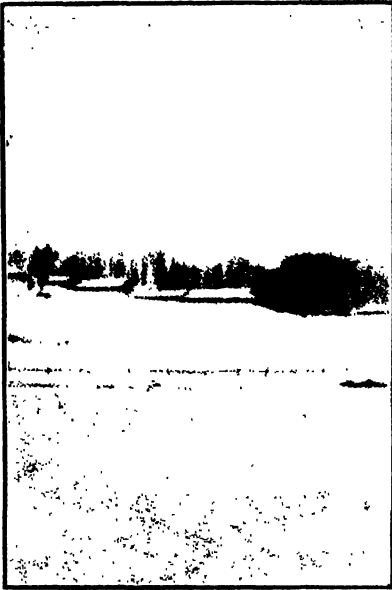
স্কেটিং-রিঙ্ক্, সম্মুখে অদূরে হোটেল

বালক-বালিকারা তাহার উপর বিচিত্র ভঙ্গীতে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়; ইহাই স্কেটিং খেলা। পতনের সান্ত্বনা এই খেলায় অত্যধিক বলিয়া যে যত হেলিয়া দুলিয়া এক-ছুটে অধিক দূর পিছলাইয়া যাইতে সমর্থ হয় সেই তত নিপুণ খেলোয়াড় বলিয়া পরিগণিত হয়। এই স্কেটিং খেলা বর্ত্তমান ইউরোপে বহুদিন যাবৎ একটি বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে হিমালয়ের পাদদেশে দু'এক জায়গায়, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি সহরে যে শীতকালে তুষারপাত হয় এ কথা অনেকেই জানেন কিন্তু সে তুষার প্রায়ই এরূপ ঘন বা বিস্তৃত হয় না

স্কেটিং-রিঙ্কে একজন সুদক্ষ খেলোয়াড়

যাহাতে স্কেটিং খেলা চলিতে পারে। আমাদের অন্ততঃ এই ধারণা ছিল যে স্কেটিং-প্রিয় কোন ইউরোপবাসী ভারতবর্ষে যতদিন থাকেন ততদিন সে নেশা ইউরোপে প্রত্যাগমনের

গল্‌ফ্ প্রাঙ্গণে বিবর অন্বেষণ

সময় পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিশ্চয় মুলতুবি রাখিতে হয়। কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করিলাম যে না, অতিথিবৎসল ভারতমাতা সকলের জন্যই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। গুলমার্গের এই ছবি কয়টি সে কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত করিবে।

ছবিগুলি দেখিলে কে ভাবিবে যে উহা ভারতবর্ষে গৃহীত। ইউরোপে আল্‌স পর্ব্বতের উপত্যকান্তরালে সুরম্য সুইজারল্যাণ্ডে যে আমোদ সম্ভব হয়, ভারতের গুলমার্গস্থ "স্কাই-ক্লাবে" তাহা দিন দিন বিস্তার লাভ করিতেছে।

ক্রীড়ার সমুপযোগী ঢালু জমি

তুষার মণ্ডিত স্কেটিং-রিঙ্ক্‌ পশ্চাতে ক্লব
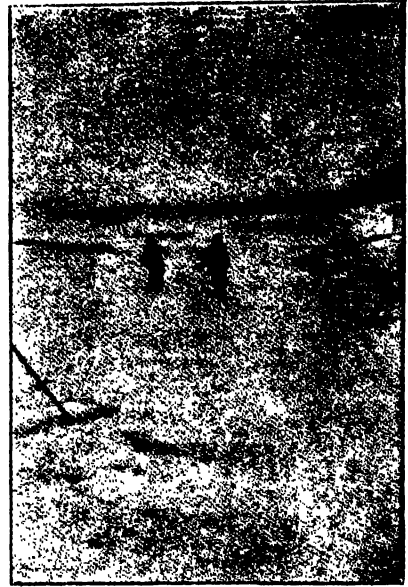
শ্রীরামেন্দু দত্ত

প্রসঙ্গ-কথা

১

চাতুর্ব্বর্ণ্যের কঙ্কাল

বিগত ১২ই ফাল্গুন সন্ধ্যার পর মিনার্ভা ইন্‌ষ্টিটিয়ুটে একটি সাহিত্য-বৈঠক বসেছিল; সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এবং স্বরচিত একটি ক্ষুদ্র নাটিকা পাঠ করেছিলেন শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাসগুপ্ত। পাঠান্তে আলোচনা কালে কথা-প্রসঙ্গে চৌধুরী মহাশয় বলেছিলেন, "জাতিভেদই এখন হিন্দুজাতির মধ্যে গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠেচে। গত দুর্গাপূজার সময়ে পাবনা জেলায় নমঃশূদ্রেরা বিসর্জ্জনের জন্য প্রতিমা বহন করতে অস্বীকৃত হয়েছিল এই ওজুহাতে যে জীবিত অবস্থায় যে দেহ স্পর্শ করবার তাদের অধিকার নেই মৃত্যুর পর সে দেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ক'রে তারা মুরদাফরাসের শ্রেণীভুক্ত হবে না;—কারণ মূর্ত্তি বিসর্জ্জন করবার জন্যে যখন তারা

বিষ্ণুশর্ম্মা

প্রতিমা বহন করবার অধিকার পায় তার পূর্ব্বেই দেবীর প্রাণ বিসর্জ্জন হয়ে যায়। এই অভিমানের বশবর্ত্তী হ'য়ে তারা স্মরণাতীত কাল থেকে পুরুষানুক্রমে যে কাজ ক'রে এসেচে, এবার তা করে নি।"

* * * *

এই ধরণের প্রসঙ্গে অনেকে এই ব'লে আক্ষেপ করেন যে, (বলা বাহুল্য চৌধুরী মহাশয় সে আক্ষেপ করেন নি) যে—জাতিভেদ প্রথা, শুধু এককালেই নয়—বহুকাল ধ'রে, কলের মত হিন্দুসমাজকে পরিচালিত করেচে, এখন তা একেবারে বিকল হ'ল কেন? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে, কলের ধর্ম্ম কালের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়;— কলের ইতিহাসে এমন দক্ষ কারিগর এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নি যাঁর নির্ম্মিত কল কালে বিকল না হ'য়ে গেছে। শত প্রকারের যত্ন ও সাবধানতা সত্ত্বেও ক্রমশঃ কলের সচল অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অচল অংশে মরচে ধরে। তা ছাড়া, নবতর কলের সমধিক উপযোগীতার হিসাবেও পুরোনো কল ক্রমশঃ অনুপযোগী হ'য়ে ওঠে।

* * * *

জাতিভেদ প্রথা সুমসৃণ কলের মত সেই সময়েই চলেছিল যে সময়ে দেশের সমস্ত লোককেই থাকৃতে হ'ত হয় তার আশ্রয়ে, নয় তার অধিকারে;—অর্থাৎ যখন চতুর্ব্বর্ণের চতুর্থ বর্ণকে আয়ত্ত এবং শাসন করবার পক্ষে প্রথম তিন বর্ণের বিশেষ কোনো বাধা কিম্বা বিপদ ছিল না। কিন্তু কালক্রমে যখন ভারতবর্ষে এমন সব লোকের আমদানি হ'তে লাগ্‌ল যাদের কোনো মতেই চতুর্থ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করা গেল না, তখন থেকে চাতুর্ব্বর্ণ্য রথের শাস্ত্র-শস্ত্র-অর্থ-দাস্য এই চার রথ-চক্রের অবাধ গতিতে গোলযোগ উপস্থিত হ'ল।

* * * *

বাধ্‌ল সর্ব্বপ্রথম জীবিকার্জ্জনের দিকটায়। যে ঘরে কমলার অধিষ্ঠান ঠেলাঠেলি প'ড়ে গেল সে ঘরের দরজায়। অর্থ আথেরে যতই অনর্থের মূল হ'ক না কেন, তার আশু ক্রিয়াটা যে জীবনধারণের পথে উপেক্ষণীয় নয়—এ বিশ্বাস অনেকেরই মনে দৃঢ় হ'য়ে এল;—তদ্বিরুদ্ধে মনুর নির্দেশ-নির্দ্দেশের তেমন আর জোর রইল না। "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ"—নিজ কর্ম্মের দ্বারা মানুষ সিদ্ধি লাভ করে,—এই নীতিবাক্যের অর্থ এখন এই হয়েচে যে অর্থই একমাত্র সিদ্ধি, এবং যে-কর্ম্মের দ্বারা মানুষ সেই সিদ্ধি লাভ করে সেই তার স্বকর্ম্ম। সেই জন্যে বর্ত্তমান কালে জুতোর দোকান এবং ধোপার কারখানা ক'রেও ব্রাহ্মণের কোনো আশঙ্কাই থাকে না, একমাত্র আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা যদি না থাকে। জাতি-ভেদের ভিত্তি এখন আর জাতি ব্যবসার মধ্যে নেই; গুণকর্ম্মবিভাগ এখন আর কিছুই নির্ণয় করে না।

* * * *

তারপর ক্রমশঃ অন্য-সব দিকেও ব্যতিক্রম দেখা দিলে। যে পাথর-বাঁধানো পথের উপর দিয়ে এতকাল রথ চলছিল তার দিকে দিকে ভাঙন আরম্ভ হ'ল। শূদ্রেরও পক্ষে পূর্ব্বে যা অনাচার ছিল ব্রাহ্মণের পক্ষে এখন আর তা অনাচার নয়; খাদ্যাখাদ্যের বিচার প্রায় সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়েচে; রীতিনীতির পরিবর্ত্তন এমন হয়েচে যে ব্রাহ্মণ বৃত্তির সঙ্গে ব্যাধ-বৃত্তিরও আর বিরোধ নেই—এক কাঁধে যজ্ঞোপবীত আর অন্য কাঁধে বন্দুক নিয়ে সমস্ত দিন পাখী শিকার ক'রে বেড়ালেও ব্রাহ্মণ ব'লে কেউ অস্বীকার করবে না। অতএব দেখা যাচ্চে, যে-সকল জিনিষের উপর জাতিভেদ প্রথার নির্ভর ছিল সেগুলি এখন নেই—অথচ প্রথা আছে।

* * * *

এই নিরালম্ব নির্ভরহীন হ'য়ে থাকা অনেকটা মৃত্যুর পর ভূত হয়ে থাকার মত। কোনোখানে যার আশ্রয় নেই, ছায়ার মত সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে যে সব জায়গা অধিকার ক'রে থাকে, যে-কোনো সময়ে যে-কোনো স্থলে যে-কোনো

মূর্ত্তিতে যে দেখা দিতে পারে, তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। ভূতকে জীবিতের মত ঠেঙিয়ে বার করা যায় না ব'লে ভূতুড়ে বাড়ির সহজে উদ্ধার হয় না। চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথারও মৃত্যু ঘটেচে তাতে সন্দেহ নেই;—পূর্ব্বে যা ছিল তার কাঠামো, এখন তা হয়েচে কঙ্কাল। তাই তার কঙ্কাল-মূর্ত্তি দেখে আমাদের শ্রদ্ধা হয় না, ত্রাস লাগে। এই কঙ্কাল-মূর্ত্তির হাত থেকে হিন্দু সমাজের উদ্ধারলাভের এখনো দেরী আছে ব'লে মনে হয়।

২

বাহু বনাম বুদ্ধি

কিছুদিন আগে একটি আইরীশ্ পত্রিকায় কোনো এক ব্যক্তি দুঃখ করেছিলেন যে, মানব-সভ্যতা এ পর্য্যন্ত সে স্তরে উপনীত হ'ল না যেখানে মানুষের ধী-শক্তি বাহু-শক্তির উপর প্রাধান্য লাভ করে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে দু-জন নামজাদা কুস্তিগির কিম্বা মুষ্টিগির (Boxer) প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলে তাদের শক্তি-পরীক্ষা দেখবার আগ্রহে উচ্চ দর্শনী দিয়ে অসংখ্য দর্শক উপস্থিত হয়; প্রতিযোগিতায় সম্মত করবার জন্যে পূর্ব্বেই প্রতিযোগী-দ্বয়কে খুব বড় রকম টাকা দেবার চুক্তি করতে হয়,—যে জয়লাভ করে শুধু সেই নয়, যে পরাভূত হয় সে-ও বিলক্ষণ অর্থ লাভ করে; বিজেতা পায় পুরস্কার, বিজিত পায় পারিশ্রমিক। পক্ষান্তরে, যদি জগতের দু-জন শ্রেষ্ঠ মনীষীর মধ্যে একটা প্রজ্ঞা-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যায় তা হ'লে দর্শকের সংখ্যা এবং দর্শনীর পরিমাণ দেখে আর সংশয়ের কারণ থাকে না যে মল্লর কাছে মনীষী এখনও পরাজিত।

*　　*　　*　　*

কথাটার মধ্যে সত্য যে একেবারেই নেই তা নয়; সত্যের পরিমাণ অনুপাতে কথাটা ক্ষোভজনকও নিশ্চয়, কারণ সাধারণ মানুষের এই প্রবৃত্তিটা তার মধ্যে যে পশু-প্রবৃত্তি বাস করছে তারই পরিচায়ক ব'লে বলা যেতে পারে। কিন্তু একদিক দিয়ে পরীক্ষা করলে মনে হয় কথাটার মধ্যে একটা অপসিদ্ধান্ত আছে। মল্ল-যুদ্ধ সম্ভোগ করবার জন্যে দর্শককে একজন মল্ল হবার কোনো প্রয়োজন নেই—অতিশয় দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের দর্শকও মল্লযুদ্ধ দেখে ঠিক সেই পরিমাণ আনন্দ পেতে পারে একজন কুস্তিগির দেখে যা পাবে। কিন্তু প্রজ্ঞা-প্রতিযোগিতা উপভোগ করতে হ'লে অজ্ঞ হ'লে চল্‌বে না, প্রাজ্ঞ হ'তে হবে। একটা ব্যাপারের উপভোগের সঙ্গে উপভোক্তার নিজের শক্তি-সামর্থ্যের সংশ্রব নেই, অপরটার আছে।

*　　*　　*　　*

অর্থাৎ, উপভোগের প্রধান ক্ষেত্র যেখানে মন অথবা বুদ্ধি, প্রধানত কোনো বহিরিন্দ্রিয় নয়, সেখানে উপভোক্তার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হতে বাধ্য। মন সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক হ'লেও, মনই যেখানে উপভোগের প্রধান অবলম্বন নয়, সেখানে উপভোগের জন্য বিশেষ কোনো উপযোগিতার প্রয়োজন থাকে না ব'লে উপভোক্তার সংখ্যা বেশী হয়।

*　　*　　*　　*

সে যাই হোক, সভ্যতার পোষাকে আবৃত হ'য়ে মানুষের মধ্যে এখনও যে পশু-প্রবৃত্তি বাস করছে—তার পরিচয় আমরা কেবল মল্ল-যুদ্ধেরই মধ্যে পাইনে, আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে দুই সভ্য জাতি রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে যখন উদাত্ত স্বরে বলে, Might is right,—তার মধ্যেও পাই।

*　　*　　*　　*

League of Nations এর সুবিশাল কক্ষে সমবেত হ'য়ে পৃথিবীর সমস্ত বুদ্ধিমানেরা যতই জপ করুন Right is might—পৃথিবীর বলবানেরা এখনও কিছুদিন বল্‌তে ছাড়বেনা, Might is right।

সম্পাদক

১১

সেই দিন বৈকালে বিনয় পূর্ব্বোক্ত চামেলী ঝাড়ের পাশে বসিয়া শোভার ছবি আঁকিতেছিল। সুকুমার বাড়ি নাই; বেলা তিনটার সময়ে সে গিয়াছে একজন রেলওয়ে এঞ্জিনীয়ারের সহিত দেখা করিতে,—যে-পথ অবলম্বন করিয়া তাহার পিতামহ লক্ষ্মীর ধনভাণ্ডারে পৌঁছিয়াছিলেন সেই হারানো পথের সন্ধান আবার যদি কোনো প্রকারে পাওয়া যায় সেই চেষ্টায়।

বিনয় শোভার চোখ আঁকিতেছিল, কিন্তু কিছুতেই মনের মত হইতেছিল না। না আসিতেছিল রেখার সাদৃশ্য, না মিলিতেছিল রঙের বিন্যাস। সে পুনঃপুনঃ রেখা মুছিয়া রেখা আঁকিতেছিল, এবং রঙের উপর রঙ চড়াইতেছিল, কিন্তু না ফুটিতেছিল নেত্র-তারকার সেই শান্ত-নিবিড় দীপ্তি, না উঠিতেছিল ভ্রূযুগলের কমনীয় বক্রতা।

হতাশ হইয়া দুই একবার ঘুরিয়া ফিরিয়া শোভাকে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বিনয় বলিল, "একটুখানি অন্যদিকে মুখ ফেরাও ত শোভা।"

"কোন্ দিকে?"

"যে-দিকে হোক্।"

শোভা মুখ ফিরাইয়া বিনয়ের দিকে চাহিল।

মাথা নাড়িয়া বিনয় বলিল, "আমার দিকে নয় শোভা, আমার দিকে নয়;—অন্য যে দিকে হোক্।"

শোভার মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল,—সে বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

মৃদু হাসিয়া বিনয় বলিল, "একেবারে অতটা আড়ি করলে চলে কি?—একটু আড়া-আড়ি কর।"

শোভা সামান্য মুখ ফিরাইল; কিন্তু তাহার চক্ষের অধিকাংশ বিনয়ের আসন হইতে অদৃশ্যই রহিল। যে-টুকু দেখা যাইতেছিল তাহাও ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল অজ্ঞাতসারে অল্প অল্প করিয়া বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়া যাওয়ায়। বিনয় কিন্তু আর কোনো রকম আপত্তি করিল না; নিবিষ্টচিত্তে একান্ত মনোযোগের সহিত সে ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিল। নিঃশব্দে অনেকখানি সময় কাটিয়া গেল।

বিনয়ের হাত চলিয়াছিল দ্রুতবেগে ছবি আঁকিয়া বটে, কিন্তু মন তাহার প্রবেশ করিয়াছিল একেবারে অন্য ব্যাপারের মধ্যে। সে ভাবিতেছিল সকাল-বেলায় রোহিণী হইতে ফিরিবার পথে সন্ন্যাসীর দেওয়া রুদ্রাক্ষ এবং তদ্বিষয়ে কমলার সহিত কথোপকথনের কথা। সে কি রহস্যপূর্ণ বাদানুবাদ! অর্থই বা তাহার কি, আর তাৎপর্য্যই বা তাহার কেমন! কমলা যখন রুদ্রাক্ষটি তাহার হাতে দিয়া

বলিয়াছিল, 'খুব জোরে এটা মাঠের মধ্যে ফেলে দিন'— তখন তাহার দৃপ্ত চক্ষুদুটির মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয় দীপ্তি দেখা দিয়াছিল তাহারই বা হেতু কোন্ নিগূঢ় রহস্য-লোকে নিহিত কে জানে!

মনেরই সহিত পর-তালে বিনয়ের তুলি চলিয়াছিল,— দেখিতে দেখিতে দুটি চোখ আঁকা শেষ হইয়া গেল। পিছন দিকে মাথা একটু হেলাইয়া ঘাড় ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বিনয় দেখিতে লাগিল;—দেখিতে দেখিতে তাহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সদ্যাঙ্কিত চক্ষুদুটির মধ্যে কি অপার্থিব আলোক জল্ জল্ করিতেছে! কি সুন্দর! কি সুন্দর! বিনয়ের অন্তর্বাসী শিল্পী সফলতার আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল!

মিলাইয়া দেখিবার অভিপ্রায়ে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া বিনয় বলিয়া উঠিল, "এঃ! করেছ কি শোভা?— একেবারে মুখ ফিরিয়ে বসেছ?—এমন করলে ছবি আঁকব কি ক'রে!"

"এতক্ষণ তা হ'লে কি করছিলেন?" বলিয়া ফিরিয়া চাহিয়া নিজ চিত্রে অঙ্কিত চক্ষুদুটি দেখিয়া শোভা হাসিয়া বলিল, "এই ত এঁকেছেন।" তাহার পর বিস্মিত-ব্যগ্র ভাবে উঠিয়া আসিয়া চক্ষুদুটি ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল, "কিন্তু এ কার চোখ এঁকেছেন আপনি? এ ত' আমার চোখের মত একটুও হয় নি!"

"তোমার চোখের মত একটুও হয়নি? বল কি শোভা!"

বিনয়ের কথায় মনোযোগ না দিয়া চিত্রের প্রতি একাগ্র দৃষ্টি নিযুক্ত রাখিয়া শোভা বলিল, "রসুন, রসুন, বলছি কার মত হয়েছে। খুব জানা-শোনা লোকের মত, কিন্তু ধরতে পারছিনে।" তাহার পর সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বুঝেচি কার মত হয়েচে;—কমলার মত! অবিকল! একেবারে অবিকল!"

বিস্ময়-বিমূঢ় স্বরে বিনয় বলিল, "কমলার মতো?—কি যে বল তুমি শোভা, তার ঠিক নেই!"

চিত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া শোভা বলিল, "আমি ঠিকই বলি,—আপনিই কি যে আঁকেন তার ঠিক নেই।" তাহার পর বিনয়ের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্যোদ্ভাসিত মুখে বলিল,"দানব আঁকতে দেবতা আঁকেন।"

বিমূঢ়-অপ্রতিভ মুখে বিনয় বলিল, "আমি ত বুঝতে পারচিনে শোভা, কোনখানটা কমলার চোখের সঙ্গে মিলছে, কিন্তু তোমার চোখের মত যে ঠিক হয়নি তা এখন বুঝতে পারছি।"

শোভা বলিল, "কোন্খানটা কমলার সঙ্গে মিলচে? ভুরুর টান দেখুন—ঠিক কমলার মত এ-দিক থেকে ও-দিক।"

বিস্মিতস্বরে বিনয় বলিল, "এ-দিক থেকে ও-দিক?— এদিক থেকে ও-দিক হবেনা ত কি, ও-দিক থেকে এ-দিক হবে? সকলেরই ভুরু তো এ-দিক থেকে ও-দিক হয়!"

বিনয়ের কথায় কর্ণপাত না করিয়া শোভা বলিল, "তারপর পাতা দেখুন। আমার পাতা কি অত ঘন?... আমার পাতা তো একেবারে পাতলা! কমলার পাতা ঠিক এই রকম ঘন।"

এবার বিনয় কোনো কথা কহিল না, নীরবে ছবির দিকে চাহিয়া রহিল।

শোভা বলিল, "তারপর চাউনি দেখুন। একেবারে কমলার চাউনি---হুবহু!" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিল, "আচ্ছা, এ-রকম কি ক'রে হোলো বিনুদা? ---আমার চোখ দেখতে পাচ্ছিলেন না ব'লে কমলার চোখ আপনা আপনি এসে পড়ল;- না, চোখ আঁকবার সময় আপনি কমলার কথা ভাবছিলেন?"

বিনয় মনে মনে চকিত হইয়া উঠিল। শোভা এ-সব কথা বলে কি করিয়া! এ কি অনাবিল সরলতা আপনার সহজ আলোকের প্রভায় সত্যে গিয়া উপনীত হইতেছে;- না, কৌশলে শোভা কথা বাহির করিতে চাহে? কিন্তু কৌশল ত' শোভার প্রকৃতির মধ্যে ঠিক সেইভাবে নাই, প্রজাপতির দেহে যে-ভাবে হুল নাই।

"বলুন না বিনুদা, কমলার কথা ভাবছিলেন?"

বিব্রত হইয়া বিনয় বলিল, "বোধহয় কিছু ভাবছিলুম!"

আগ্রহে শোভা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, "ভাবছিলেন?— কি ভাবছিলেন?—আজ সকালের কথা?"

বিনয় চমকিয়া উঠিল। অস্বীকার করিতে তাহার সাহস হইল না, মিথ্যা কথা বলিবার প্রকৃতিও তাহার নহে; বলিল, "হাঁ, আজ সকালেরই কথা।"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শোভার বিস্ময়ের পরিসীমা ছিল না; বলিল, "আজ সকালের কথা? আজ সকালের কোন্ কথা?"

এবার বিনয় আপত্তি করিল; বলিল, "সব কথা তোমাকে বল্‌তে হবে তার কি মানে আছে শোভা?" কথাটা ঠিক এ ভাবে বলিবার ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু বিমূঢ় অবস্থায় সময়াভাবে এই ভাবেই বাহির হইয়া গেল। শোভা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, নিঃশব্দে ছবির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিনয়ও ছবির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ভাবিতেছিল, এ কি অদ্ভুত বিস্ময়ের ব্যাপার! প্রথমে সে ঠিক বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু তখন আর তাহার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না যে, শোভার চক্ষু আঁকিতে সে আঁকিয়াছে কমলারই চক্ষু। প্রথমে যখন সে চক্ষু আঁকিবার জন্য শোভার চক্ষু দেখিতেছিল তখন আঁকা কিছুতেই হইয়া উঠিতেছিল না- শোভার চক্ষু যেন সহায়তার পরিবর্ত্তে ব্যাঘাতেরই সৃষ্টি করিতেছিল। শোভার চক্ষু অদৃশ্য হইলে আর যেন কোনো বাধা রহিল না—তখন সন্ধ্যাকাশে দুটি দীপ্ত তারকার মত ক্যান্‌ভাসের উপর ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল দুটি চক্ষু—কিন্তু সে কমলার। বিনয়ের বিস্ময় ও বিহ্বলতার শেষ ছিল না। তাহার সমস্ত ছবি আঁকিবার ইতিহাসে এমন ব্যাপার একেবারে অপরিজ্ঞাত!

"শোভা!"

"আজ্ঞে!"

"তোমার চোখে জল কেন শোভা?"

শোভা বলিল, "বোধহয় একদৃষ্টে ছবিটার দিকে চেয়েছিলাম ব'লে।"

কিন্তু কৈফিয়ৎটা ঠিক টিঁকিল না, বড় বড় দুই ফোঁটা অশ্রু অবলম্বন করিয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়িল।

"তুমি কাঁদছ কেন শোভা?"

শোভা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু-স্মিত মুখে বলিল, "কই কাঁদচিনে ত!"

বিনয় বলিল, "না, কেঁদ না।" তাহার মনে হইল শোভা যেন এক বৃষ্টি-সিক্ত শ্যামল বনানী, সদ্য-নিঃসৃত রৌদ্রকর মাখিয়া বলিতেছে, না, ভিজিনি ত।

শোভা বলিল, "দাদার ফিরতে দেরি হবে বোধহয়। যাই, আপনার জন্যে চা ক'রে নিয়ে আসি।"

বিনয় একটা তুলি তুলিয়া লইয়া বলিল, "বেশ তাই যাও —আমি ততক্ষণে চোখ দুটি পরিষ্কার ক'রে মুছে তুলে ফেলি।"

শোভা খপ্ করিয়া বিনয়ের হাত হইতে তুলি কাড়িয়া লইয়া বলিল, "না, সে কিছুতে হবে না। ও যেমন আছে থাক্।"

সবিস্ময়ে বিনয় বলিল, "যেমন আছে থাক কি শোভা? তোমার মুখে কমলার চোখ থাক্‌বে?"

শোভা বলিল, "আমার ছবি শেষ ক'রে কি হবে বিনুদা?—তার চেয়ে এ একটা বেশ মজার জিনিষ যেমন আছে থাক্ না।"

বিনয়ের মুখে চিন্তার একটা ক্ষীণ ছায়াপাত হইল; বলিল, "ছি, শোভা! ছেলেমানুষী করতে নেই।"

"ছেলেমানুষী নয় বিনুদা। আচ্ছা অন্ততঃ একদিন থাক্।"

"একদিনে রঙ শুকিয়ে যাবে যে।"

"রঙ শুকিয়ে গেলেও ত' আপনি বদলাতে পারেন।"

বিনয় বলিল, "সে ভাল হয় না। কিন্তু একদিন থাক্‌লে তোমার কি লাভ হবে?"

"কমলার চোখত' এখনো আপনি আঁকেন নি?"

"না।"

"কাল সকালে আঁকবেন?"

"বোধ হয়।"

"তারপর বিকেলে যেমন আমার আঁকেন তেমনি আঁকবেন।"

এমন সময়ে গেটে সুকুমারের গাড়ি দেখা দিল, এবং দেখিতে দেখিতে বিনয় ও শোভার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িয়া নিকটে আসিয়া সুকুমার বলিল, "কি, ছবি আঁকা হ'য়ে গেল?"

বিনয় বলিল, "সে কথা পরে হবে—এখন তুমি কি ক'রে এলে বলো?"

সুকুমার শোভার ছবি দেখিতে দেখিতে বলিল, "সে কথা পরে হবে—এখন তুমি যা এঁকেছ ঠিক হয় নি। এক্সপ্রেশন্ বদলে গেছে। শোভার চোখ ওরকম নয়।"

শোভাকে দেখিতে গিয়া সুকুমার দেখিল শোভা তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছে। (ক্রমশঃ)

হুইট্‌মেনিয়া

"আনন্দবর্দ্ধন" মাঘ সংখ্যার "শনিবারের চিঠিতে" "হুইট্‌মেনিয়া" শীর্ষক একটী অতি সারবান প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। স্থানাভাব বশতঃ সমস্তটা উদ্ধৃত করিতে পারা গেল না। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

"No, they are not hoaxers. They are ecstatics. Two or three of them have had a seizure, and the whole coterie is raving, for nothing is more contagious than certain nervous states." Anatole France. এক জাতীয় লেখকদের সম্বন্ধে উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আনাতোল ফ্রাঁস প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, মানুষের সাহিত্যিক দোষগুণ ততটা তাহাদের ইচ্ছার অধীনে নহে যতটা হইলে আমরা তাহাদিগকে বেশ প্রাণ খুলিয়া গালি দিতে পারি। আর্ট এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমন বহু প্রকার "অভিব্যক্তি" ছড়াছড়ি যাইতেছে, যাহার সমালোচনা Aesthetics-এর দিক দিয়া না হইয়া medicine-এর দিক দিয়া হওয়া উচিত। আনাতোল বলিতেছেন—

"I understand why the adepts of the new art should love their disease and even pride themselves on it ; and even if they have some little contempt for those who are not refined by so rare a nervous affection, I shall not complain. It would be bad taste to reproach them for being ill."

অর্থাৎ কিনা আনাতোল কর্ত্তৃক বর্ণিত সাহিত্যিকবৃন্দের মধ্যে দুই একজন পাণ্ডাজাতীয় ব্যক্তির প্রথমত এক প্রকার স্নায়বিক বিকার উপস্থিত হয় ; তৎপরে স্নায়বিক ব্যাধিমাত্রেরই প্রকৃতিগত ছোঁয়াচে-দোষ প্রযুক্ত উক্ত ব্যাধি গণ্ডীর অপরাপর সকলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। এই গেল অবস্থা। আনাতোল বলিতেছেন যে ব্যাধিগ্রস্তের প্রতি রাগ করা কদাপি উচিত নহে ; এমন কি রোগীরা যদি স্বাস্থ্যবানের নীরোগ অপকর্ষের প্রতি শ্লেষ ও অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, তথাপিও নহে।

আমারও তাহাই মনে হয়। কিন্তু শুধু ব্যাধি বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। ব্যাধির কথা উঠিলেই তাহার প্রতিকারের কথা উঠে।

আনাতোল ফ্রাঁস যাহাদের কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ অল্পই—নাই বলাই ঠিক ; কিন্তু স্নায়ুবিকার আমাদের আর্ট ও সাহিত্যেও বিরল নহে। বর্ত্তমানে বরং তাহা ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে বলিয়াই মনে হয়। এই প্রকার ব্যাধি যে শুধু কোন এক বিশেষরূপেই প্রকাশ পায় তাহা বলা যায় না। ইহার মূল ও স্বভাব অনুসন্ধান করিলে ইহার মধ্যে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। আমার উদ্দেশ্য একে একে আর্ট ও সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ ব্যাধিগুলিকে ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখান। প্রথমত আমরা যে ব্যাধির প্রকোপ বর্ত্তমান সাহিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহারই আলোচনা করিব। এই ব্যাধির নাম হুইটমেনিয়া। নাম হইতেই বুঝা যায় যে ইহা স্নায়বিক ব্যাধি ও ইহার মূলে স্নায়ুর অনুকোষ (Tissue) সংক্রান্ত বিকার কিছু নাই, আছে ক্রিয়ার (Function) বিকার।

মেনিয়া জাতীয় ব্যাধির কারণ ও লক্ষণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে (১) মানুষের মনে যদি কোন কামনা, বাসনা বা অভিলাষ পূর্ণ প্রবলতা লাভ করিয়াও অপূর্ণ থাকিয়া যায় তাহা হইলে মানুষ কাম্যকে না পাইয়া দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার আবেগে বাসনাকে ছদ্মবেশ পরাইয়া বিকৃত উপায়ে পরিতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে, অথবা (২) আসলকে না পাইয়া নকলকেই আসল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া সুখসিদ্ধি করে। (৩) মানুষ যদি কোন লজ্জাকর বিষয়ে বা চিন্তায় লিপ্ত থাকে তাহা হইলে সে হেয়কে শ্রেয়রূপ দিবার জন্য নানা প্রকার আচরণের ও তর্কের সৃজন করে। এইপ্রকার নানাবিধ কারণে

মানুষের মনে মেনিয়ার সঞ্চার হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে কোন কোন ব্যক্তি ধর্ম্মজীবন যাপনেচ্ছাকে কেমন অবাধে লাম্পটাধর্ম্মে পরিণত করিয়া গুপ্তকামনাকে চরিতার্থ করেন। কেহবা শক্তিশালী হইবার বাসনাকে, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিয়া নিবৃত্তি করেন। কেহ যৌন-চিন্তাকে আর্ট অথবা ইউজেনিক্সের আবরণে জীয়াইয়া রাখেন। বাৎস্যায়ণ বা হ্যাভেলক এলিসের দোহাই দিয়া অনেক যৌন-আসামী খালাস পাইয়াছে, এমন কি জজের প্রশংসা-লাভেও সক্ষম হইয়াছে। স্বাভাবিক দেহ-প্রদর্শন ব্যাধিকে অনেকে পলিটিক্যাল মঞ্চে লম্প ঝম্প করিয়া দাবাইয়া ও অর্দ্ধ-তৃপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। নারীর অধিকারের কথা আওড়াইয়া অনেক অতিমানব নিজের পরবধূবহিস্করণ প্রবৃত্তির সাফাই গাহিয়াছেন। ...."

লাইব্রেরী

শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পৌষের 'প্রবর্ত্তকে' লিখিতেছেন ;—

এককালে লাইব্রেরীর আদর্শ ছিল দেশের পুস্তক সংগ্রহ করিয়া রাখা। পণ্ডিতগণ সেখানে গিয়া নিজ নিজ বিষয়ের গ্রন্থ লইয়া অধ্যয়ন করিতেন। তখন লাইব্রেরী যথার্থ 'পুস্তকাগার' মাত্র ছিল, পুঁথি পত্র রক্ষিত হইবার একটা নিরাপদ স্থান মাত্র। কিন্তু যেদিন হইতে জন-শিক্ষার কথা দেশে উঠিল, যেদিন নিদ্রিত জন-সিংহ জাগিয়া উঠিয়া জ্ঞানের জন্য ব্যগ্র হইল, সেইদিন হইতে লাইব্রেরীর কাজের রূপান্তর হইয়াছে—তাহার কর্ত্তব্য নূতন হইয়াছে। লাইব্রেরী এতদিন passive প্রতিষ্ঠান মাত্র ছিল, এখন লাইব্রেরী active force হইল। আমার বক্তব্যের মূল কথা হইতেছে, libraryর এই activity, বই কেনা, কাটালগ করা, বই দেওয়া, ফেরৎ লওয়া প্রভৃতি কাজ ত আছেই ; ইহার উপর বর্ত্তমান লাইব্রেরীয়ান ভার লইয়াছে—লোকশিক্ষার। ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান, এমন কি ভারতের কোন কোন স্থানেও লাইব্রেরী actively জন-শিক্ষায় সহায়তা করিতেছে। কিন্তু জন-শিক্ষার আদর্শ লইয়া গোটা দুই কথা বলিতে চাই। কথাটি একটু অবান্তর হইলেও একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নহে।

পশ্চিমের সহিত পূর্ব্বের একটা বড় জায়গায় অমিল আছে ; সেটা racial ; বলিতে পারা যায়, Semetic ও Aryan temperamentএর পার্থক্য। আমাদের দেশের শাস্ত্রকে আমরা বলি 'শ্রুতি' ; পশ্চিম শাস্ত্রকে বলে 'Scripture'। ধাতুগত অর্থের পার্থক্য রহিয়াছে। আমাদের শাস্ত্র 'শুনিয়া' চলিয়া আসিতেছে—আমরা শ্রবণ করিয়া জ্ঞান লাভ করি। আমাদের শিক্ষক-গুরু যিনি কর্ণে মন্ত্র দেন, কথক যিনি ধর্ম্মকথা বা সামাজিক কর্ত্তব্য উপদেশ শ্রবণ করান। পশ্চিমের শাস্ত্র Scripture বা লেখায়। মুসা লিখিত-অনুশাসন পাইলেন। Scriptএর উপর ঝোঁক পড়িয়াছে। এই মূল বা fundamental পার্থক্য জীবনের প্রত্যেক কোঠায় দেখা যায়। সেকথা যাক। আমাদের শিক্ষা, Education, literary হইয়াও ব্যাপ্ত হইয়াছিল। পশ্চিমে education, literary হইয়া ব্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। Literacy ও Education এক জিনিষ নহে, সেকথা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। প্রশ্ন হইতেছে আমাদের সমস্যা কি ? উত্তর—দেশের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের। পূর্ব্বেই বলিয়াছি Library এখন active প্রতিষ্ঠান—পূর্ব্বের ন্যায় জড় পাঠাগার নয়। এখন প্রশ্ন—লাইব্রেরী কেমন করিয়া সেই শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করিতে পারে ? আমার এই কথায় কেহ যেন মনে না করেন—আমি শিক্ষা-বিভাগের ও সাধারণ বিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য ও লাইব্রেরীর কর্ত্তব্যকে অভিন্ন করিতেছি। তাহা মোটেই বলিতে চাহিতেছি না, আমার বক্তব্য—কেমন করিয়া এই লাইব্রেরী আমাদের দেশের প্রাচীন মৌলিক পদ্ধতির সহিত একসাথে কাজ করিতে পারে। বিদ্যালয় বিদ্যা দান করিতেছে—literacy বা অক্ষর জ্ঞানের মধ্য দিয়া বিদ্যা দান করিতেছে। লাইব্রেরী সেই কাজকে supplement করিতেছে। কিন্তু এ ছাড়াও তার কাজ আছে। সেটা তার activityর দিক।

লাইব্রেরীতে পূর্ব্বে লোক আসিত অধ্যয়নের জন্য ; এখন লাইব্রেরী পুস্তক লইয়া লোকদের কাছে উপস্থিত হইতেছে, শিক্ষা দিবার জন্য। লাইব্রেরীর প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে—যাহারা অধ্যয়নশীল তাহাদের সহায়তা করা।... ... ."

তরুণ সাহিত্যিক

মাঘের শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"......তরুণরা যে তরুণ, বুড়োদের অধ্যাপকপাড়া থেকে তার প্রমাণপত্র সংগ্রহ করা চলচে। এর মধ্যে কৌতুকের কথাটা হচ্চে এই যে, তারুণ্যটা হ'ল বয়সের ধর্ম্ম, ওটা স্বভাবের নিয়ম,—ওটার জন্য রুদ্ধীয় সাহিত্যশাস্ত্র থেকে নোট মুখস্থ ক'রে কাউকে এগজামিন পাশ ক'রতে হয় না,—বিধাতার বিধানে ঐ বয়সটাতে মানুষ আপনিই আসে। কিন্তু আজকালকার দিনে তারুণ্যের বিশেষ ডিগ্রী-ধারীরা নিজেদের দুঃসহ তরুণতা সম্বন্ধে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের থীসিস্ লিখ্‌তে সুরু করেচে। তারা বলচে আমরা তরুণ-বয়স্ক ব'লেই সবাই আমাদের সমস্বরে বাহবা দাও,—আমরা যুদ্ধ করেচি ব'লে না, প্রাণ দিয়েচি ব'লে না, তরুণ বয়সে আমরা যা-ইচ্ছে-তাই লিখেচি ব'লে। সাহিত্যের

তরুণকে বল্‌বার কথা এই যে, যেটা লেখা হয়েচে সাহিত্যের আদর্শ থেকে তাকে হয় ভালো নয় মন্দ বল্‌ব, কিন্তু তরুণ বয়সে লেখার একটা স্বতন্ত্র আদর্শ খাড়া করতে হবে এটা আজ পর্য্যন্ত শুনিনি। বাংলা দেশে সাহিত্যের বিচারে দুই-জাতের আইন, দুই জাতের জুরি রাখ্‌তে হবে, একটা হচ্চে আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের লেখকদের জন্যে, আর একটা বাকি সকলের জন্যে, এই বিধানটাই পাকা হবে নাকি? —থেকে লেখকদের কুষ্ঠি মিলিয়ে তবে লেখার ভালোমন্দ ঠিক করতে হবে, কোনো তরুণ-বয়স্কের লেখার নির্লজ্জতাদোষ ধর্‌লে নালিশ উঠবে যে সেটাতে কেবলমাত্র লেখার নিন্দা করা হলো না; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত তরুণ আছে সবাইকেই গাল দেওয়া হোলো।"

নানাকথা

বিগত ৪ঠা মার্চ্চ বাংলার কৃতী সন্তান লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ দেহত্যাগ করিয়াছেন। নিজের প্রতিভাবলে তিনি ধীরে ধীরে সাধারণ ব্যারিষ্টার হইতে ষ্টাণ্ডিং কাউনসেল্ ও এ্যাড্‌ভোকেট্ জেনারল্ পদে উন্নীত হন। বড়লাটের সদস্য সভারও তিনিই প্রথম ভারতীয় সদস্য। ১৯১৮ সালে তিনি লর্ড মণ্টেগু কর্ত্তৃক ভারতের অণ্ডার্ সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্ রূপে নির্ব্বাচিত এবং 'লর্ড' উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। এই উভয় গৌরবই শুধু বাঙালীর নয়, ভারতবাসীর ভাগ্যে প্রথম। মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড প্রবর্ত্তিত ভারতের নব শাসন-বিধান সম্পর্কে তিনি বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণরত্ব গ্রহণ করেন। পরে ১৯২৬ সালে তিনি প্রিভি-কাউন্‌সিল-এর অন্যতম মেম্বর এবং 'লিঙ্কনস্‌ইন্'-এর অবৈতনিক 'বেঞ্চার' এই দুই মহাসম্মানের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার মৃত্যুতে শোকসন্তপ্তা মাতৃভূমি সেই শ্রেণীর একটি পুত্র হারাইল, যাঁহারা বিদেশীর চক্ষে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

* * *

আমরা অতীব দুঃখের সহিত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ জানাইতেছি। বাংলার পণ্ডিত সমাজে তাঁহার নাম ও প্রতিষ্ঠা সর্ব্বজনবিদিত ছিল।

* * *

রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' নাটিকা, সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইয়া দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিয়াছে। এ নাটিকা যে ফাল্গুনের ফল্গুৎসবের মতই যৌবনের রঙে রঞ্জিত—ইহার গানের পিচকারীর মুখে যে যুগসঞ্চিত জড়তা ও অবসাদও ভাসিয়া যাইতে পারে, তাহার পরিচয় পাইতে কাহারো বিলম্ব হয় নাই। শুনা যায়, কলিকাতাতেও শীঘ্রই ইহার পুনরভিনয় হইবে।

* * *

গতসংখ্যা পর্য্যন্ত 'বিচিত্রা' 'মডার্ন্ আর্ট' প্রেস হইতে মুদ্রিত হইতেছিল তাহা পাঠকবর্গ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। বর্ত্তমান সংখ্যার 'বিচিত্রা' তাহার নিজের ব্যবস্থায় মুদ্রিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিল—এবং এখন হইতে আশা করি সে সৌভাগ্য অক্ষুণ্ণই থাকিবে। নূতন প্রেসের নূতনত্বের কিছু ত্রুটি হয়ত বিচিত্রার অঙ্গে দেখা যাইবে। আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ দুই এক সংখ্যার জন্যও তাহা মার্জ্জনা করিবেন। এই প্রসঙ্গে 'মডার্ণ্ আর্ট' প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ এই জন্য জ্ঞাপন করা আবশ্যক মনে করি যে, তাঁহারা যথোচিত নৈপুণ্য ও যথাতিরিক্ত পরিশ্রম দ্বারা বিচিত্রার শৈশব জীবনের উপর এমন একটি শ্রী ও সৌষ্ঠব দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, যাহা সে তাহার পরিণত বয়সেও বিস্মৃত হইবেনা।

Printed at The Sasil Printing Works, 47, Pataldanga Street, Calcutta,
by Srijut Probodh Lal Mukherjee, and published by him from 51 Pataldanga Street, Calcutta.
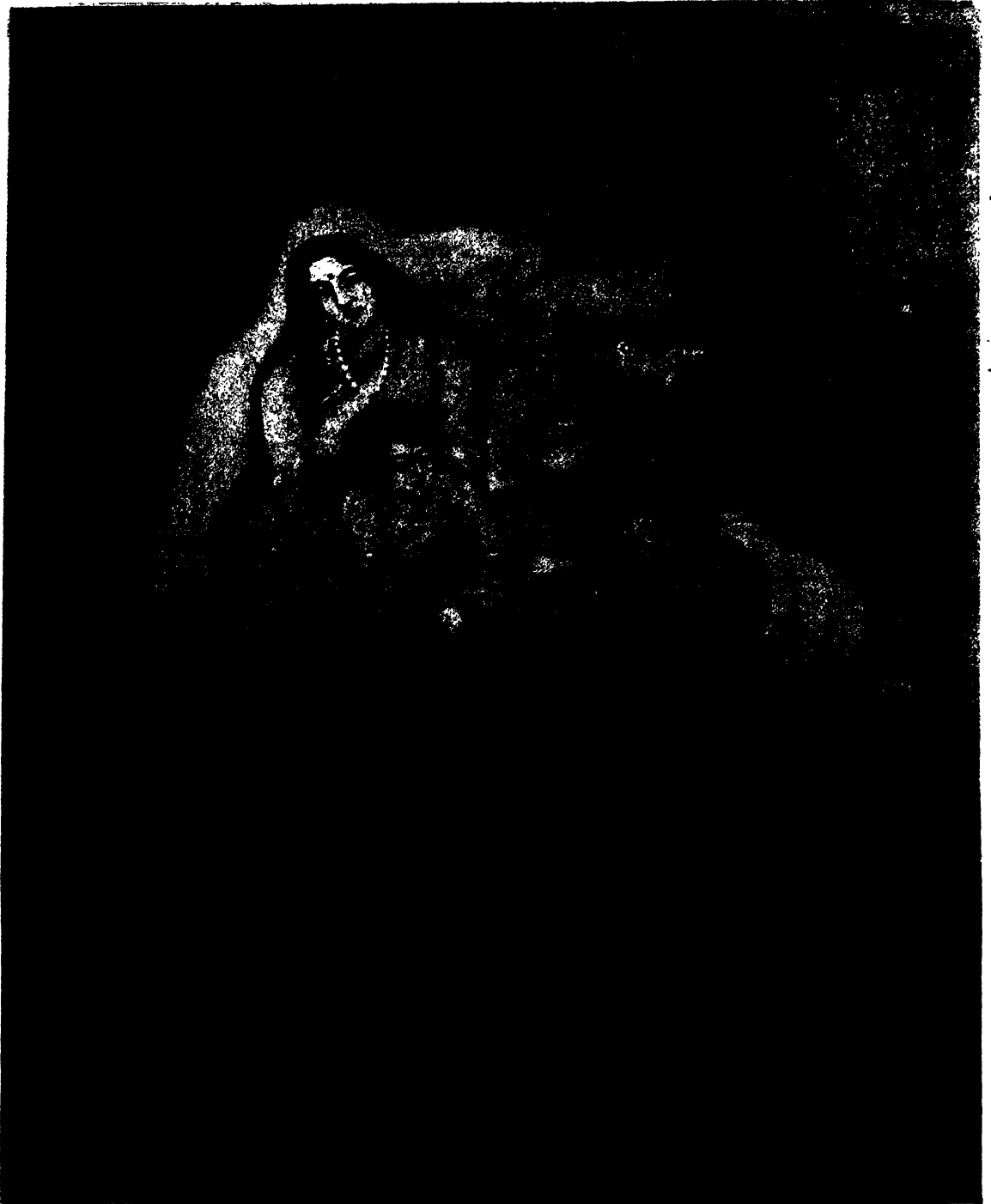
আলো ও ছায়া

বৈশাখ, ১৩৩৫

শিল্পী—শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র

প্রথম বর্ষ, ২য় খণ্ড | বৈশাখ, ১৩৩৫ | পঞ্চম সংখ্যা

উদ্বোধন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাঘের সূর্য্য উত্তরায়ণে
পার হয়ে এলো চলি',
তার পানে হায় শেষ চাওয়া চায়
করুণ কুন্দকলি।
উত্তর বায় একতারা ত'ার
তীব্র নিখাদে দিলো ঝঙ্কার,
শিথিল যা ছিলো তারে ঝরাইলো
গেলো তারে দলি' দলি'॥

শীতের রথের ঘূর্ণি ধূলিতে
গোধূলিরে করে ম্লান।
তাহারি আড়ালে নবীন কালের
কে আসিছে সে কি জানো?
বনে বনে তাই আশ্বাসবাণী
করে কানাকানি "কে আসে কি জানি,"
বলে মর্ম্মরে "অতিথির তরে
অর্ঘ্য সাজায়ে আনো॥"

নির্ম্মম শীত তারি আয়োজনে
এসেছিলো বনপারে।
মার্জ্জিয়া দিলো শ্রান্তি ক্লান্তি,
মার্জ্জনা নাহি কারে।
ম্লান চেতনার আবর্জ্জনায়
পান্থের পথে বিঘ্ন ঘনায়,
নবযৌবনদূতরূপী শীত
দূর করি দিলো তারে

ভরা পাত্রটি শূন্য করে সে
ভরিতে নূতন করি'।
অপব্যয়েরে ভয় নাহি তার
পূর্ণের দান স্মরি'।
অলসভোগের গ্লানি সে ঘুচায়,
মৃত্যুর স্নানে কালিমা মুছায়,
চির-পুরাতনে করে উজ্জ্বল
নূতন চেতনা ভরি'॥

নিত্যকালের মায়াবী আসিছে
নব পরিচয় দিতে।
নবীন রূপের অপরূপ জাদু
আনিবে সে ধরণীতে।
লক্ষ্মীর দান নিমেষে উজাড়ি'
নির্ভয় মনে দূরে দেয় পাড়ি,
নব বর সেজে চাহে লক্ষ্মীরে
ফিরে জয় ক'রে নিতে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার
সৃষ্টি তাহার খেলা।
দস্যুর মতো ভেঙে চুরে দেয়
চিরাভ্যাসের মেলা।
মূল্যহীনেরে সোনা করিবার
পরশপাথর হাতে আছে তা'র,
তাইতো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে
উদ্ধত অবহেলা॥

বলো "জয় জয়", বলো "নাহি ভয়" ;—
কালের প্রয়াণপথে
আসে নির্দ্দয় নবযৌবন
ভাঙনের মহারথে।
চিরন্তনের চঞ্চলতায়
কাঁপন লাগুক লতায় লতায়,
থর থর করি' উঠুক পরাণ
প্রান্তরে পর্ব্বতে॥

বার্ত্তা ব্যাপিল পাতায় পাতায়
"করো ত্বরা, করো ত্বরা।
সাজাক্ পলাশ আরতিপাত্র
রক্তপ্রদীপে ভরা।
দাড়িম্ববন প্রচুর পরাগে
হোক প্রগল্ভ রক্তিমরাগে,
মাধবিকা হোক সুরভি সোহাগে
মধুপের মনোহরা॥"

কে বাঁধে শিথিল বীণার তন্ত্র
কঠোর যতন ভরে,
ঝঙ্কারি' উঠে অপরিচিতার
জয়সঙ্গীতস্বরে।
নগ্ন শিমুলে কার ভাণ্ডার,
রক্ত দুকূল দিলো উপহার,
দ্বিধা না রহিলো বকুলের আর
রিক্ত হবার তরে॥

দেখিতে দেখিতে কি হ'তে কি হোলো
শূন্য কে দিলো ভরি'।
প্রাণবন্যায় উঠিলো ফেনায়ে
মাধুরীর মঞ্জরী।
ফাগুনের আলো সোনার কাঠিতে
কি মায়া লাগালো, তাইতো মাটিতে
নবজীবনের বিপুল ব্যথায়
জাগে শ্যামাসুন্দরী॥

দোল পূর্ণিমা ১৩৩৪
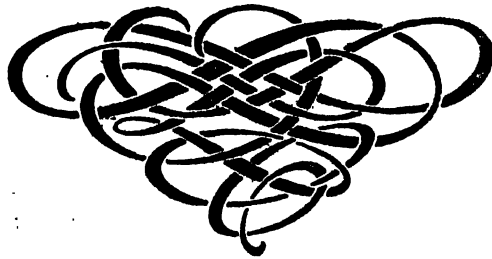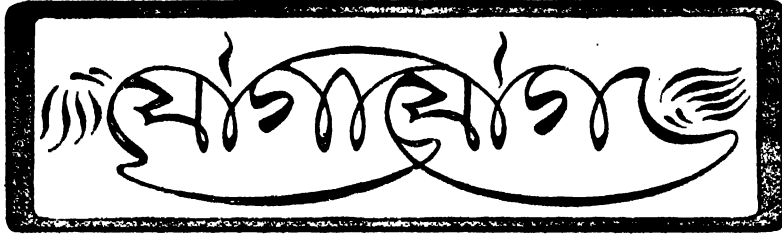
—উপন্যাস—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৬

মধুসূদন বাইরে গিয়ে নবীনকে ডেকে পাঠিয়ে বল্‌লে, "বড়বৌকে তোরা ক্ষেপিয়েছিস্‌।"

"দাদা, কালই তো আমরা যাচ্চি, তোমার কাছে ভয়ে ভয়ে আর ঢোঁক গিলে কথা কব না। আমি আজ এই পষ্ট ব'লে যাচ্চি, বড়বৌরাণীকে ক্ষেপাবার জন্যে সংসারে আর কারো দরকার হবে না,—তুমি একাই পারবে। আমরা থাকলে তবু যদিবা কিছু ঠাণ্ডা রাখতে পারতুম, কিন্তু সে তোমার সইল না।"

মধুসূদন গর্জ্জন ক'রে উঠে বল্‌লে, "জ্যাঠামি করিস নে! রজবপুরে যাবার কথা তোরাই ওকে শিখিয়েচিস।"

"এ কথা ভাব্‌তেই পারিনে তো শেখাব কি!"

"দেখ্‌, এই নিয়ে যদি ওকে নাচাস তোদের ভাল হবে না স্পষ্টই ব'লে দিচ্চি।"

"দাদা, এ সব কথা বল্‌চ কাকে? যেখানে বল্‌লে কাজে লাগে বলো গে।"

"তোরা কিছু বলিস্‌নি?"

"এই তোমার গা ছুঁয়ে বলচি কল্পনাও করিনি।"

"বড়বৌ যদি জেদ ধ'রে বসে তাহলে কি করবি তোরা?"

"তোমাকে ডেকে আনব। তোমার পাইক বরকন্দাজ পেয়াদা আছে, তুমি ঠেকাতে পারো! তারপরে তোমার শত্রুপক্ষেরা এই যুদ্ধের সংবাদ যদি কাগজে রটায় তা'হলে মেজবৌকে সন্দেহ ক'রে বোসো না।"

মধুসূদন আবার তাকে ধমক দিয়ে বল্‌লে, "চুপ কর! বড়বৌ যদি রজবপুরে যেতে চায় তো যাক্‌, আমি ঠেকাব না।"

"আমরা তাঁকে খাওয়াবো কি ক'রে?"

"তোমার স্ত্রীর গহনা বিক্রি ক'রে। যা, যা বলচি! বেরো বলচি ঘর থেকে!"

নবীন বেরিয়ে গেল। মধুসূদন ও-ডি-কলোন্‌ ভিজোনো পটি কপালে জড়িয়ে আবার একবার আপিসে যাবার সঙ্কল্প মনে দৃঢ় করতে লাগলো।

নবীনের কাছে মোতির মা সব কথা শুনে দৌড়ে গেল কুমুর শোবার ঘরে। দেখলে তখনও সে কাপড়-চোপড় পাট করচে তোলবার জন্যে। বল্‌লে, "একি করচ, বৌরাণী?"

"তোমাদের সঙ্গে যাব।"

"তোমাকে নিয়ে যাবার সাধ্য কি আমার!"

"কেন?"

"বড়ঠাকুর তা'হলে আমাদের মুখ দেখবেন না।"

"তা'হলে আমারো দেখবেন না।"

"তা সে যেন হোলো, আমরা যে বড় গরীব।"

"আমিও কম গরীব না, আমারো চ'লে যাবে।"

"লোকে যে বড়ঠাকুরকে নিয়ে হাসবে।"

"তা ব'লে আমার জন্যে তোমরা শাস্তি পাবে এ আমি সইব না।"

"কিন্তু দিদি, তোমার জন্যে ত শাস্তি নয়, এ আমাদের নিজের পাপের জন্যেই।"

"কিসের পাপ তোমাদের?"

"আমরাই তো খবর দিয়েচি তোমাকে।"

"আমি যদি খবর জানতে চাই তাহলে খবর দেওয়াটা অপরাধ?"

"কর্ত্তাকে না জানিয়ে দেওয়াটা অপরাধ।"

"তাই ভালো, অপরাধ তোমরাও করেচ আমিও করেচি। এক সঙ্গেই ফল ভোগ করব।"

"আচ্ছা বেশ, তাহ'লে ব'লে দেব তোমার জন্যে পালকী। বড়ঠাকুরের হুকুম হয়েচে তোমাকে বাধা দেওয়া হবে না। এখন তবে তোমার জিনিষগুলি গুছিয়ে দিই। ওগুলো নিয়ে যে ঘেমে উঠ্‌লে।"

দুজনে গোছাতে লেগে গেল।

এমন সময় কানে এল বাইরে জুতোর মচ্‌ মচ্‌ ধ্বনি। মোতির মা দিল দৌড়।

মধুসূদন ঘরে ঢুকেই বল্‌লে, "বড়বৌ, তুমি যেতে পারবে না।"

"কেন যেতে পারব না?"

"আমি হুকুম করচি ব'লে।"

"আচ্ছা, তা'হলে যাব না। তার পরে আর কি হুকুম বলো।"

"বন্ধো করো তোমার জিনিষ প্যাক করা।"

"এই বন্ধ করলুম।" ব'লে কুমু উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মধুসূদন বল্‌লে, "শোনো, শোনো।"

তখনি কুমু ফিরে এসে বল্‌লে, "কি বলো।"

বিশেষ কিছুই বলবার ছিল না। তবু একটু ভেবে বললে, "তোমার জন্যে আঙটি এনেচি।"

"আমার যে-আঙটির দরকার ছিল সে তুমি পরতে বারণ করেচ, আর আমার আঙটির দরকার নেই।"

"একবার দেখোই না চেয়ে।"

মধুসূদন একে একে কৌটো খুলে দেখালে। কুমু একটি কথাও বল্‌লে না।

"এর যেটা তোমার পছন্দ সেইটেই তুমি পরতে পার।"

"তুমি যেটা হুকুম করবে সেইটেই পরবো।"

"আমি তো মনে করি তিনটেই তিন আঙুলে মানাবে।"

"হুকুম করো তিনটেই পরব।"

"আমি পরিয়ে দিই।"

"দাও পরিয়ে।"

মধুসূদন পরিয়ে দিলে। কুমু বল্‌লে, "আর কিছু হুকুম আছে?"

"বড় বৌ, রাগ করচ কেন?"

"আমি একটুও রাগ করচিনে।" ব'লে কুমু আবার ঘর থেকে চ'লে গেলো।

মধুসূদন অস্থির হয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "আহা, যাও কোথায়? শোনো, শোনো।"

কুমু তখনি ফিরে এসে বল্‌লে, "কি বলো।"

ভেবে পেল না কি বলবে। মধুসূদনের মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। ধিক্কার দিয়ে ব'লে উঠলো, "আচ্ছা যাও।" রেগে বল্‌লে, "দাও আঙটিগুলো ফিরিয়ে দাও।"

তখনি কুমু তিনটে আঙটি খুলে টিপায়ের উপর রাখলে।

মধুসূদন ধমক্‌ দিয়ে বল্‌লে, "যাও চলে।"

কুমু তখনি চ'লে গেল।

এইবার মধুসূদন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলে যে, সে আপিসে যাবেই। তখন কাজের সময় প্রায় উত্তীর্ণ। ইংরাজ কর্ম্মচারীরা সকলেই চ'লে গেছে টেনিস খেলায়। উচ্চতন বড়োবাবুদের দল উঠি উঠি করচে। এমন সময় মধুসূদন আপিসে উপস্থিত হ'য়ে একেবারে খুব ক'রে কাজে লেগে গেল। ছটা বাজল, সাতটা বাজল, আটটা বাজে, তখন খাতাপত্র বন্ধ ক'রে উঠে পড়ল।

৩৭

এতদিন মধুসূদনের জীবন-যাত্রায় কখনো কোনো খেই ছিঁড়ে যেত না। প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্ত্তই নিশ্চিত নিয়মে বাঁধা ছিল। আজ হঠাৎ একটা অনিশ্চিত এসে সব গোলমাল বাধিয়ে দিয়েচে। এই যে আজ আপিস থেকে বাড়ির দিকে চলেচে, রাত্তিরটা যে ঠিক কি ভাবে প্রকাশ পাবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। মধুসূদন ভয়ে ভয়ে বাড়িতে এলো, আস্তে আস্তে আহার করলে। আহার ক'রে তখনি সাহস

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হ'ল না শোবার ঘরে যেতে। প্রথমে কিছুক্ষণ বাইরের দক্ষিণের বারান্দায় পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগ্‌ল। শোবার সময় নটা যখন বাজল তখন গেল অন্তঃপুরে। আজ ছিল দৃঢ় পণ—যথা সময়ে বিছানায় শোবে, কিছুতেই অন্যথা হবে না। শূন্য শোবার ঘরে ঢুকেই মশারি খুলেই একেবারে ঝপ ক'রে বিছানার উপরে পড়ল। ঘুম আসতে চায় না। রাত্রি যতই নিবিড় হয় ততই ভিতরকার উপবাসী জীবটা অন্ধকারে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। তখন তাকে তাড়া করবার কেউ নেই, পাহারাওয়ালারা সকলেই ক্লান্ত।

ঘড়িতে একটা বাজল, চোখে একটুও ঘুম নেই। আর থাক্‌তে পারল না, বিছানা থেকে উঠে ভাবতে লাগল কুমু কোথায়? বন্ধু কমলের উপর কড়া হুকুম ফরাসখানা তালা-চাবি দিয়ে বন্ধ। ছাদ ঘুরে এলো, ছাদে কেউ নেই। পায়ের জুতো খুলে ফেলে নীচের তলায় বারান্দা বেয়ে ধীরে ধীরে চল্‌তে লাগ্‌ল। মোতির মার ঘরের সামনে এসে মনে হোলো যেন কথাবার্ত্তার শব্দ। হ'তে পারে কাল চ'লে যাবে আজ স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ চল্‌চে। বাইরে চুপ ক'রে দরজায় কান পেতে রইল। দুজনে গুন্ গুন্ ক'রে আলাপ চল্‌চে। কথা শোনা যায় না কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল দুটিই মেয়ের গলা। তবে তো বিচ্ছেদের পূর্ব্বরাত্রে মোতির মায়ের সঙ্গে কুমুরই মনের কথা হচ্ছে। রাগে ক্ষোভে ইচ্ছে করতে লাগ্‌ল লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলে একটা কাণ্ড করে। কিন্তু নবীনটা তাহলে কোথায়? নিশ্চয় বাইরে।

অন্তঃপুর থেকে বাইরে যাবার ঝিলমিল-দেওয়া রাস্তাটাতে লণ্ঠনে একটা টিম্‌টিমে আলো জলচে, সেইখানে এসেই মধুসূদন দেখলে একখানা লাল শাল গায়ে জড়িয়ে শ্যামা দাঁড়িয়ে। তার কাছে লজ্জিত হ'য়ে মধুসূদন রেগে উঠ্‌ল। বল্‌লে, "কী করচ এত রাত্রে এখানে?"

শ্যামা উত্তর করলে, "শুয়েছিলুম। বাইরে পায়ের শব্দ শুনে ভয় হ'ল, ভাব্‌লুম বুঝি—"

মধুসূদন তর্জ্জন ক'রে ব'লে উঠ্‌ল—"আস্পর্দ্ধা বাড়চে দেখ্‌চি! আমার সঙ্গে চালাকী করতে চেয়ো না, সাবধান ক'রে দিচ্চি। যাও শুতে।"

শ্যামাসুন্দরী কয়দিন থেকে একটু একটু ক'রে তার সাহসের ক্ষেত্র বাড়িয়ে বাড়িয়ে চল্‌ছিল। আজ বুঝলে, অসময়ে অজায়গায় পা পড়েচে। অত্যন্ত করুণ মুখ ক'রে একবার সে মধুসূদনের দিকে চাইলে—তারপরে মুখ ফিরিয়ে আঁচলটা টেনে চোখ মুছলে। চ'লে যাবার উপক্রম ক'রে আবার সে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "চালাকি করব না ঠাকুরপো! যা দেখতে পাচ্চি তাতে চোখে ঘুম আসে না। আমরা তো আজ আসিনি, কতকালের সম্বন্ধ, আমরা সইব কী ক'রে?" ব'লে শ্যামা দ্রুতপদে চ'লে গেল।

মধুসূদন একটুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, তারপরে চল্‌ল বাইরের ঘরে। ঠিক একেবারে পড়ল চৌকিদারের সামনে, সে তখন টহল দিতে বেরিয়েচে। এমনি নিয়মের কঠিন জাল যে, নিজের বাড়িতে যে চুপি চুপি সঞ্চরণ করবে তার জো নেই। চারিদিকেই সতর্ক দৃষ্টির ব্যূহ। রাজাবাহাদুর এই রাত্রে বিছানা ছেড়ে খালি পায়ে অন্ধকারে বাইরের বারান্দায় ভূতের মতো বেরিয়েচে এ যে একেবারে অভূতপূর্ব্ব। প্রথমে দূর থেকে যখন চিন্‌তে পারেনি, চৌকিদার ব'লে উঠেছিল, "কোন হ্যায়?" কাছে এসে জিভ কেটে মস্ত প্রণাম করলে; বল্‌লে, "রাজাবাহাদুর, কিছু হুকুম আছে?"

মধুসূদন বল্‌লে, "দেখতে এলুম ঠিক মত চল্‌চে কিনা"। কথাটা মধুসূদনের পক্ষে অসঙ্গত নয়।

তারপরে মধুসূদন বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে দেখে যা ভেবেছিল তাই, নবীন বসবার ঘরে গদির উপর তাকিয়া আঁকড়ে নিদ্রা দিচ্ছে। মধুসূদন ঘরে একটা গ্যাসের আলো জেলে দিলে, তাতেও নবীনের ঘুম ভাঙলো না। তাকে ঠেলা দিতেই ধড়ফড় ক'রে জেগে সে উঠে বসল। মধুসূদন তার কোন রকম কৈফিয়ৎ তলব না ক'রেই বল্‌লে, "এখনি যা, বড়ো বৌকে বল্‌গে আমি তাকে শোবার ঘরে ডেকে পাঠিয়েচি।" ব'লে তখনি সে অন্তঃপুরে চ'লে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই কুমু শোবার ঘরে এসে প্রবেশ করলে। মধুসূদন তার মুখের দিকে চাইলে। সাদাসিধে একখানি লালপেড়ে সাড়ি পরা। সাড়ির প্রান্তটি মাথার উপরে

টানা। এই নির্জ্জন ঘরের অল্প আলোয় একি অপরূপ আবির্ভাব! কুমু ঘরের প্রান্তের সোফাটির উপরে বসল।

মধুসূদন তখনি এসে বসল মেজের উপরে তার পায়ের কাছে। কুমু সঙ্কুচিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি উঠবার চেষ্টা করবামাত্র মধুসূদন হাতে ধ'রে তাকে টেনে বসালে; বল্‌লে, "উঠোনা, শোনো আমার কথা। আমাকে মাপ করো, আমি দোষ করেচি।"

মধুসূদনের এই অপ্রত্যাশিত বিনতি দেখে কুমু অবাক্ হ'য়ে রইল। মধুসূদন আবার বললে, "নবীনকে মেজবৌকে রজবপুরে যেতে আমি বারণ ক'রে দেব। তারা তোমার সেবাতেই থাক্‌বে।"

কুমু কি যে বল্‌বে কিছুই ভেবে পেলে না। মধুসূদন ভাবলে, নিজের মান খর্ব্ব ক'রে আমি বড়ো বৌয়ের মান ভাঙব। হাত ধ'রে মিনতি ক'রে বল্‌লে, "আমি এখনি আস্‌চি, বলো তুমি চ'লে যাবে না।"

কুমু বল্‌লে, "না, যাব না।"

মধুসূদন নীচে চ'লে গেল। মধুসূদন যখন ক্ষুদ্র হয়, কঠোর হয়, তখন সেটা কুমুদিনীর পক্ষে তেমন কঠিন নয়। কিন্তু আজ তার এই নম্রতা, এই তার নিজেকে খর্ব্ব করা, এর সম্বন্ধে কুমুর যে কি উত্তর তা' সে ভেবে পায় না। হৃদয়ের যে দান নিয়ে সে এসেছিল সে তো সব স্খলিত হয়ে প'ড়ে গেচে, আর তো তা ধুলো থেকে কুড়িয়ে নিয়ে কাজ চল্‌বে না। আবার সে ঠাকুরকে ডাকতে লাগ্‌ল, "প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম।"

খানিক বাদে মধুসূদন নবীন ও মোতির মাকে সঙ্গে নিয়ে কুমুর সামনে উপস্থিত করলে। তাদের সম্বোধন ক'রে বল্‌লে, "কাল তোমাদের রজবপুরে যেতে বলেছিলাম, কিন্তু তার দরকার নেই। কাল থেকে বড়ো বৌয়ের সেবায় আমি তোমাদের নিযুক্ত ক'রে দিচ্চি।"

শুনে ওরা দুজনে অবাক হয়ে গেল। একে তো এমন হুকুম প্রত্যাশা করে নি, তার পরে এত রাত্তিরে ওদের ডেকে এনে একথা বল্‌বার জরুরী দরকার কি ছিল!

মধুসূদনের ধৈর্য্য সবুর মানছিল না। আজ রাত্তিরেই কুমুর মনকে ফেরাবার জন্যে উপায় প্রয়োগ করতে কার্পণ্য বা সঙ্কোচ করতে পারলে না। এমন ক'রে নিজের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ সে জীবনে কখনো করে নি। সে যা চেয়েছিল তা পাবার জন্যে তার পক্ষে সব চেয়ে দুঃসাধ্য মূল্য সে দিলে। তার ভাষায় সে কুমুকে বুঝিয়ে দিলে, তোমার কাছে আমি অসঙ্কোচে হার মানচি।

এইবার কুমুর মনে বড়ো একটা সঙ্কোচ এলো, সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল এই জিনিষটাকে কেমন ক'রে সে গ্রহণ করবে? এর বদলে কি আছে তার দেবার? বাইরে থেকে জীবনে যখন বাধা আসে তখন লড়াই করবার জোর পাওয়া যায়, তখন স্বয়ং দেবতাই হন সহায়। হঠাৎ সেই বাইরের বিরুদ্ধতা একেবারে নিরস্ত হ'লে যুদ্ধ থামে কিন্তু সন্ধি হতে চায় না। তখন বেরিয়ে পড়ে নিজের ভিতরের প্রতিকূলতা। কুমু হঠাৎ দেখ্‌তে পেলে মধুসূদন যখন উদ্ধত ছিল তখন তার সঙ্গে ব্যবহার অপ্রিয় হোক তবুও তা সহজ ছিল; কিন্তু মধুসূদন যখন নম্র হয়েচে তখন তার সঙ্গে ব্যবহার কুমুর পক্ষে বড়ো শক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। এখন তার ক্ষুব্ধ অভিমানের আড়াল থাকে না, তার সেই ফরাসখানার আশ্রয় চ'লে যায়, এখন দেবতার কাছে হাত জোড় করবার কোনো মানে নেই।

মোতির মাকে কোনো ছুতোয় কুমু যদি রাখ্‌তে পারত তা হ'লে সে বেঁচে যেত। কিন্তু নবীন গেল চ'লে, হতবুদ্ধি মোতির মাও আস্তে আস্তে চল্‌ল তার পিছনে; দরজার কাছে এসে একবার মুখ আড় ক'রে উদ্বিগ্নভাবে কুমুদিনীর মুখের দিকে চেয়ে গেল। স্বামীর প্রসন্নতার হাত থেকে এই মেয়েটিকে এখন কে বাঁচাবে?

মধুসূদন বল্‌লে, "বড়ো বউ, কাপড় ছেড়ে শুতে আসবে না?"

কুমু ধীরে ধীরে উঠে পাশের নাবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলে—মুক্তির মেয়াদ যতটুকু পারে বাড়িয়ে নিতে চায়। সে ঘরে দেওয়ালের কাছে একটা চৌকি ছিল সেইটেতে ব'সে রইল। তার ব্যাকুল দেহটা যেন নিজের মধ্যে নিজের অন্তরাল খুঁজ্‌চে। মধুসূদন মাঝে মাঝে দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকায় আর হিসেব করতে থাকে কাপড় ছাড়বার জন্যে কতটা সময় দরকার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইতিমধ্যে আয়নাতে নিজের মুখটা দেখলে, মাথার তেলোর যে জায়গাটাতে কড়া চুলগুলো বেমানান রকম খাড়া হয়ে থাকে বৃথা তার উপরে কয়েকবার বুরুশের চাপ লাগালে আর গায়ের কাপড়ে অনেকখানি দিলে ল্যাভেণ্ডার ঢেলে।

পনেরো মিনিট গেল; বেশ বদলের পক্ষে সে সময়টা যথেষ্ট। মধুসূদন চুপি চুপি একবার নাবার ঘরের দরজার কাছে কান দিয়ে দাঁড়ালো, ভিতরে নড়াচড়ার কোনো শব্দ নেই,—মনে ভাবলে কুমু হয় তো চুলটার বাহার করচে, খোঁপাটা নিয়ে ব্যস্ত। মেয়েরা সাজ করতে ভালোবাসে মধুসূদনেরও এ আন্দাজটা ছিল, অতএব সবুর করতেই হবে। আধঘণ্টা হ'ল—মধুসূদন আর একবার দরজার উপর কান লাগালে, এখনো কোনো শব্দ নেই। ফিরে এসে কেদারায় ব'সে প'ড়ে খাটের সামনের দেয়ালে বিলিতী যে ছবিটা ঝোলানো ছিল তার দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ এক সময়ে ধড়্‌ফড়্‌ ক'রে উঠে রুদ্ধ দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দিলে, "বড়ো বৌ, এখনো হয়নি?"

একটু পরেই আস্তে আস্তে দরজা খুলে গেল। কুমুদিনী বেরিয়ে এল, যেন সে স্বপ্নে-পাওয়া। যে-কাপড় পরা ছিল তাই আছে; এ তো রাত্রে শোবার সাজ নয়। গায়ে একখানা প্রায় পুরো হাতা-ওয়ালা ব্রাউন্ রঙের সার্জ্জের জামা, একটা লালপেড়ে বাদামি রঙের আলোয়ানের আঁচল মাথার উপর টেনে দেওয়া। দরোজার একটা পাল্লায় বাঁ হাত রেখে যেন কি দ্বিধার ভাবে দাঁড়িয়ে রইল—একখানি অপরূপ ছবি। নিটোল গৌরবর্ণ হাতে মকরমুখো প্লেন সোনার বালা—সেকেলে ছাঁদের—বোধ হয় এককালে তার মায়ের ছিল। এই মোটা ভারি বালা তার সুকুমার হাতকে যে ঐশ্বর্য্যের মর্য্যাদা দিয়েছে সেটি ওর পক্ষে এত সহজ যে, ঐ অলঙ্কারটা ওর শরীরে একটু মাত্র আড়ম্বরের সুর দেয়নি। মধুসূদন ওকে আবার যেন নতুন ক'রে দেখলে। ওর মহিমায় আবার সে বিস্মিত হ'ল। মধুসূদনের চিরার্জ্জিত সমস্ত সম্পদ এতদিন পরে শ্রীলাভ করেচে একথা না মনে ক'রে সে থাকৃতে পারলে না। সংসারে যে-সব লোকের সঙ্গে মধুসূদনের সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ তাদের অধিকাংশের চেয়ে নিজেকে ধনগৌরবে অনেক বড়ো মনে করা তার অভ্যাস। আজ গ্যাসের আলোতে শোবার ঘরের দরজার পাশে ঐ যে মেয়েটি স্তব্ধ দাঁড়িয়ে তাকে দেখে মধুসূদনের মনে হোলো, আমার যথেষ্ট ধন নেই—মনে হোলো, যদি রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট হতুম তা হ'লেই ওকে এ ঘরে মানাতো। যেন প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পেলে এর স্বভাবটি জন্মাবধি লালিত একটি বিশুদ্ধ বংশ-মর্য্যাদার মধ্যে—অর্থাৎ এ যেন এর জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী বহু দীর্ঘকালকে অধিকার ক'রে দাঁড়িয়ে। সেখানে বাইরে থেকে যে-সে প্রবেশ করতেই পারে না—সেখানেই আপন স্বাভাবিক স্বত্ব নিয়ে বিরাজ করবে বিপ্রদাস,—তাকেও ঐ কুমুর মতোই একটি আত্ম-বিস্মৃত সহজ গৌরব সর্ব্বদা ঘিরে রয়েচে।

মধুসূদন এই কথাটাই কিছুতে সহ্য করতে পারে না। বিপ্রদাসের মধ্যে ঔদ্ধত্য একটুও নেই, আছে একটা দূরত্ব। অতি বড়ো আত্মীয়ও যে হঠাৎ এসে তার পিঠ চাপড়িয়ে বল্‌তে পারে "কি হে, কেমন?" এ যেন অসম্ভব। বিপ্রদাসের কাছে মধুসূদন মনে মনে কি-রকম খাটো হ'য়ে থাকে সেইটেতে তার রাগ ধরে। সেই একই সূক্ষ্ম কারণে কুমুর উপরে মধুসূদন জোর করতে পারচে না—আপন সংসারে যেখানে সবচেয়ে তার কর্ত্তৃত্ব করবার অধিকার সেইখানেই সে যেন সব চেয়ে হ'টে গিয়েচে। কিন্তু এখানে তার রাগ হয় না—কুমুর প্রতি আকর্ষণ দুর্নিবার বেগে প্রবল হ'য়ে ওঠে। আজ কুমুকে দেখে মধুসূদন স্পষ্টই বুঝলে কুমু তৈরী হ'য়ে আসেনি,—একটা অদৃশ্য আড়ালের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কি সুন্দর! কি একটা দীপ্যমান শুচিতা, শুভ্রতা! যেন নির্জ্জন তুষার-শিখরের উপরে নির্ম্মল ঊষা দেখা দিয়েচে।

মধুসূদন একটু কাছে এগিয়ে এসে ধীর স্বরে বল্লে, "শুতে আসবে না বড়ো বউ?"

কুমু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। সে নিশ্চয় মনে করেছিল মধুসূদন রাগ করবে, তাকে অপমানের কথা বলবে। হঠাৎ একটা চির-পরিচিত সুর তার মনে প'ড়ে গেল—তার বাবা স্নিগ্ধ গলায় কেমন ক'রে তার মাকে বড়ো বউ ব'লে ডাক্‌তেন। সেই সঙ্গেই মনে পড়ল মা তার বাবাকে কাছে

আসতে বাধা দিয়ে কেমন ক'রে চ'লে গিয়েছিলেন। এক মুহূর্ত্তে তার চোখ ছলছলিয়ে এল—মাটিতে মধুসূদনের পায়ের কাছে ব'সে প'ড়ে ব'লে উঠল্, "আমাকে মাপ করো।"

মধুসূদন তাড়াতাড়ি তার হাত ধ'রে তুলে চৌকির উপরে বসিয়ে বল্‌লে, "কি-দোষ করেচ যে তোমাকে মাপ করব ?"

কুমু বল্‌লে, "এখনো আমার মন তৈরী হয়নি। আমাকে একটুখানি সময় দাও।"

মধুসূদনের মনটা শক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল ; বল্‌লে, "কিসের জন্যে সময় দিতে হবে বুঝিয়ে বলো।"

"ঠিক বল্‌তে পারচিনে, কাউকে বুঝিয়ে বলা শক্ত—"

মধুসূদনের কণ্ঠে আর রস রইল না। সে বল্‌লে, "কিছুই শক্ত না। তুমি বল্‌তে চাও, আমাকে তোমার ভালো লাগ্‌চে না।"

কুমুর পক্ষে মুস্কিল হ'ল। কথাটা সত্যি অথচ সত্যি নয়। হৃদয় ভ'রে নৈবেদ্য দেবার জন্যেই সে পণ ক'রে আছে, কিন্তু সে নৈবেদ্য এখনো এসে পৌঁছল না। মন বল্‌চে,—একটু সবুর করলেই, পথে বাধা না দিলে, এসে পৌঁছবে ; দেরি যে আছে তাও না। তবুও এখন ডালা যে শূন্য সে কথা মান্‌তেই হবে।

কুমু বল্‌লে, "তোমাকে ফাঁকি দিতে চাইনে ব'লেই বল্‌চি, একটু আমাকে সময় দাও।"

মধুসূদন ক্রমেই অসহিষ্ণু হ'তে লাগ্‌ল—কড়া ক'রেই বল্‌লে, "সময় দিলে কি সুবিধে হবে! তোমার দাদার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্বামীর ঘর করতে চাও !"

মধুসূদনের তাই বিশ্বাস। সে ভেবেচে বিপ্রদাসের অপেক্ষাতেই কুমুর সমস্ত ঠেকে আছে। দাদা যেমনটি চালাবে, ও তেমনি চল্‌বে। বিদ্রূপের সুরে বল্‌লে, "তোমার দাদা তোমার গুরু!"

কুমুদিনী তখনই মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "হ্যাঁ, আমার দাদা আমার গুরু।"

"তাঁর হুকুম না হ'লে আজ কাপড় ছাড়বে না, বিছানায় শুতে আসবে না! তাই নাকি ?"

কুমুদিনী হাতের মুঠো শক্ত ক'রে কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"তা হ'লে টেলিগ্রাফ ক'রে হুকুম আনাই,—রাত অনেক হোলো।"

কুমু কোনো জবাব না দিয়ে ছাতে যাবার দরজার দিকে চল্‌ল।

মধুসূদন গর্জ্জন ক'রে ধমকে উঠে বল্‌লে, "যেয়োনা বল্‌চি।"

কুমু তখনি ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "কি চাও, বলো।"

"এখনি কাপড় ছেড়ে এসো।" ঘড়ি খুলে বল্‌লে, "পাঁচ মিনিট সময় দিচ্চি।"

কুমু তখনি নাবার ঘরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে সাড়ির উপর একখানা মোটা চাদর জড়িয়ে চ'লে এল। এখন দ্বিতীয় হুকুমের জন্যে তার অপেক্ষা। মধুসূদন দেখে বেশ বুঝলে এ-ও রণসাজ। রাগ বেড়ে উঠ্‌ল, কিন্তু কি করতে হবে ভেবে পায় না। প্রবল ক্রোধের মুখেও মধুসূদনের মনে ব্যবস্থাবুদ্ধি থাকে ; তাই সে থম্‌কে গেল। বল্‌লে, "এখন কি করতে চাও আমাকে বলো।"

"তুমি যা বল্‌বে তাই করব।"

মধুসূদন হতাশ হ'য়ে ব'সে পড়ল চৌকিতে। ঐ চাদরে-জড়ানো মেয়েটিকে দেখে মনে হ'ল, এ যেন বিধবার মূর্ত্তি,—ওর স্বামী আর ওর মাঝখানে যেন একটা নিস্তব্ধ মৃত্যুর সমুদ্র। তর্জ্জন ক'রে এ সমুদ্র পার হওয়া যায় না। পালে কোন্ হাওয়া লাগ্‌লে তরী ভাসবে ? কোনো দিন কি ভাস্‌বে ?

চুপ ক'রে ব'সে রইল। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ ছাড়া ঘরে একটুও শব্দ নেই। কুমুদিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল না—আবার ফিরে বাইরে ছাতের অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইল। রাস্তার মোড় থেকে একটা মাতালের গদগদ কণ্ঠের গানের আওয়াজ শোনা যাচ্চে, আর প্রতিবেশীর আস্তাবলে একটা কুকুরের বাচ্ছাকে বেঁধে রেখেছে, রাত্রির শান্তি ঘুলিয়ে দিয়ে উঠ্‌চে তারি অশ্রান্ত আর্ত্তনাদ।

সময় একটা অতলস্পর্শ গর্ত্তের মতো শূন্য হ'য়ে যেন হাঁ ক'রে আছে। মধুসূদনের সংসারের কলের সমস্ত চাকাই যেন বন্ধ। কাল তার আপিসের অনেক কাজ, ডাইরেক-টারদের মীটিং,—কতকগুলো কঠিন প্রস্তাব অনেকের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাধা সত্ত্বেও কৌশলে পাশ করিয়ে নিতে হবে। সে সমস্ত জরুরী ব্যাপার আজ তার কাছে একেবারে ছায়ার মতো। আগে হ'লে কালকের দিনের কার্য্যপ্রণালী আজ রাত্রে নোট বইয়ে টুকে রাখ্‌ত। সব চিন্তা দূরে গেল, জগতে যে কঠিন সত্য সুনিশ্চিত সে হচ্চে চাদর দিয়ে ঢাকা ঐ মেয়ে, ঘরের থেকে বেরিয়ে যাবার পথে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে। খানিক বাদে মধুসূদন একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লে, ঘরটা যেন ধ্যান ভেঙে চম্‌কে উঠ্‌ল। দ্রুত চৌকি থেকে উঠে কুমুর কাছে গিয়ে বল্‌লে, "বড়ো বৌ, তোমার মন কি পাথরের গড়া ?"

ঐ বড়ো বউ শব্দটা কুমুর মনে মন্ত্রের মতো কাজ করে। নিজের মধ্যে তার মায়ের জীবনের অনুবৃত্তি হঠাৎ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। এই ডাকে তার মা কতদিন কত সহজে সাড়া দিয়েছিলেন, তারি অভ্যাসটা যেন কুমুরও রক্তের মধ্যে। তাই চকিতে সে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। মধুসূদন গভীর কাতরতার সঙ্গে বল্‌লে, "আমি তোমার আযোগ্য, কিন্তু আমাকে কি দয়া করবে না ?"

কুমুদিনী ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল, "ছি ছি অমন ক'রে বোলো না।" মাটিতে প'ড়ে মধুসূদনের পায়ের ধুলো নিয়ে বল্‌লে, "আমি তোমার দাসী, আমাকে তুমি আদেশ করো।"

মধুসূদন তাকে হাত ধ'রে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলে, বল্‌লে, "না তোমাকে আদেশ করব না, তুমি আপন ইচ্ছাতে আমার কাছে এসো।"

কুমুদিনী মধুসূদনের বাহু-বন্ধনে হাঁপিয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলে না। মধুসূদন রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বল্‌লে, "না, তোমাকে আদেশ করব না, তবু তুমি আমার কাছে এসো।" এই ব'লে কুমুদিনীকে ছেড়ে দিলে।

কুমুদিনীর গৌরবর্ণ মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে। সে চোখ নীচু ক'রে বল্‌লে, "তুমি আদেশ কর্‌লে আমার কর্ত্তব্য সহজ হয়। আমি নিজে ভেবে কিছু করতে পারিনে।"

"আচ্ছা তুমি তোমার ঐ গায়ের চাদরখানা খুলে ফেলো —ওটাকে আমি দেখ্‌তে পারচিনে।"

সসঙ্কোচে কুমুদিনী চাদরখানা খুলে ফেল্‌লে। গায়ে ছিল একখানি ডুরে সাড়ি, সরু পাড়ের। কালো ডোরার ধারাগুলি কুমুদিনীর তনুদেহটিকে ঘিরে, যেন তারা রেখার ঝরণা—থেমে আছে মনে হয় না; কেবলি যেন চল্‌চে—যেন কোনো একটি কালো দৃষ্টি আপন অশ্রান্ত গতির চিহ্ন রেখে রেখে ওর অঙ্গকে ঘিরে ঘিরে প্রদক্ষিণ কর্‌চে, কিছুতে শেষ কর্‌তে পার্‌চে না। মুগ্ধ হ'য়ে গেল মধুসূদন, অথচ সেই মুহূর্ত্তে একটু লক্ষ্য না ক'রে থাক্‌তে পার্‌লে না যে ঐ সাড়িটি এখানকার দেওয়া নয়। কুমুদিনীকে যতই মানাক্ না কেন, এর দাম তুচ্ছ এবং এটা ওর বাপের বাড়ির। ঐ নাবার ঘরের সংলগ্ন কাপড়-ছাড়বার ঘরে আছে দেরাজওয়ালা মেহগিনি কাঠের মস্ত আলমারি, তার আয়না দেওয়া পাল্লা,—বিবাহের পূর্ব্ব হ'তেই নানা রকমের দামী কাপড়ে ঠাসা। সেগুলির উপরে লোভ নেই—মেয়ের এত গর্ব্ব! মনে প'ড়ে গেল সেই তিনটে আঙটির কথা, অসহ্য ঔদাসীন্যে তাকে কুমু গ্রহণ করেনি, অথচ একটা লক্ষ্মী-ছাড়া নীলার আঙটির জন্যে কত আগ্রহ। বিপ্রদাস আর মধুসূদনের মধ্যে কুমুর মমতার কত মূল্য-ভেদ। চাদর খোলবামাত্র এই সমস্ত কথা দম্‌কা ঝড়ের মতো মধুসূদনকে প্রকাণ্ড ধাক্কা দিলে। কিন্তু হায়রে, কি সুন্দর, কি আশ্চর্য্য সুন্দর! আর এই দৃপ্ত অবজ্ঞা, সেও যেন ওর অলঙ্কার। এই মেয়েই তো পারে ঐশ্বর্য্যকে অবজ্ঞা কর্‌তে। সহজ সম্পদে মহীয়সী হ'য়ে জন্মেচে—ওকে ধনের দাম কষ্‌তে হয় না, হিসেব রাখ্‌তে হয় না—মধুসূদন ওকে কি দিয়ে লোভ দেখাতে পারে!

মধুসূদন বল্‌লে, "যাও, তুমি শুতে যাও।"

কুমু ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল—নীরব প্রশ্ন এই যে, তুমি আগে বিছানায় যাবে না ?

মধুসূদন দৃঢ় স্বরে পুনরায় বল্‌লে, "যাও, আর দেরী কোরো না।" কুমু বিছানায় যখন প্রবেশ করলে মধুসূদন সোফার উপরে ব'সে বল্‌লে, "এইখানেই ব'সে রইলুম, যদি আমাকে ডাকো তবেই যাব। বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করতে রাজি আছি।"

কুমুর সমস্ত গা এলো ঝিম্ ঝিম্ ক'রে—এ কি পরীক্ষা

তার! কার দরজায় সে আজ মাথা কুটবে? দেবতা তো তাকে সাড়া দিলেন না। যে পথ দিয়ে সে এখানে এলো সে তো একেবারেই ভুল পথ। বিছানায় ব'সে ব'সে মনে মনে সে বললে, "ঠাকুর, তুমি আমাকে কখনো ভোলাতে পারোনা, এখনো তোমাকে বিশ্বাস করব। ধ্রুবকে তুমিই বনে এনেছিলে, বনের মধ্যে তাকে দেখা দেবে ব'লে।"

সেই নিস্তব্ধ ঘরে আর শব্দ নেই; রাস্তার মোড়ে সেই মাতালটার গলা শোনা যায় না; কেবল সেই বন্দী কুকুরটা যদিও শ্রান্ত, তবু মাঝে মাঝে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌চে।

অল্প সময়কেও অনেক সময় ব'লে মনে হোলো, স্তব্ধতার ভারগ্রস্ত প্রহর যেন নড়্‌তে পারচে না। এই কি তার দাম্পত্যের অনন্তকালের ছবি? দুপারে দুজনে নীরবে ব'সে—রাত্রির শেষ নেই—মাঝখানে একটা অলঙ্ঘনীয় নিস্তব্ধতা। অবশেষে এক সময়ে কুমু তার সমস্ত শক্তিকে সংহত ক'রে নিয়ে বিছানা থেকে বেরিয়ে এসে বল্‌লে, "আমাকে অপরাধিনী কোরোনা!"

মধুসূদন গম্ভীর কণ্ঠে বল্‌লে, "কি চাও বলো, কি করতে হবে?" শেষ কথ'টুকু পর্য্যন্ত একেবারে নিংড়ে বের ক'রে নিতে চায়।

কুমু বল্‌লে, "শুতে এসো।"

কিন্তু একেই কি বলে জিৎ?

(ক্রমশঃ)
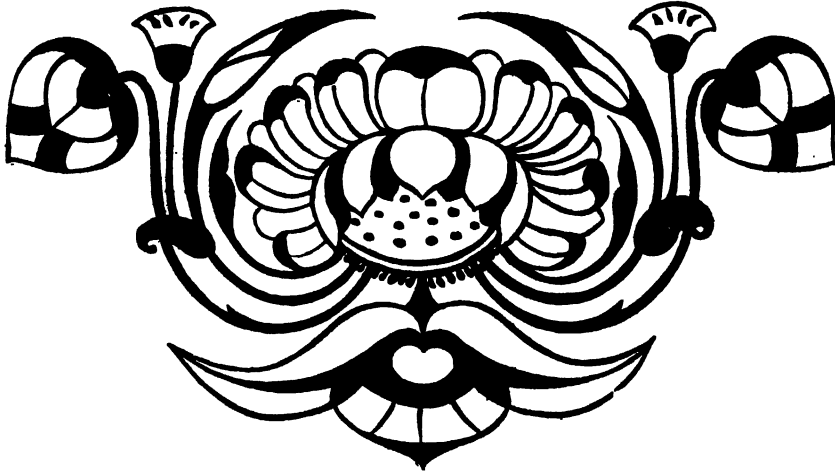
হিন্দু সঙ্গীতে মুসলমানের দান

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

আজকের এ সভায় শ্রীমান্ দিলীপকুমার রায় "হিন্দু সঙ্গীতে মুসলমানের দান" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়বেন ব'লে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। সে প্রবন্ধ-পাঠ শোনবার-জন্য আমরা সকলে উৎসুক হয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রোতারা যদিচ সকলেই এখানে present বক্তা কিন্তু absent।

ফলে এ সভা যাতে মৌনীর সভায় পরিনত না হয়, অর্থাৎ ধ্যান ধারণা নিদিধ্যাসনের মজলিস না হয়ে ওঠে, সে কারণ আপনারা আমাকে উক্ত বিষয়ে যা হয় দু-চার কথা বলতে অনুরোধ করেছেন। এ ক্ষেত্রে এসেছিলুম শ্রোতা হিসেবে কিন্তু তার পরিবর্ত্তে আমাকে যে বক্তা হ'তে হবে তা' স্বপ্নেও ভাবিনি। আপনারা সহজেই অনুমান কর্‌তে পারেন যে এ উপরোধে আমি কতদূর বেকায়দায় পড়ে গিয়েছি। প্রথমতঃ সঙ্গীত-শাস্ত্র আমি কখনও চর্চ্চা করিনি, সুতরাং সে শাস্ত্র সম্বন্ধে আমাকে যদি কিছু বলতে হয় ত আমার বক্তব্য সেই জাতীয় কথা হবে—যা অবক্তব্য থাকলে কারও কোন ক্ষতি নেই। দ্বিতীয়তঃ শ্রীমান্ দিলীপের আমি কোন হিসেবেই স্থলাভিষিক্ত হ'তে পারিনে, কেননা, তাঁর মত আমার বক্তৃতা আমি illustrate করতে পারব না। শ্রীমান্ দিলীপের বক্তৃতা এক রকম কথকতা, কারণ তাতে কথাও আছে গানও আছে। সেকালে এদেশে এক রকম কাব্য ছিল যার নাম চম্পু কাব্য, যা গদ্য ও পদ্য দুই মিলিয়ে রচিত হ'ত। শ্রীমান্ দিলীপের বক্তৃতাকেও উক্ত জাতীয় চম্পু কথা বলা যেতে পারে। আমার বক্তৃতা হবে কিন্তু সম্পূর্ণ এক ঘেয়ে বেসুরে গদ্য। আমি না হয় বকে গেলুম, আপনারা সে বকুনি ধৈর্য্য ধ'রে শুনতে পারবেন কিনা সে বিষয় আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। তবে নিরস্তে পাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে হিসেবে আমি আপনাদের অনুরোধ রক্ষা কর্‌তে দণ্ডায়মান হয়েছি।

(কারমাইকেল হস্টেলে তরুণ জমাতের অধিবেশনে উক্ত)

২

"হিন্দু সঙ্গীতে মুসলমানের দান" বিষয়টি হচ্ছে ঐতিহাসিক। এবিষয় সেই ব্যক্তিই আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ কর্‌তে পারেন যিনি জানেন যে মুসলমান এদেশে আস্‌বার পূর্ব্বে হিন্দু সঙ্গীতের চেহারা কি রকম ছিল, এবং মুসলমান সঙ্গীতের সংস্পর্শে তার রূপের কি পরিবর্ত্তন ঘটেছে। এর জন্য মুসলমান সঙ্গীতের প্রাচীন রূপটী কি ছিল তাও জানা চাই। কারণ প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীত ও প্রাচীন মুসলমান সঙ্গীত সম্বন্ধে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরাই বলতে পারেন যে, উভয়ের কি রকম মিশ্রণের ফলে বর্ত্তমান হিন্দু সঙ্গীত জন্ম লাভ করেছে, আর তার কোন অংশ হিন্দু আর কোন অংশ মুসলমান। দু ভাগ হাইড্রোজেন এবং এক ভাগ অক্সিজেনে মিলে যে জল হয়েছে এমন কথা আমরা জোর করে তখনই বলতে পারি যখন ঐ দুই বস্তুর পৃথক পৃথক রূপ গুণের সঙ্গে আমরা পরিচিত। কিন্তু হিন্দু সঙ্গীতের উক্ত রূপ বিশ্লেষণ করা জলের মত সোজা নয়।

প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীত এবং প্রাচীন মুসলমান সঙ্গীতের স্বরূপ দুই আমার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবে অপর কেউ যে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এমন আমার বিশ্বাস নয়।

প্রাক্ মুসলমান যুগের হিন্দু সঙ্গীতের এমন কোনও দলিল নেই যার সাহায্যে আমরা তাদের প্রাচীন রূপ উদ্ধার বা আবিষ্কার কর্‌তে পারি। সেকালে স্বর-লিপির রেয়াজ ছিলনা। সুতরাং সে লিপির প্রসাদে আমরা যে তাদের শব্দ-রূপ কর্ণগোচর করব তা'র উপায় নেই। সংস্কৃত ভাষায় সঙ্গীত শাস্ত্রের অবশ্য ছোট বড় অনেক বই আছে। সে সব শাস্ত্র যে কোন যুগে লেখা হ'য়েছিল তারও কোন

ঠিক ঠিকানা নেই। তারিখের বিষয় সেকেলে শাস্ত্রীরা ছিলেন একান্ত উদাসীন। তারপর এসব পুস্তক সঙ্গীত নামক scienceএর পুস্তক, সঙ্গীত নামক আর্টের সন্ধান তাদের মধ্যে মেলে না। এ জাতীয় শাস্ত্রের যথার্থ নাম হচ্ছে grammar of music। অপর পক্ষে মুসলমান-সঙ্গীত বল্‌তে কি বোঝায় তাও স্পষ্ট নয়। মুসলমান শব্দটি হচ্ছে একটা বিশেষ ধর্ম্ম মতের নাম, যে ধর্ম্ম নানা দেশের নানা জাতি অবলম্বন করেছে। এ সকল জাতিরই আর্ট বিভিন্ন। আরবী ও ফার্সি আর্ট এক নয়। সম্ভবতঃ এ দুই আর্টের ভিতর সেই মৌলিক প্রভেদ আছে, আরবী ভাষা ও ফার্সি ভাষার ভিতর যে গোড়ার প্রভেদ আছে। সুতরাং উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের জানা আবশ্যক যে সঙ্গীতের কোন্ ঢঙ,—আরবী ঢঙ, না ফার্সি ঢঙ, না তুর্কি ঢঙ হিন্দু সঙ্গীতের আকার প্রকার বদলে দিয়েছে। বলা বাহুল্য যে এ তিন রীতির মধ্যে মৌলিক প্রভেদ থাকা সম্ভব, কারণ এ তিন আর্ট মূলতঃ তিনটি বিভিন্ন raceএর অন্তর থেকে উদ্ভূত হয়েছে, আরব Semitic, পারসিয়া Aryan, এবং তুরস্ক Mongol।

৩

পুরাকালের কোনও খবর না জেনেও আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অনুমান করেন যে, ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত সঙ্গীত মুসলমান সঙ্গীতের প্রভাবে তার বর্ত্তমান রূপ ধারণ করেছে। এরূপ অনুমান করবার একটি স্পষ্ট কারণ আছে। এবং সে কারণের সন্ধান আমি শ্রীমান দিলীপ কুমারের ভ্রাম্যমানের দিন পঞ্জিকার অন্তরে পেয়েছি।

ব্যাপার হচ্ছে এই। আমরা যাকে হিন্দু সঙ্গীত বলি ভারতবর্ষেও তার দুটি স্বতন্ত্র রূপ আছে, একটির নাম দক্ষিণী অপরটির হিন্দুস্থানী। সে দুটি রূপের বিভিন্নতা কোথায় তা শ্রীমান দিলীপ এখানে উপস্থিত থাক্‌লে সুরে এঁকে আপনাদের কানের সুমুখে খাড়া ক'রে দিতে পারতেন, অর্থাৎ গেয়ে তা শোনাতে পারতেন। সঙ্গীতের বসতি কণ্ঠে, রসনায় নয়। আমার অবশ্য তা সাধ্যাতীত। বক্তৃতায় সে রূপ বর্ণনা করা যেতে পারে কিন্তু তাকে মূর্ত্ত করা যায় না। মোটামুটি হিসেবে বলা যায় যে দক্ষিণী ও হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণীর নাম যদিও এক কিন্তু তাদের রূপ স্বতন্ত্র। কোনও একটি রাগিণীর অন্তরে এ দুই জাতির সঙ্গীতে স্বর বিন্যাসেরও প্রভেদ আছে, সুরের চলাফেরারও প্রভেদ আছে। আর ধ্বনি নিয়ে এ দুই ভূ-ভাগের লোকেরা দুভাবে কসরৎ করেন। দক্ষিণী সঙ্গীতে স্বর অতি ঘন-বিন্যস্ত। এত ঘন যে কোথাও তার ফাঁক নেই।

এখন আমরা জানি মুসলমান বিজেতারা প্রধানতঃ উত্তরাপথের উপরই প্রভুত্ব করেছে। দক্ষিণাপথের উপর মুসলমান প্রভাব অতি কম। সুতরাং আমরা সহজেই এরূপ অনুমান করি যে এই বিভিন্নতার যথার্থ কারণ হচ্ছে মুসলমান সঙ্গীতের এক ক্ষেত্রে প্রভাবের সদ্ভাব, অপর ক্ষেত্রে তার অসদ্ভাব। যদি ধরে নেওয়া যায় যে দক্ষিণী সঙ্গীতই খাঁটি হিন্দু মাল তা'হলে এও ধরে নিতে পারি যে সেই সঙ্গীত মুসলমানের হাতে সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হয়ে তার হিন্দুস্থানী সংস্করণে পরিণত হয়েছে।

৪

এরূপ অনুমানের অপর একটি কারণ আছে। সঙ্গীত বাদ দিয়েও উত্তর দক্ষিণের অপরাপর আর্টেও, যথা sculpture, architecture প্রভৃতিতেও এই পার্থক্য লক্ষিত হয়। উত্তরাপথের মুসলমান যুগের architecture যে দক্ষিণাপথের architecture হ'তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তা অন্যমনস্ক লোকেও এক নজরে ধরতে পারে। উত্তরাপথের মসজিদ ও দক্ষিণাপথের মন্দির যে এক ছাঁচে ঢালাই করা হয়নি, এবিষয়ে আর কারও চোখ ফুটিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই।

ঔদার্য্য যে সৌন্দর্য্যের একটি প্রধান গুণ সে জ্ঞানে দক্ষিণাপথের আর্টিষ্টরা বঞ্চিত। অপর পক্ষে, উত্তরাপথের মুসলমান architectureএর যে রূপ আমাদের প্রথমে চোখে পড়ে সে হচ্ছে তার উদার উন্মুক্ত দরাজ ভাব। এ জাতীয় প্রাসাদ, মসজিদ ও কবরের এই surfaceএর এবং lineএর মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ লীলাই আমাদের নয়ন মন মুগ্ধ করে। এ সব ইমারতের দেওয়ালের গায়ে লতা পাতা, দেব দানব, পশুপক্ষীর ভিড় নেই। এর অঙ্গে অবকাশ অবাধ। ফলে এ architictureএ সরলতার সঙ্গে মহানতার অপূর্ব্ব মিলন

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

হয়েছে। আমরা কি বহির্জগতে কি মনোজগতে, সেই বস্তুকেই মহান বলি যার অন্তরে আকাশ আছে। দক্ষিণাপথের আর্টিষ্টরা শূন্যকে ভয় পান। তাই তাঁরা মন্দিরের অঙ্গে কোথাও একটু ফাঁক দেন না, আগাগোড়া কারুকার্য্যে ভরিয়ে দেন। ফলে এ জাতীয় মন্দিরের গায়ে, স্থাবর জঙ্গম অসংখ্য প্রাণী ও বস্তু ঘেঁষাঘেঁষি ঠেসাঠেলি ক'রে রয়েছে। উদ্যানের সঙ্গে জঙ্গলের যে প্রভেদ উত্তরাপথের architectureএর সঙ্গে দক্ষিণাপথের architectureএর সেই প্রভেদ। দক্ষিণী শিল্পের অন্তরে আকাশও নেই আলোও নেই। উত্তরাপথের বুদ্ধ মূর্ত্তির সঙ্গে দক্ষিণাপথের নটরাজের মূর্ত্তির প্রভেদ এ দুটি আর্টিষ্টিক মনোভাবের চরম প্রতীক। বুদ্ধ শান্ত, আর নটরাজ উন্মত্ত। একটি সৃষ্টির static ভাবের পরাকাষ্ঠা, অপরটি dynamic ভাবের। অর্থাৎ একটি সৃষ্টির অন্তরের স্থিরতার, আর অপরটি তার বাইরের অস্থিরতার অমর চিত্র।

৫

অপরাপর দক্ষিণী আর্টের চরিত্র নাকি দক্ষিণী সঙ্গীতের দেহেও মেলে। এ জাতের আর্টিষ্টরা যেমন দ্রষ্টার চোখকে বিশ্রাম দেয় না, তেমনি এ জাতের গায়ক বাদকেরা শ্রোতার কানকেও বিশ্রাম দেয় না। এদের গান বাজনার অন্তরে সুর সব একান্ত গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে, অথচ তারা সবই ছাড়াছাড়া সবই খাড়াখাড়া। Spaceএর অবকাশের মূল্য যেমন এরা বোঝে না, Timeএর অবকাশের মূল্যও এরা তেমনি বোঝে না। বিরলতার সৌন্দর্য্য এরা উপলব্ধি করেনি। আকাশ এরা কখন দেখেনি। এদের ধারণা সুরের সঙ্গে সুরের, মূর্ত্তির সঙ্গে মূর্ত্তির দেহের নৈকট্যই হচ্ছে তাদের আত্মার সম্বন্ধ। দক্ষিণী সঙ্গীতের সঙ্গে আমার কানের বিশেষ পরিচয় নেই। সুতরাং তার চরিত্র সম্বন্ধে যা বল্লুম সে সবই আমার পরের মুখে শোনা কথা। তবে এদের রাগ-রাগিণীর যে অনেক ডাল পালা আছে তা' আমার অবিদিত নয়। এদের পল্লব আছে অনুপল্লব আছে, ওসঙ্গীতের তোড়ায় পাতা বড্ড বেশি। সংক্ষেপে এ আর্ট হচ্ছে অপর্য্যাপ্ত অর্থাৎ বেহিসেবী। চোখের ও কানের পক্ষে ক্লান্তিকর প্রাচুর্য্য যে হিন্দু আর্টের ধর্ম্ম এ কথা জোর করে বলা চলে না। কারণ ভারতবর্ষের উত্তর ও দক্ষিণ ভূ-ভাগের ভিতর প্রাকৃতিক প্রভেদ আছে। দক্ষিণ দেশ হচ্ছে tropical, উত্তর দেশ তা' নয়। অর্থাৎ দক্ষিণের প্রকৃতির চরিত্র anarchical, উত্তরের monarchical। তার পর দক্ষিণাপথের লোক জাতিতে দ্রাবিড়, আর উত্তরাপথের লোক আর্য্য। অন্ততঃ উত্তরাপথের সভ্যতা যে মূলতঃ আর্য্য সভ্যতা ও দক্ষিণাপথের সভ্যতা দ্রাবিড় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য অসভ্যতা সর্ব্বত্রই সমান। প্রাচুর্য্যের অর্থ যে ঐশ্বর্য্য, আর ঐশ্বর্য্যের অর্থ যে প্রাচুর্য্য এ ভুল প্রাচীন আর্য্যরা কখনও করেনি, গ্রীসেও নয় ভারতবর্ষেও নয়। আর মুসলমান culture গ্রীক cultureএর দ্বারা অনুপ্রাণিত।

এই আর্য্য সভ্যতার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে সংযম, এবং দ্রাবিড় সভ্যতার অসংযম। আর্য্য সভ্যতার চরম আদর্শ হচ্ছে এই রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের বিশ্বে আত্মবশ হওয়া, আর দ্রাবিড় সভ্যতার আদর্শ হচ্ছে প্রকৃতি-নর্ত্তকীর কাছে আত্ম-সমর্পণ করা। এই জন্যেই বোধ হয় দক্ষিণা সঙ্গীত মূলতঃ নর্ত্তকীর নূপুর-ধ্বনি। অপর পক্ষে প্রাণের উপর মনের আধিপত্যই হচ্ছে আর্য্য সভ্যতার বিশিষ্টতা। এর ফলে আর্য্য সভ্যতায় contentএর অপেক্ষা formএর প্রাধান্য। সুতরাং উত্তরাপথের আর্ট যে দক্ষিণাপথের আর্ট থেকে বিভিন্ন হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? সুধু এই কারণে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে Indo-Saracenic বলা বোধ হয় সঙ্গত নয়। মহম্মদ ঘোরি এদেশে পদার্পণ করবার পূর্ব্বেও আমার বিশ্বাস উত্তর দক্ষিণের আর্টের দুটি বিভিন্ন মূর্ত্তি ছিল,—একটি সরল, অপরটি জটিল। এ প্রভেদ হচ্ছে geometryর সঙ্গে arithmeticএর যে প্রভেদ তাই। একটির প্রাণ রেখা, অপরটির সংখ্যা।

৬

হিন্দু সঙ্গীতে মুসলমানদের মুখ্য দান হচ্ছে তার গ্রহণ। মুসলমান রাজা-রাজড়ারা ও আমির-ওমরারা এ দেশের সঙ্গীত যে বাহোসে বাহাল তবিয়তে খোস্-মেজাজে আত্মসাৎ করেছিলেন তার দেদার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

তানসেনের নাম সকলেই শুনেছেন ও তিনি যে আক্‌বর বাদ্‌শাহের সভা-গায়ক ছিলেন তাও সকলেই জানেন। তান-

সেন ছিলেন আদিতে হিন্দু পরে হয়েছিলেন মুসলমান। নূতন ধর্ম্মের টানে, কিম্বা কোনও মূর্ত্তিমতী রাগিণীর রূপ লাবণ্যের টানে, তা বলা কঠিন। কারণ তানসেন সম্বন্ধে যে সকল কিম্বদন্তি প্রচলিত আছে তাতে আস্থা রাখলে তাঁর ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। জনরব এই যে তিনি ছিলেন হরিদাস গোস্বামীর শিষ্য ও সুরদাসের সতীর্থ। হরিদাস গোস্বামী যাঁর গুরু ও সুরদাস গুরু-ভ্রাতা তাঁর পক্ষে আখেরে সন্ন্যাস গ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক।

আর আক্‌বর বাদ্‌শা যে তাঁকে এ ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'তে বাধ্য করেছিলেন তাও অসম্ভব। কারণ তিনি যদি কাউকে কোনও নূতন ধর্ম্মাবলম্বী করতে প্রয়াস পেতেন তা'হলে তাঁকে তিনি তাঁর "দিন ইলাহি" নামক স্বকপোলকল্পিত নব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করতেন। আক্‌বর বাদ্‌শার প্রবর্ত্তিত নব-ধর্ম্ম অবশ্য না-হিন্দু না-মুসলমান, না-খ্রীষ্টান, না-বৌদ্ধ, না-পার্সি। আমাদের যেমন Act III অনুসারে বিয়ে করতে হ'লে একরার করতে হয় যে I do not profess the Hindu, Mahomadan, Christian and Budhistic faith তেমনি আক্‌বর বাদশার এই নব-ধর্ম্মের ইবাদৎখানায় ঢুকতে হ'লে তার পূর্ব্বে উক্তরূপ একরার করতে হ'ত। সুতরাং তানসেন যে কেন মিয়া তানসেন হলেন তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করা অসম্ভব। কিন্তু তিনি যে মিয়া হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

৭

এখন তানসেনের হাতে যে হিন্দু সঙ্গীত নব-রূপ ধারণ করেছে এই হচ্ছে লৌকিক বিশ্বাস। অনেক রাগ-রাগিণীর চেহারা তানসেন যে বদলে দিয়েছেন তার পরিচয় তাদের নামেই পাওয়া যায়—যথা মল্লার তাঁর কণ্ঠে মিয়া-মল্লার রূপ ধারণ করেছে। সুতরাং এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, মল্লারের সঙ্গে মিয়া-মল্লারের সেই জাতীয় প্রভেদ আছে তানসেনের সঙ্গে মিয়া-তানসেনের যে প্রভেদ ছিল। অর্থাৎ মল্লার হচ্ছে খাঁটি হিন্দু, আর মিয়া-মল্লার আধা হিন্দু আধা মুসলমান। এ ক্ষেত্রে হিন্দু সঙ্গীতে মুসলমানের দান আবিষ্কার করতে হ'লে মল্লারের সঙ্গে মিয়া-মল্লারের প্রভেদ কি তা আবিষ্কার করতে হয়। সে বিশ্লেষণ আমার সাধ্যের অতীত। শ্রীমান দিলীপকুমার এ সভায় উপস্থিত থাকলে সে দুই রাগের চেহারা গেয়ে আপনাদের দেখিয়ে দিতে পারতেন।

সঙ্গীত সম্বন্ধে অব্যবসায়ী হিসেবে একটি কথা মাত্র আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই। মল্লারের সঙ্গে মিয়া-মল্লারের প্রথম তফাৎ হচ্ছে ঢঙের তফাৎ। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় বাদ্‌শাদের দরবারে হিন্দু সঙ্গীতের style বদলে গেছে। দরবারী নামই প্রমাণ দিচ্ছে যে বাদশাদের দরবারেই এই নূতন ঢঙের উৎপত্তি হয়েছে। এবং styleএর এই পরিবর্ত্তনের মূলে ছিল যে মুসলমান রাজা-রাজড়া আমির-ওমরাদের রুচি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আর দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে, মল্লারের সঙ্গে কানাড়ার মিশ্রণেই মিয়া-মল্লার জন্ম লাভ করেছে। এদেশে যে অসংখ্য মিশ্র রাগ-রাগিণী দেখতে পাওয়া যায়, তাদেরও খুব সম্ভবত জন্ম হয়েছে মুসলমান যুগে। হিন্দুরা বর্ণ-সঙ্কর জিনিষটে ভারি ডরাত। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম জাতিভেদ মানে না সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে রাগ-রাগিণীর অসবর্ণ বিবাহে তাঁদের কোনই আপত্তি ছিল না। সুতরাং কানাড়া যখন মল্লারের পাণিগ্রহণ করলে তখন তাঁরা নিশ্চয়ই ব'লে উঠেছিলেন সোব্‌হান-আল্লা,—আর তানসেনকে সম্বোধন করে "তুহারি কাম।"

৮

তানসেন সম্বন্ধে এত কথা বল্লুম তার কারণ আমাদের সঙ্গীত-রাজ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত। আর তা ছাড়া লোকের বিশ্বাস যে আকবর সা ছিলেন মোগল বিক্রমাদিত্য এবং যেহেতু তানসেন তাঁর সভার নবরত্নের মধ্যে অন্যতম রত্ন ছিলেন সেই জন্যে তিনি অসামান্য প্রসিদ্ধি ও প্রতিপত্তি লাভ করেছেন।

কিন্তু মুসলমান যুগের ইতিহাসের সঙ্গে যার কিছু মাত্র পরিচয় আছে তিনিই বলতে বাধ্য যে আকবরের রাজ্যের সকল গৌরবের জন্য তিনি Credit নিতে পারেন না। Soldier এবং Statesman হিসেবে তিনি অবশ্য মুসলমান বাদশাদের মধ্যে অদ্বিতীয়। কিন্তু সে যুগের Cultureএর

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

renaissanceএর তিনি উত্তরাধীকারী মাত্র। পাঠান যুগের শেষভাগে এই renaissanceএর জন্ম। আর সাহিত্যে সঙ্গীতে আর্টে ও ধর্ম্মে এ renaissance যদি ভারতবর্ষের গৌরবের বিষয় হয় ত সে গৌরবের Credit মুখ্যতঃ পাঠান বাদশাদের প্রাপ্য। এ কথা যে ঠিক তা প্রমাণ করতে হলে আর্ট ধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে হবে। অর্থাৎ সঙ্গীতের কথা বাদ দিয়ে আর পাঁচ বিষয়ের আলোচনা করতে হবে। সে আলোচনার আজ অবসর নেই—উপরন্তু তা হবে এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং সঙ্গীতেই মনোনিবেশ করা যাক্। তানসেন আকবরের দরবারে সঙ্গীত শিক্ষা করেন নি। তিনি রাজারামের দরবারে প্রধান গায়ক ছিলেন, এবং আকবর সা তানসেন, বীরবল প্রভৃতি রত্নকে তাঁর সভায় বদলি করে দিতে রাজারামকে বাধ্য করেন। রতনে রতন চেনে এই হিসাবে তাঁকেও আমরা রাজরত্ন বলে গ্রাহ্য করতে পারি। কারণ তিনি এসব রত্নকে খুঁজে বার করেছিলেন। গুণী হওয়ার চাইতে গুণগ্রাহী হওয়া কিছু কম মর্য্যাদার বিষয় নয়।

৯

আকবর যখন দিল্লীশ্বর মাত্র—জগদীশ্বর হয়ে ওঠেন নি, সে সময় এ দেশে তানসেনের তুল্য সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী আর একজন ভারত-বিখ্যাত আর্টিষ্ট ছিলেন, তাঁর নাম বাজ বাহাদুর।

তিনি কোনও রাজার সভা-গায়ক ছিলেন না, ছিলেন স্বয়ং রাজা, মালবের অধিপতি। যে রাজ্যকে আজকে ধার-রাজ্য বলে সেই রাজ্যের মাণ্ডু নামক সহর ছিল তাঁর রাজধানী। লোক মুখে শুনেছি যে মাণ্ডুর তুল্য সুন্দর architecture ভারতবর্ষে আর কুত্রাপি নেই। এ সহরের প্রাসাদে মসজিদে নাকি মুসলমান আর্ট তার পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও মানুষের আর্ট উভয়ে হাত মিশিয়ে মাণ্ডুকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দান করেছে।

এই মালব উপত্যকার অলকায় নাকি বাজ বাহাদুর ও তাঁর প্রণয়িনী রূপমতী দিবারাত্র সঙ্গীত চর্চ্চায় মগ্ন থাকতেন। রূপমতী ছিলেন কে, মালবিকা না বসন্তসেনা, রাজকন্যা কিম্বা গণিকা তা ঐতিহাসিকরা আজও ঠিক করতে পারেন নি। কিন্তু তিনি যে-কুল থেকেই আসুন তিনি যে ছিলেন একটি স্ত্রীরত্ন সে বিষয়ে সকলেই একমত। রূপমতী ছিলেন একাধারে অপূর্ব্ব সুন্দরী, অপূর্ব্ব গায়িকা, উপরন্তু সহজ কবি। এই বাজ বাহাদুর ও রূপমতীর প্রণয়-কাহিনীর romantic ইতিহাস মুসলমান যুগের ইতিহাসে অদ্বিতীয়। Love is stronger than death এ উক্তির সত্যতা রূপমতী নিজের জীবনে প্রমাণ করেছেন। আমি এই চমৎকার প্রণয়-কাহিনী বাঙালী জাতিকে আর এক দিন শোনাব।

এই আর্টের স্বপ্ন-রাজ্যের ধ্বংস হয় দিগ্বিজয়ী আকবর সাহের হাতে। রূপমতী মোগলের আলিঙ্গন থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য আত্মহত্যা করেন এবং বাজ বাহাদুর যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। রূপমতীর কপালে তাই আর সহমরণ জুটল না। বাজ বাহাদুর ছিলেন পাঠান নৃপতি এবং দিল্লির পাঠান বাদশা সেরসার নিকট-আত্মীয়। এখন জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই বাজ বাহাদুর কার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন, তাঁর গুরু ছিলেন কে?

আমি ইতিহাসে পড়েছি যে তানসেন ও বাজ বাহাদুর উভয়েই সুরবংশের শেষ দিল্লির বাদশা আদিল সা'র নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। আদিল সা নাকি সেকালে ভারতবর্ষের সব চাইতে বড় ওস্তাদ ছিলেন।

ঐতিহাসিকের এ কথাও আমার বিশ্বাস সত্য। কারণ বাদশাকে গান-বাজানার ওস্তাদ প্রমাণ করা ঐতিহাসিকদের স্বধর্ম্ম নয়, বিশেষত মুসলমান ঐতিহাসিকদের ত নয়ই, কারণ তাঁরা সঙ্গীত-বিদ্যাকে একটি মূল্যবান বিদ্যা বলে গণ্য করতেন না। বরং সঙ্গীত বস্তুটিকে তাঁরা বিলাসের একটি অঙ্গ স্বরূপেই গণ্য করতেন, যেমন আজকের দিনে বহু সাধু ব্যক্তি আর্টকে উক্ত হিসাবে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। সুতরাং আমি ধ'রে নিচ্ছি যে আকবর সাহের সভাসদ মৌলবীরা মহম্মদ আদিলসা'র সঙ্গীত বিষয়ে কৃতিত্বের কথা বানিয়ে বলেন নি।

এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে পাঠান বাদশারা হিন্দু সঙ্গীতের সুধু গুণগ্রাহী ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে অনেকে গুণীও ছিলেন। জৌনপুরের পাঠান নৃপতিরাও অনেকে

সঙ্গীত-বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। এক জাতির টোরি আজও জোনপুরি টোরি বলেই বিখ্যাত। অর্থাৎ সঙ্গীতের তাঁরা কেবল মাত্র ভোক্তা ছিলেন না, কর্ত্তাও ছিলেন। সঙ্গীত-বিদ্যা হচ্ছে প্রয়োগ-সাপেক্ষ। এই প্রয়োগের নৈপুণ্য লাভ, আবার শিক্ষা-সাপেক্ষ। যদি আমার এ ধারণা সত্য হয় যে পাঠান বাদশাদের মধ্যে কেউ কেউ বড় ওস্তাদ বলে গণ্য হয়েছিলেন, তা'হলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে পাঠান রাজার দরবারে সঙ্গীতের ঐকান্তিক চর্চ্চা হ'ত। আর সকল বিদ্যা সকল আর্টের জীবনরক্ষা ও উন্নতিসাধন একান্ত চর্চ্চা-সাপেক্ষ। এবং হিন্দু সঙ্গীত যে আজও বেঁচে আছে আর উত্তরোত্তর তার শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে সে যে মুসলমানের লালন পালনের ফলে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

১০

মুসলমান যুগে হিন্দু সঙ্গীতের কোনও ইতিহাস নেই কিন্তু অনেক কিম্বদন্তি আছে। যে সব কথা যুগ যুগ ধরে জাতির মুখে মুখে চলে আসছে তা যে একেবারে ঐতিহাসিক ভিত্তিহীন একথা আমি মানিনে। কিম্বদন্তির ভিতর ইতিহাস নেই এমন কথা তাঁরাই বলতে পারেন যাঁদের বিশ্বাস ইতিহাসের ভিতর কিম্বদন্তি নেই।

এখন এই সব কিম্বদন্তির প্রতি লক্ষ্য করলেই একটা জিনিষ আমাদের বিশেষ করে চোখে পড়ে। হিন্দু শাস্ত্রে রাগ-রাগিণীর জাতিভেদ আছে কিন্তু উচ্চনীচ শ্রেণী-বিভাগ নেই, অর্থাৎ কোনটি প্রথম শ্রেণীর কোনটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কোনটি তৃতীয় শ্রেণীর কোনটি চতুর্থ শ্রেণীর তার পরিচয় হিন্দুর সঙ্গীত-শাস্ত্র দেয় না।

এই সব শ্রেণীর নাম বেশির ভাগ মুসলমান-দত্ত। প্রথম ধুরপদ্, দ্বিতীয় খেয়াল, তৃতীয় টপ্পা, চতুর্থ ঠুংরী। এখন এই ধুরপদ্ অবশ্য সংস্কৃত ধ্রুব-পদ। এবং সম্ভবত এ হচ্ছে ইংরাজীতে যাকে বলে sacred-music তাই, এর চাল বাঁধা-ধরা ও সুর গুরু গম্ভীর। অপর তিনটি নামই মুসলমানী, অন্ততঃ অহিন্দু। টপ্পা ঠুংরি যে কোন ভাষার কথা জানি নে, কিন্তু ও দুটি শব্দ সংস্কৃতও নয়, সংস্কৃতের অপভ্রংশও নও।

আর এক কথা। কিম্বদন্তি এই যে খেয়াল টপ্পা ও ঠুংরীর স্রষ্টা সব মুসলমান। খেয়ালের জন্ম-কথা আমি জানিনে। কেউ বলে তার স্রষ্টা সদারঙ্গ, কেউ বলে জোনপুরের জনৈক নবাব, কেউ বলে আমির খসরু। আমি আমির খসরুর পক্ষে রায় দিতে প্রস্তুত, কারণ সদারঙ্গ ত সে দিনের লোক, মহম্মদ সার সভা-গায়ক। মহম্মদ সার রাজত্বকাল ১৭২০ থেকে ১৭২৫। খেয়ালের বয়েস যে এত কম তা আমি বিশ্বাস করিনে। দু শ বৎসর আগে হিন্দু সঙ্গীতে যে সুধু টান ছিল তান ছিল না, তা হ'তেই পারে না। আমার ধ্রুব বিশ্বাস খেয়াল তার পূর্ব্বেও ছিল। আমির খসরু ছিলেন সুলতান আলাউদ্দিনের সভাকবি। তাঁর যে হিন্দু সঙ্গীতের রূপান্তর করবার প্রবৃত্তি ছিল, তার প্রমাণ তিনি ফার্সি ও হিন্দি ভাষা মিলিয়ে উর্দ্দু ভাষার আদি স্রষ্টা, আর তাঁর যে আমাদের সঙ্গীতে নূতন রূপ দেবার শক্তিও ছিল, তার কারণ তিনি ছিলেন সে যুগের রবীন্দ্রনাথ, একাধারে কবি ও musician। এ কালের সঙ্গীত-শাস্ত্রীরাও রবীন্দ্রনাথের গানের ঢংকে খেয়াল বলেন, হিন্দুস্থানী খেয়াল নয় বাঙ্গালী খেয়াল, কেননা এ গান ও শাস্ত্রের বিধি নিষেধ মান্য করে না। আর্ট মাত্রেই যুগে যুগে বিধিবদ্ধ হয়ে পড়ে আর তখন খেয়াল নামক আর্টিষ্টিক বিদ্রোহ তাকে মুক্তি দেয়। কিন্তু সেই খেয়ালই আবার পরবর্ত্তী লোকের হাতে বিধিবদ্ধ হয়ে পড়ে। তখন আবার নূতন খেয়ালের জন্ম হয়। সদারঙ্গ খেয়ালকে সুধু হালকা করে টপ খেয়াল করেছেন। আর জোনপুরের নবাবটি এতই অখ্যাতনামা যে তিনিই যে আমাদের গানের একটি প্রসিদ্ধ ঢঙের জন্মদাতা এমন কথা মানতে ইচ্ছে যায় না।

১১

যে বিষয় আমি বিশেষজ্ঞ নই, বিশেষ অজ্ঞ, সে বিষয়ে অনেক কথা বলেছি, আর বেশি বললে আপনাদের সুবুদ্ধির উপর অত্যাচার করা হবে। তাই আর একটি কথা বলেই আমার বক্তৃতা শেষ করব। আমি এ ক্ষেত্রে যত কথা বলেছি সে সবই অনুমানমূলক, দলিল-দস্তাবেজের সাহায্যে তার একটিও প্রমাণ করা যায় না। অতএব এ ক্ষেত্রে আমার আর একটি অনুমান আপনাদের কাছে নিবেদন করছি।

হিন্দু সঙ্গীতে মুসলমানের দান

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সংস্কৃত শাস্ত্রে দু রকম সঙ্গীতের নাম শোনা যায়,—এক মার্গ আর এক দেশী, অর্থাৎ শাস্ত্রীয় আর লৌকিক। আমার বিশ্বাস মুসলমানরা এই লৌকিক সঙ্গীতকে আর্টের জাতে তুলেছেন। মুসলমানরা এদেশে আসবার পূর্ব্বে দেশের সকল লোক সংস্কৃতে বাক্যালাপ করতেন না, নানা রকম দেশী ভাষাতেই কথা কইতেন, স্ত্রী শূদ্রের ত সংস্কৃতে অধিকারই ছিল না। আর বলা বাহুল্য একালেও যেমন সেকালেও তেমনি এদেশে স্ত্রী শূদ্রেরাই ছিল দলে পুরু। এই থেকে অনুমান করছি সেকালে বেশির ভাগ লোক দেশী সঙ্গীতেরই চর্চ্চা করেই আনন্দ পেতেন। মুসলমান আসবার পর দেশী ভাষা সকল যেমন সাহিত্যে প্রমোশান পেয়েছে, আমার বিশ্বাস মুসলমান যুগে দেশী সঙ্গীতও তেমনি সঙ্গীত-রাজ্যে প্রমোশান পেয়েছে, অর্থাৎ দ্বিজত্ব লাভ করেছে। আর্টের অন্তরে প্রকৃতি যে দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করে তা ত সকলেই জানেন। খেয়াল টপ্পা ঠুংরি লাউনি কাজরি প্রভৃতি, মার্গ সঙ্গীতের অপভ্রংশ নয়, দেশী সঙ্গীতের শাপমুক্ত রূপ। মুসলমানদের মন সংস্কৃত শাস্ত্রের দ্বারা শাসিত ছিল না, উপরন্তু তারা ছিল democratic, সুতরাং মুসলমান রাজা-রাজড়া আমির-ওমরাদের প্রসাদেই ভারতবর্ষের লৌকিক সঙ্গীত যথার্থ স্ফূর্ত্তি লাভ করেছে অথচ ধ্রুবপদ তার পদ-মর্য্যাদা হারায়নি। এর কারণ ধ্রুবপদ ছিল সঙ্গীতে সুর-সংযমের সনাতন আদর্শ। ভারতবর্ষের লৌকিক সঙ্গীতকে মুসলমানরাই জাতে তুলেছেন, এ তাঁদের কম বড় কীর্ত্তি নয়। তাঁরা এ সঙ্গীতকে লালন পালন করে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আর প্রাণদানের চাইতে যে বড় দান নেই তা আপনারা সবই জানেন।

পল্লিপ্রকৃতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মৌমাছি মৌচাক রচনা করলে, তার গোড়াকার কথাটা তাদের অন্নের ব্যবস্থা। ফুলে ফুলে কণা কণা মধু; কোনো ঋতু উদার, কোনো ঋতু কৃপণ। যে মৌমাছিরা দল বেঁধে সংগ্রহ আর দল বেঁধে সঞ্চয় করতে পারলে মৌচাকে পত্তন হ'ল তাদের লোকালয়। লোকালয় বলতে কেবল-মাত্র অনেকে একত্র জমা হওয়ার গণিত-রূপ নয়, ব্যবহার-নীতি দ্বারা এই একত্র জমা হওয়ার একটা কল্যাণরূপ।

অনেকে ভোগ করবার থেকে যেটা আরম্ভ হোলো অনেকে ত্যাগ করবার দিকে সেটা নিয়ে গেলো। নিজের জন্য কাজ করার চেয়ে সকলের জন্যে কাজ করাটা হ'য়ে উঠ্‌লো বড়ো, সকলের প্রাণযাত্রার মধ্যেই নিজের প্রাণের স্বার্থকতা-বোধ জন্মাল;—এরি থেকে বর্ত্তমান কালকে ছাড়িয়ে অনাগত কালকে সত্য ব'লে উপলব্ধি করা সম্ভব হোলো; যে-দান নিজের আয়ুকালের মধ্যে নিজের কাছে পৌঁছবে না, সে দানেও কৃপণতা রইল না; লোকালয় বলতে এমন একটি আশ্রয় বোঝালো যেখানে নিজের সঙ্গে পরের, বর্ত্তমানের সঙ্গে ভাবীকালের, অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ প্রসারিত। এই হোলো অন্নব্রহ্মের তত্ত্ব, অর্থাৎ অন্ন যেই বৃহৎ হয়েছে, অমনি সে স্থূলভাবে অন্নকে ছাড়িয়ে এমন একটি সত্যকে প্রকাশ করেছে যা মহান। আদিমকালে পশু শিকার ক'রে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করত, তাতে লোকালয় জমে উঠ্‌তে পারেনি। অনিশ্চিত অন্ন-আহরণের চেষ্টায় সকলে একা একা ঘুরে বেড়িয়েচে। তখন তাদের স্বভাব ছিল হিংস্র, দস্যুবৃত্তি ছিল ব্যবসায়, ব্যবহার ছিল অসামাজিক।

মানুষের অন্নব্যবস্থা সুনিশ্চিত ও প্রচুর হ'তে পেরেছে বড়ো বড়ো নদীর কূলে—যেমন নীলনদী, ইয়াংসিকিয়াং, অক্‌সাস, য়ুফ্রেটিস্‌, গঙ্গা যমুনা—সেইখানে জন্মেছে বড়ো সভ্যতা—অর্থাৎ লোকালয় বন্ধনের সুব্যবস্থা। পলি-মাটিতে ভূমিকর্ষণ ক'রে মানুষ যখন একই জায়গায় বৎসরে বৎসরে প্রচুর ফসল ফলিয়ে তুললে তখনি অনেক লোক একস্থানে স্থায়িভাবে আবাস পত্তন করতে পারলো—তখনি পরস্পরকে বঞ্চিত করার চেয়ে পরস্পরকে আনুকূল্য করায় মানুষ সফলতা দেখতে পেলে। একত্র মেলবার যে সামাজিক মনোবৃত্তি ভিতরে ভিতরে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, অন্ন-সংস্থানের সুযোগের দ্বারা সেইটে জোর পেয়ে উঠ্‌ল। মানুষ ভূমিমাতার নিমন্ত্রণ পেলে, একত্র সবাই পাত পেড়ে বস্‌ল, তখন পরস্পরের ভ্রাতৃত্বের সন্ধান মিল্‌ল, বহুপ্রাণ এক-অন্নের দ্বারা এক-প্রাণের সম্বন্ধ স্বীকার করল। তখন দেখতে পেলে পরস্পরের যোগ কেবল মাত্র সুযোগ নয়, তাতে আনন্দ। এই আনন্দে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতি-স্বীকার, এমন কি, মৃত্যু-স্বীকারও সম্ভবপর হয়।

পৃথিবী আমাদের যে-অন্ন দিয়ে থাকে সেটা শুধু পেট ভরাবার নয়, সেটাতে আমাদের চোখ জুড়োয়, আমাদের মন ভোলে। আকাশ থেকে আকাশে সূর্য্যকিরণের যে স্বর্ণরাগ, দিগন্ত থেকে দিগন্তে পাকা ফসল-ক্ষেতে তারি সঙ্গে সুর মেলে এমন সোনার রাগিণী। সেই রূপ দেখে মানুষ কেবল ভোজনের কথাই ভাবে না, সে উৎসবের আয়োজন করে, সে দেখ্‌তে পায় লক্ষ্মীকে, যিনি একই কালে সুন্দরী এবং কল্যাণী। ধরণীর অন্নভাণ্ডারে কেবল যে আমাদের ক্ষুধানিবৃত্তির আশা তা নয়, সেখানে আছে সৌন্দর্য্যের অমৃত। গাছের ফল আমাদেরকে ডাক দেয় শুধু পুষ্টিকর শস্যপিণ্ড দিয়ে নয়, রূপরসবর্ণগন্ধ দিয়ে। ছিনিয়ে নেবার হিংস্রতার ডাক এতে নেই, এতে আছে একত্র-নিমন্ত্রণের সৌহার্দ্দ্যের ডাক। পৃথিবীর অন্ন যেমন সুন্দর, মানুষের সৌহার্দ্দ্য তেমনি সুন্দর। একলা যে-অন্ন

গত ২৩শে মাঘ শ্রীনিকেতন অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে উপদেশ। বিশ্বভারতী হইতে পুস্তিকা আকারে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খাই তাতে আছে পেট-ভরানো, পাঁচজনে মিলে যে-অন্ন খাই তাতে আছে আত্মীয়তা। এই আত্মীয়তার যজ্ঞক্ষেত্রে অন্নের থালি হয় সুন্দর, পরিবেষন হয় সুশোভন, পরিবেশ হয় সুপরিচ্ছন্ন।

দৈন্যে মানুষের দাক্ষিণ্য সঙ্কুচিত করে, অথচ দাক্ষিণ্যেই সমাজের প্রতিষ্ঠা। তাই ধরণীর অন্নভাণ্ডারের প্রাঙ্গণেই বাঁধা হয়েচে মানুষের গ্রাম। মানুষের মধ্যে যা অমৃত তার প্রকাশ হোলো এই মিলন থেকে—তার ধর্ম্মনীতি, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, তার বিচিত্র আয়োজন-পূর্ণ অনুষ্ঠান। এই মিলন থেকে মানুষ গভীর-ভাবে আত্ম পরিচয় পেলে, আপন পরিপূর্ণতার রূপ তার কাছে দেখা দিল।

গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে নগরেরও উদ্ভব। সেখানে রাষ্ট্র-শাসনের শক্তি পুঞ্জীভূত, সেখানে সৈনিকের দুর্গ, বণিকের পণ্যশালা, বিদ্যাদান ও বিদ্যা অর্জ্জনের উদ্দেশে বহু স্থান থেকে একস্থানে শিক্ষক ও ছাত্রের সমাবেশ, দূর পৃথিবীর সঙ্গে জানা-শোনা দেনা-পাওনার যোগ। সেখানে মাটির বুকের পরে জগদ্দল পাথর, জীবিকা সেখানে কঠিন, শক্তির সঙ্গে শক্তির প্রতিযোগিতা। সেখানে সকল-মানুষকে হার মানিয়ে একলা-মানুষ বড়ো হ'তে চাচ্চে। বাড়াবাড়ি না হ'লে তারো ফল মন্দ নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যদি অতিশয় চাপা পড়ে তাহ'লে ব্যক্তিগত শক্তির উৎকর্ষ ঘটে না। সমান-মাথাওয়ালা ঝোপগুলোর চাপে বনস্পতি বেঁটে হ'য়ে থাকে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অত্যাকাঙ্ক্ষা অগ্নিবাষ্পের ঠেলায় জনসঙ্ঘের সাধারণ আশ্রয়ভূমিকে উঁচুর দিকে উৎক্ষিপ্ত করে, উৎকর্ষের আদর্শ বেড়ে ওঠে, পরস্পরের নকলে ও রেশা-রেশিতে মানুষের শক্তির চর্চ্চা অত্যন্ত সচেষ্ট হ'য়ে থাকে, জ্ঞানের ও কর্ম্মের ক্ষেত্রে নবনবোন্মেষ সম্ভবপর হয়, নানা দেশের নানা জাতির চিত্ত-সমবায়ে বিদ্যার আয়তন প্রশস্ত হ'য়ে ওঠে। সহরে, যেখানে সমাজের চাপ অতিঘনিষ্ঠ নয়, সেখানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সুযোগ পায়, মানস-শক্তি একটা সাধারণ আদর্শের অনুচ্চ সমতলতা ছাড়িয়ে উঠ্‌তে থাকে। এই কারণেই বুদ্ধির জড়তা ও সঙ্কীর্ণতা সকল দেশেই সকল কালেই গ্রাম্যতার নামান্তর হ'য়ে আছে।

সহরে মানুষ আপন কর্ম্মোদ্যমকে কেন্দ্রীভূত করে; তার প্রয়োজন আছে। আমাদের দেহে প্রাণশক্তি যেমন একদিকে ব্যাপ্ত, তেমনি আবার এক এক জায়গায় তা বিশেষ ও বিচিত্রভাবে সংহত। নিম্ন শ্রেণীর জীবদেহে এই মর্ম্মস্থানগুলি সংহত হয়ে ওঠেনি। দেহ-বিকাশের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক, ফুস্‌ফুস্‌, হৃৎপিণ্ড, পাকযন্ত্র বিশেষ বিশেষ দেহক্রিয়ার স্বতন্ত্র যন্ত্র হয়ে উঠ্‌ল। এইগুলিকে সহরের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

সহরগুলি লোকালয়ের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনসাধনের কেন্দ্র, মানুষের উদ্যম এক এক স্থানে বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে সংহত হয়ে তাদের সৃষ্টি করেচে। পূর্ব্বকালে ধনসৃষ্টি প্রভৃতির প্রয়োজন-সাধনে যন্ত্রের হাত ছিল অতি সামান্যই। তখনকার যন্ত্রগুলির সঙ্গে মানুষের শরীর মনের যোগ সর্ব্বক্ষণ অব্যবহিত ছিল। সেইজন্যে তার থেকে যা উৎপন্ন হতে পারতো তা ছিল পরিমিত, আর তার মুনফা বিকট প্রকাণ্ড ছিল না। সুতরাং তখন পণ্যরচনায় কর্ম্মশক্তির আনন্দটা ছিল প্রধান, কর্ম্মফলের লোভটা তার চেয়ে খুব বড়ো হয়ে ওঠেনি। তাই তখনকার নগরগুলি মানুষের কীর্ত্তির আনন্দরূপ গ্রহণ করতে পারত।

অন্যান্য সকল রিপুর মতোই লোভটা সমাজবিরোধী প্রবৃত্তি। এই জন্যেই মানুষ তাকে রিপু বলেচে। বাইরে থেকে ডাকাত যেমন লোকালয়ের রিপু, ভিতর থেকে লোভটা তেমনি। যতক্ষণ এই রিপু পরিমিত থাকে ততক্ষণ এতে ক'রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কর্ম্মোদ্যম বাড়িয়ে তোলে, অথচ সমাজনীতিকে সেটা ছাপিয়ে যায় না। কিন্তু লোভের কারণটা যদি অত্যন্ত প্রবল ও তার চরিতার্থতার উপায় অত্যন্ত বিপুল শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তবে সমাজনীতি আর তাকে সহজে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারে না। আধুনিককালে যন্ত্রের সহযোগে কর্ম্মের শক্তি যেমন বহুগুণিত, তেমনি তার লাভ বহু অঙ্কের, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তার লোভ। এতে ক'রেই ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সমাজ-স্বার্থের সামঞ্জস্য টলমল ক'রে উঠ্‌চে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে চারিদিকে কেবল লড়াই ব্যাপ্ত হয়ে চলেচে। এই রকম অবস্থায় গ্রামের সঙ্গে

সহরের একান্নবর্ত্তিতা চ'লে যায়, সহর গ্রামকে কেবল শোষণ করে, কিছু ফিরিয়ে দেয় না।

আজ গ্রামের আলো নিব্‌ল। সহরে কৃত্রিম আলো জ্বল্‌ল—সে আলোয় সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্রের সঙ্গীত নেই। প্রতি সূর্য্যোদয়ে যে প্রণতি ছিল, সূর্য্যাস্তে যে আরতির প্রদীপ জ্বলত সে আজ লুপ্ত ম্লান। শুধু-যে জলাশয়ের জল শুকালো, তা নয়, হৃদয় শুকালো। জীবনের আনন্দে মাঠের ফুলের মতো যে-সব নৃত্যগীত আপনি জেগে উঠ্‌ত তারা জীর্ণ হ'য়ে ধূলায় মিলিয়ে গেল। প্রাণের ঔদার্য্য এতকাল আপনিই আপনার সহজ আনন্দের সুন্দর উপকরণ আপনিই সৃষ্টি করেচে—আজ সে গেলো বোবা হ'য়ে, আজ তাকে কলে-তৈরি আমোদের আশ্রয় নিতে হচ্চে। যতই নিচ্চে ততই নিজের সৃষ্টিশক্তি আরো অসাড় হ'য়ে যাচ্চে।

বেশি দিনের কথা নয়, নবাবী আমলে দেখা গেছে, তখনকার বড়ো বড়ো আমলা যাঁরা রাজদরবারে রাজধানীতে পুষ্ট, জন্মগ্রামের সমাজবন্ধনকে তাঁরা অনুরাগের সঙ্গে স্বীকার করেচেন। তাঁরা অর্জ্জন করেচেন সহরে, ব্যয় করেচেন গ্রামে। মাটি থেকে জল একবার আকাশে গিয়ে আবার মাটিতেই ফিরে এসেচে—নইলে মাটি বন্ধ্যা মরু হ'য়ে যেত। আজকালকার দিনে গ্রামের থেকে যে-প্রাণের ধারা সহরে চ'লে যাচ্চে গ্রামের সঙ্গে তার দেনা-পাওনার যোগ আর থাক্‌চে না।

আজ ধূমকেতু উড়িয়ে কলের শৃঙ্গ বাজ্‌ল, মানুষকে দলে দলে তার স্নিগ্ধ সমাজস্থিতি থেকে লোভ দেখিয়ে বের ক'রে নিলে। মানুষ আবার ফিরল তার প্রথম আরম্ভের অবস্থায়—সেই আরণ্যক যুগের বর্ব্বর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই প্রবল দেহ নিয়ে আজ দেখা দিল; আপন আপন স্বতন্ত্র ভোগের দুর্গ বেঁধে মানুষ অন্যকে শোষণ ও নিজেকে পোষণ করতে লাগল;—তখনকার কালের দস্যুবৃত্তি দেহান্তর ধারণ করলে। গ্রামে একদিন অনেক মানুষ মিলেছিল সকলে মিলে সংগ্রহ, সঞ্চয় ও ভোগ করবার জন্যে। এখন সংখ্যায় তার চেয়ে অনেক বেশী মানুষ একত্র মিল্‌ল, কিন্তু প্রত্যেকেই নিজের ভোগের কেন্দ্র নিজে। তাই সমাজের সহজ বিধানের চেয়ে পুলিশের পাহারা কড়া হ'য়ে উঠ্‌ল—আত্মীয়তার জায়গায় আইনের জটিলতা বাইরের শিকল পাকা ক'রে তুলচে। নিজেরাই প্রত্যেকেই যেখানে নিজের ভোগের কেন্দ্র, সেখানে আমরা হয় পরের দাসত্ব করি নয় নিজের,—কিন্তু দুইই দাসত্ব। এই কর্ম্মপাশবদ্ধ মানুষের সংখ্যা আজ ক্রমেই বেড়ে চলেচে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যারা মিল্‌ল, অন্তরের ক্ষেত্রে তাদের মিল নেই ব'লে এই সব পরদাস ও আত্মদাসদের মনে ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ প্রবল; প্রতি-যোগিতার মন্থনদণ্ডে মিথ্যা ও হিংসাকে এরা নানা আকারে কেবলি মথিত ক'রে তুলচে। ধনী দরিদ্রে অন্তত আমাদের দেশে বিচ্ছেদ অতিমাত্র ছিল না, তার একটা কারণ ধনের সম্মান অন্য সব সম্মানের নীচে ছিল; আরেকটা কারণ, ধনী আপন ধনের দায়িত্ব স্বীকার করত। অর্থাৎ ধন তখন অসামাজিক ছিল না, তখন প্রত্যেকের ধনে সমস্ত সমাজ ধনী হ'য়ে উঠ্‌ত। তখন মান অপমান ও ভোগের তার-তম্য ধনকে আশ্রয় ক'রে স্পর্দ্ধিত আত্মম্ভরিতার সঙ্গে মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধের পথ রুদ্ধ করেনি। আজ অন্নব্রহ্ম লোভের অন্ন হ'য়ে ছোট হ'য়ে যেতেই একদিন যা সমাজ বেঁধেচে আজ তাই সমাজ ভাঙচে—রক্তে ভাসাচ্চে পৃথিবী, দাসত্বে জীর্ণ করচে মানুষের মন। আজ তাই ধন অধনের উৎকট অসামঞ্জস্য দূর করবার জন্যে চারিদিকেই উত্তেজনা।

এখনকার কালের সাধনা, লোকালয়কে আবার সমগ্র ক'রে তোলা। বিশিষ্টে সাধারণে, শক্তিতে সৌহার্দ্দে, সহরে গ্রামে মিলিয়ে সম্পূর্ণ করা। বিপ্লবের দ্বারা এই পূর্ণতা ঘটবে না। বিপ্লবকে যারা বাহন করে, তারা এক অসামঞ্জস্য থেকে আর এক অসামঞ্জস্যে লাফ দিয়ে চলে, তারা সত্যকে ছেঁটে ফেলে সহজ করতে চায়। তারা ভোগকে রাখে তো ত্যাগকে তাড়ায়, ত্যাগকে রাখে তো ভোগকে দেশ-ছাড়া করে—মানব প্রকৃতিকে পঙ্গু ক'রে তবে তাকে শাসনে আনতে চায়। আমরা এই কথা বলি যে, সত্যকে সমগ্র ভাবে না নিতে পারলে মানব-স্বভাবকে বঞ্চিত করা হয়,—বঞ্চিত করলেই তার থেকে রোগ, তার থেকে অশান্তি। এমন কি, ঐ যে কলের কথা বলছিলুম—তাকে দিয়ে আমরা বিস্তর অকার্য্য করচি ব'লেই যে তাকে বাদ দেওয়া চলে একথা বলা যায় না। এই যন্ত্রও আমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাণশক্তির অঙ্গ। এ একেবারেই মানুষের জিনিষ। হাতকে দিয়ে ডাকাতি করেচি বলে যে তাকে কেটে ফেললে মঙ্গল হয় তা নয়, সেই হাতকে দিয়েই প্রায়শ্চিত্ত করাতে হবে। নিজেকে পঙ্গু ক'রে ভালো হবার সাধনা কাপুরুষতার সাধনা। মানুষের শক্তি নানাদিকে বিকাশ খোঁজে, তার কোনোটিকে অবজ্ঞা করবার অধিকার আমাদের নেই। আদিমকাল থেকে মানুষ যন্ত্র তৈরী করতে চেষ্টা করেচে। প্রকৃতির কোনো একটা শক্তিরহস্য যেই সে আবিষ্কার করে, অমনি যন্ত্র দিয়ে তাকে বন্দী ক'রে তাকে আপনার ব্যবহারের ক'রে নেয়। এর থেকেই তার সভ্যতায় এক-একটা নূতন পর্য্যায়ের আরম্ভ। প্রথম যেদিন সে লাঙল তৈরি ক'রে মাটির উর্ব্বরতা-শক্তিকে কর্ষণ করতে পারলে সেদিন তার জীবনযাত্রার ইতিহাসে কত বড়ো পর্দ্দা উঠে গেল। সেই উন্মীলিত আবরণ কেবল যে তার অন্নশালাকে বৃহৎ ক'রে অবারিত করলে তা নয়—এতদিন তার মনের যে অনেক কক্ষ অন্ধকার ছিল তার মধ্যে আলো এনে ফেললে। এই সুযোগে সে নানাদিকেই বড়ো হয়ে উঠল। একদিন পশুচর্ম্ম ছিল মানুষের দেহের আচ্ছাদন—যেদিন চরকায় তাঁতে সে প্রথম কাপড় বুনলে, সেদিন কেবল যে সে সহজে দেহ ঢাকতে পারলে তা নয় এতে তার শক্তিকে বড়ো ক'রে উদ্বোধিত করাতে বহুদূর পর্য্যন্ত তার প্রভাব বিস্তৃত হোলো। তাই শুধু মানুষের দেহ নয়, আজকে-দিনের মানুষের মন হচ্চে কাপড়পরা মন,—মানুষ যে মানবলোক সৃষ্টি করচে কাপড়টা তার একটা বড়ো উপাদান। আজকের দিনে আমাদের দেশে আমরা ন্যাশনাল কাপড়টা খাটো করচি, কিন্তু ওদিকে ন্যাশনাল পতাকাটা বেড়ে চলল। তার মানে কাপড়টা কেবল একটা আচ্ছাদন নয়, ওটা একটা ভাষা। অর্থাৎ কাপড়ে মানুষের মন নিজেকে প্রকাশ করবার একটা নূতন উপাদান পেলে। এ কথা সবাই জানে, পাথরের যুগ থেকে মানুষ যখন লোহার যুগে এল তখন কেবল যে তার বাহুশক্তির বৃদ্ধি হোলো তা নয় তার আন্তরিক শক্তি প্রসার পেলে। পশুর চার পায়ের অবস্থা থেকে যেদিন মানুষ দুই হাত দুই পায়ের অবস্থায় এল তখনই এর গোড়া-পত্তন। দুই হাত থাকাতে পৃথিবীর সঙ্গে ব্যবহারের ক্ষমতা মানুষের বেড়ে গেছে—এই তার দেহশক্তির বিশেষত্ব থেকে তার মনের শক্তি বিশেষত্ব পেলে। সেইদিন থেকে হাতের সাহায্যেই মানুষ হাতিয়ার তৈরি ক'রে হাতকেই বহুগুণিত ক'রে চলেচে। তাতে ক'রেই বিশ্বের সঙ্গে তার ব্যবহার কেবলি বেড়ে উঠ্‌চে, তারি থেকেই তার মনের রুদ্ধদ্বার নানাদিকে খুলে যাচ্চে। কোনো সন্ন্যাসী যদি বলেন যে, বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহারের শক্তিকে সঙ্কুচিত করতে হবে তাহলে গোড়ায় মানুষের হাতদুটোকেই অপরাধী করতে হয়। ঘোরতর সন্ন্যাসী ততদূর পর্য্যন্তই যায়। সে উর্দ্ধবাহু হ'য়ে থাকে, বলে সংসারের সঙ্গে আমার কোনো ব্যবহার নেই, আমি মুক্ত। হাতের শক্তিকে খানিক দূর পর্য্যন্তই এগোতে দেব তার বেশি এগোতে দেব না—এটা হচ্চে ন্যূনাধিক পরিমাণে সেই উর্দ্ধবাহুত্বের বিধান। এতবড়ো শাসনের অধিকার পৃথিবীতে কার আছে? বিশ্বকর্ম্মা মানুষকে যতদূর পর্য্যন্ত এগিয়ে আসবার জন্যে আহ্বান করেন তাকে ততদূর পর্য্যন্ত এগোতে দেব না—বিধাতৃদত্ত শক্তিকে পঙ্গু করবার এমন স্পর্দ্ধা কোন্ সমাজ-বিধাতার মুখে শোভা পায়! শক্তির ব্যবহারের পন্থাই আমরা সমাজ-কল্যাণের অনুগত ক'রে নিয়মিত করতে পারি, কিন্তু শক্তির প্রকাশের পন্থা আমরা অবরুদ্ধ করতে পারিনে।

মানুষ যেমন একদিন হাল লাঙলকে, চরকা তাঁতকে, তীর ধনুককে, চক্রবান যানবাহনকে গ্রহণ ক'রে তাকে নিজের জীবনযাত্রার অনুগত করেছিল আধুনিক যন্ত্রকেও আমাদের সেইরকম করতে হবে। যন্ত্রে যারা পিছিয়ে আছে যন্ত্রে অগ্রবর্ত্তীদের সঙ্গে তারা কোনোমতেই পেরে উঠ্‌বে না। যে কারণে চারপাওয়ালা জীব দুইপাওয়ালা জীবের সঙ্গে পেরে ওঠেনি এও সেই একই কারণ।

আজকের দিনে যন্ত্রের সাহায্যে একজন লোক ধনী, আর হাজার লোক তার ভৃত্য, এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে যন্ত্রের দ্বারা একজন লোক হাজার লোকের চেয়ে শক্তিশালী হয়। সেটাতে যদি দোষ থাকে তবে বিদ্যা-অর্জ্জনেও দোষ আছে। বিদ্যার সাহায্যে বিদ্বান অনেক বেশি শক্তিশালী হয় অবিদ্বানের চেয়ে। এ স্থলে আমাদের এই কথাই

বলতে হবে যন্ত্র এবং তার মূলীভূত বিদ্যায় যে প্রভূত শক্তি উৎপন্ন হয় সেটা ব্যক্তি বা দলবিশেষে সংহৃত না হ'য়ে যেন সর্ব্বসাধারণে ব্যাপ্ত হয়। শক্তি ব্যক্তিবিশেষে একান্ত হ'য়ে উঠে মানুষকে যেন বিচ্ছিন্ন না করে—শক্তি যেন সর্ব্বদাই নিজের সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করতে পারে।

প্রকৃতির দান এবং মানুষের জ্ঞান এই দুইয়ে মিলেই মানুষের সভ্যতা নানা মহলে বড়ো হয়েচে—আজও এই দুটোকেই সহযোগীরূপে চাই। মানুষের জ্ঞান যেখানে কোনো পুরানো অভ্যস্ত রীতির মধ্যে আপন সম্পদকে ভাণ্ডারজাদ ক'রে ঘুমিয়ে পড়ে সেখানে কল্যাণ নেই। কেননা সে-জমা নিয়ত ক্ষয় হচ্চে, তাই একযুগের মূলধন ভেঙে ভেঙে আমরা বহুযুগ ধ'রে দিন চালাতে পারবো না। আজ আমাদের দিন চল্‌চেও না।

বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েচে। সেই শক্তি যখন সমস্ত সমাজের হ'য়ে কাজ করবে তখনি সত্যযুগ আস্‌বে। আজ সেই পরম যুগের আবাহন এসেচে। আজ মানুষকে বল্‌তে হবে তোমার এ শক্তি অক্ষয় হোক্, কর্ম্মের ক্ষেত্রে, ধর্ম্মের ক্ষেত্রে জয়ী হোক্। মানুষের শক্তি দৈবশক্তি, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা নাস্তিকতা।

মানুষের শক্তির এই নূতনতম বিকাশকে গ্রামে গ্রামে আনা চাই। এই শক্তিকে সে আবাহন ক'রে আন্‌তে পারেনি ব'লেই গ্রামে জলাশয়ে আজ জল নেই, ম্যালেরিয়ার প্রকোপে দুঃখশোক পাপতাপ বিনাশমূর্ত্তি ধরচে; কাপুরুষতা পুঞ্জীভূত। চারিদিকে যা দেখচি এ তো পরাভবেরই দৃশ্য। পরাভবের অবসাদে মানুষ নড়তে পারচে না, তাই এতদিকে তার এত অভাব। মানুষ বল্‌চে, পারলুম না। শুষ্ক জলাশয় থেকে, নিষ্ফল ক্ষেত্র থেকে, শ্মশানভূমিতে যে-চিতা নিব্‌তে চায় না তার শিখা থেকে কান্না উঠ্‌চে, পারলুম না, হার মেনেচি। এ যুগের শক্তিকে যদি গ্রহণ করতে পারি তাহলেই জিৎব, তাহলেই বাঁচব।

এইটেই আমাদের শ্রীনিকেতনের বাণী। আমাদের ফসল-ক্ষেত্রে কিছু বিলিতি বেগুন কিছু আলু ফলিয়েছি, চিরকেলে তাঁত চালিয়ে গোটাকতক সতরঞ্চ বুনিয়েছি,—আমাদের বাঁচবার পক্ষে এই যথেষ্ট নয়। যে বড়ো শক্তিকে আমাদের পক্ষভুক্ত করতে পারিনি সেই আমাদের পক্ষে দানবশক্তি; আজকের এই অল্প কিছু সংগ্রহ যা আমাদের সামনে রয়েচে সেই দানবের সঙ্গে লড়াই করবার যথোচিত উপকরণ তা নয়।

পুরাণে পড়েচি, একদিন দৈত্যদের সঙ্গে সংগ্রামে দেবতারা হেরে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁরা আপনাদের গুরু-পুত্রকে দৈত্যগুরুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। যাতে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সেই বিদ্যা দেবলোকে আনাই ছিল তাঁদের সঙ্কল্প। তাঁরা অবজ্ঞা ক'রে বলেননি যে, দানবী বিদ্যাকে আমরা চাইনে। দানবদের কাছ থেকে বিদ্যা নিয়ে তাঁরা দানবপুরী বানাতে ইচ্ছা করেননি,—সেই বিদ্যা নিয়ে তাঁরা স্বর্গকেই রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। দানবের ব্যবহার স্বর্গের ব্যবহার না হ'তে পারে, কিন্তু যে বিদ্যা দানবকে শক্তি দিয়েচে সেই বিদ্যাই দেবতাকেও শক্তি দেয়—বিদ্যার মধ্যে জাতিভেদ নেই।

আজকের দিনে আমাদের দেশে সর্ব্বদাই শুন্‌তে পাই য়ুরোপের বিদ্যা আমরা চাইনে, এ বিদ্যায় শয়তানী আছে। এমন কথা আমরা বল্‌ব না। বল্‌ব না, শক্তি আমাদের মারচে অতএব অশক্তিই আমাদের শ্রেয়। শক্তির মার নিবারণ করতে গেলে শক্তিকে গ্রহণ করতে হয়, তাকে ত্যাগ করলে মার বাড়ে বই কমে না। সত্যকে অস্বীকার করলেই সত্য আমাদেরকে বিনাশ করে, তখন তার প্রতি অভিমান ক'রে বলা মূঢ়তা যে "সত্যকে চাইনে।"

উপনিষদ বলেন, যিনি এক তিনি "বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি"—নানা জাতির লোককে তাদের নিহিতার্থ দান করেন। নিহিতার্থ,—অর্থাৎ প্রজারা যা চায় প্রজাপতি সেটা তাদের অন্তরেই প্রচ্ছন্ন ক'রে রেখেচেন। মানুষকে সেটা আবিষ্কার ক'রে নিতে হয়, তাহলেই দানের জিনিষ তার নিজের হয়ে ওঠে। যুগে যুগে এই নিহিতার্থ প্রকাশ পেয়েছে। এই যে নিহিতার্থ তিনি দিয়েছেন, এ "বহুধা শক্তিযোগাৎ"—বহুধা শক্তির যোগে। নিহিতার্থের সঙ্গে সেই বহুদিক্‌গামী শক্তিকে পাই। আজকের যুগের য়ুরোপীয় সাধকেরা মানুষের সেই নিহিতার্থের একটা বিশেষ সন্ধান পেয়েছেন—তারি যোগে বিশেষ শক্তিকে পেয়েছেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেই শক্তি আজ বহুধা হয়ে বিশ্বকে নূতন ক'রে জয় করতে বেরিয়েচে। কিন্তু এই শক্তি এই অর্থ যাঁর, তিনি সকল বর্ণের লোকের পক্ষেই এক, একোঽবর্ণঃ। সেই শক্তির অর্থ যে-কোনো বিশেষ কালে বিশেষ জাতির কাছে ব্যক্ত হোক্ না কেন, তা সকল কালের সকল জাতির পক্ষেই এক। বিজ্ঞানের সত্য যে-পণ্ডিত যখনই আবিষ্কার করুন, জাতি-নির্বিশেষে তা এক। অতএব এই শক্তি-আবিষ্কার আমাদের সকলকে এক করবার সহায়তা করে যেন। বিজ্ঞান যেখানে সত্য সেখানে বস্তুতই সে সকল জাতির মানুষকে ঐক্য দান করচে। কিন্তু তার শক্তির ভাগাভাগি নিয়ে মানুষ হানাহানি ক'রে থাকে। সেই বিরোধ সত্যের বা শক্তির মধ্যে নয়, আমাদের চরিত্রে যে অসত্য, যে অশক্তি, তারই মধ্যে। সেইজন্যে এই শ্লোকেরই শেষে আছে :—

সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু—তিনি আমাদের সকলকে, সকলের শক্তিকে, শুভবুদ্ধি দ্বারা যোগযুক্ত করুন।

ভানুসিংহের পত্রাবলী

৫৫

কলিকাতা

আজ সন্ধ্যাবেলায় ঘন মেঘ ক'রে খুব একচোট বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। এখন বৃষ্টি নেই কিন্তু আকাশে মেঘ কালো হ'য়ে জ'মে আছে। প্রশান্ত আর রাণী কোথায় চ'লে গেছে—বাড়িতে কেউ কোথাও নেই—আমি টেবিলের উপর ইলেক্‌ট্রিক্ আলো জ্বালিয়ে দিয়ে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে বসেচি। সমস্ত দিন নানা কাজে, নানা লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতে, নানা লেখায় কেটে গিয়েচে। এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করতে পাইনি—লেখার মাঝে মাঝে খুব ঘুম পেয়েছিল, কিন্তু ক'ষে ঝাঁকানি দিয়ে ঘুম তাড়িয়ে কাজ ক'রে গেছি। নিজেকে এক রকম ক'রে খুঁচিয়ে কাজ করানো একেবারেই ভাল নয় জানি। তাতে কাজও যে ভাল হয় তা নয় আর বিশ্রামও মাটি হ'য়ে যায়। কিন্তু আমার কুষ্ঠিতে কর্ম্ম-স্থানে শনি আছে, সে আমাকে দয়ামায়া একটুও করেনা—ক'ষে খাটিয়ে নেয়, মজুরিও যথেষ্ট দেয় না। কাল দিনেরবেলায় আবার নানারকম কাজের পালা আরম্ভ হবে—তাই এখন চিঠি লিখ্‌তে বসেচি। এখন সন্ধ্যে সাড়ে আটটা—তোমার ওখানে হয়ত তুমি এখন পড়ার বই নিয়ে বসে গেছ। আজকাল আমাকে যেরকম দায়ে প'ড়ে খাটতে হয়, যদি তোমাদের বয়সে সেই রকম পরীক্ষার পড়ায় খাট্‌তুম তাহ'লে এতদিনে হয়ত আই, এ, পরীক্ষা পাসের তকমা প'রে কন্তাকর্ত্তাদের মহলে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে পারতুম। তাহ'লে পণের টাকায় বিশ্বভারতীর ঝুলি ভর্ত্তি ক'রে দিনে-দুপুরে নাকে তেল দিয়ে নিদ্রা দিতে একটুও দ্বিধা বোধ হ'ত না। আমার কলকাতার কাজ শেষ হ'য়ে এল, পরশু কিম্বা শনিবার শান্তিনিকেতনে ফিরে যাব, সেখানে এতদিনে শরৎকালের রোদ্দুরে আকাশে সোনার রং ধরেছে আর শিউলি ফুলের গন্ধে বাতাস ভোর হ'য়ে আছে। আজ বুধবার; আজ থেকে ছেলেরা সব হো হো করতে করতে বাড়িমুখো দৌড়েচে—কাল পশু'র মধ্যে আশ্রম প্রায় শূন্য হ'য়ে যাবে। এদিকে শুক্লপক্ষ এসে পড়ল, দিনে দিনে সন্ধ্যার পেয়ালাটি চাঁদের আলোয় ভর্ত্তি হ'য়ে উঠ্‌তে থাক্‌বে। আমি বারান্দায় আরাম কেদারার উপর পা তুলে দিয়ে একলা চুপ ক'রে বসবো—চাঁদ আমার মনের ভাবনাগুলির পরে আপন রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে তাদের স্বপ্নময় ক'রে তুলবে,—ছাতিমতলায় ঝ'রে-পড়া মালতী ফুলের গন্ধ জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশে যাবে। সেই সুগন্ধি শুক্লরাত আমার মনের একোণ-ওকোণে উঁকি দিয়ে কোনো নতুন গানের সুর খুঁজে বেড়াবে—বেহাগ কিম্বা সিন্ধু কিম্বা কানাড়া। থাক—সে সব কথা পরে হবে, আপাতত চিঠি বন্ধ ক'রে এখানকার বারান্দায় মেঘাবৃত রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে মনটাকে ডুবিয়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম করতে যাই। যদি ক্লান্তির ঘুমে চোখ বুজে আসে তাহ'লে তাকে তাড়া দিয়ে দেশছাড়া করব না।

৫৬

বোম্বাই

তুমি লিখেছ তোমার সব কথার জবাব দিতে, অতএব তোমার চিঠি সামনে রেখে জবাব দিতে বসেচি—এবারে বোধ হয় পুরো মার্ক পাব। তোমার প্রথম প্রশ্ন আমি এখন কোথায় আছি। ছিলুম নানা জায়গায়, প্রধানত কাঠিয়াবাড়ে, তারপরে আমেদাবাদে, তারপরে বরোদায়, আজ সকালে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এসেচি বোম্বাইয়ে। এতকাল ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম ব'লে সমস্ত চিঠি এখানে জমা হচ্ছিল, তার মধ্যে তোমার ছখানা চিঠি। লেফাফার সর্ব্বাঙ্গে নানাপ্রদেশের নানা ডাকঘরের কালো কালো চাকা চাকা ছাপ। এখানে বেশিদিন থাকা হবে ব'লে বোধ হচ্চে না, কারণ ৭ই পৌষ নিকটবর্ত্তী। অতএব ছচার দিনের মধ্যে সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং বঙ্গ-ভূমিকে প্রণাম করতে যাত্রা করব। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েচি, যাই হোক খৃষ্টমাসের পূর্ব্বেই ফিরব। তোমার বাবাকে লিখে দিয়েচি তোমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসতে। এই পর্য্যন্ত তোমায় উত্তর দিয়ে তোমার চিঠি খুঁজে দেখলুম আর কোনো প্রশ্ন নেই।

এল্‌ম্‌হর্ষ্ট আমার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে বরোদায় এসে জ্বরে পড়েছিল। সেখানে তিন দিন বিছানায় পড়েছিল, এখানে এসে সেরে উঠেচে। আর আমার সঙ্গে আছে গোরা। এবারে সাধুচরণের সঙ্গ ও সেবা থেকে বঞ্চিত আছি। বনমালী নামধারী উৎকলবাসী-সেবক বৌমার আদেশক্রমে এসেচে। সে সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে আছে। সবচেয়ে ভয় আমাকে, অথচ আমি বিশেষ ভয়ঙ্কর নই। দ্বিতীয় ভয়, পাছে রাজবাড়ির অন্নপানে বিদেশে গঙ্গাতীর হ'তে দূরবর্ত্তী দেশে অকালমৃত্যু ঘটে। তৃতীয় ভয়, রেল-গাড়িতে বিদেশীয় জনতাকে, তারা ওর সঙ্গে হিন্দী বলে, ও বলে বাংলা—তাতে কথোপকথন উভয় পক্ষেই দুর্ব্বোধ হ'য়ে ওঠে। ওর বিশ্বাস এজন্য বিদেশীরাই দায়িক। ওর আর একটা বিশেষ গুণ এই যে, ওকে যদি কোনো কাপড় বের ক'রে দিতে বলি তাহলে সিন্দুক থেকে একে একে সব কাপড় বের ক'রে তবে সেটা নির্ব্বাচন করতে পারে, আবার সবগুলো তাকে একে একে ফিরে গোছাতে হয়। মানুষের আয়ু যখন অল্প, সময় যখন সীমাবদ্ধ, তখন এরকম চাকর নিয়ে মর্ত্ত্যলোকে অসুবিধায় পড়তে হয়। ওর একটা মস্ত গুণ এই যে, ও ঠাট্টা করলে বুঝতে পারে, ঠিক সময়ে হাসতে জানে; আমার late lamented সাধুচরণের সে বালাই ছিল না। আমার আবার স্বভাব এমন যে, ঠাট্টা না ক'রে বাঁচিনে, তাই ও যতক্ষণ কাপড় বের করচে আর গোচাচ্ছে আমি ততক্ষণ সেই সুদীর্ঘ সময় ঠাট্টা ক'রে অতি-বাহন করি। যাই হোক ওকে বিদেশী হাওয়া, বিদেশী খাওয়া, বিদেশী ভিড় থেকে ফিরে নিয়ে গিয়ে কোনমতে বৌমার হাতে আস্তটি ফিরে দিতে পারলে নিরুদ্বিগ্ন হই। আমার যে কতবড় দায়িত্ব, সে ওকে না দেখলে ভাল ক'রে অনুধাবন করতেই পারবে না। একে আমার বিশ্বভারতী, তার উপর বনমালী। ভাবনার আর অন্ত নাই।

আমি বোধহয় দুই তিন দিনের মধ্যেই রওনা হব, অতএব যদি চিঠি লেখ ত শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় লিখো। ইতি, বোধহচ্চে ১০ই ডিসেম্বর।

(ক্রমশঃ)

কবির সাধনা

—গল্প—

—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

—কলহ—

নন্দলাল কবিতা লিখিতেছিল।

মাঘের মাঝামাঝি। তা'হলেও আজ দুদিন হইতে হঠাৎ শীতটা একেবারে কমিয়া গিয়া বেশ একটু দক্ষিণ্য বাতাস ঝির ঝির করিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। হঠাৎ এই সময়টাতে প্রবল শীতের পরিবর্ত্তে এ রকম বসন্তের বাতাস নন্দলালের মত কবিদের হৃদয়কে আনন্দে নাচাইয়া তুলিল, কিন্তু যাহারা কবি নয় এমন অনেকের অন্তরকে কলেরা ও বসন্ত রোগের একটা আসন্ন আক্রমণের আতঙ্কে কাঁপাইয়া তুলিতেও ছাড়িল না।

অপরাহ্ণ কাল। নন্দলাল শয়ন ঘরের মেজের উপর মাদুর পাতিয়া বসিয়াছিল। দক্ষিণের জানালা দিয়া এক ঝলক বাতাস আসিয়া তাহার সম্মুখের কাগজগুলিকে এবং কপালের উপরকার লম্বা চুলগুলিকে নাড়াইয়া দিয়া গেল।

নন্দলাল লিখিল—

বসন্তবায় লেগেছে যে গায়
ঘরে আর থাকা যায় কি?

তারপর 'কি'র মিল খুঁজিতে নন্দলাল মনের মধ্যে একরাশ কথা ভাবিয়া বাহির করিল, যথা—ওকি, সাকী, দেখি, পাখী, ঢুকি, মেকী, মুখোমুখী ইত্যাদি। 'মুখোমুখী' টাই তাহার সবচেয়ে পছন্দ হওয়াতে উহাই শেষে বসাইয়া মিল খাওয়াইয়া পংক্তি সৃষ্টি করিবার জন্ত নন্দলাল ভাবিতে লাগিল।

উন্মুক্ত জানালার বাহিরে খানিকটা পোড়ো জমী। তাহারি একধারে একটি প্রকাণ্ড নিমগাছের আগডালে সম্প্রতি কবে একদিন ছেলেদের একখানা কাগজের ঘুড়ি আটকাইয়া গিয়াছিল। তাহারি হাত দুই তিন দীর্ঘ জোড় দেওয়া ল্যাজটী মৃদুমন্দ বাতাসে পত্‌পত্‌ করিয়া শব্দ করিতেছিল। শূন্য দৃষ্টিতে নন্দলাল সেইদিকে চাহিয়া তাহার কবিতার চরণ সাজাইতে মনোনিবেশ করিল। লেখা অংশটুকু মনে মনে একবার পাঠ করিল—

"বসন্তবায় লেগেছে যে গায়
ঘরে আর থাকা যায় কি?"

ময়দা মাখা ডা'ন হাতখানি উঁচু করিয়া এবং বাঁহাতে আট মাসের শিশুকন্যার নড়া ধরিয়া ঝুলাইয়া আনিয়া দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুলোচনা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এবং খুকীকে ধপ্‌ করিয়া নন্দলালের কোলের কাছে বসাইয়া দিয়া কবিতার কাগজগুলি মাদুরের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া নাড়ু পাকাইয়া জানালা দিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"মেয়ে ধরবার জন্তে একটা আলাদা লোকের বন্দোবস্ত ক'রে তবে ব'সে ব'সে কাব্যি লেখার ব্যবস্থা কত্তে হয়।"

কট্‌মট্‌ করিয়া সুলোচনার দিকে চাহিয়া নন্দলাল বলিল—"তুমি যে দেখ্‌ছি দিন দিন যা ইচ্ছে তাই কত্তে আরম্ভ কল্লে!"

"দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার এই রকম যা-ইচ্ছে তাইই করে,—কবি হয়েও এ কথাটা এতদিন জাননা?" বলিয়া সুলোচনা চলিয়া যাইতেছিল, নন্দলাল বলিল—"দেখ, আস্পর্দ্ধার মাত্রাটা তোমার—"

"হাঁ,—বড্ডই বেড়ে উঠেছে, এমনকি চরমে বল্লেও হয়, কিন্তু হাঁ করে দাঁড়িয়ে বাজে কথা শোনবার ত আমার সময় নেই। আমিও কবিতা চাপিয়ে এসেছি কিনা উনুনে। সুতরাং নকল কবিতা নিয়ে থাক্‌লে আমার চল্‌বে না—আমার আসল কবিতা চুঁয়ে যাবে।" বলিয়া যেমন দুম্‌দুম্‌ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল তেমনি দুম্‌দুম্‌ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

ক্রুদ্ধ আস্ফালনে নন্দলাল গর্জ্জাইয়া উঠিল,—"যতদূর বাড়বার তুমি বেড়ে উঠেছ দেখ্‌তে পাচ্চি! এর ব্যবস্থা যদি আমিও না কত্তে পারি, ত আমারও নাম—"

রান্নাঘর হইতে সুলোচনা শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল—"কবি কালিদাস নয়।"

ক্রোধে অধীর হইয়া খুকীকে কোলে করিয়া নন্দলাল রান্নাঘরের দরজার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইতেই সুলোচনা বলিয়া উঠিল,—"কি, খানিক বীর রসের অভিনয় ত? কিন্তু এখন তার সুবিধে হবে না। তার বদলে এখন একটু খুকীকে আগ্‌লে রাখ, নইলে এই বিকেলের জলখাবারের ব্যাপারটা হয়তো হয়েই উঠ্‌বেনা।"

নন্দলাল রাগে ফুলিতে লাগিল। রাগের মাত্রা যখন তাহার খুব বেশী হইত, তখন তাহার ভাল করিয়া কথা বাহির হইত না মুখের কথা অর্দ্ধেক তাহার মুখের মধ্যেই থাকিয়া যাইত এবং কাপড়ের কাছা অকারণ বারবার ঢিলা হইয়া পড়িত। নন্দলাল এক হাতে খুকিকে বগলে চাপিয়া, আর এক হাতে কাছা গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল—"চাষা কি কখনো বোঝে......। নিরেট মুখ্যু!—কবিতার মর্ম্ম......"

পিছন ফিরিয়া সুলোচনা বলিল—"বুঝি গো বুঝি—খুবই বুঝি। কবিতের মর্ম্মও বুঝি,—আর চাষা হলেও মদের স্বাদটাও বুঝি। তাইত ছিঁড়ে ফেলে দিই! লোকে ছাপা হলে পরে, পড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিত, আমি তোমার বিশেষ শুভাকাঙ্খী, তাই কাঁচা বেলাতেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। এতে বিশেষ কিছু অন্যায় করা হয়নি ক। যাও,—মেয়েটা যে চেপ্টে সারা হয়ে গেল! কাপড়টা এঁটে পরে, মেয়েটাকে নিয়ে খানিক খেলা দাওগে যাও। পার ত কোলে ফেলে ঘুম্‌ পাড়াবার একটু চেষ্টা কর গিয়ে।"

রুদ্ধ ক্রোধে অধীর অন্ধ হইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে নন্দলাল বলিল,—"তোমার এ তেজ আমি......। কত বড় মেয়ে মানুষ, আমি একবার......শীগ্‌গীরই এর ব্যবস্থা......।

ছ্যাঁক্‌ করিয়া একখানি পরোটা চাটুর উপর ফেলিয়া দিয়া সুলোচনা কহিল,—"হ্যাঁ, ব্যবস্থা একটা করে ফেলো।"

টলিতে টলিতে নন্দলাল কাপড়ের কসি ধরিয়া নিজের শয়ন কক্ষের দিকে চলিয়া গেল।

খানিক পরে সুলোচনা জলখাবারের থালাখানি নন্দলালের সম্মুখে ধরিয়া বলিল,—"এবেলা এই পর্য্যন্তই। রাত্রে আজ আর আমি রাঁধ্‌তে টাঁধ্‌তে পার্ব্ব না।"

নন্দলালের সমস্ত দেহের মধ্যে ভীষণ ক্রোধ পাক দিয়া ঘুরিতেছিল। মিনিট্‌ খানেক একদৃষ্টে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তার মানে?"

"তার মানে পেরে উঠ্‌বোনা। শরীর ভাল নেই।"

"অর্থাৎ বলতে চাও, সমস্ত রাত উপোস করে না খেয়ে থাক্‌তে হবে?"

"তাই। তবে রাত্রে আর খাবার দরকারও হবে না। কারণ, দীনু দত্তর দোকানের ঘীয়ে পরটা ভেজে দিয়েচি। ঐ চারখানা পরোটা খেলেই আধ ঘণ্টার মধ্যেই অম্বল হ'য়ে গলা পর্য্যন্ত ঠেলে উঠবে এখন,—পেট ফুলে চোঁয়া ঢেকুর উঠবে এখন—সুতরাং, রাত্রে আর খাবার দরকারই হবে না। একটা সোডা বরঞ্চ এই বেলা আনিয়ে রাখ।" বলিয়া সুলোচনা জলের গেলাসটী মেজের উপর রাখিয়া খুকিকে কোলে তুলিয়া লইয়া পাশের মিত্তিরদের বাড়ীতে দৈনিক তাসের আসরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—অথ বৈরাগ্য—

সুলোচনা চলিয়া গেল। পরোটা ক'খানা যেমন রাখিয়া গিয়াছিল, তেমনি ভাবেই সেইখানে পড়িয়া রহিল, নন্দলাল তা স্পর্শও করিল না। অন্তরের প্রবল ক্রোধ আজ আর কিছুতেই শান্ত হইতে চাহিল না। সুলোচনার এই অবজ্ঞা ও স্পর্দ্ধার একটা ভালরকম শিক্ষা তাহাকে দিতেই হইবে। এতদিন যথেষ্ট সহ্য করা গিয়াছে, কিন্তু আর নয়—কিছুতেই নয়। সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্য নিরূপণও হইয়া গেল। মিনিট দশেকের মধ্যে জামা কাপড় পরিয়া নন্দলাল গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং কালীঘাটের বড় রাস্তায় আসিয়া একখানি বাসে উঠিয়া পড়িল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে যখন বাস হইতে অবতরণ করিল বোধ হইল যেন কে

একজন যুবক ডাকে। নন্দলাল ফিরিয়া দাঁড়াইতেই যুবকটি সম্মুখে আসিয়া বলিল,—"কৈ, ফাল্গুনের জন্তে "জোনাকী"র লেখা কৈ? আজই আপনার কাছে যাব বলে বেরিয়ে ছিলুম্।"

নন্দলাল একটু থতমত খাইয়া বলিল,—"হাঁ, তা আপ্নার গিয়ে "জোনাকী"র জন্তে লেখা আমি প্রায় লিখেই রেখেছি, শেষের দিকটা দু'চার লাইন যা লিখতে বাকী আছে, সেইটে লিখে শেষ করে দিলেই হয়। মহা মুস্কিল হয়েছে, বাঁশরী বাবু! বাড়ীতে সব অসুখ বিসুখ—বিষম ঝঞ্ঝাটে পড়া গেছে। আচ্ছা, আপনাদের কালী-ঘাট সাইডে-এ ছোট খাট বাড়ী অল্প সল্প ভাড়ায় মাস কতকের জন্তে পাওয়া যায় না?"

বাঁশরী বাবু এক মিনিট ভাবিয়া লইয়া কহিলেন,—"দেখুন, এই সোজা 'টালিগঞ্জ রোডে' দিব্যি একটা ছোট্ট একতালা বাড়ীতে 'টু লেট্' দেওয়া আছে, একবার দেখ্তে পারেন। নম্বরটা আমার ঠিক মনে নেই, ৫২ কি ৭২। একবার দেখুন না গিয়ে।"

নন্দলাল আর দাঁড়াইল না। বাঁশরী বাবুকে একটা নমস্কার করিয়া টালিগঞ্জ রোডের দিকে অগ্রসর হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—গৃহত্যাগ—

মিত্তিরদের তাসের আড্ডা হইতে সন্ধ্যার সময় সুলোচনা গৃহে ফিরিয়া দেখিল দালানের এক কোণে বসিয়া বিম্লীর মা'র কাল বেড়ালটা একখানা পরটা লইয়া দিব্যি আরামে আহার করিতেছে। অর্দ্ধেক পরিমাণ সে ইতিপূর্ব্বেই উদরস্থ করিয়াছিল, এক্ষণে সুলোচনার পদশব্দে বাকী অংশ-টুকু মুখে করিয়া প্রথমে এক লম্ফে পাঁচিলের উপর এবং পরে তথা হইতে আর এক লম্ফে পাইখানার ছাদে যাইয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আলো জ্বালিতেই সুলোচনা দেখিল যে রেকাবীর উপর মাত্র খান দেড়েক পরোটা পড়িয়া আছে। তাহার পর ইতস্ততঃ চাহিতে দেখিতে পাইল বহুদিনের পুরাতন ঘরখানির এক কোণে যে ইঁদুরগর্ত্তটা ছিল তাহারই মুখের গোড়ায় আর একখানি পরোটা ধুলামাখা হইয়া পড়িয়া আছে এবং গর্ত্তের ভিতর হইতে দুইটি কৃষ্ণবর্ণের চকচকে চক্ষু উঁকি দিতেছে। জলের গেলাসের জল সবটুকু ঠিক তেম্নি ভাবেই আছে। শুধু গেলাসের গায়ে যে দু'একটা আরসোলা ঘুরিতেছিল আলো জ্বালিতেই তাহারা সর সর করিয়া পলাইয়া গেল। সুলোচনা সহজেই বুঝিয়া লইল যে আজ ক্রোধের মাত্রাটা একটু অধিক হইয়াছে এবং সেই কারণে ইহার স্থায়িত্বও বোধ হয় একটু বেশীক্ষণ হইবে।

হেরিকেনটি হাতে লইয়া সুলোচনা ঘরের বাহিরে জানালার নীচে যেখানে বৈকালে কবিতার কাগজখানি পাকাইয়া ফেলিয়া দিয়াছিল খিড়কী খুলিয়া সেইখানে আসিল, এবং রাশীকৃত আবর্জ্জনার ভিতর হইতে কাগজখানিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া তাহার উপর দোয়াতটি বসাইয়া দিল।

রাত অনেক হইয়া গিয়াছিল, তবুও নন্দলাল গৃহে ফিরিল না। তখন সুলোচনা উঠিয়া টেবিলের উপরকার দু'একখানি বই লইয়া নাড়াচাড়া করিল। তারপর সে-গুলিকে ভাল করিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া গুছাইয়া রাখিয়া দিল। কলম্ পেন্সিলগুলিকে লইয়া কাপড় দিয়া মুছিয়া রাখিল। ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া এগারোটা বাজিয়া গেল। তখন সুলোচনা হাই তুলিতে তুলিতে নন্দলালের বাঁধানো মোটা কবিতার খাতাখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল। একে একে অনেকগুলি কবিতা পড়িল। তারপর খাতাখানি বন্ধ করিয়া তাহা মাথায় ঠেকাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া আজিকার সেই কবিতার কাগজখানি লইয়া মনে মনে পড়িল:—

বসন্ত বায় লেগেছে যে গায়
ঘরে আর থাকা যায় কি?

সুলোচনা খানিক ভাবিয়া কলম্ লইয়া তাহার নীচে লিখিল:—

এমন সময় কোথা রসময়
ঘুরে বেড়াও যেন চরকী॥

ঠিক সেই সময় সদর দরজা দেওয়ার শব্দ পাওয়াতে সুলোচনা তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলোটা কমাইয়া দিয়া শয্যায় আসিয়া গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুরিয়া নন্দলালের বোধ হয় খুবই পিপাসা পাইয়াছিল। গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্রে এক-গ্লাশ জল গড়াইয়া পান করিল এবং পরে জামা ও চাদরখানি আলনার উপর রাখিয়া দিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিতেই নিদ্রিত সুলোচনা জাগ্রত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি গো, এই এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে ?"

অপর পক্ষ হইতে ইহার কোন উত্তর আসিল না।

"কি গো, কথা কইবেনা নাকি ?" নন্দলাল নিরুত্তর।

"কোথা গিয়েছিলে বলবেনা তাহলে ?"

দেওয়ালের দিকে চাহিয়া নন্দলাল কহিল—"কালীঘাট।"

"মিছে কথা। কালীঘাট গিয়াছিলে তা কপালে সিঁদুর গলায় মালা কই ?"

"কালীঘাট গেলেই কি সিঁদুর মালা পরতে হয় না কি ?—" দৃষ্টি দেওয়ালের দিকেই।

"ওমা, তা' হয় না ? যেখানকার যা। আমরা সেবার যখন মেজ মামার সঙ্গে বৃন্দাবন যাই, দু'বেলা রজে গড়াগড়ি দিতুম্। যেখানকার যা নিয়ম। আবার বৃন্দাবন থেকে যখন দিল্লী আগ্রা গেলুম্, তখন সকলেই চব্বিশ ঘণ্টা লুঙ্গী পরে থাকতুম আর পাঁচ বার করে পশ্চিমমুখো হয়ে নমাজ পড়তুম্।"

"আমাকে হতশ্রদ্ধা করে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা, এর ব্যবস্থা আমি করে এসেছি। তোমার ভারি বাড়—"

"মাইরি না—মাইরি না। তোমাকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। বিশ্বাস না হয়, তাঁবা তুলসী আন। তবে মেয়েটাকে নিয়ে বিকেলে একটু রাগ হয়ে গেছ্‌লো, তাই কবিতার কাগজখানাকে—। আচ্ছা, তুমি একটুতে চটে যাও কেন বল দেখি ? ওই ত তোমার দোষ! সত্যি কথা বোলবো ? তোমায় রাগাতে আমার বেশ লাগে। তা লক্ষীটী, কিছু মনে কোরোনা। আমি তোমায় খু-উ-ব ভক্তি করি—তুমি যে আমার দেবতা—'পতি পরম গুরু'—'চির আয়ুষ্মতী ভব।—"

নন্দলাল আর কথার জবাব দিবার আবশ্যকতা মনে করিল না। আলো কমাইয়া দিয়া শয্যার এক প্রান্তে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

সুলোচনা জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাগা খু-উ-ব রাগ বুঝি ?"

নন্দলাল একটু নড়িল মাত্র। সুলোচনা উঠিয়া বসিয়া তাহার পা দুটীকে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া টিপিয়া দিতে দিতে বলিল,—"অনেক ঘুরেছ বোধ হয়—পা দুটো বড্ড ব্যাথা কচ্চে ? দেখ দেখি,—তোমার পা ব্যথা পর্য্যন্ত কল্লে আমি তা জান্‌তে পারি।"

শয়ন করিতে সুলোচনার অনেক রাত হইয়া গেল। পরদিন শয্যাত্যাগ করিয়া যখন উঠিল তখন অনেকখানি বেলা হইয়া গিয়াছে। উঠিয়া দেখিল নন্দলাল গৃহে নাই। তাহার পর অনুসন্ধানের দ্বারা ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে আরও কতকগুলি জিনিষ গৃহে নাই—যথা—ইক্‌মিক্-কুকার, ষ্টোভ, কবিতার বাঁধানো খাতাখানি, নন্দলালের সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য বিশেষ প্রয়োজনীয় জামা কাপড় গুলি, ফাউণ্টেন পেন, সতরঞ্চি, কম্বল, ছোট মশারিটী, আয়না চিরুণী, গামছা, জিবছোলা, মাঘের "জোনাকী" ও পৌষের "হিল্লোল" ইত্যাদি, ইত্যাদি। 'নেই'এর সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন দ্রব্য যাহা ছিল তাহাও সুলোচনার নজরে পড়িতে বেশী দেরী হইল না। তাহা একখানি খোলা চিঠি, টেবিলের উপরে পেপার-ওয়েট্ দিয়া চাপা ছিল। সুলোচনা তাহা হাতে লইয়া পড়িল,—"আমি যাইলাম। ফিরিবার ইচ্ছাও নাই—আশাও নাই। আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া অনবরত জ্বালাতন হইয়া আসিতেছি। আর জ্বালাতন হইবার সখ নাই।"

চিঠিখানি হাতে করিয়া লইয়া সুলোচনা বিছানার উপরে বসিয়া পড়িল; মনে মনে বলিল,—"এই নিয়ে পাঁচবার হ'ল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—সাধনার প্রথম দিন—

নম্বরটা বাহান্নও নয়, বাহাত্তরও নয়,—সাতাশের দুই। ২৭।২ নং টালীগঞ্জ রোডের ছোট্ট একতালা বাড়িটি নন্দলাল গতকল্য আসিয়া ভাড়া লইয়া ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিল। আজ সকালে ছয়টার সময় আসিয়া ঘণ্টা দুইয়েকের মধ্যেই তাহার অস্থায়ী গৃহস্থালী মোটামুটি একরকম সাজাইয়া গোছাইয়া ফেলিল। তারপর ছোট্ট প্রাঙ্গণখানির মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে মুক্ত পল্লীর অনেকটা শোভা উপভোগ

করিয়া মনে ভাবিল, এই ভাল। এখানে সহরের গোলমালও ততটা নেই, সুলোচনার বিদ্রূপও নেই, খুকীটার ঘ্যান ঘ্যানানও নেই। মাস ছত্তিন এখানে কাটাতে পাল্লে কিছু বেশীরকম কবিতাও লেখা যা:ব,—সুলোচনাও একটু জব্দ হয়ে আসবে।

দ্বিপ্রহরে আহার এবং বিশ্রামান্তে নন্দলাল "তরুণবাণী"র জন্য কাগজ কলম লইয়া সেই কবিতাটি লিখিতে বসিল :—

বসন্তবায় লেগেছে যে গায়
ঘরে আর থাকা যায় কি ?

—"বা—বা—বা—বা—বাড়িতে কে আছেন ?"

সদর দরজা খুলিয়া নন্দলাল বাহিরে আসিয়া দেখিল—একটী মোটাসোটা কালো রংয়ের লোক, অসংখ্য তালিযুক্ত এবং বিবর্ণ চোগা চাপকান পরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। নন্দলালকে দেখিয়া :তিনি প্রশ্ন করিলেন,—"ম—ম—ম—ম—মশায়েরই কি বাড়ী ?"

—"আজ্ঞে, না। যাঁদের বাড়ী তাঁরা থাকেন ভবানীপুরে।"

—"লে—লে—লে—লেখা রয়েছে কি না যে ভে—ভে—ভে—ভেতরে খোঁজ ক—ক—ক—ক.........

—"হাঁা, খালি যখন ছিল, তখন তাঁদের লোক একজন এখানে থাকতো। কাল থেকে আমি ভাড়া নিয়েছি, সেই জন্যে.........

—"কা—কা—কা—কা—কাল থেকে আপনি ভা—ভা—ভা—ভা—ভা—ভা—ভা.........

—"হাঁা, কাল থেকে আমিই ভাড়া নিয়েছি।"

—"তা—তা হোলেও ফু—ফু—ফুরিয়েই গেল! ম—ম—ম—ম—মহা মুস্কিল! আজকের মো—মোধ্যে যা—যা—যা—যা—যাই বা কোথা ?"

—"মশায়ের কি করা হয় ? এখন আছেন কোথায় ?"

—"আরে মশায়, আছি এখন গি—গি—গি—গিয়ে কা—কা—কা—কা—কা—কালীঘাটে। এই আলিপুর জ—জ—জজ্ কোর্টে ওকালতী করি। তা—তাই—এ ধা—ধারে না থাকলে ব—ব—ব—ব—ব—বড় অসুবিধে হয়। নো—নো—নো—নোটীশের আর একটি দিন বা—বা—ববাকি। এই একদিনের মো—মো—মো—মোধ্যে কো—কোথায় ববাড়ী পা—পা—পাই বলুন ত ?"

—"উঠে যাবার নোটীশ দিয়েছে বুঝি ?"

"ব—ব—ব—ব—ব—বলেন কেন আর। অ—অ—অপরাধের মধ্যে—ক—ক—ক—ক—মাসের ভা—ভা—ভাড়াটা দিয়ে উঠ্‌তে পা—পা—পারিনি। বোঝেন ত, ম—ম—মক্কেল টক্কেল আজকাল ত তে—তে—তে—তে—তেমন নে—নে—নেই।"

মনে মনে নন্দলাল বলিল,—মক্কেল আর থাকবে কি করে ? একেবারে বদ্ধ কালা না হ'লেও তোমার মক্কেল হবার উপায় নেই। তবে বলিহারি সেই জজকোর্টের জজ সাহেবকে যিনি অসীম ধৈর্য্যের স:ঙ্গ তোমার সওয়াল-জবাব শোনেন !—প্রকাশ্যে কহিল,—"কোর্টে বেরুননি আজ ?"

—"বে—বে—বে—বে—বে—বে—বে—বে.........

উকীল বাবুটীর চক্ষু উল্টাইয়া ঠিক্‌রাইয়া পড়িবার মত হইল। গলা ফুলিয়া দম বন্ধ হইয়া যাইবার মত হইল।

নন্দলাল কহিল,—"আচ্ছা আসুন তা'হলে। একটু বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছি—নমস্কার।"

"ন—ন—ন—ন—ন—নমস্কার।"

নন্দলালের চোখে মুখে অনেক থুতুর ছিটা লাগিয়াছিল, চৌবাচ্চার ধারে গিয়া বেশ করিয়া মুখ ধুইয়া পুনরায় কবিতাটী লিখিতে বসিল :—

বসন্তবায়, লেগেছে যে গায়,
ঘরে আর থাকা যায় কি ?

—"বলি, কেডা আছেন ঘরে ? অ মশায়! দুয়ার ত খোলাই দেহি। বারিতে কেডা আছেন ?"

"ভাল উৎপাত আরম্ভ হ'ল ত!" বলিয়া নন্দলাল সদর দরজার কাছে আসিতেই দেখিল একটী ভদ্রলোক দরজা ঠেলিয়া একেবারে ভিতরে আসিয়াই দাঁড়াইয়া আছে। নন্দলাল জিজ্ঞাসা করিল,—"কাকে খোঁজেন আপনি ?"

লোকটীর মুখের দিকে দেখিলেই সর্ব্বপ্রথমে নজর পড়িত তাহার বিশাল দাঁড়ি-গোঁফের প্রতি। সেই দাড়ি-গোঁফের মধ্য হইতে বাজখাঁই আওয়াজে বাহির হইল, —"খোজ ত নিমু পাছে। বাড়াডা কত, সেইডা চুপে চুপে

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

অগ্রে কয়েন দেহি ; বুঝিয়া লই, আমার বাগবত্‌চন্দর পারিয়া ওঠ্‌বা কি না।"

—"ভাগবতচন্দ্রটি কে ?"

—"বাগবত্‌চন্দর আইচ্‌। বর্ত্তমানে বালিয়াঘাটায় বাসা করিয়া আছেন। এই টালিগঞ্জে সা'দের চাউলের আরতে কাজ করেন। খইলাকাটির মস্ত বর গর্‌। হুগোল বোরসেলের মইধ্যে য্যামন কুলীন আর দ্বিতীয় পাইবেন না। এই বাগবত্‌চন্দরের পির-পিতেমোহ ছিলেন—মোহারাজ কেষ্টোচন্দরের এইক্কাবারে—"

"তা—আপনি তাঁর জন্যে বাড়ী খুঁজচেন ?"

—"হঃ, পাপের বোগের কথা আর কন্‌ ক্যান্‌। আজ গোডা তিনডা দিন গুরিয়া গুরিয়া কাবু অইয়ে পড়ছি। বরই বন্ধুত্ব আমার লগে, কি করি কন্‌ মশায়। কোথায় বালিয়াঘাটা, আর কোথায় টালিগঞ্জ। পেত্যেক দিন এতডা পথ যাওয়া আসা বাগবত্‌চন্দরের পক্ষে—বোঝলেন না ? তা, এডার ভাড়াডা কত, কহেন ত আমারে। আগে টাহার কথা শুনি, তারপর আপ্‌নাগোর গর দ্যাখমু।"

—"এ বাড়ী ত আর খালি নেই। কাল থেকে আমি ভাড়া নিয়ে নিয়েছি।"

—"আপনি ভাড়া লইয়েছেন ! তবে ত ব্যাসই করেছেন ! দ্যাকতেছি, বদ্দরলোকের জন্যে আর বারী যোগার কর্‌তি পার্‌লাম না। দ্যাখ্‌ছি শ্রীমানের ইচ্ছাডাই পূর্ণ হয়।"

—"শ্রীমান্‌টি কে ?—কি তাঁর ইচ্ছে ?"

—"শ্রীমান্‌ডি অইলো, আমাগোর বাগবত্‌চন্দরের পোলা—লটবর আইচ্‌। তিনি কিছুতেই বালিয়াঘাটা ছার্‌তি চান না।"

—"কেন ?"

—"আরে বোঝেন্‌ না ব্যাপারডা ? শ্রীমান্‌ ঐ স্থানে একটি শ্রীমতী জোডাইয়াছেন। বালিয়াঘাটা ছারিয়া যাইলে শ্রীমতীর কুঞ্জ তার দূর পরিয়া যায় !" বলিয়া তাঁহার সেই গুম্ফ শ্মশ্রুর মধ্যস্থিত মুখখানি ব্যাদান করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,—হ—হ—হ—হ।

নন্দলাল মনে মনে ভাবিল,—যত আপদ কি তার কাছেই আসে ! দিনটা ত আজ বাজে কাজেই কেটে গেল। বেলাও আর বড় বেশী নেই। রাত্রের জন্যে কুকারে যা' হোক দু'টি চাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হ'বে। চায়েরও সময় হ'য়েছে। ষ্টোভ জ্বালিয়ে সে হাঙ্গামাও নেহাৎ মন্দ নয়। ক্ষুধারও কিছু উদ্রেক উপলব্ধি হ'চ্ছে, কিছু জলখাবারও আনার প্রয়োজন। কাজ অনেকই করবার রয়েছে, কিন্তু অ-কাজেই দিনটা আজ কেটে গেল। কবিতাটিতেও হাতই দেওয়া হ'ল না। প্রকাশ্যে কহিল,— "তা'হ'লে, আসুন আপনি। একটু বিশেষ রকম ব্যস্ত আছি। বাড়ী আপনি ঢের পাবেন,—দেখুন না চারিদিকে ঘুরে ফিরে।"

একটু অপেক্ষা করিয়া নন্দলাল বলিল, "নমস্কার।"

—"থাক্‌তেছি, বাগবত চন্দরের বাইগ্যাটা—আসসা, যায়েন আপনি।—নমস্কার।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

নন্দলাল ভিতরে আসিয়া কপাটে খিল লাগাইতে লাগাইতে শুনিল, কে এক জন বিশেষ যেন ব্যস্ত হইয়া দরজায় ঘা দিয়া ডাকিতেছে—"হেই ভাব্‌উ—হেই ভাবু।"

দরজায় একটি ছিদ্র ছিল। তাহা দিয়া নন্দলাল দেখিল একটী হাত পাঁচেক লম্বা কাবুলিওয়ালা ছয় হাত আন্দাজ লম্বা একটী লাঠি হাতে করিয়া দণ্ডায়মান।

নন্দলাল আর দরজা খুলিল না। ভিতর হইতে বলিল, —"ভাগো, ভাড়া নেই হ্যায়।"

—"হায়—হায়। হেই ভাবু, মট্‌ ভাগ্‌হো, হাগাড়ি ক্ষেড়ায় ডেগা।"

নন্দলাল আর ভিতরে দাঁড়াইল না। বলিতে বলিতে চলিয়া গেল,—"যাও—যাও—ভাগো, ভাড়া নেই হ্যায়।"

—"হট্‌ ! বড্‌মাস্‌!" বলিয়া মাটীতে তাহার ছয় হাত লাঠিগাছটিকে একবার ঠুকিয়া প্রস্থান করিল।

নন্দলালের মাথার ভিতর যেন গোলমাল হইয়া গিয়াছিল। বেহুঁসের মত খানিকক্ষণ প্রাঙ্গণে পাইচারী করিবার পর যখন তাহার হুঁস হইল, তখন দেখিল তাহার সেই অপরিচিত ক্ষুদ্র গৃহখানির উপর সন্ধ্যার আঁধার ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—সাধনার দ্বিতীয় দিন—

সে রাত্রে নন্দলালের সুনিদ্রা হইল না। একে নূতন স্থান, তাহার উপর সমস্ত দিন ধরিয়া রং বেরংয়ের লোক আসিয়া তাহাকে জ্বালাতন করিয়া গিয়াছে। সুতরাং যখনি তাহার একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছে তখনি স্বপন দেখিয়াছে, হয় সেই জজ্‌কোর্টের উকিল বাবুটি জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"মো—মো—মো—মো—মোশায়েরই কি বাড়ী?" নয়ত সেই 'ভাগবত্‌চন্দরে'র বন্ধুটির বিশাল গুম্ফ-শ্মশ্রুশোভিত বদনখানি তাহার চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া ভাসিয়াছে, অথবা সেই পাঁচ হাত লম্বা কাবুলিটির ছয় হাত লম্বা লাঠিগাছটি তাহার সামনে কেবলই বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিয়াছে।

সারা রাতের তন্দ্রা ও স্বপনের পর ভোরবেলায় নন্দলাল একটু নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ সদরের দিকে কি-একটা প্রচণ্ড শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া সদরের দিকে আসিতেই চমকিত হইয়া দেখিল, দরজার খিলটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কাঠের হুড়কাটা স্ক্রুশুদ্ধ চৌকাট হইতে উঠিয়া আসিয়া হাত দুই তিন দূরে ছিট্‌কাইয়া আসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, আর একটা কৌপীন-পরিহিত ঝুঁটী-বাঁধা উড়িষ্যাবাসী একটা পাতার তৈয়ারী প্রকাণ্ড চুরুট মুখে গুঁজিয়া তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া ফিক্‌ ফিক্‌ করিয়া হাসিতেছে।

নন্দলালকে দেখিয়া ঝুঁটী-বাঁধা মূর্ত্তিটী মুখ হইতে চুরুটটি হাতে লইয়া বলিল—"বাড়ী ভড়া নব।"

নন্দলাল গর্জ্জাইয়া উঠিয়া বলিল,—"তো-ব্যাটাকে পুলিসে দোবো, হারামজাদা! তোর কি দরকার ছিল—উল্লুক কোথাকার, যে খিল ভেঙ্গে বাড়ীতে ঢুকিছিস্‌? শুওর—পাজী—গাধ্‌ধা!"

—"আরে বাপ্পা, এত্তে রাগ করিচি কাঁই। মু শুনিলা, গোটা বাড়ীটা ভড়া হইবু পারা। সে কথাই ত মু পচারিতে আসচু। কেত্তে টঙ্কা ভড়া—সে কও।"

—"তোর মুণ্ডু ভাড়া! শুওর কোথাকার। আবি নিকাল যাও, ষ্টুপিড্‌, রাস্‌কেল্‌, হামবাগ!" বলিয়া নন্দলাল তাহাকে সজোরে ধাক্কা দিল।

উড়িয়াটী পড়িতে পড়িতে টাল সাম্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া, চুরুটটীতে একটা টান দিয়া বলিল—"এত্তে খাঁপুচি কাঁই? আরে মথা আপনঙ্কর খারাপ হেলা পারা? মোর বা কী দোষ হলানি, যে তম এত্তে রাগ করিছন্তি?"

—"তোর মাথা খাইছন্তি, হারামজাদা!" বলিয়া নন্দলাল আর এক ধাক্কায় তাহাকে চৌকাঠের বাহির করিয়া দিল।

লোকটা রাস্তায় দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—"ইয়ে! ভারী বাবু হউচি, পারা। ইয়ে সড়া—কিমতি লোক!"

নন্দলাল দরজাটি ভেজাইয়া দিয়া গৃহমধ্যে ফিরিয়া আসিল এবং শয্যার উপর বসিয়া পড়িল।

বসিয়া বসিয়া নন্দলাল ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া স্থির করিল, যত আপদের মূল ওই 'টু-লেট্‌'—লেখা টিনের সাইনবোর্ড খানা। ওখানাকে দেওয়াল হইতে না খুলিয়া ফেলিতে পারিলে দুর্ভোগের আর শেষ হইবে না। সুতরাং মুখ হাত ধুইয়া অন্য সব কাজ ফেলিয়া রাখিয়া নন্দলাল 'টু-লেটের' টিনখানির বিরুদ্ধে অভিযানের ব্যবস্থা করিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া, অনেক কষ্টে, অনেক পরিশ্রমে, অনেক উঁচুতে লাগানো সেই 'টু-লেটের' টিনখানিকে নন্দলাল খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে স্নানাহারের ব্যবস্থায় মনোযোগী হইল।

কোন বিশেষ আবশ্যকে আজ নন্দলালকে একবার বাহির হইতে হইবে। বৈষয়িক ব্যাপার। সুতরাং সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া লইয়া দরজায় তালা লাগাইয়া নন্দলাল বাহির হইয়া পড়িল।

সারাদিন ধরিয়া নানাস্থানে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম্ম সারিয়া সন্ধ্যার সময় যখন লালদিঘীর ধারে দাঁড়াইয়া নন্দলাল ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সেই সময় পিছন হইতে একজন প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক আসিয়া তাহার কাঁধের উপর হাত দিল। নন্দলাল ফিরিয়া চাহিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"কি হে, খবর সব ভালত! কেমন আছ বল দেখি? বুঁদি কেমন আছে?"

বুঁদি,—অর্থাৎ সুলোচনা। ইনি নন্দলালের বড় শ্যালক, বর্দ্ধমানের মুন্সেফ। বালীগঞ্জে নূতন বাটী কিনিয়াছেন।

নন্দলাল প্রথমটা একটু থতমত খাইল। তাহার পর বলিল, "হ্যাঁ, সব ভাল আছে দাদা। আপনি হঠাৎ যে?"

—"হঠাৎ কি রকম? কাল ত টেলিগ্রাম করিচি, পাওনি?"

—"হ্যাঁ, তা'ত পেয়েছি,—বলি, হঠাৎ আসবার কারণ কি তাই জিজ্ঞেসা কচ্চি। নাব্‌লেন কখন?"

—"আরে এই ত চারটের ট্রেণে নেবে, একবার 'দৈনিক-বার্ত্তা'-কাগজের আফিস হয়ে আসছি। সাত দিনের ছুটী নিয়ে এলুম। বড় মুস্কিলে পড়েছি ভাই, বালীগঞ্জের বাড়ী-খানা কিনে। ভূতের উৎপাতে কোন ভাড়াটেই টি‌ঁকতে পাচ্চে না। যে আসে, দুদিন থেকেই পালিয়ে যায়। ভাল রোজা টোজা তোমার সন্ধানে আছে? থাক্, দেখি,—কালকে বিজ্ঞাপনটা বেরুলে কি হয়। 'দৈনিক-বার্ত্তা'য় একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে এলুম। কোন রোজা ফোজা কি তান্ত্রিক, মন্তর তন্তর কি হোম যাগ করে যদি কিছু কত্তে পারে। বিজ্ঞাপনে দু'শ টাকা বকসিসের কথা ছাপিয়ে দিলুম।—যাক্, চল এখন যাই।"

—"আপনি যান দাদা। আমি এই 'স্কটে'র বাড়ী থেকে সুলোচনার ওষুধটা নিয়েই যাচ্চি!"

"বুঁদীর আবার ওষুধ কিসের?"

—"সেই—অম্বল! তা'হলে আসুন আপনি,—ওই শ্যামবাজারের গাড়ী আসছে।"

ট্রাম আসিলে নন্দলাল শ্যালককে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—সাধনার তৃতীয় দিন—

গতকল্য সমস্ত দিন ধরিয়া নানাকার্য্যে ঘুরিয়া নন্দলালের শরীরটা একটু খারাপ হইয়াছিল। রাত্রে ঈষৎ জ্বরের মত বোধ করিয়াছিল। সেইজন্য ইচ্ছা করিয়াই অনেক বেলা পর্য্যন্ত শুইয়া রহিল এবং আহারাদিও আজ আর করিবে না স্থির করিল।

আহারাদির যোগাড় করিবার কিছুই রহিল না বটে কিন্তু একটী জিনিষ তাহার করিবার ছিল, ছুতোর ডাকাইয়া সদরের খিলটি আঁটাইয়া লওয়া। কিন্তু এতই শরীর খারাপ বোধ হইতে লাগিল যে আজ আর এ সকল কিছুই তাহার ভাল লাগিল না। অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া নন্দলাল শয্যায় শুইয়াই রহিল। হঠাৎ এই অবস্থায় মুক্ত জানালার ফাঁক দিয়া খিড়কীর দরজার দিকে চাহিয়াই শয্যার উপর সে ত্রস্তে উঠিয়া বসিল। খিড়কীর বাইরে পাইখানা যাইবার যে সরু পথটি আছে, কেহ ইচ্ছা করিলে বাহির হইতে তথায় অনায়াসে আসিতে পারে। খিড়কীর দরজা তখন খোলা ছিল। নন্দলাল দেখিল, কে একটী লোক রক্তবস্ত্র পরিহিত, কাঁধের উপর রক্তবস্ত্রেরই উত্তরীয়, গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে দীর্ঘ সিঁদুরের ফোঁটা—খিড়কীর সেই পথটীর উপর দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। তাহাকে দেখিতে পাইয়াই নন্দলাল লম্ফ দিয়া উঠিয়া খিড়কীর খোলা দরজার ধারে আসিল। আসিয়া দেখিল, লোকটী তখন গলির পথ হইতে রাস্তায় পড়িয়াছে এবং একটা পোড়ো বাগানের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

নন্দলাল গলির পথে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যেখান হইতে লোকটী দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, তাহারই হাত দুই দূরে এক স্থানের মাটি সদ্য খোঁড়া হইয়া আবার যেন চাপা দেওয়া হইয়াছে। নন্দলাল একখণ্ড বাঁখারী দিয়া তথাকার মাটি উঠাইতেই দেখিতে পাইল যে, তন্মধ্যে একটী শাঁমুকের খোলা পোঁতা রহিয়াছে এবং সেই শামুকটির মধ্যে কয়েকগাছি চুল, কয়েকটি নখ, খানিকটা সিঁদুর ও আর আর কতিপয় পদার্থ রহিয়াছে। নন্দলাল কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। শামুকটিকে পাইখানার ধারে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং খিড়কীর দরজায় খিল লাগাইয়া সারা-দিনের উপবাসকাতর দেহ ও পরিশ্রান্ত মন লইয়া আবার শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

শুইয়া শুইয়া নন্দলাল অনেক কথাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিল আজ তিন দিন বাড়ী হইতে রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, আসিয়া তাহাকে কী নাকালই হইতে হই-য়াছে। বাড়ী থেকে চলিয়া আসাটা ভাল হয় নাই। সুলোচনার কাছে দাদা কাল নিশ্চয়ই সব শুনিয়াছেন।

ছিঃ ছিঃ তিনিই বা কি মনে করিতেছেন। তিনি থাকিতে আর বাড়ী ফেরা হইবে না। সাত দিনের তাঁর ছুটি। হঠাৎ তার চিন্তায় বাধা পড়িল। কোথা হইতে কতকগুলি সরিষা তার বুকে, মুখে, মাথায় এবং শয্যার চারিদিকে আসিয়া পড়িল। নন্দলাল চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিতেই দেখিল যে, একজন লোক মাথায় একখানি গামছা জড়াইয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে দেখিতেছে।

ত্রস্তে নন্দলাল উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুই?"

লোকটি নন্দলালের মুখের দিকে সেইরূপ স্থিরভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"তুই কে?"

—"আমি কে?"

—"হ্যাঁ, তুই কে? কোথা থেকে এখানে এসেছিস্? যাবি কিনা বল?"

তখন মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চ কণ্ঠে নন্দলাল কহিল,—"আভি নিকাল যাও, ড্যাম, ব্লাডি।"

—"এই যে নিকাল যাওয়াচ্চি! কে যায় এই দ্যাখ্! আমি গোষ্ঠ বাগ্দীর নাতি, শিবু বাগ্দীর ছেলে! তোর মত আমি ঢের দেখেছি। এখন যাবি কিনা ভাল মানুষের মত বল দেখি। আগে কোথায় ছিলি?" বলিয়া লোকটী পাইখানার পিছনে একটা প্রকাণ্ড নিমগাছের দিকে যাইল।

নন্দলাল ক্ষিপ্তের মত হইল। একে দেহ মন অসুস্থ, সারাদিন অভুক্ত, তাহার উপর এসব কি ব্যাপার! নন্দলাল শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া চৌকাটের উপর দাঁড়াইয়া কাছা গুঁজিতে গুঁজিতে ভীষণ চিৎকার করিয়া কহিল— "ব্যাটা —বদ্‌মাস্ রাস্কেল—ব্রুট্, এক্ষুনি......।"

ইত্যবসরে লোকটি একখানি পোড়া হলুদ লইয়া চুপি চুপি কি বলিতে বলিতে তাহাতে ফুঁ দিল এবং সেখানি নন্দলালের গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল,—"তোকে আমি কিছু কোরবনা যদি ভালোয় ভালোয় যাস,—যাবি কি না বল্। কি নিয়ে যাবি?"

নন্দলাল আর সহ্য করিতে পারিল না। মুখ দিয়া কথাও তাহার আর বাহির হইল না। তাড়াতাড়ি তাহার মোটা লাঠি গাছটি শক্ত করিয়া ধরিয়া লোকটির দিকে ধাবিত হইল। গোষ্ঠ বাগ্দীর নাতি, শিবু বাগ্দীর ছেলে, ব্যাপার তখন তত সুবিধা নয় দেখিয়া নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

নন্দলাল সদর পর্য্যন্ত আসিয়া দেখিল লোকটা সামনের সেই বাগানের মধ্যেই প্রবেশ করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—অথ ভূত-সিদ্ধি ও বন্ধন—

সন্ধ্যা হইয়াছে। নিকটস্থ টিপু সুলতানের বংশধরদিগের নির্ম্মিত সুবৃহৎ মসজিদ হইতে সান্ধ্য-নমাজের গম্ভীর ডাক বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। কিছুদূরে বেঙ্গল পুলিশের ফাঁড়ী,—ঢং ঢং করিয়া ছয়টা বাজিয়া গেল।

সেই পোড়ো বাগানখানির মধ্যে ঘাসের উপর বসিয়া তিনটি লোক কিসের একটা পরামর্শ করিতেছিল। একটি সেই রক্তাম্বর পরিহিত অবধূত, আর একটি সেই গোষ্ঠ বাগ্দীর নাতি, শিবু বাগ্দীর ছেলে আর তৃতীয়টি একটি মুসলমান।

মুসলমানটি কহিল—"আমি হাজার ভূতকে জব্দ করিচি, দেখলেই আমি কোন ভূত বলে দিতে পারি। এ নিশ্চয়ই—'মাম্‌দো'।"

অবধূত বলিল—"আমি যতদূর গণনা দ্বারা দেখলাম, ভূতটুত্ কিছু নয়,—বাড়ীটার ওপর দুষ্টগ্রহপাত দোষ হয়েছে। আমিও তাই মহা-নির্ম্মোক মন্ত্র বলে একটা ক্রিয়া করে এলুম। এর ফলে-"

গোষ্ঠ বাগ্দীর নাতি শিবু বাগ্দীর ছেলে বাধা দিয়া তাহার কথার মধ্যেই বলিয়া উঠিল—"ভূত নিশ্চয়ই তার আর কোন সন্দেহ নেই,—তবে 'মাম্‌দো' কিছুতেই নয়,—ক্ষিরিশ্চেন, নইলে ইঞ্জিরিতে গালাগাল দিয়ে ওঠে? এক কাজ করা যাক এসো। ওকে গিয়ে এক্ষুনি বেঁধে ফেলা যাক্! ও যখন সুক্ষ্ম শরীর ছেড়ে স্থূল শরীর ধারণ করেছে, তখন ওকে বেঁধে ফেলাই সুবিধে। তারপর নিয়ে যাই চল শ্যামবাজারের সেই বাবুর কাছে। টাকা দু শ না হয় তিন জনেই ভাগ করে নোয়া যাবে। কি বলো ঠাকুর মশাই আপনি?"

অবধূত ঠাকুর কহিলেন—"হ্যাঁ এ নেহাৎ মন্দ যুক্তি নয়, তোমার কি মত জালু সাহেব ?"

জালু সাহেবেরও ইহাতে অমত হইল না, কহিল—"ঠিকানাটা মনে আছে ত ? খবরের কাগজখানা ত আমারই পকেটে রয়েছে।" বলিয়া পকেট্ হইতে একখানা সংবাদপত্র বাহির করিল।

তারপর তাহারা একগাছা মোটা দড়ি কিনিয়া আনিল ও একটি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া নন্দলালের বাড়ীর সাম্‌নে রাখিয়া অতি সন্তর্পণে বাটির মধ্যে প্রবেশ করিল।

* * * *

—"দাদা, আজও ত কৈ এলেন না।"

—"ক'দিন আর থাকবে ? এসে পড়ে একদিন। তুই ভাবছিস কেন বুঁদী ; এ ত আর নতুন নয়। হাঁরে আমি বেরিয়ে গেলে, কেউ আর আমাকে ডাক্‌তে টাক্‌তে—

—"বাবু মশাই, বাবু মশাই।" বাহির হইতে কাহারা ডাকিতে আরম্ভ করিল।

নিবারণ দালানে আসিয়া সাড়া দিলেন,—"কে হে ?"

—"একবার শীগ্‌গির বাইরে আসুন বাবু।"

নিবারণ কিছু বুঝিতে না পারিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন তিনটি লোক তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে ; সম্মুখে রাস্তায় একখানি ট্যাক্সি। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোত্থেকে আস্‌ছো বাপু ?"

—"আজ্ঞে, আসচি আপনারই বাড়ী থেকে,—২৭।২নং টালীগঞ্জ। একেবারে মালশুদ্ধু হাজির কর্ত্তা।"

—"২৭।২নং টালীগঞ্জ নয়—বালিগঞ্জ। তা' মালশুদ্ধু কি বোলচো—বুঝলুম না।"

—"বালিগঞ্জ কি বোলচেন বাবু ? এই ত আমাদের কাছেই কাগজ একখানা আছে। ঐ ট্যাক্সিতে দেখুন আপনার আসামী একেবারে গেরেপ্তার। সূক্ষ্মদেহ ছেড়ে স্থূল হয়ে বসেছিলেন, তাইত বাঁধবারও সুবিধে হ'ল। যাক্—আর আপনার ভাবনা নেই। এখন আমাদের বক্সিসের টাকাটা—

নিবারণবাবু ট্যাক্সির কাছে গিয়া, ভিতরে চাহিয়া, ভূত দেখার মতই আৎকাইয়া উঠিলেন—"একি !—নন্দ ?"

জালুসাহেব কহিল,—"বাবুমশায়ের চেনা ভূত না কি ?"

"শিগ্‌গীর খোল—শিগ্‌গীর খোল" বলিয়া নিবারণবাবু ট্যাক্সির মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেই অবধূত তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল,—"দাঁড়ান, দাঁড়ান, কাছে যাবেন না। আমাদের সব দেহ বন্ধ করা আছে, আমরা খুলে দিচ্ছি। আপনি ছোঁবেন না, পেয়ে বস্‌তে পারে।"

তখনি দড়িদড়া সব খুলিয়া ফেলা হইল। নিবারণবাবু নন্দলালের হাত ধরিয়া বাটীর মধ্যে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ সব কি ব্যাপার, নন্দ ?"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—আবার গৃহস্থাশ্রম—

ঝড়ের দিনে দরিয়ায় তুফানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কর্ণধার যেমন নৌকা তীরে আনিবার পর হাঁফ ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত হয়, এই কয়দিন পরে নন্দলালও তেমনি নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন ঘরের মেজের মাদুর পাতিয়া দক্ষিণের খোলা জানালার ধারে বসিয়া আবার ফাল্গুনের জোনাকীর জন্ত তাহার সেই বসন্ত বোধন লিখিতে আরম্ভ করিল :—

বসন্ত বায় লেগেছে যে গায়
ঘরে আর থাকা যায় কি ?

—"ওগো মাগো—গেলুম গো !" ঘরে ঢুকিতে যাইয়া সুলোচনা চীৎকার করিয়া চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল।

—"কি গো—ব্যাপার কি সুলোচনা ?"

—"ওঃ—তুমি ? আমার বর—কবি-বর ! আঃ—বাঁচলুম ! এখনো আমার বুকটা কাঁপচে ! আমি যেন দেখলুম, মাদুরের ওপর বসে, কাগজ কলম নিয়ে, একটা প্রেকাণ্ড বিকটাকার ভূ·········

—"সুলোচনা, আবার ?"

—"নিশ্চয়ই।—এটা যে আমার স্বভাব !"

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

৭

ফরাসীদের পারী নগরীর নামে পৃথিবীশুদ্ধ লোক মায়া-পুরীর স্বপ্ন দেখে। আরব্য রজনীর বোগ্‌দাদ্ আর কথা-সাহিত্যের পারী উভয়েরই সম্বন্ধে বলা চলে, "অর্দ্ধেক নগরী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা।" পৃথিবীর ইতিহাসে পারীর তুলনা নেই। দুটি হাজার বৎসর তার বয়স, তবু চুল তার পাক্‌লো না। কতবার তাকে কেন্দ্র ক'রে কত দিগ্‌বিজয়ীর সাম্রাজ্য বিস্তৃত হলো, কতবার তার পথে পথে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার রক্তগঙ্গা ছুট্‌ল, কত ত্যাগী ও কত ভোগী, কত জ্ঞানী ও কত কর্ম্মী, কত রসজ্ঞ ও কত দুঃসাহসী, বিপ্লবে ও সৃষ্টিতে স্বাধীনতায় ও প্রেমে তাকে অমর মানবের অমরাবতী করলেন, সাহিত্যে চিত্রকলায় ভাস্কর্য্যে নাট্যকলায় সুগন্ধি শিল্পে পরিচ্ছদকলায় স্থাপত্যে ও বাস্তুকলায় সে সভ্যজগতের শীর্ষে উঠ্‌ল। পারীই তো আধুনিক সভ্যতার সত্যিকারের রাজধানী, অগ্রসরদের তপস্থাস্থল, অনুসারকদের তীর্থ। এর একটি দ্বার প্রতি দেশের কাঞ্চনবান সম্ভোগপ্রার্থীদের জন্যে খোলা, অন্য দ্বারটি প্রতিদেশের নিঃসম্বল শিল্পী ভাবুক বিদ্যার্থীদের জন্যে মুক্ত। একদিক থেকে দেখ্‌তে গেলে পারী রূপোপজীবিনী, আমেরিকান টুরিষ্ট্‌দের হীরা জহরতে এর সর্ব্বাঙ্গ বাঁধা পড়েছে, তবু জাপান অষ্ট্রেলিয়া আর্জেন্টিনা থেকেও সৌখীন বাবুরা আসেন এর দ্বার-গোড়ায় ধর্ণা দিয়ে একটা চাউনী বা একটু হাসির উচ্ছিষ্ট কুড়োতে। অন্যদিক থেকে দেখ্‌তে গেলে পারী অন্নপূর্ণা, সর্ব্বদেশের পলাতকদের আশ্রয়দাত্রী, তার জাতিবিদ্বেষ নেই, বর্ণবিদ্বেষ নেই, সে পোল্ রুশ্ রুমেনিয়ানকেও শ্রমের বিনিময়ে অন্ন দেয়, নিগ্রোকেও শ্বেত-সেনার নায়ক করে এবং নানাদেশের যে অসংখ্য বিদ্যার্থীতে তার প্রাঙ্গণ ভ'রে গেছে তাদের কত বিদ্যার্থীকে সে বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকাও যোগায়।

পৃথিবীর অন্য কোনো নগর দেখ্‌তে পৃথিবীর এত দেশের এত টুরিষ্ট্ আসে না; পারী দেখ্‌তে প্রতি বৎসর যে-কয় লক্ষ বিদেশী আসে, তাদের পনেরো আনা আমেরিকান্ ও ইংরেজ। আমেরিকানদের চোখে পারীই হচ্ছে ইউরোপের রাজধানী, আর ইউরোপের লোকের চোখে পারী হচ্ছে লণ্ডন ভিয়েনা বার্লিন মস্কোর চেয়েও আন্তর্জ্জাতিক। আমেরিকান বিদ্যার্থীতে পারী ছেয়ে গেছে, আর ইউরোপের নানাদেশের বিদ্যার্থীদের কাছে পারী চিরকালই আমাদের কাশীর মতো কাল্‌চার-পীঠ। শুধু কাশী নয় কামরূপও বটে, যত রাজ্যের রোম্যান্স-পিপাসু এই নগরীতেই তীর্থ করতে আসে।

আয়তনে ও লোকসংখ্যায় পারী লণ্ডনের প্রায় অর্দ্ধেক, কলকাতার প্রায় তিন গুণ। আজকালের দিনে একটা সহরের সঙ্গে আরেকটা সহরের বাইরে থেকে যে তফাৎ সেটা বড় ভাইয়ের সঙ্গে ছোট ভাইয়ের তফাৎ, বয়স ও

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

বৃদ্ধির উনিশ বিশ থাক্‌লেও পারিবারিক সাদৃশ্য উভয়েরই মুখে। বিরাট একটা ভূমিকম্প হ'য়ে যদি পৃথিবীর সব ক'টা সহর এক রাত্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তবে বিশ্বমানবের একটা আপদ যায়, মানুষ অনেক বীভৎসতা অনেক কৃত্রিমতা অনেক অসৌন্দর্য্য এড়ায়। নাগরিক মানবের না আছে চোখ না আছে কান না আছে ঘ্রাণবোধ না আছে স্বাদ-বোধ। কোনো বিষয়ে তার প্রচণ্ড ক্ষুধা নেই, সে অল্পা-হারেই অজীর্ণগ্রস্ত। সে বোঝে কেবল পল্লবগ্রাহিতা, বোঝে কেবল "smartness", বাকী সমস্ত তার মতে পাগ্‌লামী, তার মতে "unpractical" এবং ইউটিলিটি-হীন।

পারীতে ট্রাম—টিউব্‌—বাস্‌—ট্যাক্সি—ধোঁয়া—কাদা—বস্তি—ব্যারাক্‌ লণ্ডনের মতো সমস্তই আছে, কিন্তু মোটর গাড়ী কিছু বেশি সংখ্যক, বাড়ীগুলো কিছু স্বাধীন গড়নের, কাদাটা কিছু গভীর ও গাঢ়। মোটের ওপর পারী লণ্ডনের মতো ফিট্‌ফাট্‌ নয়, বেশ্‌-একটু নোংরা এবং অনেক বেশি গরীব। উঁচু দরের বাস্তকলা তার কয়েকটি প্রাসাদে সৌধে থাক্‌লেও লণ্ডনের সৌষ্ঠব তার অধিকাংশ বাড়ীর নেই। ঐতিহাসিক প্রাসাদ-সৌধের ছবি দেখে পারীকে যা ভাবি সর্ব্বসাধারণের বাসগৃহ দেখ্‌লে সে কল্পনা ছুটে যায়। কিন্তু পারীর আসল সৌন্দর্য্য তার প্রশস্ত সরল রাজপথগুলি, তার বৃহৎ চতুষ্কোণ প্লাস্‌ (place)-গুলি, তার সপ্তসেতুবেষ্টিত সর্পিণী নদীটি, সর্পিণীর দুই রসনার মতো সেন্‌ নদীর দু'টি অর্দ্ধের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপটি এবং নগরীর দুই উপান্তের প্রমোদোদ্যান দু'টি।

পারীতে লণ্ডনের মতো পার্ক্‌ বিরল; তবে তার এক একটি রাজপথ এক একটি সরল রেখাকৃতি পার্ক্‌ বিশেষ। পারীর নিতান্ত মাঝারি রাজপথগুলিও সেন্ট্রাল এভিনিউর চেয়ে চওড়া। "শাঁজেলিসী"র এক পাশ থেকে আর এক পাশ দেখা যায় না, পাশাপাশি দশটা চৌরঙ্গীর মতো। সে তো একটি রাজপথ নয় একসঙ্গে অনেকগুলি রাজপথ, রাজপথের মাঝখানে এক সারি বাগান, রাজপথের ওপরে এক একটি দোকান বা প্রাসাদ বা থিয়েটার। এক একটা বুলভার্দ্‌ এক একটা বিরাট ব্যাপার, যেমন দীর্ঘ তেমনি প্রস্থ। অধিকাংশ রাস্তার সম্বন্ধে এ কথা খাটে যে, একটি রাস্তা মানে একটি রাস্তা নয়, সমান্তরাল দু'টি তিনটি রাস্তা, কোনো কোনো স্থলে পাঁচটি রাস্তা। অর্থাৎ প্রতি রাস্তার অনেকগুলি ক'রে ভাগ আছে, যেমন ইন্দ্রধনুর সাতটি ভাগ। প্রথমে ফুটপাথ, ফুটপাথের পরে রাস্তা, রাস্তার পরে গাছের সারি, গাছের সারির পরে ঘোড়দৌড়ের রাস্তা, সে রাস্তার পরে গাছের সারি ও বসবার বেঞ্চি, তার পরে আবার ঘোড়দৌড়ের রাস্তা, তারপরে আবার গাছের পার্টিশান্‌, তার পরে আবার রাস্তা তার পরে আবার ফুটপাথ। সব রাস্তার অবশ্য একই রকম ভাগ-বিভাগ নয়, তবে অধিকাংশ রাস্তাই অসাধারণ চওড়া আর অনেক রাস্তার ফুটপাথের ওপরে স্থলে স্থলে ছোট ছোট দোকান আছে, যেমন পুরীর "বড় দাণ্ডে"র ওপরে অস্থায়ী ছোট ছোট দোকান। এক একটা ফুটপাথ ও রাস্তার মতো চওড়া, সেইজন্য তার স্থলে স্থলে এই সব দ্বীপের মতো দোকান, অধিকাংশ ছেলেদের খেলনার বা মেয়েদের এটা-ওটার দোকান, ঠিক আমাদের দেশের মতো সে সব দোকানে ভিড় জমেছে, দরদস্তুর চলেছে, হৈ চৈ হট্টগোল।

আমাদের সঙ্গে ফরাসী ইতালিয়ান প্রভৃতি দক্ষিণ ইউ-রোপীয়দের প্রকৃতিগত মিল আছে। এরাও খুব গোলমাল ভালোবাসে, অতিরিক্ত রকম বাচাল, আর বাদ্‌শাহী রকমের কুঁড়ে। কুঁড়ে বল্লে বোধহয় ভুল বলা হয়, বরং বলি বিশ্রাম-প্রিয়। সময়ের দাম এরা ইংরেজ আমেরিকানদের মতো বোঝে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দেয়। তা ব'লে এরা বড় কম খাটে না। পারীর যারা আসল অধিবাসী খুব খাট্‌তে পারে ব'লে তাদের সুনাম আছে। মেয়েরা গল্প কর্‌বার সময়েও জামা সেলাই কর্‌ছে, সৌখিন জামা। জামা কাপড়ের সখটা ফরাসীদের অসম্ভবরকম বেশী, বিশেষ করে ফরাসী মেয়েদের ও শিশুদের, পুরুষরা কতকটা বেপরোয়া। তাদের প্রধান সম্পদ তাদের জাঁদরেলী গোঁফ্‌, তাদের সেই ব্রহ্মাস্ত্রটিতে শান দেবার দিকে তাদের যত নজর তত নজর তাদের স্নান-না-করা গাত্রের দিকে নেই। সুগন্ধি শিল্প পারীকে আশ্রয় কর্‌বার কারণ নাকি এই। হাঁ—পারীর লোক খুব খাট্‌তে পারে বটে, খুব ভোরে উঠে খাট্‌তে আরম্ভ ক'রে দেয়, অনেক

রাত অবধি খাটে, কিন্তু পানাহারটা সেই অনুপাতে ঘটা ক'রেই করে। এরা ব্রেক্‌ফাষ্ট্‌ বেশি খায় না, লাঞ্চ্‌টা ইংলণ্ডের তুলনায় বেশি খায়, আর ডিনারটা ইংলণ্ডের তুলনায় রাত ক'রে খায়। আহার সম্বন্ধে এদের মোগ্‌লাই রুচি, গোপালের মতো যাহা পায় তাহা খায় না, রন্ধনশিল্প ইউরোপের কোথাও থাকে ত পারীতে। এত রকমের খাদ্য এত সস্তায় কেন অনেক দাম দিয়েও লণ্ডনে পাবার যো নেই। দুনিয়ার সব দেশের খানার এরা সমঝ্‌দার, সেই জন্যে যে কোনো রেস্তরাঁয় সব দেশের খাদ্যের একটা না একটা নমুনা পাওয়া যাবেই। সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে পারীতে অত্যল্প খরচে অনেকখানি তৃপ্তির সহিত খেতে পারা যায়। রান্নাটা উঁচু দরের তো বটেই, রান্নাটা টাট্‌কা। লণ্ডনের রেস্তরাঁগুলোর অধিকাংশ হচ্ছে কয়েকটা কোম্পানীর হাতে, এক একটা কোম্পানীর এক একশোটা রেস্তরাঁ, একশোটার রান্না একই কেন্দ্রে হয়, প্রত্যেক শাখায় কেবল ঐ জিনিষ গরম ক'রে পরিবেশন করা হয় মাত্র। এ সত্বেও লণ্ডনের খাদ্য সস্তা নয়, কারণ লণ্ডনের খাদ্যবস্তু পারীর তুলনায় মহার্ঘ। শাক্‌শব্‌জী ও মাংসের জন্যে ইংলণ্ড্‌ অন্যদেশের মুখাপেক্ষী, ফ্রান্স্‌ তেমন নয়।

এ তো গেল আহারতত্ত্ব। ফরাসী পাননিপুণও বটে। যে কোনো রেস্তরাঁয় গেলে ভোজ্য তালিকার সঙ্গে সঙ্গে একটা পানীয় তালিকাও দেয়। ও-রসে বঞ্চিত ব'লে খাঁটি খবর দিতে পার্‌ব না, কিন্তু সে জন্যে অপদস্থ হয়েছি পদে পদে। এ কেমন মানুষ যে "ভ্যাঁ" খায় না?—এই ভেবে ওরা হাঁ ক'রে তাকায়। আমি মনে করেছিলুম ইংরেজরাই ভারি মদ খায়, কেনন লণ্ডনের অলিতে গলিতে "পাব্লিক বার"। ও হরি! পারীর গলিতে গলিতে যে, একটা নয় দুটো নয় পঞ্চাশটা কাফে! লণ্ডনে কাফে নেই, লণ্ডনের রেস্তরাঁ-সংখ্যা পারীর তুলনায় আঙুলে গোণা যায়।

এই কাফে জিনিষটি ফরাসী সভ্যতার একটা অঙ্গ। ফ্রান্সের আধুনিক ইতিহাস তার কাফেগুলিতেই তৈরি হয়েছে, ইংলণ্ডের ইতিহাস যেমন তৈরি হয়েছে তার ইস্কুলগুলির প্লেগ্রাউণ্ডে। পঞ্চাঙ্ক নাটকের মতো যতগুলি বিপ্লবের অভিনয় পারীতেহয়ে গেছে সকলগুলির রিহার্সাল্‌ হয়েছিল কাফেগুলিতে, কাফেই হচ্ছে ফরাসীদের চণ্ডীমণ্ডপ, ফরাসীদের ক্লাব্‌। কাফেতে গিয়ে এক পেয়ালা কাফী বা শোকোলা "(chocolat") বা হাল্‌কা মদের ফরমাস ক'রে যতক্ষণ খুসী ব'সে আড্ডা দাও—দু' ঘণ্টা তিন ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা! তাস খেলো, দাবা খেলো, গান বাজনা শোনো, কাগজ পড়ো, চিঠি লেখো, ছাত্র হয়ে থাকোতো পড়া করো। কাফেতে একবার গিয়ে বস্‌লে আর উঠ্‌তে ইচ্ছা করে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চল্‌তে থাকে ইয়ার্কি দেওয়া, ফ্লার্ট্‌ করা, একটু আধটু নেশার ধর্‌লে রঙ্গকৌতুক থেকে মাথা ফাটাফাটি পর্য্যন্ত উদারা মুদারা তারা। ওরি মধ্যে একটু স্থান ক'রে নিয়ে একটু আধটু নাচও স্থল বিশেষে হয়। অনেক তপস্বীর তপস্যা আর অনেক কুঁড়ের কুঁড়েমী দুই একসঙ্গে চল্‌তে থাকে যখন, তখন এ কথা বিশ্বাস হয় না যে এদের কেউ কোনোদিন জগৎকে ধন্য ক'রে দেবে চিন্তাবৈশিষ্টে, অবাক ক'রে দেবে কর্ম্মনেতৃত্বে, মুগ্ধ ক'রে দেবে অভিনেত্রীরূপে। তখন এই কথা মনে হয় যে এদের যেমন খাটুনির সীমা নেই তেমনি কুঁড়েমীরও সীমা নেই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল মজ্‌লিসী রসিকতা আর মজ্‌লিসী আদবকায়দা আর মজ্‌লিসী সুরাপান।

এই একটা মস্ত জিনিষ যে কাফে ভয়ানক সস্তা। দু' চার আনা খরচ ক'রে দু' ঘণ্টা এক স্থানে বসা ও প্রাণ খুলে গল্প করা—লণ্ডনে এমন সুযোগ নেই। আমাদের দেশে চায়ের দোকানগুলোতে তর্কসভা বসে—সেই গুলোই আমাদের ভাবী যুগের কাফে। তাই থেকে আমাদের ভাবী সাহিত্যিকদের উদ্ভব হবে, ভাবী রাষ্ট্রনেতাদের অভ্যুত্থান ঘট্‌বে। ব্যয়সাধ্য ক্লাব যে আমাদের মাটীতে শিকড় গেড়ে আমাদের বট অশ্বত্থের মতো দীর্ঘজীবী হবে এমন আমার মনে হয় না। ঐ চায়ের আড্ডাগুলোর সঙ্গে একটা ক'রে পাঠাগার জুড়ে দিলে ঐগুলোই হবে জনসাধারণের বিশ্রাম, আমোদ ও শিক্ষার স্থান।

কাফের মতো পাতিসেরীগুলোতেও আড্ডা বসে। পাতিসেরী মানে কেক্‌ রুটীর দোকান, ওখানে গিয়ে কেক্‌ কিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে পারা যায়। অনেক পাতি-

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

সেরিতে চা-কাফী খাবার জন্তে একটু ঠাঁই ক'রে দেওয়া হয়, সেই সুযোগে গল্প জমে, তর্ক ওঠে, আলাপ পরিচয় হয়, দেশের মানুষ দেশের মানুষকে চিন্‌তে চিন্‌তে দেশকে চেনে, বিদেশের মানুষকে চিন্‌তে চিন্‌তে বিদেশকে চেনে। ফরাসীরা ইংরাজদের মতো নীরব প্রকৃতি নয়, গম্ভীর প্রকৃতি নয়; ওরা ভদ্রতার খাতিরে আবহাওয়া সম্বন্ধে দু'একটা তুচ্ছ প্রশ্ন ক'রে চুপ করে না, ওরা বকে আর বকায়।

পারীর লোক জন্ম-রসিক। আমোদের জন্তে এমন অকৃপণ ব্যবস্থা কুত্রাপি নেই। অবশ্য আমোদ মাত্রেই বিশুদ্ধ নিষ্পাপ হরিনাম জপ করা নয়, বরং বহুক্ষেত্রে পঙ্কিল। পথে ঘাটে জুয়োর আড্ডা। এ আপদ লণ্ডনে নেই। পথে ঘাটে নাগরদোলা প্রভৃতি শিশুসুলভকৌতুক, যেন রাস্তার মোড়ে "King Carnival"। খেলাধূলোর রেওয়াজ ইংলণ্ডের মতো নেই। ইংলণ্ডে মাঠে মাঠে ফুটবল খেলা, টেনিস খেলা, সাঁতার। ইংরাজেরা-জন্ম খেলোয়াড়। স্বাস্থ্যচর্চ্চাটাকেইওরা চরম ব'লে জেনেছে। ঐখানে ওদের জিৎ।

পারীতে অন্ততঃ বিশটি উঁচুদরের থিয়েটার আছে। এছাড়া সিনেমা, "কাবারে" (cabaret) ও সঙ্গীতশালাও আছে অগুন্‌তি। "কাবারে"গুলি পারীর বিশেষত্ব, লণ্ডনে নেই, লণ্ডনে প্রবর্ত্তন কর্‌বার প্রস্তাব অনেকে কর্‌ছেন। এর সঙ্গেও ফরাসী ইতিহাসের যোগ আছে, কেননা এতে যেসব নাচ তামাসা হয় সে সব অনেক সময় পলিটিক্যাল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। সঙ্গীতশালা পর্য্যায়ভুক্ত এমন সব রঙ্গালয় আছে যেখানে কেবল দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখানো হয়, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার সম্বন্ধ নেই, এবং দৃশ্যের সঙ্গে বাদ্য আছে, কিন্তু কথা নেই। একে বলে "revue", এ জিনিষ লণ্ডনেও প্রবর্ত্তিত হয়েছে, কিন্তু এ জিনিষ produce কর্‌তে অনেক টাকা অনেক বুদ্ধি ও অনেকখানি "নির্লজ্জতা" দরকার। এ সকলের সমন্বয় লণ্ডনে দুর্লভ, লণ্ডনের লোক এক নম্বরের শুচিবায়ুগ্রস্ত। পারীর লোক বিবসনা স্ত্রী মূর্ত্তি দেখে "Shocked" হবে, এমন কচি খোকা নয়। তারা অতি অল্প বয়স থেকে পারীর দশ বারোটা মিউজিয়ামে গ্রীক ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখে চোখকে শিক্ষিত ও চিত্তকে নির্ব্বিক্ষেপ করেছে; তারা রুশো ভল্‌টেয়ার ও জোলা-ফ্লোবেয়ারের রচনা প'ড়ে সুনীতি দুর্নীতি ও সুরুচি কুরুচির হিসাব নিকাশ ক'রে রেখেছে; তারা আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যের নাগরিক,—স্ত্যাকামী বা নাসিকা সীট্‌কারকে তারা উচ্চাঙ্গের মরালিটী বলে না; তারা সুন্দরের সমঝদার, মানবদেহকেও সুন্দর ব'লে জানে। "মুলাঁ্যা রুজ্" বা "ফোলী বের্‌জেয়ারে" অর্দ্ধ-বিবসনাদের নির্ণিমেষনেত্রে নিরীক্ষণ ক'রে "shocked" হ'তে পিউরিটান ইংলণ্ডের বা পিউরিটান নিউ ইংলণ্ডের টুরিষ্ট্‌রা দলে দলে যান, আসল ফরাসীরা যায় কি না সন্দেহ; যদি বা যায় নৃত্যনৈপুণ্য বা সজ্জানৈপুণ্য খুঁটিয়ে বিচার কর্‌বার মতো শিক্ষা নিয়ে যায়, কেবল একজোড়া কৌতূহলী চক্ষু ও একটা শুচিবায়ুগ্রস্ত মন নিয়ে যায় না। পারীর বহুসংখ্যক প্রমোদাগার বিদেশীদের জন্যই অভিপ্রেত এবং তাদেরি দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত। মার্কিনের টাকার লোভে মার্কিনের বৈশ্যসুলভ স্থূল রুচির ফরমাস তারা খাট্‌ছে। এই আভিজাত্যহীন পঙ্করস-বোধ এই চর্চ্চা-অবসরহীন পল্লবগ্রাহী সম্‌ঝ্‌দারী এই অবিশ্রান্ত অফুরন্ত থ্রিল্ (thrill)—পিপাসা ফরাসী কাল্‌চারকে ডলারের গোলা মেরে উড়িয়ে দিতে বসেছে, এর আক্রমণে ফরাসীদের বিশুদ্ধ আর্ট হয়তো আর বেশি দিন টিঁক্‌বে না, ফরাসী সভ্যতার সরস্বতী অবশেষে বাঈজীর মতো সস্তা গান শুনিয়ে ও সস্তা নাচ নেচে সরাব পান ক'রে নাসিকাধ্বনি কর্‌বেন। ফরাসী জাতিটার অমেয় vitality'র ওপরে আমার অটল আস্থা আছে ব'লেই যা' আশা হয় চতুর্দ্দশ লুই ও প্রথম নাপোলেঅঁর দেশ এই নতুন আঘাতকেও যথাকালে কাটিয়ে উঠ্‌বে, এই বিষকেও পরিপাক কর্‌বে নীলকণ্ঠের মতো।

কোনো একটা বিদেশী পৃষ্ঠপোষিত সঙ্গীতালয়ের রস-নিরপেক্ষ উলঙ্গ বিভঙ্গ ও বারম্বার মানুষের একই মোটা তারটাতে অধীর অঙ্গুলিক্ষেপ আমাকে মর্ম্মপীড়িত করেছিল ব'লে অতকথা বল্‌তে হলো। কেউ যেন না মনে করেন যে এরূপ অরসিক আমোদ ফরাসীদের ধাত-সহ। ফরাসীরা নীতি বিষয়ে ঢিলে হতে পারে, কিন্তু রুচি বিষয়ে খুঁৎখুঁতে। রোদ্যাঁর মূর্ত্তিগুলো দেখ্‌লে আমাদের নীতিনিপুণেরা তাড়া ক'রে আস্‌তেন এবং স্বাস্থ্যরক্ষকেরা মাথায় হাত দিয়ে বস্‌তেন; Venus de Milo'র আব্রু নেই এই এক অপরাধে

সে-বেচারিকে বয়কট্ করা হতো এবং "চিত্রাঙ্গদা"র সঙ্গে অর্জ্জুনের বিবাহ কেন দেননি ব'লে যাঁরা কবির কাছে কৈফিয়ৎ তলব করেছিলেন সে সব সাধুসজ্জন তাঁদের স্ত্রী-কন্যার হাতে দেবার মতো নয় ব'লে আনাতোল ফ্রাঁসের রচনাগুলোকে কন্কের আগুনে পুড়িয়ে হুঁকো টান্‌তেন।

ফরাসীরা একটা আত্মবিপরীত জাতি, তাদের ধাতটা এক্সট্রিমিষ্ট্, তারা দু'দল চরমপন্থীর সমন্বয়:—গোঁড়া ক্যাথলিক আর গোঁড়া যুক্তিবাদী। যারা মানে তারা সমস্ত মানে, ঈশ্বর সয়তান স্বর্গ নরক যীশু যীশুর কুমারী-মাতা পোপ্ কন্‌ফেসন প্রতিমা কর্ম্মকাণ্ড। যারা মানেনা তারা কিছু মানেনা, তারা জ্ঞানমার্গের নাইহিলিষ্ট, তারা বদ্ধ cynic, তারা পাঁড় Epicure, জাতটা অতিমাত্রায় শক্তের ভক্ত অথচ নৈরাজ্যবাদী। বাঙালী জাতটার সঙ্গে এবিষয়ে এদের মিল আছে—যেমন ইমোশনাল তেমনি নাস্তিক; যারা মানে তারা মন দিয়ে মানেনা, হৃদয় দিয়ে মানে;—যারে মানেনা তারা মন দিয়ে উড়িয়ে দেয় হৃদয় দিয়ে পারে না। নইলে আনাতোল ফ্রাঁসের মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টি পুরুষ কখনো গত মহাযুদ্ধের মতো নির্ব্বোধ একটা ব্যাপারের তলা পর্য্যন্ত দেখেও সস্তা পেট্রিয়টিজ্‌মের ঢাক পিটুতে যান?

গোঁড়া ধার্ম্মিক হোক গোঁড়া অধার্ম্মিক হোক রসবোধ জিনিষটা এদের জাতিগত, ও জিনিষ এরা খ্রীষ্টধর্ম্মের মতো বাইরে থেকে পায়নি ব'লে ও নিয়ে এরা ঝগ্‌ড়া করে না। Venus de Milor উলঙ্গ সৌন্দর্য্য এরা পিতাপুত্রে মিলে দেখে এবং পিতাপুত্রে মিলে আলোচনা করে। উলঙ্গতা নিয়ে তর্ক বাধে না, ওটা চোখ-সওয়া হয়ে গেছে, ওটা স্বাভাবিক, ওটা উভয়পক্ষই আবশ্যক ব'লে ধ'রে নিয়েছে, তর্ক বাধে সৌন্দর্য্য নিয়ে। রোদাঁর যে সব মূর্ত্তি আমি "বিচিত্রা"তে ছাপতে দিলে পাঠকপাঠিকাদের মূর্চ্ছা যাবার ভয়ে সম্পাদক মহাশয় ছাপতে অস্বীকার করবেন সে সব মূর্ত্তিকে ফরাসীরা সহজভাবে গ্রহণ ক'রে আর্টের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করে, আমাদের মতো পুরীর মন্দিরের বীভৎস মূর্ত্তিগুলোকে পর্য্যন্ত সশ্রদ্ধ symbolismএর দ্বারা ঢেকে নিজেদের বিচারশক্তিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে না। এক কথায় বল্‌তে গেলে আর্টের বিষয়কে এরা নীতির বিষয় থেকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখ্‌তে শিখেছে ব'লে সাহিত্য সমালোচনায় বা পুরাণ আলোচনায় দু'টোকে ঘুলিয়ে এক ক'রে দেয় না। এদের কাল্‌চার বিশ্লেষণমূলক, (analytic) আমাদের কাল্‌চার সংশ্লেষণমূলক (synthetic), আমরা পলিটিক্সে ধর্ম্ম খুঁজি, টিকিতে ইলেক্‌ট্রিসিটী খুঁজি আর এদের দার্শনিকেরা War Minister হয়, এদের যেস্যুইট্ বাবাজীরা পাকা ব্যবসাদার হয়। কিন্তু এ কথা বোধহয় সমগ্র ইউরোপীয় কাল্‌চার সম্বন্ধে খাটে, কেবল ফরাসী কাল্‌চার সম্বন্ধে নয়, যদিও ফরাসী কাল্‌চার সম্বন্ধে কিছু বেশি ও ইংরেজ কাল্‌চার সম্বন্ধে কিছু কম। এই প্রসঙ্গে বল্লে অবান্তর হবে না যে, দক্ষিণ ইউরোপের সঙ্গে উত্তর ইউরোপের এইখানে একটু তফাৎ আছে—ফরাসী ইতালীয় গ্রীক প্রভৃতি জাতিরা দেহকে প্রগাঢ় ভালোবাসে ও ভক্তি করে, সহজিয়াদের মতো দেহের মধ্যে তত্ত্ব খুঁজে পায়, এরা প্রতিমাপূজক জাতি, এদের দেবতারা সশরীরী, এদের শিল্পীরা যখন মাতৃমূর্ত্তি আঁকে তখন স্তনের ওপরে বস্ত্র টেনে দেয় না, যখন বালক যীশু আঁকে তখন খামখা কৌপীন পরিয়ে দেয় না, বাস্তবকে স্বীকার ক'রে নিয়ে তার ওপরে এরা সৃষ্টি খাড়া করে, মাতৃমূর্ত্তির চোখে সুধা মাখিয়ে দেয়, শিশুমূর্ত্তির মুখে তৃপ্তি ফুটিয়ে তোলে। উত্তর ইউরোপের লোক প্রোটেষ্টাণ্ট্, গোঁড়া নিরাকারবাদী, ওদের চিত্রকলা একান্ত দরিদ্র, ভাস্কর্য্যের বালাই ওদের নেই। ওরা মুসলমান, এরা হিন্দু। ওদের তেজ বেশি, এদের লাবণ্য বেশি।

এখন বলি পারীর থিয়েটারগুলির কথা। প্রথমতঃ পারীর থিয়েটারগুলি অসম্ভব সস্তা, দ্বিতীয়তঃ তাদের production অসম্ভব জাঁকালো। লণ্ডনে যত খরচ ক'রে যে-দরের সাজসজ্জা বা যে-দরের অভিনয় দেখ্‌তে পাওয়া যায় পারীতে তার সিকিভাগ খরচ ক'রেও তার চারগুণ ভালো সাজসজ্জা চারগুণ ভালো অভিনয় দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এর একটা কারণ এই যে, ফরাসীরা ভালো জিনিষের কদর বোঝে, দলে দলে দেখ্‌তে যায়, প্রত্যেকে অল্প অল্প দিলেও সবশুদ্ধ অনেক টাকা ওঠে, ফলে productionএর খরচ পুষিয়ে যায়। এছাড়া গবর্ণমেণ্ট্ও থিয়েটারওয়ালাদের

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

অর্থসাহায্য করে, যদিও সাহায্যস্বরূপ ডান হাতে যা দেয় ট্যাক্স স্বরূপ বাঁ হাতে তা' ফিরিয়ে নেয় ব'লে থিয়েটারওয়ালাদের আক্ষেপ। তবু এটা তো অস্বীকার করা যায় না যে, গবর্ণমেণ্ট্ ডান হাতে যা দেয় ওটা মূলধনের কাজ করে ও ঐ থেকে উচ্চাঙ্গের productionএর গোড়াকার খরচ জোটে।

পারীর থিয়েটারগুলোর জাতিবিভাগ আছে, যেটাতে অপেরা হয় সেটাতে কেবল অপেরাই হয়, যেটাতে কমেডী হয় সেটাতে কেবল কমেডীই হয়, যেটাতে ক্লাসিক (গ্রীক নাটকের অভিনয়) হয় সেটাতে কেবল ক্লাসিকই হয়। লণ্ডনে কোন স্থায়ী অপেরা-গৃহ নেই এবং জাতিবিভাগ নেই। "Old vic"এ Shakespeare ও অপেরা দুই-ই করে বটে, এবং এ ছাড়া অন্য কিছু সচরাচর করে না বটে, কিন্তু তাদের অপেরা অত্যন্ত খেলো। একটা স্থায়ী অপেরার স্কীম্ চলেছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এক পেনীও সাহায্য করবে না, এবং জনসাধারণও যথা-প্রয়োজন শেয়ার কিনবে কি না সন্দেহ। সুতরাং যতদূর দেখ্ছি লণ্ডনের ভাগ্যে আছে ভ্রাম্যমান অপেরার দলগুলির মধ্যে মধ্যে শুভাগমন। তাদের মধ্যে যেগুলি খাঁটি ব্রিটিশ্ সেগুলি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পায় না ব'লেই হোক কিম্বা জনসাধারণের ঔদাসিন্য বশতঃই হোক্ কণ্টিনেণ্টাল দলগুলির কাছে মাথা তুল্তে পারে না। কণ্টিনেণ্টাল দলগুলিতে অনেক দেশের শিল্পীরা যোগ দেয়, তাদের পেছনে অনেক দেশের টাকার জোর। পারীর যেটী স্থায়ী অপেরাগৃহ সেটি পৃথিবীর বৃহত্তম রঙ্গালয়, তার পেছনে সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে, তার সাজসজ্জা বহুকালাগত, তার নট নটীরা সমাজে বিশিষ্ট সম্মান পায়, তাতে তাদের গবর্ণমেণ্ট্ অনেক টাকা ঢালে ও সেটি তাদের জাতীয় সম্পত্তি *। অথচ তার সীট্গুলি যথেষ্ট সস্তা। পারীর দরিদ্রতম শ্রমিকও তার নিম্নতম শ্রেণীর দাম জোটাতে পারে, ধনী দরিদ্র সকলেরই জন্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা মহার্ঘ বেশভূষা প'রে মহৈশ্বর্য্যময় ষ্টেজে অবতীর্ণ হয়। লণ্ডনে তেমন ষ্টেজ বা তেমন সজ্জা নেই, শুধু সেই অভিনয় যদি কালেভদ্রে দেখ্তে পাওয়া যায় তো সেজন্যে অত্যন্ত উচ্চ হারে দাম দিতে হয়। পারীর অন্যান্য থিয়েটারগুলোরও production খুব চমকপ্রদ, অথচ সীট্ আরো সস্তা; চার আনা দিয়ে তিন ঘণ্টা আমোদ উপভোগ করতে পারা যায়, তবে এটা ঠিক লণ্ডনের সীটের আরাম পারীর সীটে নেই, লণ্ডনের লোক গদীপাতা চেয়ার ছেড়ে কাঠের বেঞ্চিতে ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে বস্তে চাইবে না, যদিও গ্যালারীতে তিনঘণ্টা ধ'রে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে আপত্তি করবে না। পারীতে অনেক শ্রেণীর সীট্ আছে, অন্ততঃ দশ বারো শ্রেণীর; কিন্তু উচ্চতম থেকে নিম্নতম অবধি অল্প দামের ক্রমান্বিত ব্যবধান, চার আনার পরে ছ'আনা, ছ'আনার পরে আট আনা, এমনি ক'রে সবচেয়ে দামী সীট হয়ত চার টাকা। লণ্ডনে কিন্তু এক টাকার পরে দু'টাকা তার পরে তিন টাকা, এমনি করে সবচেয়ে দামী সীট হয়ত পনেরো টাকা। সেইজন্যে ইংরেজরা থিয়েটারের চেয়ে সিনেমাই দেখে বেশি, গরীব লোকদের সঙ্গতি নেই ব'লে তাদের রসবোধ অচরিতার্থ থেকে যায়। ইংরেজরা আর্ট্কে সর্ব্বসাধারণের হাতে দেবার মতো স্বল্পব্যয়সাধ্য করতে পারেনি, (এদিকে একমাত্র প্রচেষ্টা "Old vic"), সেইজন্যে আর্ট্ এদের কাছে গঙ্গাজলের মতো ন্যাশন্যাল নয়। আমরাও যে গ্রামের লোককে গ্রামছ'ড়া ক'রে সহরের কোণে কোণে বস্তি গড়্ছি আমাদেরও ভাবা উচিত গ্রামের যাত্রা পার্ব্বণ কথকতা থেকে ও সহরের নাট্য সঙ্গীত ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা সমগ্র দেশকে নিরানন্দ করে তুল্ছে কি না। নাগরিকতার নাগপাশে জড়িয়ে ইংলণ্ডের আত্মা যে একান্ত ক্লিষ্ট বোধ করছে ইংলণ্ডের অসামান্য স্বাস্থ্যের আড়ালে ঢাকা পড়্লেও তা সত্য। নাগরিক ইংলণ্ড প্রাণবান, কিন্তু অমৃতবান নয়; অজর কিন্তু অমর নয়। নাগরিক সভ্যতার অধমতাগুলো তিল তিল ক'রে কুড়িয়ে ভারতবর্ষ যে পরিমাণে নাগরিক হয়ে উঠ্ছে সেই পরিমাণে নিজেকে তিলাধমা ক'রে তুল্ছে।

ফরাসীদের আর একটা জাতীয় সম্পদ তাদের মিউজিয়ামগুলো। জগৎপ্রসিদ্ধ Louvre ছাড়া Luxemburg,

* ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্টে একজন Minister of Fine Arts থাকেন, ইংলণ্ডে সেরূপ নেই, ইংরেজরা সব বিষয়ের মতো private enterprise-এর পক্ষপাতী।

Trocadero, Guiemt ইত্যাদি আরো ডজন খানেক ছোট বড় মিউজিয়াম আছে পারীতে। Louvreএর ঐশ্বর্য্যের তুলনাই হয় না, তার আকার এতবড় যে সেটা একটা যাদুঘর নয় একটা যাদু-পাড়া, সমস্তটি একবার চোখ বুলিয়ে দেখ্‌তে দু'দিন লেগে যায়। আমি আমার আকৈশোর বন্ধু Venus de Miloর কাছে প্রতিদিন দু'তিন ঘণ্টা কাটাতুম, তাকে একটা স্বতন্ত্র ঘর দেওয়া হয়েছে, সে-ঘরে তার বন্ধুদের জন্যে চমৎকার বস্‌বার বন্দোবস্ত হয়েছে, সে সব আসনে ব'সে যে কোনো angle থেকে তাকে নিরীক্ষণ কর্‌তে পারা যায়, বলা বাহুল্য যে-দিক থেকেই দেখি না কেন সব দিক থেকেই সে সমান সুদর্শনা। তাজমহলকে যেমন বারবার নানা আলোকে দেখেও চির অপূর্ব্ব-মনে হয় গ্রীক ভাস্করের এই মানসী মূর্ত্তিটিকেও তেমনি। তবে আমার ভারতবর্ষীয় চোখ নিছক রূপ দেখে তৃপ্তি পায় না, এবং বিউটিফুলের অতৃপ্তির চেয়ে সাব্লাইমের তৃপ্তিই তাকে প্রগাঢ়তর রস দেয়। সেই-জন্যে "প্রজ্ঞা পারমিতা"র ওপরে তার একটা পক্ষপাত আছে, সে পক্ষপাত নিয়ে সে বিশ্বের সাম্‌নে তর্ক কর্‌তে চায় না, সেটা ভারতবর্ষীয়ের ধাতের পক্ষপাত।

আমাদের কালিদাস যে নীতিনিপুণ ছিলেন এহেন অপবাদ তাঁকে তাঁর শত্রুতেও দেবে না, আশাকরি স্বয়ং দিঙ্‌নাগাচার্য্যও দেননি। সেই শিল্পীই কি না উমাকে শেষকালে জননীরূপে না এঁকে তৃপ্তি পেলেন না। ফুলবতীর চেয়ে ফলবতী লতার প্রতি আমাদের ধাতুগত পক্ষপাত "উর্ব্বশীর" কবিকেও "কল্যাণী" লিখিয়েছে—perfection নয় পরিণতিই আমাদের প্রিয়। এবং নীতি নয় রুচিই আমাদের অন্তর্মুখীন করেছে। বিবসনা শ্যামাকে মা বল্‌তে পারি তো বিবসনা Venusকেও প্রিয়া বল্‌তে পার্‌তুম, তবু যে বলিনে এর কারণ যতই নিখুঁত হোক্‌না কেন, Venusএর পরিণতি নেই, বৃদ্ধি নেই, সে আমাদের শুধু একটা রসই দেয়, জীবনের সমস্ত রস দেয় না, তার মধ্যে আমাদের কুমারের জননীকে দেখিনে—"নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী!"

লুভ্‌র্ মিউজিয়ামে "মোনা লিসা" (লেওনার্দো দা ভিঞ্চি-কৃত)-কেও দেখ্‌লুম। তার সেই রহস্যময় হাসি মানুষের পিছু নেয়, তাকে ভোলবার সাধ্য নেই, ইচ্ছা কর্‌লেও চেষ্টা কর্‌লেও ভুল্‌তে পারিনে। লুভ্‌রে কিছু না হোক লাখ খানেক ছবি তো আছেই, পৃথিবীর সেরা শিল্পীদের আঁকা। কেমন ক'রে বল্‌ব যে তার চেয়ে কেউ সুন্দরী নয়? তখন তো মনে হচ্ছিল অনেকেই সুন্দরতরা। একে একে সকলেই মিথ্যা হয়ে গেছে, স্বপ্নদৃষ্টার মতো। প্রভাতী তারার মতো চোখে লেগে আছে সুধু "মোনালিসা"র হাসিটি।

ফরাসীরা এসব ছবি এসব মূর্ত্তি নানা উপায়ে সংগ্রহ করেছে, সব উপায় সাধুও নয়। এদের অনেকগুলি যুদ্ধ-লব্ধ। রাজ্য জয় ক'রে অনেক বিজেতা অনেক রত্নই হরণ করে কিন্তু ফরাসীরা হরণ করেছে শিল্পসম্ভার। ফরাসীদের হারিয়ে দিয়ে বিস্মার্ক অনেক কোটী স্বর্ণমুদ্রা আদায় করেছিলেন, সে সোনা এতদিনে ধূলা হয়ে গেছে, জার্ম্মানী এখন পুনর্মূষিক। কোন্ জাতি কোন জিনিষকে বেশী দামদেয় তাই নিয়েই তার ইতিহাস। ভারতবর্ষ যদি আত্মাকে সত্যিই তার সর্ব্বস্ব দিয়ে কিনে থাকে তবে ভারতবর্ষের আত্মা মর্‌বে না।

ইংলণ্ডের বৃটিশ মিউজিয়াম প্রভৃতি জাতীয় সম্পদ দেখে যা' মনে হয়ে হয়েছিল ফ্রান্সের লুভ্‌র্, ত্রোকাদেরো প্রভৃতি জাতীয় সম্পদ দেখে তাই মনে হলো—ভাব্‌লুম, ইংলণ্ডে ফ্রান্সে জন্ম নিয়ে আত্মিক সুবিধা আছে, বাল্যকাল থেকেই মিউজিয়াম দেখতে দেখতে মানুষ হবো, বিশ্বমানবের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে সৃষ্টিরহস্য ভেদ কর্‌ব, তখন যদি আর্ট ক্রিটিক হয়ে উঠি তো বাংলা মাসিকপত্রের মাসিক সাহিত্য সমালোচনা কর্‌তে গিয়ে রসবোধের শ্রাদ্ধ কর্‌ব না, চোখ পাক্‌বে কিন্তু মন পাক্‌বে না, প্রতিদিন একটু করে বড় হবো কিন্তু বুড়ো হবো না, আমার প্রাচীন দেশের পরি-পক্ক শিক্ষাকে আমার চির-তরুণ অন্তরে ধারণ কর্‌ব এবং প্রতি দেশের নিজস্ব শিক্ষাকে আমার নিজস্ব শিক্ষার মধ্যে গ্রহণ কর্‌ব।

ফরাসী জাতিটা হচ্ছে যাকে বলে cosmopolitan—এর মানে এ নয় যে ওরা বিশ্বপ্রেমিক, এর মানে ওরা বিশ্বচেতন। প্রমাণ ওদের পথঘাটের নামগুলো। পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাস ও সব দেশের ভূগোল পড়বার যাঁদের সময় নেই

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

তাঁরা কেবল পারীর মানচিত্রখানার ওপরে চোখ বুলিয়ে যান, দেখ্‌বেন রাস্তার নাম লণ্ডনের মতো প্রত্যেক পাতায় একটা করে old street, New street, High street ও Park Road নয় রাস্তার নাম Moscou, Tokio, Pekin, Constantinople, ইত্যাদি ও President wilson, Edoward Vii, Garibaldi, Hansmann ইত্যাদি। প্লাসের নাম Etatsunis (য়ুনাইটেডষ্টেট্‌স্), Italie, Europe, ইত্যাদি ও রেলষ্টেশনের নাম Genge V, st, Fanies xavier, Michel-Ange (মাইকেল এঞ্জেলো) ইত্যাদি। এছাড়া স্বদেশের মহাপুরুষ মাত্রেরই ও স্বদেশের প্রতি অংশের নাম পারীর সর্ব্বাঙ্গে বৈষ্ণবের সর্ব্বাঙ্গে অষ্টোত্তরশত নামের মতো ছাপা। ফ্রান্সের লোকের দেশাত্মজ্ঞান এমনি ক'রেই হয় বলেই তাদের দেশাত্মবোধ আপনা আপনি জন্মায়। শৈশব থেকেই তারা পথে চল্‌তে চল্‌তে চেনে তাদের জাতীয় পূর্ব্বপুরুষদের—যাদের নিয়ে তাদের ইতিহাস লেখা হয়েছে; আর তাদের দেশের প্রতি জেলার প্রতি শহরের প্রতি নদীর প্রতি পর্ব্বতের নাম—যাদের কোলে তাদের অখণ্ড জাতি লালিত হয়েছে। স্বদেশকে চেনে বলেই তারা স্ববিশ্বকেও চিনিতে পারে।

(ক্রমশঃ)
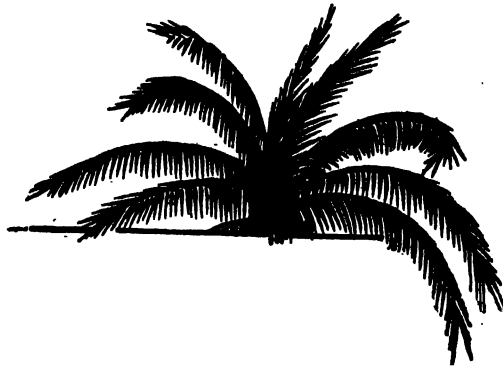
কুটীরবাসী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার কুটীরের
সমুখবাটে
পল্লিরমণীরা
চলেছে হাটে।
উড়েছে রাঙা ধূলি, উঠেছে হাসি,-
উদাসী বিবাগীর চলার বাঁশি
আঁধারে আলোকেতে
সকালে সাঁঝে
পথের বাতাসের
বুকেতে বাজে॥

কুটীরবাসী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যা-কিছু আসে যায়
মাটির পরে
পরশ লাগে তারি
তোমার ঘরে।
ঘাসের কাঁপা লাগে, পাতার দোলা,
শরতে কাশ বনে তুফান-তোলা,
প্রভাতে মধুপের
গুন্‌-গুনানি,
নিশীথে ঝিঁঝিঁ-রবে
জাল-বুনানি ॥

দেখেচি ভোরবেলা
ফিরিছ একা,
পথের ধারে পাও
কিসের দেখা।
সহজে সুখী তুমি জানে তা কেবা,
ফুলের গাছে তব স্নেহের সেবা,
এ কথা কারো মনে
র'বে কি কালি,
মাটির পরে গেলে
হৃদয় ঢালি? ॥

দিনের পরে দিন
যে-দান আনে
তোমার মন তা'রে
দেখিতে জানে।
নম্র তুমি তাই সরল-চিতে
সবার কাছে কিছু পেরেছ নিতে,—
উচ্চ পানে সদা
মেলিয়া আঁখি
নিজেরে পলে পলে
দাওনি ফাঁকি ॥

চাওনি জিনে নিতে
হৃদয় কারো,
নিজের মন তাই
দিতে যে পারো।
তোমার ঘরে আসে পথিক জন,
চাহেনা জ্ঞান তারা, চাহেনা ধন,
এটুকু বুঝে যায়
কেমন ধারা
তোমারি আসনের
সরিক তা'রা॥

তোমার কুটীরের
পুকুর পাড়ে
ফুলের চারাগুলি
যতনে বাড়ে।
তোমারো কথা নাই, তারাও বোবা,
কোমল কিশলয়ে সরল শোভা।
শ্রদ্ধা দাও, তবু
মুখ না খোলে,
সহজে বোঝা যায়
নীরব ব'লে॥

তোমারি মতো তব
কুটীর খানি
স্নিগ্ধ ছায়া তা'র
বলে না বাণী।
তাহার শিয়রেতে তালের গাছে
বিরল পাতা ক'টি আলোয় নাচে,
সমুখে খোলা মাঠ
করিছে ধূ ধূ,
দাঁড়ায়ে দূরে দূরে
খেজুর শুধু॥

কুটীরবাসী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার বাসাখানি
আঁটিয়া মুঠি
চাহেনা আঁকড়িতে
কালের ঝুঁটি।
দেখি যে পথিকের মতোই তাকে,
থাকা ও না-থাকার সীমায় থাকে ;
ফুলের মতো ও যে,
পাতার মতো,
যখন যাবে, রেখে
যাবেনা ক্ষত ॥

নাইকো রেষারেষি
পথে ও ঘরে,
তাহারা মেশামেশি
সহজে করে।
কীর্ত্তিজালে ঘেরা আমি তো ভাবি—
তোমার ঘরে ছিল আমারো দাবী ;
হারায়ে ফেলেছি সে
ঘূর্ণিবায়ে
অনেক কাজে, আর
অনেক দায়ে ॥

নব-বৃন্দাবন

—গল্প—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

কর্ণপুর সংসার ছাড়িয়া বৃন্দাবন যাইতেছিলেন।

সংসারে তাঁহার কেহই ছিলনা। স্ত্রী পাঁচ ছয় বৎসর মারা গিয়াছে, একটি দশ বৎসরের পুত্র ছিল, সেও গত শরৎকালে শারদীয় পূজার অষ্টমীর দিনে হঠাৎ বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করিয়াছে। সংসারের অন্য বন্ধন কিছুই নাই। বিষয় সম্পত্তি যাহা ছিল, সেগুলি সব জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের দিয়া অত্যন্ত পুরাতন তালপত্রের কয়েকখানি ভক্তি-গ্রন্থ জীর্ণ তসরের পুঁটুলিতে বাঁধিয়া লইয়া কর্ণপুর পদব্রজে বৃন্দাবন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কর্ণপুরের জন্মপল্লী অজয় নদের ধারে। তিনি পরম বৈষ্ণব বংশের সন্তান। অজয়ের জলের গৈরিকে, দুই তীরের বনতুলসীর মঞ্জরীর ঘ্রাণে কোন্ শৈশবেই তাঁর বৈষ্ণব ধর্ম্মে মানসিক দীক্ষা হয়। তিনি গ্রামের টোলে উত্তমরূপে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। দুই একটি ছাত্রকে কিছুকাল স্মৃতি ও বৈদ্যকশাস্ত্রও পড়াইয়াছিলেন। ছাত্রেরা দেখিত তাহাদের অধ্যাপক মাঝে মাঝে ঘরে দুয়ার বন্ধ করিয়া সমস্ত দিন কাঁদেন। পাগল বলিয়া অখ্যাতি রটাতে ছাত্রেরা ছাড়িয়া গেল—প্রতিবেশীরা তাচ্ছিল্য করিতে সুরু করিল, তাহার উপর প্রথমে স্ত্রী তৎপরে পুত্রের মৃত্যু। সংসারের উপর কর্ণপুর নিতান্তই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

যাইবার সময় জ্ঞাতি ভ্রাতা রসরাজ আসিয়া মায়াকান্না কাঁদিল, গ্রামের এক ব্রাহ্মণ বহুদিন ধরিয়া কর্ণপুরের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহার পর হইতেই সে তাঁহাকে ব্যাঘ্রজ্ঞানে শত হস্ত দূরে রাখিয়া চলিয়া আসিতেছিল। আজ যখন সে দেখিল কর্ণপুর সত্য সত্যই বাহির হইয়া যাইতেছেন, ফিরিবার কোন আশঙ্কা নাই, তখন সে আসিয়া মহা পীড়াপীড়ি সুরু করিল—আর কয়েকটা মাস থাকুন, যে করিয়া পারি ঋণটা শোধ করিয়া ফেলি, কারণ ঋণ পাপ—ইত্যাদি। উদারচিত্ত কর্ণপুর এসব কপট প্রবন্ধ বুঝিলেন না। তিনি রসরাজকে তাহার প্রার্থনা মত তাল-দিঘীর পাড়ের আশুধান্যের এক টুকরা উৎকৃষ্ট ভূমি দানপত্র করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ অধমর্ণকে বলিলেন, এক কড়া কড়ি আন ভায়া, গ্রহণ করিয়া তোমায় ঋণ মুক্ত করি।

আপনার বলিতে কেহ না থাকায় গ্রাম ছাড়িয়া যাইবার সময় তাঁহার জন্য সত্যিকার ভাবনা কেহই ভাবিল না। শৈশব-স্মৃতির প্রথম দিনটী হইতে পরিচিত মাটির চণ্ডী-মণ্ডপ, স্বহস্ত-রোপিত কত ফল ফুলের গাছ, কত খেলাধূলার জন্মভিটার আঙ্গিনা পিছনে ফেলিয়া চলিলেন, ফিরিয়াও চাহিলেন না, শুধু গ্রাম-সীমায় অজয়ের ধারে গিয়া কর্ণপুর একটুখানি দাঁড়াইলেন। অজয়ের ধারে প্রাচীন শিরীষ গাছের তলে গ্রামের শ্মশান, কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি মাতৃহীন বালক পুত্রটিকে এইখানে দাহ করিয়া গিয়াছেন। অজয় আর বাড়ে নাই সুতরাং সে চিতার চিহ্ন এখনও একেবারে বিলীন হয় নাই। তার কচিমুখের অবোধ হাসিটুকু মনে পড়িয়া গেল, মৃত্যুর পূর্ব্বে শ্বাসকষ্টে বড় যন্ত্রণা পাইয়াছিল, সে সময়কার তার আতঙ্কে-আকুল অসহায় দৃষ্টি মনে পড়িল,—কর্ণপুর অবাক্ হইয়া অজয়ের ওপারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। ধু ধু গৈরিক বালুরাশির শয্যায় জীর্ণশীর্ণ নদ অবসন্ন দেহ প্রসারিত করিয়া দিয়াছে, উপরে এখানে ওখানে এক আধটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দিক্-হারা মেঘ-শিশু আকাশের কোন্ কোণ হইতে বাহির হইয়া তখনই আবার সুদূর অনন্তের পথে কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে, কোথাও কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতেছে না। ক্ষণিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। পৃষ্ঠের পুঁটুলিতে কয়েকখানি বস্ত্র সামান্য কিছু তণ্ডুল ও অন্যান্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, দক্ষিণ হস্তে মাধবীলতার আঁকা-বাঁকা একগাছি দৃঢ়

নব-বৃন্দাবন

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

যষ্টি, বাম হস্তে একটি পিতলের ঘটি মাত্র লইয়া অজয় পার হইয়া কর্ণপুর পশ্চিম মুখে যাত্রা করিলেন। জীবনে যাহা কিছু প্রিয়, যাহা কিছু পরিচিত ছিল সবই এপারে রহিয়া গেল।

দিনের পর দিন তিনি অবিশ্রান্ত পথ চলিতে লাগিলেন। এক এক দিন সন্ধ্যার সময় কোনো গ্রামের চটীতে, নয় তো কোন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে, আশ্রয় লইতেন। গ্রামপথে চলিবার সময় লোকে আদর করিয়া গৃহত্যাগী সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণের পুঁটুলি ভরিয়া খাদ্যদ্রব্য দিত, পিতলের ঘটিটা পূর্ণ করিয়া নির্জ্জলা খাঁটি দুগ্ধ দিত; তিনি কোনো দিন তাহার সামান্য অংশ খাইতেন, কোনো দিন কোন দরিদ্র পথযাত্রী ভিক্ষুক বা কোন বুভুক্ষু গ্রাম্য কুকুরকে খাওয়াইতেন। কত গ্রাম, হাট, মাঠ, কত সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যের গঞ্জ কত নদী উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে যাইতে অবশেষে তিনি বসতি-বিরল খুব বড় বড় নির্জ্জন মাঠ ও বনজঙ্গলের পথে আসিয়া পড়িলেন। চিরকাল নিতান্ত ঘরোয়া ধরণের গৃহস্থ, বিদেশে কখনই বাহির হন নাই, সূর্য্য ডুবিয়া যাওয়ার পরই দিগন্তবিস্তৃত জনহীন প্রান্তরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত; কর্ণপুর একস্থানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে লোকালয়ের অন্বেষণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন—লোকালয় মিলিত না, তাঁহার মনে অত্যন্ত ভয় হইত যদি কোনো বন্যজন্তু বা কোনো দস্যু আসিয়া আক্রমণ করে। পরক্ষণেই ভাবিতেন আমি তো সন্ন্যাসী মানুষ, দস্যুতে আমার কি কাড়িয়া লইবে? অজয়ের ধারের বৃদ্ধ শিরীষ বৃক্ষতলে এক ধূসর হেমন্তসন্ধ্যার কথা মনে পড়িলেই অমনি কর্ণপুরের মন হইতে বন্যজন্তুর ভয় দূর হইত। বনের পথে চলিতে চলিতে অন্য খাদ্য মিলিত না, কোনো দিন বুনো কুল, মহুয়া ফুল, কোনো দিন বা ছোট তাল চারার নবোদ্গত পত্রকোরক খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন; অঞ্জলি পুরিয়া পার্ব্বত্য নদীর জলধারা পান করিতেন; মাঝে মাঝে আবার গ্রামও পাইতেন।

সন্ধ্যার সময় সেদিন তিনি একটি তালবনে আশ্রয় লইলেন। নিকটে লোকালয় নাই, পাথুরে মাটিতে অভ্রকণিকা চিক্‌চিক্ করিতেছে, একটু পরে তালবনের পিছনে সূর্য্য ডুবিয়া গেল, সন্ধ্যার আকাশে পঞ্চমীর এক ফালি চাঁদ।

সেদিন পথে এক বৃদ্ধ ভিক্ষুকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হইয়াছিল, তিন চার মাস পূর্ব্বে জীবিকার চেষ্টায় বাড়ীর বাহির হইয়া কিছু উপার্জ্জন করিয়া সেদিন সে বাড়ী ফিরিতেছে। বাড়ীতে তার ছোট ছোট দুটী মেয়ে ও একটী ছেলে আছে, তাদের মুখের দিকে চাহিয়া সে প্রবাসের কোনো কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করে নাই। ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলির মধ্যে রাঙা রাঙা পাথরের চুড়ি, নূতন ধরণের পাখীর রঙিন পালক, নানা তুচ্ছ জিনিষ সযত্নে বাঁধিয়া লইয়া চলিয়াছে বাড়ীতে ছেলে মেয়েদের খেল্‌না করিতে। কর্ণপুরের মনে হইয়াছিল সেদিন—দূর, মূর্খ সংসারাসক্ত জীব। আজ কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনে জাগিল ঐ ভিক্ষুকটা সুখী তাঁর চেয়ে। সে তো তবুও কতদিন পরে গৃহে ফিরিয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাঁহার গৃহ কোথায়? পরক্ষণেই দুর্ব্বলতাটুকু বুঝিয়া ফেলিয়া অপ্রতিভ হইয়া ভাবিলেন, ভগবান দয়া করিয়াই সংসারের ভার তাঁহার স্কন্ধ হইতে নামাইয়া লইয়াছেন। ভালই তো, ইহাতে মন খারাপ করিবার কি আছে?

তাহার পর বসিয়া বসিয়া তিনি তাঁহার প্রিয় একটী শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তালবনের মাথায় পঞ্চমীর চাঁদের দিকে চাহিয়া বার বার গাঢ়স্বরে শ্লোকটী আবৃত্তি করিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিতেছিল। রাত্রির পাতলা জ্যোৎস্নায় মাঠের নির্জ্জনতায় শ্লোকের পদলালিত্যে তাঁহার মনে কি একটা অব্যক্ত ব্যথা যেন ক্রমেই মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। সেটাকে চাপা দিবার জন্য তিনি বসিয়া ইষ্টদেবতার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইষ্ট দেবের মূর্ত্তি কল্পনা করিতে গিয়া কর্ণপুরের মনে হইল, ঐ অনন্ত আকাশের মত উদার প্রাণ, ঐ জ্যোৎস্নার মত অনাবিল, চারিধারের প্রান্তর বনের মত শান্ত, তাঁর শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্লোকের ললিত শব্দের মত তাঁর বাণী মধুর, শ্যামায়মান বনভূমির মতই তাঁর স্নিগ্ধ কান্তি—কিন্তু তাঁহার মুখটি কল্পনা করিতে গিয়া কেমন করিয়া কর্ণপুর বার বার তাঁহার মৃতপুত্রের মুখটিই ভাবিতে লাগিলেন। তাহাকে দাহ করিবার সময় হইতে কর্ণপুর সে মুখটি কখনই ভোলেন নাই, মনে কেমন আঁটিয়া ছিল। এই মুখ ছাড়া অন্য কোনো মুখ তাঁহার ভাল লাগে না। নিজের কাছে সম্পূর্ণ ভাবে স্বীকার না করিতে

চাহিলেও কর্ণপুরের মনের গোপন কোণে এ কথা জাগিতেছিল, ইষ্টদেব যদি তাঁর পুত্রের রূপ ধরিয়া দেখা দেন, তবে না সুখ? যদি কখনও দেখা পান, তবে যেন পুত্রের সেইরূপেই পান।

শেষ রাতের স্বপ্নে কর্ণপুর দেখিলেন জ্যোৎস্না দিয়া গড়া দেহ তাঁরই ছেলেটি আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছে। তাঁর মৃত পুত্রের মুখটি খুব সুশ্রী ছিল, তবুও তাহার মুখের যেখানে যাহা কিছু ছোটখাটো খুঁৎ ছিল সেই সুন্দর অতি প্রিয় খুঁৎগুলি ঠিক সে ভাবেই আছে। বাম ভুরুর উপরে শান্ত শিষ্টতার জয়তিলকটি এখনও তো বিলীন হয় নাই, সেই রকম পাগলের হাসি। আস্তে আস্তে সে তাঁর কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি ডাক দিল—বাবা। অনেকদিন-হারা পুত্রকে ক্ষুধার্ত্ত ব্যগ্র দুই হাতে জড়াইয়া ধরিতে গিয়া কর্ণপুরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলেন সকাল তো হইয়াছেই, তালবনের মাথায় রৌদ্রও উঠিয়া গিয়াছে।

সকালে উঠিয়া তিনি পুনরায় পথ চলিতে সুরু করিলেন। পথে কয়েকখানা গ্রাম পাইলেও কোথাও বিলম্ব করিলেন না। সারাদিন পথ চলিবার পরে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে দূর হইতে একটা ছোটোখাটো গ্রাম দেখা গেল। অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় সম্মুখে লোকালয় দেখিয়া কর্ণপুরের মনে বড় স্বস্তি বোধ হইল। আশ্রয়-স্থান সন্ধানে তিনি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রামপ্রান্তের প্রথম দুই চারি খানা বাড়ী ছাড়াইয়া গ্রামের ভিতর অল্পদূর অগ্রসর হইতে হইতেই গ্রামের দৃশ্য যেন কর্ণপুরের কাছে কেমন কেমন ঠেকিল। কোনো গৃহস্থ বাড়ীতেই কোন সাড়াশব্দ নাই, কোনো বাড়ী হইতেই রন্ধনের ধূম উঠিতেছে না, পথে পথিকের যাতায়াত নাই, জনপ্রাণী কোন দিকে চোখে পড়ে না। অধিকাংশ গৃহস্থ বাটীরই বাহির দরজা খোলা—খোলা দরজা দিয়া চাহিলে বাটীর ভিতর একখানা কাপড় পর্য্যন্ত দেখা যায় না। কিছু আশ্চর্য্য বোধ হইলেও সারাদিনের পথশ্রমে কর্ণপুর এত ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে অতশত ভাবিবার বুঝিবার বা ব্যাপার কি অনুসন্ধান করিবার অবস্থা তাঁহার ছিল না। তিনি সম্মুখের এক গৃহস্থ বাড়ীর বাহিরের ঘরে গিয়া উঠিলেন ও মোট পুঁটলি নামাইয়া বিশ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। দণ্ড দুই কাটিয়া গেল অথচ বাড়ীর ভিতর হইতে কোন মনুষ্যকণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণে আসিল না। সম্মুখের পথ দিয়া এই দুই দণ্ডের মধ্যে মানুষ তো দূরের কথা, একটা গৃহপালিত পশুকে পর্য্যন্ত যাইতে দেখিলেন না। ততক্ষণ তিনি অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন, ভাবিলেন এই বাড়ীটার মধ্যেই ঢুকিয়া দেখা যাউক লোকজনেরা কি করিতেছে।

বাড়ীর মধ্যে পায়ে পায়ে ঢুকিয়া যাহা তাঁহার চোখে পড়িল তাহাতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, ঘরের মধ্যে দুই তিনটি মৃত দেহ পাশাপাশি পড়িয়া আছে, মৃত্যু অনেকক্ষণ পূর্ব্বে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পাশের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে গিয়া দেখিলেন গৃহতলে একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ শয্যার উপর পড়িয়া আছে—মৃতদেহের পাশে একটা অনিন্দ্য সুন্দর গৌরবর্ণ শিশু খল্‌বল্ করিয়া শয্যায় বেড়াইতেছে ও ঘরের দাওয়া হইতে ঝুলিয়া পড়া একগাছি মাকড়সার জালের অগ্রভাগে দোদুল্যমান একটা মাকড়সার দিকে হাত বাড়াইয়া ধরিতে যাইতেছে এবং আপন মনে হাসিতেছে।

ভাবগতিকে কর্ণপুর অনুমান করিলেন কোনো ভীষণ মহামারীর আবির্ভাবে দুই-এক দিনের মধ্যে গ্রাম জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরে মৃতদেহ রাশি হইয়া আছে, সৎকারের মানুষ নাই, দেখিবার মানুষ নাই, হয়তো যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া গিয়াছে।

কর্ণপুরকে দেখিয়া শিশু একগাল হাসিয়া হাত বাড়াইল। তাহার মা যে খুব বেশীক্ষণ মারা যায় নাই, ইহা দুইটা বিষয়ে তাঁহার অনুমান হইল। প্রথমতঃ, এই ক্ষুদ্র শিশুটি ক্ষুৎপিপাসাক্রান্ত হইয়া পড়িলে এতক্ষণ এরূপ হাসিত না, কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও তাহার মা জীবিতাবস্থায় তাহাকে স্তন্য পান করাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মৃতদেহের এতটুকু বিকৃতি হয় নাই, শিশুর মা যেন এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আসন্ন মৃত্যু ও ঘনীভূত বিপদের সম্মুখে পড়িয়াও অবোধ শিশুর এই নিশ্চিন্ত হাসি ও ক্রীড়া দেখিয়া কর্ণপুরের মনে

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হইল বাল্যকালে অজয়ের তীরের বনে তিনি এক প্রকার পতঙ্গকে লক্ষ্য করিতেন সূর্য্যের আলোতে খেলা করিবার অধীর আনন্দে সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে কোথা হইতে রাশি রাশি আসিয়া জুটিত এবং ক্ষণিকক্ষণ রৌদ্রে উড়িয়া নাচিয়া খেলা করিবার পর রৌদ্র চড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-নৃত্য শেষ করিয়া মাটি ছাইয়া মরিয়া থাকিত। কর্ণপুরের মন মমতায় গলিয়া গেল, তিনি তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে উঠাইয়া লইলেন। ঘটিতে জল ছিল, বাহিরের ঘরে আসিয়া গণ্ডূষ করিয়া শিশুর মুখে ধরিতে সে আগ্রহের সহিত উপরি উপরি বহু গণ্ডূষ জল পিপাসার তাড়নায় খাইয়া ফেলিল।

তৎপরে তিনি শিশুর মাতার মুখে শুষ্ক তৃণ জ্বালাইয়া অগ্নি প্রদান করিলেন মস্তকের কাছে কর রাখিয়া বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিলেন। এইরূপে সংক্ষিপ্ত সৎকার কার্য্য শেষ করিয়া তিনি শিশুকে লইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে সে বাড়ী হইতে বাহির হইলেন।

৩

কর্ণপুর আবার পৈত্রিক ভিটাতে ফিরিয়া আসিলেন। শুধু ফিরিয়া আসা নহে, তিনি এখন পুরামাত্রায় সংসারী। জ্ঞাতি রসরাজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বিবাদ করিয়া বিষয় সম্পত্তি ও ধান্যরোপণের ভূমি কাড়িয়া লইয়াছেন, ব্রাহ্মণ অধমর্ণকে দুবেলা তাগাদা করেন। দুপুর রৌদ্রে উত্তরীয় মাথায় জড়াইয়া নিজের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ধান্য বপনের তদারক করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। বৃক্ষ-বাটিকায় স্বহস্তে বহুদিন পরে ফল ফুলের চারা রোপণ করেন।

কুড়াইয়া পাওয়া সেই শিশুটি এখন তাঁহার চক্ষের পুত্তলি। তাহাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতে পারেন না। সমস্ত সকালটা সেই বহির্ব্বাটিতে বসিয়া শিশুকে পথের লোকজন, গরু, শিবিকা-যাত্রী নববিবাহিতা দম্পতী—এই সব দেখাইয়া তাহাকে আমোদ দেন। লোকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলে কর্ণপুরের কাণ্ড দেখ, তীর্থের পথ হইতে এক বন্ধন জুটাইয়া আনিয়াছে। হৃত-সম্পত্তি রসরাজ পাড়ায় পাড়ায় বলিয়া বেড়ায়—মর্কট বৈরাগ্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে চৈতন্য মহাপ্রভু যে উক্তি করিয়াছেন তাহা কি আর মিথ্যা হইবার? হাতের কাছে দেখিয়া লও প্রমাণ! শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুলোকে কর্ণপুরের পুনরাগমনে আনন্দ প্রকাশ করেন।

কর্ণপুর এসব কথা শুনিয়াও শোনেন না। শিশু আজকাল ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা বলিতে শিখিয়াছে—তাহার মুখে আধ আধ বুলি শুনিয়া তিনি দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বের অন্তর্হিত আনন্দ আবার ফিরিয়া পান। তারও আগের কথা মনে হয়—যখন তাঁহার নব বিবাহিতা পত্নী প্রথম ঘর করিতে আসিয়াছিল। পিতামাতার বর্ত্তমানে প্রথম যৌবনের সেই সুখের দিনগুলা কত প্রভাতের বিহঙ্গ-কাকলীর সঙ্গে, কত পরিশ্রমক্লান্ত মধ্যাহ্নে প্রিয়ার হাতের অন্নব্যঞ্জনের সুঘ্রাণের সঙ্গে, অবসন্ন গ্রীষ্মদিনের শেষে উঠানের পুষ্পভারনত বাতাবী লেবু গাছটার সঙ্গে পুরাতন দিনের কত হাসি আনন্দের স্মৃতি জড়ানো আছে। তারপরে তাঁহার প্রথম পুত্রের জন্মোৎসব, স্বামীস্ত্রীতে মিলিয়া কোলের শিশুকে কেন্দ্র করিয়া কত সুখস্বর্গ গড়িয়া তোলা। আবার মনে হয় জীবনটাকে বিশবৎসর পিছু হঠাইয়া দিয়া কে আবার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করাইতেছে।

শিশুকে সামলাইয়া রাখা দায়, অনবরত হামাগুড়ি দিয়া দাওয়ার ধারে আসিতেছে—হঠাৎ একবার অত্যন্ত ধারে আসিয়া হাত পিছলাইয়া মুখ থুবড়াইয়া নীচে পড়িয়া যাইতে বসিয়াছিল—তাড়াতাড়ি আসিয়া কর্ণপুর ধরিয়া ফেলিলেন। কি একটা বিপদ ঘটিবার অজানা ভয়ে পতনোন্মুখ শিশুর অবোধ চক্ষুদুটা ডাগর হইয়া উঠিয়াছে! এ নিজের ভালও বুঝে না এই ভাবনায় তাঁহার মন এই ক্ষুদ্র পাগলের দিকে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইল।

বন্ধন এইরূপ করিয়াই জড়ায়। ক্রমে ক্রমে কয়েকবৎসর হইয়া গেল, শিশু এক্ষণে ৭।৮ বৎসরের বালক। তাহার দুষ্টামির জালায় কর্ণপুর দিনে রাত্রে একদণ্ড শান্তি পান না। এখানকার দ্রব্য ওখানে লইয়া গিয়া ফেলে, কখন কি করিয়া বসে। নিষিদ্ধ কার্য্য করিতেই তাহার আগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

বর্ষার দিনে কর্ণপুর তাহাকে ঘরের মধ্যে বসাইয়া পড়ান। পড়িতে পড়িতে সে ছুটী লইয়া অল্পক্ষণের জন্য বাইরে যায়। অনেকক্ষণ আসে না দেখিয়া কর্ণপুর দাওয়ায় আসিয়া দেখেন —বালক অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে উঠানের এ প্রান্ত হইতে

ও প্রান্তে মহা খুসির সহিত নাচিয়া বেড়াইতেছে! কর্ণপুর তিরস্কারের সুরে বলেন—ছি বাবা নীলু, দুষ্টমি করো না। উঠে এস। আদর করিয়া বালকের নাম রাখিয়াছেন নীলমণি।

বালক বর্ষণ-ধৌত সুন্দর মুখখানি উঁচু করিয়া হাসি-মুখে দাওয়ায় উঠিয়া আসে। শাসন করিতে কর্ণপুরের মন সরে না, মনে ভাবেন—কোথায় ছিল এর পাত্তা? সে সন্ধ্যা বেলা যদি উঠিয়ে না আন্‌তাম, মুখে জলের গণ্ডূষ না দিতাম—তবে? মমতায় তাঁহার মন আর্দ্র হইয়া পড়ে। মুখে তিরস্কার করিতে করিতে বালকের সিক্তকেশ মুছাইয়া শুষ্ক-বস্ত্র পরাইয়া পুনরায় পড়াইতে বসেন।

আবার অন্যমনস্ক হইলে কোন্ ফাঁকে সে বাহির হয়। কর্ণপুর পুঁথি হইতে মুখ তুলিয়া বাহিরে গিয়া দেখেন সে দুই হাত জোড় করিয়া মুখ উঁচু করিয়া খড়ের চাল হইতে পতনোন্মুখ এক বিন্দু জল ধরিবার জন্য ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। হাত ধরিয়া আবার তাহাকে ঘরের মধ্যে টানিয়া আনেন।

বালক উত্তমরূপে বুঝে বাবা তাহাকে কখনো মারিবেন না।

নিজ পুত্রের শোক কর্ণপুর ইহাকে পাইয়া ভুলিয়াছেন। কেবল এক এক দিন নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে তাহার মুখের হাসি দূরাগত করুণ সঙ্গীতের মত মনে আসে। মনের ইতিহাসে এই বালকের সে অগ্রজ, রৌদ্রভরা দ্বিপ্রহরে সে-ই আসিয়া তাহার দাবী জানায়। কর্ণপুর উঠিয়া গিয়া নিদ্রিত বালকের চুলগুলির মধ্যে আঙুল চালাইয়া দেন। মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন।

শীঘ্রই কিন্তু বালককে লইয়া তাঁহার বড় বিপদ হইল। এত বেশী এবং এত বিনা কারণে সে মিথ্যা কথা বলে যে কর্ণপুর রীতিমত বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। নানা রকমে তাহাকে মিথ্যাকথনের দোষ ও সত্যভাষণের পুরস্কার সম্বন্ধে বহু গল্প উপদেশ বলিয়াও সংশোধন করিতে পারিলেন না। তাঁহার কাছে সে অনেক কথা আজকাল লুকায়—আগে তাহা করিত না। কর্ণপুর ইহাতে মনে মনে কষ্ট পান। তাহা ছাড়া তাহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ প্রতিবেশীদের নিকট হইতে আসে। এ গাছের লেবু, ওগাছের আম ছিঁড়িয়া আনিয়াছে, অমুকের ছেলেকে মারিয়াছে। কর্ণপুর বসিয়া বসিয়া ভাবেন কোন্ বংশের ছেলে কি কুল-গত স্বভাব চরিত্র লইয়া জন্মিয়াছে কে জানে? তাঁহার আপন ছেলের বেলায় এগারো বৎসরেও কোনো অভিযোগ তাঁহাকে শুনিতে হয় নাই—কিন্তু এ বালক তাঁহাকে একি মুস্কিলে ফেলিল? ধর্ম্মভীরু সরল-স্বভাব কর্ণপুর বালকের এ সব ব্যাপারে মনে মনে বড় ব্যথিত হন। তাহার ভবিষ্যৎ কি হইবে ভাবিয়া সময় সময় ভীত হইয়া পড়েন। বাল-স্বভাব-সুলভ চপলতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে গিয়াও মনে মনে অস্বস্তি বোধ করেন; ভাবেন—উঠন্ত মূল পত্তনেই চিনা যায়—কোন্ বংশের ছেলে ঘরে আসিল, কি জানি গতিক কি দাঁড়াইবে?

অন্য সময় বসিয়া বসিয়া ভাবেন তাঁহার অবর্ত্তমানে বাল-কের ভরণ-পোষণের কি হইবে? যদি মানুষ করিয়া দিয়াও মারা যান, তাহা হইলেও একটা ব্যবস্থা এমন করিয়া যাইতে চাহেন—যাহাতে তাহার ভবিষ্যতে সাংসারিক কষ্ট না ঘটে। কোন্ জমির কি ব্যবস্থা করিবেন, কুসীদ ব্যবসায় করিলে কিরূপ উপার্জ্জন হইতে পারে ইত্যাদি চিন্তায় কর্ণপুর ব্যস্ত থাকেন।

এক এক সময় হঠাৎ যেন আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিয়া যায়। বিষয় চিন্তা!

মনে মনে ভাবেন এ সব কি আসিয়া জুটিল? সারাদিনে এক দণ্ড ইষ্ট চিন্তা করিতে পাই না, প্রৌঢ় বয়সে এ দুর্দ্দৈব মন্দ নয়।

প্রতিবেশী রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য অভিযোগ করিলেন কর্ণপুরের পালকপুত্র তাঁহার বাড়ীর ময়নাপাখীর খাঁচা খুলিয়া পাখী উড়াইয়া দিয়াছে। বালক বাড়ী আসিলে কর্ণপুর জিজ্ঞাসা করিলেন—নীলু, শুনচি তুমি নাকি ওদের পাখী উড়িয়ে দিয়ে এসেচ?

বালক বলিল—না বাবা—আমি না—

একে অপরাধ লঘু নহে, তাহার উপর তাঁহার মনে হইল এ মিথ্যা কথা বলিতেছে। কর্ণপুরের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তাহাকে খুব প্রহার করিলেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তাহার বাবা তাহাকে মারিবেন বালক ইহা ভাবে নাই— কারণ বাবার হাতে কখনো সে মার খায় নাই। তাহার চোখের সে বিস্ময় ও ভয়ের দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া কর্ণপুর তাহাকে হাত ধরিয়া দরজার কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন— যাও বাড়ী থেকে বেরোও—দূর হও—মিথ্যা কথা যে বলে তাহার স্থান নেই আমার বাড়ী—

বালকের ভরসা-হারা দৃষ্টি তাঁহাকে তীক্ষ্ণ তীরের মত বিঁধিল কিন্তু তিনি দৃঢ় হস্তে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

৪

অর্দ্ধদণ্ড পরে তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি বহির্দ্বার খুলিয়া দেখিলেন বালক সেখানে নাই। তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, কিন্তু উত্তর পাইলেন না। বাড়ীর এদিক ওদিক খুঁজিলেন—কোথাও দেখিতে পাইলেন না। নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশীদের বাড়ী খুঁজিলেন—কেহ তাহাকে দেখে নাই।

কর্ণপুর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। সন্ধ্যাকাল—বেণীদূর কোথায় গেল? তিনি নিজের হাতে রন্ধন করিতেন— বালক ভর্ৎসনা সহ্য করিয়াছে, তাহার জন্য দুই একটা সে যাহা খাইতে ভালবাসে এমন ব্যঞ্জন রন্ধন করিবার কল্পনা করিতেছিলেন—আজ রাত্রে মিষ্ট কথায় কি কি উপদেশ দিবেন ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। বালককে না পাইয়া তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তন্ন তন্ন করিয়া পাড়ার সব বাড়ী খুঁজিলেন; কেহ সন্ধান দিতে পারে না। রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র শিবানন্দ তাঁহার কাছে বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত, সে তাঁহাকে বলিল—তিনি রন্ধন করুন, সে আর একবার ভাল করিয়া সকল স্থান খুঁজিতেছে। ইতিমধ্যে যদি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া থাকে—দেখিবার জন্য বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু কোথায়? সে বাড়ী আসে নাই।

কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় শুনিলেন উঠানের পার্শ্বের গোশালার মধ্যে শিবানন্দ বার বার বালকের নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। তাড়াতাড়ি গিয়া দেখেন গোশালায় রক্ষিত তৃণরাশির উপর বালক কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল— শিবানন্দের ডাকাডাকিতে নিদ্রাজড়িত চোখে উঠিয়া ব্যাপার কি ঘুমের ঘোরে হঠাৎ না বুঝিতে পারিয়া অর্থহীন দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতেছে। কর্ণপুর তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া আনিলেন। পরে খাওয়াইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। অভিমানে বালক তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ কথা কহিল না—বহু আদরের কথা বলিয়া ও কাটোয়ার ফেণী বাতাসা কিনিয়া দিবেন অঙ্গীকার করিয়া কর্ণপুর তাহাকে প্রসন্ন করিলেন।

সেদিন রাত্রে কর্ণপুর মনে মনে ভাবিলেন—কাল্ হইতে ইহাকে একটু একটু ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিয়া শোনাইব, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে এ স্বভাবটা শোধ্‌রাইয়া যাইবে।

পরদিন হইতে তিনি তাহাকে অবসর মত নানা ভক্তি গ্রন্থ পাঠ করিয়া শোনাইতে আরম্ভ করিলেন। নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা মুখস্থ করাইয়া দিলেন, প্রতি সকালে উঠিয়া বালককে তাঁহার সম্মুখে আবৃত্তি করিতে হয়। ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা পড়িয়া শোনান। সন্ধ্যার সময় বসিয়া বালককে ডাকিয়া বলেন—ঠাণ্ডা হয়ে বোসো, একটা গল্প করি।

পরে মাধবেন্দ্রপুরীর উপাখ্যান বর্ণনা করেন।

মহাভক্ত মাধবেন্দ্রপুরী বৃন্দাবনে গিয়া শৈল পরিক্রমা করিয়া গোবিন্দকুণ্ডের বৃক্ষতলায় সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জ্জনে বসিয়া আছেন, এক গোপাল বালক এক ভাণ্ড দুগ্ধ লইয়া আসিয়া পুরীর সম্মুখে ধরিয়া বলিল, তুমি কাহারও কাছে কিছু চাওনা কেন? বোধহয় সারাদিন উপবাস আছ—এই ধর দুগ্ধ। পুরী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি করিয়া জানিলে আমি উপবাসে আছি? বালক মৃদু হাসিয়া বলিল, গ্রামের মেয়েরা জল লইতে আসিয়া তোমাকে দেখিয়া গিয়াছে, এখানে কেহ উপবাসী থাকে না; তাহারাই এই দুগ্ধভাণ্ড দিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। ভাণ্ড রহিল, গরু দুইয়া আসিয়া লইয়া যাইব।

বালক চলিয়া গেল, কিন্তু ভাণ্ড লইতে আর ফিরিল না। রাত্রিতে পুরী স্বপ্ন দেখিলেন সেই বালক আসিয়া নিকটবর্ত্তী এক বনে তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া বলিতেছে, দেখ পুরী, আমি বহুদিন হইতে এই বনের মধ্যে আছি। যবনের আক্রমণের ভয়ে আমার সেবক এইখানে আমায় ফেলিয়া

রাখিয়া পলাইয়া গিয়াছে, কেহ দেখেনা ; শীত বৃষ্টি দাবানলে বড় কষ্ট পাই, তুমি আমার একটা ব্যবস্থা কর। অনেক-দিন হইতে তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া আছি, মাধব আসিয়া কবে আমার সেবা করিবে। মাধবপুরী মঠ স্থাপন করিয়া সেখানে শ্রীগোপাল বিগ্রহ স্থাপন করিলেন।

পর বৎসর নীলাচল হইতে মলয়চন্দন আনিয়া বিগ্রহের অঙ্গে লেপন করিয়া দিবেন ভাবিয়া ঝাড়খণ্ডের পথে পুরী নীলাচল যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে রেমুনাতে আসিয়া রাত্রি বাসের জন্য তথাকার গোপীনাথ বিগ্রহের মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। তখন রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে, ঠাকু-রের ভোগের সময় উপস্থিত। কথায় কথায় পুরী মন্দিরের পূজারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপীনাথের ভোগের কি ব্যবস্থা আছে? পূজারী বলিল গোপীনাথের ভোগের জন্য অমৃতকেলি নামক ক্ষীর দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরিয়া সন্ধ্যার পর দেওয়া হয়, অমৃত সমান তাহার আস্বাদ—গোপীনাথের ক্ষীর বলিয়া তাহা প্রসিদ্ধ—অন্য কোথাও তাহা পাওয়া যায় না। কথা বলিতে বলিতে ভোগের শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পুরী মনে মনে ভাবিলেন—অযাচিতভাবে কিছু ক্ষীর প্রসাদ পাওয়া যায় না? তাহা হইলে কিরূপ আস্বাদ জানিয়া ঐরূপ ভোগ বৃন্দাবনের মঠে শ্রীগোপাল বিগ্রহের জন্য ব্যবস্থা করি। ভাবিতেই পুরীর মনে লজ্জা হইল—বিষ্ণু স্মরণ করিয়া তিনি তথা হইতে বাহির হইয়া গ্রামের হাটে আসিয়া বসিলেন।

অযাচিত-বৃত্তি পুরী বিরক্ত-উদাস
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস

রাত্রে গোপীনাথের পূজারী স্বপ্ন পান গোপীনাথ স্বয়ং তাহাকে বলিতেছেন—দেখ, এই গ্রামের হাটে এক সন্ন্যাসী বসিয়া আছে, নাম তার মাধবপুরী; তাহার জন্য একখণ্ড ভোগের ক্ষীর ধড়ার আঁচলে ঢাকা রাখিয়া দিয়াছি, আমার মায়ায় তোমরা তাহা টের পাও নাই। সে সারাদিন কিছু খায় নাই, শীঘ্র মন্দিরের দ্বার খুলিয়া ক্ষীরপাত্র লইয়া গিয়া তাহাকে দিয়া এস। পূজারী তখনই আসিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল সত্যই বিগ্রহের ধড়ার অঞ্চলে এক পাত্র ক্ষীর চাপা আছে বটে। কে এমন মহা ভাগ্যবান পুরুষ, যাহার জন্য স্বয়ং ঠাকুর ক্ষীর চুরি করিয়াছেন? ক্ষীর পাত্র লইয়া পূজারী গ্রামের হাটে আসিয়া তাঁহাকে খোঁজ করিয়া বাহির করেন। মাধবপুরী একা অন্ধকারে হাটচালাতে বসিয়া বসিয়া নাম জপ করিতেছিলেন। পূজারী তাঁহার হাতে ক্ষীরপাত্র তুলিয়া দিয়া পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, ত্রিভুবনে তোমার সমান ভাগ্যবান পুরুষ নাই; পায়ের ধূলা দাও উদ্ধার হইয়া যাই। তোমার জন্য স্বয়ং গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়াছেন।

বালক এক মনে শান্তভাবে শোনে।

৫

বারবার সে তাঁহাকে প্রশ্ন করে, বাবা, কৃষ্ণ কোথায় থাকেন? বৃন্দাবনে? প্রতিদিন এক প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া কর্ণপুর বলিল—হাঁ হাঁ থাকেন।

ইহার পর হইতেই সে সুর ধরে—বৃন্দাবন কোথায় বাবা, আমি বৃন্দাবন যাবো—

কর্ণপুর ভাবিলেন, ইহার কিছুই হইতেছে না দেখিতেছি—আমার পরিশ্রম সবই পণ্ড হইতেছে, এ কিছুই বোঝে না শুধু বাজে দুষ্টামির দিকে ঝোঁক।

বার বার তাগাদায় বালক কর্ণপুরকে বিরক্ত করিয়া তুলিল। কিছুদিন পরে দূর গ্রামের তাঁহার এক ধান্যক্ষেত্রের কার্য্য ধরাইবার জন্য কর্ণপুরের সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন হইল। পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়াছিলেন বালক যেরূপ দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া চোখে চোখে রাখাই ভাল; এক কাজে দুই কাজ হইবে। কর্ণপুর বলি-লেন—চল নীলু, আমরা বৃন্দাবন যাই।

উৎসাহে বালকের রাত্রে নিদ্রাবন্ধের উপক্রম হইল। প্রতি রাত্রে সে জিজ্ঞাসা করে যাইবার আর কয়দিন বাকী। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সেদিন রাত্রে শুইয়া সে কর্ণপুরকে বিরক্ত করিয়া তুলিল—আমি কৃষ্ণকে দেখতে যাবো বাবা! কৃষ্ণ কোথায় গরু চরান বাবা? কাল সকালে উঠে যাবো—

পরদিন শীঘ্র ধান্যক্ষেত্রে যাইবার সময় কর্ণপুর তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন ও ক্ষেত্র হইতে কিছুদূরে পথের ধারে বসাইয়া রাখিয়া বলিলেন,এখানে চুপ করে বসে থাকো—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষ্ণ এইপথে যাবেন। উঠে এদিক ওদিক গেলে কিন্তু আর দেখ্‌তে পাবে না। চুপ করে ব'সে থাকো।

সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বে ক্ষেত্রের কার্য্য শেষ করিয়া কর্ণপুর বালককে লইতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সে মহা উৎসাহে বলিল—দেখচি বাবা, এই মাত্র কৃষ্ণ গরুর পাল চরিয়ে নিয়ে ফিরে গেলেন—তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তুমি দেখ্‌তে পেলে না!

কর্ণপুর বুঝিলেন নির্ব্বোধ বালক গ্রামের রাখালদিগকে গরুর পাল লইয়া ফিরিতে দেখিয়াছে; বলিলেন—চল বাড়ী চল—আমি অনেক দেখেচি—তুমি দেখেচ তো তাহলেই ভাল।

তারপর দিন হইতে বালক প্রায়ই মাঠে বাবার সঙ্গে যায় ও পথের ধারে নির্দ্দিষ্ট স্থানটীতে বসিয়া থাকে। রোজই বাপকে অনুযোগ করে কেন বাবা এখানে সন্ধ্যার সময় থাকে না, কেন দেখে না। কোনো কোনোদিন বলে—কাল আমার দিকে চেয়ে কৃষ্ণ বল্লেন, আয় না গরু চরাবি—আমি তোমায় না জিজ্ঞাসা করে যেতে পারিনি—যাবো বাবা কাল?

প্রতিদিন এক কথা শুনিয়া কর্ণপুরের মনে খট্‌কা লাগিল। বালক যেভাবে কথাগুলা বলে তাহাতে মিথ্যা-কথা বলিতেছে বলিয়াও মনে হয় না। ব্যাপারটা কি? একদিন বালককে বলিলেন, এবার সে সময় যেন তাঁহাকে ক্ষেত্র হইতে ডাকিয়া লয়, তিনিও দেখিবেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বালক ছুটিয়া আসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, শীগ্‌গির এসো বাবা—কৃষ্ণ আস্‌চেন—

কর্ণপুর বালকের পাছু পাছু পথের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। কোথাও কেহ নাই, মাঠের ধারের নির্জ্জন পথ—কিন্তু বালক দুই হাত তুলিয়া মহা-উৎসাহে বলিল—ঐ দেখো বাবা—গরুর দল?—ঐ যে—ঐ দেখো—আস্‌চেন—

কর্ণপুর বলিলেন—কৈ কৈ?—কোনো কিছুই তাঁহার চোখে পড়িল না।

বালক বলিল, এইবার দেখেচো তো বাবা? দেখেচো কত গরু? ঐ দেখো কৃষ্ণ কেমন পোষাক প'রে।

কর্ণপুর বিস্মিত হইলেন। বালকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সে কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে উত্তেজিতভাবে জনশূন্য পথের দিকে চাহিয়া আছে। ভাবিলেন ইহা মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ নয় তো?

হঠাৎ কিন্তু সেই নির্জ্জন পথে কর্ণপুরের কানে, গেল, সত্য সত্যই যেন একদল গরুর সম্মিলিত পদশব্দ হইতেছে, যেন অদৃশ্য এক দল গরু কে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা অদৃশ্য বাঁশির তান তাঁহার সম্মুখের পথ দিয়া একটানা বাজিয়া চলিয়াছে,—খুব মৃদু বটে কিন্তু বেশ স্পষ্ট।

অপূর্ব্ব, মধুর তান! জীবনে সেরূপ কখনো তিনি শোনেন নাই।

কর্ণপুরের সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল।

বাঁশির সুর একটানা বাজিতে বাজিতে দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে আরও দূরে গিয়া আমশিফুলের বনের প্রান্তে মিলাইয়া গেল।

বালক বলিল—দেখ্‌লে বাবা? আমি বুঝি মিথ্যে কথা বলি?

কর্ণপুর চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।
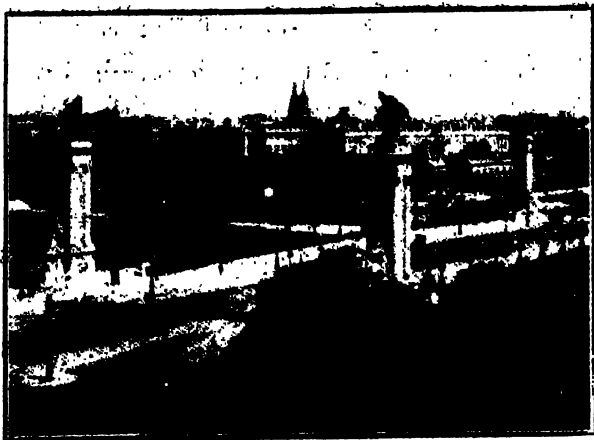
সেন নদীর একটি সেতু
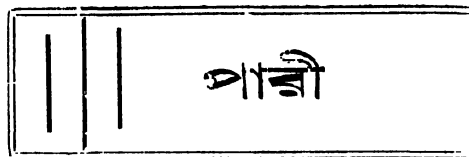
নোৎরদাম গির্জ্জা
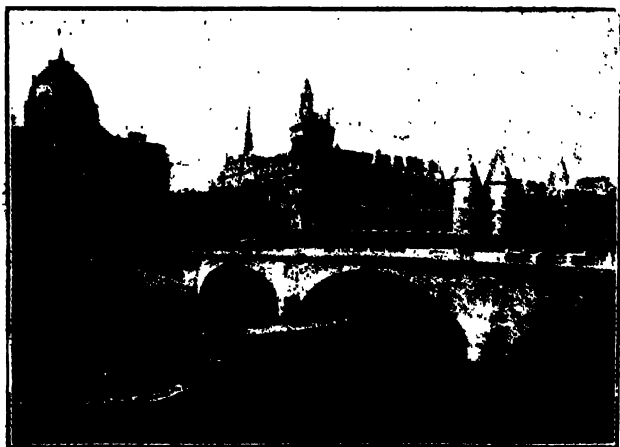
কঁ সিয়ের জেয়ারী, কারাগার
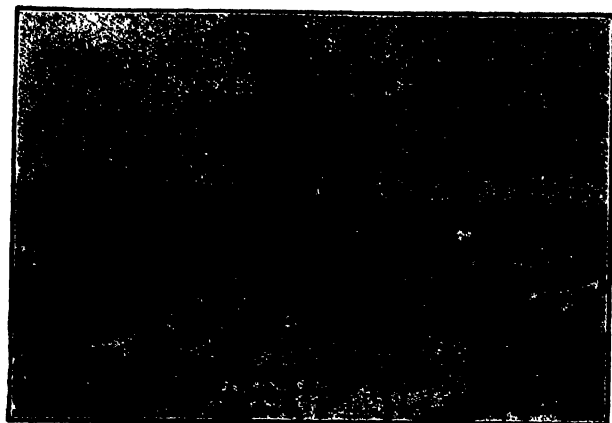
প্লাস্ দ্ লা বাস্তি ও বিপ্লব স্মারক স্তম্ভ
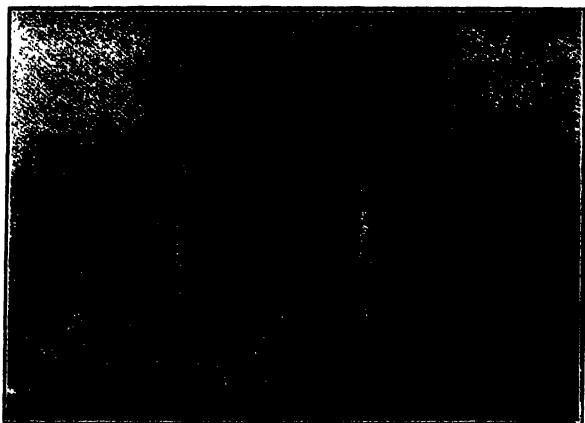
জয় তোরণ
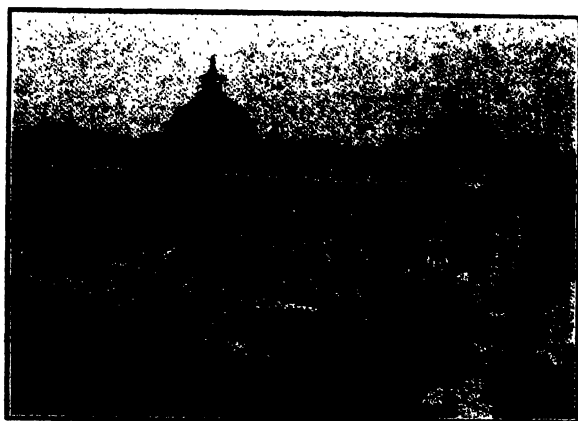
পারীর আর একটি প্রাসাদ—"পেতিপালে"
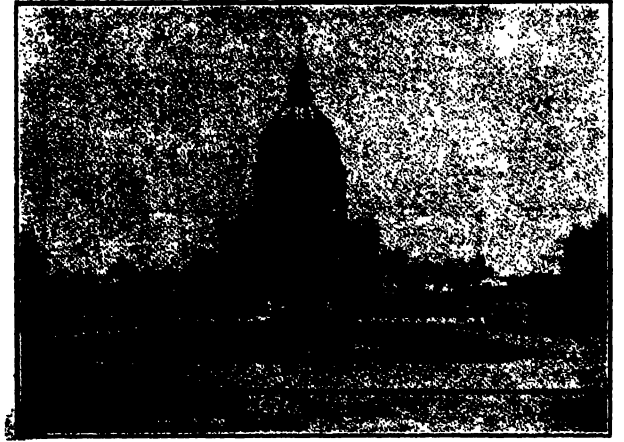
ধাঁভালিদ্ (সম্রাট নেপোলেঅঁর কবর)

ইফেল টাওয়ার

ত্রোকাদেরো মিউজিয়ম

পারী চিত্র

পারীর সবচেয়ে বড় রাস্তা "শাঁজেলিসী"
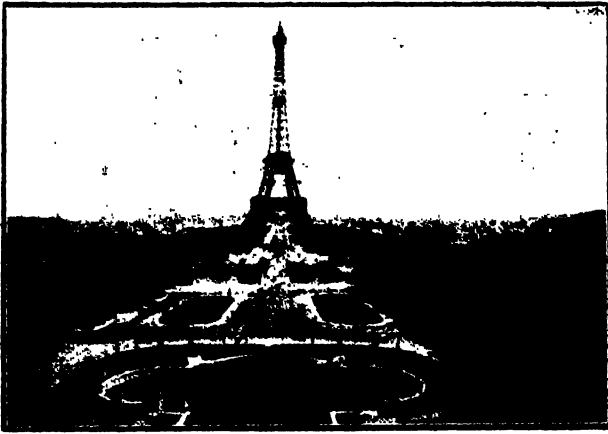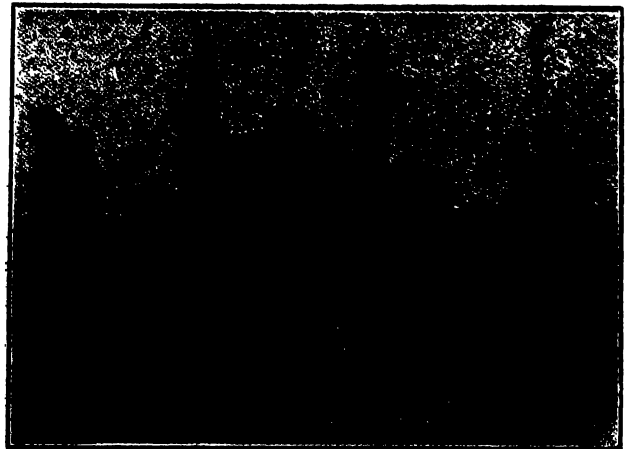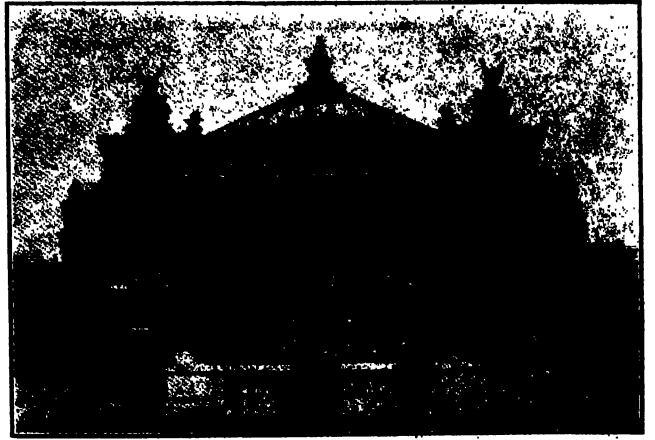
পারির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ থিয়েটার—"অপেরা"
(এইটি পৃথিবীর বৃহত্তম থিয়েটার বলিয়া কথিত)

ফরাসী পার্লামেণ্ট

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় কর্ত্তৃক
নির্ব্বাচিত ও প্রেরিত

১৪
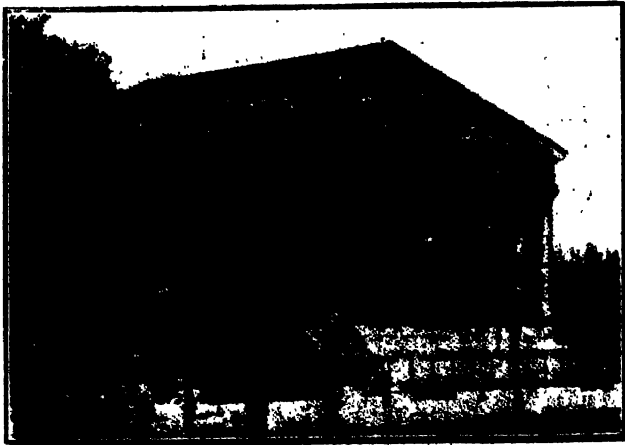
দূর-দৃষ্টির বিষয়ে যাহাই হউক, নিকটের ব্যাপারে পুরুষ যেখানে অন্ধ স্ত্রীলোক সেখানে চক্ষুষ্মতী। তাই সন্ধ্যার পর শৈলজা তাহার স্বামীকে একান্তে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ কি?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুকুমার বলিল, "বিলক্ষণ! দেখ্‌তে পাচ্ছি বৈকি।"

"কি দেখ্‌তে পাচ্ছ?"

"আপাততঃ শ্রীমতী শৈলজাসুন্দরী দেবীকে।"

হাসি দমন করিয়া গম্ভীরমুখে শৈলজা বলিল, "তা-ছাড়া?"

"তা ছাড়া মানস-চক্ষে তোমার ছোট বোন্‌টিকে।"

অল্প একটু হাসিয়া শৈলজা বলিল, "পরের বোনের উপর এত দৃষ্টি, আর নিজের বোনকে দেখ্‌তে পাওনা?"

ভ্রূকুটি করিয়া সুকুমার বলিল, "কি যে যা-তা বল তার ঠিক নেই!"

শৈলজা বলিল, "বলি ঠিকই। না দেখে থাক, একটু চোখ মেলে দেখো।"

শৈলজার কথার ভঙ্গীতে সুকুমার বুঝিল কথাটা শুধু পরিহাসই নয়, পিছনে আরও কিছু আছে; সকৌতূহলে বলিল, "কেন, শোভার কি হয়েচে?"

গম্ভীরমুখে শৈলজা বলিল, "অসুখ হয়েছে।"

"অসুখ হয়েচে? কৈ, একটু আগে ত' দেখলাম ব'সে রয়েছে, কিচ্ছু ব'ললে না?"

"এ অসুখের লক্ষণই ঐ,—ব'সে থাকে, আর কিচ্ছু বলে না। এর নাম অন্তর ব্যথা।"

সবিস্ময়ে সুকুমার বলিল, "অন্তর ব্যথা?—সে আবার কি?"

এবার শৈলজার সমস্ত মুখ নিঃশব্দ হাস্যে দীপ্ত হইয়া উঠিল; বলিল, "অন্তর ব্যথা জানো না?—

রাধার কি হ'ল অন্তর ব্যথা!
বসিয়ে বিরলে থাকয়ে একলে,
না শোনে কাহার কথা।"

কপট ক্রোধভরে সুকুমার বলিল, "বাজে বোকোনা! তোমার বোনের অন্তর ব্যথা হোক্‌।"

শৈলজা বলিল, "তা'ত বটেই। খুন করবে যদু, আর ফাঁসি যাবে মধু! নিজের বাড়ীতে অবিবাহিত বন্ধু পুষে রাখ্‌বে, আর আমার বোনের হবে অন্তর ব্যথা!"

মাথা নাড়িয়া সুকুমার বলিল, "আরে রাম, রাম! বিনয়ের বিষয়ে ও-সব কথা—না, না, সে অত্যন্ত ভালো—"

"অত্যন্ত ভালো ব'লেই ত' এর ব্যবস্থা করতে বল্‌ছি তোমাকে। শোভার দিকে একটু চাও।"

এবার সুকুমারের মুখে চিন্তার চিহ্ন ফুটিল; বলিল, "শোভা তোমাকে কিছু বলেছে না-কি?"

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

"তাও কখনো কেউ ব'লে থাকে? লক্ষণ দেখে এ-সব রোগ ধরতে হয়।"

ক্ষণকাল নীরবে অনেক কথা ভাবিয়া লইয়া সুকুমার বলিল, "কিন্তু এ কথা আমি কি ক'রে বিনয়কে বলব শৈল? সে অত্যন্ত খারাপ দেখাবে। আমাদের বাড়ী অতিথি হ'য়ে সে রয়েছে, এ অবস্থায় এ রকম একটা অনুরোধ করলে তাকে একটা বিশ্রী সঙ্কটে ফেলা হবে। তা ছাড়া, আরও একটা কথা আছে।"

"কি কথা?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সুকুমার বলিল, "সে তোমাকে পরে বলব।"

শৈলজা বলিল, "আমি সে কথা জানি। তোমার বন্ধুটি কমলা ভজন কমলা সাধন করছেন—সেই কথা তো?"

সুকুমারের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না; বলিল, "তোমার সন্ধান ত' সামান্য নয় শৈল! গিন্নীগিরি ছেড়ে গোয়েন্দাগিরি করলে দু পয়সা উপার্জ্জন করতে পারো তার সন্দেহ নেই। সে যা হোক, একথা তুমি কেমন্ ক'রে জানলে বলত?"

শৈলজা বলিল, "তোমার বন্ধুর আজকের কীর্ত্তি জাননা? চোখ বুজে ধ্যান করতে করতে শোভার মুখে কমলার চোখ এঁকে বসেছেন! বেচারী সে কথা আমাকে বল্‌তে গিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে কেঁদে ফেল্লে। অপ্রস্তুত হ'য়ে বল্‌লে চ'খে ধূলো পড়েছে। মনে মনে হেসে বললাম, তোমার চোখে ধূলো পড়েনি, আমার চোখে ধূলো দিতে চাও;—কিন্তু সে একটু শক্ত কথা।"

করুণ মুখে সুকুমার বলিল, "শক্ত কথা বৈ কি, অভিজ্ঞ ব্যক্তি কি না! হাঁা গা, তোমারো চ'খে ও-রকম ধূলো-টুলো কখনো পড়েছিল না কি?"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া শৈলজা বলিল, "পড়েছিল।"

"পড়েছিল!—কবে?"

"তোমার সঙ্গে বিয়ের কথা যে-দিন পাকা হয়েছিল, সে-দিন।"

ক্ষণকাল বিহ্বল-বিমূক থাকিয়া সুকুমার বলিল, "আনন্দাশ্রু ব'লে একটা জিনিষ আছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই!"

শৈলজা বলিল, "যেচে মান ব'লে একটা ব্যাপার আছে তা স্বীকার করতেই হবে।"

সুকুমার উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল; বলিল, "হারলাম শৈল। সন্ধির প্রস্তাব করছি।"

শৈলজা বলিল, "সন্ধি যদি করতে চাও তা হ'লে যা বল্‌লাম্ তার ব্যবস্থা কর।"

চিন্তিত মুখে সুকুমার বলিল, "কিন্তু এ যে বড় কঠিন সমস্যা! কমলার কথা যদি না জানতাম তা হ'লেও না হয়"—

অধীরভাবে শৈলজা বলিল, "ওসব কমলা-কমলার কথা ভুলে যাও!"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে সুকুমার বলিল, "আমি না হয় ভুললাম সে কথা, কিন্তু আমি ভুল্‌লে বিনয়ও যে ভুল্‌বে সে ভরসা একটুও হয় না।"

"তুমি তো আরো মনে যাতে বেশি ক'রে থাকে তার ব্যবস্থা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়েচ! বিনয় ঠাকুরপো দ্বিজনাথ বাবুর বাড়ি থাকবেন তাতে মত দিয়েছ।"

সুকুমার বলিল, "দ্বিজনাথবাবু যে-রকম ক'রে অনুরোধ করলেন তা'তে মত না দিয়ে কি করি বল? তবুও আমি বলেছিলাম যে, বিনয়ের আপত্তি না থাক্‌লে আমার অমত হবে না।"

"যে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে রয়েছে তার আপত্তির ওপর তুমি নির্ভর কর?"

"আর কোনো আপত্তি ভেবে না পেলে করি।"

"ভেবে পাওনি সে কথা ভুল,—না ভেবেই পাওনি। এখনো একটু ভাবো।"

কাতরকণ্ঠে সুকুমার বলিল, "তোমার চেয়ে আমার বুদ্ধি বেশি সে দম্ভ আমি করিনে শৈল। তুমিই একটু ভাবো। কাল সকাল আটটার সময় চীফ্ এঞ্জিনীয়ারকে দরখাস্ত দিতে হবে, আমি এখন তার পিছনে একটু লাগি"

একটু চিন্তা করিয়া শৈলজা বলিল, "সেই কথাই ভাল। তুমি বিনয় ঠাকুরপোকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও।"

সুকুমার হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। "এক্ষণি দিচ্ছি।" বলিয়া সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

বিনয় আসিয়া বলিল, "আমাকে তলব করেছেন বউদি?"

শৈলজা বলিল, "করেছি।"

"কি আদেশ, বলুন।"

"আদেশ, গুরুতর অপরাধে কিছুদিনের জন্য এ বাড়িতে আপনি বন্দী হলেন। যতদিন না ছাড়পত্র পান অন্য কোথাও যেতে পাচ্ছেন না।"

মৃদু হাসিয়া বিনয় বলিল, "দণ্ডের বিরুদ্ধে উপস্থিত প্রতিবাদ করছি নে, কিন্তু অপরাধ কি জান্‌তে পারি কি?"

শৈলজার প্রকৃতি এলোপ্যাথিক ডাক্তারের মতো,—ফোড়া পাইলে অস্ত্র না চালাইয়া সে থাকিতে পারে না, প্রলেপ লাগাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিবার ধৈর্য্য তাহার নাই; বলিল, "আপনি বুধোর মুখে উদোর চোখ এঁকেছেন।"

শৈলজার কথা শুনিয়া বিনয় হাসিয়া উঠিল; বলিল, "ওঃ এই কথা! তা আপনিও দেখেচেন না কি?"

"দেখি নি, শুনেচি।"

"কার মুখে? শোভার মুখে?"

"শোভার মুখে।"

"তা, তার জন্যে আর ভাবনা কি? বুধোর মুখ থেকে উদোর চোখ মুছে দিলেই হবে।"

কৌতুকোজ্জ্বল প্রসন্ন মুখে সহসা একটা অদ্ভুত নিবিড় ভাব ধারণ করিয়া শৈলজা বলিল, "তাই কি হয় ঠাকুরপো? মুখ থেকে চোখ মুছে দেওয়া যত সহজ, মন থেকে সব জিনিস মুছে দেওয়া কি তেমনি সহজ?"

শৈলজার এই অকস্মাৎ-পরিবর্ত্তিত ভাবে এবং অর্থ-গভীর কথায় বিনয়ের মুখ হইতে হাসি অন্তর্হিত হইল। যে ব্যাপার লইয়া কৌতুক চলিতেছিল তাহার গর্ভে এত বড় করুণতা প্রচ্ছন্ন ছিল উপলব্ধি করিয়া তাহার মুখ দিয়া বাক্য সরিল না। সে নির্ব্বাক বিহ্বলতায় শৈলজার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সহসা সময়ের যন্ত্র যেন এমন সুরে বাঁধা হইয়া গিয়াছিল যাহাতে কিছুই বেসুরা ঠেকে না। যত অদ্ভুত, যত অসাধারণ কথাই হউক, সবই বলা চলে। শৈলজা বলিল, "শোভা আপনার জন্যে পাগল ঠাকুর পো—কিন্তু আজ সে বড় ভয় পেয়েছে।"

স্বপ্নাহতের মত বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"তার ছবিতে কমলার চোখ দেখে।"

প্রশ্নোজ্জ্বল চক্ষে বিনয় একবার শৈলজার দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিল না।

শৈলজা বলিল, "সে আমাকে তার মনের কোনো কথাই খুলে বলে নি—কিন্তু আমি সব বুঝেচি। আমি যদি তাকে অত্যন্ত ভাল না বাসতাম তা হ'লে কখনই এমন ক'রে এ-সব কথা আপনাকে বলতাম না। আপনার মনে যদি কোন রকমে বেদনা দিয়ে থাকি তা হ'লে আমাকে মাপ করবেন ঠাকুর পো, কিন্তু আমি আমার একদিকের কর্ত্তব্য করলাম। এরপর একথা মনে ক'রে আমার আক্ষেপ হবে না যে শোভার জন্যে যা করা আমার অসম্ভব ছিল না, তা করিনি। আমার যা বলবার আমি বললাম, আপনার যা করবার আপনি করবেন।"

বিনয়ের মুখে একটা গভীর বেদনা ও নৈরাশ্যের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। একটু ভাবিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, "কি যে আমার করবার আছে তা আমি কিছুই জানিনে বউদি—মানুষের বুদ্ধি সময়ে সময়ে লোপ পায়। এখন আমি চললাম, পরে আপনার সঙ্গে কথা হবে।" বলিয়া বিনয় ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

(ক্রমশঃ)

অনুদ্দিষ্ট শর

বিচিত্রা

বৈশাখ, ১৩৩৫

শিল্পী—স্যর এড্উইন ল্যাণ্ড [illegible] র, এ,

রূপক কাব্য

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

১

ধোঁয়া পদার্থটা বস্তুজগতে যেমন ক্লান্তিকর, কাব্যেও তেমনি। অথচ উভয়ত্রই ও পদার্থের বিশেষ একটা উদ্দেশ্য আছে। ধোঁয়া অগ্নির অস্তিত্বের বিজ্ঞপ্তি,—ইসারায় নির্দ্দেশ। স্থানে স্থানে অবশ্য সে ধোঁয়া কুয়াশার নামান্তর, অর্থাৎ তার দেহ অগ্নি হ'তে সম্ভূত নয়, বাষ্প দ্বারা গঠিত; অন্তঃসার তার নেই—বিচারের কিরণপাতে সহজেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। কাব্যালোচনায় এই দুই বিভিন্নজাতীয় বস্তুর মর্ম্মগত প্রভেদ স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

ধোঁয়ার মূলে অগ্নি বিদ্যমান, কিন্তু অগ্নি মাত্রেই ধোঁয়ার সৃষ্টি করে না। তার তেজের অন্য বহুবিধ প্রকাশ-ভঙ্গী আছে,—যেমন উত্তাপ, দহন ও আলোক। কাব্য-অগ্নির তেজোরাশিও তেমনি বিবিধ রূপ ধারণ করে; বৈচিত্র্য তার অনন্ত। কিন্তু প্রকাশ-ভঙ্গিমার এই বৈচিত্র্যে কাব্যস্রষ্টার স্বেচ্ছাচার নেই, আছে যাথার্থ্য-বোধ। যথাযথ প্রকাশেই অনুভূতি-উপলব্ধির সার্থকতা। এক বিশেষ ধরণের ভাবোপলব্ধি আছে, যার সুস্পষ্ট প্রকাশ সম্ভবপর নয়, ধোঁয়ার ভিতর অগ্নিশিখার মত সূক্ষ্ম আবরণের আড়ালে অস্পষ্টভাবে তাকে দেখাতে হয়। তার কারণ এ নয় যে কবির নিজেরই মনে সে অনুভূতির নিবিড়তার অভাব, এবং সেইজন্য তিনি তাঁর দৃষ্টির ক্ষীণতা দুর্ব্বোধ্য কথার আবর্ত্তে ডুবিয়ে দেন। কবির নিজের কাছে স্বীয় মনোভাব স্বচ্ছ, সহজ, সুন্দর। কিন্তু ভাব ও ভাষা এই দুই বস্তুর মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান আছে। অত্যন্ত সুন্দর ব'লে আদৃত মানবদেহও যেমন মানব-মনের তুলনায় অসুন্দর, সাধারণ ভাষার একান্ত সুপরিণত গঠনও তেমনি গভীর ভাব-সৌন্দর্য্যের তুলনায় একেবারে সামঞ্জস্যহীন। ভাষার সঙ্কীর্ণ সীমায় পার্থিব বস্তুর প্রকাশ সম্ভবপর, কিন্তু এমন কিছু বস্তু যদি থাকে এ জগতের চিন্তাধারায় যা ধরা পড়ে না, তার প্রকাশের জন্য ভাষার বিশেষ কোনো রীতির বা ছাঁচের প্রয়োজন, এবং কবিকে তা' নিজের ইচ্ছানুসারে গঠন ক'রে নিতে হয়। স্বভাবতঃ এ গঠন প্রস্তর প্রতিমার মত কঠিন ও সংহত, অর্থাৎ ধরবার ছোঁবার উপযোগী হয় না,—সন্ধ্যালোকে আকাশের মেঘের মত শুধু ইঙ্গিতে ইসরায় নানা ভঙ্গিতে আপনাকে রচনা করতে থাকে। বুদ্ধির অপ্রত্যক্ষ এবং শুধু সহজবোধের (intuition) প্রত্যক্ষ কোনো অমূর্ত্ত (abstract) ভাবকে এতাদৃশ ভাষার রেখায় ও বর্ণে রূপ দিলে রূপকের সৃষ্টি হয়।

জ্ঞান ও বুদ্ধির অতীত একটা অচিন্ত্য ভাবজগৎ আছে, পৃথিবী আজন্ম একথা ভেবে এসেছে। এর থেকেই তেত্রিশ কোটি দেবতার সৃষ্টি; অনির্দ্দেশ্যকে জানবার ও জানাবার যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, তার স্থূল প্রেরণা হতে পৃথিবীর সকল প্রান্তে এই দেবতারা জন্মলাভ করেছিলেন। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষার একটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম দিক্‌ও আছে, যার ক্রম-বিকাশের সহিত মানবের ক্রমোন্নতির ইতিহাস জড়িত। মানুষ যখন বাহিরের জগৎ থেকে নিজের সমস্ত মন বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে আত্ম-নিমগ্ন হতে শিখ্‌ল, তখন তার বোধ হল, উক্ত দেবদেবীদের হাতে শুধু বজ্র নেই, বীণাও আছে। চোখে তাঁদের বিদ্যুৎ খেলে, এবং তাঁদের হৃদয় থেকে আলোর ধারা নিত্য উৎসারিত হয়। এই উপলব্ধি থেকে দুটি বস্তুর উৎপত্তি, ধর্ম্ম ও কাব্য। ক্রমশঃ বহু পরিণতির ফলে ধর্ম্ম ও কাব্য ভিন্ন দেহ লাভ করল, কিন্তু প্রাণে প্রাণে তারা সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত থেকে গেল। সেইজন্য কবি তাঁর রসানুভূতির গভীরতম মুহূর্ত্তে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা ব'লে থাকেন, এবং ঋষি সাধনার সমুচ্চস্তরে উঠে তাঁর বাণী সঙ্গীতে প্রকাশ করেন। উভয়ের দৃষ্টিভূমি পৃথক্‌, কিন্তু দৃষ্টিপথ অবশেষে একস্থানে মিশেছে। তাই এদেশের ঋষিরাই কবি; তাঁদের বাক্য রসাত্মক। বাল্মীকি, ব্যাস ও উপনিষদ-কার শ্রেষ্ঠ কাব্য-রচক। বর্ত্তমান কালে যাঁদের

mystic বলা হ'য়ে থাকে তাঁরা কবি এবং ঋষি দুইই ; এক কথায় সত্যদ্রষ্টা।

২

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আধ্যাত্মিক প্রেরণার আরম্ভ গীতাঞ্জলি অথবা নৈবেদ্য থেকে নয়,—তার বহুপূর্ব্বে রচিত 'কড়ি ও কোমলে'। শেষোক্ত কাব্যে দৈহিকতা আছে, আবার তার সহিত দেহকে অতিক্রম ক'রে মানসিক স্তরেরও উর্দ্ধে ওঠবার প্রয়াস আছে। পরবর্ত্তী কাব্যেও এই ভাব বিদ্যমান। কিন্তু এ সকল কাব্যে পূর্ণ উপলব্ধির অভাব। পথের সন্ধান আছে, প্রাপ্তি নেই। এর অস্পষ্টতা ধোঁয়ার অস্পষ্টতা নয়,—কুয়াশার। ক্রমে প্রতিভার বিকাশের সহিত রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্মজগতের সঙ্গে এমন নিবিড় প্রাণের যোগ অনুভব করেছেন, যাতে তাঁর মনোজগতের অন্ধকার একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে, এবং সকল বস্তুর আসল রূপ অনাবৃত হয়ে উঠেছে। কল্পরাজ্যের আকাশ বাতাস তখন তাঁর মানসচক্ষে এ পৃথিবীর বস্তুপুঞ্জের মতই স্পষ্টত প্রত্যক্ষ। বোধশক্তির মধ্যাহ্নসূর্য্যের মত দীপ্তি তৎকালে কবির মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে ভাবরাশি উদ্ভাসিত ক'রে দিয়েছে ভাষার পূর্ব্বব্যবহৃত ভঙ্গিমায় তা আর প্রকাশ করা যায় না। কবি ইয়েট্‌স্ লিখেছেন, "A symbol is indeed the only possible expression of some invisible essence, a transparent lamp about a spiritual flame." রবীন্দ্র নাথের কাব্যও অতঃপর স্বতঃই রূপকের আকার ধারণ করেছে। সোনার তরী কবিতাটী এর ভূমিকা, এবং গীতাঞ্জলিতে এর সুন্দর পরিণতি। ছোট ছোট রূপকের সমষ্টিতেই গীতাঞ্জলি-পর্য্যায়ের কাব্যগুলির সৃষ্টি।

ক্রমবিকাশের এই ধারা গীতাঞ্জলির পরেও বহমান। একটা শুধু পার্থক্য আছে। গীতাঞ্জলির কবি তাঁর ভাব যেন গৈরিক বসনে আবৃত ক'রে প্রকাশ করেছেন। সে ভাবের বক্ষে কণ্ঠে বাহুতে কোথাও অলঙ্কার নেই।

'অলঙ্কার যে মাঝে প'ড়ে
মিলনেতে আড়াল করে—'

ক্রমশঃ গৈরিকের উপর রক্তের ছোপ লাগে। অলঙ্কারের মৃদুমধুর ধ্বনি শোনা যায়। মিলনের মাধুর্য্য এতে কিন্তু হ্রাস পায় না,—শুধু মনোভাবের একটী তারের সুর যেন আর একটীর সহিত সংযুক্ত হয়।

'একটি একটি ক'রে আমার পুরানো তার খোলো,
সেতারখানি, সেতারখানি নূতন বেঁধে তোলো—'

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-মানসী কবির চিত্ত বার বার নূতন নূতন সুরে বেঁধেছেন, আরম্ভের তাঁর অন্ত নেই, অথচ সকল নূতন সুরেই পুরাতনের একটা স্মৃতি জড়িত। প্রতি কাব্য-পর্য্যায়ের জন্মে যেন "জননান্তর সৌহৃদানি" বিদ্যমান।

৩

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই পূর্ব্ব স্মৃতির পরিণাম অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক, যেহেতু এর প্রভাবশত তাঁর রচিত শত শত রূপকের প্রায় সবগুলিই একই উপলব্ধির বিভিন্নরূপে প্রকাশ। একই মানুষ বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়াবস্থায় বিভিন্ন দেখায়। তেমনি যে সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী তরুণ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রথম জন্মলাভ করেছেন, বহুবিধ রূপে, বিবিধ নামে বার বার আত্মপ্রকাশ করাতে তাঁকে প্রতিবারই বিভিন্ন ব'লে প্রতীয়মান হয়। বাহিরের স্বল্পাধিক পরিবর্ত্তনের প্রতি দৃষ্টিপাত না করলে এই আপাতবিভিন্নের মধ্যে ঐক্যের একটী অন্তঃসলিলা প্রবাহ লক্ষিত হবে। যা বিভেদ ব'লে মনে হয় তা আসলে শুধু পরিণতি ; চতুর্দ্দশী যেমন ষোড়শী হলে, ষোড়শী অষ্টাদশী হলে নূতন পুষ্টি, বর্ণসম্পাত, চল্‌বার বল্‌বার হাস্‌বার বিশেষভাবে নূতন একটা ভঙ্গী পেয়ে থাকে। আইরিশ্ কবি জগতের চঞ্চল পরিবর্ত্তন লীলায় চিরসুন্দরের সাক্ষাৎ পেয়েছেন— Eternal Beauty wandering on her way। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীও পথচারিণী ; 'মানসী' থেকে 'বিচিত্রা' পর্য্যন্ত তাঁর গতি ; কবির অনুভূতির বিচিত্রতা তাঁকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ দিয়েছে। এক সময়ে—

"বীণা ফেলে দিয়ে এস মানস সুন্দরী,
দুটি রিক্ত হস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভ'রি
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও—"

(মানসী)

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

অন্য এক মুহূর্ত্তে—

তোরা শুনিস্ নি, শুনিস্ নি তার পায়ের ধ্বনি,
সে যে আসে, আসে, আসে—

অথবা—

আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।
সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া

(পূরবী)

'চিত্রার' রূপক ও 'বিচিত্রার' রূপকের একত্র পাঠে পরিণতির এই গভীর ধারাটী স্পষ্টই বোঝা যায়।

চিত্রায়—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্র-রূপিণী !
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল-চরণে
তুমি চঞ্চল-গামিনী—

বিচিত্রায়—

জীবন ধারা অকূলে ছোটে,
দুঃখে সুখে তুফান ওঠে,
আমারে নিয়ে দিয়েছ তাহে খেয়া,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
কালো গগনে ডেকেছে ঘন দেয়া।

*　　*　　*　　*

বুকের শিরা ছিন্ন ক'রে
ভীষণ পূজা করেছি তোরে,
কখনো পূজা শোভন শতদলে,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
হাসিতে কভু, কখনো আঁখিজলে।

'চিত্রা'র চাঞ্চল্য গভীর হ'তে গভীরতর অনুভূতির ভিতর দিয়ে 'বিচিত্রা'র শান্ত-করুণ ধ্যানমৌনতায় এসে পৌঁছেছে। 'চিত্রা' যেন প্রভাত-সূর্য্যের আনন্দদীপ্তি; 'বিচিত্রা' সায়াহ্নের আলোছায়ার মিশ্রণে জীবনের একটী নিরাসক্ত বিকারহীন প্রকাশ। নারী যখন কিশোরী থাকে তার মনের বর্ণ 'চিত্রার' অনুরূপ; যখন সে মা হয়, তার দেহ মনে 'বিচিত্রার' ছায়া পড়ে। নারী-মনের সঙ্গে কবি-মনের বিশেষ একটী মিল আছে, কারণ উভয়েই স্রষ্টা; এবং এ সৃষ্টিকার্য্যে উভয়েরই ভয় ও আনন্দ আছে। নারী যখন আপনার সমস্ত সত্তায় অজাত সন্তানের ঈষৎ পদধ্বনি শুনতে পায়, অজানিতের দারুণ ভয়ে সে পিছিয়ে আসতে চায়। কিন্তু তার এগিয়ে চলা শুধু শরীরধর্ম্ম নয়, মনও তার আশঙ্কায় অথচ আগ্রহে, ধীরে দুরু দুরু অগ্রসর হ'তে থাকে। তেমনি বিশ্বের দুর্ভেদ্য রহস্য-যবনিকার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে কবির মনেও বিভীষিকা আসে; যা অজানা, রূপ যার রেখা ও রঙের ভিতর বন্দী করা যায় না, কল্পনা ও ভাবানুভূতির দ্বারা অস্পষ্ট ছায়ার মত দেখা যায়, এবং শুধু গভীর সাধনার দ্বারাই স্পষ্টতর ভাবে মনের দৃষ্টিপথে আনা যায়, সে বস্তুর উপলব্ধির প্রয়াস স্বভাবতঃ আশঙ্কাময়। এ ভয় অবশ্য একটা সরল অনুভূতি নয়, কারণ দেহে তার লতাতন্তুর মত আনন্দ জড়িত। যে অদৃশ্য শক্তির অদম্য আকর্ষণ কবি ও নারী উভয়কে মহাবেগে ভয়ের ভীষণ গহ্বরে টেনে নিয়ে চলে, তার নাম প্রাণশক্তি, এবং সৃষ্টির বাসনা তার একটা বন্ধন। প্রাণের এই আহ্বান কবিকে পূর্ণতার সন্ধানোন্মুখ করে; তাই—

'বুকের শিরা ছিন্ন ক'রে
ভীষণ পূজা করেছি তোরে,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,—

এখানে 'অযুত আলোকে' নেই; হাসির সহিত অশ্রু আছে। কবির মানসী এস্থানে যেন প্রত্যক্ষতর, এবং তাঁর প্রভাব সম্বন্ধে কবি যেন সমধিক সচেতন। 'চিত্রা'য় সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর যে রূপ চিত্রিত হয়েছে তার একমাত্র স্বাভাবিক বিকাশ 'বিচিত্রা'য়।

৪

পূর্ব্বোক্ত রূপকদ্বয় একই প্রাণবস্তুর প্রকাশ, কিন্তু তাদের প্রকৃতি বিভিন্ন। প্রথমটীতে ধ্বনি ও বর্ণের প্রাধান্য আছে, রেখা দেখাই যায় না। নীলাকাশে আলোকলীলায়,

ফুলে ফুলে বর্ণমাধুর্য্যে একটা উচ্ছ্বাসের হাওয়ার ভিতর 'চিত্রা'র সৃষ্টি। দ্বিতীয়টাতে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য নেই, আছে শুধু রেখার টান্। নদীস্রোতের মত জীবনধারা বহমান, সে স্রোতে ক্ষণে ক্ষণে তুফান নামে, মাঝে খেয়াতরী; আর স্বতঃই মনে হয় যেন এ সকলের উপর অদৃশ্যভাবে 'বিচিত্রা' তার দিগন্তব্যাপী দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে। বাহুল্যবর্জ্জিত রেখাচিত্র, সাদা ভূমিকায় কালো রেখা, উদাস, একান্ত-সংযত ভাব।

রূপকের দুটী বিভিন্ন প্রকারের সন্ধান এখানে পাওয়া যায়। অনুভূতি-দ্যোতক এবং ভাব-ব্যঞ্জক। —ইংরাজীতে emotional symbol এবং intellectual symbol বলা চলে। অনুভূতি-রূপক মনে শুধু অনুভূতি জাগায়, তার মধ্যে হৃদয় আছে মস্তিষ্ক নেই। ভাব-রূপক মনে ভাব বা আইডিয়া আনে। তবে অনুভূতি বস্তুটা বিশুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু আইডিয়া প্রায়ই একটা মিশ্রণ; চিন্তা-ধারার সহিত তৎসংক্রান্ত অনুভূতি ওর মধ্যে থাকা সম্ভবপর। ভাবহীন অনুভূতি যত সাধারণ, অনুভূতিবিহীন ভাব তেমন নয়।

কোনও একটা কথার প্রকৃতি মূলত তার ব্যবহার-ভঙ্গিমার উপর নির্ভর করে। রূপক সম্বন্ধেও এই একই কথা। রক্তকরবী কথাটা সাধারণ কবিতায় পাঠ করলে মনে শুধু অনুভূতি আসে; সৌন্দর্য্যের একটা সাড়া জাগে, তাই কথাটা যেন বড়ই ভাল লাগে। কিন্তু নরনারীর ভালবাসা সম্বন্ধীয় ব্যাপারে রক্ত-করবীর উল্লেখে মনে অনেকখানি চিন্তাও আসে। ভালবাসার সঙ্গে রক্ত-করবীর যোগসূত্র কোথায়, তার একটা ইঙ্গিত পেতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে রক্ত-করবী শুধু সৌন্দর্য্যের ছবি—আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। যেমন উর্ব্বশী—

> বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি'
> কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশী——

বিশ্বসৌন্দর্য্যের এই রূপকে অভিব্যক্তি নিবিড়তম অনুভূতির সৃষ্টি করে, এর সহিত কোনো সুচিন্তিত আইডিয়ার সংযোগ কিন্তু মনে আসে না। পক্ষান্তরে শেষোক্ত ক্ষেত্রে রক্ত করবী বৃন্তহীন পুষ্প নয়; বৃন্ত তার গভীর চিন্তার ক্ষেত্রে। Association নামে যে একটা মানসিক ব্যাপার আছে, তার প্রভাবে হয়তো সে তার সুন্দর পুষ্পদেহ নিয়ে মানবের বহিঃসৌন্দর্য্যের প্রতি, এবং তার ভিতরের সূক্ষ্ম গঠনে মানব-মনের কত কি জটিলতার প্রতি নির্দ্দেশ করতে থাকে।

দেখা গেল, একই রূপক ব্যবহার-ভেদে দ্বিবিধ প্রকৃতি গ্রহণ করে, অনুভূতি-রূপক অথবা ভাব-রূপক হয়। 'চিত্রা' অনুভূতি-রূপকের দৃষ্টান্ত। তার সৌন্দর্য্য নিজেকে শুধু দেখাতে চায়, বোঝাতে চায় না। 'বিচিত্রায়' দেখানো আছে এবং তার সহিত বোঝানো আছে। অনুভূতি ও ভাবের গ্রন্থিবন্ধনে তার জন্ম। সে শুধু বাজ্‌বার জন্য নয়, বোঝ্‌বার জন্যও।

৫

রূপক কাব্যে উল্লিখিত প্রকারভেদ ছাড়া আকার-ভেদও আছে। দু'চার কথায় খণ্ডভাবে তার প্রকাশ চলে; আবার সূক্ষ্মতমভাব ও অনুভূতিরাশির একত্র সমন্বয়ে যে বৃহৎ উপলব্ধির সৃষ্টি হয় তার থেকেও রূপক রচনা করা যায়। কাব্যের এই সৃষ্টিকার্য্যে মেঘের ধর্ম্ম নিহিত। কতকগুলি জলকণা মিলে ছোট মেঘের আকার পায়। বায়ুতাড়িত হলে সেই ছোট মেঘগুলি পরস্পর সম্মেলনে আপন আপন ক্ষুদ্র সত্তার স্থলে এক বৃহতের সৃষ্টি করে। প্রথম জাতীয় রূপটীর স্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু তা অপূর্ণ; ফুলের পাপড়ির মত। দ্বিতীয়টীতে পূর্ণতা বিদ্যমান; অর্থাৎ সে যেন পাপড়ি, রেণু, বৃন্ত, পত্রের সংযোগে রচিত বর্ণ-গন্ধময় সম্পূর্ণ একটী পুষ্প। সে যেন নারীদেহের মত নিগূঢ় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের লীলায় রহস্যময়। এইরূপ বিভিন্ন আকারের রূপকদ্বয়ের খণ্ডরূপক ও পূর্ণরূপক নামকরণ চলে। প্রকার সম্বন্ধে এর কিছু বৈশিষ্ট্য নেই, কারণ খণ্ডরূপক ও পূর্ণরূপক উভয়ই ব্যবহারভেদে অনুভূতিরূপক অথবা ভাবরূপক হতে পারে।

পূর্ব্বে শুধু রবীন্দ্রনাথের খণ্ডরূপকগুলির কথা বলা হয়েছে। এরূপ রূপক সম্ভবতঃ ভারতীয় প্রতিভার একটা বিশেষ প্রকাশ। কবীর প্রভৃতি বহু সাধক খণ্ড-

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

রূপকের মধ্যে দিয়ে নিজেদের ভাবোপলব্ধি প্রকাশ করেছেন।

বিশ্বসাহিত্যে পূর্ণরূপকের সংখ্যা অধিক নয়। বর্ত্তমান যুগে ফরাসী ও আইরিশ প্রতিভা ও বস্তুর মধ্যে নূতন পরিণতির হাওয়া প্রবাহিত হয়েছে। ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এর প্রবর্ত্তনা করেছেন কিনা বলা কঠিন, তবে-যে পরিণতির উচ্চতম স্তরে নিয়ে গেছেন এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। ডাকঘর, অচলায়তন, রাজা, মুক্তধারা, রক্তকরবী, ফাল্গুনী, বসন্তোৎসব ও নটরাজ পূর্ণরূপক। শেষোক্ত তিনটি অনুভূতিরূপক, এবং একই মর্ম্মকথার ত্রিধারা। বাকিগুলি ভাব-রূপক।

ফাল্গুনী পর্য্যায়ের রূপকগুলি প্রধানতঃ প্রকৃতির সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মানসচিত্র। জড়প্রকৃতি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও শেলীর কাছেও প্রাণময় ছিল, কিন্তু তাঁদের কেহই পূর্ণরূপক রচনা করেন নি। এতদ্ভিন্ন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির কাছে চেয়েছিলেন নীতিশিক্ষা, এবং শেলী প্রকৃতির মধ্যে দেখেছিলেন নিজ মনের ছবি। রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশ্বপ্রকৃতির একটা স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্তা আছে। নীতিশিক্ষা তার ধর্ম্ম নয়, কবির মর্ম্মস্থল প্রতিফলিত করা তার কার্য্য নয়। নদীর স্রোত যেমন প্রাণের উচ্ছ্বাসে ব'য়ে চলে, তাঁর কাছে প্রকৃতিও তেমনি বিরাট উচ্ছ্বাসে বর্ত্তমান। কোথাও তার জড়তা, গতির অভাব, স্তব্ধতার ভাব নেই। প্রকৃতির প্রেক্ষাগৃহে ছয় ঋতুর উৎসবে চিরসুন্দরের যে বিচিত্র লীলা মানবজীবন তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। দুইয়ের মধ্যে একই প্রাণের কথা, অন্তহীন চলা, অফুরন্ত সঙ্গীত; যেন একটা শক্তির উৎস হতে নির্গত পাশাপাশি দুটা প্রবাহ। 'বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে, আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা।'

রবীন্দ্রনাথের যে রূপকগুলিকে ভাব-রূপক বলা গেল, তার মধ্যেও অনুভূতির প্রাবল্য আছে। সেইজন্য এ নামকরণের যাথার্থ্য সম্বন্ধে মনে সংশয়ের উদয় সম্ভবপর। গভীরভাবে দেখলে কিন্তু মনে হয়, তাদের মধ্যে ভাব প্রত্যক্ষ, এবং অনুভূতি পরোক্ষ। ভাব যেন তরবারি-হস্তে মহাবেগে পথ কেটে কেটে চলেছে, পিছনে অনুভূতি তার সঙ্গিনী অথবা হয়তো তার সহকর্ম্মিণী। এই উভয়ের সম্বন্ধ যেন 'রাজা' ও 'সুদর্শনার' মত। রাজাকে দেখা যায় না, কিন্তু তার তপ্ত নিশ্বাসের স্পর্শ পাওয়া যায়। তার অদৃশ্য সত্তা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। সুদর্শনার রক্তমাংসের রূপ আছে, মূঢ় দিবালোকে রাজার দর্শন লাভের লোভে সে উদ্‌ভ্রান্ত আগ্রহে ছুটে চলে, দেখা কিন্তু হয় না। গতিপথের পদে পদে সে তার অনুভূতি প্রকাশ করে; কখনো অপ্রাপ্তির দারুণ দহন, অথবা প্রাপ্তির পরে প্রাপ্ত বস্তুর সহিত প্রত্যাশার অমিল দেখে গভীর নৈরাশ্যের জ্বালা। ভাব-বস্তুকে অন্তরের একান্ত সন্নিকটে লাভ করবার জন্য এ যেন অনুভূতির অশ্রুময় আকৃতি।

এই ভাবরূপকগুলিকে রূপক হিসাবে না দেখে সাধারণ মানবজীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি স্বরূপ মনে করার প্রবৃত্তি ক্ষেত্রবিশেষে বিদ্যমান। এতদ্বারা বহু অসম্বদ্ধতার সৃষ্টি হয়; কিন্তু নূতন ও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার দ্বারা সে সকল অসম্বদ্ধতারও হয়তো নিরাকরণ চলে। তথাপি এ কার্য্যে রূপকের অন্তরস্থ পূর্ণতার সন্ধানলাভ, এবং তদ্দ্বারা প্রকৃত রসোপলব্ধি করা সম্ভবপর হয় না, যে হেতু allegory ও রূপক উভয় এক বস্তু নয়। Allegoryর মধ্যে যে লুকানো অর্থ থাকে তা তার অন্তরাত্মা নয়— বেশের পরিবর্ত্তন মাত্র। রূপকের গূঢ় অর্থ কিন্তু তার প্রাণস্বরূপ, এবং শুধু এই প্রাণবস্তুর প্রকাশের জন্যই মূলত রূপকের দেহের সৃষ্টি। সুতরাং উক্ত নিগূঢ় ব্যঞ্জনা ত্যাগ করার অর্থ প্রাণহীন দেহের প্রতি সমধিক মমতা প্রদর্শন।

৬

'ছায়াচ্ছন্ন-জলধারা' নামক পূর্ণরূপক কাব্যে কবি ইয়েট্‌স্ লিখেছেন,

All would be well
Could we but give us wholly to the dreams,
And get into their world that to the sense is
shadow and not linger,
Among substantial things; for it is dreams
That lift us to the flowing, changing world
That the heart longs for.

সকল রূপকের এ একেবারে গোড়ার কথা। বাস্তব জগতের সঙ্গে মনের যে দুশ্ছেদ্য গ্রন্থী আছে, সে বন্ধন হতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ ক'রে অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা স্বকল্পিত ছায়ালোকে বৃক্ষ লতা মানুষের সৃষ্টি এবং সেই flowing changing world-এর স্বরূপকথন রূপকের ধর্ম্ম। বাস্তবের অস্তিত্ব একেবারে বিস্মৃত হয়ে যা অবস্তু, যা অরূপ, তাকে প্রত্যক্ষের মত একান্ত আপন ক'রে নিয়ে ভাষায় বর্ণন—রূপককারের শিল্পসূত্র। রূপক রচনা কালে কবির অন্তরে ধ্যান-মৌনতার যে সুনিবিড় সংস্থিতি আসে, রূপকের মর্ম্মবোধ করতে হলে পাঠকেরও অন্ততঃ অংশতঃ কবিমনের এই ধরণটি নিজের মধ্যে আনা আবশ্যক। নইলে সৌন্দর্য্যানুভূতি পদে পদে প্রশ্নের প্রস্তরখণ্ডে আঘাত লাভ ক'রে গতিবেগ হারাবে, তর্কের ঝড়ে শুধু ধূলিই উড়বে—চিত্ত আনন্দে নয়, সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। মানুষের মন স্বভাবতঃ অদেহী বস্তুকে রক্তমাংসের দেহে দেখতে চায়, কারণ তার ধরবার ছোঁবার আকাঙ্ক্ষা সূক্ষ্মতার দিকে যেতে চায় না। সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ তার কাম্য; বুকে বুক রেখে হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি শ্রবণে তার আনন্দ,—দূরত্বের ব্যবধানে শুধু একটী দৃষ্টির মধ্যে সমস্ত প্রাণ পুরে পরস্পরের প্রতি চেয়ে থাকা তার কাছে অসার্থক। স্থূলের দিক থেকে মনের এই কামনার মুখ ফেরাতে না পারলে রূপককাব্যের পরিকল্পনার একেবারে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ পেতে, অর্থাৎ সাধারণ বিশ্লেষণ-রীতির formula দিয়ে তার রূপ পরিষ্কার দেখতে ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। রক্তকরবীর রাজা কি বর্ত্তমান যুগের যন্ত্রশক্তির একটা বিগ্রহ? তার রঞ্জনের সঙ্গে 'ফাল্গুনীর' চন্দ্রহাসের মিল আছে কি?—এ সকল প্রশ্ন মনোভাবের এই স্থূলতার ফল, এবং এবম্বিধ প্রশ্ন শুধু নিরর্থক নয়, সৌন্দর্য্যবোধের অভাব জ্ঞাপক।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, 'কাব্যের তাজমহলে রাত্রি বাস করা চলে না কেননা অত সৌন্দর্য্যের বুকে ঘুমিয়ে পড়া কঠিন।' রূপকের তাজমহল হয় না, যেহেতু তার দেহ প্রস্তরনির্ম্মিত নয়। মেঘের বক্ষে হাত রাখলে হাতে শুধু শৈত্যানুভব হবে, রক্তমাংসের সংস্পর্শজনিত চাঞ্চল্য মনে উদয় হবে না। রূপকেরও ঐ একই ধর্ম্ম—মেঘেরই মত সে elusive। সুতরাং ও বস্তুর দ্বারা যদি কোনো মহল রচনা করা যায়, সে মেঘমহল। রূপক কাব্যের মেঘমহলে 'রাত্রিবাস'করা হয় তো চলে, কারণ তার মধ্যে ক্ষণকালের অবস্থানেই অত্যন্ত ঘুম আসতে থাকে। এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যাবার পরেই মনশ্চক্ষুর সম্মুখস্থিত কালো যবনিকাটা সহসা স'রে গিয়ে নূতন নূতন দৃশ্যপট দৃষ্টিপথে আসতে থাকে। এ অবস্থাকে স্বপ্নদেখা বলা হয়, এবং ইয়েট্স্ তাঁর কাব্যে এর প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। জীবনটা অবশ্য স্বপ্ন নয়, কিন্তু স্বপ্নে যে জীবন আছে একথা যুগ যুগ থেকে পৃথিবীতে সর্ব্বজন-বিদিত। রূপককাব্যের শিল্পলক্ষ্মীর চোখে বিদ্যুৎ নেই, আছে স্বপ্নের অঞ্জন; তাঁর দেহে গতি-চাঞ্চল্য দেখা যায় না, দেখা যায় পরম রমণীয় নিদ্রালস শৈথিল্য, কেশে বেশে এলায়িত ভাব।

—"শুধু পটে লিখা ?"

—গল্প—

শ্রীকিরণকুমার রায়

আলস্যে দিন কাটিয়া যায়। করিবার যাহা তাহা কিছুই করিতেছি না, পড়িবার বইগুলির উপর ধুলি জমিয়া গিয়াছে, বুঝি বা আর দুই দিন পরে সেখানে মাকড়সাই জাল বুনিতে আরম্ভ করে। অথচ পরীক্ষার তাগিদ, কিন্তু সেই তাগিদেই মন আরও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। খবরের কাগজ উল্টাইয়া যাই, বড় বড় অক্ষরগুলি নজরে পড়ে মাত্র, তাহারা কোন অর্থ বহন করে না—চোখ বুজিয়া আসে, হাত হইতে খবরের কাগজ খসিয়া পড়ে, ভাবি ঘুম আসিতেছে কিন্তু ঘুম আসে না। মনে হয় ক্রমাগত একটা অন্ধকার কক্ষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্তি আসিয়াছে, ভিতরে ঢুকিতে বেগ পাইতে হয় নাই, কিন্তু বাহির হইবার পথ পাইতেছি না, দেওয়াল হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি—কি জ্বালা! এতটুকু আলোও যদি কোন রন্ধ্রপথ বাহিয়া আসিত!

এমনি একটা দিনের সন্ধ্যাবেলায় ছাতা হাতে করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম, না বাহির হইয়া উপায় ছিল না,—যেন বাহির হওয়াটাই একটা কাজ বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিতে চাই। ফুটপাথের উপর দিয়া সারি সারি লোক চলিয়াছে, ব্যস্ত গল্পমগ্ন অলস নানা প্রকৃতির—কেবলই মনে হইতে লাগিল ইহারা কিছুই না, এসব কিছুই না। সকলেই দিনের পর দিন ব্যর্থ উদ্যমে জীবন কাটাইতেছে মাত্র। কিন্তু উদ্যম যে কোথায় সত্য হইয়া উঠে তাহার নির্দ্দেশই বা কে করে?

গলির মোড়ের পানওয়ালা নিরুদ্বেগে উল্লাসে পান বিক্রয় করিতেছে। চায়ের দোকানে নিয়মিত আড্ডাটী জমিয়া উঠিয়াছে। ষ্টেশনারী দোকানে বাবুটী একহস্তে বিড়ি ধরাইয়া অন্য হস্তে খরিদ্দারকে জিনিষ সরবরাহ করিতেছেন।

সবই রোজ দেখি কিন্তু কোন দিন বিশেষ করিয়া ইহাদের স্বপক্ষে কি বিপক্ষে কোন কথাই মনে উদয় হয় না। এমন কি আমি নিজেই ত কোন কোন দিন চায়ের দোকানে সান্ধ্য মজলিস সরগরম করিয়া তুলিয়াছি। মনে হইতে লাগিল কোথায় কি একটা ভুল হইয়াছে, ইহারা বুঝে নাই,—না বুঝিবার ক্লান্তি ইহাদিগকে নাকাল করিল তবুও বুঝার নাগাল ইহারা পাইল না। আজ কে যেন অন্তরাল হইতে আমার চোখের উপরকার কৃষ্ণ আবরণটী টানিয়া লইয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কদর্য্যতাকে অতি স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে—কোন দোকানের শো-কেসে কবে একটী পুর্ণায়তন নরকঙ্কাল দেখিয়াছিলাম, তাহাকেই সমস্ত লোকের ভিতরে দেখিতেছি।

এই অতি-সস্তা দার্শনিক চাপে দম আটকাইয়া আসে। ভাবিতে ভাবিতে বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম। রাস্তায় গ্যাসগুলি বিবাহ-প্রসেশনের নিশান হাতে শাস্ত্রীর মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, যেন বর আসিবে তাহারই আসিবার গণ্ডগোলে সারা পথ ব্যস্ত, কাহারা সেই সব খবর নিয়া ছুটিয়া চলিতেছে, অথচ বরের দেখা নাই—বুঝিবা লগ্নক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া যায়। এই উদ্ভট কল্পনায় মস্তিষ্ক পীড়িত হইয়া উঠে—শব্দ করিয়া মোটরকার চলিয়া গেল শঙ্খধ্বনি বলিয়া ভুল করিবার উপায় নাই, গায়ে ছিটকাইয়া যে কাদা লাগিল তাহা গোলাপ জল কিংবা আতর নহে।

পথের একপাশে একটী লোক কতকগুলি ছিন্ন বই ও নানা রকম ছবি বেচিতেছে; হঠাৎ সেইখানে থামিয়া পড়িয়া তাহার ছবির পুঁজি উল্টাইতে বসিয়া গেলাম; এই ছবি বাছিবার কাজে নিজকে নিযুক্ত করিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। কাজের বাতাসে মস্তিষ্ক-কোটরের আলস্য পালাইয়া গেল। এতক্ষণ যে কল্পনার তাসের ঘর মাথায় গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। একমনে ছবি ঘাঁটিয়া চলিয়াছিলাম, কি জন্য যে তাহার ঠিক ঠিকানা নাই। একটী বালিকা-মূর্ত্তিকে পছন্দ করিয়া দুই আনা মূল্যে তাহাকে কিনিয়া বাসায় ফিরিয়া

আসিলাম। পথে আসিতে ভাবিতেছিলাম, আচ্ছা এমনও ত হইতে পারে যে এই ছবিরই প্রতীক্ষায় সারাদিন আমার এমন করিয়া কাটিয়াছে—ওষ্ঠের কোণে যেন ব্যঙ্গের হাসি আকার নিতেছে?—যাক্ মোটের উপর খুসীই হইয়াছিলাম। একপার্শ্বে একটা সাইকেল মেরামতের দোকানে কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা ছোক্রা তখনও আড্ডা দিতেছে, তাহাদের মধ্যে কে একজন চেঁচাইতেছে, 'ও সই সন্ধ্যে-বেলার চাঁপাফুল।' শুনিয়া আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, মনে মনে বলিলাম সন্ধ্যা-বেলায় তোমার মুণ্ডু ও মাথা।

বাসায় ফিরিয়া যাহাকে সওদা করিয়া আনিলাম তাহাকে নানারকমে দেখিলাম—এগার বার বছরের একটী বালিকার মূর্ত্তি, ঠিক বালিকা বলিলে চলে না, কিশোরী—বাল্যকে অতিক্রম করিয়াছে। আরও নিবিড় দৃষ্টিতে দেখিতে চেষ্টা করিলাম, গণ্ডের দুইপাশ বহিয়া চূর্ণ কুন্তল উড়িতেছে, নীল আঁখি-তারা—হাসি হাসি মুখে কি যেন প্রচ্ছন্ন বেদনা,—সমস্ত চোখে মুখে তাহারই আভাস।

পিছনে পদধ্বনি শুনিয়া ফিরিয়া দেখি বন্ধু নরেশ। সে আর্টিষ্ট, তাহাকে ছবিখানি দেখাইলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি রকম?'

সে উত্তর দিল, 'মন্দ কি?'

হঠাৎ চটিয়া গেলাম, বলিলাম, 'মন্দ কি? কেন, ভাল নয় কেন, শুনি? এর নীচে যদি বটিচেলি কি দ্য ভিন্সির নাম থাক্‌ত, তবে খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌তে ত?'

মুখের চুরট নামাইয়া সে উত্তর দিল, 'নাম করবার প্রয়োজন হত না।'

বলিলাম, 'বাজে, তুমি আমাকে বুঝিয়ে দাও দেখি, মনা লিজের মুখের যে হাসি নিয়ে তোমাদের এত মাথা-কাটাকাটি—তার সঙ্গে এর কোথায় পার্থক্য।'

'ও বুঝিয়ে দেওয়া যায় না, চোখে যার লাগে সেই বোঝে।'

'স্বীকার করি, কিন্তু এর এই হাসিটাই বা চোখে লাগ্‌বে না কেন? পেছনে নীল সমুদ্র নেই ব'লে?'

'না, মনা লিজার চোখে যে নীল সাগর ও তার রহস্য রয়েছে, এতে তারই অভাব।'

বলিলাম, 'কখনই না; ও শুধু তোমাদের সৃষ্টি;—নীল সাগরের বৈরাটা ভরা-ভাদ্রের পগারেতেও আছে, হয়ত বা পানাপুকুরেও আছে।'

'অর্থাৎ ক্লিওপেট্রার সঙ্গে ও পাড়ার কাজুর কোনও তফাৎ নেই?'

'না, তা নয়, কিন্তু বস্তিতেও খুঁজলে টুক্‌রো-টাক্‌রা ক্লিওপেট্রার অভাব হবে না।'

'না হোক্ গে—বর্ত্তমানে বস্তির ক্লিওপেট্রাকে রেখে চল, গানের মজলিস্ আছে।'

জামা কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিলাম। পথে নরেশ আমাকে গল্প করিয়া শোনাইল, উনবিংশ শতাব্দীতে কোন্ মিউজিয়মে মনা লিজাকে দেখিয়া কোন্ এক ডিউকের মাথা বিগড়াইয়া যায়। সে দিনের পর দিন রোজ তথায় গিয়া মনা লিজার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। তারপর কি করিয়া কি হইল, ভদ্রলোকটীর মাথার বর্ত্রিশটা স্ক্রু ঢিল হইয়া গেল।

গান শুনিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। গানের কলিগুলি তখনও মাথার অলিগলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল,—শ্যামের বাঁশী আর বাদল রাতের ঝুনুঝুনু ঘন গরজন সব ভৈরবী ভীমপলাশী আর বাগেশ্রীর পর্দ্দাতে পর্দ্দাতে বাজিয়া বাজিয়া কানের কাছে কাঁদিয়া মরিতেছে।

ফিরিয়া দেখি ছবি আমার টেবিলের এক কোণে পড়িয়া—বুকটা কাঁপিয়া উঠিল, ছবিটাকে খুব চাপিয়া ধরিলাম—গান, ছবি, জীবন সমস্তই যেন কোন এক আকস্মিক বন্যায় একাকার হইয়া গেছে। দ্য ভিন্সির মনা লিজার কথা মনে পড়িল। কোথায় পার্থক্য? আমার মনের কল্পনা শুধু, আর কিছুই না? সব কল্পনা দূর করিয়া নিখুঁত বিচারের দৃষ্টি দিয়া অনেকক্ষণ দেখিলাম—হাসিতে যে অশ্রুবিন্দুর স্মৃতি তাহা মনা লিজাকে হার মানাইয়াছে। চোখ দুটীতে ভৈরবীর উদাস রহস্য, ওষ্ঠে ভীমপলাশীর করুণ কান্না, আর ঘন কৃষ্ণ চুলের মধ্যে বাগেশ্রীর দারুণ আশ্রয়-ভিক্ষা—সব কল্পনা? মনা লিজার জন্য যে ডিউক পাগল হইয়াছিল, তাহাকে

শ্রীকিরণকুমার রায়

মনে পড়িল। সহসা ভয় পাইয়া গেলাম। নিজের সঙ্গে তাহার অবস্থার তুলনা করিয়া ভাবিলাম, যদি তাহার মত হয়; মনে মনে হাসি পাইল। ছবিটির দিকে আবার চাহিলাম —নূতন একটা অনুভূতির শিহরণ পাইতেছি। সব বাদ দিয়া এইটুকুই হয়ত চরম লাভ। যেন পরিচিত চাহনি! কোথায় দেখিয়াছি—খুবই আবছা মনে পড়িতেছে—মাইলের পর মাইল যেন পাইনের সারি চলিয়া গিয়াছে, এক ফালি চন্দ্র, ঢালু পাহাড়ের উপর হইতে সমুদ্রের বিপুল জলোচ্ছ্বাস শুনিতে পাওয়া যায়—তাহারি মধ্যে কোথায়, কবে, কোন্ যুগে, কোন জীবনে?

হঠাৎ মনে হইল, একি করিতেছি! সত্যই এই ছবিকে ঘেরিয়া যে-সব আজগুবী কথা মনে পড়িতেছে তাহাকে আর বেশীক্ষণ আবদার দিলে অনর্থ বাধিবে! তাড়াতাড়ি ছবিখানি সুটকেসে বন্ধ করিয়া ফেলিলাম। চেয়ারে বসিয়া মনে হইল, কে যেন কাঁদিতেছে! যেন কত লক্ষ যোজন দূর হইতে কাহার অস্ফুট কাৎরানি ভাসিয়া আসিতেছে—অনেক জল ঝড় ভেদ করিয়া গৃহহীন পথিকের ক্রন্দন।

মনকে চাঙ্গা করিবার উদ্দেশে কলঘরে গিয়া চোখে মুখে জল দিয়া আসিয়া বই নিয়া পড়িতে বসিলাম, কিন্তু কান্নার সুর ক্রমাগতই কানের কাছে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। ছবির চোখ, গানের সুর মাথায় কল্লোল তুলিয়াছে —হাঁ প্রিয়ার সন্দেশ চাই, প্রিয়াকে আসিতে বলিতে হইবে, বাজুবন্ধ যে ক্রমাগত তাহার হাত হইতে খুলিয়া খুলিয়া পড়িতেছিল, তাহার কি হইল?

জোর করিয়া বই খুলিয়া চেঁচাইয়া পড়িতে সুরু করিলাম, কিন্তু কান্নার রেশ দূর করিতে পারিলাম না। বেগতিক দেখিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিলাম; বুঝিবা আশা ছিল, খানিকটা খোলা হাওয়ায় মনটা সুস্থ হইবে। কপালের শিরা দুটা ফুলিয়া ফাটিবার উপক্রম করিতেছে—হাত দিয়া কপাল চাপিয়া ধরিলাম। ঠিক সেই সময়ে গলির মোড়ে খুব জোরালো হেডলাইট্ সমেত একখানি মোটর হাঁকিয়া গেল, তাহারই আলোকে আমার বাসার সম্মুখে খানিকটা স্থান আলোকিত হইয়া উঠিল। দেখি, একটি দোকানে বড় বড় অক্ষরে "এখানে ছবি বাঁধাই হয়"—লেখা সাইন বোর্ড ঝুলিতেছে—অকস্মাৎ যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইলাম। গায়ের উপর চাদর ফেলিয়া, সুটকেশ হইতে বন্দিনীকে বাহির করিয়া নীচে নামিয়া গেলাম—এইবারে মুক্তি পাইব, আর কাল্পনিক ক্রন্দনে রাত্রির বিশ্রাম মাটি হইতে দিব না। একটা ডাষ্টবিনের পাশ দিয়া যাইতেছিলাম, তাহার মধ্যে ছবিখানিকে ফেলিয়া দিবার কথা মনে হইল, সঙ্গে সঙ্গে যেন কত বড় অপরাধের আতঙ্ক আমাকে পাইয়া বসিল, যেন রাত্রির অন্ধকারে শিশুর ভ্রূণকে হত্যা করিবার মানস করিতেছি। খুব জোরে হাঁটিয়া চলিয়া গেলাম, তাড়াতাড়ি দোকানে পৌঁছিয়া ছবিখানি ফেলিয়া দিয়া বলিলাম, "এখানিকে বাঁধিয়ে দিতে কত নেবেন মশাই?"

একটি সুদৃশ্য ফ্রেম পছন্দ করিয়া, দামের চুক্তি করিয়া, দোকান হইতে নামিতে যাইব, দেখি ছবি হইতে বালিকা আমার দিকে তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে; স্পষ্ট কানে শুনিতে পাইলাম "ছিঃ"।

সোজাসুজি বাসায় ফিরিয়া হাইড্রোষ্টাটিক্স্ খুলিয়া বসিলাম। প্রবলেম কষতে যাই, সমস্ত গুলাইয়া যায়, কিছুই কূল পাই না। মস্তিষ্ক বস্তুটি যেন একটা কাঁচের পাতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে যত পারি জল ঢালিতেছি কিন্তু সিক্ত করিতে কিছুতেই পারিতেছি না। বই বন্ধ করিয়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এ কি রকম হইল! শেষকালে ক্ষুধিত পাষাণের পাল্লায় পড়িলাম নাকি! মনে পড়িল 'সব ঝুটা হ্যায়'! টেবিলের উপরে পা উঠাইয়া দিয়াছিলাম, সোজা হইয়া বসিবার জন্য পা গুটাইতে গিয়া কিসে পা ঠেকিল, কি যেন মেজের উপর পড়িয়া তুমুল শব্দ করিল,—বুঝিলাম চুনার হইতে আনীত আদরের ফুলদানীটা গিয়াছে।

ছবিখানি বাঁধাই হইয়া আসিল। বাসায় আসিয়া তাহাকে অন্যান্য ছবির সঙ্গে দেওয়ালে লটকাইয়া রাখিব কি না ভাবিতেছি, এমন সময় নরেশ আসিয়া উপস্থিত। ছবিখানিকে বালিশের নীচে রাখিতে যাইব, নরেশ আসিয়া হাত চাপিয়া ধরিল, লজ্জা পাইয়া ঈজি চেয়ারের উপর গুম্ হইয়া শুইয়া পড়িলাম। নরেশ ছবিখানির দিকে না চাহিয়া

আমার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিল—"কি হে, প্রেমকে ফ্রেমে বদ্ধ কল্লে নাকি?"

কিছুই বলিলাম না, চুপ করিয়া থাকিলাম। নরেশ বলিতেছিল—"আমার এক কেরাণী বন্ধু আছে—সে এমনি রোমান্টিক যে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ কাগজে স্পেন কি ইটালীর কোন সিনোরা না ডনাকে দেখে অবধি আর হেসে কথা কয়না।"

বলিলাম—"তৎপর?"

"আর একজন এক কাশ্মিরী তরুণীকে লক্ষ্ণৌ ওয়েটীং রুমে আধঘণ্টার জন্যে দেখে তার জন্যে শ'খানেক কবিতা ত লিখেইছে, অধিকন্তু সে গুলিকে অনুবাদ করবার জন্য কাশ্মিরী ভাষা শিখ্‌ছে। অবিশ্যি সে তরুণী যে কে এবং কি, তার সংবাদ পর্য্যন্ত তার জানা নেই।"

"এইরূপ?"

"হ্যাঁ! অন্য আর একজন এদেরও বাড়া—"

বলিলাম, "হতে পারে।"

"তার প্রেমিকার না আছে ভাষা না আছে সত্তা। সেই বোধ হয় রিয়াল প্রেমিক।"

নরেশ চলিয়া গেলে ভাবিতেছিলাম, এ হইল একপ্রকার মন্দ না। প্রেমে পড়িবার বয়স হইয়াছে; বন্ধুরা প্রেমে পড়িয়া আসিয়া গল্প করে, হা হুতাশ করে, রাত্রিতে না ঘুমাইয়া বারান্দায় পাইচারী করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। সব রকম দেখিয়াছি, মনে মনে হাসিয়াছি, বিষবাক্যে প্রেমার্ত্ত বন্ধুদিগকে বিঁধিয়াছি এবং উদ্দাম স্বাস্থ্যে তাহাদের প্রেমের গল্পে হাসিয়া ঘর ফাটাইয়া দিয়াছি,—যেন উহার চাইতে বেশি বুদ্ধিহীনতা এ জীবনে কেহ কোনও দিন করে নাই। আজ আমি তাহাদেরই একজন! তাহাদের প্রেমাস্পদ তবু রক্ত মাংসের জীব,—কথা কয়, হাসে, কাঁদে। আমার প্রেমের কাহিনী অসম্ভব।

কিন্তু প্রেমে যে পড়িয়াছি, ইহার নিদর্শন কি? মাত্র নরেশের পরিহাস? ছবির সঙ্গে প্রেমে পড়িবার মত কি আছে?—কিছুতেই না, প্রেমে আমি পড়ি নাই।

ছবির দিকে নজর পড়ে, বুক কাঁপিয়া ওঠে! আবার সেই পাইন গাছের সারি, তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু-কল্লোল, আর ঢালু পাহাড়ের উপর একফালি চন্দ্র কোথা হইতে হুড়মুড় করিয়া আসিয়া পড়ে—সব ওলোট পালট হইয়া যায়। মাথা ঝাঁকাইয়া উঠিয়া পড়ি, কিন্তু রক্ষা পাই না!

ছবিখানিকে সুটকেশে তুলিয়া রাখিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, আর উহাকে লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিব না। কিন্তু আমি না চাহিলে কি হয় সে আমার স্কন্ধে চাপিয়া বসিল। বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিবার ব্যবসা কোনো দিন করি নাই; ডাম্বেল মুগুর ভাঁজিয়াছি, ডন বৈঠক দিয়াছি, ফুটবল ক্রিকেট খেলিয়া দিন কাটাইয়াছি,—সব ব্যর্থ হইল! এই সব কঠিন ব্যূহ ভেদ করিয়া কখন্ দুরারোগ্য ব্যাধি আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। প্রথম প্রথম কয়েক দিন ধারণা হইয়াছিল যে ভুয়া কল্পনা, কিছুদিনের জন্য পাইয়া বসিয়াছে মাত্র। কিন্তু দিন যত যাইতে লাগিল, ততই ছবিখানি আমার দিন রাতের অধিকাংশ সময় অধিকার করিয়া চলিল।

মাঝে মাঝে নরেশ আসিয়া বিরক্ত করে, বলে "কোর্টশিপের কতদূর—?"

কোনোদিন বলি, "অত্যন্ত ছেলে মানুষ হে, লজ্জা ভাঙ্‌তেই দিন যায়"। কোনোদিন বলি, "ভাঙন ধরেছে, এইবারে বান সুরু হবে।"

কিন্তু পরিহাসে মন তরল হয় না। নরেশ চলিয়া গেলে বই ফেলিয়া দিই—চোখের দৃষ্টি দূরে চলিয়া যায়—চক্রবাল প্রান্তে দুটী নীল চোখ ভাসিয়া উঠে আর উড়ন্ত হংস-দম্পতি মেঘের উপর মেঘ পাড়ি দিতে থাকে।

শেষ অবধি ছবিখানি বাহির করিয়া তাহার দিকে নীরবে চাহিয়া থাকা আমার নিত্য নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে হইয়া গেল। গণিয়া গণিয়া তাহার আঁখিপক্ষ্মের সংখ্যা বাহির করিয়া ফেলিলাম, তাহার চূর্ণ কুন্তলের উড়িবার বিশিষ্ট ভাবটী, তাহার চিবুকের ললিত লাবণ্যখানি সমস্ত নির্দ্ধারণ করিয়া লইলাম।

আবিষ্কার করিলাম—মনা লিজার ছবিতে নারী-মাধুর্য্যের যে রূপ গভীর-গম্ভীর ঈষৎ নিষ্করুণ হইয়া ফুটিয়াছে, ইহার মুখে তাহারই বিপরীতটুকু, সম্পূর্ণ করুণ মায়া মমতার

শ্রীকিরণকুমার রায়

প্রতীক। বালিকার মূর্ত্তি, তবুও ঈষৎ বিষাদের মধ্য দিয়া নারী-সৌন্দর্য্যের সমস্ত অজানা অতল রহস্তের পাথারে নিতল হইয়া ডুব মারিতে ইচ্ছা করে—উর্ব্বশী-আফ্রোদিতির নীড় খুঁজিয়া বাহির করিতে, তাহারই একখানি ঝিনুক চুরি করিয়া আনিতে— ; রূপকথার স্ফটিক-স্তম্ভ, মরণকাঠী জিওনকাঠী, ঘুমন্ত রাজকন্যা—সব মনের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত চকিত বিদ্যুতের মত খেলিয়া যায়।

সজাগ হইয়া উঠি। দেখি, টেবিলের উপর আড়াআড়ি ক্যালেণ্ডারে পরীক্ষার দিন লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া আর শেল্‌ফভরা সম্পূর্ণ অপরিচিত পুস্তকের স্তূপ! উঠিয়া বসি, কিন্তু মাথা ঢুলিয়া পড়ে।

গভীর রাত্রে বন্দিনীকে বাহির করি। তাহাকে দেখিয়া আর আমার তৃপ্তি হইত না, স্পষ্ট করিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে সুরু করিয়াছিলাম। ঘরের সমস্ত দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া, সযত্নে তাহাকে গোপন কোণ হইতে বাহির করিয়া, টেবিলে বসাইয়া, তাহার দিকে নির্ণিমেষ চাহিয়া চাহিয়া চোখে জল আনিয়া ফেলিতাম। দিন দিন আমার এই ধারণাই দৃঢ় হইয়া গেল যে ইহা না করিলে আমি বাঁচিব না। ছবি আর আমার কাছে মাত্র ছবি ছিল না, রক্তমাংসের মানুষ অপেক্ষা সে আমার কাছে অনেক জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার জীবনের প্রত্যেকটী স্পন্দন আমারই অনুভূতি হইতে জাগিয়া আমার শিরায় শিরায় ছুটিয়া বেড়াইত। রহস্তের সুনিবিড় জালে ঘেরা তাহার আঁখি দুটীর কাতরতা দূর করিবার জন্য আমি তাহাকে সহস্র অনুরোধ করিতাম—রাত্রির পর রাত্রি। মনে হইত যেন আমারই উপর অভিমান করিয়া তাহার আঁখিপাতা সজল হইয়া উঠিয়াছে, মুখখানি বিষণ্ণ দেখাইতেছে। ইহা তখন আর আমার মাত্র কল্পনা ছিল না, বাস্তব সত্য অপেক্ষা অনেক অধিক সত্য হইয়া উঠিয়াছিল।

এমনি করিয়া অলস সন্ধ্যায় যে উদ্ভট কল্পনা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল তাহা আমার সকল আবেগ, সকল সাধ আশা স্বপ্নের কেন্দ্র হইয়া উঠিল।

দিব্য দিন কাটিতেছিল। খেয়ালই ছিল না যে, বাহিরের বিশ্বকে অন্তরের অন্দরে পুরিয়া চলা অসম্ভব, বাহিরের বিশ্বকে তাহার দেনা পাওনা নিয়মিতই মিটাইয়া দেওয়া দরকার নহিলে তাহার বাকী খাজনার তাগিদে সতত অস্থির হইয়া উঠিতে হয়।

অতি সাধারণ একটী সংঘটন ঘটিয়া এই খেয়ালকে আমার নিকট নির্ম্মমভাবে সজাগ করিয়া তুলিল। আমার সহস্র আপত্তি লক্ষাধিক অনুরোধ সব সমানভাবে অগ্রাহ্য করিয়া পিতৃদেব আমার উপর প্রজাপতির সমন জারি করিলেন। তাঁহার রুদ্র নেত্রের প্রকোপ আমার নৈতিক, অর্থনৈতিক, শারীরিক, মানসিক সকল কৈফিয়ৎ ভস্মীভূত করিয়া, অতি গম্ভীর ভাবে আমাকে এই সুকঠোর কর্ত্তব্য সমাধান করিতে বাধ্য করিল।

বিবাহের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভাবিয়া আসিয়াছিলাম, এ বিবাহ আমার হইবে না, নিশ্চয়ই কিছু না কিছু একটা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইবে; হয়ত বা মরিয়াও যাইতে পারি—না মরিলে কি করিয়া আমার চলিবে? কিন্তু কি করিয়া যে এই সুকঠোর কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হইয়া সমস্ত ঘটনাটিকে সহসা সুমিষ্ট লাগিয়া গেল, তাহার ইতিবৃত্ত আমার পক্ষে যেমনই সমস্যার, সাধারণের পক্ষে তেমনই অবিশ্বাসের। কেননা যদি বলি শুভদৃষ্টির মুহূর্ত্তে যে আঁখি-যুগলকে দেখিলাম সে আমার চিরপরিচিত—তবে কে বিশ্বাস করিবে?

ছবিকে ঘেরিয়া আমি কল্পনার যে রঙীন ইন্দ্রধনুকে মনে মনে রচনা করিয়াছিলাম একটী মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা যে কি করিয়া আরও রঙীন হইয়া উঠিল সে যখন আমি নিজেই বুঝিয়া উঠি নাই, তখন অন্তকে বুঝাইব কিরূপে? অথচ ঠিক ইহাই ঘটিয়াছিল। ছবিকে যাহা দিয়াছিলাম, অথচ সে নিয়াছে কি না বুঝি নাই, ইহাকে তাহা নিছিয়া মুছিয়া নিঃশেষে দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম—গ্রাহ্য করিল কি না, সে প্রশ্ন আর মনের কোনও কোণে অবশিষ্ট রহিল না।

নরেশ শুনিয়া পরিহাস করিয়া বলিত, "তখনই জানতাম, চিরকাল এমনিই হয়ে আসছে।"

উত্তরে বলিতাম, "আমি কি এমনই বিশ্বাসঘাতক যে সেই চিরকালের ব্যতিক্রম ক'রব?"

ফুলশয্যার রাত্রে আমার ঐন্দ্রজালিকার ছবি নব পরিণীতার হস্তে উপঢৌকনের মত উঠাইয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে আমার জীবনের উপকথাও বলিয়াছিলাম। উপন্যাসের মত শোনাইবে এ আশঙ্কাকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় না দিয়া, গল্পের উপসংহার করিয়াছিলাম এই বলিয়া, যে, রহস্যময়ী, তোমার অবগুণ্ঠন যদি খুলিতে পারিয়াছি, তবে আঁখির ঐ বিষণ্ণতাকে দূর করিবার শক্তিও যেন পাই! শুনিতে পাইবে না জানিয়াও যদি একজনের নিকট সহস্রবার চোখের জলে এই অনুরোধ করিতে পারিয়া থাকি, তবে শুনিতেছে বুঝিয়াও অপরের নিকট এই অনুরোধ করিতে সঙ্কোচের প্রয়োজন বোধ করি নাই।

আমার ষোড়শী স্ত্রী কথিত কাহিনীর কতটুকু শুনিয়াছিলেন কিংবা বুঝিয়াছিলেন তাহা সেদিন বা পরে কোন দিনই জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছি, ছবি খানিকে তিনি ছবির বাড়া মূল্যই বরাবর দিয়া আসিয়াছেন।

পুরা সাতটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

আজ আমি সুদূর মফঃস্বলের স্কুলে অপ্রধান শিক্ষক। এই কয় বৎসরে প্রেয়সী আমাকে একে একে তিনটি সন্তান উপহার দিয়াছেন। আজ এই শুক্লা একাদশীর রাত্রে নিদ্রাহীন আমি, সম্মুখের টেবিলের উপর পুঞ্জীকৃত ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা দেখিতে বসিয়া গেছি। অদূরে তক্তপোষের উপর নিদ্রামগ্না স্ত্রী, বক্ষলগ্ন শিশুপুত্রটী, আর একটি ছেলে ও মেয়ে অন্যপার্শ্বে গভীর নিদ্রায় অচেতন। অন্যপার্শ্বে দেয়ালে আমার সেই মানসী।

খাতা দেখিতে দেখিতে মাথা ধরিয়া উঠিয়াছিল, চোখে ঝাপ্‌সা দেখিতেছিলাম। সেই ঝাপ্‌সা অন্ধকারে আমার সমস্ত পারিপার্শ্বিক স্তিমিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। স্ত্রী, পুত্র, বই, খাতা, কালী-কলম, ঘর-দ্বার সব—আর কোথা হইতে সেই অন্ধকারে একটি আলোর সূক্ষ্ম কিরণ সাত বৎসর পূর্ব্বেকার একটী সন্ধ্যাকে আমার চোখের উপর স্পষ্ট করিয়া তুলিল।

দৃষ্টি তীব্রতর হইয়া উঠিল। অতীতের সেই স্বপ্ন, পাইন গাছের সারি, ঢালু পাহাড়, সিন্ধু-কল্লোল আর এক ফালি চন্দ্র আবার নতুন হইয়া উঠিল। খুবই অল্পক্ষণের জন্য যেন তন্দ্রা আসিয়াছিল, যেন তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। তন্দ্রা ভাঙিলে পার্শ্বে চাহিয়া দেখি, সেই সব—সেই ঘর-দ্বার, নিদ্রিতা স্ত্রী, শিশুপুত্র আর সেই আমি, আরামখালী ইস্কুলের অঙ্কের শিক্ষক—সত্তর টাকা মাহিনা পাই আর ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভুগি।

সেদিনকার সেই মনের অবস্থা আজ আবার নূতন করিয়া আমাকে পাইয়া বসিল। মনে হইল কি কদর্য্যতা!

ছবির দিকে চাহিলাম। তাহার সেই লুঙ্গি পরা ছিন্ন কোট গায়ে বিক্রেতার মূর্ত্তি স্পষ্ট আমার সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। পানওয়ালা, চায়ের দোকানের আড্ডা, "ওসই সন্ধ্যা বেলায় চাঁপাফুল—" সব মনে পড়িল।

ভাবিতেছিলাম কি করিয়া কি হইল! রাত্রের অন্ধকারে ঐ ছবিকে কেন্দ্র করিয়া যে সব কল্পনা করিয়াছি সে কল্পনার সমাধি হইল কোথায়, কবে? নিদ্রারতা স্ত্রীর পানে চাহিলাম। কোথায় সে রূপ, যাহাকে একদিন ইহার মধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম? ছবির পানে চাহিলাম, চিরকালের সেই মূক সজীবতা বিন্দুমাত্র ক্ষয় নাই। একদিন ত ইহাকেই ঐ শ্রান্তা রমণীর মধ্যে পাইয়াছিলাম—সে কি মিথ্যা? আজ কোথায় সে মিল?—অথচ একদিন ছিল।

আলো নিভাইয়া বাহিরে আসিলাম। অসীম নীলাকাশ জ্যোৎস্নায় ভাসিতেছে, মনে হইল বহুদিন যেন দেখি নাই—পথের উপর সারি সারি ঝাউ, তাহারই পাতার মর্ম্মর ধ্বনি, মনে হইল বহুদিন শুনি নাই। চোখ ভরিয়া জল আসিল ভাবিলাম কে বলিয়া দিবে, কোনটা সত্য? এই সৌন্দর্য্য, না ঐ কদর্য্যতা? এই যে স্বপ্ন-মুহূর্ত্ত, ইহার কি কোনো মূল্য নাই? এই মুহূর্ত্তে যে জীবনের আভাস পাইলাম সে কি একেবারে মিথ্যা? কোথাও তাহার ভিত্তি নাই?—এই আকাশ ভেদ করিয়া, গ্রহ চন্দ্র তারকারও অনেক উর্দ্ধে, কোথায় এই জীবন সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে?

কতক্ষণ ভাবিতেছিলাম, ঠিক নাই; আচম্কা কাহার স্পর্শে চমকিয়া উঠিলাম, ফিরিয়া দেখি, স্ত্রী।

জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাইরে কেন?"

শ্রীকিরণকুমার রায়

উত্তর না দিয়া ঘরে ফিরিলাম ; দেখি, ছবি চাহিয়া আছে, তাহার মুখে চোখে সুস্পষ্ট প্রশ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে,—"আবার ঘরে ?"

পুঞ্জীকৃত খাতা দেখিতে তখনও বাকী। প্রেয়সী বলিলেন, "এবারে ঘুমোও"।—খাতাগুলির উপর হতাশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবার আলো জ্বালাইলাম।

সংশয়

শ্রীনবেন্দু বসু

জীবনের অন্তরালে স্বপ্নতরী বাহি
আজি কি আসে সে ভেসে মরতের পানে,
পরিচিত সুর বুঝি পশে তার কানে
বৃথায় আজিকে যাহা বলিবারে চাহি ?
শুধু তো বাসনা আছে—কথা আজ নাহি—
কোন্ লোকে আছি আমি সে কি তাহা জানে,
সেথা কি আঁখির কোণে অশ্রুবিন্দু আনে
কুঞ্চিত ভ্রূযুগ তার দীর্ঘ পথ চাহি ?
চলা মোর হবে শেষ সন্ধ্যা এলে পরে,
দীপ হাতে আঁধারেতে দ্বারপথে থাকি
সে কি মোরে ডাকি লবে ব্যাকুল অন্তরে,
শুধু চেয়ে র'বে তার শঙ্কানত আঁখি ?
ঘুচিবে সকল ভয় চিনে লব যবে
পরিচিত সেই রূপ নূতন বিভবে ?

তুজুক্‌-ই-বাবর

মোহাম্মদ শামছজ্জোহা

আত্মজীবনী রচনা করা মোগল বাদশাহদিগের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। আল্লামী, বদায়নী, ফেরিস্তা, খাঁফি খাঁ—ইঁহারা ঐতিহাসিক ছিলেন, জীবন-ব্যাপী ঐতিহাসিক সাধনায় হিন্দুস্থানে ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দ্বাদশ—ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া, (১) আজীবন কঠোর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া, দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলার বিধান করিয়া, দেশের শিক্ষা দীক্ষা শিল্পকলা ইত্যাদির উন্নতি সাধন করিয়া ও দায়িত্বপূর্ণ রাজ্যশাসন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যাঁহারা এই ঐতিহাসিক বনিয়াদকে দৃঢ়তর করিতে তাঁহাদের অন্তরের যে বিপুল শক্তির ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা এই তৈমুরের বংশ ব্যতীত জগতের ইতিহাসে অন্য স্থানে বিরল। অন্তরের এই শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের ফলেই বাবর, গুলবদনবানু বেগম ও জাহাঙ্গীর বাদশাহ যে আত্মজীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা ভারতে ঐতিহাসিক সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত ইতিহাস গঠন করিতে তাহার স্থান অতি উচ্চে।

তুজুক্‌-ই-বাবর বা ওয়াকেয়াত-ই-বাবর চাঘতাই তুর্কি ভাষাতে রচিত বাবরের আত্ম-জীবনী। তুর্কি ভাষা তৎকালে মধ্যএশিয়ায় বহুল ভাবে প্রচলিত ছিল। বহু কবি ও সাহিত্যিক তুর্কি ভাষার চর্চ্চা করিয়া তাহাকে সমৃদ্ধশালী করিয়া তুলিয়াছিল। বাবর নিজে তুর্কি ভাষায় অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন ও তুর্কি গদ্য ও পদ্যে সমভাবে অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। (১) তৎকালীন জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চ্চার ভাষা ফারসী হইলেও, উক্ত ভাষায় বহু অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিলেও এবং তাঁহার স্বীয় আত্মজীবনীতে বহু ফারসী বয়েত লিপিবদ্ধ করিলেও,—বাবর তাঁহার কর্ম্মময় বিপুল জীবনের গৌরবপূর্ণ নগ্ন ইতিহাস তাঁহার স্বদেশী ভাষা চাঘতাই তুর্কিতেই রচনা করিতে অধিকতর পছন্দ করেন। কাবুল কান্দাহারের স্মৃতি যেমন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছাসের সৃষ্টি করিত, হয়ত জীবনের কৈশোরে স্বদেশ-বিতাড়িত হইয়া তাঁহার স্বদেশী ভাষা চাঘতাই তুর্কিও তেমনই করিয়া অপূর্ব্ব প্রেরণা জাগাইত, তাই তাঁহার জীবনের সুখ দুঃখের জয় পরাজয়ের কাহিনী সেই ভাষাতেই অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। তুজুক্‌ মূলতঃ তুর্কি ভাষাতে রচিত হইলেও পরে তাহাই ফারসী, ইংরাজী, রুষীয় ইত্যাদি ভাষাতে অনুবাদিত হইয়া বিশ্ব সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে * এবং এশিয়ার এই সাহিত্যিক-সম্রাটের জীবন-

(১) বাবর দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ফারগনার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। আকবর ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সাম্রাজ্য ভার গ্রহণ করেন। বাবর তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহার তুজুকের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন —In the month of Ramzan, in the year eight hundred and ninety one (A H) and in the twelfth year of my age—I became king of Ferghana.

Memoir of Babar— Erskine and Leyden

(১) Soldier of fortune as he was, Babar was none the less a man of fine literary taste and fastidious critical perception. In Persian, the language of culture .... he was an accomplished poet and in his native Turki he was master of a pure and unaffected style alike in prose and verse.

Babar · Lane Poole.

* তুজুক-ই-বাবর ফারসী, ইংরেজী, ফরাসী ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত হইলেও এ পর্যান্ত বাংলা ভাষায় তাহার কোন অনুবাদ বা ইতিহাস, আলোচনার বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, আলোচিত হয় নাই। বাংলা দেশের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিতে আরবী ফারসী শিক্ষা প্রদান করা হয়, এবং বাংলা দেশে আরবী ফারসী অভিজ্ঞ বহু আলেম থাকা সত্ত্বেও যে এই সমস্ত জাতীয় ইতিহাসের দুই একখানিরও অনুবাদ হয় নাই তাহার কারণ কে নির্ণয় করিবে? লেখক।

মোহাম্মদ শামছজ্জোহা

ইতিহাস জগৎবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে।—এপর্য্যন্ত যে কয়খানা তুর্কি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত ও বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে নিম্নে তাহা বিবৃত হইল।

(১) রুশিয়ার বৈদেশিক আফিস সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি। এই পাণ্ডুলিপি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার কার (Dr. Kehr) কোন অজ্ঞাত ভিত্তি হইতে নকল করেন। পরে ইল্‌মিনিস্কি (Ilminiski) ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত তাঁহার "কাজান সংস্করণ" সঙ্কলন করিতে ব্যবহার করেন। ইল্‌মিনিস্কির এই "কাজান-সংস্করণের" উপর ভিত্তি করিয়া প্যাভেট ডি কুর্‌টেল তাঁহার ফরাসী অনুবাদ সম্পাদন করেন। এই তুর্কি পাণ্ডুলিপি যদিও খুব প্রাচীন এবং সেই হেতু উল্লেখ যোগ্য কিন্তু ইণ্ডিয়া অফিসের ভূতপূর্ব্ব লাইব্রেরীয়ান প্রাচ্য পুস্তকাদি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মিঃ এ, জি, এলিসের মতে বিশেষ মূল্যবান নয়—অধিকন্তু স্থানে স্থানে ব্যাকরণ অশুদ্ধ ও দুর্ব্বোধ্য।

(২) এলফিনষ্টোন সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে এল্‌ফিনষ্টোন সাহেব পেশওয়ার হইতে এই পাণ্ডুলিপি ক্রয় করেন এবং অনেক অবস্থা বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া এডিন্‌বরা এডভোকেট লাইব্রেরীতে স্থান প্রাপ্ত হয়। মিঃ এলিসের মতে এই পাণ্ডুলিপি ১৫৪৩ ও ১৫৯৩ খৃঃ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে নকল করা হয়। দুঃখের বিষয় পাণ্ডুলিপি খানি মূল্যবান হইলেও অসম্পূর্ণ। ঐতিহাসিক এর্‌স্কিন সাহেব এই পাণ্ডুলিপি হইতেই তাঁহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন।

(৩) হায়দরাবাদে সালারজঙ্গের পারিবারিক লাইব্রেরীতে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি। তুজুক-ই-বাবরের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সম্পূর্ণ আকারের তুর্কি পাণ্ডুলিপি। যদিও এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির ন্যায় প্রাচীন নহে তথাপি অত্যন্ত মূল্যবান এবং বিশ্বাসী। অনুমান ১৭০০ খৃঃ অব্দে এই পাণ্ডুলিপি নকল করা হয়। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বেভারিজ সাহেবের বিদুষী পত্নী মিসেস্‌ বেভারিজ গিব্‌ মেমোরিয়ালের ট্রাষ্টিদিগের জন্য বিশেষ পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের সহিত এই পাণ্ডুলিপির সম্পাদন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সংগৃহীতও সালার জঙ্গের পারিবারিক লাইব্রেরীতে রক্ষিত এই উভয় পাণ্ডুলিপি হইতেই তুজুকের ফার্‌সী তরজমা করা হইয়াছে। ফারসীতে নিম্নলিখিত তিনখানি তরজমা আছে।

(১) মির্জ্জা আব্‌দুর রহিমের তরজমা (১৫৯০ খৃ অঃ)। বৈরাম খাঁর পুত্র মির্জ্জা আব্‌দুর রহমানখাঁন তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের ফলে আকবরের দরবারে খাঁন খাঁনানের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং আরবী, ফার্‌সী, সংস্কৃত ও হিন্দীতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। (ক) তাঁহার তরজমা যদিও মূল তুর্কি পাণ্ডুলিপির ন্যায় মূল্যবান নহে, তথাপি খুব বিশ্বস্ত এবং দুই এক স্থানে সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন থাকিলেও মূল পাণ্ডুলিপির সহিত ঘটনা সূত্রের বিশেষ কিছু অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। আকবরের দরবারের চিত্রকর কর্ত্তৃক সুচিত্রিত এই তরজমার এক খণ্ড বৃটীশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

(২) পায়েন্দাখাঁন ও মোহাম্মদ কুলীর তরজমা (১৫৮৬ খৃঃ অঃ) অসম্পূর্ণ ও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য নয়। এই তরজমার একখণ্ড ইণ্ডিয়া আফিসে রক্ষিত আছে।

(৩) শেখ জয়েন উদ্দীন কাফির তরজমা (১৫৯০ খৃঃ অঃ)। এই তরজমাতে মাত্র এগার মাসের ঘটনার অনুবাদ করা হইয়াছে। খুব সম্ভব এই তরজমাতে উক্ত এগার মাসের ঘটনা ছাড়া সম্পূর্ণ অনুবাদ করা হয় নাই। সুতরাং তরজমা অসম্পূর্ণই রহিয়া গিয়াছে।

বাবর তাঁহার জীবনের কোন সময় হইতে তাঁহার এ বিশ্ব-বিশ্রুত আত্ম-জীবনী রচনা করিতে আরম্ভ করেন তাহা তাঁহার তুজুকের কোন স্থানে উল্লেখ করেন নাই। অথবা অন্য কোন দিক হইতেও তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না।

(ক) The Khan Khanan who wrote fluently under the name of Rahim in Persian as well as in Arabic, Turki, Sanskrit and Hindi, was reckoned the Maecenas of his age. Blochman, in "Ain" Vol I. P. 332. His (the Khan Khanan's) education was unusually thorough. He acquired proficiency in Arabic, Persian, Turki, Sanskrit and Hindi. He is now chiefly remembered for his Persian version of Babar's 'memoirs' from the Turki original. V. A. Smith 'Akbar' P 118 foot note 2.

লেন্‌পুল্‌ অনুমান করেন তুজুক ভিন্ন ভিন্ন তারিখে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এবং প্রথমাংশ বাবরের ভারত আক্রমণের পর সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে কিন্তু শেষাংশ সংশোধন করিয়া পুনরায় লিখিবার অবসর হয় নাই। সেই হেতু মূলতঃ যে ভাবে লিখিয়াছিলেন সেই ভাবেই রহিয়া গিয়াছে। লেন্‌পুলের এইরূপ অনুমান করিবার কারণ প্রথমতঃ তুজুকের প্রথমাংশ লিখিবার পদ্ধতি শেষাংশের লিখিবার পদ্ধতি হইতে অনেক গুণে উচ্চ ধরণের এবং প্রথমাংশের ঘটনাবলী যেরূপ সুন্দর ধারাবাহিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে শেষাংশে সেরূপ হয় নাই। কিং, এ'রস্কাইন প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত। (১) দ্বিতীয়তঃ হিজরী ৯০৮ সালের শেষ হইতে হিজরী ৯০৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত (খৃঃ অঃ ১৫০৩-৪), হিজরী ৯১৪ সালের প্রারম্ভ হইতে হিজরী ৯২৫ সালের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত (খৃঃ অঃ ১৫০৮-১৯), হিজরী ৯২৬ সালের আরম্ভ হইতে হিজরী ৯৩২ সালের আরম্ভ পর্য্যন্ত (খৃঃ অঃ ১৫২০-২৫), ও হিজরী ৯৩৪ (খৃঃ অঃ ২রা এপ্রিল হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৫২৮), এবং হিজরী ৯৩৬ সাল হইতে হিজরী ৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত (খৃঃ অঃ ১৫২৯-৩০)—এই বিভিন্ন পাঁচ সময়ের বাবরের জীবন-ইতিহাসের কোন ঘটনা বাবর তুজুকে উল্লেখ করেন নাই। এই পাঁচটী 'শূন্যতা' কালের কুটীল গতিতে সংঘটিত হইয়াছে বা নকল নবীশদের শৈথিল্যে এইরূপ হইয়াছে বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কারণ তুজুকের প্রত্যেক তুর্কি পাণ্ডুলিপিতে ও ফার্সী তরজমাতেই এই এক শূন্যতা পরিলক্ষিত হয়।*

ঐতিহাসিক সাহিত্যকে স্থায়িত্ব প্রদান করিতে হইলে আলোচ্য বিষয়ের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি ও তাহার জন্য গভীর গবেষণা ও প্রকাশ করিবার উপযুক্ত শক্তির একান্ত প্রয়োজন। বাবরের কঠোর সৈনিক জীবনে এই গুণরাজির সমাবেশ দেখিয়া সত্যই চমৎকৃত হইতে হয়। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া, কাবুল, সমরখন্দ, ফারগানা বিশেষ করিয়া হিন্দুস্থান ‡ ইত্যাদি যে সমস্ত দেশে তাঁহাকে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল সেই সমস্ত দেশের প্রাকৃতিক, ভৌগলিক ও রাজনৈতিক বিবরণ—সেই সমস্ত দেশবাসীর রুচি, রীতিনীতি, পোষাক পরিচ্ছদ, শিল্পকলা এবং সভ্যতা ইত্যাদি যেরূপ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অনুভব করিয়াছেন ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও নিপুণতার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সত্যই অতুলনীয়। * মধ্য এশিয়ার তেজঃদৃপ্ত কর্ম্মময় জীবনের যে ভাবপ্রবাহ হিন্দুস্থানে বিরাট রাষ্ট্রের স্থাপন করে, তুজুক-ই-বাবরে সেই ভাব প্রবাহের স্বরূপ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু সাহিত্য বা ইতিহাস হিসাবে নহে—নানাদিক হইতে বিচার করিয়া তুজুক বাবর শাহের অমরকীর্ত্তি।

(১) Vide—'Babar'—Lane-Poole

Memoirs of Babar—Translators (Erskines) Preface

Memoirs of Babar—Editor's (King's) Preface.

* বাবরের জীবনের এই বিভিন্ন পাঁচ সময়ের ইতিহাস প্রধানতঃ খাফিখাঁর 'মনতাখাব-উল-লুবাব', শাহ নেওয়াজ খাঁনের 'মসিরউল—ওমারা', মুন্সী ইস্কেন্দার বেগের 'তারিখ-ই-আলমআরার-ই-আব্বাসি' এবং খাজা নিজাম উদ্দীন আহমদের 'তাবাকাত-ই-আকবরি' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

‡ তুজুকে বর্ণিত বাবরের হিন্দুস্থানের বর্ণনা এত চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান যে তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচনা সম্ভব নহে। তাহা বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

* * * they (the memoirs) contain the personal... impressions and acute reflections of a cultivated man of the world, well read in Eastern literature, a close and curious observer, quick in perception, a discerning judge of persons, and a devoted lover of nature --

Lane-Poole—"Babar"

The style is plain and manly, as well as lively and picturesque, and being the work of a man of genius and observation, it presents his countrymen and contemporaries, in their appearance, manners, pursuits, and actions as clearly as in a mirror. In this respect it is almost the only specimen of real History in Asia ;... In Babar the figures, dress, tastes, and habit of each individual introduced are described with such minuteness and reality that we seem to live among them, and to know their persons as well as we do their characters. His descriptions of the countries he visited, their scenary, climate, productions, and work of art and industry, are more full and accurate than will, perhaps be found, in equal space, in any modern traveller.

Elphinstone--History of India p. 438.

২০

জ্যোতি যখন তরলাকে লইয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইল তখন ভূপতি বাড়ী ছিল না—একটু হাওয়া খাইবার জন্য বাহির হইয়াছিল।

তরলা কিছুতেই গাড়ী হইতে নামিতে চাহিল না, বড়দা ও বউদিদির কাছে সে কিছুতেই মুখ দেখাইতে পারিবে না বলিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। জ্যোতি অনেক বুঝাইয়া পড়াইয়া তাকে নামাইল।

সুরমা তখন ভাঁড়ারে ব্যস্ত ছিল। গৃহিণী আজ অনেক দিনের পর আনন্দ করিয়া আবার তাঁর সংসার গুছাইতে ছিলেন। জ্যোতি ভাঁড়ারে ঢুকিয়া শিশুর মত উচ্ছ্বসিত আনন্দের বেগে বউদির হাত ধরিয়া তাকে হিঁড় হিঁড় করিয়া টানিয়া আনিল বারান্দায় যেখানে অন্ধকারে তরলা দাঁড়াইয়াছিল।

সুইচটা টিপিয়া আলো জ্বালিয়া সে বলিল, "দেখ বউদি, কে এসেছে।"

সুরমা একাগ্রভাবে তরলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, সে দৃষ্টির সম্মুখে তরলা কুণ্ঠিত অবনত হইয়া পড়িল। তার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল নিদারুণ শঙ্কায়—বউদিদি কি বলিবেন?

অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে চাহিয়া সুরমা বলিল, "বলতে সাহস হয় না ঠাকুর পো—হয় তো আশার ঠকামি—এ কি আমাদের তরী?"

হাসিয়া জ্যোতি বলিল, "হাঁ বউদি হাঁ, ভগবান যখন দেন তখন এমনি হাত উজাড় ক'রে দেন। আজ আমরা সব ফিরে পেলাম—ভেবে দেখ বউদি!"

সুরমার সাগরের মত হৃদয়ের আনন্দে এ উচ্ছ্বাস ছিল না, কিন্তু তার সমস্ত চোখ মুখে স্নিগ্ধ আনন্দের তীব্র জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। সে হাত বাড়াইয়া তরলাকে বুকে টানিয়া লইতে গেল।

তরলা দু হাত পিছাইয়া গেল, সুরমা থমকিয়া দাঁড়াইল।

তরলা কাতরস্বরে বলিল, "ছোড়দা, সব কথা ওঁকে খুলে বল, নইলে"—

সুরমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জ্যোতির দিকে চাহিল। জ্যোতি মুখ খুলিতেই তরলা মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া জ্যোতি সুরমাকে আড়ালে লইয়া সমস্ত বিবরণ খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া সুরমা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া বলিল, "হা ভগবান।"

জ্যোতি একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। সুরমা যে সমস্ত কথা শুনিয়া তরলাকে বুকে টানিয়া লইতে কোনো সঙ্কোচ করিতে পারে, এ কল্পনাও জ্যোতি করে নাই, তাই সে তরলাকে সাহস করিয়া সোজা তার কাছে লইয়া আসিয়াছিল, আগে খবর দিবার আবশ্যকতা বোধ করে নাই। সে একটু আহত হইল। বলিল, "তুমি কি ভাবছো বউদি?

এতদিন পরে হারানিধি পেলে, তাকে কোলে তুলে নিতে এত ভাবনা ?"

সুরমা উদাস ভাবে বলিল, "ভাবনা তা নয় ঠাকুরপো, ভাবনা এই যে আমার এমন রত্ন নষ্ট হ'য়ে গেছে। দেবতার পূজার ফুল কুকুরে চেটে গেছে! এত দুঃখ লিখেছিলে ভগবান অভাগিনীর অদৃষ্টে।"

জ্যোতির এ কথায় রাগ হইল; সে বলিল, "বেশ তবে তোমরা তোমাদের পবিত্র দেবতা নিয়ে থাক, ফুলটি আমি মাথায় ক'রে নিয়ে চল্লাম। চল্লাম কিন্তু জন্মের মতন—আমার বোনকে যে ঠাঁই না দেবে সে আমার কেউ নয়।" বলিয়া সে ফিরিল।

সুরমা সংযত হইয়া বলিল, "পাগলের মত কি বক্‌ছো ঠাকুরপো! আমি কি তাই ব'লেছি যে এমন শক্ত কথাটা বল্লে আমায়? ঠাঁই দেবনা শুধু তাকে, কোলে ক'রে তুলে নেব। ছেলের যদি চক্ষু অন্ধ হ'য়ে যায় তবে মা তাকে আরও বেশী ক'রে কোলে জড়িয়ে ধরে। তবু রোগের জন্য তার প্রাণ কাঁদে না কি ?"

জ্যোতি ফিরিয়া বলিল, "মাপ কর বৌদিদি, আমি এক মুহূর্ত্তের জন্য তোমার স্নেহে সন্দেহ ক'রেছিলাম—আমার বড় অপরাধ হ'য়ে গেছে!"

তখন তারা দুজনে তরলার কাছে আসিল। সুরমা তরলাকে কোলের ভিতর সাপটিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আয় দিদি। তোর ও কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে মুখ হাত ধুয়ে বোস।" তরলার মুখে রঙিন পাউডারের পুরু প্রলেপের উপর রঙ করা ঠোঁট আর কালি দেওয়া ভুরু তার প্রাণের ভিতর ছুঁচের মত বিঁধিতেছিল, সেগুলি ধুইয়া ফেলিয়া তাকে ভদ্রভাবে সাজাইবার জন্য সুরমা ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

তখন জ্যোতি বলিল, "তবে তুমি ওকে দেখ শোন বউদি, আমি একবার বিনোদ বাবুর ওখান থেকে আসি। তিনি আমাকে একবার যেতে ব'লেছিলেন।"

বিনোদের কাছে গিয়া জ্যোতি তার বৈঠকখানায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে করিতে বিমলার দেওয়া বিলাসের চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল। মোড়ক খুলিয়া জ্যোতি অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, তার ভিতর ছিল পঁচিশ হাজার টাকার এক-খানা চেক, আর তার নামে একখানা চিঠি। খুব ব্যস্তভাবে চিঠিখানা সে পড়িল,

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন,

আপনার প্রতি কর্ত্তব্য করিবার জন্য আমার যাহা কিছু সাধ্য ছিল করিয়াছি। ইহাতে আপনার তৃপ্তি হইলে সবই সার্থক বিবেচনা করিব।

এই চিঠির সঙ্গে কিছু টাকা পাঠাইলাম আপনার আশ্রমের সাহায্যের জন্য। পাপের অর্জ্জন বলিয়া ঘৃণা করিবেন না, দয়া করিয়া ইহা গ্রহণ করিয়া আমাকে প্রায়শ্চিত্তের অবসর দিবেন। ইতি

প্রণতা

বিলাসিনী দাসী

বিস্ময়ে পুলকে প্রশংসায় জ্যোতির চিত্ত ভরিয়া উঠিল। সে ভগবানের কাছে বারবার আপনার প্রণাম জানাইল। সর্ব্বজীবে যে নারায়ণের অধিষ্ঠান আছে সে সত্য সে আজ যেমন করিয়া বুঝিল তেমন করিয়া সে কোন দিনই বুঝে নাই।

বিনোদ নামিয়া আসিলে জ্যোতি বলিল, "দাদা আপনি আমাদের যা' ক'রেছেন তা' বলবার নয়। চিরজীবন আপনার দাসত্ব ক'রলে আপনার ঋণ শোধ হবে না। আপনি হঠাৎ না গিয়ে পড়লে রাধাকিশেন দাদাকে ঠকিয়ে নিত।"

"তার জন্য যদি কারও কাছে তোমার চিরজীবন দাসত্ব করবার দরকার থাকে জ্যোতি, সে আমি নয়। তোমরা যে ভাবছো আমি হঠাৎ গিয়ে প'ড়েছিলাম সে ঠিক নয়। আমি গিয়েছিলাম সকাল-বেলায় এই চিঠিখানা পেয়েছিলাম ব'লে।" বলিয়া বিনোদ একখানা চিঠি জ্যোতির হাতে দিল।

জ্যোতি হড়হড় করিয়া পড়িল—একখানা বেনামী চিঠি :—

"প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন

আপনি ভূপতিবাবুর বন্ধু তাই আপনাকে একটা অনুরোধ করছি। ভূপতিবাবু যে রাধাকিশেন বাবুকে বিজলী থিয়েটারের লীজ দিয়েছেন তাতে রাধাকিশেনের খুব বেশী

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

লাভ হ'চ্ছে। ঠিক হিসাব হ'লে এতে এক বৎসরেই ভূপতি-বাবুর ধার শোধ হ'য়ে যাবে—অথচ রাধাকিশেন এত লাভের ব্যবসাটা ছাড়তে চায় না। সেইজন্য সে ভূপতিবাবুকে ফুসলিয়ে একটা দশ বছরের লীজ ক'রে নিতে চায়। আজ সন্ধ্যাবেলায় রাধাকিশেন ভূপতিবাবুর কাছে যাবে। আপনি দয়া ক'রে সেই সময় যাবেন, আর কিছুতেই ভূপতি বাবুকে ওই সর্ত্তে রাজী হ'তে দেবেন না।

দরকার হ'লে রাধাকিশেন ওই থিয়েটার কিনে নিয়ে তার বদলে ভূপতি বাবুর সব দেনা ও বন্দক ছেড়ে দিতে অনায়াসে রাজী হ'বে সে আমাকে একথা বলেছে। আপনি খুব চেপে ধরবেন, তার কমে কিছুতেই রাজী হবেন না। দয়া ক'রে আপনার বন্ধুর এই উপকারটা ক'রবেন।

এই চিঠির কথা ভূপতি বাবু কি রাধাকিশেন জানতে পারলে আমার সর্ব্বনাশ হবে, তাদের কিছুতেই জানাবেন না। দরকার বোধ ক'রলে জ্যোতি বাবুকে জানাতে পারেন। ইতি—

জ্যোতি তাড়াতাড়ি পত্রখানা শেষ করিয়াই পকেট হইতে বিলাসের পত্র টানিয়া বাহির করিল। দুই লেখা মিলাইয়া দেখিল।

বিনোদ বলিল, "তোমাদের এ হিতকাঙ্ক্ষীটি কে হে জ্যোতি?"

জ্যোতি দুইখানা চিঠি একসঙ্গে বিনোদের কাছে ধরিয়া বলিল, "দেখুন কে।—বিলাসিনী।"

বিনোদ বিস্মিত হইল না, সে বলিল, "আমিও তাই আঁচ ক'রেছিলাম।"

জ্যোতি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "অদ্ভুত নয়? কি প্রকাণ্ড এ মেয়েটির প্রাণ!"

বিনোদ হাসিয়া বলিল, "হ'তে পারে কিন্তু আমি উকীল মানুষ, অত সহজে লোকের অনর্থক উদারতায় বিশ্বাস করি না। আমার বিশ্বাস ও মেয়েটার অভিসন্ধি ভাল নয়। যা' হ'ক তুমি সাবধান থেক, সাবধানের মার নেই।"

জ্যোতি অবাক্ হইয়া গেল। সে বলিল, "একটি অন্যায় সন্দেহ ক'রছেন দাদা, এর ভিতর খারাপ অভিসন্ধি কি থাকতে পারে? আপনি জানেন না তাই বলছেন বোধ হয়।" বলিয়া জ্যোতি বিলাসের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের বিশদ বিবরণ বিনোদকে বলিল।

বিনোদ বলিল, "এতে আমার সন্দেহ আরও গভীর হ'চ্ছে। আমিও গিয়েছিলাম তার কাছে। আমার কাছে সে যা বলেছিল তা' থেকেই আমার সন্দেহ হ'য়েছিল; এখন তোমার কথা শুনে স্থির বিশ্বাস হ'চ্ছে—সে ভূপতিকে ছেড়ে দিয়েছে, কেন না এখন সে তাক ক'রছে তোমাকে।"

"আমাকে?—অসম্ভব। দাদা, আমি এমন একটা কিছু নই যার জন্য সে এতটা কর'তে যাবে—"

"নিখরচায় এতটা করা খুব বেশী কথা নয়।"

"নিখরচায়? দেখছেন না পঁচিশ হাজার টাকার চেক। হয় তো তার সমস্ত জীবনের সঞ্চয়।"

"আমার বিশ্বাস সে ওটা এই আশায় পাঠিয়েছে যে তুমি ওটা নেবে না—পেটও ভরবে জাতও যাবে না।"

জ্যোতির এসব কথা ভাল লাগিল না। মানব চরিত্রের প্রতি এতটা অশ্রদ্ধা তার ছিল না, তাই সে বিলাসের ত্যাগটাকে এমনি ছোট করিয়া দেখিতে পারিল না। কিন্তু ইহা লইয়া সে বিনোদের সঙ্গে তর্ক করা সঙ্গত মনে করিল না। সে বলিল, "সে যা ভেবেই যা করুক, সে আমাদের জন্যে যা' ক'রেছে তার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ না হ'য়ে পারি না।"

বিনোদ বলিল, "তোমার এ সরল উদারতাকে আমি খর্ব্ব করতে চাই না; কৃতজ্ঞ হ'তে চাও হও, কিন্তু তবু, আমার কথাটাও মনে রেখো, সাবধানের মার নেই। অবিশ্যি তোমার সম্বন্ধে আমার ভয় নেই। তবু এত বড় মহত্ত্বের ধাক্কা তুমি সামলাতে নাও পারতে পার, তাই সাবধান করছি। একটা কথা বলে দিচ্ছি। তুমি তাকে ধন্যবাদটা চিঠি লিখেই দিও, তার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা ক'রো না।"

বিনোদের একথায় জ্যোতির মনটা বড় ধাক্কা খাইল—সে অপ্রসন্ন হইল। বিলাসের প্রতি তার শ্রদ্ধা বিনোদ খর্ব্ব করিতে পারিল না, কিন্তু বিনোদের প্রতি জ্যোতি একটু অপ্রসন্ন হইল। তার মনে হইল ওকালতিতে কেবল লোকের কুটিলতার সংস্পর্শে আসিয়া বিনোদের চিত্তের

দৃষ্টিক্ষেত্র বড় সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ সন্ধ্যাবেলায় বিলাসের যে দীনমূর্ত্তি সে দেখিয়াছে এবং তার মুখে যে স্নিগ্ধ পবিত্রতার ছায়া দেখিয়াছে তাহাতে তার সন্দেহ রহিল না যে বিনোদ ভ্রান্ত।

বিনোদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা সারিয়া যখন জ্যোতি তাদের বাড়ীতে গেল তখন সে দেখিল তুমুল কাণ্ড বাঁধিয়া গিয়াছে।

ভূপতি বাড়ীতে ফিরিয়া অবধি অত্যন্ত নির্জ্জনে অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে বাস করে। কোনও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সে দেখা করিত না, জ্যোতির সঙ্গে এপর্য্যন্ত সে সাক্ষাৎ করে নাই। সুরমা গায়ে পড়িয়া তার সেবা যত্ন করিত, তাহা সে অত্যন্ত কুণ্ঠার সহিত গ্রহণ করিত, কিন্তু তাকেও যথা সম্ভব এড়াইয়া চলিত। তার ভাব ছিল কেবল খোকার সঙ্গে। তাকে লইয়া দিনরাত সে উপরের ঘরে পড়িয়া থাকিত।

ভূপতির মনে স্থির বিশ্বাস ছিল তাকে সকলেই অত্যন্ত ঘৃণা করে, মুখে যে যাই বলুক না কেন। সুরমা যে তাকে এত আদর যত্ন করে, তার তলায়ও সে একটা গভীর অশ্রদ্ধা ও ক্ষমার উদারতা-বোধ কল্পনা করিয়া আপনাকে পীড়িত করিত। এ কয় বৎসর সুরমার সঙ্গে তার যা কিছু সম্ভাষণ হইয়াছে সব সে স্মরণ করিত—তার ভিতর সুরমা বরাবর একটা নিদারুণ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছে, ঘৃণা করিয়াছে—অপমান করিয়াছে। আজ সে হঠাৎ ঘরে ফিরিয়া আসিতেই যে সুরমার চেহারা এমন ফিরিয়া গিয়াছে এটা সে একটা উচ্চ অঙ্গের অভিনয় বলিয়া মনে করিল। সুরমা তাকে এখনও ঠিক আগের মতই ঘৃণা করে, কিন্তু পাছে আবার ভূপতি বিগড়াইয়া যায় তাই সে চেষ্টা করিয়া সে ভাব দমন করিয়া স্নেহ ভক্তির অভিনয় করে ইহাই হইল তার স্থির বিশ্বাস। প্রথমে সুরমার ব্যবহারে সে মুগ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু যখন একবার এ সন্দেহ তার মনে বাসা করিল তখন সে সুরমার প্রত্যেক কথা ও কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিয়া অনেক কথা ও কাজের ভিতর সুরমার এই ঘৃণা ও অভিনয়ের পরিচয় ধরিয়া ফেলিয়াছিল। তাই অনেকদিন ধরিয়া সুরমার প্রতি একটা গভীর বিরাগ ও ক্রোধ তার মনের ভিতর পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল। তার বলিবার মুখ ছিল না, তাই সে কিছু বলিত না, কিন্তু চুপ করিয়া সে মনের ভিতর এই কথা পুষিয়া অসহ্য মর্ম্মপীড়া বোধ করিত।

সকালে ও সন্ধ্যায় সে বেড়াইতে যাইত। ময়দানের সবচেয়ে নির্জ্জন অংশে বসিয়া সে আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া এই কথাই ভাবিত—মনে করিত, এমন করিয়া ঘৃণিত লাঞ্ছিত জীবন সে বহিয়া বেড়াইবে কি করিয়া। অনেকক্ষণ এমনি নির্জ্জন দুঃখ-ভোগের পর সে বাড়ী ফিরিয়া আসিত।

আজ বাড়ী ফিরিয়া সে দেখিল বারান্দায় সুরমার পাশে বসিয়া আছে—তরলা। পরস্পরের দিকে চোখ পড়িতেই ভূপতি ও তরলা এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তারপর তরলা মুখ লুকাইয়া ঘরে পলাইল, ভূপতি মুখ গুঁজিয়া বাহিরের ঘরে ফিরিয়া গেল।

সুরমা তরলার পিছু পিছু ঘরে ঢুকিয়া তাকে ধরিয়া বলিল, "ভালো মেয়ে দেখ, তোর বড়দা'কে দেখে পালালি কিরে? চল নিয়ে যাই তোকে ওঁর কাছে।"

সুরমার পায় পড়িয়া কাতরভাবে তরলা বলিল, "মাপ করুন বউদি, আমাকে ওঁর কাছে নিয়ে যাবেন না, ওঁকে আমি মুখ দেখাতে কিছুতেই পরেবো না।" সুরমা বেশী টানাটানি করিতে সে যখন কাঁদিয়া ফেলিল, তখন সুরমা তাহাকে ত্যাগ করিল।

স্বামীর কাছে আসিয়া সুরমা বলিল, "কে এসেছে জান?"

গম্ভীর হইয়া ভূপতি বলিল, "জানি।"

সুরমা বলিল, "জান? আশ্চর্য্য নয়? আজকের দিনেই তরলা এসে পৌঁছুল!"

ভূপতি বলিল, "ওকি আপনি এসেছে, না কেউ নিয়ে এসেছে?"

"জ্যোতি নিয়ে এসেছে ওকে।"

"তা এখানে কেন?"

"ওমা সে কি? এখানে আনবে না তো কোথায় নেবে?"

"যেখানেই হউক, এখানে নয়। তুমি জান না ওকে তাই বলছো। আমি ওকে জানি ও একটা নামজাদা বেশ্যা, ঘোর মাতাল! ওকে ঘরে রাখবে কি?"

সতী

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুরমা বলিল, "ওর সব কথা জ্যোতি ব'লেছে আমাকে। বড় কষ্টের কথা যে ওর এমন দশা হ'য়েছে। কিন্তু তাই ব'লে তো মায়ের পেটের বোনকে ফেলতে পার না তুমি।—ওর যে এ দশা হ'য়েছে সে তো এক রকম আমারই দোষে।"

"মায়ের পেটের বোন কোন ছার, আপনার মেয়েকে পর্য্যন্ত ফেলতে পারি যদি সে ওর মত মাতাল বদমায়েস হয়।"

"ওগো তুমি কি বলছো? দোষ ক'রেছে বলে ওকে ফেলে দেবে ডুবে ম'রতে। দোষ কে না করে? কিন্তু যখন দোষ ক'রে লোকে অনুতাপ করে, তখন কি তার আপনার লোকের উচিত নয় যে তার হাত ধ'রে তোলে। তুমিও তো এতদিন কি না ক'রেছ—কিন্তু সেই কথা মনে ক'রে"—

ফোঁস করিয়া এ কথায় ভূপতি জ্বলিয়া উঠিল। সুরমার কথাটা ফস্ করিয়া মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, ইহাতে যে ভূপতির মনে কত বড় খোঁচা লাগিবে তাহা সে তখন আঁচ করিতে পারে নাই। যে আপনি লজ্জিত, তাকে লজ্জা দেওয়ার মত কঠিন আঘাত নাই। তাই এ কথায় ভূপতি ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিল, "হাঁ গো হাঁ, সে কথা জানি, আমি যে ভয়ানক পাপী, আর তুমি যে দেবী হ'য়ে আমাকে পরিত্রাণ ক'রছো তা জানি। কিন্তু এ পরিত্রাণের মাত্রা এত বাড়াবাড়ি ক'রলে চলবে না। তুমি আর তোমার দেওর মিলে যে বাজারের বেশ্যা পরিত্রাণ ক'রে বাড়ী ভর্ত্তি করবে সে চলবে না। তোমরা দেব দেবী হ'তে পার, আমি মানুষ, আর এ বাড়ী আমার। এখানে ও সব পরিত্রাণ চলবে না।"

সুরমা ঘা খাইয়া প্রথমে ভয়ানক মুসড়াইয়া গেল। কিছুক্ষণ সে কোনও কথা বলিতে পারিল না। তারপর ধীরভাবে সে বলিল, "দেখ যা বলবার হয় আমাকে বল, অত চেঁচিয়ে ওকে শুনিয়ে বলবার দরকার নেই।"

রাগিয়া ভূপতি বলিল, "আমার আওয়াজ পছন্দ না হয় তফাতে যাও, আমাকে বিরক্ত ক'রো না।"

"কি বলছো তুমি আজ কি ক্ষেপে গেলে নাকি?"

"ক্ষেপি, পাগল হই যা হই সে আমার খুসী—আমার বাড়ীতে আমি ক্ষেপবো তাতে কোনও শালীর তোয়াক্কা রাখি না।"

দীর্ঘ দিন নীচ সাহচর্য্যে ভূপতির অভ্যস্ত এই ইতর সম্ভাষণে সুরমার রাগ চড়িয়া গেল, সেও কয়েকটা খুব শক্ত কথা বলিল। ভূপতি সমান ওজনে জবাব দিল, ঝগড়া বাড়িয়া চলিল।

ভয় পাইয়া তরলা ঘরে ঢুকিয়া সুরমার পায় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "দোহাই বউদি, তুমি ক্ষমা দেও। আমার জন্য ঝগড়া করো না বড়দার সঙ্গে, আমি চ'লে যাচ্ছি ছোড়দার কাছে।"

তরলাকে সাপটিয়া ধরিয়া সুরমা বলিল, "কক্ষণো না। কে তোকে তাড়ায় দেখি। কার বাড়ী থেকে কাকে তাড়াচ্ছ তুমি! আমার শ্বশুরের টাকা খাচ্ছ তুমি, শ্বশুরের সন্তানদের এমনি একে একে দূর ক'রে দেবে? আমি তা' হ'তে দেবো না।"

ভূপতি দাঁত খিঁচাইয়া বলিল, "আ মরি শ্বশুরের বউরে! —শ্বশুর যদি বেঁচে থাকতো তোমার তবে সুধু ওকে নয়, তোমাকে সুদ্ধ জুতো পেটা ক'রে বের ক'রে দিত বাড়ী থেকে— তখন আর ও-সব দেবীগিরী চলতো না।"

সুরমা বলিল, "শ্বশুর আমার স্বর্গে গেছেন, তাঁর সন্তানদের রক্ষা করবার ভার তোমার। কি রক্ষা করছো শুনি? এক কথায় জ্যোতিকে বাড়ী থেকে বের ক'রে দিলে তুমি—কিন্তু তার বিষয় খেতে একফোঁটা লজ্জা হ'ল না। আজ আবার আর এক জনকে বের ক'রে দিচ্ছ, কি না এরও বুঝি বিষয়ের উপর একটু দাবী থাকতে পারে। আমি থাকতে এসব চলবে না।"

"আমি থাকতে চলবে, তোমার না চলে, পথ দেখ— বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে। অত তেজ থাকে যাওনা বেরিয়ে। এ তো তোমার শ্বশুরের ভিটে নয়, আমার ভাড়াটে বাড়ী।—আমাকে যখন এত ঘেন্না তখন আমার বাড়ীতে থাকতে চাও কোন লজ্জায়? যাও।"

সুরমার এবার কান্না পাইল। সে বলিল, "কি বলছো তুমি? আমাকে বেরিয়ে যেতে বলছো? কেমন

ক'রে পারলে একথা বলতে।" তার চোখের জল সে রোধ করতে পারিল না।

"কেন পারবো না, দুশোবার পারবো। বরং আমিই আশ্চর্য্য হচ্ছি যে এত তেজ দেখিয়ে শেষে তুমি আমার আশ্রয়ের জন্য কান্নাকাটি করছো। লজ্জা করে না, যাকে এত ঘেন্না কর পেটের দায়ে তার কাছে মায়াকান্না কাঁদতে লজ্জা হয় না? তুমি কি বেশ্যারও অধম?"

সুরমার অন্তরের ভিতরটা ঘৃণায় তিক্ত হইয়া উঠিল। দৃপ্ত সিংহীর মত সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে বলিল, "আচ্ছা বেশ, তাই হ'বে, এর পর এ বাড়ীতে আর আমি এক দণ্ডও থাকবো না।" বলিয়া সে তরলার হাত ধরিয়া উপরে চলিল।

ভূপতি বলিল, "সাবধান, খোকাকে নিয়ে যেওনা কিন্তু! আমার ছেলে বেশ্যার সঙ্গে মানুষ হয় তা' আমি চাই না।"

এক মুহূর্ত্ত সুরমা দাঁড়াইয়া রহিল। একটা আর্ত্তনাদ করিয়া সে বলিল, "হা ভগবান, এত অদৃষ্টে লিখেছিলে?"

ঠিক সেই সময় জ্যোতি আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরমা একটা তোরঙ্গের মধ্যে তার নিতান্ত আবশ্যকীয় কিছু জিনিষ গুছাইয়া লইল। ঘুমন্ত খোকার মুখে বার বার চুম্বন করিল—তারপর সে জ্যোতি ও তরলার সঙ্গে জ্যোতির আশ্রমে চলিয়া গেল। তরলা সমস্তক্ষণ কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

যাইবার সময় সুরমা ভূপতিকে প্রণাম করিতে গিয়াছিল, ভূপতি ঝটকা মারিয়া দূরে সরিয়া গেল। সুরমা সাশ্রুনয়নে ফিরিল। পশ্চাৎ হইতে ভূপতি বলিল, "তেজ ক'রে যাচ্ছ যেমন, দেখো যেন আর ফিরতে চেও না। ফিরতে যদি চাও কোনও দিন, তো তোমার ছেলের মাথা খাও।"

সুরমার সারা অঙ্গ এ দিব্যে শিহরিয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিল, "ষাট্, ষাট্।"

২১

থিয়েটারের ষোল আনা মালিক হইয়া তারপর দিন সন্ধ্যাবেলায় রাধাকিশেন খুব ঘটা করিয়া থিয়েটার জাঁকাইয়া তুলিবার সঙ্কল্প করিয়া বিলাসের কাছে গেল। বিলাসের বাড়ী গিয়া দেখিল সে বাড়ী নাই, তালা বন্ধ করিয়া একজন অপরিচিত দারোয়ান বসিয়া আছে।

বজ্রাহত রাধাকিশেন জিজ্ঞাসা করিল, "বিলাস বিবি কোথায় গেছে?"

দ্বারবান বলিল, "আমি জানি না।"

"তুমি কে?"

"সে কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ মাড়োয়ারী বাড়ীওয়ালার নাম করিয়া বলিল, যে সে তাহার দ্বারোয়ান।

"তুমি এখানে কি ক'রছো?"

সে জানাইল যে বিলাস মায়-আসবাব এ বাড়ীখানি তার মুনিবকে বিক্রী করিয়াছে, আজ তার মুনিব দখল লইয়াছেন—দ্বারোয়ানটি সেই দখলের সাক্ষাৎ প্রতীক।

"কিন্তু সে গেল কোথায়?"

দ্বারোয়ান একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, তাকে সে সম্বন্ধে বিলাস কিছু বলিয়া যায় নাই।

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রাধাকিশেন থিয়েটারে গেল, সেখানে বিলাসকে অবশ্য পাওয়া যাইবে কেন না আজ তার অভিনয় আছে এবং তার সঙ্গে দেখা হইলে এ রহস্যের একটা কিনারা নিশ্চয়ই হইবে। বিলাস হঠাৎ বাড়ীটা বেচিতে গেল কেন? এ সম্বন্ধে তার সঙ্গেই বা কোনও কথা বলিল না কেন? তার কি কোনও দেনা পত্র ছিল? কিন্তু সে কথা তো সে কোনও দিন বলে নাই। রাধাকিশেনের কাছে কোনও দিন সে টাকা পয়সা চায় নাই, কেবল চুক্তিমত মাসিক বৃত্তি রাধাকিশেন তাকে দিয়াছে, তাও দুই মাসের বৃত্তি বাকী পড়িয়া আছে, তার তাগিদ পর্য্যন্ত করে নাই। হঠাৎ তার কি এমন টাকার দরকার পড়িল যে সে তার বাড়ীখানা বিক্রী করিতে বাধ্য হইল? রাধাকিশেন এসব প্রশ্নের কোনও সমাধান আবিষ্কার করিতে পারিল না। সমস্ত ব্যাপারটা একটা প্রহেলিকার মত তার কাছে মনে হইল, আর ইহা তার মনে বিশেষ পীড়া দিতে লাগিল। বিলাসের একটা গোপন দুঃখ আছে, আর রাধাকিশেন সে সম্বন্ধে কিছু করিতে পারিতেছে না ইহাতে তার মনে খুব ব্যথা লাগিল।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

থিয়েটারে গিয়া রাধাকিশেন শুনিল বিলাস ও প্রভা তখনও আসে নাই, তাদের বাড়ীতে গাড়ী গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—তারা বাড়ী নাই, কখন আসিবে জানা নাই। প্রহেলিকা আরও গভীর হইয়া উঠিল। রাধাকিশেন পাগলের মত ছট ফট করিয়া পায়চারী করিতে লাগিল।

থিয়েটারের অভিনয় আরম্ভ হইতে দশ মিনিট দেরী তবু প্রভা বা বিলাস আসিল না। প্রভার বাড়ীতে গাড়ী আবার গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। রাধাকিশেনের অস্থিরতা অসহ্য হইয়া উঠিল। তার মনে এখন সন্দেহ হইল ইহার ভিতর জুয়াচুরী আছে। ভূপতি বিলাসকে দিয়া চক্রান্ত করিয়া তার কাছে থিয়েটার বিক্রী করিয়া দেনা শোধ করিয়া লইয়াছে, এখন দলিল সম্পাদন হইয়া গিয়াছে তাই সে বিলাসকে সরাইয়াছে, এ সম্বন্ধে তার সন্দেহ মাত্র রহিল না। সে তার সহজ উচ্চ কণ্ঠের চেয়ে অনেক বেশী তীব্র কণ্ঠে ভূপতি ও বিলাসকে গালিগালাজ করিয়া শাসাইতে লাগিল আর পাগলের মত ছট্‌ফটাইতে লাগিল। ম্যানেজার বিলাস ও প্রভার বদলি দুইটি মেয়েকে সাজাইয়া অপ্রসন্ন চিত্তে ড্রপ উঠিবার ঘণ্টার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বিলাসের প্রথম দৃশ্যেই নামিবার কথা ছিল।

ড্রপ উঠিবার পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে বিলাস ছুটিয়া আসিল। সে ভূপতির আশ্রম হইতে সোজা ছুটিয়া আসিয়াছে। ম্যানেজার ও রাধাকিশেন দুজনেই তাকে দেখিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ম্যানেজার বলিল. "কোথা ছিলে এতক্ষণ—আমরা তো ভেবে অস্থির! যাও শীগ্‌গির যাও।"

রাধাকিশেন তার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কোথায় গিয়েছিলে তুমি?—কি হ'য়েছে—এ সব তোমার কি কাণ্ড?" ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্ন করিতে লাগিল।

বিলাস হাঁপাইতেছিল। সে বলিল, "ছাড়ুন, ছাড়ুন, তাড়াতাড়ি সেজে নি—পরে কথা হবে।" বলিয়া ছুটিয়া সে সাজ ঘরে ঢুকিল।

ড্রপ উঠিতে দশ মিনিট দেরী হইল। কিন্তু তারপর বিলাস তার অভ্যস্ত নিপুণতার সহিত অভিনয় করিয়া সকলকে তৃপ্ত করিল।

একবার বিলাস ভিতরে আসিতেই ম্যানেজার বলিল, "হাঁ বিলাস, প্রভার কি হ'য়েছে? কোথায় গেছে সে জান?"

বিলাস হাসিয়া বলিল, "জানি, সে বোধ হয় থিয়েটারে আর আসবে না।"

"কেন বল তো? কি হ'য়েছে?"

"যা হ'য়ে থাকে।"

"সে কি? কে নিয়ে গেছে তাকে?"

"তা ঠিক জানি না, তবে সে আর থিয়েটারে আসবে না।"

রাধাকিশেন হাঁউ মাঁউ করিয়া উঠিল। সে বলিল, "দেখ তো বেইমানি, আমি তোমাদের দুজনের ভরোসা করিয়ে এতনা টাকা দিয়ে থিয়েটার নিলাম—আর এমনি বেইমানি ক'রে চলিয়ে যাবে।"

বিলাস হাসিয়া বলিল, "যাবে না কেন বলুন বাবু, তাকে তো আটকে রাখবার কোনও ব্যবস্থা করেন নি আপনারা, আমাকে যেমন আটকেছেন।"

রাধাকিশেন ম্যানেজারকে বলিল, "এ আপনার দোষ ম্যানেজার বাবু—হামি বোল্লাম ওর সঙ্গে কন্‌ট্রাক্ট লিখিয়ে পড়িয়ে লিন—সে আজ কাল করিয়ে করাই হ'ল না।"

ম্যানেজার বলিল, "আমার কি দোষ বলুন আপনিই তো শেষে তার হাঁক ডাকে দম ধরলেন। সে যে তিনশো টাকার কম কিছুতেই কন্‌ট্রাক্ট ক'রতে রাজী হ'ল না।"

তখন প্রভার যেখানে নামিবার কথা সেই দৃশ্যের অভিনয় হইতেছিল। প্রভার স্থানে যে অভিনেত্রী নামিয়াছিল সে একে কাঁচা অভিনেত্রী, তায় সে ভাল করিয়া প্রস্তুত হয় নাই, কাজেই তার অভিনয় ভাল হইল না। দর্শকমণ্ডলী প্রভাকে না দেখিয়াই অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। নূতন অভিনেত্রী যখন প্রভার কাছাকাছিও কিছু করিতে পারিল না তখন পিছনের বেঞ্চিগুলি হইতে "দুয়ো দুয়ো" "বেরো বেরো" "প্রভা কই?" ইত্যাদি বিচিত্র কলরব উত্থিত হইল। ম্যানেজার ও রাধাকিশেন ব্যস্ত ও উত্যক্ত হইয়া উঠিল। কোলাহল নিবারণের ব্যর্থ আয়োজন নিষ্ফল হইয়া গেলে ম্যানেজার ড্রপ ফেলিয়া দিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল যে,

প্রভার হঠাৎ অসুখ হইয়া পড়ায় সে আজ আসিতে পারে নাই, সেজন্য কর্তৃপক্ষ দর্শকবৃন্দের নিকট করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। যদি কেউ ইহাতে অসন্তুষ্ট হন তবে তিনি তাঁর টিকিটের দাম ফেরত লইয়া চলিয়া যাইতে পারেন। অত্যন্ত অনুনয়ের সঙ্গে ম্যানেজার কথাগুলি বলিল। তাতে জন কুড়ি পঁচিশ লোক উঠিয়া টিকিট ঘরে গিয়া মূল্য ফেরত চাহিল। যারা রহিল তাদের মধ্যেও অপ্রসন্নতার প্রচুর লক্ষণ দেখা গেল।

বিলাস আবার অভিনয় করিয়া যখন ভিতরে আসিল তখন রাধাকিশেন বলিল, "আচ্ছা ম্যানেজার বাবু, আনুন প্রভাকে—যে চুক্তি হয় তাতেই রাজী—না হয় যাবে দু'চার হাজার টাকা।"

ম্যানেজার বিলাসকে বলিল, "কোথায় আছে সে খবর বলতে পার? আমি এখনই তার কাছে একবার যাই।"

বিলাস বলিল, "মিথ্যে যাবেন ম্যানেজার বাবু, এখন তাকে দু'চার হাজার কেন, দশ বিশ হাজার টাকা দিলেও পাবেন না।"

রাধাকিশেন বলিল; "এমন? কেন? কে রাখিয়েছে তাকে?"

ম্যানেজার বলিল, "আচ্ছা পারি না পারি আমি দেখে নেব, তুমি তার ঠিকানাটা দাও দেখি আমায়।"

বিলাস বলিল, "পোড়া কপাল আমার! আমি যে তার ঠিকানা জিজ্ঞেস ক'রতে ভুলে গেছি। আচ্ছা এইবার যেদিন দেখা হ'বে জিজ্ঞেস ক'রে রাখবো।"

রাধাকিশেন এবং ম্যানেজার দুজনেই ভয়ানক উত্যক্ত হইয়া উঠিল। বিলাস তাদের মুখের দিকে চাহিয়া কেবল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

তার হাসিটা রাধাকিশেন হঠাৎ দেখিয়া ফেলিল। সে চটিয়া বলিল, "এ কিচ্ছু নয়, খালি দিল্লেগী ক'রছো তুমি। তুমি শয়তানী বুদ্ধি দিয়েছ তাকে দম দিয়ে আমার টাকা আদায় করবার। ও সব কুচ্ছু না ম্যানেজার বাবু, আপনি যান একবার তার বাড়ী। তাকে দুড়িয়ে বার করুন—এ বিলাসকে দিয়ে কিছু হ'বে না।"

বিলাস বলিল, "কেন মিথ্যে ম্যানেজার বাবুকে হয়রাণী ক'রছো বাবু, উনি আজ সারারাত কলকেতার গলি গলি খুঁজলেও তাকে পাবেন না। সে এ দেশেই নেই।"

দুইজনে স্তব্ধ হইয়া তার দিকে চাহিল। শেষে রাধাকিশেন বলিল, "তুমার একো কথা আমি বিশ্বাস করি না। যান মেনেজার বাবু, আপনি তার ডেরায় গিয়ে খোঁজ ক'রে দেখুন।"

ম্যানেজার চলিয়া গেল, রাধাকিশেন তার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। অন্যদিন সে টিকিট বিক্রী শেষ হইলে টাকা কড়ির হিসাব পত্র করিয়া বিদায় হয়।

থিয়েটারের যে কর্ম্মচারীর কাছে দলিলপত্র থাকিত বিলাস একবার তাকে গোপনে বলিল, "দাদা, তুমি একবার আমার কণ্ট্রাক্টটা বের ক'রে দেখাবে?"

সে কণ্ট্রাক্ট খুঁজিয়া বাহির করিল। বিলাস আর এক ফাঁকে আসিয়া তার কাছে সে কণ্ট্রাক্টের সর্ত্তগুলি ভাল করিয়া শুনিয়া লইল, তারপর সেই কর্ম্মচারীকে একটা টাকা দিয়া বলিল, "ওর একটা নকল আমাকে ক'রে দেবে ভাই?"

কর্ম্মচারী টাকাটা পকেটে পুরিয়া বলিল, "কেন বিলাস বিবি, তোমারও কি পালাবার মৎলব আছে নাকি।"

"দূর না, আমি কোন চুলোয় যাব। আমার কি প্রভার মত রূপ না বয়স আছে, না তেমন বিদ্যে আছে?"

"ইস্ বড় যে বিনয় দেখছি।"

"আশ্চর্য্য হ'চ্ছ? তোমার জানা নেই বোধ হয়, বড় লোক মাত্রই বিনয়ী হয়।" বলিয়া হাসিয়া বিলাস ষ্টেজে চলিয়া গেল।

অভিনয় যখন শেষ হইয়া গেল তখন বিলাস তাড়াতাড়ি সাজঘরে ঢুকিয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া মুখের রঙ তেল দিয়া উঠাইল; তার পর তার ফিতে পেড়ে ধুতি খানি পরিয়া বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

তার বেশের দৈন্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া আর একজন অভিনেত্রী বলিল, "একি বিলাসিনীর আজ একি দশা? তোর গয়না কি করলি? ভাল কাপড় চোপড়ই বা পরিস নি কেন?"

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

বিলাস হাসিয়া বলিল, "সব বেচে ফেলেছি।"

অবাক হইয়া অপরা বলিল, "ওমা, কি বলিস্? মাইরি না। সত্যি বেচিছিস?"

"হাঁ ভাই সত্যি।"

"কেন তোর কি হ'য়েছে? বিবাগী হবি নাকি?"

"হয় তো হব, কে জানে?"

বাহির হইয়া সে একজনকে বলিল, একখানা ট্যাক্সি আনিতে, থিয়েটারের গাড়ীতে সে যাইবে না, বড় তাড়াতাড়ি দরকার।

রাধাকিশেন পাশে দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল, "চল আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

হাসিয়া বিলাস বলিল, "না গো বাবু, না, সে অনেক দূর যেতে হ'বে, আমি তো বাড়ী যাবো না।"

"সে হামি জানি, সেই সব তুমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। কি হ'য়েছে তোমার? কোথায় গিয়েছ তুমি?"

"আমি আমার মাসীর বাড়ীতে আছি, মাসীর বড্ড অসুখ কিনা তাই।"

"মাসীর অসুখ হোইয়েছে তাই বাড়ী বেচতে হোল? মিছে ফুসলাচ্ছ হামাকে। ঠিক বলো।"

হাসিয়া বিলাস বলিল, "সে খবরও পেয়েছ? বাড়ী আমার বেচতে হ'ল, একজনের কাছে অনেক টাকা দেনা ছিল তাই।"

"কই, সে কথা হামাকে তো বোললে নাই। বললে হামি এ কিনিয়ে নিতাম বাড়ী।"

"তুমি তো আমাকে কতই টাকা দিচ্ছ, আবার তোমার ঘাড়ে ওটা গছাতে মন চাইলো না। একটা বেকুব খদ্দের পেয়ে বেশী দামে বেচেছি কিনা? চল্লিশ হাজার টাকায় বাড়ীখানা নিয়েছে সে।"

"চাল্লিশ হাজার!—আচ্ছা সে ভালো দাম হোইয়েছে। লেকিন আসবাব উসবাব লিয়ে ওতে তার লোকসান হোবে না। আচ্ছা সে যাক, চল, যেখানে আছ সেইখানে তোমাকে পৌছে দিচ্ছি।"

"না না বাবু, সে অনেক দূর। মাসী বরানগরে থাকে। তা ছাড়া সে ভদ্রপাড়া, সেখানে তুমি গেলে একটা গোলমাল হ'তে পারে। মাসীর অসুখ ভালো হ'লেই আমি ফিরে আসবো—তুমি বাড়ী ঠিক ক'রে রাখ।"

এমনি করিয়া বহু কৌশলে বিলাস সেদিন রাধাকিশেনকে এড়াইয়া একলা চলিয়া গেল। ঠিকানাটা জানিবার জন্য রাধাকিশেন বহু আগ্রহ করিয়াছিল, কিন্তু বিলাস তাহাও তাকে দিল না।

যে বাড়ীতে বিলাস গেল তাহা বরাহনগরে নয়, কলিকাতারই একটি ভদ্রপল্লীর ভিতর। বিলাসের মাসী এখানে থাকে সত্য, কিন্তু তার অসুখের কথা একেবারে মিথ্যা।

বিলাসকে দুয়ার খুলিয়া দিল একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী কিশোরী।

বিলাস তার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল, "এত রাত্তির জেগে আছিস বুড়ী?"

"হাঁ মা, দিদিমা এই ঘুমুলো, আমার ঘুম পেলো না।"

মেয়েকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া বিলাস তার সঙ্গে উপরে চলিয়া গেল।

বিলাসের মাসী একজন ভদ্রলোকের রক্ষিতা ছিল, ত্রিশ বৎসর তার সঙ্গে স্বামীস্ত্রীভাবে বাস করিয়াছিল। ভদ্রলোকটি মারা গেলে সে বৈধব্য অবলম্বন করিয়া ভদ্র স্ত্রীলোকের মত ছেলেপিলে লইয়া ঘর করিতেছিল। কিন্তু বিধিবৈগুণ্যে একটি একটি করিয়া সব কয়টি ছেলে মেয়ে তার মারা গিয়াছে।

বিলাসের মেয়ে একটু বড় হইতেই সে তাকে মাসীর কাছে রাখিয়া স্কুলে পড়াইতে লাগিল। তার ইচ্ছা ছিল মেয়েকে মানুষ করিয়া বিবাহ দিবে। যতই মেয়ে বড় হইতে লাগিল ততই সে আপনাকে তার কাছ হইতে তফাতে রাখিতে লাগিল। তার বারবনিতা-জীবনের সঙ্গে কন্যার নিকট পরিচয় হয় এটা সে ইচ্ছা করিত না।

বুড়ী এখন ষোল বছরে পা দিয়াছে, রূপে যৌবনে সে ভরিয়া উঠিয়াছে। পড়াশুনায়ও সে বেশ অগ্রসর হইয়াছে। তাকে এত বড়টি হইতে দেখিয়া বিলাস অনেক দিন ভাবিয়াছে এইবার সে একেবারে ভদ্র হইয়া যাইবে—ভূপতিকে একটু প্রকৃতিস্থ করিয়া তার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভদ্রভাবে

বাস করিবে, তার মাসীর মত। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও সে ভূপতিকে সম্পূর্ণ বাগাইতে পারে নাই।

ঘটনাচক্রে যখন ভূপতির সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল তখন সে এক নূতন দায়ে পড়িল। জ্যোতির সঙ্গে দেখা হইবার পর হইতেই তার মনের ভিতর এ কথাটা বসিয়া গিয়াছিল যে ভূপতির যে অনিষ্ট হইয়া গিয়াছে, তার কিঞ্চিৎ প্রতিবিধানের চেষ্টা তার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিল, তার যা কিছু আছে বেচিয়া কিনিয়া তার অর্দ্ধাংশ সুরমাকে, এবং অপর অর্দ্ধাংশ বুড়ীকে দিবে—সে নিজে মাসীর সঙ্গে থাকিবে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেই সময় রাধাকিশেন তাহার হাতে আসিয়া পড়িল। বিলাস স্থির করিল আরও কিছু দিন তার প্রেমলীলা করিতে হইবে। রাধাকিশেনকে হাত করিতে পারিলে সে হয় তো কোনও ফিকিরে ভূপতির বিষয়টা উদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারিবে। তাই সে রাধাকিশেনের প্রস্তাব স্বীকার করিল। এদিকে সে গোপনে তার গহনাপত্র বেচিল, বাড়ী বিক্রয়ের বায়নাও করিয়া ফেলিল। যখন ভূপতির কাছে তার দায় শোধ হইয়া গেল তখন সে রাধাকিশেনকে কোনও সংবাদ না দিয়া হঠাৎ বাড়ীখানি খরিদ্দারকে ছাড়িয়া দিয়া ভাসিয়া পড়িল।

পরের দিন সকালে বিলাস বিনোদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। বিনোদ খবর পাইল উপরে তার স্ত্রীর কাছে বসিয়া। সে হাসিয়া স্ত্রীকে বলিল, "মাগী ভূপতিকে ছেড়ে দিয়ে একেবারে হন্যে হ'য়ে বেড়াচ্ছে। ওর তাকটা কার দিকে ঠিক বুঝতে পারছি না। হয় আমি, না হয় জ্যোতি, কি হয়তো দুজনেই।"

বিনোদের স্ত্রী বলিল, "ওকে দূর ক'রে দেও, ওর কাছে যেয়ো না তুমি—কে জানে ডাইনী মাগী কি গুণ ক'রবে?"

বিনোদ হাসিয়া বলিল, "উকীলের স্ত্রীর অত শুচিবাই থাকলে চলে না। তোমার কোনও ভয় নেই—এই দেখছো না চুলে পাক ধ'রেছে। তা ছাড়া ওর চেয়ে আমি কম ধূর্ত্ত নই।"

বলিয়া বিনোদ নামিয়া আসিল। বিলাসকে দেখিয়া তার মনে একটু খটকা লাগিল। আজও বিলাস সম্পূর্ণ নিরাভরণ,—পরণে তার সেই চুল-পেড়ে মোটা ধুতি, আর একখানা তসরের চাদর গায় জড়ান, মুখের উপর একটা দারুণ বৈরাগ্যের ছায়া। কিন্তু বিনোদ তার বিস্ময় সহজেই সামলাইয়া লইল। সে স্মরণ করিল বিলাস বিখ্যাত অভিনেত্রী, এ তার একটা উচ্চ অঙ্গের অভিনয় মাত্র।

একটু হাসির রেখা ঠোঁটের ভিতর চাপিয়া বিনোদ বলিল, "আমার কাছে তোমার কি দরকার?"

বিলাস বলিল, "একখানা দলিল আপনাকে দেখাতে এনেছি।" বলিয়া সে থিয়েটারের সঙ্গে তার চুক্তিপত্রের নকল বিনোদকে দেখাইল।

সে বিনোদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল, এই চুক্তিপত্র রদ করিবার কোনও আইন-সঙ্গত উপায় আছে কি না।

বিনোদ তাকে অনেক জিজ্ঞাসাপত্র করিয়া শেষে বলিল, "না কোনও উপায় নেই, তোমার আর ছয় মাস কাজ ক'রতেই হবে।"

বিলাস বলিল, "যদি আমি এখন থিয়েটারে না যাই তবে ওরা কি ক'রতে পারে—জোর ক'রে নিতে পারে কি?"

"জোর ক'রে নিতে পারে না, কিন্তু অন্য কোথাও তুমি য়্যাক্ট্ ক'রতে গেলে তা' বারণ ক'রতে পারে আর তোমার কাছ থেকে খেসারত আদায় ক'রতে পারে।"

"আমি যদি অন্য কোথাও য়্যাক্ট্ না করি।"

"তবু খেসারত আদায় ক'রতে পারে।"

"কত?"

"তা বলা অসম্ভব। তোমার না যাওয়ার দরুণ তাদের যে ক্ষতিটা হবে সেই পরিমাণ খেসারত তারা পেতে পারে। সে যে কত হ'বে সেটা প্রমাণের উপর নির্ভর করে।"

বিলাস হতাশভাবে নকলখানি লইয়া তার রুমালের ভিতর জড়াইয়া বাঁধিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে এর জন্য কি দিতে হবে কত?"

বিনোদ নির্ব্বিকার চিত্তে বলিল, "দু মোহর—চৌত্রিশ টাকা।"

বিলাস টাকা গুনিয়া দিয়া নীরবে উঠিয়া চলিয়া গেল। বিনোদ অবাক্ হইয়া তার দিকে চাহিয়া রহিল। একি অভিনয়? বিনোদের একটু সন্দেহ হইল।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

তার স্ত্রী আড়ি পাতিয়া সব দেখিয়াছিল; সে স্থির করিল, মাগী যাদু জানে।

২২

সুরমা বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবার পরই ভূপতি অপ্রসন্ন-ভাবে অনুভব করিল, রাগের মাথায় সুরমাকে অমন করিয়া বাহির করিয়া দেওয়াটা অন্যায় হইয়া গিয়াছে। অন্যায়টা সে যে পরিমাণে বোধ করিল সেই পরিমাণে সে নিজের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং ঠিক সেই পরিমাণে ক্রুদ্ধ হইল সুরমার উপর। সুরমা তাকে অমন করিয়া ক্ষেপাইয়া দিল কেন? তার অত উদারতার জাঁক কেন? সুরমা ভাল, সুরমা ধার্ম্মিক, সুরমা মহৎ—কিন্তু সে সবের এত জাঁক কেন তার। তার সেই দর্পের জন্যই তো সে ভূপতিকে এমনি করিয়া একটা অন্যায় কাজ করাইল।

কাজেই অনুশোচনায় তাকে সুরমার দিকে টানিয়া লইল না, তাকে আরও তফাৎ করিয়া দিল। ভূপতি আপনার কাছে একথা গোপন করিতে পারিল না যে তরলাকে বাড়ীতে রাখিতে তার এত ভয়ানক আপত্তির মূলে ছিল একটা অপরিসীম লজ্জা যার জন্য সে তরলার কাছে মুখ দেখাইতে কিছুতেই পারে না। সুতরাং সে যেমন একদিকে মনের কাছে যুক্তির পর যুক্তি দিয়া তার কথার যুক্তিযুক্ততা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিল যে যুক্তি তার যতই জোর হউক তার এ আপত্তির মূল হইল তার কা-পুরুষতা। তরলার কাছে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইবার জো তার নাই, সে সাহস তার নাই।

সুরমার উপর তার যত রাগ বাড়িতে লাগিল, ততই সঙ্গে সঙ্গে সে অনুভব করিল যে সুরমার উপর রাগ করিবার প্রকৃত হেতু বা অধিকার তার নাই। বুদ্ধিমান ভূপতি মনের কাছে এ কথা গোপন করিতে পারিল না যে সুরমার উপর এমন বিজাতীয় ক্রোধের হেতু তার নিজের হীনতা-বোধ। সুরমার কাছে সে-যে কত হীন কত খাটো সে কথা সে যত অনুভব করিতেছিল ততই সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। সুরমার অশেষ গুণরাশি, তার অপূর্ব্ব চরিত্র-গৌরব সে এখনও সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারিল, কিন্তু যতই সে গৌরব সে আয়ত্ত করিতেছিল, ততই সে ক্ষেপিয়া উঠিতেছিল। সুরমা যদি এত পরিপূর্ণরূপে নির্দ্দোষ এত পরিপূর্ণরূপে গৌরবময়ী না হইত তবে বুঝি ভূপতি তার উপর এত ক্ষেপিত না। সুরমার চরিত্র-গৌরবই তার কাছে "গুণ হৈয়া দোষ হৈল"।

ভূপতি যতই ভাবিতে লাগিল ততই তার মনের ভিতর দারুণ দাবানলের মত দুঃখ জাগিয়া উঠিল। সে আর সহিতে পারে না।

খোকাকে দেখিয়া তার প্রাণে আরও জ্বালা বোধ হইত। খোকাকে সে বরাবরই খুব ভালবাসে—কিন্তু একথা সে বুঝিত যে সুরমা তার চেয়েও তাকে ঢের বেশী ভাল-বাসে। সুরমার জন্য খোকা যে অভাব বোধ করিবে, সে অভাব মিটাইবার সাধ্য নাই ভূপতির। রাগ করিয়া সে খোকাকে সুরমার কোল হইতে কাড়িয়া রাখিয়াছে, তার যে অজুহাতই সে দিক, এখন সে মনে মনে স্বীকার করিল যে সুরমাকে শুধু কঠিন আঘাত দিয়া কষ্ট দিবার জন্যই সে তাকে পুত্রের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। কিন্তু এখন সে অনুভব করিল যে এ আঘাত সুরমাকে যতই লাগুক, তার চেয়ে হয়তো বেশী লাগিবে খোকাকে। তা ছাড়া খোকার সব ভার এখন পড়িল ভূপতির নিজের ঘাড়ে, কয়েকদিন যাইতেই অনভ্যস্ত ভূপতি বুঝিল যে এ বড় বিষম বোঝা। সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

তিন চারদিন যাইতেই ভূপতি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিল যে সুরমাকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিয়া সুরমার শাস্তি যাহা হউক বা না হউক চারিদিক দিয়া শাস্তি পাইয়াছে সে নিজে। শুধু যে সুরমার সুনিপুণ সেবা ও গৃহিণীপণার অভাবে সে দারুণ অস্বস্তি অনুভব করিল তাহা নহে, প্রত্যেকটি কাজে, প্রত্যেকের সম্পর্কে সে অনুভব করিল যে সুরমা তাকে চারিদিক দিয়া কতখানি স্নেহ দিয়া বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল, সুরমা আপনার কতখানি দিয়া ভূপতির জীবনের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করিয়া ছিল। আজ তার জীবনযাত্রার প্রতি পদক্ষেপে সেই চিরপরিচিত সেবার অভাব বোধ করিল, সেই স্নিগ্ধ পরিপূর্ণতার ভিতর যে সব প্রকাণ্ড

প্রকাণ্ড ফাঁক গড়িয়া ফেলিয়াছে তাহা ভরিবার সম্বল ভূপতির কিছুই নাই বলিয়া মনে হইল।

তিন চারদিনের মধ্যেই ভূপতি অস্থির হইয়া উঠিল। এই অনুভূতিটাই তার ভিতর বাহির বিষাক্ত করিয়া দিল যে, সে তার সমস্ত জীবনটা নিজের বুদ্ধির দোষে কি পরিপূর্ণরূপে ছারখার করিয়া ফেলিয়াছে। লোকসমাজে তার যে অফুরান সুখ ও বিপুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র ছিল তাহা সে একেবারে উজাড় করিয়া ছন্নছাড়া হইয়া বসিয়া আছে জীবনের ঠিক মধ্য স্থলে। এখন তার আর জীবনে কোনও সুখ বা সম্মান পাইবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। এখনও বহুদিন হয় তো তার বাঁচিতে হইবে—মরুভূমির মত এ উষর জীবন সে কেমন করিয়া বহন করিবে ভাবিতে তার প্রাণটা উদাস হইয়া উঠিত।

এমনি করিয়া ভূপতি তার অন্তরের প্রতি কন্দরে কন্দরে, হৃদয়ের আনাচে কানাচে চারিদিকে ঘা খাইতে লাগিল অসংখ্য তীক্ষ্ণ সূচিকার আঘাতে। সে ছটফট্ করিয়া উঠিল—তার দম বন্ধ হইবার মত হইল। খোকা যদি না থাকিত তবে হয় তো সে পাগল হইয়া উঠিত, না হয় আত্মহত্যা করিত। খোকা তাকে সে অপগতি হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখিল-- তার এই বন্ধনও ভূপতির গায় যেন কঠিন নিগড়ের মত বসিয়া যাইতে লাগিল।

ছট্‌ফট্ করিয়া ভূপতি খোকাকে লইয়া দিনরাত এদিক সেদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আজ চিড়িয়াখানা, কাল মিউজিয়াম, পরশু রাজগঞ্জের ষ্টীমার—এমনি করিয়া। দিনের পর দিন সে চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইল। বাড়ী সে বদলাইয়া ফেলিল, নূতন বাসায় আসিয়া সংসার গুছাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় অনেক দিন কাটাইল, চাকর বাকরকে মারপিট করিল।

শেষে সে খোকাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল। ছয় মাস সে নানাস্থান ঘুরিল—শেষে হতাশ হইয়া কলিকাতায় ফিরিল। তার চারিদিক দিয়া যে একটা বিশাল ক্ষুধিত শূন্যতা তার অন্তরকে পিষিয়া মারিতেছিল তার হাত হইতে নিস্তার পাইবার সে কোনও উপায় করিতে পারিল না।

অনেকবার সে মনোবেদনায় অস্থির হইয়া তৃষিত নয়নে মদের দোকানের দিকে চাহিয়াছে;—সুখের আশায় নয়—ওইখানে তার এ জীর্ণ জীবন উজাড় করিয়া দিবার আশায়। কিন্তু পাশে খোকার দিকে চাহিয়া সে হতাশ-চিত্তে ফিরিয়াছে। জীবনটাকে ছারখার করিয়া দিবার অধিকার তার নাই—খোকা সে-পথ আগলাইয়া বসিয়া আছে। অনেকবার বেশ্যাপল্লীর কথা মনে হইয়াছে—হইতেই তার মনে একটা বীভৎস শিহরণ জাগিয়া উঠিয়াছে বেশ্যাগৃহে তার শেষ রজনীর স্মৃতিতে।—প্রভার—তরলার কাছে সে গিয়াছিল! তার মনে সেদিন হইতে এ সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে সেদিন পরলোক হইতে তার জননী তাকে রক্ষা করিবার জন্য এই আয়োজন করিয়াছিলেন,—তরলার সেই ছোট্ট মাদুলীর ভিতর মার কল্যাণ অঙ্গুলীর নির্দ্দেশ সে পাইয়াছিল। বেশ্যাপল্লীর কথা মনে হইলেই তার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত তিরস্কারপূর্ণ তার মায়ের মূর্ত্তি! সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত।

এমনি করিয়া যখন সে জীবন সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হইয়া উঠিয়াছে, তখন একদিন সে সংসারের ভয়ানক বিশৃঙ্খলতায় ক্ষিপ্ত হইয়া প্রত্যেক চাকরবাকরকে প্রহার করিয়া তাড়াইল। তারপর সে আগুনের মত জ্বলিয়া আসিয়া বাহিরের ঘরে বসিল।

এক ঘটক সেই সময় তার কাছে উপস্থিত হইল জ্যোতির জন্য বিবাহের সম্বন্ধের চেষ্টায়। ভূপতি তাকে অযথা দারুণ তিরস্কার করিয়া উঠিল। সে, বেচারী ভয় পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি হঠাৎ বলিল, "দাঁড়ান, একটা কাজ ক'রতে পারেন?"

"কি বলুন।"

"সংসার দেখতে পারে এমনি একটি ডাগর মেয়ে দিতে পারেন—এমন মেয়ে যে সাত চড়ে কথাটি বল্‌বে না?"

"তা কেন পারবো না। আমি যে মেয়ের কথা বলছি সে আপনার ভাইয়ের—"

"ভাইয়ের নয়" বলিয়া ভূপতি গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

"একটি গিন্নী গোছের মেয়ে যদি দিতে পারেন তবে আমি নিজে বিয়ে করবো—পারেন ?"

একটু ঢোঁক গিলিয়া ঘটক বলিল, "তা কেন পারবো না ? একটু কঠিন হবে—বিবেচনা করুন সতীনের ঘরে কিনা ! আজকাল ও রেওয়াজ ত নেই ! নইলে আপনার মত লোকের হাতে পড়া তো যে-কোনও মেয়ের সৌভাগ্য।"

"সতীনের জন্য ভাববেন না। সে স্ত্রী আমি ত্যাগ ক'রেছি, সেও আমার কাছে আসবে না। সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"তা বেশ, তা বেশ—"

ভূপতি গর্জ্জন করিয়া উঠিল "বেশ কি? ঠাট্টা ক'রছো আমার সঙ্গে, স্ত্রী ছেড়ে গেছে সেটা বেশ কিছু নয়—দুর্ভাগ্য।"

ঘটক চমকাইয়া উঠিল—খানিক ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া সে অতিরিক্ত বেগে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ তাতো বটেই। তা' আপনি চিন্তা ক'রবেন না, আমি যখন হাত দিচ্ছি জোগাড় নিশ্চয় হবে।"

ঘটক চলিয়া গেল। তারপর ভূপতি সারাদিন খাটিয়া নূতন বামন চাকর ও গোমস্তা নিযুক্ত করিয়া বেশ খাতির-জমা হইয়া বসিল। এই একটা ব্যবস্থা ঠিক করিয়া সে নানাদিক দিয়াই একটা মুক্তির পথ বাহির করিয়া ফেলিয়াছে এমনি তার মনে হইল।

সেদিন তার মন্দ কাটিল না।

ঘটকটি করিৎ-কর্ম্মা। একমাস না যাইতেই সে একটা সম্বন্ধ ঠিক করিয়া ফেলিল। মেয়ে দেখিয়া ভূপতির মন্দ লাগিল না—অসুন্দর সে নয়, বয়স কিছু বেশী, আর বিধবা মা নিতান্ত গরীব।

ভূপতি আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিল।

'ক্রমশঃ'
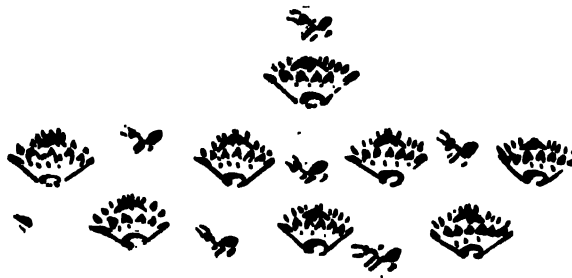
সূফী ধর্ম্মে ভারতীয় প্রভাব *

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

ঐতিহাসিক সূফী ধর্ম্মের আলোচনায় কতকগুলি শক্তিশালী প্রভাব দেখিতে পাই তাহা অবহেলা করিয়া ফেলিয়া রাখা চলে না। ইহার মধ্যে ভারতীয় প্রভাব উল্লেখ যোগ্য। ইসলাম যখন পূর্ব্বদেশ সমূহে, এমন কি চীনের সীমানা অবধি পঁহুছিয়াছিল তখন ভারতীয়-চিন্তা প্রণালীকে নিজের চিন্তা গগনে টানিয়া লইয়াছিল। এই ভারতীয়-প্রভাব অংশতঃ সাহিত্যে, অংশতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপমা সমূহে, কতকগুলি ভারতীয় উপাদানের প্রচলনে ঘটিয়াছিল।

যখন হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দীতে (খৃষ্টীয় নবম শতকে) অনুবাদ-কার্য্যে আরবীয় ভাষায় লিখিত সাহিত্য-রত্ন সমূহ বর্দ্ধিত হইতেছিল, বৌদ্ধগ্রন্থ সমূহ আরবী সাহিত্যে সংযোজিত হইয়াছিল, তখন আমরা "বিলৌহর-ও-বুদাসিফ" (বাবলাম ও জোয়াসফ) এর আরবী এবং অন্য একখানি "বুদ্ধ-বহির" আরবী সংস্করণের সাক্ষাৎ পাই। (১) উচ্চ শিক্ষিত ও মাজ্জিত দলের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মালম্বিগণের পরস্পর পরস্পরের সহিত ভাব বিনিময়ের সুযোগ ঘটিয়াছিল। এবং তাহার ফলে "শুমানিয়য়া" দলের লোকের অভাব ছিল না। (২) আমি এখানে কেবলমাত্র উল্লেখ করিতে চাই যে শরিয়তী ইসলামের প্রতিবাদ স্বরূপ যে মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছিল, যাহা সাধারণতঃ "যুহ্‌দ" নামে পরিচিত এবং যাহার সহিত আমাদের আলোচ্য সূফী ধর্ম্মেরও সম্পূর্ণ ঐক্য নাই, তাহাতে ভারতীয় জীবনের আদর্শের প্রভাবের স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়। "যুহ্‌দ" মতবাদিগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তি আবূল্‌অতাহিয়াকে সম্মানিত ব্যক্তিগণের আদর্শরূপে ধরা হয়; "যিনি রাজা হইয়াও দরবেশের বেশ ধারণ করেন, মানবের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সম্মান পাওয়ার উপযোগী।" ইনিই কি বুদ্ধ নহেন? (৩)

এতদ্ভিন্ন পরবর্ত্তী সময়ের কথা বলিতে গেলে আলফ্রেড্‌ ফন-ক্রেমার ভারতীয় প্রভাব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে। তিনি দেখাইয়াছেন যে আবূল-অলা অল্‌-মাআররী নিজ জীবনে ও নিজ দার্শনিক কবিতাবলীতে যে নীতির প্রকাশ করিয়াছেন তাহা জগৎ সম্বন্ধে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সামাজিক মতেরই অনুরূপ। (৪)

মুসলমান জগতে পরিব্রাজক ভারতীয় সন্ন্যাসীগণ দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় যে মুসলিম দিকচক্রবালে ভারতীয় জগৎ কেবলমাত্র আলোচনার বস্তু হইয়া দেখা দেয় নাই। যেমন অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালে সিরিয়া দেশের পরিব্রাজক খ্রীষ্টান সাধুগণ আরব মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তেমনই মেসোপটেমিয়ায় আব্বাস বংশীয় সম্রাটগণের কাল হইতে এই সমস্ত সন্ন্যাসী ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বিগণের পক্ষে একটি বাস্তব শক্তিশালী অঙ্গ ছিল। জাহিয্‌ (মৃত্যুর তারিখ খ্রীষ্টিয় অব্দ ৮৬৬) এই সমস্ত সন্ন্যাসীদের ছবি অতি নিপুণ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহাদিগকে তিনি ইস্‌লাম বা খ্রীষ্টধর্ম্ম কোনটাতেই অন্তর্ভূক্ত করিতে পারেন নাই তিনি তাঁহাদিগকে "যিন্দীক" সম্প্রদায়ের সাধু বলিয়াছেন। যিন্দীক শব্দটি একাধিক অর্থবোধক; কিন্তু এই শব্দকে শুধু মানী নামক ধর্ম্মপ্রচারকের শিষ্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা যাইতে পারে না। যে পুস্তক হইতে জাহিয্‌ উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা হইতে ইহা জানা যায় যে উক্ত

* বিখ্যাত জার্ম্মান প্রাচ্যবিদ্‌ Dr. Ignaz Goldziher এর "Mohammad and Islam" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদের Asceticism & Sufiism অধ্যায় (পৃষ্ঠা ১৭১—১৭৭) হইতে অনূদিত।

(১) Fihrist 118,119, 136 cf. for this literature Hommel, in the "Verhandlungm des VII Orientalisten kogr" (Vienna 1887). Sem sect 115 ff. The educated classes show an interest in Buddha, (Jahiz, "Tria opuscula" ed. Van Vloten 137, 10)

(2) Aghani 111, 24.

(৩) "Transactions of the Ninth International congress of Orientalist" London (1893) I 114.

(৪) "Ueber die Philosophischen Gedichte des Abul-'Alaal-Ma'arry" (Sitzumgsber. d. Wiener Akad. d. W. Phil, hist. Cl. CXVII No VI Vienna 1888) 30 ff.

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন

পরিব্রাজকগণ দুজন দুজন করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন; "তুমি যদি একজনকে দেখ, তাহা হইলে সতর্কভাবে অনুসন্ধান করিলে নিকটেই তাহার সঙ্গীকেও পাইবে।" তাহাদের নিয়মানুসারে এক স্থানে দুই রাত্রি যাপন নিষিদ্ধ ছিল। তাহাদের পরিব্রাজকজীবনের চারিটি বিশেষত্ব ছিল, সাত্ত্বিকতা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্যবাদিতা ও দারিদ্র্য। এই সমস্ত সন্ন্যাসীদের ভিক্ষুক-জীবনের সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পগুলির মধ্যে একটি হইতে জানা যায় যে ইঁহাদের একজন একটি পক্ষীর অপরাধ নিজের স্কন্ধে লইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য নিজের উপর চৌর্য্যাপবাদ আনয়ন করিয়াছিলেন ও সেই হেতু দুর্ব্যবহার স্বীকার ছিলেন কিন্তু পক্ষীটিকে ধরাইয়া দেন নাই; কারণ তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে তিনি কোনও প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়ান। (৫) এই সকল লোক সত্য সত্য ভারতীয় সাধু বা বৌদ্ধ ভিক্ষু না হইলেও তাঁহারা অন্ততঃ এই সকল সাধু বা ভিক্ষুর মত ও আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন।

যখন আমরা এই দিক দিয়া দৃষ্টিপাত করি তখন দেখিতে পাই যে এই সমস্ত রীতিনীতি ও সংস্পর্শের দ্বারা সূফী ধর্ম্মের উপর ভারতীয় চিন্তার এতদূর প্রভাব পড়িয়াছে যে, সূফী ধর্ম্ম তাহার জন্মগত প্রবণতার ফলে ভারতীয় চিন্তার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবের চিহ্নস্বরূপ এই কথাটী ধরিতে পারি যে ইসলামীয় সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা সাহিত্যে শক্তিশালী রাজা তাঁহাদের পৃথিবীর সাম্রাজ্য দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়াছেন, এরূপ আখ্যানের বিশেষ বিকাশ বা প্রচলন ঘটিয়াছিল। (৬) এইরূপ উপদেশ অবশ্য এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবার পক্ষে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর এবং বুদ্ধদেবের আদর্শের কাছে দাঁড়াইতে পারে না, যে আদর্শ নিজ উচ্চতার দ্বারা সকলকে অভিভূত করে। একজন পরাক্রমশালী নরপতি একদিন দেখিলেন যে তাঁহার দুইগাছি দাড়ির চুল পাকিয়া সাদা হইয়াছে; তিনি উহা উত্তোলন করিয়া ফেলিলেন কিন্তু আবার দুই গাছি দেখা দিল। তাহার ফলে এই চিন্তা তাহার মনের মধ্যে উদিত হইল "এ দুটী হইতেছে পরমেশ্বরের দূত, ইহাদিগকে তিনি এইজন্য পাঠাইয়াছেন যে আমি পৃথিবীর বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহারই উদ্দেশ্যে যেন জীবন যাপন করি। আমি তাঁহার উদ্দেশ্য মানিয়া লইব"। তিনি হঠাৎ তাঁহার রাজত্ব পরিত্যাগ করিলেন এবং বনে জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঈশ্বরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিলেন (৭)। পার্থিব শক্তির ভোগের সীমা আছে—এই কথাটী মূল উদ্দেশ্য করিয়া এইরূপ বহু সাধু সন্ন্যাসীর গল্প আছে।

সূফীমতের একজন প্রধান পুরুষের সম্বন্ধে যে সব আখ্যান প্রচলিত আছে সেগুলিতে বুদ্ধদেবের জীবন কাহিনীরই ছাপ রহিয়াছে—এই কথাটি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পূর্ণ সমাধানের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আমি সাধু ইব্‌রাহীম বিন্ অদ্‌হম্ আখ্যানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহার এই মায়াময় সংসারের সহিত সকল বন্ধন ছিন্ন করার কারণ সম্বন্ধে নানা গল্প বিবিধ ভাবে বর্ণিত আছে। যাহা হউক সকল ঘটনায় ইহা জানা যায় যে ইব্‌রাহীম বল্‌খ্ দেশের এক রাজা ছিলেন। তিনি রাজকীয় পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে ভিক্ষুকের বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া সকলের সঙ্গে এমন কি স্ত্রী পুত্রাদির সহিতও সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া মরুভূমিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন এবং পরিব্রাজকের জীবনযাপন করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। একটি মতানুসারে, তিনি দৈববাণী দ্বারা ঐরূপ ভাবে জীবনযাপন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। অন্য একদল বলেন যে তিনি তাঁহার রাজপ্রাসাদের জানালা হইতে অভাবহীন দরিদ্রের জীবনযাপন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংসার পরিত্যাগের যে সমস্ত কারণ দেওয়া হয় তাহার মধ্যে একটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবি মৌলনা জালালুদ্দিন রুমী বলিয়াছেন

(৫) Jahiz Hayawan IV. 147, Roses in Zapiski VI 336 · 360.

(৬) e.g the accounts in Yafii I C. 208 -211. The story of the Turkish king and his son-in-law, the great ascetic in Ibn-Arabshs, "Fruclus emparatorum" (Freytag, Bonn 1832). I 48 · 53, reverts to this same article of ideas.

(৭) Kurtubi. T adkira ed of Sharani (Cairo 1310).

যে, কোন এক রজনীতে ইব্‌রাহীম অদ্‌হমের রাজপ্রাসাদ-রক্ষী প্রাসাদ চত্বরে গোলমাল শুনিতে পাইল। অনুসন্ধানের ফলে কতকগুলি লোক ধৃত হইল এবং তথায় যে তাহারা তাহাদের পলাতক উষ্ট্রের সন্ধান করিতেছিল এই ভান করিল। অনধিকারপ্রবেশকারীদিগকে রাজপুত্রের সম্মুখে আনিলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেহ কি কখন প্রাসাদ চত্বরে উষ্ট্রের সন্ধান লয়?" তাহারা বলিল "আমরা আপনার আদর্শ অনুসরণ করিতেছি কারণ আপনি সিংহাসনে বসিয়া ঈশ্বরের সহিত মিলন চেষ্টা করিতেছেন। কে রাজসিংহাসনের কাছে ঈশ্বরকে লইয়া আসিতে পারিয়াছে"। কথিত আছে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, তৎপর তাঁহাকে আর কেহ দেখে নাই (৮)

ভারতীয় প্রভাবের আওতায় সুফী-ভাব অনেকটা প্রগাঢ় ভাব ধারণ করিয়াছিল। সুধী প্লাতোনের মতবাদের নব-পর্য্যায় (Neo-Platonism) আশ্রয় করায় সুফী ধর্ম্মে "সর্ব্বব্রহ্মবাদ" যে গণ্ডীর মধ্যে ছিল, এখন ভারতীয় প্রভাবে এই মত সেই গণ্ডী অতিক্রম করিল, বিশেষতঃ, ব্যক্তিত্বের বা জীবের ব্রহ্ম বা ঈশ্বরে লয়-প্রাপ্তি বিষয়ক যে চিন্তা, তাহাই ভারতীয় আত্মবাদের সহিত এক পর্য্যায়স্থিত। আত্মবাদ ঠিক পুরাপুরী সুফীমত কর্ত্তৃক স্বীকৃত না হইলেও এই ঈশ্বরে লয়প্রাপ্তি অবস্থাকে সুফী স্বীকার করেন, এবং ইহাকে "ফনা" (৯) (=পূর্ণনাশ), "মহ্‌ও" (=বিলোপ) ও "ইস্তিহ্লাক" (=নির্ব্বাণ) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন—যে অবস্থা হইতেছে এক বর্ণনাতীত অবস্থা, সুফীদের মতে যাহার কোন সংজ্ঞা সম্ভবেনা। সুফীরা বলেন যে এই অবস্থা অনুভূত (বা অন্তরুদ্ভূত) জ্ঞানরূপে প্রকট হয়, এবং ইহার কোন সরল ও সহজ সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। "যখন সাময়িক চিরন্তনের সহিত যোগ দেয় তখন সাময়িকের কোন স্বতন্ত্র সত্তাই থাকে না। তুমি আল্লাহ্ ব্যতীত কিছুই শুন না ও দেখ না, যখন তোমার এই বিশ্বাস হয় আল্লার বাহিরে অন্য কিছুই নাই যখন নিজেকেই তিনি বলিয়া জান, তখন তুমি তাঁহার সহিত মিলিয়া গিয়াছ।" আত্মসত্তার অস্বীকার করাই খোদার সহিত মিলনের পথ।

Let me become non-existent, for non-existence
Calls to me with the tone of an organ,
"To him let us turn back" (১০)

আমি যেন আর না থাকি, কারণ এই না থাকা
বিরাট বংশীর স্বরে আমাকে আহ্বান করিতেছে
"আমরা তাঁহার দিকে আবার ফিরি।"

ব্যক্তিগত অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে খোদাতায়ালার সহিত মিশিয়া যায়। সময় বা স্থানের এমন কি সত্তার বৈশিষ্টগুলিও ইহাকে সীমার মধ্যে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। মানুষ সর্ব্ব বস্তুর মূল কারণের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্যেতে নিজেকে উন্নীতকরে। এই মূল কারণের বোধ হইতেছে, সমস্ত জ্ঞানের বাহিরে।

বৌদ্ধধর্ম্মে যেমন "আর্য্যমার্গ" আছে এবং তাহাতে যেমন সাধনার আটটী পথ (আর্য্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ) আছে এবং যদ্দারা মানুষ ক্রমান্বয়ে তাহার ব্যক্তিত্বের লোপ সাধন দ্বারা সর্ব্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হয়, তেমনি সুফীধর্ম্মেও ত্বরিকা (পথ) আছে এবং ইহার কামালিয়তে (পূর্ণতায়) পৌছিবার ক্রম ও মঞ্জিল (=সোপান) আছে। যাঁহারা এই পথে আছে তাহাদিগকে পথিক (আলসালিকুণা; অহ্‌লঅল্‌-সুলুক) বলা হয়। যদিও ইহার পথের বৈশিষ্ট আছে তথাপি আসল মতের অনৈক্য দেখা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ উভয় পদ্ধতিতে নিদ্দিধ্যাসন (১১) যাহ'কে সুফীরা মুরাকবা এবং বৌদ্ধরা ধ্যান বলে,

(৮) 'Mesnevi' (Wheenfield 182). The picturesque respresentation of an episode of the miraculous tales of Ibr, Ibn Edham in the Delhi archaeological museum, (Jour Roy. As. Soc, 1909, 751; cf now ibid 1910, 167).

(৯) In contradistinction to physical death, the great 'fana' (al-f. al-Akbar), they call this condition "the small f" (al-f. al- asghar). Cf on the relation of 'Fana' conception to Nirban, the remark of count E. V. Mulinen in G Jacob's "Turkish Bibliothek" XI 70.

(১০) Mesnevi I.C. 159.

(১১) It is Ibrahim ibn Edham who says: Meditation is reason's pilgrimage (haj-al-akl)

মুহম্মদ মন্সুর উদ্দীন

কামালিয়তে বা পূর্ণতায় পৌছিবার জন্য অত্যন্ত আবশ্যকীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। "সাধক এবং সাধনার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে এক হইয়া যায়।"

ইহাই হইতেছে সূফী তৌহিদের বা একত্বের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব। আসলে ইহা মুস্‌লিমদের তৌহিদ তত্ত্ব (unity of god) হইতে পৃথক্। সূফীরা এ পর্য্যন্তও বলে যে "খোদাকে আমি জানি" ধারণা করা শির্ক (অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য নিত্য সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার) কারণ ইহাতে জ্ঞানের কর্ত্তা ও কর্ম্মকে দ্বিত্বভাবে গ্রহণ করা হইল। ইহাও ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞান। (১২)

বিভিন্ন সূফী সম্প্রদায় ও দলের যাহাদের সভ্যরা জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে সূফী মতবাদ পোষণ করেন, তাহাদের মধ্য দিয়া সূফীধর্ম্ম বহির্জীবনে একটি প্রতিষ্ঠানরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই সমস্ত লোক তাঁহাদের হুজ্‌রা ও গৃহে সম্মিলিত হইতেন এবং তথায় অবস্থান করিয়া জগতের কলরোল হইতে বহু দূরে থাকিয়া তাঁহাদের আদর্শ অনুসারে জীবন যাপন করিতে প্রয়াস পান এবং সাধারণ অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করেন। এই হুজ্‌রা জীবনেও আমরা ভারতীয় প্রভাব সমূহের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবির সাক্ষাৎ এবং সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের বাহিরেও সূফীদিগের ভিক্ষুক জীবনেও ভারতীয় সাধুদের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই। প্লাতোনের মতবাদের নবপর্য্যায় (Neo-Platonism)এর প্রভাবের কথাই শুধু সূফী সন্ন্যাসীদের বাস্তব প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। যাঁহারা প্রথমে সূফী দলভুক্ত হইতে চান তাঁহাদিগকে প্রথমে সূফী সম্প্রদায়ের খেড়কা গ্রহণ করিতে হয়। খেড়কা সূফীদের দারিদ্র্য ও সংসারের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার চিহ্ন। ইহা অভ্রান্তরূপে সত্য যে এই রকম পরিচ্ছদ গ্রহণ বৌদ্ধ ভিক্ষুক সম্প্রদায়ের চীবর ও শীল গ্রহণ দ্বারা দীক্ষিত হওয়ার অনুরূপ। (১৩) সূফী সম্প্রদায়ের যিক্‌র (বা জিক্‌র) এর অনেক অঙ্গই এবং দিব্যোন্মাদ আনিবার উপায় সমূহ এবং প্রাণায়াম পদ্ধতি ভারতীয় পদ্ধতির উপর স্থাপিত। ক্রেমার সাহেব ভারতীয় উদাহরণ সমূহ অনুশীলন করিয়া ইহা দেখাইয়াছেন।

উপাসনায় এই সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে জপমালা সূফী গণ্ডীর বাহিরেও গিয়াছিল। ভারতবর্ষে উদ্ভূত এই মালা জপা পদ্ধতি এবং ইহার ব্যবহার খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে ইস্‌লামে যে প্রবেশ করিয়াছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। ইহা প্রথমে প্রাচ্য ইস্‌লাম জগতে আরম্ভ হইয়াছিল। প্রাচী সূফীসম্প্রদায়ের উপর ভারতীয় প্রভাবের উৎপত্তিস্থান। অন্যান্য নব প্রচলনের মত এই বিদেশী পদ্ধতিকেও দীর্ঘকাল নূতন মত গ্রহণ বিরোধী দলের বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। অল্-সুয়ূত্বীকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই মালা [তস্‌বী] ব্যবহার পদ্ধতি সমর্থন করিয়া একটি ফতোয়া জারি করিতে হইয়াছিল। তখন হইতেই মালা ব্যবহার খুব জনপ্রিয় হইয়া গিয়াছিল। (১৪)

সূফীধর্ম্মের ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে এই ভারতীয় প্রভাবের বিষয় প্রত্যেককে বিবেচনা করিতে হইবে, সূফীমত Neo-Platonism দর্শন হইতে (প্লাতোনের দর্শনের নব-পর্য্যায় হইতে) উদ্ভূত এবং ভারতীয় চিন্তার প্রভাব অত্যন্ত মূল্যবান প্রভাব হইয়া রহিয়াছে।

স্নোক হুর্‌গ্রণ্যে (Snouck-Hurgronje) তাঁহার লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতায় ভারতে ইস্‌লামের ভারতীয় প্রভাবের কথা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন এবং ভারতীয় ইস্‌লাম যে সূফীভাব ধর্ম্মভাবের মজ্জা ও ভিত্তি তাহা দেখাইয়াছেন। (১৫)

(12) "Sacred books of the East" XII 282.

(১৩) Kromer Kulturgeschichfe. Streiftzuge. 50ff. cf for the Indian Ramprosad, "The Science of breath and the Philosophy of Tattwas"—from Sanskrit (London 1890).

(১৪) Cf. on this my paper "Le Rosaire dans le Islam" (Revue de la Hist. des Relig. 1890 XXI, 295. ff).

(১৫) Smouck-Hurgronje "Arabic en Oost India" (Lieden 1907). 16. "Revue de la 'Hist. des Relig". 1908. LVII, 71

চীনে হিন্দুসাহিত্য

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

৩

পরমার্থ

৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে লিয়াং বংশের রাজা বু (Wu) বৌদ্ধধর্ম্মের মূল গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য মগধে দূত প্রেরণ করেন। দূতগণের উদ্দেশ্য ছিল যে গ্রন্থাবলীর সহিত উপযুক্ত একজন হিন্দু অনুবাদককেও সঙ্গে করিয়া আনেন। তখন মগধে রাজা ছিলেন জীবিতগুপ্ত অথবা কুমারগুপ্ত। চীনা দূতদিগের মুখে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মগধের রাজা, বহু গ্রন্থ সঙ্গে দিয়া পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ পরমার্থকে দূতদিগের সহিত চীনে প্রেরণ করেন। ৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পরমার্থ নানকিংএ আসিয়া পৌছেন। সম্রাট্ বু তাঁহাকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া তাঁহার বাসের জন্য একটী প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লিয়াং রাজত্বের অবসান হয়। লিয়াং রাজাদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় এই দশ বৎসরের মধ্যে পরমার্থ ১৯টী গ্রন্থ সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করেন। পরে 'চেন' রাজাদিগের অধীনেও তাঁহার কার্য্য অবাধে চলে। ৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি অক্লান্তভাবে কার্য্য করেন। সর্ব্বশুদ্ধ ৭০টী গ্রন্থ ইনি অনুবাদ করেন, তাহার মধ্যে ৩২টী মাত্র এখন পাওয়া যায়। এই ভারতীয় শ্রমণের অগ্নিময়ী বাণীতে চীনা বৌদ্ধগণ চতুর্দ্দিক হইতে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। রাজনৈতিক নানাপ্রকার আন্দোলন সত্ত্বেও পরমার্থের প্রভাব ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তিনি নানাবিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন মহাযানপন্থী। অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর বিজ্ঞানবাদই তাঁহার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। জনসাধারণের মধ্যে এই মতটী তিনি এমন সহজভাবে প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে একবার রাজ সভাসদ্গণের মনে ভয় হইয়াছিল যে রাজ্যের তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। পরমার্থ কিন্তু নিজের কার্য্যে সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। একবার এক শিষ্যকে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে "যে উদ্দেশ্যে আমি প্রথমে এখানে আসিয়াছিলাম তাহা সিদ্ধ হইবার আশা নাই। বর্ত্তমানে ধর্ম্ম প্রচারিত হইবার সম্ভাবনা কমই।" যে পরমা শান্তির বাণী তিনি আনিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা তিনি আনিতে পারেন নাই। কিন্তু যে সকল গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন সবগুলিই অতি মূল্যবান্। অসঙ্গ ও বসুবন্ধু প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদীদিগের প্রধান প্রধান কয়েকটী গ্রন্থ ও ঈশ্বরকৃষ্ণের সটীক সাংখ্যকারিকা তিনি অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ইহা ভিন্ন নাগার্জ্জুন, অশ্বঘোষ, বসুমিত্র ও গুণমতিরও কয়েকটী গ্রন্থ তাঁহা দ্বারা অনূদিত হয়। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ গ্রন্থ হইল বসুবন্ধুর জীবনচরিত। এই গ্রন্থ হইতে আমরা বহু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। বৌদ্ধযুগের একটী তমসাবৃত পর্ব্বের উপর ইহার আলোক রেখা কিছু পরিমাণে পতিত হওয়ায় সেই যুগের একটী নূতন দিক্ আমাদের নিকট খুলিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম ব্যতীত সাংখ্যমত ও সাধারণ সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধেও ইহা হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

পরমার্থের অনূদিত কয়েকটী প্রধান গ্রন্থের আলোচনা এখন আমরা করিব। প্রথমে অশ্বঘোষের রচিত বলিয়া যে বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থটী চলিয়া আসিতেছে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিবার আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কুমারজীব প্রথম অশ্বঘোষের সহিত চীনবাসীর পরিচয় করাইয়া দেন। অশ্বঘোষের সূত্রালঙ্কার * ও বুদ্ধচরিতের নাম কুমারজীবের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। নানা সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া

* সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে "সূত্রালঙ্কার" গ্রন্থটী অশ্বঘোষের রচিত নয়। এসম্বন্ধে পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিব।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

কুমারজীবই প্রথম চীনভাষায় অশ্বঘোষের জীবনচরিত রচনা করেন।

শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র নামক একটী মূল্যবান্ দার্শনিক গ্রন্থের লেখক হইলেন অশ্বঘোষ এইরূপ অনুমান করা হয়। ৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পরমার্থ এই গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করেন। ৭১০ খ্রীষ্টাব্দে খোটানবাসী শিক্ষানন্দ পুনরায় ইহার অনুবাদ করেন। এই দুইটী অনুবাদ কিন্তু একটী গ্রন্থ হইতে হয় নাই; মূল দুইটী গ্রন্থের একটী আনা হইয়াছিল উজ্জয়িনী হইতে, অপরটী আনা হইয়াছিল খোটান হইতে। তবে দুইটী গ্রন্থের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা মারাত্মক নয়। জাপানী পণ্ডিত সুজুকি যে অজ্ঞাতনামা চীনা লেখকের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার মতে শিক্ষানন্দ যে গ্রন্থটী আনিয়াছিলেন, সেইটীই দুইটীর মধ্যে অধিক পুরাতন। কতিপয় চীনা বৌদ্ধ শ্রমণের সাহায্যে শিক্ষানন্দ তাহার অনুবাদ করেন। কিন্তু পরমার্থের অনুবাদ জনসাধারণের নিকট অধিক সমাদর লাভ করিয়াছে। মূলের সহিত অনুবাদের যথেষ্ট মিল আছে বলিয়াই যে ইহার আদর তাহা নয়; ফাৎসাং নামক এক বৌদ্ধ পণ্ডিত ইহার একটী সুন্দর টীকা রচনা করাতেই ইহার মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে। অনেক সময় মূল বাদ দিয়া এই টীকাই অধিক পাঠ করা হয়।

শ্রদ্ধোৎপাদের লেখক কে, এ বিষয়ে বহু মতভেদ আছে। সুজুকি বলেন বুদ্ধচরিত প্রণেতা অশ্বঘোষই এই গ্রন্থের লেখক। তিনি ঐ গ্রন্থ হইতেই প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে মহাযানের যথার্থ প্রবর্ত্তক হইলেন অশ্বঘোষ। ফরাসী পণ্ডিত লেভী এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, বুদ্ধ চরিতের কবি এই গ্রন্থে গভীর দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের জন্য যে মতটীর প্রয়োজন ছিল তিনি সেই মতটী এই গ্রন্থে সতেজে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। জাপানী অধ্যাপক তাকাকাসু বলেন যে পুরাতন চীনা ত্রিপিটকের তালিকাগুলিতে এই গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া অশ্বঘোষের নাম কোথাও পাওয়া যায় না; সুতরাং গ্রন্থটী যে অশ্বঘোষের রচনা সে বিষয়ে নিশ্চিত কোনও প্রমাণ নাই। ডাঃ মুরাকামী নামক বিখ্যাত জাপানী পণ্ডিতের মতে **শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র** সংস্কৃত হইতে আদৌ অনূদিত নয়; মূলতঃ উহা কোনও চীনবাসীর লেখা। তাঁহার বিশ্বাস যে এই গ্রন্থে লেখক নাগার্জ্জুন ও অসঙ্গের মত দুইটীর সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং উহা পরবর্ত্তী যুগের রচনা।

যাহা হউক, অধিকাংশ পণ্ডিতের মতেই শ্রদ্ধোৎপাদের রচয়িতা **অশ্বঘোষই**। মূল সংস্কৃত গ্রন্থখানি বহুদিন পূর্ব্বেই হারাইয়া গিয়াছে। ৭৮৪ হইতে ৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে চাঙ্‌ওান তালিকা সংগৃহীত হয়, সেই তালিকায় মূল গ্রন্থখানির উল্লেখ রহিয়াছে। তখন পর্য্যন্ত গ্রন্থখানি লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র লেখার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন যে "মহাযান সূত্রগুলির মধ্যে ইহার সকল মতই যদিও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তবুও সকল মানুষের বোধশক্তি একই প্রকার নয়; একই বস্তু বিভিন্ন মানব আপন মনের গতি অনুযায়ী বিভিন্নরূপে গ্রহণ করে। জ্ঞানলাভ করিবার পথও সকলের এক নয়। সুতরাং এই গ্রন্থ হইতে কেহ কেহ জ্ঞানলাভ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থটী লিখিতেছি।

এই গ্রন্থ লিখিবার আর একটী কারণ আছে। তথাগত বুদ্ধের সময় যে সকল ব্যক্তি তাহা শুনিতেন তাঁহাদের ধারণাশক্তি প্রখর ছিল। উপরন্তু বুদ্ধের অমৃতময়ী বাণীতে ও তাঁহার জীবনের প্রভাবে ধর্ম্মের নিগূঢ় অর্থ সরল সুন্দর হইয়া উঠিত। সুতরাং তখন কোনও দার্শনিক তত্ত্বের প্রয়োজন ছিল না।

বুদ্ধের নির্ব্বাণলাভের পর এক শ্রেণীর লোক তাঁহাদের সুতীক্ষ্ণ ধীশক্তির প্রভাবে, অল্প কয়েকটি সূত্র পাঠ করিয়াই সূত্রগুলির বহুবিধ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন। আর এক শ্রেণীর লোক সাধারণ ভাবে বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়া সহজেই তাঁহাদের অর্থ বুঝিতে পারেন। অন্য আর এক শ্রেণীর লোকদের বোধশক্তি অপেক্ষাকৃত কম, তাঁহারা বিস্তারিত টীকার সাহায্যে সূত্রের অর্থ বুঝিতে সক্ষম হন। আবার এমন লোকও দেখা যায় যে যাঁহাদের বোধশক্তি কম অথচ বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাঠ করিতে অনিচ্ছুক। একটী মতের

বিভিন্নরূপ সংক্ষেপে জানিতে পারিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। এই শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের জন্য আমার এই গ্রন্থ লেখা। ইহাতে তথাগতের গভীরতম সমগ্র মতটী অতি সংক্ষেপে বিবৃত করা হইবে।"

শ্রদ্ধোৎপাদ শাস্ত্রে অশ্বঘোষ **ভুততথাতা** এই তত্ত্বটীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই মত যাঁহারা মানেন তাঁহাদের নিকট দৃশ্যমান বস্তু (Phenomenon) ও তাহার যথার্থ সত্বার (Nomenion) মধ্যে সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন—জল ও ঢেউ যেমন, ইহাদের সম্বন্ধও তেমনই। ভুততথাতার অর্থ হইল বস্তু ও সত্য, মনের চিন্তাধারাও সত্য; বস্তু ও মনের পশ্চাতে তাহাদিগের একটী স্থায়ী সত্বা আছে; যাহার জন্যই তাহাদের অস্তিত্ব সত্য। এই পরমার্থ সত্য বা ভুততথাকে সাধারণ জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না; বৈজ্ঞানিক সূত্রের দ্বারা ইহাকে প্রমাণ করা যায় না; আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারাই ইহার ধারণা জন্মে।

শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্রে মোটামুটি তিনটী বিষয় প্রতিপাদন করা হইয়াছে। প্রথম হইল ভুততথাতার ধারণা, দ্বিতীয় হইল ত্রয়ীশক্তির প্রভাব ও তৃতীয় হইল বিশ্বাসে মুক্তির ধারণা বা সুখাবতীবাদ।

ভুততথাতা বাদের মধ্যে মাধ্যমিক দর্শনের শূন্যতা বাদের বীজ নিহিত রহিয়াছে। ভুততথাতা বা পরমার্থ সত্যকে কোনও বাক্য দ্বারা সম্পূর্ণ ব্যক্ত করা যায় না। মন, বস্তু, অন্তর, বাহির—এই সকল শব্দ আপেক্ষিক; একটীকে স্বীকার করিয়া লইলে তাহার বিপরীত অবস্থাকেও পরোক্ষভাবে মানিয়া লইতে হয়। নিরপেক্ষ সত্য হইল এ সকলের অতীত। নেতি নেতি বলিতে বলিতে সকল বস্তু অতিক্রম করিয়া ভুততথাতা বা পরমার্থ সত্যের ধারণা শূন্যতায় গিয়া পৌঁছায়। যোগাচারীদিগের আলয় বিজ্ঞানের ধারণাও ভুততথাতা বাদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। আলয়-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিস্তারিত বলিবার সময় এবিষয়ে আমরা বিশেষভাবে বলিব। বস্তুত অশ্বঘোষ মাধ্যমিক ও যোগাচার—এই দুই দার্শনিক মতেরই আভাষ দিয়া গিয়াছেন। শ্রদ্ধোৎপাদের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য বিষয় হইল ত্রয়ী শক্তির প্রভাব। মহাযান মতের এই একটী বিশেষ দিক্ অশ্বঘোষ দেখাইয়াছেন। তিনটী শক্তি হইল করুণা, জ্ঞান ও কর্ম্ম। ভুততথাতা বা পরমার্থ সত্যের উপলব্ধি দ্বারা যে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করা যায়, তাহাতে প্রথম অনন্ত প্রেমের (করুণা) আবির্ভাব হয়। আধ্যাত্মিক জীবনে অনন্ত প্রেমের আভাস না আসিয়াই পারে না। প্রেম আবির্ভূত হয় অনন্ত জ্ঞানেরই কালে। এই জ্ঞান ও প্রেমের প্রভাবে নৈতিক জীবনও নিয়ন্ত্রিত হয়, কর্ম্মফলের ধারণা সুস্পষ্ট হওয়ায় তাহা অতি-ক্রম করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এই তিনটী শক্তির প্রভাবই একত্রে অশ্বঘোষের মনকে নাড়া দেওয়ায় এই ত্রয়ী শক্তি সম্বন্ধে তিনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

সুখাবতীবাদ বা বিশ্বাসেই মুক্তি এই মতটী প্রথম শ্রদ্ধোৎপাদ শাস্ত্রেই পাওয়া যায়। এই মত সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে সংক্ষেপে বলিয়াছি।

বসুবন্ধুর দর্শন প্রথম পরমার্থই চীনে আনয়ন করেন। **বসুবন্ধুর জীবনী** তাঁহার নিজেরই লেখা, অন্য গ্রন্থের অনুবাদ নহে। এই জীবনীর মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে পরমার্থ, বসুবন্ধুর অগ্রজ অসঙ্গের জীবনকাহিনীও দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে অসঙ্গই যোগাচার দর্শনের প্রথম প্রবর্ত্তক। উত্তরভারতে পুরুষপুর নামক স্থানে কৌশিক বংশে অসঙ্গের জন্ম হয়। তাঁহারা ছিলেন তিন ভাই; অসঙ্গ জ্যেষ্ঠ, বসুবন্ধু কনিষ্ঠ। এই দুই ভাই-ই পরস্পরের সহযোগিতায় সাহিত্য ও ধর্ম্মচর্চ্চায় অগ্রসর হইয়া ছিলেন ও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, মধ্যম ভ্রাতা বিরিঞ্চিবৎসের নাম সাহিত্যক্ষেত্রে তেমন সুপরিচিত নয়।

অসঙ্গ প্রথমে মহীশাসক শাখার এক শ্রমণ ছিলেন, কিন্তু পরে মহাযান মত গ্রহণ করেন। মহাযান সূত্রের উপর কয়েকটী পুস্তিকা তিনি প্রণয়ন করেন। প্রবাদ এইরূপ যে তুষিত স্বর্গে ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রেয়ের নিকট হইতে অসঙ্গ যোগদর্শন শিক্ষা করেন। মৈত্রেয়ের নামে কতক-গুলি গ্রন্থ প্রচলিত আছে, কিন্তু বস্তুত অসঙ্গই সেগুলির রচয়িতা। হুয়েনসাং অসঙ্গের লিখিত বহু গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলির কথা আমরা যথা স্থানে বলিব। গ্রন্থ-গুলির চীনা অনুবাদই আমরা পাই, মূল গ্রন্থ পাওয়া যায়

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

না। হুয়েনসাং ছিলেন যোগাচার শাখাভুক্ত বৌদ্ধ; অসঙ্গের অধিকাংশ গ্রন্থই হুয়েনসাং ভারতবর্ষ হইতে আনিয়াছিলেন। কিন্তু বসুবন্ধুর গ্রন্থ প্রথম চীনে আনিয়াছিলেন পরমার্থ। বসুবন্ধু প্রথমে সর্ব্বাস্তিবাদী দলভুক্ত ছিলেন। বুদ্ধভদ্রের (হুয়েনসাংএর মতে মনোরথের) নিকট সর্ব্বাস্তিবাদ শাখার সমগ্র ত্রিপিটক তিনি অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি সৌত্রান্তিক মতটী অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ এই দুইটী মতের সমন্বয় করিয়া নূতন একটী মত গঠন করিবার সঙ্কল্প তাঁহার মনে উদিত হয়। এই উদ্দেশ্যে সৌত্রান্তিকবাদ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিবার জন্য ছদ্মবেশে তিনি এই মতের কেন্দ্রভূমি কাশ্মীরে যান। একটী ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া তিনি সঙ্ঘভদ্রের অধীনে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অধ্যয়ন প্রসঙ্গে সৌত্রান্তিক মত ক্রমাগত খণ্ডন করিয়া তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিতেন। এই নবাগত ছাত্রের অসাধারণ প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া সঙ্ঘভদ্রের গুরু স্কন্ধিলের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়; ক্রমশঃ তিনি নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারেন যে এই ছাত্র বসুবন্ধু ব্যতীত অপর কেহ নয়। তখন তিনি তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া পরামর্শ দিলেন যে গোপনে এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাও, নতুবা ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া কেহ তোমাকে হত্যা করিতে পারে। এই আদেশ পাইয়া বসুবন্ধু গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে যাইয়া ৬০০ শ্লোক সমন্বিত **অভিধর্ম্মকোষ** নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন ও তাহা কাশ্মীরে পাঠাইয়া দেন। এই গ্রন্থটী **অভিধর্ম্ম মহাবিভাসেরই** সারমর্ম লইয়া রচিত। কাশ্মীরের রাজা ও তথাকার পণ্ডিতবর্গ প্রথমে বসুবন্ধুর গ্রন্থটী পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হন; তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন গ্রন্থটীতে তাঁহাদের মতটাই সম্পূর্ণ সমর্থন করা হইয়াছে। কিন্তু স্কন্ধিল পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন বসুবন্ধু তাঁহাদের মত সম্পূর্ণ মানেন না; তিনি গ্রন্থটির যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিয়া রাজা ও পণ্ডিতবর্গকে জানাইলেন। তাঁহারই পরামর্শে তাঁহারা বসুবন্ধুকে পুনরায় গ্রন্থটির একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা লিখিতে অনুরোধ করেন। সুতরাং বসুবন্ধু সেই শ্লোকগুলির গদ্যে ব্যাখ্যা করিলেন; এই সটীক সংস্করণে আরও কতকগুলি নূতন শ্লোক যোগ করিয়া দেন ও নৈরাত্ম্য সম্বন্ধে একটি নূতন অধ্যায় লিখেন। এই সটিক গ্রন্থটির নাম হইল **অভিধর্ম্মকোষশাস্ত্র**। তৎপরে বসুবন্ধু অযোধ্যায় যান; তথায় তাঁহার ভ্রাতা অসঙ্গের নিকট মহাযান মতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই নূতন মত অবলম্বন করিয়া তিনি ইহার উপর বহু গ্রন্থ রচনা করেন, বহু মহাযান গ্রন্থের টিকা প্রণয়ন করেন। আশী বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

অসঙ্গের **মহাযানসম্পরিগ্রহ শাস্ত্রের** টীকা লিখেন বসুবন্ধু ও বোধিসত্ত্ব উ-সিং (বা অগোত্র ?)। পরমার্থ, অসঙ্গের মূল গ্রন্থটীও বসুবন্ধু ইহার যে অংশের টীকা লিখিয়াছিলেন সেই টিকার চীনা অনুবাদ করেন। সমগ্র টীকা ও মূল গ্রন্থ হুয়েনসাং পুনরায় অনুবাদ করেন। পরমার্থের অপর একটি প্রসিদ্ধ অনুবাদ হইল বসুবন্ধুর **বিজ্ঞপ্তিমাত্রসিদ্ধির**। এই বিজ্ঞপ্তিমাত্রসিদ্ধি, লঙ্কাবতারসূত্রের সার। লঙ্কাবতারসূত্রের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যোগাচার বিজ্ঞানবাদের ইহা একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। সুতরাং **বিজ্ঞপ্তিমাত্রসিদ্ধিতেও** বিজ্ঞানবাদের একটি সুন্দর সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ইহার চীনা অনুবাদ কিয়দংশ আমরা তুলিয়া দিতেছি :—

এই মায়াময় জগতে সে সকল প্রবৃত্তিধর্ম্ম (সমুদয় সত্য) কার্য্য করিতেছে সে সকলই আলয় বিজ্ঞানের প্রকাশ মাত্র আলয় বিজ্ঞানের প্রভাবেই সংসারে (দুঃখ সত্যে) যাবতীয় জীব বিচরণ করিতে পারিতেছে। যে সকল নিবৃত্তিধর্ম্ম (মার্গসত্য) জ্ঞানের পথে লইয়া যায়, সেগুলিও এই আলয়-বিজ্ঞান হইতে উদ্ভূত। এই বিজ্ঞানের প্রভাবেই যোগী নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ আলয় বিজ্ঞান ভূততথাতা, তথাগতগর্ভ, পরমার্থ সত্য এই সকলই একই বস্তুর বিভিন্ন আখ্যা মাত্র।"

পরমার্থ, অসঙ্গের **মধ্যান্তবিভঙ্গসূত্র**, ও বসুবন্ধু লিখিত তর্কশাস্ত্রের চীনা অনুবাদ করেন। **তর্কশাস্ত্রখানি** একটি অভিধর্ম্মের গ্রন্থ।

বসুবন্ধুর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইল **অভিধর্ম্মকোষকারিকা**, ইহার টিকাও বসুবন্ধুরই রচিত। এই দুরূহ দার্শনিক গ্রন্থখানিরও অনুবাদ পরমার্থ করেন। পরে

হুয়েনসাং পুনরায় ইহার অনুবাদ করেন। সর্বাস্তিবাদ সাহিত্য সম্বন্ধে বলিবার সময় গ্রন্থখানির বিস্তারিত আলোচনা আমরা করিব।

পরমার্থ আরও কতকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ অনুবাদ করেন। গুণবর্মণের **চতুর্সত্যশাস্ত্র**, গুণমতির **লক্ষণানুসারশাস্ত্র** বসুমিত্রের **অষ্টাদশ-নিকায়শাস্ত্র** প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তাঁহার দ্বারা অনূদিত হয়। ইহার মধ্যে বসুমিত্রের গ্রন্থখানি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে বৌদ্ধধর্মের প্রধান আঠারটি শাখার মতামত ও ইতিহাস রহিয়াছে। রাজা কনিষ্ক দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে বৌদ্ধগ্রন্থ সঙ্কলনের জন্য যে সভা আহ্বান করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে বসুমিত্র ছিলেন একজন প্রধান ব্যক্তি। পরমার্থ যে বসুমিত্রের গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ ইনিই সেই বসুমিত্র। কাশ্মীরের সভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপের সুযোগ পাওয়াতেই তাঁহার পক্ষে বিভিন্ন মতামতের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করা সম্ভব হইয়াছিল। Masuda নামক এক জাপানী পণ্ডিত চীনা হইতে ইংরাজী ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস যাঁহারা অধ্যয়ন করিতে চান তাঁহারা এই গ্রন্থ হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন।

হুয়েনসাং গুণমতির সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে বিখ্যাত সাংখ্য পণ্ডিত মাধবকে এই গুণমতি তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইঁহারই সম্মানার্থে মগধে এক বিহার নির্ম্মিত হয়। Watters বলেন যে গুণমতি নামে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন। যিনি মাধবকে পরাস্ত করেন সেই গুণমতি দক্ষিণ ভারতবাসী জনৈক বোধিসত্ত্ব। নালন্দায় ইনি এবং স্থিরমতি নামক অপর এক ব্যক্তি ইঁহাদের সহজ সরল রচনার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে উভয়ে মিলিয়া দক্ষিণ ভারতে বলভীতে যাইয়া গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন। পরমার্থ যে লক্ষণানুসারশাস্ত্রের অনুবাদ করেন এই গুণমতিই তাঁহার রচয়িতা এইরূপ মনে করা হয়।

পরমাচার্য্যের **সাংখ্যকারিকাভাষ্যের** অনুবাদ হইল তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদ। ইহার অপর একটি নাম **সুবর্ণসপ্ততীশাস্ত্র**। অনুবাদের প্রথম দিকে একটি স্থানে পরমার্থ বলিয়াছেন যে গ্রন্থখানি নাস্তিক ঋষি কপিলের লেখা। ইহাতে ২৫টী তত্ত্ব বা সত্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শেষদিকে আবার আমরা দেখি পরমার্থ বলিতেছেন পঞ্চশিখ (কাপিল্য) ৬০০০০ শ্লোক রচনা করেন। এই কাপিল্যের গুরু আসুরি ছিলেন ঋষি কপিলের শিষ্য। এই ৬০০০০ শ্লোক হইতে ঈশ্বর কৃষ্ণ নামক এক ব্রাহ্মণ ৭০টি শ্লোক বাছিয়া লন। চীনা অনুবাদে তিন খণ্ডে ভাষ্য ও কারিকা দুই-ই রহিয়াছে। কারিকা ঈশ্বর কৃষ্ণের লিখিত, কারিকাটীর নাম সাংখ্যসপ্ততি। সাংখ্যের মূল তত্ত্বগুলি ইহাতে রহিয়াছে। অধ্যাপক তাকাকাসু অনুমান করেন যে বিন্ধ্যবাস নামক প্রতিভাশালী সাংখ্য-দার্শনিক ও ঈশ্বরকৃষ্ণ একই ব্যক্তি। সাংখ্যসপ্ততি বিন্ধ্যবাসেরই লেখা। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এই বিন্ধ্যবাস ছিলেন এই তাঁহার অনুমান। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের মতে ঈশ্বরকৃষ্ণ ছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীতে, খ্রীষ্টপরে নহে।

পরমার্থকৃত ভাষ্যের অনুবাদ, গৌড়পাদের ভাষ্যের সহিত বহুস্থানে মেলে। Beal প্রভৃতি কতিপয় মনীষী ব্যক্তিদিগের মতে ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা ও গৌড়পাদের ভাষ্য পরমার্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাকাকাসু গৌড়পাদের ভাষ্য ও বৃত্তি চীনা অনুবাদের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলাইয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে চীনা অনুবাদটী গৌড়পাদেরই ভাষ্য হইতে করা হইয়াছে। সংস্কৃত ও চীনা এই দুইটি ভাষ্যের মধ্যে যেরূপ মিল রহিয়াছে তাহা আকস্মিক হইতে পারে না। তাকাকাসু আরও দেখাইয়াছেন যে কারিকা ও বৃত্তি উভয়ই এক ব্যক্তি দ্বারা লিখিত, ঈশ্বরকৃষ্ণই হইলেন কারিকা ও বৃত্তি উভয়ের লেখক। গৌড়পাদ পরে ঈশ্বরকৃষ্ণের বৃত্তি আপনার বলিয়া চালাইয়াছেন। অধ্যাপক বেলবলকার এর মতে পরমার্থ যে সংখ্যকারিকা বৃত্তি অনুবাদ করেন তাহার মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইল মাঠরবৃত্তি। এই মূল গ্রন্থখানি এখন পাওয়া যায় না।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

যুক্তি তর্কের ক্ষেত্রে বৌদ্ধদিগের কয়েকটি প্রতিদ্বন্দ্বী মতের সহিত লড়িতে হইয়াছিল, ইহাদিগের মধ্যে প্রধান হইল দুইটি সাংখ্য ও বৈশেষিক। পরমার্থ সাংখ্যদর্শনের একটি আভাস দিবার জন্য উপরি উক্ত গ্রন্থটি চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই সকল মতকে বৌদ্ধগণ বলিতেন নাস্তিকবাদ, এগুলিকে খণ্ডন করিতে যাইয়া বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগকে এই সকল মত বিশেষভাবে জানিতে হইত। চীনে এইরূপ একটি প্রবাদ আছে যে একবার সাংখ্যশাস্ত্রের রচয়িতার সহিত বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধুর বাগ্‌যুদ্ধ হয়; তাহাতে বসুবন্ধু পরাজিত হন। সেই সাংখ্যদার্শনিক **সুবর্ণসপ্ততি** গ্রন্থ লিখেন। তর্কযুদ্ধে জয়ী হওয়ায় পুরস্কার স্বরূপ রাজা তাঁহাকে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করেন। হুয়েনসাংএর সুপ্রসিদ্ধ শিষ্য কোয়াই-চের (Kwei-chi) মতে এই প্রবাদ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তিনি বলেন যে চীনে এইরূপ একটি কিম্বদন্তী আছে যে বৌদ্ধ পণ্ডিত ও সাংখ্যপণ্ডিতদের মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ হয়, তাহাতে বসুবন্ধু ছিলেন বৌদ্ধদিগের একজন প্রধান সমর্থক। সাংখ্যপণ্ডিত বিন্ধ্যবাসের সহিত এই প্রসঙ্গে তর্ক খুবই সম্ভব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাকাকাসুর মতে বিন্ধ্যবাস ঈশ্বরকৃষ্ণেরই অপর এক নাম। বসুবন্ধু **পরমার্থসপ্ততি** নামক একটি গ্রন্থে কথোপকথন প্রসঙ্গে সুবর্ণসপ্ততি-প্রতিপাদিত সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন। মূল গ্রন্থখানি বা তাহার চীনা অনুবাদ কিছুই এখন পাওয়া যায় না। হুয়েনসাংএর সময় কিন্তু গ্রন্থখানি ছিল, কোয়াই-চে তাঁহার গ্রন্থে এই গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। পরমার্থ বসুবন্ধুর **জীবনীতে** বলিয়াছেন যে বিন্ধ্যবাস নামক সাংখ্যপণ্ডিতের সহিত বাক্‌যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাঁহার গুরু বসুবন্ধু **পরমার্থসপ্ততি** নামক গ্রন্থ লিখেন; এই গ্রন্থে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীর সাংখ্যশাস্ত্র তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেকটি অংশ খণ্ডন করেন। বসুবন্ধুর গ্রন্থখানি হারাইয়া গিয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি সেই গ্রন্থে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর মত কি ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

পরমার্থের অনুবাদ হইতে আমরা এমন অনেক গ্রন্থের কথা জানিতে পারি যে গুলির মূল গ্রন্থ ভারতবর্ষে আর পাওয়া যায় না, তাহাদের চিহ্নমাত্র নাই। ইহা ব্যতীত বৌদ্ধদর্শন বিশেষতঃ বসুবন্ধুর দর্শন চীনবাসীর নিকট সহজ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়া তিনি যে মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই।

(ক্রমশঃ)

একটী বয়াৎ গান
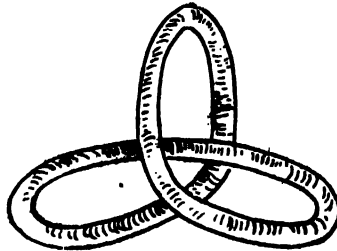
সংগ্রাহক—শ্রীরমেশ বসু

[পুব্ বাঙ্‌লায় অনেক রকমের লোক-সঙ্গীত চলিত আছে। তার মধ্যে বয়াৎ গান নামে এক জাতীয় গান আছে, তার আবার নানা রকম দেখা যায়। এগুলি খুব লম্বা ও প্রায়ই করুণ রসাত্মক। ইহা প্রথমে একজনে গায়, পরে চার-পাঁচ জন "পাছ্-দোহারে" একসঙ্গে গায়। গানগুলি শুন্‌তে বেশ লাগে।

নীচে একটি বয়াৎ গান দেওয়া গেল। এ গানের রচয়িতা মুসলমান। নাম দেওয়া আছে "মোমিন"। হিন্দু সমাজের বাল-বিধবার দুঃখ এই গ্রাম্য মুসলমান কবির গানে কি করুণ হয়েই ফুটে উঠেছে! এই গানটি ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমা থেকে সংগৃহীত।]

কেরই তোম্‌রা কইবার্ পার, কোন্ পাপেতে জন্ম নইলাম্
অধম নারী-কুলে গো, অধম নারী-কুলে ?
নারী জন্ম নইলাম যদি, এই দ্যাশেতে জন্ম হইল
কোন মহাপাপের ফলে গো, মহাপাপের ফলে ?
চ্যাঙ্গ্‌রা কালে বিয়ার পরে গ্যালাম শশুর ঘরে,
খুটি-মুচি রইলো পইর‍্যা ছাইন্‌চ্যাতে দুয়ারে ;
মায়ের আচল ছিনিয়া নিল দ্যাচ্‌রাইয়্যা আমারে,—
য্যামন্ বক্‌রী জব-কালে গো, বক্‌রী জব-কালে !
জেল-খানার কয়েদী হইলাম, নিষেধ কওয়া কথা,
সারাদিনই কাম করি হায় ! কেউ বুঝে না ব্যাথা ;
গুম্‌ঠা কালে কাপর করে ঘোমটা-ঢাকা মাথা,—
য্যান চুবায় জলের তলে গো, চুবায় জলের তলে !
গাঙ্গে নতুন জলের সাথে পায়ে-প্যাটে শোতের ভারে,
কার্ত্তিকে তান্ ছুইট্‌লো পীলা, আমার কপাল গেল পুরে ;
সাউরী কান্দে মাথা কুইটা য্যান ঢেকী নোটে পরে—
ভোরে চিয়া-কোটার কালে গো, চিয়া-কোটার কালে।
সে সব কথা ছ্যাকার মত আইজ্‌ক্যা পরে মনে,
সে সময় যা বুঝি নাই তা বুইঝ্‌ত্যাছি অ্যাখনে ;
আমার কইল্‌জ্যার্ মধ্যে ক্যামন্ জানি করে রাইতে-দিনে,
য্যান্ খাইম্‌চায়্ বিয়ালে গো, খাইম্‌চায় বিড়ালে !
জৈষ্ঠ মাসে কুলের ডাকে জারাইয়্যা উঠে গায়,
বাইস্‌সা ভোরে দেওয়ার ডাকে শরীল্ শির্‌শিরায় ;
চিতার নিশান মতন করে আমার বুকে হায় ! হায় !—
যখন্ আঘন্-হাওয়া চলে গো, আঘন্-হাওয়া চলে !
নিত্যি আইস্যা হরিদাসী বুঝাইয়্যা কয় মা'রে,
এ বুকের শ্যাল্ আর কতদিন রাইখ্‌ব্যা দিদি ঘরে ?
ভ্যাক্ দিয়্যা দ্যাও গুরুর কৃপায় হাইস্যা যাইবো পারে,—
রাধা নামের বাদাম্ তুইলে গো, নামের বাদাম্ তুইলে।
রামা মালীর বৌ আইস্যা কয়—ওরে দ্যাও না বাবুর বারী,—
আচল দিয়্যা আগুন ঢাইক্যা রাইখ্‌ব্যা ক্যামন্ করি ;
তোমার কপাল যাইবো ফিরা, সুখে থাইক্‌বো ছেরী ;—
য্যামন মোল্লা মুর্গী পালে গো, মোল্লা মুর্গী পালে !
পারার মাইন্‌সে আমার কথা কানাকানি করে,
পথে ঘাটে যাইস্যা আমি লোকের কথার ডরে ;
আকাশ পাতাল ভাবি বইস্যা ওসারার উপরে ;—
আমার বুক ভাইস্যা যায় জলে গো, বুক ভাইস্যা যায় জলে !
সারা রাইত্ মা জাইগ্যা থাকে, ঘরে মইল্‌ক্যা রাখি,
আচল ধইর‍্যা ঘুমাই আমি খ্যাতায় মাথা ঢাকি ;
স্বপ্ন দেইখ্যা চইম্‌ক্যা উইঠ্যা যখন 'মা' 'মা' কইর‍্যা ডাকি,
আমায় টাইন্যা মা ন্যায় কোলে গো, টাইন্যা মা ন্যায় কোলে।
অলক্ষিণ্যা বইল্যা সাউরী আর নিলো না আমারে,
বিধ্‌বা মা এই শত্রু-মালে আমায় ক্যামনে রাখে ঘরে ?
ভ্যাক্ নইবার্ তাই নবদ্বীপে আইচি দ্যাশের মায়া ছাইরে।
বাঙ্গ্‌লা গ্যালো রসাতলে গো, গ্যালো রসাতলে—
মোমিন্ কাইন্দ্যা বলে।

[শব্দের অর্থ :—কেরই = কেউ। চ্যাঙ্গ্‌রাকালে = বাল্যকালে। খুটি-মুচি = খেলিবার জন্য মাটির বাসনপত্র।
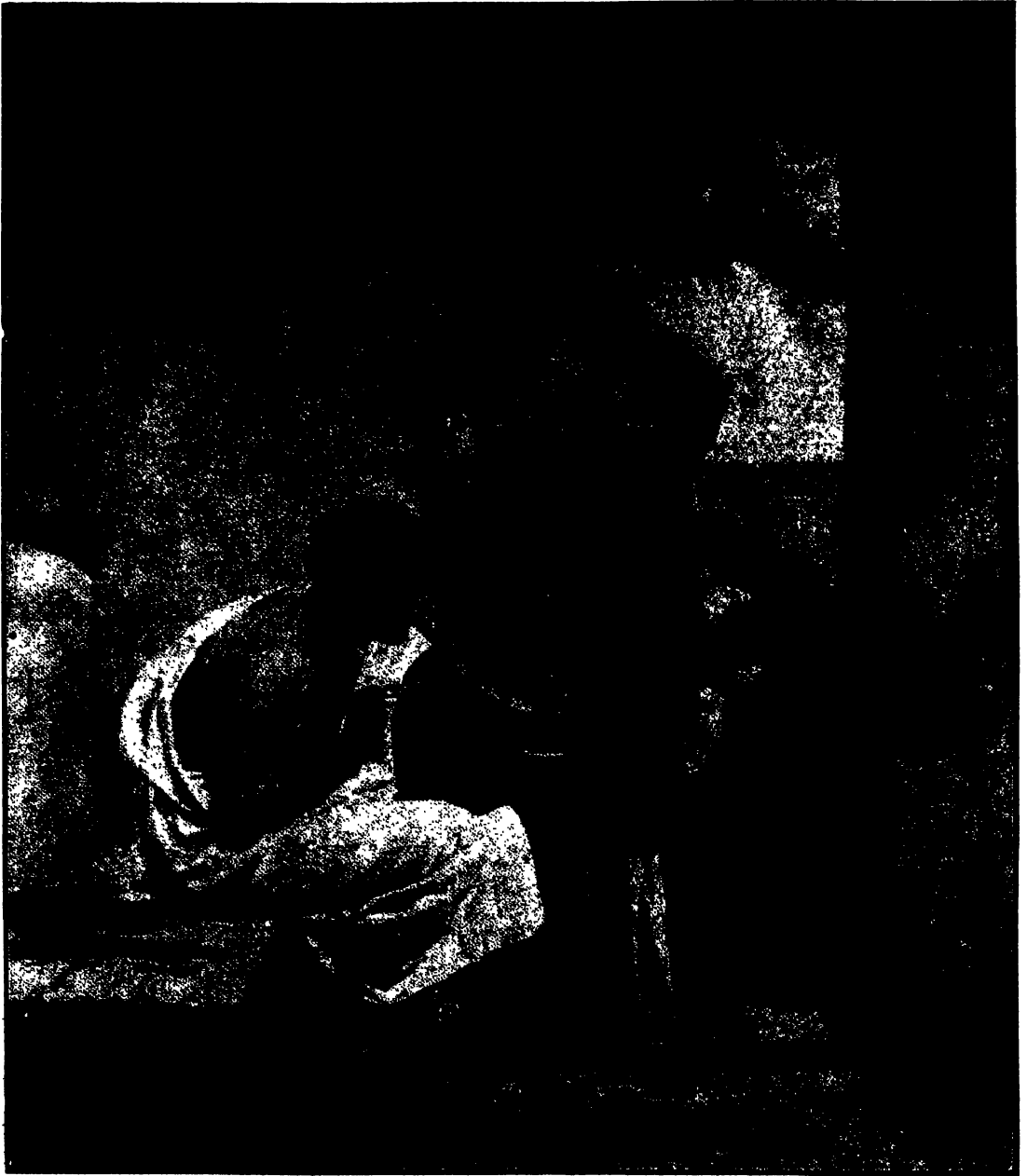
চিত্রাঙ্কণ

(বিদেশী চিত্র)

সংগ্রাহক—শ্রীরমেশ বসু

ছাইন্‌চ্যা=ঘরের বাতার তলে উঠানের যে অংশ পড়ে। স্যাচরাইয়া=টেনে-হিঁচড়ে। জব=জবাই। গুম্‌ঠা=গ্রীষ্ম। গাঙ্গ=নদী। শোত=শোধ। তান্=তাঁহার, স্বামীর। নোট=ধান ভানিতে যে গর্ত্তের মধ্যে ধান রাখা হয়। কোটা=ঢেঁকির সাহায্যে তৈরী করা। ছ্যাকা=লোহা পুড়িয়ে দাগ দেওয়া। খাইম্‌চায়=আঁচড়ায়। কুল=কোকিল। জারাইয়্যা=রোমাঞ্চিত হ'য়ে। বাইস্‌সা=বর্ষা। দেওয়া=মেঘ। শরীল্=শরীর। শির্‌শিরায়=শিউরে উঠে। চিতায়...চলে=চিতার উপর নিশান যেমন মৃতের জন্য হায় হায় করে সেইরূপ অগ্রহায়ণের বাতাস বুকের মধ্যে হায় হায় করে। শ্যাল্=শেল। ভ্যাক্=ভেক। বাদাম=পাল। ওরে=ওকে। ছেরী=ছুঁড়ী। ওসারা=বারান্দা। মইল্‌ক্যা=প্রদীপ। খ্যাতা=কাঁথা। অলইক্ষণ্যা=অলক্ষণা। বইল্যা=বলিয়া, জন্য। শক্র-ম্যালে=শক্রমধ্যে।]

ভস্মের জন্মকথা

শ্রীলীলা দেবী

কাজল পরিনু মুছিয়া গেলো তা
　　নয়ন লোরে ;
আঁচল ভরিনু খসিয়া টুটিল
　　ভাবের ঘোরে।
ভূষণ যত সে হারাইল পথে
　　ফেলিল হরি ;
অলকা-তিলকা শুকাইল মুখে
　　পড়িল ঝরি'।
ফল ফুল দীপ ধূপ চন্দন
　　থালায় ভরা
কেঁপে গেলো প'ড়ে স্পন্দন তলে
　　ভরিল ধরা।
আপন আবেগে আপনি চুমিনু
　　আপন দেহ,
দেখার আগে যে দেখিবার বাড়া
　　হরষ সেহ।

ভাবের উছাসে বিপুল পুলকে
　　উঠিনু জ্ব'লে,
যা ছিল আমার তোমায় দেবার
　　হৃদয় তলে
জ্বলিয়া উঠিল বনে বনে তাহা
　　তরুতে তৃণে
পাতায় পাতায় কুসুমে লতায়
　　নিশীথে দিনে।
আকাশে অনিলে সাগরে অনলে
　　ভরিল সে যে,
বিশ্বের অণু পরমাণু মাঝে
　　উঠিল বেজে।
জ্বলিয়া উঠিনু ধূপের মত যে
　　মরিনু পুড়ে,
ছাই হ'য়ে আজ মিলাই শূন্যে
　　বাতাসে উড়ে।

প্রতিভা-বিভ্রাট

—গল্প—

—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায়

প্রফেসার দত্তর জীবনী কেহ লিখে নাই, লিখিবারও বিশেষ কিছু ছিলনা। লোকে তাহাকে ভালও বলিত না, মন্দ বলিতেও কুণ্ঠিত হইত; এবং সে অপর দশজনের ন্যায় ভালমন্দের ঊর্দ্ধে বিচরণ করিত। তাহার পর যখন সরিষার তৈল মাখিয়া ও তাঁমাকু সেবন করিয়া মরিতে উদ্যত হইল, তখন একদিন অতর্কিতে তাহার জীবনের অসামান্য যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়া যায় ও প্রমাণস্বরূপ তাহার খাতাপত্র পেশ করে। যৌবনের আবেগে মানুষ যে দু একটা অপকর্ম্ম করিয়া ফেলে, ইহা তাহারই একটি উদাহরণ।

দত্তদের বাড়ীর যতীশ ছেলেটি ছিল আধুনিক যুগের। আধুনিক যুবকের একটা লক্ষণ যে তাহারা সব জিনিষ চট্ করিয়া বুঝিতে পারে এবং বুঝিতে না পারিলেও দু-কথা বলিতে পারে। সুতরাং গবেষণা না করিয়াই যখন সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল অনিয়ন্ত্রিত প্রতিভাই ভারতের অধঃপতনের কারণ, তখন তাহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। তাহার বিশ্বাস ছিল ভারতে প্রতিভার অভাব নাই (ভারতের প্রতিভা প্রমাণের অপেক্ষা করে না, সে নিরবলম্ব ও স্বতঃসিদ্ধ—যতীশের নোটবুক), যা কিছু বিলম্ব খুঁজিয়া লইবার। হয়ত ইহার অভিনবত্ব কিছুই ছিল না, কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত প্রেরণায় সে চমৎকৃত হইল ও ইহার ক্রমিক ও দৈনিক অনুভূতির সহিত বেশ বলশালী বোধ করিতে লাগিল।

বন্ধু রমেশ বার্গ্‌সঁ পড়িয়াছিল; সে বলিল উক্ত তথ্য সহজানুভূতির রন্ধ্র দিয়া তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছে, উহাকে সযত্নে রক্ষা করা প্রয়োজন।

তরুণ প্রফেসার দত্ত এক মফঃস্বল কলেজের tutorial class পড়ানর ভার পাইল। নবীন বয়সে experiment'এর দিকে একটা ঝোঁক থাকে। ক্লাসে অল্প ছেলে, কিন্তু তাহারই মধ্যে সর্ব্ব জাতির সর্ব্ব বর্ণের সমন্বয়। সে মুগ্ধ হইয়া ভাবিল যদি এই সকল প্রতিভার গতিপথ নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারে, তাই কি একদিন অধীনতা-সমস্যার একটা কিনারা হইয়া যাইবে।

এইখানে যতীশের শিক্ষার কথা কিছু বলা ভাল। সে সাহিত্যে এমএ,—কিন্তু বোটানি, সাইকো-এনালিসিস, ফিজিয়লজি এমন কি ফিসিক্স পর্য্যন্ত নিজে পুস্তক পড়িয়া শিখিয়াছে (গ্রামোফোনে যদি নাটক অভিনীত হইতে পারে, তবে কেবল পড়িয়া শিখা যাইবেনা কেন;—নোটবুক)। সে সব জিনিষই কিছু বুঝিত এবং কোন জিনিষই ভাল বুঝিত না; ইহাতে তাহার হৃদয়ে সন্দেহ ও সিদ্ধান্তের অবিরত দ্বন্দ্ব হইত এবং লোকের সম্মুখে ভয়ে কথা বলিত না। কিন্তু নোটবুক জিনিষটা ভারসহ, সুতরাং নোটবুকই তাহার প্রতিভার আশ্রয় হইয়া উঠিল।

একদিন এক পুস্তকে দেখে এক বৈজ্ঞানিক specialisation-এর সহিত শিক্ষার সার্ব্বাঙ্গীনতার সাতিশয় প্রশংসা করিয়াছে। পড়িতে পড়িতে তাহার স্মরণ হইল Einstein বেহালা বাজান এবং তদীয় সহকর্ম্মী জনৈক ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সেতার বাদনে সুদক্ষ। সে specialise করিতে পারিবে না, এবিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। সে ক্ষমতা তাহার নাই এবং তাহার ভার যোগ্যপাত্রে অর্পিত হউক, ইহা সে সরলভাবে স্বীকার করিত, কিন্তু একটা ছোটখাট সর্ব্বাঙ্গীনত্ব, ইহাও কি তাহার শক্তির বাহিরে? যাহাতে মানুষ তাহার স্বাভাবিক প্রবণতা খুঁজিয়া পায়, সেই ত তাহার পথ। তাহার পর বিলম্ব হইলে সে মরিয়া যাইবে, কোন চিহ্নই থাকিবে না। (শ্মশান বর্ণনার উপসংহার—এইখানে আসিলে সাম্য ও মৃত্যু সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া যায়—রচনার খাতা)।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায়

কি পদ্ধতিতে কাজ আরম্ভ হইবে, ইহা লইয়া সে কিছু গোলে পড়িল। এ ত আমেরিকা নয় যে কল্পনা, বুদ্ধি, প্রতিভা যন্ত্রের সাহায্যে নিক্তির ওজনে মাপিয়া বলিয়া দিবে। ক্লাসের পরিচয়টা সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু অন্য পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ছাত্র অপমানিত বোধ করিবে, অভিভাবক অনধিকারচর্চ্চা ভাবিবেন এবং কর্ত্তৃপক্ষ পুলিশের গন্ধ পাইবেন। সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া সে পর্য্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তে নিজের গবেষণা বিভক্ত করিয়া ফেলিল। ক্লাসের পরিচয়ের প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ নাম দিল, অপর ছেলেদের দ্বারা খবর নেওয়া পরোক্ষ পর্য্যবেক্ষণ দাঁড়াইল, কিন্তু কয়েকবার ঠেকিয়া পরোক্ষ পর্য্যবেক্ষণ কাটিয়া জনশ্রুতি নাম দিল। যদি বিজ্ঞান দৃশ্য হইতে অদৃশ্যে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে পারে, তবে তাহার পদ্ধতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের সমন্বয়ে বৈজ্ঞানিক আখ্যা পাইবে না কেন? তাহার পর প্রবলবেগে প্রতিভা নির্ণয় চলিল। সাইকো-এনালিসিসের করুণায় সব ঘটনা instinct দ্বারা বুঝাইবার স্পৃহা সে রোধ করিতে পারিত না এবং instinct-এর সংখ্যারও তাহার হস্তে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছিল। তাহার পরিচয় ১৯২০ সালের নোটবুকে পাওয়া যাইবে।

Semi = বৈজ্ঞানিক প্রতিভা রিসার্চ্চ।

(প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ, প্রঃ পঃ জনশ্রুতি, জঃ শ্রুঃ সিদ্ধান্ত = সিঃ)

১। মৃণালকান্তি চৌধুরী

প্রঃ পঃ—অতিশয় সুশ্রী, গায়ে শিল্কের জামা ও চাদর, পরণে মিহি কালাপেড়ে ধুতি, আস্কন্ধ চুল, লেখাপড়ায় উদাসীন।

জঃ শ্রুঃ—জমিদার পুত্র সতীশ কয়েকদিন তাহাকে মোটরে লইয়া বেড়াইবার পর পিতার নিকট হইতে পত্র পায়, "তুমি স্ত্রীলোক লইয়া প্রকাশ্যে বেড়াইবার মত নির্লজ্জ কি করিয়া হইলে? এতদূর অধঃপতন......"ইত্যাদি—

সিঃ—(female instinct) সখের থিয়েটারে মেয়ের পার্ট ভাল করিবে কিন্তু অন্যত্র মেয়েদের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিবে না।

২। রমেশচন্দ্র দাস

প্রঃ পঃ—খদ্দরের কাপড়, জামা, টুপি এবং জুতা পরে; ইংরাজী ভাল বলে; অঙ্কে কাঁচা; শরীর দুর্ব্বল।

জঃ শ্রুঃ—ডিবেটিং ক্লাবে বক্তৃতার সময় কাঁপিয়া পড়িয়া যাইবার মত হয়। ইতিপূর্ব্বে উক্ত অবস্থায় দুইবার মূর্চ্ছা গিয়াছে।

সিঃ—(garrulous instinct) দেশহিতৈষী বাগ্মী হইয়া ভারতকে জাগাইবে, কিন্তু সম্ভবতঃ জাগরণের পূর্ব্বেই মরিয়া যাইবে।

৩। হামিদ আলি

প্রঃ পঃ—অতিশয় বলবান, পড়াশুনা বন্ধ দিয়াছে, হকি টিমের ক্যাপ্টেন।

জঃ শ্রুঃ—সংগ্রহ করিতে সাহস হয় নাই।

সিঃ—(fighting instinct) কালে ট্রেনে গোরাদের সহিত প্রথমে তর্ক ও পরে মারামারি করিবে এবং ভবিষ্যতে চাটুয্যের ন্যায় মুষ্টিযুদ্ধ শিখিতে পারিবে।

৪। সরোজকুমার রায়

প্রঃ পঃ—সুবিন্যস্ত টেরি, হাতে রিষ্টওয়াচ, ফিটফাট এবং অত্যন্ত সৌখিন। সিগারেটের গন্ধ দশগজ দূর হইতে প্রেরণ করে, টিফিনে বেহালা বা বাঁশি বাজায়।

জঃ শ্রুঃ—উত্তরের আশা না রাখিয়া মেয়েদের পত্র লিখিতে পারে এবং পথে ঊর্দ্ধনেত্র।

সিঃ—(sex complex-এর মূল্যবান উদাহরণ) ফ্রয়েডের মতে ইহাই স্বাভাবিক অবস্থা, ইহার প্রতিরোধের (repression) ফলে মানুষ কল্পনায় তৃপ্ত হইতে চাহে। ফ্রয়েড পাইলে বক্ষে লইতেন, তবে অকালে বিকশিত না হইলেই মঙ্গল।

৫। মাধব, বিপিন, ঘনশ্যাম ইত্যাদি

প্রঃ পঃ—শান্ত, নির্ব্বাক, পড়া কখনও করে, কখনও বা করেনা।

জঃ শ্রুঃ—মিটিংএ বেঞ্চি সাজায়, থিয়েটারে সিন ঘাড়ে করিয়া লইয়া আসে, মড়া পুড়াইতে ভালবাসে ও বিড়ি খায়।

সিঃ—(Herd instinct) যূথবদ্ধ ভাবে কাজ করিবে, পরের কথায় চলিবে, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মপ্রচারকদের কাজে

লাগিবে। (এই শ্রেণীর লোকদের প্রতি ধর্ম্মসংস্থাপকদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। ইহাদের জন্যই প্রচলিত ধর্ম্মসকল টিকিয়া আছে—নোটবুক)

৬। মৃগাঙ্ক মজুমদার

প্রঃ পঃ—খাটো জামা, নহাতি কাপড় এবং নাগরা জুতা পরিহিত।

জঃ শ্রঃ—সকালে ছোলা খায়, দিনে অসম্ভব জল পান করে, বাজার দর অনুসারে ভাত বা আটা এক বৎসর নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে খাইতে পারে।

সিঃ—(possessive instinct) অর্থশালী হইবে; তবে স্ত্রী অসুখী হইবে ও পুত্র বাক্স ভাঙ্গিবে।

৭। শরদেন্দু ব্যানার্জ্জি

প্রঃ পঃ—ফর্সা ও স্বপ্নময় দৃষ্টি, সৌন্দর্য্যপিয়াসী ও চা-ভক্ত, ক্লাসে অধিকাংশ সময় ছবি আঁকে।

জঃ শ্রঃ—বাঙলা মাসিকে একটি মাত্র চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বিষয়,—একটি অজ্ঞাত জাতীয়া এবং দেশীয়া নারী (পুরুষও হইতে পারে) অরণ্যপ্রান্তে (সমুদ্র, আকাশ বা পর্ব্বত ভাবিলে অসঙ্গত বা অন্যায় হইবে না) বেড়াইতেছে (কি অভিপ্রায়ে বলা শক্ত যদি না ফুটনোট থাকিত—"অভিসার)।"

সিঃ—(Creative instinct) চিত্রকর হইয়া অনাহারে তনুত্যাগ না করিলে কেরাণী হইতে পারে।

৮। বঙ্কিম চক্রবর্ত্তী

প্রঃ পঃ—বয়স বোধ হয় আটাশ, ক্লাসে অতিশয় গম্ভীর, কেবল মাঝে মাঝে অর্থপূর্ণ ভাবে মাথা নাড়ে। বৃদ্ধ গণিত-প্রফেসরের গণনায় একাদিক্রমে এক ক্লাসে ছয় বৎসর পড়িতেছে। হাবভাব অসাধারণ না হইলেও রহস্যময়। কলেজশুদ্ধ ছেলে দাদা বলিয়া ডাকে। কলিকাতায় বাড়ী।

জঃ শ্রঃ—ফোর্থ-ইয়ারের ছাত্র নরেন প্রমুখাৎ—"সেবারে সহরে কলেরা হওয়াতে কলিকাতায় পরীক্ষা দিতে যাই। আমাদের সিট দারভাঙ্গা বিল্ডিংসে পড়ে। আমার কাছেই দাদার সিট ছিল। তৃতীয় দিন আমাদের ইতিহাস পরীক্ষা। কুড়ি মিনিট হ'ল পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে, এমন সময়ে দোরের কাছে গোলমাল শুনে দেখি দাদা সিগারেটে ক'সে দম দিচ্ছে আর গার্ডকে বলছে—"মশায়, চুল পাকতে চলল আর Examination Hall এ smoke করা বারণ এটা আর জানিনে, তা ব'লে মুখের সিগারেট ফে'লে দেবো, পরকালে জবাব দেবো কি?"—যাক দাদা ত সিটে এসে বসল। বসেই টোকা মেরে তবলা বাজাতে এবং তার সঙ্গে একটা গতের সারগম গাইতে লাগল। গার্ডরা হাঁ হাঁ করে এসে পড়লে হেসে বল্ল, "কাল গতটা শিখেছি মশাই, একটু মক্স করে নিচ্ছিলাম। গানটা disturbance নয় মশাই।" তারপর Question paper-এ একবার চোখ বুলিয়ে বিশ গজ দূরে সতীশকে বলতে আরম্ভ কল্ল, "আরে সতে, মাইরি, কি কোশ্চেনই দিয়েছেরে, একেবারে জল। একটা unimportant নেই। কি কপাল, আজ সকালেই পড়েছি।" গার্ড এসে প্রতিবাদ কল্লে বললে, "মশায়, রাগ করেন কেন—এত unfair means নিচ্ছিনা। আমি ছোট লোক নই মশাই। হাঁা দেখুন, সতেকে এই দু খিলি পান দেবেন আমার bosom friend।" গার্ড হেসে পান দিয়ে এল। তারপর দাদা খানিকটা কি লিখে এক ঘুম দিয়ে বেরিয়ে এল। গানটা বেশ জানে স্যার।"

সিঃ—(Instinct of mischief and creation—বোধ হয় conflict এর অবস্থা) দুরূহ কেস, ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট ও অন্ধকার।

দাদার কেসে ঠেকিয়া যতীশের চৈতন্য হইল যে প্রতিভা ও instinct নির্ব্বাচন অত সহজ নয় (কার্য্যকারণ অপার রহস্যে আচ্ছন্ন, মানুষ অল্পই বুঝিতে পারে--নোটবুক)। এদিকে ছাত্রেরা পুলিশের গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিল এবং একথা দশকানে উঠিয়া গোলযোগের উপক্রম হইল। সুতরাং নিরুপায় যতীশ নিরস্ত হইল এবং কর্তৃপক্ষ আশ্বস্ত হইলেন।

দোলের ছুটি

শ্রীরামেন্দু দত্ত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যখন রাত চারটে, কানের কাছে ক্রিং-ক্রিং এলাম-ঘড়ি বেজে উঠ্‌লো; আমরাও পরস্পরকে ডাকাডাকি করে' উঠিয়ে নামবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলাম। মথুরা-এক্স্‌প্রেস্‌ তখন আলোকোজ্জ্বল টুণ্ডলা ষ্টেশন ছাড়িয়ে ঘণ্টায় ৩৫ মাইল বেগে আমাদিকে আগ্রার দিকে নিয়ে ছুটেছে। আমাদের মন অননুভূতপূর্ব্ব আশা ও আনন্দে দোল খেতে লাগ্‌লো।

চন্দ্রলোক-বিধৌত তীব্র শীতের নিশীথান্তে প্রায় সাড়ে চারটার সময় 'আগ্রা-সিটি' ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌লো। তৃপ্তিভরে দেখলাম চিঠি পেয়ে আগ্রা-প্রবাসী আট-ন' জন বাঙালী যুবক সেই প্রচণ্ড শীতকে অগ্রাহ্য করে' রাত্রি-শেষের অসময়ে আমাদের জন্য প্লাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে। আরো আনন্দ হ'ল এই কারণে যে তাঁদের মধ্যে মাত্র একজন (যাঁকে পত্র দেওয়া হয়েছিল) আমাদের পরিচিত; অপর সকলে কেবল প্রবাসে স্বদেশবাসী—এই সুবাদে এতটা কষ্ট স্বীকার করেছেন।
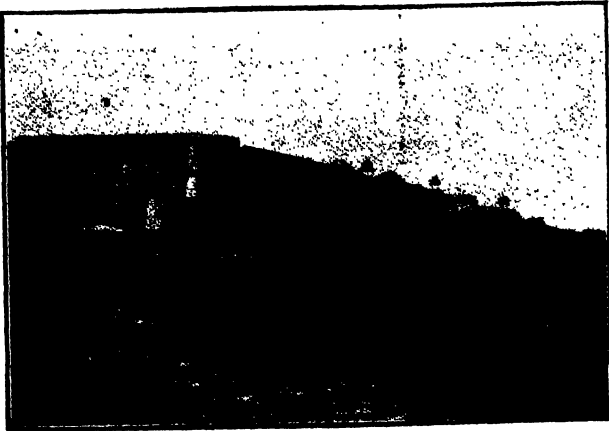
গঙ্গাতীরস্থ বারাণসী (চলন্ত ট্রেন সেতুমধ্যে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই গৃহীত)

'Be a Roman while in Rome' (লঙ্কায় এলেই রাবণ হ'তে হয়) এই প্রবাদ-বাক্যের মর্য্যাদা-রক্ষার্থে আমরা 'এক্কা' নামধেয় এদেশের সনাতন একক-অশ্বযানটিকেই বেছে নিলাম। বর্ণপরিচয় পড়ার সময় থেকে কৈশোর পর্য্যন্ত যে দ্বিচক্রযানকে ('বাইসিক্‌ল্‌' নয়) পরিচিত করিয়ে দেবার জন্যে দিদিমা ছড়া শিখিয়েছিলেন—"এক্কা গাড়ী খুব ছুটেছে; ঐ দেখ ভাই চাঁদ উঠেছে!" তা ছাড়া আ-শৈশব শোনা "বেহারে বেঘোরে চড়িনু এক্কা"—সেই এক্কাকে হেলায় পরিহার করে' অদ্যবধি বিংশ-শতাব্দী-সঙ্গত যানে আরোহণ করি, অতরুণ না হ'লেও অতটা অতি-তরুণও হ'তে পারলাম না। পথে যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম যে একটা পুরোণো ধারণা বদ্‌লে ফেলবার সময় এসেছে। এতদিন ধূলোর উৎপাতে আমার কাছে মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়াই শ্রেষ্ঠ ছিল; এখন দেখলাম এই বাদ্‌শাহী আগ্রা-নগরী ধূলিসম্পদে-ও বাদশাহী। অরাতি-অশ্ব-ক্ষুরোত্থিত ধূলিরাশি দেখ্‌বার পর পূর্ব্বকালে রাজারা কি করে

আগ্রা-দুর্গের বহির্দৃশ্য (চলন্ত এক্কা হইতে)

যুক্ত-প্রদেশের পল্লী (চলন্ত ট্রেন হইতে)

একটা প্রকাণ্ড সৈন্য-সমারোহ সংগ্রহ করে' নেবার সময় পেতেন তা' যেন কতক কতক বুঝ্‌তে পারছিলাম! উত্তর-ভারতের এই সব নবাবী সহরগুলি আবার নবাবী রোগের জন্যও বিখ্যাত। যথা আগ্রায় ত প্লেগ্ লেগেই আছে; পথে যেতে যেতে আমাদের আগ্রার বন্ধুদের কাছে শুন্‌লাম যে ঠিক সেই সময়টাতেই প্লেগ্ দেখা দিয়েছে আর লোকও মর্‌ছে কম নয়। মনটা দমে গেল; তাজমহলের দেশে-ও প্লেগ্! ছোট ছাত্রটি ত রোগাক্রান্ত হ'বার ভয়ে সেই যে নাকে কাপড় দিলে, আর বাসায় না পৌছানো পর্য্যন্ত নাকের কাপড় খোলেনি। আমরা যদিও তা'র মত আত্মরক্ষার জন্যে অতটা পরিশ্রম করি নাই, তবু জ্যোৎস্নালোকের আব্‌ছা অন্ধকারে যখন পাথর-বাঁধানো অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ গলির মধ্য দিয়ে এক্কা ছুটেছিল, তখন এই রোগের প্রাদুর্ভাবের বিপক্ষে কোন আয়োজনই দেখ্‌তে পেলাম না। আগ্রার সৌধশালী ধনীদের কথা ছেড়ে দিলে যে সমস্ত বাড়ীতে মধ্য বিত্ত লোকেরা বাস করেন সেগুলিকে অন্ধকূপ বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। পাথরের তৈরী অতীত যুগের আলো-বাতাসহীন পায়রা-খোপ; একতলার ঘরগুলিতে রান্না ছাড়া আর কিছু করা চলে না, ভয়ানক স্যাঁৎসেঁতে ও অন্ধকার; দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি একান্ত অল্প পরিসর, এমন অন্ধকার যে দিনের বেলায় সেখানে বাতি বা প্রদীপের আলোর বন্দোবস্ত করলেই ভাল হয়, কলকাতার দর্ম্মাহাটা বড়বাজার অঞ্চলের কয়েকটা মাড়োয়াড়ী বাড়ীতে এর জুড়ীদার মেলে; বাড়ীর সর্ব্বত্র ড্রেনের পচাগন্ধে পরিপূর্ণ (আমার বিশ্বাস, সেখানকার বায়ুকে বিশ্লেষণ করলে রসায়ন-শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় দুর্গন্ধী বাষ্প একত্র পাওয়া যাবে); প্রত্যেক নালা-নর্দ্দমায় পেটমোটা মরা-ইঁদুর। সমস্ত মিলেজুলে এই প্রাচীন যুগের বাড়ীগুলিকে একটি ভয়াবহ নরককুণ্ডের সমীপবর্ত্তী করে' আনবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা জুড়ে দিয়েছে।

রাত্রের অবশিষ্ট সময়টুকু সুনিদ্রার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে' বেলা আটটায় আমি ও শিবকুমার (আমার পাটনার বন্ধুটি) সেকেন্দ্রাবাদের দিকে একটা টাঙ্গায় চড়ে' রওনা হ'লাম। "টাঙ্গা" জিনিষটা এক্কার রাজ-সংস্করণ। যে সব স্থান দেখেছি তা'র ঐতিহাসিক বিবরণ বা বর্ণনা দেওয়া অনাবশ্যক মনে করি, কারণ ইতিপূর্ব্বে বহুভ্রমণকারী এবং ঐতিহাসিকে মিলে ঐ সব গুরু-গম্ভীর কাজ করেছেন; সুতরাং একজন কৌতূহলী বাঙালীর প্রথম-দৃষ্টিতে যে যে জায়গা যে রকম লেগেছিল তাই সংক্ষেপে বলে' যাবো।

সেকেন্দ্রাবাদ যাবার পথে মনে অনেক কথা উঠ্‌ছিল; মনে হ'ল আজ আমরা যে পথে টাঙ্গা হাঁকিয়ে চলেছি,—আকবর, জাহাঙ্গীরের স্বর্ণ-তাঞ্জামে একদিন সেই পথ শোভিত হয়েছে। আজ সেকেন্দ্রাবাদের যে মাটি আমরা পায়ের

গোবিন্দ জিউয়ের মন্দির (বর্ত্তমান অবস্থা)

দোলের ছুটি

শ্রীরামেন্দু দত্ত
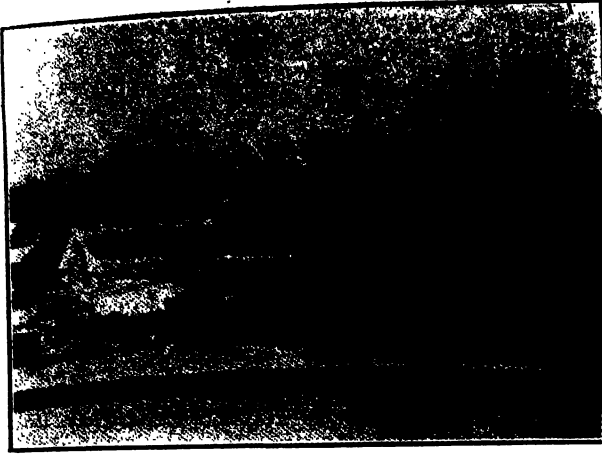
বৃন্দাবনের সাধারণ দৃশ্য (গোবিন্দ জিউয়ের মন্দিরের উপর হইতে) ; সম্মুখে 'শেঠেদের মন্দির'

তলায় মাড়াচ্ছি, কে জানে সে কত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিশ্ব-বিশ্রুত লোকের পদস্পর্শ পেয়েছে! এই নীল আকাশ কত প্রবল-পরাক্রান্ত বাদশা কত নুরজাহান-মমতাজের নীল নয়ন মুগ্ধ করেছে ; এই বাতাস কতবার তাঁদের অঙ্গ শীতল করেছে! সমস্ত পথ-প্রান্তরে, আকাশে-বাতাসে যেন একটা অশরীরী মহান্ রহস্যময় অতীতের উপলব্ধি ভেসে বেড়াচ্ছিল।

পূর্ব্বসংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম চিত্রটির নীচে যে পরিচয় দেওয়া আছে তা'তেই তা'র ইতিহাস পাওয়া যায়। সেকেন্দ্রাবাদের বিশাল নির্জ্জন প্রান্তরে আকবর শেষ জীবনে শান্তির সন্ধান করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বেই একটা সাদাসিদে রকম মর্ম্মর-খণ্ড তৈরী করিয়ে তিনি তাঁর কবরের ওপর সেইটে দিতে বলে' যান। এই সমদর্শী জনপ্রিয় সম্রাট সেকেন্দ্রাবাদের তিন দিকে মুসলমানী ঢঙের তিনটি "ফটক, খ্রীষ্টানী ঢঙের একটি নহবৎখানা, আর হিন্দুদের মন্দির চূড়ার অনুকরণে একটা চূড়া তৈরী করিয়ে গিয়েছিলেন। যে ফটকের ছবি দেওয়া হ'ল সেটি আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর তৈরী করিয়ে দেন, তাই তার নাম "জাহাঙ্গীর ফটক।" পাথরের মত কঠিন জিনিষের এমন বিরাট স্তূপ শিল্পির হাতে পড়ে' কি করে' যে সৌন্দর্য্যে আর মাধুর্য্যে সজীব হ'য়ে উঠ্‌তে পারে তা তখনই প্রথম দেখলাম। দেশালাই জ্বেলে এরই একটা মিনারের মধ্যে উঠে পড়া গেল। যখন চূড়ায় উঠ্‌তে আর একটা জানালা বাকী আছে তখনই কিন্তু নীচের দিকে চেয়ে চূড়ায় ওঠার আশা পরিত্যাগ করতে হ'ল। নির্জ্জনতা, অন্ধকার, আর অস্বাভাবিক উচ্চতা মিলে মনকে একটা অননুভূত-পূর্ব্ব ভয়ে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌ল। যা' হোক্ সেটা ঐ ধরণের প্রথম প্রচেষ্টা ব'লে ও রকম হ'য়েছিল, নইলে এরপর তাজমহলের উচ্চতর মিনার বা উচ্চতম কুতব-মিনারে ওঠার সময়ে-ওএকটু আটকায়নি।

ফটকের ঠিক সোজা ভিতরে লাল পাথরের তৈরী আকবরের সমাধি-মন্দির। এইটে দ্বিতীয় চিত্র। ময়ূর ময়ূরী, টিয়া, ঘুঘু, নাম-না-জানা অনেক রকমের পাখী, বিচিত্র ফুল, লতা পাতা, নির্ম্মল বাতাস, সমস্ত মিলে জায়গা-টিকে সৌন্দর্য্য-বিলাসী মোগল-সম্রাটের যোগ্য-সমাধি স্থান করে' রেখেছে। সেকেন্দ্রাবাদ থেকে ফিরে সেই দিন বিকেলে তাজমহলে যাবার আয়োজন চল্‌তে লাগলো।
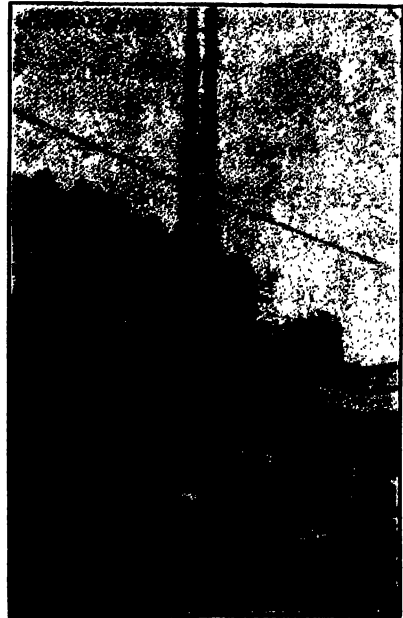
বৃন্দাবনে সোনার তালগাছ
(শেঠেদের মন্দির)

ছাত্রেরা ইতিমধ্যে সকাল বেলায় স্থানীয় বন্ধুদের সঙ্গে 'ইৎমৎ উদ্দৌলা' দেখে এসেছিল। শুনেছিলাম ভাস্কর্য্য ও কারু শিল্প হিসাবে ইৎমৎ উদ্দৌলা একটা দর্শনীয় বস্তু। অনেকে তাজমহলের চেয়েও এর শিল্পকার্য্যের সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করেন।

যখন তাজমহলে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা সমাগত। পথে আসতে আসতে চলন্ত এক্কা থেকে আগ্রা দুর্গের একটা Snapshot নিয়েছিলাম। দিনের পূর্ণ-আলোকে তাজের ছবি নিতে পারলাম না ব'লে একটা আক্ষেপ হ'লেও "তাজমহলের প্রধান প্রবেশ তোরণ" ও "সন্ধ্যার তাজ" এই ছবি দুটি আমার সে আক্ষেপ ভুলিয়ে দিয়েছে। এই ছবি দুটি পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধাংশের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে। তাজমহল দেখে একটা অপূর্ব্ব বিস্ময় ও সৌন্দর্য্য-স্নিগ্ধ ভাবে মন পরিপূর্ণ হ'য়েছিল সত্য, কিন্তু বাক্যের উচ্ছ্বাসে সে ভাবকে ভাষা দেবার চেষ্টা করে' তাকে খাটো করবো না। যুগে যুগে যে সৌন্দর্য্য-নিকেতন বিশ্বের বিস্ময় ও বন্দনা অর্জ্জন করে' এসেছে সে যে মনকে মুগ্ধ, নয়নকে তৃপ্ত করবে তা'তে আর আশ্চর্য্য কি? এই সব ভেবে আর সমাগত দর্শক বৃন্দের জাতি-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে' আমার যা মনে হ'ল তা' এই:—

> "মুক্ত হ'য়ে গেছে এর জাতির বন্ধন
> মুক্ত হ'য়ে গেছে এর কাল পরিমাণ
> এক সুরে, এক স্বর্গে চলিয়াছে এক প্রেম-গান!"

সেদিন পূর্ণিমার রাত্রি, কিন্তু চন্দ্রালোকে তাজমহল দর্শনের তৃষ্ণা যে কেমন করে' লাঞ্ছিত হ'য়েছিল তা পূর্ব্বেই বলেছি। যখন ফিরে এলাম তখন বেশী রাত হয় নি, কিন্তু শরীরের ওপর অত্যধিক নির্ম্মম হওয়ার ফলে ভোরের ট্রেণে বৃন্দাবন যাওয়া ঠিক ক'রেই তখুনি ঘুমিয়ে পড়া গেল। শরীরকে বিশ্রাম দেবার লোভ এড়াতে না পেরে ছাত্রেরা আগ্রাতেই রইল।

কুয়াসাচ্ছন্ন শীতের ভোরে মথুরা ষ্টেশনে পা দেওয়া মাত্রই, "···দক্ষিণে, বামে, পিছনে, সমুখে যত, লাগিল পাণ্ডা নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।" কিন্তু প্রশ্রয়ের

সাহাদের মন্দির (বৃন্দাবন)

ফলে নিগ্রহ যে কতদূর হ'তে পারে তা জেনে কড়া ভাবে দু একটা চোটপাট জবাব দিতেই ভগ্নোৎসাহ পাণ্ডারা বলাবলি করতে লাগলো, "আরে ঈ বাবুলোক তীর্থ্ করনে নাহি আরা; ছোড়্‌দে, ছোড়্‌দে—"। যা হোক্ বাকীটা পথ নিরাপদে অতিক্রম করে' বৃন্দাবনে পৌঁছলুম। সেখানে একটু আধটু খোঁজ করেই গোবিন্দ জীউয়ের মন্দির পাওয়া গেল। কাঠের হাত-বাক্স আর খাতা-পত্র নিয়ে যে কর্ম্মচারী বসে ছিলেন তাঁকে আমাদের সেই বিচিত্র উপায়ে অর্জ্জিত চলন্ত ট্রেণের প্রাগুক্ত বন্ধু শম্ভুনাথ রায়ের নাম বলাতেই তিনি ব্যস্ত সমস্ত ভাবে উঠে পড়লেন। লোকজন চাকর-বাকর হাঁকডাকের মধ্যে একটু পরেই সহাস্য মুখে "ছোট জামাই বাবু" নেমে এলেন। আমরা তাঁকে সমস্ত বৃন্দাবনটা ঘুরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করতে বল্‌লাম। একজন পুরাতন সর্দ্দার পাণ্ডার সঙ্গে তিনি কিছু পরেই আমাদের নিয়ে বেরুলেন। প্রথমে গোবিন্দ জীউয়ের পুরোনো মন্দিরের এবং মন্দিরের ওপর হ'তে সমস্ত বৃন্দাবনের একটা ফটো নেওয়া হ'ল; এই সংখ্যায় তা'র প্রতিলিপিও দেওয়া হয়েছে। পাঠক লক্ষ্য করবেন যে পূর্ব্বোক্ত ছবির মধ্যে দুধের কেঁড়ে সমেত একটি গোয়ালিনী ধরা পড়ে গেছেন; আমি কিন্তু শত চেষ্টা করে'ও তাঁর মধ্যে আমার মানসলোকের বৈষ্ণব-গোপীর কোন সন্ধানই পেলাম না। গোবিন্দজীউয়ের বিগ্রহটি ঐ পুরোনো মন্দির থেকে সরিয়ে এনে এখন একটা নূতন মন্দিরে স্থাপন করা হ'য়েছে। পুরোনো

মন্দিরটি প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্পের একটি অপূর্ব্ব নিদর্শন। শোনা যায় এটি আগে ছয় তলা ছিল। এখন মাত্র দুই-তল অবশিষ্ট আছে। ফটোতে মন্দিরটির বর্ত্তমান ধ্বংসাবস্থা দেখে পাঠক এর পূর্ব্বের বিশাল উচ্চতা সম্বন্ধে সহজেই ধারণা করতে পারবেন। পাণ্ডা বললে যে পূর্ব্বে এর চূড়াস্থিত আলোটি দিল্লী হ'তে একদিন ঔরঙ্গজীব দেখতে পেয়ে জিগ্যেস করেন 'ওটা কিসের আলো ?' যখন শুনলেন যে ওটা বৃন্দাবনের একটা হিন্দু মন্দিরের চূড়ার আলো, তখন সৈন্য সামন্ত পাঠিয়ে গোবিন্দ জিউয়ের মন্দিরের ওপর চূড়া সমেত চারতলা ভেঙে দিয়েছিলেন। পূজারীরা ভয়ে ভয়ে আগে হ'তেই বিগ্রহটিকে সরিয়ে রেখেছিলেন।

একটার পর একটা দর্শনীয় স্থান পার হ'য়ে যাচ্ছি আর পাণ্ডাটি সযত্নে এক এক করে' সেগুলোর পরিচয় জানিয়ে দিচ্ছে। এমনি করে' আমরা শেঠেদের মন্দিরে পৌছলাম। শেঠেদের মন্দির সাতটি দেউড়ি দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ সোনার তালগাছ এই মন্দির প্রতিষ্ঠাতাদের অপরূপ খেয়াল, দেবভক্তির পরিচয় প্রদানের অদ্ভুত ধারণা ও অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দান করছে। দেউড়িতে দেউড়িতে বন্দুকধারী প্রহরী। একটা সামান্য দেশলাই কাঠি পর্য্যন্ত নিয়ে ঢুকতে দিতে আপত্তি করে। দলের মধ্যে কেবল আমারই হাতে একটা ছোট ক্যামেরা ছিল। মনে হ'ল সেটা ভেতরে না নিয়ে যেতে পারলে ত এতদূর আসাই বৃথা। চোখে ত ক্ষণিকের জন্য দেখবো, আলোক-চিত্রে তা'কে যখন-তখন দেখবার অধিকার দান করবে, সুতরাং এ ক্ষেত্রে একটা পাপ করে ফেললাম। পাহারাদারকে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল :—এই যে কালো বাক্সের মত বস্তুটি এতে অতি পবিত্র হরিদ্বারের শালগ্রাম-শিলা বাস করছেন ; আর পরম ভক্ত আমি এক দণ্ড এটিকে কাছ ছাড়া করতে পারি না, এমন কি প্রভু নারায়ণকে প্রবেশে বাধা দিলে তা'কে যে মৃত্যুর পর কোটি-কল্প-লোক ধরে' নরকে বাস করতে হবে, চট করে' বিষ্ণুপুরাণের একটা শ্লোক আউড়ে তা'কে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ করে দেওয়া হ'ল। তখন মহাপুরুষের দয়া হ'ল এবং তিনি আমাদিগকে সেই শালগ্রাম শিলার বাক্স সমেত প্রবেশানুমতি দান করলেন। সোনার তালগাছ দেখলুম। কাঁঠালের আমসত্ত্বের মত, নাম ছাড়া আর অন্য কিছুতে আত্মত্ব নাই! একটা কাঠের স্তম্ভকে নীচে থেকে ওপর পর্য্যন্ত সোনার পাত দিয়ে মোড়া হয়েছে, ওপরটা একটুখানি তালপত্রের অনুকরণে বিস্তৃত। পাশে আর একটা এই রকম তালগাছ আরব্ধ হয়ে অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। সোনার তালগাছটার সোনার পাতের ওজনের পরিমাণ শুনলাম সাড়ে বারো মণ। বিশ টাকা ভরি হলে দাম কত হয় তাই ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে বাইরে চলে এলাম। দেব বিগ্রহ দেখার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। শেঠেদের ঐশ্বর্য্য তাদের প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে আড়ম্বর দিয়ে নিপুণ ভাবে আড়াল করে ফেলেছে।

তার পর আসা গেল 'বংশীবটে'। গেঞ্জীর নীচে ক্যামেরা লুকিয়ে নিয়ে পাণ্ডাদের সন্দিগ্ধ নয়ন অগ্রাহ্য ক'রে সটান ভিতরে ঢুকে পড়লাম। কারণ কৈফিয়ৎ দিয়ে আর বুদ্ধি খরচ করবার প্রবৃত্তি ছিল না। বংশীবট একটা ইঁটের প্রাচীরে ঘেরা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার জায়গা। একটা বটগাছ সেখানে ছিল বটে কিন্তু তার অঙ্গে দ্বাপর যুগের কোন চিহ্নই দেখলাম না। দিব্য নবীন বপু, নধর সবুজ কিশলয়ে মণ্ডিত হয়ে বনেদী ঘরের নধর নন্দদুলালটি! ভেবেছিলাম ব্যাসদেবের মত প্রবীণ, প্রাচীন জটাজূট ধারী অতিবৃদ্ধ ঋষিকল্প বটের সাক্ষাৎ পাবো। রসিক অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের মত হয়ত বা তার পদমূলে বসে অতীত যুগের পুণ্যবৃন্দাবনের কিছু কিছু লীলারহস্যের সন্ধান মিলবে। কিন্তু আশা যে মরীচিকা। দ্বাপরের বংশীবট কি করে আজও নবীন আছে জিজ্ঞাসা করায় শুনলাম, আদি বংশীবট ঐ খানেই ছিল। এটা তারই বর্ত্তমান বংশধর। দেখলাম বনেদী ঘরই বটে, এবং তরুণ নধর নন্দদুলালের কল্পনাও সত্য। তারপর ধীরে ধীরে গেঞ্জীর ভেতর থেকে সন্তর্পণে ক্যামেরাটি বের করলাম। তখনই বাধল গোল, চারিদিক হ'তে চারজন পাণ্ডা 'হাঁ—হাঁ' করে' ছুটে এল, কিছুতেই 'তস্বীর' তুলতে দেবেনা, কেননা ও ব্যাপারটা সবই বিলেতী ; আর পবিত্র স্থানের সঙ্গে ম্লেচ্ছত্বের এই সামান্য সংমিশ্রণও তা'দের কাছে অসহ্য। অনেক কাকুতি-মিনতি করার পর তা'রা কড়া ভাবে কড়ার করিয়ে নিলে, ছবি

তুলতে পারি বটে কিন্তু তুলে বিলেতে পাঠাতে পারবো না। বললাম, আরে রামঃ! আমরা কি আর্য্যসন্তান হিন্দু নই? এইটুকু ধর্ম্মজ্ঞান কি আমাদের নাই যে নিজেদের দেব-বিগ্রহের পবিত্র স্থানের ছবি তুলে সেই প্রতিকৃতি বিলেতে পাঠাতে যাবো! এতবড় নাস্তিক, অধার্ম্মিক কি কখনো হ'তে পারি? পরম গম্ভীরভাবে কথাগুলো বলে' তবে অনুমতি পাই! কিন্তু আলোক-চিত্র নেবার মত 'আলোক' কোথায়? ক্যামেরাটাকে একটা ইঁটের ওপর বসিয়ে time exposure দিতে হ'ল। যে পাণ্ডারা এতক্ষণ অত আপত্তি করছিল, তা'রা দেখ্‌লাম 'তস্‌বীর' ওঠাবার লোভে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে আমার বন্ধুদের পাশে ঠেলাঠেলি ক'রে দাঁড়িয়েছে।

বংশীবট থেকে বেরিয়ে যখন আমরা আবার বৃন্দাবনের বালুময় রাস্তা বেয়ে চলেছি, দেখ্‌লাম রং দেবার খুব ধুম লেগে গেছে। অতিকষ্টে আততায়ীদের হাত এড়িয়ে পথের একপাশ দিয়ে চলেছি এমন সময় অদূরে হাতে রংয়ের ঘড়া বা ভাঁড় (যা খুশী বলা যায়) নিয়ে একদল গোপী আস্‌ছেন দেখা গেল। বহুপূর্ব্বেই কল্পনা-রচিত শ্যামসুন্দরের লীলা-মধুর বৃন্দাবনের রঙিন স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল সুতরাং দীর্ঘশ্বাস চেপে নিয়ে যখন পাশ কাটিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় সেই গোপীবৃন্দ রঙের কেঁড়ে হস্তে আমাদের প্রতি ধাবমানা হ'লেন। শম্ভুনাথবাবু আমাকে ও শিবকুমারকে হাত ধরে' হিড়্ হিড়্ করে' টেনে সবেগে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন, অভিজ্ঞ পাণ্ডা মহারাজ ইতিপূর্ব্বে কখন যে অদৃশ্য হয়েছিলেন জানিনা, বাকী রইলেন 'বড় জামাইবাবু'!—তিনি শম্ভুনাথের ভায়রা-ভাই—চারচোখো (চশমা-পরা) লোক, চট্ করে' চোখে সব ব্যাপারটা ধরা পড়ে না। যখন আমরা একটা গলি পেরিয়ে অন্য রাস্তায় পড়ে' দম নিচ্ছি, তিনি তখন এসে পৌঁছলেন। গেঞ্জি ছেঁড়া, রঙে স্নান হয়ে গেছে, আর একটু ভাল করে' লক্ষ্য করে' দেখ্‌লাম যে তাঁর হাতের ও পিঠের কোথাও কোথাও 'কালশিরে' পড়ে গেছে এবং হোলীর রঙের সঙ্গে স্থানে স্থানে গায়ের রক্ত-ও মিশেছে! যখন বিস্ময় অতিরিক্ত হয়ে উঠেছে, তখন পাণ্ডা আর এক পথ থেকে ছুটে এসে বললে "আরে, আরে, জামাইবাবুকো হোরী দে দিয়া!"

হোরীর সঙ্গে এই অঙ্গ-নির্য্যাতনের কি সম্বন্ধ আছে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে যে এখানকার গোপীদের মধ্যে একটা প্রথা আছে, দোলের ৮।১০ দিন আগে হ'তে তা'রা খুব ঘি-দুধ খেয়ে বল করে' নেয়, তারপর হোলীর দিনে এক হাতে ছড়ি আর হাতে রংএর ভাঁড় নিয়ে রং দিতে বেরোয়। নিয়ম হচ্ছে কোন পুরুষকে পেলে সবাই মিলে তাকে ঘিরে যুগপৎ রংএ ভাসিয়ে দেয় ও ছড়ি-পেটা করে। তখন মনে পড়লো, হাঁ, তাদের সকলেরই হাতে ছড়ি ছিল বটে।

আমরা বৃন্দাবনের 'প্রেম মহাবিদ্যালয়' 'সাহাদের মন্দির', 'মদন গোপালের মন্দির,' 'কালীয়া-দহ দীঘি' এবং দ্রষ্টব্য আরও বহু স্থানে গিয়েছিলাম কিন্তু পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় সে সম্বন্ধে কেবল উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হ'লাম। সাহাদের মর্ম্মর মন্দিরের একটি ছবি দেওয়া হ'ল।

আগ্রায় ফিরে সেখানকার দুর্গ দেখ্‌তে গেছি আবার সেই "বড়লাটের" হাঙ্গাম। বেছে বেছে ঠিক সেই দিনই তিনিও আগ্রা দুর্গ দেখ্‌ছেন। গোরা সৈন্য, কড়া পাহারা, প্রবেশ নিষেধ। আমরাও নিরুপায়—আগ্রার জন্য নির্দ্দিষ্ট তিন দিন সময় শেষ হয়ে গেল, সেই দিনই দুপুরের গাড়ীতে দিল্লী চল্‌লাম। রাত আটটায় ট্রেণ যমুনার সেতুর মধ্যে প্রবেশ করল। রেল লাইনের দু'ধারে বহুমাইল জুড়ে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোক-মালা, সমস্ত আকাশ বাতাস মহা-নগরীর মহা-কোলাহলে পরিপূর্ণ। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাটি আপনা হতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল:—

> "অতুল বিরাট বিপুল দিল্লী
> শত-সম্রাট-প্রেয়সী অয়ি!
> গজ-মোতী গুঁড়া তব পথ-ধুলা
> মোহিনি, রূপসি, মহিমাময়ি!"

সত্যই অতুল, বিরাট, বিপুল! এখানে আগে থেকে কোন ব্যবস্থা করা ছিল না। কলকাতায় বাস করেছি, তা'র কল-কোলাহল, তা'র জনবহুলতা কোনদিন এরকম ভাবে অনুভব করি নাই। ক্ষণিকের জন্য এই নগরীর প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে তা'র বিশালতার মধ্যে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌লাম; কিন্তু সে ক্ষণিকেরই জন্য। মস্ত ষ্টেশন, অফুরন্ত আলো, অগুন্তি লোক—যেন হাওড়া ষ্টেশনেই ফিরে এসেছি।

শ্রীরামেন্দু দত্ত
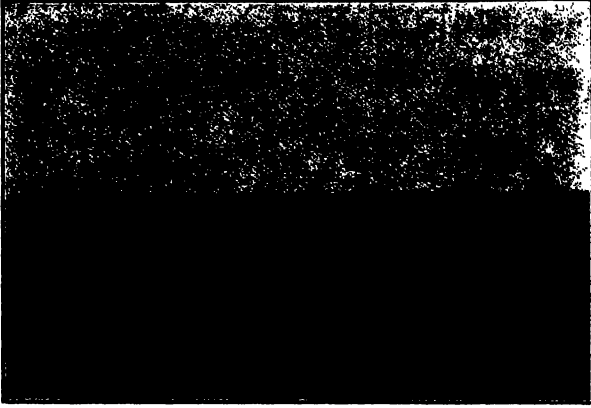
কুতব মিনারের শীর্ষ হইতে দৃশ্যমান কুতব-পল্লী

ষ্টেশনের কাছেই "পাঞ্জাব হোটেলে" দৈনিক দু'টাকা ভাড়ায় দোতলায় একটা বেশ বড়-গোছের গোছানো ঘর পাওয়া গেল। খাওয়ার বন্দোবস্ত আলাদা,— সঙ্গে সমস্ত আয়োজনই ছিল, সুতরাং স্বকীয়।

পরদিন সকাল ও দুপুর বেলাটা পুরাতন দিল্লী, টিমারপুর ও চাঁদনী চকে ঘুরেই কেটে গেল। বেলা দু'টো থেকে ছ'টা পর্য্যন্ত এই চার ঘণ্টার জন্যে একটা টাঙ্গা ভাড়া করলাম। সফ্‌দরের জঙ্গ, হুমায়ুনের্‌ সমাধি, ইন্দ্রপ্রস্থ, নূতন দিল্লী (রায়সিনা), যন্তর মন্তর্‌, দেখে কুতব-রোড ধরে' কুতব মিনারে পৌছলাম। দূর থেকে উচ্চশির সেই কীর্ত্তিস্তম্ভ চোখে পড়তেই আমার মাথা যেন সম্ভ্রমে বিস্ময়ে আপনা-আপনি নত হয়ে গেল। সত্যি কথা বল্‌তে কি, বারো দিন ধ'রে এই হাজার হাজার মাইল ঘুরে যা-কিছু দেখ্‌লাম, তা'র মধ্যে এই কুতব মিনারই আমার মনে সব চেয়ে গভীর ছাপ রেখে গেছে। ভাবতে দুঃখও হয় এই 'যা-কিছু'র মধ্যে তাজমহল ও অন্তর্গত; কিন্তু যা' সত্যি তা' বল্‌তেই হ'বে। কুতব মিনারের পদমূলে দাঁড়িয়ে আমার মন নানা ভাবে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। মনে হয়েছিল:—

"......অতীতের কীর্ত্তিলীলা জয়-গীতি বাহি'
তুমি এলে কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে,
উন্নত-উষ্ণীষ শিরে, হাসিতে হাসিতে।

*　　　*　　　*

আজি আমি আসিয়াছি বহু-আশা করে'
সোপানের বাহু মেলি' লহ তুলি' মোরে।
দৈত্যবীর! আসিয়াছি বিস্ময়-নির্ব্বাক—
ইতিকথা যা'ক্‌ আজি স্তব্ধ হ'য়ে যা'ক।
চাহিনা মানিতে আমি, নরহস্ত দিয়া
মূর্ত্তি তব সৃষ্ট হ'ল প্রস্তর গাঁথিয়া।

*　　　*　　　*

স্মিত-হাস্যে চেয়েছিলে কখন কে জানে,
নৃত্যোচ্ছল, নিত্যোজ্জ্বল দিল্লীপুরী পানে?
তা'র পর ম্লান-মুখে ব্যথিত অন্তরে
দৃষ্টি তব বদ্ধ হ'ল পাণিপথ পরে।
বৃদ্ধবীর, অশ্রু তব করিয়া সংযত
ধ্বংসলীলা নেহারিলে পাষাণের মত।

*　　　*　　　*

ম্লান সন্ধ্যা কভু যবে ঢাকে বসুধায়,
ঝিল্লী-রুত অন্ধকারে দিল্লী কাঁদে, হায়!
ভাসি' উঠে অতীতের স্বপ্ন থরে থরে—
বিপুল ব্যথায় তব হৃদয় ডুকরে!

*　　　*　　　*

যত ব্যথা বক্ষে চাপি' আছ হে সংযমী
সংসারের রণগুরো! নমি তোমা নমি।
তব মাঝে বাজে সুর মঞ্জুল বীণার—
ক্রন্দনো শুনেছি তব কুতব-মিনার!"

পরদিন আমরা দিল্লী-দুর্গ দেখ্‌তে গেলাম। সেখানকার দেওয়ানী-খাস, দেওয়ানী-আমের ছবি এর আগের সংখ্যায় বেরিয়েছে। মখ্‌মলের গাল্‌চে পাতা, তাকিয়া, আলবোলা, আতরদান, চামর দিয়ে সাজানো একটা সুন্দর কক্ষ; 'গাইড' বল্‌লে এইটি মোগল বাদশাহদের বিশ্রাম-কক্ষ; একবার কল্পনায় সেই গালিচায় শরীর ঢেলে দিয়ে, তাকিয়াটা টেনে নিয়ে বাদ্‌শাহ হওয়া গেল। দেওয়ানী আমের মধ্যে একটা সুন্দর কারু-কার্য্যশোভিত পাথরের সিংহাসন আছে; সেইখানে বসে' ময়ূর-সিংহাসনে বাদশাহেরা বিচার করতেন—আমরাও পালা করে' একবার সেই পাথরের বেদীর ওপর বসে' নিলাম; বাদশাহ হ'তে কা'র না ইচ্ছা করে?

দিল্লী-দুর্গের ফটকের ওপর দু'টি মস্ত হলে গ্রেট্‌ ইউরোপিয়ান্‌ ওয়ার্‌ মিউজিয়াম (Great European War Museum)। বড়, ছোট, বিবিধ কামান; গোলা, গুলি; বর্ম্ম, বিষাক্ত গ্যাসের পেটিকা; বন্দুক, তলোয়ারে পরিপূর্ণ। মানবের নৃশংসতা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে' বিভীষিকা সৃজন করছে!

এই প্রবন্ধের সমস্ত চিত্রগুলি লেখককর্ত্তৃক গৃহীত আলোক-চিত্র হইতে প্রস্তুত। বিঃ স

বঙ্গীয় ভৌমিকগণের স্বাধীনতা-সমর

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

৩

বঙ্গীয় ভূঞাগণের রাজ্য পরিচয়

'বার' সংখ্যাটির এই সম্পর্কে যে বিশেষ কিছু মূল্য নাই, পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রবন্ধে বোধ হয় তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। ভাগবত বলিয়াছেন—অবতারাহ্যসংখ্যেয়াঃ—অবতার অসংখ্য। কিন্তু ইহা বলিয়াও আবার প্রধান অবতারগণের নাম দিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশেও ঠিক অসংখ্য না হইলেও ভূঞা যে বহু সংখ্যক ছিলেন, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বাধীন ভূপতি পদবাচ্য হইয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সম্রাট আকবরের সহিত লড়িয়াছিলেন মাত্র কয়েকজন। এই হিসাবে ওসমান, মস্থম কাবুলী, ঈশা খাঁ এবং কেদার রায় ভিন্ন ভূঞা বলিয়া অন্য কাহারও নাম করা যাইতে পারে না। প্রতাপাদিত্যের নাম করিলাম না বলিয়া অনেকেই বিস্মিত হইবেন। আমার জ্ঞান-বুদ্ধি মত ঐতিহাসিক প্রমাণ যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে করি তাহাতে প্রতাপাদিত্য আকবরের সহিত কোন দিন লড়িয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। স্বাধীনতা, দেশ উদ্ধার ইত্যাদি যত বড় বড় আদর্শ ও চেষ্টা প্রতাপাদিত্যের প্রতি. আরোপ করা হইয়াছে তাহা আমার মতে বিলকুল কবিকল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। জাহাঙ্গীরের সময়ে বঙ্গের সুবাদার ইসলাম খাঁর সেনাপতিগণের সহিত প্রতাপ লড়িয়াছিলেন বটে এবং লড়িয়া বন্দীও হইয়াছিলেন, কিন্তু সে নেহাৎই আত্মরক্ষার্থে; এবং সেই তাঁহার প্রথম ও সেই তাঁহার শেষ প্রয়াস বলিয়া আমি বুঝিয়াছি। শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু এবং বঙ্গের অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ আমি ভুল বুঝিয়াছি বলিয়া আমায় ভুল বুঝাইয়া দিলে আমি বাস্তবিকই অত্যন্ত আনন্দিত হইব।

ক্ষুদ্রতর ভূঞাগণের মধ্যে আকবরের সহিত যাঁহারা যাঁহারা লড়িতে সাহস করিয়াছিল স্বাধীনতা-সমর বর্ণনা কালে যথা স্থানে তাহাদের নাম উল্লেখ করা যাইবে।

যশোহরের প্রতাপাদিত্য ছাড়া, বাঙ্গলার কন্দর্প রায়, ভুলুয়ার লক্ষণ মাণিক্য, ভূষণার মুকুন্দ রাম, ভাওয়ালের ফজল গাজি, চাঁদ প্রতাপের চাঁদ গাজি, হিজলির মনসদালি, বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বিরও ভূঞা বলিয়া কথিত হন। কিন্তু আকবরের সহিত তাঁহাদের স্বাধীনতা রক্ষার্থে যুদ্ধের কোন পরিচয় পাই না।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার বাহার-ই-স্তান অবলম্বনে প্রবাসীতে যে কয়টি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন * তাহা হইতে দেখা যায় যে নিম্ন লিখিত জমীদারগণ জাহাঙ্গীরের রাজত্বে বাঙ্গালার সুবাদার ইসলাম খাঁর সহিত লড়িয়াছিলেন।

১। ওসমান ও তাহার ভ্রাতৃগণ

২। ঈশা খাঁর পুত্র মুশা, দায়ুদ আবদুল্লা ও মহমুদ এবং ঈশা খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলাওল খাঁ।

৩। মাসুম খাঁর পুত্র মির্জ্জা মুমিন খাঁ। পাবনা জেলার চাট-মোহরে মাসুম খাঁর রাজধানী ছিল। চাটমোহরের মসজিদ লিপিতে মাসুম খাঁকে স্বাধীন সুলতান রূপে পরিচিত করান হইয়াছে। (Pabna Gazetteer, by L. S. S. O' Malley. Ed. 1923, Pp, 116-117)

৪। আলম খাঁর পুত্র দরিয়া খাঁ। পরিচয় পাইলাম না।

৫। খলশার জমীদার মধু রায়। রেনেলের ১৬নং ম্যাপে খলশীর অবস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। পদ্মা হইতে যেখানে ধলেশ্বরী নদী উত্থিত হইয়াছে তাহার অল্প দূরেই জাফরগঞ্জ। জাফরগঞ্জের মাইল পাঁচেক পূর্ব্বে খলশী। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের রেভেনিউ সার্ভে ম্যাপে দেখা যায় যে এই স্থান চাঁদ প্রতাপ পরগণার একেবারে পশ্চিমাংশে অবস্থিত। এই স্থানের

---

* ১। প্রতাপাদিত্যের পতন, প্রবাসী, কার্ত্তিক ১০২৭। ২ বঙ্গের শেষ পাঠান বীর, প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১০২৮। ৩। বাঙ্গালা স্বাধীন জমীদারদের পতন, প্রবাসী, ভাদ্র, ১০২৯। ৪। বঙ্গে মগ ফিরিঙ্গী, প্রবাসী, ফাল্গুন, ১০২৯।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

উত্তর-পশ্চিম দিকে সিন্দুরী পরগণা। খলশীতে জমীদার-বংশ আছে কিনা, থাকিলে উহা মধু রায়ের বংশ কিনা, পরিবারে মধু রায়ের স্মৃতি এখনও জাগরূক আছে কিনা জানিতে পারি নাই। অনুসন্ধান নিতেছি।

৬। শাহজাদপুরের জমীদার রাজা রায়। শাহজাদপুর পাবনা জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত স্থান। রাজা রায় কোন বংশীয় জানা যাইতেছে না।

৭। চাঁদ প্রতাপের জমীদার নবুদ (বিনোদ ?) রায়। চাঁদ প্রতাপ ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার উত্তরার্দ্ধ জুড়িয়া বৃহৎ পরগণা; ধলেশ্বরী নদীর উত্তর ও দক্ষিণ, দুই ধারেই এই পরগণার বিস্তৃতি। চাঁদপ্রতাপের হিন্দু জমীদার বলিতে সাধারণতঃ রোয়াইলের রায় বংশ বুঝায়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সঞ্জয় হাজরা নামক ব্যক্তি। রায় বংশের বংশাবলিতে সঞ্জয়ের দুই পুত্রের নাম পাওয়া যায়, গন্ধর্ব্ব রায় ও শ্রীচন্দ্র। শ্রীচন্দ্রের দুই পুত্র মদন রায় ও কমল রায়। মদন রায় হইতে বর্ত্তমানে ১০।১১ পুরুষ হইয়াছে। বিনোদ রায় বলিয়া কাহারও নাম পাওয়া যাইতেছে না। সম্ভবতঃ মদন রায়ই পারস্য লিপিকারের প্রসাদে নবুদ বা বিনোদ রূপ ধারণ করিয়াছে।

৮। বাহাদুর গাজী। শোনা গাজী। আন্‌ওয়ার গাজী। এই গাজীগণ যে ভাওয়ালের বিখ্যাত গাজী বংশীয় সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ওয়াইজ সাহেব বাহাদুর গাজীর নাম করিয়াছেন এবং লক্ষ্যা তীরে কালীগঞ্জের নিকট বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত মসজিদের উল্লেখ করিয়াছেন। ওয়াইজ বলেন, আকবরের বঙ্গ আক্রমণ কালে বাহাদুরই গাজী বংশীয় ভূঞা ছিলেন। তাঁহার পুত্র ফজল গাজী, রাউজের মতে ইহার নাম জোনা গাজী। ফজল গাজী যে সের শাহের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে।* গাজী বংশে সম্ভবতঃ ফজল্ গাজীই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ভূঞা ছিলেন; কারণ ভাওয়ালের ভূঞা বলিতে সকলেই ফজল্ গাজীকেই এখনও মনে রাখিয়াছে। বাহাদুর গাজী জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনিই প্রথম ৪৮৩৭৯ টাকা বাৎসরিক ব্যয়ে সম্রাটের জন্য ৩৫ খানা সুন্দর ও কোষা জাতীয় জলযুদ্ধের নৌকা তৈয়ার রাখিবার সর্ত্তে আকবরের নিকট হইতে ভাওয়াল পরগণায় বন্দোবস্ত পা'ন (Dacca Review 1911, P. 221)। কাজেই ফজল্ গাজীরই পুত্র বা উত্তরাধিকারী বাহাদুর গাজী। সোণা গাজী সম্ভবতঃ বাহাদুরের পুত্র, রাউজ সোণা গাজীকে বাহাদুরের পুত্রই বলিয়াছেন। জাহাঙ্গীরের আমলে মুশা খাঁর পক্ষে যুদ্ধ করিয়া সম্ভবতঃ পিতা পুত্র উভয়েই নিহত হন এবং বাহাদুরের ভ্রাতা * মহ্‌তাব ভ্রাতার উত্তরাধিকার সূত্রে ভাওয়াল পরগণা লাভ করেন।

গাজীগণের অধিকারে চাঁদ প্রতাপ, সুলতান প্রতাপ, সেলিম প্রতাপ, কাশিমপুর, তালিপাবাদ এবং ভাওয়াল পরগণা ছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের আরম্ভেই দেখা যায় চাঁদ প্রতাপ বিনোদ বা মদন রায়ের হস্তগত। পূর্ব্বে তুরাগ নদী এবং পশ্চিমে বংশী ও ধলেশ্বরী মোটামুটি এই সীমার অভ্যন্তরে দক্ষিণাংশে ধলেশ্বরী বংশীর পারে সুলতান প্রতাপ এবং তুরাগের পারে কাশিমপুর এবং উত্তরাংশে তালিপাবাদ পরগণা। সেলিম প্রতাপের অবস্থান ঠিক করিতে পারিলাম না, কাছেই কোথাও হইবে। আনওয়ার গাজীর জমীদারী এই তিন পরগণায় কোনো স্থানে ছিল বলিয়া ধরিতে হইবে।

চাঁদ প্রতাপে সঞ্জয় হাজরার বংশের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে চাঁদ গাজী নামে এক ভূঞা ছিলেন বলিয়া কথিত হয়। তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

* The Seven sixteenth Century Cannon discovered in the Dacca District in 1909, By K. B. S. Anlad Hason. Dacca Review, 1911, P. 219. এই বিষয় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ৩৮৭ পৃঃ W. H, E. Stapleton সাহেবেরও একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। একটি কামানে শের শাহের ৯৪৯ হিজরীর লিপি (1542 A. D.) আছে এবং উহাতেই লেখা আছে যে কামানটি ফজল গাজীর নিকট হইতে উপহার প্রাপ্ত। ষ্টেপলটন সাহেব ফজল গাজীর নাম ভুলে রিফাত গাজী পড়িয়াছিলেন, আওলাদ হাসান সাহেব তাহার সংশোধন করেন।

* ওয়াইজ একস্থানে ভ্রম ক্রমে মহতাবকে বাহাদুরের পুত্র বলিয়াছেন—J. A. S. B. 1874, P. 202, top line.

চাঁদ প্রতাপ পরগণার পূর্ব্বে যেমন সুলতান প্রতাপ পরগণা দেখা যায়, চাঁদপ্রতাপের পশ্চিমেও তেমনি সুরতান প্রতাপ নামক এক পরগণা দেখা যায়, উহা বর্ত্তমানে পাবনা জেলার অন্তর্গত। (Pabna Gazetteer 1923, P. 90) অনেক সময় পরগণা গুলি ছিটা পরগণা হয়, অর্থাৎ উহার জমী একলপ্তে না থাকিয়া নানাস্থানে ছড়াইয়া থাকে। সুলতান প্রতাপ এরূপ একটি ছিটা পরগণা ছিল, দেখা যাইতেছে।

পাবনা জেলার সুরতান বা সুলতান প্রতাপ পরগণার লাগ পশ্চিমেই প্রতাপবাজু নামে একটি পরগণা দেখিতে পাওয়া যায়।

৯। পালোয়ান। ইহাকে মটংএর জমীদার বলা হইয়াছে। কোথায়, বুঝিলাম না।

১০। হাজি শামসুদ্দিন বোগদাদী। কোন পরিচয় দেওয়া হয় নাই।

১১। মজলিস কুতব। ফতেহাবাদ, বর্ত্তমান ফরিদপুরের জমীদার। পূর্ব্বে এই ফতেহাবাদের মালিক ছিলেন মুরাদ খাঁ। তিনি ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছে কোন সময়ে মারা যান এবং তাঁহার পুত্রগণ ভূষণার জমীদার মুকুন্দরাম কর্ত্তৃক নিমন্ত্রণছলে নিহত হয়। এইরূপে ফতেহাবাদ কিছু দিন মুকুন্দরামের হস্তগত ছিল ; পরে উহা কিরূপে মজলিস্ কুতবের হস্তগত হইল সেই ইতিহাস অজ্ঞাত। আকবরনামাতে ভূষণা বারবার শত্রুহস্তগত হইবার প্রসঙ্গ আছে। ফতেহাবাদও তেমনি বিদ্রোহী ভৌমিকগণের করতলগত হইলে মজলিস্ কুতব তাহা অধিকার করিয়া থাকিবেন। ইসলাম খাঁ তাঁহাকে আক্রমণ করিলে ঈশা খাঁর পুত্র মুশা খাঁ সৈন্য ও নৌকা পাঠাইয়া মজলিস্ কুতবকে সাহায্য করিয়াছিলেন, এই তথ্য বাহার-ই-স্তানেই আছে।

১২। বাকলার জমীদার রামচন্দ্র। কন্দর্পের পুত্র, প্রতাপাদিত্যের জামাতা, ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্যের নিধনকারী।

১৩। চিনা-জোয়ারের জমীদার পীতাম্বর ও অনন্ত। পীতাম্বর পুর্ণিয়া রাজবংশের আদি পুরুষ। নাটোর হইতে বর্ত্তমান রাজসাহী সহর পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত রাস্তা গিয়াছে তাহার প্রায় মাঝামাঝি স্থান হইতে দক্ষিণে গঙ্গাতীরে সমুদ্রা পর্য্যন্ত রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তায় এক মাইল চলিয়াই পুটিয়া। পুটিয়া লস্করপুর পরগণার অন্তর্গত। ভাতুড়িয়া পরগণার অন্তর্গত চিনা জোয়ার গঙ্গার পারে বর্ত্তমানে সারাঘাট নামে পরিচিত স্থানকে ঘিরিয়া বর্ত্তমান ছিল বলিয়া বুঝিতেছি। এই চিনা জোয়ার পীতাম্বরের অধীনে ছিল।

পুটিয়ার জমীদারী সম্বন্ধে পরিবারগত প্রবাদ এই যে পীতাম্বরকে আকবর বাদশাহকর্ত্তৃক লস্করপুর পরগণার জমীদারী প্রদত্ত হয়। বাহার-ই-স্তানের লেখা হইতে বুঝা যায় যে পীতাম্বর আগে বাদশাহের বশই ছিলেন এবং খাজনা দিতেন। প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি আবার খাজনা বন্ধ করেন। তাই প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যখন অভিযান প্রেরিত হয় তখন পথে তাঁহাকেও দমন করা হইয়াছিল। পীতাম্বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলাম্বরের পুত্রের নাম অনন্ত,—বাহার-ই-স্তান বোধহয় এই অনন্তেরই উল্লেখ করিয়াছে।

১৪। আগাইপুরের আলা বক্স। আগাইপুর পুটিয়ার বার মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে গঙ্গাতীরে। যাহার নাম হইতে লস্করপুর পরগণার নামকরণ হয় সেই লস্কর খাঁর বাস নাকি এই আগাইপুরে ছিল। লস্কর খাঁ বিদ্রোহী হইলে তাহার জমীদারী পীতাম্বরকে দেওয়া হয়। পুটিয়ার রাজধানীতে আজিও নাকি পুণ্যাহের সময় আগাইপুরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ আগাইপুরের প্রজাগণের খাজনা সকলের আগে লওয়া হয়।

আলা বক্স সম্ভবতঃ লস্কর খাঁরই উত্তরাধিকারী। মোগল বাহিনী অগ্রসর হইলে পীতাম্বর যাইয়া আলা বক্সের আশ্রয় লইয়াছিলেন,—বোধহয় এই ভরসায় যে আলা বক্স মধ্যে পড়িয়া একটা মিটমাট করিয়া দিতে পারিবেন। পীতাম্বরকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে কিন্তু আলা বক্সের পর্য্যন্ত শাস্তি হইয়াছিল। তাঁহার দুর্গগুলি মোগলসেনাপতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, পুটিয়ার জমীদারীর অস্তিত্ব দেখিয়াই বুঝা যায় যে পীতাম্বর শেষ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। আলা বক্সের কি পরিণাম হইল জানা যায় না।

১৫। ভুলুয়ার অনন্ত মাণিক্য। ভুলুয়ার রাজাগণের ইতিহাস নিতান্তই কুহেলিকাচ্ছন্ন। ওয়াইজ, আনন্দনাথ রায়, রাজ

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

মালা প্রণেতা কৈলাসচন্দ্র সিংহ ভুলুয়ার যে ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে ঐতিহাসিকত্ব সামান্যই আছে। ত্রিপুরা রাজগণের সহিত ভুলুয়ার ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, কিন্তু কৈলাস বাবুর রাজমালা প্রদত্ত ত্রিপুরা রাজগণের তারিখ অনেকস্থানে একেবারে ভুল। বিজয় মাণিক্য, অমর মাণিক্য, রাজধর মাণিক্য এবং যশোধর মাণিক্য এই জন নৃপতির রাজমালার প্রদত্ত তারিখ মোটেই গ্রাহ্য চারি নহে।

কৈলাস বাবু বলেন, ভুলুয়া রাজগণ ত্রিপুরার সর্ব্বপ্রধান সামন্ত বলিয়া গণ্য ছিলেন এবং ত্রিপুরা রাজের অভিষেক কালে ভুলুয়া রাজই ত্রিপুরারাজের ললাটে সর্ব্বপ্রথম রাজটীকা পরাইবার অধিকারী ছিলেন। অমর মাণিক্য সুজন্মা নহেন বলিয়া ভুলুয়ারাজ বলরাম শূর তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বা তাঁহাকে টীকা পরাইতে অস্বীকার করেন। অমর মাণিক্য তাই ভুলুয়া আক্রমণ করিয়া বলরামকে বশীভূত করেন। (রাজমালা ৩৯৯ পৃঃ)

চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত রাজমালা খুলিয়া দেখিলাম, অমর মাণিক্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ভুলুয়া রাজের নাম তাহাতে দেওয়া আছে গন্ধর্ব্বনারায়ণ! এই অবস্থায় কৈলাস বাবু "বলরাম" নামটি কোথায় পাইলেন খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলাম, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় ৫৩৩ পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া লঙ্‌ সাহেব রাজমালার যে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি ছাপিয়া গিয়াছেন তাহাতে নিম্নোদ্ধৃতরূপ লিখিত আছে :—

Amarmanik worsted the throne ; he was the brother of Bijayamanik ; his mother was a private individual, whom his father fell in love with....... The Raja next defeated the Zamindars of Balaram, who refused to submit, on the ground that Amar-manik was not of royal line, but he was also defeated....... After this he sacked the fine city of Bakla and sold the men as slaves.

J. A. S. B. 1850. P. 548.

ভুলুয়া শব্দটি অনেক সময় ইংরাজীতে ভালুয়া বা বালুয়া রূপ ধারণ করিত, লঙ্‌ সাহেবের অসতর্কতায় বা ছাপাখানার ভূতের দৌরাত্ম্যে তাহাই 'বালারাম' রূপ ধারণ করিয়াছিল এবং অনুমাণ হইতেছে, তাহাই কৈলাসবাবু "বলরাম" রূপে সংশোধিত করিয়া তাহাকে ভুলুয়ার জমীদাররূপে খাড়া করিয়াছেন! কৈলাসবাবুর 'বলরাম' পরিত্যাগ করিয়া অমরমাণিক্যের প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম রাজমালা অনুসারে 'গন্ধর্ব্বনারায়ণ' বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত।

কৈলাস বাবু অমরমাণিক্যকে জাহাঙ্গীরের সুবাদার ইসলাম খাঁর সমকালীন বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। (রাজমালা, ৭১ পৃঃ)। ইহা স্পষ্টই অসম্ভব। ইসলাম খাঁ ১৬০৮ খ্রীঃ হইতে ১৬১৩ খ্রীঃ পর্য্যন্ত বঙ্গের সুবাদার ছিলেন। এদিকে অমর মাণিক্যের পুত্র রাজধর এবং তাহার পুত্র যশোধরের তারিখ তাঁহাদের মুদ্রা হইতে নির্ভুলরূপে অবধারিত হইয়াছে। (N. K. Bhattasali, M, A., On the Coinage of Tippera. J. A. S. B. 1923. Numismatic Supplement XXXVI. P. 51—52.)

রাজধর ১৫০৮ শকাব্দে এবং যশোধর ১৫২২ শকাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কাজেই অমরমাণিক্যের রাজত্ব যদি শক ১৫০৮=১৫৮৬ খ্রীঃ শেষ হইয়া থাকে তবে তিনি কিছুতেই ১৬০৮ খ্রীঃতে যে ইসলাম খাঁর সুবাদারীর আরম্ভ তাঁহার সমকালীন হইতে পারেন না।

মুদ্রার প্রমাণে দেখা যায় রাজধরপুত্র যশোধর ১৫২২ শকাব্দে=১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজমালা মতে তাঁহার রাজ্যকাল ২১ বৎসর এবং তিনি মোগল সুবাদার নবাব ফতেজঙ্গ কর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দীকৃত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন। ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গই রাজমালার নবাব ফতেজঙ্গ সেই বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। ইব্রাহিম খাঁ ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখে বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত হন (তুজক্, রজার্স্ কৃত অনুবাদ, ১ম খণ্ড ৩৭৩ পৃষ্ঠা)। কাজেই ইব্রাহিম খাঁ কর্ত্তৃক যশোধরের পরাজয়ের তারিখ ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায়। ইসলাম খাঁর সুবাদারী (১৬০৮—১৬১৩ খ্রীঃ)

যশোধরের রাজত্বের মধ্যভাগে পড়ে। ইসলাম খাঁ ত্রিপুরা জয় করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু তিনি ভুলুয়া-রাজ অনন্তমাণিক্য এবং বাকলা রাজ রামচন্দ্রকে জয় করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্র প্রচলিত প্রবাদমতে ভুলুয়ার বিখ্যাত রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য বাকলারাজ রামচন্দ্র কর্ত্তৃক কৌশলে ধৃত ও নিহত হন। অনন্তমাণিক্যকে লক্ষ্মণমাণিক্যের পুত্র বা বংশধর এবং পরবর্ত্তী রাজা বলিয়া বোধ হয়। নিম্ন সমীকরণ দৃষ্টে এখন এই যুগের ত্রিপুরা, ভুলুয়া, বাকলার নৃপতিগণের ও বাঙ্গালার সুবাদারগণের আপেক্ষিক কাল বুঝা যাইবে।

লক্ষ্মণ মাণিক্য প্রণীত আরও নাটকের পুথি পাওয়া যায়। বিখ্যাত বিজয়ের পুথি বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটিতে আছে। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃত Report for the search of Sanskrit manuscripts. 1895—1900 নামক পুস্তিকায় লক্ষ্মণমাণিক্য প্রণীত কুবলয়াশ্ব চরিত নামক আর একখানা নাটকের উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য এই সমস্ত নাটকই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কথিত আছে যে বাকলা রাজা রামচন্দ্রের সহিত লক্ষ্মণমাণিক্যের সদ্ভাব ছিল না। একদা রামচন্দ্র লক্ষ্মণ-

ত্রিপুরারাজগণ	সুবাদারগণ	ভুলুয়ারাজগণ	বাকলারাজগণ
অমর ১৫৭৮ খ্রীঃ মৃত		গন্ধর্ব্বনারায়ণ	কন্দর্পনারায়ণ
রাজধর (১৬০০ খ্রীঃ মৃত)	ইসলাম খাঁ (১৬০৮—১৬১৩) কাশিম খাঁ (১৬১৩—১৬১৭)	লক্ষ্মণমাণিক্য	
যশোধর (১৬২১ খ্রীঃ রাজ্যশেষ)	ইব্রাহিম খাঁ (১৬১৭—১৬২৪)	অনন্তমাণিক্য	রামচন্দ্র

ভুলুয়ারাজগণের মধ্যে লক্ষ্মণ মাণিক্যই বোধ হয় প্রথমে যশোধর শাসিত ত্রিপুরা রাজ্যের দৌর্ব্বল্যের সুযোগে ত্রিপুরা-রাজগৌরবস্পর্দ্ধী 'মাণিক্য' উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। লক্ষ্মণ মাণিক্য সুলেখক এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কৈলাসবাবু তৎপ্রণীত "বিখ্যাত বিজয়" নামক নাটকের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য লক্ষ্মণমাণিক্য প্রণীত "কৌতুক রত্নাকর" নামক এক-খানা নাটকের ৩৭ পাতায় সমাপ্ত এক পুথি পাইয়াছি (Dacca University. S. N. O. 1871.) ত্রিপুরা রাজদরবারের পুথি সংগ্রহেও লক্ষ্মণমাণিক্য প্রণীত কৌতুক রত্নাকরের একখানা সম্পূর্ণ পুথি আছে। শুনিয়াছি

মাণিক্যের অতিথি হইলে তাঁহার অভ্যর্থনার্থ লক্ষ্মণমাণিক্য রামচন্দ্রের নৌকায় যাইবামাত্র রামচন্দ্র তাহাকে বন্দী করেন এবং বাকলায় লইয়া গিয়া কিছুকাল পরে নিষ্ঠুরতার সহিত নিহত করেন। লক্ষ্মণের দৈহিক বল সম্বন্ধে এখনও নানা প্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে। এই বিদ্যোৎসাহী বীরের এইরূপে বিশ্বাসঘাতকের হস্তে শোচনীয় মৃত্যু এতকাল পরেও যেন গাত্রদাহ জাগাইতে থাকে। প্রতাপ এবং তাঁহার জামাতা রামচন্দ্র উভয়েই রাজ-নৈতিক ব্যাপারে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানের এমন অভাবের পরিচয় দিয়াছেন যে আলোচনা করিলে মন ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া উঠে।

স্বরলিপি

হে মাধবী, দ্বিধা কেন
আসিবে কি ফিরিবে কি !
আঙিনাতে বাহিরিতে
মন কেন গেল ঠেকি' !
বাতাসে লুকায়ে থেকে
কে যে তোরে গেছে ডেকে ;
পাতায় পাতায় তোরে
পত্র সে যে গেছে লেখি' ।
কখন দখিন হতে
কে দিল দুয়ার ঠেলি' !
চমকি' উঠিল জাগি'
চামেলি নয়ন মেলি' ।
বকুল পেয়েছে ছাড়া
করবী দিয়েছে সাড়া
শিরীষ শিহরি' উঠে
দূর হতে কারে দেখি ॥ (নূতন গান)

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর　　　　স্বরলিপি—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II না না -া । না র্সা -া I জ্ঞা জ্ঞা -া । জ্ঞরা সা -া I
হে মা ০ ধ বী ০ দ্বি ধা ০ কে ন ০

I ধা ণা -া । ণধা ণা -া I ধর্সা র্সণা -া । ণধা পা -া I
আ সি ০ বে কি ০ ফি রি ০ বে কি ০

I জ্ঞা জ্ঞা -া । জ্ঞরা সা -া I না না -া । না র্সা -র্রর্সা I
দ্বি ধা ০ কে ন ০ হে মা ০ ধ বী ০০

I -র্সনা -র্সা -া । -া -া -পা I পা -ধা ণা । -র্রা র্রর্সা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ভী ০ রু ০ মা ০

I সধা র্সণা -া । ধা পা - I মা জ্ঞা -া । রা সা -া I
ধ বা ০ তো মা র দ্বি ধা ০ কে ন ০

I পণা ণা -া । ণধা ণা -া I ধর্সা র্সণা -া । ধা পা -ধা I
আ ঙি ০ না ভে ০ বা হি ০ রি তে ০

I ধমা মা -পা । পা পা -া I -পা -ণা ণা । ণধা পা -ধা I
ম ন ০ কে ন ০ ০ ০ গো তো মা র্

I ধমা মা -পা । পা পা -া I পা পা -ধা । ণা র্সা -া I
ম ন ০ কে ন ০ গে ল ০ ঠে কি ০

I জ্ঞা জ্ঞা -া । রা সা -া I না না -া । না র্সা -র্রর্সা I
দ্বি ধা ০ কে ন ০ হে মা ০ ধ বী ০ ০

I -র্সনা -র্সা -া । -া -া -পা I পা -ধা ণা । -র্রা র্রর্সা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ভী ০ রু ০ মা ০

I র্সধা র্সণা -া । ধা পা -া I মা জ্ঞা -া । রা সা -া I
ধ বী ০ তো মা র্ দ্বি ধা ০ কে ন ০

I {র্সজ্ঞা জ্ঞা -া । জ্ঞর্রা জ্ঞা -া I জ্ঞর্রা জ্ঞা -া । র্রা জ্ঞা -া I
বা তা ০ সে লু ০ কা য়ে ০ থে কে ০

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I জ্ঝর্রা -া -র্মা । জ্ঝর্া -র্রা -র্সা I র্সা -জ্ঝর্া জ্ঝর্া । জ্ঝর্রা র্সা -া I
কে ০ ০   ০ ০ ০   কে ০ যে   তো রে ০

I র্সর্রা র্রর্সা -না । না র্সা -র্রা I র্রনা -র্সা -া । -া -া -া} I
গে ছে ০   ডে কে ০   কে ০ ০   ০ ০ ০

I প -ধা ণা । -র্রা র্রর্সা -া I ধা -র্সণা -ধণা । ণধা পা -ধা I
পা ০ তা   য় পা ০   তা ০ ০ ০ য়্   তো রে ০

I ধমা -া পা । পা পা -া I -পা -ণা ণা । ণধা পা -ধা I
প ০ ত্র   সে যে ০   ০ ০ গো   তো রে ০

I ধমা -া পা । পা পা -া I পা পা -ধা । ণা র্সা -া I
প ০ ত্র   সে যে ০   গে ছে ০   লে খি ০

I জ্ঞা জ্ঞা -া । রা সা -া I না না -া । না র্সা -র্রর্সা I
দ্বি ধা ০   কে ন ০   হে মা ০   ধ বী ০ ০

I র্সনা -র্সা -া । -া -া -পা I পা -ধা ণা । -র্রা র্রর্সা -া I
০ ০ ০   ০ ০ ০   ভী ০ রু   ০ মা ০

I ণধা র্সণা -া । ধা পা -া I জ্ঞা জ্ঞা -া । রা সা -া I
ধ বী ০   তো মা র্   দ্বি ধা ০   কে ন ০

I মা মা -া । মা মা -পা I পা পা -মা । পা -া -ণা I
ক থ ন্   দ খি ন্   হ তে ০   কে ০ ০

I -ণধা -পা -া । -পা -া -ণা I ণধা ণা -া । ধা ণা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ দি ল ০ ছু য়া র্

I ণধা র্সণা -া । ধা পা -মা I পা -া -ণা । -ণধা -পা -া I
ঠে লি ০ তো মা র কে ০ ০ ০ ০ ০

I -পা -না না । না না -া I -া -া না । না না -া I
০ ০ চ ম কি ০ ০ ০ উ ঠি ল ০

I র্সা -া -না । নর্সা -া -া I -া -া র্সনা । নর্রা র্রর্সা -া I
জা ০ ০ গি ০ ০ ০ ০ চা মে লি ০

I -ধা -র্সণা -া । ণধা পা -মা I পা -া -ণা । ণধা -পা -া I
০ ০ ০ মে লি ০ কে ০ ০ ০ ০ ০

I র্রা -া র্জ্ঞা । -া র্জ্ঞা -া I র্জ্ঞর্রা র্জ্ঞা -া । র্জ্ঞর্রা র্জ্ঞা -া I
ব ০ কু ল্ পে ০ য়ে ছে ০ ছা ড়া ০

I -া -া র্জ্ঞা । র্জ্ঞর্রা র্সা -া I র্সর্রা র্রর্সা -না । না -র্সা র্সনা I
০ ০ ক র বী ০ দি য়ে ০ ছে ০ সা

I র্সা -া -া । -া -া -র্জ্ঞা । র্জ্ঞর্রা -া র্জ্ঞা । -া র্জ্ঞা -া I
ড়া ০ ০ ০ ০ ০ ব ০ কু ল্ পে ০

I র্জ্ঞর্রা র্জ্ঞা -া । র্জ্ঞর্রা র্জ্ঞা -া । -া -া র্জ্ঞা । র্জ্ঞর্রা র্সা -া I
য়ে ছে ০ ছা ড়া ০ ০ ০ ক র বী ০

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I র্সর্রা র্রর্সা -না । না -র্সা র্সনা I র্সা -া -া । -া -া -া I
দি য়ে ০ ছে ০ সা ড়া ০ ০ ০ ০ ০

। পা -ধা ণা । -র্রা র্রর্সা -া I ণধা র্সণা -া । ণধা পা -ধা I
শি ০ রী ষ্‌ শি ০ হ রি ০ উ ঠে ০

I ধমা -া -পা । পা পা -া I -া -া -া । -া -া -ধা I
দূ ০ র্‌ হ তে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I ধমা -া -পা । পা পা -া I পা পা -ধা । ণা র্সা -া I
দূ ০ র্‌ হ তে ০ কা রে ০ দে খি ০

I জ্ঞা জ্ঞা -া । জ্ঞরা সা -া I না না -া । না র্সা -র্রর্সা I
দ্বি ধা ০ কে ন ০ হে মা ০ ধ বী ০ ০

I -র্সনা -র্সা -া । -া -া -পা I পা -ধা ণা । -র্রা র্রর্সা -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ভী ০ রু ০ মা ০

I ণধা র্সণা -া । ণধা পা -া I মা জ্ঞা -া । রা সা -া II
ধ বী ০ তো মা র্‌ দ্বি ধা ০ কে ন ০

২

বৈশাখ-আবাহন

এসো, এসো, এসো, হে বৈশাখ !
তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জ্জনা দূর হয়ে যাক্।
যাক্ পুরাতন স্মৃতি, যাক্ ভুলে যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক্।
মুছে যাক্ গ্লানি, ঘুচে যাক্ জরা
অগ্নিস্নানে শুচি হোক্ ধরা।
রসের আবেশ রাশি শুষ্ক করি দাও আসি',
আনো, আনো, আনো তব প্রলয়ের শাঁখ,
মায়ার কুজ্ঝটি-জাল যাক্ দূরে যাক্॥ (নটরাজ)

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গা রা I
এ স

II গা -রা সা -া । -া -া সা রা I র্সা -র্সা র্সা -না । ধপা -া গা রা I
এ • স • • • এ স হে • বৈ • শা খ্ এ স

I গা -রা সা -া । -া -া -া -া I
এ • স • • • • •

I {গা -পা পা পা । পা -া পা পা I পা -ন্ধা ধা -া । -া -া ধা -া I
তা • প স নি • শ্বা স বা • য়ে • • • মু •

I ধপধা -না না না । না -া না -া I না -ধা র্সা -া । -া -া -া -া } I
মু র্ মু রে দা ও উ • ড়া • য়ে • • • • •

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I র্সা -র্গা র্গা র্গা । র্গর্রা -া র্সা -ন I ধনা -া নধা -া । -পা -া -া -া I
ব ৎ স রের আ ০ ব র্ জ ০ না ০ ০ ০ ০ ০

I পা -না না না । ধা -া পা -া I গা -া গা রা । গা -রা সা -া I
দূ র্ হ য়ে যা ক্ যা ক্ যা ক্ এ স এ ০ স ০

I -া -া সা রা । রসা -র্সা র্সা -না I ধপা -া গা রা । গা -রা সা -া I
০ ০ এ স হে ০ বৈ ০ শাখ্ ০ এ স এ ০ স ০

I পা -া গা গা । পা পা ধা -পা I
যা ক্ পু রা ত ন স্ম ০

I পর্সা -া -া -া । -া -া র্সা -া I র্সা র্গা র্গা -া । র্গর্রা -া র্রা -না I
তি ০ ০ ০ ০ ০ যা ক্ ভু লে যাও ০ গ্না ০ গী ০

I র্সা -া -া -া । -া -া র্সা -া I র্সা -র্গা র্গা -া । র্গর্রা -া র্সা -া I
তি ০ ০ ০ ০ ০ যা ক্ অ ০ শ্রু ০ বা যু প ০

I র্সনা র্সা র্রা র্সা । না -া ধা -া I পা -া গা রা । গা -রা সা -া I
সু দূ রে মি লা ক্ যা ক্ যাক্ ০ এ স এ ০ স ০

I -া -া সা রা । রসা র্সা র্সা -না I ধপা -া গা রা । গা -রা সা -া I
০ ০ এ স হে ০ বৈ ০ শাখ্ ০ এ স এ ০ স ০

I {সা রা গা -া । গা -রা পা -া I গা গা গরা -া । গা -রা সা -া I
মু ছে যা ক্ গ্লা ০ নি ০ ঘু চে যা ক্ জ ০ রা ০

I সা -পা পা -া । পা -হ্মা পা -া I পহ্মা পা ধা -া । ধপা -হ্মা গা -া }I
অ গ্ নি ০ স্না ০ নে ০ শু চি হো ক্ ধ ০ রা ০

I পা পা গা গা । পা -হ্মা ধা ধপা I পর্সা -া -া -া । -া -া -া -া I
র সে র আ বে ০ শ রা শি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা -র্গা র্গা র্গা । র্গর্রা -া র্রা -া I র্সনা -র্রা র্রর্সা -া । -া -া র্সা না I
শু ষ্ ক ক রি ০ দাও ০ আ ০ সি ০ ০ ০ আ নো

I নধা র্সা র্সনা -া । -া -া না ধা I ধপা -না ধা -া । -া -া -া -া I
আ ০ নো ০ ০ ০ আ নো ত ০ ব ০ ০ ০ ০ ০

I ধপা ধা না ধা । পা -র্সা র্সা র্সা I র্সনা -র্রা র্সা -া । -া -া র্সা না I
প্র ল য়ে র শাঁ খ্ আ নো আ ০ নো ০ ০ ০ আ নো

I নধা -র্সা না -া । -া -া -া -া I ধা না র্সা সনা । ধপা -া -া -া I
ত ০ ব ০ ০ ০ ০ ০ প্র ল য়ে র শাঁখ্ ০ ০ ০

I র্গা -া র্গা -া । র্গা -া র্গা র্রা I র্রা -া র্সা -া । র্সনা র্রা র্সা -া I
মা ০ য়া র্ কু জ্ ঝ টি জা ল্ যা ক্ দূ ০ রে ০

I না -া ধা -া । পা -া গা রা I গা -রা সা -া । -া -া সা রা I
যা ক্ যা ক্ যাক্ ০ এ স এ ০ স ০ ০ ০ এ স

I রসা -র্সা র্সা -না । ধপা -া গা রা I গা -রা সা -া । -া -া -া -া II
হে ০ বৈ ০ শাখ্ ০ এ স এ ০ স ০ ০ ০ ০ ০,

সহযোগী-সাহিত্য

টমাস হার্ডির উপন্যাস

শ্রীগোপাল হালদার

সাতাশী বৎসর বয়সে টমাস হার্ডির দেহান্ত হইল। ইংরাজী সাহিত্যের এক মহারথী তাঁহার অনুজ সমাজের নিকট চির-বিদায় লইলেন। ভিক্টোরীয় যুগের মধ্যদিনের শেষে তাঁহার প্রকাশ, তখনো মেরিডিথ সে আকাশ আলো করিয়া রহিয়াছেন,—জর্জ্জীয় যুগে জীবনের অস্তাচল হইতেও তাঁহার প্রতিভার ভাস্বর দান তিনি প্রায় শেষ নিমেষটি পর্য্যন্ত অকাতরে উৎসারিত করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার প্রথম আসন চিহ্নিত হয় কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে; কিন্তু তার পূর্ব্বেই তিনি কবিতার মৃদুগুঞ্জন শুনিয়াছিলেন। তাই, ভিক্টোরীয় যুগ শেষ না হইতেই আবার ইংরেজী সাহিত্যের আসরে তিনি কবিরূপে দর্শন দিলেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত কবিতাই উপহার দিয়া গেলেন। যে পাঠক সমাজ ঔপন্যাসিক বলিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলেন, কবিরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে তাঁহারা একটু কুণ্ঠা বোধ করেন। সত্যকারের কবি-প্রতিভার তিনি প্রথম হইতেই অধিকারী ছিলেন; তথাপি তাঁহার কবিতার চিন্তাধারা ও কবিতার নিজগতি এমনি বিশেষত্ব-বিহীন চাকচিক্যবর্জ্জিত যে তাহা সহজে লোক-রঞ্জন করিবার মতো নয়। সত্তর বৎসরের কাছাকাছি যিনি এই যুগে 'ডাইনাষ্ট'এর মত কাব্যাত্মক মহানাট্য (উনিশ অঙ্কে একশ ত্রিশ দৃশ্যে) রচনা করিতে পারেন তাঁহার প্রতিভার সাধারণ আদর্শে নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়।

তাঁহার কাব্য ও উপন্যাস দুই-ই সৃষ্টি হিসাবে বড়। ১৮৭০ এর পর হইতে ১৮৯৫ পর্য্যন্ত মোটামুটি তাঁহার উপন্যাসের যুগ—তারপরে কবিতার। Under the Greenwood Treeতে (১৮৭১) তাহার বিকাশ, Far From the Madding Crowd-এ (১৮৭৪) তাহার প্রতিষ্ঠা, The Return of the Nativeএ (১৮৭৮) তাহার জয়-লেখা, Tess of the D'urbervilles' এর শেষে' jude the Obscure'এ (১৮৯৫) পরিসমাপ্তি।*

১

সমস্ত জাতির সশ্রদ্ধ স্মৃতিপূজা টমাস হার্ডির ভস্মাবশেষকে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবির ঘুমন্ত অমর-লোকের কোলে স্থাপনা করিয়া চরিতার্থ হইয়াছে; কিন্তু কবির অন্তরের কামনাকে মানিয়া লইয়া তাঁহার হৃদয়টি তাঁহার অন্তরের লোকদেরই অতীত ও ভাবী শয়ন-ক্ষেত্রের মধ্যে সমাহিত করা হইল। সত্যই জীবন্তে তাঁহার হৃদয়ের দুয়ারে যাঁহাদের আশা-নিরাশার কাহিনী প্রতিনিয়ত আঘাত করিয়া তাঁহার সমস্ত শিল্প-সাধনাকে সঞ্চালিত করিয়াছে, জীবন-শেষে তাঁহাদেরই মাঝে তাঁহার বিশ্রাম শোভন।

---

* হার্ডির উপন্যাস

1. Desperate Remedies (1871),
2. Under the Greenwood Tree (1872)
3. A Pair of Blue Eyes (1873)
4. Far From the Madding Crowd (1874)
5. Hand of Ethellest (1876)
6. The Return of the Native (1878)
7. The Trumpet Major (1879);
8. A Laodicean (1880-81),
9. Two on a Tower (1822),
10. The Mayor of Casterbridge (1884--85)
11. The woodlanders (1886-87)
12. Tess of the D'urbervilles (1891)
13. Jude the Obsure (1895)

যে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে টমাস হার্ডির আত্মা সহজ মুক্তিতে ছাড়া পাইয়া কখনো উপন্যাসের রূপোদ্ভাবনায়, কখনো কবিতার রস সৃষ্টিতে আপনাকে নিঃশেষিত করিয়া দিয়াছে, তাহা ইংলণ্ডের বিশেষ একটা অঞ্চলের,—সে অঞ্চলের নাম ডরসেটশায়ার ও উইল্টশায়ার, তাঁহার ভাষায় ওয়েসেকস। তাঁহার সেইখানেই জন্ম, সেইখানেই অবসান, সেই স্থানটিকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার সমস্ত জীবনের শিল্প-সাধনা। ওয়েসেকসের প্রাকৃতিক দৃশ্য রমণীয় ও কমনীয় নয়,—প্রকৃতির শালীনতা ও শোভনতা, তাহার লীলায়িত মাধুর্য্য সেখানে স্থান লাভ করে নাই। একদিক দিয়া দেখিলে প্রকৃতি যেন সেখানে হৃতাভরণা, চির-বিধবা, তাই অন্তহারা রহস্যের নিকেতন ; আর একদিক দিয়া দেখিলে প্রকৃতি যেন সেই আদিম সৃষ্টিক্ষণের রিক্তাভরণা, লাবণ্য-লেশ-হীনা, কঠিন রমণী—যাহার স্নেহহীন অন্তরের গহন অন্তস্থলে যতদূর চক্ষু যায় কোনো করুণার ক্ষীণ রেখাও দেখা যায় না,—তাহার রূপ ও রহস্য যেমন অনাদি, তেমনি হয়ত অনন্ত-কাল-স্থায়ী। এই আবেষ্টনের মধ্যে তাই যে মানব-চরিত্রগুলি আপনাদের জীবনের খেলা খেলিয়া যায়, তাহারাও চারিদিককার আকাশ-বাতাস, চারিদিককার জল-স্থলের মতোই ;—যেন সৃষ্টির আদিক্ষণ হইতে যে ধারাটি বহিয়া আসিয়াছে তাহাদের জীবনযাত্রা তাহাতে একেবারেই ভাসিয়া-ভাসিয়া নানা ঘাটের নানা তরঙ্গাঘাতে বদলাইয়া রূপান্তরিত হইয়া যায় নাই ; তাহাদের মনে প্রাণে, চৈতন ও অচেতন জীবন গতিতে যেন জগতের দ্রুত-চলন্ত বিকাশের কোনো ছোঁয়াচই লাগে নাই, যেন আদিম জীবনের অসহায়, অনালোকিত মানস-লোক, অজানা কোন্ শক্তিতাড়িত রূঢ় ভরসাহীন জীবনযাত্রা, এখনো তাহাদের অটুট রহিয়াছে।

হার্ডির সৃষ্টির প্রতি পত্রে ও প্রতি ছত্রে এই প্রকৃতিই আপনার উষর, কর্কশ, নির্ব্বান্ধব ধূসর মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। তাঁহার সবকয়টি চরিত্রই এই ওয়েসেক্সের মানব-প্রকৃতির নিদর্শন, তাঁহার সব কয়টি উপন্যাসের প্রেক্ষা-পটই এই ওয়েসেক্সের বাহ্য-প্রকৃতি। আর এই প্রেক্ষা-পট ও এই চরিত্রাবলী সর্ব্বত্র অঙ্গাঙ্গী জড়াইয়া আছে,—একটি যেন আর একটিরই প্রতিলিপি।

হার্ডি 'ওয়েসেক্সের' কবি, 'ওয়েসেক্সে'রই কথা-সাহিত্যিক। কুম্বারল্যাণ্ডের সঙ্গেও বোধ হয় প্রকৃতির বিমুগ্ধভক্ত ওয়ার্ডসওয়ার্থের সম্বন্ধ এত নিবিড় ছিল না, প্যারিসের সঙ্গেও বুঝি সেই বিলাসিনী নগরীর বিভ্রম-মোহিত স্তাবক ব্যালজাক্-এর সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ছিল না। হার্ডির সঙ্গে 'ওয়েসেক্স' ও 'ওয়েসেক্সের' সঙ্গে হার্ডি সাহিত্য-রসিকের নিকট যেন এক নাড়ীর টানে বাঁধা।

বিলাতের ওই অঞ্চলের সঙ্গে যাঁহারা পরিচিত, হার্ডির গ্রন্থের মধ্যে তাঁহারা যেন তাহার প্রত্যেক পথ-ঘাট, প্রত্যেক গ্রাম ও সহর একেবারে অনায়াসে চিনিয়া লইতে পারেন। কথাসাহিত্যের নামের অবগুণ্ঠনগুলিও হার্ডি এমনি সহজ করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রতি উপন্যাসের শেষে এই ওয়েসেক্সের একখানি মানচিত্র তাই তিনি সংযুক্ত করিয়াছেন।

এই ভূম্যাত্মক (Regional) পটভূমি ছাড়াও হার্ডির নামের সঙ্গে আর একটি বাহ্য-বিশেষত্ব প্রায় এরূপেই জড়াইয়া আছে। তাহাকে কালাত্মক পটভূমি ('temporary') বলা সর্ব্বাংশে যুক্ত না হইতেও পারে। তাহার কথাসাহিত্যের প্রধান চরিত্রগুলি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে সম্বন্ধযুক্ত। এই বিভিন্ন উপন্যাসমালার মধ্যে একটি ক্রম বা ধারাও এদিক দিয়া প্রকাশিত। চরিত্র চিত্রের মধ্য দিয়া এই বাহিত ধারাটি আবার ব্যালজাক্ বা জোলার চরিত্র ও উপন্যাস-মালার পরিকল্পনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—যদিও সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহাদের সহিত হার্ডির অন্তপ্রকৃতির বৈষম্য নিতান্তই স্পষ্ট। তথাপি, তাঁহার পাঠকের কাছে তাঁহার বায়ুমণ্ডলটি যেমন সর্ব্বাগ্রেই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে, এবং সর্ব্বশেষ পর্য্যন্ত প্রকাশিত থাকে, তেমনি তাঁহার এই দূর-বিসর্পিত দৃষ্টিও একটু পরেই পাঠকের নিকট পরিষ্কার দেখা দেয়, এবং ক্রমেই আরো বেশী স্বচ্ছ হইয়া উঠে।

২

ভিক্টোরিয় যুগের যে কোঠায় হার্ডির সাহিত্য-জীবনের সূচনা, সেখানে মানুষের মন জীবনের দ্বন্দ্বকে এড়াইয়া চলিতে চায় না। সাহিত্যে-ও তখন nature red in tooth and claw র

শ্রীগোপাল হালদার

পাশ কাটাইয়া যাওয়াটা—মানুষের অকারণ দুঃখ-বেদনার কি ও কেনকে এড়াইয়া যাওয়াটা ফাঁকি হইয়া উঠিল। হার্ডি সাহিত্যে সেই মানুষের চেতন-অচেতন লোকের প্রবৃত্তি-প্রেরণার বিশ্লেষণে সেই কি ও কেনরই অন্বেষণ। আর এই অন্বেষণেরই ফল দুঃখবাদ। তাই, হার্ডি মনে প্রাণে ট্রাজিডিয়ান্। তাঁহার প্রথম যুগের Under the Greenwood Tree ছাড়া সেই ট্রাজিডির আশ্রয় ঘটনা-সংযোগ নয়, মানব-চরিত্র। তাই তাঁহাকে গ্রীক মনস্বীদের সঙ্গে সমশ্রেণীতে ভুক্ত না করিয়া ইংরেজ সেক্‌সপীয়রের সমধর্ম্মী বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত। সেক্‌স্‌পীয়রের নিকট নর-নারীর চরিত্রই তাহাদের দুরন্ত দুর্ভাগ্যের মূল কারণ; তাই তাঁহার দৃষ্টিতে চরিত্রই নিয়তি। হার্ডির চিত্রিত নরনারীদের সম্বন্ধেও একথা কতকাংশে সত্য; কিন্তু একটু স্থির দৃষ্টিতে দেখিলেই মনে হয় যে এই অসহায় নরনারীদের চরিত্র তাহাদের সমস্ত প্রয়াস, সমস্ত সজ্ঞান মনের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করিয়াই কোন্ দুর্ণিবার নিয়তির নির্দ্ধারিত পরিণতির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টিতে তাই নিয়তিই চরিত্র। টেস্, এলফ্রিড্, জুড্, ইউষ্টিসিয়া,—নিয়তি যেন ইহাদের জীবনকে এমনি কবলিত করিয়া রাখিয়াছে, অজানা ও অকারণ দৈব যেন এমনি করিয়া ইহাদের জীবন-নাট্যের উপরে আসিয়া পড়ে যে মনে হয় দুর্ভাগ্যকে ঠেকাইয়া রাখিতে ইহারা সচেষ্ট হউক বা না হউক, বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। এই অদৃষ্টবাদ ও দুঃখবাদের মিশ্রণে তাঁহার প্রতিভা যে রূপ লইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে এস্কাইলাস অপেক্ষা সোফোক্লিস এর অধিকতর সমধর্ম্মী বলিয়াই বোধহয়। এস্কাইলাসের সঙ্গে তাঁহার বিভিন্নতা তাঁহার নিজেরও অগোচর ছিল না,—টেস-এর জীবনের খেলা সাঙ্গ করিয়া যে অমর-পতি (President of the Immortals) নিশ্চিন্ত হইলেন, সেই মহাক্ষণে তাঁহার উল্লেখেও আমরা ইহার পরিচয় পাই। এস্কাইলাসের অন্তর্নিহিত আস্থা ছিল এক ন্যায়বান্ দেব-পতির (জোভ্) উপরে,—তিনি নিদারুণ ও নিষ্করুণ, কারণ তাঁহাকে সমহস্তে ন্যায়ধর্ম্ম বাটিয়া দিতে হয় উদ্ধত এগামেমনের মস্তক চূর্ণ করিয়া, মাতৃঘাতী আরিষ্টসকে শতদাহনে পীড়া দিয়া। টমাস হার্ডি বিশ্ব-বিধানের একদিকে তাঁহার এই বজ্র-মুষ্টির নিপীড়ন দেখিয়াছেন, কিন্তু অপরদিকে এস্কাইলীয়ান ন্যায়ধর্ম্মের লেশমাত্রও দেখিতে পান নাই;—তাই টেস্-এর পরম শোকাবহ ভীম পরিণাম দেখিয়া এই ন্যায়ধর্ম্মের প্রতি ও এস্কাইলাস-কল্পিত অমর-পতির প্রতি ব্যঙ্গ না করিয়া ছাড়েন নাই। তাই মনে হয় তাঁহার সহিত সাফোক্লিসেরই মিল বেশী। সাফোক্লীসের নাটকত্রয়তে অবশ্য দেবতার প্রতি ব্যঙ্গ অতি প্রচ্ছন্ন; কিন্তু তাঁহার ন্যায়-পরায়ণতায় বিন্দুমাত্র আস্থাও ভয়ে সাফোক্লীসের যে নাই তাহা সুস্পষ্ট। এস্কাইলাসের ট্রাজিডিতে আপনার অতিচার ও অত্যাচারের জন্যই মানুষ দুর্ভাগ্যকে প্রতিফলরূপে টানিয়া আনে—শাস্তি তাহার নেমিসিস। কিন্তু, হার্ডির চিন্তা জগতে মানুষ এক অভিশপ্ত গরীয়ান্ বীর, অজ্ঞাত ও অন্ধ শক্তি-পুঞ্জের বিরুদ্ধে অসহায়, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন-দেহ-প্রাণ, চূর্ণবিচূর্ণ বক্ষ-মস্তক,—কিন্তু তথাপি নিয়ত সংগ্রামে বদ্ধপরিকর, এবং নিয়ত পরাজয়ের ধূলিশয্যার মধ্যেও গরিমাময়। দুর্ভাগ্য তাহার ন্যায়দণ্ড নয়, অন্ধদেবের ক্রূর খেলা, কিম্বা খেয়ালী বিধাতার অর্থহীন নির্ম্মম বিলাস। পৃথিবী-জোড়া ট্রাজিডির পিছনে 'crass casuality'—তাই, মানুষ Time's Laughing stock মহাকালের পরিহাস, এবং 'Satire of circumstances' ঘটনার ব্যঙ্গ রূপ।

ভারতবর্ষের চিন্তায় দুঃখবাদ নিতান্ত অপরিচিত নয়,—এখানকার সমস্ত দর্শন ও সাধন প্রায়ই 'দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ' যাত্রারম্ভ করিয়াছে এবং কোনো এক দুঃখ-শেষ নির্ব্বাণ-লোকে না পৌছিয়া থামে নাই। এখানকার জীবনে ও চিন্তায় তাই দুঃখই চূড়ান্ত কথা নয়। অজানিত 'কর্ম্মফলের' প্রতি সুদৃঢ় ধারণায় এইখানে এস্কাইলীয়ান মনেরই আর একরূপ দেখি;—এখানেও বিধাতার ন্যায় ধর্ম্মে আস্থা সুস্পষ্ট। তাই, দুঃখের পশরা মাথায় লইয়াও ভারতবর্ষের প্রাকৃতজন ব্রাউনিঙের মতো সহজ বিশ্বাসে ভাবিতে চেষ্টা করে বিধাতা স্বর্গে আছেন এবং জগৎ সুন্দর চলিয়াছে। এখানকার মানুষ দুঃখবাদে ও অদৃষ্টবাদে হার্ডির চেয়ে কম বিশ্বাসী নহে; কিন্তু মানুষের নিজস্ব গরিমায়, নিজস্ব শৌর্য্যে, ব্যর্থ হইলেও তাহার আপন সংগ্রাম-শক্তিতে ও সাধনার মহিমায় হার্ডির গৌরববোধ ও করুণা-অনুভূতির এক কণাও তাহা-

দের নাই। অপরদিকে ইহারা যেমন অতি সহজেই সমস্ত দুঃখের মধ্য দিয়াও করুণাময় বিধাতার মঙ্গল হস্ত দেখিতে পায় (যেমন ব্রাউনিঙে দেখা যায়), হার্ডির পক্ষে তাহা একেবারেই অসম্ভব।

দুঃখবাদকে যাঁহারা একান্ত করিয়া দেখেন, তাঁহাদের পূর্ণদৃষ্টি বিকাশের অবসর বড় হয় না। মনের প্রবণতা-বশে তাঁহারা দুঃখাতীত লোক সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া বসেন এবং সুখ-দুঃখের শতপাকে-জড়ানো এই জীবনের মধ্যে সুখের চিহ্নও দেখেন না। এক কথায়, তাঁহাদের মন সুস্থ ও সংযত থাকে না। টমাস হার্ডির মধ্যেও আমরা মাঝে মাঝে ইহার প্রমাণ পাই। রিটার্ণ অব দি নেটিভ্ বা টেসএ তাঁহার সমাহিত চিত্তের প্রশান্তি একেবারে ভাঙে নাই, মাত্র দু একবার অসহায়া বালিকার চূড়ান্ত গ্লানির মধ্যে তারস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'কোথায় ছিলেন দেবতারা'? দু একবার তাহাদের প্রতি আন্দোলিত-চিত্তে কঠিন শ্লেষবর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু জুড্এর অখ্যাত জীবনের আখ্যায়িকায় পৌঁছিয়া মনে হয়, তিনি মনের হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন,—যেন কোন্ ব্যথিত আক্রোশে নিতান্ত সরল প্রাণ শিশুর দেহমন দুঃখবাদের চক্রতলে নিষ্পেষিত না করিয়া ছাড়িতেছেন না। জুড্ তাঁহার শেষ উপন্যাস; কিন্তু তার পূর্ব্বেকার উপন্যাসগুলিতে ও পরেকার কবিতায় শেষ অবধি তিনি সুস্থ, সরল চিত্তের প্রশান্তি হারাইয়া ফেলেন নাই। দুঃখবাদের আব্হাওয়া তেমনি রহিয়াছে, তবে তা ক্লৈব্য ও অবসাদেরও উদ্রেক করে নাই, আবার তা অসংযত বিকৃত প্রলাপ বা চিৎকারেও গিয়া ঠেকে নাই। হার্ডির দুঃখবাদের সঙ্গে যে কয়টি কথা জড়িত, তা এই:—sane, sober, solemn—সুস্থ, সংযত, সুগভীর।

বুঝা যাইতেছে, হার্ডিকে ঠিক অপূর্ণ-দ্রষ্টা বলা হয়ত সঙ্গত নয়। যাঁহারা সাধনার বলে দুঃখাতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। কিন্তু, পৃথিবীর অধিকাংশ লোক যেরূপ এক নিঃশ্বাসে বিশ্ব ব্যাপারে বেদনার মধ্যে অপার মঙ্গলের চিহ্ন দেখেন (যেন সবাই ব্রাউনিঙ) তাহাতে মনে হয় জীবনের কঠিন বাস্তবপীঠটি হইতে তাহারা হয় মুখ ফিরাইয়া নিজেদের ভুলাইতে সচেষ্ট, নয় ভয়ে একেবারে পলায়নে উন্মত্ত। হার্ডির যতো অপরাধই থাকুক, কাপুরুষতা নাই। তাই জীবনের অসারতা ও অস্থির অনিত্যতা, এবং নিয়তির দুর্বারতা ও অলঙ্ঘ্যতার বিশ্বাসী হইয়াও তিনি মায়াবাদীর বীতরাগকে আশ্রয় করেন নাই,—করুণায় ও গরিমায় পরিপ্লুত হৃদয়ে তিনি যদি কোনো তত্ত্ব প্রচার করিয়া থাকেন, তবে তাহা এই বিধাতার বজ্রকে উন্নত-শিরে গ্রহণ করিবার, দুর্ভাগ্যকে অনুদ্বেল চিত্তে মুক্ত-হস্তে বরণ করিবার। ইহাকেই হার্ডির ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে; কারণ তাঁহার প্রাক্-খ্রীষ্টান 'পেগান' মনের উপর খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের প্রলেপের অপেক্ষা এই দুঃখবাদ ও অদৃষ্টবাদ-জাত ভাবধারাই বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল।

হার্ডির এই দুঃখবাদের একটি কারণ হয়ত এই যে তাঁহার জীবন ছিল অন্তর্মুখীন। বহির্মুখীন জীবনে joie de vivre'র সম্ভাবনা অধিক; এবং অন্তর্মুখীন জীবনে একদিকে নব-বিজ্ঞানের নির্ম্মম শিক্ষা পাইয়া ও অপরদিকে বিশ্ব-ব্যাপারের মর্ম্ম কথা খুঁজিয়া বিষণ্ণ হইয়া উঠিবারই কথা। সুস্থ মন ইহার আওতায় আত্মহারা হয় না;—হার্ডিও হন নাই। তাঁহার আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে তাই আমরা একটি নিশ্চিত যুক্তি-নিবদ্ধ ধারার গতি দেখি। তাঁহার ঘটনা-পুঞ্জ শিথিল-গ্রন্থি নয়,—তাই নায়ক-নায়িকার পরিণামও যেন ন্যায়-শাস্ত্রের যুক্তি-নিয়মকে মানিয়াই এইরূপে আসিয়া শেষ হয়। 'টেস্ অব্ দি ডুরবারভিল', 'জুড্ দি অবস্কিওর', 'রিটার্ণ অব্ দি নেটীভ্', 'মেয়র অব কেষ্টারব্রিজ', ইত্যাদি উপন্যাস গুলির ঘটনা-গতিতে যেন কোথাও একটিও যুক্তিহীন পাদ পাত নাই। একদিকে ইহা যেমন তাঁহার সুস্থ চিত্তের চিহ্ন, অপরদিকে ইহা তেমনি তাঁহার গভীর চিন্তাশীল মনের পরিচায়ক।

হার্ডির নিবিড় বেদনা-বোধ যে দুর্ব্বল-চিত্তের শ্রান্তি ও অবসাদ-বোধ, অথবা সাধারণ-লোকের মঙ্গল-বোধ অপেক্ষা কত খাঁটি ও কত উঁচু, তাহা তাঁহার প্রত্যেক চিত্রের ও প্রত্যেক ছত্রের অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য ও গরিমা হইতেই সহজে অনুমান করা যায়। দুঃখবাদ যে হার্ডির নিতান্ত কোনো চিত্ত-বিলাস নয়, মিথ্যা একটা ঢং (pose) নয়, অথচ আবার ইহার তাড়নায় যে ভাবুক শিল্পী সংযম হারাইয়া

শ্রীগোপাল হালদার

'বেতাল' হইয়াও উঠেন নাই, তাঁহার রচনা-রীতির প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য, তাঁহার ঘটনাবলীর অনুদ্বেল গতি, সর্ব্বোপরি, তাঁহার অসহায় অভিশপ্ত নায়ক-নায়িকাদের সৌম্য-মূর্ত্তি, গর্ব্বোন্নত শির, উচ্ছ্বাস-আকুলতাহীন গভীর মর্ম্ম-বেদনা হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। যে দুঃখবোধ মানুষের হৃদয়কে একেবারে নিঙড়াইয়া লয়, একমাত্র তাহারই অনুভূতিতে মানুষ আপনার পরিপূর্ণ মহত্ত্বের সন্ধান পাইতে পারে, তাহাকে প্রত্যক্ষ করিলেই মৌন গর্ব্বে অন্তরের গরিমাকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। মনুষ্যত্বের এই গগন-চুম্বী মহত্ত্বের দিকেই সন্নদ্ধ টমাস হার্ডির করুণা-স্নিগ্ধ দৃষ্টি, এই মহত্ত্বের জ্যোতি-মুকুটে উজ্জ্বল তাঁহার ভাগ্যহীন নর-নারীদের বজ্রাহত শির।

পৃথিবীর প্রত্যেক 'ট্র্যাজিক' নায়কের মধ্যেই এমনিতর একটি গাম্ভীর্য্য থাকা চাই ; এমনি একটি মহত্ত্বের স্ফুরণ, অন্তত আভাস তাহাদের ব্যর্থতার মধ্যেও জাগিয়া থাকিয়া একদিকে তাহাদের অপার করুণায় অভিষিক্ত করে, অপরদিকে তাহাদের পায়ে শ্রদ্ধায় সকলের মাথা নোয়াইয়া দেয়। গ্রীক ট্র্যাজিডির নায়কদের চরিত্র এই গাম্ভীর্য্য ও গরিমায় সর্ব্বাধিক মণ্ডিত। এদিক হইতে দেখিলে এস্কাইলাসের ও সফোক্লিসের কৃতিত্ব সেক্‌সপীয়রের-ও উপরে ; এবং হার্ডির স্থানও সেই গ্রীক অমর সমাজের নীচেই। বরং তাঁহার পক্ষে এই মহত্ত্বকে প্রতিফলিত করা ছিল আরো কঠিন, কারণ তাঁহার চরিত্রচয় অতি নগণ্য পল্লী বা নগরের অতি সাধারণ নর-নারী, গ্রীক্ নাটক বা সেক্‌সপীয়রের নাটকের নায়ক-নায়িকাদের মতো অভিজাত-সম্প্রদায়ের নহে। তাহাদিগকে মহত্ত্বে মহীয়ান্ করা শিল্পীর পক্ষে সহজসাধ্য নয়।

এই দুঃখ-বোধের সহিত একটি তাপস-মনের সংযোগ আছে বলিয়াই তাঁহার রূপ-সৃষ্টিতে এমন একটি সুগম্ভীর গরিমার সমাবেশ সম্ভব হইয়াছে। বিলাস-বর্জ্জিত এই তপস্বী-রূপ টমাস হার্ডির সকল সাহিত্য সাধনার মধ্যেই ফুটিয়া উঠিতেছে। তাঁহার রচনা-রীতিতে তাই এই বিলাসের অভাব, তাঁহার আখ্যায়িকাতে তাই অনাড়ম্বর সরলতা এবং তাঁহার চরিত্র-চিত্রের মধ্যেও তাই সমাহিত তপঃ-প্রভাবের গাম্ভীর্য্য ও গরিমা।

দুঃখবাদ ভাবুক মানুষের মনকে ধীরে ধীরে সংযত, রিক্ত, তাপস-হৃদয়ে পরিণত করে। ভারতবর্ষের পরমার্থ-সাধকের জীবন হইতে এই যে সত্য লাভ করা যায়, ইংরেজী সাহিত্য-সাধকের রস-সৃষ্টি-বৈশিষ্টের মধ্যেও তাহারই সাক্ষ্য মিলে। ভাবুক মনের ধর্ম্ম যেমন দুঃখবাদ, সত্যকার দুঃখবাদী মনের ধর্ম্ম তেমনি সংযম,—বৈরাগ্য নয়, সহজ বাহুল্যহীন তপস্যা,—ascetic নয়, কিন্তু austere outlook on life.

৩

হার্ডির দুঃখবাদের পিছনে অবশ্য 'ওয়েসেক্‌সের' প্রকৃতি-দেবীর প্রতি নিবিড় আকর্ষণ-ও অনেকাংশে কাজ করিয়াছে। ওয়েসেক্‌সের প্রকৃতি-লক্ষ্মীর সহিত আমরা পূর্ব্বেই পরিচয়ের চেষ্টা করিয়াছি,—নিষ্করুণ, নির্ব্বান্ধব, নিরাভরণা। তাহার ভয়াল মোহজালে যে রসিক ও ভাবুক মন বাঁধা পড়িয়াছে, তাহার পক্ষে জীবনের অনাদি অনন্ত প্রহেলিকাকে কোনো অন্ধ শক্তির নির্ম্মম পরিহাস মাত্র বলিয়া ধারণা করা স্বাভাবিক।—রহস্যময়ী সেই শক্তিকে যে তিনি তাঁহার সকাল সন্ধ্যার-পরিচিত সম্মুখের প্রকৃতি দেবীরই মতো রহস্যময়ী 'খুসী-ক্ষ্যাপা' নিয়তি-রূপে দেখিবেন তাহাতেই বা বিচিত্র কি ?

টমাস হার্ডির ভাগ্যক্রমে তিনি ছিলেন জন্মাবধি প্রকৃতির পূজারী—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থেরই সমতুল্য। ওয়েসেক্‌সের কোলে জন্মিয়া ও বাড়িয়া উঠিয়া তিনি তাহারই স্তব গাহিতে গাহিতে সেই মাতৃকোলেই চির-সুপ্তিতে মগ্ন হইয়াছেন। তাই, ওয়েসেক্‌সের প্রকৃতিকেই তিনি মন-প্রাণের, সমস্ত সাহিত্য-সাধনার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া দিয়াছেন।

প্রকৃতি যে মানব-জীবনের পটভূমি মাত্র নয়—একটা বিচিত্র, বিভিন্ন সত্তা,—ইহা কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের যুগের প্রধান বাণী। ভিক্টোরীয় যুগের প্রভাতোদ্বোধন-ক্ষণের এই আবিষ্কৃত সত্য তাহার বিষণ্ণ বৈকালী আলোতে আবার টমাস হার্ডির সাহিত্যে তেমনি সগৌরবে সমুচ্চারিত হইয়াছে। 'রিটার্ণ অব দি নেটিভ্'-এ তাহার বহু-পরিচিত, বহুবার বর্ণিত এগ্‌ডন হীথ যেন একটি জীবন্ত চরিত্র

—মনে হয় সেখানকার জীবন-নাট্যের সূত্রগুলি যেন তাহারই হাতে। "সে যেন মানব-প্রকৃতির সঙ্গে পুরাপুরী খাপ-খাইয়া আছে—বীভৎস নয়, জঘন্য নয়, কুৎসিৎ-ও নয়,—নিতান্ত সচরাচর নয়, অর্থহীন নয়, একেবারে শান্ত-সুবোধও নয়;—সে যেন মানুষের মতোই নিপীড়িত ও সহন-শীল আবার তাহার সুশ্যাম স্থিতিশীলতায় অপূর্ব্ববিরাট ও রহস্যাবৃত।" এই রহস্যমর্ম্মী প্রকৃতির একাংশ যেমন বাহিরের ভূমি, তৃণ, গুল্ম আশ্রয় করিয়া, আর-একাংশ তেমনি তাহার কোলের মানব-সন্তানদের লইয়া। বহিঃপ্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতি এখানে অঙ্গাঙ্গী জড়াইয়া আছে। হার্ডি প্রকৃতির এই দুই প্রকাশকেই সমান প্রীতিতে দেখেন, দুই খণ্ডকেই একত্র জুড়িয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের মর্ম্ম উপলব্ধি করেন ও উদ্‌ঘাটিত করেন। তাই হার্ডির মানব-চরিত্র ওই প্রাকৃতিক বেষ্টনী হইতে ছাড়াইয়া লইয়া কল্পনা করা-ও অসম্ভব, আবার এমনিতর প্রকৃতির বুকে হার্ডির চিত্রিত চরিত্র ছাড়া অন্য-কোনো রূপ মানব-মানবীর অস্তিত্ব ও জীবন-লীলা আরোপ করা-ও শক্ত।

প্রকৃতির পূজারী উপন্যাসের মধ্যে খুব সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র পান না। উপন্যাসের আশ্রয় প্রধানত মানব-প্রকৃতি। কিন্তু মানব-প্রকৃতি যখন বাহিরের প্রকৃতির সহিত সমছন্দে ছন্দিত সমতালে আন্দোলিত ও শতপাকে জড়াইয়া একেবারে এক হইয়া যায়, তখন প্রকৃতি উপন্যাসের অন্তরেও আপনার আসন পাতিয়া লন। টমাস হার্ডির মধ্যে প্রকৃতি একদিকে যেমন তাঁর নর-নারীদের জীবন-খেলার নিয়ন্ত্রী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, আরদিকে তেমনি আপনার উদয়াস্ত, ঝড়-বাদল, আলো-ছায়া, নিস্তব্ধ শ্রান্ত মৌনতা লইয়া মাঝে-মাঝে একান্ত হইয়াই প্রকাশিত। প্রকৃতির সেই সব চিত্রে হার্ডি নিজের তুলিকামুখে যে রঙ্ ফলাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রখর অভ্রান্ত দৃষ্টিশক্তির এবং তাঁহার রঞ্জন-কুশল শিল্প-প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কি সন্ধ্যার ধূসরতা, কি দুপুরের শ্রান্ত অবসর, কিবা ম্লান জ্যোৎস্নায়-ঘেরা রাত্রি, মনে হয় না যে এই সব প্রাকৃতিক শোভা তাঁহার চক্ষুকে ফাঁকি দিয়াই অন্তরে ঢুকিয়া তাঁহার প্রিয় হইয়া বসিয়াছে! চোখ ভরিয়া তিনি প্রকৃতির এই খেলা দেখিয়াছেন, এবং অন্তরের মধ্য গ্রহণ করিয়া আবার রসে সঞ্জীবিত করিয়া ইহাদিগকে উৎসারিত করিয়াছেন।

৪

টমাস হার্ডির প্রকৃতি পূজার মধ্যে মানব-প্রকৃতির স্থান-ও নীচে নয়। তবে, একথা বলা বাহুল্য যে সে মানব জন-সমাজের জীব ততটা নয়, যতটা সে প্রকৃতির সন্তান। তাই, সামাজিক জীবনের প্রভাব যাহাদের জীবনে অতি-বিস্তৃত হইবার অবসর পায় নাই, এমনি সব ওয়েসেক্সের সামান্য নর-নারী লইয়া তাঁহার কারবার। এই সব সাধারণ চাষী ও কারিকরদের মধ্যে তিনি সুমহৎ গরিমা অনুভব করিয়াছিলেন। ওয়েসেক্সের ওই স্থাণু, অচঞ্চল প্রকৃতির কোলে এই সব স্থিতিশীল মানব-প্রকৃতি বাড়িয়া উঠিতেছে ও যুগ যুগ ধরিয়া একইরূপে ঝরিয়া পড়িতেছে, বিষণ্ণ গম্ভীর বেষ্টনীর মধ্যে তাহাদের জীবন বিষাদে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, এবং গম্ভীর অক্ষুব্ধ হৃদয়ে তাহার বোঝা ইহারা মাথা পাতিয়া লয়।

হার্ডির চিত্রিত এই কৃষকদের একাধিক রসিকচিত্ত সেক্স্‌পীয়রীয় কৃষকদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সেক্সপীয়রীয় কৃষকেরা যেন জীবন্ত,—তাহাদের কথা-বার্ত্তা, চাল-চলন যেন সহজ সুরে বাঁধা, অথচ তাহাদের মধ্যে একটা প্রশস্ততাও আছে। হার্ডির কৃষকদের বিদেশীর পক্ষে বিচার করা সহজ নয়, তাহাদের আলাপ-আচরণে পারি-পার্শ্বিকের তুলনায় কোনো ত্রুটি থাকিলে তাহা বিদেশীর নজরে সহজে ধরা পড়ে না। কিন্তু, বিদেশীর মন-ও তাহাদের স্বাভাবিকতা, নিত্যকালীন চিত্র হিসাবে তাহাদের সহজ, স্বচ্ছন্দ গতি দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়।

সেক্সপীয়রীয় কৃষকের সহিত তাহাদের একটা মিল কিন্তু অতি সহজেই ধরা পড়ে;—তাহাদের রঙ্গপ্রিয়তা। এই সব লোক যে কত কৌতুক-রঙ্গের ভক্ত তাহা প্রায় তাহাদের প্রত্যেক কথায় ও প্রত্যেক কাজেই দেখা যায়। ইহাদের রঙ্গ-ভোগের শক্তি যেমন অশেষ, ইহাদের রঙ্গের ভাণ্ডার-ও তেমনি অফুরন্ত; অবশ্য সে রঙ্গ সভ্য-সমাজের মত প্রয়াস-জাত নয়। তাহাদের রঙ্গ আবার অনেক-সময়েই নিজেদের ধর্ম্মের সূত্র ও ধারণাগুলি লইয়াই আরম্ভ হয়।

শ্রীগোপাল হালদার

হার্ডির রঙ্গ-প্রিয়তা সুখ্যাত। তাঁহার যে রসভাণ্ড পৃথিবীর বেদনা-বোধে সাড়া দেয়, এ অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার যে, স্বচ্ছ রঙ্গের হিল্লোলে তাহা কত বেশী আন্দোলিত হয়। অবশ্য একথা ঠিক যে তাঁহার বেদনাহত অদৃষ্টবাদী মন রঙ্গ অপেক্ষা ব্যঙ্গের দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়িবে, এবং তাহাই পড়িয়াছেও। তাঁহার রঙ্গরস তাই নিতান্ত সরল রঙ্গের পর্য্যায় ছাড়িয়া কখনো ব্যঙ্গ (satire) রূপে বিচ্ছুরিত হইতেছে, আবার কখনো অদৃষ্টের কঠিন শ্লেষরূপে (irony) গ্রীক্ নাট্যকারদেরই বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসকে মনে পড়াইয়া দেয়,—বেদনাকে সে রঙ্গ এমন নিবিড় কঠোর করিয়া তোলে যে তাহার মধ্যে আমরা কোন স্বচ্ছতাই খুঁজিয়া পাই না।

যে বেদনা-বোধ অথবা দুঃখবাদ টমাস হার্ডির মনের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, তাহার সহজ রঙ্গ-ক্ষমতা এমনি করিয়া কখনো তাহাকে একবার সেক্সপীয়রীয় ট্রাজিডির দুঃখবস্তুর মতো গাঢ়তর ও অধিকতর করুণ, আবার গ্রীক ট্রেজিডির বেদনাবলম্বের মতো ক্রূরতর ও অধিকতর ভয়াল করিয়া তুলিয়াছে।

৫

টমাস হার্ডির রস-সম্পন্ন চিত্তে যেমন তাঁহার বেদনা-বোধ ও প্রকৃতি-প্রেম ও রঙ্গ-প্রিয়তা পরস্পরকে অনুরঞ্জিত করিয়া বাসা বাঁধিয়া আছে, তাঁহার শিক্ষানিপুণ মন তেমনি সুবিন্যস্ত নির্ম্মাণ-কলায় (technique) ও সুন্দর রচনা-রীতিতে (style) আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসের আখ্যায়িকাগুলির ক্রমবিকাশ ও পরিণতির দিকে দৃষ্টি রাখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যৌবনে তিনি যে বাস্তু-শিল্পের আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ যায় নাই। তাহার প্রত্যেকটি ঘটনাংশই যেন অপরিহার্য্য, আবার তাহা এমনি সুসংস্থত যে সমগ্রতার সামঞ্জস্যকে তাহা অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে না। উপন্যাসের এই নির্ম্মাণ-কলার দিকটা আজ-কালকার ঔপন্যাসিকরা শিথিলতার সহিত দেখেন; সে হিসাবে হার্ডি শুধু নির্দ্দোষ নন, একেবারে আদর্শস্থানীয়। তাঁহার একখানা উপন্যাসকে তিনি 'ডচ্ রীতির চিত্র' বলে পরিচয় দিয়াছেন।—সত্য বটে, তাহার প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র অংশ বর্ণাঢ্যতায় গরীয়ান্, সূক্ষ্ম কারুকর্ম্মে সুসম্পন্ন কিন্তু বাস্তশিল্পের সূত্রগুলির সঙ্গে পরিচয় থাকায়, তিনি সমগ্রের সু-সমতাকে কখন অংশের বাহুল্যের মোহে ভাঙিতে দেন নাই। ভাবধারার দিক দিয়াও যেমন তাঁহার রস যুক্তিকে অতিক্রম করে নাই, নির্ম্মাণ-কর্ম্মেও তেমনি তাঁহার শিল্প সুযৌক্তিক বিকাশকে অবহেলা করে নাই।

রচনা-রীতির মধ্যে টমাস হার্ডির শিল্পী স্বভাবেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাঁহার রীতি বিষয়াপেক্ষিক। বর্ণিত বিষয়কে ছাড়াইয়া অনাবশ্যক বর্ণাঢ্যতার বা বর্ণ অপনয়ের অর্থহীন খেলা তাহাতে নাই; আবার আজকালকার 'লজ গজে' (slovenly) ভঙ্গীও তাহা গ্রহণ করে নাই। উহার মধ্যে একটা শালীনতা আছে, একটি সুসীম, স্বচ্ছন্দ গতির সহিত একটা সর্ব্বব্যাপী প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য আছে যাহাতে তাঁহার ভাব ও আখ্যান গম্ভীরতর হইয়া উঠিয়াছে।

বহুমানব ও বহুমনীষীর অশ্রুজলের মধ্যে টমাস হার্ডির সমাধি হইল: কিন্তু তথাপি, তাঁহার ভাব ও রূপকলা লোকপ্রিয় না হওয়ারই কথা। জীবনের অনিত্যতা ও অশেষ বেদনা-বোধকে যিনি চিন্তা ও রসে রূপ দিয়াছেন, নিত্যকালের নিকষ-পাষাণে তাঁহার দাগ হয়ত সহজে মুছিয়া যাইবে না।

উইল

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

উইল না ক'রে মরাটা ভাল নয়, সম্পত্তি কিছু থাক্ বা না থাক্। শোনা গেছে স্বর্গ জায়গাটা হচ্ছে অত্যন্ত একঘেয়ে রকমের। সেখান থেকে মজা দেখবার খুব একটা ভাল উপায় হচ্ছে উইল রেখে মরা। নন্দনকাননে ব'সে চোখের উপর দেখ্‌তে পাওয়া যাবে পরিত্যক্ত উইল নিয়ে কি রকম ছেঁড়াছিঁড়ি প'ড়ে গেছে। এ বলে এক, ও বলে আর এক; শেষে গিয়ে দাঁড়ায় সম্পূর্ণ বিপরীত আর এক! তামাসা মন্দ নয়। উইলে ত লিখে দিয়ে স'রে পড়া গেল এক কথা, কিন্তু প্রিভিকৌন্সিল পর্য্যন্ত দৌড়তে দৌড়তে তার মানে দাঁড়াল ঠিক তার উল্টো কথাটা। ভাগ্যিস্ সেখান থেকে স্বয়ং ব্রহ্মার কাছে আপীল করার ব্যবস্থা সিভিল প্রোসিজর কোডের কোনো ধারায় পাওয়া যায় না তাই রক্ষে। তা না হ'লে সব শেষে আরও কি বিচিত্র দাঁড়াত সেটা স্থূল বুদ্ধির অগম্য। আইনের কেতাবে কিন্তু বিশেষ করে উপদেশ দেওয়া আছে যে উইল-কর্ত্তার ইচ্ছাটা যাতে সর্ব্বতোভাবে বজায় থাকে তারই চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তব্য। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কর্ত্তা যদি লিখে দিয়ে গেলেন 'ক'টা। টীকা টীপ্পনি নিয়ে সেটা গিয়ে ঠিক দাঁড়াল 'খ'টা। শুধু তাই নয় অনেক সময় প্রমাণ হয়ে যায় উইল কর্ত্তার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। বৃথা উকীলকে পয়সা দিয়ে কাগজ নষ্ট করেছেন।

আইনজ্ঞ পুরুষেরা সর্ব্বজ্ঞ। সেইজন্য অনেক অজ্ঞের অস্পষ্ট কথা তাঁদের কাছে সূর্য্যালোকের মতন সুস্পষ্ট। কিন্তু নিজের মনে মনে যে সব জিনিষ খুবই পরিষ্কার ছিল, উকীল কৌন্সুলীর ওজস্বিনী বক্তৃতাভাষ্যে সেগুলাকে আরও পরিষ্কার হতে দেখে দিব্যধামবাসীদের মুখের উপর যে হাস্যোদয় হয় সেটুকুই স্বর্গের বৈচিত্র্যহীন জীবনে একটা মন্দ লাভ নয়।

নজির দেখান যাক্। পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়ীর প্রসন্নকুমার ঠাকুর যখন উইল ক'রে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি প্রথমে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে তারপর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এই রকম পুরুষানুক্রমে দিয়ে গেলেন, তখন দিব্যধামের দেবতারা অলক্ষ্যে নিশ্চয়ই একটু হেসে নিয়েছিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল তাঁর একমাত্র পুত্র যিনি ইতিপূর্ব্বেই খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেছিলেন তিনি যেন সম্পত্তির কোন অংশই না পান। কিন্তু অনেক তর্ক বিতর্কের পর সবচেয়ে বড় আদালতে গিয়ে এই স্থির হোল যে সম্পত্তিটা প্রসন্নকুমারের ভ্রাতুষ্পুত্রের অবর্ত্তমানে তাঁর পুত্রেতেই গিয়ে বর্ত্তাবে। ফলতঃ প্রমাণ হয়ে গেল যে ঠাকুর মহাশয়ের মত অমন পাকা-বিষয়ী আইন-জানা পুরুষও বে-আইনী কাজ ক'রে গেছেন।

উইলের সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত কথা আইনের চক্‌চকে বাঁধান কেতাবে আর আইন ব্যবসায়ীদের মগজে গুহায়িতং হয়ে আছে। সাধারণের জন্য কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল।

গোড়ায় তাহলে প্রশ্ন ওঠে, উইল করবার অধিকারী কে? অধিকারী-ভেদটা সর্ব্বত্রই আছে। আইনে বলে পাগল আর নাবালক ছাড়া সবাই উইল কর্ত্তে পারেন। সাধারণ বুদ্ধিতে পাগল বলতে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে টিকা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ঐ পাগল কার নাম শুধু সেই বিষয়েই আইনে যে সব মস্ত মস্ত কূটতর্ক আছে তা' বুঝতে চেষ্টা করলে অনেক অনেক বিদ্যাদিগ্‌গজদেরও মাথা গুলিয়ে যায়। ক্ষ্যাপা বলতে যে পাগল বোঝায় সে পাগল আইনী পাগল নয়। আবার আর এক রকমের পাগল আছে, যারা অন্য সব বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতন, কিন্তু একটা বিশেষ কোন বিষয়ে অপ্রকৃতিস্থ। যেমন এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর পাগলামীটা ছিল যে তিনি নিশ্চয়ই জান্‌তেন ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সঙ্গে তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল; আর নিজকে বোধ হয় ভেবেছিলেন স্যার ওয়ালটার র‍্যালে ব'লে কিম্বা লর্ড এসেক্স, নতুবা ঐ রকম আর কিছু।

উইল

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

ঐ লোকটীকে জজের রায়ে তাঁর বিপক্ষের লোকেরা পাগল ব'লে সাব্যস্ত করতে পারেন কি? সোজা কথা, আইনের মতে পাগল হচ্ছে সেইজন যিনি এমনি অবিবেচক যে নিজের সম্পত্তি নিজে রক্ষা করবার ক্ষমতা নেই! কবি কি আর্টিষ্ট ব্যক্তি আইনের প্যাঁচে ঐ দলে গিয়ে পড়েন কিনা এসকল নজির এখনও পর্য্যন্ত চোখে পড়েনি।

নাবালকদের সম্বন্ধে অবশ্য অত গভীর আলোচনা আইন-শাস্ত্রে নেই। তার কারণ নাবালকত্বের বয়সটার বিষয় একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। সচরাচর আঠার বৎসর বয়স অতিক্রম করলে লোকে নাবালক খোলস ছেড়ে সাবালক পদবীতে আরূঢ় হন। কিন্তু এখানেও সামান্য একটু কথা আছে। যদি আদালত থেকে কোনো নাবালকের অভিভাবক ঠিক ক'রে দেওয়া হয় তাহলে সে বেচারীর অর্ব্বাচীন দুর্নাম ঘোচাতে পুরো একুশ বৎসর বয়স লাগে। কেন যে এমন ধারা হয় সে যুক্তি শোনা নেই। তবে আইনকর্ত্তাদের মনে মনে বিশ্বাস বোধ হয় এই যে অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে ছেলেদের বুদ্ধি পাক্‌তে কিছু বিলম্ব হতে পারে।

স্ত্রীজাতিরাও উইল করতে পারেন। নীতিবিদ্‌রা বলেন স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য উচিত নয়। কিন্তু আইনে ওবিষয়ে কোনো পক্ষপাত নেই। তবে স্ত্রীলোক কেবল নিজের সম্পত্তিই উইল ক'রে দিতে পারেন। কারণ আইনের বচন আছে—অন্যের সম্পত্তি উইল ক'রেও কেউ কাউকে দান করতে পারে না। যদি কেউ তাঁর উইলে গভর্ণমেণ্ট হাউস্‌টা আমাকে দান ক'রে যান তাহলে সেটা তাঁর আমার প্রতি প্রীতির নিদর্শন হতে পারে, কিন্তু আইন-নীতির উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা প্রদর্শন।

উইল করতে হলে সর্ব্বাগ্রে দেখা চাই অন্ততঃপক্ষে দুজন সাক্ষী ঠিক আছে কিনা। উইল কর্ত্তার হয় তাঁদের সামনে সই করতে হয়, নচেৎ তাঁদের বলা চাই যে দস্তখত করবার কাগজটি হচ্ছে তাঁর উইল, আর সাক্ষী দুজনকেও পরস্পরের সামনে সই করা দরকার। একজন সাক্ষী হ'লে কিন্তু একেবারেই চলবে না। তার কারণ তিনি মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারেন। কিন্তু দুজনের সাক্ষী মিললে যে মিথ্যাসাক্ষ্যের পরিমাণ দ্বিগুণ বেড়ে যেতে পারে এর নজীর মামলার ইতিহাসে নিতান্ত বিরল নয়।

উইল যে সাধারণ চল্‌তি ভাষায় করা চল্‌তে পারে, এটা সব আইনজ্ঞ ব্যক্তিই স্বীকার করেন। বরং আইনের বিশেষ ভাষা ব্যবহার করলেই বিপদের সম্ভাবনা। কারণ সে ক্ষেত্রে আইনের ভাষার যে বিশেষ মানে প্রচলিত আছে সে অর্থ তখন প্রযোজ্য। আইন-বাক্য বহুঅর্থ-প্রেয়সী। অর্থাৎ তিনি কখন যে কোন অর্থকে আশ্রয় করেন তা' শুধু ভাব্‌তে গেলেই মহা-অনর্থ উপস্থিত হয়। সুতরাং আইনের কথাগুলোকে নীতিবাক্য অনুসরণ ক'রে শতহস্ত দূরে রাখাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

কিন্তু তা হোলেই যদি মনে করা যায় যে আপদ বিদায় হোল সেটা কিন্তু একটা মস্ত ভ্রম। উইল করা সম্বন্ধে আইনশাস্ত্রে বিস্তর বিধি-নিষেধ আছে। সেগুলো একেবারে উপেক্ষা করার বস্তু নয়। তবে সব জানা থাক্‌লেও যে বিপদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে যে তাহলে ও সম্বন্ধে আদালতে কখনও কোনো প্রশ্নই উঠ্‌ত না। তবে সুখের বিষয় এই যে বিপদ যখন সত্যই উপস্থিত হয় তখন উইল বক্তার কাছে সেটা আর আপদ-জনক নয় বরং আমোদজনক।

এখন এই বিধি-নিষেধগুলো সম্বন্ধে তাহলে সংক্ষেপে দুটো কথা বলা যাক্। সব কথা খুলে বল্‌তে গেলে সে হবে আর একটা আস্ত মহাভারত।

অস্পষ্ট কথার ব্যবহার আইনের প্রধান নিষেধ। কেননা ওটা আইন-ব্যবসায়ীদের একেবারে নিজস্ব। উদাহরণ,—উইলে যদি লেখা থাকে আমি অমুককে কিছু টাকা দিলুম,—এ দান অগ্রাহ্য। কেননা কিছু টাকা যে কত টাকা তা বোধহয় অঙ্ক-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত আইনষ্টাইনও বুঝিয়ে দিতে পারেন না।

কিন্তু অস্পষ্ট কথা যদি পরবর্ত্তী বিবরণ দ্বারা একটু সুস্পষ্ট আকার ধারণ করতে সমর্থ হয় তাহলে অন্য কথা। যথা,—পড়া গেল উইলে লেখা আছে—আমার ভ্রাতা অশোকের মধ্যম পুত্র নীরেশকে হাজার টাকা দান করলুম। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে ভ্রাতা অশোকের নীরেশ বলে

কোনো পুত্রই নেই, কিন্তু তাঁর মধ্যম পুত্রের নাম সুরেশ। সুরেশের ভাগ্য প্রসন্ন। তিনিই হাজার টাকার অধিকারী।

এ ছাড়া আরও খানিকটা সুবিধা আছে। বিবরণটা সম্পূর্ণ ঠিক না হলেও ক্ষতি নেই, যদি বর্ণনা খানিকটাও মেলে। তাহলেও কেল্লা ফতে! যেমন উইলকার কেউ দিয়ে গেলেন তাঁর রামপুরের জমিদারী। দেখা গেল উইলকর্ত্তার রামপুর ব'লে কোনো জমিদারী নেই, তবে একটা তালুকদারী আছে বটে। এখানে আইনের বেশী বাচ বিচার নেই। যা' তালুকদারী তাই জমিদারী।

তবে এক জিনিষের একাধিক বিবরণ দিলে গোল হবার সম্ভাবনা। বহুভাষণ আইনশাস্ত্রমতে বর্জ্জনীয়। যথা,—উইলে যদি লেখা থাকে আমার রামপুরে প্রজাবিলি যে জমি আছে সেটা আমি অমুককে দান করলুম। দেখা গেল যে রামপুরের খানিকটা জমি প্রজাবিলি আর খানিকটা খাস। এক্ষেত্রে অমুকের কপালে খাসের জমি ফস্কে গেল।

একই জিনিষ একাধিক লোককে দেওয়া যায় না। কিন্তু একাধিক জিনিষ একই লোককে স্বচ্ছন্দে দেওয়া চল্‌তে পারে। এই নিয়মটা বহু গবেষণার ফলে প্রাপ্ত। কিন্তু এই নিয়ম না মেনে যদি কেউ ঐ রকমই দিয়ে যান তাহলে প্রথমে যাঁর নাম উল্লেখ আছে তিনি দান গ্রহণের অধিকারী হবেন না, সবশেষে যিনি বিদ্যমান তিনিই দানের যোগ্য পাত্র। উদাহরণ,—একটা হীরার আংটি প্রথমে দেওয়া গেল সুরেশকে আবার সেই আংটিটাই উইলের শেষে দেওয়া গেল নীরেশকে। এখানে আর সুরেশকে জয়লাভ করতে হবে না। কিন্তু দান-পত্র ক'রে যদি এই আংটি-দান ব্যাপারটা সম্পন্ন করা হোত তাহলে সুরেশকে ঠকান নীরেশের কর্ম্ম নয়। কারণ সেখানে কার্য্যঞ্চাগে। অর্থাৎ দলিলে আগেকার কথাগুলোই কার্য্যকরী হয়।

একাধিক জিনিষ যদি একজনকে দেওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে জিনিষটা রূপে এবং পরিমাণে বিভিন্ন হওয়া দরকার। অর্থাৎ যদি উইলের প্রথম ভাগে একশ টাকা একজনকে দান করা গেল, আবার শেষ ভাগেও একশ টাকা সেই একই লোককে দেওয়া হোল, অঙ্ক শাস্ত্র মতে একে একে মিলে দুই হোলেও আইনশাস্ত্র মতে লোকটির একশ টাকাই প্রাপ্য। তবে এক স্থানে একশ, এবং পরবর্ত্তী স্থানে দু'শ থাক্‌লে দুই আর একে মিলে তিনশ হবে। এই নিয়মটা কোন গবেষণার ফলে, এখনও তা' ঠিক জানা যায় নি।

দান জিনিষটা সম্পূর্ণ না হোক খানিকটা দাতার উপর নির্ভর করে। সুতরাং দাতা ইচ্ছা করলে চুক্তি ক'রে দান করতে পারেন। ধরা যাক দাতা বল্লেন যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমার ভ্রাতার অনুমতি নিয়ে বিবাহ করলে হাজার টাকার যৌতুক পাবেন। এখন ভ্রাতুষ্পুত্র যদি সুপুত্র না হয়ে, প্রেমের খাতিরে মনোমত নায়িকাতে সম্মিলিত হন, তাহলে তাঁর ভাগ্যে যৌতুকটা নিছক কৌতুকে পরিণত হবে।

তবে দানকর্ত্তার কোনো অদ্ভুত বা বেআইনী খেয়াল চরিতার্থ করতে গ্রহীতা বাধ্য নন। সেক্ষেত্রে দান অসিদ্ধ। যথা, উইলে বলা গেল যে রামমূর্ত্তি যদি এক ঘণ্টায় একশ মাইল হেঁটে যেতে পারেন ত একশ মাইলের একশ গুণ টাকা তিনি পুরস্কার পাবেন। এমন ধারা অসম্ভব খেয়ালী দানকে রামমূর্ত্তি রাবণমূর্ত্তি ধারণ করেও আদালতে সুসিদ্ধ করাতে পারবেন না।

তথৈব চ, যদি উইলে বলা যায় যে অমুককে খুন করলে অমুক আমার সমস্ত জমিদারীর অধিকারী হবেন,—সেই পড়ে দ্বিতীয় অমুক যদি সেটা কার্য্যে পরিণত করতে যান ত তাঁর কপালে পেঁয়াজ ও পয়জার দুইই।

উপরের ব্যাখ্যা শুনে কেহ যেন না মনে করেন যে আসলে আইন জিনিষটা অতি সরল সাদাসিদে ব্যাপার। আবার নীতিবাক্য স্মরণ করে কেহ যেন বিলাপ না করেন,—অর্থমনর্থম্ ভাবয় নিত্যম্—।

তবে উইল ক'রে মরা ভাল, সম্পত্তি কিছু থাক্ বা না থাক্।

ভারতীয় মন্দিরের গঠন বৈশিষ্ট্য

উত্তর ভারত

ভারতবর্ষের অগণিত মন্দিরগুলি বাহির হইতে দেখিলে মোটামুটি একই ধাঁচের বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহার মধ্যেও বিভিন্ন প্রদেশের যে নিজস্ব একটা বিশিষ্টতা আছে এবং তজ্জন্য তাহাদের বহিরাভরণ ও গঠন-প্রণালীর যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহা মনোযোগ সহকারে দেখিলেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মোটামুটি আমরা এই সব মন্দিরগুলিকে দুইটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি; যথা (১) আর্য্যাবর্ত্তের মন্দির, (২) দাক্ষিণাত্যের মন্দির। এই দুই প্রদেশের মন্দিরগুলির গঠন-প্রণালী ও বাহিরের আকারের বিভিন্নতা কোন দর্শকেরই দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। এই দুইটী প্রধান শ্রেণীকেও আমরা আবার আয়তন ও গঠন-প্রণালীর দিক্ দিয়া নানান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। আমরা আপাততঃ প্রথমোক্ত একটা প্রধান শ্রেণীর বিষয়ই কিছু আলোচনা করিব।

আমরা ভারতবাসীরা চিরকালই ধর্ম্মপ্রবণতার জন্য প্রসিদ্ধ, কাজেই ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে মন্দির নির্ম্মাণ
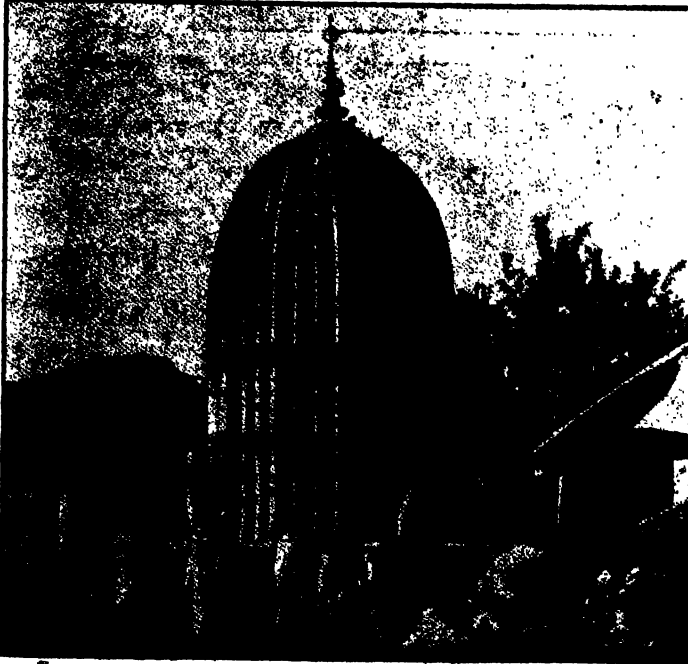
উত্তর ভারত মন্দিরের পুরাতন ঠাট্

গোয়ালিয়রের 'তেলিকা মন্দির'

নয়শত বৎসরের পুরাতন ৮০ ফুট উচ্চ

কার্য্যে সমস্ত জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। যদিও আমরা অধুনা-আবিষ্কৃত পাঞ্জাবের মহেঞ্জোদারোতে খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ বৎসরের মন্দিরের অস্তিত্ব দেখিতে পাই, কিন্তু সচরাচর যে সব পুরাতন মন্দির আমরা এখনও দেখিতে পাই তাহা আর্য্যদের ভারতবর্ষে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। হিন্দু-মন্দির ছাড়া বৌদ্ধ-বিহার ও চৈত্যও ভারতবর্ষে অনেক আছে, কিন্তু এই সকলের সংখ্যা ভারতবর্ষের বাহিরে ব্রহ্মদেশ, সিংহল, শ্যাম, চীন ও জাপানেই বেশী। জৈনমন্দিরও ভারতবর্ষে অনেক আছে।

যখন সূর্য্য-উপাসক আর্য্যেরা ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করেন, তখন তাঁহাদের ৩৩টী প্রাকৃতিক দেবতার অর্চ্চনার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের ন্যায় চৈত্য স্থাপনা করিলেন। তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তে কয়েক শতাব্দী স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার পর এই সব মন্দিরের গঠন-স্থায়িত্বের দিকে মনোযোগ দিলেন। প্রথম প্রথম কিয়দংশ জমি পারিপার্শ্বিক জমি হইতে কিছু উচ্চ করিয়া একটী চত্বরের ন্যায় করা হইত এবং ইহার উপর অগ্নি দেবতার স্থাপনা হইত। ক্রমশঃ এই চত্বর ঘিরিয়া কাষ্ঠ ও বাঁশের সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরের আকারে মন্দির নির্ম্মিত হইত, যদিও এই সকল ক্ষুদ্র মন্দিরের অস্তিত্ব আজকাল কোথাও নাই। এই সব ক্ষুদ্র মন্দিরের উপরিভাগ সর্ব্বদাই বৃত্তাকার হইত, সর্ব্বোপরিভাগ চূড়ার আকার ধারণ করিত অথবা গম্বুজের ন্যায় হইত। এই প্রকার চূড়ার নাম 'শিখর' এবং এই প্রকারের মন্দিরকে শিখরজাতীয় মন্দির বলা যাইতে পারে। যখন এই মন্দির গুলির স্থায়িত্বের দিকে আর্য্যেরা দৃষ্টি দিলেন তখন হইতে প্রস্তরের এই প্রকারের মন্দির নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইল। বস্তুতঃ এই প্রকারের বহু প্রস্তর-মন্দির এখনও উত্তর ভার-

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

তের বহু স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথম প্রথম সমস্ত মর্ম্মর-মন্দিরগুলিই কাঠের মন্দিরের অনুরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু পরে ক্রমশঃ যতই তাঁহাদের মন চারু-শিল্পের দিকে আকৃষ্ট হইল ততই তাঁহারা মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যের ভিতর দিয়া শিল্প-সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। মন্দিরের অবয়ব ও গঠন-প্রণালীর উন্নতি ও তৎসঙ্গে মন্দির-গাত্রে খোদাই করা চিত্রের বাহুল্য তখন হইতেই আরম্ভ হইল। মন্দিরগুলিকে কিরূপে আরও সুদৃশ্য করা যায় সেই দিকেই সকলে তখন বিশেষ করিয়া দৃষ্টি দিলেন। আয়তন বৃদ্ধির সহিত শিখরের উচ্চতাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপ মন্দির হইতেই যে বর্ত্তমান যুগের মন্দিরের কাঠাম লওয়া হইয়াছে এবং এই কাঠামের সহিত যে ক্রমশঃ বিভিন্ন প্রকারের গঠন-প্রণালীর সংযোজনে পরবর্ত্তী যুগের বিরাট বিরাট মন্দিরগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের মন্দির ও বুন্দেলখণ্ডের খাজুরহোর মন্দির এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করে।

মানুষের চিন্তার ধারা যতই ধর্ম্মের বিভিন্ন স্তরে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, বিভিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাও মানুষ ততই উপলব্ধি করিতে শিখিল এবং নিজ নিজ সমাজের মধ্যে স্বীয় উপাস্য দেবতার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, তাঁহাদের এক একটা বিশিষ্ট আকার দান করিয়া মূর্ত্তিগঠনে সচেষ্ট হইল। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের বৃদ্ধির সহিত বিভিন্ন দেবতার জন্য বিভিন্ন প্রকারের মন্দির গঠিত হইতে আরম্ভ হইল। এই সকল মন্দিরের গঠন-বৈশিষ্ট্য ও নানা প্রকারের হইত। বিষ্ণুর মন্দিরের দ্বার সর্ব্বদাই উদিয়মান সূর্য্যের দিকে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে রাখা হইত। শিব মন্দিরের দ্বার পশ্চিম দিকে এবং ব্রহ্মার মন্দিরের চারি দিকে চারিটা দ্বার থাকিত। অতএব দেখা যাইতেছে যে পূর্ব্বকালেও এই সব মন্দির নির্ম্মাণের সময় প্রত্যেককেই নিজস্ব স্বতন্ত্র স্থায়ী নিয়মাবলীর অধীনে থাকিতে হইত।

দেবমূর্ত্তি স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরের ভিতরকার স্থান পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হওয়াতে, পূজারী ব্যতীত অন্য কাহারও ভিতরে প্রবেশ স্বভাবতঃই নিষিদ্ধ হইল। উপাসক-মণ্ডলী বাহিরে দাঁড়াইয়া মন্দির-দ্বার দিয়া বিগ্রহ দর্শন করিত। এই সব জনমণ্ডলীর বসিবার জন্য ক্রমশঃ মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে চত্বর প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হইল, এবং এই

শিল্প-কৌশলের উন্নতির সহিত
মন্দির-শিখরের উচ্চতা-বৃদ্ধি

সকল দর্শকগণকে রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য চত্বরের আচ্ছাদন স্বরূপ কতিপয় স্তম্ভের উপর ছাদ নির্ম্মিত হইয়া ইহা অবশেষে বারান্দায় পরিণত হইল। স্থপতি-বিদ্যার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গেই ভাস্কর্য্যের দিকেও লোকের দৃষ্টি পড়ায় মন্দির ও স্তম্ভগাত্র খোদিত চিত্র দ্বারা বিচিত্রিত হইল। মন্দিরের উল্লিখিত শিখরটীর চতুঃপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখরগুলি কেবল মাত্র শোভাবর্দ্ধনের নিমিত্তই সন্নিবেশিত হইল। বিকশিতদল পদ্মের ও লতাপাতার চিত্র খোদিত করিয়া মন্দিরের ভিতরের ও বাহিরের শোভা বর্দ্ধনের চেষ্টা চলিতে লাগিল, এবং মন্দিরের ভিতরকার প্রাচীরগাত্রে রঙীন চিত্র অঙ্কন আরম্ভ হইল। গম্বুজের উপর খোদাই নক্সা দ্বারা ও তাহা নানা আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া সুদৃশ্য করা হইল। মন্দিরের বাহিরের দ্বারমণ্ডপের বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। চারিটী অনাবৃত স্তম্ভের পরিবর্ত্তে খিলানের প্রবর্ত্তনে উহা আরও সুদৃশ্য হইল। কিছুকাল পরে এই উন্মুক্ত দ্বারমণ্ডপকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করিয়া উহাকে দ্বার-প্রকোষ্ঠে পরিণত করা হইল।

এই সময়ে চতুর্দ্দিকেই সংস্কারের কার্য্য অতি দ্রুতবেগে আরম্ভ হইল। মন্দিরগাত্রে, স্তম্ভে ও শিখরের উপরকার খোদাইকরা নক্সা ইত্যাদি সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইতে লাগিল, মন্দিরগুলিও তদনুরূপ গঠন-নৈপুণ্যে সুদৃশ্য হইতে লাগিল। একটী দ্বারপ্রকোষ্ঠের চতুর্দ্দিকে প্রয়োজনানুযায়ী আরও একটী দুইটী করিয়া দ্বারমণ্ডপ সংযোজিত হইল। কোনও কোনও মন্দিরের দ্বারমণ্ডপগুলি শিখর-জাতীয় মন্দিরের সমষ্টি বলিয়া মনে হয়, কারণ প্রত্যেকটীই এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের আকারে তৈয়ারী, এবং স্তরে স্তরে পরস্পরের সহিত সংলগ্ন থাকিয়া পরিশেষে মন্দিরগাত্রে গিয়া সমাপ্ত হইত। কোন কোনগুলির উপর গম্বুজও থাকিত আবার কোন কোন স্থলে মণ্ডপশ্রেণী মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ আঙ্গিনা বেষ্টন করিয়া নির্ম্মিত হইত এবং প্রবেশদ্বার সুদৃশ্য তোরণ-যুক্ত থাকিত। সকল মন্দির নির্ম্মাণে যে একই নির্দ্দিষ্ট ধারা অবলম্বিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না, তবে প্রধানতঃ এই প্রথাই যে প্রকৃষ্ট বলিয়া ধরা হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তৎকালীন রাজা মহারাজারাই এই সব মন্দির নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করিতেন। এই সব পুরাতন মন্দিরের অনেকেরই আজকাল আর অস্তিত্ব নাই। কোন কোন মন্দির পরিত্যক্ত হওয়ায় জীর্ণ-সংস্কারের অভাবে ধ্বংশপ্রাপ্ত হইয়াছে, কোন কোন মন্দির মুসলমানরা ধ্বংস করিয়াছে, আবার কোন কোনও স্থলে ধনীরা প্রাসাদ নির্ম্মা-নের সময় প্রস্তরের প্রয়োজন হওয়ায় মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়াছে।

প্রাচীন মন্দিরের অধিকাংশই অতি দুর্গম স্থানে অথবা লোকালয় হইতে বহু দূরে অবস্থিত, সেই জন্য অনেকেই সেই সব স্থানে কষ্ট স্বীকার করিয়া যাইতে সক্ষম হন না। উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের মন্দির উত্তর ভারতীয় প্রাচীন মন্দিরের অন্যতম। হিন্দুর নিকট অতি পবিত্র ভুবনেশ্বরের হ্রদের চতুঃপার্শ্বে এক সময়ে সাতহাজার ক্ষুদ্র বৃহৎ মন্দির ছিল, তন্মধ্যে কয়েক শত মাত্র বর্ত্তমান আছে, তাহাদেরও অধি-কাংশই ধ্বংসোন্মুখ, কিন্তু এই সব মন্দির হইতে খ্রীষ্টীয় সপ্ত শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ের মন্দির নির্ম্মা-নের কৌশল ও ক্রমবিবর্ত্তনের যথেষ্ট মূল্যবান ইতিহাস আমরা সংগ্রহ করিতে পারি। সর্ব্ব প্রথমে মন্দিরগুলির শিখর অতিশয় নিম্ন ও স্থূলকায় ছিল। অনাবৃত মণ্ডপ-শ্রেণীর পরিবর্ত্তে প্রাচীর বেষ্টিত সঙ্কীর্ণ দ্বার প্রকোষ্ঠই দৃষ্টি-গোচর হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দিরগুলির শিখরের উচ্চতা সর্ব্ব প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাচীরগুলি প্রায় একেবারে ঋজু ভাবে উঠিয়া কেবল মাত্র উপরে গিয়া বাঁকি-য়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর মন্দিরের মধ্যে আমরা গঠন সৌষ্ঠব ও ভাস্কর্য্যের নিপুণতা দেখিতে পাই। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে 'বড় মন্দির' নামে যে একটা মন্দির আছে তাহাকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিদ্বজ্জনেরা পুরাতন মন্দিরের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা খ্রীষ্টীয় ৬১৭ হইতে ৬৪৭ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার শিখরের উচ্চতা ১৮০ ফুট্ এবং ইহার এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থানও খোদাই ও নক্সার কাজ হইতে বাদ পড়ে নাই।

উড়িষ্যার আরও একটী মন্দিরের বিশেষ খ্যাতি আছে, উহা কোণারকের মন্দির। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে ইহার

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

ভুবনেশ্বরের সুবিখ্যাত মন্দির
আকারে এবং প্রকারে ক্রমোন্নতি

শিখরটী ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, তবে মণ্ডপটী এখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আছে ইহার প্রাচীরগুলি অতিশয় উচ্চ, প্রায় ১৩৮ ফুট্। এই সব উপাদান হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে ঐ শিখরের উচ্চতা প্রায় ২০০ ফুট্ ছিল। মন্দির নির্ম্মাণের সময় ৩০।৪০ মাইল দূর হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর আনিয়া পরে উহাকে ভূমি হইতে ২০০ ফুট্ উচ্চে কি করিয়া যে কারীগরগণ উত্তোলন করিয়াছিল তাহা আমরা ধারণাও করিতে পারিনা। মন্দিরগাত্রে চক্রের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে। এই প্রকারে বৈশিষ্ট্য সচরাচর আমরা অন্য কোনও মন্দিরে দেখিতে পাই না।

গোয়ালীয়ার দুর্গের পার্শ্বে, পর্ব্বতশিখরের উপরিভাগে একটী প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহার মণ্ডপগুলি এখনও পর্য্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় থাকাতে একসময়ে মন্দিরটী যে সুবৃহৎ ও সুন্দর ছিল তাহা অনুমান করা যায়। এটী 'শশবাহুর' মন্দির বলিয়া অভিহিত এবং ১০৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত। মন্দির শিখরের কেবলমাত্র বনিয়াদটী বর্ত্তমানে বিদ্যমান আছে। ইহা ত্রিতল এবং মধ্যবর্ত্তী কক্ষটী গম্বুজাকারের। গম্বুজটীর বিশেষত্ব এই যে উহা সমকেন্দ্রিক বৃত্তাকারের প্রস্তরগুলিকে একটীর উপর একটীকে রাখিয়া সুচারুরূপে নির্ম্মান করা হইয়াছে।

প্রাচীন চাণ্ডেলা রাজধানী বুন্দেলখণ্ডের অর্ন্তগত খাজুরাহোর মন্দিরের গঠনও অতিশয় চমকপ্রদ। ইহা প্রায় ২৮টী মন্দিরের সমষ্টি। মন্দিরগাত্রের লিপি হইতে স্থির করা যায় যে উহা ৯৫০ হইতে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্থানের মন্দির নির্ম্মানের ধারা অন্য স্থান হইতে অনেক পৃথক ও জটিল। সর্ব্ববৃহৎ শিখরটীর পার্শ্বে

বুন্দেলখণ্ডে শিবমন্দির
উত্তর ভারত স্থাপত্যের পরাকাষ্ঠা—
১০৯ ফুট দীর্ঘ, ৬০ ফুট প্রস্থ, ১১৬ ফুট উচ্চ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখর ও গম্বুজ স্তবকের আকারে সন্নিবেশিত, এবং ইহার উপর খোদাইয়ের কাজ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরটীর এক বিষয়ে নূতনত্ব আছে, কারণ ইহা একাধারে বৈষ্ণব, শৈব, জৈন ও হিন্দুদের অর্চ্চনার স্থান। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে সেই যুগের লোকেদের পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা ছিল।

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

জরীন কলম

আফগান মহিষী ও সম্রাটের সফর

সম্রাট আমানুল্লাহ্ ও তাঁহার পত্নী ইয়োরোপ ভ্রমণে বের হয়েছেন। এ কথার মধ্যে বিশেষত্ব কিছু আছে কিনা তা আমদের দরকার নেই এবং অজস্র অর্থব্যয় ও আড়ম্বর অভ্যর্থনার মধ্যে কার স্বার্থ তা নিয়ে আমাদের একটা দুঃসাহসিক কাজ কি করে আফগান মহিষী করতে পারলেন? আর খুসী হয়েছিলেম তাঁর হৃদয়ের বল ও বিবেকনিষ্ঠা দেখে। আজীবন পর্দার পাষাণ-প্রাচীরের অন্তরালে লালিত পালিত হয়ে অম্লানবদনে আবর্জ্জনার মত পর্দাকে দূরে নিক্ষেপ করলেন! শুধু তাই

আফ্গান রাজ-মহিষী ও ফ্রান্সের সমর-সচীব পেইনলিভ্

(সওগাতের সৌজন্যে)

মাথাব্যথার প্রয়োজন নেই। তবে আসল কথা দেশ বিদেশ দেখা সহজে জ্ঞান লাভ করবার একটা পন্থা।

'রয়টার' যে দিন আফগান মহিষীর 'ঘোমটাহারা' হওয়ার সংবাদ দিয়েছিল সে দিন আমরা খুব খুসীই হয়েছিলেম এবং সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যান্বিত না হয়েছিলেম তা নয়। আশ্চর্য্য হয়েছিলেম এই ভেবে যে এত বড় নয় 'গয়ের-মোহররম' [ইসলামিক্ শাস্ত্রানুসারে যে পরপুরুষদিগকে মেয়েরা দেখতে বা ছুঁতে পারে না] পুরুষের মহলে বের হলেন এবং ফরাসী দেশের সুধী ও রাজনীতিজ্ঞ মহলে যথেষ্ট নাম করে ফেললেন। ইয়োরোপ ধারণা করেছিল এক বস্তা মখমল দেখবে, আর সেখানে সাহসিকা আফগান নারীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল।

ভারতীয় মুসলমানগণ এ ঘটনা কিভাবে গ্রহণ করেছেন তা আমরা ঠিক জানি না। তবে তাঁরা যাঁদের দিকে আদর্শের জন্য চেয়ে থাকেন তাঁরা যা করছেন তার অনুসরণ করলেই খুসী হব। তুর্কি যা করচে তা সকলের জানা আছে, আফগান-মহিষী যা করলেন তা জানা গেল।

জরীন কলম

পারিসে আফ্গান-রাজ ও রাজ-মহিষী

(সওগাতের সৌজন্যে)

প্রসঙ্গ কথা

সাহিত্যে সুনীতি

কিছুদিন থেকে বাঙলা দেশে সাহিত্যে শ্লীলতা অথবা অশ্লীলতা নিয়ে একটা প্রবল আন্দোলন চলছে—এত প্রবল যে অশীলতায় অন্য সবরকম আন্দোলনকে অতিক্রম করেছে। গত শ্রাবণ মাসের বিচিত্রায় সাহিত্য-ধর্ম্ম নামে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সেই প্রবন্ধই বর্ত্তমান আন্দোলনের মূল। কিন্তু সেই তুলসী-মূল অবলম্বন ক'রে বেরিয়েচে অশ্বত্থের কাণ্ড, যার শাখা-প্রশাখা থেকে ঝুলেছে অসংখ্য বটের শিকড়। কারো সঙ্গে কারো সঙ্গতির বালাই নেই।

* * * *

সে যাই হ'ক্ মূল প্রশ্নটা এখন দাঁড়িয়েছে—সাহিত্যে নর-নারীর দৈহিক লালসার এবং অস্বাস্থ্যকর ও ঘৃণিত বিষয়-বস্তু এবং পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের স্থান আছে কি-না। এ এমন একটি প্রশ্ন যার অনুরূপ প্রশ্ন হ'তে পারে—মানুষের

দেহে উত্তাপ থাকা ভাল কি-না। ভালো নিশ্চয়ই যদি তা ৯৮-৪ ডিগ্রি কিম্বা তার কাছাকাছি হয়;—১০৭ ডিগ্রি কিম্বা ৯২ ডিগ্রি নিশ্চয়ই ভালো নয়,—কারণ উভয় অবস্থাই দেহ এবং প্রাণের পক্ষে আশঙ্কাজনক। কেউটে সাপের যেটুকু বিষ মুমূর্ষুর লুপ্ত-প্রায় জীবনী-শক্তিকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারে, তারই একটু বেশি পরিমাণ বলিষ্ঠ ব্যক্তির প্রাণ-নাশ করতে সক্ষম। মাত্রা যেখানে প্রধান কথা, নিরপেক্ষ বস্তু-গুণ বিচার সেখানে নিরর্থক।

*　　*　　*

একটি পুরাতন কাহিনী বল্‌লে কথাটা একটু পরিষ্কার হবে। বহু-প্রাচীন কালে কোনো এক দেশে এক চিত্রকর একটি নগ্ন নারী-মূর্ত্তি এঁকেছিল। ছবিটি সাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হ'লে দেশের প্রবীণরা ক্ষেপে উঠ্‌ল;—ঘরে ঘরে আন্দোলন চল্‌ল, কুরুচি যদি এ ভাবে প্রশ্রয় পায় তা হ'লে সুনীতি আর কতক্ষণ টিঁক্‌তে পারবে! দেশ এবার রসাতলে যাবে! ইত্যাদি। ক্রমে তারা এতদূর উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল যে, দল বেঁধে রাজ-দরবারে উপস্থিত হয়ে চিত্রকরের নামে নালিশ করলে; বল্‌লে, "মহারাজ! অমুক চিত্রকর এক অতি অশ্লীল নগ্ন নারীমূর্ত্তি এঁকেছে। তরুণদের কথা ছেড়ে দিন, আমাদেরই সে ছবিতে একবার দৃষ্টিপাত করলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া কঠিন হয়। এর যথোচিত প্রতিবিধান না করলে দেশ উৎসন্ন হবে!" রাজা চক্ষু লাল ক'রে হুকুম দিলেন, "আনো সে ছবি, আর ডাকো সে চিত্রকরকে।" প্রহরীরা চিত্র আর চিত্রকরকে এনে হাজির করলে। বহুক্ষণ ধ'রে নানাভাবে চিত্রখানাকে দেখে রাজা বললেন, "অশ্লীল নিশ্চয়ই। এ ছবি রাজভাণ্ডারে বাজাপ্ত হ'ল, আর চিত্রকরের হ'ল প্রাণদণ্ড।" সে সময়ে প্রাণ অতিশয় সস্তা জিনিষ ছিল, কথায় কথায় প্রাণদণ্ড হ'ত। তখন চিত্রকর যুক্তকরে কাতরভাবে বললে, "মহারাজ! প্রাণদণ্ড হ'ল সেজন্য তত ক্ষোভ নেই, ক্ষোভ এই যে বিনা বিচারে প্রাণদণ্ড হ'ল! আপনার নিষ্কলুষ যশশ্চন্দ্রে কলঙ্কপাত হবে।" ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রাজা বল্‌লেন, "সে কি হে! বিনা বিচারে কেন? আমি তো ভাল ক'রে ছবিটা দেখ্‌লাম। বল ত' আর একবার না হয় ভাল ক'রে দেখি।" চিত্রকর বল্‌লে, "মহারাজ! যে বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ তাঁর দ্বারাই সে বিষয়ের বিচার হওয়া উচিত। কোনো বড় শিল্পীর দ্বারা বিচার হওয়া উচিত ছিল যে এ ছবি অশ্লীল কিনা।" রাজা একটু ভেবে বল্‌লেন, "এ সমীচীন কথা। ডাকো আমার সভা-চিত্রকরকে।" সভা-চিত্রকর উপস্থিত হ'লে রাজা বল্‌লেন, "এ ছবির বিষয়ে তোমার মত ব্যক্ত কর।" চিত্রখানা দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রবীণ শিল্পীর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল; বললে, "মহারাজ! এ ছবির চিত্রকর কে?" চিত্রকরকে দেখিয়ে দেওয়া হল। তার দিকে প্রসন্নমুখে চেয়ে সভা-চিত্রকর বললে, "বেঁচে থাক বাবা! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।" তারপর রাজার দিকে তাকিয়ে বললে, "মহারাজ! আমার অনুরোধ উপযুক্ত পুরস্কার দিয়ে এ ছবিখানি রাজ-চিত্রালয়ে গ্রহণ করা হ'ক। আর আমার অবর্ত্তমানে এই চিত্রকরকে যেন রাজ-চিত্রকর করা হয়।" সবিস্ময়ে রাজা বল্‌লেন, "সে কি কথা! আমি যে অশ্লীল বিচারে চিত্রকরের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছি!" চমকিত হ'য়ে রাজ-চিত্রকর বললে, "মহারাজ! অবিচার হয়েচে—দণ্ড প্রত্যাহার করুন। এ ছবি একেবারেই অশ্লীল নয়,—অনবদ্য! নারী-সৌন্দর্য্যের অনুপম শ্রীটুকু অকলুষ নির্ম্মলতায় প্রকাশ পেয়েছে! এর মধ্যে রক্ত মাংসের স্থূলতা কিম্বা দুঃখ একেবারে নেই। একজন অক্ষম শিল্পীর হাতে পড়লে কত সহজে এ ছবি অশ্লীল হ'ত আমি এখনি দেখিয়ে দিচ্ছি।" ব'লে নিজের শিষ্যদের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "দাও ত' হে, একটা তুলি আর একটু কালো রঙ।" রঙ, তুলি আর সেই ছবিখানা নিয়ে রাজ-চিত্রকর পাশের একটি ঘরে প্রবেশ করল। আসন্ন পরিবর্ত্তনের আশঙ্কায় রাজসভার সকলে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে বসে রইল। একটু পরে ছবিখানা নিয়ে বেরিয়ে এ'সে সকলের সম্মুখে ধ'রে রাজ-চিত্রকর বল্‌লে, "এবার দেখুন, কি রকম হয়েচে।" ছবির দিকে তাকিয়ে সকলে চক্ষু কুঞ্চিত ক'রে চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল, "নিয়ে যাও! নিয়ে যাও! ভয়ানক অশ্লীল!" রাজা চীৎকার ক'রে উঠলেন,

"শীগ্‌গির জল নিয়ে এসো, ধুয়ে ফেলো! রঙ শুকিয়ে গেলে দাগ উঠ্‌বে না!" রাজ-চিত্রকর আর কিছুই করেনি, নগ্ন নারীর ছুটি পায়ে ষ্টকিং পরিয়ে দিয়েছিল। বলা বাহুল্য, চিত্রকরের প্রাণদণ্ড রহিত হয়েছিল।

* * *

নগ্ন সৌন্দর্য্য আঁক্‌তে চান আঁকুন—কিন্তু পায়ে ষ্টকিং পরালে চল্‌বে না; মাংসের স্থূলতাকে অতিক্রম করতে হবে। তার জন্যে চাই সৌন্দর্য্যবোধ, মাত্রাজ্ঞান, প্রণালী-বিচার;—শুধু উপকরণের উৎকর্ষে কিম্বা অপকর্ষে কোনো জিনিষ ভাল-মন্দ হয় না। অনেক সময়ে একই উপকরণে দেব গড়তে বানর গড়া হয়।

* * *

সাহিত্যে দৈহিক লালসার স্থান আছে এই মতবাদের যাঁরা স্বপক্ষে, তাঁদের নামকরণ হয়েছে তরুণ-দল। এই নামের অর্থ-বিষয়ে সমীচীনতার পক্ষে বা বিপক্ষে যাই বলবার থাকুকনা কেন, সুবিধার জন্যে তাঁদের তরুণ ব'লেই উল্লেখ করা যাক। তরুণরা তাঁদের মতবাদের স্বপক্ষে একটা মস্ত যুক্তি দেখান বাস্তবতার। বাস্তবকে উপেক্ষা করলে চলবে না, বাস্তবের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখলে চলবে না, দেহের ক্ষুধার সঙ্গে মনের ক্ষুধাকে ভুললে চল্‌বে না, জীবনে বাস্তব যখন অত খানি জায়গা জুড়ে রয়েছে তখন সাহিত্যের মধ্যেও তাকে স্বীকার করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই মতবাদের অনুরোধে তাঁরা মানুষকে তার সব-রকম শিক্ষা-সংস্কার সামাজিকতা থেকে মুক্ত ক'রে নগ্ন বাস্তবতায় দেখাতে চান। তাঁরা ভাবেন ক্ষুধাই মানুষের মধ্যে একমাত্র বাস্তব, ক্ষুধাকে সংবরণ করে যে শিক্ষা এবং সংস্কার সে একটা মায়া। প্রেমকে তাঁরা বলেন কামের উত্তপ্ত বালুর উপর মরীচিকা। প্রবৃত্তিকে তাঁরা বলেন শক্তি, নিবৃত্তিকে বলেন দুর্ব্বলতা। গতিকে তাঁরা স্বীকার করেন, যতিকে করেন না।

* * *

মানব প্রকৃতির মধ্যে যে আদিম বৃত্তিগুলি বাস করছে তাদের শক্তি যতই প্রবল হোক না কেন, সেই শক্তির সঙ্গে যার যুদ্ধ চলে এবং সন্ধি হয় সেই শিক্ষা এবং সংস্কারের শক্তি ও কম নয়। Habit যদি Second nature হয়—তা হ'লে জন্মার্জ্জিত সংস্কার এবং জীবনার্জ্জিত শিক্ষাকে অত অবহেলা করলে চলবে কেন।

* * *

প্রতিমার ভিতরকার খড় এবং মাটি প্রতিমার পক্ষে একটা খুব বড় রকম সত্য তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু প্রতিমার উপরকার বর্ণ টুকুও প্রতিমার পক্ষে ততোধিক সত্য, ওজনে খড়-কাদার চেয়ে তা যত লঘুই হ'ক। সুন্দরী নারীর কঙ্কালের মধ্যে যত বস্তুই থাক, গঠনের লালিত্যে এবং আকৃতির সৌন্দর্য্যেই তাঁর মহিমা। বাস্তবই যদি গল্প এবং উপন্যাসের প্রধান ব্যাপার হ'ত তা হ'লে পুলিশ কোর্টের মকর্দ্দমার বিবরণগুলিই এক একটি শ্রেষ্ঠ গল্প এবং উপন্যাস হতে পারত। বাস্তব-মাত্রই যদি নির্ব্বিচারে গল্পের উপকরণ হয় ত হ'লে এখনও এমন বহু অকথিত বাস্তব আছে যা ব্যবহার করতে বর্ত্তমান তরুণদল সঙ্কুচিত হবেন, তার জন্যে তরুণতর দলের প্রয়োজন হবে।

পুস্তক সমালোচনা

দখিন হাওয়া—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি, এ, প্রণীত, মূল্য আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানি কবিতা পুস্তক। বইখানি পড়িয়া আমরা সুখী হইয়াছি। সকল কবিতাগুলিরই মধ্যে সহজ কাব্য-শক্তি এবং কাব্যের অবাধ গতি সুপরিস্ফুট। সুমিষ্ট কৌতুক রসের সৃষ্টিতেও লেখকের বেশ শক্তি আছে। উদাহরণস্বরূপ দ্বিতীয় পক্ষ, দুটি দিন এবং অথ স্ত্রীপুরুষসংবাদ উল্লেখ করা যাইতে পারে। ছন্দ এবং মিলের বিষয়েও কবির দৃষ্টি সতর্ক। কাব্য-রসিকেরা বইখানি পড়িয়া সুখী হইবেন।

পর্দ্দা-নশীন—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি, এ, প্রণীত, মূল্য বারো আনা। প্রাপ্তিস্থান—বরেন্দ্র লাইব্রেরী ২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

নয়খানি গল্প লইয়া এখানি একটি গল্প-পুস্তক। পর্দ্দা-নশীন, জগাপিসী, প্রেমযাচাই, ঝিলম্ নদীর তীরে গল্পগুলি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। করুণ এবং কৌতুকরসের অবতারণায় লেখক ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্য সাধনায় এই নবীন লেখক সফলতা লাভ করিবেন বলিয়া আশা হয়।

সঞ্জীবনী—শ্রীবীণাপাণি রায় প্রণীত, মূল্য এক টাকা। প্রকাশক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ৪৪ বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রথমে সঞ্জীবনী নামে একখানি ছোটো উপন্যাস, পরে স্বপ্ন-লব্ধা নামে একটি গল্প। উপন্যাসখানির প্রথম দিকে লেখিকা যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন পরে তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। আখ্যান-বস্তুও ক্রমশঃ নিতান্ত সাধারণ ধারায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। গল্প এবং উপন্যাস রচনা-কৌশলের একটা প্রধান তত্ত্ব হইতেছে 'কি লিখিব' অপেক্ষা 'কি লিখিব না' তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ সুনিশ্চিত অনুভূতি। অত্যুক্তি অথবা পুনরুক্তির দ্বারা পাঠকচিত্তে তন্ময়তা অথবা কৌতুহলের ব্যাঘাত উৎপাদন করিলে কিছুতেই চলিবে না; সুনিপুণ সংযমের পাশে পাঠকের আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। কোন্ কথা কথোপকথনের ভিতর দিয়া ফুটাইতে হইবে এবং কোন্ কথা বর্ণনার দ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে, কোন কথা শুধু ইঙ্গিতে শেষ করিতে হইবে এবং কোন কথা খুলিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে,—এ সকল বিষয়ে সতর্ক বিচার এবং বিবেচনা আবশ্যক।

দ্বিতীয় কথা, উপন্যাস এবং গল্পের মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে সামাজিক অথবা অন্য কোনো সমস্যা এবং তাহার সমাধানের অবতারণা না করাই ভাল। হিন্দী ভাষায় একটা কথা আছে, আধা মুরগী আধা বটের;—কথাটা এ ক্ষেত্রেও খাটে। উপন্যাসের সহিত প্রবন্ধের খানিকটা জুড়িয়া দিলে উপন্যাস এবং প্রবন্ধ উভয়েরই প্রতি অবিচার করা হয়। রসোপভোগের আশায় কোনো স্থানে প্রবেশ করিয়া তথায় শিক্ষকের ভ্রূকুটি এবং বেত্র সঞ্চালন দেখিলে অতি অল্প ব্যক্তিই সন্তুষ্ট হয়। উপন্যাসকে উদ্দেশ্যমূলক করিলে তাহার চিরন্তনতা খর্ব্ব করিয়া তাহাকে স্বল্পায়ু করা হয়।

লেখিকার ভাষা সরস, বর্ণনা-কৌশল মন্দ নহে, কথোপকথনের ধারা চিত্তাকর্ষক। অনাবশ্যক অংশ হইতে মুক্ত হইতে পারিলে উপন্যাসটি ভাল হইত।

বাঙ্গালীর খাদ্য—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী, ভিষগ্‌রত্ন এল, এ, এম, এস প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রাপ্তি স্থান—কলিকাতা বুক ডিপো লিঃ, ২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্টীট্ কলিকাতা।

পুস্তকের নাম হইতেই পুস্তকের বিষয় সূচিত হইতেছে। এই পুস্তকে লেখক আয়ুর্ব্বেদ মতে খাদ্য-তত্ত্ব, দিনচর্য্যা, ঋতুচর্য্যা প্রভৃতি আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহার সহিত ডাক্তারী মতও দেখাইয়াছেন। পুস্তকখানি যে সাধারণ গৃহস্থের উপকারে আসিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বার্ষিক সওগাত—শ্রীযুক্ত নাসির উদ্দীন সম্পাদিত। মূল্য এক টাকা বারো আনা। প্রাপ্তি স্থান সওগাত কার্য্যালয়, ১১ ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

১৩৩৪ সালের বার্ষিক সওগাত। বিষয়-বৈচিত্র্যে ও চিত্র-বৈচিত্র্যে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের এ সাহিত্য-সাধনার প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নারী-প্রসঙ্গে

চৈত্রের 'উদ্বোধনে'র কথা প্রসঙ্গ হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল :—

শূর্পণখার চিত্র দেখে সীতা ভীত হয়ে পড়ায় রামচন্দ্র বলেছিলেন— অয়ি বিপ্রয়োগত্রস্তে! চিত্রমেতৎ!—অয়ি বিয়োগভীতে! এ ছবি— তোমার ভয়ের কোনও কারণ নেই। বন্ধু! তোমারও ভয়ের কোনও কারণ নেই। এই যে গোটাকতক ছোঁড়ায় মিলে নবরসিকদের নকড়া ছকড়া করচে—এর সঙ্গে তাদের family matter এর কোনও সংস্রব নেই—এ সব তাদের শিল্প-সাহিত্যের Hero Heroineদের নিয়েই হচ্চে। তোমরা ত খুব Herbert Spencerএর ভক্ত, তাঁর কথাটা স্মরণ আছে—"আত্মরক্ষার চাইতে দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম"?—বিবেকানন্দের দলেরা এটা খুব মানে। তুমি ত বঙ্কিমবাবুর নাম করলে নাল-ঝোল খেয়ে যাও—বল যে তিনি হলেন নবীন বাংলার সাহিত্য-গুরু।—সেই গুরুরও গুরুঠাকুর হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্তে চার পায়া উপদেশ করেন, (১) স্ত্রীর প্রতিপালন ও রক্ষণের ভার তোমার ওপর। স্ত্রী নিজে আত্মরক্ষণে ও প্রতিপালনে অক্ষম; অতএব তাহা তোমার অনুষ্ঠের কর্ম্ম। স্ত্রীর পালন ও রক্ষা ব্যতীত প্রজার বিলোপ সম্ভাবনা। এজন্ত তৎপালন ও রক্ষণ জন্ত স্বামীর প্রাণপাত করাও ধর্ম্মসঙ্গত। (২) স্বামীর পালন ও রক্ষণ স্ত্রীর সাধ্য নহে; কিন্তু তাঁহার সেবা ও সুখসাধন তাঁহার সাধ্য। তাহাই তাঁহার ধর্ম্ম। অন্ত ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ, হিন্দু-ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ; হিন্দুধর্ম্মে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলিয়াছে। যদি দম্পতি-প্রীতিকে পাশব-বৃত্তিতে পরিণত না করা হয়, তবে ইহাই স্ত্রীর যোগ্য নাম; তিনি স্বামীর ধর্ম্মের সহায়। অতএব স্বামীর সেবা, সুখ-সাধন ও ধর্ম্মে সহায়তা—ইহাই স্ত্রীর ধর্ম্ম।

(৩) জগৎ রক্ষার্থ এবং ধর্ম্মাচরণের জন্ত দম্পতি-প্রীতি। তাহা স্মরণ রাখিয়া এই প্রীতির অনুশীলন করিলে ইহাও নিষ্কাম ধর্ম্মে পরিণত হইতে পারে ও হওয়াই উচিত। নচেৎ ইহা নিষ্কাম ধর্ম্ম নহে।

শিষ্য তখন তত পরিপক্ক হয়নি, সেই জন্তে গুরুঠাকুরের কথায় চুপ করেছিল। এখন নিজের বল বুঝতে পেরে তাল-ঠুকে এসে বললে, গুরু-দেব! 'যুদ্ধং দেহি।' পুরুষ যদি স্ত্রীর গয়না কেড়ে নিয়ে race খেলতে পারে, টাকার জন্তে গরিব কন্যার বাপকে সর্ব্বস্বান্ত করতে পারে, তবে স্ত্রীলোকেরা রঙ্গমঞ্চে বা মেলায় অর্থোপার্জ্জন না করবে কেন? তথা "ধনলোভে পিশাচীরা পুত্র-কন্যা বিক্রয়" নাই করবে কেন? বংশ-মর্য্যাদার ভয়ে যদি পিতা "দেবদাসে"র সর্ব্বনাশ করতে পারে, তবে সেই মর্য্যাদা ভয়ে স্ত্রীলোকও শিশুত্যাগ না করবে কেন? চরণামৃত-ধারিণী সতী ঘরে থাকতেও যদি পরদাররত পুরুষ হয়, তবে "কামুকী কামাতুরা হইয়া" গৃহত্যাগ না করবে কেন? নীতি আওড়ালেই কি হয়—পালন করবে কে? গুরুঠাকুর তার ত কিছুই হদিস্ দিতে পারেন নি? ঐ যে গুরুঠাকুর আর তাঁর যে আদর্শ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, এখনকার নব্য রসিকরা তাঁকেই যে তাদের Theoryর একটা example করে তুলেচে, আর গুরুঠাকুরের চারি পায়া যা পুর্ব্বে আমরা উল্লেখ করেচি—কচ্ কচ্ করে কেটে দিচ্চে। আহুদী যুগের সয়তান বাইবেল পড়েনি কিন্তু এখনকার শয়তানদের ভট্টাচার্য্য মশাইদের চাইতে শাস্ত্রে দখল যে ঢের বেশী! রুশের এক ম্লেচ্ছ নাকি একখানা dictionary করেচে তাতে বেদের কোন্ জায়গায় কোন্ শব্দ কতবার ব্যবহার হয়েচে এবং তাদের অর্থই বা কি—লেখা আছে, আর আমাদের পূজ্যপাদ পণ্ডিত মশাইরা নারায়ণের স্নানে যে কটি বেদের মন্ত্র লাগে তাও জানেন না।

তুমি কি বলতে চাও ধর্ম্ম টর্ম্ম সব উঠিয়ে দিতে হবে? আমি কি তাই বলছি? তবে তোমরা যাকে ধর্ম্ম বল—এই ধর ১নং পারলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস, ২নং দেব-দেবীতে বিশ্বাস ৩নং ঈশ্বরে বিশ্বাস, ৪নং নির্গুণ ব্রহ্মে বিশ্বাস, ৫নং শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধই ধর্ম্ম প্রভৃতি পুবে

নারী প্রসঙ্গে

মত আর (১) কাঁন্টের Religion is morality (নীতিই ধর্ম) (২) ফিক্তের, Religion is knowledge (জ্ঞানই ধর্ম) (৩) সিয়ের মেকরের Religion is absolute dependence on something—(আত্মসমর্পণই ধর্ম) (৪) হেগেলের Religion is or ought to be perfect freedom (সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-লাভই ধর্ম) (৫) মোক্ষ মূলরের Religion is a subjective faculty for the apprehension of the infinite—(অনন্তকে উপলব্ধি করবার বৃত্তিই ধর্ম) (৬) টেলারের Spiritual Beings (লোকাতীত চৈতন্য) (৭) মিলের Strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal (আদর্শের নিমিত্ত আন্তরিকতা) (৮) সীলীর Ecce Homoতে Religion is culture (অনুশীলনই ধর্ম) প্রভৃতি পশ্চিমে মত—এতে আজ কাল আর চিঁড়ে ভেজে না। মানুষ চায় সেই বৃত্তিটি যা মানুষকে দেব ও পশু থেকে পৃথক করে রেখেচে, সেটা হচ্চে—মানুষের মনুষ্যত্ব। সেটার বিকাশ ত্যাগে ও প্রেমে, বুদ্ধে ও চৈতন্যে, একীভূত ভাবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে। যত বড়ই Novelist হোক তার নীতির ধর্ম চির কাল অ-চল রবে, যতই বড়ই কবি হোক তার মর্ম্মের কথায় কেউ বেদনা বোধ করবে না, যতদিন না মানুষ তাদের বাস্তব জীবনে ঐ মনুষ্যত্বের দুটো ধারার শান্তি আস্বাদ না করতে পারবে। নচেৎ চোখ বুজলেই বৃন্দাকুণ্ড!

ধর্ম্মের সঙ্গে যদি সহানুভূতি না থাকে, তবে সে ধর্ম্ম অকেজো হয়ে দাঁড়ায়। মনু মহারাজ বলচেন—

> কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
> যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥
> (১২।১১৩)

যুক্তিহীন শাস্ত্রে ধর্ম্মহানি হয়। এ কথা মেনে নিলেও, সহানুভূতি-রহিত যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মও লোকে মানে না। এই দেখ না, শঙ্কর-ধর্ম্মের চাইতে যুক্তিপূর্ণ ধর্ম্ম মানুষ অদ্যাবধি সৃষ্টি করতে পারেনি, কিন্তু সেই ধর্ম্মারী ব্রহ্মের প্রতীক কুলি-শূদ্রদের যেমন ঘৃণা করে তেমন আর কেউ করে না—এখন তাদের সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মবাদ কে শুনবে? স্মার্ত্ত ত নস্তিতে কসে দম দিয়ে বললেন, বর্ণ-সংকর ভাল নয়,—ভগবান গীতায় বলেচেন। কিন্তু ছেলেমেয়েগুলোর একটা ব্যবস্থা কর যাতে তাদের মধ্যে বর্ণ-সংকর না ঢোকে। পাকা গেরস্ত ছেলের দর এমন চড়িয়ে রেখেচে মেয়ের বাপ তার দিকে তাকাতেই সাহস করে না—বা এক একটা সমাজে ছেলে বা মেয়ের সংখ্যা এত কম যে প্রজাপতির তাড়নায় ব্রাহ্মণের মেয়েকে শূদ্র বর বেছে নিতে হচ্চে বা ছেলেদের নায়ার-বংশের পরিপোষণ করতে হচ্চে। অকেজো ধর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়ে সত্য যুগের এক ব্রাহ্মণ জাতি এখন নাক কতকে এসে দাঁড়িয়েচে, বোধ হয় আর ৫০।৬০ বছর পর ব্রাহ্মণ জাতটাকে Red Indianদের মত Preserve করতে হবে। ঐলুষ কবষ, সত্যকামের মত ব্রাহ্মণ যদি সৃষ্টি না করতে পার ত ব্রাহ্মণ জাতির আর কয়েক শতাব্দীতেই ইতি!

স্মার্ত্তজী ব্যবস্থা দিলেন, বাড়ির বাইরে বেরুলেই নারীকে দুশ্চরিত্রা বলে জানবে, লেখা পড়া একেবারেই শেখাবে না, কিন্তু এমন অবস্থা-চক্রে এসে আমরা পড়েচি যে, ৫০৲ টাকার কেরাণী গোটা ছয়েক মেয়ে নিয়ে শুকদেবের প্রথম শীলটি কিছুতেই মেনে চলতে পারে না—মানতে গেলে হয় অসৎ উপায় আর নয় উপবাস। তাই ডাক্তার-কুল-ধুরন্ধর প্রথম উপায়টাই অবলম্বন করবার জন্যে নভেল লিখেচেন, আর সেকালে বাৎস্যায়নও নাকি ঐ জন্যে কলাবিদ্যে শিক্ষে রাখবার উপদেশ দিয়েচেন—দুর্ভিক্ষাদি অসময়ে-কাজে লাগতে পারে।

ব্যাপারটা কি জান? ব্যবহারিক রাজ্যে যা কিছু আইন কানুন সবই মানুষের করা। 'হিংসা ছাড়া যজ্ঞ হয় না', 'হিংসা কোরো না', 'সতীত্ব' ও 'দ্রৌপদীত্ব' প্রভৃতি মতবাদ সবই কালের ইতিহাসে লেখা আছে। যার যত দিন আয়ু সে তত কাল রাজত্ব করে। সব মতই কতকগুলো মানুষে মিলে যাতে সকলের মঙ্গল হয় এই ভেবেই করে। কিন্তু আইন করবার সময় exception গুলোর কথা একে-বারেই ভুল হয়ে যায়—যেমন জন্মের আইন হিসাবে বেদব্যাস একজন exception, সহানুভূতি ছিল বলে ব্যাসকে religious aristocratদের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছিল, সহানুভূতির অভাবে যবন হরিদাস যবনই রয়ে গেল, তবে এইটুকু দয়া দেখান হল যে গোলকে গিয়ে ঠিক তিনি ব্রজলালের সঙ্গে বিহার করতে পারবেন—সমাজ এ pass-port খানি তাঁর হাতে কৃপা করে তুলে দিয়েছিলেন। যিনি গোলকের অধিপতি তিনি কিন্তু বললেন, "[illegible] পরায়ণঃ।" কে যবন, কে হিন্দু?—নির্ণয় করে মানুষ—[illegible] নয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাই।

একজন intellectual wrestler বললেন, আমি প্রত্যাদেশ পেয়েচি বা ব্রহ্মা বা শিব তাঁকে বলে পাঠিয়েচেন—"এর নাম কাঁটা আর এর নাম পথ।"—এই কাঁটা রাস্তায় ছড়ান রইল, তোমাদের মঙ্গলের জন্যে বলচি, সাবধান! রাস্তায় কাঁটা আছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য যদি—রাস্তাই যদি না বলে দিতে পার, তবে দয়া করে রাস্তায় কাঁটাগুলো ছড়িয়ে রাখলে কেন? দোষের মধ্য দিয়ে যে নির্দ্দোষ শিশু জন্মাল তাকে যদি দয়া করে স্নেহের বক্ষে তুলে নাও তাহলে ত অনেক নরনারী নৃশংস পাপ থেকে বিরত থাকে আর Orphanage খুলে ধর্ম্মও সঞ্চয় করতে হয় না। গঙ্গাস্নান করলে যদি মুসলমান-ধর্ষণের হাত থেকে হিন্দু নারী নিস্তার পেত, তা হলে বাট কোটি হিন্দু কি আজ বাইশ কোটি হোত, না তাদেরই বংশধরেরা আজ বাপ পিতামহের প্রতিমা ভাঙত!

আর একদল বলচেন, পাপ করে যাও ক্ষতি নেই, কিন্তু motiveটা যেন ভাল থাকে। বাপ খেতে পায় না তাই মেয়ে অসৎ বৃত্তি নিয়েচে, ক্ষতি কি? বাঁচাটাই ত আগে। নিষ্ঠুর সমাজের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই তার এই প্রচেষ্টা, এতে দোষ কি? আরে বেকুব! তার বাপকে খেতে না দেওয়া যেমন সমাজের নিষ্ঠুরতা, মেয়েটার অসৎ উপায় অবলম্বন করাটাও ত সমাজের তেমনি নিষ্ঠুরতা। একটা নিষ্ঠুরতার উপশম করিতে গিয়ে যে আর একটা নিষ্ঠুরতাকে বাড়িয়ে দেওয়া হচ্চে—বাপ বাঁচচে বটে কিন্তু মেয়েটা ত মল! একটা নারী দশের উপভুক্ত হলে সেটা কি তার বাঁচা? একটাকে বাঁচাতে গিয়ে আরও দশটাকে যে নারকী করা হোল তার জন্যে দায়ী কে? লেখক?—না—সমাজ? পাপটাকে পুণ্য বলে ধরবার চেষ্টা না করে লেখক যদি রতন ছাপানর খরচটা বাপকে দিতেন তা হলে মেয়েটার প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ করবার জন্যে বই লেখার দরকারই হোত না। তবে হাঁ, ঐ রকম ব্যাপার না ঘটালে উপন্যাসিকের রোজগার হয় না। নইলে কোন্‌টা ভাল—শরীরে অযথা ব্যাধির সৃষ্টি করে সারা ভাল, না—রোগ না হতে দেওয়াই ভাল? [illegible] দয়ার দিকটা উদ্রেক করে বই লিখলেই ত ও-ব্যাধিটার উপশম হতে পারে। মেয়েটা যদি শিক্ষিতা হোত, গৃহস্থ কুলবধূর [illegible] করাটা যদি [illegible] না হোত, তা হলে ত শিক্ষয়িত্রী হয়ে, Nurse হয়ে, [illegible] কাজ করে, Governess হয়ে, তার বাপ [illegible] পারত। [illegible] দ্বারা তার [illegible] হয় [illegible] defend করবার জন্যে বইও লিখতে হয় না।

তুমি কি নরের দুর্ব্যবহারে প্রত্যেক নারীকে তার প্রতিশোধ নেবার জন্যে উত্তেজিত হতে বল?—না—তা বলি না। যাঁরা পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, পুত্রের অযথা লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তাদের কল্যাণে সচেষ্ট, প্রেম ও স্নেহ বিতরণে অকুণ্ঠিত, তাঁরা যথার্থই ধন্যা। তাঁরাই জগন্মাতা, উমার সাক্ষাৎ প্রতীক; তাঁদেরই সংযমে, ত্যাগে, তপস্যায়, জ্ঞানে, প্রেমে প্রাণী-জগতের মধ্যে এই শ্রেষ্ঠ মানব-সমাজ গড়ে উঠেচে। নইলে মানুষ ও পশু দুই এক হয়ে যেত। কিন্তু সে সংযম যখন সকলের সাধ্যায়ত্ত নয় তখন পতিতকে একেবারে ফেলে না দিয়ে তার মনের ব্যাধিটা সারিয়ে তুলে নেওয়াই ভাল। Orphanageএর দরজায় একটা কচি শিশুকে গোপনে ফেলে দিয়ে গেল, ও দেশ হলে কোনও অপুত্রক বাপ মা তাকে নিয়ে গিয়ে নিজের ছেলে করে নিত। সকলের মত ঐ নির্দ্দোষ শিশুরও সমাজে একটা স্থান হোত। আর যেখানে Orphanage নেই সেখানে হত্যা অবশ্যম্ভাবী। আবার যেখানে Orphanage আছে অথচ সমাজ-শাসন অতি তীব্র, সেখানে শিশু বাঁচে বটে কিন্তু চিরকাল তার ললাটে কলঙ্কের চিহ্ন আঁকা থাকে যার জন্যে তাকে বিদ্যালয়ে, সভায়, সমিতিতে, উৎসবে, পারিবারিক জীবনে, সমাজে মাথা নীচু করে রাখতে হয়।—কেন?—কার পাপে? তাই স্বামিজী অনেক ভেবে চিন্তেই বলেছিলেন—যে জাতের ভিতর বিবাহের আদর্শ খুব উঁচু সেখানে গণিকার সংখ্যাও বেশী আবার যে জাতের বিবাহের আদর্শ নেই সেখানে গণিকাও নেই। আমাদের কিন্তু আদর্শ বদ্‌লালে চলবে না, তবে পুরুষদের বেলায় আমরা যে সহানুভূতিটা দেখাই, স্ত্রীলোকদের বেলাও সে সম্বন্ধে ভাববার জন্যে সুধি-সমাজকে আমরা অনুরোধ করি।

নানাকথা

[illegible] অনুগ্রাহক বর্গকে যথা নব-[illegible] করিতেছি। বিচিত্রার নববর্ষ [illegible] নিয়ে আরম্ভ হবে।

[illegible] বর্তমানে অত্যধিক [illegible] পরিশ্রমে তাঁহার শরীর [illegible] ভাল [illegible] পর তিনি [illegible] Lectures) প্রদান করিবেন।

'বিচিত্রা'র পাঠকবর্গের সুপরিচিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটকের লিখিত গীতিনাট্য "শ্রীরাধার অভিসার" কলিকাতার পূর্ণ থিয়েটারে অভিনীত হইতেছে। গীতিনাট্যখানি সুন্দররূপে অভিনীত হইলে যে জনপ্রিয় হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* * * *

শিল্পাচার্য্য অসিতকুমার হালদার শীঘ্রই কলিকাতায় আসিবেন। এখানে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য এবং তাঁহাকে দিয়া দু'একটী প্রবন্ধ পাঠ করাইবার জন্য কলিকাতার সুধী-[illegible] আয়োজন করিতেছেন।

Printed [illegible] Works, 47, Pataldanga Street, Calcutta,
[illegible] Probodh L[illegible] from 51 Pataldanga Street, Calcutta.

দ্বিপ্রহর

শিল্পী—প্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম বর্ষ, ২য় খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ | ষষ্ঠ সংখ্যা

স্বপ্ন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
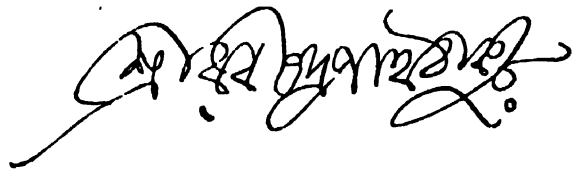
স্বপন পারের ডাক শুনেছি,—
জেগে তাই তো ভাবি
কেউ কখনো খুঁজে কি পায়
স্বপ্ন-লোকের চাবি ?
নয় তো সেথায় যাবার তরে,
নয় তো কিছু পাবার তরে,
নাই কিছু তার দাবী,—
বিশ্ব হ'তে হারিয়ে গেছে
স্বপ্নলোকের চাবি ॥

চাওয়া-পাওয়ার বুকের ভিতর
না-পাওয়া ফুল ফোটে,
দিশাহারা গন্ধে তারি
আকাশ ভ'রে ওঠে।
খুঁজে যা'রে বেড়াই গানে,
প্রাণের গভীর অতল পানে
যে জন গেছে নাবি',
সেই নিয়েছে চুরি ক'রে
স্বপ্নলোকের চাবি ॥

মায়া

আমার মাঝে তোমারি মায়া
জাগালে তুমি কবি।
আঁকিছ মোর জীবনপটে
তব মানস ছবি।
তাপস, তুমি ধেয়ানে তব
কী দেখ মোরে, কেমনে কবো,
আপন রঙে মেঘ-স্বপন
রচনা করো, রবি,
তোমার জটে আমি তোমারি
ভাবের জাহ্নবী ॥

তোমারি সোনা বোঝাই হলো
আমি তো তার ভেলা।
নিজেরে তুমি ভোলাবে ব'লে
আমারে নিয়ে খেলা।
কণ্ঠে মম কি কথা শোনো
অর্থ আমি বুঝি না কোনো,
বীণাতে মোর কাঁদিয়া ওঠে
তোমারি ভৈরবী।
মুকুল মম সুবাসে তব
গোপনে সৌরভী ॥
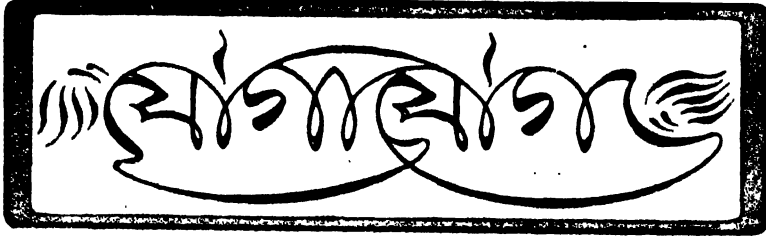
—উপন্যাস—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৮

পরের দিন সকালে মোতির মা যখন কুমুর জন্যে এক বাটি দুধ নিয়ে এল, দেখ্‌লে কুমুর দুই চোখ লাল, ফুলে আছে, মুখের রং হয়েচে পাঁশের মতো। সকালে ছাদের যে-কোণে আসন পেতে পূব দিকে মুখ ক'রে সে মানসিক পূজায় বসে, ভেবেছিল সেইখানেই কুমুকে দেখ্‌তে পাবে। কিন্তু আজ সেখানে নেই, সিঁড়ি দিয়ে উঠেই যে একটুখানি ঢাকা ছাদ, সেইখানে দেয়ালের গায়ে অবসন্ন ভাবে ঠেসান দিয়ে সে মাটিতে ব'সে। আজ বুঝি ঠাকুরের উপরে রাগ করেচে। নিরপরাধ ছেলেকে নিষ্ঠুর বাপ যখন অকারণ মারে তখন সে যেমন কিছুই বুঝতে পারে না—অভিমান ক'রে আঘাত গায়ে পেতে নেয়, প্রতিবাদ করবারও চেষ্টা করতে মুখে বাধে, ঠাকুরের পরে কুমুর আজ সেই রকম ভাব। যে আহ্বানকে সে দৈব ব'লে মেনেছিল, সে কি এই অশুচিতার মধ্যে, এই আন্তরিক অসতীত্বে? ঠাকুর নারীবলি চান ব'লেই শিকার ভুলিয়ে এনেচেন নাকি,—যে-শরীরটার মধ্যে মন নেই সেই মাংসপিণ্ডকে করবেন তাঁর নৈবেদ্য? আজ কিছুতে ভক্তি জাগ্‌ল না। এতদিন কুমু বারবার ক'রে বলেচে, আমাকে তুমি সহ্য করো—আজ বিদ্রোহিনীর মন বল্‌চে, তোমাকে আমি সহ্য করব কি ক'রে? কোন্ লজ্জায় আন্‌ব তোমার পূজা? তোমার ভক্তকে নিজে না গ্রহণ ক'রে তাকে বিক্রি ক'রে দিলে কোন্ দাসীর হাটে,—যে হাটে মাছ মাংসের দরে মেয়ে বিক্রি হয়, যেখানে নির্ম্মাল্য নেবার জন্যে কেউ শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজার অপেক্ষা করে না, ছাগলকে দিয়ে ফুলের বন মুড়িয়ে খাইয়ে দেয়।

মোতির মা যখন দুধ খাবার জন্যে অনুরোধ করলে, কুমু বল্‌লে, "থাক্।"

মোতির মা বল্‌লে, "কেন, থাক্‌বে কেন? আমার দুধের বাটির অপরাধ কি?"

কুমু বল্‌লে, "এখনো স্নান করিনি, পূজা করিনি।"

মোতির মা বল্‌লে, "যাও তুমি স্নান করতে, আমি অপেক্ষা ক'রে থাক্‌ব।"

কুমু স্নান সেরে এল। মোতির মা ভাব্‌লে এইবার সে খোলা ছাদের কোণটাতে গিয়ে বস্‌বে। কুমু মুহূর্ত্তের জন্যে অভ্যাসের টানে ছাদের দিকে যেতে পা বাড়িয়েছিল, গেলনা, ফিরে আবার সেই মাটিতে এসে বস্‌ল। তার মন তৈরি ছিল না।

মোতির মাকে কুমু জিজ্ঞাসা করলে, "দাদার চিঠি কি আসে নি?"

চিঠি খুব সম্ভব এসেচে মনে ক'রেই আজ খুব ভোরে মোতির মা নিজে লুকিয়ে আপিস ঘরে গিয়ে চিঠির দেরাজটা টান্‌তে গিয়ে দেখ্‌লে সেটা চাবি দিয়ে বন্ধ। অতএব এখন থেকে চুরির উপর বাটপাড়ি করবার রাস্তা আটক রইল।

মোতির মা বল্‌লে, "ঠিক বল্‌তে তো পারিনে, খবর নিয়ে দেখব।"

এমন সময় হঠাৎ শ্যামা এসে উপস্থিত; বললে, "বৌ, তোমাকে এমন শুক্‌নো দেখি যে, অসুখ করেনি তো!"

কুমু বললে, "না।"

"বাড়ির জন্যে মনটা কেমন করচে। আহা, তাতো হ'তেই পারে। তা তোমার দাদা তো আসছেন, দেখা হবে।"

কুমু চমকে উঠে শ্যামার মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলে।

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, "এ খবর তুমি কোথায় পেলে, বকুল ফুল?"

"ঐ শোনো! এতো সবাই জানে। আমাদের রান্না-ঘরের পার্ব্বতী যে বললে, ওঁর বাপের বাড়ির সরকার এসেছিল রাজা বাহাদুরের কাছে, বৌয়ের খবর নিতে। তার কাছে শুনেচে, চিকিৎসার জন্যে বৌয়ের দাদা আজকালের মধ্যেই কলকাতায় আস্‌চেন।"

কুমু উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "তাঁর ব্যামো কি বেড়েচে?"

"তা বলতে পারিনে। তবে এমন কিছু ভাবনার কথা নেই, তাহ'লে শুনতুম।"

শ্যামা বুঝেছিল ওর দাদার খবর মধুসূদন কুমুকে দেয়নি, যে-বৌয়ের মন পায়নি, পাছে সে বাড়ি-মুখো হয়ে আরো অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়। কুমুর মনটাকে উস্‌কিয়ে দিয়ে বললে, "তোমার দাদার মতো এমন মানুষ হয় না এই কথা সবার কাছেই শুনি। বকুল ফুল, চলো, দেরি হ'য়ে যাচ্ছে, ভাঁড়ার দিতে হবে। আপিসের রান্না চড়াতে দেরী হ'লে মুস্কিল বাধ্‌বে।"

মোতির মা দুধের বাটিটা আর একবার কুমুর কাছে এগিয়ে নিয়ে বললে, "দিদি, দুধ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে ফেল লক্ষ্মীটি।"

এবার কুমু দুধ খেতে আপত্তি করলে না।

মোতির মা কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, "ভাঁড়ার ঘরে যাবে আজ?"

কুমু বললে, "আজ থাক্‌,—গোপালকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও।"

একটা কালো কঠোর ক্ষুধিত জরা বাহির থেকে কুমুকে গ্রাস করেছে রাহুর মতো। যে পরিণত বয়স শান্ত, স্নিগ্ধ, শুভ্র সুগম্ভীর, এতো তা নয়; যা লালায়িত, যার সংযমের শক্তি শিথিল, যার প্রেম বিষয়াসক্তিরই স্বজাতীয়, তারই স্বেদাক্ত স্পর্শে কুমুর এত বিতৃষ্ণা। ওর স্বামীর বয়স বেশি ব'লে কুমুর কোনো আক্ষেপ ছিল না, কিন্তু সেই বয়স নিজের মর্য্যাদা ভুলেছে ব'লে তার এত পীড়া। সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদন একটা ফলের মতো, আলো হাওয়ায় মুক্তির মধ্যে সে পাকে, কাঁচা ফলকে জাঁতায় পিষলেই তো পাকে না। সময় পেল না ব'লেই আজ ওদের সম্বন্ধ কুমুকে এমন ক'রে মারচে, এত অপমান করচে। কোথায় পালাবে! মোতির মাকে ঐ যে বললে, গোপালকে ডেকে দাও, সে এই পালাবার পথ খোঁজা,—বৃদ্ধ অশুচিতার কাছ থেকে নবীন নির্ম্মলতার মধ্যে, দূষিত নিশ্বাস-বাষ্প থেকে ফুলের বাগানের হাওয়ায়।

একটা পাৎলা তুলো-ভরা ছিটের জামা গায়ে দিয়ে হাবলু সিঁড়ির দরজার কাছে এসে ভয়ে ভয়ে দাঁড়ালো। ওর মায়ের মতোই বড়ো বড়ো কালো চোখ, তেমনিই জল-ভরা মেঘের মতো সরস শাম্‌লা রঙ, গাল দুটো ফুলো ফুলো, প্রায় ন্যাড়া ক'রে চুল ছাঁটা।

কুমু উঠে গিয়ে সঙ্কুচিত হাবলুকে টেনে এনে বুকে চেপে ধরলে; বললে, "দুষ্টু ছেলে, এ দুদিন আসোনি কেন?"

হাবলু কুমুর গলা জড়িয়ে ধ'রে কানে কানে বললে, "জ্যাঠাইমা, তোমার জন্যে কি এনেছি বল দেখি?"

কুমু তার গালে চুমো খেয়ে বললে, "মাণিক এনেচ গোপাল।"

"আমার পকেটে আছে।"

"আচ্ছা তবে বের করো।"

"তুমি বলতে পারলে না।"

"আমার বুদ্ধি নেই, যা চোখে দেখি তাও বুঝতে পারিনে, যা না দেখি তা আরো ভুল বুঝি।"

তখন হাবলু খুব আস্তে আস্তে পকেট থেকে ব্রাউন কাগজের একটা পুঁটুলি বের ক'রে কুমুর কোলের উপর রেখে দৌড়ে পালাবার উপক্রম করলে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"না, তোমাকে পালাতে দেবো না।"

পুঁটুলিটা হাত দিয়ে চাপা দিয়ে ব্যস্ত হয়ে হাবলু বললে, "তাহলে এখন দেখো না।"

"না, ভয় নেই, তুমি চ'লে গেলে তখন খুলব।"

"আচ্ছা জ্যাঠাইমা, তুমি জটাইবুড়িকে দেখেচ?"

"কি জানি, হয়তো দেখে থাকব, কিন্তু চিন্‌তে সময় লাগে।"

"একতলায় উঠোনের পাশে কয়লার ঘরে সন্ধ্যের সময় চামচিকের পিঠে চ'ড়ে সে আসে।"

"চামচিকের পিঠে!"

"ইচ্ছে করলেই সে খুব ছোট্টো হ'তে পারে, চোখে প্রায় দেখাই যায় না।"

"সেই মন্তরটা তার কাছে শিখে নিতে হবে তো।"

"কেন, জ্যাঠাইমা?"

"আমি যদি পালাবার জন্যে কয়লার ঘরে ঢুকি তবুও যে আমাকে দেখতে পাওয়া যায়।"

হাবলু এ কথাটার কোনো মানে বুঝতে পারলে না। বললে, "কয়লার মধ্যে সিঁদুরের কৌটো লুকিয়ে রেখেচে। সেই সিঁদুর কোথা থেকে এনেছে জানো?"

"বোধ হয় জানি।"

"আচ্ছা, বল দেখি।"

"ভোর বেলাকার মেঘের ভিতর থেকে।"

হাবলু থমকে গেল। তাকে ভাবিয়ে দিলে। বিশেষ সংবাদদাতা• তাকে সাগরপারের দৈত্যপুরীর কথা বলেছিল। কিন্তু জ্যাঠাইমার কথাটা মনে হল বিশ্বাসযোগ্য, তাই কোনো বিরুদ্ধ তর্ক না তুলে বললে—"যে মেয়ে সেই কৌটো খুঁজে বের ক'রে সিঁদুর টিপ কপালে পরবে সে হবে রাজরাণী।"

"সর্ব্বনাশ! কোনো হতভাগিনী খবর পেয়েচে না কি?"

"সেজো পিসিমার মেয়ে খুদি জানে। ঝুড়ি নিয়ে ছমু যখন সকালে কয়লা বের করতে যায় রোজ খুদি সেই সঙ্গে যায়—ও একটুও ভয় করে না।"

"ও যে ছেলে মানুষ তাই রাজরাণী হতেও ভয় নেই।"

বাইরে ঠাণ্ডা উত্তরে হাওয়া দিচ্ছিল তাই মোতিকে নিয়ে কুমু ঘরে গেল; সেখানে সোফায় ব'সে ওকে কোলে তুলে নিলে। পাশের তেপাইয়ে ছোট রূপোর থালিতে ছিল শীতকালের ফুল,—গাঁদা, কুন্দ, দোপাটি, জবা। প্রতিদিনের জোগান-মতো এই ফুলই মালির তোলা। কুমু ছাদের কোণে ব'সে সূর্য্যোদয়ের দিকে মুখ ক'রে দেবতাকে উৎসর্গ ক'রে দেবে ব'লে এরা অপেক্ষা ক'রে আছে। আজ তার সেই অনিবেদিত ফুল থালাসুদ্ধ নিয়ে সে হাবলুর কাছে ধরল; বললে, "নেবে ফুল?"

"হাঁ নেব।"

"কি করবে বলো তো?"

"পুজো-পুজো খেলব।"

কুমুর কোমরে একটা সিল্কের রুমাল গোঁজা ছিল, সেইটেতে ফুলগুলি বেঁধে দিয়ে ওকে চুমো খেয়ে বললে, "এই নাও।" মনে মনে ভাবলে, "আমারো পুজো-পুজো খেলা হোলো।" বললে, "গোপাল, এর মধ্যে কোন্ ফুল তোমার সব চেয়ে ভালো লাগে—বলো তো?"

হাবলু বললে, "জবা।"

"কেন জবা ভালো লাগে বলব?"

"বল দেখি।"

"ও যে ভোর না হ'তেই জটাইবুড়ির সিঁদুরের কৌটো থেকে রং চুরি করেছে।"

হাবলু খানিকক্ষণ গম্ভীর হ'য়ে ব'সে ভাবলে। হঠাৎ ব'লে উঠল, "জেঠাইমা, জবাফুলের রং ঠিক তোমার সাড়ির এই লাল পাড়ের মতো।" এইটুকুতে ওর মনের সব কথা বলা হ'য়ে গেল।

এমন সময় হঠাৎ পিছনে দেখে মধুসূদন। পায়ের শব্দ পাওয়া যায়নি। এখন অন্তঃপুরে আসবার সময় নয়। এই সময়টাতে বাইরের আপিস-ঘরে ব্যবসাঘটিত কর্ম্মের যত উচ্ছিষ্ট পরিশিষ্ট এসে জোটে; এই সময় দালাল আসে, উমেদার আসে, যত রকম খুচরো খবর ও কাগজপত্র নিয়ে সেক্রেটারি আসে। আসল কাজের চেয়ে এই সব উপরি কাজের ভিড় কম নয়।

৩৯

যে ভিক্ষুকের ঝুলিতে কেবল তুষ জমেচে চাল জোটেনি, তারই মত মন নিয়ে আজ সকালে মধুসূদন খুব রুক্ষভাবেই বাইরে চ'লে গিয়েছিল। কিন্তু অতৃপ্তির আকর্ষণ বড়ো প্রচণ্ড। বাধাতেই বাধার উপর টেনে আনে।

ওকে দেখেই হাবলুর মুখ শুকিয়ে গেল, বুক উঠ্‌ল কেঁপে, পালাবার উপক্রম করলে। কুমু জোর ক'রে চেপে ধরলে, উঠ্‌তে দিলে না।

সেটা মধুসূদন বুঝতে পারলে। হাবলুকে খুব একটা ধমক দিয়ে বল্‌লে, "এখানে কি করচিস্? পড়তে যাবিনে?"

গুরুমশায়ের আসবার সময় হয়নি একথা বল্‌বার সাহস হাবলুর ছিল না—ধমকটাকে নিঃশব্দে স্বীকার ক'রে নিয়ে মাথা হেঁট ক'রে আস্তে আস্তে উঠে চল্‌ল।

তাকে বাধা দেবার জন্যে উদ্যত হ'য়েই কুমু থেমে গেল। বল্‌লে, "তোমার ফুল ফেলে গেলে যে, নেবে না?" ব'লে সেই রুমালের পুঁটুলিটা ওর সামনে তুলে ধরলে। হাবলু না নিয়ে ভয়ে ভয়ে তার জেঠামশায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মধুসূদন ফস্ ক'রে পুঁটুলিটা কুমুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এ রুমালটা কার?"

মুহূর্ত্তের মধ্যে কুমুর মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল; বল্‌লে, "আমার।"

এ রুমালটা যে সম্পূর্ণই কুমুর, তাতে সন্দেহ নেই,—অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বের সম্পত্তি। এতে রেশমের কাজকরা যে পাড়টা সেও কুমুর নিজের রচনা।

ফুলগুলো বের ক'রে মাটিতে ফেলে মধুসূদন রুমালটা পকেটে পুরলে; বল্‌লে, "এটা আমিই নিলুম—ছেলেমানুষ এ নিয়ে কী করবে? যা তুই?"

মধুসূদনের এই রূঢ়তায় কুমু একেবারে স্তম্ভিত। ব্যথিত মুখে হাবলু চ'লে গেল, কুমু কিছুই বল্‌লে না।

তার মুখের ভাব দেখে মধুসূদন বল্‌লে, "তুমি তো দানসত্র খুলে বসেচ, ফাঁকি কি আমারই বেলায়? এ রুমাল রইল আমারই; মনে থাকবে কিছু পেয়েছি তোমার কাছ থেকে।"

মধুসূদন যা চায় তা পাবার বিরুদ্ধে ওর স্বভাবের মধ্যেই বাধা।

কুমু চোখ নীচু ক'রে সোফার প্রান্তে নীরবে ব'সে রইল। সাড়ির লাল পাড় তার মাথা ঘিরে মুখটিকে বেষ্টন ক'রে নেমে এসেচে, তারি সঙ্গে সঙ্গে নেমেচে তার ভিজে এলো চুল। কণ্ঠের নিটোল কোমলতাকে বেষ্টন ক'রে আছে একগাছি সোনার হার। এই হারটি ওর মায়ের, তাই সর্ব্বদা প'রে থাকে। তখনো জামা পরেনি, ভিতরে কেবল একটি সেমিজ, হাত দুখানি খোলা, কোলের উপরে স্তব্ধ। অতি সুকুমার শুভ্র হাত, সমস্ত দেহের বাণী ঐখানে যেন উদ্বেল। মধুসূদন নতনেত্রে অভিমানিনীকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লে, আর চোখ ফেরাতে পারলে না, মোটা সোনার কাঁকন-পরা ঐ দুখানি হাতের থেকে। সোফায় ওর পাশে ব'সে একখানি হাত টেনে নিতে চেষ্টা করলে—অনুভব করলে বিশেষ একটা বাধা। কুমু হাত সরাতে চায় না—ওর হাত দিয়ে চাপা আছে একটা কাগজের মোড়ক।

মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, "ঐ কাগজে কী মোড়া আছে?"

"জানিনে।"

"জাননা, তার মানে কি?"

"তার মানে আমি জানিনে।"

মধুসূদন কথাটা বিশ্বাস করলে না; বললে, "আমাকে দাও, আমি দেখি।"

কুমু বল্‌লে, "ও আমার গোপন জিনিষ, দেখাতে পারব না।"

তীরের মতো তীক্ষ্ণ একটা রাগ এক মুহূর্ত্তে মধুসূদনের মাথায় চ'ড়ে উঠ্‌ল। বললে, "কী! আস্পর্দ্ধা তো কম নয়।" ব'লে জোর ক'রে সেই কাগজের মোড়ক কেড়ে নিয়ে খুলে ফেল্‌লে—দেখে যে কিছুই নয়, কতকগুলি এলাচ-দানা। মাতার শস্তা ব্যবস্থায় হাবলুর জন্যে যে জলখাবার বরাদ্দ তার মধ্যে এইটেই বোধ করি সব চেয়ে হাবলুর পক্ষে লোভনীয়—তাই সে যত্ন ক'রে মুড়ে এনেছিল।

মধুসূদন অবাক! ব্যাপারখানা কি! ভাবলে, বাপের বাড়িতে এই রকম জলখাবারই কুমুর অভ্যস্ত—তাই লুকিয়ে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আনিয়ে নিয়েছে, লজ্জায় প্রকাশ করতে চায় না। মনে মনে হাস্‌লে ; ভাবলে, লক্ষ্মীর দান গ্রহণ করতে সময় লাগে। ধাঁ ক'রে একটা প্ল্যান মাথায় এলো। দ্রুত উঠে বাইরে গেলো চ'লে।

কুমু তখন দেরাজ খুলে বের করলে তার একটি ছোটো চৌকো চন্দন কাঠের বাক্স, তার মধ্যে এলাচদানাগুলি রেখে তার দাদাকে চিঠি লিখ্‌তে বস্‌ল। দু চার লাইন লেখা হতেই মধুসূদন ঘরে এসে উপস্থিত। তাড়াতাড়ি চিঠি চাপা দিয়ে কুমু শক্ত হ'য়ে বসল। মধুসূদনের হাতে রূপোয় সোনায় মিনের কাজকরা হাতল দেওয়া একটি ফলদানি, তার উপরে ফুলকাটা সুগন্ধি একটি রেশমের রুমাল। হাসিমুখে ডেস্কে সেটি কুমুর সামনে রাখলে। বল্‌লে, "খুলে দেখতো!"

কুমু রুমালটা তুলে নিয়ে দেখে সেই দামী ফলদানিতে কানায় কানায় ভরা এলাচদানা। যদি একলা থাকৃত হেসে উঠ্‌ত। কোনো কথা না ব'লে কুমু গম্ভীর হ'য়ে চুপ ক'রে রইল। এর চেয়ে হাসা ভাল ছিল।

মধুসূদন বল্‌লে, "এলাচদানা লুকিয়ে খাবার কি দরকার? এ'তে লজ্জা কি বলো! রোজ আনিয়ে দেবো—কত চাও? আমাকে আগে বললে না কেন?"

কুমু বল্‌লে, "তুমি পারবে না আনিয়ে দিতে।"

"পারবো না! অবাক করলে তুমি!"

"না, পারবে না!"

"অসম্ভব দাম না কি এর!"

"হাঁ, টাকায় মেলে না!"

শুনেই মধুর মাথায় চট্‌ ক'রে একটা সন্দেহ জাগ্‌ল— বল্‌লে, "তোমার দাদা পার্শেল ক'রে পাঠিয়েছেন বুঝি!"

এ প্রশ্নের জবাব দিতে কুমুর ইচ্ছে হোলো না। ফলদানিটা ঠেলে দিয়ে চ'লে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। মধুসূদন হাত ধ'রে আবার জোর ক'রে তাকে বসিয়ে দিলে।

মধুসূদনকে কোনো কথা বল্‌তে না দিয়েই কুমু তাকে প্রশ্ন করলে, "দাদার বাড়ি থেকে তোমার কাছে লোক এসেছিল তাঁর খবর নিয়ে?"

এ কথাটা কুমু আগেই শুনে ফেলেছে জেনে মধুর মন ভারি বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। বল্‌লে, "সেই খবর দেবার জন্যেই তো আজ সকালে তোমার কাছে এসেচি।" বলা বাহুল্য এটা মিথ্যে কথা।

"দাদা কবে আস্‌বেন?"

"হপ্তা খানেকের মধ্যে।"

মধু নিশ্চিত জান্‌ত কালই বিপ্রদাস আসবে, "হপ্তা-খানেক" কথাটা ব্যবহার ক'রে খবরটাকে অনির্দ্দিষ্ট ক'রে রেখে দিলে।

"দাদার শরীর কি আরো খারাপ হ'য়েচে?"

"না, তেমন কিছু তো শুন্‌লুম না।"

এ কথাটার মধ্যেও একটুখানি পাশ-কাটানো ছিল। বিপ্রদাস চিকিৎসার জন্যই কলকাতায় আস্‌চে—তার অর্থ, শরীর অন্ততঃ ভালো নেই।

"দাদার চিঠি কি এসেচে?"

"চিঠির বাক্সো তো এখনো খুলিনি, যদি থাকে তোমাকে পাঠিয়ে দেবো।"

কুমু মধুসূদনের কথা অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেনি, সুতরাং এ কথাটাও মেনে নিলে।

"দাদার চিঠি এসেচে কি না একবার খোঁজ করবে কি?"

"যদি এসে থাকে, খাওয়ার পরে দুপুর বেলা নিজেই নিয়ে আসব।"

কুমু অধৈর্য্য দমন ক'রে নীরবে সম্মত হ'ল। তখন আর একবার মধুসূদন কুমুর হাতখানা টেনে নেবার উপক্রম করচে এমন সময় শ্যামা হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকেই ব'লে উঠ্‌ল, "ওমা, ঠাকুরপো যে!" ব'লেই বেরিয়ে যেতে উদ্যত।

মধুসূদন বল্‌লে, "কেন, কি চাই তোমার?"

"বউকে ভাঁড়ারে ডাকৃতে এসেচি। রাজরাণী হলেও ঘরের লক্ষ্মী তো বটে। তা আজ না হয় থাক।" মধুসূদন সোফা থেকে উঠে কোনো কথা না ব'লে দ্রুত বাইরে চ'লে গেল।

আহারের পর যথারীতি শোবার ঘরের খাটে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পান চিবতে চিবতে মধুসূদন কুমুকে ডেকে পাঠালে। তাড়াতাড়ি কুমু চ'লে এল। সে জানে আজ দাদার চিঠি পাবে। শোবার ঘরে ঢুকে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

মধুসূদন গুড়গুড়ির নলটা রেখে পাশে দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লে, "বোসো।"

কুমু বস্‌ল। মধুসূদন তাকে যে-চিঠি দিলে তাতে কেবল এই কয়টি কথা আছে—

প্রাণপ্রতিমাসু

শুভাশীর্ব্বাদরাশয়ঃ সন্তু

চিকিৎসার জন্য শীঘ্রই কলিকাতায় যাইতেছি। সুস্থ হইলে তোমাকে দেখিতে যাইব। গৃহকর্ম্মের অবকাশ মতো মাঝে মাঝে কুশল সংবাদ দিলে নিরুদ্বিগ্ন হই।

এই ছোট চিঠিটুকু মাত্র পেয়ে কুমুর মনে প্রথমে একটা ধাক্কা লাগ্‌ল। মনে মনে বল্‌লে, "পর হয়ে গেছি।" অভিমানটা প্রবল হ'তে না হ'তেই মনে এল "দাদার হয়ত শরীর ভালো নেই, আমার কী ছোট মন! নিজের কথাটাই সব আগে মনে পড়ে!"

মধুসূদন বুঝ্‌তে পারলে কুমু উঠি উঠি করচে; বল্‌লে, "যাচ্চ কোথায়, একটু বোসো।"

কুমুকে ত বস্‌তে বল্‌লে, কিন্তু কি কথা বল্‌বে মাথায় আসে না। অবিলম্বে কিছু বল্‌তেই হবে, তাই সকাল থেকে যে কথাটা নিয়ে ওর মনে খট্‌কা রয়েচে সেইটেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। বল্‌লে, "সেই এলাচদানার ব্যাপারটা নিয়ে এত হাঙ্গামা করলে কেন? ওতে লজ্জার কথাটা কী ছিল!"

"ও আমার গোপন কথা।"

"গোপন কথা! আমার কাছেও বলা চলে না?"

"না।"

মধুসূদনের গলা কড়া হ'য়ে এল, বললে, "এ তোমাদের নূরনগরী চাল, দাদার ইস্কুলে শেখা।"

কুমু কোনো জবাব করলে না। মধুসূদন তাকিয়া ছেড়ে উঠে বস্‌ল, "ঐ চাল তোমার না যদি ছাড়াতে পারি তাহ'লে আমার নাম মধুসূদন না।"

"কী তোমার হুকুম, বলো।"

"সেই মোড়ক কে তোমাকে দিয়েছিল বল।"

"হাবলু।"

"হাবলু! তা নিয়ে এত ঢাকাঢাকি কেন?"

"ঠিক বল্‌তে পারিনে।"

"আর কেউ তার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েচে?"

"না।"

"তবে?"

"ঐ পর্য্যন্তই; আর কোনো কথা নেই।"

"তবে এত লুকোচুরি কেন?"

"তুমি বুঝতে পারবে না।"

কুমুর হাত চেপে ধ'রে ঝাঁকানি দিয়ে মধু বল্‌লে, "অসহ্য তোমার বাড়াবাড়ি!"

কুমুর মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল, শান্তস্বরে বল্‌লে, "কি চাও তুমি, বুঝিয়ে বলো। তোমাদের চাল আমার অভ্যেস নেই সে কথা মানি।"

মধুসূদনের কপালের শির দুটো ফুলে উঠ্‌ল। কোনো জবাব ভেবে না পেয়ে ইচ্ছে হ'ল ওকে মারে। এমন সময় বাইরে থেকে গলা-খাঁকারি শোনা গেল, সেই সঙ্গে আওয়াজ এল, "আপিসের সায়েব এসে ব'সে আছে।" মনে পড়ল আজ ডাইরেক্টরদের মীটিং। লজ্জিত হ'ল যে সে এজন্যে প্রস্তুত হয় নি—সকালটা প্রায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ গেছে। এত বড়ো শৈথিল্য এতই ওর স্বভাব ও অভ্যাস-বিরুদ্ধ যে, এটা সম্ভব হ'ল দেখে ও নিজে স্তম্ভিত।

(ক্রমশঃ)

ভারত রোমক সমিতি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

১

আমাদের এই Indo Latin সমিতি আজ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করলে। এ সমিতিকে যে আমরা এক বৎসর বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পেরেছি এ আমাদের কম কৃতিত্বের কথা নয়। কারণ এ জাতীয় সমিতি এ দেশে বড় বেশি দিন টেঁকে না পাঁচজনের সহানুভূতির অভাবে। দেশের লোক যে সব বিষয়ের চর্চ্চা আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য মনে করে, এ সমিতিতে সে সব বিষয়ের কোনরূপ আলোচনা হয় না, আর যে সব প্রচেষ্টার হাত হাত কোনও সুফল অথবা কুফল দেখাতে পারা যায় না কেজো লোকে সে সব প্রচেষ্টাকে বাজে সথ হিসেবেই গণ্য করে।

তবে আমরা যদি মনে করি যে আমাদের এ সমিতি স্থাপনের কোনও সার্থকতা আছে তাহলে অপরের এ সমিতি নিরর্থক মনে করায় কিছু যায় আসে না। সুতরাং আমরা পাঁচজনে কি উদ্দেশ্যে একত্র হয়েছি এবং কি উপায়ে সে উদ্দেশ্য সাধন করতে পারব সে বিষয়ে আমাদের মনে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। তা যে থাকা উচিত সে বিষয়ে আশা করি আমরা সকলেই একমত। আমরা যখন ফরাসী সাহিত্যের ভক্ত তখন যে আমরা clear এবং definite ideaর পক্ষপাতী তা বলাই বাহুল্য।

এখন আমরা হচ্ছি কারা? সে বিষয়ে একটু নজর দেওয়া যাক্। আমাদের সকলেরই ফরাসী ভাষা ও ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে। উপরন্তু আমাদের অনেকেরই ফরাসী দেশের সঙ্গেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় আছে। এবং সে পরিচয়ের ফলে আমরা ফরাসী ভাষা ও ফরাসী জাতির প্রতি অনুরক্ত হয়েছি বই বিরক্ত হই নি; কারণ ফরাসী জাতির সঙ্গে আমাদের সাংসারিক হিসেবে কোনও দেনা পাওনা নেই, ও জাতি আমাদের জমিদারও নয় মহাজনও নয়। অতএব আমাদের পক্ষে মনোজগতে ফরাসী মনের সঙ্গে সখ্যস্থাপন করা স্বাভাবিক ও সহজ। এই অনুরাগ বশতঃই আমরা প্রসন্ন মনে ফরাসী সাহিত্যের চর্চ্চা করতে পারি। এর থেকে কি এই অনুমান করতে হবে যে আমাদের সমিতি হচ্ছে জনকতক ফরাসী সাহিত্যের রস-পিপাসু যুবকের আপান-মণ্ডল মাত্র? আমার বিশ্বাস তা নয়; কেননা, ও claret একা ঘরে বসেও পান করা যায়, এবং সম্ভবতঃ অসামাজিক অর্থাৎ অপরিমিত মাত্রায়।

২

প্রথমতঃ এ সমিতির নামের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্।—Indo Latin সমাসটির বাঙ্গলা হচ্ছে ভারত রোমক সমিতি। এ সমাসের অর্থ মস্ত ফলাও। কিন্তু আমরা এর একটি সঙ্কীর্ণ অর্থেরই উপর আমাদের এ সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেছি। বাঙালী মনকে ফরাসী মনের সঙ্গে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আর ভারত বলতে যে আমরা ছেরেফ বাঙলা বুঝি তার চাক্ষুষ পরিচয় একবার আমাদের দিকে যিনি তাকিয়ে দেখবেন তিনিই পাবেন।

তারপর ইউরোপে যে সকল ভাষা ল্যাটিনের অপভ্রংশ ব'লে গণ্য সে সকল ভাষার চর্চ্চা করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়; একমাত্র ফরাসী সাহিত্যচর্চ্চা করবার দিকেই আমাদের ঝোঁক। এর প্রথম কারণ, ইতালীয়, স্প্যানিস, পর্ত্তুগিজ, রুমেনিয়ান প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে আমাদের অনেকেরই জানাশুনো নেই, আর যদি কারও এদের দু' একটির সঙ্গে থাকে-ত সে উপর উপর মাত্র।

আমি ইতালীয় ভাষা অল্পস্বল্প জানি। ও ভাষা আমি কতদূর আয়ত্ত করেছি তার পরিচয় এই থেকেই পাবেন যে, যে-ক'পাতা বাঙলা পড়তে আমার এক ঘণ্টা লাগে সে-

Indo Latin সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত সভাপতির অভিভাষণ।

'ক'পাতা ইংরেজী পড়তে লাগে দু'ঘণ্টা, ফরাসী চার ঘণ্টা, আর ইতালীয় আট ঘণ্টা। এর কারণ এর চাইতে বেশি ইতালীয় ভাষা শিখতে আমার কখনো লোভ হয় নি, হবার কোনও কারণও ছিল না।

ইতালীয় স্প্যানিস্‌ প্রভৃতিতে উচ্চাঙ্গের কাব্য আছে কিন্তু সে সবই সেকালের, একালের নয়। দান্তে পড়া সংস্কৃত পড়ারই তুল্য কারণ Infernoর কাছে পৌঁছতে হলে তার পূর্ব্বে ইতালীয় ভাষামার্গে অনেক ক্লেশ করতে হয়। সে ক্লেশ করতে আমরা অনেকেই প্রস্তুত নই কারণ আধুনিক ইতালীর সাহিত্য তাদৃশ উজ্জ্বল ও মনোহারী নয়, যার রূপ আমাদের সহজে আকৃষ্ট করতে পারে। আর সে সাহিত্যের ভিতর যা চিত্ত-প্রমাথী তা ফরাসী ছাঁচে ঢালা, যথা D' Annunzioর নাটক নভেল। ল্যাটিন জাতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে একমাত্র ফরাসী সাহিত্যই বর্ত্তমানে যথার্থ ঐশ্বর্য্যবান। সুতরাং ফরাসী ভাষার জ্ঞানলাভ করা শিক্ষিত লোক মাত্রেরই কর্ত্তব্য এবং আমার বিশ্বাস Romance ভাষাগুলির মধ্যে এই ভাষাই বিদেশীদের পক্ষে আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ, অন্ততঃ সেই সব বিদেশীদের পক্ষে ইংরাজী ভাষা যাঁদের কণ্ঠস্থ।—সুতরাং ফরাসী ভাষা শেখা যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য এবং তা শেখা যে কষ্টকর নয়, এ ধারণা পাঁচজনের মনে জন্মে দেওয়াটাও আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য; অন্তত আমি তাই মনে করি।

৩

সাহিত্য ছেড়ে দিয়ে অপর কোনও বিদ্যার যাঁরা চর্চ্চা করেন, যথা দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি, তাঁরা এ বিষয়ে সকলেই একমত যে ও সকল শাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞান লাভ করবার জন্য আমাদের সকলেরই জার্ম্মান ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ একমাত্র ইংরাজী ভাষার মারফৎ ও-সব শাস্ত্রের সম্যক চর্চ্চা করা যায় না। তা যে যায় না তার একটি কারণ ও-সব শাস্ত্রের ফরাসী ও জার্ম্মান সকল পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ নেই। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে—মূল ও অনুবাদ এক জিনিষ নয়।

বিজ্ঞান আমার অধিকারবহির্ভূত, সুতরাং বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনুবাদের সঙ্গে মূল গ্রন্থের কি প্রভেদ আছে সে সম্বন্ধে কোনও কথা বল্‌তে পারিনে। তবে যেহেতু দর্শনও একরকম সাহিত্য, সুতরাং হেগেল অথবা Bergsonএর মূল গ্রন্থ যে এক এবং তার অনুবাদ যে আর, সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে জার্ম্মান ভাষা আমার নিকট সম্পূর্ণ অবিদিত তবুও জার্ম্মান হেগেল ও ইংরাজী হেগেল যে যমজ ভ্রাতা নয় একথা সাহস করে বলতে পারি।

জনৈক ফরাসী দার্শনিক বলেছেন যে তিনি কখনও হেগেলের মতের বিচার করেন নি, তার কারণ তিনি হেগেলের মূল গ্রন্থ সব অতি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছেন। তার থেকে তাঁর ধারণা হয়েছে যে হেগেলের লেখা অন্য ভাষায় অনুবাদ করলে তার সুধু অস্থি রক্ষা করা যায়, কারণ অনুবাদকের লেখনীস্পর্শে হেগেলের রক্ত মাংস ঝ'রে পড়ে। আর হেগেলদর্শনের হাড়ের মূল্য বেশি নয়—তার গভীর প্রাণের পরিচয় ঐ রক্তমাংসেই পাওয়া যায়। এ কথায় আমি বিশ্বাস করি। Bergsonএর ফরাসী লেখার সঙ্গে তার ইংরাজী অনুবাদের প্রচুর প্রভেদ আছে। Bergson মূলে কাব্য ও অনুবাদে বিজ্ঞান।

সে যাই হোক্ অনূদিত সাহিত্য যে রূপলাবণ্যহীন সাহিত্য সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। শুনতে পাই এযুগের একটি মাত্র বড় লেখক আছেন যাঁর রচনা একমাত্র অনুবাদেই রূপ লাভ করে এবং তাঁর নাম Roman Roland। কিন্তু দুঃখের বিষয় সকল ফরাসী লেখক Roman Rolandর সহোদর নন্, সুতরাং তাদের রচিত সাহিত্য অনুবাদে পড়লে আমরা সুধু দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে বাধ্য হব।

৪

আমার জ্ঞান হয়ে অবধি ইউরোপীয় মনোভাবের সঙ্গে স্বদেশী মনোভাবের মৌলিক প্রভেদের কথা শুনে আস্‌ছি, যদিচ স্বদেশী মনোভাবটা যে ঠিক কি, তা এ যুগে কেউ স্পষ্ট করে প্রকাশ করেন নি। অপর পক্ষে বহু ইউরোপীয়দের ধারণা যে আমরা যে সব মনোভাব প্রকাশ করি তা'ইউ-

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

রোপীয়ও নয়, ভারতবর্ষীয়ও নয়, পুরোপুরি ইংরাজী। এ ধারণা ইউরোপীয়দের মনে এতটা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে যে রবীন্দ্র নাথের মন Anglo-Saxon কিনা তা নিয়ে সেদেশে মহা তর্ক ওঠে। Belloni নামক জনৈক ইতালী দেশের সংস্কৃতের অধ্যাপক ইউরোপীয়দের মন থেকে এই অদ্ভুত সন্দেহ দূর করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা লিখেছেন। তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে উপনিষদ থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথের কাব্য পর্য্যন্ত সবই একই জাতীয় মন থেকে উদ্ভূত হয়েছে। নচেৎ রবীন্দ্রনাথ যদি Anglo-Saxon মনের পরিচয় দিতেন তাহলে ইউরোপীয়দের সে সাহিত্য চর্চ্চা করবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কারণ Anglo-Saxon আত্মার রূপ ইউরোপীয়দের কাছে সুপরিচিত। Anglo-Saxon মন নাকি একটি বিশেষ জাতীয় মন, সামান্য মানব মন নয়। সে মন যতটা সুস্থ ততটা সুন্দর নয়, যতটা সবল ততটা সচল নয়, এবং অপর মনের উপর তার যতটা প্রভুত্ব আছে, ততটা সখ্য নেই। এ মন অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ।

একথা শুনে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, ইউরোপের এক জাতের সাহিত্যের সঙ্গে অপর আর এক জাতের সাহিত্যের কি আকাশপাতাল প্রভেদ, ও সবই কি এক ছাঁচে ঢালা নয়? তাহলে বলি ইউরোপীয় সাহিত্য মাত্রই সেই হিসেবে এক ছাঁচে ঢালা যে হিসেবে স্ত্রীলোক মাত্রই এক ছাঁচে ঢালা; অর্থাৎ তাদের সবারই নাক আছে চোখ আছে কান আছে ঠোঁট আছে, আর এই সব উপাঙ্গের মাপ-জোখের ফের-ফেরে তাদের মোহিনী শক্তির প্রচুর প্রভেদ হয়।

আমি এ কথাটি উল্লেখ করলুম এই জন্য যে ইংরাজী মনোভাব যে একমাত্র পাশ্চাত্য মনোভাব তা মোটেই নয়, সুতরাং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনোভাবের ভিতর আমরা না ভেবে চিন্তে যে দাঁড়ি টানি সেটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। আর একথাটাও সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমাদের বর্ত্তমান মনের উপর ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শনের প্রভাব এত বেশি যে সে প্রভাবের ফলে আমরা আত্মহারা হয়ে পড়েছি। আমরা যখন ইংরাজী সভ্যতার নিন্দা করি তখন সত্য সত্য যা করি তা হচ্ছে সে সভ্যতার অতি-প্রশংসা। কারণ সে নিন্দার মূলে থাকে ইংরাজদের কাছে ষোলআনা ধারকরা বিলেতি মন। Imitation is the sincerest form of flattery এ হচ্ছে ইংরাজদেরই কথা।

ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি আমার যথেষ্ট অনুরাগ ও ভক্তি দুইই আছে, আর আমি মনে করি যে কোন কোনও বিষয়ে ইংরাজী সাহিত্য ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য। তা সত্ত্বেও আমি ফরাসী সাহিত্যের চর্চ্চা করা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক মনে করি, কারণ সে চর্চ্চার প্রসাদে আমাদের ইংরাজী সভ্যতার মোহ কতকটা কেটে যাবে। সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চাতেও তা হবে না, কারণ সংস্কৃত সাহিত্য পুরাকালের। হার্বর্ট স্পেন্সরের প্রভাব থেকে শঙ্কর আমাদের মুক্ত করতে পারবেন না, কারণ শঙ্করকে আমরা নিজের অজ্ঞাতসারে দ্বিতীয় স্পেন্সর বানিয়ে নেব। যেমন আমরা আজকাল গীতা ও Bertrand Ruesslএর প্রতি সমান ভক্তিমান। অপরপক্ষে স্পেন্সরের দাসত্ব হতে আমাদের মনকে মুক্ত করতে পারবেন Bergson। একটা ওষুধের সঙ্গে আর একটা ওষুধ আমরা মেশাই পরস্পরকে নির্বিষ রাখবার জন্য।

৫

বছর দশ পোনেরো আগে Pioneer পত্র একটা অদ্ভুত প্রশ্ন তোলে। Cliveএর পরিবর্ত্তে Duplex যদি জয়লাভ করত, আর ভারতবর্ষ যদি ইংলণ্ডের অধীন না হয়ে ফ্রান্সের অধীন হত, আর আমরা সকলে ইংরাজীর পরিবর্ত্তে ফরাসী ভাষা মুখস্থ করতুম, তাহলে ফরাসী সাহিত্যের প্রভাবে বাঙলা সাহিত্য কি রূপ ধারণ করত?

এক হিসাবে এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারবে না, কারণ যা হয় নি তা হলে কি হত এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ নিরর্থক। কারণ যা হয়নি তা হতে পারত না বলেই হয়নি, এই হচ্ছে ন্যায়ের কথা।

কিন্তু এই বিষয় নিয়ে দেদার কল্পনা খেলানো যায়। শূন্যে মন্দির গড়াও একরকম আর্ট। এবং এ মন্দির নির্ম্মাণ করাও অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ এ ক্ষেত্রে ভিত-পত্তনের

বালাই নেই। ইংরেজী Pioneer পত্রের সম্পাদক যখন বঙ্গসরস্বতীর এহেন মন্দির গড়েছেন তখন বাঙলা সবুজ পত্রের সম্পাদকও ওর জুড়ি মন্দির নিশ্চয়ই গড়্‌তে পারেন, কারণ আমার বিশ্বাস উভয় সম্পাদকেরই ফরাসী বিদ্যা সমান, সুধু বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমি তাঁর চাইতে বেশি ওয়াকিব হাল। উক্ত বাজে প্রশ্নের একটা মনগড়া উত্তর দেবার আমারও লোভ আছে। কিন্তু আজকে সে সব খেয়ালি কথা বলতে আমি প্রস্তুত নই। কারণ শূন্যে মন্দির গড়াও কতকটা পরিশ্রম সাপেক্ষ, কেননা সে মন্দিরের নেই সুধু ভিত বাদবাকী অংশত সবই আছে। এবং তার জন্যও ত মাল মশলা সব সংগ্রহ করতে হয়। সমস্ত ফরাসী সাহিত্য ঘেঁটে সে উপাদান সংগ্রহ করবার সময় আমার হাতে আজ নেই।

এ কথাটা উল্লেখ করলুম এই জন্য যে ফরাসী সাহিত্য যে আমাদের মনের উপর একাধিপত্য করবে তা আমি চাইনে। ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব আমাদের মনের উপর যে পরিমাণ হয়েছে ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব যদি সে পরিমাণ হত, তাহলে আমি হয় একটি Indo German সমিতির মেম্বর হতুম, আর না হয়ত কোন Anglo Indian Societyর। আমি চাই ইউরোপীয় সাহিত্য আমাদের মনকে উস্‌কে দেবে, চেপে নিবিয়ে দেবে না।

৬

আমি যে একালে ফরাসী সাহিত্যের চর্চ্চার পক্ষপাতী তার কারণ আমার বিশ্বাস সে চর্চ্চায় আমাদের লাভ ব্যতিত ক্ষতি নেই। আমাদের মন সে সাহিত্যের একান্ত বশীভূত কখনই হবে না,—কেননা আমরা ইংরাজী শিক্ষিত মন নিয়ে তা পড়ব অর্থাৎ কতকটা শিক্ষিত বিচার বুদ্ধি নিয়ে সে সাহিত্যের চর্চ্চা করব। আমরা ফরাসী সাহিত্যের যতই ভক্ত হইনে কেন, এ কথায় কখনো সায় দিতে পারব না যে Racine Shakespeareএর চাইতে বড় কবি। তা ছাড়া যে সকল লেখকের চরণে ফরাসীরা দিবারাত্র পুষ্পাঞ্জলি দান করছেন, যথা—Stendhal প্রভৃতি, তাঁদের পাদোদক পান করতেও আমরা ইতস্ততঃ করব। এবং তাঁদের গুণগ্রাহী হলে এই পর্য্যন্ত বলব যে ফরাসীদের কাছে এঁরা খুব বড় লেখক, কিন্তু সর্ব্বমানবের কাছে নয়। আর কবি হিসেবে Baudelaire এর Keatsএর সঙ্গে কোন তুলনা হতে পারে এ কথা শুনলে আমরা হেসে উঠব।

অপর পক্ষে গদ্য যে কাকে বলে তা আমরা Montaigne, Pascal, Valteire ও Rousseau পড়লেই বুঝতে পারব। ইংরাজী গদ্য সাহিত্যের সঙ্গে ফরাসী গদ্য সাহিত্যের প্রভেদ যে ধোঁয়াটে তেলের বাতির সঙ্গে বিজলিবাতির প্রভেদ, তা উক্ত সাহিত্য-রাজ্যে প্রবেশ করলেই সকলের চোখে তা পড়্‌বে।

আমাদের সাহিত্যের উপরে উক্ত সাহিত্যের কি সুপ্রভাব হতে পারে তা গত বৎসর একরকম মোটামুটি ভাবে আপনাদের কাছে নিবেদন করেছি। আর লেখক বাদ দিয়ে যদি পাঠকের কথাই ধরা যায় তাহলেও বলি পাঠক মাত্রেই আবিষ্কার করবেন যে উক্ত সাহিত্যের চর্চ্চা করা হচ্ছে বিচার-বুদ্ধিকে সানে চড়ানো। ফরাসী সাহিত্যের আলোয় আমরা অনেক বিষয়ে সূক্ষ্মদর্শী হব, এ আমি মহালাভের কথা মনে করি। কারণ ইংরাজী সাহিত্যের শতগুণের মধ্যে একটি মহাদোষ এই যে তার একান্ত চর্চ্চায় বুদ্ধি মোটা হয়, ফলে আমাদের মুখের ভাষাও ফুলে ওঠে। ফরাসী সাহিত্য আমাদের মনে অন্তত মাত্রাজ্ঞানের জন্ম দেবে।—ও সাহিত্যের প্রভাবে লজিকের মাত্রা অতিক্রম করা আমরা মহাপ্রাণতার লক্ষণ মনে করবনা।

৭

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাক্। ইংরাজের তুলনায় ফরাসীদের মন ঢের বেশি লজিকাল। মাথা গরম লোক পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে আর সম্ভবত ইংলণ্ডের চাইতে ফ্রান্সে ও শ্রেণীর লোক সংখ্যায় বেশি। তবে আমার বিশ্বাস ইংরাজের যত মাথা চড়ে যায় তত সে illogical হয়, অপর পক্ষে ফরাসীর মাথা যত চড়ে যায় সে তত logical হয়, অর্থাৎ যে অবস্থায় ইংরাজের মন দিশেহারা হয় ঠিক সেই অবস্থায় ফরাসীর মন একদিকে সোজা ভাবে তেড়ে চলে,

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

যদিচ সে চলার ফলে শেষে গিয়ে খানায় পড়ে। কারও মন সরল রেখায় সমান পা ফেলে চল্‌ছে দেখলে কার না ভাল লাগে। বিশেষতঃ যখন সে কোথায় যাচ্ছে তার খবর আমরা রাখিনে। লজিকের শেষে সত্য না থাকতে পারে কিন্তু তার অন্তরে সৌন্দর্য্য আছে। ফরাসী মনের এই লজিকাল সরলতা ফরাসী সাহিত্যে দিব্যি ফুটে উঠেছে। ফরাসী সাহিত্যের এ গুণ যার চোখে পড়েছে সে আর মোটা বুদ্ধিকে হৃদয় বলে ভুল করবে না, এবং হৃদয়-চর্চ্চা করছি ভেবে নিজের বুদ্ধিকে ভোঁতা করতেও চেষ্টা করবে না। ইংরাজী সাহিত্যের sentimentalismএর প্রসাদে উক্ত রূপ ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হওয়া আমাদের মত দুর্ব্বল মনের লোকের পক্ষে স্বাভাবিক। ইংরাজ জাতি অবশ্য জীবনে sentimental নয়, সুধু মনে। ফরাসী সাহিত্যের লজিক ইংরাজী সাহিত্যের sentimentalismএর এক রকম antidote। সুতরাং ইংরাজী সাহিত্যের আশৈশব চর্চ্চা যখন আমাদের করতেই হবে তখন আমাদের আত্মার স্বাস্থ্যের জন্য ফরাসী সাহিত্যও চর্চ্চা করা আবশ্যক। জীবনে সম্ভবতঃ ফরাসী জাত sentimental কিন্তু মনে তারা পুরো লজিকাল, এমন কি passionএর লজিকেও তারা বিশ্বাস করে। মানুষের জীবন অতিশয় জটিল কিন্তু তার মন সরল হওয়া উচিত এই হচ্ছে উক্ত মনের ধারণা।

এদেশে লোকে গম্ভীর ভাবে কিছু বলতে উদ্যত হলেই "সত্য শিব সুন্দরের" দোহাই দেয়। এখন এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে ফরাসী সাহিত্য মুখ্যতঃ সত্যের পক্ষপাতী এবং ইংরাজী সাহিত্য শিবের। আর ফরাসীরা যাকে বলে সত্য, ইংরাজরা অনেক সময়ে তাকে বলে অশিব, আর ইংরাজরা যাকে বলে শিব, ফরাসীরা অনেক সময়ে তাকে বলে অসত্য; আর সম্ভবতঃ ফরাসীরা সত্যকেই সুন্দর মনে করে ও ইংরাজরা শিবকেই সুন্দর বলে।

এখন এই দুইই বিভিন্ন মনের সংস্পর্শে এসে আমরা হয়ত সত্য শিব সুন্দরের একটি তৃতীয় ধারণা করতে পারব যার ফলে আমাদের কাছে আত্মার এই ত্রিমূর্ত্তির স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে, আর এ ওর পেটে ঢুকে যাবে না। —একাধিক ভাষাশিক্ষাও আমদের মনের একরকম রক্ষা কবজ।

৮

ইংরাজরা বহুকাল ধরে ফরাসী সাহিত্যের একটি দোষ দেখিয়ে আস্‌ছেন। তাঁদের মতে ফরাসী সাহিত্যের মুখে কিছু বাধে না। কোনও বিষয়ে নীরবতা যদি বাণীর একটি গুণ হয়, তাহলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে ফরাসী সাহিত্য এ গুণে বঞ্চিত। তবে এ কথাও বলা আবশ্যক যে ইংরাজরা ছাড়া ইউরোপের অন্য কোনও জাতি এ জন্য ফরাসী সাহিত্যের প্রতি নাসিকা কুঞ্চিত করেননি, এমন কি জার্ম্মানরাও নয়। যদি এই স্পষ্টভাষিতা ফরাসী সাহিত্যের দোষ হয়, তাহলে সে দোষ ফরাসী সাহিত্যের প্রধান গুণেরই বিকার। আর আমাদের পক্ষেও ইংরাজদের মত শুচিবাতিক গ্রস্ত হবার কোনও সঙ্গত কারণ নেই—কেননা সংস্কৃত সাহিত্যও মুখচোরা নয়, প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যও তা নয়। "ভিন্নরুচির্হি লোকা" লোকের বিভিন্ন রুচির কারণ সুধু দেশের ভেদ নয় কালের ভেদও। আজকের দিনের ইংরাজী সাহিতের রুচি যে ফরাসী সাহিত্যের রুচির চাইতে সুকুমার তা ত মনে হয় না, বরং অনেক ইংরাজী নভেল বাঙালী পাঠকের মনে যে রকম জুগুপ্সা ও লজ্জার উদ্রেক করে সম্ভবতঃ একালের ফরাসী সাহিত্য তাদৃক করে না। একজন ফরাসী সাহিত্যিক হেসে বলেছেন যে "Freud আর কারও কোন উপকার না করুন, ইংলণ্ডের নভেলিষ্টদের মহা উপকার করেছেন। Freudএর দোহাই দিয়ে এখন তারা খারাপ কথা বলে বাঁচছে, এতদিন যে সব কথা তাদের পেটের ভিতর গজগজ করছিল এখন সে সব তারা মন খুলে বলছে, নইলে বেচারারা মনের সব চাপা-কথার অম্লশূলে পেটফুলে মারা যেত।" তবে আসল কথা এই যে আমরা দেশের লোককে যা চর্চ্চা করতে পরামর্শ দেই সে হচ্ছে ফরাসী সাহিত্য অর্থাৎ সে দেশের বড় লেখকদের কাব্য। এ সাহিত্য নোংরা নয়। অবশ্য সে দেশের একজন বড় লেখক আছেন—যাঁর লেখা নোংরামিতে ভরা। কিন্তু Rabelaisএর বই কেউ পড়বে না কেননা তাঁর ভাষা তাঁর

দেশের লোকের পক্ষেই সুবোধ্য নয় আর বিদেশীদের পক্ষে একেবারে অবোধ্য। দু জাতের পাঠক আছেন, এক যাঁরা ষটপদের মত মধুমিচ্ছন্তি আর যাঁরা মক্ষিকার মত ব্রণমিচ্ছন্তি। মক্ষিকার মত যাঁরা ব্রণমিচ্ছন্তি তাঁরা তাঁদের লোভনীয় ব্রণ সব ভাষাতেই পাবেন। কিন্তু আমরা ষট্পদ জাতীয় পাঠকদের সঙ্গে ফরাসী সাহিত্যের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই, চতুষ্পদ জাতীয়দের সঙ্গে নয়। ভাল কথা মাছির কটা পা? চারটে নয়?

৯

আমি এ প্রবন্ধে সাহিত্য শব্দ কোনও সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিনি। এক্ষেত্রে সাহিত্য অর্থে কাব্যও বুঝতে হবে দর্শনও বুঝতে হবে; আর বলা বাহুল্য যে প্রবন্ধও বুঝতে হবে, কেননা প্রবন্ধ হচ্ছে আধা-কাব্য আধা-দর্শন। যথার্থ essay যে উক্তরূপ বর্ণ-সঙ্কর রচনা তা Montaigneএর essaysএর সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন। গত উনবিংশ শতাব্দীতে দুটি ফরাসী সাহিত্যিকের নাম জগদ্বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। Renanও Taine অবশ্য উভয়েই ইতিহাস লিখেছিলেন—কিন্তু তাঁদের রচিত সে ইতিহাস প্রবন্ধমালা মাত্র আর St. Beaveএর সমালোচনা অতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য। আমার বিশ্বাস প্রবন্ধ-সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যে ফরাসীভাষা অতুলনীয়। এবং উক্ত জাতীয় সাহিত্যই পাঠকের মনের উপর বিশেষ করে তার ফরাসী ছাপ রেখে যায়।

ফরাসী দেশের আদি দার্শনিক Descartes বলেছিলেন Cogito Ergo Sum এবং তদবধি ফরাসী জাতি ধরে নিয়েছে যে মানুষের অস্তিত্ব তার চিন্তা-শক্তির উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ যে চিন্তা করে না তার অহং বলে কোনও পদার্থ নেই। অর্থাৎ তার ergo sum বলবার কোনও অধিকার নেই। সম্ভবতঃ এই বিশ্বাস বশতঃই সে দেশের সাহিত্যিকরা জাতীয় চিন্তার ধারা কখনও মরাগাঙ্গে পরিণত হতে দেয়নি। আমারও বিশ্বাস ফরাসী মন যে-মুহূর্ত্তে নিশ্চিন্ত হবে সেই মুহূর্ত্তেই তা নাস্তির কোঠায় পড়ে যাবে। তাই ফরাসী সাহিত্যের স্পর্শে আমাদের মনের ঘুম ভাঙ্গবে এবং তখন আমার স্বপ্ন ও সত্যের প্রভেদ বুঝতে পারব। এ ভেদজ্ঞান থাকা নিতান্ত দরকার; কাজের জন্যও, কাব্যের জন্যও।

এই দেকার্তের শিষ্যরা তাঁদের আদিগুরুর আর একটি মতেও আস্থাবান। উক্ত দার্শনিকের মতে সেই আইডিয়াই সত্য যে আইডিয়া পরিস্ফুট পরিচ্ছন্ন ও পরিষ্কার। এই মতের বশবর্ত্তী হয়ে ফরাসী সাহিত্যিকেরা যুগ যুগ ধরে তাদের আইডিয়া সাকার ও স্বচ্ছ করতে চেষ্টা করে এসেছে। সস্তা ইংরাজী সাহিত্যের Beer পান করে করে আমাদের মন এ যুগে ঘুলিয়ে গিয়েছে; তা যে গিয়েছে তার প্রমাণ দেশের বক্তৃতায় আর লেখায় আমরা নিত্য পাই। ফলে যাঁর মন যত ঘোলা তাঁর আত্মাকে আমরা তত মহৎ মনে করি। সে যাই হোক মনের এ ঘোলাটে চেহারাটা সুদৃশ্য নয়। সুতরাং ফরাসী সাহিত্যের wineএর সাহায্যে আমাদের মনের বিলেতি ময়লা কাটে কি না তাও পরীক্ষা করে দেখা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

১০

ইংরাজী অনুবাদের পরদার ভিতর দিয়ে আমরা Guy de Moupassant, Anatole France প্রভৃতির সরস্বতীর আবছায়া মূর্ত্তি অনেকে দেখেছেন এবং তাই দেখেই তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু Anatole Franceএর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ফরাসী সরস্বতী যে তাঁর সহমরণে গিয়েছেন তা মোটেই নয়। সেদেশে আজও অনেক ছোটবড় লেখক আছেন যাঁরা এ সাহিত্যের নব কলেবর দান করছেন। এঁদের ভিতর অন্ততঃ তিন জন সমগ্র ইউরোপে সুপ্রসিদ্ধ। Gide, Proust ও Valery। এ সভায় বোধ হয় অনেকে উপস্থিত আছেন যাঁদের Valeryর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। Proustএর লেখার ইংরাজী অনুবাদ আছে অপর দু-জনের তা নেই। এসব লেখকের সঙ্গেও আমাদের পাঠক সমাজের কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকা দরকার, অন্ততঃ এই সত্যটি প্রত্যক্ষ করবার জন্য যে ফরাসী সরস্বতী চিরায়ুষ্মতী।

ফরাসী সাহিত্যের আর একটি গুণের কথা উল্লেখ করতে চাই। পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্যকেই ছোট

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বড় মাঝারি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। এখন ছোট ও বড় সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিয়ে যদি মাঝারি সাহিত্যের কথা ধরা যায় ত একথা জোর করে বলা যায় যে অপর দেশের মাঝারি সাহিত্য সব, ফরাসী মাঝারি সাহিত্যের তুলনায় নগণ্য। ফরাসী জাতির বুদ্ধি এতটা পরিষ্কৃত ও রসজ্ঞান এতটা প্রবুদ্ধ যে সে দেশের লেখকদের অরসিকে রস নিবেদন করতে হয় না। ফলে সেদেশে সুলেখক মাত্রই সুরসিক। ফরাসী ভাষার esprit কথার প্রতিবাক্য বাঙলাতেও নেই ইংরাজীতেও নেই। ও হচ্ছে একরকম কথার জলুস, যাতে করে ফরাসী মাঝারি সাহিত্যকেও উজ্জ্বল করেছে। লজিকের গায়ে এ রং অপর কোনও সাহিত্যে প্রায় দেখা যায় না। ও সাহিত্য পড়ে মনে হয় ফরাসী জাতটা সেয়ানা হয়েছে। ফরাসী-সাহিত্যকে এক হিসেবে সামাজিক সাহিত্য বলা যেতে পারে অর্থাৎ যে সাহিত্যে সামাজিক লোকমাত্রেরই অধিকার আছে, সে সাহিত্য কেবলমাত্র দু-চার জন বড় গুণী ও পাকা সমাজদারের একচেটে সাহিত্য নয়। ফলে এ সাহিত্য সকল সমাজের সুহৃদ ও শিক্ষক এবং এই কারণেই এর বাণী হচ্ছে সুহৃদ-সম্মত বাণী, প্রভু-সম্মত বাণী নয়। এই আটপৌরে সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে, ফরাসী ভাষা শিক্ষা করা ব্যতীত উপায়ান্তর নেই। এবং এই সাহিত্যের civilising প্রভাব সমগ্র ইউরোপে স্বীকৃত।

১১

ফরাসী ভাষা ও ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে আমার উক্তি সকল আশা করি আপনাদের কাছে অত্যুক্তি বলে গণ্য হবে না, কেননা আপনারা সকলেই উক্ত ভাষা এবং উক্ত সাহিতের সঙ্গে সুপরিচিত, তাছাড়া বক্তা ও লেখক হিসেবে আমার দোষই এই যে, আমি কোন বিষয়ে উচ্চবাচ্য করতে পারিনে। তারা সুরে আমি কখনোই গলা সাধিনি।

বাঙলার পাঠক সমাজের সঙ্গে ফরাসী সাহিত্যের পরিচয় থাকা যদি নিতান্ত বাঞ্ছনীয় হয়, তাহলে সে পরিচয় করিয়ে দেবার ভার আমাদের নিজের ঘাড়ে কতক পরিমাণে নেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আমাদের সমিতি স্বদেশী সমাজে ফরাসী সাহিত্য প্রচার কার্য্যে অদ্যাবধি হাত দেন নি। অদ্যাবধি আমাদের এ সমিতি একরকম ফরাসী সরস্বতীর গুপ্ত সাধনার চক্র মাত্র হয়েই রয়েছে। ফরাসী ভাষা যাতে আমরা ভুলে না যাই সেই বিষয়েই আমরা সযত্ন হয়েছি, অপরকে তা শিক্ষা দিতে নয়। এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ফরাসী ভাষা চর্চ্চা করার আমি বিশেষ পক্ষপাতী, কেননা কোনও কিছু প্রচার করবার আগে তার সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত হওয়া কর্ত্তব্য। এ সমিতির প্রসাদে আমার নিজেরও একটি মহালাভ হয়েছে। পূর্ব্বে ও ভাষার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় মাত্র ছিল—Indo-Latin Societyর প্রসাদে এখন আমার এ বিষয়ে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়েছে। ফরাসী ভাষা যে সুধু বইয়ে লেখা হয় না, মুখেও বলা হয়, আপনাদের দৌলতে তার সাপ্তাহিক প্রমাণ আমি পেয়েছি। এটি আমার পক্ষে একটি সৌভাগ্যের কথা। কেননা যে ভাষার সাক্ষাৎ আমরা সুধু পুস্তকে পাই আমাদের কাছে সে একরকম মৃত ভাষা।

আমার নিজের কথা ছেড়ে দিলেও—এই সমিতির কাছ থেকে দেশের লোকে ফরাসী সাহিত্যের জ্ঞান লাভ করবার ন্যায্য দাবী করতে পারে। কারণ এ সমিতির সভ্যগণ নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং এঁদের মধ্যে অনেকে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই জীবনের ব্রত করেছেন। সুতরাং এ সমিতি যে, দেশে ফরাসী সাহিত্য প্রচারের ভার নেবেন এরূপ আশা দেশের অন্ততঃ ছাত্র সমাজ করতে পারে।

১২

আমার বিশ্বাস আমরা একাজ করতে পারি সুধু বাঙলা ভাষার মারফৎ। ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু বলবার আছে সে সবই আর পাঁচ জনকে বাঙলায় শোনাতে হবে। দেশে ইংরাজীশিক্ষিত লোক অসংখ্য আছে কিন্তু তাঁদের কাছে বাঙলা সাহিত্য বড় বেশী ঋণী নয়। ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে বেশির ভাগ লোকেরই বাক্ রোধ হয়। ফলে যে শিক্ষা তাঁরা লাভ করেছেন তার ভাগ তাঁরা

দেশের লোককে দিতে পারেন না। এককালে এঁরা বলতেন যে এঁরা বাঙলা লিখতে পারেন না কারণ যে-একমাত্র ভাষা তাঁরা লিখ্‌তে পারেন তার নাম ইংরেজী। আর ভাল করে ইংরাজী শিখতে হলেও নাকি বাঙলা ভুলতে হয়। একথায় অবশ্য আমরা এখন বিশ্বাস করি নে, কারণ নিত্য প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যাঁরা আমাদের নব সভ্য মনের দৈনিক খোরাক যোগান তাঁরা যে ভাষায় লেখেন তা ইংরাজীও নয় বাঙলাও নয়—ও দুয়ের অবৈধ মিলনের একটা অপূর্ব্ব ফল মাত্র; আর সে খিঁচুড়ি যে আমরা দৈনিক গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করি সে সুধু তার অন্তরের প্রচুর পেঁয়াজ-লঙ্কার গুণে।

আপনারা যখন ফরাসী ভাষায় সুশিক্ষিত তখন অবশ্য ওরকম ওজুহাতে সদর্পে স্বভাষা বর্জ্জন করবেন না, কারণ ফরাসী সাহিত্য অপর কোন সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞার প্রশ্রয় দেয় না। তাছাড়া আপনাদের অনেকের হাতেই যে বাঙলা কলম আছে তাও সর্ব্বলোক বিদিত।

যদি মনে করেন ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের বক্তৃতায় কেউ কান দেবে না তাহলে বলি পলিটিক্‌স সম্বন্ধে ফরাসী জাতির মতামত পাঁচ জনকে শোনান যাক্‌। এ যুগের পলিটিক্‌সের বীজমন্ত্রগুলির অর্থাৎ liberty, equality and fraternity প্রভৃতি শব্দের অর্থ যে ফরাসীরা বোঝে, তা কোনও ইংরাজীশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতও অস্বীকার করতে পারবেন না, কারণ ও তিনটি মন্ত্র ফরাসীরাই বিশ্বমানবের কানে দিয়েছে। আর অপর যার কাছেই ওতিনটি হ্রিং ক্রী শ্রীং জাতীয় অর্থহীন শব্দ হোক ফরাসীদের কাছে আজও তা নিরর্থক হয়ে যায় নি। ওতিন কথার টিকাভাষ্যের সেদেশে আর অন্ত নেই; ও তিন সূত্রের পূর্ব্ব মিমাংসা পূর্ব্বে হয়ে গিয়েছে এখন সুরু হয়েছে তার উত্তম মীমাংসা; আর সত্য কথা এই যে ঐ ত্রিমন্ত্রই ফরাসী সাহিত্যের প্রাণ। ঐ তিন বীজ থেকে যে পুষ্পপল্লব সমন্বিত মহা বৃক্ষ জন্মলাভ করেছে তার ফল সর্ব্বমানবের উপভোগ্য, কেননা অমৃতোপম।

ভানুসিংহের পত্রাবলী

৫৭

জাহাজ প্রায় নটার সময় ছাড়ল। সেই আমাদের পুরোনো গঙ্গাতীর—এই তীর ছেলেবেলায় আমাকে কতদিন কি গভীর আনন্দ দিয়েচে। ধীরে ধীরে যখন সেই শান্ত সুন্দর নিভৃত শ্যামল শোভা দেখি আর এই উদার গঙ্গার কলধ্বনি শুনি তখন আমার সমস্ত মন একে আঁকড়ে ধরে—ছোট শিশু যেমন ক'রে মা'কে ধরে। আমি জীবনের কতকাল যে এই নদীর বাণী থেকেই আমার বাণী পেয়েছি, মনে হয় সে যেন আমি আমার আগামী জন্মেও ভুলব না। বস্তুত এই জীবনেই আমার সেই জন্ম কেটে গিয়েচে।

ছেলেবেলায় যখন সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে এই জলস্থল আকাশের মহাপ্রাঙ্গণে আমার খেলা আরম্ভ করেছিলুম, সেই খেলার দিন আজ ফুরিয়ে গেছে। আজ এই বিপুল বিচিত্র মাতৃ-অঙ্গন থেকে বহুদূরে এসেছি। সকালবেলাকার ফুলের সব শিশির শুকিয়ে গেছে—আজ প্রখর মধ্যাহ্নের কর্ত্তব্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করচি। আমার এই কর্ম্মের সঙ্গে পাখীর গান, নদীর কল্লোল, পাতার মর্ম্মর আপনার সুর যোগ ক'রে দিতে পারচেনা—অন্যমনস্ক হয়ে আছি। নীলাকাশের অনিমেষ দৃষ্টি আমার দৃষ্টিতে এসে তেমন অবারিত আত্মীয়তায় মিলচে না, কর্ম্মশালার জানলা-দরজার ফাঁক দিয়ে এই বিশ্বের হৃদয় আগেকার মত তেমন সম্পূর্ণ ক'রে আমার বুকের উপর এসে পড়ে না, মাঝখানে কত রকমের চিন্তার, কত রকমের চেষ্টার ব্যবধান। এইত দেখ্‌চি সেদিনকার লীলালোক থেকে আজকের দিনের কর্ম্মলোকে জন্মান্তর গ্রহণ করেচি, তবু সেদিনকার ভোরবেলায় সানাইয়ের সুরে ভৈরবী আলাপ এখনো ক্ষণে ক্ষণে মনে প'ড়ে মনকে উতলা ক'রে দেয়।

কাল গঙ্গার উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলুম। তখন কেবলি জলের থেকে আকাশ থেকে তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি থেকে এই প্রশ্ন আমার কানে আসছিল, "মনে পড়ে কি?" এবারকার এই দেহের ক্ষেত্র থেকে যখন বেরিয়ে চ'লে যাব, তখনো কি এই প্রশ্ন ক্ষণে ক্ষণে আমার হৃদয়ের উপর হাওয়ায় ভেসে আসবে? এবারকার এই জীবনের এই ধরণীর সমস্ত জন্মান্তর সৌহৃদানি!

কাল দোল পূর্ণিমা গঙ্গার উপরেই দেখা দিল। জাহাজ বালির চরে জোয়ারের অপেক্ষায় রাত্রি সাতটা পর্য্যন্ত আটকে পড়েছিল। সমুদ্রে যদি দোল পূর্ণিমার আবির্ভাব হ'ত তা হ'লেই তার নাম সার্থক হ'ত—তাহলে দোলনও থাকত, আর নীলের সঙ্গে শুভ্রের, সাগরের সঙ্গে জ্যোৎস্নার মিলনও দেখতুম।

আজ ভোরে উঠে দেখ্‌লুম জাহাজ কূলরেখাহীন জলরাশির উপরে ভেসে চলেছে—"মধুর বহিছে বায়।" আজ শনিবার; সোমবারে শুনচি রেঙ্গুনে পৌঁছব। সেখানে দিন দুয়েক সভাসমিতি, অভ্যর্থনা, মাল্য-চন্দন, বক্তৃতা, জনতার করতালিতে আমাকে চেপে মারবার চেষ্টা। তারপরে বোধ হয় বুধবারে কোনো এক সময়ে মুক্তি। ইতি, চৈত্র ১৩৩০।

কলম্বো

৫৮

ভারতবর্ষ ছেড়ে এই খানিকক্ষণ হ'ল সিংহলে এসেছি। কাল সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়বে। আকাশ অন্ধকার। ঘন বাদ্‌লার মেঘ সকালবেলার সোনার আলো গণ্ডূষ ভ'রে

পান করেছে, কেবল তার তলানি ছায়াটুকু বাকি। দেশে থাক্‌লে সকালবেলায় দিনের এই ছায়াবগুণ্ঠন ভালই লাগ্‌ত। ইচ্ছে করত কাজকর্ম্ম বন্ধ ক'রে মাঠের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নরাজ্যে মনটাকে পথহারা ক'রে ছেড়ে দিই, কিম্বা হয়ত গুন-গুন সুরে নতুন একটা গান ধ'রে মেঘদূতের কবির সঙ্গে যথাসাধ্য পাল্লা দিতে বস্‌তুম।

কিন্তু এখানে মনটা বিরাগী, তার একতারাটা কোথায় হারিয়ে গেছে। "গানহারা মোর হৃদয়তলে" এই অন্ধকার যেন একটা স্তূপাকার মূর্চ্ছার মতো উপুড় হ'য়ে প'ড়ে আছে। সুদূর এবং সুদীর্ঘ যাত্রার দিনের মুখে আকাশ থেকে সূর্য্যের আলো দেবতার অভিনন্দনের মতো বোধ হয়। আজ মনে হচ্ছে যেন আমার সেই জয়যাত্রার অধিদেবতা নীরব। গগন-বীণার থেকে যে বাণী পাথেয় স্বরূপ সংগ্রহ করে সমুদ্রে পাড়ি দিতুম সেই আকাশভরা বাণী আজ কোথায়?

কালস্রোতে যে বাড়িতে এসে আছি, এ একজন লক্ষপতির বাড়ি। প্রকাণ্ড প্রাসাদ। আরামে বাস করবার পক্ষে অত্যন্ত বেশি ঢিলে, ঘরগুলোর প্রকাণ্ড হাঁ মানুষকে গিলে ফেলে। যে ঘরে ব'সে আছি তার জিনিষগুলো এত বেশি ফিটফাট্‌ যে মনে হয় সেগুলো ব্যবহার করবার জন্যে নয় সাজিয়ে রাখবার জন্যে। বসবার শোবার আসবাবগুলো শুচিবায়ুগ্রস্ত গৃহিণীর মতো। সন্তর্পণে থাকে, কাছে গেলে যেন মনে মনে স'রে যায়। এই ধনী ঘরের অতিপারিপাট্য এও যেন একটা আবরণের মতো।

আমার সেই তেতালা ঘরের চেহারা মনে পড়ে ত? সমস্ত এলোমেলো। সেখানে শোবার বসবার জন্যে একটুও সাবধান হবার দরকার হয় না;—তার অপরিচ্ছন্নতাই যেন তার প্রসারিত বাহু, তার অভ্যর্থনা। সে ঘর ছোটো, কিন্তু সেখানে সবাইকেই ধরে। মানুষকে ঠিক মত ধরবার পক্ষে হয় ছোট্ট একটি কোণ, নয় অসীম বিস্তৃত আকাশ। ছেলেবেলায় যখন আমি পদ্মার কোলে বাস করতুম, তখন পাশাপাশি আমার দুই রকম বাসাই ছিল। একদিকে ছিল আমার নৌকোর ছোট ঘরটি, আর এক-দিকে ছিল দিগন্তপ্রসারিত বালুর চর। ঘরের মধ্যে আমার অন্তরাত্মার নিশ্বাস, আর চরের মধ্যে তার প্রশ্বাস। একদিকে তার অন্দরের দরজা, আর একদিকে তার সদর দরজা।

(ক্রমশঃ)
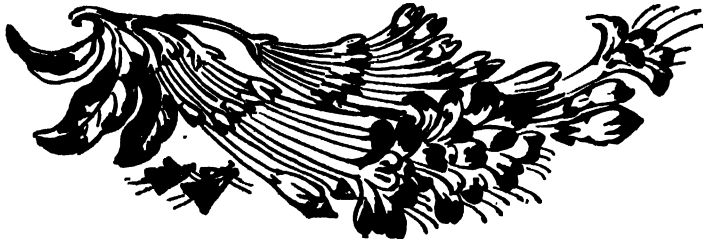
শিক্ষা প্রসঙ্গ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রায় সকলেই আমরা মনে করি যে, অন্ততঃ মোটামুটি ভাবে, শিক্ষার মূল্য কি তা' আমরা জানি।

কিন্তু শিক্ষা ব'লতে সত্য কি বোঝায় তা' যদি পাচ জনে এক সঙ্গে ব'সে আলোচনা করা যায় তো পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই ধারণা বিভিন্ন, একের সঙ্গে অন্যের মত মেলে না।

ঠিক ক'রে না বুঝে বুঝেছি বলা শুধু যে বালকের দোষ তা নয়; বয়স্কদের মধ্যেও এটি খুবই দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

সম্প্রতি আমাদের জীবনটা 'গণ্ডায় এণ্ডা' দেওয়ার মত অপ্রবুদ্ধ ভাবে ব'য়ে চ'লেছে; দৃঢ়ভাবে মননের শক্তির একান্ত অভাব আমাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়: একটা জিনিষকে ঠিক ক'রে বুঝে নেওয়ার মধ্যে যে ইচ্ছাশক্তি কাজ ক'রে তা যেন আমাদের ফুরিয়ে আসচে; তাই, আমাদের জানাটা বস্তুকে অনুসরণ না ক'রে তার ছায়াটাকে পেয়েই সন্তুষ্ট হ'য়ে থাকে।

শিশুর মনে যে-সকল নিহিত শক্তি থাকে, সেই গুলিকে পরিস্ফুট ক'রে তোলা, তাদের পূর্ণতা দান করা শিক্ষার মূল কাজ; এই মত সর্ব্ববাদি-সম্মত কিনা জানিনে, তবে অনেকে এটা স্বীকার করেন।

আবার, কেউ কেউ বলেন যে, শিশুকে জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত এবং উপযুক্ত ক'রে তোলাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

এমনি, নানা মুনির নানা মতের কথা বলা যেতে পারে।

ইংরেজদের আমোলে বহুদিন ধ'রে শিক্ষা ব'লে আমরা যা পেয়ে আসছি তাতে আজ যেন আমরা সন্তুষ্ট নই। তাতে মনুষ্যত্ব আমাদের ফুটে উঠ্‌ছে না, এবং জীবন-সংগ্রামের উপযুক্ত মোটেই আমরা হ'তে পারিনি। চাকরি যেন আমাদের জীবনের অবলম্বন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

এই শিক্ষা যে পূর্ণাঙ্গ নয় তা' একটা কথা ভাব্‌লেই বুঝতে পারা যায়। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান—এদিকে কোন বয়সেই আমাদের কৃষি কাজের উপযুক্ত ক'রে তোলার ব্যবস্থা এর মধ্যে নেই।

জাতির দৈনন্দিন কার্য্য-কলাপ প্রাণ ধারণের সহজ উপায়গুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গিয়ে আমাদের যুবকদের কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা' কে না জানে?

ইংরাজ-প্রবর্ত্তিত শিক্ষায় যে আমরা স্বাবলম্বন শিখিনি তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

এর জন্যে ইংরাজকে দোষ দিয়ে নিজেদের সাফাই গাওয়ায় লাভ আছে কি?

আর আমাদেরই বা দোষ দিতে হবে কেন, সেদিন প্রকাশ্য সভায় একজন ইংরেজ বক্তৃতা দিয়ে বল্লেন, যে পদ্ধতি পঞ্চাশ বছর আগে বিলেতে অকেজো ব'লে বাতিল ক'রে দেওয়া হ'য়েছে, তাকেই ব্রিটীশ-রাজ কোন্ বুদ্ধিতে এখেনে বাহাল করতে ব'সেছেন, তা তিনি বুঝেই উঠ্‌তে পারেন নি।

ইংরেজ ভারতবর্ষে তার বৈষয়িক বুদ্ধি দিয়ে কাজ করে। এটা যে কেবল মাত্র ইংরেজের দোষ তা মনে হয় না। এটা মানুষের প্রকৃতি। সে ঘরের ব্যাপারে এক রকম ক'রে চলে, বাইরের ব্যাপারে আবার অন্য রকম। আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের জন্য যে ব্যবস্থা করি, চাকর-বাকরদের জন্য কি ঠিক তাই করি?

আমাদের স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারটা আলোচনা করলে বুঝতে পারা যায় যে ওর মধ্যে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে আমাদের বিষয়-বুদ্ধিই কাজ ক'রে। পুরুষ স্বভাবতই নারীকে, যাতে তার কাজে লাগে, এমন ক'রেই শিক্ষা-দীক্ষা দিতে চায়। নারীর মধ্যে জোয়ান অফ আর্কের বল-বীর্য্য জাগিয়ে তুলে পুরুষ কোন ক্রমে বিপদগ্রস্ত হ'তে চায় না।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা ভুলে গেলে আমাদের চলবে না। সেটা আত্ম-নির্ভরতা। যারা সত্যিক'রে আত্ম-নির্ভর নয় তাদের পক্ষে স্বরাজ স্বাধীনতার স্বপ্ন-দেখা বিলাসিতা মাত্র।

পরের মুখাপেক্ষী হ'য়ে পরাধীনতার পঙ্ক-কুণ্ডে আমরা হাবু-ডুবু খাচ্ছি ;—সে কথা মনে রাখা বোধ হয় আমাদের বেঁচে থাকার চেয়েও বেশী দরকার।

ইংরেজ যে শিক্ষা চালিয়ে দিয়েছেন, সেটা ভাল কি মন্দ তাও কি আমরা কোন দিন ভেবে দেখি? আলস্যের ক্লৈব্য এমনি জুড়ে ব'সেছে আমাদের মনকে যে, নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারেও আমরা অভিনিবেশ দিয়ে দেখিনে সেটা কিসে দাঁড়াচ্ছে। পূর্ব্ব-পুরুষের দোহাই পেড়ে, ভারতবর্ষের প্রচলিত পুণ্য-প্রথার পথে চলেছি ভেড়ার দলের মত। এই চলার স্ব-চেষ্টা কোথাও সার্থক হ'য়ে উঠ্‌ছে ব'লে তো দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

ছেলে মেয়েদের স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে তাদের বই কিনে মাসে মাসে মাইনে দিতে পারলেই মনে করি যে আমাদের কর্ত্তব্য শেষ। আর যাঁদের অবস্থা ওর মধ্যেই একটু ভাল, এবং গিন্নীর তাড়া আছে, তাঁরা বাড়ীতে মাষ্টার রেখে সকল দায়-মুক্ত হ'য়ে বসেন।

তারা কি শিখ্‌ছে না শিখছে—সে সব জানা কি বোঝার আমাদের দরকার নেই। মা সরস্বতীর যদি অনুগ্রহ হয়তো ছেলে পাশ ক'রে বেরুলে সায়েবকে ধ'রে তার একটা চাক্‌রি বাগিয়ে দিতে পারলেই এক নম্বরের কেল্লা ফতে!

দ্বিতীয় নম্বর, বৈবাহিকের গাঁট থেকে হাজার কতক খসিয়ে ঘরে একটি মা-লক্ষ্মী আনা।

তারপর গিন্নীর সঙ্গে খটা-মটি ক'রে দিন ক'টা কাটিয়ে দিয়ে চক্ষু বুজলে বাঙ্গালার গরিমাময় জীবনের অবসান!

এই সব কথা ভাবলে কি রক্ত জল হয়ে যায় না? করছি কি আমরা? কি ভীষণ পরিণামের মধ্যে ধীরে ধীরে নিয়ে চলেছি—এই জাতটাকে আমরা!

যদি বাঁচতে চাই ত' আমাদের নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াতে হবে। চোখ কান তীক্ষ্ণ ক'রে দেখ্‌তে হবে, বুঝতে হবে, কোথায় গলদ। দু'হাত দিয়ে—দীর্ঘ-আলস্যে-সঞ্চিত আবর্জ্জনাকে দূর ক'রে দিয়ে জীবনে নবীন উদ্যমকে জাগ্রত ক'রে তুল্‌তে হবে।

বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির অনেক দোষ আছে; সেগুলির আগা-গোড়া আলোচনা সম্ভব হবে না। কয়েকটা মারাত্মক দোষের কথা বলা যেতে পারে।

বিলেতে পরীক্ষা দ্বারা জানা গেছে যে, অতি অল্প বয়সে (৪-৭) ছেলে মেয়েরা যদি বেশী মস্তিষ্ক-চালনা ক'রে তো তারা স্বল্পায়ু হয়। তাই শিশু-বিদ্যালয় গুলিতে সেখেনে ইন্দ্রিয়-গুলির শিক্ষা (sense training) দেওয়া হয়। চোখ, কান, নাক, ত্বক্ ইত্যাদি দিয়ে আমরা বহু জ্ঞান সঞ্চয় করি। শিশু-বয়সে যদি এগুলিকে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে পরে বুদ্ধি, ধী, স্মৃতি, কল্পনা, অনুভূতি, মনন এই সব গুলো পূর্ণাঙ্গ হ'য়ে বেড়ে উঠার সুবিধা পায়।

শুধু এই নিয়েই শিশু-বিদ্যালয় গুলি থাকে না—সেখেনে শিশুদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে, স্বাস্থ্য-রক্ষা ক'রে—সচ্চরিত্র হ'য়ে কি ক'রে সত্যিকার মানুষ হওয়া যায়—তার বক্তৃতা নয়—তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে, হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়।

এদেশে ভারতবর্ষীয় ছেলে-মেয়েদের জন্য ঐ জাতীয় একটা স্কুল কি পাঠশালা আছে ব'লে আমার জানা নেই।

ইন্দ্রিয়-শিক্ষার যে খুব বেশী লাভ আছে তা বলা বাহুল্য মাত্র।

বছর কয়েক আগে পর্য্যবেক্ষণ ব'লে একটা কথা শিশু-পাঠ্য তালিকার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে সে-কাজ একেবারেই হয়নি ব'লে জানি।

আমাদের শিশু-বিদ্যালয় গুলির শিক্ষক যাঁরা, তাঁরা সত্যিকার শিক্ষা কাকে বলে তার কল্পনাও করতে পারেন কিনা ঘোর সন্দেহ।

তাঁরা জানেন নামতা আর শুভঙ্করীর আর্য্যা মুখস্ত করতে পারলে কাজ হয়; আর ড্রিল, ড্রয়িং, গান কি পর্য্যবেক্ষণ —ও সব বাজে সময় নষ্ট করার একটা উপায় মাত্র।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শিশু-বিদ্যালয়ে ভাল মাষ্টার কি ক'রে কাজ ক'রবে? গুরু মশাইরা ১০, ১৫ কি বড় জোর ২০ টাকা বেতনে কাজ করেন। সেখেনে একজন ১৫০।২০০ টাকার লোক দেওয়ার কথা শুনলে সরকারের চক্ষু চড়ক গাছ হয়।

অতএব আপাততঃ সেটা আকাশ-কুসুম।

শিশু-বিদ্যালয়ে ব্যায়াম-চর্চ্চার খুব বেশী প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। ঐ বয়সে তাদের শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার একটা স্থায়ী ধারণা ক'রে দেওয়ার প্রয়োজন।

নানা কারণে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ছে;—তা বন্ধ ক'রতে হ'লে শিশুর মনের ভিতর দিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হয়।

অল্প বয়সে ব্যায়াম চর্চ্চা করলে শরীরের ক্ষতি হয়, তাই শিশুদের খেলা-ধূলোর ব্যবস্থা বেশী পরিমানে থাকা উচিত—আর তাদের সকল সময়ে খোলা জায়গায় রাখা উচিত। তাদের ইচ্ছামত বসা-উঠা করার মত ব্যবস্থা য়ুরোপ এবং আমেরিকার বেশীর ভাগ স্কুলেই হয়েছে।

শিশু-বিদ্যালয় গুলিকে সম্পূর্ণ সুন্দর ক'রে তোলার ব্যবস্থা আমাদের অচিরে করতে হবে। সরকারের সেদিক দিয়ে কাজ করার কোন চেষ্টা না হ'তে পারে; কিন্তু জাতির উন্নতি এবং রক্ষার জন্য যদি আমরা এই কাজে মন না দিই ত' আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

জাতির অভ্যুত্থানের প্রধান তম উপায় শিক্ষার দ্বারা সত্য-জ্ঞানের বিস্তার। এদিক দিয়ে আমরা বিশেষ কিছুই করছিনে।

কি ক'রে শিশু-প্রতিষ্ঠান গুলি আমাদের অবস্থার অনুযায়ী ক'রে অল্প-পয়সায় গ'ড়ে তোলা যেতে পারে, তার আলোচনা বারান্তরে করার ইচ্ছা রইল।

সনেট

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

কৃপা শুধু? প্রেম নিয়ে অনুগ্রহ দান?
নহে তাহা—তোমা পরে এই ভালবাসা—
আশাশূন্য—নাহি তবু সুতীব্র নিরাশা,
নাহি ভিক্ষা, পদে পদে আত্ম-অপমান;
এ নহে উদাস কণ্ঠে ভৈরবীর তান,
পূরবীর ম্লান সুর, অশ্রুরুদ্ধ ভাষা,
দীরঘ নিশ্বাস সনে আকুতি হতাশা,
মিলন-পরশ ফাঁকে মান অভিমান।

সে আজ অতীত স্মৃতি; এই দৃষ্টি নব—
এ যে মোর ফিরে আসা আত্মার সম্মান,
স্বরগ আশীষ মানি শিরে বহি লব।
আজিকে সার্থক হোক দেবতার দান—
তুচ্ছ সোহাগের বাণী তোমারে কি কব?
হৃদয়-স্পন্দনে বাজে তব জয়-গান।

সেন নদীর অষ্ট সেতু

গ্রাঁ পালে (পারীর একটী প্রাসাদ)

ম্যাদ্‌লীন্ গির্জ্জা
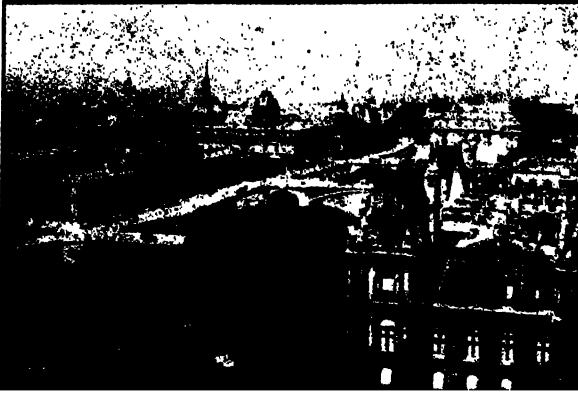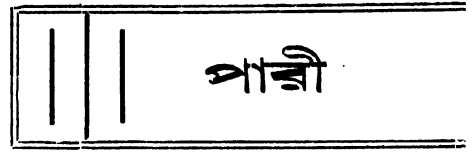
পারীর এক্‌স্‌চেঞ্জ
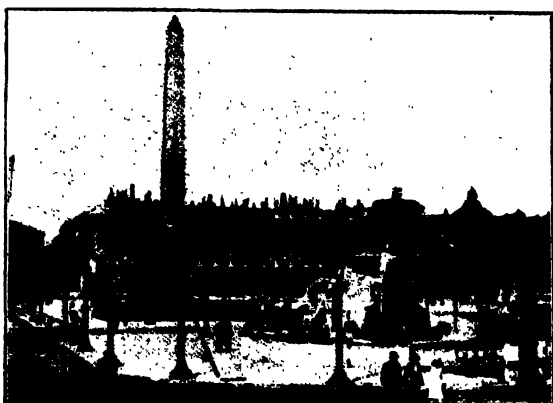
প্লাস্‌ দ্‌ লা কঁকর্দ (একটী চৌমাথা)
পারীতে স্কোয়ার নেই, তার বদলে খানিকটা ক'রে
খোলা জায়গা থাকে, তাকে বলে প্লাস্‌

ল্‌ পাঁথেঅঁ
নরদেবতাদের পীঠস্থান
মনীষীদের কবর

ওতেল্ দ্ ভিল
টাউন হল

সাক্রে ক্যঅর গির্জ্জা

শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় কর্ত্তৃক
নির্ব্বাচিত ও প্রেরিত
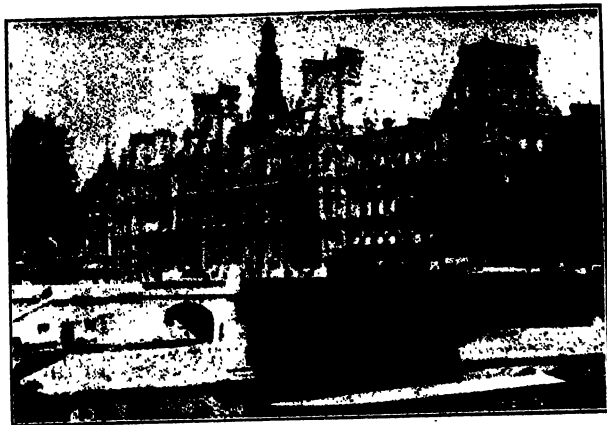
নারীর মনুষ্যত্ব

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু,

মেয়েদের সম্বন্ধে যে লেখাটি লিখেচ আমার হাতে পড়েচে। এই বিষয়ে অনেক বাঙালী মেয়ে আজকাল লিখ্‌তে বসেচেন। সে সব লেখায় মুদ্রাদোষ অত্যন্ত বেশি। তাঁদের লেখা অশান্ত, তাতে উদ্দীপনা কম উত্তেজনা বেশি। আলোকের চেয়ে দাহ বেড়ে উঠেচে। তোমার লেখায় আত্মশ্রদ্ধ গাম্ভীর্য্যের শান্তি, এতে কলহের ঝাঁজ পাওয়া গেল না।

যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেচ সে সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে চাই। এটা জানা কথা যে বৈষম্যে শক্তিকে জাগরুক করে, সাম্যে আনে তার নিষ্ক্রিয়তা। শাস্ত্রে বলে সত্ত্ব, রজ, তমর ভেদ মিটলে ঘটে প্রলয়। জীবলোকে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ ঘটিয়ে প্রাণশক্তির বেগ প্রবল করেচে, যদি যুগান্তকালে একাকারত্ব ঘটে তবে প্রাণের তেজ ম্লান হবে।

কিন্তু মনে রাখা চাই, স্ত্রী পুরুষের এই যে ভাগ, এর মধ্যে ঐক্য অনৈক্য দুই তত্ত্বই সমান গৌরবশালী। তবু অনৈক্যটার উপরেই পনেরো আনা জোর দেওয়া হয়েচে। তার একটা কারণ, মিলনের আকর্ষণ ও ভোগটাকে নিবিড় করা; আর একটা, পরস্পরের আচরণ-রীতিকে পাকা নিয়মে সহজ করা।

স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের ভেদ সম্বন্ধে বোধটা প্রকৃতি আপন প্রয়োজনের সীমায় পরিমিত ক'রে দিয়েচে। মানুষ আপন কল্পনা ও সংস্কারের দ্বারা তাকে অনেক দূর বাড়িয়ে তুলেচে। প্রকৃতির নিমন্ত্রণে যে আয়োজন তাতে অমিতব্যয়িতা নেই। মানুষ তার পরিবেষণে মাত্রাটাকে অত্যন্ত বাড়াবার জন্যে ক্ষুধাটাকে খুঁচিয়ে খাঁচিয়ে জাগিয়ে রাখচে। ভেদ-বোধের মধ্যে সেই ক্ষুধা, সেই ক্ষুধাটাকে চির অতৃপ্ত করবার জন্যে বিস্তর কৌশল। শুনেচি কোনো ইংরেজ কবি রসনায় মদের তীব্রতাকে প্রখরতর করবার উদ্দেশ্যে জিবে গোলমরিচের গুঁড়া লাগাতেন। আকাঙ্ক্ষার সীমানা বিস্তীর্ণ করবার জন্যে মেয়েদেরকে অত্যন্ত বেশি সংহত ভাবে মেয়ে করবার চেষ্টা করা হয়েচে, কড়া জ্বালের উত্তাপে দুধকে মেরে ক্ষীর ক'রে তোলার মতো, এতে পাকযন্ত্রের তাগিদ অমান্য ক'রে রসনার তাগিদ অগ্রগণ্য করা হয়।

নানা কারণে সহজেই স্ত্রীলোকের কিছু ভয় আছে, সঙ্কোচ আছে, তার এই অপূর্ণতা পুরুষের আত্মশ্লাঘায় উত্তেজনা সঞ্চার করে, তাই সেটাকে অনেক কাল ধ'রে বিশেষ যত্নেই বাড়ানো হয়েচে। ইংরেজি সাহিত্যে দেখ্‌তে পাই, বিলাতে কিছুকাল পূর্ব্বে কাকুক্তি, মূর্চ্ছা, লজ্জারক্তিমতা প্রভৃতির দ্বারা দুর্ব্বলতাকে খুব বেশি ফলিয়ে ফলিয়ে দেখানোটাকেই মেয়েরা স্ত্রীস্বভাবের অলঙ্কার ব'লেই জানতেন। সময়ের পরিবর্ত্তন ঘটতেই আজ দেখতে পাওয়া গেল তার বারো আনাই বানানো। পুরুষ যতটা দাবী করেচে সেটা তহবিলের অতিরিক্ত হওয়াতে মেয়েরা তার অনেকখানি জাল জালিয়াতী ক'রে মিটিয়েচে, আর আমরাই বলেচি মেয়েরা মায়াবিনী। আমরা চেয়েছিলুম তারা মায়াবিনীই হয়; যখন অসুবিধা ঘটে তখন গাল পাড়ি, যখন ভোগে লাগে তখন স্তব করি। পুরুষ যাকে বলে মেয়েলি, সেটা স্বাভাবিক মেয়েলির চেয়ে অনেকটা বেশি ব'লেই তাকে টানাটানি ক'রে বাড়িয়ে মেয়েদের স্বভাবটা এক-ঝোঁকা হ'য়ে উঠেচে। সুপরিমিত মানুষের সামঞ্জস্য নষ্ট ক'রে তারা অপরিমিত নারীকে গ'ড়ে তুললে। এতে ক্ষতি না হ'য়ে যায় না। শোনা যায় ইংলণ্ডের লাটের দল মস্ত মস্ত ভূখণ্ডকে শিকার-স্থান ও বিলাস-অরণ্যে বেড়া দিয়ে রেখেচে। অন্তত তার অনেক খানিই সাধারণের জন্যে চাষে লাগানো উচিত ছিল।

মেয়েদেরকে তেমনি করে সঙ্কীর্ণ ও বিশেষ ব্যবহারের মধ্যে বেড়া দিয়ে রাখাতে মানুষের সমগ্রতার লোকসান ঘটিয়েছে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। বিলেতের লাটদেরকে যদি বলা যায় অন্যায় করচ, তারা ক্ষ্যাপা হ'য়ে ওঠে; কেননা যেখানে কোনো পক্ষের বিশেষ অধিকার, সেখানে কল্যাণের দোহাই দিলে সেটা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া আগুন করিয়া দেয় প্রাণ। এই জন্যে বিশেষ ভাবে আমাদের দেশে মেয়েদের পক্ষে লেশমাত্র স্বাতন্ত্র্য দাবী করলে পুরুষ মহলে তুমুল উত্তেজনা উপস্থিত হয়। বিশ্বজগতে কোথাও বঙ্গবাসীর ন্যায্য অধিকারের স্বাধীনতা নেই। রাষ্ট্রক্ষেত্রে আমরা পরবশ, সমাজে পদে পদেই বাধাগ্রস্ত। আমাদের একমাত্র অবাধ অধিকারের ক্ষেত্র আমাদের স্ত্রী। সেখানে আমাদের যোগ্যতার কোনো নিশানা দাখিল করতে হয় না। সেখানে আমরা দেবতা, তাই স্ত্রী নামক লাখেরাজ স্বর্গের কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সীমানা সম্বন্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ সংশয় বাধলে আমাদের শস্তা দেবত্ব ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। আমরা মন্ত্র প'ড়ে নিজের মূর্ত্তি স্থাপন ক'রে স্ত্রীকে আমাদের দেবত্র সম্পত্তি ক'রে ব'সে আছি। শাস্ত্র তার দলিল পাকা করে দিয়েচে, এই দলিলের জোরে দেবতাও আমরা, সেবায়তও আমরা। এই দলিলের একটা বর্ণকেও যে দুঃসাহসিক অবৈধ বলে, তার মাথা ভাঙতে ইচ্ছে করে। তবু বল্‌বার সময় এসেচে যে সমগ্র মানুষটার মধ্যে থেকে স্ত্রীলোকটিকে ছেঁটে বের ক'রে তাকে বিশেষ অধিকারীর জিম্মায় কুলুপ দিয়ে রাখ্‌লে সমস্ত মানব-জগৎকে বঞ্চিত করা হয়। সেই ফাঁকি যে সমাজে যত বেশি সেই সমাজে পুরুষেরই তত বেশি দুর্ব্বলতা। সেই সমাজে মেয়েরা বিষম একটা ভার। তাদের জন্যে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। তাদের জন্মগ্রহণ পরিবারের পক্ষে সঙ্কট। তাদের সম্বন্ধে বলে আসচি, "পথে নারী বিবর্জ্জিতা।"

সেখানেই বলাটা থামেনি। যেই আজ আমাদের আর্থিক অবস্থায় ভাঁটা পড়ল, এবং জীবন-যাত্রার সব জিনিষের দর চ'ড়ে গেল, অমনি আমাদের পুরুষরা বলতে আরম্ভ করেচে যে শুধু পথে নহে, গৃহেও নারী বিবর্জ্জিতা। বিবাহ করতে মুখ বাঁকিয়েছি, মোটা পণ দিয়ে ঘাড় সোজা করতে হয়। মেয়েত্ব ছাড়া মেয়ের যেখানে আর কিছু নেই সেখানে সে পুরুষের আনুষঙ্গিক মাত্র। এই জন্য পুরুষের পক্ষে সে বোঝা। আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিবাহ করতে পুরুষের শঙ্কা ও সঙ্কোচ, কেননা বিবাহ বলতেই বোঝায় বৈষম্যকে বহন করা। যেখানে একপক্ষ খোঁড়া সেখানে সে অন্যপক্ষের চলৎ-শক্তির পক্ষে বিষম অত্যাচার।

শুধু সংসারের নয়, আধ্যাত্মিক সাধনাতেও কথায় কথায় বলচি নারী বর্জ্জনীয়া। কাঞ্চনের সঙ্গে নারীকে এক কোঠায় ফেলেচি যেন থলির আঁট গিঠটা খুলে উপুড় ক'রে দিলেই হোলো। এ কথা বলতে আমাদের সঙ্কোচ এই জন্যে হয় না যে নারী বস্তুতই নিজের জোরে নেই। পুরুষের উপরেই তার ভর। পুরুষ তাকে যে মূল্য দিয়েছে সেই তার মূল্য। এখন তাকে আর সহজে ছাড়ানো যায় না, "কমলী নেহি ছোড়তী।" সাধক বলচেন, এও তো বিষম আপদ।

বহুদিনের চর্চ্চার কৌশলে মানুষ কোনো কোনো ফলের আঁঠি লোপ করেচে। সেটা গাছের পক্ষে ভালো নয়, ভোগীর পক্ষে ভালো। সমাজের বহুযুগের চর্চ্চায় মেয়েদের ভিতরকার শক্তি জিনিষটা ক্ষইয়ে ক্ষইয়ে খুইয়ে দেওয়া হলো, সেটা থাকলে তাদের নিজের উপর প্রতিষ্ঠা দৃঢ় থাকত, অন্যের প্রতি অতিপরিমাণ সংসক্তিতে তার না থাকত আনন্দ, না থাকত প্রয়োজন। ভোগী পুরুষের হাতে-গড়া নারীকে আজ সাধক বলচেন, তুমি যদি অত বেশি জড়িয়ে থাকো তবে আমার মুক্তি নেই। সংসার-যাত্রায় স্বভাবতই মেয়ের হওয়া উচিত ছিল পুরুষের অনুকূল, তা' না হয়ে সে হ'ল ভার। কবি বল্‌লেন, কন্যাপিতৃত্বং খলুনামকষ্টং। সাধনার ক্ষেত্রেও পুরুষ ও মেয়ের সহযোগিতাই স্বাভাবিক হ'ত, তা' না হ'য়ে মেয়ে হ'ল বাধা। তার প্রধান কারণ, মেয়ে স্বাভাবিক মানুষ নয়, সে ফলিয়ে তোলা নারী। এই জন্যেই সে হ'ল বন্ধন,—কি সংসারের পথে, কি সাধনার পথে। যাকে বন্দিনী করেছি সে বহুযত্নে আপন বন্ধন-শৃঙ্খলকেই সুন্দর ক'রে তুলেছে আমাদের মনকে বাঁধবে ব'লে। যাকে অক্ষম করেছি সে আমাদেরই ক্ষমতাকে করেচে বিপন্ন।

নারীর মনুষ্যত্ব

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি আমার স্বজাতির প্রতি হয়তো অবিচার করচি আর কলমটা অত্যুক্তির দিকে ঝুঁকেছে। পৃথিবীর অর্দ্ধেক মানুষকে বাকি অর্দ্ধেক কখনো আপন কামনা বা প্রয়োজনের অনুগত ক'রে কৃত্রিম উপায়ে বা জবরদস্তি ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারে না, যদি না এর মধ্যে প্রকৃতির ইসারা এবং আনুকূল্য থাকত। গোড়া থেকে নারীর প্রয়োজন ছিল পুরুষকে বন্দী করা সে কথাটাও ভুললে চলবে না। পুরুষকে প্রকৃতি অনেকটা মুক্তি দিয়েছে তাই সে বিবাগী—তাই সে দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পথে সর্ব্বদা ধাবমান। তার মন ছড়িয়ে পড়ে নানা দিকে। জৈবতাত্ত্বিক বিশেষ প্রয়োজনের খাদে তার স্বভাবকে কোনো একাগ্র প্রবর্ত্তনায় ধাবিত করেনি। মানব-শিশুর দায় দীর্ঘ কালের, তার তাগিদে মেয়েদেরকে ঘর বাঁধাই চাই। সেই ঘর বাঁধার কাজে পুরুষদেরকেও জড়ানো তাদের পক্ষে দরকার। অথচ সন্তান স্নেহের প্রবৃত্তি পুরুষদের প্রবল নয়।

তাই বিবাগী পুরুষকে ভুলিয়ে বাঁধতে হয়েচে। নারীর প্রতি পুরুষের টান জিনিষটা প্রকৃতির স্বহস্তের ব্যবস্থা, তাই সেইটের জোর বাড়িয়ে তুলে ঘরের প্রতি টানটাকে মেয়েরা নিজে সৃষ্টি করেচে। এই ঘর বাঁধাটা সভ্যতার প্রথম বড়ো ভূমিকা, এইটেই সমাজ-পত্তনের গোড়া। মেয়েরা ঘরের কেন্দ্র অধিকার ক'রে পুরুষকে সেই ঘরে বেঁধেচে। অনেক দিন ধ'রে অনেক উপায়ে ও উপাদানে বাঁধন হয়েচে পাকা, লোভের সৃষ্টি খুব ঘটা ক'রেই হ'ল। দুই পক্ষ থেকেই বন্ধনের বিনুনি গাঁথা বিচিত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েচে। এমন সময় নূতন যুগ এল; আজ কথা উঠেচে বাঁধাবাঁধির পাক অত্যন্ত বেশি হয়েচে, দুই পক্ষেরই চলা-ফেরার পদে পদে পড়চে বাধা। নারী বলচে এতদিন কেবলি বেঁধেচি আর বাঁধা পড়েচি, এই কাজে আমার বিকাশকে খর্ব্ব করল; পুরুষ বলচে, কামনার আগুনে কেবলি চলেচে আহুতি, এতে আমার সাধনার বিঘ্ন ঘটেচে। অবস্থাটা এমন হয়ে উঠেচে যাতে স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের জীবনে পরস্পরের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্যের সব চেয়ে বাধা হোলো। এর মধ্যে নিশ্চিত একটা মস্ত ভুল আছে। এমন একটা বিষম গাঁঠ প'ড়ে গেল যাতে মেয়েও বলচে পুরুষ আমাকে বেঁধেচে, পুরুষও বলচে তাই।

সমাজের চাক তো বাঁধা হ'ল। এই চক্রটি মেয়ে পুরুষকে নিয়ে। এখানে সব চেয়ে বড়ো সমস্যা—পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আচরণ নিয়ে। এই আচরণ-বিধিকে সহজ করতে হ'লে পরস্পরকে মোটামুটি ক'রে ভাগ করতে হয়। একান্ত ক'রে শ্রেণী বাঁধবার ইচ্ছা অনেক সময়েই আমাদের কর্ম্মবুদ্ধি ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির আলস্যের ফল। যাকে শ্রেণীতে বাঁধা যায় না, তার সম্বন্ধে বিশেষ ক'রে ভাবতে হয়। যেখানে অনেক মানুষকে নিয়ে কারবার সেখানে পাইকেড়ি ব্যবস্থায় এই বিশেষ ভাবনার দায় যথাসম্ভব বাঁচাতে চাই। তাতে বহুসংখ্যক ব্যক্তিবিশেষের প্রবল পরিমাণ পীড়া হ'তে পারে, কিন্তু কৃপণ মন ব্যয়সংক্ষেপের পক্ষপাতী। বর্ণভেদকে পাকা করবার মূলে এই ইচ্ছে; তাতে আর কিছু না বাঁচুক ব্যক্তিমূলক আচরণকে শ্রেণীমূলক ক'রে কাজ বাঁচল। ভেদের কাঠামোর মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঠিকমতো ধরানো যায় না, তখন হাড়গোড় ভেঙ্গে খুব ঠেসে ধরাতে হয়, তাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, কিন্তু বিধি বিধানে হয় সুবিধা। এই সুবিধার খাতিরেই আমরা জেলখানায় বিবিধ অপরাধীকে একবিধ আখ্যা দিয়ে এক কামরায় ঠাসি, বিদ্যালয়ে ক্লাসের কোঠায় ছেলেদেরকে ভ'রে দিই, যাদের মধ্যে মোটা লক্ষণের ঐক্য আছে কিন্তু গভীরতর অনৈক্য। মানুষের প্রায় সকল বিধানই সত্যের চেয়ে শ্রেণীকে বড়ো করেচে। য়ুরোপীয় যখন চোখ বুজে বলতে চায় যে প্রাচ্যজাতীয়েরা একান্তই প্রাচ্য তখন তাদের মনের এবং ধর্ম্মবুদ্ধির কুঁড়েমির প্রমাণ হয়। সমাজের কাজ সহজ করবার গরজে বহুকাল থেকে মেয়ে পুরুষের প্রভেদকে পাকা ক'রে দেওয়া হয়েচে। এমন ক'রে বাইরে পাকা ক'রে দিলে ক্রমে অভ্যাসবশতঃ ভেদটা ভিতর দিকেও পাকা হ'য়েই ওঠে। মনে করা যাক লাথি মারা থেকে আরম্ভ ক'রে দৌড় মারা পর্য্যন্ত কাজে পুরুষদের পায়ের শক্তি মেয়েদের চেয়ে বেশি; সেই তত্ত্বের উপর একান্ত জোর দিয়ে পুরুষ যদি বলে বিস্তারিতভাবে পদচারণা মেয়েদের অনাবশ্যক, অতএব সে সম্বন্ধে চিত্ত-বিক্ষেপ ও পদবিক্ষেপ নিবারণ করবার জন্যে তাদের পা-

দুটোকে কড়া শাসনে খর্ব্ব ক'রে দেওয়া যাক, তাহ'লে সেই চাপে পা খর্ব্ব হয়েই আসে। তাতে কিছু সুবিধাও ঘটে। গৃহসীমার বাইরে গতিবিধির সংকল্প সেই পদমর্য্যাদাহীন মেয়ের মনেই আসেনা ব'লে সংসারের কর্ম্মবিভাগ সহজ হয়। এর মধ্যে এইটুকু সত্য থাকতেও পারে যে মেয়েদের দেহ-প্রকৃতির কোমলতা বশতঃই পীড়নের চাপে তাদের পাদুটো যত সহজে পঙ্গু হ'য়ে উঠেচে, হাড়-মোটা পুরুষের হয়তো তত সহজে হ'ত না। পৃথিবী জুড়ে অতি দীর্ঘকাল মেয়েরা নারীত্ব ব'লে যে একটা সঙ্কীর্ণ সামাজিক কাঠামোয় ভিতর নিষ্পিষ্ট ভাবে ধরা দিয়েছে নিঃসন্দেহ তার একটা কারণ এই যে, তারা চাপ সয় এবং সেই চাপের সঙ্গে তারা নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

যাই হোক মেয়ে পুরুষের সেই ভেদমূলক ব্যবস্থা অনেক-দিন ধ'রে সহজে চ'লে এসেচে এমন সময় একটা যুগান্তকালের ভূমিকম্প পাশ্চাত্য দেশে সমাজকে প্রচণ্ড নাড়া দিলে—সেই ধাক্কায় গণ্ডির বাইরে মেয়ে পুরুষ এসে ভিড়লো। এই জায়গাটাতেই মেয়েদের স্বতন্ত্র আয়োজন নেই; এখানে ভেদের উপর থেকে স্বভাবতঃই ঝোঁক উঠে যাচ্চে, ঝোঁক পড়চে মেয়ে পুরুষের বিশেষত্ব উত্তীর্ণ হয়ে যে সাধারণ মানুষ আছে তারই মূলগত ঐক্যের উপর। মানুষের সমাজে এটা একেবারে নতুন সৃষ্টির চর্চ্চা—এটা চিরকালের অভ্যাস-বিরুদ্ধ। অতীত কালের চিরসঞ্চিত মোহ যতদিন না কাটবে, ততদিন এই দেখাটা স্পষ্ট হবে না। কিন্তু স্ত্রী পুরুষের মধ্যে এই শ্রেণীভাগের অতীত মানুষকে স্বীকার করা চাই। তার মানে এ নয় যে, সত্য ভেদকে সত্য ব'লে মানব না, তার মানে সত্য অভেদকেও সত্য ব'লে মানতে হবে।

স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে সেটা অস্বীকার করা ভুল। একথা আজ সকলেই জানে আমাদের দেহে কতকগুলি gland আছে তার রস আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে কেবল যে শরীর-প্রকৃতিকেই বিশিষ্টতা দেয় তা নয়, আমাদের মানস প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ গুণকে বিশেষভাবে পুষ্টি দিয়ে থাকে। তাতে কেবল যে মেয়েদের কণ্ঠস্বরে বিশেষ একটা গুণ দেয় তা নয়, তার আনুষঙ্গিক গুণ তার অন্তরেও সঞ্চার করে। যদি দৈহিক কারণের উল্টোপাল্টায় মেয়ের কণ্ঠস্বর পুরুষালি হয় তবে দেখা যাবে তার মনটার মধ্যেও পুরুষের ভাব। অস্থিতে চর্ম্মেতে বিশেষত্ব যে কারণে ঘটায় সেই কারণেই বিশেষত্ব ঘটায় চিত্তে। মেয়ে পুরুষের দেহ মনের বিশেষত্বের সঙ্গে সঙ্গে সংসারে তার ঔৎসুক্যের (interestএর) বিশেষত্ব ঘটতে বাধ্য। এই ঔৎসুক্যের বিশিষ্টতার উপরে পরস্পরের ক্ষমতার বিশিষ্টতা। জীবের প্রতি মেয়েদের ঔৎসুক্য, আর ভাবের প্রতি পুরুষের ঔৎসুক্য,—সাধারণতঃ এ কথাটা যদি সত্য হয় তবে বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যেই তার কারণ আছে। মেয়েদের কাছে প্রকৃতির যে দাবী, পুরুষের কাছে প্রকৃতির সে দাবী নেই। এদিকে প্রকৃতি কখনো দুর্ব্বলভাবে দাবী করে না, তার দাবীর সঙ্গে চাবুক এবং ঘুস দুয়েরই ব্যবস্থা রাখে। এক দিকে দেয় পেটে ক্ষুধা আর একদিকে দেয় রসনায় রস, এই দুইয়ের চোটে লোভের তাড়ায় খাদ্য খুঁজে ফিরতেই হয়। জীবরক্ষার প্রতি ঔৎসুক্য মেয়েদের মধ্যে যে অত্যন্ত প্রবল সে প্রকৃতিরই চক্রান্তে, এই জন্যেই মেয়েদের প্রীতি এত বেশি ব্যক্তিগত। বস্তু-পরিচ্ছিন্ন (abstract) ভাবের সৃষ্টিতে, অব্যবহারিক সত্যের সন্ধানে মেয়েদের যে বাধা সে বাইরের নয়, সে অন্তরের। সাহিত্য, কলা বা বিজ্ঞান প্রভৃতিতে মেয়েদের কৃতিত্ব যথেষ্ট পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায় না তার বাহ্য কারণ অনেকে অনেক রকম নির্ণয় করেন। বাইরের প্রভাবকে আমি বড়ো ব'লে মানি না। তোমার লেখায় গান সম্বন্ধে মেয়েদের বিশেষ শক্তির উল্লেখ করেচ। একটা কথা ভুলেচ,—মেয়েরা গান গেয়েছে, গান সৃষ্টি করেনি। ভাবলোকের জ্ঞানলোকের সৃষ্টিতে অনেকটা পরিমাণে বুদ্ধির বৈরাগ্য থাকা দরকার। ব্যক্তিগত, বস্তুগত, ব্যবহারগত সংসক্তি বেশি থাকলে সেই বৈরাগ্যের অভাব ঘটে। অপর পক্ষে সেই বৈরাগ্যের প্রাবল্য ঘটলে জীব-সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্যের ক্ষীণতা হয়।

প্রকৃতির ভেদ আছে, তাই ব'লে ভিন্ন যারা তাদের জন্যে দুই স্বতন্ত্র জগৎ নির্দ্দিষ্ট হয়নি। একই আলো একই হাওয়া একই মাটিতে লিচুগাছ আমগাছ উভয়েরই পুষ্টি। সেই পুষ্টির উৎকর্ষে আমের আমত্ব লিচুর লিচুত্ব স্বতন্ত্র ভাবে

নারীর মনুষ্যত্ব

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎকর্ষ পায়। আমার মতে সংসারে মেয়ে পুরুষের ক্ষেত্র একই। সেই এক ক্ষেত্রে উভয়ে ভিন্নভাবে কাজ করে। লড়াইয়ে বাম হাত ধনুকটাকে ধ'রে রাখে ডান হাত শরটাকে প্রক্ষিপ্ত করে। এস্থলে দুই হাত একইভাবে একই কাজ করলে শক্তির ব্যাঘাত ঘটে। গত য়ুরোপের যুদ্ধে মেয়েরা ঘরকন্না নিয়ে ছিল না, তারা যুদ্ধই করেছিল, সে নিজের ভাবে। পৃথিবীর সকল বিভাগের সকল কাজই মেয়েদের বিশেষ শক্তির অপেক্ষা রাখে। সেই শক্তির প্রকাশ অবরুদ্ধ ব'লে জগতে কত যে দৈন্য তা আমরা জানতেই পারিনে। মেয়ে পুরুষ যদি সর্ব্বাংশে একই হ'ত তা হ'লে এই দৈন্য কেবলমাত্র সংখ্যাগত হ'ত, কিন্তু তাদের স্বভাবে পৃথক বিশিষ্টতা আছে ব'লেই মেয়েদের শক্তির ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ করাতে আমাদের দৈন্য গভীরতর গুণগত হয়েছে। কর্ম্মে স্বাদেশিকতার প্রকাশ প্রধানতঃ পুরুষের হাতে থাকাতে দেশের আবষ্ট্রাক্ট্ হিতকে লক্ষ্য ক'রে তার কাছে দেশের ব্যক্তিদেরকে নির্ম্মমভাবে বলি দিতে পুরুষের বাধে না, প্রতিদিন তার প্রমাণ পাই। এই পঙ্গু আচরণে স্বাদেশিকতার সত্য নিশ্চয়ই আহত হয়। নিবেদিতার ভারতভক্তি আমি দেখেছি, তার মধ্যে ব্যক্তিপ্রেম ভরা ছিল। প্রত্যেক ভারতবাসীর তিনি যেন মাতৃস্বরূপ ছিলেন। সেই মাতৃবোধে যেমন ছিল তেজ, তেমনি ছিল করুণা। তিনি তাঁর বুদ্ধিকে অবচ্ছিন্ন ভাবে কেবলি সমস্যা সমাধানে নিযুক্ত করেননি। তিনি ভারতবর্ষকে একেবারে প্রাণবান মানুষের মতই সেবার দ্বারা, প্রীতির দ্বারা, চিন্তার দ্বারা বেষ্টন করেছিলেন। এই চিত্তবৃত্তি অর্থশাস্ত্রিকের না, রাষ্ট্রতাত্ত্বিকের নয়, এর মধ্যে সেই সমস্ত শাস্ত্র ও তত্ত্ব প্রাণবান হ'য়ে মিলিত ছিল। সংসারে সকল বিভাগেই বৈরাগী সত্যের সঙ্গে দরদী সত্যের যোগ থাকা চাই, তা হ'লেই হরপার্ব্বতীর মিলন সম্পূর্ণ হয়।

কিন্তু এই বৃহৎ যজ্ঞক্ষেত্রে মেয়েকে আপন স্থান নিতে হ'লে অশিক্ষিতপটুত্বে চলবে না। জীবনের পরিধি সঙ্কীর্ণ হ'লে শুধু ইনষ্টিংক্টের জোরেই চলে, কিন্তু বড়ো ক্ষেত্রে দেহ মন হৃদয়ের পরিপূর্ণ শিক্ষা চাই। বর্ব্বরতার ক্ষুদ্র সীমায় ইনষ্টিংক্টের স্থান আছে, সভ্যতার বড়ো সীমায় সে দুর্ব্বল। মেয়েকে পূর্ণশক্তিতে আজ মেয়ে হ'তে গেলে তার সমস্ত মানবিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ আবশ্যক। পশু পাখীর শাবকদের জন্য ইনষ্টিংক্ট যথেষ্ট। মানুষের মা যদি জ্ঞানে বুদ্ধিতে কর্ম্মে ইনষ্টিংক্টের অনেক উপরে না ওঠেন তবে মানব সন্তানের পক্ষে সেটা অনিষ্টকর। এই অনিষ্ট আমাদের দেশে প্রভূত পরিমাণে ঘটে সন্দেহ নেই। আমাদের ঘোরো মা বাঙালীর ছেলেকে কেবল ঘরের ছেলেই করেচে, ঘরের বাইরে মায়ের আদুরে ছেলে পদে পদে পরাস্ত। এতকাল মনে করেছিলুম, শিক্ষায় অসম্পূর্ণতা, চিত্তবিকাশের ক্ষীণতা মেয়েদের কর্ত্তব্য সাধনের পক্ষেই আবশ্যক। তার মানে খাঁচার ভিতরকার কর্ত্তব্যে পাখার জড়তা সহায় সন্দেহ নেই। তাই ব'লে আজ নতুন যুগে একথা বলব না যে মেয়েরা গায়ের জোরে পুরুষ হবে। এই বলা চাই পুরুষের মতো সংসারের সর্ব্বত্রই তার দুরূহ কর্ত্তব্য। পৃথিবীতে এতদিন মানুষের আত্মপ্রকাশ প্রায় অর্দ্ধেক হ'য়ে ছিল—অথবা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ব্যর্থ হ'য়ে ছিল। আজ আমরা অর্দ্ধনারীশ্বরের অপেক্ষায় চেয়ে আছি। এই কথা বলচি প্রাণের ঐশ্বর্য্যে মেয়েপুরুষের অসমান ভাগ নয়, আধাআধি ভাগও নয়, উভয়ের সম্মিলিত অখণ্ড সম্পদ।

মেয়েদের উপরে প্রকৃতির দিক থেকে অত্যন্ত মা হবার তাগিদ আছে। তেমনি সমাজের দিক থেকে পুরুষের উপর তাগিদ আছে অত্যন্ত কেজো হবার। যদি পুরুষ কেজো হ'তে না পারে তাহ'লে তার শাস্তি ও লাঞ্ছনার অন্ত থাকে না। এই সমস্ত কাজ কোনোটা উচ্চশ্রেণীর কোনোটা নিম্নশ্রেণীর, কিন্তু সাধারণত এগুলি ধরা-বাঁধা কাজ। মেয়েরা গার্হস্থ্যের কাজ না করলে নিন্দিত হয়, পুরুষেরা সমাজের নির্দ্দিষ্ট কাজের চাকা না ঘুরিয়ে চললে নিন্দিত হয়। পৃথিবীর পনের আনা লোকই সাধারণ মানুষ, তারা এই তাগিদের ছাঁচেই গড়া। বস্তুত তাগিদের কড়া নির্দ্দেশ না থাকলে তারা দিশাহারা হয়।

কিন্তু দৈবক্রমে একদল মানুষ আসে তারা তাগিদের ক্ষেত্রের বাহিরে জন্মায়। আকবর বাদসাহের মতো তাদের জন্ম ঘরে নয়, পথে। তারা অতি বিশেষভাবে মেয়েও নয় পুরুষও নয়। সেই জাতের মেয়ের উপর প্রকৃতির সঙ্কীর্ণ

প্রবর্ত্তনা জোর পায়না; সেই জাতের পুরুষের প্রতি দলের তাড়না ব্যর্থ হয়। তারা নিজের স্বতন্ত্র শক্তিতে নিজের জীবনকে ও জগৎকে সৃষ্টি করে। এজন্যে দুঃখ পায়, মার খায়, কিন্তু উপায় নেই। এদের মধ্যে যারা সর্ব্বপ্রধান তাদের প্রাধান্য কোনো না কোনো সময়ে স্বীকৃত হয়। যারা মাঝামাঝি তাদের কেউ স্বীকার করতে চায় না। তাদের নিয়ে সংসারে ট্রাজিডির অন্ত নেই। এই মাঝারি দলের সংখ্যা অল্প নয়, কিন্তু এদেরকে দেখতে পাইনে কেন না চাপে এরা হয় মারা পড়ে, নয় এদের বাহ্য চেহারা অন্য সকলের সমান হয়ে ওঠে। লোকালয়ে এই তৃতীয় জাতির কর্ম্মক্ষেত্র নির্ণীত হয়নি ব'লেই কখনো এরা অনর্থপাত করে, কখনো বা এরা একেবারে নিষ্ফল হ'য়ে থাকে। আমার বিশ্বাস আজকের যুগে এই যূথভ্রষ্ট তৃতীয় জাতি স্বক্ষেত্রে স্বধর্ম্ম রক্ষার অবকাশ পাবে, এবং সংসারে এদের কর্ত্তৃত্বই সবচেয়ে বড়ো হ'য়ে উঠবে—কেন না এরাই বাহ্যদায়-মুক্তভাবে অন্তরের দায় গ্রহণ করতে পারে।

সৃষ্টি-সঙ্গীতে প্রকৃতি আপন তাল লাগাতে লাগাতে হঠাৎ একসময় বাঁধা রাগিণীর বাইরে গিয়ে পৌঁছয়। এমনি ক'রে এক একটা খাপছাড়া বৈচিত্র্যের উদ্ভব হয়। মেয়েদের মধ্যে এই আকস্মিক বৈচিত্র্য তেমন বেশি ক'রে ঘটতে পায় না। তার কারণ আপন প্রয়োজনে প্রকৃতি মেয়েদেরকে বিশেষ ক'রে ঢালাই করেচে। প্রকৃতির প্রয়োজনের হিসাবে পুরুষের অনেকটাই ফালতো। এইজন্যে বাধাবাধি বেশি না থাকাতে তাদের সৃষ্টিতে প্রকৃতি আপন ছাঁদের কাঠামো কথায় কথায় অতিক্রম করে। তাদের মধ্যে বেহিসাবী ও বেওজনের মানুষ প্রায় দেখা যায়। একটা দৃষ্টান্ত দেখ। আমাদের দেশে অন্ত্যজ জাতের লোকেরা সমাজের শ্রদ্ধা ও উচ্চশিক্ষা থেকে যুগ যুগ ধ'রে বঞ্চিত। তারা ধর্ম্মে কর্ম্মে জ্ঞানে কনিষ্ঠ অধিকারী এই কথাটা তাদের মনে দেগে দেওয়া হয়েছে। এই বিশ্বাসটা তাদের সংস্কারের মধ্যে দানা বেঁধে গেছে। তাদেরকে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে জোর করতে হয় না, তারা নিজেরাই সর্ব্বদা সঙ্কুচিত। অথচ ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগে এই অন্ত্যজ জাতির মধ্যেই অধ্যাত্মতত্ত্বের যে সব সাধক উঠেচেন তাঁরা কেবল জ্ঞানে নয়, চরিত্রে নয়, কাব্যরচনায় অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিলেন। বংশানুক্রমে সমাজের পায়ের তলায় যাঁদের স্থান তাঁরা অনায়াসে শীর্ষস্থানে উঠলেন, তাঁরা হ'লেন গুরু। হঠাৎ তাঁদের সৃষ্টির উপাদান ছাঁচ ছাপিয়ে খাপছাড়া গড়ন খাড়া করলে। এই অতিপরিমিত রচনায় কোনো পূর্ব্বাপরতা রইল না। এঁরা পূর্ব্ব যুগের এবং বর্ত্তমান পরিবেষ্টনের প্রবল প্রতিবাদরূপে সমস্তকে ছাড়িয়ে দাঁড়ালেন। এঁদের পরেও এই ধারার অনুবৃত্তি পাওয়া গেল না। অবস্থার প্রতিকূলতাকে লঙ্ঘন করবার মতো এই শক্তিকে অতিক্রমী-শক্তি নাম দেওয়া যাক। এই শক্তি মেয়েদের মধ্যেও একেবারেই দেখা যায় না তা হ'তেই পারে না। কিন্তু তাকে সকলে মিলে অঙ্কুরেই বিনাশ করে। দলানুগত মানুষ স্বভাবতই এই শক্তিকে দেখতে পারে না। কেননা একে তাদের সামাজিক প্যাকবাক্সে ধরানো শক্ত। মেয়েদের জন্যে যে প্যাকবাক্স তার মালমসলার স্থিতিস্থাপকতা একেবারেই নেই। এই জন্যে কোনো বিশেষ মেয়ের সৃষ্টি-প্রকরণে অতিপরিমিত যা' কিছু থাকে তা একেবারে শিশুকাল থেকেই কড়া প্যাকবাক্সের চাপে একেবারে চ্যাপটা হয়ে যায়।

অথচ এভোলুসন কাণ্ডে সীমাতিক্রমার দল প্রকাশের পথে এগিয়ে দেয়। মানুষের ইতিহাস প্রধানত ব্যক্তি বিশেষের রচনা। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টির পশলা আকাশের থেকে নেমে অন্তর্ধান করে, গভীর ও স্থির জলাশয় সেই মহাক্ষণিকের দানেই রচিত। মানুষের ইতিহাস ক্ষণজন্মাদের পালাগান। তারা একক কণ্ঠে নতুন নতুন ধুয়ো ধরিয়ে দেন, তখন দশের কণ্ঠ তার সঙ্গে সুর মেলাতে লাগে। অনেক বর্ব্বর সমাজে কন্যাসন্তানকে শিশুকালেই মারে। সকল সমাজেই এ পর্য্যন্ত নারীবেশে আবির্ভূত মহা আকস্মিককে গোড়াতেই মেরেচে। আর পঁচিশ বছর আগে য়ুরোপেও তাই ছিল। আজ সেখানে সামাজিক শ্রেণীগত কুঠরি থেকে মেয়েরা বেরিয়ে এসেচে। এখন থেকে অতিমানবীরা সংসারে আপন পুরো জায়গা পাবে ব'লে আশা করি। তাদের শক্তি নষ্ট হবে না। মানব

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমাজের সম্পদ বিপুল পরিমাণে বেড়ে যাবে। আমাদের দেশেও সেই শুভদিন কবে আসবে কে জানে? কিন্তু প্রাণ-পুরুষের অভাবনীয় লীলাকে চিরদিন ঠেকিয়ে রাখবে কে?

বর্ত্তমান যুগের একটা প্রবল লক্ষণ এই যে চিরদিন যারা পিছনে অন্ধকারে ছিল আজ তারা সামনে এগিয়ে আসচে। জগতের শূদ্রেরা সমাজের তলায়, তারা উপরি দলের প্রকাণ্ড চাপে প'ড়ে ছিল। এই চাপকে অস্বীকার ক'রে কোন দিন তারা মুক্ত হ'য়ে বেরিয়ে আসবার স্পর্দ্ধা করবে এমন কথা কেউ চিন্তা করতেও পারত না। সমাজের সমস্ত স্থূল প্রয়োজনের সম্মিলিত তাগিদ বহন করবার কাজে আপন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত ক'রে দিয়ে তারা সকলে মিলে একটা মানবপিণ্ড হ'য়ে উঠেছিল; আত্মশক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রাণের চাঞ্চল্য বিস্তার করবে এমন ফাঁক তাদের মধ্যে যথেষ্ট ছিল না, এইজন্যে তারা কেবল বাইরের ঠেলাতেই নড়েচে গড়িয়েচে, ঘানির মতো ঘুরেচে, জাঁতার মতো পিষেচে। মনোগতির স্বাধীনতা না থাকাতে তারা বিশেষ কিছু সৃষ্টি করতে পারত না, কেবল উৎপন্ন করত; চালন করতে পারত না, বহন করত। তাদেরকে অজ্ঞ ক'রে রাখাই সমাজের গরজ ছিল। কেননা জ্ঞানে মানুষ কেবল বাইরের জিনিষকে জানে না, নিজেকেও জানে। নিজেকে যে জানে অন্যে তাকে আপন দরকারের সঙ্গে একান্ত খাপ খাইয়ে নিতে গেলেই ঠোকাঠুকি বাধে। তার সঙ্গে যোগ-সাধন করতে গেলেই আপোষে রফা নিষ্পত্তি করতে হয়। রাজার পক্ষে প্রজার আকারেই হোক, ধনীর পক্ষে মজুরের আকারেই হোক, এটাতে উপরওয়ালার রাস্তা বন্ধুর হ'য়ে ওঠে। পাশ্চাত্য সমাজে জ্ঞানের আলো পরিব্যাপ্ত হ'য়ে যেখানে শূদ্রেরা অচেতনে একাকার হ'য়ে ছিল সেখানে চৈতন্য বিস্তার করলে, তার সঙ্গে সঙ্গেই হোলো তাদের স্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধি, আত্মকর্ত্তৃত্ব-বোধ। প্রভু-দাসের সম্বন্ধটা আজ আর সহজ থাকচে না। দেশের সনাতনী অজ্ঞানটা জনসাধারণের ঘাড় থেকে যেই নামবে অমনি আপনিই তাদের মাথা হবে উঁচু। রাজা প্রজার সম্বন্ধের মূলে যে গভীর অপমান আছে সে সহজেই যাবে ঘুচে। জ্ঞান ছাড়া, আত্মোপলব্ধি ছাড়া স্বাধীনতা হ'তেই পারে না। আমাদের পূর্ব্বযুগে মেয়েরা ছিল পুরুষদের অন্তরায়। সংসারের সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনের কাছে তারা পারিবারিক কল-টেপা পুতুলের মতো বিহিত নিয়মে আওয়াজ করেচে, হাত পা নেড়েচে। অজ্ঞতা ও অশক্তিই যে তাদের ভূষণ এই কথাই তারা জানে। মাতা বা গৃহিণীর বিশেষ বিশেষ মোড়কেই তাদের পরিচয়। তাদের মনুষ্যত্বের যে স্বাতন্ত্র্যটি মোড়ক ছাড়িয়েও প্রকাশ পায় তা কখনো বা অস্বীকৃত, কখনো বা নিন্দিত। এমনি ভাবে মেয়েরা মানুষের একটা প্রকাণ্ড লোকসান ঘটিয়ে এসেচে। আজ এল এমন যুগ যখন মেয়েরা মানবত্বের পূর্ণ মূল্য দাবী করচে। জননার্থং মহাভাগা ব'লে তাদের গণনা করা হবে না। সম্পূর্ণ ব্যক্তিবিশেষ ব'লেই তারা হবে গণ্য। মানব সমাজে এই আত্মশ্রদ্ধার বিস্তারের মতো এত বড়ো সম্পদ আর কিছুই হ'তে পারে না। গণনায় মানুষের পরিমাণ পাওয়া যায় না, পূর্ণতাতেই তার পরিমাণ। আমাদের দেশেও কৃত্রিম-বন্ধন-মুক্ত মেয়েরা যখন আপন পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমা লাভ করবে তখন পুরুষও পাবে আপন পূর্ণতা।

চিঠি লিখ্‌তেই বসেছিলুম, কিন্তু ঝরনা হয়ে গেল নদী। মাথার মধ্যে অনেক কথাই বরফের মতো অচল হ'য়ে জমে থাকে, হঠাৎ সূর্য্যের তাপে একবার যদি গলতে সুরু করে তাহলেই বন্যা নামে, এই চিঠিটা সেই রকমের একটা আকস্মিক উৎপাত। এই বেলা যদি বাঁধ না বাঁধি তাহ'লে প্রবন্ধের ভদ্রসীমাও টিকবে না। ইতি ১৫ই বৈশাখ ১৩৩৫।
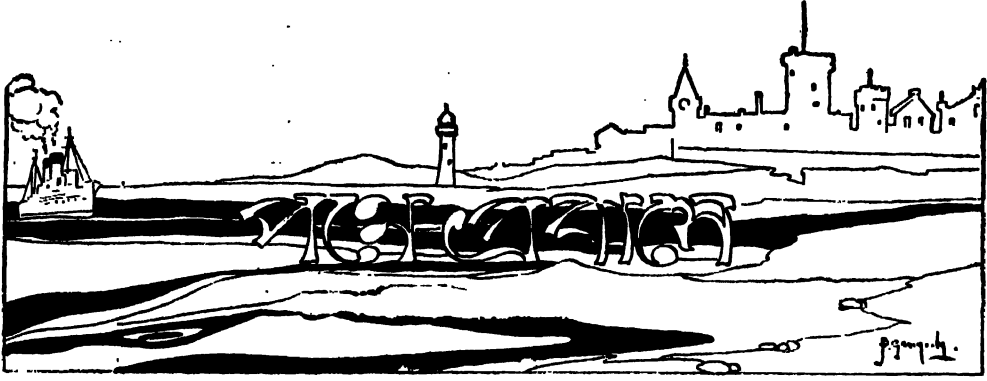
—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

৮

এদেশে স্বতন্ত্র বর্ষাঋতু নেই ব'লে প্রত্যেক ঋতুই অংশত বর্ষাঋতু। সময় নেই অসময় নেই বর্ষাঋতুর বর্গীরা অপর ঋতুদের খাজনা থেকে চৌথ আদায় ক'রে যায়। সকালবেলা শুয়ে শুয়ে দেখ্‌লুম আলোতে ঘর ভরে গেছে, ফুট্‌ফুটে খোকার মুখে হাসি আর ধরে না, আকাশের সেই হাসি তরুণী ধরণীর মাতৃ-মুখখানিকে পুলকে গর্ব্বে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। এটা বসন্তকাল। কোকিলের কুহু শুন্‌ছিনে, কিন্তু সমস্তদিন কত পাখীর কিচিমিচি। গাছেরা নতুন দিনের নতুন ফ্যাসান অনুযায়ী সাজ বদলে ফেলেছে, তাদের এই কাঁচা সবুজ রঙের ফ্রক্‌টিকে তারা নানা ছলে দেখাচ্ছে, ঘুরে ফিরে দেখাচ্ছে, আধেক খুলে দেখাচ্ছে। বাতাস একজন গ্যালাণ্ট্‌ যুবার মতো তাদের শ্রীমুখের তুচ্ছতম মামুলীতম কায়দা-দুরস্ত ফরমাস্‌ শুন্‌বে ব'লে উৎকর্ণ হয়ে নিমেষ গুন্‌ছে এবং শুন্‌বামাত্র শশব্যস্ত হয়ে দিগ্বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। তার সেই ব্যস্ততার উষ্ণ স্পর্শ পেয়ে উঠে বস্‌লুম। ভাব্‌লুম এবারকার বসন্তটাকে এক ফাদিং-ও ফাঁকি দেবো না, পরিপূর্ণভাবে ভোগ ক'রে নেবো। আকাশ এত নীল, মাটী এত সবুজ, বাতাস এত কবোষ্ণ, পাখী এত অস্থির, ফুল এত অজস্র—এই ভরাভোগের মাঝখানে আমি যদি আন্‌মনা থাকি তো আমার শিরসি চতুরানন কী না লিখ্‌বেন?

কিন্তু, এ কি হা হন্ত কোথা বসন্ত! দেখ্‌তে দেখ্‌তে এলেন কি না ইন্দ্ররাজের ঐরাবতের পাল, স্বর্গরাজ্যের ইস্কুল মাষ্টার তাঁরা, অত্যন্ত পক্ক প্রবীণ অভ্রান্ত, তাঁদের গুম্ফশ্মশ্রু-ধবল বদন-মণ্ডল। তাঁদের স্থূল হস্তাবলেপনে আকাশের চোখ ফেটে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল, তার সদ্যোজাত লাবণ্য গেল এক ধমকে মলিন হয়ে। হায় হায় ক'রে উঠ্‌ল পৃথিবীর জননী-হৃদয়টা।

এ দেশের এই খেয়ালী weather দু'দিনেই মানুষকে মরীয়া ক'রে তোল্‌বার পক্ষে যথেষ্ট। বার বার আশাভঙ্গের মতো পরীক্ষা আর নেই, প্রতিদিন সেই একই পরীক্ষা। সকালের আশা দু'পুরে ভাঙে, রাত্রের আশা সকালে ভাঙে। নিত্য অনিশ্চয়ের মধ্যে বাস কর্‌তে কর্‌তে জীবনের ফিলজফীটাই যায় বদ্‌লে। মনে হয়, দূর হোক ছাই, বাইরের কাছ থেকে খুব বেশি প্রত্যাশা কর্‌ব না, কালেভদ্রে যখন যেটুকু পাই তখন সেইটুকু ঢের, যেন সেইটুকুকেই হাতে হাতে ভোগ ক'রে নিতে প্রস্তুত থাকি, অন্যমনস্কভাবে লগ্ন না বইয়ে দিই, কিম্বা চপল লগ্নকে র'য়ে স'য়ে ভোগ কর্‌তে গিয়ে মুখের গ্রাস থেকে বঞ্চিত না হই।

বাইরের কাছ থেকে আনুকূল্য না পেয়ে ইউরোপ একদিকে হয়েছে ভোগগ্রাহী, অন্যদিকে হয়েছে ভোগসংগ্রাহী। সে বাইরে থেকে যা পায় তার তলানি অবধি শুষে নেয়, যা

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

পায় না তাকে প্রাণপণে অর্জ্জন করে। বার বার আশাভঙ্গ জনিত অনিশ্চয় তাকে অভিভূত করতে পারলে সে কবে মরত, কিন্তু অভিভূত করা দূরে থাক্ তার জেদ বাড়িয়ে দিয়েছে। বাইরের সঙ্গে তার যে পরিচয় সে যেন "খড়্গো খড়্গো ভীম পরিচয়।" প্রতিপক্ষকে হার মানাবে বলে সে প্রতিপক্ষের নাড়ী নক্ষত্র জেনে নিয়েছে—সেই হচ্ছে তার বিজ্ঞান। জগৎটাকে মায়া বল্বার মতো সাহস যে তার হয়নি তার কারণ মরীচিকা দেখ্তে পাবার মতো চোখ-ধাঁধানো সূর্য্যালোক এদেশে দুর্ল্লভ। যা পায় তাকে অনিত্য ব'লে ত্যাগ কর্বার মতো বাবুয়ানাও তার সাজে না, কেননা সে যা পায় তা অপ্রসন্না প্রকৃতির বাম হস্তের মুষ্টিভিক্ষা, আর আমরা যা পাই তা অন্নপূর্ণা প্রকৃতির অঞ্জলিভরা দান। ভিক্ষা ক'রে এদেশে একমুঠো ভিক্ষার সঙ্গে এত মুঠো অপমান মেলে যে নিতান্ত দায়ে ঠেক্‌লে ভিক্ষার চেয়ে উদ্বন্ধনই হয় শ্রেয়। অথচ ভিক্ষা করাটা আমাদের উপনয়নের অঙ্গ, সন্ন্যাসের অবলম্বন, আমাদের শিব স্বয়ং ভিখারী। অবশেষে এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের দেশে সন্ন্যাসী যত আছে গৃহস্থ তত নেই, মুখের চেয়ে হাতের সংখ্যা কম, পুরুষকারের অভাবে সমস্ত দেশজোড়া ক্লৈব্য। সেইজন্যে ভো'গের নামটা পর্য্যন্ত আমাদের কানে অশ্লীল।

ইউরোপের মানুষের একমাত্র ভাবনা যে জীবনটাকে enjoy কর্‌তে পার্‌ছে কিনা, enjoy করা ছাড়া তার কাছে জীবনের অন্য কোনো মানে নেই। ভোগের জন্যে সে প্রাণপণে ভুগেছে, বার বার আশা ভঙ্গ সত্ত্বেও প্রাণভ'রে আশা রেখেছে, যে লক্ষ্মীকে সে অর্জ্জন করলে তাকে যদি সে ভোগ করতে না পার্‌লে তবে তার জীবনটাই ব্যর্থ হলো। তার স্ত্রীকে তো সে পিতার হাত থেকে পায়নি যে অতি সহজে ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসীয়ানা কর্‌বে! সে স্বয়ম্বর-সভার বীর, প্রকৃতি তার ভোগ্যা। প্রকৃতিকে এড়াবার তপস্যা তার নয়, মুক্তি নয় ভুক্তিই তার লক্ষ্য, এর জন্যে যে ক্ষমতা চাই সেই ক্ষমতার তপস্যাই ইউরোপের তপস্যা।

ঈষ্টারের ছুটীতে লণ্ডনের বাইরে গিয়ে ভোগের চেহারা দেখ্‌লুম। তপস্যার জন্যে কাজের জন্যে লণ্ডন। ভোগের জন্যে ছুটীর জন্যে সমস্ত ইংলাণ্ড। যেখানে যাই সেখানে দেখি অসংখ্য হোটেল, বোর্ডিং হাউস্, সরাই, রেস্তর্যাঁ, paying guest রাখ্‌তে ইচ্ছুক গৃহস্থ বাড়ী। সর্ব্বত্র মোটরগম্য মজ্‌বুৎ তক্‌তকে রাস্তা। সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানগুলিতে স্নান সাঁতার নৌ-চালনার আয়োজন। কোথাও মাছধরা কোথাও শিকার করা। সর্ব্বত্র টেনিস্‌কোর্ট সর্ব্বত্র গল্‌ফ্‌কোর্স্। এমন স্থান অতি অল্পই আছে যেখানে সিনেমা নেই রেডিও নেই টেলিগ্রাফ টেলিফোন ডাকঘর নেই সারকুলেটীং লাইব্রেরী নেই। যার যতদূর সাধ্য সে ততদূর খরচ ক'রে ছুটী কাটাতে যায়, অত্যন্ত অল্পবিত্তদের পক্ষেও এর ব্যতিক্রম হয় না। আমাদের যেমন তীর্থযাত্রার বাতিক, এদের তেমনি holiday habit। কাজের সময় যেমন কাজকে এক মিনিট ফাঁকি দেয় না, ছুটীর সময় তেমনি ছুটীকে এক সেকেণ্ড ফাঁকি দেয় না। ছুটী পেলেই এক একখানা স্যুট্‌কেস্ হাতে ক'রে বালক-বৃদ্ধ-বনিতা কর্ম্মস্থল ছেড়ে ক্রীড়াস্থলে রওয়ানা হয়। তারপর একস্থানে যতদিন খুসী হোটেল বাস, char-a-banc পূর্ব্বক স্থান পরিক্রম, খেলাধূলার ধুম, পানাহারের আড়ম্বর, নাচ গানের মজ্‌লিস্। গত যুগের পূজা পার্ব্বণ আর নেই, দেড় শতাব্দীর industrialisation ইউরোপের চেহারা বদ্‌লে দিয়েছে। কর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের এবং ছুটীর সঙ্গে পার্ব্বণের যে সোদর সম্বন্ধ ছিল এখন সে সম্বন্ধ অনেক দূর সম্বন্ধ, মাঝখানে অনেক পুরুষ গত হয়েছে।

আমি যে অঞ্চলে গিয়েছিলুম তার নাম আইল্ অব্ ওয়াইট্। দ্বীপটির পরিধি প্রায় ৬০ মাইল, কিন্তু তারি মধ্যে গুটি আটদশ ছোট ছোট সহর ও বিশ পঁচিশটি ছোট ছোট গ্রাম। এই সহর ও গ্রামগুলির অধিকাংশই টুরিষ্ট্-জীবী। গ্রীষ্মকালে যে সব টুরিষ্ট্ আসে তাদের খাইয়ে খেলিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাদেরি দৌলতে বৎসরের বাকী সময়টা নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। তখন হোটেলগুলো খাঁ খাঁ করতে থাকে দোকান পাট কোনো মতে বেঁচেবর্ত্তে রয় খেলার মাঠে আগাছা গজায়। স্থানীয় লোকগুলি সাধারণতঃ চাষা মুদি রুটিনির্ম্মাতা মাঝি জেলে মজুর। তবু এরাই নিজেদের প্রতিনিধি দিয়ে এই সব সহর গ্রাম শাসন করে। খুব ছোট ছোট গ্রামগুলিতেও স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত।

সহর যেমন সব দেশেই প্রায় একই রকম গ্রামও দেখ্‌লুম সব দেশেই প্রায় এক রকম। মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে ইট-পাথরের দেওয়ালের ওপরে খড়ের চালা বা টালির ছাদ, দেওয়ালের গায় লতা উঠেছে ছাদের উপরে ঘাস গজিয়েছে —এরি নাম কটেজ্‌। তবে নূতনের সঙ্গে সন্ধি না ক'রে পুরাতনের গতি নেই। সংকীর্ণ গবাক্ষ, কিন্তু কাঁচের সার্শী। সেকেলে গড়ন, কিন্তু একেলে সরঞ্জাম। মুদির দোকানের ভিতরে ডাকঘর বসেছে, তামাক-চকোলেটের দোকানে টেলিফোনের আড্ডা, রেল ষ্টেশনের ভিতরে সস্ত্রীক ষ্টেশন মাষ্টারের আস্তানা। প্রত্যেক গ্রামে ছেলেদের খেলার মাঠ আছে, পাব্লিক লাইব্রেরী আছে। স্কুলের চেয়েও এদুটো জিনিষ উপকারী। স্কুলের সংখ্যা ক'মে এদুটোর সংখ্যা বাড়্‌লে ছেলেগুলি বাঁচে। স্কুলমাষ্টার মশাইগণকে কসাই-খানার ভার দিলে তাঁরাও তাঁদের যথাস্থান পান। শিক্ষার নামে শিশুমনের ওপর যে-বলাৎকার সব দেশেই চলে এসেছে এ যুগের শিশু সে-বলাৎকার সহ্য করবে না। শিশুও চায় স্বরাজ। তার নিজস্ব শিক্ষা সে নিজেই খুঁজে নেবে।

সহর ও গ্রামগুলি যেমন পরিষ্কার তেমনি পরিপাটী। ক্ষুদ্রতম গ্রামেরও পথঘাট অনবদ্য এবং বাড়ী ঘর সুখদৃশ্য। অতি দরিদ্র "chimney sweep" (ঝাড়ুদার) যে বাড়ীতে থাকে সে বাড়ীর বাইরে bell আছে, তার কাঁচের জানালার ওপাশে ধব্‌ধবে পর্দ্দা, যথাস্থানে সন্নিবেশিত অল্পবিস্তর আস্‌বাব, সমস্ত গৃহটির বাইরে ভিতরে এমন একটি শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যের আভাস যে তেমনটি আমাদের ধনীদের গৃহেও বিরল। ধন নয়, মনই রয়েছে এর পিছনে, সে মন ভোগ-তৎপর মন। সেইটি যদি থাকে তো উপকরণের অভাব হয় না, যা জোটে তাকেই কাজে লাগানো যায়, যা জোটে না তাকে অর্জ্জন ক'রে নেওয়া যায়। এ সংকেত আমরা জানিনে, কেননা পরলোকে বাসা বাঁধ্‌বার ব্যস্ততায় ইহলোকের বাসাকে আমরা এক রাত্রির পান্থশালা ভেবে এসেছি, তার প্রতি আমাদের দায়িত্ব মানিনি, যে-দেহে বাস করি সে-দেহকে যেমন অনিত্য ভেবে অনাস্থা দেখাই, যে-গৃহে বাস করি সে-গৃহকেও তেমনি অনিত্য ভেবে অবহেলা করি। এদিকে কিন্তু ইহলোককে এরা মরেও ছাড়্‌তে চায় না, কফিনের ভিতরে শুয়ে মাটীকে আঁকড়ে ধরে, এদের বিশ্বাস জগতের শেষ দিন অবধি এদের এই মাটীর শরীরখানা থাক্‌বে।

তা ছাড়া আমার মনে হয় এদেশের এই গৃহ-পারিপাট্য ও পরিচ্ছদ-পারিপাট্যের মূলে রয়েছে এদেশের নারী-শক্তির সক্রিয়তা। আমাদের ইহবিমুখ ধর্ম্ম হচ্ছে নারীবিমুখ ধর্ম্ম, আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারে নারীর অন্তরের সায় নেই, আমাদের গৃহ নারীর সৃষ্টি নয় এবং গৃহের বাইরেও নারী আমাদের সৃষ্টি কর্‌তে পায় না। ইউরোপের নারী তার স্বামীগৃহের রাণী, শ্বাশুড়ী-জা'দের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই, ইউরোপের কোথাও একান্নবর্ত্তী পরিবার নেই। নিজের ঘরের সমস্ত দায়িত্ব এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার হাতে, সেইজন্যে ইউরোপের গৃহিণীর হাত এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম পায় না, ঘরটির ঝাড়া মোছা ঘষা মাজাতে সর্ব্বক্ষণ ব্যাপৃত। সন্তান সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি দায়িত্ব এবং ততখানি স্বাধীনতা। জা' শ্বাশুড়ীর সাহায্য নেই হস্তক্ষেপ নেই। ইউরোপের ছেলেরা "home" নামক যে-জিনিষটি পায় সেটির একদিকে মা অন্যদিকে বাবা, মাঝখানে ছোটবড় ভাইবোনগুলি। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় এক টেবিলে সকল ক'টিতে মিলে খায়, রাত্রে এক অগ্নিস্থলে সকল কটিতে মিলে গল্প বা গান বাজনা করে, অল্পে সম্পূর্ণ ছোট একটুখানি নীড়। এর মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা সহজ, এর মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি কর্‌তে গিয়ে নিত্য কলহ নেই, এটা একটা বিরাট যজ্ঞশালার মতো কোলাহলমুখর নয়।

সে যাই হোক, ইউরোপের গৃহিণীদের কাছ থেকে আমাদের গৃহিণীদের অন্ততঃ একটি বিষয় ভক্তি ভরে শিক্ষা কর্‌বার আছে। সেটি, গৃহের শৃঙ্খলাবিধান ও পারিপাট্য-সাধন। নিজের আশে পাশেকে নিয়েই নারীর সৃষ্টি। নারীর আভামণ্ডল হচ্ছে নারীর পরিচ্ছদ, নারীর গৃহ। কিন্তু আমাদের রন্ধনপর্ব্ব এত অধিক সময় নেয় যে তার পরে অন্য কিছু কর্‌বার না থাকে অবসর না থাকে বল। অথচ গ্যাসের উনুনের সাহায্যে এদেশে দরিদ্রতমা গৃহিণীরাও আধ ঘণ্টায় এক বেলার রান্না চুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। তার পরে hire purchase প্রথার প্রবর্ত্তন হয়ে অবধি

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

গরীবের ঘরেও আস্‌বাবের নিঃস্বতা নেই, অনেকের একটি পিয়ানো পর্য্যন্ত আছে। কোন্ বিষয়ে খরচ কমিয়ে কোন্ বিষয়ে খরচ বাড়াতে হয় সেটা একটা আর্ট্‌। খরচ কমানো মানে টাকার খরচ না, সময়েরও খরচ! আমাদের দেশে যা দাসীর কাজ এদেশের গৃহিণীরাও তা যন্ত্রের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত ক'রে স্বহস্তে সারেন। তার ফলে যে-টাকা ও সময় বাঁচে সে টাকায় ও সময়ে বিদ্যাবতী কলাবতী স্বাস্থ্যবতী হওয়া যায়। গ্রামে দেখ্‌লুম প্রায় প্রত্যেকেরই বাগান আছে, সে বাগানে বাড়ীর মেয়েরাই কাজ করে, ছেলেরা বাইরের কাজে ব্যস্ত। লণ্ডনেও অনেক বাড়ীতে ছোট একটুখানি বাগান আছে, বাগানকে ইংরাজেরা বড় ভালোবাসে। বাইরের কাজ থেকে ফিরে এসে বাগানের কাজ করা এদের অনেকেরই একটা hobby। গ্রামে দেখ্‌লুম অবসর পেলেই গৃহিণীরা সেলাই নিয়ে বসেছেন, গল্পগুজবে গা ঢেলে দিয়েও হাতের কাজটিতে ঢিল দিচ্ছেন না। হাজারো বিলাসিতা করুক্ এদেশের মেয়েরা উপার্জ্জন কর্‌তে পটু, তথা উপার্জ্জন বাঁচাতে পটু। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় কারুশিল্পের ও গার্হস্থ্য অর্থনীতির। জনপিছু ছ' পেনী খরচ ক'রে কতখানি supper (নৈশ ভোজন) রাঁধা যেতে পারে কিম্বা অল্প খরচে কি-কি পোষাক স্বহস্তে তৈরী করা যেতে পারে প্রতিযোগিতার এইরূপ বিষয় নির্দ্দেশ ক'রে দেন গ্রামের কর্ত্তৃপক্ষ। অনেক বাড়ীতে যে বাগান আছে সেই বাগানে পর্য্যটকদের চা' খাইয়ে অনেকে সংসারের আয় বাড়ায়। এই সব "tea gardens" ছাড়া অনেকের বাড়ীতে বা farm houseএ দু' তিনটে ঘর খালি থাকে, সেখানে paying guest রাখা হয়। অধিকাংশ গৃহস্থের মুরগী শূয়োর গরু ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পোষ্য আছে। অর্থাগমের ও অর্থ সঞ্চয়ের যত উপায় আছে কোনোটাই কেউ পারৎপক্ষে বাদ দেয় না। কায়িক শ্রমকে ঘৃণা কর্‌বে কি, কায়িক শ্রমকে এরা শ্রদ্ধা ক'রে থাকে। বাড়ীর ভৃত্যের সঙ্গে এক টেবিলে ব'সে খাওয়া বাড়ীর কর্ত্তার পক্ষে কিছুমাত্র লজ্জাকর নয়। এবং আহারের পরে সকলের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার কর্‌তে এগিয়ে যান স্বয়ং গৃহিণী।

গ্রামে দেখলুম সাইক্লের চল কিছু বেশি। এবং ওটা সাধারণতঃ মেয়েদেরই যান। মেয়েরা ঐ চ'ড়ে বাজার কর্‌তে যায়। ছেলেরা চড়ে মোটর সাইক্ল্‌। তবে মেয়েরা যেমন উঠে পড়ে লেগেছে আর কিছুকাল পরে ওটাও হবে প্রধাণতঃ মেয়েলী যান। এরোপ্লেনে ক'রে এাট্‌লাণ্টিক অতিক্রম কর্‌তে গিয়ে মরাটাই হচ্ছে এখন তাদের আধুনিকতম ফ্যাসান। হিষ্টিরিয়ায় মরার চেয়ে এটা তবু স্বাস্থ্যকর ফ্যাসান। মহাযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপে cult of joy এর চর্চ্চা বেড়েছে। যুবকরা জেনেছে, যে-কোনো দিন দেশের ডাকে প্রাণ দিতে হবে, এই নিষ্ঠুর যুগে প্রাণের মূল্য নেই, প্রাণ সম্বন্ধে serious কেউ নয়। সুতরাং যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ হাস। যুবতীরা জেনেছে পুরুষ-সংখ্যার স্বল্পতা বশতঃ বিবাহ অনেকের ভাগ্যে নেই, আর্থিক অস্বচ্ছলতাবশতঃ মাতৃত্ব আরো অনেকের ভাগ্যে নেই। সুতরাং যতটুকু পাই হেসে লবো তাই। ঘোরতর মোহভঙ্গের ভিতরে এ যুগের তরুণ তরুণীরা বাস কর্‌ছে। ছেলেদের চোখে democracyর কালো দিকটা ধরা প'ড়ে গেছে, উনবিংশ শতাব্দীর সব আদর্শ খেলো হয়ে গেছে, জীবন নামক চিত্রিত পর্দ্দাখানা তারা তুলে দেখ্‌লে এর পেছনে লক্ষ্য ব'লে কিছু নেই। সুধু বাঁচ্‌বার আনন্দে বাঁচ্‌তে হবে, হাস্‌বার আনন্দে হাস্‌তে হবে। এ যুগের তরুণ যত হাসে তত ভাবে না। মেয়েরা বুঝ্‌তে পেরেছে, ভোট্ এবং আর্থিক অনধীনতাই সব কথা নয়, ওসব পেয়েও যা বাকী থাকে তার ওপরে জোর খাটে না, সেটা হচ্ছে পরের হৃদয়। এ যুগের মেয়েদের মতো দুঃখিনী আর নেই। তবু তারা পণ করেছে কিছুতেই কাঁদবে না, কিছুতেই হট্‌বে না। জীবনের কাছ থেকে খুব বেশি প্রত্যাশা করা চলে না, এইটে এ যুগের ইউরোপের মূল সুর। যেটুকু আমাদের নিজেদের আয়ত্তগম্য সেইটুকুর ওপরে এ যুগের ইউরোপের ঝোঁক পড়েছে। সেইজন্যে এত দেহের দিকে নজর, আয়ুর দিকে নজর, যৌবনের দিকে নজর। ক্রমশঃই ইউরোপের লোকের স্বাস্থ্য বেড়ে চলেছে, আয়ু বেড়ে চলেছে, যৌবন বেড়ে চলেছে। সেই গর্ব্বে এ যুগের অগ্রসরপন্থীরা খ্রীষ্টীয় চরিত্রনীতি মান্‌তে চায় না, ইউরোপে এখন paganismএর যুগ ফিরে

এসেছে, দেহের উৎকর্ষের জন্যে এখন চরিত্রের সাতখুন মাপ।

এ যুগের মানুষ নির্জ্জনতাকে বাঘের মতো ডরায়। গ্রামের আদিম নির্জ্জনতার ভয়েই সে শহর শরণ করেছে, শহরে অরুচি হলে মাঝে মাঝে মুখ বদ্‌লাবার জন্যে সে গ্রামে যায়, সেই সঙ্গে সহুরে আমোদ প্রমোদ আরাম বিলাস-গুলোকেও পুঁটুলি বেঁধে গ্রামে নিয়ে যায়। প্রতি গ্রামের যে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল নাগরিক সভ্যতার steam roller তাকে থেঁতলে গুঁড়িয়ে সমতল ক'রে দিচ্ছে। সেই সমতলের ওপর দিয়ে নাগরিকের দল char-a-banc চ'ড়ে দু'ঘণ্টায় ষাট মাইল চক্কর দিয়ে যান, তারি নাম দেশ ভ্রমণ। এবং ছেঁটে কেটে সমান ক'রে আনা দৃশ্যগুলোকে মুহূর্ত্তমাত্র চোখে ছুঁইয়ে পরমুহূর্ত্তে বিস্মৃতির waste paper basketএর মধ্যে নিক্ষেপ করেন, তারি নাম দেশ-দর্শন। তারপর সন্ধ্যা জুড়ে বন্ধ ঘরে সিগারেটের ধোঁয়ায় অন্ধকূপ রচনা ক'রে সেই গর্ত্তের মধ্যে ব'সে সিনেমা দেখা এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে আহার নিদ্রা বিশ্রম্ভালাপ। কাজের দিনে ভূতের মতো খাটুনি, ছুটীর দিনে অরসিকের মতো সময়ক্ষেপ।

শহরে এ জিনিষ চোখে লাগে না। কিন্তু গ্রামে যখন এই জিনিষ দেখি তখন কেমন খাপছাড়া ঠেকে, চারিদিকের সঙ্গে এর মেলে না। প্রকৃতি সেই আদিকালের মতো শান্ত সুস্থির আত্মস্থভাবে কাজের সঙ্গে ছুটীর মিতালি ক'রে গরজের সঙ্গে আনন্দের তাল রেখে একঠাঁই দাঁড়িয়ে একটি পায়ে নূপুর বাজাচ্ছে। আর মানুষ কি না কাজকে দাসখৎ লিখে দিয়ে তার অনুগ্রহদত্ত অবকাশটুকু লাটিমের মতো ঘুরে অপচয় করছে। সমুদ্রের কলরোলের দিকে কান দেবার অবসর নেই, তৃণের সীমাহীন শ্যামলতার আহ্বানে চোখ সাড়া দেয় না। মাথার ওপরে উড়্‌ছে এরোপ্লেন, সমুদ্রের ওপরে ভাস্‌ছে লাইনার জাহাজ, রাস্তা তোলপাড় কর্‌ছে বাস্ মোটর, মাঠ তোলপাড় কর্‌ছেন গল্‌ফ্ ক্রীড়ারত টেনিস্ ক্রীড়ারত মানব-মানবীর দল। গতিশীল সভ্যতা যে জীবনের আনন্দ বাড়িয়েছে এমন তো মনে হয় না, বাড়িয়েছে কেবল জীবনের উত্তেজনা। জীবনকে সচেতন-ভাবে ভোগ করা নয়, কোনোমতে হেসে খেলে ভুলে কাটিয়ে দেওয়া। নির্জ্জনতার মধ্যে নিজের সঙ্গে একলা থাকার মতো শাস্তি আর নেই। কাজে হোক অকাজে হোক কিছু-একটাতে ব্যাপৃত না থাক্‌তে পার্‌লে মনে হয় সময়টা মাটী হলো, এই সময়টা অন্যেরা কাজে লাগাচ্ছে, ফুর্ত্তি লুটছে। কাজের দিনে এক মুহূর্ত্ত ধ্যানস্থ হবার জন্যে স্থির হবার জো নেই পাছে প্রতিযোগীর দল মাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যায়, পেছিয়ে প'ড়ে প্রাণে মরি। ছুটে চলার এই বেগ ছুটীর দিনেও সম্বরণ করতে পারিনে, নানা বাসনে নিজেকে ব্যস্ত রেখে মনে করি খুব enjoy করছি বটে, এই তো সক্রিয় আনন্দ, এই তো জ্যান্ত মানুষের মতো। আসলে কিন্তু এইটেই হচ্ছে চূড়ান্ত নিষ্ক্রিয়তা। ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে চলার চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ঢেউ ভাঙা বড় কঠিন আনন্দ। আত্মস্থ না হয়ে ভোগ নেই।

তবে এই একটা মস্ত কথা যে একালের বাসন সেকালের মতো বলক্ষয়ী নয়। একালের মানুষ হয়তো দৃশ্য-গন্ধ-সঙ্গীতের রসগ্রাহী নয়, কলার নামে কৃত্রিমতাকেই সে মহামূল্য মনে করে, বাস্তবতার অন্বেষণে সে কল্পনাবৃত্তি খুইয়েছে, প্রগাঢ় passionএর পরিবর্ত্তে উগ্র sensationই তার অনুভূতি জুড়েছে। তবু এসব সত্ত্বেও সে স্বাস্থ্যবান প্রাণবান বলবান। বিষপান করেও সে নীলকণ্ঠ। প্রচুর হাস্যরস তার স্বাস্থ্য বাড়িয়ে দিচ্ছে, অজস্র খেলাধূলা তার বল বাড়িয়ে দিচ্ছে, বিজ্ঞান তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌ছে—"অহং ত্বাং সর্ব্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

আইল্ অব ওয়াইট্ বড় সুন্দর স্থান। নীলরঙের ফ্রেমে বাঁধানো একখানি সবুজ ছবির মতো সুন্দর। তবে এদেশের সবুজ যেন আমাদের সবুজের মতো কান্ত নয়, স্নিগ্ধ নয় কেমন যেন তীব্র আর ঝাঁঝালো। তৃপ্তি দেয় না, উন্মাদনা দেয়; ছাড়্‌তে চায় না, টেনে রাখে; আবেশের চেয়ে জ্বালা বেশি। দ্বীপটির কোনো কোনো স্থল এত নিরালা যে নেশার মতো লাগে। দিন যেদিন উজ্জ্বল থাকে চোখ সেদিন তন্দ্রালসে নুয়ে পড়্‌তে চায়। বাতাসে পাল তুলে দিয়ে নৌকা ভেসে যাচ্ছে। গম্ভীরভাবে ওপারের পাশ দিয়ে যাচ্ছে দূরদেশগামী জাহাজ। মাথার ওপরে চিলের মতো উড়্‌ছে এরোপ্লেন— এত ওপরে যে, তার বিকট কণ্ঠরব কানে পৌছয়না।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

কানে বাজ্‌ছে শুধু জলকণ্ঠের ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল। তটকে যেন আদি কাল থেকে সেধে আস্‌ছে, তবু তার মান ভাঙাতে পার্‌ছে না। মাটী তার সবুজ চুল এলিয়ে দিয়েছে। যেমন তার রূপ তেমনি তার গন্ধ। ঘুমের থেকে প্রশান্তি কেড়ে নেয়, চেতনার থেকে প্রতীতি কেড়ে নেয়। সব মিলিয়ে মনে হতে থাকে যেন স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম। সত্য কেবল ঐ আপনাভোলা শিশুগুলি, ঐ যারা বালি দিয়ে ঘর তৈরি কর্‌ছে, বাঁধ তৈরি কর্‌ছে, ঘরের মধ্যে ভালোবাসার পুতুলকে রাখ্‌ছে। সমুদ্রের এক ঢেউ এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ওরা তাই দেখে হো হো করে হেসে উঠ্‌ছে, আবার সেই ঘর ইত্যাদি।

গ্রামের লোকগুলিকে ভালো লাগ্‌ল। বিদেশী দেখ্‌লেই সম্মান করে, কুশল প্রশ্ন করে, সাহায্য কর্‌তে ছুটে আসে। শহুরে ইংরেজদের দেখে ইংরেজ জাতিকে যতটা নিঃশব্দ-প্রকৃতি ভেবেছিলুম গ্রাম্য ইংরেজদের দেখে ততটা মনে হলো না। সৌজন্যের চেয়ে বড় জিনিষ সৌহার্দ্দ্য। গ্রামের লোকের কাছে অল্পেতেই ও জিনিষ পাওয়া যায়। শহরের লোকের সঙ্গে বিনা introductionএ ভাব কর্‌বার উপায় নেই, যেটুকু আলাপ হয় সেটুকু ঘড়ির ওপরে চোখ রেখে। কিন্তু গ্রামের লোকের হাতে কাল অন্তহীন। সময়কে তারা ফাঁকি দিতে ডরায় না, সময়ের মূল্য নামক কুসংস্কারটা তাদের তেমন জানা নেই। তাদের নিজেদের মধ্যে পরস্পরের মনে অন্তরঙ্গতা যেমন সব দেশে, তেমনি এদেশেও। নিজের গ্রামের যে-কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হলেই নমস্কার বিনিময়, সুখদুঃখের আলোচনা। মুখ গুঁজে না দেখার ভাণ ক'রে পালাবার পথ খোঁজা নেই, কিম্বা weather সম্বন্ধে দুটো তুচ্ছ প্রশ্নোত্তর ক'রে ঘণ্টা ধ'রে চুপ ক'রে এক গাড়ীতে ভ্রমণ করা নেই।

তবে গ্রাম্য সভ্যতার এখন দিন ঘনিয়ে এসেছে সব দেশে। ইংল্যাণ্ডে এখন পল্লীতে যত লোক থাকে তার তিনগুণ থাকে নগরে। ফ্রান্সে জার্ম্মাণীতেও ক্রমশ গ্রামকে শোষণ ক'রে নগর মোটা হচ্ছে। "Back to Villages" যে ভারতবর্ষে সম্ভব হবে এমন তো মনে হয় না। বড় জোর গ্রাম থাকবে দেহে, তার আত্মা যাবে বদলে। গ্রাম্য সভ্যতার শবখানেতে ভর করবে নাগরিক সভ্যতার তাল বেতাল। গ্রামগুলি হবে নগরেরই ক্ষুদে সংস্করণ। তা ছাড়া গ্রামে নগরে ভেদরেখা কোনখানে টান্‌ব? লোক সংখ্যা বাড়্‌লেই গ্রামের নাম হচ্ছে নগর। নগরে ও গ্রামে যে প্রভেদ সেটা আকৃতিগত নয়, আকারগত প্রভেদ। নগরেরই মতো গ্রামও হোটেলে ভ'রে যাচ্ছে, ভাড়া ঘরে ভ'রে যাচ্ছে। এর মানে এই যে, এ যুগের মানুষ কোথাও স্থায়ী হতে চায় না। বেদেরা তাঁবু ঘাড়ে ক'রে বেড়ায়, আমরা তা করিনে। অন্যলোক আমাদের জন্যে তাঁবু খাটিয়ে রাখে, সারাজীবন আমরা কেবল এক তাঁবুর থেকে আরেক তাঁবুতে পাড়ি দিতে থাকি। এক কালে আমরা যাযাবর ছিলুম। তারপর কোন একদিন ধানের ক্ষেতের ডাকে ঘর গড়্‌লুম, স্থিতিশীল হলুম। এখন আমরা বাণিজ্যের পণ্য নিয়ে ফেরিওয়ালার মতো পথে বেরিয়ে পড়েছি, আমরা গতিশীল। পথও মনোহর। এতে শীত-আতপের কষ্ট আছে, ধুলো-বালির ঝড় আছে, কোথাও কর্দ্দম কোথাও কঙ্কর, তবু এও ভালো। লণ্ডনের বাইরে গিয়ে দেখ্‌লুম লণ্ডনের জনতার ভীড়কে অন্যমনস্কভাবে ভালোবেসে ফেলেছি। কাউকে চিনিনে, তবু সকলের প্রতি অজ্ঞাত টান। যেখানে যাই সেখানে দেখি লণ্ডনের লোক পরস্পরকে ঠিক্ চিনে নিচ্ছে, লণ্ডনে থাক্‌লে যার সঙ্গে কোনোদিন নমস্কার বিনিময়টা পর্য্যন্ত হয়ে উঠ্‌ত না, তার সঙ্গে অল্পেতেই ঘনিষ্ঠতা জন্মে যাচ্ছে। শহরের আড়ষ্টতা বাইরে থাকে না, আদব কায়দা চুলোয় যায়, শহর ছেড়ে যারা গেছে তাদের সেই অল্প ক'জনের মধ্যে কতকটা পারিবারিক সম্বন্ধের মতো দাঁড়ায়। তবে এটা দীর্ঘকালের নয় ব'লেই এত মধুর। সকলেই মনে মনে জানে যে ছাড়াছাড়ি যে-কোনো মুহূর্ত্তে হতে পারে। বিচ্ছেদটা অনিশ্চিত নয়, মিলনটাই অনিশ্চিত। অবুঝের মতো ভাব্‌তে ইচ্ছা করে, বলেও বসা যায় যে, আবার দেখা হবে, পুনর্দর্শনায় চ। কিন্তু আঁধার রাতের অপার সমুদ্রের জাহাজ দু'টির সেই যে সংকেত বিনিময় সেই আরম্ভ সেই শেষ। তারপর মাথা খুঁড়লেও আর দেখা হবে না। যদি হয়ও, তবে সে দেখা বন্দরের সহস্র জাহাজের ভীড়ে। তখন জনতার টানে টান্‌ছে, জনের

টান গায়ে লাগে না। তখন সে দেখায় চমক থাকে না, মামুলী মনে হয়। এটা পুনর্যাযাবরতার যুগ, আমরা সকলকেই চাই, কাউকেই চাইনে, আমাদের আলাপী বন্ধু শত শত, কিন্তু দরদী বন্ধু একটিও নেই, আমরা বিশ্বসুদ্ধ প্রসিদ্ধ লোকের নাড়ীর খবর জানি, কিন্তু আমাদেরি পাড়া-পড়শীদের নাম পর্য্যন্ত জানিনে। পাড়াপড়শী দূরে থাক্ আমাদেরি ফ্ল্যাটের নীচের তলায় যারা থাকে চোখেও তাদের দেখিনি। রেল ষ্টীমার এরোপ্লেনের কল্যাণে জগৎটা তো ছোট হয়ে গেল। কিন্তু ঘরের মানুষকে যে মনে হচ্ছে লক্ষ যোজন দূর। তবু এও সুন্দর। আমরা পথিক, আমাদের স্নেহ প্রীতি বন্ধুতার বোঝা হাল্‌কা হওয়াই তো দরকার, নইলে পদে পদে বাধা পড়্‌তে পড়্‌তে চলাই যে হবে না। একটি প্রেমে আমরা সকল প্রেমের স্বাদ পেয়েছি—সেটি, চলার পথের প্রেম। এর মধ্যে আর যাই থাক, আসক্তি নেই। আমরা নিষ্কাম ভোগী, আমরা ভোগ করি লোভ করিনে। কেন না, লোভ কর্‌লে পথে থাম্‌তে হয়, আর পথে থামাই হচ্ছে পথিকের মৃত্যু।

সিন্ধুকূলে

হুমায়ুন কবির

অনন্ত আঁধার মাঝে নিভিয়াছে আলোকের রেখা,
আকাশে নক্ষত্র নাই, সঙ্গীহীন এ ধরণী একা
চলেছে অসীম শূন্যে, অমাকৃষ্ণ গগনের তলে
বসিয়া বসিয়া একা শুনিতেছি তরঙ্গ কল্লোলে।
নিবিড় তিমিরতলে উঠিতেছে দুলিতেছে বারি,
দীর্ঘচ্ছন্দে প্রসারিত উর্ম্মি রেখা আঁধার বিদারি'
বারে বারে ঝলসিয়া উঠিতেছে ক্ষণিকের তরে।
তারা সবে দলে দলে ছুটে এসে লুটে বেলাপরে,
যেন দলে দলে সবে আলো জ্বালি' আঁধারের মাঝে
হারাণো মণির খোঁজে ঘুরে মরে তারাহীন সাঁঝে।
কাঁদিছে বালুকাবেলা, প্রিয় হারা উর্ম্মিরাশি কাঁদে,
বেদনাবন্ধন ডোরে নিঃসঙ্গ হৃদয় মম বাঁধে,
পথিক পবন কাঁদে, কাঁদিতেছে নিঃশব্দ ভুবন,
ব্যথায় উচ্ছ্বসি ওঠে চিত্ত মম, না মানে বারণ!

কানা-কড়ি

—গল্প—

শ্রীজগদীশরঞ্জন ঘোষ

১৩ই চৈত্র, ১৩৩৩ সাল।

আজ পঁয়ত্রিশের ঘরে পা দিলুম। জীবনের অর্দ্ধেকেরও বেশী পথ তো পেরিয়ে এলুম। ভবিষ্যতের পাথেয় সঞ্চয় করলুম কী?

স্ত্রী ইন্দ্রাণী, মেয়ে সুধারাণী, আর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে শ' কয়েক টাকা। এই আমার গত তিন যুগের সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য। এই শেষোক্ত আইটেমের পরিমাণ থেকে সহজেই অনুমান করা চলে আমার মাসিক বরাদ্দ আফি.স ধরা কত। মাহিনের ম্যাক্‌সিমাম চল্লিশের ওদিকটা আমার কাছে বরাবর অনাবিষ্কৃত রাজ্যই থেকে যায়—আফিসের দোর পেরোতে পারি, দেয়াল পেরোতে পারিনে।

নদীর কিনারে কিনারে যে পোড়া কাঠ্‌টা ফিকে বাদামী রংয়ের ফেনায় আর খড়কুটায় মণ্ডিত হয়ে কোন্ গুপ্ত ধনের সন্ধানে একবার এখানে আর একবার ওখানে কপাল ঠুকে ঠুকে ভেসে ভেসে যায়, সেটা স্রোতের টানে ধান-ক্ষেতের পাশে একটা অপরিসর নালায় ঢোকে আর জলের কিনারাটি ধরে বেত ঝোপের অন্তরালে মাদার গাছের গোড়া ঘেঁসে নিশ্চল হয়ে থাকে—নড়েও না চড়েও না।

এদিকে চল্লিশ টাকা থেকে দু'টাকা ন' আনা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর রসিদের জন্যে আফিসে রেখে সাঁইত্রিশ টাকা সাত আনা নিয়ে ঘরে ফিরি। তার অর্দ্ধেক যায় বাড়ীওয়ালা, ডাক্তার, ধোবা, নাপিত, মুচির পিছনে—সত্যি তো, মুচিও তো কম নেয় না কিছু!

ন' সিকের আলবার্ট, ঠনঠনে কেনা। তালির উপর তালি খেয়ে খেয়ে পাগলের গাত্রাবরণের মত বিচিত্র হয়ে ওঠে, তবু ওর পেট ভরাতে পারিনে। হয়ত অফিসে যাবার মাঝ রাস্তায়ই জিব্ বের করে অসহযোগের দাবী জানায়। পা'টা সন্তর্পণে উঁচু করে ফেল্‌তে হয়—নইলে পায়ে হুচট্ লাগার এবং নিজের সমূহ অনিষ্ট ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

স্ত্রীর নাম কিন্তু ইন্দ্রাণী। কার ইন্দ্রাণী? এককড়ি চক্কোত্তির। এককড়ি! ন' কড়ি নয়, সাত কড়ি নয়, ছ' কড়ি, পাঁচকড়ি, তিনকড়িও নয়, ঐ এককড়ি। মনে মনে হেসে বলি আমার মা বাপের কি আশ্চর্য্য দূরদৃষ্টি এবং দিব্যদৃষ্টি ছিল—

না হয়, অদৃষ্টের দোষ দিই। এ যে অদৃষ্টের একটা বিকট হা-হা করা বিদ্‌ঘুটে পরিহাস! এককড়ি, আর তার কিনা ইন্দ্রাণী! এ যে খালের ধারে বাজ-পড়া মাথা কাটা কাঠ্‌ঠোকরার ঠোঁটের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত তালগাছের পাশে কোন্ আমলের ময়ূরপঙ্খী গালসাটি—হাল ভাঙ্গা, পাঁজর বের করা তলা ফুটো। তার জান্‌লা আছে পাখি নেই, পাটাতন আছে ছাত নেই। তার সাদা রং দাঁড়ায় এসে ছাইয়েতে, লাল খয়েরে। সুধু কখনো একটা মাছরাঙ্গা ওর ভাঙ্গা হালখানায় এসে বসে।

এই আমার ইন্দ্রাণী। ত্রিশ পেরোয় নি, এক মেয়ের মা। কিন্তু দেখে মনে হয় কাঁচা বাঁশটিকে ঘুণে কেটেছে, ওর মধ্যে বুঝি সার পদার্থ কিছুই নেই। ও যেন ঝরা শিউলি ফুলটি। শুক্‌নো পাতা আর মাকড়শার জালে আট্‌কা পড়ে গেছে—মায়ের হাতের মত স্নেহ-শীতল বাতাসের এতটুকু স্পর্শ, ছোঁয় কি না ছোঁয়—আর টুপ্ করে নীচে পড়ে মা ধরিত্রীর শীতল বক্ষে আশ্রয় নেবে। ও যেন তাই চায়।

ওকে আর ইন্দ্রাণী বলিনে, মুখে কেমন বাধে। ইন্দু বলি। হ্যাঁ, ইন্দুই তো! নিশান্তের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর ইন্দু—পাণ্ডুর নিষ্প্রভ, ক্ষীণকায়া। সুধু নবসূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষায় আছে বুঝি। তারপর চোখকে ফাঁকি দিয়ে মেঘের আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে বেড়াবে।

ওর মুখের কমনীয়তা, দেহের লাবণ্য, অভাব তার খড়খড়া জিভ্ দিয়ে চকচক্ করে চেটে নিয়েছে। ঘাড়ে, গালে, কণ্ঠায় খাল—

ওর বগলের কাছে ছেঁড়া সেমিজ্টা বগলের আঁট রাখে না। ওর হাঁটুর নীচে কাপড়টা মস্ত একটা তালি নিয়ে "এই যে আমি, হি—হি" বলে নির্লজ্জের মত চেয়ে থাকে।

ওর হাতের উপর নীল শিরাগুলো ভাঙ্গা দেয়ালের গায়ে বটের বিক্ষিপ্ত শিকড়ের মত চোখকে পীড়িত করে। চোখ আপনি বুজে আসে বিষাদে।

* * *

আমি বলি—ইন্দু, এলাহাবাদে যাবে একবার? শরীরটা একটু সারতো হয়ত।

এলাহাবাদের ষ্টেশানের হেড্ বুকিং ক্লার্ক ওর বাবা। পয়সাওয়ালা।

ইন্দু বলে—শোন কথা। এই ধাড়ী মেয়ে নিয়ে নাকি —বলবে মেয়ে গলায় ঝুলছে কিনা কিছু টাকা পয়সা চায় তাই। আর আমি না হয় গেলুম-ই। তোমার কি হবে? হোটেলের ভাত তো তোমার রোচে না।

আমি বলি—রামচন্দ্রঃ! হোটেল কেন? স্বপাক! বেশ থাকা যাবে।

ইন্দু বলে—আমি বুঝি আর জানিনে! তোমরা নাকি হেঁসেলের ভোগ পোয়াতে পার?

আমি বলি—একবার দেখই না পরখ করে।

ইন্দু বলে—না গো না। এই তো বেশ আছি!

ফিক্ করে হাসে।

কে বলে অদৃষ্টের পরিহাস? এই তো ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য আমারি ভাঙা ঘরের উপর পর্য্যাপ্ত হয়ে পড়েছে মেঘের ফাঁকে চাঁদের আলোর মত।

দৈন্য দুঃখ ভুলে থাকি মুহূর্ত্তেক। রাত্রি শেষের কুয়াশায় ঢাকা পড়ে দিগন্ত প্রসারিত এব্ড়ো খেব্ড়ো অনুর্ব্বর জমি!

ওকে কাছে টেনে নিই। অযত্ন-বিন্যস্ত রুক্ষ চুলের মধ্যে নাক মুখ গুঁজে বলি—ইন্দু, বড় ভুল করেছি তোমাকে ঘরে এনে।

গলা ধরে আসে…

ইন্দু বোজা চোখে আবিষ্টের মত বলে—পাগল। তার চোখ্ও হয়ত ছলছলিয়ে আসে। কিন্তু ঠোঁটের উপর ফুটিয়ে রাখে একটু হাসি।

কী মলিন সকরুণ সে হাসি।

পনেরো বছর আগেকার সেই সোনালী উষার সাতরঙ্গা ভাণ্ডার লুট করা গোলাপী হাসিটিতো এ নয়! এ যে ক্লান্ত সন্ধ্যার স্তব্ধ তরুছায়াঙ্কিত নিথর জলের উপর অবলুণ্ঠিত সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মিটি—তেমনি ম্লান, তেমনি অবসন্ন—শেষ বিদায়ের অশ্রুজলে অভিষিক্ত!

হাতের তেলোয় আর আঙ্গুলের নখে হলুদ বাটার চিহ্ন নিয়ে এসে সুধা বলে—আজ মোচার ঘণ্ট বাবা। ঘি নেই, চারটে পয়সা দিতে হবে কিন্তু। চাবিটে দাও তো মা।

গোধূলির ধূসর অঞ্চল ধরে সন্ধ্যা তারাটি জ্বল্জ্বল্ করে।

আমি বলি—জানিস্ মা, পনোরো বছর আগে ঠিক্ তোর মত ছিল দেখ্তে তোর এই মা? তোর সিঁথেয় আজো সিঁদুর ওঠেনি এই যা তফাৎ।

তিন জনেই হাসি। কিন্তু তিনটি চাপা নিশ্বাস বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে এক হতে চায়। বুকের ভিতর পাক খেয়ে মরে।

এই আমাদের ধাড়ী মেয়ে সুধা। ও অনেক দিন আগে ওর বিয়ের বয়েস একটি একটি করে হজম করে তবে আজ অত বড় হয়েছে।

ওর মায়ের রূপগুণ সুধা পেয়েছে। বাপের সোনারূপো তো কিছুই পায় নি। তাই বিয়ের হাটে সুধা বিকোয় না। কেবল ধারে তো কাটে না, ভারেও কাটে যে। এ বয়সে আমাদের মত মা বাপের কাছে ওকে কিন্তু বেথাপ্পা দেখায়। বসন্তের ঝিরঝিরে হাওয়াটি যেন পথ ভুল করে গেরুয়ার আলখাল্লায় ঘেরা শুকনো লতাবিতানে এসে পড়েছে।

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন একটা সময় আসে যখন বাইরের অভাব অনাটনের কাছে তার অন্তর হার মান্তে চায় না—কেবলি আলগোছে, ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে চলে যায়। গায়ে হয়ত আঁচ লাগে,—মনে আঁচও লাগে না, ফোস্কাও পড়ে না।

কানা-কড়ি

শ্রীজগদীশরঞ্জন ঘোষ

চার পাঁচ বছরের আগেকার কথা। বিনয়ের মা ইন্দুর দূর সম্পর্কের কোনো-রকম-এক দিদি। বিনয়ের বাবা রংপুরের এক জমিদারের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বিধবা মাকে নিয়ে বিনয় আমাদের পাশের বাড়ীতে উঠে আসে। ব্যাঙ্কের গচ্ছিত অর্থ থেকে মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান ওদের হয়।

বিনয় তখন আই এ পড়ে। সুধা বছর দশেকের। গানের দিকে ওর ঝোঁক দেখে বিনয় ইন্দুকে বলে—মাসীমা ওকে আমি গান শেখাবো।

বিনয়ের গান বাজনায় বেশ একটু দখল ছিল। ইন্দু খুসি হয়ে বলে—শুধু গান নয়, একটু লেখাপড়াও শিখিও। ওর জন্যে আর মাষ্টার রাখ্‌তে পারিনে।

দুই-ই চলে।

একদিন সুধা তার মাকে বলে—একটা এসরাজ হলে বেশ হতো মা! নইলে শিখতে কষ্ট হয়।

ইন্দু বলে— পোড়াকপাল আমার। তোর এসরাজের তার ছিঁড়ে গেলে তার কেনার মত পয়সা যে জুট্‌বে নারে।

সাত আট টাকা দিয়ে একটা ছোট খাটো এসরাজ কিনে মেয়ের এই আব্‌দার রাখি তেমন সঙ্গতি নেই। আর মেয়ের এই প্রথম আব্‌দার। সাড়ী ব্লাউজ জ্যাকেট শায়ার জন্যে নয়। এক আধখানা গয়নার জন্যে নয়। সামান্য একটা এসরাজ। তাও দিতে পারিনে। ন্যায্য অন্যায্য কোনো একটা আব্‌দার রক্ষার মত অর্থের আনুকূল্য তার বাপ মায়ের যে নেই সুধা অল্প বয়সেই বুঝ্‌তে পারে! তবু এসরাজ না পেয়ে দুদিন যে মন মরা হয়ে থাকে।

ইন্দু বলে—দেখ, এতো সইতে পারিনে। ওর হাত খালি, গলা খালি, কান খালি। খোঁপার একখানি চিরুণী পর্য্যন্ত দিতে পারিনি। কোনো দিন কিছু চায়ওনি ও। দাও ওকে একটা এস্‌রাজ কিনে।

তার সামান্য গয়নার বাক্স থেকে দুখানি হাফ্‌গিনি—বের করে। বিয়ের সময় শ্বশুর মশায়ের আশীর্ব্বাদী। অনেক ঝঞ্ঝাবাত এদের উপর দিয়ে গেছে, কোনো দিন স্বস্থানচ্যুত হয়নি। আজ মার মন ট'লে। তাদেরও আসন টলে।

সুধার সেই বয়েস। ও খুব জানে ওর বিয়ের জন্যে ওর মা-বাপের ভাব্‌নার অন্ত নেই। সেই ভাবনার দীর্ঘ কালো ছায়া ওকেও যে না ছোঁয় তা নয়। সে মুহূর্ত্তের জন্যে।

মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে সুধা বলে—কেন এত ভাব তোমরা, বলতো মা? বিয়ে যে দিন হবে সে দিন তো হবেই। আমিই কি ছাই ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারবো?

আমি বলি—ইন্দু, তোমার মেয়ের মুক্তি অকাট্য।

ইন্দু সস্নেহে হাসে। সুধার চুল নিয়ে পড়ে।

সুধা চুলের গোড়ায় টান্‌ খেয়ে মাঝে মাঝে উঃ আঃ করে আর গুণগুণ করে, আঙ্গুলে চুলের দড়া জড়াতে জড়াতে।

শেষ পারাণির কড়ি আমি কণ্ঠে নিলাম গান।

গান! সাত বছর থেকে ওকে গানের নেশায় পায়। সুরের সোনার শিকল দিয়ে ও নিজকে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধে। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, অবিশ্রান্ত বয়ে যায় সুরের লহরের পর লহর। ও হয়তো স্বপ্নেও গান গায়।

ইন্দু বলে—ওরে এত গান তোর মুখে, না জানি কত কান্নার বান ডাক্‌বে তোর চোখে।

সুধা হেসে বলে—ভয় কি মা? সব গানেরই তো একই ধুয়া—এই কান্না। যে যা খুসি যেম্‌নি গাক্‌ শেষে ফির্‌তে তো হবে এইখানটাতেই। আচ্ছা, গাইব একটা?

মার অনুমতির অপেক্ষা রাখেনা। এস্‌রাজটা* নিয়ে বসে। গায়:

আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে।

ইন্দু গান শোনে, আর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে চোখের কোণ বেয়ে, কানের লতি বেয়ে বালিশের উপর টপ্‌টপ্‌ করে।

কদিন থেকেই লক্ষ্য করি বড় দুর্ব্বল হয়েছে ওর মন। কথায় কথায় চোখ ছাপিয়ে জল আসে।

বাদলা হাওয়ার এতটুকু দোল খেয়ে বৃষ্টি ভেজা গাছের পাতা থেকে বৃষ্টির জল আচমকা ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করে ঝরে পড়ে।

* * *

* এসরাজটা বিনয় দেয়।

আমি বলি—ও ছুটো থাক, ইন্দু। এস্‌রাজের ব্যবস্থা আমি করি।

ইন্দু স্বামীর পৌরুষে আঘাত দিতে চায় না। তুলো ভরা মোষের শিংয়ের ছোট কৌটোটিতে গিনি দুটি রেখে দেয়। বলে—আচ্ছা,এবারের মাইনেটা পেলে তাই করো।

বিনু ঘরে এসে বলে—রাণী কোথায় মাসীমা? দুদিন ওকে দেখিনি যে বড়? ওরে দেখ্‌সে, তোর জন্যে কি এনেছি।

তার হাতে নিজের এস্‌রাজটা। সুধা ছুটে আসে। এস্‌রাজটা সুধার হাতে ধরে দেয়। বলে—দেখ্‌ ব্রীজের নীচে তোর নাম খোদা সুধারাণী। বাজা দেখি তোর সেই বিভাসটা?

সুধা একবার আমার দিকে চায়, একবার তার মার দিকে চায়। সাহসে ভর করে বলে—নেবো মা?

বিনু বলে—তোমার পায়ে পড়ি মাসীমা, না বলো না কিন্তু।

ইন্দু বলে—ছেলে মানুষ, এক্ষুনি ভেঙ্গে চুরে একাকার করবে।

বিনু বলে—না, ভাঙ্গবে কেন? দেখো তুমি, আমার এ এস্‌রাজ ওর হাতেই বাজ্‌বে ভালো।

* * *

এস্‌রাজ বাজে।

দিন কাটে। সুধার বয়েস বাড়ে। মাঁ বাপের ভাবনাও বাড়ে।

বিনু এসে বলে—মাসীমা, অত ভাবো কেন? আমার হাতে পাত্র আছে সোনার টুক্‌রো। ওর সুবোধ নাম সার্থক।

ইন্দু মুহূর্ত্তেক চুপ করে থাকে। বিনুর হাত ধরে বলে—বিনু ওকে তুমিই নাও না।

আমি জানি বিনুর পর ইন্দুর বরাবর একটু লোভ ছিল। কিন্তু বিনুর ভালো ভালো সম্বন্ধের কথা আসে। এম, এ পাশ করা ছেলের মার কাছে তার এই নিরাভরণা মেয়ের কথা পাড়তে সাহস পায় না।

বিনু ইন্দুর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বলে—সে কি মাসীমা, সুধাকে আমার ঘরে মানাবে কেন? ওযে রাণী! দেখনি তুমি ওর ভুরুর ওর ঘাড়ের ওর হাতের ভঙ্গীটি!

ইন্দু করুণ হেসে বলে—আমিও তো একদিন এই রাণীই ছিলুম বিনু। এ ঘরে আমি কি মানাইনি? সুধাকে ওরূপ শিক্ষা তো দিইনি আমি!

তবু বিনু বলে—মাসীমা, তুমি সুবোধকে দেখনি। সুবোধের পাশে আমি দাঁড়াতেই পারিনে। আমার এই ময়লা ঢেঙ্গা হেংলা কাঠখোট্টা স্বদেশী চেহারা, এই ঢোলা-হাতা খদ্দরের পাঞ্জাবী, আর মোটা আট হাতি থান সুধার পাশে? ছোঃ! আজ সন্ধ্যে বেলা সুবোধ আস্‌বে। যেও মাসীমা! দেখো ওর পাশে সুধাকে মানাবে কি চমৎকার!

বিনয় নেহাৎ বিনয় করেই নিজেকে ওরম করে বলে। সত্যি সে যেমন বলে তেমন একটুও নয়। তবে সুধার চেয়ে একটু ময়লাও হয়ত। কিন্তু পুরাদস্তুর স্বদেশী। ও কিংখাবে মোড়া খাপে ঢাকা ইস্পাতের তলোয়ার—বিদ্যায় সমুজ্জ্বল, বিনয়ে কমনীয়, বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ, ধারালো।

কথাবার্ত্তা চলে।

সুবোধ পুলিশের সবইনস্‌পেক্টার। তার বাবা সরকারি উকিল। পয়সা করেন অনেক। স্ত্রী নেই। সংসারের ভার সুবোধের বড়দিদির উপর।

তিনি বিনয়কে দিয়ে বলে পাঠান—পয়সার জন্যে আট্‌কাবে না। মেয়ে পছন্দ হলেই হলো।

সুবোধের বাবা বলেন—টাকা পয়সা? আর কেন? এই খায় কে?

হাব্‌ভাবে চালচলনে যেন বড্ড বেশি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব। মন খারাপ করি। বলি তবু মোটামুটি একটা।

বলেন—এক পয়সাও না। সুবোধের পছন্দ-মত হলেই হয়।

দোটানায় পড়ি। ভাবি, ভারে কাটে না ধারে কাটে। বলি—আপনার দয়া আর ভগবানের আশীর্ব্বাদ। একথা সেকথা ভেবে ঘরে ফিরি।

ক্রমে মেয়ে দেখার পালা সুরু হয়।

শ্রীজগদীশ রঞ্জন ঘোষ

আজ সুবোধের বন্ধুরা। কাল সুবোধ আর তার দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু। পরশু সুবোধ একলা বিনুর সাথে। তার পরদিন সুবোধের কাকা, মামা, ভগ্নীপতি, ভাগ্নে।

এই অনাবশ্যক উৎপাতকে বিয়ের আনুষঙ্গিক বলেই ধরে নিই। অত্যাচার বলে মনে করতে পারিনে।

* * * *

একদিন বিনুর মা বলেন—মেয়ে দেখাচ্ছিস, এক আধ খানা গয়না টয়না দিচ্ছিস্ না ?

ইন্দু হেসে বলে—না দিদি। ওকে যারা নেবে, এই বেশেই নিতে হবে। এই হাতে চারগাছা চারগাছা করে আটগাছা কাঁচের চুড়ি, আর এই ডুরে শাড়ী।

বিনুর মা চুপ করে থাকেন। হঠাৎ বলে উঠেন—দে, বোন ওকে আমাকেই দে! ওকে ওই বেশেই নেবো—ওই—যোগিনীর বেশে।

ইন্দুর মন সরে না! বাঘিনী যে আজ তাজা রক্তের স্বাদ পেয়েছে! পাত্র হিসেবে সুবোধ যে বিনয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর, ইন্দু কেন, আমিও মনে করি। পাড়ার দুএকজন ঠাট্টার স্বরে বলে—তা আর হবে না? বিনু স্বদেশী, তার পিছনে পুলিশ লেগেই আছে। আর সুবোধ পুলিশের "ছোটবাবু" কত জনার পিছনে পুলিশ লাগায়!

ইন্দু মুখের উপর না করতে পারে না। সাত পাঁচ করে, বলে—কিন্তু বিনুই তো বলে দিদি, সুধাকে নাকি তোমার ঘরে মানাবে না। ও নাকি রাণী!

বিনুর মা হাসেন। বলেন, এ বয়সের ছেলে-মেয়েরা তো সবার কাছে সবাই রাজারাণী। তা হোক্, তুই দে ওকে আমাকে। মানাবে কি নামানাবে সে আমি বুঝ্‌বো।

ইন্দু পথ পায় না। বলে—আচ্ছা, ওঁকে জিজ্ঞেস করি।

বিনুর মা বলেন—এক কথা বোন। তোর মেয়ে নিচ্ছি তোকে সব কথা না বলে তো নিতে পারিনে। তারপর ইচ্ছে হয় দিস্ নাহয় না দিস্। আমার মেয়ে কুসুমের কথা তোর মনে আছে? ওঁর মৃত্যুর পরেই কলেরায় মরে?

ইন্দু বলে—তখন তোমরা কাশীতে ছিলে, নয়?

বিনুর মা বলেন—সে মরেনি।

ইন্দু তার দুই ভুরু এক করে বলে—মরেনি?

বিনুর মা বলেন—আজ কালীঘাট দেখে এলুম, দাসী সাথে পূজো দিতে এসেছে।

ইন্দু বলে—থামো দিদি……

বিনুর মা সেকথা কানে নেন না, বলেন—নাটমন্দিরের সিঁড়িটার উপর আমি বসে। মা? বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে। কুসুমের গলা? সাম্‌নে চেয়ে দেখি সেই তো! তাকে তো অনেক দিন ভুলে আছি বোন, মনে করি। ওর মা-ডাক যে আমার মনের কোনে কোথায় লুকিয়ে ছিল জানতুম না তো! দেখি আমার পায়ের কাছে শান বাঁধানো উঠোনের পর মাথা রেখে পড়ে আছে। ও বোন্, আমারি মেয়ে আমার পায়ের ধুলো নেবার অধিকার ও খুইয়েছে, এ দুঃখ আমি কোথায় রাখি?

মনে করি ওই পাষাণীর মত পাষাণ হয়ে থাকি। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরি। পারিনে বোন, পারিনে। মায়ের মন বাঁধ মানে না, এই দেখ্ পোড়া চোখে ফের জল আসে। মরণ নেই আমার! ওকে কোলে টেনে নিই। বলি, ও হতভাগী, আমার মেয়ে তুই, তোর এ মতি কেন হলো। তার পিঠে চুলে মাথায় হাত বুলোই।

সে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদে। বলে, শুন্‌ছিস্ বোন্?—সে জন্যে দুঃখ করিনে মা! তোমার মায়াও তো আমাকে ধরে রাখ্‌তে পারেনি, কিন্তু মা, আর তো তোমার কাছে ফির্‌তে পারবোনা। এই দুঃখু!

আর বলতে পারে না। কেবলি কাঁদে। আমিও কাঁদি……

দাসী বলে—ও দিদিমণি, বাবু দাঁড়িয়ে আছেন যে!

লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায় বোন্। মাথার কাপড় টেনে দিই। কাঠের পুতুলের মত শক্ত হয়ে বসে থাকি।

হতভাগীর মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কাঁটা দেয়। কান লাল হয়ে ওঠে।

আর আমি হতভাগী মুখে বল্‌তে পারিনে, পোড়ার-মুখী তোর মরণ নেই?

আমার কোলে মুখ লুকিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে বলে, মা, আর কবে দেখা হবে?

আমার লোভ হয় বোন। কিন্তু মাথা নেড়ে না করি। মুখে বলতে সাহস পাইনে, কি বলতে কি বলে বসবো!

তবু সে বলে—আর একটি দিন মা!

দাসী বলে— দিদিমণি বাবু… ..

আমি তাকে কোল থেকে ঠেলে দিই বোন্। সিঁড়ির কোনটায় ঠেকে তার বাঁ চোখের কোণটা কেটে যায়। টস্ টস্ করে রক্ত পড়ে, দাসী হা হা করে ছুটে আসে।

হাত দিয়ে তাকে ঠেকায়, বলে—যা, যা, কিচ্ছু হয়নি।

আঁচল দিয়ে রক্ত মুছে।

আর হাসে বোন্। হাসে…

মনে করে ওর মাকে ও ভোলাবে। মাকে জানতে দেবে না ওর মা ওকে আজ যে দাগা দিলে, তার ব্যথা ওর বুকে বাজে কত! ওরে হতভাগী, এত দরদ-ই যদি তোর ছিল কোন প্রাণে তুই সব বাঁধন কেটেকুটে এই সাগরে ঝাঁপ দিলি, বল্?

আমার পায়ের উপর হাত রেখে ঠোঁট কাঁপিয়ে ভাঙ্গাগলায় বলে—মা, আর একটি দিন মা, শুধু একটি দিন। তোমার পায়ে পড়ি মা!

ওরে তোর মা কি আছে রে? মরে গেছে!

পা টেনে নিই। ছুটে চলে আসি, ওই পাষাণীর সামনে মাথা খুঁড়ে মরি,—না জানি কত অপরাধ করেছিলুম মা তোর তাছে।

সে চোখ মুছতে মুছতে ফিরে যায়। পিছনের দিকে তাকায় না। হয়ত মার উপর অভিমান করে। ওযে আমার বড় অভিমানী মেয়ে ছিল বোন্। কিন্তু সেই আগেকার মত আজতো আর ওকে সাধাসাধি করতে পারিনে। একবার একটু থামে। হয়ত ভাবে মা বুঝি ডাকে। তবু মুখ ফিরে চায় না। আমাকে কাঁদায়!

ফিরে যায়…

রেলিং ধরে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থাকি। দেখি তার সাড়ীর আঁচলে রক্তের ছোপ—লাল গোলাপের মত—বাতাসে দোলে। আমার বুকে রক্তপাত করে ঐ আঁচলের রক্তের ছোপ—তার মায়ের দেওয়া শেষ আশীর্ব্বাদী ফুল!

গঙ্গায় ফের ডুব দিতে যাই……

ও দিদি, আমারি মেয়ে। আমার মেয়েকে আমি কোলে নিতে পারিনে, এ দুঃখ আমি কোথায় রাখি বোন্?

* * *

ইন্দু এ প্রসঙ্গ চাপা দিতে চায়। বলে, দিদি যা হবার হয়ে গেছে। দুঃখ করে কি হবে? জান আজ নাকি ওদের আবার কারা সুধাকে দেখতে আসবে, আরতো পারিনে। মেয়েও এক একবার বেঁকে বসে। বলে, মা আমাকে কি ওরা মেকি টাকা পেয়েছে যে সেটাকে বারবার উল্টে পাল্টে দেখবে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ঘসবে, আর শানের উপর ফেলে ঠন ঠন করে বাজিয়ে নেবে? এমন বে না দিলেই নয় মা?

বিনুর মার মুখে হাসি ফোটে। বলেন—দে বোন্ ওকে আমাকে। কুসুম তো তোদের কাছে মরেই আছে। সুধু তার মায়ের কাছে ও আছে বেঁচে। সবার দৃষ্টির আড়ালে বুকের আঁচলে ঘিরে ওকে লুকিয়ে রেখেছি। বোন্। আহা, থাক্না অমনি আমার ওই কলঙ্কিনী মেয়ে, তার মায়ের কাছে!

ইন্দু বলে—বিনু জানে দিদি?

বিনুর মা বলেন—আগে জানতো না। এখানে এলে পর সুধাকে দেখে বলি।

ইন্দু বলে—তাই বুঝি বিনু বলছিলো সুধাকে ওর ঘরে মানাবে না। দেখ দিদি, তোমার সাথে চালাকি করবো না। তুমি যে সুধাকে কত ভালবাস এর আগে বুঝতে পারিনি। তোমার এই পা ছুঁয়েই বলছি কুসুমের জন্যে যে সুধাকে তোমার হাতে দিতে চাইনি তা নয়। কিন্তু সুবোধকে আমার বড় পছন্দ হয়েছে। আমায় মাপ কর দিদি।

বিনুর মা আশ্চর্য্য হয়ে বলেন—কি, আমার বিনুর কাছে ওই সুবোধ?

শ্রীজগদীশ রঞ্জন ঘোষ

ইন্দু আম্‌তা আম্‌তা করে। স্রোতের টানে বেত নুয়ে পড়ে, ভাঙ্গে না।

বিনুর মা বলেন—বেশ বোন্। সুধা সুখী হোক্ এই কামনাই করি, আর কিছু না। আমি যে তোর উপর রাগ করলুম, মনেও স্থান দিস্‌নে বোন্।

ইন্দু ফাঁক পেয়ে বলে—তা মনে করবো না দিদি। কিন্তু সুধাকে না পেলে তুমি যে—কথা শেষ করতে দেন না। বলেন—আমার কথা ভাবিস্‌নে। না, না। যে অভাগীর মেয়ে থাক্‌তেও মেয়ে নেই, সে আর-এক মেয়ের কথা তোলে কোন লাজে?

ইন্দু বলে—ওই তো তুমি রাগ করলে দিদি!

বিনুর মা হেসে বলেন—কি করবো, বল? আমার মরণ হলেই যে বাঁচি।

ইন্দুর মনে খট্‌কা লাগে। দ্বিধায় পড়ে। পায়ের নখের উপর চোখ রেখে বলে—যত গোল তোমার বিনুই তো পাকালে। সুবোধকে তো ওই এনে হাজির করে।

বিনুর মা মনে মনে গর্ব্ব করে বলেন—ওই তো ওর স্বভাব বোন্! যা কর্ত্তব্য বলে ধরবে নিজের হাত পা কেটে রক্তারক্তি করেও তাই করবে।

ইন্দুও মনে মনে গর্ব্ব করে বলে—জানি আজ আমি নিষ্ঠুর। কিন্তু আমিও তো মা।

আশ্চর্য্য! মানুষ এত স্বার্থপর? এই স্তূপীকৃত রক্তাক্ত বেদনার সাম্‌নে ইন্দু মাথা নোয়ালে না গা! বিনুর মার অতবড় মনের জোর আছে বলেই এবং সুধার পর তাঁর স্নেহের দাবী ব্যর্থ হবেনা বুঝেই অতবড় দুঃখের কথা ইন্দুকে বল্‌তে পারেন। স্নেহান্ধ ইন্দুর মন সায় দেয় না। কিন্তু মনে একটা অনিশ্চিত আশঙ্কার ছায়া পড়ে, এতবড় দুঃখের এতবড় অপমান! ভগবান সইবেন তো? বলে—দেখ, কাজটা ভালো হলো কি? ওদেরই বা ঠেকাই কি করে? কথা দিয়েচি।

আমি বলি—মেয়ের উপর মায়ের যত অধিকার, বাপের তো তত নয়।

ইন্দু রাগ করে—মেয়ে কি একলা আমারই নাকি! যাও তুমি, কিচ্ছু তোমার করতে হবে না।

ইন্দু রাগ করে আমার উপর নয়, নিজের উপর।

* * *

এস্‌রাজ বাজে…

বিনু খবর দেয় আজ সুবোধ তাদের বাড়ী আসবে তার দিদিকে নিয়ে। সুধাকে দেখে তিনি শেষ কথা দিয়ে যাবেন।

মেয়ে দেখেন। কী সে দেখা! সুবোধের পাশে বসিয়ে, তার পাশে দাঁড় করিয়ে দেখেন সুধা সুবোধের কাঁধ ছোঁয় না কান ছোঁয়। হাত টেপেন, গাল টেপেন, চুলের আগা দেখেন, পায়ের নখ দেখেন, হাঁটুর উপরের কাপড় তুলে দেখেন। একবার বসান, একবার হাঁটান। একবার ঘোরান, একবার ফেরান। পায়ের কড়ে আঙ্গুল মাটি ছোঁয় কিনা তাও দেখেন।

লজ্জা, লজ্জা…

সুধা রাগে ঘৃণায় গুম্‌রোতে থাকে। তার চোখ এক একবার ধক্‌ধক্ করে ওঠে। বাঁ দিকে গলার পাশে একটা নীল শিরা দপ্ দপ্ করে লাফায়।

বিনু উস্‌খুস্ করে। একবার দক্ষিণের জানলাটা খোলে, আবার বন্ধ করে। সুবোধের কানে কানে বলে—আর কেন ভাই, এইবার ছেড়ে দিতে বল্ না!

সুবোধের দিদি বলেন—একটা গান শোনাবে না ভাই?

সুধা চেয়ার থেকে গুণকাটা ধনুকের মত ছিট্‌কে ওঠে। টেবিলের কোনটা ধরে বলে—অনেক পরীক্ষা তো দিলুম, তবু……?

চোখ্ দুটি একরকম ছোট করে আনে। মুখের উপর কি রকম একটা গভীর অশ্রদ্ধার ভাব এনে বলে—মাসীমা, তোমরা আমাকে কী পেয়েছ, শুনি? হলুম-ই বা আমরা গরীব, তা বলে…

শেষ করতে পারে না। টেবিলে রাখা এস্‌রাজটার উপর চোখের জল টপ্ টপ্ করে পড়ে।

সুবোধের দিদি গালে হাত দিয়ে সুধার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

বিনুর মা পাথরের মত বসে থাকেন।

বিনু ফের দক্ষিণের জান্‌লাটা খোলে, ফের বন্ধ করে।

ইন্দু সুধার মাথায় হাত রেখে শুধু বলে—মা...মেঘ সরে। বরফ গলে।

চোখের জলের মালা প'রে ক্ষীণ হাসির রেখাটি বেরোয়।

সুধা ছড়ে মীড় দেয়। এস্রাজ নিয়ে গায় :

মারো মারো প্রভু, আরো আরো
এম্‌নি করে আমায় মার।

চোখের জলে গানের শেষ হয়।

বুকের দুঃখ গলানো চোখের জলের উপর অন্তরের হাসির ছাপ্‌টি দিয়ে সুধা বলে—

বিনুদা, এ গানটা যে এত মিষ্টি আগে কোনো দিন তো টের পাইনি!

বিনু কিছু বলে না। দক্ষিণের জান্‌লাটা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

পরদিন সুবোধ লিখে পাঠায়—দিদির মেয়ে পছন্দ হয়েছে। পাকা দেখার দিন স্থির করাচ্ছেন।

দিন যায়।

পাকা দেখার দিন আর স্থির হয় না। আজ এর অসুখ কাল তার অসুখ। আজ বারবেলা, না হয় মঘা। কাল কালবেলা না হয় অশ্লেষা।

আরো দিন যায়। দিন আর স্থির হয় না। শুভদিনের নির্ঘণ্ট নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে থাকে। ক্রমে স্থির জানি সুবোধের দিদি ভাইয়ের জন্যে অন্য পাত্রী স্থির করেছেন—দশ হাজার নগদ, ছ' হাজার গয়না, সুন্দরী।

দেখা যায় ভারেও কাটে, ধারেও কাটে। যাক! দ্বিধা ঘোচে।

* * *

বিনয় বলে—ছিঃ সুবোধ, এত ছোট তোমার মন! কোনো অভাব তো তোমার নেই, এই যে অপমানটা এঁদের তুমি করলে, আমাকে দিয়ে করালে। যদি জান্‌তে কী চোখে আমি ওদের দেখি আর কতবড় প্রলোভন আমি ছাড়ি।

সুবোধ বলে—কি করবো বল। বাবার অনুরোধ।

বিনু বলে—বাবার অনুরোধ! বাবার চেয়ে যিনি অনেক বড় তাঁকে যে মার। তোমার পর রাগ হয় না বন্ধু, ঘৃণা হয়। জান, এ কয়দিন কেবলি মনে পড়ে, Just for a handful of silver he left us। যাও, তোমার মত বন্ধুর মুখ দেখ্‌তে চাইনে।

সুবোধ চেয়ার থেকে উঠে বলে—ডেকে এনে এই অপমানটা করলে বিনু? ছেলেবেলাকার বন্ধু তুমি।

বিনু তিক্ত কণ্ঠে বলে—মান অপমান বন্ধুত্ব এই সব বড় বড় কথা তোমার মুখে, তোমার মত ছোট মুখে সাজেনা সুবোধ। তুমি যদি আমার মায়ের পেটের ভাই হতে, I would have horsewhipped you! হাঁ, চাব্‌কিয়ে তোমার রক্ত বের করে তবে ছাড়তুম।

আমি তাকে একটা ঝাকুনি দিয়ে বলি—থাম বিনু। তোমার আজ হয়েছে কি?

বিনু দুহাতে মাথা চেপে ধরে। একটু থেমে বলে—আমায় মাপ কর ভাই। মাথাটা এলোমেলো হয়ে গেছে। চল, তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি সুবোধ।

সুবোধ মাপ করে কিনা জানিনে। তিন চার দিন পরে পুলিশ বিনুর বাড়ী সার্চ্চ করে। রাজদ্রোহ মূলক তেমন কিছুই পায় না, তা বলে তাকে ছাড়েও না। বর্ম্মায় কোন্ একটা জেলে আটক্ করে রাখে।

* * *

এস্রাজ আর বাজে না·········

একদিন রাস্তায় ব্যাণ্ড্ বাজ্‌না শুনি।

জান্‌লাটা খুলে দেখি প্রায় আমাদের দরজার সামনে ফুলের মালায় ঘেরা মটরে করে সুবোধ আর তার বউ। সাম্‌নে একটা গরুর গাড়ী—মটর এগোতে পথ পায় না।

আমাকে দেখে সুবোধ একটু হাস্‌লে।

জান্‌লাটা বন্ধ করে দিই। মনে মনে বলি—যা অপমান আমাদের করেছ, তার কাছে এ আর বেশি কি! কোনো দরকার ছিল না তো!

ইন্দু বলে—ওকি?

আমি বলি—কিছু নয়। বায়োস্কোপের হ্যাণ্ড্‌বিল বিলি করে।

কানা-কড়ি

শ্রীজগদীশ রঞ্জন ঘোষ

ইন্দু তার শিয়রের জান্‌লাটা খুট্‌ করে খোলে···বলে—ডাক ওদের। দোরের সাম্‌নে লক্ষ্মী, ঘরে না এনে কি পারি? ডাক। আমি বলি—থাক্‌ ইন্দু।

ইন্দু বলে—পাগল! এইটুকু আর আমি সইতে পার্‌বনা, তুমি মনে কর? ভগবানের মার থেকে ওদের মার কি বেশি? ডাক। নিজেই হাতছানি দিয়ে ডাকে। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সুবোধ বউ নিয়ে আসে, ইন্দু তার সেই গয়নার বাক্স থেকে তুলোয় মোড়া সেই মোষের কৌটোয় ভরা হাফ-গিনি ছুটি বের করে। তাই দিয়ে বর-কনেকে আশীর্ব্বাদ করে। বউয়ের সিঁথেয় সিঁদুর দেয়। বলে—সতী লক্ষ্মী হও মা।

সুধা নিয়ে আসে রেকাবিতে করে গুটি কয়েক মিষ্টি, ছ'খিলি পান, পানের বোটায় এক্‌ চিম্‌টি চুণ। এক গেলাস জল সুবোধের সাম্‌নে রাখে। এ কথা সে কথা হয়, কথা জমে না। সুধা বউকে ধরে নিয়ে যায় তার ঘরে।

দরজার ফাঁকে দেখি ছুটিতে মিলে আসর জমায়। সাম্‌নে এক থালা মুড়ি।

সুধা বলে—হ্যাঁ ভাই, কাঁচা পেয়াজ দিয়ে খাবে? ভারি চমৎকার লাগে কিন্তু।

বউ বলে—আন না ভাই! আচ্ছা কাঁচা লঙ্কা নেই তোমাদের?

সুধা বলে—কত—অ! অই দেখ গাছ ভরা। তুলসী-বেদীর পাশে কাঁচা লঙ্কার গাছ ছুটো দেখায়। কাঁচা লঙ্কা আর পেঁয়াজ আন্‌তে যায়।

আমি বলি—এই বুঝি তোর বউকে মিষ্টিমুখ করানো!

সুধা বলে—তা কেন? এই যে মিহিদানা দিয়ে মুড়ি মেখে নিয়েছি। বউ খায়নি বুঝি? আমার চেয়ে বেশি খেয়েচে।

বউ ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলে—তুমি ভাই বড় দুষ্টু!

পরের দিন হাফগিনি ছুটি অক্ষতদেহে দিগ্বিজয়ী বীরের মত ফিরে আসে। সাথে এক হল্‌দে কাগজের রাজটীকা তাতে লেখা—দিদি বারণ করলেন। মাপ করবেন। সুবোধ।

ইন্দু কাগজটা পড়ে আর কেবল হাসে। বলে—একবার বাবার অনুরোধ, আর একবার দিদির অনুরোধ। সত্যি সুবোধ বড় সুবোধ ছেলে।

*　　　*　　　*

ইন্দু একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। আপন বৃন্তের উপর এলিয়ে পড়া মিইয়ে যাওয়া পূজান্তের বাসি আধ ফোটা পদ্ম ফুলটির মত, বলে— আচ্ছা, আমারই না হয় মতিচ্ছন্ন হয়েছিল, তোমার বুদ্ধি সুদ্ধি কোথায় ছিল?

আমি হাল্‌কা করে বলি—কোথাও নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তখন পাকেনি। এইবার বিনু ফিরে এলেই দেখ্‌বে পেকে টস্‌ টস্‌ করছে!

হতাশের মত বলে—আর বিনু! কবে বা সে ফিরবে আর আমিই বা আর কদ্দিন।

বিনু ফেরে একদিন মাস চারেক পরে। জেলের জঠরাগ্নি ওর সব জীর্ণ করেছে—বাকি রেখেছে শুধু হাড় ক'খানা। চেনা যায় না।

জান্‌লা দিয়ে দেখি সে তার মার হাত ধরে লাঠি ভর করে গাড়ী থেকে নামে।

গাড়ীর শব্দ শুনে সুধা এসে বলে—ও কে বাবা?

বিনু যেন এই প্রশ্নটীর জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে। হেসে বলে—আমি রে আমি রাণী! চিন্‌তে পাচ্ছিস্‌ নে?

সুধা বলে—ও মা! এ দশা তোমার কে করলে বিনুদা?

বিনু বলে—আর যেই করুক তুই নোস্‌।

সুধা ইন্দুকে বলে—মা, এদ্দিন আমার ভাব্‌না তোমরা ভেবেছো। এবার নিজের ভাব্‌না আমি নিজে ভাব্‌বো। কি বল মা? চল মাসীমার কাছে, এক্ষুনি। উঠ্‌তে পার্‌বে না মা?

ইন্দু বলে—পার্‌বো মা। চল্‌ যাই।

সুধা বলে—শুধু এই কথাটি মাসীমাকে বলো মা—সাধা লক্ষ্মী আমি একবার পায় ঠেলেছিলুম। তা বলে তুমিও যেন ঠেলো না দিদি।

ইন্দুর মুখে কথা ফোটে না। চোখ দিয়ে জল গড়ায়।

সুধা বলে—মা তোমার মনে কি হচ্ছে জানি। একটু শক্ত হও মা।

ইন্দু শক্ত করে মনকে বাঁধতে চায়, পারে না। কেঁদে উঠে।

মায়ের কপালের উপর তার গাল রেখে সুধা বলে—চুপ কর, চুপ কর মা। তুমিই বল মা এর চেয়ে আর কোনো সোজা পথ তো নেই!

ইন্দু চোখ্ মুছে বলে—চল্ মা।

বিনুর মাও রাজি হন না, বিনুও রাজি হয় না।

মা বলেন—ছেলে ভালো হয়ে উঠুক্।

ছেলে বলে—আমার তো আর সময় নেই! পুব যে ফর্সা হয়ে আসে।

ইন্দুর ঠোঁট্ নড়ে। কি যে সে বলে, সে নিজেই বুঝ্‌তে পারে না।

সুধা বলে—তুমি আমায় ভয় দেখাও বিনুদা?

বিনু হেসে বলে—ভূতের ভয় করিসনে তুই!

সুধা বলে—নিজে ভয় খাও তাই বল। কিন্তু তোমায় আমি জিনে আন্‌বো এই আমার পণ!

বিনু বলে—যদি পারিস্ তোর সুধারাণী নাম ঘুচিয়ে নাম রাখ্‌বো মন্দাকিনী! আর যদি না পারিস্ অই বেল্‌গাছ- টার আগ্‌ডাল্‌টায় বসে ডাকবো—মন্দভাগিনী আয়, আয়।……

গোধূলি লগ্নে দুই হাত এক করি। হ্যাঁ, ওই বিনুর সাথেই সুধার বিয়ে হয়।

সুধা বলে—মা আশীর্ব্বাদ করো সাবিত্রীর মত যেন হই!

* * *

সাবিত্রী!

এক মাসও কাটে না। বিনু দিন কয়েক ভালো ছিল। হঠাৎ এক দিন শেষ রাত্রে মুখ দিয়ে তিন বার তিন ঝলক রক্ত ওঠে। শেষ বার সব শেষ হয়। ডাক্তাররা বলে—লাংস্-এর হেমারেজ্।

শেষেরও শেষ নেই।

ইন্দু সেই যে বিনুর শয্যাপাশে ইজি চেয়ারটায় ঠেস্ দিয়ে পড়ে থাকে, আর ওঠে না। ডাক্তারেরা বলে—হার্ট ফেল।

সুধু এই কথাটাই মনে কাঁটার মত বিঁধে থাকে ওর জীবনের সর্ব্বশেষ কথাটি আমার কাছে অবক্তব্য রয়ে গেল!

খবর পেয়ে সুবোধ এল। 'রাজদ্বারে শ্মশানে চ।' সে বন্ধুর কাজ করে!

দুটো চিতা পাশাপাশিই সাজানো হলো!

আরো একমাস যায়।

সুধা এসে আমার পায়ের ধুলো নেয়। বলে—বাবা একবার মার সাথে পশ্চিম ঘুরে আসি।

তাকে বুকে জড়িয়ে ধরি। ঢোক গিলে বলি—তুইও যাবি মা?

সে বলে তুমিও চল না বাবা? তুমি তো এখানে বাচবেনা।

ঘরের দিকে তাকাই। পরিচিত আস্‌বাব-পত্র। এটা ওটা সেটা…ঝরা ফুলের ছিন্ন পাপড়ি!

মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় আর কেন? সুধা। সাথে নিয়ে যায় ত'র সেই এস্‌রাজটা। সুধারাণী নাম খোদা।…

আর এক ১৩ই চৈত্র, ১৩৩৪ সাল।

জীবনের অর্দ্ধেক পথ ত পেরিয়ে এলুম অনেক দিন। সঞ্চয় করলুম কি?

সেই প্রভিডেন্ট ফণ্ডে সামান্য কিছু টাকা, আর সেভিং ব্যাঙ্কে কিছু! কার জন্য এ সব করি? আমি তো আজ একান্তই একলা সেই এক কড়ি। তাও নয়, কানা কড়ি!

কানা কড়ি? হাসি——

ওয়ে কানা কড়ির পর কানা কড়ি। ঝাঁকে ঝাঁকে জমে ওঠে। অন্ত কই! তাদের আকাশ-বেঁধা চূড়ার আড়ালে আকাশের চন্দ্রসূর্য্য যে আট্‌কা পড়ে।

হতভাগা, চেয়ে দেখ আর এক কানা কড়ি—ওই বিনুর মা। স্বামি-হারা, পুত্র হারা, কন্যা-হারা, ওরে, ওর কাছে তুই?

দাবাগ্নির মুখে একবিন্দু শিশির ঝলমল করে।

পলকে শুকিয়ে যায়।

তবু একটু সান্ত্বনা পাই।
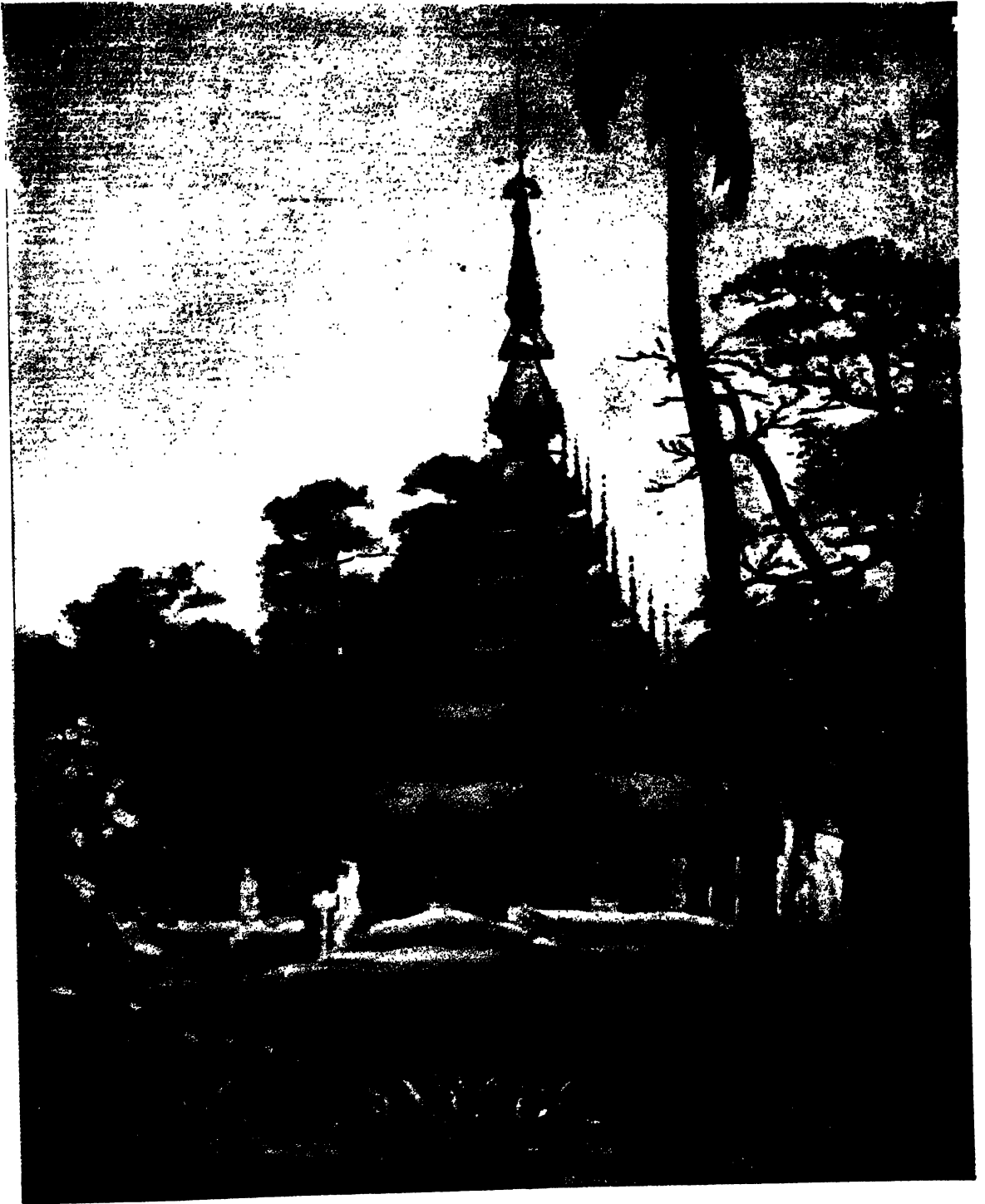
প্যাগোডা-ইডেন গার্ডেন

শিল্পী—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মীরাটে সাহিত্য সম্মিলন

শ্রীঅবনীনাথ রায়

গত বছর দিল্লীর সাহিত্য সম্মিলন সম্বন্ধে বন্ধু ধূর্জ্জটী প্রসাদ এক বে-সরকারী বিবরণী লিখেছিলেন। এ বছর নানা কারণে যদিও তিনি আস্‌তে পারেন নি কিন্তু তাঁর চিঠি এসে পৌছেছিল আমার কাছে। আমার দুর্ভাগ্য সেই চিঠিতে তাঁর একটী অনুরোধ বহন করে নিয়ে এসেছিল—সম্মিলন সম্বন্ধে Detached view নিয়ে একটা কিছু লিখতে হবে।

তাই তাঁর অনুরোধ অনুযায়ী আমার এ বিবরণী হল না সরকারী, না বে-সরকারী—হয়ত এটাকে অ-সরকারী বলা যায়।

মীরাটের সম্মিলনী সাফল্য লাভ করেছে এক কথায় বলা যায়। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের দর্শন পাওয়া সকল বাঙ্গালীর পক্ষেই ভাগ্যের বিষয়। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। কেননা এ কথা হলফ করে বলা যায় যে তাঁর বক্তব্য বিষয়ের কোন অনুশাসনই কেউ মেনে চল্‌বেন না। কেউ নিশ্চয়ই চাও ছাড়বেন না, সিগারেটও ছাড়বেন না। খদ্দর যাঁরা আগে পরতেন এখনো তাঁরাই পরবেন—ঝোঁকে পড়ে কেউ কিছু খদ্দর কিন্‌তে পারেন হয়ত কিন্তু সেটা স্থায়ী হবে না। গত বছর দিল্লীতে যখন স্থির হয় যে পরবর্ত্তী সম্মিলন মীরাটে হবে তখন দিল্লীওয়ালারা আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাঁরা অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য হতে ইচ্ছুক আছেন এবং যদি প্রয়োজন হয় কেউ কেউ সম্মিলনীর ২।১ দিন আগে থাকৃতে এসে সমস্ত কাজকর্ম্মে সহায়তা করবেন। তাঁদের অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য করবার কোন প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু কাজ কর্ম্মে সাহায্য করার প্রস্তাব সম্বন্ধে বলা যায় যে তাঁদের অধিকাংশ প্রথম দিন বেলা ১২টা নাগাদ মোটরে এসে উপস্থিত হন এবং সেই রাত্রেই 'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনয় দেখে মোটরে চলে যান। বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর সম্মিলন সমিতিতে যোগ দেওয়ার এটা হয়ত একটা short cut আবিষ্কার কিন্তু এর নাম কোনমতেই সম্মিলনের প্রতি অনুরাগ নয়। প্রকৃত অনুরাগ যাঁদের ছিল তাঁদের কপালে অনেক কর্ম্মভোগ লেখা ছিল—যথা শীত ভোগ, বাড়ীর বাইরে নিশাযাপন ইত্যাদি। কিন্তু এই গুলোই ত চাই।

সাহিত্য শাখাটি মীরাটে এবার নতুন খোলা হ'ল—আর তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন কাশীর বৃদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়। ইংরাজীতে যাকে বলে in the fitness of things এ ঠিক তাই হয়েছিল। কেদার বাবু প্রবাসীও বটে (জলধর বাবু ক্ষমা করবেন) বৃদ্ধও বটে (যেহেতু তিনি সকলের দাদামশাই)। কবে তাঁর পরপারের ডাক পড়বে তা জানা নেই। এবার না হলে হয়ত বৃদ্ধের প্রতি এ সম্মান দেখানোর ফুর্সৎই পাওয়া যেতো না। আর এমন নির্ব্বিরোধী ভালমানুষ বৃদ্ধ আমি আর দ্বিতীয়টি দেখি নি—কোন কথাতেই কাউকে না বলতে দেখলুম না।

সঙ্গীত শাখার উপর বিধাতার যেন অভিশাপ পড়েচে মনে হচ্চে। দিল্লীতে অতুলপ্রসাদ আস্‌তে পারেন নি মাথায় রক্তের চাপ বেড়েছিল বলে—সুতরাং সঙ্গীত শাখা বন্ধ ছিল। মীরাটে তিনি আস্‌তে পারলেন না তাঁর মাতাঠাকুরাণীর ভস্ম প্রোথিত করতে তাঁকে দেশে যেতে হ'ল বলে—সুতরাং শিল্প ও সঙ্গীত শাখা মিলিয়ে দেওয়া হল। ইন্দোরে পরের বছর সম্মিলন হচ্চে। তাঁদের কাছে আমার নিবেদন এই যে তাঁরা যেন সঙ্গীত শাখাটিকে precedent দেখে উঠিয়ে না দেন। বার বার তিন বার। ইন্দোরেও যদি সঙ্গীত শাখার অধিবেশন না হতে পারে তা' হলে বুঝবো সঙ্গীতের উপর বিধি নিতান্তই বাম।

যথেষ্ট চেষ্টা করে এবারও সাহিত্য শাখার সব প্রবন্ধ পড়া হ'ল না। তবে দিল্লীর চেয়ে বেশী পড়া হয়েছে। দিল্লীতে হয়েছিল দু' দিনে ১০টি, এখানে হয়েছে একদিনে

১৬টি। কিন্তু একটা বিশেষ অসুবিধা ক'রে এটা করতে হয়েছিল। শাখা সভাপতিদের সব অভিভাষণ দ্বিতীয় দিনে পড়া শেষ হয়ে গেল। তারপর তৃতীয় দিনের জন্য বাকি রইল শুধু প্রবন্ধ পড়া। যাঁরা দিল্লী প্রভৃতি কাছাকাছি জায়গা থেকে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই সেদিন চলে গেলেন —সম্মিলনের অর্দ্ধেক interest কমে গেল। আর একটা কথা। প্রত্যেক শাখার সভাপতির অভিভাষণ পড়া হয়ে তারপর সেই বিষয়ে প্রবন্ধ পড়া হ'লে যেন একটা অবিচ্ছেদ বজায় থাকে—তা' না হলে শুধু প্রবন্ধ পড়া একটা কলেজের ক্লাসের মত হয়ে দাঁড়ায়—তাতে সম্মিলনীর মর্য্যাদা এবং সম্মিলনীতে উপযুক্ত atmosphere কিছুতেই রক্ষা করা যায় না। শ্রোতার সংখ্যাও যথেষ্ট হ্রাস হয়ে যায়। এখানে হয়েছিলও তাই—দর্শনশাখার অধিবেশন একটা ক্লাসের বেশী আর কিছুই হয় নি। গত বছর দিল্লীতে একই সঙ্গে সমস্ত শাখার অধিবেশন হওয়ার কথা উঠেছিল, কিন্তু ঐ সমস্ত অসুবিধার কথা বিবেচনা করে সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। দিল্লীতে একটির পর একটি শাখার অধিবেশন আমার মনে হয় এর চেয়ে সার্থক হয়েছিল—তাতে যদিও মাঝে মাঝে কেউ কেউ সিগারেট খাওয়ার নাম করে বাইরে গিয়েছিলেন কিন্তু সম্মিলনীর atmosphere একেবারে নষ্ট হয়নি। তিন দিনের মধ্যে কি উপায়ে সমস্ত কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে এ একটা বিশেষ চিন্তার বিষয় —বিশেষতঃ যখন তার খানিকটা সময় নষ্ট হবেই "উত্তবার" সম্পর্কে ঝগড়া করে (অবশ্য বিলিতি মতে)—এই ত প্রত্যেক বছর দেখে আস্‌ছি।

মীরাটের নিমন্ত্রণ লিপিগুলি দিল্লীকেই অনুসরণ করেছে —ব্যাজের পরিকল্পনাও কিছু নতুন হয় নি।

স্থানীয় নাট্যসমাজ দ্বিতীয় দিন গিরীশচন্দ্রের "প্রফুল্ল" অভিনয় করেছিলেন। আমার মনে হয় অভিনয়ের জন্য কোন বই নির্ব্বাচণের একটা গুরুতর দায়িত্ব আছে সে দায়িত্ব এই যে বইখানি যুগোপযোগী হওয়া চাই। "প্রফুল্লর" যুগ গত হয়েছে নিঃসন্দেহ—ভাই ভাইয়ের শত্রুতা করে কি রকমে সোনার সংসার ছারে খারে দেয় তা চল্লিশ বছর আগে বাংলা দেশের লোক দেখেছে এবং দেখে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছে—তার জন্যে আমাদের এখন আর সে যুগে ফিরে যাওয়ার দরকার নেই। আমরা এখন একটা বৃহত্তর যুগে বাস করচি—যার সমস্যা বিচিত্র, যার সমাধানও বিভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সাহিত্যে এই নতুন সমস্যার সন্ধান মেলে—এই সাহিত্যই আমাদিগকে এগিয়ে যেতে বলে।

কিন্তু এটা ত গেল আদর্শের কথা। যেখানে আদর্শ নিয়ে কোন বালাই নেই সেখানে যেটা সহজসাধ্য সেই বই অভিনয় করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। সেই হিসাবে মিরাট-বাসীরা বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। অভিনয় হিসেবে বইখানি ভালই হয়েছিল। তবে অভিনয় এত দেরীতে (রাত ৯॥০ টা) সুরু হয়েছিল যে তিন অঙ্ক শেষ হতেই রাত দেড়টা বেজে গেল। তার পর শীতের রাত্রে প্রতিনিধিদের আর বড় কেউ থাক্‌তে পারেন নি (এক হৃষীকেশ বাবু ছাড়া)। সন্ধ্যা ৭॥০ টার সময় সুরু হলে ভাল হ'ত।

মহিলা সম্মিলনের পক্ষ থেকে অভিনীত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের "বাল্মীকি প্রতিভা"। এ বইখানি নির্ব্বাচনের জন্য এঁদের বাহাদুরী দিই এবং সে বাহাদুরী মিসেস্ হালদারের প্রাপ্য। স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী এই বইখানি অভিনয় সম্বন্ধে আমাকে ভয় দেখিয়ে যে চিঠি লিখেছিলেন তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্চি:—"বাল্মীকি প্রতিভা যদি তোমরা ষ্টেজ কর্‌তে পারো ত তার উপর আর কথা নেই। তবে তা' করে উঠ্‌তে পারবে কি না সেটা ভেবে দেখো। ও হচ্ছে আগাগোড়া গান। তোমরা দিল্লীতে কি এত গাইয়ে লোক একসঙ্গে জোটাতে পারবে? বিশেষতঃ গোটা কয়েক গানের সুর যখন আছে বিলেতি। উপরন্তু দুটি মেয়ে চাই যারা বেশ ভাল গাইতে পারে। ডাকাতদের শুধু গলার জোর থাকলেই চলে যাবে, অবশ্য সেই সঙ্গে সুরের কান থাকা চাই। সুর ও তাল বজায় রেখে পাঁচ জন লোকের পক্ষে একসঙ্গে গাওয়া যে কতটা কঠিন ব্যাপার তা' বাল্মীকি-প্রতিভার রিহার্সেল যে কখনও দেখেছে সেই জানে—"। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' দিল্লীতে হয় নি—হয়েছে মীরাটে—আর একান্তভাবে মেয়েদেরই চেষ্টায়। দু'টি মেয়ে পাওয়া গিয়েছিল যারা ভাল গাইতে

শ্রীঅবনীনাথ রায়

পারে। বলা বাহুল্য গানের সুর রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুরের অনুরূপ হয় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বইও যে অভিনীত হয়ে সব রকম লোকের পেটের মধ্যে থেকে হাত্‌-তালি টেনে বার করতে পারে এ আমি সেদিন দেখে খুসী হয়েছি। সকলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন।

বে-সরকারী ভাবে এই সম্মিলনের জন্য যাঁরা খেটেছেন তাঁদের মধ্যে কাপ্তেন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম মনে পড়ছে। স্বেচ্ছাসেবকদের অনেক কাজ তাঁকে স্বেচ্ছায় করতে দেখেছি। এলাহাবাদের ছাত্রমণ্ডলীর ত তিনি 'ঠাকুরদা' বনে গিয়েছিলেন। তৃতীয় দিন আচার্য্য প্রফুল্ল-চন্দ্রের প্রতি প্রবন্ধাকারে তিনি যে ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন সেটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। আমি অনেককে সেই প্রবন্ধ শুনে কাঁদ্‌তে দেখেছি। ভক্তি সম্পর্কীয় কোন লেখা সম্বন্ধে এর চেয়ে বড় তারিফ বোধ হয় আর কিছু হতে পারে না।

নিরাসক্ত

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

হে শোভনে, মোর লোভ নাই ;
নাহি যদি পাই, ক্ষোভ নাই।
  তুমি সুন্দরী, তুমি সুধা—
  আমার নয়নে রূপক্ষুধা,
চোখে চাই আমি, বুকে চাই,
সুখে চাই আর দুখে যাই।
  তবু রাখিনাকো মিছা আশা,
  বচনে ঢাকিনা মনোভাষা।
কারো লাগি মোর লোভ নাই,
হারাই যদি তো, ক্ষোভ নাই।

তুমি পথে আর আমি পথে।
চকিতের মতো থামি' পথে,
  চোখে ভ'রে লই যাহা পারি—
  কী যে রহস্য তুমি, নারি!
কণা পরিমাণ কোনোমতে—
খুঁটে খুঁটে লই দূর হ'তে।
  সাথে সাথে চলা হাতে ধরা
  নাই যদি হয়, নাই ত্বরা।
বাঁকে বাঁকে ভরা বাঁকা পথে
কেন কারে ধ'রে রাখা পথে!

হে শোভনে, আমি সাধিব না ;
নাই যদি পাই, কাঁদিব না।
  তুমি চঞ্চলা, তুমি পাখী-
  সাধ যায় বুকে বেঁধে রাখি ;
বাঁধিবার তরে কী বেদনা!
সকল অর্ঘ্য নিবেদনা!
  তবু রাখিব না মিছা আশা,
  পাখীরে বাঁধিতে নারে বাসা!
বাঁধিবার তরে সাধিব না,
বাঁধা নাই পড়ো—কাঁদিব না।

উড়িতে উড়িতে পাশাপাশি
নিমেষের ভালোবাসাবাসি।
  বুকে ভরে' ল'নু যাহা পারি,
  কী যে অমৃত তুমি, নারি!
পলেক চাহনি তিল হাসি,
বুকে বাজাইল সুখ-বাঁশি।
  এর বেশি পাওয়া অতি পাওয়া,
  নাই যদি পাই, নাই ধাওয়া।
আকাশে আকাশে পাশাপাশি,
এই ঢের ভালোবাসাবাসি।

কামার-দাদা

—গল্প—

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ষাকালে আমাদের গ্রামের নদীটি একেবারে কূলে কূলে ভরিয়া উঠিত। জলের স্রোত তীরের মত বহিয়া যাইত। মাঠের ধারে কিষাণ-মাঝির যে নৌকাটা বাঁধা থাকিত, সেটা কেবলই দুলিত। অন্য সময়ে তাহার কোনই প্রয়োজন হইত না। কিন্তু এই কালটায় তাহার সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এতটুকু বিশ্রাম ছিল না। এপারের লোকদের ও-পারে লইয়া যাইত, আবার ওপারের লোকদের এপারে লইয়া আসিত।

বিকালে আমরা নদীর ধারে বেড়াইতে যাইতাম।

সূর্য্য পশ্চিমের মেঘাঞ্চলে ডুবিয়া যাইত। আকাশের গাঢ় রক্তিমবর্ণ জলকে রাঙাইয়া তুলিত। এবং সেই লাল জল কূলে লাগিয়া নিরন্তর ছল্ ছল্ শব্দ হইত।

নদীর ও-পারে কাশবন, তাহার গোড়ায় জল জমিয়া উঠিত। তাহার পরে খেজুর ও তালগাছ ছাড়া স্পষ্ট আর কিছুই দেখা যায় না। এই তালবনের পাশেই হাট বসে। দিনমানে সেখানে কোলাহলের অন্ত থাকে না, কিন্তু সন্ধ্যার পর একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া যায়। ছেলেবেলায় নদী-পাড়ে বসিয়া এই বিজন ভূমের দিকে চাহিয়া কি মনে হইত, ঠিক মনে নাই, হয় ত' কিছুই মনে হইত না,—কিন্তু এইটুকু বেশ মনে পড়ে, আমরা সকলেই এক সময়ে একেবারে চুপ হইয়া যাইতাম। যেন সব কথা ফুরাইয়া যাইত।

কামারবাড়ীর হাতুড়ী-পেটার শব্দ এই সময়ে খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিত। একমাত্র সেইই এই হাটের ধারে হাট বাঁধিয়া বসবাস করিত।

আমরা সকলেই তাহাকে কামার-দাদা বলিয়া ডাকিতাম। আমাদের মত বয়সে আমাদের দাদারাও ঐ নামেই তাহাকে ডাকিতেন। তাঁহারা কেহ বড়লোক হইয়াছেন, কেহ পিতা হইয়াছেন,—আজিও এই নামটা কিন্তু ভুলেন নাই। কাহারও কোন কাজ পড়িলে ছোটদের উপর হুকুম পড়িত, কামার-দাদাকে একবার ডাকিয়া আন্ ত!

যাহার উপর হুকুম পড়িত, সে বুক ফুলাইয়া হুকুম তামিল করিতে যাইত। সঙ্গীরা যদি জিজ্ঞাসা করিত কোথা যাইতেছিস্, সে গর্ব্বমিশ্রিত স্বরে উত্তর করিত কামার-দাদার কাছে।

আমাকে নিবি রে?

অতি ঔদার্য্যের সহিত সে বলিত, আয়।

কামার-দাদা বেশী কথা কহিত না। তাহার সেই শব্দহীন চাপা ঠোঁটদু'টোর অন্তরালে কি যে আছে ছেলেবেলায় আমরা কিছুতেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতাম না।

এইটুকু জানিতাম, তাহার হাতের মধ্যে একটা জিনিষ আছে, সঙ্কুচিত করিলেই তাহা গোলাকার ধারণ করিয়া লোহার মত শক্ত হইয়া উঠে।

কামারদাদা বাড়ীতে আসিলেই ছোটরা তাহার চারিধারে ঘেরিয়া দাঁড়াইত। একজন হয়ত' নিতান্তই কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া মা'কে বলিত, তিনি যেন কামার-দাদাকে একবার মাগুল তুলিতে হুকুম দেন।

গৃহিণীর আদেশ পাইয়া কামার দাদা হেঁট হইয়া বসিয়া পেশী শক্ত করিয়া তুলিত। একটা দুঃসাহসী বালক সেটা অতি সন্তর্পণে টিপিয়া দেখিত,—তাহার পর বাকী সকলে ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি করিয়া হাতের উপর ঝুঁকিয়া পড়িত।

বড়রাও কামারদাদার কথা কহিতেন। কিন্তু তাঁহাদের কথার ধরণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুতরাং শুনিতাম না। কিন্তু এইটুকু বুঝিয়াছিলাম, এককালে নাকি কামারদাদার একটা সুন্দরী বৌ ছিল। সে একদিন গ্রামের নদীর বর্ষাস্রোতে পড়িয়া ডুবিয়া যায়। সেই হইতে সে একাই থাকে।

আমরা কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করিতাম না।

কামার-দাদা

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

কামারদাদার নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রার পিছনে একটি সহজ ও সরল রহস্য আমাদের মনে স্থায়ীভাবে আসন পাতিয়া বসিয়াছিল। আমরা জানিতাম, আমাদের মত বয়স হইতেই সে নিঃসঙ্গ। গুরুজনদের কথাটা নেহাৎই কল্পনা বলিয়া ভাবিয়া লইতে না পারিলে আমরা কিছুতেই শান্তি পাইতাম না। কামারদাদার যে কোনদিন একটা বৌ হইতে পারে, সে বৌ যে সাহস করিয়া কামারদাদার সঙ্গে বাস করিতে পারে,—এ আমাদের ধারণার অতীত ছিল।

বৈকালে নদীর ধারে বসিয়া আমরা গান গাহিতাম, গল্প করিতাম। সূর্য্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ব.কা নিস্তব্ধ হইত। তাহার পর কামারবাড়ী হইতে খট্‌ খট্‌ শব্দ আসিত।

ক্রমে রাত্রি নামিত। কিষাণমাঝি শেষ-পার করিয়া ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া বাড়ি ফিরিত। ধূসরসন্ধ্যা অন্ধকারে লেপিয়া যাইত। কামারবাড়ী হইতে মিট মিটে আলো দেখা যাইত। আমরা সেইদিকে চাহিয়া থাকিতাম।

উঠিবার সময় হইত। কেমন একটা নীরবতার মধ্যে আমরা চলিতে থাকিতাম। পিছনে নদীর জল তখনও ছল্‌ ছল্‌ করিত। আমরা আরও আগাইয়া যাইতাম। নদীর গান থামিয়া যাইত। কামারবাড়ীর হাতুড়ীর শব্দ তখনও শুনা যাইত। ক্রমে গ্রামের মধ্যে ঢুকিতাম। আর কিছুই শুনিতাম না। তবুও সেই খট্‌ খট্‌ শব্দের একপ্রকার অদ্ভুত স্মৃতি আমাদের ঘিরিয়া থাকিত।

ছেলেবেলার এই কথাগুলো বেশ মনে আছে।

তারপর বড় হইয়াছি। সহরে পড়িতে গিয়া ছুটীতে ছুটীতে বাড়ী আসিতাম ;—তখনও নদীর পাড়ে গেলে কামারদাদার বাড়ীর দিকে চাহিতাম, সন্ধ্যার পর হাতুড়ী পেটার শব্দ আরম্ভ হইলে ছেলেবেলার কথা মনে পড়িত। মনটা কেমন করিয়া উঠিত।—বিস্মৃতস্বপ্নের ছায়ায় কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য ফিরিয়া যাইতাম, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকিতাম না, ফিরিয়া আসিতাম।

তখন আমরা দাদাদের পর্য্যায়ে উঠিয়াছি। একদিন পড়া শেষ হইল। চাকুরীও মিলিল। দেশত্যাগ করিয়া বিদেশে আস্তানা বসাইলাম।

সুদীর্ঘ তিন বৎসর পরে আবার দেশে ফিরিলাম। বাড়ী মেরামৎ হইল। পুরাতন যাহা যেখানে ছিল, তাহাদের সহিত আবার চেনা পরিচয় হইল। চিনিতে পারিলাম না সুধু আমাদের প্রাচীন নদীটিকে। তাহার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে ; এবং ওপারের প্রান্তটুকুর আরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে,—আগেকার চিহ্নমাত্র নাই।

কোথায়ই বা কাশবন, কোথায় বা হাট। লাল টালি-ছাওয়া অসংখ্য বাড়ী সমস্ত স্থানকে ঘেরিয়া রাখিয়াছে,—শ্যামলতা এতটুকু চোখে পড়ে না। সবচেয়ে প্রথমে যেটা দেখিলাম, সেটা একটা সুদীর্ঘ স্তম্ভবিশেষ। যেন আকাশের দিকে নির্ণিমেষে চাহিয়া আছে।

শুনিলাম পাটকল বসিয়াছে।

গ্রামে পা দিতেই যে শব্দটা শুনিয়াছিলাম, বুঝিলাম সেটা শঙ্খধ্বনি নয়, কলের ডাক। যে কোলাহল অনুভব করিয়াছিলাম, সেটা হাটের নয়, হাহাকারের।

হঠাৎ কামারদাদার কথা মনে পড়িল।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে আর কামারদাদা নয়, এখন সে পাটের কুলীর বড় সর্দ্দার।

আর নাকি চিনিবারও জো' নাই। বিবাহ করিয়াছে, একটা মেয়েও হইয়াছে। সাহেব তাহাকে ভাল ঘর দিয়াছে। স্ত্রী-কন্যা লইয়া সুখেই ঘর-সংসার করিতেছে।

যাঁহারা খবরটা দিলেন, তাঁহারা একবাক্যে বলিলেন, কামারের বরাত ভালই ছিল। নচেৎ এমন উন্নতি কয়জ.নর ভাগ্যে ঘটে ?

তাঁহারা আমাকে এমনও আশ্বাস দিলেন, ও-পারে গেলে তাহার সাক্ষাৎ মিলিলেও মিলিতে পারে।

যাবেন ?

সহসা উত্তর করিতে পারিলাম না। একটা ঢোক গিলিয়া বলিলাম, না থাক্‌।

রাত্রে শয়ন করিয়া কামারদাদার কথাটাই বিশেষ করিয়া মনে পড়িতে লাগিল। চোখের উপর একটা দৃঢ় কঠিন ও কঠোর-সংযত মুখ বার বার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। রাত্রের নিবিড় নীরবতার মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া একটা রহস্যাবৃত দূরাগত শব্দ শুনিতে লাগিলাম,—খট্, খট্,—

ঝির ঝির করিয়া এক একটা বাতাস বহিয়া যায়, আর স্বপ্ন সহসা ভাঙ্গিয়া যায়।

ভাবিলাম, কত প্রভেদই না হইয়াছে।—স্বর্গ ও মর্ত্ত্য। কিন্তু কোন্‌টা স্বর্গ, কোনটা মর্ত্ত্য,—আগেরটা কি বর্ত্তমানটা—ভাবিয়া কিছুতেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

দুর্লভ

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

তোমারে আমি জীবন ভরি'
খুঁজিনু মনে মনে!—
কারণে-অকারণে,
কতনা দুখে, কতনা সুখে
কত মিলন ক্ষণে,
নবীন-নব শিশুর মুখে
হাসির রেখা সনে!

আজিকে মোর নয়ন দু'টি
ভরিয়া উঠে জলে।
কখনো কোনো ছলে
শ্রীহীন মনে গোপনে যেথা
বেদনা-শিখা জ্বলে,
আস'নি নেমে। তাইত সেথা
মরিনু পলে পলে।

আমারি পথে চলিতে মোর
শিকল বাজে পায়ে।
দাঁড়ায়ে গায়ে-গায়ে
হাজারো জন, হাজারো মন;—
শাসন ভাসে বায়ে।
তোমারে পা'ব নাহি সে ক্ষণ
পরাণ ভরে ছায়ে!

নিজেরি মাঝে ডুবিয়া রহি'
মরি যে তিলে তিলে!
সময় নাহি মিলে!
জীবন-ভার বাড়িয়া উঠে
তুমি ত নাহি নিলে!
দীর্ণ মোর পর্ণ-পুটে
অমৃত নাহি দিলে!

হে চি[illegible]ময়, চলেছি পথে;
সহজ হ'বে কবে?
টানিয়া মোরে ল'বে;
মায়েরি মতো চুমিয়া মুখ
ডাকিবে স্নেহ-রবে।
গরবে মোর ভরিবে বুক
সহজ হ'বে যবে!

তোমারে সদা ভুলিয়া যাই
ঘূর্ণীস্রোত-মাঝে!
চির-নবীন সাজে
মরণে বসি' হাসিছ তুমি
স্মরণে রহে না যে!
জীবনে তুমি সহজে চুমি'
রহিলে মনোমাঝে!

চীনে হিন্দু-সাহিত্য

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

৪

বোধিরুচি ও বোধিধর্ম্ম

দক্ষিণ চীনে লিয়াংরাজাদিগের ও তৎপরে 'চেন' রাজগণের অধীনে ভারতীয় শ্রমণশ্রেষ্ঠ পরমার্থ চীনে হিন্দু সাহিত্য বিস্তারের জন্য কিরূপ অক্লান্তভাবে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি। ৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীনে আসেন; ৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কার্য্য করেন।

৩৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর চীনে "বাই" (wei) রাজত্বের আবির্ভাব হয়; সমগ্র উত্তর চীন ক্রমশঃ "বাই" রাজাদিগের অধীনতা স্বীকার করে। ৩৮৬ হইতে ৫৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইঁহারা রাজত্ব করেন। "বাই" রাজগণ সাধারণভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান্ ছিলেন। মধ্যে মধ্যে দু'একজন রাজা বৌদ্ধদিগের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া কিছু কিছু উৎপীড়ন করিতেন। তোবাতাও ছিলেন এই বংশের তৃতীয় সম্রাট। তাঁহার প্রতাপ বহুদুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কোরিয়া, তুর্কীস্থান প্রভৃতি বহুদুর দেশ হইতে তাঁহার রাজসভায় উপঢৌকন আসিত। তোবাতাও ছিলেন 'তাও' মতাবলম্বী। তাঁহার শিক্ষাসচিব ছিলেন 'সুই হাও'; বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি ইঁহার আস্থা ছিল না। ইঁহার ম ও সহায়তায় সম্রাট বৌদ্ধদিগের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে চাঙ্‌ঙান বিহার হইতে অস্ত্র বাহির হয়। ইহাতে তাঁহার ক্রোধ আরও বাড়িয়া যায়। বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে দুশ্চরিত্র ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া তিনি অপবাদ দিলেন। ৪৪৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট তোবাতাও বৌদ্ধবিহারগুলি ও বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ পুড়াইয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন এবং বৌদ্ধ শ্রমণদিগের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিলেন। যুবরাজ যিনি তিনি ছিলেন বৌদ্ধ। তিনি বহু শ্রমণের প্রাণ বাঁচাইয়া দিলেন; কিন্তু বিহারগুলি একটাও রক্ষা করিতে পারিলেন না। এই উৎপীড়ন কিন্তু বেশীদিন চলে নাই। তোবাতাও গুপ্ত শত্রুর হস্তে নিহত হন। তাঁহার উত্তরাধিকারী রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রথমেই বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করেন ও তাঁহার প্রজাবৃন্দকে বৌদ্ধশ্রমণ হইবার জন্য অনুমতি দান করেন। সি-তান-য়াও নামক এক চীনা শ্রমণের সহিত এই রাজার সৌহার্দ্দ ছিল। তাঁহার পরামর্শে উত্তর শান্সীর ইয়াংকাং পর্ব্বতের গাত্রে তিনি পাঁচটী বুদ্ধের মূর্ত্তি খোদিত করান; সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মূর্ত্তিটা উচ্চতায় ৭০ ফিট্। এই 'বাই' রাজাদিগের সময় হইতেই বৌদ্ধশিল্পের সূচনা হয়। ৪৭১ খৃষ্টাব্দে তোবাহাং নামক এক 'বাই' (wei) রাজা বুদ্ধের একটী প্রকাণ্ড মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ তাঁহার এতই প্রবল ছিল যে, বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে দিনযাপন করিবার জন্য তিনি রাজপদ পরিত্যাগ করিলেন। তাহার উত্তরাধিকারী ছিলেন আবার কুংফুৎসুর মতাবলম্বী। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহার প্রভাব চীনে এমন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহার প্রয়াস বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজার সময় পুনরায় বৌদ্ধগণ অবাধে কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই রাজার সময় 'বাই' (wei) রাজ্যে তের হাজার বৌদ্ধ বিহার ছিল বলিয়া শুনা যায়। তুং-ক্যিয়েন (ইতিহাস দর্পণ) নামক সুপ্রসিদ্ধ চীনা ইতিহাসে দেখা যায় যে এই সময় প্রায় সকল গৃহস্থই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধশ্রমণের সংখ্যা এত অধিক হয় যে, ক্ষেতে কায করিবার জন্য লোক পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। 'বাই' (wei) রাজাদিগের কাহিনীতে রহিয়াছে যে তখন বিশ লক্ষ শ্রমণ ছিলেন এবং ত্রিশ হাজার বৌদ্ধবিহার ছিল; এই সংখ্যা কিছু অতিরঞ্জিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা হইতে অনুমান করা যায় সে সময় কিরূপ দ্রুতগতিতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইতেছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনে হিন্দুর সংখ্যা তিন হাজারেরও অধিক ছিল। যে সকল হিন্দু শ্রমণ গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমরা কিছু জানিতে পারি; ইহা ব্যতীত কত শত ভারতীয় শ্রমণ যে

দলে দলে চীন, তীব্বত ও মধ্যএশিয়ায় প্রচারোদ্দেশে গিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে 'বাই' সম্রাজ্ঞী ছিলেন মৃত রাজার পত্নী 'হু'। ব্যবহারিক নীতির দিক দিয়া তিনি তেমন ভাল না হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। ৫১৮ খৃষ্টাব্দে সুং উন্ (Sung yin) ও হুই সেং নামক দুই ব্যক্তিকে তিনি বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহের নিমিত্ত 'উদ্যান' ও গান্ধারে পাঠাইলেন। তাঁহারা ১৭০ খণ্ড মহাযান গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনেন। 'বাই' রাজত্বের সময় বহু লেখক এই সকল পুঁথির অনুবাদ করেন।

'বাই' (wei) রাজত্বের দেড় শতাব্দীর মধ্যে সাত জন শ্রমণ ৬৯টী গ্রন্থ অনুবাদ করেন, তাহার মধ্যে ৪২টি পাওয়া যায়। এই সাত জন অনুবাদকের মধ্যে ৪ জন ছিলেন হিন্দু। সেই ৪ জন হইলেন ধর্ম্মরুচি, রত্নমতি, বুদ্ধশান্ত ও বোধিরুচি। ইঁহাদের মধ্যে বোধিরুচিই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১২৭ খণ্ডে ৩৯টী গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেন। উত্তর ভারতে তিনি ছিলেন একজন ত্রিপিটকাচার্য্য। বিদেশে সদ্ধর্ম্মপ্রচারার্থে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া পামীর মালভূমি পার হইয়া অবশেষে ৫০৮ খৃষ্টাব্দে লোয়াংএ আসিলেন। তখন সম্রাট সিয়ান বু (Sinan wu) রাজত্ব করিতেছেন। সম্রাট তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ৭০০ শ্রমণের নেতৃত্বে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই ৭০০ শ্রমণের প্রত্যেকে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। বোধিরুচির সম্মানার্থে একটী বিহার নির্ম্মিত হয়। সেই বিহারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি অনুবাদ কার্য্য আরম্ভ করেন। ৫৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্য 'বাই' রাজগণ লোয়াং হইতে রাজধানী Yehতে লইয়া যান। বোধিরুচিও নূতন রাজধানীতে যাইলেন। ৫০৮ হইতে ৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অনুবাদ কার্য্যে রত থাকিয়া ৩৯টী গ্রন্থ অনুবাদ করেন।

যোগাচার শাখার লঙ্কাবতারসূত্র বোধিরুচি প্রথম সম্পূর্ণভাবে অনুবাদ করেন। ৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে গুণভদ্র যে ইহার অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা অসম্পূর্ণ। আর একটী প্রসিদ্ধ সূত্র বোধিরুচি প্রথম অনুবাদ করেন, সেটী হইতেছে ধর্ম্মসঙ্গীত। মূল গ্রন্থখানি হারাইয়া গিয়াছে কিন্তু শিক্ষা সমুচ্চয়ে ইহা হইতে কয়েকটী উৎকৃষ্ট অংশ উদ্ধার করা হইয়াছে। পরার্থে নিঃস্বার্থ কার্য্য, ধ্যান ও মনঃসংযোগ, মন ও বাক্য সম্বন্ধে সতর্কতা, নিস্বার্থ দান, গভীর ধ্যানযোগ, শূন্যতা, সৎসঙ্কল্প ও ধর্ম্মপরায়ণতা সম্বন্ধে কয়েকটী অংশ শিক্ষা সমুচ্চয়ে রহিয়াছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে অংশটী রহিয়াছে তাহা যে কী চমৎকার তাহা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি,—"বোধিসত্ত্বের মনে এই চিন্তার উদয় হইল যে অনন্ত-গুণসম্পন্ন বোধিসত্ত্বগণ ধর্ম্ম হইতে জন্ম গ্রহণ করেন, ধর্মতেই বাস করেন, ধর্মের আলোকেই পথ দেখিয়া চলেন। তাঁহাদের কর্মের উৎস ধর্ম, কর্মের ক্ষেত্র ধর্ম। ধর্মধনে তাঁহারা ভূষিত, পার্থিব অপার্থিব সর্বপ্রকার সম্পদে তাঁহারা সম্পদবান। অতএব বোধিজ্ঞানলাভার্থে আমি ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিব, ধর্ম হইতে শক্তি সঞ্চয় করিব, ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করিব।" বোধিসত্ত্ব পুনরায় আপন মনে বলিতেছেন "ধর্ম সকল প্রাণীর নিকটই এক। ধর্মের নিকট উচ্চ নীচ বা সাধারণ বলিয়া কোনও প্রভেদ নাই। ধর্মে যেমন কোনও প্রভেদ নাই, আমার মনেও সেরূপ কোনও প্রভেদ রাখিব না। কেবল প্রেয়কে মানিয়াই ধর্ম চলে না, আমার মনও যেন কেবল প্রেয়ই না চায়। ধর্ম কালের অপেক্ষা রাখে না, ইহা কালাতীত। প্রত্যেকে নিজ জীবনে ইহা উপলব্ধি করে, আমিও ধর্মকে আমার জীবনে বরণ করিয়া লইব। ধর্ম কেবলমাত্র পবিত্র জিনিসে নাই, কেবলমাত্র অপবিত্র জিনিসেও নাই; ধর্ম পবিত্রতা অপবিত্রতার অতীত, ভালমন্দের অতীত, আমার মনকেও ভালমন্দের অন্ধসংস্কার হইতে মুক্ত করিব। কেবল সাধু ব্যক্তির মধ্যেই ধর্ম নাই, আবার সংসারী ব্যক্তির মধ্যেও কেবল নাই; ধর্ম পথের বিচার করে না, আমার মনকেও সেইরূপ উদারতা দান করিতে চাই। কেবল রাত্রে ধর্ম নাই অথবা কেবল দিনেও নাই; ধর্ম সর্বদা বিদ্যমান, আমার মনেও ধর্ম অনুক্ষণ বিরাজ করুক। ধর্মে দীর্ঘসূত্রতা নাই, আমার মনও দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করুক। ধর্মে শূন্যতাও নাই, পূর্ণতাও নাই; ইহাকে পরিমাপ করা যায় না। বাতাস যেমন তেমনই ধর্মের উদ্ভবও নাই, বিনাশও নাই, বাতাসের ন্যায় ধর্ম আমার নিশ্বাস প্রশ্বাসের

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

সহায়তা করুক। ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য কাহারও প্রয়োজন নাই, ধর্মই সকলকে রক্ষা করে; আমার চিন্তাও ধর্মদ্বারা সুরক্ষিত হউক। ধর্ম কাহাকেও আশ্রয় করে না, ধর্মই সকলের আশ্রয়; ধর্ম আমার আশ্রয় হউক। ধর্মের গতি কেহ রোধ করিতে পারে না, ইহার গতি অবাধ, দুর্ণিবার, আমার জীবনেও ধর্মের স্রোত অবাধে চলুক। ধর্মে কোনও আসক্তিই নাই, আমার মনও অসক্তিশূন্য হউক। পুনর্জন্মকে ধর্ম ভয় করেনা, নির্বাণেও সে অত্যধিক হর্ষান্বিত নয়, কারণ ইহা হর্ষ ভয়ের অতীত; আমার মনও এইরূপ শান্তভাব অবলম্বন করুক।" এইরূপে বোধি-সত্ত্ব ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ ধ্যান করেন।

বোধিরুচির অনূদিত ১৭টী সূত্র গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য আর্য্যদেবের তিনখানি গ্রন্থ ও বসুবন্ধুর ৭ খানি গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেন। আর্য্যদেব একটী গ্রন্থে তখনকার ৪টী বিরুদ্ধমতের খণ্ডন করিয়াছেন; এই চারটীর প্রভাব তখন খুব প্রবল ছিল। লঙ্কাবতার সূত্রেও ইহাদের উল্লেখ রহিয়াছে। চারিটীর মধ্যে প্রথম হইল সাংখ্য, দ্বিতীয় বৈশেষিক, তৃতীয় নিগ্রন্থপুত্রাঃ ও চতুর্থ জ্ঞাতিপুত্রাঃ। আর একটী গ্রন্থে আর্য্যদেব ২০টী বিরুদ্ধ মতের বিভিন্ন প্রকার মুক্তির আদর্শ-ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর্য্যদেবের তৃতীয় গ্রন্থটীর নাম হইল শতাক্ষর।

বজ্রছেদিকা প্রজ্ঞাপারমিতার নাম পূর্বে করা হইয়াছে। ইহার ছয়বার অনুবাদ হয়; বোধিরুচির অনুবাদ হইল চতুর্থ। অসঙ্গ বজ্রছেদিকার এক টীকা লিখেন, সুই (Sui) রাজত্বের সময় ধর্মগুপ্ত নামক এক ব্যক্তি তাহার চীনা অনুবাদ করেন। বসুবন্ধু অগ্রজের লিখিত টীকার আবার এক ব্যাখ্যা লিখেন। ৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে বোধিরুচি ইহার অনুবাদ করেন।

গয়াশীর্ষ নামক একটী প্রসিদ্ধ মহাযান গ্রন্থ কুমারজীব প্রথম চীনভাষায় অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থের বসুবন্ধু কৃত একটী টীকা রহিয়াছে, তাহার নাম মঞ্জুশ্রী-বোধিসত্ত্ব পরিপৃচ্ছা-বোধিসূত্রশাস্ত্র। ৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বোধিরুচি এই টীকার অনুবাদ করেন। এইরূপ কথিত আছে যে বুদ্ধ উরুবিল্বে বহুলোককে দীক্ষাদান করিয়া গয়াশীর্ষের চৈত্যে আসিলেন। সেইখানে তিনি নানারূপ অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইলেন। তাহার পর অগ্নির দাহশক্তি সম্বন্ধে, আকারের নশ্বরত্বের বিষয়, উপাদান, সজ্ঞা ও সংস্কার সম্বন্ধে ও নিদান বিষয়ক নানা উপদেশ দিলেন। স্বয়ং রাজা বিম্বিসার ও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থ এই উপদেশের ফলে দীক্ষাগ্রহণ করেন।

বিশেষ চিন্তাব্রহ্ম পরিপৃচ্ছা নামক নির্বাণ শাখার একটী সূত্র আছে, চীনভাষায় তাহার তিনবার অনুবাদ হয়। প্রথম ২৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মক্ষেম তাহার অনুবাদ করেন; দ্বিতীয়বার কুমারজীব ৪ খণ্ডে অনুবাদ করেন; তৃতীয় অনুবাদ করেন বোধিরুচি। বহুপ্রকার ধর্মমতের বিবর্ত্তনের ফলে এই গ্রন্থে মহাযানপন্থীদিগের সূক্ষ্মতম কয়েকটী মত ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটী মত এই যে নির্বাণ ও সংসার এক। নাগার্জুন তাঁহার মধ্যমক কারিকায়ও এই মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন সংসারকে নির্বাণ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। নির্বাণকেও সংসার হইতে বিভিন্নরূপে দেখা যায় না। বিশেষচিন্তাপরিপৃচ্ছার লেখক এই মতটী অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। খুব সম্ভব গ্রন্থটী নাগার্জুনের পূর্বেই লিখিত। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যেই চীনে বৌদ্ধধর্মের যে উচ্চ আদর্শ প্রচার করা হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিবার জন্য আমরা গ্রন্থটীর অংশবিশেষ উদ্ধার করিয়া দিতেছি:—

"প্রত্যেক বস্তুর সারসত্ত্বা সত্যে নিহিত রহিয়াছে; কোনও প্রকার আসক্তি বা প্রবৃত্তি দ্বারা তাহা আবৃত নয়, তাহা নির্গুণ। প্রত্যেক বস্তুর সারসত্তাটী নিষ্কলঙ্ক পবিত্র। জন্ম মৃত্যু মূলত শুদ্ধসত্ত্ব; নির্বাণের মূলকথা তাহাই। সুতরাং জন্ম মৃত্যু মূলত একই। বস্তুত সংসারের বাহিরে নির্বাণ খুঁজিবার প্রয়োজন নাই। আপাতদৃষ্টিতে সংসার নশ্বরই বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার সহিত নির্বাণের কোনও প্রভেদ নাই। 'নির্বাণ ও সংসার এই দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক, নির্বাণ লাভ করিতে হইলে জন্ম মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে হইবে'—এই ধারণাই ভ্রমাত্মক। কুতর্কের জাল ছিন্ন করিতে পারিলে এই সত্যই প্রতিভাত হয় যে আমাদের

সাংসারিক জীবন নির্বাণেরই ক্রিয়ামাত্র ; ইহার গতি নির্বাণের দিকে।" বসুবন্ধু তাঁহার বুদ্ধগোত্র সূত্রে এইমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। বসুবন্ধু বিশেষচিন্তাব্রহ্মপরিপৃচ্ছার একটী টীকা লিখেন। বোধিরুচি তাহারও অনুবাদ করেন। বোধিরুচির আর একটী গ্রন্থ হইল দশভূমিকা-সূত্রের অনুবাদ।. এই দশভূমিকার লেখকও বসুবন্ধু ; ইহার টীকাও বসুবন্ধুর লিখিত। দশভূমিকার উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। ধর্মরথং কুমারজীব ও বুদ্ধযশ পূর্ব্বে ইহার অনুবাদ করেন। বুদ্ধাবতংসক মহাবৈপুল্য শাস্ত্রের দ্বাবিংশ অধ্যায় হইল দশ ভূমিকা। বুদ্ধভদ্র প্রাচ্য ৎসীন রাজত্বের সময় ঐ সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি অনুবাদ করেন।

অমিতায়ুবাদ নাগার্জুন প্রথমে প্রচার করেন বলিয়া প্রবাদ ; তৎপরে করেন বসুবন্ধু। অমিতায়ুসূত্রের চীনা অনুবাদ একাধিকবার হইয়াছে। অমিতায়ুসূত্রের একটী টীকা বসুবন্ধু লিখেন, তাহাতে অনন্ত জীবন ও ভক্তিবাদ বিশদভাবে তিনি ব্যাখ্যা করেন। বোধিরুচি বসুবন্ধুর এই টীকার অনুবাদ করেন। বসুবন্ধুর অপর একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ বোধিরুচি করেন, তাহার নাম সদ্ধর্মপুণ্ডরীকসূত্রশাস্ত্র। সদ্ধর্মপুণ্ডরীক মূল গ্রন্থখানি এখনও পাওয়া যায়। মহাযান মতের ইহা একটী প্রামাণ্য গ্রন্থ। ছয়বার ইহার চীনা অনুবাদ হয়। চীনে বৌদ্ধধর্মের Tientai নামক একটী বিশেষ শাখার মতে বুদ্ধের কর্ম-জীবনকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় ; সর্ব্বশেষ অংশে তিনি সদ্ধর্মপুণ্ডরীক প্রচার করেন। তাঁহারা বলেন জীবনের প্রথম দিকে বুদ্ধ অবতংসকসূত্র প্রচার করেন, তাহাতে মহাযানের গভীরতম তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে তিনি কাশী নগরীর নিকট সারনাথ নামক স্থানে আগম সূত্র ব্যাখ্যা করেন ; তৃতীয় ভাগে তথাগত বুদ্ধ আট বৎসর ধরিয়া হীনযান ও মহাযানের সূত্র সমূহ বিবৃত করেন ; চতুর্থ ভাগে তিনি ৪২ বৎসর ধরিয়া প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র প্রচার করেন। পঞ্চম ও শেষভাগে আট বৎসর ধরিয়া সদ্ধর্মপুণ্ডরীক ও মহানির্বাণ সূত্র ব্যাখ্যা করেন। এই শেষাংশেই তথাগত তাঁহার উচ্চতম ও পূর্ণতম আদর্শ ব্যক্ত করেন।'

বসুবন্ধু এই গ্রন্থখানির যে টীকা লিখেন সেই টীকা এখন আর পাওয়া যায় না; বোধিরুচি কৃত অনুবাদ হইতেই আমরা তাহার বিষয় জানিতে পারি।

বোধিরুচি যে লঙ্কাবতার সূত্রের অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বসুবন্ধু এই লঙ্কাবতার সূত্রের উপর একটী সুচিন্তিত গ্রন্থ লিখেন, গ্রন্থটী হইল বিজ্ঞপ্তিমাত্রসিদ্ধি। পরমার্থ এই গ্রন্থটীর প্রথম অনুবাদ করেন, বোধিরুচি দ্বিতীয়বার করেন, পরে আর একটী অনুবাদ করেন হুয়েনসাং। পরমার্থ প্রসঙ্গে গ্রন্থটীর বিষয় আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি।

বোধিরুচি যে সকল গ্রন্থ অনুবাদ করেন, তাহার কতকগুলি হুয়েনসাং পুনরায় অনুবাদ করেন বটে ; কিন্তু তাহাতে বোধিরুচির অনুবাদের মূল্য কিছুমাত্র কমে নাই ; বরং ভারতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মত তাঁহাদিগের ন্যায় গুণী ব্যক্তিগণ চীনবাসীর নিকট পুনঃপুনঃ সতেজে উপস্থিত করায় চীনে সেগুলির প্রভাব বদ্ধমূল হইয়া যায়।

বোধিরুচির পর সেই যুগের অনুবাদকদিগের মধ্যে Ki-Kia-Yea (চীনা প্রতিশব্দ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত তাঁহার নাম ছিল কেকয় বা কির্কায় ; কিঙ্কার্য্যের প্রাকৃতরূপ হইল কিকায়। কেহ কেহ মনে করেন তিনি মধ্য এশিয়াবাসী ; কোন কোন চীনা পণ্ডিত মনে করেন তিনি পশ্চিম ভারতবাসী হিন্দু। কিকায় পাঁচটী গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাজার আদেশে তিনি **Tsa-pao-tsang-King** (চীনা নাম) নামক একটী গ্রন্থ অনুবাদ করেন। মূল গ্রন্থটীর নাম সংযুক্তরত্নপীটকসূত্র। তাহার মধ্যে ১২১টী আখ্যায়িকা আছে, কতকগুলি দীর্ঘ, কিন্তু অধিকাংশই সংক্ষিপ্ত। প্রথম গল্পটীতে রামায়ণই সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে ; পালীতে এই গল্পটী দশরথ জাতক নামে সুপরিচিত। এই গ্রন্থের গল্পগুলি অধিকাংশই জাতক বা অবদান। কিকায়ের অনূদিত বোধিহৃদয়ব্যূহসূত্র গ্রন্থখানি কুমারজীব ইহার পূর্ব্বে একবার অনুবাদ করিয়াছিলেন, কুমারজীবের অনূদিত গ্রন্থখানির নাম দিয়াছিলেন মহাবৈপুল্য বোধিসত্ত্বদশভূমিসূত্র ; মূলত দুইটী অনুবাদ একই

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুধাময়ী দেবী

গ্রন্থের। কিকায় নাগার্জ্জুনের একটী গ্রন্থেরও অনুবাদ করেন; তাহার নাম উপায়কৌশল্যাহৃদয়সূত্র-কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ গ্রন্থ হইল **Fu-ta-tsang-yin-yuan-chuan** অর্থাৎ ধর্ম্মপিটক গুরুপরম্পরায় বিস্তৃত হইবার ইতিহাস বা নিদানের ইতিহাস। চীনা গ্রন্থখানি কোনও বিশেষ গ্রন্থের অনুবাদ নয়; কতিপয় বিভিন্ন গ্রন্থের অংশ বিশেষ সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থখানি প্রণীত। Henry Maspero বহু যুক্তি তর্ক দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে গ্রন্থখানি ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে লিখিত প্রাচীনতর কতিপয় গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন মাত্র করিয়া পৃথক একটী গ্রন্থ বলিয়া ইহা চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে! বস্তুত মূল গ্রন্থখানির:কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। Maspero বিশ্বাস করেন না যে কোনও কালে তাহা ছিল।

কিকায়ের গ্রন্থখানিতে প্রথমে মহাকাশ্যপ হইতে আরম্ভ করিয়া ভিক্ষুসিংহ পর্য্যন্ত ২৩ জন বৌদ্ধগুরুর ইতিহাস রহিয়াছে। মহাযান মতে বুদ্ধের ধর্ম্মমতের ও ধর্ম্ম সমাজের পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২৮ জন গুরু ছিলেন। কিকায়ের গ্রন্থে ২৩ জনের নাম রহিয়াছে, বসুমিত্রের নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে। ইঁহাকে লইয়া ২৪ জন গুরু কিকায়ের সময় পর্য্যন্ত ছিলেন। অবশিষ্ট ৪ জন সম্ভবত কিকায়ের পরে আবির্ভূত হন। আবার অনেকের মতে সর্ব্বশুদ্ধ ২৪ জনই গুরু ছিলেন, ২৮ জন নহেন। এইরূপ প্রবাদ যে শেষ গুরু ভিক্ষুসিংহ কাশ্মীরের অধিপতি মিহিরকুলের হস্তে নিহত হন। ভিক্ষুসিংহ তাঁহার উত্তরাধিকারী কে হইবে স্থির করিয়া যাইতে পারেন নাই। মিহিরকুলের রাজত্বকাল ৫১০ হইতে ৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ভিক্ষুসিংহ ছিলেন তাঁহার সমসাময়িক। তাহা হইলে ৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে কিকায়এর এই গ্রন্থ লেখা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে কিকায় এই গ্রন্থের রচয়িতা হইতে পারেন না। এইরূপ শুনা যায় যে ভিক্ষুসিংহের পর ৩ জন গুরু ও সর্বশেষ গুরু বোধিধর্ম ছিলেন দক্ষিণভারতবাসী; সুতরাং তাঁহাদের সমসাময়িক উত্তরভারতবাসীর নিকট তাঁহাদের সংবাদ পৌছায় নাই। তখনকার বৌদ্ধসাহিত্যে সেই জন্যই তাঁহাদের নাম নাই।

উত্তরে wei রাজত্বের সময় ৫২০ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সর্ব্বশেষ ভারতীয় গুরু বোধিধর্ম্ম চীনে আসেন। চীনের বৌদ্ধ সাহিত্যে বোধিধর্ম্মের নাম নাই বটে. কিন্তু চীনে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে ধারা ক্রমশঃ বহিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে বোধিধর্ম্মের প্রভাব খুব বেশী। তিনি লিখিত কোনও গ্রন্থ রাখিয়া যান নাই বলিয়া তাঁহার স্থান আমরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারি না। কত শত সহস্র লোক যে তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া জীবনের গতি ফিরাইয়া মহত্বের পথে, ধর্ম্মের পথে চলিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ৫২০ খ্রীষ্টাব্দে (কেহ বলেন ৫২৬) বোধিধর্ম্ম ক্যাণ্টনে আসেন। চীনাগণ বলেন তিনি Hsiangchih নামক দেশের এক রাজার পুত্র। সম্ভবতঃ এ স্থানটী পারস্যে। এইরূপ অনুমান করা হয় যে বোধিধর্ম্ম হিন্দু ছিলেন না, ছিলেন পারস্যবাসী পারসিক।

বোধিধর্ম্ম চীনে আসিয়া নামকিংএ লিয়াংরাজা (wu) 'বু'র সাক্ষাৎ করেন। সম্রাট 'বু' তাঁহাকে সগর্ব্বে বলেন যে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন ও বৌদ্ধগ্রন্থাবলী অনুবাদে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। এই সকল শুনিয়া বোধিধর্ম্ম সংক্ষেপে বলিলেন যে এই সকল কার্য্য করিয়া তিনি বস্তুত কিছু লাভবান হন নাই, বস্তুতঃ তাঁহার কোনও পুণ্য সঞ্চয় করা হয় নাই, কারণ অন্তরের মধ্যে আত্মদর্শনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। রাজা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে পুণ্যকার্য্য বলিয়া কি কিছু নাই?" বোধিধর্ম্ম উত্তর করিলেন 'যেখানে সবই শূন্যতা, সেখানে পুণ্য বলিয়া কিছু নাই।' রাজা তাহাতে অধিকতর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'তবে যে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছে সে কে? বোধিধর্ম্ম বলিলেন "তাহা জানিনা।"

রাজার সহিত বোধিধর্ম্মের কথোপকথন প্রসঙ্গে এই ভিক্ষুপ্রবর কি বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ আমরা উদ্ধার করিয়া দিতেছি;—'পুনর্জন্মের চক্র হইতে কোনও সূত্র, কোনও প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে না। অধ্যয়ন ব্রহ্মচর্য্য সকলই বৃথা যায়। গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার কিছুই প্রয়োজন নাই। অধ্যয়ন, সদুপদেশ

শ্রবণ দ্বারা কিঞ্চিৎ সহায়তা হইতে পারে মাত্র কিন্তু চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ করিয়া স্তব্ধভাবে ধ্যানমগ্ন হও, অন্তর গুহাবাসী আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি কর। সেই অন্তরবাসী আত্মাই বুদ্ধ, তাঁহাকে উপলব্ধি করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র দর্শন। আর সকল প্রকার দৃষ্টিই মায়াময় মরীচিকা। আত্মাতে বুদ্ধদর্শনই প্রকৃত সত্যদর্শন। বুদ্ধের যে স্বরূপ নানাজন নানাপ্রকারে ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পায়, সেই স্বরূপ প্রত্যেক মানবের অন্তস্তলে নিহিত রহিয়াছে। অন্য সকল ভুলিয়া সেই চরম সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই জন্মান্তরের শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করা যায়; সেই স্বরূপে নিমগ্ন হইয়া নির্ব্বাণলাভ করা যায়। নানাপ্রকার মতবাদ নানাপথে মানবকে লইয়া গিয়া কেবলই মায়াজালে জড়ায়, সেগুলি মারেরই বাহন। সদাচার, শুদ্ধি, সৎকার্য্য, সৎপথে চলিবার কথা মানবকে বলিয়া কোনও লাভ নাই। প্রত্যেক মানবের মধ্যেই বুদ্ধ বর্ত্তমান, প্রত্যেক মানবই বুদ্ধ; সেই আত্মাতে বুদ্ধের উপলব্ধিই মানবের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র পথ, একমাত্র সত্য। নিজের বুদ্ধত্বের স্বরূপ না জানাই একমাত্র পাপ; ইহা ব্যতীত আর পাপ বলিয়া কিছু নাই। কিন্তু আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞতা-জনিত যে পাপ তাহা যথার্থই গুরুতর, কারণ এই অজ্ঞতাই মানবের নশ্বরত্বের মূল। দেহ ক্ষণভঙ্গুর, জীবন স্রোতের ন্যায় বহিয়া চলিয়া যায়। সুতরাং এই ক্ষণস্থায়ী জীবনেই আপনার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মৃত্যুর কবল হইতে আত্মাকে মুক্ত করা প্রয়োজন।"

বোধিধর্ম্মের সকল বাক্য সম্রাট্ 'বু' সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। বোধিধর্ম্ম ইহা বুঝিতে পারিয়া নানকিং ছাড়িয়া উত্তরাভিমুখে চলিলেন। লোয়াংএ যাইয়া শাওলিন্ বিহারে তিনি নয় বৎসর কাটান। এই দীর্ঘ নয় বৎসর তিনি নীরবে প্রাচীরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। এই কারণেই তাঁহাকে "প্রাচীরাবলম্বী ঋষি" বলিয়া উল্লেখ করা হয়। বোধিধর্ম্মের জীবন সম্বন্ধে বহু কাহিনী শুনা যায়। বহু শিল্পী তাঁহার পুণ্যজীবন হইতে অনুপ্রাণনা লাভ করিয়া চিত্রে তাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

বোধিধর্ম্ম চীনে আসাতে চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের একটী নূতন ধারা দেখা দিল। তিনি ধ্যান-শাখার প্রবর্ত্তক তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বৌদ্ধধর্ম্ম পরিচালনার জন্য গুরু হওয়ার প্রথাও তিনি চীনে প্রবর্ত্তন করেন, কিছুকাল এই প্রথা চীনে চলিয়াছিল। নিজে কোনও গ্রন্থ না লিখিলেও তাঁহার জীবনের প্রভাবে ক্রমশঃ তাঁহার চিন্তাধারা লোকপরম্পরায় বিস্তৃত হইতে থাকে। **Ta-mo-hsue-mai-lun** নামক চীনা গ্রন্থে তাঁহার ও তাঁহার বাণীর একটী সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে সম্রাট্ 'বু'র সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে।

বোধিধর্ম্মের মূল মতটী নাগার্জ্জুনের শূন্যতা-বাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। নাগার্জ্জুন দার্শনিক তত্ত্বদ্বারা যাহা প্রমাণ করিয়াছেন এই ঋষি ধর্ম্মভাবের প্রেরণার ভিতর দিয়া তাহাই বলিয়াছেন। বোধিধর্ম্মের মতকে চীনবাসীগণ বলেন Tsungmen বা Chan-tsing। Chan কথাটী আসিয়াছে সংস্কৃত 'ধ্যান' শব্দ হইতে। জাপানীগণ বলেন Zen। বোধিধর্ম্ম কোনও গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু এই নীরব ঋষির শিষ্যগণ সেদিকের অভাবটী পূরণ করিয়া দিয়াছেন। পরবর্ত্তী যুগে চীন ও জাপানে এই ধ্যানশাখার একটী বৃহৎ সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে। *

* বোধিধর্ম্ম নয় বৎসর বসিয়া ধ্যান করেন, তাহার ফলে জনশ্রুতি তাঁহার পা পড়িয়া যায়। জাপানী একপ্রকার পুতুল বাজারে বিক্রয় হয়—শোয়াইয়া দিলে বসিয়া পড়ে, পা নাই। সেই পুতুল নাকি বোধিধর্ম্মের মূর্ত্তির অনুকরণে নির্ম্মিত।]

শেষ সাধ

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

জীবনের দিনে অবহেলে যারা হোলেনা আমার সাথী
আমার সমাধি মন্দিরে তারা জেলো জেলো ভাই বাতি।
ধূপ্ ধুনা কিছু না ই দিলে ভাই
গীত-সঙ্গীত কিছু নাহি চাই ;
মোর মঙ্গল-মৃত্যু-তিথিতে না করিলে মাতামাতি,
কেবল আমার মন্দিরে জেলো একটি মাটির বাতি।

তোমরা আবার নব-উৎসাহে নব-উৎসবে মেতো
অতীতে যাহারে পতিত করেছ অতিথ্ হবেনা সেতো !
যে বলে গিয়েছে ফিরিবে না আর
হাসি ও কাঁদন মিলাবে তাহার—
দু'ইটি নয়ন বাহিয়া যখন ঘনায়ে আসিবে রাতি
তার মন্দিরে সন্ধ্যাবেলায় জেলে দিও ভাই বাতি।

এক জীবনের দুঃসহ জ্বালা নিভে যাবে নিঃশেষে
চিতা ধূমে ঘুম আনিবে আমার চির সুপ্তির দেশে।
শোধ দিতে এই বিশ্বের ধার
যেটুকু আমার ছিল দরকার
সেইটুকু কাজ শেষ করে গেনু অশ্রুর মালা গাঁথি।
আমার সমাধি মন্দিরে জেলো একটি মাটির বাতি।

দিনের আলোতে যে অভাগা হায় হোলোনা কারুর প্রিয়
রাতের আঁধারে তার মন্দিরে একটি প্রদীপ দিও।
আমার সমাধি-মন্দির পাশে
যদি কোনো দিন বনফুল হাসে
আমারই মুখের তৃপ্তির হাসি তাহাতে উঠিবে ভাতি।
মোর অনুরোধ বেশী কিছু নয়—একটি মাটির বাতি।

সাবধানী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

চ'লেছে রূপের প্রবাহ বহিয়া,
আছি মোরা সাবধানে ;
সুখ-মরীচিকা টানিছে দুখের
মহাপারাবার পানে।
কেতকী কুসুম গাছে
কাঁটা বিছাইয়া আছে,
পরশ তাহারে করিনাক ক্ষত-
বিক্ষত হই পাছে।
সহজ সুখেরে ফেলিয়া ফিরিনা
অতি-সুখ সন্ধানে।

হৃদয়পুরের বন্দরে মোরা
বাঁধিনা মোদের তরী ;
করে টলমল্ সুগভীর জল
মনে মনে বড় ডরি।
বাহুলতিকার ফাঁসে,
কণ্ঠ জড়ায়ে আসে,
মুখ-চন্দ্রের চন্দ্রিকা হেরি,
কাঁপি মোরা সন্ত্রাসে,
অসহ ব্যথায় চাহিনা মরিতে
নীল নয়নের বাণে।
চলেছে রূপের প্রবাহ বহিয়া
আছি মোরা সাবধানে।
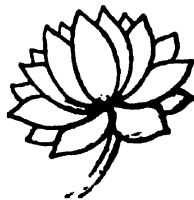
বাঙলার লোক সঙ্গীত

জরীনকলম

আমাদের দেশে লোকসঙ্গীত সংগ্রহের জন্য বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান বা সোসাইটী নাই। ইয়োরোপে লোক সঙ্গীত সংগ্রহ করবার জন্যে সমিতি আছে। এই সমিতিগুলি সুধু লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত হয় নাই। প্রত্যুত সে গুলি সুসংবদ্ধভাবে টীকাটীপ্পনী ও ভূমিকা সমেত লোকের চিত্তাকর্ষক করে বের করেছে।

অনুকরণের বশবর্ত্তী হ'য়ে যাত্রা থিয়েটারের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। একদল একে অগ্রাহ্য করছে, অন্যদল ছেড়ে দিচ্ছে, এবং তৃতীয় দল ধর্ম্মের অঙ্গহানি হয় ব'লে তাকে গলাটিপে মারছে। এবংবিধ ত্রিধারায় পড়ে লোকসঙ্গীত ত্রিশঙ্কু দশা প্রাপ্ত হয়েছে!

লোকসঙ্গীতের যে কোন রকম মূল্য আছে তা আমাদের
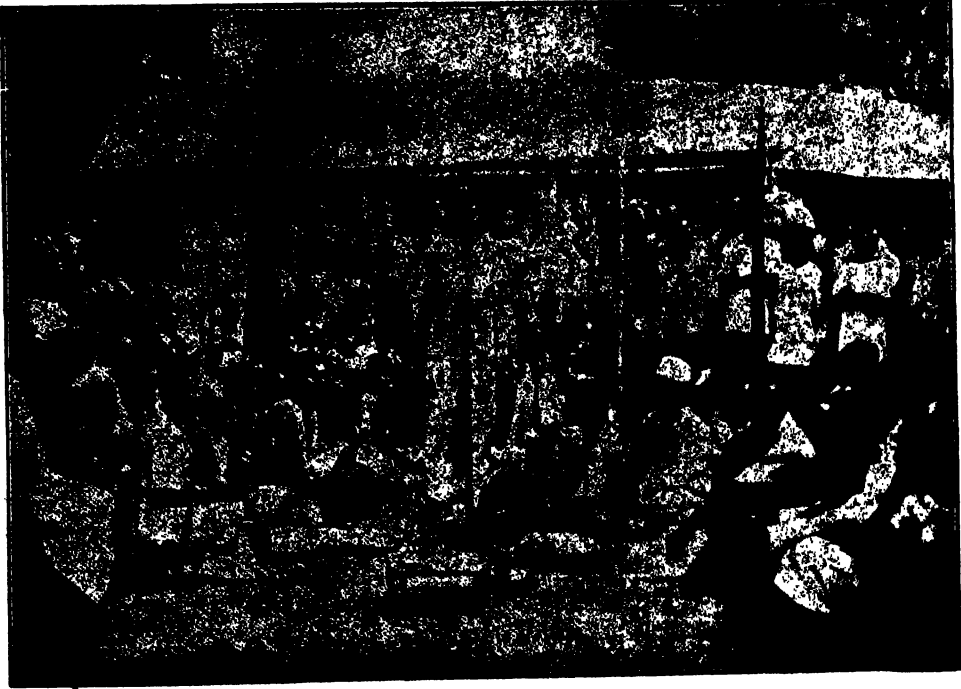
মৈমনসিংহের পালাগান

লোকসঙ্গীত সাধারণত অশিক্ষিত চাষা ভূষার দলই সব দেশে রক্ষা করে এসেছে। অনেক অনুষ্ঠানের মত আমাদের দেশের এই প্রাচীন মূল্যবান অনুষ্ঠানটীও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তথাকথিত ইংরাজীশিক্ষিতের কাছে এর বিশেষ আদর ও কদর নেই এবং অশিক্ষিত দল

দেশের অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির খেয়াল নাই। যদি তাঁদের নজর এদিকে থাকত তা হ'লে এতদিন আমরা লোকসঙ্গীত সংগ্রহের চেষ্টা দেখতে পেতেম। লোক-সঙ্গীতের যে কি মূল্য তা Nelson's Encyclopædia (Vol III p 76) থেকে তুলে দিচ্ছি, "Yet this know-

ledge is as indispensable to the student of evolution of literature as the knowledge of savage and barbaric institutions is to the student of the growth of human society."

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে পূর্ব্ববঙ্গের "গীতিকা" (Ballads) সংগ্রহ বের হয়েছে। এর সরস মাধুর্য্য ও সরল ভাষায় সকলেই চমৎকৃত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এ গানগুলো সম্বন্ধে যা বলেছেন তা এর গুণাগুণ বিচার পক্ষে যথেষ্ঠ হবে বলে তুলে দিচ্ছি। তিনি বলেছেন, "ময়মনসিং থেকে যে সব গাথা সংগ্রহ করা হয়েচে তাতে সহজেই বেজে উঠেচে বিশ্ব সাহিত্যের সুর। কোনো সহুরে পাব্লিকের দ্রুত ফরমাসের ছাঁচে ঢালা সে সাহিত্য ত নয়। মানুষের চিরকালের সুখ দুঃখের প্রেরণায় লেখা সেই গাথা। যদি বা ভিড়ের মধ্যে পাওয়া হ'য়ে থাকে তবু এ ভিড় বিশেষ কালের বিশেষ ভিড় নয়। তাই এ সাহিত্য সেই ফসলের মতো যা গ্রামের লোক আপন মাটির বাসনে ভোগ করে থাকে তবু তা বিশ্বেরই ফসল,— তা ধানের মঞ্জরী।" [বিচিত্রা, কার্ত্তিক, ১৩৩৪, পৃ ৬৫৫] এ বৎসর বাজেটে তিন হাজার টাকা ডাক্তার রায়বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি,এ, মহাশয়ের সংগৃহীত পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা প্রকাশের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। এ সংবাদ শুনে আমরা খুসী হয়েছি। ঢাকা ইউনিভার্সিটী কলিকাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করলে মঙ্গলের কাজ হ'ত। যা হোক এবার আমরা মৈমনসিংহে কেমন করে পালাগান গাওয়া হয় তার ছবি তুলে দিচ্ছি। অন্যান্য দেশের লোকসঙ্গীত কিভাবে গাওয়া হয় আমরা জানিনা, তবে এ থেকে নৃতত্ত্ববিদেরা সমাজতত্ত্বের মাল মসলা পাবেন আশা করা যায়।

আমাদের দেশে যে লোকসঙ্গীত সুধু পালাগান নয় তা ইউনিভার্সিটী না ভুললেই আনন্দের কথা। পালাগানের চেয়ে যে বাউলগানগুলো কম দামী নয় তা রবীন্দ্রনাথের কথায়ই বলছি,"...ক্ষিতিমোহন সেন মশায়ের অমূল্য সঞ্চয়ের থেকে এমন বাউলের গান শুনেচি ভাষার সরলতায় ভাবের গভীরতায় সুরের দরদে যার তুলনা মেলেনা,—তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্য রচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেচে। লোক সাহিত্যে এমন অপূর্ব্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করিনে।" [প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩৪ পৃঃ ৭৪৪] কাজেই এই বাউলগানগুলো পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার মত সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ও গভর্ণমেণ্ট যদি পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা না বলে বাঙলার লোকসঙ্গীত প্রকাশের জন্য তিন হাজার টাকা ব্যবস্থা করতেন তাহলে আমরা অধিকতর খুসী হতেম।

মৈমনসিংহের পালাগান প্রণালীর ছবি মৌলবী জসীম উদ্দীন সাহেবের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অশোক স্তম্ভ

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারত শিল্প সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে প্রস্তর বা ধাতুনির্ম্মিত বিশাল স্তম্ভগুলি উহার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। স্তম্ভগুলি প্রায়ই স্তূপ বা চৈত্যমন্দিরাদির সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত এবং উহাদের চূড়াদেশে দেবদেবী, মনুষ্য বা পশুমূর্ত্তি অথবা অপর কোন পবিত্র চিহ্নাদি স্থাপিত হইত। এই লাট বা স্তম্ভগুলি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিত। জৈনদিগের নিকট স্তম্ভগুলি দীপদানরূপে ব্যবহৃত হইত, কখনও কখনও বা উহাদের উপরে জিনমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ শৈব ও বৈষ্ণব ভেদে স্তম্ভগাত্রে ত্রিশূল বা পতাকাচিহ্ন অঙ্কিত ও চূড়াদেশে গরুড় বা হনুমান মূর্ত্তি স্থাপিত করিত। বৌদ্ধগণ ভগবান বুদ্ধদেবের স্মারকচিহ্নরূপে পূতস্থানসমূহে প্রতিষ্ঠা এবং কারুণ্য ও মৈত্রীধর্ম্মের উপদেশবাণী সর্ব্বসাধারণে প্রচারোদ্দেশ্যে ইহার ব্যবহার করিত। স্তম্ভশীর্ষে সিংহ, বৃষ, গজ, অশ্ব, চক্র প্রভৃতি পবিত্র চিহ্নাদি স্থাপিত হইত। এই প্রসঙ্গে শিল্পাচার্য্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কয়টী কথা অনুধাবনযোগ্য,—"বৌদ্ধপ্রভাবের সময় এগুলির উপরে অনুশাসনলিপি—শিখরদেশে চারি সিংহমূর্ত্তি—যেন পশু স্বভাব ছাড়িয়া তাহারাও করুণার মহিমা কীর্ত্তন করিতে শিখিয়াছে। জৈনধর্ম্মে এইগুলি দীপদানস্বরূপে কল্পিত, ভাবটা ধর্ম্মের জ্যোতি মর্ত্তলোক আলোকিত করিয়া যেন দেবতাগণকেও আলোক প্রদান করিতেছে। বৈষ্ণবেরাও এই লাট স্তম্ভের শিখরে গরুড়মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া এটাকে গরুড়স্তম্ভ বা ভগবৎপ্রেমে দাস্যভাবের আদর্শ মূর্ত্তিরূপে কল্পিত করিয়া মন্দির সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। অতএব দেখিতেছি তিনকালে উক্ত তিন ধর্ম্মই লাটস্তম্ভের লক্ষ্য বজায় রাখিয়াছে।"

বর্ত্তমানে যত স্তম্ভ দেখা যায় তন্মধ্যে অশোক প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভগুলিই সর্ব্বপ্রাচীন। মৌর্য্য সম্রাট অশোক তাঁহার অমরবাণী সম্বলিত যেসকল সুবৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভ আজ দ্বিসহস্রাব্দি কেরও অধিককাল পূর্ব্বে স্বীয় বিশাল সাম্রাজ্যের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অল্পবিস্তর ভগ্নদশায় কয়েকটি আজও দেখা যায়। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান ও হিউয়েনসঙ্গের ভ্রমণ বিবরণ হইতে আরও কয়েকটা অশোক স্তম্ভের পরিচয় পাওয়া যায়, বর্ত্তমানে যাহাদের কোনই নিদর্শন এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন আরও কত স্তম্ভ যে উঁহাদের আগমনের পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল, কত স্তম্ভ যে উঁহাদের অজানা বা অদেখা স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল; কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? অশোক সর্ব্বসমেত কয়টী স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার আজ কোনই উপায় নাই।

সাধারণতঃ অশোকসম্বন্ধীয় পুস্তকাদিতে এই তেরটী স্তম্ভের উল্লেখ দেখা যায়,—দিল্লীর তোপরা ও মিরাট স্তম্ভ, এলাহাবাদ, লৌড়িয়া-নন্দনগড়, লৌড়িয়া অররাজ, রামপুরোয়া (২টী) সাঁচি, সারনাথ, নিগ্লীভা, রুম্মিনী, বসাঢ় ও সঙ্কিশ। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পর্য্যটক হিউয়েনসঙ্গ যোলটী স্তম্ভ দেখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে পাঁচটী স্তম্ভ (পূর্ব্বোক্ত তালিকার শেষ কয়টি) বর্ত্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে একথাও কোন কোন পুস্তকে লিখিত দেখিয়াছি। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখান যাইবে যে অল্পবিস্তর ভগ্নদশায় তেইশটী অশোকস্তম্ভের নিদর্শন ভারতের নানাপ্রান্ত হইতে বাহির হইয়াছে। তদ্ভিন্ন হিউয়েনসঙ্গের গ্রন্থমধ্য হইতে আমি ১৭টী স্তম্ভের পরিচয় পাইয়াছি।

কয়েকবৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত পণ্ডিত ভিনসেণ্টস্মিথ জর্ম্মনদেশীয় প্রাচ্য অনুসন্ধান সমিতির পত্রে (Zeitschrift der Deutschen Morgenlanden Gesselschaft বা সংক্ষেপে Z. D. M. G.) একটি প্রবন্ধে বিভিন্ন সূত্র হইতে পরিজ্ঞাত অশোকের প্রস্তর স্তম্ভগুলির একটা তালিকা

প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বর্ত্তমানে প্রাপ্ত ২২টী, চীনপরিব্রাজকদৃষ্ট অথচ বর্ত্তমানে অনাবিষ্কৃত ৯টি, নানাসূত্র হইতে শ্রুত অথচ উপযুক্ত অনুসন্ধানকার্য্য দ্বারা অসমর্থিত ৫টী, সর্ব্বসমেত ৩৬টী অশোকস্তম্ভের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি পড়িয়া কয়েকটী ভ্রমপ্রমাদ আমার সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়ে; তাঁহার তালিকাধৃত কয়েকটী স্তম্ভ যে কোন মতেই অশোকের হইতে পারে না তাহা আমার তখনই মনে হইল। পক্ষান্তরে যথার্থই অশোক প্রতিষ্ঠিত কয়েকটী স্তম্ভ দেখিলাম স্মিথ তালিকাভুক্ত করেন নাই। অতঃপর আমি এবিষয়ে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হই এবং তাহার ফলে আরও কয়টী নূতন স্তম্ভের সন্ধান পাইয়াছি। আমার তালিকায় অশোকস্তম্ভের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ৪৪টীতে দাঁড়াইয়াছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে অধ্যাপক ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন তাঁহার অশোক সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন, তখন বক্ষ্যমান প্রবন্ধের অন্তর্গত অনেক তথ্যের সন্ধান তাঁহাকে দিয়াছিলাম এবং কয়েকটী অশোক স্তম্ভের চিত্রও তাঁহাকে সংগ্রহ করিয়া দিই। সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধধৃত কোন কোন তথ্য তাঁহার গ্রন্থমধ্যেও দেখা যাইতে পারে।

এবারে স্তম্ভগুলির পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে দৃষ্ট অশোক স্তম্ভগুলি নিম্নলিখিত স্থান সমূহে অবস্থিত,—দিল্লীতে দুইটী তোপরা এবং মিরাট স্তম্ভ, এলাহাবাদ, চম্পারণ জেলায় লৌড়িয়া নন্দনগড়, লৌড়িয়া অররাজ, রামপুরোয়া (দুইটি), মজঃফরপুর জেলায় বসাঢ়, সাঁচি, সারনাথ, নেপালি তরাই প্রদেশে রুম্মিনীদেই, নিগ্লীভা বা নিগাইল সাগর, গুত্তিভা, পলতাদেবী ও পরাণী বাজার, সঙ্কিশ, কোসম, গয়া-বকরোর, হিসার-ফতেহাবাদ, পাটনা সিটি, পাটনা-লোহাণীপুর, বারাণসীতে লাট ভইরো এবং কুইন্স কলেজের হাথার মধ্যে অবস্থিত ও গাজীপুর জেলার পহ্‌লাদ পুর নামক স্থান হইতে আনীত।

হিউয়েনসাঙ্গ দৃষ্ট উনিশটী স্তম্ভের অবস্থান নিম্নে প্রদত্ত হইল,—কিপিথা বা সাঙ্কাশ্য, শ্রাবস্তী (তিনটী), কপিলবস্তু জনপদে যথাক্রমে ক্রকুছন্দ, কনকমুনি ও গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান (তিনটী), রামগ্রাম, কুশিনগর (দুইটি), বারাণসী, মৃগদাব বা সারনাথ, বর্ত্তমান সারণ জেলায় কোন স্থানে অবস্থিত শরণ স্তূপ সন্নিকটে, বৈশালী, পাটলিপুত্র (দুইটি), বুদ্ধ গয়ার অদূরে গন্ধহস্তী, মোহো নদীর অদূরে অরণ্য মধ্যে বুদ্ধগয়া হইতে রাজগৃহ যাইবার পথে এবং রাজগৃহ। রামগ্রামে হিউয়েনসঙ্গ অশোকের প্রতিষ্ঠিত একটি স্মারকলিপির উল্লেখ করিয়াছেন। উহা কিসে উৎকীর্ণ ছিল তাহা তাহা তিনি না বলিলেও, তাহা যে একটী প্রস্তরের স্তম্ভগাত্রে ক্ষোদিত ছিল তাহা নিঃসন্দেহ মনে হয়। কারণ বুদ্ধদেবের সম্পর্কে পূত স্থানে প্রতিষ্ঠিত উক্ত মৌর্য্য সম্রাটের সমস্ত স্মারকলিপিই ঐভাবে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় রামগ্রামের অবস্থান অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই, নচেৎ এই অনুশাসনযুক্ত অশোক স্তম্ভটী আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারিত। যাহা হউক হিউয়েনসঙ্গ-দৃষ্ট স্তম্ভনিচয়ের মধ্যে কপিলবস্তুর দ্বিতীয় ও তৃতীয়, বারাণসী, মৃগদাব, বৈশালী ও গন্ধহস্তীর স্তম্ভ নিঃসন্দেহে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলা চলে। যুক্তপ্রদেশের ফরুখাবাদ জেলায় অবস্থিত প্রাচীন সাঙ্কাশ্যপুরীর নিদর্শন বর্ত্তমান সঙ্কিশ গ্রামে একটি হস্তিমূর্ত্তিযুক্ত স্তম্ভচূড়া পাওয়া গিয়াছে; অথচ ফাহিয়ান এবং হিউয়েনসঙ্গ উভয়েই তথায় সিংহস্তম্ভের উল্লেখ করিয়াছেন। তাই উভয় স্তম্ভ এক বলিয়া মনে হয় না। পণ্ডিতগণের মধ্যে যদিও কেহ কেহ সেরূপ মনে করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধযুক্তি এত প্রবল যে উভয় স্তম্ভ কোন মতেই অভিন্ন হইতে পারে না। সুতরাং পরিব্রাজকদ্বয়বর্ণিত সাঙ্কাশ্যস্তম্ভ এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে বলিতে হইবে। যাহা হউক যথাস্থানে সে কথার উল্লেখ করা যাইবে। এতএব হিউয়েনসঙ্গ দৃষ্ট স্তম্ভসমূহের মধ্যে তেরটী এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

ফাহিয়ানের লিখিত বিবরণ মধ্যে ছয়টী স্তম্ভের উল্লেখ দেখা যায়, তন্মধ্যে পাঁচটীর উল্লেখ হিউয়েনসঙ্গও করিয়া গিয়াছেন। স্তম্ভগুলির অবস্থান এক্ষণে দেওয়া যাইতেছে,—সাঙ্কাশ্য, শ্রাবস্তী (২), পাটলিপুত্র (২) এবং কুশিনগর ও বৈশালীর মধ্যবর্ত্তী লিচ্ছবি বিদায়ের স্থান; উহা কুশিনগরের ১২শ যোজন দক্ষিণ-পূর্ব্বে এবং বৈশালীর ৫ যোজন পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এই শেষোক্ত স্তম্ভটী নূতন, অপর চীন পরিব্রাজকের লেখায় ইহার কোনই উল্লেখ নাই।

অশোক স্তম্ভ

শ্রীঅমুজনাথ বন্দোপাধ্যায়

ভারহুত স্তূপের বেষ্টনীগাত্রে ক্ষোদিত ভাস্কর্য্য মধ্যে বুদ্ধগয়ায় প্রতিষ্ঠিত একটি অশোকস্তম্ভের চিত্র দেখা যায়। উহা যে সুধুই কল্পনার আশ্রয় গড়িয়া উঠে নাই, সত্যই যে বুদ্ধগয়ার একটি স্তম্ভ অশোক স্থাপন করিয়াছিলেন সে কথা যথাস্থানে বলা যাইবে। অনুসন্ধান ব্যতিরেকে অসমর্থিত পাঁচটী স্তম্ভ স্থানে আমার তালিকায় ঐ শ্রেণীর আর একটা স্তম্ভ বাড়িয়া ছয়টীতে দাঁড়াইয়াছে। এইরূপে অধুনা আবিষ্কৃত ২৩টী, চীন পরিব্রাজকগণের লেখা হইতে পরিচিত বর্ত্তমানে অনাবিষ্কৃত ১৪টী, ভারহুত শিল্প হইতে পরিজ্ঞাত ১টী ও অসমর্থিত ৬টী, মোট ৪৪টী অশোক স্তম্ভের পরিচয় পাওয়া গেল।

যাহা হউক এবারে স্তম্ভগুলির সম্বন্ধে কিছু বলা যাইবে। পূর্ব্বে যে তেইশটী স্তম্ভের নাম প্রদত্ত হইয়াছে—তন্মধ্যে প্রথম ছয়টীর গাত্রেই অশোকের প্রধান স্তম্ভলিপিগুলি উৎকীর্ণ দেখা যায়। সপ্তম লিপি সুধু দিল্লীর তোপরা স্তম্ভেই আছে, বাকী গুলির গাত্রে সুধু প্রথম ছয়টী অনুশাসন ক্ষোদিত। দিল্লীর স্তম্ভ ছুইটী আসলে এখানে ছিল না। ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে পাঠান সম্রাট সুলতান ফেরোজ প্রথমটীকে সিবালিক পর্ব্বতের পাদমূলে তোপরা নামক স্থান হইতে এবং দ্বিতীয়টীকে মিরাট হইতে আনয়ন করিয়া নিজ রাজধানীতে প্রতিষ্ঠা করেন। এলাহাবাদের স্তম্ভটীও উক্ত সম্রাট কর্ত্তৃক কৌশাম্বী (বর্ত্তমানে কোশম, এলাহাবাদের ৩১ মাইল পশ্চিমে) হইতে ঐস্থানে নীত হইয়াছিল। ইহার গাত্রে গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত নিজ দিগ্বিজয় কাহিনী উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। কোশমে আরও একটী প্রস্তরস্তম্ভ বিদ্যমান। তাহা সর্ব্বাংশে অশোকের অন্যান্য স্তম্ভের অনুরূপ। সুদীর্ঘকাল হইতে ইহার অস্তিত্বের কথা জানা থাকিলেও এটীও যে অশোকস্তম্ভ হইতে পারে সে কথা কাহারও মনে হয় নাই। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে স্মিথই প্রথম ইহাকে অশোকস্তম্ভ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। তাহার পর ১৯২১-২৩ সালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পণ্ডিত দয়ারাম সাহনী এখানে অনুসন্ধান করিয়া এটীও যে অশোকের স্তম্ভ সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েন। সাহনী ভগ্নপ্রায় স্তম্ভটীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন।* কৌশাম্বীতে ছুইটি অশোক স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও আশ্চর্য্যের বিষয় হিউয়েনসঙ্গের ন্যায় সাবধানী লেখক তাহার কোনই উল্লেখ করেন নাই।

ফেরোজ তোগলক আরও একটী অশোক স্তম্ভ স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। পঞ্জাবের হিসার নগরে ফেরোজ নিজ নামে একটী মিনার প্রতিষ্ঠা করেন। উহার সর্ব্বনিম্ন অংশ একটী প্রাচীন প্রস্তর স্তম্ভের ভগ্ন খণ্ড এবং উপরের অংশ লাল পাথরের নির্ম্মিত। নিম্নের স্তম্ভখণ্ড যে একটী অশোক স্তম্ভের অংশ সে বিষয়ে পণ্ডিতগণ নিঃসন্দেহ। ঐ অংশের দৈর্ঘ্য ১০ ফুট ১০ ইঞ্চি এবং পরিধি ৮ ফুট ৩ ইঞ্চি। হিসার স্তম্ভ মূলতঃ হান্সি নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ব্রাউন সর্ব্বপ্রথম হিসার স্তম্ভখণ্ডের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেই অবধিই পণ্ডিতগণ ইহার স্বরূপ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। হিসার স্তম্ভের ১০ ফুট ১ ইঞ্চি পরিমাণ দীর্ঘ অপর একখণ্ড সন্নিকটবর্ত্তী ফতেহাবাদ নগরে দেখা যায়। এই ফতেহাবাদ ফেরোজের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফতেখাঁ নিজ নামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।†

নন্দনগড়, অররাজ, সাঁচি, সারনাথ, বসাঢ় প্রভৃতি লাটগুলির কথা বিশেষ ভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। কারণ ইহাদের কথা সকল পুস্তকেই দেখা যায়। সুধু যে অশোক স্তম্ভগুলি সাধারণে তাদৃশ পরিচিত নহে বা যে গুলিকে আমি অশোকের স্থাপিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহি সেইগুলির কথা বিশেষ ভাবে বলিব। হিউয়েনসঙ্গ কপিলবস্তু জনপদে তিনটী অশোকস্তম্ভের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটী কপিলবস্তুর প্রায় ৫০ লি দক্ষিণে ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধের জন্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার গাত্রে

* কোশম স্তম্ভ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ কানিংহামের Archaeological Survey of India Reorts vol I. pp 309-11 এবং Arch, Sur. of India, Annual Reports for 1921-22, pp, 9, 45; for 1922-23, p 13 দ্রষ্টব্য।

† হিসারস্তম্ভ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ J. A. S. B. VII. 429 ও কানিংহামের Arch. Sur. Rep. vol. V. pp. 140-42 গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

একটা লিপিতে তাঁহার নির্ব্বাণের বিবরণ উৎকীর্ণ ছিল। দ্বিতীয়টী ইহার ৩০ লি উত্তরপূর্ব্বে কনকমুনির জন্মস্থানে অবস্থিত ছিল। ইহার গাত্রেও উক্ত বুদ্ধের নির্ব্বাণ কাহিনী ক্ষোদিত ছিল। তৃতীয়টী কপিলবস্তুর ৫০ লি দক্ষিণ পূর্ব্ববর্ত্তী 'শরকূপ' নামক স্থানের ৮০-৯০ লি উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত গৌতমবুদ্ধের জন্মস্থানে লুম্বিনী উদ্যানে অবস্থিতি ছিল। *

নেপাল তরাই প্রদেশে বর্ত্তমানে পাঁচটী অশোক স্তম্ভের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে রুম্মিনীদেই স্তম্ভ যে লুম্বিনীর স্তম্ভ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। রুম্মিনীর ১৩ মাইল উত্তর পশ্চিমে নিগ্লীভা বা নিগাইলসাগর স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইটিকেই কনকমুনির স্তম্ভ বলিয়া সকলে মনে করেন। কিন্তু ইহার গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে প্রিয়দর্শী রাজত্বের চতুর্দ্দশ বর্ষে কনক মুনির স্তূপ দ্বিগুণ করিয়া বর্দ্ধিত ও বিংশ বর্ষে শিলাস্তম্ভ উত্থাপিত করান। কনকমুনির নির্ব্বাণের কোন কথা ইহাতে নাই। সেজন্য কেহ কেহ এইটিই হিউয়েনসঙ্গ দৃষ্ট স্তম্ভ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রাখেন। অশোকের প্রায় সহস্র বর্ষ পরে যখন এদেশে ব্রাহ্মীবর্ণমালার পাঠ লোকে বিস্মৃত হইয়াছিল তখন অশোক-লিপির প্রকৃত তাৎপর্য্য অবধারণ করা উক্ত পর্য্যটকের পক্ষে কতদূর সম্ভব তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। তাঁহাকে স্থানীয় লোকেরা যাহা বুঝাইয়াছে তিনি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কনক মুনি স্তম্ভ ও নিগাইলসাগরে প্রাপ্ত স্তম্ভ যে ভিন্ন এ সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। দুঃখের বিষয় এই স্তম্ভ তাহার আদি প্রতিষ্ঠা স্থানে অবস্থিত নহে, কোথা হইতে বর্ত্তমান স্থানে নীত হইয়াছে তাহাও জানিবার উপায় নাই। তাই কনকমুনির জন্মস্থান এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধের স্তম্ভের কোনই নিদর্শন এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই।

নেপালতরাই প্রদেশে আরও তিনটি প্রাচীন স্তম্ভের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটী যে মূলতঃ অশোকের স্থাপিত সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তিলৌরাকোটের (প্রাচীন কপিলবস্তু) ৪ মাইল দক্ষিণে গুতিভা নামক গ্রামে একটী ধ্বংসস্তূপ ও ভগ্নস্তম্ভ দেখা যায়। স্তূপটীর পরিধি এখনও ৬৮ ফুট ও উচ্চতা ৯ ফুট। উহার কিছু দক্ষিণ-পশ্চিমে ভগ্ন স্তম্ভটী অবস্থিত। উহার এক্ষণে নিতান্তই চরম দশা, তলদেশের মাত্র কয়েক ফুট পরিমাণ অংশ এখনও দণ্ডায়মান। এই অংশের দৈর্ঘ্য মাত্র ১০ ফুট ২ ইঞ্চি। তদ্ভিন্ন গ্রামমধ্যে আরও তিনটী ভগ্ন খণ্ড দেখা যায়। মৃত্তিকামধ্যে নিহিত ৭ ফুট দীর্ঘ, ৮½ ফুট বিস্তৃত ও ১০ ফুট স্থূল বিশাল এক গ্রাণাইট প্রস্তরের বেদীর উপরে স্তম্ভটী রক্ষিত। নন্দনগড়, বখাড়, দিল্লী, সারনাথ প্রভৃতি আরও অনেক অশোক স্তম্ভের নিম্নে এরূপ প্রস্তর বেদীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে স্তম্ভটী এখনও তাহার আদি প্রতিষ্ঠাস্থানে দণ্ডায়মান। রুম্মিনী, নিগাইলসাগর ও গুতিভার স্তম্ভ অবিকল একই প্রকারের হরিদ্রাভ কঠিন বালুপ্রস্তরের নির্ম্মিত—এ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। এমন কি দুই বিভিন্ন স্তম্ভের ভগ্নখণ্ড জোড়া দিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেও কোনই পার্থক্য চোখে পড়ে না। গুতিভার স্তম্ভও অশোক কর্ত্তৃক অন্য স্তম্ভ দুইটির সহিত একই সময়ে অভিষেকের বিংশবর্ষে স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পরিব্রাজক-বর্ণিত কোন স্তম্ভের সহিত ইহাকে অভিন্ন বলিয়া মনে হয় না।

তরাই প্রদেশে আরও দুইটি প্রাচীন স্তম্ভের নিদর্শন বাহির হইয়াছে। পিপরাবার * ৬ মাইল দক্ষিণে পলতা দেবী গ্রামে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসনিদর্শন দেখা যায়। একটী প্রস্তর স্তম্ভের ভগ্নখণ্ড গ্রামে শিবলিঙ্গ বলিয়া পূজিত হয়। উহা সর্ব্বাংশে অশোকস্তম্ভের ভগ্নখণ্ডের অনুরূপ, গাত্রে অন্যান্য স্তম্ভের ন্যায় সেই উজ্জ্বল পালিস এখনও দেখা যায়। তবে গ্রামবাসিদের পূজার ফলে তাহা এখন অনেকাংশে ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। পলতাদেবী অতি পুরাতন নগর। ভিন-

* 'লি'র দূরত্ব লইয়া মতভেদ দেখা যায়। কানিংহাম প্রভৃতি অনেকে ৭ 'লি'য়ে মাইল ধরেন। ডা: ফ্লিটের মতে ৮-১/৪ 'লি'য়ে এক মাইল।

* এইস্থানে একটী ভগ্নস্তূপ হইতে ১৮৯৭ সালে শাক্যগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত বুদ্ধদেবের চিতাভস্ম বাহির হইয়াছে। অনেকে ইহাকে নূতন কপিলবস্তু বলিয়া মনে করেন।

অশোক স্তম্ভ

শ্রীঅমূল্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেণ্ট স্মিথের মতে ইহা ক্রকুচ্ছন্দ বা কনকমুনির নগরের নিদর্শন হইলেও হইতে পারে।

বিগত শতাব্দীর শেষভাগে Dr. Hoey I. C. S. নেপাল তরাই অঞ্চলে কিছু অনুসন্ধান কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি বৃটিশ ভারতের সীমানা হইতে ৫।৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত পরাসীবাজার নামক স্থানের প্রায় ৪ মাইল উত্তরে জাড়াহী নদীর তটে একটী স্তম্ভেরচূড়া (capital) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহার পরিধি প্রায় ৪ ফুট এবং অন্যান্য অশোকস্তম্ভের ঐ অংশের ন্যায়ই উহা সুডৌল এবং সুগঠিত। পরাসীবাজারের প্রায় ২।৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে উক্ত নদীর তীরে তিনি একটি ইষ্টকস্তূপও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। স্তূপটী বেশ ভাল অবস্থাতেই ছিল। *

এই দুইটি স্তম্ভও যে অশোক প্রতিষ্ঠিত তাহা নিঃসন্দেহে বলিবার উপায় নাই। তবে তরাই প্রদেশ অতি প্রাচীনকালেই অরণ্য সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ফাহিয়ান যখন এ প্রদেশে পদার্পণ করেন তখনই এতদঞ্চল বিরলবসতি, জঙ্গলাকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া উক্ত পরিব্রাজক লিখিয়া গিয়াছেন। রীজ ডেভিডস সত্যই বলিয়াছেন "After the destruction of the clans by the neighbouring monarchies jungle again spread over the country. From the fourth century onwards down to our own days, the forest covered over the remains of the ancient civilization."† তাই তরাই প্রদেশে প্রাপ্ত বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পর্কে পূতস্থানসমূহে প্রতিষ্ঠিত 'চুণারের বালুপ্রস্তরে' নির্ম্মিত স্তম্ভগুলি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে অপর কোন নৃপতি কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল মনে করা অপেক্ষা সম্রাট অশোক, যাঁহার স্থাপিত ঠিক ঐ প্রকার স্তম্ভ ঐ অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তিনিই বাকিগুলিও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মনে করাই সঙ্গত।

নেপাল তরাইয়ের দুর্গম অভ্যন্তরদেশে নানাস্থানে প্রস্তরস্তম্ভের অবস্থানের কথা জনপ্রবাদ হইতে জানা যায়। কিন্তু উপযুক্ত অনুসন্ধানকার্য্য ব্যতিরেকে এ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হওয়া সম্ভব নহে। তরাইয়ের এইরূপ পাঁচটী বিভিন্নস্থানে প্রস্তরস্তম্ভ আছে বলিয়া লোকমুখে শুনা গিয়াছে।

(১) নেপালতরাই প্রদেশে মৌরাঙ্গগড় নামক স্থানের নিকটে।

(২) চম্পারণ জেলার অন্তর্গত নেপাল সীমানার অদূরে অবস্থিত বৈরাগনিয়া নামক স্থানের উত্তরে দূর জঙ্গল মধ্যে একটী প্রস্তরের লাট আছে বলিয়া গ্রামবাসিদের মধ্যে বিশ্বাস দেখা যায়।

(৩) গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত নেপালসীমানার সন্নিকটে অবস্থিত নিচলাউল নামক স্থানের উত্তরে নেপালরাজ্যের মধ্যে ত্রিবেণী ঘাটের পশ্চিমে পালি নামক গ্রামের সন্নিকটে।

(৪) চম্পারণ জেলার উত্তরে বারেওয়া নামক স্থান সমীপে।

(৫) গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত নেপালগঞ্জের ২১ মাইল উত্তরে নেপাল রাজ্যের কোলিবা পরগণার অন্তর্বর্ত্তী বৈরাট নামক একটী ধ্বস্তগ্রাম সন্নিকটে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বলরামপুরের রাজপরিবারের মেজর যশকরণ সিংহ শিকারে গিয়া একটী অশোকস্তম্ভ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ আসে। তাৎকালীন অনেক সংবাদপত্রে ঐ সংবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে Dr. Fuhrer ইহার সন্ধান করিতে গমন করেন। তিনি এই লাট দেখিতে পান নাই, কিন্তু নিগ্লীভা স্তম্ভ এই যাত্রার ফলে বাহির হইল। বৈরাটে সত্যই কোন লাট ছিল কি না, বা তাহা Dr. Fuhrerএর আগমনের পূর্ব্বে গ্রামবাসিগণ নষ্ট করিয়াছিল, অথবা তিনি তাহা খুঁজিয়া পান নাই এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা চলে না। বড়ই দুঃখের বিষয় নেপাল তরাই প্রদেশে এ পর্য্যন্ত উপযুক্ত অনুসন্ধানকার্য্য হয় নাই, বা হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। আফগানিস্থান গভর্ণমেণ্ট ফরাসী সমিতিকে পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান ও খনন করিতে দিয়াছেন এবং তাহার ফলে বৌদ্ধযুগের 'নগরহার' নগরের ধ্বংশরাজি উন্মোচিত হইয়া লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইতেছে। আর এদেশে নেপাল

* Pioneer, 25th March 1898

† Buddhist India, p. 21.

গভর্ণমেণ্ট ভারতসরকারকে নেপাল রাজ্যে অনুসন্ধান করিতে দিতে সম্মত নহেন, এবং নিজেরাও এবিষয়ে কিছুই করিতে অনিচ্ছুক !

পাটলিপুত্র নগরে ফাহিয়ান ও হিউয়েনসঙ্গ উভয়েই দুইটি অশোকের প্রস্তর স্তম্ভের উল্লেখ করিয়াছেন। দক্ষিণের স্তম্ভটী জম্বুদ্বীপস্তম্ভ এবং অপরটী উহার কিছু উত্তরে অবস্থিত ও নীলি বা নরকস্তম্ভ নামে পরিচিত ছিল। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে ডাঃ ওয়াডেল ও শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাটনায় স্থানে স্থানে খনন করিয়াছিলেন। তাহার ফলে কুমরাহার, যমুনাদীঘি, বুলন্দিবাগ, সন্দলপুর প্রভৃতি গ্রামে বহু স্তম্ভখণ্ড ভূগর্ভ হইতে বাহির হয়। অন্যান্য অশোক স্তম্ভের ন্যায় ঐগুলিও বালুপাথরে নির্ম্মিত ও উজ্জ্বল পালিসযুক্ত। পূর্ব্বে এইগুলি নীলি ও জম্বুদ্বীপ স্তম্ভের ভগ্নখণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সকল স্থানে এত স্তম্ভচূর্ণ বাহির হওয়ায় সকলেই মনে করিতেন যে ঐ দুই স্তম্ভ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অনুশাসনযুক্ত কোন খণ্ড বাহির হয় কিনা তাহা দেখিবার জন্য সকলেই সচেষ্ট ছিলেন। কুমরাহার গ্রামের উত্তরে কল্লু ও চমনতালাও নামক পুষ্করিণিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে খননের ফলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনেকগুলি ভগ্নস্তম্ভখণ্ড পাইয়াছিলেন। ঐগুলি হইতে তিনি নির্ণয় করেন যে স্তম্ভটীর ব্যাস প্রায় ৩ ফুট ছিল। যেভাবে ভস্মরাশি, অঙ্গার প্রভৃতি মধ্য হইতে খণ্ডগুলি বাহির হয় তাহাতে মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্থির করেন যে স্তম্ভটীর চারিপার্শ্বে দাহ্য পদার্থ রাখিয়া অগ্নিযোগে তাহার উত্তাপে স্তম্ভটীকে চূর্ণবিচূর্ণ করা হইয়াছিল। * তিনি এইটীকে নীলিস্তম্ভ বলিয়া স্থির করেন। ভিনসেণ্টস্মিথ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং নীলিস্তম্ভের অগ্নিযোগে ভগ্ন হওয়ার উল্লেখ স্বীয় লেখার মধ্যে অনেক স্থলেই করিয়াছেন। † শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাটনাতে আরও দুইটি অশোকস্তম্ভ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার অপ্রকাশিত রিপোর্ট হইতে জানা যায়। পাটনা সহরে সদরগলি মহল্লায় 'কালুখাঁকেবাগ' নামক একটী অট্টালিকায় মহম্মদ কবীর ও মহম্মদ আমীর নামক এক মুসলমান পরিবারের জেনানার মধ্যে প্রাঙ্গনের কয়েক ফুট নিম্নে একটী বিশাল প্রস্তরস্তম্ভ প্রোথিত আছে বলিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় শুনিয়াছিলেন। ১৮৯৪-৯৫ সালে কূপ খননকালে উহা বাহির হইয়াছিল, এবং কিছুকাল খোলা থাকিবার পর আবার মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হয়। উহা এত স্থূল যে দুইজন লোক হাত ধরাধরি করিয়াও উহা ঘেরিতে পারে নাই।

বাঁকিপুর রেলষ্টেসনের (অধুনা পাটনা জংসন) সন্নিকটে লোহানীপুর গ্রামেও এক আলুক্ষেতের মধ্যে ভূগর্ভের ১২ ফুট নিম্নে মুখোপাধ্যায় মহাশয় আর একটী স্তম্ভ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভগ্নচূড়াদেশ ও স্তম্ভের অনেকগুলি টুকরা তিনি পাইয়াছিলেন। পাটনার সন্নিকটে তিনি সর্ব্বসমেত ৫।৬টী অশোকস্তম্ভ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে কুমরাহারে ডাঃ স্পুণারের খননের ফলে পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপেই ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। নীলিস্তম্ভের নিদর্শন বাহির করার উদ্দেশ্যে প্রথমে এখানে খনন কার্য্য আরম্ভ করা হয়। কিছুদূর খননের পর বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরের বহু স্তম্ভখণ্ড বাহির হইতে লাগিল। এগুলি যে একটী স্তম্ভের নিদর্শন হইতে পারে তাহা আর তখন মনে করা সম্ভব হইল না। এইরূপে স্পুণার ওয়াডেলের সিদ্ধান্তে সন্দিহান হইয়া ক্রমে তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কুমরাহারে খননের ফলে স্পুণার মৌর্য্যযুগের বহু সংখ্যক স্তম্ভযুক্ত একটী প্রাসাদের ধ্বস্ত নিদর্শন বাহির করিতে সমর্থ হয়েন এবং উহার অবস্থাদৃষ্টে জলপ্লাবনে ও অগ্নিদাহে উহা বিনষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তিনি স্থির করেন। যে স্তম্ভখণ্ডগুলিকে মুখোপাধ্যায় ও স্মিথ অগ্নিদাহে চূর্ণীকৃত নীলিস্তম্ভের নিদর্শন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, স্পুণারের আবিষ্কারের পর আর তাহাদিগকে উক্ত স্তম্ভের অংশ বলা চলে না। সুতরাং পাটলিপুত্রের নীলি ও জম্বুদ্বীপস্তম্ভ এখনও অনাবিষ্কৃতই রহিয়াছে বলিতে হইবে।

স্পুণার 'কালুখাঁবাগে'র তদানীন্তন অধিকারিদের অনুমতি লইয়া তথায় অনুসন্ধান কার্য্য করিয়াছিলেন।

* শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত রিপোর্ট।

† Z. D. M. G., 1909., p. 339 ; Asoka, pp. 29, 62.

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উপরের বাড়ী পড়িয়া যাইবার ভয়ে তিনি এইস্থানে ইচ্ছানুরূপ খনন করিতে পারেন নাই। সুধু প্রাঙ্গণের নানাস্থানে কয়েকটী গর্ত্ত খুঁড়িয়াছিলেন। স্তম্ভটী দেখা যায় নাই বটে, কিন্তু বহু সংখ্যক প্রস্তর স্তম্ভের ভগ্ন খণ্ড বাহির হইয়াছিল। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, যথার্থই এইস্থানে কোন প্রাসাদ স্তম্ভাদি ভূগর্ভে লুক্কায়িত আছে। বড়ই দুঃখের বিষয় এইস্থানে কোন উপযুক্তরূপ অনুসন্ধান কার্য্য সম্ভব নহে।

সুতরাং জম্বুদ্বীপ এবং নীলিস্তম্ভ এখনও অনাবিষ্কৃতই রহিয়াছে বলিতে হইবে। পাটনা সিটি ও লোহানিপুরের স্তম্ভদ্বয় বর্ত্তমানে প্রাপ্ত অশোক স্তম্ভের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। *

সঙ্কিশে প্রাপ্ত দণ্ডায়মান হস্তিমূর্ত্তিযুক্ত স্তম্ভশীর্ষের কথা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি। ফাহিয়ান ও হিউয়েনসঙ্গ উভয়েই সাঙ্কাশ্যে সিংহস্তম্ভের কথা বলিয়াছেন। হিউয়েন সঙ্গ বলেন সিংহটী পশ্চাতের পদদ্বয়ে ভর দিয়া উপবিষ্ট ছিল। প্রথমোক্ত পরিব্রাজকের বিবরণ মধ্যে আবার উক্ত সিংহমূর্ত্তি সম্বন্ধে এক অলৌকিক কাহিনীর উল্লেখ দেখা যায়। সঙ্কিশ গ্রামই যে প্রাচীন সাঙ্কাশ্যপুরীর নিদর্শন তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হইয়াছে। মথুরা, কনৌজ হইতে সাঙ্কাশ্যের প্রদত্ত দূরত্বের সহিত বর্ত্তমান গ্রামের ঐ দুই স্থান হইতে দূরত্বের কোনই পার্থক্য নাই। কিন্তু পরিব্রাজক বর্ণিত সিংহমূর্ত্তির স্থলে বর্ত্তমানে আবিষ্কৃত হস্তিমূর্ত্তি লইয়াই যত মতভেদ। কানিংহাম উভয়ের সমতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া বলেন যে সেই প্রাচীন যুগেই হস্তিমূর্ত্তির এরূপ ভগ্নদশা হইয়াছিল যে পঞ্চাশ ফুট উর্দ্ধে স্তম্ভচূড়ায় অবস্থিত হস্তিমূর্ত্তিকে পরিব্রাজকগণ সিংহমূর্ত্তি বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য এ সিদ্ধান্ত নিতান্তই হাস্যজনক। হিউয়েনসঙ্গ অনেকস্থলেই সিংহমূর্ত্তিশীর্ষ অশোকস্তম্ভ দেখিয়াছিলেন—হস্তীমূর্ত্তিশীর্ষ স্তম্ভও তিনি এদেশে দেখিয়াছেন। তদ্ভিন্ন দণ্ডায়মান হস্তিকে উপবিষ্ট সিংহ বলিয়া ভ্রম কিরূপেই বা হইতে পারে? এবং উভয় পরিব্রাজকের ঐ একরূপ ভ্রম করা একটু আশ্চর্য্যের ব্যাপার নহে কি? সাঙ্কাশে বর্ত্তমান স্তম্ভটী ব্যতীত আর একটী স্তম্ভ ছিল মনে করায় কোনই বাধা নাই। হিউয়েনসঙ্গের হস্তিমূর্ত্তিযুক্ত স্তম্ভটী অনুল্লেখে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কারণ পূর্ব্বেই একবার দেখা গিয়াছে যে তাঁহার আগমনকালে কৌশাম্বীতে দুইটি অশোকস্তম্ভ থাকিলেও তিনি সে বিষয়ে নিজ গ্রন্থে কোন কথাই বলেন নাই।

বারাণসীর উত্তরপূর্ব্বে সারনাথ যাইবার পথে বরণা নদীর পশ্চিমতটে অশোক রাজার নির্ম্মিত একটী স্তূপের সম্মুখে হিউয়েনসঙ্গ একটী প্রস্তরের স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন (Beal's Records, vol. II. p 45)। ঠিক ঐ স্থানটীতে লাটভৈঁরো নামে পরিচিত বিশাল শিবলিঙ্গ অবস্থিত। দেখিলেই নিঃসন্দেহে মনে হয় ইহা কোন সুদীর্ঘ প্রস্তরস্তম্ভের অংশমাত্র। লাটভৈঁরো এককালে আরও দীর্ঘ ছিল। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের হিন্দুমুসলমানের এক দাঙ্গায় মুসলমানেরা ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলে। তাহার পূর্ব্বে লাট ২৫ হাত উচ্চ ছিল এবং ইহার গাত্রে নানারূপ লেখা ছিল একথা কাশীর সকলেই বলিয়া থাকে। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী পর্য্যটক ট্যাভার্ণিয়ে যখন দেখিয়াছিলেন তখন ইহার চূড়াদেশে একটা পিরামিড ও তদূর্দ্ধে একটি বল রক্ষিত ছিল। তিনি ইহার উচ্চতা ৩২-৩৫ ফুট বলিয়াছিলেন। বিশপ হেবার তাহা ৪০ ফুট লিখিয়াছেন। লাটভৈরো যে আসলে কোন প্রাচীন স্তম্ভের নিদর্শন তাহা দীর্ঘকাল হইতে জানা থাকিলেও, * হিউয়েনসঙ্গ বর্ণিত উক্ত অশোকস্তম্ভের সহিত যে ইহা অভিন্ন একথা কাহারও মনে হয় নাই। প্রায় একই সময়ে ভিনসেণ্টস্মিথ ও Oertel তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করেন। ‡

কাশীতে আরও একটী অশোকস্তম্ভ আছে। সে কথা কিন্তু কেহই অবগত নহেন। এটী বর্ত্তমানে কুইন্স কলেজের

* এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য এই বইগুলি দ্রষ্টব্য, P. C. Mukherjiর Reports, Waddellএর Report on the Excavations at Pataliputra ও Arch. Surv. India, Ann Rep. 1912-13 pp. 53

* Rev. Sherring "Benares the sacred city of the Hindus" pp. 190-95, 305-08.

† Z. D. M. G., 1909, 337-45; Indian Antiquary 1908.

হাতার মধ্যে রক্ষিত। গাজীপুর জেলার জামানীয়া তহসিলে গাজীপুর সহর হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত পহ্লাদপুর গ্রামে সর্ব্বপ্রথম (১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) স্তম্ভটী কাপ্তেন বার্ট নামক জনৈক সৈনিক পুরুষ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। তখন স্তম্ভটী মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল এবং বালুকা রাশিতে অর্দ্ধ প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন লেফ্‌টন্যান্ট গভর্ণর মিঃ টমসনের আদেশে স্তম্ভটী পহ্লাদপুর হইতে বারাণসীতে স্থানান্তরিত ও এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। তজ্জন্য উত্তোলনকালে স্তম্ভটীর তলদেশে সুবৃহৎ একখণ্ড প্রস্তরের বেদী বাহির হয়। সেটীও লইয়া আসিয়া তাহারই উপরে স্তম্ভটীকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি যে কয়েকটি অশোকস্তম্ভের নীচে এই ধরণের প্রস্তরের বেদীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং অনুসন্ধান করিলে আদিম প্রতিষ্ঠাস্থানে অবস্থিত অর্থাৎ যেগুলি কখনও স্থানান্তরিত হয় নাই সেরূপ সকল স্তম্ভের নিম্নেই এরূপ বেদী দেখা যাইবে। স্তম্ভটী অন্যান্য লাটের ন্যায়ই উজ্জ্বল পালিসযুক্ত; দৈর্ঘ্যে সর্ব্বসমেত ৩৬ ফুট, তন্মধ্যে নিম্নের ৯ ফুট পালিসশূন্য। ভূগর্ভে প্রোথিত থাকিত বলিয়া ঐ অংশে পালিস দিবার প্রয়োজন ছিল না। স্তম্ভটী রক্তাভ বালুপাথরের—এ ধরণের পাথর চুণারেই পাওয়া যায়, এবং আকারে ও ডৌলে সর্ব্বাংশে অন্যান্য অশোকলাটের অনুরূপ। স্তম্ভটীর গাত্র বেড়িয়া এক লাইনে সম্পূর্ণ খ্রীষ্টীয় ১ম—২য় শতকের প্রচলিত অক্ষরে উৎকীর্ণ শিশুপাল নামক জনৈক নৃপতির গৌরবদ্যোতক একটি লিপি আছে। এই রাজার কোন পরিচয়ই অপর কোন সূত্র হইতে পাওয়া যায় না। লেখাটীতে তাঁহাকে অনেক যশ ও কীর্ত্তির ভাগী করা হইলেও, আমার মনে হয় এগুলি সুধুই বাগাড়ম্বরপূর্ণ গৌরবাত্মক প্রশংসামাত্র। শিশুপাল কোন বড় রাজা ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি কোন স্থানীয় ভূস্বামী বা সামন্ত নৃপতি মাত্র ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। শিশুপাল রাজার নামে পরিচিত এই লাটটি আসলে যে একটি অশোক-স্তম্ভ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শিশুপাল "বিপুল বিজয়কীর্ত্তি"র দাবী করিলেও এবং "পঞ্চম লোকপাল" বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেও, তিনি হাতের কাছে অশোকের এই প্রাচীন স্তম্ভটী পাইয়া তাহাতেই নিজ কাহিনী উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় আর নূতন একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণের ক্লেশ স্বীকার করেন নাই। এলাহাবাদ, দিল্লীতোপরা ও সারনাথের অশোকস্তম্ভের গাত্রেও এইরূপ পরবর্ত্তীযুগের রাজগণের উৎকীর্ণ লিপি দেখা যায়। তবে ঐ তিনটী স্তম্ভে সম্রাট অশোকের লিপি ক্ষোদিত থাকার ফলে উহারা মূলতঃ কাহার নির্ম্মিত সে বিষয়ে কোনই সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয় নাই।*

কুইন্স কলেজের লাটটিও যে আসলে একটি অশোকস্তম্ভ সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সকল পুস্তকেই ইহাকে পরবর্ত্তীযুগে নির্ম্মিত বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখিয়াছি। ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে কেহই ইতিপূর্ব্বে সন্দেহ করেন নাই।

পণ্ডিত দয়ারাম সাহানী একবার প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বার্ষিক রিপোর্ট মধ্যে রামপুরোয়ায় তাঁহার কৃত অনুসন্ধান প্রসঙ্গে এইটি অশোকলাট হইলেও হইতে পারে বলিয়াছিলেন। সেকথা আমি সম্প্রতি এই প্রবন্ধ লিখিবার পর জানিয়াছি।

বুদ্ধগয়া হইতে রাজগৃহ যাইবার পথে হিউয়েনসঙ্গ দুইটি প্রস্তরস্তম্ভ দেখিয়াছিলেন। অন্যান্য স্তম্ভের ন্যায়ও এ দুটী তিনি অশোক রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত স্পষ্টতঃ না বলিলেও যেভাবে বুদ্ধদেবের সম্পর্কে পূতস্থানে স্মারকস্তূপাদির সান্নিধ্যে প্রতিষ্ঠার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে ঐ দুটি স্তম্ভও অশোক ব্যতীত অপর কাহারও স্থাপিত নহে। তন্মিন্ন প্রথম স্তম্ভটীর যে নিদর্শন বর্ত্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে সুস্পষ্টতই দেখা যায় যে উহাও সর্ব্বাংশে অন্যান্য অশোকলাটের অনুরূপ।

হিউয়েনসঙ্গ লিখিয়াছেন, "বোধিবৃক্ষের পূর্ব্বদিকে নিরঞ্জনা নদীর অপর পারে বনমধ্যে একটি স্তূপ দেখা যায়।

---

* অধুনালুপ্ত "অলকা" পত্রে (১৩২৯ সালের ভাদ্র সংখ্যা) একটী প্রবন্ধে শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় শিশুপাল রাজাকে পল্লব-বংশীয় অজ্ঞাত পরিচয় কোন সার্ব্বভৌম নৃপতি বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না।

শ্রীঅমূল্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তাহার উত্তরে একটী তড়াগ আছে। এইস্থানে গন্ধহস্তী তাহার জননীর সেবা করিত। (অনন্তর হিউয়েনসঙ্গ গন্ধহস্তী প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের বোধিসত্বাবস্থায় পূর্ব্বতন জীবনের একটি কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। বাহুল্যবোধে তাহা দেওয়া হইল না।) তড়াগের পার্শ্বেই একটি স্তূপ; তাহার সম্মুখে একটি শিলাস্তম্ভ আছে। এই স্থানে বহুকাল পূর্ব্বে কশ্যপ বুদ্ধ ধ্যানে বসিয়াছিলেন। ইহার পার্শ্বে পূর্ব্বতন চারি বুদ্ধের ভ্রমণ ও উপবেশনের চিহ্ন দেখা যায়।”

(Beal's Records, Vol II, pp. 138-9)

গন্ধহস্তীর স্তূপ, স্তম্ভ ও তড়াগ আজিও দেখা যায়। এই স্থান এখন বকরোর নামে পরিচিত। বুদ্ধগয়া মন্দিরের প্রায় একমাইল দক্ষিণপূর্ব্বদিকে ফল্গু বা লিলাজন নদীর অপরপারে বকরোর গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের উত্তরে বিশাল একটী ইষ্টকস্তূপের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত, সমতল ভূমির উপরে তাহা এখনও প্রায় ৫০ ফুট উচ্চ। তড়াগটী এখনও মাতঙ্গবাপী নামে পরিচিত, ইহার নিকটে প্রতিবৎসর মেলা হয়, তখন কুণ্ডের জলে স্নানের জন্য বহু সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়। বলা বাহুল্য কুণ্ডের নামের মধ্যে গন্ধহস্তীর স্মৃতি আজিও রহিয়াছে। স্তম্ভটীর আজ নিতান্তই চরম দশা। স্তূপটীর কিছু উত্তরে উহার তলদেশের মাত্র কিয়দংশ স্বস্থানে প্রোথিত—অদূরে আর একখণ্ড পড়িয়া আছে। বুদ্ধগয়ায় মোহান্তের আবাসের প্রাঙ্গনে আর একখণ্ড রক্ষিত দেখা যায়। অপর এক খণ্ড ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে Charles Boddam নামক গয়ার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক গয়া সহরে নীত হইয়াছিল। গয়ার সাহেবগঞ্জ নামক নগরাংশে “পিলগ্রিম হস্পিটালের” সম্মুখে ঐ খণ্ড এখনও প্রোথিত আছে। এই অংশ প্রায় ১৬ ফুট দীর্ঘ এবং অন্যান্য অশোকস্তম্ভের মতই মসৃণ ও উজ্জ্বল পালিসযুক্ত। স্তম্ভটী অপরাপর লাটের ন্যায়ই চুণারের বালুপাথরের। বকরোরের স্তম্ভটী অভগ্ন অবস্থায়, বর্ত্তমানে প্রাপ্ত খণ্ডগুলি হইতে যতদূর জানা সম্ভব, ৩:—৩৬ ফুট দীর্ঘ ছিল বলিয়াই মনে হয়। এটীও যে আসলে একটী অশোকস্তম্ভ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ভগবান তথাগতের জীবনী সম্পর্কে বা, পূর্ব্বতন বুদ্ধগণের সম্বন্ধে পবিত্রীকৃত স্থানসমূহে স্মারক-চিহ্নরূপে প্রতিষ্ঠিত স্তূপসান্নিধ্যে প্রস্তরস্তম্ভের প্রতিষ্ঠা সম্রাট অশোক ব্যতীত অপর কাহারও কার্য্য নহে। কারণ হিউয়েনসঙ্গের ভ্রমণ বিবরণ হইতে দেখা যায় যে অশোকের সকল স্তম্ভই ঐভাবে স্তূপসান্নিধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত পরিব্রাজকের অদেখা যে কয়টা স্তম্ভ বর্ত্তমানে পাওয়া গিয়াছে তাহাদের নিকটেও প্রাচীন অশোকস্তূপের ধ্বংস-নিদর্শন অবস্থিত দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন বকরোর স্তম্ভের নিদর্শন হইতেও তাহা যে অশোকস্তম্ভ তাহা সম্পূর্ণরূপেই সমর্থিত হইতেছে। সুতরাং এ বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। বকরোরের বিবরণ প্রসঙ্গে এই স্তম্ভটীকে অশোকলাট বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিলেও অশোক বা অশোকস্তম্ভ সম্বন্ধীয় কোন লেখায় সেকথা কেহই বলেন নাই।*

বর্ত্তমানে আবিষ্কৃত তেইশটী লাটের কথা বলা হইল। এবারে নানাসূত্র হইতে পরিজ্ঞাত অথচ বর্ত্তমানে অনাবিষ্কৃত অশোকস্তম্ভগুলি সম্বন্ধে কিছু বলিব। নেপালতরাইয়ে জনপ্রবাদানুসারে শ্রুত পাঁচটী স্তম্ভের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। হিউয়েনসঙ্গ দৃষ্ট উনিশটী স্তম্ভের মধ্যে তেরটীর কোন চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নাই সে কথা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি। এগুলি নিম্নলিখিত স্থানসমূহে অবস্থিত ছিল।

(১) সাঙ্কাশ্যে (কিপিথা) যেস্থানে বুদ্ধদেব ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে তিনটী বহুমূল্য সোপানযোগে শক্র ও ব্রহ্মার সহিত ধরাধামে অবতরণ করিয়াছিলেন তথায় নির্ম্মিত একটি বিহারের বহির্ভাগে এই স্তম্ভটী দণ্ডায়মান ছিল। স্তম্ভটী বেগুনি রঙের সূক্ষ্ম দানাদার কঠিন প্রস্তরে নির্ম্মিত ও দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল ও ৭০ ফুট উচ্চ ছিল। ইহার উপরে সোপানের দিকে মুখ করিয়া পশ্চাতের পদদ্বয়ে ভর দিয়া উপবিষ্ট একটী সিংহমূর্ত্তি ছিল।. সঙ্কিশে আবিষ্কৃত দণ্ডায়মান হস্তিমূর্ত্তিযুক্ত স্তম্ভ যে ইহার সহিত অভিন্ন হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

---

* বকরোর স্তম্ভ সম্বন্ধে এই বইগুলি দ্রষ্টব্য :—Cunningham, Archaeological Survey of India Reports. vol I, pp 12-13; Major Kittoe in J. A. S.B. XVI (1846), pp. 79-80; 275; Gaya Dist. Gaz. pp, 228. 241,

(২) শ্রাবস্তীতে জেতবনবিহারের পূর্ব্ব তোরণের দক্ষিণ পার্শ্বে বৃষমূর্ত্তিশীর্ষ ৭০ ফুট উচ্চ একটী অশোক স্তম্ভ ছিল।

(৩) ঐ তোরণের বাম পার্শ্বে চক্রচিহ্নশীর্ষ ৭০ ফুট উচ্চ আর একটী অশোক স্তম্ভ ছিল।

(৪) শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডদের উদ্যানের উত্তর পশ্চিম দিকে কিছুদূরে অশোক রাজা নির্ম্মিত একটী স্তূপের সন্নিকটে আর একটী স্তম্ভ ছিল। বিল ও জুলাঁর কৃত অনুবাদে এই স্তম্ভটীর উল্লেখ আছে। হিউয়েনসঙ্গের অন্যতম অনুবাদক ওয়াটারসের গ্রন্থে ঐ স্থলে শুধু স্তূপের উল্লেখ দেখা যায়। একারণ অনেকে শ্রাবস্তীতে তৃতীয় অশোকস্তম্ভের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান। কিন্তু যখন দুইজন অনুবাদক উহার কথা বলিয়াছেন, এবং ওয়াটারস সকল স্থলে মূলানুগত অনুবাদ করেন নাই, অনেক স্থলে সারমাত্র দিয়াছেন বলিয়া জানা আছে, তখন তাঁহার অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া পূর্ব্বতন অনুবাদকের ভুল ধরা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

সাহেঠ মাহেঠে বিগত শতাব্দীতে কানিংহাম ও Dr. Hoey কয়েকবার অনুসন্ধান ও কিছু কিছু খনন কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯০৮—১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেও এখানে খনন কার্য্য হইয়াছে। কিন্তু স্তম্ভত্রয়ের কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

(৫) কপিলবস্তুর ৫০ মাইল দক্ষিণে ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধের জন্মস্থানে ৩০ ফুট উচ্চ, সিংহমূর্ত্তি শীর্ষ একটী প্রস্তর স্তম্ভগাত্রে তাঁহার নির্ব্বাণকাহিনী উৎকীর্ণ ছিল। ইহার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উপযুক্ত অনুসন্ধানের ফলে তরাই মধ্য হইতে এইটি এবং আরও অনেক অশোকস্তম্ভ বাহির হইতে পারে।

(৬) রামগ্রামে যেখানে নাগ হ্রদ মধ্য হইতে বাহির হইয়া অশোকের সহিত দেখা করিয়াছিলেন, সেখানে একটী ক্ষোদিত লিপিতে সেকথা লিপিবদ্ধ ছিল বলিয়া হিউয়েনসঙ্গ লিখিয়া গিয়াছেন।

রামগ্রাম বৌদ্ধদিগের একটি পরম পবিত্র তীর্থ স্থান। বুদ্ধদেবের দেহ দাহের পর রামগ্রামের কোলিয়গণ তাঁহার ভস্মধাতুর অষ্টমাংশ লইয়া গিয়া এক স্তূপ মধ্যে তাহা রক্ষা করে। কথিত আছে যে অজাতশত্রু রাজা হইবার পর অপরাপর স্তূপ মধ্যে হইতে শরীর ধাতু নিষ্কাশন করিয়া লইয়া নিজ রাজধানীতে এক স্তূপ মধ্যে তাহা প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু রামগ্রামের ধাতু লইতে পারেন নাই। বৌদ্ধ কাহিনী মতে, পরবর্ত্তী যুগে অশোক স্বীয় বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ৮৪০০০ স্তূপ মধ্যে ঐ দেহধাতু রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি রামগ্রামের স্তূপ হইতে ভস্মরাশি লইবার জন্য ঐ স্থানে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু নাগরাজকৃত পূজায়োজন দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া স্তূপ উন্মোচন হইতে বিরত হয়েন। যেস্থানে নাগ জলমধ্য হইতে বাহির হইয়া অশোককে দেখা দিয়াছিলেন, সেইখানেই ঐ লেখাটী ছিল। লেখাটি কিসের উপর ছিল সেকথা হিউয়েনসঙ্গ না বলিলেও তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কারণ প্রস্তরফলক ভিন্ন অপর কিছুতে তাহা উৎকীর্ণ থাকা সম্ভবপর ছিল না এবং প্রস্তরস্তম্ভ ভিন্ন গিরিগাত্রে অশোকের স্মারকলিপি দেখা যায় না। রামগ্রামের অবস্থান এখনও অজানা। ভবিষ্যতে যদি কখনও রামগ্রাম আবিষ্কৃত হয়, তবে এই অশোকস্তম্ভটী বাহির হইলেও হইতে পারে।

(৭) কুশীনগরে নির্ব্বাণবিহারের পার্শ্বে ২০০ ফুট উচ্চ একটি অশোকস্তূপের সম্মুখে স্থাপিত একটি প্রস্তরস্তম্ভগাত্রে তথাগতের নির্ব্বাণকাহিনী উৎকীর্ণ ছিল। কিন্তু তাহাতে বর্ষ বা মাস সম্বন্ধে কোন উল্লেখ ছিল না।

(৮) কুশীনগরে যে স্থানে আটজন রাজা বুদ্ধদেবের চিতা ভস্ম বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন তথায় অশোক রাজা নির্ম্মিত একটি স্তূপের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত শিলাস্তম্ভে ঐ কাহিনী উৎকীর্ণ ছিল।

কুশিনগর বর্ত্তমানে গোরখপুর জেলার অন্তর্গত তহসিল দেওরিয়ার অন্তর্গত কাশিয়া নামক ক্ষুদ্র গ্রামটীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বি, এন, ডব্লিউ রেলপথের তহসিল দেওরিয়া ষ্টেসন হইতে উহা ২২ মাইল উত্তর পূর্ব্বে ও পাদ্রাওনা হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। আজ ৬০ বৎসরেরও অধিক হইল কানিংহাম কুশিনগর ও কাশিয়ার অভিন্নতা প্রতিপন্ন করেন। ভিনসেন্টস্মিথ প্রমুখ কেহ কেহ দীর্ঘকাল সেকথা মানিতে না চাহিলেও বর্ত্তমানে কানিংহামের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপেই অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। কাশিয়াতে অনেকবার খনন কার্য্য হইয়াছে। ইহার ফলে নির্ব্বাণস্তূপ ও

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তাহার পার্শ্বে বিহার মধ্যে হিউয়েনসঙ্গ দৃষ্ট সুবৃহৎ বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে, কিন্তু অশোকস্তম্ভ দুইটির কোনই নিদর্শন এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই।

(৯) মহাসারের (বর্ত্তমানে আরা সহর হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে মসাড় গ্রাম) উত্তরে গঙ্গা নদীর উত্তর তটে অবস্থিত নারায়ণদেবের সুবৃহৎ ও সুন্দর মন্দিরের ৩০ লি পূর্ব্বে অশোক রাজা নির্ম্মিত একটি ধ্বস্ত-স্তূপের সম্মুখে ২০ ফিট উচ্চ সিংহমূর্ত্তিশীর্ষ একটি প্রস্তরস্তম্ভ ছিল। ঐ স্থানে বুদ্ধদেব নরমাংসভুক দুরন্ত মরু-দৈত্যগণকে বশ করিয়াছিলেন। স্তম্ভগাত্রে সেই কাহিনীই ক্ষোদিত ছিল।

এই স্তম্ভটীর কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, উহার অবস্থান এখনও নির্ণীত হয় নাই। সারণ জেলার কোন স্থানে উহা অবস্থিত ছিল।

(১০) পাটালিপুত্র নগরে প্রাচীন রাজপ্রসাদের উত্তরে একটি প্রস্তর স্তম্ভ আছে, এইখানে অশোক তাঁহার নরক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। স্তম্ভটী কয়েক দশম ফুট উচ্চ।

ফাহিয়ান এইটীকে নীলি স্তম্ভ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন রাজা অশোকের যে স্থানে বাসস্থান ছিল, তথায় তিনি নীলিনগর প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার মধ্যভাগে তিনি একটি প্রস্তর স্তম্ভ স্থাপন করেন। স্তম্ভটী প্রায় ৩৫ ফুট উচ্চ, ইহার উপরে একটি সিংহ মূর্ত্তি আছে, স্তম্ভগাত্রে নীলিনগর স্থাপনের বিবরণ এবং তাহার বৎসর, মাস ও দিন দেখা যায়।

(১১) নরকের দক্ষিণে অদূরে অশোক রাজার ৮৪০০০ স্তূপের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম নির্ম্মিত স্তূপটী ভগ্নদশায় অবস্থিত। তাহার পার্শ্বে কিছুদূরে একটি বিহার আছে। বিহারের পার্শ্বে নিকটেই প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ একটি প্রস্তর স্তম্ভ আছে। তাহার গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি অনেকাংশেই এক্ষণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উহার মর্ম্ম এইরূপ, "রাজা অশোক ধর্ম্ম-প্রণোদিত হইয়া বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ উদ্দেশ্যে জম্বুদ্বীপ তিনবার দান করেন এবং নিজ ধন রত্ন বিনিময়ে তিনবারই তাহা উদ্ধার করেন। ইহা তাহারই বিবরণ।"

ফাহিয়ান লিখিয়াছিলেন, "অশোকের ৮৪০০০ স্তূপের মধ্যে যেটী সর্ব্বপ্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা পাটলিপুত্র নগরের প্রায় ৩ লি দক্ষিণে অবস্থিত। তাহার সম্মুখে একটি বিহার আছে। স্তূপের দক্ষিণে একটি প্রস্তর স্তম্ভ আছে। তাহার পরিধি ১৮ ফুট ও উচ্চতা ৩৫ ফুট। স্তম্ভগাত্রে এইরূপ একটি লিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়. "রাজা অশোক যতি সঙ্ঘকে জম্বুদ্বীপ দান করিয়াছিলেন এবং পরে অর্থ দ্বারা তাহা ক্রয় করেন। তিনি এইরূপ তিনবার করিয়াছিলেন।" এই স্তূপের তিন বা চার শত পদ উত্তরে নীলি নগরের অবস্থান ফাহিয়ান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১২) বুদ্ধগয়া হইতে রাজগৃহ যাইবার পথে, গন্ধহস্তীর পূর্ব্বদিকে মোহো নদীর অপর পারে অরণ্য মধ্যে একটি প্রস্তর স্তম্ভ ছিল। ঐ স্থানে উদ্রারামপুত্র নামক এক তাপসের কাহিনীর হিউয়েনসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার একশত লি পূর্ব্বদিকে কুক্কুটপাদ গিরি।

এই স্তম্ভটী পাওয়া যায় নাই। কুক্কুটপাদ গিরির অবস্থান এখনও সঠিক নির্ণীত হয় নাই। এই স্তম্ভটীর স্থান নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। কালে গয়া জেলার অরণ্য ও শৈল সমাকীর্ণ অঞ্চলে স্তম্ভটী আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে।

(১৩) রাজগৃহে করণ্ডহ্রদের উত্তরপশ্চিম দিকে ২।৩ লি দূরে অশোক রাজা নির্ম্মিত একটী ৬০ ফুট উচ্চ স্তূপের পার্শ্বে একটি প্রস্তর স্তম্ভ ছিল। স্তম্ভটীর গাত্রে স্তূপ নির্ম্মাণের কাহিনী উৎকীর্ণ ছিল। উহা প্রায় ৫০ ফুট উচ্চ ও উপরে একটী হস্তীমূর্ত্তি ছিল।

রাজগিরে কিছু কিছু অনুসন্ধান হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। উপযুক্তরূপ অনুসন্ধানের ফলে এই স্তম্ভটী বা তাহার ভগ্ন নিদর্শন বাহির হইবে বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব্বে যে অশোক স্তম্ভগুলির কথা বলা হইল, দেখা যাইবে যে এগুলি স্মারক চিহ্নরূপে বুদ্ধদেব সম্পর্কে পবিত্র স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং প্রত্যেকটী স্তম্ভের সন্নিকটেই অশোকের স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ফাহিয়ানের গ্রন্থ হইতে আর একটি স্তম্ভের পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়াছি। তিনি কুশীনগর হইতে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে গমন করিয়া বৈশালী পঁহুছিয়াছিলেন। এই পথ দিয়াই নির্ব্বাণ লাভের পূর্ব্বে বুদ্ধদেব বৈশালী হইতে কুশী-

নগর গিয়াছিলেন। লিচ্ছবিগণ ভগবান পরিনির্ব্বাণ লাভের জন্য যাইতেছেন জানিতে পারিয়া তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগে অনিচ্ছুক হইয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতে থাকে। অনন্তর ভগবান তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে কোনমতে না পারিয়া মায়াবলে একটী তরঙ্গভীষণা সুগভীর নদীর সৃষ্টি করিলেন। লিচ্ছবিগণ আর তাহা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারিল না। তখন বুদ্ধদেব তাহাদিগকে স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ স্বীয় ভিক্ষাপাত্র প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পালি সাহিত্যে এই কাহিনী দেখা যায়। ফাহিয়ান ও হিউয়েনসঙ্গ উভয়েই বৈশালী সম্পর্কে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তবে ঐ স্থানের অবস্থান এবং তথায় প্রতিষ্ঠিত স্মারকচিহ্ন সম্বন্ধে উভয়ে একমত নহেন। ফাহিয়ান বলেন যে লিচ্ছবি বিদায়ের স্থান কুশীনগরের দ্বাদশ যোজন দক্ষিণ পূর্ব্বে ও বৈশালীর পাঁচ যোজন পশ্চিমে,* পক্ষান্তরে হিউয়েনসঙ্গের মতে উহা বৈশালীর মাত্র ৫০।৬০ লি উত্তর পশ্চিম।‡ প্রথম পরিব্রাজক তথায় এক প্রস্তরস্তম্ভগাত্রে ঐ ঘটনার বিবরণ খোদিত ছিল বলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তথায় প্রতিষ্ঠিত মাত্র একটী স্মারকস্তূপের উল্লেখ করিয়াছেন।

লিচ্ছবি বিদায়ের স্থান এখনও নির্ণীত হয় নাই। কানিংহাম চম্পারণ জেলায় কেসারিয়াকে একবার ঐ স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু কেসারিয়া তাহা অপেক্ষা হিউয়েনসঙ্গ বর্ণিত বৈশালী হইতে ২০০ লি দূরবর্ত্তী (৩০-৩৩ মাইল) চক্রবর্ত্তী রাজার নগরের নিদর্শন হওয়াই অধিকতর সম্ভব ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। লিচ্ছবি বিদায়ের স্থান বৈশালীর সন্নিকটেই কোথাও অবস্থিত ছিল। তাহা বৈশালী হইতে ৫ যোজন (২৫ মাইল) দূরে ছিল বলিয়া মনে হয় না, বরং ৫০।৬০ লি (৮-১০ মাইল) দূরে থাকাই সম্ভব। ফাহিয়ান ধৃত ব্যবধান ভুল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু স্তম্ভটীর উল্লেখ হিউয়েনসঙ্গের গ্রন্থে না থাকায় মনে হয় তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই তাহা বিনষ্ট হইয়াছিল। ইহাও সম্ভব যে লোকমুখে এতদঞ্চলে অবস্থিত লৌড়িয়াস্তম্ভ দুইটির কথা শুনিয়া, ফাহিয়ান তাহাদের মধ্যে একটীকে, সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত দক্ষিণে অবস্থিত অররাজ লাটটিকে লিচ্ছবি বিদায়ের স্থানে আরোপ করিয়াছেন।

এক অভিনব সূত্র হইতে আর একটি অশোকস্তম্ভের পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের সিদ্ধিলাভের স্থান উরুবিল্ব বা মহাবোধি বৌদ্ধদিগের পরম পবিত্র তীর্থস্থান। বর্ত্তমানে এখানে মন্দির সন্নিকটে কোন স্তম্ভের নিদর্শন দেখা যায় না। চীন পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ বিবরণেও এস্থানে প্রতিষ্ঠিত কোন অশোকস্তম্ভের পরিচয় পাওয়া যায় না। অথচ সম্রাট অশোক যে বোধিবৃক্ষ সন্নিকটে কোনও স্মারক-স্তম্ভ স্থাপন করেন নাই তাহাও সত্য বলিয়া মনে হয় না। বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনিকানন, সাধনাস্থান উরুবিল্ব, প্রচারস্থান মৃগদাব ও পরিনির্ব্বাণস্থান কুশিনগর বৌদ্ধের নিকট সমভাবেই পবিত্র। অপর তিনস্থলেই অশোক স্মারক প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া হিউয়েনসঙ্গের লেখা হইতে জানা যায়। তন্মধ্যে লুম্বিনি ও মৃগদাবের স্তম্ভদ্বয় বর্ত্তমানে যথাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অশোক অপর তিনস্থানে স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং বুদ্ধগয়ায় করিলেন না এরূপ মনে করা যে কিরূপ অসঙ্গত তাহা বলাই বাহুল্য-মাত্র। তাই মনে হয় অশোক প্রতিষ্ঠিত উরুবিল্বস্তম্ভ হিউয়েনসঙ্গের আগমনের পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছিল, অথবা সাঙ্কাশ্য ও কৌশাম্বীর স্তম্ভের ন্যায় তিনি এটীরও উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

অশোক বুদ্ধগয়ায় যে হস্তিমূর্ত্তিযুক্ত প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা এক অভিনব সূত্র হইতে জানা যায়। ভারহুটের স্তূপ বেষ্টনীর গাত্রে ক্ষোদিত চিত্রমালা মধ্যে (নির্ম্মাণকাল আনুমানিক ১৫০ খ্রীঃ অব্দ) সুপ্রাচীন মহা-বোধি বিহারের এক চিত্র আছে। এই চিত্র হইতে বুঝা যায় যে তখন বোধিদ্রুমের নিম্নস্থ বজ্রাসনই প্রধান উপাস্য বস্তু ছিল। বোধিবৃক্ষের চারিপার্শ্বে দ্বিতল গৃহ অবস্থিত, তাহার তোরণের সম্মুখে একটি হস্তিমূর্ত্তিশীর্ষ স্তম্ভ দণ্ডায়মান। উহা অশোকের অন্যান্য প্রস্তরস্তম্ভের অবিকল অনুরূপ। তোরণের উপরে সুপ্রাচীন ব্রাহ্মীমালার অক্ষরে উৎকীর্ণ—"ভগবতো সকমুনিনো বোধো"—অর্থাৎ ভগবান শাক্যমুনির বোধিদ্রুম। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে অশোক উরুবিল্বে

* Beal's Records, Introduction, pp. li-lii.

‡ Ibid, vol. II. p. 73.

শ্রীঅমূজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বজ্রাসন সন্নিকটে অন্যান্য স্থানের ন্যায়ই একটি স্মারক শিলা-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং উক্ত লাটের উপরে একটি হস্তীমূর্ত্তি রক্ষিত ছিল। বর্ত্তমানে তাহার কোনই নিদর্শন এ যাবৎ বাহির হয় নাই। ফাহিয়ান ও হিউয়েনসঙ্গের কেহই তাহার উল্লেখ করেন নাই।

ভারহুট চিত্র যে কাল্পনিক নহে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। বুদ্ধদেবের জীবনী ও কাহিনী সম্পর্কে পূতস্থানসমূহে অশোক যখন স্মারকস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তখন তিনি যে মহাবোধিকে বাদ দিয়াছিলেন তাহা মনে করা অসঙ্গত। অশোকের অনতিকাল পরেই ভারহুট শিল্পের কাল সে বিষয়ে সকলেই একমত। শিল্পী যে মহাবোধি বিহারের চিত্র রচনা করিতে সুধুই কল্পনার আশ্রয় লইয়াছিল তাহা কোনমতেই সম্ভব নহে। অঙ্কিত স্তম্ভটী যে অন্যান্য অশোকস্তম্ভের অবিকল অনুকৃতি তাহা চিত্র দেখিলে সকলেই স্বীকার করিবেন। * মহাবোধিতে এরূপ কোন স্তম্ভ দেখা না থাকিলে বোধিবৃক্ষ, বজ্রাসন ও বিহার-সমীপে তাহা চিত্রিত করা শিল্পীর পক্ষে সুধুই কল্পনার বলে সম্ভবপর ছিল না। এইরূপে বৌদ্ধগয়ায় প্রতিষ্ঠিত আর একটী অশোকস্তম্ভের পরিচয় পাওয়া গেল।

মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে উইলিয়ম ফিঞ্চ নামক জনৈক ইংরাজ পর্য্যটক এদেশে আসিয়াছিল। তাঁহার লিখিত বিবরণ মধ্যে ফতেপুর সিক্রির সন্নিকটে ভূগর্ভ হইতে একটি প্রস্তরস্তম্ভ আবিষ্কৃত হওয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। ফিঞ্চ লেখে "ভারতবর্ষের বহু বিভিন্ন স্থানে ইহার (ফেরোজের লাট) অনুরূপ স্তম্ভ দেখা যায়। সম্প্রতি ফতেপুরের নিকটে একটি প্রস্তরস্তম্ভ মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল, উহা প্রায় শত হস্ত পরিমাণ দীর্ঘ হইবে। রাজা (জাহাঙ্গীর) উহা আগ্রায় আনিবার আদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে উহা ভাঙ্গিয়া যায়, ইহাতে তিনি নিরতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন।" * ফিঞ্চ প্রদত্ত দৈর্ঘ্য নিতান্ত অতিরঞ্জিত হইলেও, স্তম্ভটী যে প্রাচীন যুগের তাহা নিঃসন্দেহ। তবে উহা মৌর্য্য সম্রাট অশোকের কিনা তাহা বলিবার উপায় নাই। আগ্রা-ফতেপুর অঞ্চলে কোন স্থানে স্তম্ভখণ্ডগুলি মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে কোনকালে হয়ত পুনরাবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে।

এইরূপে সর্ব্বসমেত চুয়াল্লিশটী অশোকস্তম্ভের পরিচয় পাওয়া গেল। তন্মধ্যে তেইশটী বর্ত্তমানে দেখা যায়।

* নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহে ভারহুটের চিত্রটী দ্রষ্টব্য—Sir Alexander Cunningham, "Bharhut Stupa" pls. XII, XXX; Mahabodhi, pl. I; Gruwedel. "Buddhist Art in India" p. 69; Arch. Surv. India, Ann-Rep. for 1908-09.

* Purchas, His Pilgrimage (1624); p. 431.

গানের পালা

—গল্প—

শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১

ছোট্ট বাড়ী, পশ্চিমের একেবারে নোংরা সহরের মাঝ-খানে। নিত্য নূতন অবসাদের মধ্যে এ যেন একটা দীর্ঘ-শ্বাসের মত। জীর্ণ কঙ্কালসার, বহু পুরাতন, যমরাজের সহচর প্লেগের জন্মভূমি। বাতাস যায় না, আলো পালায়, স্নিগ্ধতার পরশ বুঝি সে কোনদিন পায়নি। চারটী ছোট ছেলে তিনটী মেয়ে, ছুটী নাত্‌নি, আর অকালবৃদ্ধা, শীর্ণা তরুণী ভার্য্যা রাধারাণীকে নিয়ে বাঙালী ডাক্তার অতুল এই বাড়ীটায় বাস করত বহুদিন থেকে। ডাক্তারীর প্রথম যুগে সে নাকি ধূলোমুটোকে কড়িমুটো করেছে এবং তারি কিছু জমানো টাকায় আজও নাকি সে দাঁড়িয়ে আছে।

লম্বা, রোগা, ফর্সা, এক মুখ সাদাপাকা গোঁফ্ আর দাড়ি; বহু পুরাণ ফ্লানেলের প্যাণ্ট প'রে সাইকেলে চ'ড়ে লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ায়। সকলেই ভালবাসে, সম্ভ্রম করে, কিন্তু কেউ হাত দেখায় না; বাড়ী গেলেই হার-মোনিয়াম বা তবলা এগিয়ে দিয়ে বলে—"ডাক্তার গান গাও।" শনি পেলে লক্ষ্মী ছাড়ে—ডাক্তারের লক্ষ্মী ছাড়ল গানের জ্বালায়। রুগী দেখতে পেলে ধ্রুপদের তালের গল্প ফাঁদে; প্রেসকৃপসন লিখতে গেলে স্বরলিপি লেখে। ছুনিয়ার কারও গান সে পছন্দ করে না। ছুনিয়ার কোন বাজনা তার অজানা নেই।

২

শীতের সন্ধ্যা। ঝাপসা ধোঁয়াটে অন্ধকার একটা ঘরে ভাঙা ছুখানা তক্তাপোষ জোড়া তার উপর ছেলে মেয়েগুলো উদ্দাম দাপাদাপি আরম্ভ করেছিল। রাধারাণীর সন্ধ্যা যেতেই জ্বর এসেছিল, একটা চাদর মুড়ি দিয়ে সে মৃতের মত এক পাশে শুয়েছিল। গুটী বারো শিশুদস্যুর অত্যাচার তার কাছে হয়ত মৃদঙ্গের মত লাগছিল।

অতুল ঘরে এলো—এক মাথা ধূলো, মোজাটা নেমে জুতার উপর লুটীয়ে পড়েছে—এক হাতে বাঁয়া, অন্য হাতে তবলা। সে ঘরে আস্‌তেই ছেলেপিলেগুলো দৌড়ে এসে তার পকেটে হাত দিলে—কোনো পকেটে কতকগুলো লজঞ্চুষ, কোনো পকেটে জেম বিস্কুট, কোনো পকেটে পয়সা খানেকের মুড়ি; তারা মহানন্দে আহার সুরু করলে। কত রাত্রি তাদের হাঁড়ি চড়ে না এমনি আহারে রাত কাটে। অতুল মাটীতে বাঁয়াতবলা রেখে জিজ্ঞাসা করলে—

"রাণী কেমন আছিসরে?"

রাণী ক্ষীণস্বরে উত্তর দিলে—"ভাল নেই জ্বর এসেছে—তুমি আজ আর বেরিয়ো না।"

মাটির উপর চেপে ব'সে কোলের উপর বাজনা টেনে নিয়ে তাতে ছুটা থাপোড় দিয়ে অতুল বল্লে—"কি যে বলিস রাধী, আজ রাত্রে যমুনা বাইজীর সঙ্গে তবলা বাজাতে হবে। জানিস এ বাইজীর সঙ্গে তবলা বাজায় এ সহরে এমন কেউ নেই।"

আতঙ্কে ও উত্তেজনায় রাধারাণী বিছানার উপর উঠে বসেছিল, সে তীক্ষ্ণ কর্কশস্বরে বল্লে—

"বাইজীর সঙ্গে তবলা বাজানোর প্রবৃত্তি কতদিন থেকে হয়েছে? এ খবর ত জানতুম না।"

অতুল আপন মনে বাজাতে বাজাতে বল্লে—"জানবি কি ক'রে—রোগে ভুগবি না ছুনিয়ার খবর নিবি।" রাধা-রাণীর সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলে যাচ্ছিল। অভাবে মস্তিষ্কের বিকৃতিতে তার দেবতুল্য স্বামী অধোগতির কতটা নিম্নস্তরে নেমেছে তা সে এতদিন বুঝতে পারেনি। তার রুগ্ন কৃশ দেহটাকে কোন রকমে টেনে এনে সে অতুলের হাতটা ধ'রে বললে—"ওগো ভুলোনা তুমি কোন্ বংশের ছেলে—দেশ শুদ্ধ লোক গায়ে থুথু দেবে যে।"

হঠাৎ মাঝ পথে তাল কেটে যাওয়াতে অতুলের মাথায় আগুন চড়ে উঠেছিল, সে ঠাস ক'রে রাধারাণীর গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বললে—"দিন দিন বড় তেজ হচ্ছে, ছোট-লোক কোথাকার।" ব'লেই সে বাজনা ছুটো ছুহাতে নিয়ে উঠানে নেবে পড়ল, ছেলে মেয়েগুলো আড়ষ্ট হয়ে গিছল, শুধু এগার বছরের মেয়ে বামা ছুটে এসে অতুলের হাত ধ'রে

শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বললে—"বাবা, শীঘ্র এস, মা কেমন করছে।"

হাতটা ছিনিয়ে নিয়ে অতুল বল্লে—"সব এক এক করে মর্ বাপী যে আমি তোদের খোরাক যোগাবার হাত থেকে বাঁচি। ঐ কুলুঙ্গীতে ব্রাণ্ডি আছে খানিকটা খাইয়ে দিগে যা, ও কাঙালীর প্রাণ সহজে বেরুবে না।" সে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

৩

বুঝি ইন্দ্রপুরী। লোকে লস্করে, আলোয় বাজনায় সভা-স্থল মুখরিত। পশ্চিমের শ্রেষ্ঠা বাইজী যমুনার গান শোনবার জন্য বুঝি লোকে প্রাণই দেয়। সেই সভার রূপ সহস্র গুণ বাড়িয়ে রূপসী যমুনা গান ধরেছিল—

বরষা লাগেরে মেরি গুঁইয়া,
সেঁইয়া মেরি নেহি আয়িরি।

সুরের যাদুতে সকলে যেন স্তব্ধ, পুতুলের মত দাঁড়িয়ে সেই লীলায়িত সুরলয়ের মধ্যে অতুলের তবলা যেন এক অদ্ভুত মায়াজাল সৃষ্টি করছিল। সে কেউ শোনেনি, সে কেউ ভাবেনি—স্বর্গলোকের কোন বাদ্যকার আজ যেন নিমেষের জন্য ভূলোকে অবতীর্ণ। দর্শকজনের বাহবা, সহস্রজনের সপ্রশংস দৃষ্টি, বাইজীর নীরব আত্মনিবেদন আজ যেন অতুলকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দিচ্ছিল—মুহূর্ত্তের জন্য সে ভুলেছিল সে এক অনাহারক্লিষ্ট জীবন সংগ্রামে মুমূর্ষু হতভাগ্য স্বামী, ও এক-ঘর শীর্ণ শিশুর দায়িত্ববোধহীন জনক। আজ সে যেন নৃপতির চেয়েও বড়; আজ সে বিশ্বের চক্ষে প্রশংসনীয় পূজ্য দেবতা।

পাশ থেকে কে একজন অতুলের কানের কাছে বললে—"বাবুজী, শীঘ্র বাড়ী যান, মাজীর বড় ব্যারাম তিনি ডাক্‌ছেন।"

কিন্তু সে কথা বোধ করি অতুলের কানে গেল না, সে তখন আপনভোলা, তন্ময়চিত্ত সন্ন্যাসীর মত সিদ্ধিলাভে ব্যাকুল হয়ে বাজিয়ে চলেছে; তার বিস্ফারিত দৃষ্টিপথের উপর এক শ্রেষ্ঠা সুন্দরীর বিলোল হিল্লোলে আর চপল কটাক্ষে সে আত্মহারা। কতক্ষণ এ রকম সে ছিল জানেনা—হঠাৎ বাজাতে বাজাতে মনে হল বুঝি বাইজী সুন্দরী শূন্যে মিলিয়ে গেছে—এবং তারই স্থানে তার রুগ্না তরুণী পত্নী দাঁড়িয়ে তাকে হাতছানি দিয়ে কাতর অনুরোধ করছে—"একবারটী এস ওগো, একবারটী এস।" তার সর্ব্বাঙ্গে একটা হিম রক্তস্রোত বইল; তার কানের পাশে বাইজীর মধুভরা গানের পরিবর্ত্তে কার যেন একটা বুকভাঙা আওয়াজ গুমরে কেঁদে বল্‌ছিল—"বরষা এসেছে হে সখি, আমার প্রিয়তম এলনা, এলনা, এলনা।"

হঠাৎ মাঝ পথে তাল কেটে দিয়ে অতুল "মাগো" ব'লে মুখ ঢেকে ব'সে রইল। সমবেত ক্রুদ্ধ কণ্ঠের একটা বিশ্রী চীৎকার—বাইজীর পরিহাস-হাসি ছাপিয়ে তার অন্তরাত্মা কাতর মিনতি জানাচ্ছিল—"যাচ্ছি, ওগো যাচ্ছি।"

স্মৃতিকথা

কাল্‌ভে বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

কার্ত্তিক মাসের "বিচিত্রা"য় শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের "সবুজপত্রে" প্রকাশিত "ভ্রাম্যমানের জল্পনা" থেকে ফ্রান্সের একটী শ্রেষ্ঠা গায়িকার সঙ্গে বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে তাঁর যে আলাপ আলোচনা হয়েছিল, তা সঙ্কলিত ক'রে দেওয়া হয়েছে এবং "বিচিত্রা" "নানাকথা"য় সেই "শ্রেষ্ঠা গায়িকা"র ভারত ভ্রমণ বিষয়ে উল্লিখিত হয়েছে।

যদি এই শ্রেষ্ঠা গায়িকা মাদাম কাল্‌ভে হন, তবে দিলীপ বাবুর এঁর নাম অপ্রকাশ রাখবার কারণ বুঝতে পারা গেল না। মাদাম কাল্‌ভের নাম ভারতবর্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ সুপরিচিত। বিশেষ এই বাংলা দেশে। স্বামীজী তাঁর "পরিব্রাজকে" নিজেই "কাল্‌ভে"র এইরূপ পরিচয় দিয়েছেন :—

"সঙ্গের সঙ্গী তিনজন—দুজন ফরাসী, একজন আমেরিক। আমেরিক তোমাদের পরিচিতা মিস্ ম্যাক্‌লাউড; ফরাসী পুরুষ-বন্ধু মস্যিয় জুলবোওয়া, ফ্রান্সের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত দার্শনিক ও সাহিত্য-লেখক; আর ফরাসিনী বন্ধু, জগদ্বিখ্যাত গায়িকা মাদ্‌মোয়াজেল্ কাল্‌ভে। ফরাসী ভাষায় "মিষ্টর" হচ্ছেন "মস্যিয়," আর "মিস্" হচ্চেন মাদ্‌মোয়াজেল্—"জ"টা পূর্ব্ব-বাঙ্গলার জ। মাদ্‌মোয়াজেল কাল্‌ভে আধুনিক কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা—অপেরা গায়িকা। এঁর গীতের এত সমাদর যে এঁর তিন লক্ষ, চার লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়, খালি গান গেয়ে। এঁর সহিত আমার পরিচয় পূর্ব্ব হ'তে।

মাদ্‌মোয়াজেল্ কাল্‌ভে এ শীতে গাইবেন না, বিশ্রাম কর্‌বেন; ইজিপ্ত প্রভৃতি নাতিশীত দেশে চলেছেন। আমি যাচ্ছি—এঁর অতিথি হয়ে। কাল্‌ভে যে শুধু সঙ্গীতের চর্চ্চা করেন, তা নয়; বিদ্যা যথেষ্ট, দর্শন শাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন। অতি দরিদ্র অবস্থায় জন্ম হয়, ক্রমে নিজের প্রতিভাবলে, বহু পরিশ্রমে, বহু কষ্ট সয়ে, এখন প্রভূত ধন!—রাজা, বাদশার সম্মানের ঈশ্বরী।

মাদাম মেল্‌বা, মাদাম্ এমা এমস্ প্রভৃতি বিখ্যাত গায়িকা সকল আছেন; জাঁ দরেজ কি, প্লাঁসঁ প্রভৃতি অতি বিখ্যাত গায়ক সকল আছেন—এঁরা সকলেই দুই তিন লক্ষ টাকা বাৎসরিক রোজগার করেন!—কিন্তু কাল্‌ভের বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব প্রতিভা। অসাধারণ রূপ, যৌবন, প্রতিভা, আর দৈবী কণ্ঠ—এসব একত্র সংযোগে কাল্‌ভেকে গায়িকা মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় করেছে। কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র্য অপেক্ষা শিক্ষক আর নেই! সে শৈশবের অতি কঠিন দারিদ্র্য, দুঃখ, কষ্ট—যার সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ কোরে কাল্‌ভের এই বিজয় লাভ, সে সংগ্রাম তাঁর জীবনে এক অপূর্ব্ব সহানুভূতি, এক গভীর ভাব এনে দিয়েছে।"

সুতরাং বাংলা পাঠকদের মধ্যে এবং স্বামীজীর ভক্তদের মধ্যে "কাল্‌ভে"র নাম নূতন নয়—এক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত দিলীপ বাবু নাম প্রকাশ কর্‌লে বাংলার পাঠক পাঠিকারা আগ্রহের সঙ্গেই পাঠ কর্‌তেন। আজ মাদাম কাল্‌ভের আলোচনা কর্‌তে কর্‌তে কাল্‌ভে যখন কল্‌কাতায় এসেছিলেন তখন তাঁর বেলুড়মঠ দর্শনের কথা মনে পড়্‌ল, এবং "বিচিত্রা"র 'নানাকথা'র মন্তব্য পাঠ ক'রে সেই পুরাতন স্মৃতি আবার নবীন হ'য়ে জেগে উঠ্‌লো।

মাদাম কাল্‌ভে যখন কল্‌কাতায় আসেন তখন ইংরাজী ১৯১১ সাল 'ইংলিসম্যান' পত্রিকা মাদাম কাল্‌ভের আনুপূর্ব্বিক পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে পত্রিকার প্রতিনিধির যে কথাবার্ত্তা হয় তা' সবিস্তারে প্রকাশিত করেন। সেই আলাপ-আলোচনা প্রবন্ধে উল্লেখ ছিল যে কাল্‌ভের ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্য—ভারত সম্বন্ধে তাঁর যে আদর্শ এতদিন কল্পনা ও স্বপ্নরাজ্যে ছিল—যে দেশকে তিনি জগতের

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

একটী তীর্থরূপে মনে ক'রে এতদিন এসেছেন—সেই আদর্শকে ধারণা কর্‌তে তীর্থযাত্রীরূপে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য প্রদান কর্‌তে তিনি ভারতবর্ষে এসেছেন। প্রশ্নকর্ত্তা ইংলিশ-ম্যানের প্রতিনিধি জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন যে, ভারত সম্বন্ধে তাঁর এই আদর্শ ও শ্রদ্ধা কি করে হ'ল?—মাদাম বল্লেন, "স্বামী বিবেকানন্দের নিকট থেকে। তাঁর মুখে যখন প্রাচীন ভারতের মহোজ্জ্বল বর্ণনা শুন্‌তাম—তখন থেকে এই পবিত্র ভূমিকে দেখ্‌বার ইচ্ছা জেগে উঠেছিল। ভগবানের কৃপায় আজ আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।"

ইংলিশম্যানের এই প্রবন্ধ পাঠ ক'রে আমাদের বিবেকানন্দ সমিতিতে তৎক্ষণাৎ এই বিষয়ের আলোচনা হয়। বিবেকানন্দ সমিতি তখন ১।৪ নং শঙ্কর ঘোষের লেনে মেট্রোপলিটান কলেজের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্য—রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভক্তিভাজন স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সে সময়ে "বিবেকানন্দ সমিতি"র সম্পাদক ছিলেন। বিবেকানন্দ সমিতির সেই সভায় স্থির হ'ল যে পরদিন আমরা বেলা ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে গ্র্যাণ্ড-হোটেলে মাদাম কাল্‌ভের সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাব—এবং তাঁকে জানাব তিনি যদি শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামিজীর লীলাস্থান দক্ষিণেশ্বর বা বেলুড়মঠ দর্শন কর্‌তে চান তবে আমরা তাঁর সাহায্য কর্‌তে প্রস্তুত আছি। পূর্ণ বাবুর উপদেশ ও প্রস্তাবানুযায়ী আরও স্থির হ'ল যে আমাদের সমিতির পক্ষ হ'তে কাল্‌ভেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ফটো ছবিগুলি উপহার স্বরূপ প্রদান করা হ'বে।

পূজনীয় পূর্ণ বাবু, ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক সকলে মিলে গ্রাণ্ড হোটেলের দ্বিতল কক্ষে গিয়ে জানাই যে আমরা বিবেকানন্দ সমিতির সম্পাদক ও কয়েকজন সভ্য মাদামের দর্শন প্রার্থী। সংবাদ পাঠাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমাদের ডাক পড়্‌ল। প্রাসাদোপম গ্রাণ্ড হোটেলের সুসজ্জিত কক্ষে আমরা ছ'জন প্রবেশ কর্‌লেম, একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক আমাদের সম্বর্দ্ধনা ক'রে চেয়ারে আসন গ্রহণ কর্‌তে অনুরোধ কর্‌লেন। তিনি বল্‌লেন "আপনারা এসেছেন শুনে মাদাম বড় আনন্দিত হয়েছেন, তিনি আপনাদের পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কর্‌তে অনুরোধ ক'রেছেন।" আমরা সকলেই মাদামের আগমন প্রতীক্ষায় রইলেম, কিন্তু অবিলম্বে দুটী ভদ্রলোককে সঙ্গে ক'রে ভিতরের কক্ষ থেকে মাদাম কাল্‌ভে আমাদের সম্মুখে হাস্যমুখে উপস্থিত হ'লেন। তাঁকে দেখে আমরা যখন সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লাম—তখন তিনি আমাদের অভিবাদন করে ওষ্ঠে অঙ্গুলী-সঙ্কেত ক'রে বল্‌লেন "নথ্‌ ইংলিশ" পরে তাঁর সঙ্গী একটী ভদ্রলোককে ফরাসী ভাষায় কি বল্‌লেন—তা তখন আমাদের অবোধ্য। মাদামের সঙ্গী ভদ্রলোক দু'জনের মধ্যে একজন (দীর্ঘাকার কেশবিরল প্রৌঢ়) বল্‌লেন "মাদাম ইংরাজী জানেন না এই জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখ বোধ কর্‌ছেন। তাঁর মনের ভাব তিনি আপনাদের নিকট আপনাদের জানিত ভাষায় প্রকাশ কর্‌তে পার্‌ছেন না। আমি দোভাষী হ'য়ে আপনাদের কথা তাঁকে জানাব এবং তাঁর কথা আপনাদের জানাব।"

আমাদের মুখপাত্র স্বরূপ পূর্ণবাবু কথা আরম্ভ কর্‌লেন। তিনি প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ফটোগুলি মাদামকে উপহার দিলেন। মাদাম সহাস্যবদনে সেগুলি নিজের হাতে গ্রহণ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো দেখে অতি শ্রদ্ধাভরে মস্তক স্পর্শ কর্‌লেন—পরে টেবিলের উপর রাখ্‌লেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের ফটো দেখে তিনি যেন আনন্দের বেগে আত্মহারা হ'য়ে গেলেন; স্বামিজীর ফটো তিনি বুকের মধ্যে চেপে ধর্‌লেন; মুখে চোখে—সর্ব্ব শরীরে যেন সেই আনন্দের দীপ্তি উদ্ভাসিত ও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো; অতি আনন্দপূর্ণ দৃষ্টিতে রুদ্ধকণ্ঠে ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলিলেন, "Oh! I am very very happy," তারপর ফরাসী ভাষায় অনর্গল বল্‌তে লাগ্‌লেন এবং আমাদের দিকে একটু করুণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগ্‌লেন। সেই দৃষ্টি যেন স্পষ্ট ক'রে বল্‌লে—"কি দুঃখ! আমার এই মনের ভাবগুলি তোমাদের জানিত ভাষায় প্রকাশ কর্‌তে পারছি না।" দোভাষী মাদামের উচ্ছ্বাসগুলি যেন ব্যক্ত কর্‌তে অক্ষম—তিনিও শ্রদ্ধানত হৃদয়ে বল্‌লেন, "মাদাম ভাবে বড় অভিভূত হ'য়ে পড়েছেন। তাঁর পুরাণো

স্মৃতি সব জেগে উঠেছে! স্বামিজীর এই ছবি দেখে মাদাম স্বামিজীকে যেন চ'খের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্ছেন।" দোভাষীর কথা শেষ হ'তে না হ'তে মাদাম অনর্গল ফরাসী ভাষায় তাঁর মনের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করতে লাগলেন। তখনও তিনি স্বামী বিবেকানন্দের ফটো বক্ষে চেপে রেখেছেন, দোভাষী হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাক্‌লেন—মাদাম কাল্‌ভে নিজেই মনের আবেগে ভাঙ্গা ইংরাজীতে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "স্বামী বিবেকানন্দ যীশু খ্রীষ্টের মত ছিলেন, যীশুর ন্যায় তাঁর সরলতা ছিল, যীশুর মত তাঁর জীবন প্রেমপূর্ণ পবিত্র সরস ছিল।" এই কথা বল্‌তে বল্‌তে আবার ফরাসী ভাষায় বল্‌তে লাগ্‌লেন। দোভাষী বল্‌লেন "মাদাম বল্‌ছেন—তাঁর জীবনের অতি শুভ মুহূর্ত্তে তিনি স্বামিজীর দর্শন ক'রেছিলেন। তিনি পাঁচ বছরের ছেলের মত পবিত্র ছিলেন। তাঁর সঙ্গেও লোকে পবিত্র হ'ত। ভগবৎ শক্তির প্রকাশমূর্ত্তি বিবেকানন্দ ছিলেন। তাঁর কি প্রবল আকর্ষণ ছিল—সে রকম আকর্ষণ আমি জীবনে অন্য কোথাও বোধ করিনি। কতদিন তাঁর কথা শুন্‌তে শুন্‌তে এত তন্ময় হ'য়ে গেছি যে কখন্ আমার স্পেশাল ট্রেণ এল—কখন্ চ'লে গেল—কিছু লক্ষ্য ছিল না। তাঁর পবিত্র সঙ্গের জন্য শুধু একবার নয়—বহুবার আমাকে অর্থদণ্ড দিতে হয়েছে। কিন্তু তা আনন্দের সঙ্গে দিয়েছি। কি বিশাল প্রেমপূর্ণ হৃদয়—কি অদ্ভুত পবিত্রতা—কি মোহন আকর্ষণ—কি মর্ম্মস্পর্শী বাণী—কি বালকসুলভ সরলতা—কি উন্নত উদার সঙ্গ—কি অপূর্ব্ব তেজপুঞ্জ মূর্ত্তি—কি সুন্দর বিশাল আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু!" দোভাষীরও চক্ষু সজল হ'য়ে উঠ্‌ল। মাদাম আবার ফরাসী ভাষায় তাঁর আকুল আকুতি—আনন্দের আবেগ জানালেন। যদিও ভাষা আমাদের অবোধ্য, কিন্তু সেই মর্ম্মবাণী—গভীর ভাবোচ্ছ্বাস—অন্তরের অব্যক্তবাণী শ্রোতাদের অন্তর স্পর্শ করেছিল—ভাব প্রবাহের কলধ্বনি অন্তরের সুরে সুরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল—স্বামিজীর পবিত্র তেজোদৃপ্ত বিরাট প্রেমপূর্ণ মূর্ত্তি সকলের সম্মুখে সজীব হয়ে উঠেছিল। সেই বিলাস-সজ্জিত কক্ষ তখন শ্রদ্ধা ও পূজার বিরাট আবহাওয়ায় ভ'রে গিয়েছিল।

ধীরে ধীরে পূর্ণবাবু সেই দোভাষীর মারফত মাদামকে বল্‌লেন, "যদি আপনি স্বামিজীর প্রতিষ্ঠিত বেলুড়মঠ দেখতে ইচ্ছে করেন তবে আমরা আপনার সুবিধামত বন্দোবস্ত কর্‌তে প্রস্তুত আছি।" মাদাম তা'তে বল্‌লেন, "স্বামী বিবেকানন্দের সমাধিস্থান কোথায়?" পূর্ণ বাবু তাঁর উত্তরে বল্‌লেন "বেলুড়মঠে।" পরদিন বেলা আড়াইটার সময়ে সমিতির একজন সভ্যকে তাঁর নিকট আস্‌তে বল্‌লেন, এবং সেই সময় তিনি বেলুড়মঠ দর্শন কর্‌তে যাবেন এই রকম ঠিক হ'ল। পূর্ণ বাবু আমাকে দেখিয়ে বল্‌লেন যে, "কাল ইনিই আস্‌বেন—আপনাদের পথপ্রদর্শক হ'য়ে।" বলা বাহুল্য এই সব কথাগুলোই দোভাষী মারফত।

আমরা সকলে মিলে মাদামের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এলাম। আমাদের পেছনে পেছনে দোভাষী এলেন এবং করমর্দ্দন ক'রে বিদায় নিলেন। যাবার সময় জিজ্ঞেস ক'রে গেলেন, "এখান থেকে বেলুড়মঠ কতদূর? ট্যাক্সি যায় কিনা? সময় কত লাগ্‌বে?" পূর্ণ বাবু যথাযোগ্য উত্তর দিয়ে পুনর্ব্বার করমর্দ্দন করে বিদায় নিলেন।

ডাক্তার কাঞ্জিলাল তৎক্ষণাৎ উদ্বোধন মঠে গিয়ে পূজনীয় স্বামী সারদানন্দজীকে সব কথা জ্ঞাপন কর্‌লেন। স্বামিজী শুনে আহ্লাদিত হ'লেন এবং তৎক্ষণাৎ মঠে সংবাদ পাঠালেন। এদিকে সুপ্রসিদ্ধ বংশীবাদক হাবুবাবুকে খবর দেওয়া হ'ল—তিনি তাঁর দলবল নিয়ে মঠে যাবেন তা স্থির হ'ল।

পরদিন ঠিক বেলা আড়াইটার সময় গ্রাণ্ড হোটেলে গিয়ে হাজির হ'লাম। সেই দোভাষী আমাকে সাদর সম্ভাষণ ক'রে সুসজ্জিত কক্ষে নিয়ে গেলেন। মাদাম মাথা নত ক'রে আমাকে অভিবাদন কর্‌লেন। ঠিক পাঁচ মিনিট পরে আরও কতকগুলি সাহেব মেম এলেন। মাদাম দোভাষী মারফত আমাকে জানালেন যে এঁরা চন্দননগরে থাকেন, এবং এঁরাও মাদামের সঙ্গে বেলুড়মঠে যাবেন। দু'খানা ট্যাক্সি ক'রে বেলুড়মঠ দর্শনে যাত্রা করা গেল।

আমি যে ট্যাক্সিতে স্থান পেয়েছিলাম—তাতে মাদাম এবং আর দুইটী ফরাসী মহিলা ছিলেন। এঁরা ফরাসীতে কথাবার্ত্তা বল্‌ছিলেন কিন্তু মাদাম কাল্‌ভে ছিলেন স্থির, ধীর, গম্ভীর।

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

ধীরে ধীরে ট্যাক্সি বেলুড়মঠে প্রবেশ করল—মঠের স্বামিজীরা এবং ভক্তেরা মাদামকে অভ্যর্থনা করতে অগ্রসর হয়ে এলেন। পূজনীয় স্বামী সারদানন্দকে দেখিয়ে আমি মাদামকে বললাম, "ইনি স্বামী সারদানন্দ—রামকৃষ্ণ মিসনের সেক্রেটারী—স্বামী বিবেকানন্দের গুরু-ভাই—স্বামী বিবেকানন্দের জীবিত কালে ইনি মার্কিনে বেদান্ত প্রচার করতে গিয়েছিলেন।" ইতিমধ্যে স্বামী সারদানন্দ মাদাম কাল্‌ভেকে এসে জিজ্ঞেস করলেন "মাদাম আমাকে চিনতে পারছেন?" দুজনে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেলেন—সঙ্গে সেই দোভাষী। অপর সাহেব মেমরা মাদামের পশ্চাদানুসরণ করতে লাগলেন।—

মাদাম সর্ব্বাগ্রে স্বামিজীর সমাধিস্থান দেখতে চাইলেন। স্বামী সারদানন্দজী স্বামিজীর সমাধি-মন্দিরের সম্মুখে নিয়ে গিয়ে বললেন—"এই স্থান।" মাদাম কাল্‌ভে অতি শ্রদ্ধাভরে সেই মন্দিরে প্রবেশ করলেন—অপর সাহেব মেমরা তাঁর সঙ্গে প্রবেশ ক'রে পাঁচ মিনিট পরে বাইরে এলেন, কিন্তু মাদাম ভিতরে রইলেন। আমরা বাইরে থেকে দেখতে পেলাম মাদাম স্বামিজীর প্রস্তর মূর্ত্তির সম্মুখে নতজানু হ'য়ে রয়েছেন। সকলেই নীরব—একটা গাম্ভীর্য্যের রেখা যেন সেখানে ফুটে উঠেছিল। সম্মুখে পূতসলিলা কলনাদিনী ভাগিরথীও কল্ কল্ গম্ভীরনাদে যেন সকলের অন্তর প্রতিধ্বনিত করছিল। দেখতে দেখতে পনর মিনিট চ'লে গেল—মাদাম সেই ভাবে নতজানু হ'য়ে র'য়েছেন—চোখে মুখে গণ্ড পবিত্র অশ্রুধারা বেয়ে পড়ছে। কি মহান্ পবিত্র দৃশ্য! কৌপীন-সম্বল ভিখারী সন্ন্যাসীর মর্ম্মর মূর্ত্তির চরণপ্রান্তে বিদেশিনী জগৎ-প্রসিদ্ধা শ্রেষ্ঠা গায়িকার নীরবে অশ্রুর অর্ঘ্যদান!

পরে মাদাম ধীরে ধীরে সে মন্দির থেকে বাইরে এলেন। স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে অগ্রণী ক'রে মাদাম ফরাসী মহিলা ও ভদ্রলোকদের সঙ্গে নিয়ে ঠাকুর ঘরে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মঠের ভক্ত দর্শকেরাও প্রবেশ করলেন।—সেখানে মাদাম কাল্‌ভে যখন নতজানু হ'লেন—তখন তাঁর সে গাম্ভীর্য্য নেই—তখন তিনি হাস্যময়ী আনন্দোৎফুল্লা। স্বামী সারদানন্দজীকে বললেন, "স্বামিজী একটী বৈদিক প্রার্থনা বলতেন, তার মানে—অন্ধকার থেকে আমাদের আলোকময় পথে নিয়ে চল। যদি জানেন—তবে সেই প্রার্থনা আপনি এখানে বলুন। আমার অত্যন্ত শুনতে ইচ্ছে হচ্চে।—" স্বামী সারদানন্দজী তাঁর সুমধুর গম্ভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন—

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্ম্মামৃতং গময়।

সকলেই সেই মুহূর্ত্তে যেন স্বতঃই ধ্যানস্থ হ'লেন। পরে পূজনীয় সারদানন্দ স্বামিজী মাদাম কাল্‌ভেকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "মাদাম! ঠাকুরকে আপনি এখানে গান শোনাবেন না?" মাদাম শ্রদ্ধানত হয়ে হাস্যমুখে স্বামী সারদানন্দজীর আদেশ গ্রহণ করলেন। মাদাম তাঁহার কলকণ্ঠে ফরাসী সঙ্গীত গাইলেন। যদিও সে সঙ্গীতের অর্থ আমাদের অবোধ্য—কিন্তু কি মধুর স্বরলহরী—যেন হঠাৎ হাজার বুল্‌বুল বন্যা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—সেই স্বরলহরী যেন মঠের স্নিগ্ধ গম্ভীর বায়ুস্তরকে কম্পিত ক'রে আন্দোলিত ক'রে এক আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত করলে। অর্থশূন্য ভাষাশূন্য বিহগকাকলী যেন প্রাকৃতিক অন্তর্বীণায় ধ্বনিত হ'ল। ঠাকুরঘর যেন নিকুঞ্জের পাখীর কূজনে মুখরিত হ'য়ে উঠলো! মাদাম পর পর দুইটী গান গাইলেন।

কিছুক্ষণ পরে সকলে ঠাকুরঘর থেকে নেমে নীচে এলেন। মাদামের অভ্যর্থনার জন্য মঠ ও ঠাকুরঘর সংলগ্ন প্রাঙ্গণে চেয়ার টেবিল সাজান ছিল। নীচে ফরাসে হাবু বাবু তাঁর দল নিয়ে ব'সে ছিলেন। পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ প্রমুখ স্বামিজীরা সম্মুখের বারান্দায় উপস্থিত ছিলেন। —সারদানন্দ স্বামিজী মাদাম কাল্‌ভেকে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট ব্রহ্মানন্দ স্বামিজীর সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিলেন। মাদাম তাঁর সঙ্গে করমর্দ্দন করলেন। পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজ মাদাম কাল্‌ভেকে এবং তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোক ও মহিলাদের বসতে বললেন, এবং কিছু ফলমূল মিষ্টান্ন প্রসাদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। মাদাম তাঁর আদেশ

শিরোধার্য্য ক'রে সকলে চেয়ারে বস্‌লেন এবং কিছু ফলমূল মিষ্টান্ন আহার করতে লাগ্‌লেন। সেই সময়ে হাবু বাবু কনসার্ট বাজালেন। মাদাম কাল্‌ভে হাবু বাবুর বংশীবাদন শুনে খুব মুগ্ধ হ'য়েছিলেন। তিনি দেশী গৎ ও গান শুন্‌তে চাইলেন। হাবু বাবু তাই বাজালেন। দেশী গানগুলি ইংরেজী নোটেশানে এনে তাঁকে দিতে অনুরোধ কর্‌লেন। পরে ধীরে ধীরে মাদাম কাল্‌ভে অতি বিনীতভাবে মঠের স্বামিজীদের কাছে বিদায় চাইলেন।

যেতে যেতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দত্তকে দেখে মাদাম কাল্‌ভে থম্‌কে দাঁড়ালেন। স্বামী সারদানন্দজীকে জিজ্ঞেস কর্‌লেন "উনি কে? অনেকটা স্বামিজীর চেহারার আদল্ আছে।" স্বামী সারদানন্দ বল্‌লেন "উনি স্বামিজীর সহোদর ভাই।" এই ব'লে সারদানন্দ স্বামিজী মহেন্দ্র বাবুকে ডাক্‌লেন। মাদাম মহেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞেস কর্‌লেন, "যখন স্বামিজীর সঙ্গে আমি কন্‌ষ্টান্টিনোপলে যাই—তখন আপনি সেখানে ছিলেন?" মহেন্দ্রবাবু বল্‌লেন "না। আপনাদের যাবার কিছু পূর্ব্বেই আমি সেস্থান ত্যাগ ক'রে-ছিলাম।" মাদাম কাল্‌ভে তাঁর সঙ্গে পরদিন বেলা ৩টা ৪টার মধ্যে দেখা কর্‌বার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানা্‌লেন।

গ্রাণ্ড হোটেলে পৌছে দেবার জন্য মাদাম আমাকে ট্যাক্সিতে বস্‌তে অনুরোধ করলেন। সূর্য্য তখন প্রায় অস্তগমনোন্মুখ—অস্তগামী সূর্য্য চারদিকে যেন ম্লান সোনার কিরণ ছড়িয়ে দিয়েছে—রাস্তায় যেতে যেতে আঁধার নেমে এল।

যখন আমরা গ্র্যাণ্ড হোটেলে পৌছলাম তখন চারি-দিকে রাস্তাঘাট বিদ্যুতের আলোকে আলোকিত। আমি মাদামের নিকট বিদায় গ্রহণ কর্‌বার সময় তিনি বল্‌লেন, "কাল আস্‌বেন ৩টা থেকে ৪ টার মধ্যে স্বামিজীর ভাইকে সঙ্গে নিয়ে। কাল আমার কন্‌সার্ট আছে।"

পরদিন মহীন বাবুর সঙ্গে গ্র্যাণ্ড হোটেলে গেলাম। —দোভাষী বেরিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে সেই সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে নিয়ে গেলেন। তিনি বিষণ্ণমুখে জানালেন, "মাদামের শরীর অসুস্থ। কাল মঠ থেকে আস্‌তে তাঁর ঠাণ্ডা লেগেছিল—তাইতে সর্দ্দি হ'য়েছে। বড় কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গী ডাক্তার তাঁকে ঔষধ দিচ্ছেন। সর্দ্দির দরুণ তাঁর গান ঠিক হবেনা ব'লে আজকের কনসার্ট বন্ধ করতে বলেছেন—তাদের টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন। আজ রাত্রেই আমরা কল্‌কাতা ত্যাগ ক'রে যাব।"

মহীনবাবু বল্‌লেন, "মাদামের অসুস্থতা শুনে আমরা দুঃখিত হ'লাম। আমরা এখন বিদায় নিচ্ছি।" দোভাষী তাড়াতাড়ি বল্‌লেন,—"একটু অপেক্ষা করুন, আপনারা এসেছেন তা মাদামকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথা শুনে বিদায় নেবেন।"

এমন সময়ে একজন ফরাসী মহিলা তাড়াতাড়ি এসে ফরাসী ভাষায় আস্তে আস্তে দোভাষীকে কি বল্‌লেন। দোভাষী আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "মাদাম শয্যায় শায়িতা আছেন, পীড়িতা ব'লে তিনি উঠে এসে আপনাদের সাক্ষাৎ করতে পারছেন না—তাই তিনি ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি তাঁর শয্যাকক্ষে আপনাদের ডাক্‌ছেন।"

আমরা ধীরে ধীরে মাদাম কাল্‌ভের শয্যাগৃহে প্রবেশ কর্‌লেম। একটী পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপরে তিনি শায়িত ছিলেন। আমরা নত হয়ে তাঁকে অভিবাদন ক'রে দাঁড়ালেম। তিনি মহীনবাবুকে দেখে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বল্‌লেন, "আপনি এসেছেন—বড় সুখী হ'লাম। মঠ থেকে ফিরে আস্‌বার সময় ঠাণ্ডা লেগে বড় সর্দ্দি হয়েছে, আজ বম্বে মেলে কল্‌কাতা ত্যাগ কর্‌বো।"

এই ব'লে মাদাম অর্দ্ধশায়িত ভাবে বালিসে হেলান দিতে উঠ্‌লেন। সেই সময় দেখ্‌তে পেলাম স্বামিজীর ফটোগুলি—যা আমরা বিবেকানন্দ সমিতি থেকে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেম—বিছানায় ছড়িয়ে পড়্‌লো। এই পীড়িত অবস্থায় তিনি তাঁর নির্জ্জন শয্যাকক্ষে ছবিগুলি বক্ষের উপরে রেখে দিয়েছিলেন—তাই দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। স্বামিজীর প্রতি এই শ্রেষ্ঠা গায়িকার—এই বিদেশিনী মহিলার কি প্রাণঢালা অনুরাগ! কি অসীম ভক্তি! মাদাম কাল্‌ভে ধীরে ধীরে সেই ছবিগুলি একে একে দেখে

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

আবার তাঁর বক্ষের উপরে রাখ্‌লেন। পরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "কি আনন্দে কাল বেলুড় মঠে কাটালেম। বড় আনন্দ পেয়েছি—কাল আমার জীবনের একটী স্মরণীয় দিন। কখনও ভুল্‌তে পার্‌বো না।"

আমি বল্‌লাম "মাদাম! যদি কাল একটু আগে আস্‌তেন তবে বোধ হয় এই অসুখ হ'ত না।"

মাদাম বল্‌লেন, "এই সর্দ্দিতে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইনি। কাল মঠে যেন একটী সঙ্গীতের সুরের মত—কবিতার কাব্যালোকের মত কেটেছে। স্বামিজীর সমাধি-স্থান দর্শন করেছি! মঠের স্বামিজীদের—স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাইদের দর্শন করেছি!—কি পবিত্র শান্তিময় স্থান!" ব'লে মাদাম একটী বন্ধকরা খাম বালিসের নীচে থেকে তুলে নিয়ে মহীনবাবুকে দিয়ে বল্‌লেন "মঠে দিবেন—স্বামিজীদের জন্য।" মহীনবাবু মাদামের সাম্‌নেই সেই খামটী আমাকে দিয়ে বল্‌লেন "শরৎ মহারাজকে দিও।" আমরা বিদায় নিতে চাইলেম—মাদাম ধীরে ধীরে বল্‌লেন,—"আমি বড় আনন্দিত হ'লাম। স্বামীজীর কথা আর কি বল্‌বো—তাঁর ধ্যানে তাঁর বাণীতে মানুষ নূতন জীবন গ'ড়ে তুল্‌তে পারে। জগতের পতিত দুর্ব্বল পদদলিত দরিদ্র ব্যথিতদের জন্য কি অগাধ প্রেম! কি বিরাট সহানুভূতি! বর্ত্তমানকালে তিনি খ্রীষ্টের মত মানবজাতির পরিত্রাতা—নবযুগের প্রবর্ত্তক।"

আমরা নত হ'য়ে তাঁর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে এলাম।

পথে আস্‌তে আস্‌তে মনে হ'ল—স্বামিজীর কি অলৌকিক প্রভাব—কি অদ্ভুত তাঁর ব্যক্তিত্ব! কোথায় পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়িকা—পাশ্চাত্য ভোগবিলাসবর্দ্ধিতা—রাজাবাদশাহ আদির আদৃতা—প্রচুর ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারিণী এই ফরাসিনী নারী—আর কোথায় সর্ব্বত্যাগী কৌপীন-সম্বল আকুমার ব্রহ্মচারী বেদান্তমূর্ত্তি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। আজ কত বছর অতীত হ'ল স্বামিজীর দেহত্যাগ হয়েছে, কিন্তু তাঁর পবিত্র সংস্পর্শে এমন একটী ব্যক্তিত্বের—একটি আদর্শের ছাপ এই ফরাসিনী মহিলার অন্তরে অঙ্কিত ক'রে গেছেন যে, শত সহস্র ভোগ বিলাস আরাম ঐশ্বর্য্যের আবহাওয়ার মাঝখানেও তিনি তা ভুল্‌তে পার্‌ছেন না। মানব পরিত্রাতা যীশুর মতই সেই মহাপুরুষের ভিতর পবিত্রতা, সরলতা ও জীবন্ত আদর্শ দেখ্‌তে পেয়ে এই শ্রেষ্ঠ গায়িকা রমণী তাঁর অন্তরের একান্ত শ্রদ্ধা ভক্তি ও অনুরাগ স্বামিজীকে অর্পণ ক'রেছেন। আমরা বাঙালী—আমরা ভারতবাসী আজও বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি যে স্বামিজী সমগ্র জগতে—কি ইউরোপে, কি আমেরিকায়, কি এই প্রাচ্য-দেশে—ভাবী সভ্যতার কি মহাবীজ উপ্ত ক'রে রেখে গেছেন, যা কালে মহামহীরুহ হয়ে প্রকাশ পাবে—যা কোনও সংকীর্ণ-গণ্ডী বা পাঁচিলে আবদ্ধ থাক্‌বে না—যার ছায়াতলে বিশ্বের সন্তাপিত নরনারী বিমল প্রেমের মৃদুমন্দ হিল্লোলে পরম শান্তিতে ও আনন্দে সম্মিলিত হবে।

ফললাভ

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

প্রথম দৃশ্য

[কৃপণ রামধনের বাড়ী, তালা দেওয়া। সামনে খুব বড় বাগান, নানান ফলফুলে ভরা। রামধন গেছে তারকেশ্বরে মানত করতে যাতে সে মকদ্দমায় জেতে। গাঁয়ের একটি প্রান্তে নিরিবিলি এই বাগানে একদল ছোট ছোট ছেলে মেয়ের আবির্ভাব। প্রথমে একটি ছোট ছেলের গান গাইতে গাইতে প্রবেশ।]

বসন্ত তার গান তার গান লিখে যায়
ধূলির পরে কি আদরে!
তাই সে ধুলা উঠে হেসে বারে বারে,
নবীন বেশে বারে বারে;
রূপের সাজি আপনি ভরে কি আদরে।
তেম্নি পরশ লেগেছে মোর হৃদয়তলে,
সে যে তাই ধন্য হ'ল মন্ত্রবলে,
তাই প্রাণে কোন্ মায়া জাগে বারে বারে,
পুলক লাগে বারে বারে;
গানের মুকুল আপনি ধরে কি আদরে!

প্রথম

ভাই, আয়না ভাই, দেখ্না কি সুন্দর ফুল ফুটেচে বাগানে!

দ্বিতীয়

হ্যাঁ ভাই কি সুন্দর আর কি ঠাণ্ডা এ জায়গাটা আর—

তৃতীয়

ওরে, এযে ভাই রামধনের বাগান, সে দেখ্তে পেলে আমাদের আর আস্ত রাখ্বেনা।

দ্বিতীয়

যাঃ, তুই ভাই খালি খালি সব্তাতেই বাধা দিস্। না চল্ আরো আরো ভিতরে যে মধুমালতী লতা আছে তার উপরে চ'ড়ে দুলিগে!

[মধুমালতী লতার চারধারে ছেলেমেয়েদের নৃত্য আরগান]

মোরা নাচি ফুলে ফুলে
দুলে দুলে,
মোরা নাচি সুরধুনীর
কুলে কুলে,

[গান শেষ না হ'তে হ'তেই]

তৃতীয়

ভাই দেখ্ তোরা থাম্—

দ্বিতীয়

কেন?

তৃতীয়

কেন? একে পরের বাগান তায় কিপ্টে রেমোর।

দ্বিতীয়

তাতে কি হয়েচে? সে আমাদের খেয়ে ফেল্বে নাকি?

তৃতীয়

আরে বুঝ্চিসনে, রেমো কিপ্টের বাগান তাই বলচি!

প্রথম

ভাই, অটাকে নিয়ে আর খেলা হবে না—ভাই ও সবতাতেই বাধা দেয়। ওর সঙ্গে সবাই আড়ি করে দে, (কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই শিশুর দল "আড়ি" "আড়ি" বলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠ্ল)

তৃতীয়

(লজ্জিত ভাবে) আরে রামধন টের পেলে—

দ্বিতীয়

আরে টের পেলে ত কি হয়েচে?

প্রথম

আয় ভাই, আয় আমরা আবার নেচে নেচে ফাগুনীর সেই গানটা গাই!

ফললাভ

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

[ছেলেমেয়েদের গান]

ওরে ভাই ফাগুণ লেগেছে বনে বনে,—
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে,
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।
রঙে রঙে রঙিল আকাশ,
গানে গানে নিখিল উদাস,
যেন চল-চঞ্চল নব পল্লবদল
মর্ম্মরে মোর মনে মনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে।

হের হের অবনীর রঙ্গ,
গগনের করে তপোভঙ্গ।
হাসির আঘাতে তা'র, মৌন রহেনা আর,
কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
বাতাস ছুটিছে বনময় রে,
ফুলের না জানে পরিচয় রে,
তাই বুঝি বারে বারে, কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে,
সুধায়ে ফিরিছে জনে জনে,
ফাগুন লেগেছে বনে বনে।

তৃতীয়

ভাই মনি তুই থাম্ নইলে আমাদের মহা বিপদে—

দ্বিতীয়

আরে আবার বিপদ বিপদ করচে জটা!

প্রথম

নাঃ ওর কথা শোনা হ'বেনা।

তৃতীয়

আমরা আবার—আবার—ফের—ফের অনেক গান গাইব!

[এমন সময় ফুলের ডালা হাতে বনদেবীর আবির্ভাব]

বনদেবীর গান

কমল-বনের মধুপরাজি
এসহে কমল-ভবনে।
কি সুবাগন্ধ এসেচে আজি
নব বসন্ত-পবনে।
কমল চরণ ঘেরিয়া পুলকে
শত শতদল ফুটিল।
বারতা তাহারি দ্যুলোকে ভুলোকে—
ছুটিল ভুবনে ভুবনে।
গ্রহ তারকার কিরণে কিরণে
বাজিয়া উঠেছে রাগিণী,
গীত গুঞ্জন কূজন কাকলি
আকুলি উঠিছে শ্রবণে।
সাগর গাহিছে কল্লোলগাথা,
বায়ু বাজাইছে শঙ্খ,
সামগান উঠে বন পল্লবে,
মঙ্গলগীত জীবনে।

বনদেবী

কে ভাই তোমরা এখানে এসেচ এই কৃপণের বাগানে?

প্রথম

আমরা গোয়ালপাড়ার ছেলেমেয়ের দল, এখানে খেল্‌তে এসেচি।

বনদেবী

দেখ, আমি এই বাগানেই থাকি, তোমাদের সাড়া পেয়ে খেলা দেখতে ছুটে এসেচি!

দ্বিতীয়

তুমি খেলনা? এস আমাদের সঙ্গে খেল্‌বে এস।
(বনদেবীর হাত ধরে ছেলেদের টানাটানি)

বনদেবী

খেলতে গেলে বাগানের মালিক রাগ করেন।

প্রথম

রাগ করেন কেন?

বনদেবী

তিনি রাগ করেন আর বলেন, খালি যদি ফুলই বাগানে ফোটে ত তা'তে তিনি ফল খেতে বঞ্চিত হন।

কি আশ্চর্য্য! তিনি কি কেবল ফল খেতেই চান? ফুল তিনি ভালবাসেন না?

বনদেবী

না ভাই তিনি ফুল দুচক্ষে দেখতে পারেন না। তাই তিনি বলেন খেলা করাতো হ'ল ফুলের মত ব্যর্থ জিনিষ, কাজই হ'ল ফল।

প্রথম

তিনি তাই বুঝি খেটে খেটে লোহার সিন্দুক বোঝাই করচেন।

বনদেবী

শুধু বোঝাই নয়, সুদেরও সুদ পর্য্যন্ত আদায় করচেন।

দ্বিতীয়

অত টাকা ধনদৌলৎ নিয়ে একলা তিনি করেন কি?

বনদেবী

কি করেন? কিছুই না!

তৃতীয়

তবে কেন টাকা জমান?

বনদেবী

জমাবার আনন্দেই জমান, ছেলে মেয়ে ত নেই যে পরে ভোগ করবে?

প্রথম

কোনো গরীবের ছেলেকে কাছে রেখে কেন মানুষ করেন না?

বনদেবী

গরীবের ছেলে আর বড় লোকের ছেলে—ছেলে মেয়ে মাত্রই—তার দু চক্ষের বিষ!

প্রথম

আমাদের দেখ্‌লেও তিনি রাগ করবেন?

বনদেবী

সুধু রাগ? তোমাদের তাঁর বাগানে ঢুকতেই দেবেন না।

দ্বিতীয়

রামধন যতদিন না আসবেন ততদিন তাহ'লে আমাদের কি মজা হ'বে!

প্রথম

আমরা রোজ এখানে খেলতে আসব।

বনদেবী

তা' বেশত! আমিও বেশ তো'মাদের সঙ্গী পাব।

দ্বিতীয়

রেমো কিপ্পণের ভাব্‌না না ভেবে এখন আয় ভাই আমরা খেলা করি আর গান গাই।

প্রথম

ঐ ভাই দেখ দেখ, কেমন একটি ছোট্ট পাখী গাছের সবুজ পাতার আড়ালে ব'সে রাঙা ঝোটন দুলিয়ে কেমন গান গাইচে। আমরাও ওদের মত মনের আনন্দে গান গা'ইব।

(ছেলেদের গান)

ওদের সাথে মেলাও, যারা
চরায় তোমার ধেনু।
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু।
পাষাণ দিয়ে বাঁধা ঘাটে,
এই যে কোলাহলের হাটে,
কেন আমি কিসের লোভে এনু।
কি ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি,
কার ইসারা তৃণের অঙ্গুলি!
প্রাণেশ আমার লীলাভরে,
খেলেন প্রাণের খেলাঘরে,
পাখীর মুখে এই যে খবর পেনু॥

তৃতীয়

চল, চল ভাই মাষ্টার আসবে বাড়ী চল্!

দ্বিতীয়

আবার মাষ্টার, রেমো কিপ্পণ, দানা দৈত্যি কত যে জুজুর ভয় দেখাবে এই জটা!

প্রথম

নাঃ, চল্ আজ বেলা হ'য়ে গেছে।

(ছেলেদের গান গাইতে গাইতে প্রস্থান)

চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে'।
পথের প্রদীপ জ্বলে গো
গগন তলে।
বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি,
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,
রঙিন বসন উড়িয়ে চ'লি
জলে স্থলে।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

পথিক ভুবন ভালবাসে
পথিক জনেরে।
এমন সুরে তাই সে ডাকে
ক্ষণে ক্ষণে রে।
চলার পথের আগে আগে,
ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে,
চরণ ঘায়ে মরণ মরে
পলে পলে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কৃপণ রামধন তাগা তাবিজ হাতে বেঁধে মালা জপ্‌তে জপ্‌তে ঘরে ফিরচে। বাগানে প্রবেশ করেই—]

রামধন

সব নয় ছয় ক'রে দিয়ে গেছে ব্যাটারা! বাগানটার একটা মজবুৎ বেড়া না দিলে নয় দেখ্‌চি। ওরে নব?

নব

এজ্ঞে!

রামধন

হতভাগা, বাগানে আবার ফুল গাছের চাষ করা হয়েচে?

নব

এজ্ঞে চাষ নয়, বাগান্ হয়েচে!

রামধন

ফের মুখের উপর জবাব, ফলটলের নাম নেই, কেবল যত সব লাল নীল হলুদের বাহার! যা' এক্ষুণি যত ফুলগাছ আছে সব ছিঁড়ে দে! আর বাগানের চারপাশে খুব উঁচু বেড়া লাগিয়ে "প্রবেশ নিষেধ" লিখে দে।

(নবর প্রস্থান)

রামধন

(স্বগত) পিতোম যদি টাকায় চার আনা দেয় ত বেশ হয়। তাহ'লে আমার কানাইয়ের টাকার সুদ, নেপালের সুদ, বাতাসী ময়রাণীর সুদ সব মিলিয়ে অনেক গণ্ডা সুদ হবে। কিন্তু—

[এমন সময় সহসা ছেলের দলের গান গাইতে গাইতে প্রবেশ]

ও আমাদের ভয় কাহারে?
বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতে,
ও আমাদের ভয় কাহারে?
বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতে,
কি আমাদের কর্‌তে পারে?
আমাদের রাস্তা সোজা, নাইক গলি,
নাইক ঝুলি, নাইক থলি,
ওরা আর যা কাড়ে কাড়ুক, মোদের
পাগ্‌লামি কেউ কাড়বে নারে।
আমরা চাইনে আরাম, চাইনে বিরাম,
চাইনে যে ফল, চাইনেরে নাম,
মোরা ওঠায় পড়ায় সমান নাচি,
সমান খেলি জিতে হারে,
আমাদের ভয় কাহারে?

রামধন

ওরে নব, ওরে জগা, কে কোথায় আছিস্‌রে—ধর্ তোরা ধর্ ঐ ছেলেগুলোকে ধর্‌ত!

[বেগে ছেলেদের পিছন পিছন ধাবমান]

ছেলেদের দল

ওরে, রেমো কেপ্পণ ক্ষেপেচেরে—পালা, পালা—

(বেগে প্রস্থান)

[রামধন ছেলেদের তাড়িয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাগানের বেড়া দেওয়ার তদারক করতে গেল। গিয়ে দেখে নব বেড়া দিয়েচে কিন্তু রামধনের কিছুতেই আর পছন্দ হল না। এমন সময় পুনরায় ছেলের দলের গান গাইতে গাইতে বেড়ার বাইরে আবির্ভাব।]

[ছেলেদের নেপথ্যে গান]

আজ সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে।
ওগো আমার প্রিয়,
তোমার রঙিন উত্তরীয়
পর পর পর তবে।
মেঘ রঙে রঙে বোনা,
আজ রবির রঙে সোনা,
আজ আলোর রঙ যে বাজ্‌ল পাখীর রবে।
আজ রঙ সাগরে তুফান ওঠে মেতে।
যখন তারি হাওয়া লাগে,
তখন রঙের মাতন জাগে,
কাঁচা সবুজ ধানের ক্ষেতে।

সেই রাতের স্বপন-ভাঙা,
আমার হৃদয় হোক্না রাঙা,
তোমার রঙেরি গৌরবে।

(নেপথ্যে)

প্রথম

ভাই এ যে সব বেড়া দেওয়া, কোনো দিকে আর পথ নেই।

দ্বিতীয়

তাইত রেমো এর মধ্যেই বেড়া দিয়ে ফেলেচে দেখচি?

তৃতীয়

তোদের ত ভাই আগেই বলেছিলুম রেমো কেপ্পণের বাগান, আমাদের সে আর ঢুক্‌তে দেবেনা মৎলব করে বেড়া দিয়েচে।

দ্বিতীয়

তা' বেশ ত। আমরা বেড়ার আনাচে কানাচে গান গেয়ে গেয়ে বেড়িয়ে ওর কান ঝালাফালা করে দেব—দেখি ও কি কর্‌তে পারে!

প্রথম

আয় আমরা কবির সেই দখিন হাওয়া গানটা গাই!

তৃতীয়

না ভাই আর কাজ নেই রেমো আবার শেষটা তাড়া করবে?

দ্বিতীয়

তোর ভাই সব তাতেই ভয়, তাড়া যদি করে তখন খাড়া পিট্টান দেওয়া যাবে—কি বল ভাই!

প্রথম

ধর, তাহ'লে গান ধর :—

ওগো দখিণ হাওয়া, পথিক হাওয়া,
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে;
নূতন পাতার পুলক ছাওয়া
পরশখানি দাও বুলিয়ে।
আমি পথের ধারে ব্যাকুল-বেণু,
হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু,
আহা, এস আমার শাখায় শাখায়
প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে।
ওগো দখিণ হাওয়া, পথিক হাওয়া,
পথের ধারে আমার বাসা,
জানি তোমার আসা-যাওয়া,
শুনি তোমার পায়ের ভাষা।

[রামধন আর থাকতে না পেরে একটা বেড়ার বাঁশ খুলে নিয়ে ছেলেদের পিছন পিছন তাড়া করলে—ছেলেরা কোলাহল করে পালাল]

রামধন

(স্বগত) তাইত বাগানে বেড়া দিয়ে ত ব'সে আছি, কিন্তু কৈ, গাছগুলো যে একেবারে শুকিয়ে উঠেচে—মহা বিপদেই পড়লুম। ভেবেছিলুম এবার সুদের টাকাও ছোঁবনা। ফলপাকুড় বেচে এবছরটা চালাব, তা দেখচি আর হ'তে দিলে না। নব ও নব—

[নবর প্রবেশ]

নব

এজ্ঞে কর্ত্তা!

রামধন

নিতাইকে ডেকে আন্।

নব

যেজ্ঞে। (প্রস্থান)

রামধন

(স্বগত) নিতাই এলে তার সঙ্গে একটা পরামর্শ আঁটতে হ'বে, নইলে আর পারা যাচ্চে না।

(নামাবলি গায়ে, টিকি, কণ্ঠি আর চন্দনের তিলকে গায়ময় বাঘ-ছাপ এঁকে নস্যি নিতে নিতে নিতাইয়ের প্রবেশ)

রামধন

এই যে নিতাই এস ভায়া!

নিতাই

হ্যাঁ তা ডাকাও হচ্চে আবার দোর গোড়ায় পাছে কেউ আসে ব'লে "প্রবেশ নিষেধ" ও টাঙিয়ে দেওয়া হয়েচে—বলি ব্যাপার কি?

রামধন

ভাই সহজে করিনি, দায়ে পড়েই অত টাকা অপব্যয় করে বেড়া দিয়েচি আর "প্রবেশ নিষেধ" তক্তি এঁটেচি।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

নিতাই

খুব তীর্থ ক'রে এলে তা হ'লে?

রামধন

হাঁ, বাবা, তারকেশ্বরের দুয়ারে ধন্না দিয়ে এলুম।

নিতাই

কেন? আবার কি হ'ল? আমায় ডাকা হয়েচে কেন?

রামধন

আর হবে কি? যত সব পাড়ার ছেলেমেয়েগুলো জুটে আমার বাগানে আর কিছু হ'তে দিলে না। গাছপালাগুলো ওদের জ্বালায় শুকিয়ে উঠেচে ভাই!

নিতাই

হাঁ, তাইত, তাইত! ভাববারই কথা!

রামধন

আমি কোথায় ভাব্‌লুম এবছর ফল পাকুড়-বেচে চালাবো, তা' আর হ'তে দিলে না। এখন করি কি?

নিতাই

তাইত ভাববারই কথা!

রামধন

না ভাই, ভেবে চিন্তে বল এখন এর কি বিহিত করি!

নিতাই

তাইত হে, বেশ ভাবতে হবে দেখচি!

রামধন

এই দেখনা আমিও বাবা তারকেশ্বরের দুয়োরে ধন্না দিতে গেছি, আর নব ব্যাটাও বাগান বাড়ী ঘর সব ছেড়ে স'রে পড়েচে!

নিতাই

তাইত বড়ই অন্যায়!

রামধন

আর কোথা থেকে সব ছেলেগুলো ঢুকে সব ছারখার ক'রে দিয়ে গেল!

নিতাই

হায়! সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!

রামধন

নিজের হাতে সব লাগালুম ফল খাব বলে তা' নোলার জল নোলাতেই শুকোলো, গাছগুলোকে শুকোতে দেখে।

নিতাই

আহাঃ তাইত, তাইত!

রামধন

এখন ভায়া বল কি করি!

নিতাই

তাইত বলা বড় শক্ত!

রামধন

দেখ বাগানের বেড়া দিয়ে অবধি আর ছেলেদের উৎপাৎ নেই বটে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে ফল ফুলেরও বালাই গেছে!

নিতাই

তাইত, সেই ত যত রোগের সূত্রপাত।

রামধন

তবে এখন কি করি বল ত?

নিতাই

(অগ্রাহ্য ভাবে) আরে গোপালপুজোকর—গোপালপুজো!

রামধন

সে কি? আমায় তুমি গোপালপুজো করতে বল? বালককালে পত্নীবিয়োগ হয়েছিল, পুন্নাম নরকোদ্ধারের জন্যেও আর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিনি, ওদেরই ভয়ে।

নিতাই

আরে এখন এই সব গোপালদের তুমি ঠেকাতে পারবে না—গোপালই গোপালদের ঠেকিয়ে রাখবে। বিষে বিষক্ষয় হয় এটা শাস্ত্রের কথা, বুঝলে কিনা?

রামধন

না হে নিতাই, রসিকতা ছেড়ে আমায় একটা সৎ-পরামর্শ দাও দেখি।

নিতাই

না, আমি চালাকি করচিনে, গোপালপুজো ক'রেই একবার দেখনা?

রামধন

আচ্ছা তা' বেশ !

[শুক্‌নো বাগানের বেড়ার বাইরে বাইরে ফিরে ফিরে বনদেবীর গান]

কে দিল আবার আঘাত আমার
দুয়ারে !
এ নিশীথ কালে, কে আসি দাঁড়ালে,
খুঁজিতে আসিলে কাহারে ॥
বহুকাল হ'ল বসন্ত দিন,
এসেছিল এক অতিথি নবীন,
। জীবন করিল মগন
অকুল পুলক-পাথারে ॥
আজি এ বরষা নিবিড় তিমির,
ঝর ঝরে জল, জীর্ণ কুটির
বাদলের বায়ে, প্রদীপ নিবায়ে
জেগে বসে আছি একারে।
অতিথি অজানা, তব গীতসুর,
লাগিতেছে কানে ভীষণ মধুর,
ভাবিতেছি মনে, যাব তব সনে,
অচেনা অসীম আঁধারে ॥

রামধন

আঃ জ্বালালে ! ঐ দেখনা, সাঁকচিন্নির দল আমায় খেয়ে ফেল্লে। বেড়া দিয়ে দিলুম তাতেও নিস্তার নেই—বাইরে বাইরে ঘুরে ঘুরে গান গেয়ে বেড়াচ্চে !

নিতাই

না ভাই, আমার সব সহ্য হয়, হয়না ঐ গান ; আজ চল্লুম রামুদা।

রামধন

না ভাই, আমার প্রাণ বাঁচান দায় হয়েচে, এরা দেখ্‌চি আমায় ভিটেছাড়া ক'রে তবে ছাড়বে !

নিতাই

তা' ঐ যা' বল্লুম তাই কর। গোপালপুজো কর।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[নাড়ুগোপালের মূর্ত্তির সামনে রামধন চোক বন্ধ করে হাতযোড় করে উপবিষ্ট ; সামনে পুজোর ধূপ তৈজসপত্র ইত্যাদি রাখা]

[গোপালের ধ্যান]

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তম।
নমস্তে সর্ব্বলোকাত্মন্ নমস্তে তিগ্মচক্রিণে ॥
নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণহিতায়চ।
জগদ্ধিতায় গোপালায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥
ব্রহ্মত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ।
রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমস্তুভ্যং গোপালয়ে ॥

[হঠাৎ চোখ খুলে দেখে গোপাল হাসচে আর গান গাইচে]

[গোপালের গান]

আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব।
খেলব কত ছুটাছুটি বাঁশি বাজাব।
আমি খেলতে বড় ভালবাসি,
ছুটে ছুটে তাইত আসি,
মনের মত খেলার সাথি
কতই জুটাব।

রামধন

গোপাল ! গোপাল ! তুমিই সেই গোপাল, তোমাকেই আমি ছেলেদের সঙ্গে তাড়িয়েছিলুম ? এস কোলে এস, বুকে এস ! আমি আর তোমাদের তাড়াবার জন্যে বেড়া দিয়ে রাখব না।

[রামধন গোপালকে কোলে তুলে নিলে]

রামধন

বল গোপাল তোমার কি চাই ?

গোপাল

হাঁ আমি চাই যেন তোমার বাগানে আর বেড়া দেওয়া না থাকে, সব ছেলে মেয়েরা মনের আনন্দে অবাধে আসতে পারে।

রামধন

নব !

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

নব

এজ্ঞে !

রামধন

যাও, তালা খুলে এক্ষুনি সব বেড়া ভেঙে দাও। কোনো বাধা আর রেখোনা ছেলেদের জন্তে।

নব

যেজ্ঞে

(প্রস্থান এবং বেড়া ভাঙার শব্দ)

[এমন সময় ছেলের দলের প্রবেশ]

[ছেলেদের গান]

আমরা খুঁজি খেলার সাথী,
ভোর না হ'তে জাগাই তাদের,
ঘুমায় যারা সারারাতি।
আমরা ডাকি পাখীর গলায়,
আমরা নাচি বকুলতলায়,
মন ভোলাবার মন্ত্র জানি,
হাওয়াতে ফাঁদ আমরা পাতি।
মরণকে ত মানিনে রে,
কালের ফাঁসি ফাঁসিয়ে দিয়ে
লুট করা ধন নিইযে কেড়ে।
আমরা তোমার মনোচোরা,
ছাড়ব না গো তোমায় মোরা,
চলেচ কোন্ আঁধার পানে,
সেথাও জ্বলে মোদের বাতি।

রামধন

(গোপালকে কোলে ক'রে বাইরে এসে) এই যে, এস গোপালের দল সব, এস আমার বাড়ী আলো কর। এস—

[রামধনের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই গোপাল তার কোল থেকে লাফিয়ে পড়ে ছেলেদের দলে গিয়ে নাচতে নাচতে পালাল]

ছেলেদের দল

ওরে পালা পালা, রেমো কেপ্পণ—রে, পালা পালা !

[গোপাল পালাতে গিয়ে পিছিয়ে পড়ে একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কান্না জুড়ে দিলে। রামধন তাকে আবার কোলে তুলে নিতেই বাগান পুনরায় ফুল ফলে ভরে উঠল।]

চতুর্থ দৃশ্য

[রামধন বাগানের সামনে নিজের কুটিরের দাওয়ায় গোপালকে নিয়ে খেলা করচে। এমন সময় নিতাই উপস্থিত]

নিতাই

কৈ রামুদা' বাড়ী আছ ?

রামধন

কে, নিতাই নাকি ?

নিতাই

হ্যাঁ, কি হ'ল ? খুব যে বাগানের বাহার খুলেচে ! নানান রঙের ফুলে যেন আগুন ধরে গেছে। ব্যাপার কি ?

রামধন

আরে ভাই, সবই এই গোপালের ইচ্ছে !

নিতাই

আরে তাঁরই ইচ্ছাতে ত সবই হয়, তাইত ফুল থেকেই ফল ফলে, কেবল শুক্‌নো ডালে ত আর ফল গজায় না ?

রামধন

যাহোক্ ভাই তোর কথাটা না শুন্‌লে আজ আমায় ঐ শুক্‌নো গাছের মতই দেখতে পেতিস্—

নিতাই

ভাল কথা, পদিপিসীর টাকার সুদটা কি—

রামধন

আরে ভাই সুদ-টুদ থাক্, আমি এখন সুদের সুদ যা' পেয়েচি তাতেই মনের আনন্দে আছি।

নিতাই

আরে সেই কৈলেশ যে টাকা কটা—

রামধন

থাক্ থাক্ কৈলেশ বেচারী ছাঁপোষা লোক, না হয় দিতে নাইবা পারলে।

নিতাই

না—বলচি কি যদি—

রামধন

না থাক্ ভাই ওসব কথা, শোন আমার গোপালের কথা শোন।

নিতাই

আরে কাজের কথাটা না হয় সেরেই নেওয়া যাক্‌না।

রামধন

না ভাই, কাজ আমার এই গোপালকে পেয়েই চুকেচে। সব কাজ এখন থেকে তার জন্যেই করি, আর তাতেই বেশ আনন্দে আছি।

নিতাই

তা' ঐ কৈলেশের—

রামধন

না, কৈলেশের জন্যে আর ভাব্‌না নেই!

নিতাই

তাহ'লে রইল তোমার ভাব্‌না, তুমি ভাবগে, আমি চল্লুম! (রেগে বেগে প্রস্থান)

[রামধন বাগানের দিকে ফিরে দেখে যে বাগানের ভিতর একটা গাছ সোনা হ'য়ে গেছে আর তার ডালে ডালে রঙিন ফুলে ভ'রে উঠেচে। তার নীচে ফুলের সাজপরা একটি মেয়ের কোলে বাঁশী হাতে গোপাল আর তাদের ঘিরে সব ছেলেমেয়েদলের নৃত্যগীত]

গান

হেদেগো নন্দরাণী
মোদের শ্যামকে ছেড়ে দাও,
আমরা রাখাল বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে,
হের গো প্রভাত হ'ল,
সূর্য্যি ওঠে—
ফুল ফোটে যে বনে।
আমাদের শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব
আজ করেচি মনে;
পীত ধড়া পরিয়ে তারে
কোলে নিয়ে আয়,
হাতে দিও মোহন বেণু
নূপুর দিও পায়।
রোদের বেলায় গাছের তলায়
নাচব মোরা সবাই মিলে,
বাজবে নূপুর রুমু ঝুমু
বাজবে বাঁশী মধুর রোলে।
বনফুলে গাঁথব মালা
পরিয়ে দেব শ্যামের গলে॥

যবনিকা।

ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস
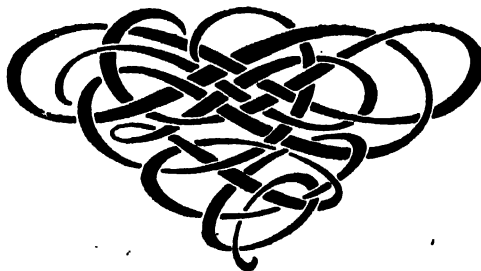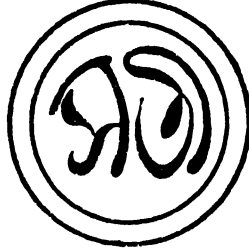
(২৩)

যেদিন সুরমার কাছে জ্যোতি বিলাসের দানের কথা বলিয়াছিল সেদিন সুরমা কথাটা শুনিয়া মন ভার করিয়াছিল। বিলাসের উপর তার যে মর্ম্মান্তিক বিরুদ্ধতা তাহা ক্ষমা জানিত না, তাই সুরমা কথাটায় প্রসন্ন হইতে পারে নাই। সুরমার মুখ কাল দেখিয়া জ্যোতি আর সে বিষয়ে উচ্চবাচ্য করে নাই, চেকও ভাঙ্গায় নাই। ইহাতে বিলাস অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হইয়া বিমলার কাছে কান্নাকাটি করিয়াছিল। বিমলা সুরমাকে ধরিয়া পড়িল, তার একান্ত অনুরোধে সুরমা জ্যোতিকে টাকা লইতে আদেশ দিয়াছিল। বিলাসের টাকায় জ্যোতির আশ্রমে দোতলা বাড়ী হইয়াছে।

এক বছর কাটিয়া গিয়াছে, সুরমা স্বামী পুত্র ছাড়িয়া আসিয়া ভগ্ন হৃদয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অনেক ধাক্কা সহিয়া সহিয়া তার বুকটা একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন আর সে সহিতে পারে না।

খোকাকে কোল ছাড়া করিয়া তার প্রাণ হাহাকার করে, সে হাহাকার সে কিছুতে নিবারণ করিতে পারে না। কমলা ও বিমলার দুটি ছেলেকে বিমলা সর্ব্বদা তার কাছে রাখে, তাদের লইয়া সে থাকে। বিমলা তাকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য অশেষ যত্ন করে, কিন্তু সুরমার দুর্দ্ধর্ষ প্রতিজ্ঞা আর তাকে খাড়া করিয়া রাখিতে পারে না।

তার বুকটা আরও ভাঙ্গিয়া গেল তরলার ব্যবহারে। তরলাকে তার মা সুরমার হাতে হাতে দিয়া গিয়াছিলেন। শাশুড়ীর মৃত্যুকালের দান সে একটা চরম দায়িত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই সে স্বামীর সকল তিরস্কারের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সে তা'কে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল। তরলা এখানে আসিয়া বৌদিদির সেই স্নেহের প্রতিদানে স্নেহ, ভক্তি, ও সেবা দিতে ত্রুটি করে নাই। তা ছাড়া জ্যোতির আদেশে সে আশ্রমের কাজেও আপনাকে সাধ্যমত নিযুক্ত রাখিত। কিন্তু সে খুব বেশী দিন নয়। অল্পদিনেই তরলা আশ্রমের জীবনে নিদারুণ শ্রান্তি অনুভব করিতে লাগিল।

একদিন তরলার বিছানার তলায় একটা শিশি পাওয়া গেল, তাতে মদের গন্ধ। তারপর ক্রমে আবিষ্কার হইল যে ইদানীং সে কমলার মাকে পয়সা দিয়া গোপনে মদ আনায় আর রাত্রে সবাই শুইলে খায়।

তারপর জানালায় ও ছাদে প্রায়ই অকারণে তরলাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। বিমলা একদিন দেখিল সে রাস্তায় একটি পুরুষের সঙ্গে ইসারা করিতেছে ও হাসিতেছে। খুব গোপনে বিমলা তাকে বুঝাইয়া সাবধান করিল। কিন্তু তাতেও কিছু হইল না, ক্রমে দেখা গেল সে আশ্রমের সমস্ত বিধি কৌশলে লঙ্ঘন করিয়া তার পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আয়োজন করিয়াছে।

সুরমা আগের সব কথাই অল্পবিস্তর শুনিয়াছিল। শুনিয়া তার মনে ব্যথা লাগিয়াছিল দুই দিক দিয়া। তরলার যে এমন পরিণতি হইয়াছে তাহাতে সে ব্যথিত হইল, আর ব্যথিত হইল ইহা ভাবিয়া যে, স্বামীর সহিত সে তরলাকে

লইয়া যে ঝগড়াটা করিয়াছিল তাতে তার চেয়ে তার স্বামীর পক্ষেই যুক্তি ছিল প্রবল। উদ্দাম যৌবনের প্রথম সোপানে যে পাপের স্বাদে ভরপুর হইয়া গিয়াছে, সুধু একটা ক্ষণিক উত্তেজনায় যদি সে পথ ছাড়িয়া আসে, তবু তার তা'তে মুক্তি হয় না। মদের নেশা যেমন বার বার লোককে টানিয়া লয়, সব পাপের নেশাই তেমনি। এমন মেয়েকে যে ঘরে রাখিয়া ভব্যতা বজায় রাখা দায়, এ বিষয়ে ভূপতির মত ভ্রান্ত নয় একথা সুরমা অনুভব করিল। তাই এখন তার মনে হইল যে এমন দুর্ব্বল যুক্তি সম্বল করিয়া সে বৃথাই স্বামীকে ক্লেশ দিয়াছে আপনি ক্লেশ পাইয়াছে। এই অনুভূতিতে সে একেবারে দুমড়াইয়া পড়িল। তরলাকে কি উপায়ে যে ভাল করা যায় তাহা সে ভাবিয়া পাইল না।

ভিতরটা তার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল. কিন্তু বাহিরে সে তার দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইতে দিল না। তাই সে তিল তিল করিয়া শুকাইয়া যেন ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বিমলা একদিন বলিল, "বউদি তুমি কি ক'রছো, তোমার ছেলে দুটোকে দেখনা, তারা কোথায় তারও খবর নেও না।"

"কেন দিদি, তোর ছেলের তো আমি অযত্ন করিনি।"

"ও আবার কি? আমার ছেলে কি? সে কি আমাকে মা ব'লে কোনও দিন খোঁজটা করে? তাকে জিগ্‌গেস ক'রে দেখো তার মা কে? ও তোমার ছেলে বউদিদি।"

হাসিয়া সুরমা বলিল, "বেশী লোভ দেখাসনে বিমলা, শেষে আমি তোর ছেলে সত্যি সত্যি কেড়ে নিয়ে বসবো। যে সুন্দর ছেলে তোর!"

"নাও দিদি নাও, এক্ষুণি নাও, দিয়েছি তো তোমাকে, না হয় বল তো উকীল ডেকে দানপত্তর ক'রে দিচ্ছি। আমার ছেলে হ'য়ে ওর ভারি তো যশ, তোমার ছেলে হ'লে ওর তো স্বর্গ!" বিমলার মুখে একটা ছায়া ভাসিয়া গেল। পুত্র যে জারজের অপবাদ বহিয়া জীবন কাটাইবে, এই চিন্তা তার আজকালকার সুখের জীবনের একটি মাত্র কাঁটা।

সুরমার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, সে বলিল "ষাট, ষাট, বাছা আমার মায়ের কোল জুড়ে থাক। আমার মত আবাগীর বরাতের সঙ্গে ওর বরাত জুড়ে দিসনে ভাই। আমি যাকে ছুঁই তার ভাল হয় না।"

হাসিয়া বিমলা বলিল, "তোমাকে ছুঁয়ে আমার মত কত কালো লোহা সোনা হ'য়ে গেল বউদি! আবার কি চাও!"

সুরমা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। এ ব্যর্থ সান্ত্বনায় সে ভুলিল না। জীবনে সে জানিয়া কোনও অন্যায় করে নাই, কিন্তু তার অদৃষ্টে তার সোনার স্বামী নষ্ট হইয়া গেল, লক্ষ্মণের মত দেবর গৃহচ্যুত সন্ন্যাসী হইল, অবোধ মেয়ে তরলার এমন সর্ব্বনাশ হইল, আর কচি খোকাটি তার মা থাকিতেও মাতৃহীন হইয়া না জানি কি কষ্টে দিন কাটাইতেছে। সে অভাগিনী নয় তো কি?

এখন তার দিন রাত মনে হয় যে তার পর্ব্বত-প্রমাণ দর্প সে চূর্ণ করিয়া দিয়া স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া তার ভুল, তার অপরাধ স্বীকার করে—কিন্তু স্বামীর দেওয়া কঠিন দিব্যের কথা স্মরণ করিয়া সে শিহরিয়া উঠে।

বিমলা সুরমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "অমন মনমরা হ'য়ে থেকো না বউদি, তোমার ভার মুখ দেখে আমরা যে বাঁচি না।"

সুরমা বিমলাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। তার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পর সুরমা বলিল, "হাঁ বোন তরলার মন কি কিছুতেই ফিরবে না।"

বিমলা বলিল, "ফিরবে দিদি ফিরবে! ওর বয়েসটা খারাপ, তায় কি দুর্ভাগ্য ওর গেছে সে কথা মনে ক'রে ওকে ক্ষমা করো দিদি।"

"ক্ষমা করবো ভাই? ক্ষমা করবার মত করে তার দোষকেই যে দেখতে পাই না। ওকে অপরাধী ব'লে জেনে কি শাস্তি কি ক্ষমা কিছুর কথাই ভাবতে পারি না। সুধু বুক আমার ভেঙ্গে যায় ওর এক একটা মন্দ কাজ দেখলে। মনে হয় এর অপরাধ তো ওর নয় আমারই। যেদিন ও হারিয়ে যায় সেদিন যদি ভুল ক'রে ওকে ছেড়ে না দিতাম, তবে তো ওর এ দশা হ'ত না। যখনই ওর একটা দোষ দেখি তখনই মনে পড়ে আমার শাশুড়ীর মরণের কালের সেই কাতর মুখের কথা। কত আশা ক'রেই মা আমাকে

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত

মেয়েটি দিয়ে গিয়েছিলেন, আর কি ক'রলাম আমি তার!"

"এমনটি ক'রে যদি তুমি ওর দোষ মাথায় পেতে নাও, আর এমনি ক'রে যদি তুমি ওকে আশীর্বাদ কর বৌদিদি, তবে ভগবানের আসন ট'লে যাবে, তরলার মন ফেরা তো ছার কথা। তুমি কিছু ভেবো না দিদি। দাদা থাকতে, তুমি থাকতে তরলা উদ্ধার না হ'য়ে যায় না।"

"তোর মুখে ফুল চন্দন পড়ুক বোন। আমার আশীর্ব্বাদে কি ক'রবে জানি না, কিন্তু তোকে দেখে আমার আশা হচ্ছে। যদি কেউ ওকে ফেরাতে পারে সে তুই। বিমলা তুই এমন প্রাণখানা কোথায় পেয়েছিস দিদি?"

ইহার পর বিমলা উঠিয়া গেল, সুরমা আপনার ঘরে ঢুকিল। সেখানে গিয়া দেখিল তরলা তার বিছানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া কাঁদিতেছে। বিস্মিত সুরমা তার কাছে গিয়া সস্নেহে তাকে বুকে টানিয়া লইল, তরলা তার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুরমা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "কি হ'য়েছে তরী? কাঁদছিস কেন? বল আমায়, লক্ষ্মী দিদি।"

তরলা কাঁদিয়া বলিল, "বউদি, তুমি আমায় গলা টিপে মেরে ফেল, চোখ দুটো উপড়ে ফেলে দাও। কেন আমি মরতে এসেছিলাম তোমাকে এত দুঃখ দিতে।"

"ষাট্, ওকথা বলিস না দিদি। কেন এমন করছিস? কি হ'য়েছে বল্।"

"আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি—আমার মরে যেতে ইচ্ছা করছে বৌদি, আমি তোমায় এত কষ্ট দিয়েছি।"

স্নিগ্ধ কণ্ঠে সুরমা বলিল, "আমার কোনও কষ্টই কষ্ট ব'লে মানবো না বোন যদি আজ থেকে তুই ভাল হোস। দুঃখ করিসনে দিদি, তুই যা দোষ করিস সে আমারই অপরাধ; তার শাস্তি আমি পাব না তো কে পাবে? একবার মন ঠিক ক'রে ভগবানের নাম ক'রে যদি তুই বলিস আমি ভাল হব—আর দিন রাত সে কথা মনে ভাবিস তবেই ভাল হ'বি বোন। পাপ কত লোকে করে, কিন্তু পাপ ক'রে যে শুদ্ধ হয় তার পুণ্য যে পাপ করেনি তার চেয়ে বেশী বই কম নয়।"

তরলা স্থির হইয়া বসিয়া বলিল, "আমি কি করবো বউদি? আমার ঘাড়ে যেন তখন একটা ভূত চাপে। তখন আর কিছু জ্ঞান থাকে না। তখন যদি তোমরা আমাকে চাবকে ফেরাতে পার তবে বোধ হয় আমি শুধরে যাই।"

"যে চাবুক মন ফেরাতে পারে ভাই, সে থাকে সুধু প্রত্যেকের নিজের মনে। সেটা তুই সুধু গুটিয়ে রেখেছিস। একবার যদি সে ছাড়া পায় তবে আর কোন ভয় থাকবে না।"

"বউদি এক কাজ ক'রবে? তুমি এখন থেকে আমাকে কক্ষণও কাছ ছাড়া ক'র না। আমার কোনও কাজে দরকার নেই, আমি সুধু তোমার কাছে থাকবো।—সব সময় থাকবো। তোমার কাছে থাকলে আমার মনে কোনও গ্লানি থাকে না।"

"বেশ ভাই থাকিস, তোতে আমাতে একসঙ্গে সব কাজ করবো।"

বিমলা ঘরে আসিয়া বলিল, "তরলা তুই ভাই, গিয়ে নীচের ঘরে তিন পেয়ালা চা দিয়ে আসবি?"

তরলা উঠিল।

সুরমা বলিল, "কেন, কে কে এসেছে বিমলা?"

"বিনায়ক বাবু সৌরীন বাবু আর একজন কে?"

সুরমা তরলাকে ধরিয়া বসাইয়া বলিল, "থাক তরলার গিয়ে কাজ নেই, তুই দিয়ে আয় দিদি। তরলাকে নাই পাঠালি।"

বিমলা চলিয়া গেল, একটু অপ্রসন্নভাবে।

তরলা কিছুক্ষণ বসিয়া বলিল, "বড্ড বাঁচিয়েছ বউদি—ওদের নাম শুনে ভূতটা এক্ষুণি ঘাড়ে চেপেছিল। ওদের সামনে গেলেই হয়তো একেবারে চেপে ধরতো।"

নীচের ঘরে সৌরীন আসিয়াছিল জ্যোতির কাছে। সে এমন প্রায়ই আসে। যেদিন তার সঙ্গে কলেজে যাইতে যাইতে জ্যোতি হঠাৎ পড়া ছাড়িয়া সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া বসিল, সেই দিন হইতে সে সৌরীনের চক্ষে দেবতা হইয়া উঠিয়াছিল।

সৌরীন খুব বড়লোকের ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়েও তার স্থান ছিল সুধু জ্যোতিরই নীচে। যেমন মেধাবী সে,

তেমনই সচ্চরিত্র। সে এখন পাশ করিয়া হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছে, কিন্তু এখনও বিবাহ করে নাই। গোড়া হইতেই সৌরীন টাকা পয়সা দিয়া জ্যোতিকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে—আর সে সদা সর্ব্বদাই আসিয়া তার আশ্রমের খবরাখবর করে।

সৌরীন বলিল, "ভাই, তোমায় দেখে আমার কি আনন্দ হয় কি বলবো। নিজের অপদার্থতাটা যে পরিমাণে অনুভব করি, ঠিক সেই পরিমাণে অনুভব করি তোমার গৌরব। একই পড়া তুমি আমি দুজনেই ক'রেছি, কিন্তু কোথায় তুমি, কোথায় আমি।"

জ্যোতি হাসিয়া বলিল, "কেন তুমি মন্দটা কিসে হ'লে? আমার যদি গৌরব কিছু থাকে তার অর্দ্ধেক ভাই, তোমার। তুমি যদি আমার পাশে না দাঁড়াতে তবে তো আমি কিছুই ক'রতে পারতাম না।"

"একে বল পাশে দাঁড়ান। আমি কি পারতাম না ঠিক তোমারই মত সব ছেড়ে ঠিক সত্যি সত্যি তোমার পাশে দাঁড়াতে। কেন পারিনি? কেন না প্রথমতঃ আমি ভীরু, দ্বিতীয়তঃ আমি স্বার্থপর।"

"নিজেকে যে এত ছোট ভাবে ভাই, সে কখনই সত্যি সত্যি ছোট নয়।"

"না ভাই, আমি যে কত ছোট তা' তুমি কল্পনা ক'রতে পার না। আমি আপনাকে কত ঘৃণা করি তা তুমি ত জান না; কেন না তোমাকেও কোনও দিন বলিনি আমি কত বড় কাপুরুষ। আমাদের ঘরের কথা বলিনি কোনও দিন তোমাকে—কিন্তু—কি বলবো ভাই, তুমি এখানে যত হতভাগ্য শিশুদের আর মাদের টেনে এনে মানুষ ক'রছো, আর আমি আমার চোখের উপর ভ্রূণহত্যা হ'তে দেখেও কিছু বলিনি।"

ওর জন্যে নিজেকে বেশী নিন্দা ক'রোনা ভাই। সে অবস্থায় পড়লে আমিই যে কি ক'রতাম তা কে জানে? পরের ঘরের ভ্রূণহত্যায় যারা বড় ঘৃণা করে তারাও অনেক সময় পরিবারের সম্মানের কাছে মাথা নত ক'রে বসে দেখেছি।"

"আমি নিজেকে কিছুতেই এতটা ক্ষমা ক'রতে পারছি না। তোমাকে কথাটা বলি—না বল্লে প্রাণটা ঠাণ্ডা হচ্ছে না। আমার বিধবা এক বোন অন্তঃস্বত্বা হ'য়েছিল। আমরা সবাই শুনে অস্থির হ'য়ে গেলাম। আমাদের একটা পোষা ডাক্তার আছে—পাষণ্ডের শিরোমণি—বাবা তাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তখনও শুনিনি ব্যাপার কি? ডাক্তার কিন্তু যন্ত্রপাতি ঠিক করবার সময় আমায় ব'লে ফেল্লে। বোঁ ক'রে আমার মাথা ঘুরে গেল। পাগলের মত আমি ছুটে গেলাম নিজের ঘরে। বুঝলাম কাজটা কত অন্যায়—কিন্তু সাহস হ'ল না মাথা তুলে গিয়ে বলি, আমি এ হ'তে দেব না। ইচ্ছা হ'ল—সাহসে কুলোল না। তখন যদি তাই ক'রতাম। অকর্ম্মণ্য ডাক্তার তার পাপকর্ম্ম সমাধা ক'রলে কিন্তু বোনটি আমার টেটানাস হ'য়ে মারা গেল।"

হঠাৎ পাশের ঘরে ঝনাৎ করিয়া একটা শব্দ হইল। জ্যোতি গিয়া দেখিল বিমলার হাত হইতে একটা চায়ের পেয়ালা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বিমলা ছুটিয়া পলাইল।

সৌরীন বলিল, "সুধু এই একটা নয়—আরও একটা বড় tragedy আমাদের বাড়ীতে হ'য়ে গেছে। এক হতভাগা আমার বউদির সর্ব্বনাশ ক'রেছে—হয়তো বউদি বেঁচেই নেই। সে পাষণ্ডকে চিনি, জানি—কিন্তু সাহস নেই আমার যে তাকে প্রকাশ্যে উপযুক্ত শাস্তি দিই। আমি সুধু আমার অসহায় বউদিকে অসভ্যভাবে গাল দিয়েছিলাম, সেই দিন রাত্রে অভাগিনী নিরুদ্দেশ হ'ল—কোথায় গেল জানি না।"

"এই যে জ্যোতি"—বলিয়া বিনায়ক আসিয়া ঘরে ঢুকিল; সৌরীনকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। সৌরীন উঠিয়া অন্য ঘরে গেল। বিনায়ক আসিয়া তার চেয়ারে বসিল।

বিনায়ক বলিল, "দেখ ভাই, তোমার কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে। কথাটা কিছুদিন ধ'রে আমার মাথায় খেলছে, অনেক দিন ধ'রে তোমাকে ব'লব মনে করছি, ঝঞ্ঝাটের মাঝে আসবার সময়ই পাইনে।"

বিনায়কের প্রস্তাবটি সংক্ষেপতঃ এই। থিয়েটারগুলি বেশ্যা লইয়া অভিনয় করে। সেটা নৈতিক হিসাবে কল্যাণকর কি না সেকথা বিনায়ক ভাবে নাই, সে ভাবিয়াছিল

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত

যে ইহাতে ভাল অভিনেত্রী প্রায় হয় না। কারণ অভিনয় বিদ্যায় সাফল্য সুধু শক্তিতে হয় না, তার জন্য একাগ্র সাধনা চাই। সে সাধনা ব্যবসায়ী বারবনিতার দ্বারা সম্ভব হয় না। বিনায়কের আশা ছিল সে থিয়েটারে আসিয়া ক্রমে ভদ্রলোকের মেয়েদের দিয়া অভিনয়ের আয়োজন করিবে, কিন্তু তাহা যে একেবারে অসম্ভব তাহা সে এখন বুঝিয়াছে। এখন তার সঙ্কল্প এই যে অনাথা শিশু ও বেশ্যাদের ছোট ছোট মেয়েদের অল্প বয়স হইতে বাছিয়া লইয়া একটা রীতিমত নাট্যশিক্ষাগারে সে আখড়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়কলা শিক্ষা দিবে, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অভিনেত্রী সংগ্রহ সহজ হইবে। বিনায়কের প্রস্তাব এই যে জ্যোতি যদি সম্মত হয় তবে তাহার আশ্রমেই এই কার্য্যের সূত্রপাত করা যাইতে পারে। বিনায়ক সে বিষয়ে যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিতে প্রস্তুত।

জ্যোতি এ প্রস্তাবে অসম্মত হইল।

বিনায়ক বলিল, "আমার স্কীমটা তুমি ভাল ক'রে"—

জ্যোতি বাধা দিয়া বলিল, "আপনার স্কীম সম্ভবতঃ খুব ভাল, কাজটাও হয়তো ভাল, কিন্তু সেটা আপনি স্বতন্ত্র-ভাবে ক'রলেই ভাল হয়। দেখুন থিয়েটার জিনিষটার উপর আমার একটা মজ্জাগত বিদ্বেষ আছে। থিয়েটার থেকে আমাদের কত বড় সর্ব্বনাশ হ'য়েছে তা তো জানেন।"

"সেটা কি থিয়েটারের দোষ? তোমার দাদা"—

"দেখুন দোষগুণ বিচার করবার প্রয়োজন নেই। আমি ঠিক যে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে দোষগুণ আলোচনা ক'রতে পারবো তাও হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু মাপ ক'রবেন, আমি এ কাজে হাত দিতে পারবো না।"

বিনায়ক উঠিল।

জ্যোতি বলিল, "রাগ ক'রবেন না, বসুন। একটু চা খেয়ে যান।"

বিনায়ক বসিল।

বুক পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া বিমলা একটা থালায় তিন পেয়ালা চা সাজাইয়া লইয়া আসিল। জ্যোতি বলিল, "এস হে সৌরীন।"

সৌরীন খুব গম্ভীর ভাবে আসিয়া বসিল। বিমলা চায়ের পেয়ালাগুলি নামাইতে লাগিল।

এতক্ষণে জ্যোতির নজরে পড়িল যে বিমলার মুখ ঘোমটায় ঢাকা। সে হাসিয়া বলিল "এ আবার কি বিমলা? আমার এ আশ্রমে পরদা নিষেধ।" বলিয়া সে বিমলার মাথার কাপড় খাঁ করিয়া টানিয়া দিল।

ইহাতে যে কাণ্ডটা হইল তাহাতে জ্যোতি আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

বিমলার হাতে তখন একটা চায়ের বাটী ছিল, তাড়াতাড়ি সেটা টেবিলে রাখিয়া সে থালা ফেলিয়া দুই হাতে মুখ চাপিতে চাপিতে পালাইল। কিন্তু তার পূর্ব্বেই বিনায়ক ও সৌরীন এক সঙ্গে চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল।

সৌরীন বলিল, "বৌদি!"

বিনায়ক বলিল "সুলোচনা!"

জ্যোতি বলিল, "একি! এ তোমার বউদি সৌরীন?"

"হাঁ ভাই—ওঃ আজ একটা মস্ত বোঝা আমার মাথা থেকে নেমে গেল। বউদি বেঁচে আছে—তোমার আশ্রয়ে আছে, এতে আমি যেন পুনর্জ্জন্ম পেলাম।"

বিনায়ক মাথা নীচু করিয়া বসিয়াছিল—সে গম্ভীর ভাবে বলিল, "জ্যোতি, সুলোচনাকে একবার ডাক আমার কয়েকটা কথা আছে।"

সৌরীন বলিল, "কিছুতেই না। এর পরও তোমার কথা বলতে লজ্জা হয় না হতভাগা?"

জ্যোতি বিমূঢ় হইয়া চাহিয়া রহিল।

বিনায়ক বলিল, "তুমি গাল দেও মার আমায় সৌরীন, তাতে তোমার অধিকার আছে। আমি অত্যন্ত নীচ কাজ ক'রে তোমাদের সম্মান হরণ ক'রেছি—তোমার কাছে অপরাধী। তার জন্য তুমি শাস্তি দিতে চাও তাতে আজ আর আমার দুঃখ নেই ভাই—কেন না সুলোচনা বেঁচে আছে। বুঝতে পারছোনা বোধহয় কিছুই তুমি জ্যোতি। সৌরীনের দাদা আমার পরম বন্ধু ছিল, সে তার বাপ মাকে লুকিয়ে সুলোচনার সঙ্গে আমার আলাপ ক'রে দেয়। আমি তার সে বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে পারিনি।

আমি সুলোচনাকে ভাল বেসেছিলাম, সেও আমায় ভাল বেসেছিল, ওর স্বামী বেঁচে থাকতেই। তারপর হঠাৎ ও বিধবা হ'ল—তখনও আমাদের গোপনে দেখাশোনা হ'তে লাগলো। তারপর হঠাৎ ব্যাপারটা নিয়ে একটু সন্দেহ হওয়ায়"—

সৌরীন বলিল, "সুধু সন্দেহ নয়।"

"হাঁ আমরা ধরাই প'ড়েছিলাম। তাতে আমি ভীরুর মত পালিয়ে যাই। একেবারে কলকাতা ছেড়ে চলে যাই। কয়েক মাস পরে আমার মনে হ'ল যে ভয়ানক অন্যায় হ'য়ে গেছে আমার, সুলোচনাকে এমনি ফেলে যাওয়া। আমি স্থির ক'রলাম, যেমন ক'রে হোক তাকে বিবাহ ক'রবো। কিন্তু ফিরে এসে শুনলাম সে নেই। কেউ বল্লে বেরিয়ে গেছে, কেউ বল্লে ম'রে গেছে। আমার ভাগ্য, যে সে বেঁচে আছে। আজ আমি আমার সেই নষ্ট সুযোগ ফিরে চাই—আমি ওকে বিয়ে ক'রে সুখী করবার চেষ্টা ক'রবো ভাই।"

বিনায়কের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সৌরীন তার কথা শুনিয়া, তার দিকে চাহিয়া নরম হইয়া গেল।

জ্যোতি ভিতরে বিমলার সন্ধানে গিয়া দেখিল বিমলা একটা নির্জ্জন ঘরের কোণায় বসিয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে।

জ্যোতি স্নিগ্ধভাবে তার মাথায় হাত দিয়া বলিল, "কেঁদ না দিদি, কাঁদবার কিছু হয় নি। আজ হয়েছে সুধু এই যে তোমার পরিচয় প্রকাশ হয়ে গেছে। ছি, সত্যের কাছে তুমি আজও এত কুণ্ঠিত হ'চ্ছ?"

বিমলা—সুলোচনা—মাথা নত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

জ্যোতি বলিল, "লক্ষ্মী দিদি, সাহস কর, সত্যকে সম্মুখে দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ কর, তার কাছে পালিও না। এস ওঁরা দুজনই তোমার অমঙ্গল কল্পনা ক'রে কষ্ট পেয়েছিলেন, তুমি বেঁচে আছ, ভাল আছ জেনে ওঁরা সুখী। ওঁদের সঙ্গে কথা কও এসে।"

বিমলা নত মস্তকে জ্যোতির আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত হইল।

বিমলাকে দেখিয়া সৌরীন বলিল, "বউদি, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।"

বিমলা কাঁদিয়া বলিল, "তোমার অপরাধ কি ভাই? অপরাধ তো আমার, তোমাদের অতবড় কুলে কালি দিয়েছি, তুমি আমাকে তার যোগ্য শাস্তি তো কিছুই দাও নি। আর ও কথা ব'লে লজ্জা দেও কেন?"

বিনায়ক বলিল, "কিন্তু সুলোচনা, আমি অপরাধী। আমাকে ক্ষমা কর। দয়া ক'রে আমাকে গ্রহণ কর, আমি তোমাকে বিয়ে ক'রে সংসারী হই। অনেক অপকার্য্য জীবনে ক'রেছি সুলোচনা, কিন্তু তোমার এটুকু সম্মান আমি রেখেছি যে আমি আজও বিয়ে করিনি। আমার ধর্ম্মপত্নীর স্থান তোমার জন্য বাঁধা আছে—তুমি এসে তা অধিকার কর।"

জ্যোতি হাসিয়া বলিয়া উঠিল "কি বল বিমলা—থুড়ি সুলোচনা? আর একটা বিবাহ উৎসব হোক তবে এ আশ্রমে?"

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠ হইয়া বিমলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—আনন্দে তার অন্তর ভরিয়া উঠিল—পাষণ্ড বলিয়া বিনায়কের উপর একটা তীব্র ঘৃণা এতদিন তার অন্তরে বাসা করিয়াছিল, কিন্তু আজ বিনায়কের কথায় সে সব ঘৃণা যেন হাওয়া হইয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল। সে বিনায়ককে বড় ভালবাসে, তাই সে আজ সুখী হইল এই ভাবিয়া যে বিনায়ক পাষণ্ড নয়। এ আনন্দ তো তার মুখ ফুটিয়া বলিবার নয়—লজ্জা যে তার সমস্ত অন্তরকে চাপিয়া পিষিয়া মারিতেছিল। যাতে তার এ আনন্দ—সে যে পাপ! তার উপভোগ যে তার বড় অপরাধ, নিদারুণ লজ্জা। তবু সে আনন্দ তার অন্তর ছাপাইয়া উঠিল, লজ্জায় সে মরিয়া গেল।

জ্যোতি, বিনায়ক, সৌরীন ব্যগ্র প্রতীক্ষায় বিমলার মুখের দিকে চাহিল—তাদের দৃষ্টি বিমলাকে সুগভীর লজ্জায় একেবারে ঢাকিয়া ফেলিল। অনেকক্ষণ সে নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—অনেকক্ষণ নীরব নিস্তব্ধ প্রতীক্ষায় ইহারা তার দিকে চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া বিমলা দৃঢ় স্নিগ্ধকণ্ঠে কথা বলিল, তখন তার বুকভরা আবেগে চক্ষু ভরিয়া উঠিয়াছে। সে বলিল "দাদা, তোমার কাছে জীবনে যা

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত

পেয়েছি সেই আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তোমার কাজ ক'রেই আমার একমাত্র আনন্দ। আমাকে এ ব্রত থেকে বঞ্চিত ক'রো না।" তারপর চক্ষু নত করিয়া লজ্জিত কুণ্ঠিত কণ্ঠে সে বিনায়ককে বলিল, "আমাকে ক্ষমা কর, আমি পাপিষ্ঠা, আমার মুক্তি এখানে। তুমি সাধ্বী সতীকে বিয়ে ক'রে সুখী হও।" বলিয়া বিমলা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

* * * *

কমলা এক বাড়ীতে নাসের কাজে কিছুদিন হইল যাইতেছিল, সে বাড়ী ভূপতির বাড়ীর পাশে। রোজ আসিয়া ভূপতির ও খোকার খবরাখবর সুরমাকে দিত। আজ সন্ধ্যায় সে মুখ কালি করিয়া আসিয়া জ্যোতিকে গোপনে বলিল, ভূপতির বিবাহ স্থির হইয়াছে—পরশু বিবাহ।

জ্যোতি রাগে চুল ছিঁড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ গর গর করিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

মেয়ের ভাই ও মার সঙ্গে ঝুলোঝুলি করিয়া জ্যোতি কিছুতেই তাহাদিগকে বিবাহ ভাঙ্গিতে সম্মত করিতে পারিল না। তাহারা বলিল শুধু এক কথা, "জ্যোতি যদি বিবাহ করে মেয়েটিকে, তারা সম্মত আছে, নহিলে ভূপতির সঙ্গে বিবাহ ভাঙ্গিবে না।

জ্যোতি বলিল, "আমি উপযুক্ত বর যোগাড় ক'রে দিচ্ছি।"

কিন্তু তাহারা বলিল, পাঁচ বছরে যে মেয়ের বর জুটিল না তাকে সে অনিশ্চিত প্রত্যাশায় নিশ্চিত বিবাহ হইতে ফিরাইতে পারিবে না।

কিছুতেই কিছু হইল না।

তখন জ্যোতি গেল বিনোদের বাড়ী।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, পরের দিন গোধূলি লগ্নে বিবাহ। জ্যোতি ছট্ ফট্ করিতে লাগিল।

বিনোদ আসিলেই জ্যোতি বলিল, "বিনোদদা! আমি দাদার নামে নালিস ক'রবো, তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়ে দিতে হবে।"

বিনোদ অবাক্ হইয়া জ্যোতির মুখের দিকে চাহিল। "কি বলছো? পাগল হ'লে নাকি? কিসের নালিস ক'রবে?"

"সেই হুণ্ডী জাল করার।"

ঘাড় নাড়িয়া বিনোদ বলিল, "এতদিন পরে সে হয় না—টিকবে না।"

"তবে আমার বিষয় ঠকিয়ে নেওয়ার।"

"সে বিষয়ের ভাগ তো ভূপতি কড়ায় গণ্ডায় তোমায় বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে, তুমিই অস্বীকার ক'রেছ। তা নিয়ে কি আর নালিশ চলে।

"না হয় তো আর একটা কিছু ভেবে ঠিক করুন, এমন একটা কিছু করুন যাতে কালকের দিনের মধ্যে তাঁকে ধ'রে হাজতে পোরা যায়। করতেই হবে।"

আশ্চর্য্য হইয়া বিনোদ বলিল, "কেন বল দিকিন, ব্যাপারটা কি? যখন ভূপতি তোমার সর্ব্বনাশ ক'রতে চেষ্টা ক'রেছিল, নিজের সর্ব্বনাশ ক'রছিল, তখন তোমাকে মেরে কেটে নালিস করাতে পারিনি, আর আজ হঠাৎ তোমার এ খেয়াল হ'ল কেন বল দেখি?"

জ্যোতি বলিল ভূপতি বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, কাল বিবাহ। বিবাহ নিবারণের সকল উপায় সে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে, কিছুই করিতে পারে নাই—এখন কাল দাদাকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া আর উপায় নাই।

বিনোদ স্তম্ভিত ও গম্ভীর হইয়া গেল। অনেক ভাবিয়া শেষে বলিল, "ও কোনও কথাই নয়—নালিস তুমি ক'রলেও প্রথমেই যে ওয়ারেণ্ট দেবে গ্রেপ্তার করবার তা সম্ভব মনে হয় না। কিন্তু আমি একটা সহজ উপায় বলে দিচ্ছি—তুমি কাল ও মেয়েটাকে বে ক'রে ফেল।"

"সে হবে না দাদা—সে অসম্ভব—আমি অনেক ভেবে দেখেছি।"

"কিন্তু তা' ছাড়া আর অন্য উপায় নেই।"

উত্তেজিত হইয়া জ্যোতি বলিল, "কোনও উপায় না থাকে—গুণ্ডামী করবো—দাদাকে ঘ'রে কুলুপ দিয়ে রেখে দেব!"

তার ভাব দেখিয়া বিনোদ ভয় পাইল। সে বলিল "আচ্ছা এসো তুমি কাল সকালে, ভেবে দেখবো। আমার কথাও তুমি একবার ভেবে দেখো।"

জ্যোতি বাহির হইতে গেল, বারান্দায় একটি নারী দাঁড়াইয়া ছিল সে জ্যোতিকে প্রণাম করিল।

জ্যোতি চট্ করিয়া তাকে চিনিতে পারিল না। মাথা-মুড়ান—বিলাস সম্প্রতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে—একখানা সুতি চাদর গায় জড়ান। জ্যোতি আর একটু চাহিয়া চিনিল—বলিল, "এ কি? আপনি?"

হাসিয়া বিলাস বলিল, "হাঁ আমি। বড় সৌভাগ্য আমার ঠিক এই সময় এসে প'ড়েছি। হাঁ তা আপনার দাদা কাল বে ক'রছেন?"

"হাঁ।"

"মাপ ক'রবেন আমি আপনাদের কথাগুলো এখানে ব'সে শুনে ফেলেছি। আমি একটা কথা বলবো?"

"কি?"

"আপনার দাদা যদি গ্রেপ্তার হন তবে দুদিন হ'ক একদিন হ'ক, পরে আবার জামিনে খালাস পাবেন। তখন বে আটকাবেন কি ক'রে?"

"এই তারিখটা পেরিয়ে গেলে সামনে ভাদ্রমাস, তখন বিয়ে হয় না। একটা মাস সময় পেলে অনেক কিছু করা যাবে।"

"ও! কিন্তু আমার মনে হয় উকীল বাবুর পরামর্শটাই ভাল। আমি বলে রাখছি, আপনি যদি বে করেন তবে আপনার কাজের শক্তি বাড়বে বই কমবে না।"

"সে হয় না—হবার জো নেই" বলিয়া জ্যোতি চলিয়া গেল।

* * *

পরের দিন ভোরে উঠিয়া ভূপতির মনটা হঠাৎ ভারী স্নিগ্ধ বোধ হইল। দুই দিন অনর্গল বৃষ্টি বাদলার পর আজ সকালে হঠাৎ রোদ উঠিয়াছে সমস্ত পৃথিবী যেন হাসিয়া উঠিয়াছে। ভূপতির অন্তরও ভারী শান্ত স্নিগ্ধ বোধ হইল।

তারপর তার মনে পড়িল আজ তার বিবাহ। মনটা বিষাইয়া গেল। একটা ঝোঁকের মাথায় বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিয়াই সে মনে মনে লজ্জিত বোধ করিতেছিল, আজ তার মনটা ধিক্কারে ভরিয়া গেল।

খোকা উঠিয়া তার কোল চাপিয়া বসিল, ভূপতির প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল—সে খোকার দিকে চাহিতে পারিল না।

দেয়ালে সুরমার একখানা ফটোগ্রাফ ছিল, তার দিকে চাহিয়া ভূপতি চক্ষু নত করিল। আজ তার প্রশান্ত দৃষ্টিতে সমস্ত অতীতের দিকে চাহিয়া তার এক ফোঁটাও সন্দেহ রহিল না যে সে দীর্ঘ আট বৎসর একটা নিরাপরাধ অশেষ গুণবতী সাধ্বী স্ত্রীকে সুধু অনর্থক নির্যাতন করিয়া আসিয়াছে, আজ তার সেই পাপযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে চলিয়াছে। আজকার দিনে সে আপনার মনকে ঠকাইয়া নিজের দোষ ক্ষালন করিবার এক ফোঁটা অবসর খুঁজিয়া পাইল না।

কিন্তু ফিরিবার পথও তো আর নাই—আজ সে বিবাহ না করিলে অরক্ষণীয়া কন্যার জাত যায়। পাঁচ বৎসর যার একটি বর জোটে নাই তার জন্য যে সুধু আজকের দিনের মধ্যে একটি বর জোটান যাইবে ইহা সম্ভব মনে হইল না। সুতরাং ফিরিবার পথ নাই।

সারা সকালটা সে খোকাকে বুকে করিয়া পড়িয়া রহিল—মনটা ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

তারপর সে ঝির সঙ্গে খোকাকে সুরমার কাছে পাঠাইয়া দিল। সুরমাকে বিবাহের কথা জ্যোতি তখনও বলে নাই। সে হঠাৎ খোকাকে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—তার আশা হইল বুঝি তার স্বামীর মন ফিরিয়াছে।

* * *

বৈকালে জ্যোতি অবসন্ন হৃদয়ে তার আশ্রমে ফিরিল। কোনও সদুপায়ই সে করিতে পারে নাই। অগত্যা বিবাহ নিবারণ অসম্ভব দেখিয়া সে মরিয়া হইয়া একটা ভয়ানক কাজ করিয়া বসিয়াছে। একটা গুণ্ডার সঙ্গে টাকা দিয়া বন্দোবস্ত করিয়াছে, সে তার লোকজন লইয়া বিবাহের পূর্ব্বে একটা হল্লা করিয়া কোনও মতে ভূপতিকে লইয়া বন্দী করিবে। বন্দোবস্তটা করিয়াই তার মন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। গুণ্ডা যদিও বলিয়াছিল, সে কাহাকেও খুন বা জখম করিবে না, তবু অনেক নিরপরাধ ব্যক্তি হয়তো ইহাতে আহত হইবে—হয় তো বা খুন হইবে। একথা মনে উঠিয়া তার অন্তর শিহরিয়া উঠিল। সে অশান্ত মনে আশ্রমে আসিয়া পায়চারী করিতে লাগিল—তিনবার সে ছুটিয়া বাহির হইল সেই গুণ্ডার সঙ্গে দেখা করিয়া তাকে নিবারণ করিতে—তিনবার ফিরিয়া আসিল।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত

অশান্ত হৃদয়ে সে স্থির করিল সুরমাকে সব কথা খুলিয়া বলিবে। সুরমাকে ভূপতির বিবাহ প্রস্তাবের কথা কেহ বলে নাই—সে আজ তার খোকাকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়াছে—স্বপ্ন দেখিতেছে, তার সব সে ফিরিয়া পাইবে, ভূপতি তার কাছে আসিবে।

জ্যোতি দেখিল আনন্দময়ী হাসি মুখে খোকার সঙ্গে খেলা করিতেছেন—কমলা ও বিমলার ছেলে দুটো খোকার সঙ্গে আড়াআড়ি করিয়া সুরমাকে লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে। সুরমা সকলকেই কোলে টানিয়া বুকে চাপিয়া চুম্বন করিতেছে।

সুরমার বুক ভরা আনন্দের খেলা, ও মুখ ভরা হাসি দেখিয়া জ্যোতির চক্ষে জল আসিল। যে নিদারুণ বার্ত্তা সে শুনাইতে আসিয়াছিল, তাহা তার বলা হইল না, সে ফিরিয়া গেল।

গোধুলি লগ্নে বিবাহ। পাঁচটার সময় জ্যোতি বসিয়া ভাবিল, এতক্ষণ বোধ হয় একটা গণ্ডগোল লাগিয়া গিয়াছে! সে অস্থির হইয়া ছুটিয়া বাহির হইল।

দুয়ারের বাহির হইয়াই তার দেখা হইল মেয়ের ভাইয়ের সঙ্গে। সে ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া জ্যোতির হাত ধরিয়া কাতর স্বরে বলিল, "ভায়া, আমার জাত রক্ষা কর। লগ্ন ব'য়ে যায়।"

জ্যোতি বুঝিল, কাজ হইয়া গিয়াছে, ভূপতিকে গুণ্ডারা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহাতে সে প্রসন্ন হইল—কিন্তু কি যে হইয়াছে তার অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা বিবরণ জানিবার জন্য তাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। কিন্তু পাছে কোনও কথা বলিয়া সে ধরা পড়িয়া যায়, সে জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

কিন্তু এই লোকটার উপর তার যে অপরিসীম ঘৃণা হইল তার বেগ সে রোধ করিতে পারিল না। এ কয়দিন ধরিয়া জ্যোতি ইহার কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়াছে, ইহাকে টাকা দিতে চাহিয়াছে, পায় ধরিয়া সাধিয়াছে, বিবাহ নিবারণ করিবার জন্য। সে ভূপতির সব অপরাধের কথা, সুরমার নির্ম্মম নির্য্যাতনের কথা ইহাকে বলিয়াছে—বুঝাইয়াছে যে ভূপতির সঙ্গে ইহার ভগ্নীর বিবাহ দেওয়া তাকে হত্যা করার চেয়ে কম অনিষ্টকর নয়। এ পাপিষ্ঠ অম্লানবদনে জ্যোতির সে সব কথা অগ্রাহ্য করিয়াছে—জ্যোতিকে কুৎসিৎ পরিহাস করিয়াছে—ভগিনীকে ধনীর ঘরে দিয়া ভগ্নীপতির স্কন্ধে চাপিয়া আমোদ করিবার আনন্দে অধীর হইয়া সে জ্যোতিকে অপমান করিয়া তাড়াইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। আর আজ সে আসিয়াছে জ্যোতির কাছে আশ্রয় চাহিতে, তার জাত বাঁচাইবার জন্য।

অসীম ঘৃণার সহিত জ্যোতি বলিল, "দূর হও হতভাগা! তোমার জাত কুকুরের জাত—লাথি মেরে লোকে যদি তোমায় সেখানে নামিয়ে দেয় তবে আমি তাদেরকে একটা লাথি চাঁদা দেব।"

ভদ্রলোক জ্যোতির পায় পড়িয়া বলিল, "দোহাই জ্যোতি বাবু দয়ার শরীর তোমার, একটু দয়া কর। আমার জাত না রাখ, সে হতভাগিনী মেয়েটার কথা একবার ভাব।"

"তার কথা ভাবছি। ভগবানের দয়ায় সে বেচারী যে তোমার পাপ চক্র থেকে রক্ষে পেয়েছে তাতে আমার আনন্দ হ'চ্ছে।"

"তা—তা—তা—সে কথা যাই হোক, আজ না হ'লে আর তো তার বিয়ে হবে না। তখন তার কি উপায় হবে সেটা একবার ভেবে দেখ ভাই, দয়া কর।"

"বিয়ে হবে না—তোমার তাতে বড় অসুবিধা—নয়? তাকে খেতে দিতে হবে"—

"না না তা নয়—কিন্তু তার, জাত"—

"আরে হতভাগা, জাত ধুয়ে খাবে? মানুষ একটা এতবড় জিনিষ তাকে কথায় কথায় জাতের কাছে বলি দিচ্ছ তোমরা—একথা বলতে লজ্জা হয় না? ঘেন্না হয় না। এই জাতসর্ব্বস্ব পশুর জাত বন্যায় ডুবে মরে না?"

হতাশ হইয়া লোকটা মাটিতে বসিয়া পড়িল।

জ্যোতি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যাপারটার স্বরূপ জানিবার জন্য তার তীব্র ব্যাকুলতাতেই সে ইহাকে সে সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বলিল,

"আচ্ছা তোমার বোনের যা'তে মঙ্গল হয় সে ব্যবস্থা করবার পুরো ভার আমি নিচ্ছি—এখন বল দেখি ব্যাপারটা কি হ'য়েছে?"

"ভূপতি বাবুকে ধরে নিয়ে গেছে।"

জ্যোতি কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "কে?" জানিয়া শুনিয়া জীবনে এই প্রথম মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতে সে ভয়ানক কুণ্ঠিত ও কম্পিত হইল।

লোকটি বলিল "পুলিস।"

এক মুহূর্ত্তে জ্যোতির ভাবান্তর হইয়া গেল। একটা বোঝা ঝাঁ করিয়া তার মন হইতে নামিয়া গেল, কিন্তু নিদারুণ আশঙ্কায় সে পীড়িত হইল। সে চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, "পুলিস! কেন কি ক'রেছেন তিনি?"

"সে জানি না ভাই। বেলা ব'য়ে যায় বর আসেনা দেখে আমি তাঁর বাড়ী গেলাম খোঁজ ক'রতে, গিয়ে শুনলাম পুলিসে তাকে নিয়ে গেছে। সেখান থেকেই ছুটে এসেছি তোমার কাছে।"

"কোথায় নিয়ে গেছে জান?"

"জানি না—যাবে আর কোথা? হাজতে গেছে।"

"কতক্ষণ হ'ল?"

"বড় জোর ঘণ্টাখানেক হবে।"

জ্যোতি আর অপেক্ষা করিল না। সে বেগে ছুটিল ভূপতির সন্ধানে।

মেয়ের ভাই বলিল, "আমার বোনের কি উপায় ক'রলে?"

জ্যোতি একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়াছিল। উঠিয়া সে বলিল, "পাঠিয়ে দেও গে আমার আশ্রমে।"

ট্যাক্সি চলিয়া গেল।

জেলে ভূপতির সঙ্গে জ্যোতি দেখা করিল। ভূপতি তার ঘরে নতমস্তকে গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিল। জ্যোতি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একি ব্যাপার দাদা?"

ভূপতি শান্তভাবে বলিল, "আমি কিছুই জানিনা ভাই—নির্জ্জলা মিথ্যা এ মোকদ্দমা। কেন যে এ মোকদ্দমা করেছে কিছু বুঝতে পারছি না।"

"কে নালিস ক'রেছে?"

"বিলাসিনী। সে নালিশ ক'রেছে এই ব'লে যে আমি তার অনুপস্থিতিতে তার বাড়ী থেকে গোপনে তার গহনাপত্র চুরী ক'রেছি।"

জ্যোতি বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হইয়া গেল—সে কিছুই না বুঝিতে পারিয়া বলিল "তার মানে?"

"সেইটাই বুঝতে পারছি না। মোকদ্দমা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কিন্তু তবু বিলাস যে আমার এই উপকারটা ক'রেছে তার জন্য আমি তাকে আশীর্ব্বাদ করছি।"

"সে কি?"

"আমি পাগল হ'য়েছিলাম জ্যোতি। তোমার বউ-দিদিকে বাড়ী থেকে বের ক'রে দিয়ে যাচ্ছিলাম বিয়ে ক'রতে। ভগবান রক্ষে ক'রেছেন, নইলে আজ সারাদিন ভেবে কোন উপায়ই খুঁজে পাচ্ছিলাম না কি ক'রে বিয়েটা ঠেকাই। বিলাস আমার এই উপকারটা ক'রেছে।"

জ্যোতির মনে এতক্ষণে একটা সন্দেহ উঁকি মারিতে লাগিল।

ভূপতি বলিল, "তুমি এখন যাও, আমার জন্য ভেবনা, আমার কোনও দুঃখ নেই। তুমি গিয়ে তোমার বউদিকে আমার হ'য়ে বল গে আমাকে যেন সে ক্ষমা করে। আর —সে মেয়েটি—তার বিয়ের একটা ব্যবস্থা হয় না? মেয়েটি বাস্তবিক বড় ভাল হে।"

"আচ্ছা সে পরে ভেবে দেখবো।" বলিয়া জ্যোতি বিদায় হইয়া সেখানে ভূপতির সুখ সুবিধার যতদূর বন্দোবস্ত সম্ভব তাহা করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া গেল।

* * * *

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিমলা মুখ ভার করিয়া সুরমার কাছে আসিয়া বসিল। এখন আর কথাটা না বলিলেই নয়, জ্যোতি সে ভার দিয়া গিয়াছে বিমলার উপর।

অনেকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর বিমলা সংবাদটা জানাইল।

একটা আর্ত্তনাদ করিয়া সুরমা বিমলার কোলে মাথা লুকাইল।

বিলাস আসিয়া সুরমাকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইল।

সহানুভূতি

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত

হাসিয়া বিলাস বলিল, "না দিদি, ভগবান আছেন, তোমার মত দেবীর কি এমন সর্ব্বনাশ ক'রতে পারেন? সে বিয়ে হয় নি।"

সুরমা চমকিত হইয়া বলিল, "হয়নি—সত্যি বলছো?"

"হাঁ দিদি, আমি তা' হ'তে দিই নি।"

"তুমি?—কে তুমি?"

"তোমার সব চেয়ে বড় শত্রু দিদি, আমি বিলাস।" বলিয়া ছল ছল চক্ষে সে সুরমার পায়ের ধূলা লইল।

বিলাস তখন জানাইল যে কাল সে বিনোদবাবুর কাছে তার একটা বিষয় সম্পর্কিত উপদেশের জন্য গিয়াছিল। সেখানে সব কথা শুনিয়া তার মনে হইল জ্যোতি যাহা করিতে চায় তা সে অনায়াসে করিতে পারে। কেন না জ্যোতি মিথ্যা বলিবে না, বিলাস তা অনায়াসে পারে। তাই সে পুলিস কোর্টের এক উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এক সম্পূর্ণ কাল্পনিক মোকদ্দমা সৃষ্টি করিয়া ভূপতিকে গ্রেপ্তার করাইয়াছে। কাল ভূপতি খালাস হইয়া আসিবে, কেননা বিলাস আর আদালতে হাজির হইবে না।

জ্যোতি যখন আসিয়া একথা শুনিল তখন সে বলিল, "সর্ব্বনাশ! মিথ্যা নালিস করার জন্য যদি জেলে দেয় তোমাকে?"

"কে দেবে ভাই? তোমার দাদা? দিক না। তোমাদের এত সর্ব্বনাশ ক'রেছি না হয় দুদিন জেল খেটে একটু উপকারই ক'রলাম।"

সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইল। সে কোনও কথা বলিল না, সুধু বিলাসকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

জ্যোতি চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

সমাপ্ত

আঁধার রাতের গান

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

আজ নিশীথে কে দিলে রে
  আমায় হাজার কান,—
বাতায়নে দাঁড়িয়ে শুনি
  আঁধার রাতের গান।
সীমা-শেষের বিজন তীরে
কি সুর বাজে ধীরে ধীরে,
তারার স্বরলিপি-লেখা
  আকাশ-খাতাখান;
ছায়া-পথের শুভ্র সারং—
  স্বপ্ন-ঘন তান!

আকাশ চেয়ে দাঁড়িয়ে শুনি
  আঁধার রাতের গান,—
কোন্ রজনীগন্ধা পেল
  আমার বুকে প্রাণ।
রাত্রি-শেষের সন্ধি-ক্ষণে,
প্রভাতী শুকতারার সনে,
কোন্ দেবতা আস্‌বে নিতে
  এই কুসুমের দান—
অশ্রু-শিশির দিয়ে ধোয়া,
  পবিত্র, অম্লান!

স্বরলিপি

"নটরাজ"

শেষের রং

রাঙিয়ে দিয়ে যাওগো এবার
যাবার আগে,
আপন রাগে,
গোপন রাগে,
তরুণ হাসির অরুণ রাগে,
অশ্রুজলের করুণ রাগে ॥
রং যেন মোর মর্ম্মে লাগে,
আমার সকল কর্ম্মে লাগে,
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে,
গভীর রাতের জাগায় লাগে ॥
যাবার আগে যাওগো আমায়
জাগিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমার চরণ-দোলা
লাগিয়ে দিয়ে।
আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণ গুহার কক্ষে নিঝর ধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে,
বিশ্ব-নাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,
তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও
যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে,
কাঁদন-বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে ॥

কথা ও সুর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II {সা রা সা । সণ্‌্ ণ্‌্ -া I সা -া -া । রা -া গা I
রা ঙি য়ে দি য়ে ° যাও ° ° যা ° ও

I গরা -পা পা । পমা মা -া I গা গা -মগা । গরা সা -া} I
যা ও গো এ বা র্‌ যা বা র্‌ আ গে °

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I -া -া -জ্ঞা । জ্ঞরা জ্ঞা -া I জ্ঞরা জ্ঞা -া । রা সা -া I
০ ০ ০ তো মা র্ আ প ন্ রা গে ০

I -া -া -জ্ঞা । জ্ঞরা জ্ঞা -া I রা জ্ঞা -া । জ্ঞরা সা -া I
০ ০ ০ তো মা র্ গো প ন্ রা গে ০

I -া -া -জ্ঞা । জ্ঞরা জ্ঞা -া I জ্ঞরা জ্ঞা জ্ঞা । রা জ্ঞা -া I
০ ০ ০ তো মা র্ ত রু ণ হা সি র

I রা জ্ঞা জ্ঞা । রা মজ্ঞা -রা I
অ রু ণ রা গে ০

I সা -া রা । রমা মা -া I মগা মা গা । রা সা -া I
অ ০ শ্রু জ লে র্ ক রু ণ রা গে ০

I সা রা সা । সণ্া ণ্া -া I সা -া -া । রা -া -গা I
রা ঙি য়ে দি য়ে ০ যা ০ ও যা ০ ও

I গরা -পা পা । পমা মা -া I গা গা -মগা । গরা সা -া I
যা ও গো এ বা র্ যা বা র্ আ গে ০

I মা -পা পা । পা পা ণা I ণধা -া ণা । ধা পা -া I
র ঙ্ যে ন মো র্ ম র্ মে লা গে ০

I পর্সা র্সা -া । র্সা র্সা -র্রা I ণর্সা -া ণা । ণধা ণা -া I
আ মা র্ স ক ল্ ক র্ মে লা গে ০

I ধা না পা । মা মা -া I পা -া পণা । ণধা পা -া I
র ঙ্ যে ন মো র্ ম র্ মে লা গে •

I পা ণা ণা । ণধা ণা -া I ধর্সা র্সণা -া । ণধা পা -ধা I
স ন্ ধ্যা দী পে র্ আ গা র্ লা গে •

I মা পা -া । পণা ণা -া I ণধা পা -া । মগা পমা -গা I
গ ভী র্ রা তে র্ জা গা য় লা গে •

I রা জ্ঞা রা । সা ণ্ -া I সা -া -া । রা -া -গা I
রা ঙি য়ে দি য়ে • যাও • • যা • ও

I রা -পা পা । পমা মা -া I গা গা-মগা । গরা সা -া I
যা ও গো এ বা র্ যা বা র্ আ গে •

I সা সা -জ্ঞা । জ্ঞরা জ্ঞা -া I জ্ঞরা -মা মজ্ঞা । রা সা -রা I
যা বা র্ আ গে • যা ও গো আ মা য়্

I রন্া ন্া ন্া । ন্া সা -া I
জা গি য়ে দি য়ে •

I সা -া সপা । পা পা -া I পধা ধপা -া । মগা মা -া I
র ক্ তে তো মা র্ চ র ণ দো লা •

I মপা মা জ্ঞা । জ্ঞরা মজ্ঞা -রা I
লা গি য়ে দি য়ে •

I সা সা -জ্ঞা । জ্ঞরা জ্ঞা -া I জ্ঞরা মা মজ্ঞা । রা সা -রা I
যা বা র্ আ গে • যা ও গো আ মা য়্

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

I র্ন্া ন্া ন্া । ন্া সা -া I
জা গি য়ে দি য়ে ০

I মা পা -া । পা পা -া I পা -া পা । পা পা -ধা I
আঁ ধা র্ নি শা র্ ব ০ ক্ষে যে ম ন্

I ণা ণা -া । ণধা পা -া I
তা রা ০ জা গে ০

I মা পা -া । পণা ণা -া I ণধা -া পা । মা মা -া I
পা ষা ণ্ গু হা র্ ক ০ ক্ষে নি ঝ র্

I মগা পমা -া । গা রসা -া I
ধা রা ০ জা গে ০ ০

I {সর্সা র্সা -া । র্সা র্সা -া I র্সা র্সা -না । র্সা র্সা -র্রা I
মে ঘে র্ বু কে ০ যে ম ন্ মে ঘে র্

I ণর্সা -া ণা । ধা ণা -া I
ম ন্ দ্র জা গে ০

I ণধা -া ণা । ধা ণা -া I ধা -া ণা । ণধা ণা -া I
বি ০ শ্ব না চে র্ কে ন্ দ্রে যে ম ন্

I ণধা -র্সা ণা । ধা পা -া I
ছ ন্ দ জা গে ০

I পা -ণা ণা । ণধা ণা -া I ণধা -া ণা । ধা র্সণা -ধা I
তে ম্ নি আ মা য়্ দো ল্ দি য়ে যা ও

I পা পা -ধা । ধর্সা র্সা -া I র্সণা ণা ণা । ণধা পা -ধা I
যা বা র্ প থে ০ আ গি য়ে দি য়ে ০

I ধমা পা -া । পণা ণা -া I ণধা পা পা । মগা পমা -গা I
কাঁ দ ন্ বাঁ ধ ন্ ভা গি য়ে দি য়ে ০

I রা জ্ঞা রা । সা ণ্া -া I সা -া -া । রা -া -গা I
রা ঙি য়ে দি য়ে ০ যাও ০ ০ যা ০ ও

I গরা -পা পা । পমা মা -া I মগা গা -মগা । রা সা -া II
যা ও গো এ বা র্ যা বা র্ আ গে ০
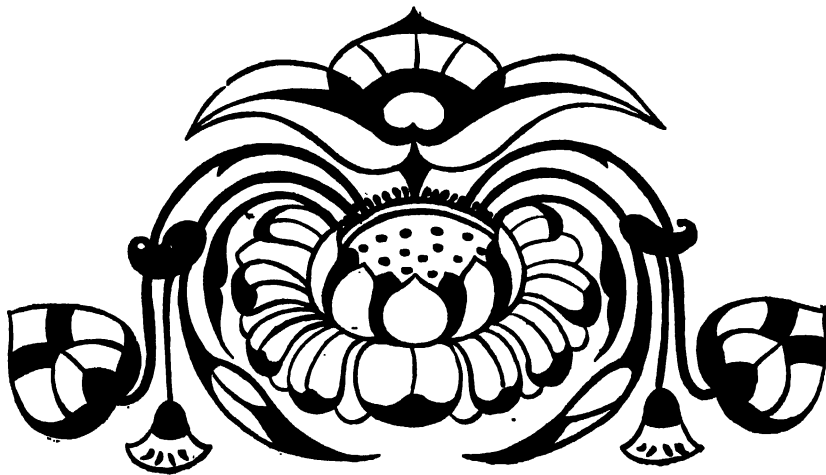
শেষ-আলো

—গল্প—

শ্রীকৃপানাথ মিশ্র

এক

শেষ হ'য়ে এলো—আমার করুণ জীবনের দীপ-শিখা। জানিনা আর কতদিন পর্য্যন্ত এই নরকঙ্কাল বহন করতে হবে। তবু বেশ বুঝতে পারছি যে আমার মুক্তি খুব কাছে। অদূরে মৃত্যুর গভীর ডাক শুনে গা শিউরে উঠে।

আমার একটু দুঃখ হচ্ছে সংসারের কাছ থেকে বিদায় নিতে। এই সেদিন আমি সংসারকে চিন্‌তে পারলুম। তার আগে একটা মস্ত ভুলকে আশ্রয় করে চলেছিলুম মাতালের মত এক অজানা পথে। কিছু বুঝতে পারতুম না, বুঝবার চেষ্টাও করতুম না। সুধু চলেছিলুম, চলেছিলুম। আমার চলার বিরাম ছিল না—এখন মৃত্যু-দূত আমার জীবনের বন্যায় এক সুদীর্ঘ যতি উৎপন্ন করেছে। তাই জগতের যত জিনিষ সব আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করছে।

মনে পড়ে আজ কিছুদিন আগেকার কথা। তখন কলেজে পড়তুম। সারাদিন গাধার মতন খাটুনির পর একটা টিউসনি করতে হতো। তখন জগতের যত সৌন্দর্য্য, যত শান্তি সব আড়ালে থাকত। চারিদিকে আমি দেখতুম সুধু এক নিষ্ঠুর নির্ম্মম জীবন সংগ্রাম। সব যেন তারি মধ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে আহুতির মত পড়ে ছার হয়ে যেত। দৈন্যের নৃত্য আমার জীবনে মধুর সঙ্গীতের রস জমতে দেয় নি। পাখীরা গান গাইত বসন্তের সময়; শিশুরা হাসত আনন্দে; আমি সব শুনতুম, দেখতুম কিন্তু তবুও আমার জীবনের বিষণ্ণ-ছায়া দূর হ'ত না।

কিন্তু সব বদ্‌লে গেছে, এখন। আমার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দের আবির্ভাব হয়েছে। আমি নতুন সৌন্দর্য্যের সাড়া পাচ্ছি—এক অজানা সঙ্গীতের মধুর স্বর সব সময়েই কানে বাজছে। পৃথিবীর বুক থেকে করুণ ক্রন্দনের হাহুতাশ আর ফুঁফিয়ে উঠছে না। দেখতে পাচ্ছি চারিদিকে এক দিব্য আলোকের বিমল বিকাশ। আগে কতবারই না মনে হ'ত মরে গেলেই বাঁচি, জীবনের বোঝা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এখন আর সেরকম মনে হয় না। এই "সেদিনকার পাওয়া" নতুন প্রেয়সী বসুন্ধরাকে ছাড়তে হবে। বড় দুঃখ হয়; কান্না পায়। কিন্তু উপায়?

দুই

আজ বিকেলে Capt Banerjee'র ওখানে গিয়েছিলুম। তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল না। কোথায় মফঃস্বলে গিয়েছিলেন কলে। আর দেখা হ'লেই বা কি হ'ত। রোজই তো এক কথা "রোগটা ক্রমশঃ বাড়ছে, কোন পাহাড়ে যাও।" মাঝে মাঝে ভাবি মানুষ মানুষের অভাব বুঝতে পারে না কেন? এখানেই যা হবার হ'ক, আমি আর কোথাও নড়ছি না।

Capt Banerjeeর বাঙলায় এক অদ্ভুত কাণ্ড হ'য়ে গেল। সেরকম কাণ্ড আমার জীবনে খুব কম ঘটেছে, তাই শরীর খারাপ থাকলেও এত রাত্রে ডায়েরি খুলে বসলুম।

বেলা তখন চারটে। সম্মুখের রোদমাখা সবুজ মাঠ বড় করুণ দেখাচ্ছিল। মাঝে মাঝে দু' একটা পাখী এসে মুহূর্ত্তের জন্য গানের আঁচল পেতে কোথায় যেন চলে চলে যাচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল আমার যদি ডানা থাকতো………"আঃ কি করুণ! আমার যত কবিত্ব জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেই কি দেখা দিচ্ছে!

হঠাৎ কার মধুর স্বরে চমকে উঠলুম। একজন রমণী ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা কচ্ছিল,—"ডাক্তার বাবু হ্যাঁয়?"

সসম্ভ্রমে চাকর উত্তর দিল, "আভী আতে হ্যাঁয়।"

রমণী আমার কাছে এসে ব'সল। কতক্ষণ আমি তার দিকে চেয়েছিলাম জানিনা। যখন সে জিজ্ঞেস কর'ল, "আপ্‌কো ক্যা হুয়া হ্যায়?" তখন লজ্জায় আমি উত্তর দিতে পারলুম না।

তার পর কত কথা। মাঝে মাঝে তার চোখ দুটো জ্বলে উঠ্‌ছিল। নারীর এমন রুদ্র মূর্ত্তি আগে আমি কখনও দেখিনি। সংসারে তার কেউ ছিল না। মানুষের নিষ্ঠুরতায় সে পতিতা। কিন্তু তার মধ্যে "নারী" জেগে ছিল। আমি অবাক্ হয়ে শুনছিলুম তার কথা।

হঠাৎ তার হাতটা আমার মাথার উপর রেখে সে বল্লে "বাবুজী, তোমার চোখটা কি করুণ! কত দিন থেকে ভুগছ?" তখন মুহূর্ত্তের জন্য আমার সমস্ত শরীর স্নেহের স্পর্শে পরিপূর্ণ হয়ে, হাল্কা হ'য়ে গেল।

"বা—বা—বা—" ছোট এক শিশুর ডাকে পতিতা নারীর "মা" সজোরে জেগে উঠ্‌ল'। ছুটে সে শিশুটিকে কোলে তুলে আদর করে বল্লে, "লক্ষীটী আমার!" অপরিচিতার কোলে শিশু খুব জোরে কেঁদে উঠ্‌ল। ঝি তখন ছুটে এসে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল সেই রমণীর দিকে। ছেলের কান্না শুনে মা জান্‌লার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সেখান থেকেই তিনি বল্লেন,—"ও ঝি, দাঁড়িয়ে কি কচ্ছিস্, খোকাকে নিয়ে আয় না।" ঝি সেই ছেলেকে রমণীর কোল থেকে কেড়ে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে মার তীব্র কণ্ঠ শোনা গেল, "কার কোলে ছেলে দিয়েছিলি তুই ঝি? বুঝ্‌তে পার্‌ছিস নে ও কে? ওর কোলে ভদ্রলোকের ছেলে দিতে আছে?"

আবার সেই স্নেহের স্পর্শ। রমণী দাঁড়িয়ে বল্লে, "বাবুজী, আমি চল্লুম" আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই সে চলে গেল তার মোটরের দিকে।

কোথায় গেল তার শরীরের অসুখ, কোথায় গেল তার ম্লান-মধুর সৌন্দর্য্য। আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। সুধু এক তেজস্বিনী নারীর দীপ্ত মাতৃমূর্ত্তি আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌'ল।

* * *

আর লিখ্‌তে পার্‌ছি না। গা ঝিম্ ঝিম্ করছে। শরীর খুব দুর্ব্বল মনে হচ্ছে। কিন্তু লিখে অনেকটা শান্তি পাচ্ছি। যে পতিতা নারীর স্নেহস্পর্শে আমার প্রাণ মধুর স্বরে বেজে উঠেছে, আমি তাকে নমস্কার কর্‌চি, আর নিমন্ত্রণ কর্‌ছি এই শেষ-আলোর আহ্বানে যোগ দিতে—কেননা যে আলোক-পথের যাত্রী আমরা তার শেষ এখানে নয়—সে মৃত্যুর পরপারে।

"বাঙ্গালীর অতীত"

শ্রীনীলমণি আচার্য্য

উত্তর

অধ্যাপক সঙ্ঘের এক অধিবেশনে "বাঙ্গালীর অতীত" নামে যে প্রবন্ধটী বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয় পাঠ করেন তাহা গত পৌষ সংখ্যার "বঙ্গবাণী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গলার প্রাচীন ধর্ম্ম-সাহিত্যের সামান্য দুই চারিখানি কাব্য মাত্র অবলম্বন করিয়া, বাঙ্গলার বিরাট সংস্কৃত, বৌদ্ধ, নাথ ও পল্লীসাহিত্যের কিছুমাত্র উল্লেখ না করিয়া, এবং বাঙ্গলার অতীত গৌরবের যে সকল নিত্য-নূতন ঐতিহাসিক তথ্যগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াই তাঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে স্বজাতির অতীত জীবনকে এরূপ ভাবে কলঙ্কলিপ্ত করা সঙ্গত হয় নাই। উক্ত প্রবন্ধটীতে তিনি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে‥"বাঙ্গলার অতীত ইতিহাস যে খুব গৌরবময় এমন কথা…জোর করিয়া বলা যায় না।" তিনি বলেন যে "প্রাগ্‌বৃটিশ যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যে…মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ, ত্যাগে, প্রেমে, শৌর্য্যে মহনীয় বাঙ্গালী চরিত্রের চিত্র বড় একটা নয়নগোচর হয় না।" বরং তাঁহার মতে "এই সাহিত্যই যাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট আনন্দের প্রস্রবণ স্বরূপ ছিল, তাহা পাঠ করিয়া আজ আমাদের মন আনন্দের পরিবর্ত্তে বিষাদ ও নৈরাশ্যে ভরিয়া যায়।" ইত্যাদি।

সাহিত্যিক যখন ঐতিহাসিকের আসন দখল করিয়া জাতীয় চরিত্রের চিত্র অঙ্কনে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার অঙ্কিত সেই চিত্রের বর্ণ ও রেখাগুলি যাহাতে সত্যের বিকৃতরূপে পরিণত না হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়। বাঙ্গলার অতীত ইতিহাস যে "শৌর্য্যে বীর্য্যে দীপ্ত, জ্ঞান ও গরিমায় উজ্জ্বল, সভ্যতা ও ললিত শিল্পকলার বিকাশে মহৎ," পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের অতীত ইতিহাস অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে, তাহার নানা ঐতিহাসিক প্রমাণ আজ পাওয়া যাইতেছে। এই সকল ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে তাহা করা যাইবে। এই "সুজলা, সুফলা শস্যশ্যামলা" বঙ্গমাতার ফলেজলে পরি-পুষ্ট কৃশাঙ্গ বাঙ্গালীই যে এককালে ভারতবিজয়ী হইয়াছিল, এককালে যে "গান্ধার হ'তে জলধি শেষ" সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত এই মসীজীবী বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষগণের অসিলব্ধ জয়-গানে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আর আজ কবি কল্পনা নহে,—"ইহা সমসাময়িক প্রশস্তিতে পরিচিত, কঠিন শৈল বা তাম্রের বক্ষে পরিস্ফুট।" এই গৌরবময় অতীতের স্মৃতি "ক্ষীণ" বা "প্রবাদ গল্পের কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন" বলিয়া পরিত্যাগ করিতে সাহিত্যিক ঐতিহাসিকগণ অতিশয় ব্যগ্র;—অথচ বিচারকের আসনে উপবিষ্ট হইয়া এক তরফা ডিক্রী জারি করিয়া জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙ্গালীকে কলঙ্কলিপ্ত করিতে তাঁহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না। যদি কেবলমাত্র সাহিত্য হইতেই জাতীয় চরিত্র অঙ্কন করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বড় সাবধানে তুলি ধারণ করিতে হইবে। বাঙ্গলার যাহা খাঁটী জাতীয় সাহিত্য, যাহা তার প্রকৃত বিশিষ্টতার সাহিত্য, তাহাই তাঁহাদের একমাত্র না হউক সর্ব্বপ্রধান উপাদান হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী বাবুর ন্যায় সুসাহিত্যিকের পক্ষে বাঙ্গলার বিশিষ্টতার সাহিত্যের সন্ধান না লইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের কেবলমাত্র সামান্যদুই চারিখানি অনুবাদ-শাখার বা ধর্ম্মশাখার কাব্য অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর অতীত জীবনকে এরূপ কলঙ্কলিপ্ত করা সঙ্গত হয় নাই। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে ধর্ম্মসাহিত্য হইতে যে সকল দৃষ্টান্তগুলি উদ্ধৃত করিয়া তিনি "আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের চরিত্রে প্রকৃত মনুষ্যত্বের অত্যন্ত অভাব" লক্ষ্য করিয়াছেন, বাঙ্গালীর "সর্ব্বব্যাপী পুরুষাকার বর্জ্জিত" চরিত্রের দুর্গতি

দেখিয়া মাথা হেঁট করিয়াছেন, সেই সকল দৃষ্টান্ত গুলিরও সম্যক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি, একমাত্র মসীময় বাঙ্গালী চরিত্র অঙ্কন করিয়া একেবারেই সত্য কথা কহেন নাই। বাঙ্গলার বিশাল প্রাচীন সাহিত্যের সম্যক্ উদ্ধার হইলে বাঙ্গালীর অতীত গৌরবের কতশত অধুনা-বিস্মৃত-প্রায় কাহিনী যে সংগৃহীত হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই আজ অধ্যাপক সঙ্ঘের আর একটা অধিবেশনে বাঙ্গলা সাহিত্য হইতেই বাঙ্গলার অতীতের যে সত্যরূপটার সন্ধান পাইয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আপনাদের সম্মুখে ধরিলাম। ইহাতে কৃষ্ণবিহারী বাবুর উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত দ্বারাই তাঁহার যুক্তির অসারতা প্রমাণ করিয়া বাঙ্গালীকে কলঙ্ক মুক্ত করা হইয়াছে। কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছি তাহা আপনারাই বিচার করিবেন।

কৃষ্ণবিহারী বাবু স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে "আগেকার বাঙ্গলা সাহিত্যে ধর্ম্মের খুব ছড়াছড়ি দেখিতে পাই বটে—কোন একটা বিশেষ ধর্ম্ম মত প্রচারের জন্যই তখন সাহিত্য রচিত হইত।" অথচ তিনি এই সব দেবদেবীকে লইয়াই আমাদের যাহা কিছু সাহিত্য সেই সাহিত্যেও "স্বাধীন চিন্তা ও ভাবের" গন্ধও আশা করেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে ধর্ম্মসাহিত্য বাঙ্গলার বিশিষ্টতার সাহিত্য নয়, "উহাতে যে দেবতাদের মাহাত্ম্যের ঝলকে মানুষের স্বাভাবিক প্রাণের ছবি মলিন হইয়া রহিয়াছে।" সকল দেশের ইতিহাস ইহাই সাক্ষ্য দেয় যে ধর্ম্ম হইতেই বিশেষ ধর্ম্ম মত প্রচারের জন্যই, সাহিত্যের প্রথম উৎপত্তি। তখন এক বিজয়গুপ্ত এক মুকুন্দরাম বা এক ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেব দেবী বিশেষের "স্বীয় পূজা প্রচারের জন্য দিনে শান্তি ও রাত্রে নিদ্রা" নাই এই বর্ণনা থাকাই স্বাভাবিক। তারপর এই অতি-প্রাকৃতের গণ্ডী এড়াইয়া "ধর্ম্ম প্রসঙ্গের সীমা বন্ধনী" অতিক্রম করিয়া "ধর্ম্ম সাহিত্য" যখন "শিষ্ট সাহিত্যে" পরিণত হয়, তখনই তাহা জাতীয় জীবনের স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ভাবের সৌরভে ভরপুর হইয়া উঠে। তাই রমাই পণ্ডিত হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সাহিত্যের কবিকাব্যে হেমচন্দ্রের "শিঙ্গারব" বা "মিলটন সাহিত্যে স্বাধীনতার তূর্য্য নিনাদ" দাবী করা অন্যায়। অবশ্য তিনি এই ধর্ম্ম সাহিত্যেরই বৈষ্ণব পদাবলী ও চরিতশাখা যে "প্রাচীন সাহিত্যের পঙ্কিল সরোবরে প্রস্ফুট পদ্মরূপে চিরদিন বিরাজ করিবে" তাহা বলিয়াছেন;—তাঁহার এইটুকু কৃপা-দৃষ্টিপাতে বৈষ্ণব সাহিত্যের মান বাড়িয়াছে সত্য কিন্তু তিনি যদি মহত্ত্বের তেজে উজ্জ্বল, সতীত্বের অপূর্ব্ব বিকাশে বিকশিত, সহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগ ও আত্মবিলুপ্তির চরম সৌরভে ভরপুর, সাহিত্য সরোবরে, প্রস্ফুটিত শতদল চয়ন করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে একবার রাজধানীর দরবারি সাহিত্যের পঙ্কিল সরোবর ও ধর্ম্ম সাহিত্যের অক্ষয় মন্দাকিনী ধারা ত্যাগ করিয়া, বাঙ্গলা মায়ের পল্লী সাহিত্যের কাব্য-কাননে প্রবেশ করিয়া পুষ্প চয়ন করিতে অনুরোধ করি। শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দে মহাশয়ের সংগৃহীত ও শ্রীযুক্ত ডাঃ রায় দীনেশ চন্দ্র সেন বাহাদুরের সম্পাদিত ময়মনসিংহের পল্লীগাথাগুলি পাঠ করিলে কৃষ্ণবিহারী বাবুকেও বলিতে হইবে যে "সকলগুলি গাথাই মানুষের প্রাণের স্পন্দনে হৃদ্য ও চরিত্রের বিকাশে উজ্জ্বল। "পৌরাণিক গল্প বা মনসার ভাসান বা বিদ্যাসুন্দরের পালার মত ভূয়োভূয়ঃ পুনরাবৃত কাহিনীর নূতন প্রকাশ "এই সকল পল্লীগাথায় নাই; "এ সকল গল্পের পাত্র পাত্রী দেবতা নন, প্রকাণ্ড রাজা-রাজড়াও নন, সামান্য মানুষ, আমাদেরই মতন সাধারণ তাদের জীবন, সাধারণ তাঁদের অনুভূতি।" অথচ এই সকল "মানুষেরা ন্যায়নিষ্ঠ হইয়া সকল বিপদ ও প্রলোভনের মধ্যে আপনাদের চরিত্রের মাহাত্ম্য বাড়াইতেছে, এরূপ মনোহর লৌকিক বর্ণনা এই পল্লীগাথাগুলিতে আছে।" ধর্ম্ম ও দরবারি সাহিত্য যে "সুবিধার জোরে বাঙ্গলার খাঁটী জাতীয় জীবনের চিত্রকে ঢাকিয়া ফেলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, এবারে সে চাপ দূর করিয়া পল্লীর গাথা মাথা তুলিয়াছে, আর আমরা প্রাচীনের পরিচয় পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছি।" এই সকল গীতি কবিতার কিছুমাত্র উল্লেখ না করিয়া কৃষ্ণবিহারী বাবু অন্যায় করিয়াছেন। কেন না তিনিই একবার ১৩৩১ সালের কার্ত্তিক সংখ্যার বঙ্গবাণী পত্রিকায়" 'উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা

শ্রীনীলমণি আচার্য্য

সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণতা ও পল্লীসংশ্রবশূন্যতাজনিত-স্বাতন্ত্র্য-হীনতা” লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথের ১৮৮৬ সালে লিখিত পত্রটী উদ্ধৃত করিয়াছিলেন যে—“এখনকার অধিকাংশ বাংলা বই পড়ে আমার এই মনে হয় যে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের সময় বাংলা দেশই ছিল কিনা ভবিষ্যতে এই নিয়ে তর্ক উঠ্‌তে পারে।” ইত্যাদি। তিনি আজ বুঝিয়াছেন যে বঙ্গজননী বিরাজ করিতেছেন—

ঐ আম্র বন ঘেরা সহস্র কুটিরে,
দোহন মুখর গোষ্ঠে ছায়া বট মূলে,
গঙ্গার পাষাণ ঘাটে, দ্বাদশ দেউলে,

কিন্তু তন্দ্রাতুর “সন্ধ্যাকালে” শত পল্লীর বালকবালিকার ও তাহাদের পিতৃপিতামহের চরিত্র-গৌরব তাঁহাকে মোহিত করিতে পারে নাই। চাঁদ সদাগরের পায়ে “তাঁহার সমস্ত হৃদয় ও মন শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে নুইয়া” পড়িয়াছে, কিন্তু ‘বাঙ্গালীর অতীতে’, আমির, কেনারাম, কঙ্ক, বা আমিনা, মহুয়া, মলুয়া প্রভৃতি বাঙ্গলার পল্লী-দেবদেবীর পাদপদ্মে সামান্য পুষ্পজলও অর্পণ করা তিনি কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই।

কৃষ্ণবিহারী বাবু যে ঐতিহাসিক নন, তিনি যে কেবল সাহিত্য হইতেই বাঙ্গালী চরিত্র অঙ্কন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি। বাঙ্গলার দুর্ভাগ্য যে তাহার অতীত ইতিহাস শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট “কুহেলিকায় আচ্ছন্ন”, অথচ কবে বা কোথায়, মিশর, গ্রীস, রোম প্রভৃতি ভারতভূমির বহির্ভূত দেশগুলি এককালে সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল সেই “বিপুল সুদূর” “অতীতের স্মৃতি ত তাঁহার নিকট ক্ষীণ নহে, অনেক স্থলে ইহা আবার প্রবাদ গল্পের কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন” হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার নিকট ত ইহা ঐতিহাসিক সত্যরূপেই গণ্য হয়। বাঙ্গলার এই “বিপুল সুদূর” অতীতের ইতিহাস না হয়, ছাড়িয়াই দিলাম; কিন্তু খ্রীঃ সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দের শেষ পর্য্যন্ত “বাঙ্গলার মহিমান্বিত প্রাগ্‌-মুসলমান যুগের” স্মৃতি যদি আজ বহু ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের পরেও সাহিত্যিকের নিকট “ক্ষীণ” থাকিয়া যায়, তাহা হইলে দোষ কাহার? আর একটী কথা, বাঙ্গলার ইতিহাস তাহার কোনও ‘হেরোডটাস্‌’ লিখিয়া রাখেন নাই; গত সার্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বহু চেষ্টার ফলে যাহা কিছু “পাথুরে প্রমাণ” আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাই আধুনিক ঐতিহাসিকগণের নিকট বাঙ্গলার ইতিহাস রচনার প্রধান উপাদান। কিন্তু সাহিত্যিকের নিকট এই সকল প্রমাণই “মিথ্যাময়ীর মুখর ভাষণ” ও কবির লেখনী-নিঃসৃত যাহা কিছু তাহা ঐতিহাসিক সত্যরূপে গণ্য হইয়া উঠিতে বিলম্ব লাগে না। কবি বা কাব্য আধুনিক হইলেও ক্ষতি নাই, কেন না, কবিকাব্যে ত জাতীয় জীবনের চিত্রটীকে প্রতিফলিত হইতেই হইবে; অথচ কবি যে কত “স্বকপোল-কল্পিত অযথা কলঙ্কে স্বজাতির আপাদ মস্তক কলঙ্কিত করিয়া কাব্য রসের অবতারণা করিয়াছেন” সে দিকে তাঁহার কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। কবি লেখনীর প্রতি এই অগাধ ও অন্ধবিশ্বাস ইতিহাস-বিমুখ বাঙ্গলা দেশে কবির পথ একরূপ “নিরঙ্কুশ” করিয়াই দিয়াছে। তাই আজ ভয় হয় বুঝি বা হাস্য-রসিক কবির ব্যঙ্গোক্তি “লক্ষণ ত দিলেন চম্পট কচুবনে এক দৌড়েতে” অথবা সভা কবির “ঘৃণা ভরা ঔদাস্যের” সহিত প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু বর্ণনায় কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য না থাকিলেও তাহা সত্যরূপেই গণ্য হইয়া বসে। শিক্ষিত বাঙ্গালীর এই “সাধারণ মনোভাব” লক্ষ্য করিয়াই শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার যশোহর-খুলনার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে “বাঙ্গালী আজকাল এতই গল্পরসিক যে তাহার নিকট হইতে সস্তায় বাহবা লইতে হইলে কোনও প্রকার চেষ্টা, অনুসন্ধান বা ঐতিহাসিক সঙ্গতি রক্ষার প্রয়োজন হয় না।” শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয়ের বহুপূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ও তাঁহার সিরাজদ্দৌলায় নবীন বাবুর ন্যায় স্বদেশ ভক্ত, কৃতবিদ্য সাহিত্য সেবকের দ্বারা সিরাজের প্রেতাত্মাকে অলীক ও কঠোর আক্রমনে জর্জ্জরিত হইতে দেখিয়া লিখিয়াছেন যে, “যে দেশের কবিকাহিনী ইতিহাস রচনার ভার গ্রহণ করিয়াছে, সে দেশের সিরাজ-কালিমা যে উত্তরোত্তর দুরপনেয় হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি?” শ্রীযুক্ত ডাঃ রায় দীনেশ চন্দ্র সেন বাহাদুর কিছু সান্ত্বনার কথা কহিয়াছেন যে,

"সত্য হইতে মিথ্যার ছবিই কবির তুলিতে সুন্দর হয়, চার্লস সেকেণ্ডের নিকট একবার এক কবি একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" আমাদের এইটুকুই সান্ত্বনা যে পরাধীন বাঙ্গালা দেশ ভিন্ন অন্যান্য স্বাধীন দেশের কবির তুলিতেও "সত্য হইতে মিথ্যার ছবিই সুন্দর" হইয়া ফুটিয়া উঠে। কিন্তু তবুও ত একথা ভুলিতে পারা যায় না যে, ইংলণ্ডের ও বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের মনোভাব আকাশ পাতাল তফাৎ। ইংলণ্ডের ইতিহাস জানিতে হইলে কোনও শিক্ষিত ইংরাজকে তাহার শ্রেষ্ঠ কবি শেক্সপীয়রের নাটকের শরণাপন্ন হইতে দেখা যায় না, কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের ন্যায় বাঙ্গালার ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা জানিতে হইলে শিক্ষিত বাঙ্গালীকে কবি নবীনচন্দ্রের "যুদ্ধকাব্য"খানি ইতিহাস রূপে পাঠ করিয়া তাহার জ্ঞানলাভ-স্পৃহা নিবৃত্ত করিতে দেখি।

সাহিত্য হইতেই জাতীর চরিত্র অঙ্কন করিতে যাইয়া কৃষ্ণবিহারী বাবু বিজয়সিংহ, শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজগণ ও প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্রের উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন; সবিশেষ আলোচনা করেন নাই। বোধ হয় তাঁহাদের বীরত্ব "দেব-দেবীকে লইয়া আমাদের যাহা কিছু সাহিত্য" তাহাতে প্রতিফলিত হয় নাই বলিয়াই তাহাদের স্মৃতি তাঁহার নিকট "ক্ষীণ" হইয়া গিয়াছে। বিজয় সিংহের লঙ্কাজয় ঐতিহাসিক ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিয়াও তিনি তাহা "প্রবাদ-গল্পের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন" বলিয়া ত্যাগ করিতে চাহেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই কি তাঁহার পক্ষে বাঙ্গালার মুসলমান যুগে রচিত মনসা ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য গুলিতে খ্রীঃ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতেও সিংহলের সহিত বাঙ্গালার যে কত মধুর সম্বন্ধ ছিল, তাহাও উল্লেখ করা উচিত ছিল না? বাঙ্গালার সেই বিপুল সৌসাধনের স্মৃতি আজিও যে নারায়ণদেব, বিজয় গুপ্ত, বংশীদাস, কেতক-দাস, ক্ষেমানন্দ, মুকুন্দরাম প্রভৃতি মধ্যযুগের কবি কাব্যে ও বাঙ্গালার পল্লিগীতিকায় স্পষ্টরূপেই জাগ্রত রহিয়াছে, তাহাও কি তিনি নিছক কবিকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন? "গৌড় ভুজঙ্গ" শশাঙ্কের স্মৃতি না হয় তাঁহার নিকট "ক্ষীণ" কিন্তু তাই বলিয়া সেই যুগেই যে গৌড়ী ভাষা নামক এক স্বতন্ত্র ভাষা ও কাব্য রচনাতে গৌড়ী রীতি নামক এক স্বতন্ত্র রীতি অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালী সাহিত্যের ইতিহাসেও এক অভিনব স্বাধীন মত প্রচার করিয়া ধন্য হইয়াছিল তৎসম্বন্ধেও নির্ব্বাক্ থাকা তাঁহার পক্ষে কি উচিত হইয়াছে? প্রায় সার্দ্ধ চারি শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালার বিরাট গৌরবময় পাল-বৌদ্ধ যুগ তাঁহার নিকট "সুদূর অতীতের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন"; কিন্তু এই পাল নরপাল-দিগের স্মৃতি জাতির মনোরাজ্যে কি প্রভাব প্রকটিত করিয়াছিল তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যেরই "প্রশংসাগীতি" গুলি পরিচয় প্রদান করে। পালরাজগণের এই স্তুতিব্যঞ্জক গীতিকাগুলি আজিও দিনাজপুর ও রংপুরের যুগীদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। রামচরিত, চণ্ডকৌশিক, দিক্বেশ্বরী প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ বীর বাঙ্গালীর মূর্ত্তিই চক্ষের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলে। মাণিক রাজার গান, ময়নামতির গান, গোবিন্দ রাজার গান, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি, বাঙ্গালার ধর্ম্ম-সাহিত্য একদিকে যেরূপ বাঙ্গালীর শৌর্য্যবীর্য্যের ও বঙ্গ-রমণীর অসিধারণ পটুত্বের পরিচয় প্রদান করে, অন্যদিকে সেইরূপ বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী রাজ্যেশ্বর রাজার দ্বিতীয় সিদ্ধার্থের ন্যায় সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া বাঙ্গালীর ত্যাগে ও প্রেমে মহনীয় চরিত্রের সন্ধান জানাইয়া দেয়। এই যুগেই রচিত খনা ও ডাকের বচনগুলি প্রমাণ করে যে "বাঙ্গালী এক-কালে চিন্তাশীলতায়, সূক্ষ্মদর্শিতায়, ও ভবিষ্যৎদর্শিতায় এক অতি উচ্চস্তরে উঠিয়া পড়িয়াছিল।" এই সকল সাহিত্যিক প্রমাণগুলি "বাঙ্গালীর অতীতে" উল্লেখ করিয়া বাঙ্গালীকে কিছু কলঙ্কমুক্ত করিবার চেষ্টাও তিনি সঙ্গত বোধ করেন নাই। "শঙ্কর গৌড়েশ্বর" লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন কাহিনী তিনি হাস্যরসিক কবির ভাষায় বর্ণনা করিয়া স্বজাতির চরিত্রে কটাক্ষপাত করিতে ছাড়েন নাই, কিন্তু এই সুকবি লক্ষ্মণ সেনের, বা তাঁহার সভাকবি শ্রুতি-ধরা ধোয়ীর, অথবা কোকিল-কণ্ঠ জয়দেবের মধুর কলতানে তিনি মুগ্ধ হন নাই। বাঙ্গালার এই "বিক্রমাদিত্যের" রাজসভার হলায়ুধ, পশুপতি, পুরুষোত্তম, শূলপাণি, গোবর্দ্ধনাচার্য্য, উমাপতিধর প্রভৃতি এক একটী উজ্জ্বল রত্নেরও কিছুমাত্র উল্লেখ করা তিনি কর্ত্তব্য বোধ করেন

শ্রীনীলমণি আচার্য্য

নাই। আবার পাঠান আমলের হুসেন শাহী সাহিত্য ও প্রতাপাদিত্যের আমলে মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম প্রভৃতি সমসাময়িক কবির কাব্য বাঙ্গালার শৌর্য্য বীর্য্যের, শিল্প গৌরবের, বাণিজ্য বিস্তারের কত কথা যে স্মরণ করাইয়া দেয় তাহাও তিনি উল্লেখ করেন নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুও লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালী তখনও একান্ত মৃদু ও কুসুম-সুকুমার হইয়া পড়েন নাই, তাই বীরত্বের কাহিনীগুলিতে মূলের উদ্দীপনার যথাযথ প্রতিধ্বনি জাগিয়াছে, অমার্জ্জিত ভাষার মধ্যেও সংক্ষুব্ধ চিত্তের ক্রোধ, অপমান প্রভৃতি রসের প্রবাহ অনেকটা বাধ বাধ হইয়াও যেন কবির উত্তেজনার প্রখরতার পরিচয় দিতেছে।" তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন "তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যুদ্ধাদি সর্ব্বদাই ঘটিত এবং এই কৃশাঙ্গ ভীরু বঙ্গবাসীদের মধ্যেও সৈনিকপুরুষের অভাব ছিল না।" বাঙ্গালী কবি গঙ্গারামের "মহারাষ্ট্র পুরাণ" পলাশী যুদ্ধের সাত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। কবি সমসাময়িক বর্গীর অত্যাচার-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া একবার আলীবর্দ্দীর বাঙ্গালী সৈন্যের নিকট মহারাষ্ট্র বীর ভাস্কর পণ্ডিতের পরাজয় কাহিনী ও পুনরায় চল্লিশ হাজার বরগী ফৌজের" সহিত উড়িষ্যা-বিজয় জনিত রণশ্রমে ক্লান্ত, অনাহার-ক্লিষ্ট, মুষ্টিমেয় পঞ্চ সহস্র বঙ্গ সেনার "চৌদ্দ রোজ" ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া কাটোয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন কাহিনী গাহিয়া ধন্য হইয়াছেন। বাঙ্গলার দুর্ভাগ্য যে তাহার কোনও জেনোফন্ এই পঞ্চ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া অমর হইবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু সমসাময়িক ইংরাজ লেখক হলওয়েল, "ইহাকে দশ সহস্র গ্রীক সৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তনের" সহিত তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন—"If we consider the retreat of these veterans... ..in all its circumstances it will appear as amazing an effort of human bravery as the history of any age or peopole have chronicled, and we think it merits as much being recorded and transmitted to posterity as that of the celebrated Athenian general and historian." এইরূপে বিশাল বঙ্গসাহিত্যের মধ্যেই যে বাঙ্গালার কত শত লুপ্ত গৌরবের সন্ধান পাওয়া যায় তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আজ এক গ্রাণ্ট ডাফ্ ও এক টডের কৃপায় মহারাষ্ট্র ও রাজপুত জাতি ভারত ইতিহাসে বীর বলিয়া পরিচিত, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে এক মেকলের কৃপায় বাঙ্গালী জগৎ সভায় মিথ্যাবাদী, শঠ, প্রবঞ্চক, জালিয়াত ও ভীরু-রূপেই গণ্য হয়।

তারপর মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের যে নায়ক দুইটীর চরিত্র হইতে কৃষ্ণবিহারী বাবু বাঙ্গালীকে ভীরু ও দৈবী-শক্তিতে একান্ত নির্ভরশীলরূপে চিত্রিত করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাক্। মূল চণ্ডীকাব্যখানি পাঠ করিয়াও তিনি যে কেন তাহাদের "ললাটে মহত্ত্বের দীপ্তি" দেখিতে পাইলেন না তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। প্রথমে কালকেতুর কথাই ধরা যাক্। ব্যাধ কালকেতুকে লইয়া কোনও তর্ক নাই; কেন না কৃষ্ণবিহারী বাবুও স্বীকার করেন যে তখন তাহার "অতুলনীয় বল বিক্রম ও সাহস তাহাকে প্রকৃত বীরের উচ্চ পদবীতে সমারূঢ় করিয়া রাখিয়াছিল।" যত গোল এইখানে যে চণ্ডীর কৃপায় রাজা হইয়া নাকি কালকেতু এই প্রকৃত বীরত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু গুজরাটে রাজা হইবার পরও কবি বহুস্থলে কালকেতুকে অর্জ্জুন সমান বীর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কালকেতুর চরিত্র সম্যক আলোচনা করিলে এই একমাত্র সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। কলিঙ্গ রাজদূতের মুখে কবিবীরের বীরত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

অর্জ্জুন সমান ধরে বাণ।

* * * *

বড় ক্ষেত্রী ব্যাধের নন্দন

* * * *

দেখিয়া বীরের দাপ অঙ্গে মোর হইল কাঁপ
বেগে আইলুঁ মনে পেয়ে দুঃখ।
যোদ্ধাপতি বীরবর জিনিতে কদাচ পার
নিশ্চয় কহিতে নাহি পারি।"

কবিকঙ্কনও যাহা বর্ণনা করেন নাই তাহাও যদি কবির স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া কালকেতুকে ভীরু প্রমাণ করা

হয় তাহা হইলে ত দুঃখ রাখিবার আর স্থান থাকে না। কৃষ্ণবিহারী বাবু লিখিয়াছেন যে "কলিঙ্গাধিপতির সহিত যুদ্ধে হারিয়া, স্ত্রীর অনুরোধে সে (কালকেতু) শয়ন-প্রকোষ্ঠে লুকাইয়া রহিল।" অথচ আমরা দেখিতে পাই যে কবি মুকুন্দরাম কলিঙ্গাধিপতির সহিত যুদ্ধে কাল-কেতুর কণ্ঠেই বিজয়মালা অর্পণ করিয়াছেন -

বীরের বিক্রম দেখিয়া নিরুপম
নৃপতি সেনা দেয় ভঙ্গ॥

অথবা—"পলায় রাজার সেনা না হয় সম্মুখ।"

যদি কালকেতুর 'চরিত্রে কিছুমাত্র কলঙ্ক থাকে তবে তাহা এইটুকুই যে এই পরাজিত কলিঙ্গ সেনা ধূর্ত্তশ্রেষ্ঠ ভাঁড়, দত্তের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া পুনরায় গুজরাট রাজ্য আক্রমণ করিলে যখন সে সমর করিতে প্রস্তুত ছিল তখন ফুল্লরার কথা শুনিয়া "লুকাইল বীর ধান্যঘরে।" শয়ন প্রকোষ্ঠে নহে। এখন দেখিতে হইবে যে ফুল্লরা এমন কি কথা তাহাকে শুনাইল যাহাতে কালকেতু আর যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না হইয়া ধান্যঘরে লুকাইয়া রহিল। এই স্থলে কবি বর্ণনা করিয়াছেন যে, পত্নীর কাতর প্রার্থনায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সে যখন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে রাজি হইল না, তখন ফুল্লরা, "স্বায় আহ্লাদের" সহিত রামায়ণ হইতে "জায়ার বুদ্ধি না মানিয়া" সমর করিতে আসিয়া বালী কিরূপে রামশরে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল সেই ইতিহাস বর্ণনা করিয়া পতিকে রাজার সমর হইতে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল—

হারিয়া যে জন যায় পুনরপি আইসে তায়
হেতু কিছু আছয়ে বিশেষ॥

* * *

আমি কহি উপদেশ যদি না ছাড়িবে দেশ
রামায়ণে শুন ইতিহাস॥

* * *

সুগ্রীব রামের তেজে বালির দুয়ারে গর্জ্জে
ধায় বালী রণ অভিমুখে।

* * *

তারে বিড়ম্বিল বিধি না মানে জায়ার বুদ্ধি
সমরে পড়িল রাম শরে।

(অতএব) ফুল্লরার কথা রাখ কিছুকাল জীয়া থাক
না যাইও রাজার সমরে॥
(তখন) ফুল্লরার কথা শুনি হিতাহিত মনে গণি
লুকাইল বীর ধান্যঘরে।"

এ কথা ভুলিলে ত চলিবে না যে কবির প্রধান উদ্দেশ্য কালকেতুর দ্বারা চণ্ডী দেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন। তাই বীরের পরাজয় ঘটাইবার জন্য কবিকঙ্কন ব্যাধ দম্পতির উপযুক্ত শিক্ষা ও দীক্ষার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া কাল-কেতুর মহৎ তেজকে তাহার সরল বিশ্বাস বা কুসংস্কারের ঊর্দ্ধে লইয়া যান নাই। অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কার যে প্রকৃত বীরত্বকে কিছুমাত্র মলিন করিতে পারে না, তাহা যাঁহারা গ্রীস ও রোমের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। গ্রীসের Delphic Oracle ও রোমের Augurs, গ্রীক ও রোমক জাতিকে "দৈবী শক্তিতে একান্ত নির্ভরশীল" জাতি বলিয়াই পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহ গ্রীক্ ও রোমক বীরকে পুরুষাকার হিসাবে খর্ব্ব করিতে বা তাহাদের চরিত্রে ভীরুতার কলঙ্ক লেপন করিতে সাহস পায় নাই। আর আমাদের দুর্ভাগ্য যে মেকলের তুলি দিয়া আঁকা আমাদের জাতীয় জীবনের চিত্রটীকে আমাদেরই শিক্ষিত ব্যক্তিরা উত্তরোত্তর মসীময় করিয়াই তুলিতেছেন। মুকুন্দরাম যদি দেবীর মাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্য কালকেতুর বীরত্বকে এই স্থলে কিছু খর্ব্বও করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করিবার কারণ নাই। কেননা এই মুকুন্দরামেরই সমসাময়িক কবি মাধবাচার্য্য তাঁহার চণ্ডী-কাব্যে কালকেতুকে এই স্থলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার কালকেতু ফুল্লরার নিষেধ বাক্যে রোষকষায়িত লোচনে উত্তর দিয়াছিল—

শুন রামা আমার উত্তর।
করে লইয়া শর গাণ্ডী পূজিব মঙ্গল চণ্ডী
বলি দিব কলিঙ্গ ঈশ্বর॥
যতেক দেখহ অশ্ব সকল করিব ভস্ম
কুঞ্জর করিব লণ্ড ভণ্ড
বলি দিব কলিঙ্গ রায় তুষিব চণ্ডিকা মায়
আপনি ধরিব ছত্র দণ্ড॥

শ্রীনীলমণি আচার্য্য

শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন যে "জনার্দ্দন কবির কালকেতু উপাখ্যানে গুজরাটে যাইয়া রাজ্যাদি স্থাপনের কথা ও কলিঙ্গাধিপতির সহিত যুদ্ধ বর্ণনা নাই; ক্ষুদ্র গীতিটী কাব্যে পরিণত করিবার সময় কবিগণ নিজ হস্তে একটী মানচিত্র আঁকিয়া লইয়াছেন।" তিনি আরো বলেন যে "গল্পাংশে উভয় কবিরই (মুকুন্দরাম ও মাধবাচার্য্য) বেশ ঐক্য আছে—মধ্যে মধ্যে মুকুন্দ স্বীয় কল্পনার কোন রম্য দৃশ্য বা মানুষ-চরিত্র জ্ঞানের কোন বিচিত্র আদর্শ দেখাইতে পূর্ব্বশ্রুত গল্পের সরল বর্ত্মের পার্শ্বে একটু তির্য্যগ-লীলা করিয়া লইয়াছেন।" আমার মনে হয় কবিকঙ্কনের এই তির্য্যগ্ লীলার ফলেই কালকেতুর ধান্যঘরে অবস্থান। কেন না, যদি একই সময়ের দুইটী কবি-কাব্যে একই কালকেতু উপখ্যান পাঠ করিবার কালে যদি স্থান বিশেষে ভিন্নরূপ "মানচিত্রের" নয়ন গোচর হয়, তাহা হইলে কি এক-মাত্র সেই কবির কল্পনাই তাহার জন্য দায়ী হয় না? ক্ষণি-কের তরে ধান্যঘরে লুকাইয়া ছিল বলিয়া কালকেতুর তথা বাঙ্গালীর চরিত্রে ভীরুতার কলঙ্ক রোপণ করা কি আমাদের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত? মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরামের প্রায় এক-শত বৎসর পরে রচিত মুক্তারাম সেনের "সারদামঙ্গলে"ও কালকেতুকে বীর রূপেই চিত্রিত হইতে দেখি—

> সৈন্যের ভিতরে কেতু মহা অস্ত্র মারে।
> প্রচণ্ড বাতাসে যেন কদলী উফারে॥
> ভয় পাইয়া কালকেতু শূন্যহাতে জাএ।
> মধ্যপথে বন্দী হইল দুর্গার লীলাএ॥

এই কাব্যেও কালকেতুর কণ্ঠে কবি বিজয়মাল্য অর্পণ করিয়াছেন ও তাঁহার কলিঙ্গ সেনার হস্তে বন্দী হইবার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপেই বিবৃত করিয়াছেন। সরল বিশ্বাস যদি কলঙ্ক হয় তাহা হইলে এইটুকু মাত্র কলঙ্কই মুকুন্দরাম এই স্থলে ব্যাধরাজার দীপ্ত ললাটে লেপন করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত বীরত্বকে তিনি কোথাও খর্ব্ব করেন নাই। সুচতুর ভাঁড়ু দত্তের কৌশলে কালকেতুর ধান্যঘরে অবস্থান বুঝিতে পারিয়া কোটাল বীরের পুরী পুনরায় ঘেরিলে, কবি দেখাইয়াছেন যে—

> শুনিয়া বৃত্তান্ত বীর হয়ে রোমাঞ্চিত।
> বিপক্ষ পক্ষের মধ্যে হৈল উপনীত॥
> একদিকে একাকী বীর হানে লাখে লাখে।
> কোটালের চতুরঙ্গ সৈন্য অন্য দিকে॥

সাধারণ ভীরুর ন্যায় আত্মসমর্পণ না করিয়া সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায় একাকী কলিঙ্গ রাজের চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ বর্ণনা করিয়া কবি কালকেতুর বীরত্বই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই যুদ্ধে তাহার পতন হয়, কিন্তু তাহার জন্য মহামায়া দায়ী। তিনি কালকেতুর শাপ অবসান প্রায় দেখিয়া ও পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া বীরের অঙ্গের বল হরণ করিলেন। তখন—

> চতুরঙ্গ দলেতে কোটাল বীরে বেড়ে।
> সৈন্য ঠেলাঠেলিতে ভূমিতে বীর পড়ে॥
> দশ বিশ জনে মেলি ধরে এক হাত।
> বীরে ধরি কোটাল স্মরয়ে বিশ্বনাথ॥

সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াও যে রাজমুকুট তাহার চরিত্রের হীনতা" (?) ঢাকিতে পারিয়াছিল, কবি তাহাও বর্ণনা করিয়াছেন—

> গুজরাটে কালকেতু খ্যাত হৈলা রাজা।
> আর যত ভূঞা রাজা করে তার পূজা॥
> কোন রাজা সম নহে করিতে সমর।
> পরাজিত হয়ে সবে দেয় রাজ কর॥

কৃষ্ণবিহারী বাবুর পক্ষে কবিকঙ্কনের সমসাময়িক বা ভিন্ন ভিন্ন যুগের চণ্ডীকাব্য কালকেতু চরিত্র কিরূপ ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে তাহার কিছু মাত্র আলোচনা না করিয়া কেবল মুকুন্দরামের কালকেতুকেই ভীরু বাঙ্গালীর প্রতিমূর্ত্তি রূপে গণ্য করা সঙ্গত হয় নাই। তবুও যদি তিনি কবি-কঙ্কনের কালকেতু চরিত্রটী যথাযথ রূপে ফুটাইয়া তুলিতেন। তিনি মূল চণ্ডীকাব্য খানি পাঠ করিয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" হইতে একটী লাইন মাত্র উদ্ধৃত করিয়া শিক্ষিত লোকসমাজে কালকেতুর ভীরু (?) চরিত্র প্রকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুই কালকেতু সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহাও উল্লেখ করা কি তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য ছিল না? "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" অপর স্থলে শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু

লিখিয়াছেন যে "কালকেতুর বল ও সাহস একজন উচ্চদরের সৈনিকের উপযুক্ত।" কালকেতু সম্বন্ধে তাঁহার মত আরো স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইয়াছে তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত "History of Bengali Language and Literature" নামক গ্রন্থখানিতে—"When we come down from the higher ranks of Hindu community to the lower, we find our hero Kalketu and his wife Phullara representing all stages of poverty-stricken rustic life, but *the manliness of Kalketu and the chaste womanhood of Phullara exemplify the noble qualities which with all their ignorance and superstition characterise the masses of Bengal.*" শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর এই অভিমতের সন্ধান কৃষ্ণবিহারী বাবু বোধ হয় রাখেন নাই।

তারপর কবি কঙ্কনের দ্বিতীয় নায়ক ধনপতি সদাগর। ধনপতির চরিত্র বিশেষ ভাবে আলোচনা না করিয়াই তিনি এই স্থলেও শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। তাই তিনি ধনপতির ললাটে "মহত্ত্বের দীপ্তি" দেখিতে পান নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন যে "দেব শক্তির প্রতি একান্তরূপ নির্ভরতা হেতু পুরুষ চরিত্রগুলি স্বীয় শক্তির ভিত্তিতে দাঁড়াইতে পারে নাই।" আর কৃষ্ণবিহারী বাবু লিখিয়াছেন—"দৈবীশক্তিতে একান্ত নির্ভরশীল কবি পুরুষকারকে খর্ব্ব করিয়াছেন।" শ্রদ্ধেয় ডাঃ সেন মহাশয় তাঁহার এই পূর্ব্ব মত বদলাইয়াছেন কিনা জানি না, না বদলাইয়া থাকিলেও মূল চণ্ডীকাব্যখানি পাঠ করিয়া ধনপতির ললাটে "মহত্ত্বের দীপ্তি" দেখিবার চেষ্টা করিলে কি বঙ্গভাষার অন্যান্য সু-সাহিত্যিকের পক্ষে অন্যায় হইত? একমাত্র চাঁদ সদাগরের ভাগ্য ভাল কেননা, কৃষ্ণবিহারী বাবুও স্বীকার করিয়াছেন যে "তাহার চরিত্রে তেজ ও পুরুষকার মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছে।" এই চাঁদ সদাগরের সহিত তুলনা করিয়া ধনপতিকেই আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও বিদ্যাতে "তেজ ও পুরুষকার" হিসাবে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছি। হয় ত বা ভুল করিয়াছি; কিন্তু ধনপতির চরিত্র আমাকে সত্যই বড় মুগ্ধ করিয়াছে;—তাহার "দুঃখ বজ্রখিন্ন বীরোচিত উন্নত মস্তকে যে ক্ষাত্র তেজ" কবি "আগ্নেয় লিপিতে অঙ্কিত করিয়াছেন" তাহা আপনাদের সম্মুখে জাজ্বল্যমান করিয়া তুলিয়া ধরিলাম; আপনারাই ধনপতির চরিত্রের প্রকৃত মহত্ত্বের বিচার করিবেন। মনসামঙ্গলের সকল কবিই দেখাইয়াছেন যে চাঁদ বেনের দ্বারা পূজিত না হইলে জগতে বিষহরি দেবীর পূজার প্রচলন হইবে না; তা সে পূজা চাঁদ ভক্তি ভরেই করুক্ বা (শিবের আদেশে) বাম হস্তে অশ্রদ্ধারই সহিত করুক্। কাব্যগুলিতে "চাঁদের অসামান্য তেজ, ধৈর্য্য, দৃঢ়তা ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠা খুব স্পষ্টই ফুটিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু শতবিপদে পড়িয়াও চাঁদের এই দৃঢ় বিশ্বাসটুকু ছিল যে স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই মনসা দেবী তাহার প্রাণবধ করিতে পারিবেন না। অতএব চাঁদের মনসা বিদ্বেষে ইহাই তাহার মস্ত বড় একটা শক্তি ছিল যাহার বলে সে শত দৈন্য ও প্রলোভনের হাত এড়াইয়াছিল। অবশ্য স্নেহশীলা বেহুলার পতি-প্রেমের করুণাধারায় তাহার দৃঢ়তা ভাসিয়া না গেলে, (ও শিবের আদেশ না হইলে) চাঁদ যে মৃত্যু তুচ্ছ করিয়াও মনসার পাদপদ্মে পুষ্প-জল অর্পণ করিত না, ইহাও ঠিক। চাঁদের এই অপূর্ব্ব পুরুষকারকে খর্ব্ব করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু বিনা দোষে চণ্ডীর প্ররোচনায় 'অশেষ দুর্গতির মাঝেও ধনপতি সদাগর যখন একনিষ্ঠ হইয়া স্বধর্ম্ম পালন করিয়াছিল, তখন তাহার কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না যে চণ্ডীদেবী তাহাকে প্রাণে মারিতে পারিবেন না, বরং ভয়ই ছিল যে তাহাকে—

"না জানি চণ্ডীর কাছে দেয় বলিদান।"

চণ্ডীকাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রধান উদ্দেশ্য দেবীর অভিলাষ "স্ত্রীলোকের হাতে পূজা গ্রহণ করিবার বর্ণনা। দেবীর এই সাধ পূর্ণ হইয়াছিল তাঁহার" ধনপতির সহিত বিবাদ বাধিবার বহুপূর্ব্বেই। কিন্তু ধনপতি পুত্র শ্রীমন্তের দ্বারা অবনীমণ্ডলে স্বীয় পূজা প্রচার করিতে হইবে বলিয়াই ধনপতিকে দেবী কর্ত্তৃক অশেষরূপে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে দেখি। তাই ধনপতি চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করিয়া মঙ্গল

শ্রীনীলমণি আচার্য্য

বারি ফেলিয়া দিলে যদিও দেবী—

"শুন পদ্মা আমার বচন ॥

দেহ গো নিশান শিঙ্গা, বুড়াও সাধুর ডিঙ্গা,

ধনে প্রাণে মরুক ধনপতি।

সাধিব আপন কাজ, নিশ্চয় বধিব আজ,

কেমনে রাখিবে পশুপতি ॥"—

বলিয়া কোপ প্রকাশ করিয়াছিলেন তবুত তাঁহাকে ধনপতির "শোনিতে স্নান" করিবার সাধ তখন দমন করিতেই হইয়াছিল, কেন না—পদ্মা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে—

"ধনপতি সাধু যদি মরে এই কালে

তবে ত না হবে পূজা অবনীমণ্ডলে।"

এই যাত্রায় ধনপতির প্রাণ দেবীর কৃপায়ই রক্ষা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ধনপতি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না, সে—

দ্বাদশ বৎসর হৈতে, পূজা (করে) এক চিত্তে

বংশে বংশে মৃত্তিকা শঙ্কর।

অতএব প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে স্বীয় সিংহল যাত্রার সকল বিঘ্ন নাশ হেতু চণ্ডীর নিকট প্রার্থনা করিতে দেখিয়াও ধনপতি—

মোর ব্রত ভঙ্গ কৈলি হইলি কুলের কালী

মেয়ে দেব পূজি হৈলি অরি—

বলিয়া চণ্ডীর ঘট পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল।

পুরুষকারের এই জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি ধনপতি, দৈবজ্ঞের প্রতিকূল গণনায় কিছুমাত্র ভীত না হইয়া শত অমঙ্গল চিহ্ন অগ্রাহ্য করিয়া, আপনার ইচ্ছামত দিবসে, "শঙ্কর স্মরণ করিয়া" সিংহলে যাত্রা করিল। মগরায় দেবীর চক্রান্তে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টিতে, চক্ষের সম্মুখে একে একে তাহার বড় সাধের ছয়খানি ডিঙ্গা লোক লস্কর পণ্যরাজিসহ ডুবিয়া গেল ; স্বীয় "মধুকর" আচ্ছাদন শূন্য হইয়া জলমধ্যে "চাকের ন্যায়" ঘুরিতে লাগিল, সাধু তখনও শঙ্কর বলিয়াই ক্রন্দন করিয়াছিল। এদিকে মায়াজালে তাহার ছয় ডিঙ্গা ডুবাইয়া বরং মহামায়ারই ভয় হইয়াছিল যদি ভক্ত-শ্রেষ্ঠ ধনপতির কাতর ক্রন্দনে আশুতোষের হৃদয় গলিয়া যায়—

নিত্য সেবে প্রভু হর, তারে মোর বড় ডর

ব্রহ্মবধ সম তার বধ।

সদাগরে দিলে দুঃখ, প্রভু না দেখিবে মুখ,

পদে পদে আমার বিপদ ॥

শুনেছি শঙ্কর স্থানে, দেবগণ বিদ্যমানে

আগে ধনপতির গণনা।

অতএব

"যত নদ নদীগণ, মেঘে দেও বিসর্জ্জন,

মন্দিরে চলহ হনুমান্।

শিব পদে দিয়া মতি, সুখে থাক ধনপতি।"

এইরূপে দেবী রণভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন।

তারপর যখন দেবীরই ছলনায় কালীদহে কমলে কামিনী দেখাইতে না পারায় সিংহলরাজের আদেশে দ্বাদশ বৎসরের জন্য ধনপতিকে অন্ধকূপ কারাগৃহে নিক্ষেপ করা হইল, তখন ব্রাহ্মণীর বেশ ধরিয়া দেবী নিদ্রিত সাধুর শিয়রে উপস্থিত হইলেন। স্বপনে তাহার নিকট কালীদহে কমলে কামিনী দর্শন মণিমুক্তা প্রবালাদিতে পূর্ণ মধুকর ও জলমগ্ন ছয় ডিঙ্গার উদ্ধার, এমন কি "কিঙ্কর করিয়া দিব সিংহল ঈশ্বর." রূপ শত উৎকোচ ও প্রলোভন, এবং "চণ্ডিকা না ভজিলে যে তাহার কারা যন্ত্রণার মোচন হইবে না," বরং "হাটে সুতা বেচিবেক্ লক্ষ পতির ঝি" এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া দেবী যখন ধনপতিকে আদেশ করিলেন—

"সাধু ধনপতি এবে সেব মহামায়া"—তখনও কিন্তু এই একনিষ্ঠ শিবোপাসকটীকে কিছুমাত্র বিচলিত হইতে দেখি না। সে স্বপন হইতে "গজেন্দ্রমোক্ষণ" স্মরণ করিয়া জাগ্রত হইয়া দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিয়াছিল—

যদি মোর বন্দিশালে বাহিরায় প্রাণী।

মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি ॥

সিংহলে পিতাপুত্রের মিলন হইলে পুত্র কর্ত্তৃক চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণনে ও নূতন বৈবাহিক সিংহলরাজ শালবাহন কর্ত্তৃক শিব ও শক্তির অভিন্নতা ও একতনুতা সম্বন্ধে জ্ঞানপূর্ণ উপদেশে, পিতার কঠিন হৃদয় গলিয়া যায় নাই, এবং

বৈবাহিক ধনপতির জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল না,—তাহার অচল অটল প্রতিজ্ঞা—

"যদি মোর যায় প্রাণ, মহাদেব বিনা আন,
অন্য দেব না করি পুজন,

কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই।

এইরূপে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রায় প্রতি ছত্রে ছত্রে কবি ক্ষুদ্র মানবের পুরুষকারের নিকট দৈবশক্তিকে খর্ব্ব করিয়াই দেখাইয়াছেন, চাঁদ সদাগরের ন্যায় ধনপতিরও এই ধনুর্ভঙ্গ পণ মিল্টনের প্যারাডাইস লষ্টের দেব-দ্রোহীর কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু কবিকঙ্কণের বিশেষত্ব এই যে মনসা মঙ্গলের কবিগণের ন্যায় তিনি ধনপতির শিব ভক্তিতে মহামায়াকে ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তিরূপে অঙ্কিত করেন নাই; বরং দেখাইয়াছেন যে ভক্তবৎসলা জগন্মাতা ভক্তশ্রেষ্ঠ ধনপতির নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিতাই বোধ করিতেছেন;—ধনপতির শিবভক্তিতে—

"হাসিতে লাগিল দুর্গা সেবক বৎসল।"
দৃঢ় ভক্ত বটে ধনপতি সদাগর॥

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চাঁদ সদাগরের ন্যায়ই ধনপতিকেও স্ত্রী-দেবতার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই দুইটী পরম শিবভক্তের দ্বারা মনসা ও চণ্ডী দেবীর পূজার প্রচলন তুলনা করিলে ধনপতিকেই শ্রেষ্ঠ আসন না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। শত দুঃখ দৈন্য ও প্রলোভন সহ্য করিয়াও অবশেষে চাঁদ সদাগরের কঠিন হৃদয় স্নেহশীলা বেহুলার অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ ও পতিভক্তির করুণা ধারায় গলিয়া গিয়াছিল;—সতীর পতি-প্রেমের জ্বলন্ত পুরুষকার, চাঁদের দৃঢ়তা ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠা [ভ]াম করিয়া দিয়াছিল, তাই শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু লিখিয়াছিলেন "ইহা গুণীর নিকট গুণীর অবনতি।" কিন্তু শত প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া, সহস্র দুঃখ দৈন্যেও অবসন্ন না হইয়া স্নেহময়ী পত্নীর ছল ছল নেত্রের করুণ আবেদনে ও একমাত্র নয়নপুত্তলি পুত্রের কাতর প্রার্থনায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া স্বীয় সাধনার দ্বারা যখন পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল তখনই, তাহার পূর্ব্বে নহে, ধনপতি চণ্ডীর পূজা করিয়াছিল। যে ধনপতি পুরুষ ও প্রকৃতির অভিন্নতা শিব ও শক্তির একতনুতা সম্বন্ধে সিংহলরাজ মুখে শ্রবণ করিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিয়াছিল, সেই সাধু আজ স্বীয় নিকেতনের নিভৃত পূজামন্দিরে ধ্যান যোগে সেই অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ দর্শন করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিল—

ধ্যানে ধনপতি পূজে মৃত্তিকা শঙ্কর।
পার্ব্বতী হইল তাঁর অর্দ্ধ কলেবর॥

* * *

অর্দ্ধ অঙ্গে শিব শিবা রহেন ধেয়ানে।
বিপরীত দেখি সাধু করে অনুমানে॥
দুই জনে একতনু মহেশ পার্ব্বতী।
না জানিয়া এত দুঃখ হৈল মূঢ়মতি॥

সংসার সাগরের অনেক ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া পুরুষকার মাত্র অবলম্বন করিয়া, স্বীয় একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারাই ধনপতির এই পূর্ণজ্ঞানের বিকাশ—এইখানেই ধনপতি চাঁদ সদাগর হইতে পৃথক, এইখানেই ধনপতির শ্রেষ্ঠত্ব। মনসার ক্রোধে চাঁদের "মহাজ্ঞান" লুপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু "ভ্রূকুটি কুটিল ললাটে শত উৎপীড়ন ও কষ্ট নীরবে সহ্য করিয়া পরাজয় বা আত্মসমর্পণের কথা মনেও স্থান না দিয়া ধনপতির এই মহাজ্ঞানের বিকাশ। এইরূপে পূর্ণ জ্ঞানালোকে তাহার মনের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হইয়া গেল, সেই সঙ্গে দূর হইয়া গেল তাহার দেবী-বিদ্বেষ, তখন ধনপতি কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিল—

চর্ম্ম চক্ষে তোমা আমি না চিনিনু মা।
এই হেতু আমার ডুবিল ছয় না॥
না জানিয়া তোমা সহ হইলাম দ্বন্দ্বী।
এই হেতু দ্বাদশ বৎসর হৈনু বন্দী॥
দোষ ক্ষমা করি মোর লহ পুষ্পজল।
অন্তকালে চরণ-কমলে দিও স্থল॥

ধনপতির এই মহৎ চরিত্রের প্রতিচ্ছবি অন্য কোনও দেশের কবি-কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে কি?

আজিও একশত বৎসর হয় নাই, এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইংরাজি শিক্ষার ফলে আমাদের আজ এতদূর অধঃপতন হইয়াছে যে কালকেতু ও ধনপতির চরিত্র ত আমা-

শ্রীনীলমণি আচার্য্য

দিগকে মুগ্ধ করেই না, এমন কি বাঙ্গলার গৌরবময় বৌদ্ধ-যুগের আচার্য্য জেতারা, জ্ঞান শ্রীমিত্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতীশ, অভয়াকর গুপ্ত, আচার্য্য শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত, প্রভাকর প্রভৃতি বাঙ্গালী ধর্ম্মবীরের স্মৃতি লইয়া গৌরব প্রকাশ করিলে নাকি আমাদের আজ দীনতাটাই বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠে। আজ "ক্যাসাবিয়াঙ্কা" বা "ফিলিপ্ সিড্নী" না হইলে উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাশ্চাত্য সভ্যতা-লোকোদ্ভাসিত চিত্তটাকে আদর্শ পিতৃভক্তি বা আদর্শ ত্যাগের নিদর্শন বড় একটা মুগ্ধ করে না। শিক্ষিত বাঙ্গালীকে কবে এই "সাধারণ মনোভাব" পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের ও মহত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিব? একমাত্র বিশাল বঙ্গসাহিত্য হইতেই যে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের কত শত ত্যাগে প্রেমে, শৌর্য্যে মহনীয় চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তাহারই গণনা করিবার দিন আজি আসিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ মতটী "অন্ধের যষ্টির ন্যায় প্রবলভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়া" তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া, মেকলের ঢঙ্গে স্বজাতির চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিবার উৎসাহ তাঁহাকে আজ ত্যাগ করিতে হইবে। বাঙ্গলা মায়ের শ্যামল কোলে জন্মলাভ করিয়া যে সকল ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীর তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপে বাঙ্গালী জাতিরই কণ্ঠে গৌরবমাল্য অর্পণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সেই অনুপম স্মৃতির আজ সম্যক উদ্ধার করিতে হইবে। মন প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিতে হইবে যে বঙ্গভূমি বাঙ্গালীর শৌর্য্য বীর্য্যের, ধনসম্পদের, শিল্পকলার লীলাভূমি, "আপাত প্রতীয়মান মত-পার্থক্যের সমন্বয় ভূমি, অনন্ত সাধারণ স্বাতন্ত্র লিপ্সার কৌতুহলপূর্ণ সাধন ভূমি।" এই ভূমিকেই কেন্দ্র করিয়া ভারতের ধ্যান-ধারণা, ধর্ম্ম-আরাধনা, ললিত শিল্প-কলার অক্ষয় মন্দাকিনী ধারা একদিন হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া ও বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে লীলা বিভঙ্গে নৃত্য করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল; বাঙ্গালী সেইদিন বিশ্বমানবের দ্বারে দ্বারে এই কল্যাণবারি পরিবেশন করিয়া বৃহত্তর ভারতকে সঞ্জীবিত করিবার গৌরবেই গৌরবান্বিত ছিল। বাঙ্গলার এই গৌরবোজ্জ্বল সুমহান চিত্রটী, অতীতের রুদ্ধ দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাত্র সত্যের ন্যায়, আজ স্বদেশে বিদেশে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী কি এখনও তাঁহার প্রবাদ গল্পের কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন নয়নে এই অনুপম চিত্রটী নিরীক্ষণ করিয়া স্বদেশের গৌরব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিবেন? *

---

* ভাগলপুর কলেজের অধ্যাপক সঙ্ঘের ত্রিংশতিতম অধিবেশনে পঠিত। এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু, অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় ও সতীশচন্দ্র মিত্র ভিন্ন বঙ্গবাণী পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয়ের ময়মনসিংহ পল্লীগীতিকা সম্বন্ধে মতামত মদীয় জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র অগ্রজ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য মহাশয়ের "বাঙ্গালার বল" ও শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "নবাবী আমল" হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।
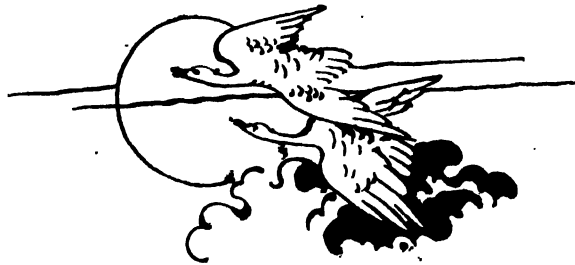
বিবিধ সংগ্রহ

ভারতীয় মন্দিরের গঠন বৈশিষ্ট্য

দক্ষিণ ভারত

পূর্ব্ব সংখ্যায় উত্তর ভারতের মন্দিরগুলির গঠন-বৈশিষ্ট্য আলোচনার ফলে যতটা বুঝা যায় তাহা হইতে মোটামুটি এই বলা যাইতে পারে যে উত্তর ভারতের মন্দির সাধারণতঃ বৃত্তাকারে উঠিয়া ক্রমশঃ শিখরের দিকটা গম্বুজাকারে পরিণত হয়। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের গঠন প্রণালী—স্থপতি-কৌশলের প্রথম অবস্থা হইতেই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। প্রারম্ভে দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির সাধারণতঃ প্যাগোডা আকারের হইত। প্যাগোডা দেখিতে ঠিক ঘণ্টার মত মাথায় চূড়া ও ছত্র আছে। কারু-শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের বৈশিষ্ট্য আরও নূতনত্ব ধারণ করে। মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য মূল মন্দির হইতে খানিকটা দূরে কারুকার্য্য-খচিত তোরণ সৃষ্ট হয়। এই তোরণ দ্বারকে গোপুরম্ কহে। যদি কোন সুবৃহৎ প্রবেশ দ্বারের উপরকার তলাগুলিকে ক্রমশঃ চাপিয়া উপর মুখে উঠান যায়, এবং শেষ পর্য্যন্ত ছাদটিকে শিখর অথবা গম্বুজাকার না করিয়া তাহাকে সরু লম্বা খিলান দেওয়া ছাদে পরিণত করা যায়, তাহা হইলে উহা গোপুরমের আকার ধারণ করে। গোপুরমের মধ্য স্থলে একতলায় প্রবেশ দ্বার থাকে, এবং পরবর্ত্তী তলাগুলি প্রথমটির উপরে পর পর নির্ম্মিত হয়। ইহাদের দেওয়াল, কার্ণিস ও চতুঃপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারাণ্ডাগুলি একতলা হইতে সর্ব্বোচ্চ তলা পর্য্যন্ত কারুকার্য্য ও উৎকীর্ণ চিত্র দ্বারা বিভূষিত থাকে। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ গোপুরম্‌গুলিও দাক্ষিণাত্যের নিজস্ব বিশেষত্ব। উচ্চে ইহারা ৭০ হইতে ২০০ ফুট পর্য্যন্ত হয়।

মাদ্রাজ হইতে পঁয়ত্রিশ মাইল উত্তরে সমুদ্র উপকূলে মামল্লাপুরম্ নামক স্থানে যে বিখ্যাত মন্দির আছে, উহাকে দক্ষিণ ভারতীয় গঠন শিল্পের শৈশব অবস্থা বলা যাইতে পারে, এবং পরে এই আদর্শ অবলম্বনেই তামিল প্রদেশের জগদ্‌বিখ্যাত

মীনাক্ষী মন্দিরের অবস্থান

শ্রীহিমাংশু কুমার বসু

সুচারু মন্দিরগুলির উদ্ভব হইয়াছে। মাম্‌লাপুরমের মন্দিরের পর দাক্ষিণাত্যের বারাণসী কাঞ্চীভরমে আসিলে কৈলাসনাথের বিখ্যাত মন্দির আমাদের চোখে পড়ে। আকারে ছোট হইলেও ইহা দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির-গঠনের দ্বিতীয় অধ্যায়স্বরূপ। কৈলাসনাথের মন্দির এবং নগরবহিরস্থ পল্লব রাজগণের অন্যান্য ক্ষুদ্রতর মন্দিরগুলি, দাক্ষিণাত্যের পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত উন্নত অঙ্গের বৃহৎ বৃহৎ মন্দিরের সহিত মাম্‌লাপুরমের বিহার জাতীয় মন্দিরের জ্ঞাতিত্ব প্রচার করে। [মাম্‌লাপুরম্‌ ও কাঞ্চীভরম্‌ এই উভয় স্থানের মন্দিরই পল্লব-বংশীয় হিন্দু রাজগণের কীর্ত্তি।

মীনাক্ষী মন্দির—মাদুরা

গঠন প্রণালীর দিক্‌ হইতে দেখিলে মাম্‌লাপুরম্‌ মন্দির বৌদ্ধ স্থপতি-শিল্পের আদি যুগের হুবহু অনুকরণ। বাস্তবিক পক্ষে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত মন্দিরের গঠন-প্রণালীই যে বৌদ্ধ স্থাপত্যের আদর্শ অবলম্বনে উদ্ভূত হইয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ যুগের ইমারতগুলি সাধারণতঃ 'চৈত্য' ভেদে দুই প্রকারের। আদিম অবস্থায় চৈত্য ও বিহার পর্ব্বতগাত্র কুঁদিয়া প্রস্তুত—একটার উপর আর একটা পাথর বসাইয়া নির্ম্মিত নহে—কখনও কখনও কাষ্ঠের দ্বারাও প্রস্তুত হইত। পরবর্ত্তীযুগে চৈত্য ও বিহার একটির উপর আর একটি প্রস্তর বসাইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে বটে, কিন্তু

তাহাদের নির্ম্মাণের সাধারণ নক্সা পূর্ব্বাপর একই ধাঁচে চলিয়া আসিতেছে। মাম্‌লাপুরমের মন্দির আদিযুগের বৌদ্ধ চৈত্য ও বিহারের মত পর্ব্বতগাত্র কুঁদিয়া প্রস্তুত। চৈত্যের আকৃতি আয়তাকার, ছাদ পিপার মত গোল ও দীর্ঘ। এই ছাদের এক প্রান্তে দেখিতে ঘোড়ার নালের মত ও উপরের দিকটা ত্রিকোনাগ্র এবং অপর প্রান্ত অর্দ্ধবৃত্তাকার। বিহার চৈত্য অপেক্ষা অধিকতর উন্নত প্রণালীর—স্তরে স্তরে উঠিয়া শীর্ষদেশে গম্বুজাকারের ছাদ লইয়া শোভা পায়। মাম্‌লাপুরমের "ধর্ম্ম রাজের রথ" নামক মন্দিরটী এইরূপ বিহার জাতীয় মন্দির বিশেষ। ইহার ছাদ তিনটি স্তরে স্তরে উঠিয়া চতুর্থ ধাপে গম্বুজাকারে পরিণত হইয়াছে। প্রত্যেকটী স্তরের চারিপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈত্যশ্রেণী কার্ণিস ও আলিসা স্বরূপ থাকিয়া মন্দিরের শোভা সম্পাদন করিতেছে। ছাদের উপরকার এই রকম গম্বুজের নাম 'বিমান'। "ধর্ম্ম রাজের রথ" মম্‌লাপুরমের সাতটি মন্দিরের অন্যতম।

কৈলাসনাথের মন্দিরটি পর্ব্বতগাত্র কুঁদিয়া তৈরী নহে, পাথরের উপর পাথর বসাইয়া নির্ম্মিত। অন্যান্য গঠন-বৈশিষ্ট্য "ধর্ম্মরাজের রথের" প্রায় অনুরূপ; কিন্তু উচ্চতা মূল আদর্শ অপেক্ষা অনেক বেশী এবং ছাদের স্তরের সংখ্যা চারিটি। প্রত্যেক স্তরই পূর্ব্ব বর্ণিত মন্দিরের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈত্যরাজি শোভিত। মন্দিরের সম্মুখে ছাদবিশিষ্ট দ্বারমণ্ডপ ও মন্দির-প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া ৫৭টি ছোট ছোট কুঠুরী আছে।

মন্দির নির্ম্মাণ কৌশলের চরম উৎকর্ষ তাঞ্জোর মন্দির। এই মন্দিরটীর বিমান ত্রয়োদশটী তলার উপর ১৯০ ফুট উচ্চে গঠিত। তাঞ্জোর মন্দির দ্রাবিড় স্থপতি বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। ইহারা শোভা এবং গঠন-কৌশল চাক্ষুষ না দেখিলে সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না। মন্দিরটীকে অধিকতর পরিস্ফুট করিবার জন্য চতুঃপার্শ্বস্থ গৃহাদি একটু নীচু করিয়া গঠিত হইয়াছে। দশম শতাব্দীর শেষের দিকে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়া ১০১২ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। চোলা বংশীয় নৃপতি, ১ম রাজরাজের যুদ্ধজয়ের স্মারক চিহ্ন স্বরূপ এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

দক্ষিণ ভারতে আরও অনেক অতিকায় মন্দির আছে। মাদুরার শিবমন্দির ইহাদের অন্যতম। মন্দিরটীর পরিধি এক মাইলের উপর। মন্দিরের চতুঃসীমা দেওয়াল বেষ্টিত।

শ্রীরঙ্গম্ মন্দির

প্রত্যেকদিকের দেওয়ালের ঠিক মধ্যস্থলেই বিরাটাকার গোপুরম্ বা তোরণদ্বার আছে। ইহা ছাড়া ভিতরের দিকে আরও ছয়টী গোপুরম্ আছে—ইহাদের এক একটী ১০০ হইতে ২০০ ফুট পর্য্যন্ত উঁচু। এই শিবমন্দিরের ও 'মীনাক্ষী' দেবীর মন্দিরের বিমান স্বর্ণনির্ম্মিত; ইহাদের উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া চোখ ঝলসাইয়া দেয়। এই মন্দিরের বিশেষত্ব এই যে ইহাতে এক সহস্র স্তম্ভযুক্ত একটা প্রকাণ্ড নাটমন্দির আছে। প্রত্যেকটী স্তম্ভই এক একটা পাথর কুঁদিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে এবং প্রত্যেকটাই উৎকীর্ণ চিত্রবিভূষিত।

শ্রীরঙ্গমের মন্দির দাক্ষিণাত্যের মধ্যে সুবৃহৎ। মণ্ডপের

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

শ্রীরঙ্গম্—ভাস্কর্য্য

চারিপার্শ্বস্থ স্তম্ভশ্রেণীর গাত্রে খোদাই করা জীবন্ত চিত্রের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। খোদিত চিত্রগুলি এতই বাস্তব যে সহসা দেখিলে কোন ক্রমেই স্থির করা যায় না যে উহা চিত্র মাত্র। স্তম্ভগাত্রের গমনোন্মুখ অশ্বের যে আলোক চিত্র এই পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল উহা দেখিলেই একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। ইহা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ত্রিচিনাপল্লী হইতে তিন মাইল দূরে জম্বুগেশ্বরমে একটী

তিনেভেলির মন্দির ও সরোবর

মন্দিরগুলিরও বিশেষ খ্যাতি আছে। এইস্থানের একটী মন্দিরের গঠন-সৌষ্ঠব অতীব মনোহর। মন্দিরটীর মধ্যে ৫৬টী ৮ ফুট উচ্চ সুদৃশ্য স্তম্ভযুক্ত একটী "নৃত্যসভা" আছে। প্রত্যেকটী স্তম্ভের গাত্রে নৃত্যরত খোদিত মূর্ত্তি আছে। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মূর্ত্তির একত্র সমাবেশ দক্ষিণ ভারতের আর কোনও মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায় না। নৃত্য সভার ঠিক সম্মুখেই দ্রাবিড় স্থাপত্যের পরাকাষ্ঠা "কনক সভা" নামে আর একটী হলঘর রহিয়াছে। 'কনকসভা' 'নৃত্যসভা' অপেক্ষাও সুদৃশ্য ও মনোহর।

নিখিল ভারতবর্ষের হিন্দু নরনারীর নিকট পরম পবিত্র রামেশ্বরমের মন্দির মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির একেবারে দক্ষিণে সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। এই শিবমন্দিরটীও দেখিতে অতি চমৎকার। উচ্চভূমির উপর সমকোণ চতুর্ভুজের আকারে ইহা নির্ম্মিত। মন্দিরের চতুর্দ্দিক পর পর তিনটী প্রসিদ্ধ শিবমন্দির আছে। ইহার গঠন-প্রণালীর মধ্যে অনেক নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভাস্কর্য্যের দিক্ দিয়া ইহা শ্রীরঙ্গমের মন্দিরকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

মাদ্রাজের দক্ষিণে কুম্ভাকোনাম্ সহরটীকে "মন্দিরপুরী" নামে অভিহিত করা হয়। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী নগর চিদাম্বরমের

কাঞ্চীপুরম্ মন্দির ও সরোবর

শ্রীরামেন্দু দত্ত
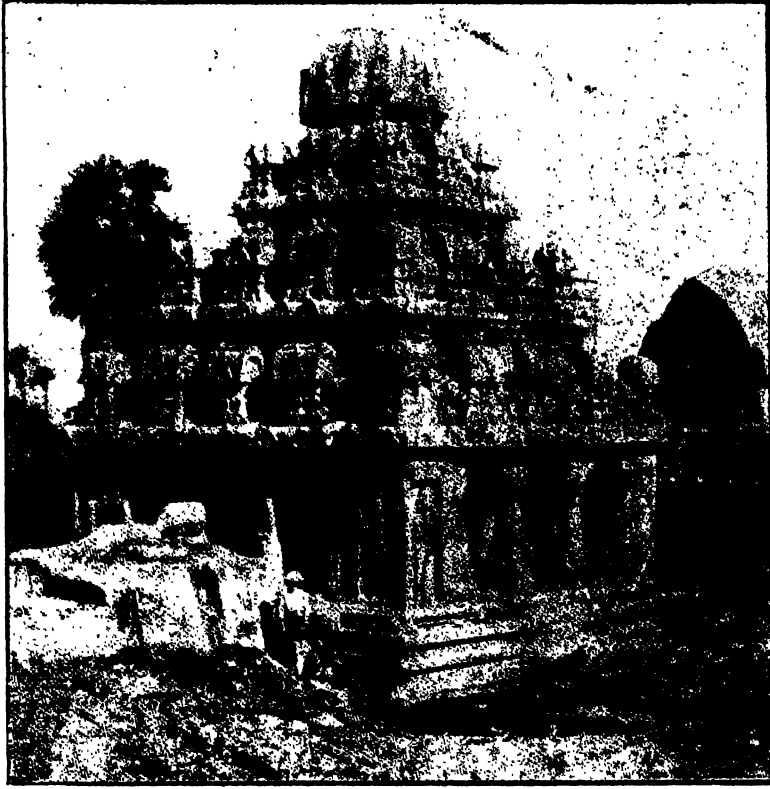
মামলাপুরম্‌—ধর্ম্মরাজার মন্দির

প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই মন্দিরেও দক্ষিণ ভারতের গঠন-শিল্পের সম্পূর্ণতা ও বিশেষত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। রামায়ণের যুগে ইহার নির্ম্মাণ হইয়াছিল আজও সকলের এই বিশ্বাস।

শ্রীহিমাংশুকুমার বসু

অজন্তা ও এলোরার ভাস্কর্য্য-তীর্থ

উত্তর-দক্ষিণে প্রায় মাঝামাঝি আসিয়া ভারতের সমতলভূমি হঠাৎ শেষ হইয়াছে, এবং মৃত্তিকা ঊর্দ্ধদিকে এক লম্ফ দিয়া দাক্ষিণাত্যের উপত্যকা সৃজন করিয়াছে। এই উপত্যকার প্রান্তভাগে অজন্তার ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম; দুইশত ফিট নিম্নে খান্দেশের শ্যামল-সমতল শস্যক্ষেত্র, আর সন্নিকটে প্রাচীনতম ও সমৃদ্ধতম ভাস্কর-শিল্প, চিত্র-শিল্পের তীর্থভূমি। কোন্‌ সৌন্দর্য্য-বিলাসী সম্রাট-শিল্পীর পরিকল্পনাকে কত শতাব্দীর অক্লান্ত সাধনা ও পরিশ্রম যে এই অতুলনীয় মূর্ত্তি দান করিয়াছে, তাহা ভাবিতে প্রাণ বিস্ময়ে ভরিয়া উঠে।

গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিবার অনুমিত তিনশত বৎসর পরে বৌদ্ধ শ্রমণগণ এই স্থানটিকে তাঁহাদের সাধনার বেদীরূপে মনোনীত করেন। সহস্র বৎসর ধরিয়া ধর্ম্মানু-প্রাণিত পুণ্যাত্মা ভাস্করেরা জীবন্ত পর্ব্বত গাত্রে ছেদনীর আঘাতে যুগযুগান্তের বিস্ময়করী চৈত্য-মন্দির-বিহার-সমন্বিত

অজন্তা—পর্ব্বত শিখরে কৈলাস

তাঁহাদেরই কোন সতীর্থবৃন্দ, বিশ্বের বিস্ময়স্থল রচনা করিয়া গিয়া থাকিবেন।

দর্শকগণ যদি পূর্ব্ব হইতে মনে ধারণা লইয়া অজন্তা দেখিতে যান্, যে অন্ধকার অন্ধকূপের মত 'গুহা' দেখিতে হইবে, তাহা হইলে তাঁহারা প্রতারিত হইবেন। অজন্তার বৃহত্তম কক্ষটি ইউরোপ বা আমেরিকার উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নিৰ্ম্মিত যে কোন নাট্যশালার প্রেক্ষাগৃহ হইতে ক্ষুদ্রতর আয়তনবিশিষ্ট নহে। ষোড়শ (XVI) চিহ্নিত কক্ষটি দৈর্ঘ্যে ৬৬ ফিট, প্রস্থে ৬৫ ফিট ৩ ইঞ্চি, এবং উচ্চতায় ১৫ ফিট ৩ ইঞ্চি। বিংশতি-সংখ্যক স্তম্ভ মালায় ইহার পাষাণ-আচ্ছাদন ধরিয়া আছে। সম্মুখ ও পশ্চাতের স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী স্তম্ভযুগলের চতুষ্কোণ পাদদেশগুলি কতকপথ উপরে গিয়া প্রথমে অষ্ট ও পরে ষোড়শকোণ বিশিষ্ট হইয়া শেষে চূড়ায় গিয়া পুনরায় চতুষ্কোণ হইয়াছে। এই কক্ষের বহির্দ্দেশস্থ বারান্দার দৈর্ঘ্য ৬৫ ফিট এবং প্রস্থ ১০ ফিট ৮ ইঞ্চি! কক্ষগুলি একটি বৃত্তাকার পর্ব্বতের মধ্যে নির্ম্মিত হওয়ায় দিনের কোনো সময়ে কোনো কোনো কক্ষ অধিক, আবার অন্য সময়ে অন্য কক্ষগুলি অধিক আলো পাইয়া থাকে। প্রভাত-সূর্য্য কতকাংশকে অরুণাভায় স্নিগ্ধ-স্নান করায়, মধ্যাহ্নের তপন কোথাও উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করে, আবার কোনো অংশ অস্তগামী দিনমণির লোহিত ছটায় প্লাবিত হইতে থাকে! কক্ষের প্রান্তবর্ত্তী ক্ষোদাইয়ের কাজ অথবা চিত্রসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা ব্যতীত কৃত্রিম আলোকের অন্য কোন প্রয়োজন নাই। এমন কি ফ্ল্যাশ্-লাইট (Flash-light) না থাকিলেও আলোক-চিত্রাদি লওয়া চলিতে পারে।

কক্ষগুলির প্রবেশ-দ্বারের উপরিভাগে কোনো কোনোটিতে অর্দ্ধবৃত্তাকার বাতায়ন আছে; ছাদ গুলি খিলান্-করা এবং সমান সমান অন্তরে প্রস্তর কাটিয়া যে

অর্দ্ধচন্দ্রাকার এক অপরূপ রূপ-নিকেতন রচনা করিয়া গিয়াছেন। নানাবিধ কারু-শিল্প-খচিত স্তম্ভরূপী শিলাখণ্ড সেই সব বিশালায়তন পাষাণ-হর্ম্ম্যের অতীত গৌরব মস্তকে ধরিয়া আজও মৃত্যুহীন বীরের মত উন্নত-শীর্ষে দণ্ডায়মান!

পর্ব্বত গাত্রস্থ সোপান সমূহ অতিক্রম করিয়া কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ভ্রমণ করিলে, কী বিপুল পরিশ্রমের ফলে যে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার উপলব্ধি হইবে। ডিনামাইট্, বোমা, বারুদ, প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইবার বহু পূর্ব্বে কোটি কোটি মণ প্রস্তর ক্ষুদ্র ছেদনীর সাহায্যে কাটিয়া এরূপ বিরাট দানবীয় মন্দির নির্ম্মাণ, সে কেবল ধর্ম্মানুপ্রাণিত অদম্য উৎসাহশীল সাধক-শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। যে সকল দৈত্যের মত শক্তিশালী, দেবতার মত সহিষ্ণু, ধ্রুবের মত একনিষ্ঠ ও ব্রহ্মার ন্যায় স্রষ্টা শিল্প সাধক মিলিয়া মিসরের মরুভূমিতে পিরামিড্ গড়িয়া তথায় শিল্প-সৌন্দর্য্যের মন্দাকিনী বহাইয়াছেন, অজন্তার এই পর্ব্বত-কন্দরে বিশ্বকর্ম্মার আশীর্ব্বাদ-ধন্য

শ্রীরামেন্দু দত্ত

পাষাণ-পঞ্জরগুলি তৈয়ারী হইয়াছে, তাহা দেখিতে ঠিক কাঠের বরগার মত। অধিকাংশ ছাদই কিন্তু সমান এবং তন্ম নানাবিধ লতাপাতা, পশুপক্ষী, মানব জীবনের নানা ঘটনা, অপূর্ব্ব বর্ণসম্পাতে চিত্রিত,—অথবা সুন্দরভাবে ক্ষোদিত মূর্ত্তি ও দৃশ্যে পরিপূর্ণ। সুমসৃণ পাষাণ-কুট্টিমের মধ্যে মধ্যে দুই একটি অগভীর গহ্বর আছে। অনুমান করা হয়, চিত্রকরেরা তন্মধ্যে রঙ্ চূর্ণ করিতেন। ক্ষুদ্রতম কক্ষসমূহ শ্রমণ—ভিক্ষুগণের নিদ্রাভবন ছিল। উহাদের অভ্যন্তরে প্রস্তর-শয্যা ও ঈষদুন্নত উপাধানের ন্যায় প্রস্তরখণ্ড আজও বর্ত্তমান। পশ্চাৎবর্ত্তী দেওয়ালে প্রস্তর কাটিয়া ছোট ছোট গর্ত্ত করা আছে, উহার মধ্যে কাষ্ঠ-কীলক প্রবেশ করাইয়া দিয়া তাহার উপর সন্ন্যাসীরা নিশ্চয় তাঁহা-

মানব-মনের নিগূঢ় ভাবগুলিকে চিত্রে প্রকাশ করা সহজ নয়। তাঁহার ক্ষোদিত মূর্ত্তির অঙ্গ-সৌষ্ঠবের প্রতি লক্ষ্য, শিল্পকলার জ্ঞান ও প্রকাশভঙ্গীর নিপুণতা যেরূপ অনবদ্য ছিল, ভগবদ্দত্ত কল্পনাশক্তি ও সুন্দরের বরে-ও তিনি তদ্রূপ ধন্য ছিলেন। কেবল বহিরঙ্গের সুলভ সৌষ্ঠব অপেক্ষা আরো বহু সম্পদে তাঁহার প্রচেষ্টাবলী সমৃদ্ধ। সকল চিত্র-গুলিই রেখার স্পষ্টতা, তুলিকার সূক্ষ্মতার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে; মনের নানাবিধ ভাব এমন পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়াছে যে তাৎকালীন জীবন যেন দর্পণে প্রতিবিম্বিত দেখা যায় শোক-দুঃখ, ঈর্ষা-ভয়, লোভ-লালসা, চিত্রে সমস্তই এমন প্রস্ফুট যে দর্শক অভিভূত হইতে বাধ্য। এত দিক দিয়া জীবনকে চিত্রিত করা হইয়াছে যে, কোনো দিক বাদ

অজন্তা গুহা—দ্বারের উপরের অঙ্কিত চিত্র

দের গৈরিক গাত্রবাস ঝুলাইয়া দিতেন। মন্দির-প্রাচীরের শেষ দিকে অনেক স্তূপ দেখা যায়; তাহার গাত্রে বুদ্ধের নানা অবস্থার নানা মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে, এবং দেওয়ালের মধ্যে মধ্যে ঐতিহাসিক ও রূপক প্রস্তরমূর্ত্তি বিদ্যমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একস্থানে মন্দিরগাত্রে বুদ্ধের মৃত্যুশয্যার চিত্র খোদিত আছে; তিনি একটি পালঙ্কের উপর শয়ান; বদনমণ্ডলের প্রশান্ত জ্যোতি আশিস্-বর্ষণ করিতেছে এবং তীব্র-শোকাচ্ছন্ন ভিক্ষুবর্গ তাঁহার শয্যা-বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন।

যে ভাস্কর অজন্তার চিত্র ক্ষোদাই করিয়াছেন, বলা বাহুল্য তাঁহার প্রতিভা অপূর্ব্ব ছিল। এত অল্প রেখার সাহায্যে

পড়িয়াছে মনে হয় না। ইহাদের ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্য অত্যধিক। অনুমিত সহস্র বৎসর ধরিয়া এই চিত্রাঙ্কণ ও ভাস্কর্য্য চলিয়াছিল; এবং তাহাতে ঐ সময়কার মানব-সমাজের কোন চিত্রই বাদ দেওয়া হয় নাই, সেইজন্য ঐ সহস্র বর্ষের মানবেতিহাস অজন্তার গুহা-গাত্রে উৎকীর্ণ আছে। কতকগুলি চিত্র দেখিলে দর্শক বুঝিবেন, তখনকার দিনে ভারতবাসী নরনারী কি ভাবে কেশ-বিন্যাস বেশ-বিন্যাস করিত, অলঙ্কারে দেহ সাজাইত, কিরূপ গৃহে বাস করিত; কিরূপ পাত্রে কিরূপ আহারীয় কি ভাবে রন্ধন করিত; কেমন পাত্রে ভোজন করিত; তাহারা কি কি পুষ্প ও ফলের পক্ষপাতী ছিল; স্থলপথে ও জলপথে কি করিয়া ভ্রমণ

করিত; কিরূপ পশুপক্ষী পালন করিত; তাহাদের ক্রীড়া-কৌতুক, বিলাস-ব্যসন ও ব্যায়াম-পদ্ধতিই বা কিরূপ ছিল।

স্থানীয় উপাদান হইতে প্রস্তুত রঙ্ যে কি করিয়া এত শতাব্দী ধরিয়া তাহাদের ঔজ্জ্বল্য ও স্থায়িত্ব অপ্রতিহত রাখিয়াছে তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। চিত্র সংস্কার কালে বরং যে সব স্থানে আধুনিক শিল্পীর তুলিকা স্পর্শ করিয়াছে সেই সেই স্থানের চিত্র-সৌন্দর্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা বহুতর হীন হইয়া গিয়াছে। ভারতের, শুধু ভারতের নহে, সমগ্র জগতের এই ভাস্কর্য্যের তীর্থভূমি দিন দিন নূতন শিল্পী, উৎসুক পরিব্রাজক, মুগ্ধ ছাত্রকুল ও ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে দর্শকবৃন্দকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সকল শ্রম সার্থক করিয়া তৃপ্তিদান করিতেছে।

এলোরা

অজন্তা হইতে প্রায় একশত মাইল দূরে দাক্ষিণাত্যের উপত্যকা এলোরার নিকট হঠাৎ তিনশত ফিট উর্দ্ধে উঠিয়া চন্দ্রমৌলীর চন্দ্রাকৃতি এক পর্ব্বত-মালা সৃষ্টি করিয়াছে; তাহার দুইটি শৃঙ্গ অস্তাচলমুখী। প্রাবৃটকালীন জলরাশি এইস্থান হইতে প্রপাত সৃষ্টি করিয়া নিম্নস্থ গহ্বর-কুক্ষিতে সবেগে পতিত হয়। ধার্ম্মিক তীর্থযাত্রীরা মহাদেবের জটানিষ্যন্দিত-গঙ্গা-স্রোত-জ্ঞানে ঐ জলে স্নান করিয়া মোক্ষ প্রাপ্তির পথ সুগম করিয়া লয়। এলোরার পর্ব্বতগাত্রের এই দিকে প্রায় একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সওয়া মাইল ধরিয়া খননকার্য্যদ্বারা ধ্বংসস্তূপ হইতে প্রাচীন কীর্ত্তির পুনরুদ্ধার হইয়াছে। এই সমস্ত পাষাণগৃহ যখন নির্ম্মিত হইয়াছিল তখন ভারতবাসীরা ভাস্কর্য্য-শিল্পে সিদ্ধহস্ত হইয়াছে, এবং বৌদ্ধ ভাস্করের পরিত্যক্ত কার্য্য পরবর্ত্তী সময়ে জৈন ও ব্রাহ্মণ শিল্পীরা স্ব-স্বহস্তে তুলিয়া লইয়াছিল। এই জন্যই এলোরার মন্দিরগুলির একটা নিজস্ব মূল্য ও আবশ্যকতা আছে। একমাত্র এইখানেই শিলাগাত্র কাটিয়া দরজা, জানালা, সিঁড়ি সমেত একটা প্রকাণ্ড ত্রিতল বাটী নির্ম্মাণ, স্থপতি-শিল্প হিসাবে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। দ্বিতল ও ত্রিতল কাটিয়া নির্ম্মাণে দানবীয় শক্তি, অধ্যবসায় ও নিপুণতা পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ অগ্রে উপরিতল এবং তৎপরে ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয় ও প্রথম তল নির্ম্মিত হইয়াছিল। সর্ব্বোচ্চ কক্ষগুলি নিম্নতলস্থ কক্ষসমূহ অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর ও সম্পূর্ণরূপে ক্ষোদাইয়ের কাজে পরিপূর্ণ; ইহাতে মনে হয় যে প্রথম আরম্ভের পর, হয় সেই উৎসাহ উদ্যম ধৈর্য্য ও ইচ্ছা নিম্নতল পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই, নয়ত তৎপূর্ব্বে কোনরূপ বাধা পায়। ভিতরের দিকের ছাদে চিত্র ক্ষোদাই যে কিরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। একটি আধটি নয়, বহু বর্গমাইল ধরিয়া অসম্পূর্ণ ত্রস্তহস্তের অবহেলা নয়, সাধক-শিল্পীর নিপুণ হস্তের নিখুঁৎ কার্য্যে——মাটি নয়, কাষ্ঠ নয়, বজ্র-কঠিন শিলাবক্ষ——উর্দ্ধদিকে নয়ন

অজন্তা গুহা—ভিতরের দৃশ্য

শ্রীরামেন্দু দত্ত

রাখিয়া কতদিন-ই না কাটিয়া গিয়াছে !

সূত্রধরের কুটিরে (সুতর্-কা-ঝোঁপ্রা) অথবা **বিশ্বকর্ম্মার মন্দিরেই** ক্ষোদাই-শিল্প উৎকর্ষের শীর্ষস্থানে পঁহুছিয়াছে। এখানকার খিলান-করা ছাদের শিলাগাত্রের ক্ষোদাইগুলি দেখিলে নিঃসন্দেহে মনে হইবে যে ইহার কারিগরেরা ভাস্কর-শিল্পের সেই আশ্চর্য্য শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন যাহাতে পাষাণ প্রাণ পায়, জড় চেতনা লাভ করে, মূর্ত্তির মুখে কথা ফুটে !

ইহাদের ছাদগুলি যেন কাঠের বরগার উপর স্থাপিত; তেমনি গঠন, তেমনি রং এমন কি পেরেকের মাথাগুলিও শিলাগাত্রে সেই রূপ অনুকৃত হইয়াছে ! সূত্রধরের কুটির, এই নামের ভিত্তিও বোধ হয় ইহার কাষ্ঠ নির্ম্মিত মন্দিরের মত প্রতিকৃতি। এমনও কথিত হয় যে এইখানে কর্ম্মী-শিল্পিগণ একত্র সম্মিলিত হইতেন।

এলোরার আর একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির——**কৈলাস**। ইহা পর্ব্বতগাত্রে কর্ত্তিত গুহা নয়; পর্ব্বতের উপর হইতে কাটিয়া কাটিয়া নির্ম্মিত। ইহার নির্ম্মাণ-কালে প্রায় তিনশত ফিট দীর্ঘ দুইটি পরিখা পর্ব্বতমুখ হইতে লম্বাভাবে খনন করিতে হইয়াছিল এবং দেড়শত ফিট দীর্ঘ
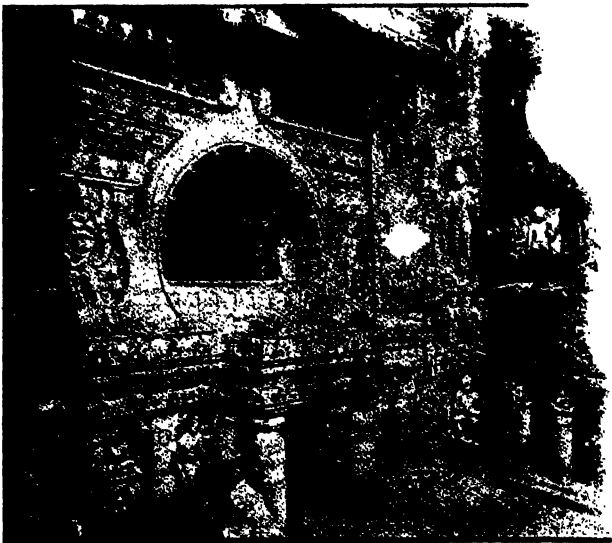
অজন্তা গুহায় অঙ্কিত চিত্র

অজন্তা গুহার বহির্দৃশ্য

ও একশত সাত ফিট গভীর একটি তৃতীয় পরিখা এই দুইটিকে দূরে পর্ব্বতের অভ্যন্তরে যুক্ত করিয়াছিল এবং এইরূপে মধ্যস্থলে একটি বিরাট পাষাণ-স্তূপ পড়িয়া রহিল। এই শেষোক্ত স্তূপ হইতে কৈলাসের প্রধান মন্দিরটি কাটিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৬৪ ফিট, প্রস্থে প্রায় ১০৯ ফিট এবং ভূমিতল হইতে উচ্চতম অংশ ৯৬ ফিট ঊর্দ্ধে। ইহার বিরাট পর্ব্বতখণ্ড সমন্বিত পার্শ্ব ও ঊর্দ্ধদেশে নানারূপ অপূর্ব্ব চিত্রাবলী উৎকীর্ণ। ইহার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ-তলে, যথাস্থানে বিশালায়তন স্তম্ভরাজি, স্বাভাবিক আকারের হস্তী, দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রভৃতি এই উদ্দেশ্যে পরিত্যক্ত শিলাখণ্ড হইতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কর্ত্তিত রহিয়াছে। সমস্ত কার্য্যের মধ্যে এমন একটি সামঞ্জস্য ধরা পড়ে যে দর্শক-মাত্রেই পরিকল্পনাকারীর সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও কর্ম্মী-শিল্পীর নিপুণ-ছেদনীক্ষেপের

প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। বহু বঞ্ঝাবাত, বজ্রাঘাত, হিংস্র বন্যপশুপক্ষীর অত্যাচার, কালের করাল হস্ত, মায়াদয়া বিবর্জ্জিত ভিখারীর আবাস স্থাপন-চেষ্টা সমস্ত সহ্য করিয়া যে গৌরব অর্দ্ধ প্রোথিত, অর্দ্ধ প্রকাশিত অবস্থায় এতদিন টিকিয়া গিয়াছে, আজ বহু ভাগ্যবলে তাহা নিখিল মানবের বিরাট শিল্পের উত্তরাধিকার। সেইজন্যই দেশ ও জাতি নির্ব্বিশেষে এলোরা ও অজন্তা বিশ্ব-শিল্পিবৃন্দের তীর্থভূমি।
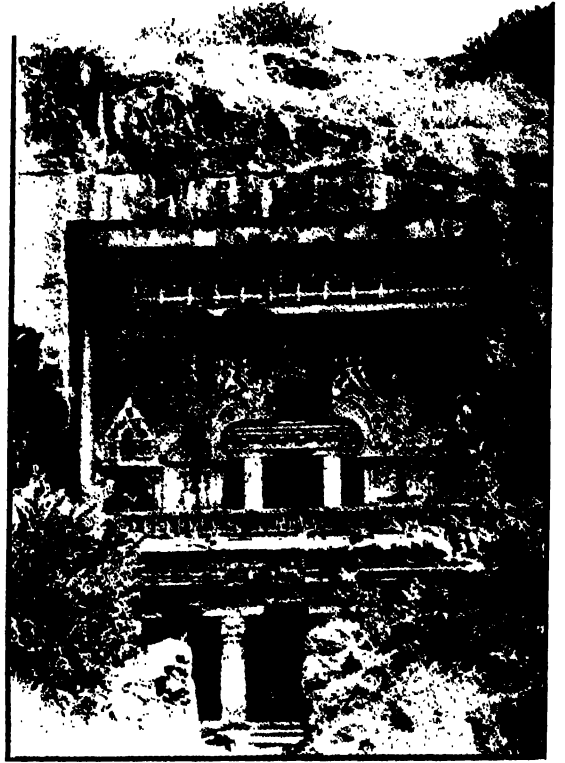
এলোরা—পাহাড় কাটিয়া গৃহ

এলোরা—পাহাড় কাটিয়া ত্রিতল গৃহ

শ্রীরামেন্দু দত্ত

সহযোগী-সাহিত্য
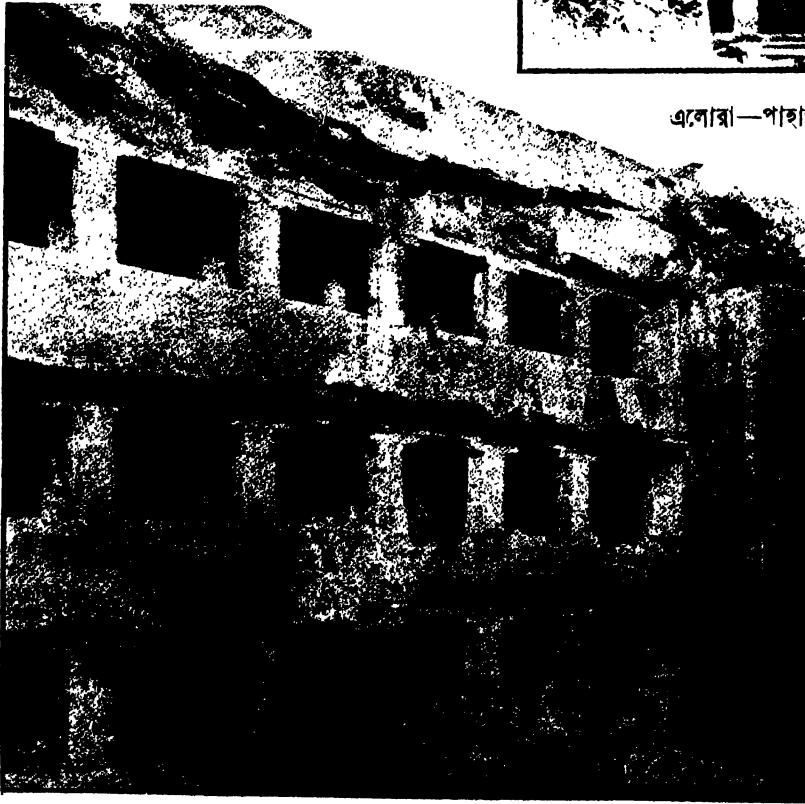
নুট হাম্‌সুন্

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

কথা-সাহিত্য বাস্তব জীবনের প্রতিচিত্র,—এ কথা যখন আমরা বলি, তখন আমরা কথাটার জন্ম-বৃত্তান্ত দেখিনে। মানুষের ধীশক্তির একটা দেহ আছে; স্বভাবের ধর্ম্মবশত সে দেহের প্রত্যহ ব্যায়াম করা প্রয়োজন। বহু চিন্তাবীরের ধীশক্তি ব্যায়ামের জন্য অহরহ ইতস্তত ধাবমান হয়; এই ধাবনের ফলে উক্ত ধীশক্তির দেহ সবল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্য হ'তে একটা নূতন বস্তু বাহির হয়, তার নাম সত্য। মনের রাজ্যের মূলার, ম্যাক্সিকুরা তাঁদের সৃষ্ট সত্যগুলিকে যুক্তির বর্ম্মে আবৃত ক'রে লোক-সমাজে প্রেরণ করেন। এই সত্যগুলির দর্শনমাত্র আমরা আকৃষ্ট হই এবং যতদিন না এই সত্যগুলির বর্ম্ম কোনো নূতন সত্যের অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হয়, ততদিন আমরা সযত্নে তাদের পূজায় নিরত থাকি। আমাদের দেশ আজকাল যে সব বিগ্রহের পূজারী, তার একটীর নাম বাস্তবতন্ত্র। যে মন্ত্রের দ্বারা আমরা এই বাস্তবতন্ত্রের উপাসনা করতে শিখেছি তার নাম কথাসাহিত্য।

এই বিগ্রহ কিন্তু আমাদের কাছে পূজা পাবার জন্য আগ্রহান্বিত নয়, যেহেতু পূজার নামে আমরা সুধু তার অপমান করছি। আমাদের অনেকেই যাকে বাস্তব-জীবন ব'লে জানি, তার মধ্যে বস্তু নেই,—আছে কল্পনা; অর্থাৎ আমরা বস্তুর নামে কল্পনার উদ্দেশে নৈবেদ্য নিবেদন করি। কল্পনাকে যে বস্তু আমরা ব'লে ভুল করি, এ কার্য্য কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। শাদাকে নীল ভাবতে হলে নীল কাচের ভিতর দেখলেই চলে, এবং যদি আমরা শাদাকে নিত্যই নীল কাচের ভিতর দিয়ে দেখতে থাকি, তাহ'লে অবশেষে একদিন সে যে সত্যই নীল নয় এ কথা শুনলে আমরা ভয়ানক চম্‌কে উঠব। আমাদের আধুনিক সাহিত্যের শত শত নরনারীর জন্ম মাটির বুকে নয়,—হাওয়ায়। তথাকথিত অত্যন্ত 'বাস্তব' দীনতম ভিক্ষুককেও যে আমরা হাওয়ায় নিক্ষেপ করতে পেরেছি তার কারণ আমরা তাকে দুঃখের নীল রঙে অতিরঞ্জিত কল্পনা-কাচের মধ্য দিয়ে দেখে থাকি। এইরূপ দেখাকে সার্থক ও সত্য ব'লে আমরা বিশ্বাস করি, যেহেতু বহুদিন ব্যবহারে উক্ত নীলিমার প্রতি আমাদের চোখ সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে। আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে এ বিষয়ে আমাদের আমূল তফাৎ, সে তফাৎ এই যে ইউরোপ জীবনকে সাধারণ শাদা কাচের মধ্য দিয়ে দেখে। কিন্তু আধুনিক ইউরোপে জন্মগ্রহণ করেও নুট হামসুন তার শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার কিছুই গ্রহণ করেননি। যে কাচের ভিতর দিয়ে হামসুন্ জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তার নাম অতসী কাচ। অতসী কাচের ধর্ম্ম এই যে তার ভিতর দিয়ে কোনো বস্তু দেখলে সে বস্তু বহুবর্ণে রঞ্জিত দেখায়। সে সকল বর্ণ আসলে শাদার ভগ্নাংশ মাত্র; তাদের একত্র মিশ্রণে শাদার সৃষ্টি জীবনের সাত-রঙা আলোর প্রতি হামসুনের চক্ষু নিবদ্ধ; কিন্তু সাতরঙা আলো যে প্রকৃতপক্ষে শুভ্র সূর্য্যালোক, জড়বিজ্ঞান এ জ্ঞান বহু পূর্ব্বে সঞ্চয় করেছে।

হামসুনের সৃষ্ট নরনারীর সকলেই আসলে নিতান্ত সাধারণ হ'লেও কেন এত অসাধারণ দেখায়,—এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় তাঁর এই দৃষ্টি-বিশিষ্টতায়। বিস্ময়-দৃষ্টির কাছে জগতে যা বহু-পুরাতন তাও চির-নূতন। সৌন্দর্য্যের অন্বেষণ হামসুনের কাছে নিষ্প্রয়োজন যেহেতু তাঁর চক্ষে অসুন্দর কিছুই নেই। ক্ষুদ্র, বৃহৎ তাঁর কাছে সমান প্রিয়;

বাতাসের মৃদু মর্ম্মরে তাঁর যে বিস্ময়-বোধ, অন্ধকারের স্তব্ধতায় অথবা বজ্রের গর্জ্জনে সেই একই বিস্ময়।—"এই যে নিস্তব্ধতা আমার কানে গুঞ্জন করছে, এ যেন সমস্ত প্রকৃতির বুকের রক্ত।"—একথা ইউরোপে একমাত্র হামসুনই বলতে পারেন। Pan উপন্যাসের নায়ক বলছে, "ছোট ছোট জিনিষও আমায় স্পর্শ করে,—বাতাসে-ওড়া মুখাবরণ, নেমে-আসা চুলের রাশি, দুটি চোখ যখন হাসিতে বুজে আসে সেই হাসি।" একথা হামসুনের আত্মকথা।

হামসুনের চোখ সুধুই শাদার মধ্যে বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখে না; সাধারণ দৃষ্টিতে যা সমতল, সেস্থানে তাঁর চোখ অতল গভীরতা দেখতে পায়। বিজ্ঞানের চক্ষে "বিচিত্রা"'র এই মসৃণ পাতায় লেশমাত্র মসৃণতা নেই; এর অক্ষরগুলি বন্ধুর পথের উপর দিয়ে ধাবমান। জীবনের প্রতি পৃষ্ঠার ক্ষুদ্রতম অংশও সেইরূপ অমসৃণ; সে লেখার আঁকাবাঁকা রেখা সহসা অতল গহ্বরে নামে, আবার সহসা উচ্চ অচলে ওঠে। এই ওঠা-নামায় যে ছন্দ আছে তার সন্ধানে আর্টিষ্টের প্রবল আনন্দ; জীবনের গতি রেখার কলধ্বনির সঙ্গে তাঁর চিত্ত নৃত্য করতে থাকে। হামসুনের মনের নৃত্য-ভঙ্গী কিন্তু আমাদের পরিচিত সর্ব্ববিধ নৃত্য-ভঙ্গী থেকে পৃথক্। এ-নৃত্যের এক নিজস্ব technique আছে। তার স্বরূপ না বুঝলে উক্ত নৃত্যলীলাকে এমন কি তাণ্ডব-নৃত্য বলেও ভুল হ'তে পারে। নিঃসন্দেহ তাণ্ডব-নৃত্যও একটা আর্ট্, কিন্তু এ আর্ট্ হামসুনের নয়। যে নৃত্যশীলা নটী তার মধ্যে বিদ্যমান, তার অঞ্চলে চঞ্চলতা দেখা যায় না; এবং তার চরণের নূপুর গুঞ্জন করে না। এর কারণ এই,—সে নটীর অঞ্চল চির-চঞ্চল বলেই তার চঞ্চলতা চক্ষের অগোচর, যেমন মহাবেগে ঘূর্ণায়মান লৌহচক্রের ঘূর্ণন আপাত-দৃষ্টির অলক্ষ্য। সে চরণের নূপুর অত্যন্ত মৃদু-কণ্ঠা বলেই তার গুঞ্জন-তান শোনা যায় না, সুধু বোধ করা যায়। এ কথা হামসুনের সৃষ্ট নারীদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য; এদ্‌ভার্দা অথবা ভিক্টোরিয়ার মনে নিবিড় অনুভূতির যে অগ্নিশিখা অহরহ জ্বলছে, আমরা বাহির হতে তার তীব্র তাপের আভাস পাই সুধু ঈষৎ আরক্ত আভায়। তাই যখন সহানুভূতির সহায়তায় আমরা ইভা, এদ্‌ভার্দা, ভিক্টোরিয়ার হাতে হাত রাখবার অধিকার লাভ করি, তখন তাদের শুভ্র বাহুর সুনীল শিরায় রক্তের উন্মত্ত উচ্ছ্বাস অনুভব করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে আমরা আপন মনে ভাব্‌তে থাকি, ওদের ও হিম-শীতল বাহুর মধ্যে অনুভূতির এ জ্বালাময় কম্পন কেমন করে আসে!

হামসুনের লেখার একটা রীতি-বৈশিষ্ট্য (mannerism) সহজেই চোখে পড়ে। তাঁর চিত্রিত নারী মাত্রেই জীবনে সবার চেয়ে যে তার প্রিয় তাকে নিষ্ঠুরের মত ব্যথার পর ব্যথা, কঠোর আঘাতের পর আঘাত না দিয়ে থাকতে পারে না। সে আঘাত কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই তার নিজেরি বক্ষে নির্ম্মম মুদ্গরাঘাতের মত ফিরে আসে, এবং এ আঘাত সে হাসিমুখে সহ্য করে। মাঝে মাঝে মনে হয়, এই সব নারী দুঃখ পিয়াসী। আঘাত দিয়ে এবং সে আঘাত দ্বিগুণ ফিরে পেয়ে তাদের আনন্দ; ব্যথা তাদের প্রাণের খাদ্য; তারা অপরকে জ্বালা, নিজে জ্বলবার জন্য। এর থেকে মনে হ'তে পারে, এই সব নারীর মন অস্বাভাবিক। কথাটা অংশত সত্য। হামসুনের নারী প্রধানত একটা টাইপ্; আলোর রাজ্যে সূর্য্যালোক, তারার আলো, হীরার আলো যেমন এক একটা টাইপ্। সূর্য্যের আলোকে যদি আমরা একমাত্র স্বাভাবিক আলো ব'লে ভেবে নিই, তাহ'লে অন্য সব আলো অস্বাভাবিক বোধ হবে; সেই জন্য নারী-চরিত্রের চল্‌তি পরিকল্পনায় অভ্যস্ত মনের কাছে হামসুনের নারী চরিত্র-চিত্রণ অস্বাভাবিক।

যে দৃষ্টির দ্বারা ইব্‌সেন বা ইবানেজের মর্ম্ম বোঝা যায়, তদ্দ্বারা হামসুনের লেখা বোঝা চলে না। তার কারণ পূর্ব্বোক্তের লেখার ভাব বহিঃসলিলা; হামসুনের লেখার ভাব অন্তঃ-সলিলা। তাছাড়া যে চক্ষু বিদ্যুতের আলোয় অভ্যস্ত, দীপালোকে সে চক্ষু অন্ধকার দেখে। ইব্‌সেন, ইবানেজ, বোয়ায়ের লেখায় বিদ্যুতের আলোর মত একটা আশ্চর্য্য প্রাখর্য্য আছে; তার নাম idea অথবা বার্ণাড্‌স'র ভাষায়,—'discussion.'। এ প্রাখর্য্য অন্ধ ভিন্ন অন্য সকলের দৃষ্টিগোচর। হামসুনের রচনায় সর্ব্বত্র পরিকল্পনা যেন গভীর রাতের দীপশিখা। অন্ধকারে এ-আলো সহজে দেখা যায় না, কিন্তু এ-আলোর প্রভায় হামসুনের লেখা পাঠ না

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

করলে সে লেখা অসঙ্গতি, অস্পষ্টতায় কালো হয়ে উঠবে।

আমরা যখন আধুনিক নরওয়েজিয় সাহিত্যের কথা বলি তখন আমাদের মনে একটি মাত্র বিশিষ্টতার কথা জাগ্রত থাকে। এ-সাহিত্যের বিশিষ্টতা কিন্তু এক নয়, দুই। হামসুন এবং বোয়ারকে এক পথের পথিক ভাবার মত ভুল আমরা করি তার কারণ আমরা বোয়ারকে বুঝি এবং হামসুনকে বুঝি না। বোয়ারকে বোঝা সহজ যেহেতু বিদ্যুতের আলো দীপালোকের চেয়ে সহজে মনশ্চক্ষুর দৃষ্টি-গোচর; এবং স্বভাবের ধর্ম্মবশত আমরা অবোধ্য লেখককে অবাধে, অম্লানবদনে বোধগম্যের মধ্যে ফেলে তাঁর সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হই।

আধুনিক যুগের পাঞ্চজন্য প্রথম বেজেছিল ইবসেনের লেখায়, এবং ইউরোপে পাঁচজন সাহিত্যিক এই পাঞ্চজন্যের ধ্বনি থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। তাঁদের নাম বার্ণার্ড শ, গল্‌স্‌ওয়ার্দি, আনাতোল ফ্রাঁস্‌, রোমাঁ রোলাঁ ও ব্লাস্কো ইবানেজ্‌। হার্ডি সিয়েন্‌কিউইক্‌স্‌ গোর্কি প্রভৃতি কথা-সাহিত্যিক এ শঙ্খ শ্রবণে বিচলিত হন্‌ নি। চিন্তাধারার দিক্‌ থেকে তাঁরা এ যুগের লোক নন্‌,—এর পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের। হামসুনও এযুগের নন্‌,—এর পরবর্ত্তী যুগের। Strindberg প্রভৃতি ইব্‌সেনের সমসাময়িকদের কথা এখানে বলা হল না। একালের যুগগুরু ইব্‌সেন যে নূতন ধর্ম্মের বার্ত্তা এনেছেন তাঁর নাম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অথবা ব্যক্তিত্ব-বোধ। এই ব্যক্তিত্ব-বোধ নুট্ হামসুনের ধর্ম্ম নয়,—তাঁর স্বধর্ম্মের নাম অস্তিত্ব-বোধ। দুইয়ের মধ্যে তফাৎ অতি সূক্ষ্ম। ব্যক্তিত্ব-বাদী বলে, আমি আছি। অস্তিত্ব-বাদী বলে, আমি আছি, কিন্তু আমরাও আছি। অর্থাৎ সে তার আমিত্বকে জগৎ-সত্তার সঙ্গে পাশাপাশি দেখতে ভালবাসে। হামসুনের এ অস্তিত্ব-বাদের অর্থ কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য-রোধ নয়। স্বাচ্ছন্দ্য-রোধ এর একদিক্‌ এবং স্বাচ্ছন্দ্য-বোধ অন্য একদিক্‌। আসলে হামসুন এ দুইয়েরই উপরে—যন্ত্রী যেমন যন্ত্রের উপরে। জীবনের সহস্রতন্ত্রী বীণায় ঝঙ্কার তোলাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, স্বাচ্ছন্দ্যবোধ এবং স্বাচ্ছন্দ্য-রোধ এই বীণার দুই তার। আকাশের আলোয় হাওয়ায় যেমন মানুষ এবং জড়প্রকৃতির দেহেও তেম্‌নি জীবনের প্রগাঢ় এবং পরিপূর্ণ উপলব্ধি হামসুনের শিল্প-ধর্ম্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মর্ম্ম।

আমাদের ভাষায় এমন অনেক কথা আছে যা অত্যন্ত সুন্দর, কিন্তু ব্যবহারের প্রাচুর্য্যে সে সৌন্দর্য্য মলিন হ'য়ে গেছে। বারম্বার হস্তার্পণে তাদের আর পূর্ব্বের ঔজ্জ্বল্য নেই। মাথা নত করা, মুখ রাঙা হওয়া, দুটি ভুরুর বাঁকা রেখা, সন্ধ্যার ধূসর বর্ণ এসব কথাচিত্রের ইঙ্গিত অত্যন্ত গভীর; কিন্তু এদের সহিত আমরা এত সুপরিচিত যে সহসা দেখা হওয়ার মধ্যে যে রোমান্স্‌ আছে তা এরা হারিয়েছে। এই কারণে আর্টিষ্টকে ওসব কথা যথাসম্ভব বাদ দিয়ে উক্ত অর্থজ্ঞাপক নূতন নূতন কথার সৃষ্টি ক'রে নিতে হয়। কুরুচিজ্ঞাপক কক্ষ যদি তার শ্রীহীন বক্ষ পুষ্পপল্লবে সাজায়, সে কক্ষে প্রবেশ ক'রে রুচিবানের মনে স্বভাবতই বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। আর্টিষ্টের কাছে শব্দ ঠিক্‌ পুষ্পপল্লবের মতই সুন্দর, অত্যন্ত সাবধানে নির্ম্মল হস্তে তিনি তাদের একে একে স্পর্শ করেন। রুচিহীন লেখকের বিকৃত লেখার সারা অঙ্গে অলঙ্কারস্বরূপ ব্যবহৃত ভাল ভাল শব্দের শিঞ্জিনী শ্রবণ করলে তাঁর মন পীড়িত হয়। যেসব শব্দ তাদের অর্থের গভীরতা এখনো হারায়নি, কিন্তু ক্রমশঃ হারাতে বসেছে, তাদের মধ্যে 'প্রাণশক্তি' একটি। হামসুনের মনের একটি দুয়ার খুলতে হ'লে ও শব্দটীর প্রয়োজন। প্রাণশক্তি বস্তুটা কি তা পূর্ব্বে দেখা আবশ্যক।

চালাবার আনন্দে যাঁরা মোটর চালিয়ে থাকেন, তাঁরা জানেন, ঊর্দ্ধবেগে মোটর চালানো অত্যন্ত প্রীতিকর। কিন্তু ততোধিক প্রীতিকর গতিহীন মোটরে ষ্টার্ট্‌ দেবার পর এককালে ক্লাচে এবং ব্রেকে সজোরে চাপ pressure দেওয়া —মোটরের এঞ্জিন পূর্ণবেগে চালানো এবং সেইরূপ শক্তি সহকারে তার গতিরোধ। একার্য্যে মোটর চলে না, কিন্তু তার চালকের মন বায়ুবেগে উড়ে চলে। পায়ের কাছে দুটি বিভিন্নমুখী শক্তির অদম্য বিকর্ষণে যে উত্তাপ উত্থিত হয়, সে উত্তাপে চালকের মনোযন্ত্রে বাষ্পের সৃষ্টি হয় এবং এই বাষ্পযোগে উক্ত যন্ত্র আকাশে উঠতে থাকে। এই বাষ্পের চলতি নাম কল্পনা। বাস্তব মোটরের সঙ্গে আমাদের জীবনের আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়; এই মিল অবশ্য সর্ব্বাঙ্গীন নয়, যেহেতু জীবনের অঙ্গের সংখ্যা নেই এবং

মোটরের অঙ্গের একটা বিশেষ অঙ্গ আছে। মানুষ তার জীবনযন্ত্রের চালক; তার হাতের কাছে, পায়ের কাছে চালন-দণ্ড বিদ্যমান। মোটরে পূর্ব্বোক্ত শক্তিদ্বয়ের সংঘর্ষ দেখে আনন্দ পেতে চায় এরূপ চালকের সংখ্যা অধিক নয়, কারণ এমন অত্যদ্ভুত ইচ্ছা সহজে চালকের মনে আসে না, এবং দৈবক্রমে মনে এলেও কাজে পরিণত হয় না, যেহেতু এতে মোটরের এঞ্জিন খারাপ হবার ভয় আছে। জীবনেও তাই। জীবনের চালক তার এঞ্জিনের প্রতি মায়া ক'রে চলে। নির্ম্মম বেগে সে এঞ্জিন চালানো এবং ততোধিক নিষ্ঠুর শক্তির সংঘর্ষণে তার ঘূর্ণনরোধের প্রয়াস—একার্য্য জীবনের লক্ষ লক্ষ চালকের কাছে সুধু অর্থহীন নয়, একটা প্রকাণ্ড কৌতুক ব'লে বোধ হবে। যাঁরা কিন্তু এবম্বিধ লক্ষ্যহীন, অর্থহীন, নিরুদ্দেশ্যভাবে শুধু চলার আনন্দে চলতে চান, সমস্যার ভিন্নমুখী শক্তিদ্বয়ের সঙ্ঘর্ষণে নিজেকে নিক্ষেপ ক'রে আনন্দ পান, নুট হামসুন তাঁদের সমর্থক। জগৎ বলে, এ সুধু শক্তির অপব্যয়। হামসুনকে যদি মুখের উপর একথা বলা হয়, তিনি হয়তো হেসে উত্তর করবেন, জীবনটা তো অপব্যয়ের জন্যই! অপব্যয়ের অভাবে সঞ্চয়ের কোনো মানে হয় না।

নদী যখন বন্যাবেগে ফুলে ওঠে তার প্রবাহ তখন সুধুই সাগরাভিমুখী থাকে না; সে প্রবাহ তৎকালে বহুমুখী। তার জলধারা নিজেকে নিঃশেষে বিতরণ ক'রে দিতে চায়। আলো যখন আকাশ ছাপিয়ে ভ'রে ওঠে তখন তার ঢেউয়ের পর ঢেউ ধরিত্রীকে অসম্বৃতা ক'রে তোলে। হরিণ শিশু নৃত্যগতিতে ইতস্তত ছুটে বেড়ায়,—যেন নিশ্বাসের বায়ু হ'তে কি এক বস্তু লুটে নেবার জন্য তার অসীম আগ্রহ। উষাগমে শত শত পাখী কলোচ্ছাসে গান গেয়ে ওঠে, যেন তাদের কণ্ঠে সুর আর ধরে না; ঝর্ণার মত উদ্বেলিত প্রবাহে বাহির হয়ে আসে। পূর্ব্বোক্ত নদী, আলো, হরিণ শিশু, পাখী এরা অত্যন্ত বেহিসাবী। এরা যে জীবনের পায়ে পায়ে হিসাব ক'রে চলে না, সে এদের অন্তরের আবেগের অদম্য তাড়নায় (impulse)। যে কেন্দ্রীভূত শক্তিসমষ্টি হ'তে এই আবেগের উৎপত্তি, তার নাম প্রাণশক্তি। এই শক্তিরই প্রবল প্রভাবে জীবনযন্ত্রের চালক স্বীয় যন্ত্রে গতিবৈষম্য এনে আনন্দ লাভ করে। হামসুনের Glahn বলছে, কে যেন তাকে নির্ম্মম হস্তে চুলের মুঠি ধ'রে দ্রুতবেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে, এ ছোটায় নিশ্বাস তার রুদ্ধ হয়ে আসে, কিন্তু আনন্দেরও তার অন্ত নেই যেহেতু সেই নির্ম্মম হাতখানিকে সে ভালবাসে। এ অদৃশ্য হাত যার, তার নাম প্রাণশক্তি। তাকে দেখা যায় না, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে বোঝা যায়। তার তপ্তশ্বাস যার উপর পড়ে সে ব্যক্তির সর্ব্বদেহ বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত রোমাঞ্চিত হতে থাকে।

জীবনটাকে বাজিয়ে চলায় জীবনের সার্থকতা—এ বিশ্বাসের বর্ণে তাঁর সকল লেখাই অনুরঞ্জিত। এই বাজানো কখনো বাঁশী বাজানো, আবার কখনো তূর্য্যধ্বনি। জীবনে শুধু বাঁশি বাজানোয় হামসুন তৃপ্ত নয়; 'মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ ব্যর্থ কোরো না'—এ তাঁর মর্ম্মকথা। তাই মাঝে মাঝে তাঁর মৃদু সুরের কণ্ঠ হতে যেন একটা লৌহের কঠিন ধ্বনি বাহির হ'য়ে আসে। বায়স্কোপের পর্দ্দার স্থিতিশীল অসংখ্য ছবি আমাদের চোখে গতিশীল একটি ছবি হ'য়ে দেখা দেয়; এর মূলে আছে পরিবর্ত্তনের দ্রুততা। তেম্নি মনের পর্দ্দায় বাঁশির শব্দ চিত্র ও তূর্য্যের শব্দ-চিত্র যদি অত্যন্ত দ্রুত বারম্বার একে অপরের স্থান গ্রহণ করতে থাকে, তাহ'লে উক্ত উভয়বিধ চিত্রের বায়স্কোপের ছবির মতই গতিময় ও সজীব হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। হামসুনের লেখার সুর এই বিশিষ্ট প্রক্রিয়ায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর চরিত্রগুলি সহসা প্রবল আনন্দের ক্ষণে দুঃখের আঘাতে বিবর্ণ হয়ে ওঠে। দুঃখ সুখের এই অত্যন্ত দ্রুততালে নর্ত্তন, অর্থাৎ উল্লিখিত তূর্য্যধ্বনি ও বাঁশির সুরের মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আবর্ত্তন তাদের মাঝে বিভেদের রেখা টান্‌তে দেয় না। আলোছায়ার খেলার মত। মাঝে যদি রেখা টানা যায় পরক্ষণেই দেখা যাবে, যেখানে আলো ছিল সেখানে ক্রমশঃ ছায়া নামছে, এবং যেখানে ছায়া ছিল সেস্থানে আলো আসছে। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে তেমনি সুখ দুঃখের পদাঘাতে এবং দুঃখ সুখের কশাঘাতে আপন আপন স্থানচ্যুত হ'তে থাকে। (১)

(১) হামসুনের জীবন-কাহিনী পাঠ করলে বোঝা যায়, দুঃখ সুখ সে জীবনের নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গী ছিল। এমন আশ্চর্য্য ঘটনাবহুল জীবন অন্য কোনো আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যিকের ছিল ব'লে আমরা জানি না। জীবনে উপলব্ধ সত্যের প্রতিচ্ছবি আছে তাঁর সাহিত্যে। লেখক।

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

প্রশ্ন হ'তে পারে, সুখ দুঃখের এই চক্রবৎ পরিবর্ত্তনের কথা অত্যন্ত পুরাতন, এবং পৃথিবীর ছোট বড় শত শত ঔপন্যাসিক এই চক্রের কথা লিখে গেছেন। তবে হামসুনের বৈশিষ্ট্য কোথায়? এর প্রত্যুত্তর পাওয়া যাবে অন্য একটি প্রশ্নের উত্তরে। সে প্রশ্ন এই,—নরনারীর ভালোবাসার কথা বাল্মীকি, ব্যাস, হোমার কাব্য-ভারতীর প্রথম জন্মক্ষণে অনিন্দ্য শক্তিসহকারে বর্ণনা করে-গেছেন। তবে আজ ও বস্তুর বর্ণনায় নূতনত্ব কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর সকলেরই মনে লিখিত আছে। সেকালের সীতা, উর্ম্মিলা আমাদের প্রিয়া; কিন্তু এ কালের সীতা, উর্ম্মিলারা আমাদের ততোধিক প্রিয়া। নরনারীর দুটি রূপ থাকে,—একটি চিরন্তন এবং একটি কালগত। সুখ দুঃখেরও এই দ্বিবিধ রূপ আছে। বহু সুখ দুঃখ চিরঞ্জীবি; আবার শত শত সুখ দুঃখ শতাব্দীর নবজাত সন্ততি; তাদের হাস্য-ক্রন্দনে শতাব্দীর পঞ্জরাস্থি স্পন্দিত হতে থাকে; যুগের অবসানে এই সব যুগ-সন্ততিরও অবসান হয়। যে সব সুখ দুঃখের ছবি হামসুনের লেখায় গ্রথিত, তারা এ যুগের একান্ত আপন।

বর্ত্তমান যুগের সব চেয়ে বড় ভাববার কথা,—যন্ত্রশক্তির বিবর্ত্তন এবং মানব জীবনের উপর তার প্রভাব। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তার সঙ্গে হামসুনের মনোভাবের বিশেষ মিল আছে। তাঁর 'Children of the Age' উপন্যাসে এই মনোভাব সুপরিস্ফুট। উক্ত উপন্যাসখানি হামসুনের সাধারণ রচনা-ভঙ্গী থেকে একেবারে পৃথক্ 'Hunger,' Mothwise.' 'Victoria,' 'Pan.' এ সব উপন্যাসের গতিধারা যেন নৃত্যাবেগে চঞ্চল; তাদের রেখায় রঙে প্রতি পদক্ষেপে সুরের উচ্ছলতা শিল্পের সংযমে সংহত। কিন্তু 'Children of the Age,' 'Wanderers, অথবা 'Growth of the Soil'-এ যে প্রতিভার প্রকাশ, সে প্রতিভা lyrical নয়, epical। lyrical এবং epical এই উভয়বিধ রচনা ধারাতেই হামসুনের গভীর শক্তি প্রকাশিত হয়েছে। শেষোক্ত উপন্যাসটি Pan ভিন্ন হামসুনের অন্য সব লেখার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে আমাদের মনে হয়। তার আইজ্যাক্ চরিত্র সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের epical চরিত্র-চিত্রাবলীর মধ্যে এরূপ চিত্র সম্ভবত জঁা ক্রিস্‌তফ্ ছাড়া অন্যত্র নেই।

হামসুনের লেখা সম্বন্ধে কিরূপ মনোভাব এদেশে বিদ্যমান, সে সম্বন্ধে কিছু লেখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এ দেশের কোন লেখক বলেছেন, নরওয়েজিয় সাহিত্যের আলোচনার্থে আমাদের ও দেশের ভাষা জানা আবশ্যক। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে ইউরোপীয় সাহিত্যের পরিচয় লাভের জন্য আমাদের আট নয়টি ভাষা জানা চাই। কথাটা কিন্তু সত্য নয়। যেহেতু য়ুরোপ ভারতবর্ষ নয়। কোনো য়ুরোপীয় যদি ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের পরিচয় লাভ করতে চান, তাঁর অন্তত তিন চারটি এদেশীয় ভাষা জানলে ভাল হয়; কোনো ভারতীয় যদি য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত পরিচিত হতে চান, শুধু ইংরাজি বা ফ্রেঞ্চ্ শিখলেই তাঁর কাজ চলবে। ভারতবর্ষের দেহ এক, কিন্তু মন অনেকগুলি; য়ুরোপের মন এক, দেহ বিভিন্ন। এখানে মনের অর্থ culture কাল্‌চারের স্বার্থ ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নরওয়েজিয় ভাষার শিরায় বিদ্যমান, ইংরাজি ভাষার শিরায় সেই একই ধর্ম্মা-ধর্ম্ম বহমান। সামাজিক ভাবে ইংরাজ ও নরওয়েজিয়ানে প্রভেদ নেই; একই সংস্কার, সুনীতি, সুরুচি, কুনীতি, কুরুচির প্রভাব উভয়ে প্রভাবান্বিত। অমিল অবশ্য প্রতি ক্ষেত্রেই আছে, এবং প্রতি ভাষারই একটা বিশেষ করে নিজস্ব ভঙ্গী বর্ত্তমান কিন্তু এ অমিল অথবা ভঙ্গীভেদে আত্মার আত্মীয়তায় বাধে না। নরওয়েজিয় লেখার সুন্দর অনুবাদ ইংরাজিতে সম্ভবপর; হার্ডির রচনার গঠন যদি আমরা বুঝি হামসুনের রচনার গঠন বুঝতে বাধবে না। অবশ্য হার্ডির রচনার গূঢ় অর্থ বুঝলেই যে আমরা হামসুনের গূঢ়ার্থ বুঝব—এমন কোনো কথা নেই, কিন্তু সে হামসুন নরওয়েজিয় ব'লে নয়। হার্ডির প্রভাব যদি আমাদের লেখায় পড়ে অনুবাদে গঠিত হামসুনের রচনার প্রভাবও আমাদের লেখায় পড়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। (১) মূল

(১) দৃষ্টান্ত স্বরূপ "কল্লোলে" প্রকাশিত বেদের দেহে হামসুনের Wanderers এর ছাপ একেবারে সুস্পষ্ট; এরূপ প্রভাব সাহিত্যের স্বাস্থ্যের উন্নতিকর যেহেতু এর দ্বারা সাহিত্যের বাহির হতে গ্রহণ করবার শক্তি বর্দ্ধিত হয়।—লেখক

গ্রন্থ পাঠের সুবিধা না থাকলে অনুবাদ পাঠ করা অনুচিত, পৃথিবী যদি এ কথা বিশ্বাস করত, তাহলে রবীন্দ্রনাথের নাম ভারতবর্ষের বাইরে কেউ জানতে পারত না এবং তাতে পৃথিবীর ভয়ানক ক্ষতি হত। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের লেখার ইংরাজী অনুবাদ যত সহজ এবং সম্ভাব্য হামসুনের লেখার ইংরাজী অনুবাদ ততোধিক সহজ এবং সম্ভাব্য। (২)

Literary fashion নামক এক বস্তু সব দেশেই আছে। আজকাল নরওয়েজিয় সাহিত্য সম্বন্ধে কোনো গভীর কথা বলা অত্যন্ত বিপজ্জনক যেহেতু ও সাহিত্য সম্বন্ধে অগভীর কথা শুনতেই আমরা একান্ত অভ্যস্ত। এরূপ হবার কারণ এই যে নরওয়েজিয় সাহিত্যের আলোচনা আমাদের বর্ত্তমান literary fashion দেহের সজ্জার মত মনের সজ্জাতেও আমরা নিজেদের সগৌরবে আধুনিক বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করে থাকি। বাহিরের পরিচ্ছদে যেমন পরিচ্ছন্নতার চেয়ে আধুনিকতার প্রতি আমাদের সমধিক লক্ষ্য, মনের সজ্জাতেও তেমনি স্বচ্ছতা ও গভীর উপলব্ধির চেয়ে নূতন নূতন কথা অস্পষ্ট এবং অসংলগ্নভাবে জানার আমরা একান্ত পক্ষপাতী। এর এক অবশ্যম্ভাবী পরিণাম আছে। সে পরিণাম এই—কোনো fashionএর প্রবর্ত্তন কালে একদল তার সম্পূর্ণ সমর্থন অন্য একদল তার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করেন। শেষোক্তের বিরুদ্ধ আচরণে fashion এর প্রতি বিরোধ থাকে না, থাকে উক্ত fashionএর প্রবর্ত্তকের প্রতি। এই বিরোধের মূলে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নেই; যা আছে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় তার নাম inferiority complex। আমাদের দেশে এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য যখন প্রথম এদেশে literary fashion হয়ে ওঠে তখন একদল রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ করতেন সেই মনোভাব নিয়ে, যে মনোভাববশতঃ তাঁরা নূতন ধরণের দৈহিক পরিচ্ছদ পরিধান করতেন। আর দ্বিতীয় দল রবীন্দ্রনাথের কাব্যের তারস্বরে নিন্দা করতেন যেহেতু পূর্ব্বোক্ত দল যে নূতন কোনো কবিকে আবিষ্কার করেছেন এ চিন্তায় তাঁদের মণপ্রাণ হাহাকার ক'রে উঠত। এই মনোভাব নিয়েই তাঁরা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাইকেলকে বড় ব'লে সগৌরবে ঘোষণা করতেন। আজকাল বিনা যুক্তি এবং প্রমাণে হামসুনের চেয়ে হার্ডিকে বড় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টায় সেই একই মনোভাব পাঠ করা যায়। প্রথমোক্ত মনোভাব যে আসলে মনশ্চক্ষুর অভাব তার প্রমাণ এই,—হামসুনের ভক্তরা তাঁদের প্রিয় শিল্পীর লেখার নিন্দায় হাসেন না,—ক্রুদ্ধ হন্। ধোঁয়ার স্পর্শে সূর্য্যের আলো যে কালো হয় না এ অতি সহজবোধ্য সত্য; সূর্য্যের আলো সম্বন্ধে আমাদের চক্ষু যখন সন্দিহান সুধু তখনই আমারা ধোঁয়া দেখলে ভয়ে ভীত হই।

সুতরাং দেখা গেল, আমরা অনেকেই হামসুনের লেখার প্রশংসা করি fashionএর চরিতার্থতার জন্য, এবং নিন্দা করি আমাদের inferiority complex নামক মানসিক ভাবের প্রবল তাড়নায়। হামসুনের সত্য স্বরূপের সন্ধিৎসা আমাদের কাছে নিষ্প্রোজন যেহেতু হামসুনের রূপের চেয়ে নাম আমাদের কাছে অধিক সার্থক এবং সত্য। কিছুদিন পরে হামসুনের স্থান হয়তো আধুনিক জগতের অন্যান্য বড় বড় লেখক, যেমন আইসল্যাণ্ডের Guner Gunnarson, Gudmundar Fridjonson, ফিন্ল্যাণ্ডের Johannes Linnakooki, Silanpaa, জাপানের খ্যাতনামা লেখিকা Xayoi Nogami প্রভৃতির যে কেহ গ্রহণ করবেন, এবং তখন আমরা হয়তো শুধু চুরুচ্চার নামের স্মরতিক্রিয়া মোহে মুগ্ধ হয়ে পরম উৎসাহে নূতনের চতুষ্পার্শ্বে মধুচক্র রচনা করতে থাকব।

---

(২) বার্ণার্ড শ তাঁর Quintessence of Ibsenism পুস্তকে একটী প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। সেক্স্পীয়র মলিয়ার ডিকেন্স্ আমরা নির্ব্বিকারে পাঠ করি কিন্তু ইবসেন ষ্ট্রিণ্ড্বার্গ, ব্রিউ পাঠে মনে হয় যেন আমাদের মনোজগতের অর্দ্ধেকটা ভূমিকম্পে নেমে গেল; আমাদের পূর্ব্ব সঞ্চিত সংস্কার, বিশ্বাস, আইডিয়ার উপর আধুনিক লেখকদের এই প্রভাব কোথা থেকে আসে? এ প্রশ্নের উত্তরে বার্ণার্ড শ যা বলেছেন, নরওয়েজিয় সাহিত্যের আলোচনা কালে সে উত্তর জানা একান্ত আবশ্যক।

ধূলট

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী চৈত্রের 'মাতৃমন্দিরে' সেকালের ধূলট উৎসবের নিম্নলিখিত চিত্র আঁকিয়াছেন—

অনেক দিন আগেকার কথা বলিতেছি। দোলের শেষ দিনকে ভাঙ্গা দোল বলে; সেদিন মহাপ্রভু শ্যামরায়জী দোলবেদী হইতে নামিয়া নিজ মন্দিরে চলিয়া যাইতেন। হাট বাজার সব উঠিয়া যাওয়ায় পথ-ঘাট খালি হইয়া যাইত; কেবল আবীর ও ধূলায় চারিদিক এক অদ্ভুত দৃশ্যে পরিণত হইত। সেইদিন ধূলটের রাজা বাহির হইতেন। পুরাতন কোন আম্‌লা কি ভৃত্য নবরাজবেশে সজ্জিত হইয়া কাছারী বাড়ী রাণীসহ আসিয়া উপস্থিত হইত। রাজার শতধা ছিন্ন মলিন বস্ত্র, গলায় ছেঁড়া জুতার মালা, মাথায় কাল হাঁড়ী ও হস্তে সম্মার্জ্জনী। একজন অতি কুৎসিতা বারবণিতাকে মুড়া ঝাঁটার মালা পরাইয়া, বাড়নের (ঝাঁটা) মুকুট দিয়া, চটের শাড়ী পরাইয়া পথের আবীর মিশ্রিত ধূলায় সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত করিয়া রাজার চাদরের সহিত "গাঁটছড়া" বাঁধিয়া বধূবেশে দাঁড় করাইয়া ধান্য-খৈয়ের পরিবর্ত্তে সকলে ধূলা-বালি বর্ষণ করিত। কছারী-প্রাঙ্গণ জন কোলাহলে ও আনন্দ হাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিত। কর্দ্দম, গোময়, যাহার যাহা ইচ্ছা রাজারাণীর গাত্রে নিক্ষেপ করিত। খানিক পরে রাজা তক্তরাজায় ও রাণী ডুলীতে চড়িয়া গ্রাম ভ্রমণে এবং খাজনা আদায়ে বহির্গত হইতেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই অজস্র জনস্রোত নানারূপ হোলীর গীত গাইতে গাইতে কলরব করিতে করিতে যাত্রা করিত, ঢাক ঢোল কাঁসি উচ্চরবে বাজিতে থাকিত। মধ্যাহ্নে পুনর্ব্বার জমিদার-গৃহে রাজারাণীর শুভাগমন হইলে, রাজা জমিদার মহাশয়কে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া নজর তলপ করিতেন ও জমীদার ২৫৲ ৩০৲ টাকা ধূলটের রাজাকে সেলামী দিয়া অন্তর্দ্ধান হইতেন।। রাণীকে অন্তঃপুর হইতে নূতন শাড়ী ও কিছু টাকা গৃহিণীরা দাসীদ্বারা উপঢৌকন পাঠাইতেন। তাহার পর বাহকদের মজুরী ও নববস্ত্র দিয়া বিদায় করিতে হইত।

চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ফাল্গুনের 'প্রবর্ত্তকে' চণ্ডীদাসের প্রণয় প্রসঙ্গে লিখিতেছেন :—

বাঙ্গালার মধ্যযুগের প্রথম বড় কবি চণ্ডীদাস। তাঁহার কবিতার মধ্যে তৎকালীন সামাজিক চিত্রের আভাব বিশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়না। কিন্তু তাঁহার নিজের জীবনের প্রধান ঘটনাতে তৎকালীন সমাজের অর্গল কিঞ্চিৎ উদ্ঘাটিত হয়। চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ-বংশীয় ছিলেন, কিন্তু কালে রামী নামে এক রজকিনী তাঁহার প্রণয়ের পাত্র হয়। এই যুবতীকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"শুন রজকিনী রামী, ওদুটি চরণ, শীতল বলিয়া
শরণ লইলাম আমি।"

* * * *

তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, তুমি সে নয়নের তারা
তোমা বিনে মোর সকলই আঁধার, দেখিলে
জুড়ায় আঁখি।
যে দিন না দেখি ও চাঁদবদন মরমে মরিয়া থাকি।"

কিন্তু ব্রাহ্মণের রজকিনীর সহিত প্রণয়, ব্রাহ্মণ সমাজ হজম করিতে পারে নাই। ইহার ফলে, চণ্ডীদাস জাতিচ্যুত হন। এই ঘটনাতে ইহা প্রতীত হয় যে বর্ণাশ্রম-জনিত জাতিভেদের বন্ধন তৎকালে বিশেষ ভাবে দূরীভূত হইয়াছিল। মহাভারতের কথিত পরাশরের সহিত

মৎস্যগন্ধার প্রেম ও তাহার ফলে বেদব্যাসের জন্ম কোন অশাস্ত্রীয় ও অসামাজিক হয় নাই। তৎপরে মনুর অনুশাসন-যে ব্রাহ্মণ চতুর্বর্ণে বিবাহ করিতে পারে, তাহাতেও হিন্দুসমাজ এককালে বিচলিত হয় নাই, এবং অর্দ্ধশূদ্র ব্যাসের এক শূদ্রানীর সহিত প্রণয়ের ফলে বিদুরের জন্ম হওয়া ব্যাপারও সমাজে অশোভনীয় হয় নাই। কিন্তু বাংলায় পৌরহিত্যাধিপত্যকালে চণ্ডীদাসের এই প্রেম সমাজের বাহিরে সংঘটিত হইলেও এবং তৎকালীন লোকাচার জন্য ইহার দ্বারা অসবর্ণ বিবাহ হইবার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও, ব্রাহ্মণ সমাজ এই অবৈধ প্রেম সহ্য করিতে পারে নাই। "সনাতন" ধারা-ধ্বজাকারীরা এ বিষয়ে কি বলেন! সমাজ দুইটা হৃদয়ের সংযোগের উপরও আইন চালাইল, পৃথিবীর সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বসময়ে একদল ব্যক্তি Exploitation নীতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানবের ব্যক্তিত্বের উপর সমাজের জোর জুলুম চালাইতে চায় ও দলের স্বার্থের জন্য মানবের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব করিতে চায়। সেই জন্য কালে সেই সমাজও পূতিগন্ধময় হয়। ইংরেজীতে একটা কথা আছে 'Love is blind, এবং ইউরোপীয় কলাচিত্রে Cuipd (পাশ্চাত্য কামদেব) মূর্ত্তিকে অন্ধ করিয়া নির্ম্মিত করা হয়। চণ্ডীদাসের স্বজাতিরা এবং এখনও যাহারা সমাজে এইরূপ জোর জুলুম করেন, তাঁহারা উপরোক্ত সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। আর এত জোর জুলুম সত্ত্বেও আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্যে বিশলক্ষ মূলাটোর (অর্দ্ধ শ্বেত ও অর্দ্ধ নিগ্রো রক্তসম্ভূত বর্ণসঙ্কর) উদ্ভব হইয়াছে, এবং আজ নৃতত্ত্ববিৎদের মতে হিন্দুরা একটি বর্ণসঙ্কর জাতিরূপে পরিগণিত হয়। এই জন্যই ইউরোপে সমাজবৈপ্লবিকেরা বর্ত্তমানের বিবাহ আইন পরিবর্ত্তিত করিতে চান!

যাহাই হউক, চণ্ডীদাস এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কারণ শেষে তিনি "রজকিনী" রামীকে ত্যাগ করিতে অস্বীকার করেন। ইহার ফলে তিনি বাকি জীবনটা জাতিচ্যুত হইয়া বাস করেন, এবং ব্রাহ্মণদের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্যই বোধ হয় বা তাঁহার প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইবরে জন্য রামীকে "বেদমাতা গায়ত্রী" বলিয়া সম্বোধন করেন। আবার, প্রেমে অন্ধ হইলে যে ভাষা প্রেমিকের মুখ হইতে নির্গত হয়, চণ্ডীদাসেরও তাহা হইয়াছিল, তিনি রামীকে 'তুমি রজকিনী আমার রমণী............তুমি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, পর্ব্বত .....তুমি সে মন্ত্র, তুমি সে তন্ত্র, তুমি উপাসনা রস" প্রভৃতি বলিয়াছেন। যাঁহারা "India is peculiar a country" (ভারত একটী অদ্ভুত দেশ) বলিয়া আজকাল সোরগোল করিতেছেন, তাঁহাদের চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে মানবের মনস্তত্ত্ব সর্ব্বত্র সমান, এবং এক অবস্থায় পতিত হইলে মানব একভাবে চিন্তা করে ও কার্য্য করে। বঙ্গভাষী চণ্ডীদাসের মুখ দিয়া এই অবস্থায় যে কথা বহির্গত হইয়াছিল, একজন ইংরেজীভাষী প্রেমিকও এই অবস্থায় তাহার প্রণয়িণীকে সম্বোধন করিয়া বলে "you are everything to me" (তুমি আমার সর্ব্বস্ব) এবং একজন জর্ম্মণভাষী প্রেমিক বলে 'Du bist maine welf" (তুমিই আমার জগৎ অর্থাৎ সর্ব্বস্ব!)

চণ্ডীদাস অনেক সামাজিক নির্য্যাতন সহিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে এক মহাসত্য তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল যে "মানবের উপর বড় আর কিছুই নাই" মানব নিজের ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষতা সাধন করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমাজের সৃষ্টি করে, কিন্তু কালে মানবসমাজ সেই উদ্দেশ্য বিস্মরণ করিয়া লোকপীড়নের যন্ত্রস্বরূপ হয়। মানব সমাজ সর্ব্বত্রই এক্ষণে এই দুরাবস্থায় পতিত হইয়াছে। যদি চণ্ডীদাসের স্বদেশের লোকেরা তাঁহার উপরোক্ত ঐ মহান উক্তিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত, তাহা হইলে বাঙ্গালী জগতে আজ পতিত হইয়া এত হেয় হইত না। বিধি নিয়মের নামে, ধর্ম্মের নামে সমাজ কেবল তাহার সভ্যদের পীড়ন করিয়াছে, সেইজন্য আজ বাঙ্গলার অর্দ্ধেকের উপর লোক অহিন্দু এবং সমাজ-আইনের মর্য্যাদা রক্ষার নামে সমাজের চক্ষের উপর "অসামাজিক কর্ম্ম" ও "ব্যভিচার' চলিতেছে, আর হিন্দু সমাজের শক্তি নাই যে নিজের প্রাচীন আইন ও বিধিনিষেধ পরিবর্ত্তিত করিয়া যুগধর্ম্মানুযায়ী অসামাজিক কার্য্যকে সামাজিক করিয়া লয়। যে আইন এক কর্ম্মকে অসামাজিক ও ব্যভিচার বলে, সমাজ সেই আইন পরিবর্ত্তিত করিলে তাহা সামাজিক ও সমাজগ্রাহ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। হিন্দুসমাজ নিজের অস্বাভাবিক ও অকেজো বিধিনিষেধগুলিকে আঁকড়িয়া আছে বলিয়াই চণ্ডীদাসের ন্যায় অনেককে এখনও নির্য্যাতনাভোগ সহ্য করিতে হয়। যদি সমাজ এই প্রকারের ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিবাহ করিবার অনুমতি দেয়, তাহা হইলে ইহা বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে ও ব্যভিচারও হইবে না।..."

নানা কথা

কয়েকটি ভদ্রব্যক্তি এবং ভদ্রমহিলার যত্নে এবং উদ্যোগে সম্প্রতি কলিকাতায় সাহিত্য-সঙ্গত নামে একটি স্ত্রী-পুরুষের মিলিত সমিতি স্থাপিত হয়েচে। বিগত ১৫ই বৈশাখ ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে বিচিত্রা গৃহে উক্ত সমিতির উদ্বোধন উৎসব হয়। উৎসবে বহু সংখ্যক পুরুষ এবং ভদ্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গতের অন্যতমা সহঃ সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী মহোদয়ার নির্দ্দেশে যন্ত্র এবং কণ্ঠ সঙ্গীতের ব্যবস্থা শ্রোতৃবর্গের পক্ষে বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল। সঙ্গতের স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হৃদয়গ্রাহী ভাবে অতিশয় সহজ সরল ভাষায় সঙ্গতের উদ্দেশ্য এবং সঙ্কল্পিত ধারা ব্যক্ত করেন এবং তদবসরে, পারিবারিক গণ্ডির বাইরে সমাজের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের যে সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপিত বাঞ্ছনীয়, তদ্বিষয়ে তিনি বহু সারগর্ভ কথা ব'লেন। সঙ্গতের নামের সহিত সাহিত্য কথাটি জড়িত থাকলেও সাহিত্যই সঙ্গতের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; সাহিত্য শিল্প এবং সঙ্গীতের অবলম্বনে পরস্পরের মধ্যে একটা সহজ সামাজিকতা এবং সৌহৃদ্যের সৃষ্টিই প্রধান উদ্দেশ্য। স্ত্রী জাতিকে বর্জ্জন না করে এই সঙ্গত গঠনের সঙ্কল্প বঙ্গদেশে একটা নুতন প্রচেষ্টা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই;—এর সফলতা নির্ভর করছে সদস্যবর্গের সুরুচি, এবং দায়িত্ব বোধের উপর। উদ্যোগীদের মধ্যে আছেন শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, শ্রীমতি লতিকা বসু, শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপধ্যায়, শ্রীযুক্ত শিশির কুমার মিত্র, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীমতী লীলা দেবী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। সঙ্গতের দ্বিতীয় অধিবেশন সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর পরিচালনা করবেন।

* * * *

গত ২৫শে বৈশাখ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্মদিন-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভাগৃহে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করলে পুষ্পবৃষ্টি এবং শঙ্খধ্বনির দ্বারা তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়েছিল। বেদ-গান, প্রশস্তি-পাঠ, সঙ্গীত ইত্যাদি উৎসবকে পূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক করেছিল। এতদুপলক্ষে তুলাদণ্ডে রবীন্দ্রনাথকে স্থাপিত ক'রে তাঁর সমভার স্বরচিত পুস্তকাবলী ওজন ক'রে রাখা হয়েচে—যথাযোগ্য সেগুলি বাঙ্গালাদেশের গ্রন্থাগারে বিতরণ করা হবে। বহু-বহুবার এই উৎসব বঙ্গদেশে অনুষ্ঠিত হ'ক, এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

* * * *

গত ২৮শে বৈশাখ মাদ্রাজ্ মেলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সীলোন যাত্রা করেছেন। তথায় কয়েকদিন অবস্থানের পর তিনি ইয়োরোপের জন্য সমুদ্র যাত্রা করবেন। ফ্রান্সে কিছুকাল বিশ্রামের পর অক্স্‌ফোর্ডে হিবার্ট লেকচার্স দিয়ে তিনি দেশে ফিরবেন।

* * * *

চট্টগ্রামের কবি শশাঙ্কমোহন সেনের শোচনীয় মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের অন্তরের সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি। তাঁহার লেখার সঙ্গে অনেকেই পরিচিত নন্ কেননা তাঁহার কবিতা ঠিক এ যুগের উপযোগী নয়। কিন্তু তাঁহার কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য যাঁদের হইয়াছে, তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে শশাঙ্কমোহনের মধ্যে যথেষ্ট কবিত্বশক্তি ছিল।

* * * *

নবীন লেখিকা শ্রীমতী বীণাপাণি রায়ের অকাল মৃত্যুতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হয়েছি। এই লেখিকার "সঞ্জীবনী"

নামে একখানি উপন্যাস গত বৈশাখ মাসের বিচিত্রায় সমালোচিত হয়েছিল। লেখিকার লেখার মধ্যে শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল বলে আমরা উক্ত সমালোচনায় একটু বিস্তৃত ভাবে উপন্যাস রচনা-তথ্য নির্দ্দেশ করেছিলাম। লেখিকার সন্তপ্ত আত্মীয়বর্গকে আমরা আমাদের সহানুভূতি জানাচ্ছি।

বর্ত্তমান সংখ্যায় বিচিত্রার প্রথম বর্ষ শেষ হল। আগামী বর্ষে বিচিত্রার পরিচালনা যাতে সুন্দরভাবে হয় তার বিশেষ ব্যবস্থা আমরা করেছি। যে সকল গ্রাহক, পাঠক, বন্ধু ও হিতৈষীগণের কাছে আমরা সহানুভূতি ও সাহায্য পেয়েছি তাদের আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আমরা আগামী বর্ষে কাজে প্রবৃত্ত হলাম।

Printed at the Susil Printing Works, 47, Pataldanga Street, Calcutta,
by Srijut Probodh Lal Mukherjee, and published by him from 51 Pataldanga Street, Calcutta.